প্রথম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা)

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।

কলিকাতা,

১৬৬, নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-ইলেক্ট্রিক-মেশিন-প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

বর্ষ } (১৩২৯ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত)। { ১ম খণ্ড

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

চিত্র-সূচী।

ত্রিবর্ণ চিত্র—

দ্বিবর্ণ চিত্র—

একবর্ণ চিত্র—

চিত্রসূচী

রেখা চিত্র।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

১ম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩২৯ { ১ম সংখ্যা

পত্র-সূচনা।

আজ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়, তখন তাহার পত্র-সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় মাসিকপত্র প্রচারের কারণনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—"যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।" আজ আর সেরূপ কারণ-নির্দ্দেশের কোন প্রয়োজন নাই। কেন না, তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী সাহিত্যিকদিগের সাধনাফলে বাঙ্গালায় আজ পাঠকের অভাব নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় যে সব উক্তি বিন্যস্ত করিয়াছিলেন, সে সকল সাদরে অনূদিত হইয়া বিদেশীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের রচনা অনুবাদে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। অর্দ্ধ-শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও বিশেষ সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইয়াছে।

'বঙ্গদর্শন' তাহার সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিল। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের দ্বাদশ বৎসর পরে 'প্রচারের' "সূচনায়" লিখিত হইয়াছিল—"চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বানচাল হইয়া গেল।" তখন 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব' প্রভৃতিরও সেই দশা হইয়াছিল; কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নাই। সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' চারি বৎসর যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছিল—কিন্তু সে জন্য বাঙ্গালী পাঠকসমাজকে দায়ী করা যায় কি না, সন্দেহ আজ 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী' ও 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্র নিয়মিতভাবে প্রচারিত ও পঠিত হইতেছে। সমাজপতির 'সাহিত্য' ও দেবীপ্রসন্নের 'নব্য ভারত' আকারে ছোট হইলেও বঙ্গীয় পাঠকসমাজে আদর-লাভে বঞ্চিত হয় নাই।

বাঙ্গালীর পাঠকসমাজের পরিসরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও মাসিকপত্র-প্রচার সম্ভব হইয়াছে। ভাবের প্রচার যত অধিক হয়, উন্নতির পথ ততই জাতির পক্ষে সুগম হয়। সেই জন্য আমরা যথাসাধ্য সাহিত্যের সহায়তায় দেশের সেবা করিবার জন্য এই পত্রিকার প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মা'র আশীর্ব্বাদ ও বঙ্গীয় পাঠকদিগের প্রীতি লাভ করিতে পারিলে আমরা শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কোন কোন সাময়িক পত্রে রাজনীতিক কথার আলোচনা বর্জ্জিত হয়। আমরা তাহা করিব না। আজকাল রাজনীতিক সমস্যাই দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি রাজনীতিক উন্নতিসাপেক্ষ। সেই জন্য আমরা রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা করিব। বিজ্ঞানের কথা—শিল্প-বাণিজ্যের কথা—ঐতিহাসিক কথা—কৃষি প্রভৃতির উন্নতির

আলোচনা—সামাজিক সমস্যার আলোচনা—এই পত্রিকায় থাকিবে। আর পাঠকদিগের চিত্তবিনোদন করিবার উদ্দেশ্যে গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। যাহাতে ইহার চিত্রসম্পদ্ প্রবন্ধগৌরবের উপযোগী হয়, সে দিকেও আমরা দৃষ্টি রাখিব।

এই সঙ্কল্প লইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। লেখক, চিত্রকর ও পাঠকদিগের সহায়তা ব্যতীত এ কার্য্যে সাফল্যলাভ করা সম্ভব নহে। আমরা আশা করি, আমরা সে সহায়তালাভে বঞ্চিত হইব না।

প্রথম বর্ষণ।

নিদাঘ-জ্বালা জুড়াল আজ প্রথমাসার বরষণে
ভস্ম হ'তে জাগ্‌ল জীবন শান্তিজলের পরশনে।
ধরাসতী পারণ ক'রে দীর্ঘ উপবাসের পরে
চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গে প্রণাম করে পুরন্দরে।
সদ্যঃস্নাতা দিগ্‌বধূরা ধূপের ধোঁয়ায় শুকায় কেশ
নভঃসতীর নীল-নয়নে অমল আলোর নবোন্মেষ।
দীর্ঘ পর্য্যটনের শেষে বিশ্বলোক আজ চিত্ত ভরি'
তীর্থসিনান ক'রে যেন উঠ্‌ল স্তবের মন্ত্র পড়ি।

আজকে বহে লঘু পবন রজঃশূন্য সত্ত্বময়
গোষ্ঠমাতার প্রাঙ্গণে আজ উশীর-মূলের গন্ধ বয়।
বারুণীর আজ অরুণ আঁখি কারুণ্যে যে এলো ভ'রে
তারুণ্যের আজ অধিবাসন জীর্ণ-জরার ঘরে ঘরে।
ঘাটে-বাটে মাঠে মাঠে পুণ্যাহেরি বাজ্‌ল বাঁশী
লক্ষ্মীমায়ের বোধন-কুম্ভ গৃহে গৃহে ভর্‌ল চাষী।
তরুলতার পাতায় পাতায় নূতন খাতার নিমন্ত্রণ
ক্ষেত্র-মাতার শষ্পগৃহে আজকে শুভ পুংসবন।

তড়াগরাণী তুল্লে বদন কুমুদ্বতীর বিকসনে
ভ্রমর আবার গুঞ্জরিল চমকিত কমল-বনে।
সারস করে শঙ্খনাদে সরোরমায় আবাহন
মরাল রচে পুণ্ডরীকে শ্বেতবরণীর সিংহাসন।
দীঘির আঁখি চপল হ'ল আজ সফরীর চটুলতায়
কণ্ঠ তুলে মর্ম্মকথা কূর্ম্মী আজি কূর্ম্মে জানায়।
ডুবায়ে আজ তড়াগ-বাপীর আর যত সব হর্ষবাণী
মহোৎসবে প্রখর মুখর ভেকেরা সব ঐক্যতানী।

নীপবালার কর্ণে কে আজ কইলে প্রথম প্রণয়-কথা
আজ কেতকীর কুঞ্জশালায় উঠ্‌ল হঠাৎ প্রসব-ব্যথা।
চীনকরবী হৃদয়ঘটে ঘনামৃতই সঞ্চি' রাখে
রুগ্নকলি স্তন্যসম বিন্দু বিন্দু পিতেই থাকে।
শিলীন্ধ্রেরা ধর্‌ল ছাতা নবীন তৃণাঙ্কুরের শিরে
রসাবেশ আজ অঙ্কুরিত রুক্ষ তরুণ চর্ম্ম চিরে।
লকলকিয়ে উঠ্‌ল জীবন নারিকেলের নূতন মাজে
তালীবনের দেউড়ি-চূড়ায় কলকূজন ন'বৎ বাজে।

ঘর থাক্‌তে ভিজল বাবুই আনন্দে আজ অকারণ
চাতক করে কাজরীতে আজ চাতকীরে সম্ভাষণ।
পতঙ্গেরা নবান্ন আজ করে ফুলে মহোল্লাসে
মাতঙ্গেরা পল্বলে আজ মাত্‌ল নব জলোচ্ছ্বাসে।
শুষ্ক-শীর্ণ গুঞ্জালতা আজকে পীন পর্ণায়ত
আশু পরিণয়ের আশে রুগ্না কৃশা বালার মত।
হঠাৎ শ্যামল বন্যা এলো ঘাটে মাঠে বনে বনে
বনশ্রী ভ্রূবিলাস রচে নয়ন ভুষি রসাঞ্জনে।

সঞ্জীবনের আনন্দ কি শুধুই আজি বিশ্ব জুড়ে
কতই নিধি হারিয়ে আজ কত হৃদিই ব্যথায় ঝুরে।
ঝড়-ঝাপ্‌টা শিলার ঘায়ে কত বুকই হলো ক্ষত
কত কুলায় লুটল ধূলায়, ঝ'রে গেল মুকুল কত।
ক্ষুদ্র ক্ষতি ক্ষুদ্র ক্ষত—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনারা
বিরাট লাভের রুদ্রহর্ষে হারিয়ে গেল চিহ্নহারা।
জাগাইয়া ঝঞ্ঝাঘাতে ধারাপাতে সঞ্জীবিয়া
নিদাঘ-নীরদ গেল আজি দেবের আশীষ বরষিয়া।

শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ।

১২৪২ সাল, ৬ই. ফাল্গুন, বুধবার (খৃঃ ১৮৩৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারী.) বাঙ্গালীর একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ধর্ম্মজগতের নবযুগ-প্রবর্ত্তক শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন সুদূর সাগরপার হইতে প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের সিংহনাদে হিন্দুর চিরন্তনসংস্কারমূলক অতীন্দ্রিয় জগতে বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে। জলে স্থলে বিপুল অধিকার বিস্তার করিয়া জড় বিজ্ঞানের বিজয়-ভেরী বাজিতেছে। কঠোরতপঃপরায়ণ স্বার্থশূন্য বৈজ্ঞানিক জনহিতকামনায় জড় প্রকৃতির ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন। নিগূঢ় রহস্যময়ী প্রকৃতি সাধকের একনিষ্ঠ সাধনায় সদয় হইয়া এক দিকে বরাভয় প্রদর্শনে তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন; অন্য দিকে অসি-মুণ্ডের ইঙ্গিতে সংহার-শক্তি-সাধনায় সাধক সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তখন অষ্ট শতাব্দীর কষ্টসহিষ্ণু জীর্ণ অস্থিপঞ্জর ও উপহাসাস্পদ নাম ভিন্ন হিন্দুর আর আপন বলিবার কিছু ছিল না। পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্য-ললিতকলার সম্মোহন প্রভাব তাহার স্বভাব বিকৃত করিয়া ধর্ম্মে কর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে বিজাতীয় রুচির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান-দীক্ষিত হিন্দু শিখিয়াছে যে, কাম-কাঞ্চন-ত্যাগ আত্ম-বঞ্চনা মাত্র, ঐহিক ভোগ-বিমুখতা মূর্খতা; আত্মা, পরলোক, ঈশ্বর কবির কল্পনা; জীবনের চরম লক্ষ্য, ঐহিক ভোগ এবং উচ্চ আদর্শ—লোক-কল্যাণ-বিধান। কলিকাতা তখন ভারতের রাজধানী, বিজাতীয় শিক্ষার বিষময় কেন্দ্র। এই বিজাতীয় ভাব-কেন্দ্র ক্রমে দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় সংক্রামক হইয়া উঠিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় বায়রণের কাব্য হইতে কয়েকটি কথা বাছিয়া লইলেন—

"Oh, pleasure ! you'r indeed a pleasant thing"

হে ভোগ, সত্যই তুমি আরামের,

"The best of life is but intoxication."

মত্ততাই জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ,

আর উন্নতির চরমপন্থী কেহ কেহ আবৃত্তি করিতেন—

"Pleasure's a Sin, and Sometimes Sin's a Pleasure."

আনন্দ পাপ—সময় সময় পাপই আনন্দ।

নবীনের দল সাংখ্য, শঙ্কর, রামানুজকে বর্জ্জন করিয়া ক্যাণ্ট, কমটে, শোপেনহরকে গুরুরূপে বরণ করিয়া লইলেন। দেব-দেবীর আসন টলিল, এবং কৃষ্ণের সিংহাসন অধিকার করিবার নিমিত্ত খৃষ্টের রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। এই ভয়াবহ স্রোতঃ রোধ করিবার অভিপ্রায়ে মহাত্মা রামমোহন রায় বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে প্রচার করিলেন। কিন্তু ইহাতেও আশানুরূপ ফল ফলিল না। হিন্দুর তখন বিষম দুর্দ্দিন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ধর্ম্মের এই তিন সনাতন পথ নানা মতের জটিল অরণ্যে আচ্ছন্ন। এক দিকে সুরাসেবী তান্ত্রিকদিগের উদ্দাম পাশবাচার, অন্য দিকে ভেকধারী ভক্তগণের আবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা। ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য যে ধর্ম্মের ভিত্তি, বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাই ঐহিক ভোগ-সুখ-পরায়ণ সাধককে প্রবৃত্তির পথে প্রেরণা দিতেছে। জ্ঞান অন্ধ, কর্ম্ম কুপথগামী, ভক্তি ভণ্ডামীতে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মান্বেষিগণ এই অমানিশার অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া ফিরিতে লাগিলেন। এই সময় এক দিন বঙ্গের এক নগণ্য পল্লীতে দৈন্যের চিহ্নিত কুটীরে নিশাশেষে ঊষার উন্মেষে সহসা শুভ শঙ্খরোলে ধ্বনিত হইল—"সম্ভবামি যুগে যুগে।"

যে ব্রাহ্মণ-পরিবার পবিত্র করিয়া এই অলোকসামান্য কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহা সারল্য, সত্যনিষ্ঠা, দেবভক্তি, উদারতা ও আতিথেয়তার আধারস্বরূপ ছিল। ইঁহাদের পূর্ব্ববাস ছিল—দেরেগ্রাম। জমীদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহার উৎপীড়নে নিঃস্ব হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা, ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় কামারপুকুরে স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু নিঃস্ব হইলেও ক্ষুদিরাম-গৃহিনী চন্দ্রমণি দেবী অতিথি বিমুখ করিতে পারিতেন না; আপনার মুখের অন্ন ধরিয়া দিয়া তাহার সৎকার করিতেন। পিতৃকার্য্যার্থ গয়াধামে গমন করিয়া ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখিলেন, গদাধর তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। ক্ষুদিরাম পুত্রের নাম রাখিলেন গদাধর।

গ্রাম্য পাঠশালায় 'চাল-কলা-বাঁধা' বিদ্যার্জ্জনের অপেক্ষা সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা গদাধরের প্রিয়তর ছিল। তাহার উপর

আবার "শুভঙ্করী ধাঁধা লাগিত।" কিন্তু পাড়ায় বৈষ্ণব-ভিখারীরা যে সকল গীত গাহিত, যাত্রায় যে সকল পালা এবং সঙের অভিনয় হইত, সাধু-সন্ন্যাসিগণ যে সব স্তব, বন্দনা ও ভজন আবৃত্তি করিতেন, অসামান্য শ্রুতিধরত্ব গুণে বালক সে সকল একবার শুনিয়াই আয়ত্ত করিত। পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গদাধরের মুখে এই সকলের পুনরভিনয় ও আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাহার উপর বালক যেমন প্রিয়দর্শন, তেমনই সুকণ্ঠ। দিনে দিনে বালক পল্লীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিল।

গদাধরের যখন সাত বৎসর বয়স, সেই সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারকে সংসারভার দিয়া ক্ষুদিরাম স্বর্গারোহণ করিলেন।

কিছু দিন পরে গদাধরের উপনয়নকাল উপস্থিত হইল। রামকুমার যথাসাধ্য আয়োজন করিলেন। কিন্তু বালক প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, তাহার ধাত্রীমাতা ধনী কামারিণীর নিকট প্রথম ভিক্ষা লইতে সে সত্যে বদ্ধ। অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী বংশে ইহা অসম্ভব। কিন্তু গদাধরের মুখে ঐ এক কথা— যে সত্যভঙ্গ করে, সে উপবীত গ্রহণের অযোগ্য। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কাছে পরাস্ত হইলেন। উপনয়নান্তে গৃহদেবতা রঘুবীরের পূজাধিকার পাইয়া গদাধরের সহজ ভাবপ্রবণ হৃদয় প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

ক্রমে সংসারের অভাব অনাটনে রামকুমার বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। দীন-দরিদ্র পল্লীতে ইহার কোন উপায় হইবে না ভাবিয়া রামকুমার মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের উপর সংসারের ভার দিয়া কলিকাতাবাসী হইলেন। কিছু দিন পরে গদাধরও জ্যেষ্ঠের আশ্রয়ে আসিল। তাহার বয়স তখন সপ্তদশ বর্ষ।

ইহার তিন বৎসর পরে দৈবপ্রেরণায় রাণী রাসমণি গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে দেবালয় স্থাপন করিলেন। একসঙ্গে হরিহর-শ্যামার প্রতিষ্ঠা হইল এবং ঘটনাযোগে রামকুমার প্রধান পূজক নিযুক্ত হইলেন। রামকুমার অকূলে কূল পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গদাধরেরও সাধন-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল।

গদাধরকে দেখিয়া রাণী রাসমণির জামাতা মথুর ভাবিলেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবের ন্যায় এই প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণকুমার নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক কার্য্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; এই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি অদূর-ভবিষ্যতে অমিত-প্রভায় আত্মপ্রকাশ করিবে।' মথুর বিশেষ চেষ্টায় গদাধরকে দেব-সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

কিছুদিন শ্যামা-প্রতিমার পূজা করিতে করিতে গদাধরের মনে হইল, "আমি কাহার আরাধনা করিতেছি? ইনি কি সত্যই চিন্ময়ী, না মৃন্ময়ী? মানবের আকুল প্রার্থনা কি ইঁহার কর্ণগোচর হয় না? শুনিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণ ইঁহার দর্শনে ধন্য হইয়াছেন। আমি কেন তবে বঞ্চিত হইব? মা, দেখা দাও, দেখা দাও!"

গদাধরের আকুল ক্রন্দনে শ্রীমন্দির কাঁপিতে লাগিল; এবং বোধ করি, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীও বিচলিতা হইয়া উঠিলেন। কেন না, উন্মত্ত ব্যাকুলতায় গদাধর দেবী-সমক্ষে আত্মবলি দিবার নিমিত্ত বলিদানের খড়্গ তুলিয়া লইতেই তাঁহার নয়নে দিক্-দেশ-কাল তিরোহিত হইয়া প্রতিভাত হইল—কেবল এক অনন্ত ভাবময়ী চিদ্ঘন করুণা-মূর্ত্তি। এইরূপে প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ ও ব্যাকুলতা সহায়ে দেবীদর্শনে সিদ্ধকাম হইয়া গদাধরের সাধনার প্রথম চারি বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর চন্দ্রমণি দেবী ও মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর গদাধরের বিবাহ দিলেন। ইহার পর দীর্ঘ অষ্টবর্ষকাল শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সাধনায় অতিবাহিত হইল। শাক্ত, বৈষ্ণব, রামাইত প্রভৃতি মতে দ্বৈতভাবের যত প্রকার সাধন-বিধি আছে, একে একে সকলগুলিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া গদাধর অবশেষে অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন হইতে তাঁহার নাম হইল—রামকৃষ্ণ। সাধারণ সাধকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অতি দুষ্কর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময় লাগিত না এবং ইচ্ছামাত্রে উপযুক্ত গুরুর আবির্ভাব হইত।

অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল এবং অচিরে তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন যে, প্রচলিত সকল ধর্ম্মমতই অদ্বৈতভাবে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র; নিষ্ঠাসহকারে যে কোন পন্থা আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিলে মানব শান্তির অধিকারী হইতে পারে। এই ঐশী বাণী প্রচারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ লোকাচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-জগতে যখনই বিপ্লব ঘটে; যখন সত্য পথহারা, নিষ্ঠা নিরাশ্রয়, বিবেক বিমূঢ়; ভোগ রোগরূপে পরিণত হয়;

যখন সারল্যের মুখে শঠতার কপট হাসি ফুটিয়া উঠে, ত্যাগ আত্মহত্যা, সংযম স্বেচ্ছাচার এবং প্রেম হীনসেবা করে; যখন ধর্ম্ম ধুলায় পড়িয়া গায় আবর্জ্জনা মাখে, বিশ্বাস সংশয়-দোলায় দুলিতে থাকে, ভ্রান্তির ছলনায় নিপীড়িতা শান্তি পরিত্রাহি ডাকে; তখনই এইরূপ এক জন অলোকসামান্য পুরুষ দর্শন দেন। জীবনের শুভ্রপত্রে স্বর্ণাক্ষরে ইঁহারা যে পবিত্র ইতিহাস লিখিয়া যায়েন, তাহার আলোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীতি জন্মে যে, ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, শ্রীভগবানের উপর অচলা ভক্তি, অটল ভালবাসা এবং অনন্যনির্ভরতাই জীবনের পরমপুরুষার্থ; কামকাঞ্চনানুরাগী মানক যে শান্তি খুঁজিতেছে, তাহা ভোগে নাই, আছে কেবল ত্যাগে। সংসারী মানব কিরূপে সে অমূল্য রত্নের অধিকারী হইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বৈভবশালী মথুর তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া, বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরাইয়া স্বর্ণপাত্রে আহার্য্য দিতেন, সোনার আল্‌বোলায় তামাক খাওয়াইতেন। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্য-বিলাসের সন্ধিস্থলে থাকিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ ভোগে নির্লিপ্ত, দার-পরিগ্রহ করিয়াও ব্রহ্মচারী। ভবিষ্যৎ ভরণ-পোষণের জন্য মথুর তাঁহার নামে বিষয় লিখিয়া দিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে, "তুই আমায় বিষয়ী করতে চাস্" বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ লাঠী লইয়া তাড়া করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী অর্থ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়াছিলেন, "মা, তোর কাছ থেকে যা'রা আমাকে তফাৎ করতে চায়, তাদের এখানে আনিস্ কেন ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ঈশ্বরলাভ। কিন্তু হায়, কে সে স্পর্শমণির অন্বেষণ করে? যখন জীবনের জোয়ারে অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া সারি গাহিতে গাহিতে মানুষ সৌভাগ্যের স্রোতে ভাসিয়া যায়, যখন আশা না করিতে পাশায় পোয়া-বারো পড়ে এবং ধূলিমুষ্টি স্বর্ণরাশিতে পরিণত হয়, তখন সে মনে করে, ঈশ্বর কাপুরুষের আশ্রয়। কিন্তু যখন সারাণি ভাঁটায় হালে পানি পায় না; পোয়াবারো পাড়িতে পঞ্জুড়ি পড়িয়া জিতের বাজি হারি হয়; যখন কামনার প্রসূন কেবল মাকাল ফল প্রসব করে; যখন মানুষ দেখে যে, দুরাশার রক্ত-পিপাসা দুষ্পূরণীয়; আশা যায়, তৃষ্ণা ফুরায় না; স্বপ্ন ছুটে, মোহ টুটে না; আর উপায় থাকিতে উপায় জুটে না; তখন হতবুদ্ধি মানব বুঝিতে পারে, সে কত অসহায়, কত দুর্ব্বল। তখন সে বুঝিতে পারে—রোগ, শোক, বিঘ্ন, বিপত্তি, মৃত্যুভয়-সঙ্কুল সংসারে ঈশ্বরই একমাত্র সহায়, সম্পদ্, বন্ধু। কিন্তু কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া সে তাঁহাকে লাভ করিবে? এইরূপ সংশয়াকুল-চিত্তে হতাশার অমানিশায় উষালোক প্রস্ফুটিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "মত—পথ। নিষ্ঠা সহায়ে অগ্রসর হও, তাঁহাকে লাভ করিবে।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

কে ডাকে ?

উঠিতেছে স্বর ভেদি অন্তঃপুর,
　　কে ডাকে মধুর স্বরে ?
শুনে সে আহ্বান চমকিত প্রাণ,
　　যেন রে কাহার তরে !
কোথা হ'তে আসে এ স্বর ভাসিয়া
　　কে ডাকে এমন ক'রে ?

যেন ঘুমের মাঝারে ফোটে রে স্বপন
　　ছায়া কায়া রূপ ধরে ;
যেন শত জনমের কাতর আহ্বান
　　শত মরণের কোলে
মিলি এক সাথে তুলিছে ধ্বনি এ
　　করুণ মধুর রোলে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

তুষানল। *

"কে তুমি বসিয়া এই বটমূলে,
উতল নয়ন, উদাস বেশ?
অহে বৃদ্ধ নর জীর্ণ কলেবর
কোথায় জনম, কোথায় দেশ?
এ মধু-বাসরে সুখের বসন্তে
না হেরিছ চখে বসন্ত-খেলা,
না হেরিছ আহা নবীন তরুণ
কিসলয়-মাঝে বিহঙ্গ-মেলা!
না শুনিছ মরি কিবা সুললিত
মধুর কূজনে পূরিছে বন!
কিবা কুহুস্বরে ডাকিছে কোকিল
অতুল আনন্দে আকুল মন!
মলয়েতে নাড়ি ভ্রমে কত সুখে
আজি এ বসন্তে কতই লোক;
নাহি কি তোমার দারা সুত কেহ
নিকটে রাখিয়া জুড়াতে শোক?
আজি বসুন্ধরা হাসিছে হরিষে
ভাসিছে আনন্দে ভারতভূমি,
কি শোক-হুতাশে বসিয়া একাকী
বিরলে এখানে কাঁদিছ তুমি?"
বলিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াই,
অমনি সহসা প্রসারি কর,
পাষাণ জিনিয়া কঠিন অঙ্গুলি
রাখিল আমার স্কন্ধের' পর।
শিরেতে জটিল শ্বেতবর্ণ কেশ
তুষার যেমন কিরণময়,
প্রদীপ্ত প্রশস্ত ললাট-উপরে,
জ্বলন্ত পাবক নয়নদ্বয়!
"আমার কাহিনী শুনিবে বিদেশি,
জানিবে কেন এ বিরলে বাস?
অহে যুবাজন দাঁড়াও ক্ষণেক
শুন তবে কেন হৃদে হুতাশ।"

বলিল গম্ভীর বচনে সে প্রাণী,
কটাক্ষে বাঁধিয়া কটাক্ষ মম;
বচন-লহরী শ্রবণ-কুহরে,
পশিল জ্বলন্ত শলাকা সম।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কহিল "সুরভি, বসন্ত সে দিন,
এমনি শীতল পবন ছুটে;
হাসিয়া হাসিয়া সুবাস ছড়ায়ে
এমনি সোহাগে কুসুম ফুটে;
এমনি মধুর মৃদুল হিল্লোল
সরোবর-নীরে নাচিয়া ধায়;
চারু তরুচ্ছায়া এমনি সুন্দর
সলিলে পড়িয়া শাখা দুলায়।

* অনুমান ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের প্রথম খণ্ড 'কবিতাবলী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরেই, হেমচন্দ্র এই কবিতাটি রচনা করেন। 'তুষানল' ও 'ভারতসঙ্গীত' একত্র মুদ্রিত করিয়া কোন কোন বন্ধুকে তিনি উপহার দিয়াছিলেন এবং তৃতীয় সংস্করণের কয়েক খণ্ড পুস্তকের শেষভাগে উহা বাঁধানও হইয়াছিল। কিন্তু 'তুষানল' কবিতাটি হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না।—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

অপরাহ্ণ দিবা, বেড়াই সেদিন
ভ্রমিয়া নগর নগর-তল,
শুনি প্রাণ ভোরে প্রাণি-কোলাহল,
যৌবন আশ্বাসে হয়ে বিহ্বল ;
সুখে নিমগন সকলেই হেরি,
সুখে নিমগন আমার (ও) প্রাণ,
বেড়াই আনন্দে জনমভূমিতে
ভাবিয়া ভূতলে অতুল স্থান।
ক্রমে সন্ধ্যাকাল ঢাকিল মেদিনী
আকাশে পড়িল নিশির ছায়া,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সে মৃদু তিমিরে
নিরখি অপূর্ব্ব রমণী-কায়া—
করেতে ধারণ রতন-মুকুট
ভাঙ্গিয়া পড়েছে শিখরভার,
চারু কণ্ঠমূলে ছিন্ন কণ্ঠমালা
মাণিক্য মুকুতা ঝরিছে তার ;
ঝুলিছে অাঁচল ভূমিতে লুটায়ে,
সহস্র চীরেতে ঝরিছে ধূলি,
কপালে পদাঙ্ক নেত্রে জলধারা,
বিশাল কবরী পড়েছে খুলি ;
এখন(ও) পূর্ব্বের যৌবনের তেজ
ফুটিছে আননে মৃদু ছটায়,
এখন(ও) অসীম মাধুরী অঙ্গেতে
নয়ন জুড়ায়ে প্রকাশ পায়।
'তনয়' বলিয়া আসিয়া নিকটে
স্নেহেতে আমায় করিল কোলে,
'বাছা এ দুখিনী ভারত-জননী'
বলিল মধুর অমৃত বোলে,
'বাঁচাও আমারে আর নাহি পারি
সহিতে যাতনা হৃদয় ফাটে ;
* * * * * *
* * *
ছিল আগে আশা এখন(ও) বাঁচিয়া
আছয়ে আমার অপত্যগণ,
এখন(ও) সবল শিরাতে তাদের
আর্য্যের শোণিত করে ভ্রমণ।

বৃথা কি সে আশা ? মিছা কি রে ভবে ?
নাহি কি আমার কুমার-মাঝে
নাহি কি রে হেন কেহ এক জন
মা'র কষ্ট যার হৃদয়ে বাজে ?
কেহ কি রে নাহি এ বিপুল দেশে
এখন(ও) যেখানে আর্য্যের বেণু,
প্রতিধ্বনি করে শিলায় শিখরে,
পবিত্র যাহার প্রত্যেক রেণু ;
নাহি যেথা স্থান বারি, তরু, গিরি,
নিরখিলে যায় হৃদয়-মাঝে
আর্য্য বেণুধ্বনি শ্রবণ বিদারি.
পরাণ বিন্ধিয়া হৃদে না বাজে ;
পরশে যাহার প্রতি রেণুভাগ,
শরীর মানস পবিত্র হয়,
প্রভাত, মধ্যাহ্ন নিশীথে যেখানে
অপূর্ব্ব সঙ্গীত-নির্ঝর বয়—
কাপুরুষ তারা তেয়াগি পৌরুষ
জগতে যাহারা বাঁচিতে চায় ;
জীবের আরাধ্য জীবন লভিতে
সহস্র জীবন বিনাশ পায়।
নাহি কর ভয় অহে আর্য্যসুত
পিতৃপদচিহ্ন ভারত-অঙ্গে
রয়েছে অঙ্কিত নিরখিয়া চিহ্ন
হও অগ্রসর উৎসাহ-রঙ্গে ;
তব পিতৃকুল অসাধ্য সাধন
করি যুগে যুগে স্থাপিল পথ,
স্থির নাহি রহ হও অগ্রসর,
পুরাও তাঁদের আশা মহৎ।
এ রঙ্গভূমিতে যে নারে ছুটিতে
তেয়াগি জীবন-সঙ্কট ভয়,
সে নহে পুরুষ জীবের জঘন্য,
জীবন থাকিতে জীবিত নয়।
হে ভারত-সুত ভেবো সার কথা
সমাজ-শিখরে দিনেক বাস,
সেহ শ্রেয়স্কর জিনি যুগকাল
সমাজ-অরণ্য-মাঝে প্রবাস—

কাপুরুষ তা'রা তেয়াগি পৌরুষ
জগতে যাহারা বাঁচিতে চায়,
জীবের আরাধ্য জীবন লভিতে
সহস্র জীবন বিনাশ পায়।
বৃথা কি রে হায় বৃথা কি এ রব
নিয়ত প্রবেশে শ্রবণ-মূলে?
বৃথা কি ভ্রমিনু এতকাল তবে
কাঁদিয়া ডাকিয়া ভরতকুলে?
বৃথা কি রে তবে রুধির-তরঙ্গে
গেল ধৌত করি ধরণীতল
মম পুত্রগণ, এ পুণ্যভূমিকে
করিতে এ হেন নরকস্থল?
হে কমলযোনি, আমার কপালে
এই যদি আগে লিখিয়াছিলে,
তবে কি কারণ নৃসিংহরূপীকে
হিরণ্যকশিপু বধিতে দিলে?
কেন দেবগণ দিয়া নিজ তেজ
সাজালে মহিষমর্দ্দিনী বালা?
কেন নারী হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী
সহিলা নিশুম্ভ-সমর-জ্বালা?
কেন নাহি দিলে রামের সীতায়
গৃহিণী হইতে রাবণ-ঘরে?
এ দণ্ড মুকুট এ রত্ন-ভাণ্ডার
রাখিলে হে বিধি কাহার তরে?'
বলিতে বলিতে গলিতাশ্রুমুখী
কাতরে চাহিয়া আমার মুখ,
নিক্ষেপি অন্তরে রতনের দণ্ড,
কিরীট আছাড়ি প্রহারে বুক।
সেই দিন হ'তে ভ্রমি দেশে দেশে
দিবস-শর্ব্বরী বিরাম নাই,
ভারত-ভূমিতে জননী-যন্ত্রণা
অন্তরে ভাবনা কিসে ঘুচাই।
যাই দেশে দেশে নগর নগরী,
অটবী অচল যেখানে যাই,
'জননী' বলিলে অমনি কে যেন
সম্মুখে দাঁড়ায়ে দেখিতে পাই—

ভীম কলেবর ভীষণ ভ্রূকুটি
ইঙ্গিতে অঙ্গুলি ওষ্ঠেতে তুলি,
হুতাশনময় দানব-দম্ভোলি
হৃদয়-উপরে রাখয়ে খুলি;
না পারি সহিতে সে বিষম তেজ
অন্য কোন দিকে ছুটিয়া যাই,
আবার সম্মুখে সেই ভীমকায়
দুর্জ্জয় পুরুষ দেখিতে পাই;
হয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হারাইয়া জ্ঞান
শতদ্রু-সলিলে পশিতে চাই,
বিকট-মূরতি পুরুষ সে জন
নিবারি তর্জ্জনী ধীরে হেলাই,
করিয়া গর্জ্জন কহিল 'বাতুল,
আত্মঘাতী হয়ে কি ফল পাবি?
দিব মন্ত্র কানে সাধনেতে যা'র
যাতনার জ্বালা ভুলিয়া যাবি।
সেই মন্ত্র জপ কর কিছু কাল
পারিবি আবার পূরাতে সাধ,
জননী বলিয়া ডাকিয়া আনন্দে,
ঘুচাতে তাহার চির-বিষাদ;
সে ভগ্ন কিরীটে নূতন মাণিক
পরাইতে পুনঃ পাবি অশেষ,
পাবি রে নির্ভয় হৃদয়ে বলিতে
এই সে ভারত আমার দেশ।'
দিল মন্ত্র কানে, শিখিনু যতনে
তাঁ'র দেশী ভাষা স্বদেশী ছাড়ি,
কত আশালতা কত সুখবীজ
পরাণ হইতে ফেলি উপাড়ি।
হল্লা কত কাল জপি সেই জপ
তবু আরাধনা নাহিক ফলে,
আরো সে দ্বিগুণ হুতাশে এখন
বাসনা-ইন্ধন হৃদয়ে জ্বলে;
ছিল আগে আঁটা প্রাণের কপাট,
কিরণ প্রবেশ না হ'ত তায়—
শরীর দুর্ব্বল মানসে আগুন
গুরুবীজমন্ত্রে পরাণ যায়।

কেন সুধামাখা সেই হলাহল
অবোধ হইয়া করিনু পান,
না পারি ভুলিতে জ্ঞান-সুধাস্বাদ,
বাসনা-বিষেতে শুকায় প্রাণ।"
বলিয়া প্রাচীন ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
যুবারে চাহিয়া কহে তখন—
"কেন নাহি হাসি এ সুখ-বসন্তে
শুনিলে বিদেশী যুবা এখন ?

জানি হে হাসিতে শুন রে বালক,
হাসিবার দিন যখন হবে,
ভারত-কিরীটে নূতন মাণিক
আনন্দে আবার পরাবে যবে,
বৃটন সহায় অন্তরে অভয়
হইব যখন হাসিব তবে।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বুরহানপুরে।

এই কি সে সৌধ ? সেই রাজ-রূপসীর
হেম-অঙ্গ ধরি রাখে বুকের ভিতরে !
এই কি সে ভূমি ? যথা রাজ-নেত্র-নীর,
প্রেমের করুণ শোকে ঝরিল নির্ঝরে !

যে প্রেমে রচিত তাজ দূর আগরায়,
তোমারি মহিমা লয়ে হে বররমণি !
সে স্মৃতি জড়িত হেথা শত সুষমায়,
প্রথম প্রেমের রাগ মুছে কি ধরণী ?

ত্যজে কি সুবাস কভু কুসুম ঝরিলে ?
নিদাঘে নদীর কোথা ক্ষান্ত কলস্বর ?
ঘুচে কি বসন্ত অন্তে শীততা অনিলে ?
মুছে কি হেমাঙ্গী উষা বরণ সুন্দর ?

শ্রীহীন উদ্যান, রাণি, তোমারি বিহনে,
তবুও ফুটিছে কত সৌন্দর্য্য নয়নে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

আওরঙ্গাবাদে।

সমাধি-মন্দির তব রাবেয়া দোরাণী,
স্বর্গ-চিত্র সম, এই দাক্ষিণাত্য-দেশে ;
তুমিও ত ছিলে মর্ত্ত্যে সৌন্দর্য্যের রাণী,
সম্রাট-হৃদয়ে বিশ্ব-বিমোহিনী বেশে।

প্রফুল্ল নলিনী সম স্মৃতির সম্ভার,
জাগায়ে রেখেছে হেথা গৌরব-হিল্লোলে
নন্দন-উদ্যান-কান্তি কবি-কল্পনার,
রচিত ভূতলে নীল চন্দ্রাতপতলে।

কোথা সে নগরী-শোভা—ঐশ্বর্য্য অতুল,
অতীতের লক্ষ-স্মৃতি মিশেছে ধূলায়,
তোমারি সমাধি শুধু শ্মশানের ফুল,
ফুটেছে শ্মশান-বুকে অপূর্ব্ব শোভায় !

ঘুমাও ঘুমাও, তবে, সুখের স্বপনে ;
সে দিন ফুরায়ে গেছে ভারত-ভুবনে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

লণ্ডনে জয়োৎসব।

ইংরাজকে আমি দুই রূপে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। প্রথম—যুদ্ধের সময় বিপদের কালে কঠোর সংযমীর রূপে। হইয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর যখন চ্যানেল পার হইবার জন্য খেয়া জাহাজে উঠিলাম, তখন ইংরাজের কঠোর

মহিলারা সেল প্রস্তুত করিতেছে।

দ্বিতীয়—যুদ্ধ-বিরতিকালে আনন্দোৎসবে উৎকট উচ্ছৃঙ্খলের রূপে। জার্ম্মাণ সাবমেরিণের ভয়ে যুদ্ধ-তরীর প্রহরিমধ্যস্থ জাহাজে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া, ইটালী ও ফ্রান্স পার সংযমী মূর্ত্তি প্রথম ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। কাহারও মুখে হাসি নাই—মুখে উৎকণ্ঠা, আর তাহারই সঙ্গে দৃঢ়সঙ্কল্পের ভাব যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। তখনও

জার্ম্মাণী অমিত-বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে; কিন্তু ইংরাজের আশা হইয়াছে—সে জয়ী হইবে। ইংরাজ তখনও জার্ম্মাণীর অন্তর্বিপ্লবের কথা বা জার্ম্মাণীতে খাদ্যদ্রব্যের অভাবের বিষয় জানিতে পারে নাই; তাই মনে করিতেছে—যুদ্ধ শেষ হইতে হয় ত আরও তিন বৎসর লাগিবে। এ তিন বৎসর সব কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, তবে জীবন-মরণের সন্ধি-স্থল হইতে মৃত্যুকে পশ্চাতে রাখিয়া- ধ্বংসকে উপহাস করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। এমন ইংরাজ পরিবার নাই, যাহার কেহ না কেহ যুদ্ধে জীবনদান করে নাই। সমগ্র দেশে শোকের মলিনতা।

৩টা ১৫ মিনিটের সময় বুঁলো হইতে খেয়া জাহাজে উঠিয়া যখন বিলাতে—ফোকষ্টোন (Folkstone) ষ্টেশনে উপনীত হইলাম, তখন ৫টা বাজিয়া ১৫ মিনিট। চারিদিক্ অন্ধকার—ষ্টেশনের সব ল্যাম্পের কাচে কালী-মাখান—পাছে আলো দেখিয়া উপর হইতে জার্ম্মাণ বিমান স্থান নির্ণয় করিয়া বোমা বর্ষণ করে। কালীমাখান লণ্ঠনের মধ্য হইতে যে সামান্য আলোক বাহির হইতেছে, তাহাকে আলো না বলিয়া, ইংরাজ কবি মিল্টনের ভাষায় darkness visible বলিলেই ভাল হয়। সেই সামান্য আলোকে পথ দেখিয়া—পথিপ্রদর্শকের সাহায্যে কোনরূপে আসিয়া ট্রেণের নির্দ্দিষ্ট কামরায় আসন গ্রহণ করিলাম। বিলাতের সংবাদ সরবরাহ মন্ত্রি-সভার পক্ষ হইতে ক্যাপ্টেন সণ্ট আমাদিগকে লইতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে পুলম্যান কারে বসাইয়া গাড়ীর দ্বার-বাতায়নে সব পর্দ্দা টানিয়া দিলেন, যেন ভিতরে আলো জ্বালিলে বাহিরে দেখা না যায়। তাহার পর তিনি বিদ্যুতের আলো জ্বালিলেন। অন্ধকারে পথ অতিক্রম করিয়া ট্রেণ রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটের সময় লণ্ডনের ষ্টেশনে পৌছিল। লণ্ডন অন্ধকার—ষ্টেশনে আলো—সেই ফোকষ্টোনের আলোরই মত। মোটরে উঠিলাম—অন্ধকার পথ দিয়া মোটর হোটেলের দ্বারে আসিয়া স্থির হইল। অন্ধকারে দ্রব্যাদি লইয়া হোটেলে প্রবেশ করিলাম। ঘরের দ্বার রুদ্ধ—ভিতরে আলো। কক্ষে কক্ষে বিজ্ঞাপন—পর্দ্দা না টানিয়া আলো জ্বালিলে দণ্ডিত হইতে হইবে। পথে আলো নাই—ঘরে, বিশেষ কারণ ব্যতীত, অগ্নি জ্বালান নিষিদ্ধ—কয়লা ব্যবহারে বিশেষ মিতব্যয়ী হইতে হইবে।

পুরুষরা যুদ্ধে যাইতে বাধ্য—পুরুষের অনেক কায স্ত্রীলোক করিতেছে। লণ্ডনের বড় বড় হোটেলে পরিচারক আছে বটে, কিন্তু আর সকল হোটেলে—এমন কি, এডিনবরা, গ্লাসগো, চেষ্টার, কার্লাইল প্রভৃতি সহরের হোটেলেও কেবল পরিচারিকা। যাত্রী গাড়ীর চালক পুরুষ—কিন্তু টিকিট দিতেছে—Conductor—মহিলা। মহিলারা উর্দ্দী পরিয়াছে—শ্রমসাধ্য কায করিতেছে। এমন কি, কলকারখানাতেও নানা কায স্ত্রীলোক করিতেছে। গ্লাসগো সহরের উপকণ্ঠে জলাভূমিতে জলনিকাশ করিয়া বিস্ফোরকের যে কারখানা রচিত হইয়াছে, তাহাতে ১৫ হাজার লোক অত্যন্ত বিপজ্জনক কার্য্যে ব্যাপৃত—তাহাদের মধ্যে ১৩ হাজার যুবতী, ২ হাজার মাত্র পুরুষ। কাহারও মুখে ক্লান্তির আভাস নাই; সকলেই সঙ্কল্পে অবিচলিত—ইংলণ্ড জয়ী হইবে, বিলাতের নরনারী সকলকেই সেই কাযে সাহায্য করিতে হইবে। যে জাতির দেশাত্মবোধ প্রবল, এরূপ কায সেই জাতির দ্বারাই সম্ভব হয়।

জার্ম্মাণীর সাবমেরিণ ইংরাজের জাহাজ ডুবাইয়া দিতেছে, দেশে খাদ্যের অভাব। তাই—যাহাতে কোনরূপে খাদ্য-দ্রব্যের অমিতব্যয় না হয়, সেই জন্য—কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক লোককে টিকিট দেওয়া হইয়াছে—সেই টিকিট না দিলে কেহ রুটী, মাখন, মাংস পাইবে না। লর্ড কার্ম্মাইকেলের গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণেও সঙ্গে চিনি লইয়া যাইতে হয়—তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট চিনি অপেক্ষা এক ছটাকও বেশী চিনি পাইতে পারেন না। মদ্য দুর্ল্লভ। রাজা প্রজা সকলকেই কঠোর নিয়মের অধীন হইতে হইয়াছে। মহিলাদিগের বেশেও সর্ব্ববিধ বাহুল্য ও বিলাস-বিকাশ বর্জ্জিত হইয়াছে; রাণীর বেশও সাদাসিদা—বাহুল্য-বর্জ্জিত। যাহারা অধিক চিনি না হইলে চা পান করিতে পারে না, তাহারা স্যাকারিণ বা সেইরূপ কোন রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত শর্করা সঙ্গে রাখে। আহার্য্যের বিষয়ে কেহ আইন ভঙ্গ করিলে, তাহার কঠোর শাস্তি হয়। অকারণে মোটরে তেল (পেট্রোল) খরচ করায় মহিলারাও দণ্ডিত হইয়াছেন। রঙ্গালয়ে অভিনয়ের সময় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিলাসের দ্রব্যের উপর চড়া শুল্ক বসাইয়া সে সকলের আমদানী যথা-সম্ভব কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে—অনেক জিনিষের আমদানী বন্ধ করা হইয়াছে। নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্যও বিবর্দ্ধিত—দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিবার লোকের অভাব। বিশেষ

ইংলণ্ড শিল্পজ পণ্যোৎপাদনে মন দিয়া কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিয়াছিল—ফলে তাহাকে খাদ্যদ্রব্যের জন্য প্রধানতঃ বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইত; এখন বিদেশ হইতে আমদানীর পথ রুদ্ধপ্রায় হওয়ায় সেই পরমুখাপেক্ষিতার বিষফল এখন তাহাকে বাধ্য হইয়া ভক্ষণ করিতে হইতেছে।

দেশে শোকের ছায়া—লোকের মুখে হাসি নাই; সর্ব্বদা আশঙ্কা, সর্ব্বদা উৎকণ্ঠা। এই অবস্থায় মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—সংযম যেন লোকের চরিত্রগত হইয়াছে—তাহা না হইলেও সংযমের কঠিন আবরণ যেন মানুষের স্বাভাবিক আনন্দোৎফুল্লতা আবৃত করিয়াছে। সে সংযম সহজে ত্যাগ করা যায় না।

হইয়াছে; হয় ত যুদ্ধ শেষ হইবে—শঙ্কা-দুঃসহ দিবস ও নিদ্রা-হীন রজনী বুঝি শেষ হইবে—দীর্ঘ চারি বৎসরের পর মেঘান্ধকার কাটিয়া যাইবে। এ সংবাদ কত মধুর। কিন্তু এই সংবাদের আঘাতেও ইংরাজের চারি বৎসরের অভ্যস্ত সংযম নষ্ট হইল না। রঙ্গালয়ে সকলেই নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ; বোধ হয়, সূচিপাত হইলে সে শব্দও সেই মর্ম্মরমণ্ডিত বিশাল গৃহে শ্রুত হয়। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গৃহের কোন অংশ হইতে আনন্দধ্বনি বা করতালির শব্দ শ্রুত হইল না। মনে হইতে লাগিল, যেন সব পুত্তল আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তাহার পর যবনিকা উত্তোলিত হইল—আবার—যেন ছিন্ন সূত্র সংযুক্ত করিয়া—অভিনয় চলিতে লাগিল। যেন কোন অসাধারণ ঘটনাই ঘটে নাই। অথচ তখন ইংলণ্ডের

ANY ADDITIONAL MEAT COUPONS TO BE ADDED HERE

INSTRUCTIONS TO HOLDER

EMERGENCY BUTTER OR MARGARINE

EMERGENCY SUGAR

EMERGENCY LARD

EMERGENCY CHEESE

খাদ্য-সংগ্রহের টিকিট।

তাহার প্রথম পরিচয় পাই—১২ই অক্টোবর। রাত্রি-কালে আমরা কলিসিয়াম (Coliseum) রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করিতেছি। সহসা অসমাপ্ত অঙ্কে—যবনিকাপাত হইল, আর দেখিতে দেখিতে সেই যবনিকার উপর আলো-কের অক্ষরে সংবাদ ফুটিয়া উঠিল—জার্ম্মাণী মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নির্দ্ধারিত সর্ত্তে সম্মত হইয়াছে।

তখন মার্কিণ আসিয়া সম্মিলিত শক্তিপক্ষে যোগ দিয়াছে—ইংলণ্ডের জয়লাভাশা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; যেন "যস্মিন্ পক্ষে জনার্দ্দনঃ।" জার্ম্মাণী সেই মার্কিণের প্রদত্ত সর্ত্তে সম্মত

নরনারীর মন ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া আছে—সকলে সাগ্রহে যুদ্ধের সব সংবাদ পাঠ করিতেছে—যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচয় পাই—প্রায় এক মাস পরে, ৯ই নভেম্বর। তখন আমরা ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের নানা স্থানে সংগ্রামের উপ-করণ গঠনের কারখানা দেখিয়া আসিয়াছি, ইংলণ্ডের শক্তি-কেন্দ্র নৌবহর দেখিয়াছি এবং ফ্রান্সে ও বেলজিয়মে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবর্ষণের মধ্যে ইংরাজ সৈনিকদিগের নির্ভীক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। ঈপ, ক্যামব্রাই, এলবার্ট, এমিয়ে,

নীল—প্রভৃতি দেখিয়া আমরা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় আবার লণ্ডনে আসিয়াছি। ৯ই নভেম্বর—লণ্ডনে লর্ড মেয়রস শো। সে দিন চিরাচরিত প্রথানুসারে বর্ষান্তে নূতন লর্ড মেয়র নিযুক্ত হয়েন; তিনি শোভাযাত্রা করিয়া সহরে বাহির হয়েন।

আজকাল খাস লণ্ডন সহরে ঘোড়ার গাড়ী বড় দেখা যায় না—কেবল মোটর, মোটর বাস, মোটর লরী, আর কোথাও কোথাও ট্রাম। কিন্তু এ দিন চিরাচরিত প্রথানুসারে দিয়াছিল—লণ্ডনের বড় ফাঁকা যায়গা হাইড পার্কেও এক এক স্থানে ক্ষেত্র করিয়া সব্জী উৎপন্ন করা হইতেছিল। শোভাযাত্রায় স্ত্রীলোকরা কৃষিজ পণ্য—শাক-সব্জী বহন করিয়া যাইতেছিল। তাহাদের বেশ ভূমিচুম্বিত—গাউন নহে—কাটা আঁটা পাজামা ও কোর্ত্তা। কোথাও বাহুল্যের চিহ্নমাত্র নাই।

লর্ড মেয়রস শো সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা। সে শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য রাজপথে লোকারণ্য হয়—পথের ধারে বাড়ীর
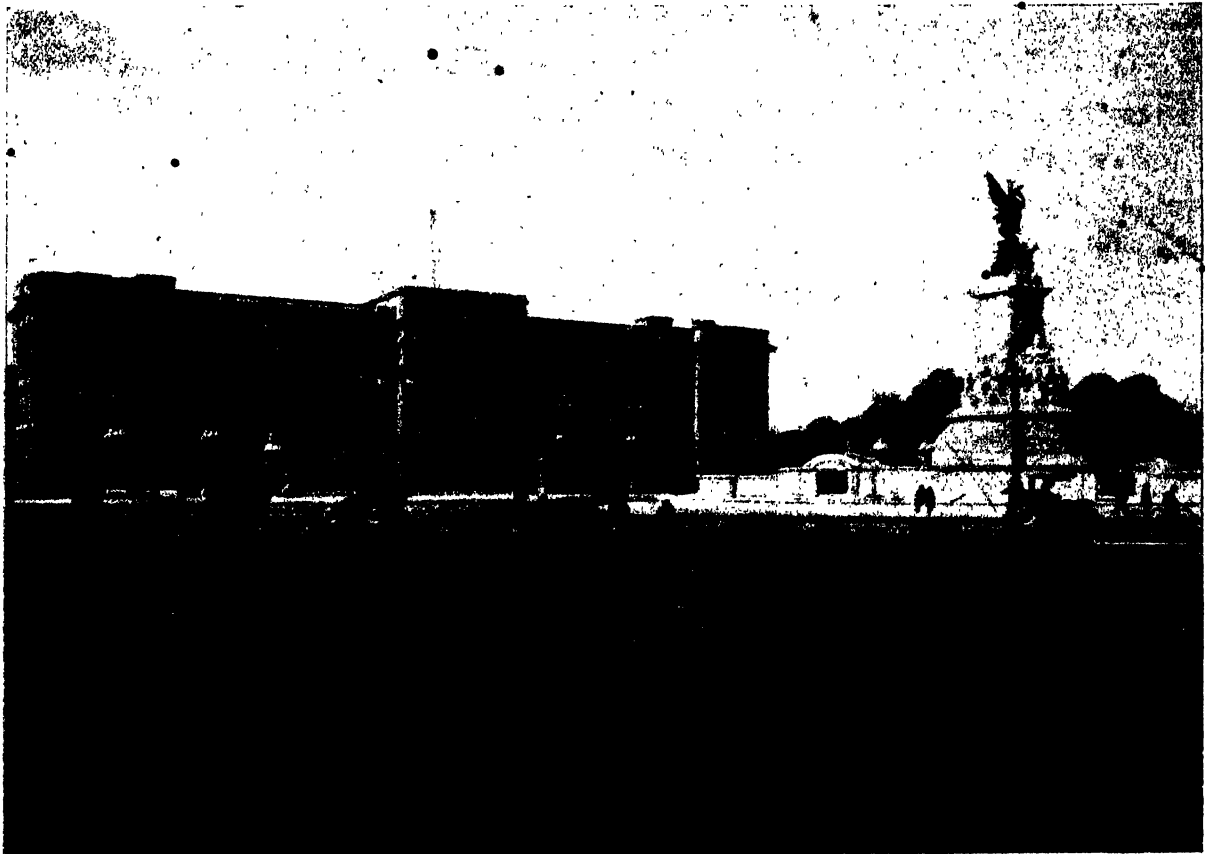
বাকিংহাম প্যালেস।

শোভাযাত্রায় ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহৃত হয়। ইংরাজ জাতিটার ধাতুতে রক্ষণশীলতার প্রাবল্য আছে। সাজ-সজ্জা, আসাসোটা, পরচুলা—এ সব আজও পর্ব্বাদিতে পূর্ব্ববৎ ব্যবহৃত হয়। লর্ড মেয়রের শো উপলক্ষে সে সবই ব্যবহৃত হইয়াছিল। তবে এবার শোর শোভাযাত্রায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। যুদ্ধের সময় আহার্য্য বিষয়ে আপনার পরমুখাপেক্ষিতা বুঝিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টায় ইংরাজ কৃষিকার্য্যে মন বাতায়নে লোক দাঁড়ায়, আর ঘন ঘন জয়ধ্বনি ও আনন্দ-ব্যঞ্জক রব উত্থিত হয়। এবার তাহার একান্ত অভাব। জয়-পরাজয় ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত হইতেছে—মিনিটে মিনিটে কত ইংরাজ যুবকের দেহের শোণিতে রণভূমি রঞ্জিত হইতেছে; আজ গৃহে গৃহে শোকাতুরা জননী, ভগিনী, পত্নী, দুহিতা; এখনও কেবল আশঙ্কা—যদি জার্ম্মাণী জয়ী হইয়া ইংলণ্ডকে পরাভূত প্রজায় পরিণত করে। ইংলণ্ড নিরানন্দ।

রাস্তায় একটি অন্তর একটি ল্যাম্পের কালী মুছিয়া দিয়াছে--প্রায় চারি বৎসর পরে রাস্তায় আলো জ্বালা হইয়াছে—আর দোকানের আলো রাস্তা আলোকিত করিয়াছে।

হোটেলে সেদিন কি আনন্দ! আহার্য্য-তালিকায় সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের পতাকা অঙ্কিত। এতদিন মহিলারা ভূলুণ্ঠিত—বিচিত্র বেশ পরিহার করিয়াছিলেন—আজ সাজ-সজ্জার বাহুল্য; যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়াবলে হোটেলের আহার-কক্ষ সুন্দরীদিগের বিহারক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

আহারের পর আবার রাজপথে বাহির হইলাম। এবার অন্ধকারে উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে মাদ্রাজের 'হিন্দু'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার ছিলেন; ভাব দেখিয়া তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "আজ কি বুড়াকে সঙ্গে আনিতে হয়?" আমি উত্তর দিলাম, "কি জানি যদি বিপদ্ ঘটে।"

তখন স্থানে স্থানে স্ত্রী-পুরুষে নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে—আলিঙ্গনের ও চুম্বনের বন্যা বহিতেছে—পথে পথে যুগল—আর বড় রাস্তার পার্শ্বে আলোকশূন্য গলি-রাস্তায় অপরিচিত-অপরিচিতায় নির্লজ্জ যুগল মিলন। সহরে সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যাপার।

নেলসনের স্মৃতিস্তম্ভ।

সে রাত্রিতে লণ্ডন সহরের পথে ৫০ জন লোক ভিড়ে আহত হইয়াছিল। কয় দিন পরে আমার বৃদ্ধ অধ্যাপক মিষ্টার পার্সিভালের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন — "৫০ জন লোক ভিড়ে আহত হইল, অথচ লোক মদ পায় নাই—মদ পাইলে ব্যাপার আরও কত বীভৎস হইত, তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারা যায়। আর ইহারাই সভ্য!!"

কয় জন লোক আমোদ করিয়া একটা সাজান কামানে কতকগুলা পেরেক ও বারুদ পূরিয়া রন্ধ্রে আগুন দেয়—তাহাতে নেলসনের স্মৃতি-স্তম্ভের বেদীর একাংশ ভাঙ্গিয়া যায়। পরদিন পুলিস এক ইস্তাহার দিয়া লোককে বলে—"এ কি? এখনও যুদ্ধজয় হয় নাই—সন্ধি ত পরের কথা; যুদ্ধ-বিরতিতেই যদি লণ্ডনের লোক এমন উচ্ছৃঙ্খল হয়, তবে অন্য দেশের লোক কি বলিবে?"

লোককে লজ্জা দিবার জন্য পুলিস এই ইস্তাহার প্রচার করে। কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে যে বিশেষ ফল হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, পরদিনও সহরে আফিস প্রভৃতি বন্ধ ছিল—কেহ কাযে যায় নাই; সেদিনও
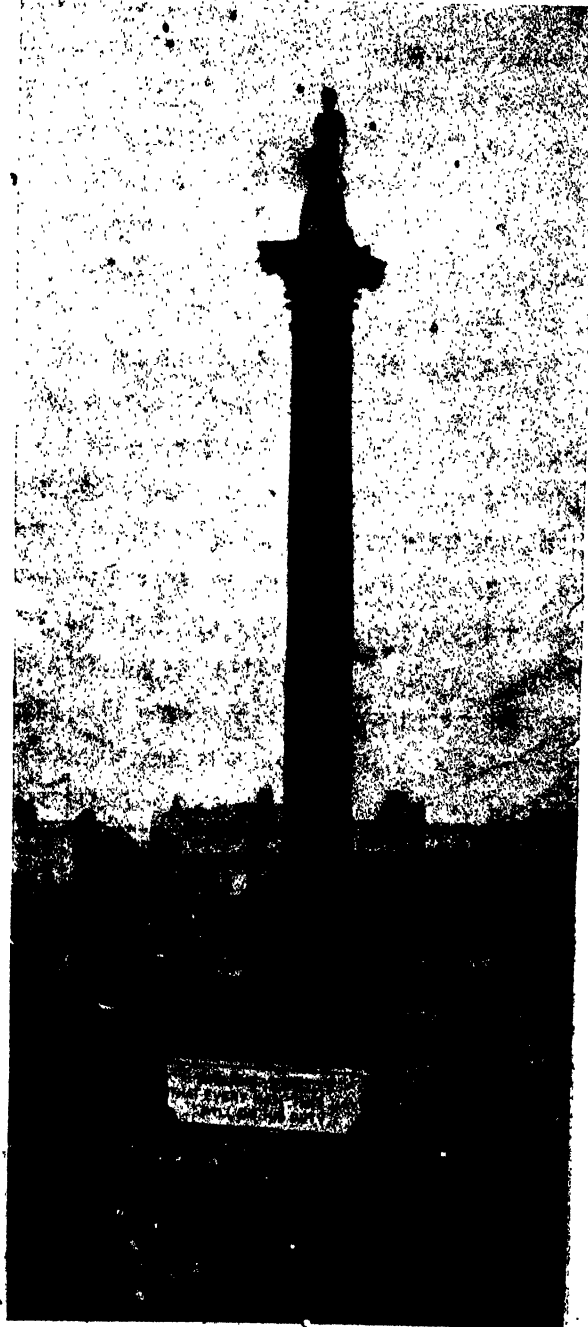
সে রাত্রিও এমনই উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে কাটিয়াছিল। এমন কি, শনিবার রাত্রিতে যখন হাইড পার্কে বাজী পোড়ান হয়, তখনও অবধি ইহার জের চলিয়াছিল। সে দিনও যুবতীরা অপরিচিত যুবকদিগকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিয়াছিল—সে দিনও সারারাত্রি হাইড পার্কে উৎকট উৎসব চলিয়াছিল।

কিন্তু এ ব্যবহারে কেহ এতটুকু লজ্জার কারণ সন্ধান করিয়া পায় নাই!

তাহার পর—সপ্তাহব্যাপী উৎসব শেষ করিয়া লোক আবার যে যাহার কাযে ব্যাপৃত হইয়াছিল। সে উৎসবের ধারণা আমরা করিতে পারি না; কারণ, সে উৎসবের যে পদ্ধতি, তাহা আমাদের প্রথাবিরুদ্ধ—তাহার উৎস আমাদের ধাতুতে নাই।

তিরস্কার।

তুমি রাজার ঝিয়ারী সোহাগিনী, প্যারী,
তোমারে কি বল বলিব আর?
তুমি নয়ন-আসারে তিতা'লে তাহারে
তোমারি এবে সে আসার সার।
সে যে কত কেঁদেছিল, কত সেধেছিল,
চূড়া লুটায়েছে তোমারি পায়!
তুমি বসেছিলে মানে, শুন নাই কানে,
বিনয়-বচন; চাহ নি তায়।
তা'র যে বাঁশীতে সাধা রাধা—রাধা—রাধা
সে বাঁশী কেঁদেছে ব্রজের বনে।
যবে শুনি' তা'র বাঁশী কাঁদে ব্রজবাসী
সে বাঁশী পশে নি তোমারি মনে!
সে যে ভাসি' আঁখি-জলে যমুনার জলে
ভাসায়ে গিয়াছে সাধের বাঁশী;
সে যে যমুনা-কিনারে বলেছে সবারে,
দেখাবে না মুখ এ ব্রজে আসি'।
তুমি মানে নিমগন তুলনি নয়ন,
কথাটি বলনি, মানিনি রাই;
আর এবে তা'র লাগি' সকল তেয়াগী—
এখন তাহারে কেমনে পাই?
সে যে নিখিলের বঁধু, তুমি তারে শুধু
আপনার প্রেমে রাখিবে বাঁধি'?

রাই এ কি তব ভুল, বুঝিলে না স্থূল
নিখিল মাগিছে তাহারে কাঁদি'।
দেখ ললিতা, বিশাখা হৃদি প্রেমমাখা,
চারু চন্দ্রাবলী, গোপিকা শত
তা'রা যাচিছে সবাই তা'রে শুধু, রাই,
অসীম সাগরে তটিনী মত।
তুমি ভাবি' দেখ মনে এ ব্রজের বনে
কা'র লাগি' তাজি' এসেছ কুল,
সাধে কলঙ্ক-কাঁটায় পরেছ মাথায়,
ভেবেছ সে কাঁটা পূজার ফুল?
তুমি লোক-কানাকানি পরিবাদ-বাণী
ভেবেছ ভূষণ, ভেবেছ সুখ।
শেষে কোন্ অপযশে কোন্ মোহবশে
ফিরা'লে তাহারে ফিরায়ে মুখ?
তব নয়ন-সলিলে সে মোহ ঘুচিলে
লভিবে আবার মিলন তা'র;
তবে হৃদি-বৃন্দাবনে মুরলী-বদনে
বাঁধিবে, বিরহ র'বে না আর।
দিয়ে প্রেম, ভক্তি, মান, লাজ, ভয় দান
চরণে যখন শরণ ল'বে,
তবে তা'র মুক্তি-বাঁশী বাজা'বে সে আসি,—
সাগরে তটিনী মিশিবে তবে।

মিলন-রাত্রি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রক্তরাগরঞ্জিত উজ্জ্বল অপরাহ্ণে প্রসাদপুরের রাজা অতুলেশ্বরের কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহার শিক্ষয়িত্রী কুন্দের সহিত নিভৃত কানন-কুঞ্জমধ্যে বসিয়া যাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অনাদি তাঁহাকে পৌছিয়া দিয়া গেল।

ইনিই কি তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত গুরুদেব! প্রণামান্তে জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। ইনি সুপুরুষ নহেন; কুরূপও নহেন—ইঁহার বর্ণ ও মুখাবয়ব সাধারণ বঙ্গ-যুবকেরই ন্যায়; অসাধারণের মধ্যে ইঁহার সন্ন্যাসিবেশ এবং আশা-বিশ্বাস-দীপ্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে বেশ একটু কঠোর উগ্রভাবও মিশ্রিত ছিল। সন্ন্যাসীর আলখাল্লায় এ ভাব মোটেই বেমানান হয় নাই—বরঞ্চ জন-নয়নের প্রশংসা-সম্মানলাভের একটা কারণস্বরূপই দাঁড়াইয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীও তাঁহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইলেন না। এ মূর্ত্তি ত তাঁহার কল্পনার দেবমূর্ত্তি নহে! মানববুদ্ধির অগম্য জ্ঞানোজ্জ্বল প্রভা ত এ দৃষ্টিতে নাই! ঋষিকল্প ভূত-ভবিষ্যধারণাশক্তি ত এ মূর্ত্তিতে তিনি প্রতিফলিত দেখিতেছেন না! জ্যোতির্ম্ময়ী আশাহত হইয়া কুন্দের উদ্দেশে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কুন্দ সেখানে নাই। তিনি বিস্মিত-নেত্রে ঊর্দ্ধে চাহিয়া নিঃশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সুদূর তরুশাখা হইতে উড়িয়া আসিয়া একটি পাখী মাথার উপর হইতে ডাকিল—'কথা ক, কথা ক!'—পরিচিত আত্মীয়ের কণ্ঠস্বরে যেন সহসা আশ্বস্ত হইয়া বালিকা নয়ন নামাইয়া দেখিলেন, আগন্তুকের স্তব্ধদৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত।

সঙ্কোচ-মৃদু স্বরে জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি আসন গ্রহণ করুন।" অতিথির অভ্যর্থনার জন্য কৌচ চৌকীর উপর একখানি পশমাসন বিস্তৃত ছিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "আপনিও উপবেশন করুন।" উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন। আকাশের উজ্জ্বল আভা তখন ম্লান হইয়া আসিতেছিল—পাখীর বিদায়গানে কানন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল; জ্যোতির্ম্ময়ীর পশ্চাতে সুচারু কারুকার্য্যময় কাষ্ঠস্তম্ভজড়িত যূথিকালতাবলী-বিলম্বিত ফুলগুচ্ছ দুলিয়া দুলিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার মাথায় আসিয়া ঠেকিতেছিল; দুই একটি তাঁহার কোলে আসিয়া পড়িয়াছিল। অন্য যে সায়াহ্নে তিনি এখানে আসিয়া বসেন, সে দিন তাঁহার কণ্ঠোত্থিত মধুর সঙ্গীতে কানন-তল মধুরতায় ভরিয়া উঠে। আজ তাঁহার এই স্তব্ধভাব তাহাদের যে ভাল লাগিতেছে না—ইঙ্গিতে এই কথাই যেন তাহারা জানাইয়া দিতেছিল।

রাজকুমারীও মনে মনে বুঝিতেছিলেন, এরূপ নীরবতা ভদ্রসমাজের রীতিবিরুদ্ধ, অতিথির পক্ষে সম্মানজনক নহে। তিনি ফুলগুলি কাপড় হইতে হাতে উঠাইতে উঠাইতে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অনাদি-দা বল্‌ছিলেন,—আপনি আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "সত্য কথা, কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে কুন্দও আমাকে আহ্বান-নিমন্ত্রণ দিয়েছেন। দু'জনের অজ্ঞাতে আমরা দু'জনেই দেখ্‌ছি পরস্পরের দর্শন-কামনা করেছি।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর সবল এবং ভীষণ। ভঙ্গীও সরস; কথা কহিবার সময় তাঁহার উগ্রতা স্নিগ্ধ হইয়া আইসে এবং চক্ষু-তারকা বার বার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া কথিত কথার সহিত প্রচ্ছন্ন গূঢ় কথাও যেন বলিতে থাকে।

জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের ভাব লঘু হইয়া পড়িল, তিনি সহজ-ভাবে এইবার কহিলেন, "আমি গুরুলাভের প্রত্যাশায় আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়েছি। কিন্তু আপনি যে কেন আমার মত নগণ্য নারীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন, এতে বড় আশ্চর্য্য হয়ে পড়েছি।"

"আশ্চর্য্য কিছুই নয়। যোগ্য শিষ্যালাভের জন্য গুরুও সমান আগ্রহবান্‌। আপনার ব্রত আমার ব্রত একই—উভয়েরই উদ্দেশ্য দেশ-মঙ্গলসাধন। পুরুষ-সঙ্কল্পের সহিত আদ্যাশক্তির সহযোগেই প্রকৃতভাবে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে।"

"আপনি দেখছি বড় ভুল বুঝেছেন। আমি নিতান্ত শক্তিহীন দুর্ব্বল নারী। গুরুকে দান করার মত তেজ আমাতে

নাই, আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁ'র কৃপাপ্রার্থী। এমন কি, যে পথ ধ'রে আমি চলেছি, তা'ও ঠিক কি না, আমি জানি না। দারুণ সংশয়ের মধ্যে আমি দিশাহারা। আপনি যদি দিব্য দর্শক হ'ন ত আমার এই সংশয় মিটিয়ে দিন।"

"তা'র আগে আমার প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে। আপনি কি আমাকে গুরু ব'লে মান্‌তে প্রস্তুত আছেন ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী হঠাৎ নীরব হইয়া পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন ? তাঁহার মন ত এখনও ইঁহাকে গুরুরূপে ঠিক বরণ করিতে চাহিতেছে না। থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন, "যদি আমার সংশয় মেটাতে পারেন—"

তিনি হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা চান ? নূতন বটে। গুরুকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করাই ত আমাদের দেশের চিরন্তন প্রথা। যদি আমাকে গুরু ব'লে মানেন, তা' হ'লে বিনা প্রশ্নে বিনা সন্দেহে আমার উপদেশ পালন কর্‌তে হ'বে।"

আবার জ্যোতির্ম্ময়ী নীরব হইয়া পড়িলেন। এক দিন তিনি ভগবানের নিকট গুরুমিলন প্রার্থনা করিয়াছেন, আর আজ গুরুদর্শন পাইয়াও তাঁহার মন কেন অপ্রসন্ন ? ইহাতে কি সেই সর্ব্বশক্তিমানের দানকেই অগ্রাহ্য করা হইতেছে না ? তিনি সন্ন্যাসীর প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান না করিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি কোন গুরু আছেন ?"

"আছেন।"

"কে তিনি ? কোনও সিদ্ধপুরুষ বোধ হয় ?"

"না। স্বয়ং দেশমাতাই আমার গুরু।"

"তিনি ত আমারও গুরু, কিন্তু আমি ত তাঁ'র কথার সব অর্থ ঠিক বুঝ্‌তে পারি না, আপনি বুঝেন কিরূপে ? আমাকে সেইটুকু ব'লে দিন, দয়া ক'রে।"

একটা পরিপূর্ণ আকুলতার স্বরে জ্যোতির্ম্ময়ী এই প্রশ্ন করিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "সাধক মাত্রেই ত তা'র অর্থ বুঝ্‌তে পারেন—আপনিও ত এক জন সাধক !"

"না, আমি বুঝ্‌তে পারিনে—সাধকরা এ বিষয়ে কি বলেন, আপনি খুলে বলুন।"

"সকলেই একবাক্যে বল্‌ছেন, 'স্বরাজ চাই, স্বাধীন ভারত চাই।' আকাশে বাতাসে এই কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে —আর আপনি শুন্‌তে পান না ?"

"শুনতে পেয়েছি, কিন্তু উপায় কি, সে উপদেশ ত পাচ্ছি না—সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—বলুন—বলুন আপনি, উপায় কি ?"

উত্তর হইল—"শরীর-পতন কিংবা মন্ত্রের সাধন।"

"কিন্তু সে মন্ত্র কি ? সেই মন্ত্রলাভের জন্যই ত উৎসুক হয়ে আছি।" রাজকুমারী অধীরভাবে এই কথা বলিলেন। সন্ন্যাসী ধীরভাবে কহিলেন—"সর্ব্বত্যাগী হ'তে পারেন যদি, তবেই সে মন্ত্র পাবেন।" রাজকন্যার মনে পড়িল শরৎ-কুমারকে ; অন্তঃপ্রাণের মধ্যে দীর্ঘ-নিশ্বাস উঠিয়া সেইখানে আবদ্ধ রহিয়া গেল। তথাপি ইতঃপূর্ব্বে শ্যামসুন্দরের পদ-তলে যাহার প্রেমকে বলিদান দিতে অপারগ হইয়াছিলেন, আজ গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাতেও স্বীকৃত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "পার্‌ব।"

"পার্‌বেন ? ঠিক বল্‌ছেন, পার্‌বেন ?"

রাজকুমারী আবার কহিলেন, "পার্‌ব। ধর্ম্ম ছাড়া মায়ের চরণে, সুখ-শান্তি ধন-জন সর্ব্বস্ব উৎসর্গ কর্‌তে প্রস্তুত আছি।"

সন্ন্যাসীর বঙ্কিম অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিল' তিনি তাহা সংযত করিয়া লইয়া গম্ভীর ভাবেই কহিলেন— "এই ত কুণ্ঠা রেখে বল্লেন। ধর্ম্ম কথাটা ত মস্ত ফাঁপা জিনিষ, এক জন খৃষ্টানের পক্ষে যা' ধর্ম্ম এক জন হিন্দুর পক্ষে তা' অধর্ম্ম। যোদ্ধার ধর্ম্ম নরহত্যা—কিন্তু সাধারণের পক্ষে এ কাজ মহাপাপ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী চিন্তা-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়া অজ্ঞানের মত বলিলেন, "আপনার উপদেশ কি ?"

"গুরুর উপর বিশ্বাসস্থাপন করুন ; ধর্ম্মাধর্ম্ম তাঁ'কে স্থির কর্‌তে দিন। আর আপনি তাঁ'র আদেশ মেনে চলুন। যদি তা' পারেন, তবেই দেশমাতার সেবার অধিকারী হবেন। পারবেন কি ?—বলুন।"

সন্ন্যাসী দীপ্ত নয়ন সমধিক প্রদীপ্ত করিয়া প্রতি অক্ষরে জোর দিয়া এই কথা বলিলেন। স্ত্রীলোক পুরুষের নিকটে যে শক্তি, যে তেজ প্রত্যাশা করে—সেইরূপই শক্তিপূত তাঁহার এ বাণী ; জ্যোতির্ম্ময়ী অভিভূত হইয়া পড়িলেন ; আত্মহারা মুগ্ধদৃষ্টি তাঁহার দিকে স্থাপিত করিয়া বলিলেন "বেশ, তাই হ'বে, গুরুজী ; মন্ত্র দান করুন।"

জ্যোতির্ম্ময়ী কর্ত্তৃক এই প্রথম গুরু সম্বোধনে সম্বোধিত হইয়া আনন্দসহকারে সন্ন্যাসী 'স্বস্তি' 'স্বস্তি' বলিয়া উঠিয়া

দাঁড়াইলেন, এবং রাজকুমারীকে আর কথা কহিবার অবসর না দিয়া দ্রুতপদে তাঁহার কানের নিকট আসিয়া বলিলেন, "শবসাধন—শবসাধন!"

জ্যোতির্ম্ময়ী শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার দেহের উষ্ণ শোণিত যেন সহসা তুষার-শীতল হইয়া পড়িল, তাহার চলাচল বন্ধ হইয়া গেল, তিনি পাষাণ-পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। একটা কাঠবিড়ালী তাঁহার গা ঘেঁসিয়া লতাবল্লীর উপর উঠিল। তিনি চমকিয়া ডাকিলেন—"কুন্দদিদি!" এই সময় কুন্দ আসিয়া কহিল, "ডাক্তার আস্‌ছেন।" রাজকুমারী যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন,—সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি যথাস্থানে গিয়া বসিলেন। তখন পূর্ণ সন্ধ্যা, চন্দ্রহীন আকাশ তারকাগুচ্ছে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার আলোকরশ্মি শাখা-পল্লব অতিক্রম করিয়া কাননতল অতি মৃদুভাবে আলোকিত করিতেছিল।

শরৎকুমার এখানে আসিয়া প্রথমে স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পাইলেন না, পরে নয়ন অভ্যস্ত হইয়া আসিলে সেই ছায়ালোকে জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। একটা অজ্ঞাত বিপদের ভয় তাঁহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল, প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুরে কহিলেন, "রাজকুমারি, কাল আপনার অতিথিরা এসে পড়্‌বেন? পরন্তু কন্‌ফারেন্স—রাজা আপনার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন।"

রাজকুমারী সে কথা যেন না শুনিয়া কহিলেন, "ডাক্তারদা, আমাদের মুক্তির পথ কি? ভারত স্বাধীন হবে কি উপায়ে, আপনি মনে করেন?"

উত্তর হইল, "ধর্ম্মবলে।"

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "অমন একটা ফাঁকা কথা বল্‌বেন না। বিদেশি-বিবর্জ্জিত ভারত হবে কি উপায়ে, কখনও ভেবেছেন কি? যদি ভেবে কোন উপায় পেয়ে থাকেন ত বলুন।"

শরৎকুমার অবজ্ঞার সুরে কহিলেন, "ভারত কখনই বিদেশি-বিবর্জ্জিত হ'বে না—হ'তে পারে না। এ বাসনা উন্মাদের প্রলাপ। তবে নৈতিক একতার বলে, ধর্ম্মবলে এমন এক দিন আস্‌তে পারে, যে দিন বিদেশীও স্বদেশী নামভুক্ত হ'তে বাধ্য হ'বে। আসুন রাজকুমারি, আর দেরি কর্‌বেন না।"

রাজকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আপনি তবে আজ আসুন, আর এক দিন কথাবার্ত্তা হবে। কুন্দদিদি, এঁকে নিয়ে যান।"

কানন-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া শরৎকুমার জ্যোতির্ম্ময়ীকে কহিলেন, "আপনাকে সাবধান ক'রে দিই, রাজকুমারি, এই সব ভণ্ড সন্ন্যাসীদের কথায় ভুলবেন না, এদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকবেন।"

রাজকুমারী কথাটা সুপরামর্শ বলিয়া বুঝিলেন—তথাপি অসন্তুষ্টভাবে কহিলেন, "আমি ত পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিনি।"

শরৎকুমারের হৃদয় বিদ্ধ হইল; তিনি সে জ্বালা সবলে চাপিয়া রাখিয়া কহিলেন, "হিতকামনায় উপযাচক হয়েও অনেক সময় উপদেশ দিতে হয়।"

"সে প্রার্থনাও ত করিনি।"

"তবে নিতান্তই অন্যায় করেছি, ক্ষমা কর্‌তে পারেন ত কর্‌বেন।" ইহার পর দুই জনে নিস্তব্ধে রাজা বাহাদুরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন।

* * * *

যথাসময়ে বিদ্রোহী দলের মিটিং বসিল। রাজকন্যা দেশমঙ্গলে সর্ব্বস্ব পণ করিতে উদ্যত; কিন্তু ডাক্তার শরৎকুমার এ কার্য্যে তাঁহার বিঘ্নকারী। অতএব এই সভা কর্ত্তৃক অবিসংবাদিতরূপে তিনি দেশশত্রু বলিয়া বিবেচিত হইলেন ও লটারী দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার দণ্ড-ব্যবস্থা হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা অবলম্বন করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ক্রোধ-খড়্গের নিম্নে মাথা পাতিয়া দিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর ছেলে। তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, সে সহন-নীতি (Passive Resistance) ভারতবাসীর প্রকৃত মুক্তির পথ বলিয়া অধুনা পরিকল্পিত, তাহারও সূচনা এই বঙ্গদেশেই দেখা যায়।

সমগ্র বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দ সদলবলে প্রসাদপুরে সমাগত। কাল কন্‌ফারেন্স বসিবে, আজ ক্লাউডেন "সাহেবের" স্থলভুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট প্রচারপত্র দ্বারা হুকুম দিলেন যে, মিছিলে বা সভায় কেহ "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করিতে পারিবে

না। ভারতীয় শাসন-নীতির বিরুদ্ধে কিছু দিন হইতে জনসঙ্ঘের মনে যে অসন্তোষ-বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে ধূমায়িত হইতেছিল, বঙ্গ বিভাগের দ্বারা তাহা প্রজ্বলন্ত আকারে বহির্বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। দেশের আবহাওয়া এখন অশান্তি-চাঞ্চল্য-পূর্ণ। পক্ষপাতময় শাসননীতি ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ছেলের দল বিশেষভাবে বদ্ধপরিকর। তাহারা প্রাণের মায়াহীন; সম্ভব অসম্ভব হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য; জননী জন্মভূমির শৃঙ্খল-মোচনজন্য নিজেরা শৃঙ্খল পরিতে বা প্রাণ দিতে কিছুমাত্র কাতর নহে। মায়ের নামে যাত্রা করিয়া, তরঙ্গসঙ্কুল বিপদ্-সমুদ্রে দোদুল্যমান নৌকায় পা দিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তরণী নাবিকবিহীন; কর্ণধারের জন্য উদ্‌গ্রীব তাহারা যাহাকেই সম্মুখে দেখিতেছে, তাহাকেই গুরু বলিয়া ডাকিতেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ব্বোক্ত অন্যায় আদেশে যুবকদিগের ক্রোধতপ্ত শোণিত তাপমান-যন্ত্রের উর্দ্ধসীমায় আসিয়া পৌঁছিল; তাঁহারা কি শীতল পানীয় ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন, তাহার জন্য নেতৃবর্গের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বলা বাহুল্য, নেতৃগণও যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনাশক্তি হারাইলেন না। পরামর্শ-সভায় স্থির হইল যে, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং যতক্ষণ আইন-প্রবর্ত্তন দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রদান না করেন—ততক্ষণ কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের এমন ক্ষমতা নাই যে, তিনি জনসঙ্ঘের কোন পবিত্র বন্দনা-বাক্য উচ্চারণ নিষিদ্ধ করিতে পারেন। অতএব সাত কোটি বাঙ্গালীর প্রতিনিধি-সভা কখনই এক জন যথেচ্ছাচারী জুলুম-দারের লাঞ্ছনা অপমান বৈধ আদেশরূপে শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য নহে। কিন্তু শান্তিভঙ্গ না করিয়া আইন-বিধি রক্ষা-পূর্ব্বকই, বাহুবলের পরিবর্ত্তে মনের বল অবলম্বনে এই বে-আইনী অনধিকার আদেশের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। এ জন্য যদি পুলিসের অত্যাচার সহিতে হয়, অকুতোভয়ে তাহা সহ্য করিয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে সকলে অগ্রসর হইবেন।

সভার এই পরামর্শানুসারে রাজা তাঁহার প্রহরী এবং লাঠিয়ালদিগকে মিছিলে যোগ দিতে নিষেধ করিলেন। রাজ-ভবনের কম্পাউণ্ড হইতে বেলা ৮টার সময় মিছিল বাহির হইবে। প্রাতঃকাল হইতে উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। সভা-মণ্ডপ এ স্থল হইতে দূরে নহে, সভাপতিকে মোটরে বসাইয়া আর সকলে পদব্রজে মণ্ডপে গমন করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া, প্রয়োজন হইলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনাড়ম্বর প্রাণ-পাতের জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। মনে ধর্ম্মবল এবং হস্তে "বন্দে মাতরম্" নিশান ধরিয়া সকলে ক্ষমতাশালী রাজপক্ষের অন্যায় বাধার মধ্য দিয়া শোভা-যাত্রা করিলেন। রাজা অতুলেশ্বর গায়কদলের অগ্রণী হইয়া মোটর-যানের অগ্রবর্ত্তিভাবে এবং প্রতিনিধি প্রভৃতি অন্যান্য লোক পার্শ্ববর্ত্তী এবং অনুবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজা প্রথমে নিশান উঠাইয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি তুলিবামাত্র শত শত হস্তে নিশান পতপত শব্দে উর্দ্ধে উঠিল—শত শত কণ্ঠে মেঘমন্দ্রনাদে—"বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারিত হইল। সে ধ্বনি শূন্যে বিলীন হইতে না হইতে দিঙ্মণ্ডল সুরের আগুনে জ্বালাইয়া গায়কদল মহোৎসাহে গান ধরিল,—

"বন্দে মাতরম্ ব'লে,—
আয় রে ভাই দলে দলে!
হই রে আগুয়ান্, যায় যা'বে যা'ক প্রাণ,—
মায়ের কাজে আত্মদান, কর্‌ব সবাই কুতূহলে।"

রাস্তার পরপারে অশ্বারোহী পুলিসকর্ত্তা তাঁহার পদাতিক দলবলের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। মিছিল রাজ-কম্পাউণ্ড অতিক্রম করিবামাত্র তিনি তাঁহার সহকারী সুবেদার, জমাদার প্রভৃতি তিন শত লোকসহ মিছিলের গতিরোধ করিয়া গান বন্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু জনসঙ্ঘের একটি ক্ষুদ্র বালকও এ আজ্ঞায় ভীত হইয়া নিশান নামাইল না; আকাশভেদী স্বরে আবার "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উঠিল। গায়কদল গানের দ্বিতীয় কলি ধরিল—

"বল ভাই 'বন্দে মাতরম্'
সাত সমুদ্রের ঢেউ-তুফানে খেলুক গানের রং।
অস্ত্র নাইক হাতে, মোদের, ভাবনা কি রে তা'তে,
ভক্তি মহাশক্তি, ও ভাই অজেয় ভূতলে
আয় রে ভাই 'বন্দে মাতরম্' ব'লে।"

পুলিসকর্ত্তার ক্রোধ-বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই নিরস্ত্র, বর্ব্বর, ভীরু জনসঙ্ঘকে দমনের জন্য তিন শত পুলিস দলই তিনি যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সনাতন অভিজ্ঞতা, ধারণা মিথ্যা করিয়া দিয়া আজ কি না সেই বর্ব্বর দল সদর্পে চলিয়া যায়! এ কি অদ্ভুতপূর্ব্ব কাণ্ড! "পুলিস সাহেব" আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, গায়কদিগকে

গান নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়েই প্রধানতঃ তদাজ্ঞায় রেগুলেশন লাঠিগুলা উদ্যত, উদ্ধত বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। আঘাতে কাহারও মাথা ফাটিল, কাহারও হাতের নিশান উড়িয়া গেল, কেহ ভূপতিত হইবামাত্র সহচর সেবকগণ কর্তৃক শুশ্রূষাস্থলে নীত হইতে লাগিল। পুলিসের আক্রমণ আরম্ভ হইলেই রাজা অতুলেশ্বরের ধমনী-সঞ্চিত বংশগত বীররক্ত সতেজে দেহ-সঞ্চারিত হইয়াছিল; তিনি সামান্য নিশান-যষ্টির দ্বারাই পুলিসের প্রকাণ্ড লাঠির আক্রমণ ব্যর্থ করিতে করিতে গায়ক বালকদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। একবার তাঁহার শিরস্ত্রাণ মলমল-পাগড়ির উপর লাঠির অল্প আঘাত লাগিল। এক জন পার্শ্বচর সেই সময় তাঁহাকে সবলে সরাইয়া না দিলে তাঁহাকে আহত হইতে হইত। অতুলেশ্বর মুহূর্ত্তমাত্র মুখ তুলিয়া তাঁহার রক্ষাকারীকে দেখিয়া লইয়া পুনরায় গায়কদলের সহিত গান করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

মোটর জনতার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। নিশ্চেষ্ট বন্দিরূপে প্রেসিডেণ্টের পার্শ্বে বসিয়া রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী যেন দাহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। ধৈর্য্যের এ কি ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা! কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি স্বপ্নে যে অগ্নিদাহ অনুভব করিয়াছিলেন—এ যে সেইরূপ ভীষণ কষ্টকর জ্বালা! তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল—দশভুজার মহাশক্তিতে তিনি সকলকে রক্ষা করেন—কিন্তু শক্তি নাই,—শক্তি নাই। নিতান্ত বলহীনা নিরুপায় নারী মাত্র তিনি।

বন্ধ মোটর হইতে সম্মুখের ঘটনা ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না, দেখিবার জন্য জ্যোতির্ম্ময়ীর আগ্রহও ছিল না। অধিকাংশ সময়ই মুদিত-নয়নে একাগ্রচিত্তে তিনি সেই সর্ব্বশক্তিশালী বিচারককে ডাকিতেছিলেন।

গায়কদল গানের তৃতীয় কলি ধরিল—

"আমরা রক্তবীজের ঝাড়!
মরণ মাঝেই গোপন মোদের সঞ্জীবনী বাড়।
চাহি না রক্তপাত,—আমরা—কোর্‌বো না আঘাত
ব্যর্থ কোর্‌বো অরির অস্ত্র ধর্ম্ম-কৃপা-বলে
আয় রে ভাই দলে দলে, 'বন্দে মাতরম্' ব'লে!"

গায়কদিগের শত কণ্ঠের উর্দ্ধে অতুলেশ্বরের সবল কণ্ঠ [illegible] ধ্বনিত হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী সেই ধ্বনিতে [illegible] পুরুষেরই অভয়বাণী যেন শুনিতে পাইলেন; তাঁহার হৃদয়-প্রাণ আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, প্রেসিডেণ্ট উঠিয়া দরজামুখে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া চালককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "লাল পাগড়িগুলো স'রে পড়লো নাকি? আর ত কই বেশী দেখতে পাচ্চিনে। পাণ্ডালের কাছাকাছিও এসে পড়া গেছে।" মোটর-চালক উত্তর করিল, —"পুলিসকর্ত্তা এই একটু আগে কোথায় চ'লে গেলেন, পাহারাওয়ালাগুলো একটু দম নিচ্ছে বোধ হয়, আর মিনিট পনেরর মধ্যে আমরা পাণ্ডালে পৌঁছিতে পারব।"

প্রেসিডেণ্ট যথাস্থানে বসিতে বসিতে দম লইয়া বলিলেন, "হুঁ, পুলিস দেখছি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে কোন নতুন হুকুম আন্‌তে গেল!" তাহার পর পার্শ্বোপবিষ্ট নীরব স্তব্ধ জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বোধ হয় খুব ভয় পাচ্ছ—রাজকুমারি?" উত্তর হইল—"ভয় পাবার ত কোন কারণ নেই। আমরা ত গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বা শত্রু নই। আমাদের দেশবন্দনা-গীতিতে ম্যাজিষ্ট্রেট যে কেন এত ক্ষেপে উঠলেন—তা ত বুঝতেই পারিনে। এ দেশ কি তাঁদেরও বন্দনীয়, পূজ্য নয়?"

প্রেসিডেণ্ট বলিলেন—"তাঁদের এরূপ ভুল বুঝাই ত যত অনর্থের মূল। এতে মিত্রকেও তাঁরা শত্রু ক'রে ফেলেন।"

এই সময় অদূরে রোরুদ্যমান বালক-কণ্ঠ হইতে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী গাড়ীর দরজায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন,—দুই জন পাহারাওয়ালা এক জন বালককে বাক্য-শাসনে গান নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া লাঠির শাসনে বলপূর্ব্বক ময়দানের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; কিন্তু আহত হইয়াও বালকের গান বন্ধ হয় নাই।

এ দৃশ্য জ্যোতির্ম্ময়ীর অসহ্য হইয়া উঠিল। চালককে গাড়ী থামাইতে আজ্ঞা দিয়া প্রেসিডেণ্টকে তিনি বলিলেন, "দেখছেন ত কি কাণ্ড হচ্চে! আমি নেমে পড়লুম—হেঁটেই পরে পাণ্ডালে যাব—আপনি এগিয়ে চলুন; আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না।"

প্রেসিডেণ্ট অবাক্ হইয়া গেলেন, তাঁহার বাক্যস্ফুট হইবার অগ্রেই জ্যোতির্ম্ময়ী নামিয়া পড়িলেন। মোটরের পাশেই বসন্ত এবং অনাদি রক্ষ[illegible]কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা রাজকুমারীকে পথ করি[illegible]।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

মুক্তি ও ভক্তি।

১

সকল ভারতীয় দর্শনেরই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য—মুক্তি। এই মুক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য মুক্তিকে নির্ব্বাণ বা কৈবল্য বলা যায়। নির্ব্বাণ বা কৈবল্য শব্দের মোটামুটি অর্থ, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। অর্থাৎ জীবের যে অবস্থায় সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্ত হয় অথচ ভবিষ্যতে আর কখনও তাহার কোন প্রকার দুঃখ হইবার সম্ভাবনাও থাকে না, সেই অবস্থাই জীবের কৈবল্য বা নির্ব্বাণ। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক দার্শনিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈতবাদী পর্য্যন্ত সকল আস্তিক দার্শনিকগণ নির্ব্বাণ বা কৈবল্যের এইরূপ বিবৃতি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ইহাই হইল উক্ত শব্দ দুইটির সর্ব্বসম্মত ব্যাখ্যা; কিন্তু এই প্রকার মুক্তি হইলে জীবের অহংভাব থাকে কি না, তাহার সুখানুভব হয় কি না, শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত তাহার এখনকার ন্যায় সম্বন্ধ থাকে কি না ইত্যাদি বিষয় লইয়া আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে অনেক প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তাহারও আলোচনা করা যাইতেছে।

চার্ব্বাক ও বৌদ্ধদার্শনিকগণের মতে মোক্ষাবস্থায় জীবের অস্তিত্বই থাকে না; সুতরাং দুঃখভোগ করিবার সম্ভাবনারও নিবৃত্তি হয়। তাহার মধ্যে বিশেষ হইতেছে এই যে, চার্ব্বাক মতে এই দেহের বিধ্বংস হইলেই মুক্তি হয়। কারণ, এই ভৌতিক দেহ হইতে পৃথক্ আত্মা নাই; সুতরাং দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সকল ভবযন্ত্রণা মিটিয়া যায়। তাঁহারা বলেন—

"আত্মাস্তি দেহব্যতিরিক্তমূর্ত্তি-
র্ভোক্তা স লোকান্তরিতঃ ফলানাম্।
আশেয়মাকাশতরোঃ প্রসূনাৎ
প্রথীয়সঃ স্বাদুফলাতিসন্ধৌ।"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—চার্ব্বাকদর্শন)

অর্থাৎ দেহ হইতে যাহার স্বরূপ পৃথক্, এইরূপ এক আত্মা এই দেহে আছে, আর সেই আত্মা লোকান্তরে যাইয়া এই লোকে কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিবে, এই প্রকার যে আশা, তাহা আকাশ-তরুর পুষ্প হইতে স্বাদু ফল হইবে এবং সেই ফল আস্বাদন করা যাইবে, এই প্রকার আশার ন্যায় অর্থাৎ এই প্রকার কল্পনা একান্ত ভিত্তিহীন।

ইঁহারা তাই বলিয়া থাকেন—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—চার্ব্বাকদর্শন)

অর্থাৎ যত দিন বাঁচিয়া থাক, সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর—প্রয়োজন বোধ করিলে ঋণ করিয়াও ঘৃত ক্রয় পূর্ব্বক খাইবে। এই দেহ একবার পুড়িয়া ছাই হইলে আর কি কখন ফিরিয়া আসিবে?—কখনই নহে। যে কোন প্রকারে পার, ভোগের সাধন সংগ্রহ করিয়া ফূর্ত্তিতে কাল কাটাও; ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাবিয়া এ সংসারের সুখে বঞ্চিত হইও না।

ইহাই হইল চার্ব্বাক দার্শনিকগণের মত। চার্ব্বাক দর্শনের আর একটি নাম লোকায়তিক দর্শন। লোকসমূহে যাহা আয়ত অর্থাৎ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে প্রচলিত, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া এই দর্শন রচিত হইয়াছে বলিয়া এই দর্শনের নাম লোকায়তিক। পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জন মানব এই মতানুসারে যে চলিয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই মত কতদূর প্রমাণসঙ্গত এবং কি প্রকার প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা এই মত খণ্ডিত হয়, তাহা এই প্রবন্ধে আলোচ্য নহে।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে এই দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকল বস্তুই ক্ষণিক। ইহারা যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ইহাদের বিনাশের জন্য পৃথক্ কোন সাধনানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। এই বিনশ্বর দেহাদির উপর স্থিরতা-জ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের নিদান এবং সেই স্থিরতা-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি হইতেই ইহাদের উপর আমাদের আত্মত্ব-ভ্রান্তি হয়। আত্মা এই বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন স্থির বস্তু এ জগতে নাই; ধ্যান-সমাধি-প্রভাবে এই স্থিরাত্মত্ব-জ্ঞান যখন একেবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে, সকল অস্থির বস্তুকেই ক্ষণিক ও মায়িক বলিয়া দৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারিব, তখনই আমাদের সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্ত হইবে। আত্মা বলিয়া একটা মায়িক বস্তু কল্পনার বা ভ্রান্তির সাহা[illegible] করিয়া আমরা এই ভবযন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছি। ভ্রান্তিমূলক

অনর্থের নিবারণ করিতে হইলে সেই ভ্রান্তিরই উচ্ছেদ করা প্রয়োজন; তত্ত্বজ্ঞানই ভ্রান্তির উচ্ছেদক হইয়া থাকে। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অষ্টাঙ্গ-যোগের সাধনা করিতে হয়। যোগসাধনায় চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান বা সকল বস্তুতে ক্ষণিকতা জ্ঞান আপনা আপনি উদিত হইয়া থাকে; ইহার জন্য যজ্ঞ, তপস্যা বা তীর্থ-পর্য্যটনাদির কোন আবশ্যকতা নাই। ইহাই হইল মোটামুটি বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মত। এই প্রসঙ্গে এই মতের যুক্তিযুক্ততা বা অযৌক্তিকতা বিচার্য্য নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক নামে প্রসিদ্ধ আস্তিক দার্শনিকগণের মতানুসারে নির্ব্বাণ বা কৈবল্যের সময় আমাদের আত্মার কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িকগণ বলেন—আত্মা অজর ও অমর, ইহা আকাশের ন্যায় নিরবয়ব এবং বিভু। সকল পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত যাহা মিলিত হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই বিভু বলা যায়, আত্মা এই কারণে নিষ্ক্রিয়। যে বস্তুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না। কারণ, ক্রিয়া হইলেই সেই ক্রিয়াশ্রয় বস্তু বিচলিত বা পূর্ব্বস্থানভ্রষ্ট হয়। যাহা সর্ব্বদা একভাবে সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইতে ক্রিয়া কিরূপে হইতে পারে? সেই বিভু বা ব্যাপক আত্মার গুণ হইতেছে জ্ঞান। জ্ঞান ও চেতনা একই বস্তু। এই চেতন আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া তাহা চেতন। চেতন আত্মার আরও কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, যথা—ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য ও সংস্কার বা বাসনা। এই সকল গুণ আত্মাতে সর্ব্বদাই যে থাকে, তাহা নহে—বিশেষ বিশেষ কারণের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে এই গুণগুলি যথাসম্ভব আত্মাতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন আকাশের গুণ শব্দ অথচ শব্দ সকল সময় আকাশে থাকে না, দুই হাতে তালি দিলে আকাশে শব্দ উৎপন্ন হয়; তেমনই জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ গুণ সকল সময়ে আত্মাতে যে হইবে, তাহা নহে; আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি, তখন আমাদের জ্ঞান বা ইচ্ছা প্রভৃতি কোন গুণ থাকে না; কিন্তু জাগরণ বা স্বপ্নকালে মনের সহিত সংযোগ-বিশেষরূপ কারণ ঘটিলে আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সংযোগবিশেষ নিদ্রার সময় হয় না বলিয়া সে সময় আমাদের জ্ঞানও হইতে পারে না।

দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে যে অহন্তা-জ্ঞান ও মমতা-জ্ঞান, তাহাই আমাদের সকলপ্রকার দুঃখের কারণ। সুতরাং এই অহং-জ্ঞান ও তন্মূলক মমতা-জ্ঞানের উচ্ছেদ করিতে পারিলেই আমাদের দুঃখ-নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ হইতে পারে। আত্মা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্রিয়াদিরূপ জড় বস্তু নহে, এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানই সেই দেহাদিতে অহন্তা-জ্ঞান ও তন্মূলক মমতা-জ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, শাস্ত্র ও গুরুর সাহায্যে তাহা শ্রবণ করিয়া মনন ও ধ্যান করিতে করিতে কালে সেই তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়। তত্ত্ব-জ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ আমিই দেহ বা আমার দেহ প্রভৃতি এইরূপ ভ্রান্তি আর হয় না। মিথ্যা জ্ঞান এই ভাবে নিবৃত্ত হইলে দোষ অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানমূলক রাগ ও দ্বেষ নিবৃত্ত হয়। দোষ নিবৃত্ত হইলে তন্মূলক প্রবৃত্তি অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য নিবৃত্ত হয়। সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে আর জন্ম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। জন্ম না হইলে আর দুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে ক্রমে সকল দুঃখের নিবৃত্তি বা আত্যন্তিক অনুৎপত্তিই আত্মার মোক্ষ বা নির্ব্বাণ।

তাই ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানানাং উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

সুতরাং ন্যায়মতানুসারে ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে যে, মোক্ষদশায় শব্দহীন আকাশের ন্যায় আত্মা একেবারে জ্ঞান হইয়া থাকে, সে অবস্থায় তাহাতে সুখ বা দুঃখ হয় না। এই মোক্ষাবস্থায় সংজ্ঞাহীন প্রস্তরাদির ন্যায় আত্মাও চেতনাহীন হইয়া থাকে, তাহার অনাদিকালের সঙ্গী অহংভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়। এক কথায় অহন্তা বা জীবভাবের আত্যন্তিক অস্ফুরণই আত্মার নির্ব্বাণ বা কৈবল্য। ইহাই হইল ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মোক্ষের স্বরূপ। সাংখ্য ও যোগমতে মোক্ষদশায় আত্মা কি ভাবে অবস্থান করে, এইবার তাহাই দেখা যাউক।

সাংখ্য ও যোগদর্শনে আত্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপ। সেই আত্মা আকাশের ন্যায় ব্যাপক অথচ বহু; প্রত্যেক দেহের সহিত এক একটি আত্মার সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া দেহের মধ্যে অবস্থিত বুদ্ধিতত্ত্ব নামক প্রাকৃত বস্তুতে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখাদির সহিত আত্মার এক প্রকার ঔপাধিক সম্বন্ধ হয় এবং সেই জন্যই আত্মা সুখ-দুঃখাদি-রহিত হইলেও সুখী ও দুঃখী, এই প্রকার বোধের বিষয়ীভূত হয়। এই প্রকারে

সুখ ও দুঃখের ভোগ আত্মাতে হয় বলিয়া তাহা সংসারী হইয়া পড়ে, নিঃসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সহিত প্রকৃতি কার্য্য জড় বস্তুর এইরূপ সম্বন্ধই আমাদের যাবতীয় অনর্থের হেতু। এই সম্বন্ধের কারণ হইতেছে জড় ও চেতনের অবিবেক। সেই অবিবেক পরস্পরের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান বা বিবেক-খ্যাতি দ্বারা বিনাশিত হইলেই আত্মা মুক্ত হইয়া থাকে। এই মুক্ত দশায় আত্মা কেবল জ্ঞান বা প্রকাশরূপেই অবস্থিতি করে। তখন অহংজ্ঞান থাকে না এবং আমি সুখী বা দুঃখী, এই প্রকার কোন জ্ঞানই থাকে না,—এই মুক্তির সময় আত্মার স্বপ্রকাশময় অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্য কোন ধর্ম্ম থাকে না। ইহাই হইল, সাংখ্য ও যোগমতে নির্ব্বাণের স্বরূপ।

শাঙ্করমতানুযায়ী অদ্বৈতবাদিগণের মতে মোক্ষের স্বরূপ কি, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

এই মতে আত্মা জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, আত্মাই একমাত্র সদ্বস্তু—আত্মা ব্যতিরেকে আর যাহা কিছু সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা বাস্তবিক সৎ নহে। শুক্তির সত্তা যেমন তাহাতে আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত রজতে প্রতীত হয়, সেই স্থলে দৃশ্যমান রজত বাস্তব সৎ নহে, শুক্তিই সৎ বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ বাস্তবিক সৎ না হইলেও ইহার অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম বা আত্মা, তাহার সত্তাই ইহার উপর আরোপিত হইয়া থাকে। আবার দেখ, শুক্তিতে অজ্ঞানবশতঃ রজতের সাক্ষাৎকারস্থলে যেমন শুক্তির স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলে ঐ আরোপিত বা কল্পিত রজত নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের নিরুপাধিক-ভাবে সাক্ষাৎকার হইলে তাহার উপর আরোপিত এই সমস্ত প্রপঞ্চই নিবৃত্ত হয়। এই প্রকার প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি হইলেই আত্মা মুক্তি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা কোন সময়েই বদ্ধ হয় না, তাহা সর্ব্বদাই মুক্ত; কেবল অনাদি অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশতঃ তাহার উপর এই প্রাপঞ্চিক দুঃখ-শোকাদি আরোপিত হইয়াছে মাত্র। এই আরোপিত সাংসারিক ভাব সুতরাং তাহার বাস্তব নহে, উহা আধ্যাসিক বা কল্পিত। এই কল্পিত সংসারই তাহার বন্ধন; এই বন্ধন হইতে উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায় তাহার প্রকৃতস্বরূপে সাক্ষাৎ অনুভূতি। সেই অনুভূতির উপায় শ্রবণ, মনন ও ধ্যান। দীর্ঘকাল বিরক্তির সহিত এই আত্মস্বরূপের শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিতে করিতে ধীর [illegible] তাহার নিত্যস্বরূপতা সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয় এবং সেই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সকল প্রকার কল্পিত অনর্থের নিবৃত্তি হয়। ইহাই হইল সংক্ষেপতঃ অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের মতে মোক্ষ বা নির্ব্বাণের স্বরূপ। মীমাংসকগণের মতেও নির্ব্বাণ আত্মার আনন্দরূপতার নিরবধি স্ফুরণ হইতে থাকা। অবশ্য সকল মীমাংসকই আত্মাকে মুক্ত দশায় আনন্দের অনুভবিতা বলিয়া স্বীকার করেন না; কিন্তু মুক্ত অবস্থায় আত্মা যে দুঃখ অনুভব করে না, ইহা সকল মীমাংসকেরই স্বীকার্য্য। বিস্তার ভয়ে সেই সকল মত-ভেদ এ স্থলে প্রদর্শিত হইল না।

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক। এইরূপে দেখা গেল যে, মুখ্য মুক্তি বা নির্ব্বাণ-লাভ হইলে জীবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্ত হয় এবং আর কোন সময় তাহার দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকে না। এই বিষয়ে কি আস্তিক কি নাস্তিক সকল দার্শনিকেরই ঐকমত্য আছে।

এইবার একটু গৌণ মুক্তির আলোচনা করা যাইতেছে। গৌণ মুক্তি চারিভাগে প্রবিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—সালোক্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য ও সারূপ্য।

জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন নহে; জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না, এই প্রকার যাঁহারা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতানুসারেই এই ভাগে গৌণ মুক্তি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর যে লোকে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সেই বৈকুণ্ঠাদি লোকে বাস করার নাম সালোক্য মুক্তি। বলা বাহুল্য, এই সালোক্যরূপ মুক্তি-দশায়ও জীবের কোন প্রকার জরা, মরণ, ব্যাধি ও শোকাদিজনিত সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি-লাভই সার্ষ্টি মুক্তি। তাঁহার সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস করাই সাযুজ্য মুক্তি এবং তাঁহার ন্যায় আকারবান্ হইয়া ঐশী শক্তি-লাভ করার নাম, সারূপ্যমুক্তি। বলা বাহুল্য, পরমেশ্বরকে যে সকল দার্শনিক সাকার ও নিয়ত লোকবিশেষে অবস্থিত বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের মতানুসারে এই প্রকারে মুক্তির চারিটি বিভাগ বর্ণিত হইল। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের মধ্যে কেহ জীবন্মুক্তিরূপ গৌণ মুক্তিও অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এই জীবন্মুক্তি এই সাধনায় দেহ থাকিতে থাকিতেই হইতে পারে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণও এই জীবন্মুক্তি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

ইহা তত্ত্বজ্ঞানের পরিপাকদশাতেই হইয়া থাকে

জীবন্মুক্তির স্বরূপ শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে নানা প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। উপনিষদ্ বলিতেছে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

এই আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগীর হৃদয়ে সকল প্রকার কামনা যে সময় একেবারে নিবৃত্ত হয়, তখন সে মানুষ হইলেও অমৃত হয় এবং এই দেহেই সেই আনন্দ চিন্ময়-ব্রহ্ম-স্বরূপের আস্বাদন করিয়া থাকে।

ঈশ্বর কৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকায় উক্ত হইয়াছে—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মিন্ মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদবিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥"

এই প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস বা ধ্যান করিতে করিতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রসাদে এক অখণ্ডাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া সেই দেহে অহন্তা বা মমতার প্রকাশ হয় না; আত্মার যে অহমাকার, তাহাও তখন প্রকাশ পায় না।

গীতাতে জীবন্মুক্তকে গুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—এই গুণাতীতের লক্ষণ তাহাতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গুণাতীত বা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সুখ, দুঃখ ও মোহময় সকল গুণকার্য্যই উপেক্ষা করিয়া প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন। কোন গুণ-চেষ্টাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি ভাবিয়া থাকেন, গুণ সকল গুণসমূহে ন্যূনাধিকভাবে মিশ্রিত হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিতেছে, তাহাতে আমার বিচলিত হইবার কারণ কিছুই নাই। সুখ ও দুঃখ তাঁহার সমক্ষে তুল্য বলিয়া প্রতীত হয়, [illegible] প্রস্তর বা লোষ্ট্র কিংবা স্বর্ণ সকলই তাঁহার তুল্য-মূল্য বা হেয় বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহার স্নেহ প্রিয় বা অপ্রিয় থাকে না, তাঁহার মিত্র ও শত্রু সম হয়, ইহা আমার কণ্টক বা ইহা আমার হইবে, এই প্রকার ভাবিয়া তিনি কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। তিনি সর্ব্বদা ধীর ও নিরুদ্বিগ্ন থাকেন। এই প্রকার জীবন্মুক্তি মানব-সাধনার যে পরম সিদ্ধি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণও এই প্রকার জীবন্মুক্তিকে আর্হতাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুখ ও দুঃখের পরস্পর প্রতিকূল তরঙ্গে উদ্বেলিত সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন মানবের পক্ষে এই প্রকার মানসিক শান্তিময় অবস্থা যে একান্ত স্পৃহণীয়, তাহা কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না।

ইহাই হইল সংক্ষেপতঃ মুখ্য ও গৌণ মুক্তির পরিচয়। ভারতের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস এই দ্বিবিধ মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; যাবতীয় দর্শনই এই মুক্তির উপাদেয়তা সপ্রমাণ করিবার জন্য সর্ব্বসময়ে সমুদ্যত। এই মুক্তির সাধন কি, তাহা লইয়া দার্শনিকগণের মধ্যে বিচিত্র বিচিত্র মতভেদ সৃষ্ট হইয়াছে—সকলে একবাক্যে বলিয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞানই ইহার মুখ্য বা সাক্ষাৎ সাধন, অথচ ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণের মতানুসারে সেই তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ-জ্ঞানও ভিন্ন ভিন্ন আকারের হয়। এইরূপ অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মোক্ষকাম হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোন্ দার্শনিকের কোন্ তত্ত্বজ্ঞানটি যে উপাদেয়, তাহার নির্ণয় করা অতি কঠিন সমস্যা। নৈয়ায়িকের ভেদবাদ কিংবা বেদান্তীর অভেদবাদ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রসব করিতে সমর্থ, এই সন্দেহের মীমাংসা এখনও হয় নাই; কখনও যে হইবে, তাহার আশাও নিতান্ত অল্প। এই সকল ভাবিয়া ভক্তিবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, ভক্তিই তাহার সাক্ষাৎ ও একমাত্র কারণ। এই ভক্তির স্বরূপ কি, ঐ সকল নানা প্রকারের তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সেই ভক্তির সম্বন্ধ কি এবং সেই ভক্তিমার্গে যাইবার অধিকারীই বা কে হইতে পারে, তাহারই বিস্তৃত আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধ। ক্রমে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

আমার বোধ হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে ভক্তি-তত্ত্বের আলোচনা নানা প্রকারে প্রীতিকর হইতে পারে। কারণ, ভক্তির প্রতি ভারতের [illegible] জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীর দাবী যে কোন অংশেই কম নহে, তাহা যেমন এক সত্য, সেইরূপ [illegible] আমার ভক্তিতত্ত্বের

আলোচনার দাবী যে অত্যন্ত অধিক, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। যে দেশে প্রেম-ভক্তির পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবৎপ্রেমের বন্যায় বাঙ্গালা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও উড়িষ্যাকে প্লাবিত করিয়া ধন্য করিয়াছেন, দর্শন, কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের সুসমঞ্জস সমন্বয়ের একমাত্র উপায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদরূপ ভাবপ্রবণ মহাদর্শন যে বাঙ্গালার মহাতীর্থরূপ নবদ্বীপে প্রথম প্রচারিত হইয়াছে, সেই বাঙ্গালা দেশে জন্মলাভ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব, শান্তিময় বিশ্বমানবদর্শনের মহা ভিত্তিরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বা প্রেমভক্তিবাদের পরমাশ্চর্য্যময় অথচ পরমানন্দপ্রদ অনুশীলনে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাহা যে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বতোমুখী বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইবে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই বিশেষ দাবীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। আগামী বারে ভক্তির ক্রমিক ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিবাদের ক্রমিক বিবর্ত্ত প্রদর্শিত হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বৈশাখ।

আমি আসিয়াছি রুদ্র—দীপ্ত রৌদ্রে অনল ছড়ায়ে,
ঝলসি ধরার শ্যাম অঞ্চল ফুৎকারে ধূলি উড়ায়ে;
প্রলয় আঁধার ঘন মেঘভার পতাকা উড়ায়ে ঈশানে-
কড় কড় কড় বজ্র-নিনাদে বাজায়ে বিজয়-বিষাণে;
বিদ্যুৎ জ্বালি লিখি নাম মোর আঁধার আমার কেতনে।
নির্ম্মম আমি? ঘন মেঘে মোর ঝরে বারিধারা সঘনে!
সিক্ত ধরার গন্ধ মিশায় বেলা চামেলীর সুবাসে,
পুলকিত আঁখি কৃষকবধূর হেরি ঘন মেঘ আকাশে।
শীর্ণ-শরীর তটিনী আবার পূর্ণ আমার সলিলে;
নির্ঝর কভু সুপ্ত কি রহে গিরির তুষার গলিলে?
ছড়ায়ে অনল জ্বালিয়া বিজলী বরষি স্নিগ্ধ ধার,
মরণের মাঝে জীবন রচিয়া আসি আমি বার বার।
আমি আসিয়াছি; মুছ পুরাতন নবীনে বরণ কর—
নব উদ্যমে কর্ম্মজীবনে আপনার পথ ধর।
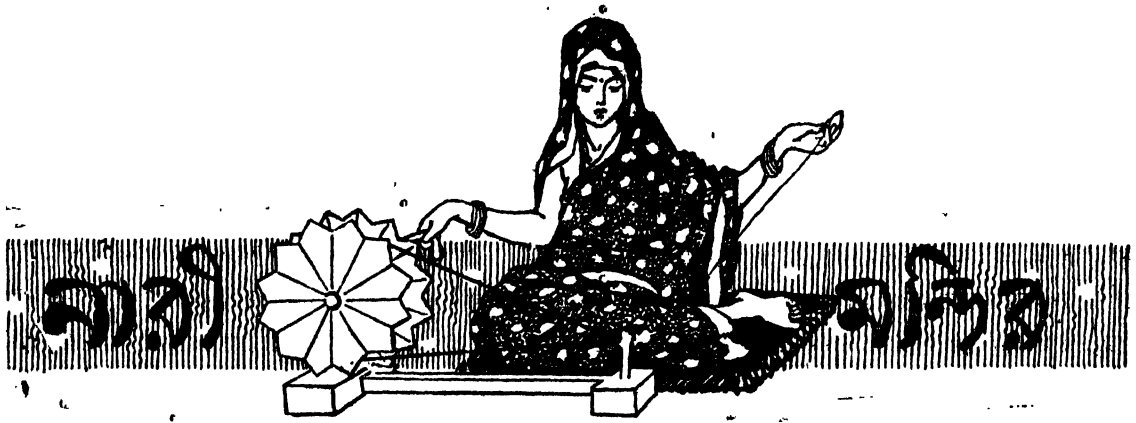
নারীত্ব।

নারীর নারীত্ব নানা যুগে নানা দেশে নানা আকারে ব্যাখ্যাত হইয়া আসিয়াছে—সকল দেশে সকল যুগে নারীত্বের কোন বাঁধাধরা নিয়ম কেহ বাঁধিয়া দেয় নাই। তবে নারীত্বের একটা দিক্ সকল দেশে সকল সময়েই বিশেষভাবে রক্ষিত, লক্ষিত ও প্রশংসিত হইয়া আসিয়াছে—সেটি প্রাচ্যে নারীর সতীত্ব নামে অভিহিত ও প্রতীচ্যে fidelity আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল যুগে সকল সভ্য দেশেই কবির কাব্যে, চিত্র-শিল্পীর চিত্রে, ভাস্করের ভাস্কর্য্য-কার্য্যে, বক্তার বক্তৃতায়, শাস্ত্রকারের শাস্ত্রে, নীতিবিদের নীতিকথায়, ঐতিহাসিকের ইতিকথায়, প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রত্নতত্ত্বে নারীর সতীত্বমহিমা শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুরুষের যেমন সত্যই ধর্ম্ম, নারীর ধর্ম্ম তেমনই সতীত্ব। সতীত্বসৌরভ ব্যতিরেকে নারী-কুসুম অসার, এই ভাবটা সকল যুগে সকল জাতিরই মনোরাজ্যের অস্থিমজ্জাগত।

সতীত্বহীনা নারীর সমাজে যে অতি নিকৃষ্ট স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজবদ্ধা নারীর চরিত্রের আরও একটা দিক্ আছে। সতীত্বের দিক্‌টার যে সে দিকের সহিত সম্বন্ধ নাই, এমন নহে, তবে এখনকার কোনও কোনও দেশের ভাবুক ও চিন্তাশীল লেখক উহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা psychology বা মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। সমাজবদ্ধ মানুষের মনোবৃত্তি সমূহের সম্যক্ অনুশীলন, স্ফূর্ত্তি ও পুষ্টি-সাধনের সহিত নৈতিক চরিত্রগঠন ও পুষ্টির সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া নারীকে পুরুষের মত সমালোচনা করা হইয়া থাকে। পুরুষের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রগঠনের দিক্‌টা বাদ দিয়া যেমন পুরুষের মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক্ দিয়া তাহার পৌরুষ বা পুরুষত্ব ফুটাইয়া তুলা হয়, নারীর পক্ষে তেমনই নারীত্ব মহিমা ফুটাইয়া তুলা হইতেছে। আইরিশ মুক্তিকামীদিগের দলপতি পার্ণেলের নৈতিক চরিত্র আদর্শ নহে, কবি লর্ড বায়রণের চরিত্র আদর্শ নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া পার্ণেল বা লর্ড বায়রণের পৌরুষের স্তুতিবাদকের অভাব নাই—সে স্তুতিবাদকরা পার্ণেল বা লর্ড বায়রণের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ইহা ভাল কি মন্দ, সে বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। সে সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার আলোচনা এ দেশেও হইতেছে এবং হওয়াও সমাজের পক্ষে প্রয়োজন। বর্ত্তমানে নারীর নারীত্ব সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে, সে বিরোধের উভয় পক্ষের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া, উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উপহার দেওয়াই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। নারীর নারীত্ব কি, নারীত্ব-মর্য্যাদাই বা কি, তাহার বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান প্রয়োজন। নারীত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন ভাব-ধারার পার্থক্য এই স্থানে ফুটাইয়া তুলিলে এই আলোচনার পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে। এই হেতু উপক্রমণিকা হিসাবে প্রাচীন ও নবীন ভাবের তুলনায় আলোচনা করিতেছি।

আমাদের ভাবের ধারা।

প্রথমেই আমাদের শাস্ত্র পুরাণের কথা বলি। মনু স্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ, হিন্দু-সমাজ ইহার উপর খুবই নির্ভর করেন, কেন না, মনুই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া মানিত। মনু নারীত্বের দিক্‌টা কেমনভাবে ফুটাইয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি:

মনু এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—

যেখানে যে গৃহে নারী পূজা পায়েন, সেখানে সে গৃহে দেবতা প্রীতি লাভ করেন।

অপিচ,—

"প্রজননার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হি॥"

অর্থাৎ গৃহের আলোকস্বরূপ মহাভাগ্যবতী নারী পূজা পাইবার উপযুক্ত, প্রজা-উৎপাদনার্থ বহু কল্যাণভাগিনী। গৃহে নারী ও লক্ষ্মীর মধ্যে প্রভেদ নাই। অপত্যোৎপাদন, সঞ্জাত পুত্রের পালন এবং লোকযাত্রানির্ব্বাহকল্পে, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্য-নির্ব্বাহাদি বিষয়ে ভার্য্যাই প্রধান সহায়। ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান, অপত্যলাভ, শুশ্রূষা, এবং আপনার ও পিতৃলোকের স্বর্গপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে ভার্য্যাই গতি।

আর এক স্থানে,—

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥"

অর্থাৎ যে পরিবারে ভার্য্যার দ্বারা ভর্ত্তা এবং ভর্ত্তার দ্বারা ভার্য্যা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, সেই কুলে সর্ব্বদা কল্যাণ বিরাজ করে।

লিখিত বলিয়াছেন,—

"তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।
অনুকূল-কলত্রো যস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি॥"

অর্থাৎ পতি সহধর্ম্মিণীর সাহায্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব যে ভাগ্যবান্ পুরুষের ভার্য্যা অনুকূল, তিনি পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন।

মহাভারতে আছে,—

"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥"

অর্থাৎ ভার্য্যা পতির অর্দ্ধাঙ্গ, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের মূল, সংসার-সাগর পার হইবার অর্থাৎ মোক্ষেরও মূল।

নারী সংসারে কত বড়—নারীত্ব সংসারে কত প্রয়োজনীয়, তাহা উপরি-উক্ত শাস্ত্রবচনেই জানা যায়। সে নারীত্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য শাস্ত্রকারের ব্যবস্থা এই :—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥"

অর্থাৎ—কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত (পুত্রের ন্যায়) লালনপালন ও সুশিক্ষাদান করিবে এবং সেই সুশিক্ষিতা কন্যাকে ধনরত্ন যৌতুক দিয়া বিদ্বান্ বরে অর্পণ করিবে।

শিক্ষার কথাটা আবার হেমাদ্রি খোলসা করিয়া বুঝাইয়াছেন :—

"কুমারীং শিক্ষয়েদ্‌বিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যা বিদ্যামধিগচ্ছতি॥
ততো বরায় বিদুষে দেয়া কন্যা মনীষিভিঃ।
এষঃ সনাতনঃ পন্থা ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতে॥
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাং অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্‌বাহয়েৎ পিতা বালাং অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥"

অর্থাৎ—কুমারী কন্যাকে বিদ্যা শিখাইবে, ধর্ম্মনীতিতে তাহার মন নিবিষ্ট করাইবে; যে বিদ্যায় ধর্ম্ম ও নীতি প্রবিষ্ট হইয়াছে, ঐ বিদ্যাই অশেষ কল্যাণপ্রদ। মনীষীরা তৎপরে সেই (শিক্ষিতা কুমারী) কন্যাকে বিদ্বান্ বরে অর্পণ করিবেন। ইহাই সনাতন পন্থা বলিয়া ঋষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে কন্যা পতিমর্য্যাদা, পতিসেবা এবং ধর্ম্মশাসন জানে না, পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।

মনু ইহারও উপরে গিয়াছেন,—

"কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যর্ত্তুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্‌বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥"

অর্থাৎ—প্রাপ্তবয়স্কা হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবেন, ইহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি নির্গুণ পাত্রে সমর্পণ করিবে না। কুমারী বিবাহযোগ্য বয়স পাইয়া তিন বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া আপন পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন।

নারীত্ব সম্বন্ধে ঋষিদের এক দিকে এই ধারণা, অপর দিকে কিন্তু ধারণা একেবারেই ভিন্ন। নারীর সম্বন্ধে এক স্থানে আছে,—

"শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ॥"

অর্থাৎ—মনু কল্পনা করিয়াছেন, স্ত্রীজাতি হইতেই শয়নাসন-ভূষণ, শীলতা, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য, এবং কুৎসিতাচার,—এ সমস্ত উদ্ভূত হইয়া থাকে।

যেন এ সব অপরাধ নারীরই একচেটিয়া সম্পত্তি! আবার ইহা হইতে আরও ভীষণ কল্পনাও আছে।

নারীজাতি—মাতৃজাতির প্রতি অতি জঘন্য কলঙ্কারোপের কথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে মনে হয়, ঋষিরা দুষ্টা চরিত্রহীনা নারীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথা বলিয়াছেন। নহিলে যাঁহারা গৃহে স্ত্রীতে ও লক্ষ্মীতে প্রভেদ নাই বলিয়াছেন, তাঁহারা কুললক্ষ্মীদিগের পক্ষে অপমানজনক কথা বলিবেন কিরূপে?

নারীর স্বাতন্ত্র্যের কথায় মনু বলিয়াছেন,—

"অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্তঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥"

অর্থাৎ—ভর্ত্তা প্রভৃতি স্বজনরা দিবারাত্রি কদাপি নারীকে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থান করিতে দিবেন না; বরং সদা অনিষিদ্ধ রূপরসাদি বিষয়ে প্রসক্ত করিয়া নিয়ত তাহাদিগকে স্ববশে সংস্থাপন করিবেন।

নারীজাতি যেন গোমেষাদি অস্থাবর সম্পত্তিরই মত,—তাই তাহাদিগকে কখনও দড়ীছাড়া করিতে নাই!

মনু অপর স্থানে বলিয়াছেন :—

"ন কশ্চিৎ যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্।
এতৈরুপায়যোগৈস্তু শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্॥
অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্যবেক্ষণে॥
অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

অর্থাৎ—কেহ কখনও বলপূর্ব্বক কোন নারীকে সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তবে বক্ষ্যমাণ উপায় দ্বারা তাহারা সহজে রক্ষণীয়া। সেই উপায় এই,—অর্থের সংগ্রহ ও ব্যয়সাধনে, নিজ শরীর ও গৃহদ্রব্যাদির শুদ্ধিবিধানে, অন্নপাককরণে এবং গৃহোপকরণের পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতিকে নিয়োজিত করিবে। যে নারী দুঃশীলতাহেতু স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাহাকে নিকট আত্মীয়রা গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না; কিন্তু যে নারী স্বয়ং আত্মরক্ষায় তৎপর, কেহ তাহাকে রক্ষা না করিলেও সে সুরক্ষিত।

মনু শেষে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, প্রাচীনকালের ঋষিরা নারীর নারীত্ব-মর্য্যাদাজ্ঞান বিষয়ে যে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এমন নহে। তবে কেন যে তাঁহারা কেবল বেড়ার আড়াল দিয়া অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় নারীকে বাহির হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বুঝা যায় না। স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচারিতা নহে, এ কথা সকলেই জানেন। মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশে নারীর স্বাধীনতা আছে, তাহা বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতা নাই। সে সব দেশে নারীর নারীত্বমর্য্যাদাজ্ঞান, স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান আছে। আমাদের বাঙ্গালায় বা আর্য্যাবর্ত্তে নাই। কিন্তু সকল দেশেই সংসারে ও জাতির উপর নারীর অসাধারণ প্রভাব। কারণ, নারী—জননী।

নবজাগরণে নারীর অংশ।

এই যে নারীর নারীত্ব, এই যে নারীর স্বাতন্ত্র্য—ইহার ভিতর দিয়া বর্ত্তমানে দেশের নারীর—মাতৃজাতির চরিত্র গড়িয়া উঠিবে, কি নারী গৃহকর্ত্রীরূপে লক্ষ্মীরূপে সংসারের সেবিকা ও প্রেমিকারূপে গড়িয়া উঠিবেন,—তাহা বিচারের সময় আসিয়াছে। নবভাবে দেশের জীবন পরিপুরিত হইয়াছে, দেশে নবজাগরণের সাড়া আসিয়াছে, বহুকালের জাড্য ও অন্ধকার দূর করিয়া নবশক্তির অরুণোদয় হইতেছে। এ সময়ে পুরুষ কি একা জাগিবে, না নারী তাহার জাগরণের পথে সহযাত্রী হইবে? নারীর নারীত্ব ঘরের ভিতরে, না বাহিরে, না ভিতরে বাহিরে উভয়ত্র? নারী কি কেবল খেলার সাথী, সেবার দাসী, সন্তান-পালয়িত্রী, সংসার-কর্ত্রী থাকিবে, না বাহিরের কুটিল পঙ্কিল ধূলিকর্দ্দমাক্ত পথেও পুরুষের অনুগামিনী হইবে, অথবা আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া পুরুষকেই পথিপ্রদর্শন করিবে? এ সব সমস্যার সমাধানের সঙ্গে আমাদের উন্নতি বিশেষভাবে বিজড়িত।

রামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য-পালনে বনগমন করিয়াছিলেন, এবং ভীষণ দণ্ডকারণ্যে যখন রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন পত্নীহারা রাম সীতাকে না দেখিতে পাইয়া সখেদে বলিয়াছিলেন,—

"যা মে রাজ্যবিহীনস্য বনে বস্তেন জীবতঃ।
সর্ব্বং ব্যপানয়চ্ছোকং বৈদেহী ক নু সা গতা॥"

এই যে সীতা রাজ্যসুখচ্যুতা হইয়াও বনে বন্য ফলে জীবন ধারণ করিয়া পুরুষসিংহ পতির দুঃখশোক নিবারণ করিতেন, তিনিও ত আর্য্য মহিলা। তাঁহারও নারীত্ব-মর্য্যাদা-জ্ঞান সামান্য ছিল না। যখন রামচন্দ্র বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সীতাকে বনে লইয়া যাইতে চাহেন নাই, সে সময়ে আদর্শ-সতী সীতাদেবীও নারীত্ব-মর্য্যাদাগর্ব্বে দীপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"কিং ত্বামনত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্॥"

অর্থাৎ—মদীয় পিতা মিথিলাধিপতি বৈদেহ তোমাকে জামাতা করিয়া, পরে তুমি যে কেবল পুরুষ মাত্র, কার্য্যে স্ত্রীলোকের ন্যায়, তাহা কি জানিতে পারিয়াছেন? (অর্থাৎ তুমি পুরুষ হইয়াও নিজ নারীকে অরণ্যে রক্ষা করিবার অসামর্থ্য হেতু আমাকে বনে অনুগমন করিতে দিতেছ না, এই তোমার পুরুষত্ব! ধিক্!)

নারী যে বিলাসের দ্রব্য নহে,—রণে বনে ছায়ার ন্যায় পুরুষের সকল মহৎ কার্য্যে অনুগামিনী, তাহা আদর্শ ভারত-মহিলার চরিত্র-চিত্রে প্রকট। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা,—সকল চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই। নারী চেলির পুঁটুলিটি থাকিয়া লাগেজের সামিল হইবে; না প্রজাপতিটির মত সাজিয়া গুজিয়া শুধু নাটক-নভেল পড়িবে, সংসার দেখিবে না, Libertyর নামে Licenseএর পূজা দিবে;—এ দুই extremeই যে বর্ত্তমানে কাহারও মনঃপূত হইবে না, তাহা বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই জানা যায়।

প্রতীচ্যের আদর্শ।

মনে ভাবিবেন না যে, কেবল এ দেশেই নারীত্ব-সমস্যা জটিল হইয়াছে। প্রতীচ্যেও তথৈবচ। সেখানেও আদর্শ হাতড়াইয়া বেড়ান হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক, হায় রে সেকাল, অর্থাৎ "ভিক্টোরিয়ার যুগ" ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। এই শ্রেণীর মধ্যে অনেক নারীও আছেন। ইঁহাদের মধ্যে একটি বড় ঘরের ঘরণী সে দিন বিলাতের এক শক্তি-শালী সংবাদপত্রে এ কালের মেয়ে-মর্দ্দানীর যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া সে কালের নারীর লজ্জাশীলতা, কোমলতা ও গৃহিণী-পনার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। আবার ইহার উত্তরে এ কালের যথেষ্ট গুণগান করিয়া সে কালের ভণ্ডামীকে গালি-পাড়া হইয়াছে। এ কালের fast women এবং সে কালের prude বলাটা যেন কবির লড়াইয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এক শ্রেণীর লোক বলেন, এ কালের young womenরা কেমন vivacious, তাহাদের outdoor sport manly sport, তাহাদিগকে কত healthy কত energetic করিয়াছে! এ জন্য তাহারা কত প্রজননক্ষমা হইতেছে, কত শক্তিশালী সন্তানের জননী হইতেছে! যুদ্ধের সময় যে license বা স্বেচ্ছাচারিতা এবং promiscuous mixing বা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেশামিশি ঘটিয়াছিল এবং যাহাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা বৃদ্ধি পাইয়াছিল;—সে অবস্থা ক্রমে লুপ্ত হইতেছে; এখন আবার মেয়েরা সামলাইয়া উঠিতেছে। তবে যুদ্ধকালে তাহারা যে পুরুষোচিত আত্মনির্ভরতা, কর্ম্মনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াছিল, উহাতে তাহারা পূর্ব্বের অপেক্ষা বহুগুণে জীবন-সংগ্রামে যথার্থ সঙ্গিনী হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, পুরুষের ন্যায় শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছে এবং পুরুষের সহিত সমান শক্তিতে চিন্তা ও ভাবরাজ্যের সম্পদ্-সংগ্রহে অভ্যস্ত হইয়াছে।

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, যদি এমনই হইল, তাহা হইলে স্ত্রী ও পুরুষে প্রভেদ রহিল কি? মানুষ একই ভাবে একই উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুরুষ হইয়া সৃষ্ট হয় নাই। পুরুষ ও নারীর গঠন ও প্রকৃতি একই ছাঁচে ঢালা নহে। সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্য তাহা হইলে ভিন্নাকার ধারণ করিত। তবে নারী পুরুষোচিত manly (মর্দ্দানা) ভাবাপন্ন হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না কি? আজকাল প্রতীচ্যের নারীরা কেবল পুরুষের মত অশ্বারোহণ, শীকার, ভ্রমণ, অভিনয় প্রভৃতি করিয়া এবং সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা করিয়া পুরুষের সম-কক্ষতা অর্জ্জন করিতেছেন, এমন নহে; পরন্তু তাঁহারা পুরুষের মত ফুটবল, হকি, ক্রীকেট, ব্যায়াম, দৌড়ঝাঁপ, সন্তরণ, বাচখেলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে পুরুষের সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইতেছেন। এ সব 'মেয়ে-মর্দ্দানী' তাঁহাদের ভাল লাগে না, তাঁহারা চাহেন, সে কালের 'মেয়েলী ঢঙের মেয়ে।'

অনেক দিনের কথা নহে, গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ

ভাগে বিলাতের একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে "নারীর রাজত্ব কোথায়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক সাদামটনের উইল রোড নিবাসী ডাক্তার আর্থার কিং, এম ডি। প্রবন্ধের মর্ম্ম এইরূপ :—

"পুরুষ যতই শক্তিশালী হয়, ততই সে স্বগৃহে কর্ত্তৃত্ব করিতে অসমর্থ হয়। ইহা আশ্চর্য্য হইলেও সত্য। পুরুষ যতই শক্তিশালী হয়, ততই নারীর বশবর্ত্তী হয়। কারণ,নারীর সাহায্য ব্যতীত সে একদণ্ড সংসারে চলিতে পারে না। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, ভালবাসা ব্যতিরেকে মনীষা তিষ্ঠিতে পারে না। নেপোলিয়নের নিজের জীবনে এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার জীবনে নারী কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। গৃহেই নারীর কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে। গৃহে নারীর মঙ্গল-হস্তস্পর্শে সকল জিনিষের শোভা ফুটিয়া উঠে। ভালবাসাই গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ভালবাসাই নারীর রাজত্ব, here in lies her realm."

ইবসেন ও ষ্ট্রীনবার্গ।

এইভাবে ভাবের দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। বিখ্যাত ইংরাজ মহিলা ঔপন্যাসিক ভিক্‌টোরিয়া ক্রশের এক নায়িকা যে ভাবে চিত্রিতা হইয়াছেন, তাহা আমাদের মত প্রাচ্যের লোকের নিকট অতীব বিস্ময়কর। তাঁহার নায়িকা ইংরাজদুহিতার একই আধারে দুই রূপ। এক রূপে তিনি শিক্ষিত পাশ্চাত্য নায়ককে মনের পূজা intellectual worship দিতেছেন, অন্য রূপে প্রাচ্যের সুরূপ সুগঠন পাঠান যুবককে দেহের পূজা দিতেছেন। এক দিকে তাঁহার নায়িকার উচ্চশিক্ষিত সুমার্জ্জিত সভ্য মন সমকক্ষ সুমার্জ্জিত সুসভ্য পুরুষের মনের সঙ্গলাভের জন্য বুভুক্ষিত, অন্য দিকে তাঁহার নায়িকার দুর্জ্জয় বাসনা-চালিত প্রবৃত্তিবশীভূত দেহ পাঠান যুবকের প্রত্যেক চলনভঙ্গী ও গঠন-সৌন্দর্য্যের সঙ্গলাভে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত। ইহার ভিতর দিয়া ভিক্‌টোরিয়া ক্রশ তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাঁতে দোষের কথা কিছুই তিনি দেখিতে পায়েন নাই; কেন না, ইহা nature ও art painting. তাঁহার মতে নারীর সৌন্দর্য্য পুরুষের বাসনার মুখাপেক্ষী, অন্যথা নারীর সৌন্দর্য্যের সার্থকতা নাই —a woman's beauty lies in man's desire. ভিক্‌টোরিয়া ক্রশ ব্যতীত টমাস হার্ডি, বার্ণার্ড শ প্রমুখ মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌গণ নারীকে মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া নানাভাবে ফুটাইয়াছেন।

আজ প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসরাধিক কাল প্রতীচ্যে নারীর নারীত্ব মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হইতেছে। দুইটি পরস্পর-বিরোধী মত তন্মধ্যে প্রধান। এখন যে জগতে Capital ও Labourএর দ্বন্দ্ব হইতেছে, এ দ্বন্দ্বও তাহারই অনুরূপ। এক দিকে নরওয়ের বিখ্যাত লেখক ইবসেন, অন্য দিকে সুইডেনের ষ্ট্রীনবার্গ। ইবসেন তাঁহার Doll's House গ্রন্থে নারীর অধিকারের পক্ষে, নারীত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন। তিনি বলেন, সৃষ্টির আদি হইতে প্রবল পুরুষ নারীকে exploit করিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্মগত অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নিজের সুখ ও স্বার্থসাধনোদ্দেশে তাহাকে সেবাদাসী করিয়া রাখিয়াছে। এই exploitationএর বিরুদ্ধে নারীর দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি ঘর ভাঙ্গিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নূতন করিয়া গড়িবার পথ কিছুই দেখান নাই।

আর এক দিকে সুইডেনের ষ্ট্রীনবার্গ, ইবসেনের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তিনি ইবসেনকে Norweigian blue-stocking আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "ভাল রে ভাল! পুরুষ নারীকে exploit করিল কবে? চিরদিন নারীই ত পুরুষকে exploit করিয়া আসিয়াছে। পুরুষ একইরূপে নারীর নিকট তাহার প্রাপ্য চাহে; নারী মাতা, জায়া, ভগিনী ও কন্যা—এই চারি রূপে প্রাপ্য চাহিয়া পুরুষকে exploit করে। তাহা হইলে exploitation কাহার অধিক? এই exploitationএর বিপক্ষে পুরুষের দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য।"

আমরা উপক্রমণিকায় সকল দিকেরই আভাস দিবার প্রয়াস পাইলাম। এই আলোচনার ভিত্তির উপর দেশের শ্রদ্ধেয়া মনস্বিনী লেখিকারা তাঁহাদের মতামতের বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করুন, ইহাই বাসনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

দিনের বেসাতী

বঙ্গনারীর কাজ

আজকাল আমাদের দেশে একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই—জীবন-সংগ্রাম। একটা ইংরাজী কথার প্রতিশব্দ আমাদের দেশে না থাকায় এই কথাটা রচনা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে এ কথাটা না থাকিবার বিশেষ কারণও আছে। আমাদের দেশে যখন জীবন ছিল, তখন তাহার জন্য সংগ্রাম ছিল না, অর্থাৎ "প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত" ছিল না। আর আজ যখন সংগ্রামটাই প্রবল, তখন "তীরস্থ করা" লোকের নাড়ীর মত জীবনটা খুঁজিয়া পাওয়া দায় হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কথা ছিল, "স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেন" উদর পূর্ণ হইত; অভাব অত্যন্ত অল্প ছিল। সে-ই ভাল ছিল কি না, তাহার বিস্তৃত আলোচনা অর্থাৎ সে বিষয়ে গভীর গবেষণা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথাটা আর অস্বীকার করা যায় না যে, সংগ্রামটা প্রবল হইয়াছে।

এই সংগ্রামের কঠোরতা এমন হইয়াছে যে, শ্রমের আধিক্যে অনেক পুরুষের অকাল-মৃত্যু হয়। তখন মনে হয়, আমরা নারীরা যদি কেবল সেবা-শুশ্রূষা না করিয়া, জীবন-সংগ্রামে যোগ দিয়া পুরুষের পক্ষে তাহার কঠোরতার হ্রাস করিতে পারিতাম!

কেবল তখনই নহে, আজকাল আরও অনেক সময় নারীর সেই কথা মনে হয়। যাহারা বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্ত্তার ও স্থবিরে পুত্রের ভার—তাহারা অদৃষ্টের দোষে সময় সময় এমন ভার হয় যে, সে ভার কেহই বহন করিতে চাহে না। দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য—সকল দিকেই ব্যয় বাড়িয়াছে, আরও বাড়িতেছে; অর্থ-নীতিক কারণে একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; যে যাহার লইয়া ব্যস্ত—তবুও আয়ে ব্যয় কুলায় না—যশোদার দড়ীর দুই মুখ এক হয় না। এ অবস্থায় কেহ যে বিধবা ভগিনীর ও তাহার পুত্র-কন্যার বা বিধবা ভ্রাতৃবধূর বা পিসী মাসীর ভার লইতে ভয় পাইবে, তাহা স্বাভাবিক। সে জন্য সে কালের কথা ভুলিয়া লোকের নিন্দা করা সঙ্গত নহে। কারণ, সায়েস্তা খাঁর আমলে চাউলের যে দর ছিল, এখন তাহা নাই। কাজেই অনেক সময়েই মনে হয়, এ দেশে কি নারী তাহার গৃহকর্ম্ম করিয়াও গৃহেই বসিয়া কোন কাজ করিয়া আপনার ভরণ-পোষণের জন্য কিছুই অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না?

অবশ্যই পারে। এখন যে পারে না, সে কেবল শিক্ষার অভাব।

এ দেশে—এই বাঙ্গালা দেশেও পূর্ব্বে মহিলারা চরকায় সূতা কাটিয়া অর্থ অর্জ্জন করিতেন। 'ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। যাঁহাদের অভাব ছিল না, তাঁহারাও চরকায় সূতা কাটিয়া বেচিতেন, যে পয়সা হইত, তাহা তাঁহাদের স্ত্রীধন হইত। তখন চরকার এত আদর ছিল যে, চলিত ছড়া ছিল—

"চরকা আমার স্বোয়ামী পুত,
চরকা আমার নাতি;
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতী।"

চরকায় দ্বারে হাতী বাঁধা যাইত কি না, ঠিক বলা যায় না; কিন্তু তাহাতে যে অবসরকালে অন্তঃপুরে থাকিয়া—অন্য কাজের মধ্যে অর্থার্জ্জন হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন আমাদের সেই অভ্যাসটিই গিয়াছে। কেন গিয়াছে, সে কথার উত্তর এক কথায় দেওয়া সহজ নহে। তবে সে জন্য বর্ত্তমান শিক্ষার পদ্ধতি যে অনেকটা দায়ী, তাহা সহজেই মনে হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যেমন পুরুষকে জাতীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত করিয়াছে—বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাও তেমনই স্ত্রীলোক-দিগকে বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত করিয়াছে। আমরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি, তাহার সহিত আমাদের সামাজিক জীবনের কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ"—লিখা বেথুন স্কুলের গাড়ী যে দিন বাঙ্গালীর মেয়েদের আনিতে বাহির হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই এ বিষয়ে বিষম ভুলের আরম্ভ। সেই দিন হইতে আমরা বিদেশী মেয়েদের অক্ষম অনুকরণে ব্যাপৃত হইয়া পূর্ব্বের আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়াছি, কিন্তু বিদেশী মেয়েদের ছাঁচে আপনা-দের গড়িতে পারি নাই। আজও সেই ভুল চলিতেছে এবং বাড়িতেছে। বাপ-মা "লেখাপড়া" না জানিলে মেয়ের বিবাহ

হইবে না বলিয়া মেয়েদের স্কুলে দেন। শিক্ষা কি হয়, তাহা দেখিবার যোগ্যতা মা'র নাই—বাপের সে সময় নাই। সহরে খৃষ্টান মিশনারী-স্কুল সর্ব্বাপেক্ষা কাছে ও সস্তা—পল্লী-গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে পড়ে; কেবল "বৃত্তি" পাইবার জন্য গুরুমহাশয় খাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্বতন্ত্র লিখেন। মেয়ে দেখিতে আসিয়া বরপক্ষের লোক জিজ্ঞাসা করে, "কি পড় ?" মেয়েটি ভয়ে ভয়ে পদ্মপাঠ হইতে নবধারাপাত পর্য্যন্ত কতকগুলি পুস্তকের নাম করে। বরপক্ষ বিদ্যার বহর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যায়েন। বিদ্যালাভ যাহা হয়, তাহাতে অশুদ্ধ বানানে স্বামীকে পত্র লিখা পর্য্যন্ত চলে—ছেলে-মেয়েকে পড়ান চলে না; আর চলে, উপন্যাস লইয়া তাহার বর্ণনা প্রভৃতি অংশ বাদ দিয়া কেবল মোটামুটি গল্পাংশ বুঝিতে পারা। এ বিদ্যায় মানুষ গড়া যায় না। আজ যখন দেশে জাতীয় জীবন গড়িবার কথা শুনি—যখন দেশাত্মবোধের কথা শুনি, তখন মনে হয়, যদি সব ছাড়িয়া আমাদের জাতীয় নেতারা সমাজের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, তবে জাতীয় জীবন আপনা আপনি গড়িয়া উঠিবে। কারণ, মা'র কাছে মুখে মুখে জাতির আদর্শের শিক্ষা পাইয়া বালক-বালিকারা প্রকৃত জাতীয় জীবনের সন্ধান পাইতে পারে। এখন জাতীয় সাহিত্য হইতেও মেয়েরা আদর্শ সঞ্চয় করিতে পারে না—রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী এখন আর পঠিত হয় না; বিদেশী আদর্শে রচিত উপন্যাসই আদৃত।

স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে—সে ভাল কথা; তাহারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমরা যেটুকু লিখিতে ও পড়িতে শিখি, তাহাতে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। প্রকৃত শিক্ষা হইলে আমরাও অবসরকালে কাজ করিয়া পুরুষের শ্রম লাঘব করিতে ব্যস্ত হইতাম এবং আপনারাও স্বাবলম্বী হইবার উপায় করিতে পারিতাম। আমাদের স্বাবলম্বী হইবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় আমরা অনেক সময় পরের গলগ্রহ। আর সেই জন্যই সময় সময় নারী নারীর মর্য্যাদা রাখিয়া—ভারতে নারীর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হয়।

যে শিক্ষায় আমরা প্রয়োজন হইলে স্বাবলম্বী হইতে পারি, আমাদের জন্য সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—সে প্রয়োজন দিন দিন অধিক উপলব্ধ হইতেছে। চরকা যদি সে ব্যবস্থা করিতে পারে, আমরা চরকাকেই আদর করিয়া লইব। কিন্তু চরকার উপযোগিতা এবং স্থানবিশেষে তাহার একান্ত উপযোগিতা অস্বীকার না করিয়াও বলা যায়, চরকা চালান ছাড়া অন্য কাজেও যদি আমরা ঘরে থাকিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারি বা স্বামিপুত্রের সাহায্য করিতে পারি, তবে সে কাজ ত্যাগ করিয়া কেবল চরকাই বা চালাই কেন?

পূর্ব্বে যখন মেয়েরা চরকায় সূতা কাটিতেন, তখন পুরুষরা একখানা চাদর মাত্র গায়ে দিতেন। মোজা, গেঞ্জী, জামা এ সকলের তখন চলন ছিল না। কাটা পোষাক আজও পূজার সময় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তখনও মহিলারা অন্য কাজও করিতেন। ঢাকাই কাপড়ে বুটা তুলা, কাঁথায় নক্সা সেলাই করা, আমসত্ব দেওয়া এ সব তখনও ছিল।

এখন কর্ম্মক্ষেত্র আরও বাড়ান যায়। কোন কোন বাড়ীতে সেলাইয়ের কল আসিয়াছে। তাহাতে গৃহস্থের অনেক টাকা লাভ হয় অর্থাৎ অনেক খরচ বাঁচে। আমি কাশীতে দেখিয়াছি, দুই জন বালবিধবা ভদ্রকন্যা ছেলেমেয়েদের জামা সেলাই করিয়া তাহারই বিক্রয়লব্ধ অর্থে আপনাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন এবং একটি ভ্রাতাকে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে পড়াইতেছেন। দেখিয়া আমার যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারি না। আবার তাঁহাদের সেই সব জামা যাহারা বাড়ী বাড়ী বেচিয়া বেড়ায়, তাহারাও তাহাতেই জীবিকা অর্জ্জন করে। এইরূপে কত লোক স্বাধীনভাবে পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে।

তেমন অনেক কাজ আমরা করিতে পারি। তাহাতে পুরুষদিগের কোনরূপ আপত্তি থাকা ত পরের কথা, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা তাহাতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ শিক্ষা দিবার পথটাই পাইতেছেন না। যেমন আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সব ছেলের উপযোগী নহে, বুঝিতে পারিলেও তাঁহারা অন্য উপায়ের অভাবে সব ছেলেকেই সেই এক পড়া পড়ান, তেমনই আজকাল মেয়েরা যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহা তাহাদের উপযোগী নহে, বুঝিতে পারিয়াও তাঁহারা অন্য উপায় করিতে পারিতেছেন না। মধ্যে বিলাতী আদর্শই দেশে অনুকরণ করা হইতেছিল, "ন দণ্ডের মধ্যে নবান্ন" সারার মত এগার বৎসর:

বয়সে যতটুকু ইংরাজী আদর্শের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তাহাই হইত। এখনও তাহাই চলিতেছে—প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্ষ্ট বুক', পদ্যপাঠ, চারুপাঠ, আবার কোথাও কোথাও হারমোনিয়মে গোটা কতক গৎ বা গান বাজান। ইহার অধিকাংশই কাজে লাগাইবার মত শিখিবার সময় হয় না। যে সব ঘরে খুব সেকেলে চাল চলিত আছে, সে সব ঘরে মেয়ে পড়িলে—বিবাহের পরই এ সব শিক্ষায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, অন্যত্র বিবাহের পরও হয় ত এক বৎসর মিশনারী সভার "গুরু মা" আসিয়া সপ্তাহে দুই দিন বাইবেল পড়াইবার উদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গে অন্য শিক্ষাও দিয়া থাকেন। অথচ এই শিক্ষায় অনেক স্থলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাহাতে সংসারের সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই বাড়ে। কবি হেমচন্দ্র বাঙ্গালীর মেয়ের সম্বন্ধে যে দুইটি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই শিক্ষার প্রতি তাঁহার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। নামমাত্র বিদেশী শিক্ষার ফল বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

"কার্পেটে কারচুপী কাজ কারু নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধ্‌তে ডাল।"

যে শিক্ষার ফলে স্ত্রীলোককে ঘরকন্নার কাজে জলাঞ্জলি দেওয়ায়, সে শিক্ষা যে স্ত্রীলোকের উপযোগী নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্যই অল্প শিক্ষার কুফল অধিক শিক্ষায় দূর হইবে মনে করিয়া তিনি দুই জন বাঙ্গালীর মেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"যেই দুঃখে লিখিয়াছি বাঙ্গালীর মেয়ে,
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে।"

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভই নারীর শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। যে শিক্ষা মানুষকে তাহার কর্ত্তব্যের উপযোগী করে, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

এই শিক্ষা অবশ্যই ব্যক্তি, অবস্থা ও সুবিধাভেদে ভিন্নরূপ হইবে। মোট কথা এই যে, গৃহকর্ম্ম ব্যতীত স্ত্রীলোকেরও এমন একটু শিক্ষার প্রয়োজন—যাহার অনুশীলন হইলে প্রয়োজনকালে স্ত্রীলোকেও স্বাবলম্বী হইতে পারে। মহাত্মা গন্ধী চরকা চালাইবার পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে একটি এই যে, চরকার চলন উঠিয়া যাওয়ায় অর্থার্জ্জনের অন্য কোনরূপ উপায়ের অভাবে এ দেশে অনেক স্ত্রীলোককে গৃহের বাহিরে এমন সব কাজ করিতে হইতেছে যে, তাহাতে প্রলোভনের পিচ্ছিল পথে তাহারা বিপন্ন হয় বা হইতে পারে। এ কথাটা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অভাবের তাড়নায়, বিশেষ পুত্রকন্যা পালন করিবার থাকিলে তাহাদের জন্য এ দেশে বিধবাকে বা রুগ্নপতির পত্নী হইলে স্ত্রীলোককে অনেক সময় হয় ভিক্ষাজীবী বা অপরের গলগ্রহ হইতে হয়, নহে ত দাসীবৃত্তি করিয়া যেরূপে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাতে পদে পদে বিপদ্ থাকিতে পারে। যাহাতে এমন দুরবস্থা না হয়, তাহার জন্য সময় থাকিতে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সমাজের কর্ত্তব্য—নহিলে সমগ্র সমাজের বিপদ্ ও অমঙ্গল ঘটে।

এই স্থানে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, সেরূপ শিক্ষার এবং শিক্ষা হইলে তাহার চর্চ্চা রাখিবার অবসর মহিলাদের কোথায়? তাঁহাদিগকে বলিতে পারি, ইচ্ছা থাকিলে সময়ের একান্ত অভাব হয় না। আমাদের যাহার যত কাজই কেন থাকুক না—আমরা খানিকটা সময় কাজ না করিয়া বৃথা কাটাই—সে কেবল যে বিশ্রামের প্রয়োজনে, এমনও নহে। বিলাতে ভৃত্যের বেতন অত্যন্ত অধিক—গৃহের অনেক কাজই গৃহকর্ত্রীকে করিতে হয়। অবশ্য, সে শীতপ্রধান দেশে লোক যত পরিশ্রম করিতে পারে, এ দেশে তত পারে না। কিন্তু এ দেশেও দরিদ্র ইংরাজ-পরিবারে মহিলারা যে শ্রম করেন, আমাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব হইবে কেন? শুনিয়াছি, জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বিলাতে স্ত্রীলোকরা অনেক শ্রমসাধ্য কাজ করিয়াছে—তাহারা পূর্ব্বে কখন সে সব কাজে অভ্যস্ত ছিল না। তাহাতেই মনে হয়, শ্রম করিবার অভ্যাস ও স্বাবলম্বী হইবার প্রবৃত্তি ছিল বলিয়াই দেশের প্রয়োজনের সময় তথায় স্ত্রীলোকরা যে কাজের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই কাজই করিতে সাহস করিয়াছে এবং চেষ্টার ফলে সেই কাজই ভাল করিয়া করিতে পারিয়াছে। জাতির পক্ষে ইহা অল্প লাভ নহে।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোক যদি পুরুষের—স্বামীর ও পুত্রের ভারমাত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামীর বা পুত্রের অভাবে তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হওয়া অনিবার্য্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়—অনুমান করিবারও

প্রয়োজন নাই, কারণ, আমরা অনেক গৃহেই তাহা লক্ষ্য করি। স্বাবলম্বনের উপায়ের অভাবে অনেক সময় এ দেশে স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। যাহাতে সেই উপায় করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই স্বাবলম্বনের ভাবের একান্ত অভাবে আমরা পথে ঘাটে মোট-মাটরার (লাগেজের) সামিল—গৃহেও ভার-মাত্র। যাহাতে আমরা স্বামিপুত্রের এবং প্রয়োজন হইলে আপনাদের সাহায্য করিতে পারি, গৃহ-কার্য্যের অবসরে আমাদিগকে তাহারই উপযোগী শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

যে সময়টুকু আমাদের আবশ্যক বিশ্রামের অতিরিক্ত এবং যেটুকু আমরা আলস্যে অতিবাহিত করি—সেই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। চরকায় সেই-রূপে সময়ের সদ্ব্যবহারের শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু চরকা চালানই হউক বা অন্য কোন কাজই হউক—সেই অতিরিক্ত সময়টুকু তাহাতে প্রযুক্ত করা—যে সময়ের অপব্যয় করি, তাহার সদ্ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা আমাদের সে প্রয়োজন আরও বাড়াইয়া দিয়াছে এবং অভাবের তাড়নাতেও যদি আমাদের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে জাতিহিসাবে আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা বাড়িতে থাকিবে এবং দারিদ্র্যের পেষণে আমাদের সংসার হইতে সর্ব্ববিধ আনন্দের ও আশার বিনাশ সাধিত হইবে।

আমাদের যে কাজ সর্ব্বপ্রধান, সেই শিশুপালন এবং সংসারের শ্রীসাধনও স্বাবলম্বী শিক্ষায় সুসম্পন্ন হইবে—নহিলে তাহার জন্য অতিরিক্ত শ্রমে পুরুষদিগের অজস্র কষ্ট অনিবার্য্য হয়।

শ্রীমনোরমা ঘোষ।

সমান অধিকার।

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ।

প্রতিভা দেবী

বর্ত্তমান ভারতে যে সকল মহীয়সী আর্য্যমহিলা দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগতা প্রতিভা দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন রূপগুণবতী সতী সাধ্বী গৃহিণী এ কালে ক্বচিৎ গৃহস্থের ঘর উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। তাঁহার অকালে পরলোকগমনে কেবল যে তাঁহার স্বামীর ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, তাহা নহে; উহাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এক জন আদর্শ-শিক্ষিতা গুণবতী গৃহিণী হারাইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রতিভা দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী ও তাঁহার তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা। কন্যার শৈশবেই তাঁহার পিতা স্বয়ং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নানা ভাষায় ও সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় তাঁহাকে প্রথমাবধি ব্যুৎপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভাষা অপেক্ষা সঙ্গীতবিদ্যায় প্রতিভার প্রতিভা অসামান্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ফলে হেমেন্দ্রনাথ বড় বড় গুণিগণকে কন্যার গীতবাদ্যাদি শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে শিক্ষা বিফল হয় নাই। পরিণামে প্রতিভা দেবীর অতুল কীর্ত্তি সঙ্গীত-সঙ্ঘে সে শিক্ষার ফল মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রতিভা দেবী।

পঞ্চমবর্ষীয়া প্রতিভা সুরতানমানলয়ে পিতামহ মহর্ষিদেবের সকাশে এমন সুন্দর গান করিতেন যে, তিনি প্রত্যেক গানের পারিতোষিকস্বরূপ স্নেহের পৌত্রীকে একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতেন। কখনও কখনও হস্তিদন্তের কারুকার্য্যসমন্বিত খেলানাও প্রতিভা পারিতোষিক পাইতেন। প্রতিভার প্রতিভা কিশোরবয়সেই শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনীর 'বালক' পত্রে সঙ্গীতের স্বরলিপি-প্রণয়নে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 'বাল্মীকিপ্রতিভার' অভিনয়ে দ্বাদশ-বর্ষীয়া প্রতিভা সরস্বতীর ভূমিকায় সমবেত বিদ্বজ্জনসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কবি রাজকৃষ্ণ রায় সেই অভিনয় দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, 'আর্য্য-দর্শন' পত্রে "দ্বাদশবর্ষীয়া প্রতিভা" নামে এক কবিতা রচনা করিয়া প্রতিভা দেবীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ১২৯২ সালে 'বালক' প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্ব্বে রাজা সার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর বাঙ্গালায় স্বরলিপি প্রকাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রতিভাসুন্দরী তাহার পর - সেই আদর্শের আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া— স্বরলিপি সরল করিয়া 'বালকে'র প্রথম সংখ্যায় "বল্, গোলাপ, মোরে, বল্" গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যে জাহাজে বিলাতযাত্রা করেন, সেই জাহাজে একটি প্রিয়দর্শন মধুরভাষী যুবককে দেখিয়া তাঁহাকেই ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভার উপযুক্ত পতি বলিয়া মনোনীত করেন। বলা বাহুল্য, তিনিই স্যর আশুতোষ চৌধুরী। হেমেন্দ্র বাবু কন্যার বিবাহের পূর্ব্বেই পরলোকে প্রয়াণ করেন, এই হেতু রবীন্দ্রনাথ সেই ভার গ্রহণ করিয়া প্রতিভা দেবীকে আশুতোষের হস্তে সমর্পণ করেন। আশুতোষের পিতা রাজসাহী জিলার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমীদার হইলেও উদার-নৈতিক বলিয়া পুত্রকে বিলাতে পাঠাইতে বা রাঢ়ী ঠাকুর পরিবারে বিবাহ দিতে কোনওরূপ আপত্তি করেন নাই।

সুশীলা স্বল্পভাষিণী গুণবতী সুন্দরী পুত্রবধূর মধুর ব্রহ্ম-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহার নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরিত। কেবল সঙ্গীতে নহে, সেবাশুশ্রূষায়, যত্নে, ভালবাসায় শ্বশুরকুলের সকলকেই প্রতিভা অল্পদিনে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। এই দয়াবতী বধূ গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিতা হইলে কত নিঃস্ব সহায়-হীন বিদ্যার্থী বালক তাঁহার গৃহে থাকিয়া, তাঁহার স্নেহে বর্দ্ধিত হইয়া "মানুষ" হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রতিভা দেবী সর্ব্বতোভাবে আদর্শ হিন্দুপরিবারের সমুচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কন্যার মত শাশুড়ীকে সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর পরিবারে আশুতোষের ছয় ভ্রাতা ও দুই ভগিনী তাঁহার অসীম স্নেহযত্নে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। অতিথি, অভ্যাগত, বন্ধু, সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে এরূপ গৃহিণীপনা ও স্বার্থত্যাগ বিরল।

প্রতিভা দেবী স্বয়ং যেমন সঙ্গীতজ্ঞা সরস্বতীর মত ছিলেন, স্বয়ং যেমন সঙ্গীত-বিদ্যার অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, দেশের অন্তঃ-পুরচারিকাদিগকেও সেইরূপ সে বিদ্যায় শিক্ষিতা করিবার উদ্দেশে 'সঙ্গীত-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অর্থে, সামর্থ্যে, প্রাণপাত পরিশ্রমে উহাকে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। এখনও সে বিদ্যালয়ের উপকারিতা দেশবাসী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছে।

তাঁহার 'আনন্দ-সঙ্গীত পত্রিকা' আর এক মহান্ অনুষ্ঠান। উহাতে উচ্চাঙ্গের বহু সঙ্গীত ও স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়া থাকে। দেশ-বিদেশের গুণী গায়ক ও বাদকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবার নিমিত্ত তিনি নিজ গৃহে "আনন্দ-সভার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতি মাসে এই সভার অধিবেশন হইত এবং বহু বন্ধুবান্ধব ইহাতে পরম আনন্দ লাভ করিবার অবসর পাইতেন।

প্রতিভা দেবীর পতিভক্তি, পতিসেবা হিন্দু গৃহিণীরই উপযুক্ত। তিনি ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইয়া সুশৃঙ্খলার সহিত সুচারুরূপে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আশুতোষ সর্ব্বাংশে যোগ্য সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিভা দেবী সত্যই

> "গৃহিণী সচিবঃ সখি মিথঃ
> প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

ছিলেন। গার্গীর মত বিদুষী কলাবতী এই আর্য্যমহিলা প্রত্যহ উপাসনান্তে পতিসেবায়, আত্মীয়স্বজনপোষণে এবং অতিথি-অভ্যাগতপরিচর্য্যায় আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। আশুতোষ বহুভাগ্যে এমন পত্নী লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার জীবনের সাফল্য যে বহু পরিমাণে পত্নীর কার্য্যের ফল, তাহা তাঁহার বন্ধুরা সকলেই জানেন।

জীবনেও যেমন, মরণেও তেমনই, সাধ্বী সমান তেজের সহিত চলিয়া গেলেন। মাত্র ১২ ঘণ্টা কাল রোগ ভোগ করিয়া পুত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া হিন্দুনারীর কাম্য পতির ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, পতিপদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া তিনি সতী-লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ বাঙ্গালী শিক্ষিতা নারীকে অনুপ্রাণিত করিবে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর প্রতি নববর্ষের সম্ভাষণ।

আজ নূতন বৎসরের আরম্ভে পুরাতন ঝাড়িয়া ফেল, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নবজীবন আরম্ভ কর ("Ring out the old; ring in the new")। হালতামামীর দিন হিসাব-নিকাশ করিয়া সকলে আত্মপরীক্ষা কর। আমি বাঙ্গালী; এ জন্য —গর্ব্ব অনুভব করি। ঠিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় জ্ঞান-বর্ত্তিকা লইয়া নিবিড় তমসাচ্ছন্ন অমানিশার দিনে স্বদেশবাসীদিগকে উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালী, অন্ততঃ বুদ্ধির ক্ষেত্রে, ভারতবাসীর মধ্যে অগ্রণী। আশা করি, বাঙ্গালী এ গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু এক অন্নসমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া আজ বাঙ্গালী জাতি লয়প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। এখন এই ধ্বংসোন্মুখ জাতি যদি রক্ষা পাইতে চাহে, তাহা হইলে আমাদের যে সকল জাতিগত দোষ আছে, সে সকল পরিহার করিতে হইবে। বাঙ্গালী অলস, শ্রমবিমুখ, ফন্দীবাজ ও ফাঁকীদার। এই কারণে বাঙ্গালী একে একে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-বিভাগ হইতে বিতাড়িত হইতেছে। কসাইটোলা (বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট) হইতে আরম্ভ করিয়া ফৌজদারী বালাখানা পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে চীনা জুতার মিস্ত্রী; কেবল শেষোক্ত স্থানে ২১৪ ঘর হিন্দুস্থানী মিস্ত্রী আছে—তোতা, নাকচাঁদী প্রভৃতি। এই সকল পাদুকাকারদিগের আবার অনেকেরই কলিকাতার উপকণ্ঠে ট্যাঙ্গরা প্রভৃতি স্থানে ট্যানারী অর্থাৎ চর্ম্ম-সংস্কারের কারখানা আছে। ফৌজদারী বালাখানা হইতে বাহির হইলে মুর্গীহাটার দুই ধারে দিল্লীওয়ালা সওদাগরদের আস্তানা। ইহারা বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার বিলাতী দ্রব্য—যথা মনোহারী (ষ্টেসনারী), বিস্কুট, জমাট দুধ ও নানাবিধ ঔষধ ইত্যাদি আমদানী করে। তাহার পর বড়বাজার মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া ধনকুবেরদিগের একচেটিয়া। এতদ্ভিন্ন এজরা ষ্ট্রীট, পোলক ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থান আর্ম্মাণী ও ইহুদী সওদাগরদিগের প্রধান আড্ডা। আর ইংরাজটোলার ত কথাই নাই। আলুগুদাম (ক্লাইব ষ্ট্রীট) হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর লালবাজার দিয়া দক্ষিণদিকে গেলে চৌরঙ্গীতে পৌছান যায়। দুই ধারেই বড় বড় ব্যাঙ্ক, হৌস্ ও ইংরাজদিগের বিশাল বিপণি-শ্রেণী বিদ্যমান। এই ত' গেল উচ্চ স্তরের কথা। নিম্ন স্তরে আসিলেও দেখা যায় যে, কলিকাতায় যত মজুর ও শ্রমজীবী আছে, তাহারা প্রায়ই হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া। কলিকাতার লোকসংখ্যা যত—তাহার প্রায় অর্দ্ধেক অ-বাঙ্গালী। আমরা কলিকাতা নগরীকে ভারতের, শুধু ভারতের কেন, এসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী মনে করিয়া গর্ব্বানুভব করিয়া থাকি। কিন্তু বেল পাকিলে কাকের কি? কলিকাতায় যে অগাধ ধনরাশির আদান-প্রদান হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ বাঙ্গালীর হাত-ছাড়া। বাঙ্গালী ছুতারকে চীনা ছুতার আসিয়া তাড়াইতেছে। এমন কি, চীনারা চাঁপাতলা অঞ্চলেও কাঠের গোলাগুলি পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নিকট হইতে দখল করিতেছে। তদ্ভিন্ন কলিকাতায় যত পান, চুরুট, লেমোনেড্ ও সরবৎ ইত্যাদির দোকান আছে, তাহা একটিও বাঙ্গালীর নহে। যত ভাল ও কর্ম্মঠ করাতী বা আড়াকুসী আছে, তাহারাও কচ্ছ-প্রদেশীয়। শিক্ষিতই হউক আর অশিক্ষিতই হউক, ভদ্রবংশীয়ই হউক আর তথাকথিত নিম্নশ্রেণীরই হউক, সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীই জীবনসংগ্রামে হঠিয়া যাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, সকল জাতি ও শ্রেণী এই কলিকাতা মহানগরীতে বেশ দুই পয়সা রোজগার করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতেছে। বাঙ্গালীই কেবল "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া জীর্ণ শীর্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে বাঙ্গালীজাতির অনেক দোষ আসিয়া স্পর্শিতেছে। কথায় বলে, অভাবে স্বভাব নষ্ট—দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিনাশী। বাঙ্গালীর মত পরপ্রত্যাশী ও পরভাগ্যোপজীবী আর কোন জাতি নাই। এক জন রোজগারক্ষম হইলে দশ জন আত্মীয়-কুটুম্ব ভূতের মত তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। বাঙ্গালী কেরাণীগিরি, স্কুলমাষ্টারী ও ওকালতী ছাড়া আর কিছুই শিখিলও না, বুঝিলও না। মফঃস্বলেও এই দশা। বাঙ্গালার যে কোন সহর বা মহকুমায় যাও, দেখিবে, এক ঢাকা অঞ্চল ছাড়া, সমস্ত বড় বড় ব্যবসাদারই মাড়োয়ারী।

এখন আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কোথায় কোথায় আমাদের গলদ আছে, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ, চীনা, মাড়োয়ারী প্রভৃতি

কি কি গুণে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কৃতিত্বলাভ করিতেছে, সেই সব বুঝিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলস্য আমাদের সর্ব্বনাশের অন্যতম মূল। আমরা একনিষ্ঠ হইয়া কোন কাজ করিতে পারি না; কোন কার্য্য বা ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া একটু ধাক্কা খাইলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি ও প্রারব্ধ কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া নূতন কোন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত হই। আমরা "হইবে" "হইবে খন" অর্থাৎ "যদ্ভবিতব্যম্ তদ্ভবিষ্যতি" প্রভৃতির দোহাই দিয়া দিন কাটাই; ভুলিয়া যাই যে, আজ যাহা করিতে পারি, তাহা কালিকার জন্য ফেলিয়া রাখা কদাচ উচিত নহে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি, আমাদিগকে শ্রমের মর্য্যাদা শিখিতে হইবে। নিজে মোট মাথায় করিয়া ও নিজে দোকানে দাঁড়ী-পাল্লা ধরিয়া ব্যবসা শিখিতে হইবে। আমাদের যুবকগণ এই প্রকারে ব্যবসা না শিখিয়া একেবারে "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ" হইতে চাহে ও রাতারাতি বড়লোক হইবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করে, এই জন্য সামান্য মূলধন অবলম্বন করিয়া কঠোর পরিশ্রমবলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। বাস্তবিক লোটা ও কম্বল সম্বল করিয়া বিকানীর, যোধপুর প্রভৃতি রাজপুতানার সুদূর মরু হইতে আসিয়া মাড়োয়ারী বাঙ্গালা দখল করিয়াছে ও লক্ষ্মী দ্বারে বাঁধিয়াছে। ব্যবসা শিখিতে হইলে প্রথমে কোন লাভের প্রত্যাশা না করিয়া, ইহাদের দ্বারে দ্বারে উমেদারী করা উচিত ও ইহাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিসরূপে প্রবেশ করা উচিত। তাহা না হইলে কেবল ব্যবসা করিব বলিলেই ব্যবসা করা যায় না। বাঙ্গালী যুবক পুস্তকগত বিদ্যালাভ করিয়া ব্যবসার বিষয়ে মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় অসহায়। উপাধির জন্য লালায়িত হইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে আঘাত না করিয়া এখন হইতে অধিকাংশেরই তরুণ বয়সে ব্যবসা-ক্ষেত্রে শিক্ষানবিসী করা উচিত।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সবুরে মেওয়া ফলে।

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ।

ব্যুরোক্রেশী"—সবুর কর; বিনামূল্যে সব পাইবে।"

জো-হুকুম—"তা' আর জানি না? সবুরে মেওয়া ফলে—তা ভালই হউক—আর পচাই হউক।"

গুহামধ্যে।

সন্ন্যাসীর কথা।

১

প্রায় বৎসর ত্রিশ গৃহত্যাগ করিয়াও এই ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছি। হায়! মর্কট বৈরাগ্যের এই ফল! তবে যখন জড়াইয়াছি, তখন এ কাহিনী লেখার কতকটা অংশ গ্রহণ করিয়া আমি সে মর্কট বৈরাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত করি।

শুধুই প্রায়শ্চিত্ত নহে। সমাজের একটা বিষম পরিবর্ত্তনের যুগে এমন একটা কাহিনী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বাহির হইলে, তাহাতে অবিশ্বাসের সমস্ত উপাদান থাকিলেও, লোক একেবারে অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। যদি করে, বড় জোর আমাকে ভণ্ড বলিবে।

আজকাল নিত্য যাহা ঘটা সম্ভব, সেই কাহিনীই তোমরা শুনিতে চাও। তাহাদের ভিতর হইতে একটা অসম্ভব কথা শুনিতে দোষ কি?

তখন ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছি দশ বৎসর। সংসারটা অসার বলিয়া গৃহত্যাগ করি নাই—বিধাতা আমাকে সংসারে থাকিতে দিলেন না—উৎপীড়ন করিলেন। সে উৎপীড়ন একবার নয়—বার বার। কলেরার নৃশংসতায় আমার প্রথম সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। মরিল স্ত্রী, দশমবর্ষীয় পুত্র, পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা। দুই দিন কাঁদিলাম, মাসখানেক হা-হুতাশ করিলাম, আর মাসখানেক পরে আবার বিবাহ করিলাম। বংশরক্ষা না হইলে পিতৃপুরুষ কি বলিবেন? বছরখানেকের মধ্যে একটু বড় হইতে না হইতেই সেও মরিয়া গেল। তাই ত, হাত পুড়াইয়া কত দিন খাইব? বংশ থাক্ আর না থাক্, ক্রমে যে অশক্ত হইতেছি—বাড়ীতে আমাকে দেখে, বিশেষতঃ অসুখ হইলে, এমনটি যে কেহ নাই! আবার একটা। এবারে মনে হইল, বিধাতা সদয় হইয়াছেন। এমন গুণবতী নারী কম দেখিয়াছি। এমন স্বামিসেবা—লিখিতে এ বৃদ্ধ বয়সেও হাতটা একটু নড়িয়া গেল! তার চেয়ে বয়স আমার ঢের বেশি। তার বয়স যখন দশ, তখন আমার ওঃ! আমি ত্রিশ বছরের বড়! তার বাপ মা'কে গাল দিও, আমাকে যত পার দিও; তাহাকে দিও না। তোমরা—পুরুষ, নারী—কেহ যেন তাহার জন্ম দুঃখ করিও না। এক দিনের জন্য তার মুখ বিমর্ষ দেখি নাই। আমি কোথাও যাইলে, আমার আসা-পথপানে সে চাহিয়া থাকিত। রোগে পড়িলে, তার স্নিগ্ধ করস্পর্শ আমার দেহের ব্যাধিটাকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তুলিত! এক দিন আমার বয়স লইয়া রহস্য করিতে আনন্দময়ীকে কাঁদাইয়াছিলাম। তার ফলে ভুবনের মা'র কাছে আমার তিরস্কার-লাভ ঘটিয়াছিল। আমার প্রথম স্ত্রীর সময় হইতে সে আমার বাড়ীতে চাকরী করিত। তার ছেলে ভুবন বহুকাল আগে মরিয়াছে, পুত্রের নামটি মাত্র তার অবশিষ্ট আছে। বহুকাল হইতেই আমার ঘর তার ঘর হইয়াছে। কায়স্থ-কন্যা, আমা হইতে দু'চারি বৎসরের বড়—আমি তাহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি। তাহাকে ঝি বলিতে পারি নাই। সে আমার সংসারের একরূপ অভিভাবিকা। এক একবার স্ত্রী-বিয়োগে বৈরাগ্যের ভান দেখাইয়া তারই প্ররোচনায় আমি বিবাহ করিয়াছি। সে বলিয়াছিল, "বাবা, এরূপ তামাসা আর কখন যেন ক'র না। এ মেয়ে যার ঘরে থাকে, তার শিবের সংসার।"

আমি ভুবনের মা'র সুমুখে নাক-কান মলিয়াছিলাম।

তার বয়স পঁচিশ। আমার বয়স? হিসাব কর, আমার বলিতে সরম হইতেছে। তার রূপ? যত পার, ভাল কল্পনা কর। হইবে না, হইবে না করিয়া সবে মাত্র ছয় মাস একটি কন্যা হইয়াছে। তার রূপ? কল্পনা করিতে যাইও না—কল্পনা পরাস্ত হইবে।

এই সময়ে এক দিন দয়া—তার নাম ছিল দয়াময়ী—তাহাকে পা দিয়া নাচাইতে নাচাইতে, আমার সেই পূর্ব্বকৃত রহস্যের উত্তর শুনাইতেই যেন বলিয়াছিল—"তালগাছ কাটন বোসের বাটন গৌরী গো ঝি! তোর কপালে বুড়ো বর, আমি করব কি? অক্কা দিলুম, কক্কা দিলুম, কানে মদন কড়ি; বে'র সময় দেখতে এল (কিনা) বুড়োচাঁদ ধাড়ী?"

এই তার প্রথম রহস্য, এই তার শেষ। বিধাতা আমার এমন স্ত্রীকেও কাড়িয়া লইলেন! শুধু সে গেল না, কন্যাটিকেও সঙ্গে লইয়া গেল। রোগে মরিল না—পুড়িয়া মরিল।

আমি আহারান্তে স্থানান্তরে পাশা খেলিতে গিয়াছি। ভুবনের মা নিকটস্থ নদী হইতে পানীয় জল আনিতে গিয়াছে। পল্লীতে আগুন লাগিল।

অনেকের সম্পত্তি নষ্ট হইল বটে, আমার সব গেল—সম্পত্তি, ঘর, স্ত্রী, কন্যা। আগুনের বেড়াজাল ঘিরিয়া কেহ তাহাদের উদ্ধার করিতে পারিল না। দেহ দেখিয়া দগ্ধাময়ীকে চিনিতে পারিলাম না, তার কন্যাকে চিনিলাম। তার মা দুই হাতে আঁকড়িয়া তাকে যেন অস্থি-পঞ্জরের ভিতর লুকাইয়াছিল। তার বর্ণের বিলয় হয় নাই, শ্রীর এতটুকু হানি হয় নাই। শুধু সে মরিয়াছে।

আমি, ভুবনের মা—উভয়েরই এবার অশ্রু শুকাইয়াছে। প্রাণের ভিতর চক্ষু সিক্ত করিবার আর রস নাই। এ, ও, সে আমাদের উভয়কে স্থান দিতে কতই না আগ্রহ করিল। আমার মন ভিজিল, কিন্তু ভুবনের মা কঠোর হইল। আমাকে বলিল—"কি বাবা, আবার কি নরক ঘাঁটতে ইচ্ছা আছে?"

আমি বলিলাম—"তুমি কি কর্‌বে?"

"কাশী যাব।"

"আমিও যাব, ভুবনের মা!"

২

দশ বৎসর উভয়ে কাশীবাস করিতেছি। এ দশ বৎসরে অনেকটা যেন শান্তি পাইয়াছি—সংসারটাকে এক রকম যেন ভুলিয়াছি। মাঝে মাঝে মেয়েটার মুখচ্ছবি চোখের সুমুখে এক একবার ভাসিয়া উঠে—আমি জোর করিয়া সরাইয়া দিই। মাস পাঁচ ছয় তাও আর উঠে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এক সিদ্ধ যোগীর আশ্রয় পাইয়াছি। তিনি আমাকে গৈরিক দিয়াছেন মাত্র—সন্ন্যাস দেন নাই। লইবার আগ্রহ দেখাইলে বলিতেন—"তার জন্য ব্যস্ত হইও না। সময়ে সন্ন্যাস আপনিই আসিবে—অপক্ক সন্ন্যাসে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন কর।"

তদবধি ব্রহ্মচারীর জীবনই যাপন করিতেছি। রাত তিনটার সময় উঠিয়া গঙ্গাস্নান করি, তার পর তীর্থস্থ দেবতা সকল দর্শন করিতে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ ঘোরা-ফেরা করি।

বাসায় ফিরিতে কোনও দিন নয়টার কম হয় না। ভুবনের মা পরিচর্য্যার যা কিছু সব করে, কেবল রন্ধন কার্য্যটি আমার। বৈকালে সাধু-সঙ্গ, ভাগবত-কথা শুনা, সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথের আরতি দেখা—সত্য সত্যই দিনগুলি আনন্দে ও শান্তিতেই একরূপ অতিবাহিত হয়।

তবু সন্ন্যাস-লাভ হইল না বলিয়া মনটা সময়ে সময়ে একটু কেমন সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। গুরুর উপদেশ মনে পড়িত। এখনও কি তবে অদৃষ্টে কর্ম্মভোগ আছে? সংসার আর করিব না, বিশ্বনাথের মাথায় বিল্বপত্র চাপাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। গুরুর সম্মুখেও সে কথা অনেকবার উচ্চারিত করিয়াছি।

আমার বয়স তখন প্রায় সত্তর। আমার অপেক্ষা কত অল্প-বয়স্ককে, এমন কি, দুই চারি জন যুবককেও, গুরুকে সন্ন্যাস দিতে দেখিয়াছি। আর আমি চাহিলেই তিনি বলিতেন—"ব্যস্ত কেন, অম্বিকাচরণ? তুমি বেশ আছ।"

তবে বেশই আছি—সন্ন্যাসের কথা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছি। আমার সন্ন্যাসী-গুরু-ভাইরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখান। শুধু তাই নয়, গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলে, অনেকে আমার পরিচর্য্যা করিতে ছুটিয়া আইসেন। গুরুদেবের যে দিন ইচ্ছা হইবে, সেই দিনেই সন্ন্যাস লইব ভাবিয়া আবার নিত্যকৃত্যকর্ম্মে মন দিয়াছি।

সে দিন একে শীতকাল, তায় দুর্য্যোগ—বৃষ্টিও হইতেছে, ঝড়ও হইতেছে, শীতে শরীরের রক্তও বুঝি জমিবার উপক্রম করিয়াছে। রাত্রি তিনটা। এমনই সময় নিত্য গঙ্গাস্নান করিতে যাই। কাশীতে আসিবার পর হইতে এই দশ বৎসর একটি দিনের জন্য আমার এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আজ ঘটিবে? নিত্যকার্য্যগুলা এত দিন ঘড়ীর কাঁটার মত করিয়া আসিয়াছি। আজই কি তার ব্যতিক্রম হইবে? কিছুক্ষণের জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতে ইতস্ততঃ করিয়া, দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া যেই ঘর হইতে বাহির হইয়াছি, অমনিই আমার গন্তব্য-পথের সম্মুখে আসিয়া ভুবনের মা বলিল—"আজ বড় দুর্য্যোগ।"

বুঝিলাম, যাইতে নিষেধ করিবার জন্য সে সে কথা বলিল। পাছে পিছু ডাকা হয়, এই জন্য সম্মুখে আসিয়া বলিল, আমাকে সম্বোধন করিল না। আমি বলিলাম—"হ'ক ভুবনের মা, এ হ'তে বড় বড় দুর্য্যোগ ত মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেছে। আমি যাব।"

"তবে কমণ্ডলু রেখে যাও। কমণ্ডলুতে বৃষ্টি-জল পড়া রোধ কর্‌তে পার্‌বে না।" ভাবিলাম ঠিক—কমণ্ডলুর গঙ্গাজলে বৃষ্টির জল পড়িবেই। অথবা না পড়িলেও, পড়ে নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। সে জন্যে

দেবতার সেবা হইবে না। কমণ্ডলু রাখিয়া স্নানে গেলাম।

চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট। তখনও ঘোর অন্ধকার। বিশেষতঃ চাঁদনীতে ঘনতম অন্ধকার। বিদ্যুতের সাহায্যে কতকটা পথ চলিতেছি, কতকটা অন্ধের মত হাতড়াইতেছি। ঘনতম অন্ধকার-গর্ভে প্রবেশ করিলাম। চাঁদনী পার হইয়া সোপানে পা দিব; শুনিতে পাইলাম, এক মৃদু আর্ত্তনাদ। কি মৃদু! তবু ঝড়ের হুঙ্কারকেও দলিত করিয়া শব্দ আমার কানে লাগিল। সিঁড়িতে পা না দিয়া মুখ ফিরাইলাম, চাঁদনীর ভিতরে আসিলাম। আবার স্বর—বোধ হইল, যেন সদ্যোজাত শিশুর।

বিদ্যুৎ চমকিতেই দেখিলাম, কোণের একপাশে কাপড়ের পুঁটুলির মত একটা কি। নিকটে উপস্থিত হইতেই আবার অন্ধকার। কান পাতিয়া আর একটা কান্নার প্রতীক্ষা করিলাম। কই শব্দ? বুঝি মরিয়াছে—এ দারুণ শীতে আমিই মরমর হইতেছি, সে সদ্যোজাত শিশু কি বাঁচিতে পারে? ভাবিলাম, কোন অভাগিনীর অবৈধ লালসার ফল। প্রসবের পর এখানে ফেলিয়া গিয়াছে, যদি কোনও মমতাময়ের দৃষ্টিতে পড়িয়া শিশুর জীবন রক্ষা হয়! প্রথম আলোকে যতটুকু অনুভূতি আমার হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, ত্যাগের ভিতরেও ব্যাকুলতাভরা জননী-স্নেহ। সুশুভ্র বস্ত্রে, প্রকৃতির আক্রমণ হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য শিশুটিকে অভাগী মা ঘেরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু চেষ্টা তার নিষ্ফল, শিশু বাঁচিল না! আবার বিদ্যুতালোক। শিশুর মুখ দেখিতে পাইলাম। সর্ব্বাঙ্গ সযত্নে ঢাকা, কেবল মুখখানি বাহির হইয়া আছে। মুখখানির কাছে মুখ লইয়া আর একটা তড়িদ্বিকাশের প্রতীক্ষা করিলাম। বজ্র-নিনাদে প্রচণ্ড আলোক লইয়া এবারে তড়িৎ যেন সে স্বর্ণ-শিশুর মুখের উপর উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিল। দেখিলাম, সে পদ্ম-চক্ষু কড়ির দিকে চাহিয়া যেন কি দেখিতেছে। বুক কাঁপিয়া উঠিল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—দশ বৎসরের লুক্কায়িত যাতনা লইয়া—দয়াময়ীর বুকে জড়ানো তার সকল মমতার সার। তার চক্ষু মুদ্রিত ছিল—এ চোখ মেলিয়াছে। মৃত্যু লুকাইয়াছিল তার পলকের ভিতরে, এর মুক্ত পলকে তারার উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার অভাগিনী মা'কে শত ধিক্কার দিলাম। সামান্য একটু অশ্রু বুঝি চোখের কোণে আসিয়াছিল, হাত দিয়া মুছিয়া, মুখটি ফিরাইয়াছি। না, না—এখনও ত বাঁচিয়া আছে? শিশুর কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল।

ভাবিবার আর অবকাশ পাইলাম না। বাঁচা মরার বিচার পরে। সেই অন্ধকারে পুঁটুলি বুকে করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

৩

"ভুবনের মা!"

"এস বাবা, আমি ভাবছিলুম—বড় দুর্য্যোগ।" বাড়ীর দোর খুলিয়াই আবার সে বলিল—"তুমি আজ এমন সময় গঙ্গাস্নানে যাও, আমার ইচ্ছা ছিল না।"

"দেখ দেখি, ভুবনের মা!"

ভুবনের মা পুঁটুলির দিকে চাহিয়াই বলিল—"কি ও?"

"দেখ দেখি, বেঁচে আছে কি না?"

পুঁটুলির যত সন্নিকটে পারে চোখ দিয়াই ভুবনের মা, বলিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ! এ খুনের দায় কোথা থেকে নিয়ে এলে?"

"যদি ম'রে থাকে, গঙ্গায় ফেলে দিয়ে স্নান ক'রে আসি।"

ভুবনের মা আমার হাত হইতে শিশুটিকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল। আলো জ্বালিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশু মরিয়াছে ভাবিয়া আমি বাহির হইতেই বলিয়া উঠিলাম—"নিয়ে এস, ভুবনের মা!"

ভুবনের মা উত্তরও দিল না—আসিলও না।

আমি একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলাম—"দেরি ক'র না, ভুবনের মা! এর পরে ফেলে দেওয়া কঠিন হবে।" এই সময় দুই এক জন লোক বাড়ীর সুমুখের পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা গঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়াছে। সুতরাং এবারে বেশ রুক্ষস্বরেই আমাকে বলিতে হইল—"কর্‌চিস্ কি, বুড়ি, আমাকে বিপদে ফেল্‌বি?"

"তুমি ঘরে এসো।"

গৃহের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম—"আ পোড়ামুখী, সেই তুমি! কোন্ চুলো থেকে ফিরে এলে?"

বুঝিলাম মেয়ে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বেঁচে আছে?"

"এসে দেখ—ভাল ক'রে দেখ—বুঝতে পারছ?"

"তাই ত, ভুবনের মা, এমন সাদৃশ্য ত দেখি নি!"

ভুবনের মা আলোর অতি সন্নিকটে শিশুর মুখখানি ধরিয়া বলিল—"সেই মুখ—সেই চোখ।"

"তার পর?"

"এখনও কর্ম্মভোগ আছে—তার পর কি! শীগ্‌গির গয়লা-বাড়ী থেকে দুধ যোগাড় ক'রে নিয়ে এস।"

দশ বছরের পর সেই প্রথম আমার সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া গেল। সে দিন স্নান করিতে বাজিল নয়টা। জলে জলে আহ্নিক সারিয়া, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদারনাথ—এই তিনটিকে মাত্র দেখার একটু ইঙ্গিত মাত্র করিয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখনও দেখি, ভুবনের মা মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গ তৈল-ভূষিত করিয়া আগুন দিয়া ভাজিতেছে।

"ভেজে মেরে ফেল্‌বি—বুড়ি?"

"না গো, তুমি আপনার কাজ কর। মেয়ে এত হৃষ্টপুষ্ট হবে কেন? তাপ দিয়ে একটু কাহিল ক'রে দি।"

"বাঁচ্‌বে কি ভুবনের মা?"

"বালাই! বেঁচেছে; আবার বাঁচ্‌বে কি!"

যেন একটা প্রচণ্ড আশ্বাসে, তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন—সব বয়সের ছবি মনে মনে আঁকিয়া লইলাম। ছবির পর ছবি আমার মানস-দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে আসিল। সন্ন্যাস লইবার সাধ তাহাদের মধ্যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে!

ভাগ্যে গুরুদেব সে সময় কাশীতে ছিলেন না! থাকিলে বোধ হয়, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার সম্ভব হইত না।

দয়াময়ী আমাকেও লুকানো আমার মর্ম্মকথা বুঝি শুনিয়াছে। সতী বুঝি শুনিয়া স্বর্গেও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। তার বুকের ধন আমাকে দিবার জন্য চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে নিক্ষেপ করিয়াছে!

সীতা শকুন্তলাও ত এইরূপেই সংসারে আসিয়াছিলেন। এক জন পশিয়াছিলেন রাজর্ষি জনকের ঘরে, এক জন ঋষি কণ্বের। তবে আমার ঘরে ইহাকে রাখিতে দোষ কি?

কিন্তু ইঁহাদের অদৃষ্ট? মনে মনে প্রশ্ন করিতেও শিহরিলাম! না—না—এ কলিকাল। সকলের অদৃষ্টই কি একরূপ হইবে? না—না! সুখী হ' শিশু, সুখী হ'।

৪

মেয়েটা ছয় মাসের হইয়াছে। ভুবনের মা সমস্ত মাতৃস্নেহ মেয়েটাতে ঢালিয়া তাহাকে ছয় মাসের করিয়া তুলিল। আর আমি? সত্য সত্যই এই অজ্ঞাত-কুলশীল—এই মায়ার ডেলাটাকে লইয়া আবার আমি কি সংসারী হইতে চলিলাম? বুড়ী সব কাজ ফেলিয়া তাহাকে লইয়াই একরূপ দিন কাটাইয়া দেয়। পালে-পার্ব্বণে এক আধ দিন সে ঠাকুর দেখিতে যায়, তাহাকে এ, ও, তার কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া। তাও যাওয়া নামমাত্র—যাইয়া একটু পরেই ফিরিয়া আইসে।

আর আমি? মনটাকে যথাশক্তি টানিয়া এখানে ওখানে লইয়া যাইতেছি—পূর্ব্বেরই মত নিত্যকর্ম্ম করিতেছি। কিন্তু কর্ম্ম আমার ক্রমেই প্রাণশূন্য হইতেছে। ভুবনের মা তাকে লালন করে, সর্ব্বদাই বুকে করিয়া রাখে, কিন্তু আমাকে দেখিলে শিশু যেন কি এক আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে; তা'র বুক হইতে আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়। হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে। যেখানেই থাক, আমাকে দেখিতে পাইলে, সেইখান হইতেই দুড়দুড় করিয়া ছুটিয়া আইসে। কাঁদিতে একরূপ জানেই না—যদি কখন কাঁদে, আমাকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হয়।

দেখিতে দেখিতে শিশু ছয় মাসের হইল। যদি কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তা হইলে তার ত সংস্কার করিতে হইবে।

আমি ঠাকুর দেখা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া সবে মাত্র বসিয়াছি। ভুবনের মা, অন্যদিন যেখানেই থাক, শিশুকে আমার কোলে দিবার জন্য লইয়া আইসে। আজ সে নিজেই আসিল।

"খুকী কি ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"না।"

"তাকে কোথায় রেখে এলে?"

"আছে গো ঠাকুর, তামাক খাও। তুমি যে আজ গিয়েই ফিরে আস্‌বে, তা কেমন ক'রে জান্‌ব?"

সত্য সত্যই আমি কর্ত্তব্য ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঠাকুর দেখা আমার ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

ভুবনের মা'র কাছে মুখ-রক্ষার জন্য বলিলাম—"আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল। ছয় মাস উত্তীর্ণ হয়—মেয়েটার ত একটা সংস্কার করতে হবে?"

"তা হবে বই কি, বাবা।"

"বড় সমস্যায় পড়েছি, ভুবনের মা। এই সময় ওর মুখে ত দুটি অন্ন দিতে হয়।"

"খুকীর অন্নপ্রাশনের কথা বল্‌ছ ? তা ত দিতেই হবে।"

"তা তো হবে—কিন্তু—"

ভুবনের মা আমার মনের কথা ধরিয়া ফেলিল—"আবার 'কিন্তু' কিসের, বাবা, তুমিই ত ওর বাপ—তুমিই ত ওর মা।"

"আর তুমি ?"

"আমি ওর যে দিদি ছিলুম, সেই দিদি।"

"বেশ জড়াবার ব্যবস্থা কর্‌ছিস্ ত বুড়ি! তা হ'লে জগতে এসে আর মা বাক্য উচ্চারণ কর্‌তে পেলে না ?"

ঠিক এমনই সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে অতি মিষ্ট কণ্ঠে কে ডাকিল, "ভুবনের মা!"

"কেন মা ?"

"খুকী ঘুমিয়েছে।"

"বাবা, তুমি একবার ঘরের ভিতর যাও ত" বলিয়াই ভুবনের মা চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে দেখিব না দেখিব না করিয়া দেখিলাম—এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী। ভুবনের মা'র অন্তরাল দিয়া সে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। দেখিলাম মাত্র তার দুইটি চরণ—কি অপূর্ব্ব সুন্দর পা দু'খানি! বর্ণ—কে যেন দুটি পায়ে দুধ-আলতা মাখাইয়া দিয়াছে। চরণের অনুপাতে মুখ যদি সুন্দর হয়, তা হ'লে, এ তো অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী।

ভুবনের মা ফিরিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে উনি গা ?"

"তোমার এ মেয়েকে কি বাঁচাতে পার্‌তুম বাবা, ওই মেয়েটি যদি না থাক্‌ত। ও প্রতিদিন এমনি সময় এসে খুকীকে মাই খাইয়ে যায়।"

উল্লাস-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ রকম খাওয়াচ্ছে কত দিন ?"

"তুমি আন্‌বার চার পাঁচ দিন পর থেকে।"

"তবে ত আজ সকালে ফিরে বড়ই অন্যায় করেছি। তুমি এ কথা আমায় বলনি কেন ?"

"তাতে কি হয়েছে—ও তোমার কন্যাই মনে কর।"

"তা হ'লে ত খুকীর মা আছে ভুবনের মা ?"

"তা, স্তন্য দিয়ে যে বাঁচায়—সে মা বই আর কি ? তুমি এখন খুকীর মুখে ভাত দেবার ব্যবস্থা কর।"

যথারীতি শিশুর অন্নপ্রাশন করিয়া দিলাম। নিজেই তার পিতৃত্বের অধিকার লইলাম। নাম দিতে গিয়া দয়াময়ীর রহস্যের কথাটা মনে পড়িল। প্রথম সাগ্রহে তাকে বুকে তুলিয়া ডাকিলাম—গৌরী!"

আরও পাঁচ মাস—গৌরীর বয়সের বছর পূরণ হইতে মাত্র এক মাস বাকী। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গুরু কাশীতে ফিরিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া দেখা করিতে গেলাম। ছোট গৈবী কূপের নিকটে একটি বাগানের ভিতর তিনি আসন করিয়াছেন। কাশীতে তাঁহার কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রম ছিল না; যেখানে যখন সুবিধা হইত, সেইখানেই আসন পাতিতেন—এবারে পাতিয়াছেন গৈবীতে।

যাইয়া দেখিলাম, বহু লোক আসনের সম্মুখে বসিয়াছেন। সকলেই আমার অপরিচিত। সকলে নীরবে বসিয়া সাধুমুখ-নিঃসৃত উপদেশ শুনিতেছিল। সকলের মধ্য দিয়া গুরুর সম্মুখে আমি প্রণত হইলাম। আমাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য উপদেশ স্থগিত রাখিয়া তিনি আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন। স্থান দেখিয়া যাহার পার্শ্বে বসিলাম, পরে পরিচয়ে জানিলাম, তাহার নাম ব্রজমাধব চক্রবর্ত্তী—পাবনার এক জন বিশিষ্ট জমীদার।

উপদেশ 'অস্তেয়' কথার অর্থ লইয়া হইতেছিল। অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের ভিতরে 'যম'-সাধনের কথাটা আছে। সাধন-মুখে সাধককে কতকগুলি গুণ অর্জ্জন করিতে হয়—উহা তাহাদের মধ্যে একটি। উহার অর্থ অচৌর্য্য। তিনি বলিতেছিলেন, যোগ-সিদ্ধ হইতে হইলে চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে—ত্যাগ করিতে হইবে কায়মনোবাক্যে। চোর কোনও কালে আত্মলাভ করিতে পারে না।

আগে ত জানিতাম, না বলিয়া পরের ধন গ্রহণ করার নাম চুরী। আর ধন অর্থে—তুমি আমি চিরকাল যাহা বুঝিয়া আসিতেছি, তাহাই বুঝিতাম।

চুরীর এত অর্থ! আমার আসিবার পূর্ব্বে গুরু চুরীর কত উদাহরণ দিয়াছেন—আমি শুনি নাই। যাহা শুনিলাম, সে উদাহরণগুলা একত্র করিলেও যে একখানা মহাভারত রচনা হইয়া যায়! কাজের চুরী, মনের চুরী, বাক্যের চুরী—ভাবের ঘরে চুরী। এ কাহিনীর ভিতরে এত চুরীর কথা কহিবার স্থান নাই।

তাহাদের মধ্যে একটি অর্থ—শুধু সেইটিই তোমাদের শুনাইব। শুনিয়া আমি ও আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট, জমীদার-পুত্র উভয়েই যুগপৎ শিহরিয়া উঠিয়াছি।

চৌর্য্যের নানা উদাহরণ দিতে দিতে হঠাৎ তিনি, আমি ও ব্রজমাধব উভয়েরই মুখের দিকে একটু দৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"এই মনে কর, লালসার চরিতার্থতার জন্য মানুষ কতই না চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। কায়, মন, বাক্য, ভাব—যত প্রকারের চুরী আছে, এ হতভাগারা তার একটিও বাদ দেয় না।" বলিয়াই কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিয়া আবার বলিলেন—"অবৈধ সংসর্গের ফল।"

ব্রজমাধব, আমার মনে হইল, কথাটা শুনিতেই শিহরিয়া উঠিল।

গুরু বলিতে লাগিলেন—"নষ্ট করিল ত সেই হতভাগ্য জীবের জন্মের সমস্ত সার্থকতাটা চুরী করিল। শিশু মরিলেও তার পিতামাতা চোর, বাঁচিলেও চোর। রাখিল ত তার সমাজের আসন চুরী করিল; পথে নিক্ষেপ করিল ত তার প্রাপ্য, মাতৃস্তন্য, তার একমাত্র আশ্রয় মাতৃ-অঙ্ক—সেই সঙ্গে সঙ্গে আর কত বলিব—তার সব চুরী করিল।"

ব্রজমাধব একটু যেন চঞ্চল হইল।

"শেষকালে সেই হতভাগা হতভাগিনীর সমস্ত জীবন কেবল ভাবের ঘরে চুরী করিতে করিতেই কাটিয়া যায়। তার পর তারা হয় ত কত দান করিল, কত জলাশয়, কত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিল—প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কত জয়ধ্বনি শুনিল। কিন্তু শান্তি? সেই সমস্ত জয়ধ্বনির শিরে সেই পরিত্যক্ত শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন ভাসিয়া উঠিতেছে! সেই সূক্ষ্ম স্বর তাহাদের সমস্ত শান্তি গ্রাস করিয়া ফেলিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরুদেব! সে হতভাগা হতভাগিনীর কি মুক্তি নাই?"

"ভাবের ঘরে চুরী পরিত্যাগ না করিলে নাই।"

"সে কি করিবে?"

"সে চুরীর কথা প্রকাশ করিবে।"

"জগতের কাছে?"

"তা' করিতে পারিলে ত তন্মুহূর্ত্তেই মুক্তি। না পারে, কোনও সাধুর কাছে, তাঁর শরণাগত হইয়া পাপ-স্বীকার; তিনি তার মুক্তির উপায় বলিয়া দেন।"

ব্রজমাধব একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"শুনিয়াছি, খৃষ্টানদের এইরূপ পাপ-স্বীকারের প্রথা আছে।"

এক জন ইংরাজীনবীশ শ্রোতা বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, তার নাম 'কনফেশন'। কোনও পাদরীর কাছে, পাপ-কথা বলিয়া আসিতে হয়। তিনি তার পাপ-মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর, গুরুদেব বলিয়া উঠিলেন—"যে সেই পরিত্যক্ত পুত্র কিংবা কন্যা কুড়াইয়া লয়—সেও চোর।"

সর্ব্বশরীরের রক্ত মুহূর্ত্তের ভিতরে মাথার দিকে ছুটিয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই বলিলাম—"সেও চোর?"

"তুমিই বল না, অম্বিকাচরণ।"

"কেন প্রভু, এইরূপ বহু পরিত্যক্ত পুত্রকন্যাকে সাধুরা যে অনাথ-আশ্রমে স্থান দিতেছে।"

শুনিবামাত্র এমন তিরস্কারের সহিত আমার কথার তিনি উত্তর দিলেন যে, সকলেই কিছুক্ষণের জন্য যেন স্তম্ভিতের মত হইয়া গেল।

"হতভাগ্য সন্ন্যাস লইবার জন্য আমাকে অস্থির করিয়াছিলে, অথচ মায়ায় ও দয়ায় প্রভেদ বুঝিতে তোমার সামর্থ্য নাই! মনে কর, স্ত্রীপুত্রকন্যার বিয়োগে মনস্তাপে তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াই সেই অবস্থায় একটি শিশুকে কুড়াইয়া পাইয়াছ। দয়া অথবা মায়া যে কোন একটার সাহায্যে তাহাকে তুমি পালন করিতে পার। যদি তৎপ্রতি মমতা হয়, অম্বিকাচরণ, তখন দয়ায় তাহাকে পালন করিতেছি, এ কথা বলিলেই তোমার ভাবের ঘরে চুরী হইবে। সেই শিশু যখন 'বাবা' বলিয়া তোমার গলাটা জড়াইয়া ধরিবে, তখন তোমার কি একবারও মনে উঠিবে না, আমি এই শিশুর পিতৃ-স্নেহ চুরী করিতেছি?"

আমারও দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

"কি রাজমোহন, শুন্‌ছ?"

"ও চিরকালই শুনে আস্‌ছি প্রভু, কুলীনের ঘরে যখন জন্মেছি। কত চুরী নিজেই কর্‌লুম! কর্‌লুম কেন, এখনও কর্‌ছি। কত দিন কর্‌ব, তারই বা ঠিক কি!"

ফিরিয়া দেখিলাম, একটি মধ্যবয়সী সুকান্তদেহ পুরুষ সকলের একরূপ পশ্চাতে, সেই স্থানের এক প্রান্তদেশে বসিয়া আছে।

"তুমি ত সাধু হে—তুমি চুরী কর্‌তে যাবে কেন?"

"পাঁচ সাতটা বিয়ে করেছি, আমি সাধু?"

"কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন ত যেখানে যাইতেন, সেই স্থানেই

একটা বিবাহ করিতেন। রাজমোহন, সংযমী যে, তার শত বিবাহেও ক্ষতি হয় না। অসংযমী একটা বিবাহেই শত অনিষ্টের সৃষ্টি করে।"

এইখানেই একরূপ কথার শেষ হইল। ব্রজমাধব গুরুজীকে প্রণাম করিয়া উঠিল। আমিও উঠিলাম। সহসা আমার দেহে যেন শত-বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা ধরিল। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না।

আমি উঠিতেই গুরুদেব বলিলেন—"কি অম্বিকাচরণ, আমার সঙ্গে দিন কয়েক ঘুরে আস্‌বে?"

"এসে বল্‌ব, প্রভু!"

"বেশ।" একটু করুণার হাসি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া দিল। দন্তের শুভ্রতার ভিতর দিয়া মনে হইল, আমাকে শান্ত করিতে তাঁর আশ্বাসের বাণী আসিতেছে।

পথে চলিতে ব্রজমাধবের সঙ্গে একটু পরিচিত হইয়া লইলাম। একবার সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এই সাধুটির সঙ্গে যে কোনও সময়ে নির্জ্জনে আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন?"

আমি বলিলাম—"চেষ্টা করিব।"

সুতরাং পরস্পরকে আমাদের বাসার পরিচয় দিতে হইল।

বাসায় ফিরিয়া দ্বার খুলিতে ভুবনের মা'কে ডাকিলাম। যেমন দ্বারটি খোলা হইয়াছে, অমনিই মেয়েটা ভুবনের মা'র কোল হইতে ঝুঁকিয়া আমার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিল।

"বা-বা-বা!"

"ছাড়্ গৌরী ছাড়্!"

"বা-বা-বা!" যথাশক্তিতে দুইটি বাহুলতা দিয়া সে আমাকে বাঁধিয়াছে।

"ও মা, ছাড়্!" তখন আমার চক্ষু জলে অন্ধপ্রায় হইয়াছে।

"একবার বুকে না নিলে কি ও ছাড়্‌বে! এতক্ষণ ফেল্-ফেল্ ক'রে কেবল পথের পানে চাচ্ছিল।" বলিয়াই ভুবনের মা সত্য সত্যই গৌরীকে আমার বুকের উপর তুলিয়া দিল।

হায়! এই বুকে আশ্রয় লওয়া ননীর পুতুলটি আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে? এরই নাম কি বৈরাগ্য?

[ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

উদ্ভট-সাগর।

লোক গঙ্গা-দেবীকে 'পতিত-পাবনী' বলিয়া থাকে। কিন্তু এ কথা যে কত দূর সত্য, তাহা কবি কৌশল-সহকারে এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

জননি সুরতটিনি ভবতীং
কদাচন ন পতিতপাবনীং মন্যেঽহম্।
শূলী গদী চ তীরে
নীরেঽপি মৃতঃ পুনরপি শূলী গদী চ॥

(উদ্ভটসাগরস্য)

নিবেদন করি, ও মা, জাহ্নবী-জননি!
কিসে নাম পেলে তুমি 'পতিত-পাবনী'?
কোন জন মরে যদি কভু তব তীরে,
শূলী গদী সেই জন হয় জন্মান্তরে!

ব্যাখ্যা। শূলী—শূলগ্রস্তঃ; (পক্ষে) মহাদেবঃ। গদী—রোগগ্রস্তঃ; (পক্ষে) নারায়ণঃ।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বৃন্দাবনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহাই কবি উদ্ধবের মুখ দিয়া এই শ্লোকে কৌশল-সহকারে বলিতেছেন:—

শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শষ্পায় ন স্পন্দতে
মূকাঃ কোকিলপংক্তয়ঃ শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি।
সর্ব্বে ত্বদ্‌বিরহেণ হন্ত নিতরাং গোবিন্দ দৈন্যং গতাঃ
কিন্ত্বেকা যমুনা কুরঙ্গনয়না-নেত্রাম্বুভির্বর্দ্ধতে॥

জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছে সাধের গোকুল,
তৃণ খেতে নাহি আর নড়ে পশু-কুল।
বোবা হয়ে প'ড়ে আছে কোকিলের দল,
নাহি আর নাচে হর্ষে ময়ূর সকল।
হে গোবিন্দ! বৃন্দাবনে যত প্রাণী রয়,
তোমারি বিরহে সব পাইয়াছে ক্ষয়।
কুরঙ্গ-নয়না গোপীদের নেত্র-জলে
কেবল যমুনা দেখি বাড়িতে বিরলে!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

স্মৃতি-সৌধ

১

এক হিসাবে দেখিলে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে শাহজাহানাবাদ পর্য্যন্ত দিল্লীর যে স্থানে যে সব সৌধ আজও দণ্ডায়মান, সে সবই স্মৃতিসৌধ—সকলেরই সহিত অতীত ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত। বেলাবালুবিস্তারমধ্যে কলধৌতপ্রবাহবৎ স্বল্প-তোয়া যমুনাও যেন অতীতের স্মৃতির অবশেষ। ৩৭৯টি স্তরে বিভক্ত সোপান অতিক্রম করিয়া কুতব-মিনারের সমুচ্চ শিরে আরোহণ করিলে চারিদিকে যেন স্মৃতির রাজ্য নয়নগোচর হয়। মিনারের পাদমূলে হিন্দু-মুসলমানের কত সৌধের ভগ্নাবশেষ! ভগ্নগৃহের প্রাচীরে এখনও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ পাষাণে ক্ষোদিত হইয়া কালজয়ী অবস্থায় বিস্তমান। অদূরে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে গঠিত বিরাট্ লৌহস্তম্ভ—দীর্ঘকালের ঝঞ্ঝাবাত, করকাপাত, নিদাঘের রৌদ্র, বর্ষার বারিধারা, হিমের শিশির—তাহার মসৃণ অঙ্গে চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে নাই। দূরে জুম্মা মসজেদের মিনার ও গম্বুজ; শাহজাহানাবাদে রক্তপ্রস্তরের রচিত দুর্গ; ইন্দ্রপ্রস্থে শের সাহের মসজেদ; ঘনশ্যামপত্রবহুল বৃক্ষরাজির মধ্যে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির।
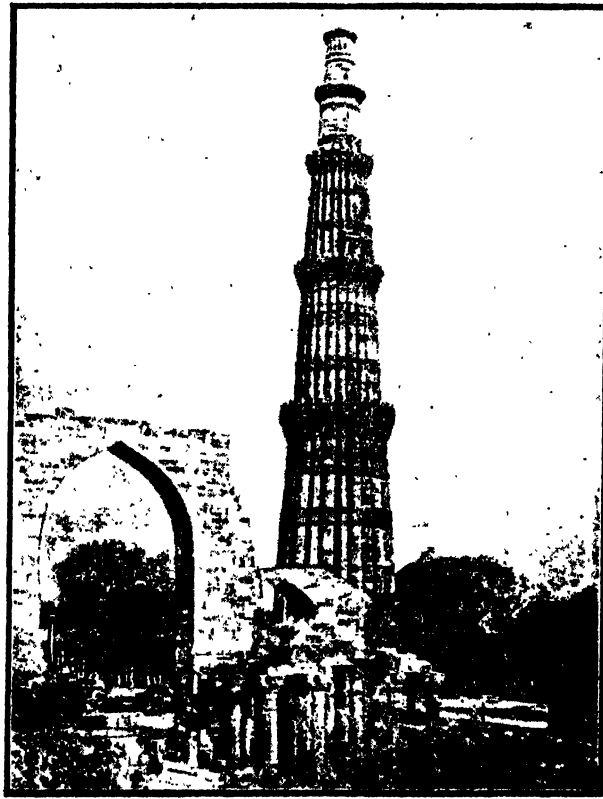
কুতব-মিনার।

এমন সমাধি-মন্দির দিল্লীতে অনেক আছে। মুসলমানরা এইরূপ স্মৃতি-সৌধ রচনায় বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতবর্ষের নানাস্থানে এই সব স্মৃতি-সৌধ লক্ষিত হয়। হিন্দুর দেহ শ্মশানে চিতানলে ভস্মীভূত হয়; মুসলমান রাজা ও আমীর-ওমরাহদিগের শব কারুকার্য্য-মনোহর সমাধিসৌধে রক্ষিত হয়। মোগলের ও পাঠানের সমাধিসৌধ ভারতবর্ষে নানা যুগের স্থপতিশিল্পের আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

মোগলদিগের এই সব স্মৃতি-সৌধের আবার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। মোগলরা উদ্যান ও জল বড় ভালবাসিতেন—দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, সর্ব্বত্র তাঁহাদের প্রাসাদ ও স্মৃতি-সৌধ বেষ্টন করিয়া উদ্যান রচিত হইত—জলপ্রবাহের ব্যবস্থা থাকিত—ফোয়ারায় উৎক্ষিপ্ত জলধারা বিন্দু বিন্দু হইয়া রবিকরে হীরকের শোভা অনুকরণ করিয়া ফোয়ারার জলাধারে আসিয়া পড়িত—গৃহের মধ্য দিয়াও জলপ্রবাহ প্রবাহিত হইত—বহুদূর হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করা হইত। এখন এই সব স্মৃতি-সৌধের বেষ্টন উদ্যান-বৃক্ষ লতাহীন—যত্নের অভাবে বৃক্ষলতা শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু জলের প্রবাহপথ আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

তখন প্রাসাদ দুর্গমধ্যে অবস্থিত হইত। মোগল নৃপতিরা দুর্গের বাহিরে—প্রাচীরবেষ্টিত সহর অতিক্রম করিয়া অনেকটা স্থান ঘিরিয়া উদ্যান রচনা করিতেন। সেই উদ্যানমধ্যে তাঁহারা গম্বুজশোভিত গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। জীবিতকালে তাঁহারা কখন বা বন্ধুবান্ধব লইয়া, কখন বা মহিলাকুল-পরিবৃত হইয়া সেই উদ্যানগৃহে উৎসবানন্দসম্ভোগ

করিতেন। নৃত্যে, গীতে, কলহাস্যে সেই গৃহ ধ্বনিত হইত। উদ্যানতরুর কুসুম শুদ্ধান্তচারিণীদিগের হেমারাগ-রঞ্জিত অঙ্গুলীতে বৃন্তচ্যুত হইয়া মাল্য-রচনায় ব্যবহৃত হইত—সুরভিসিক্ত কেশে শোভা পাইত—ফুলদানীতে রক্ষিত হইত। ইরাক, ইরাণ, কাশ্মীর কত দেশ হইতে সুন্দরী আনিয়া এই সব নৃপতির শুদ্ধান্ত সজ্জিত হইত! সে শুদ্ধান্তের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য, ভোগ ও বিলাস, পাপ ও ষড়যন্ত্র কবিকল্পনাকেও পরাভূত করিত। যে উদ্যানগৃহে জীবিতকালে গৃহস্বামী আনন্দোৎসবে মগ্ন হইতেন, সেই উদ্যানগৃহই তাঁহার সমাধিতে—তাঁহার স্মৃতি-সৌধে পরিণত হইত। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকার্য্য—এ সকলের মধ্যে যে স্থানে আসিয়া তিনি আনন্দলাভ করিতেন, সেই স্থানেই—সেই তরুচ্ছায়া-সমন্বিত, সলিল-সঙ্গ-শীতল পবনাকুলিত, বিহগবিরাবিত উদ্যান-মধ্যেই তাঁহার শবের শেষ শয়ন রচিত হইত। শবাধার রক্ষা করিয়া তাহার উপর মর্ম্মরের আবরণ দেওয়া হইত। তাহার পর—সেই নিদ্রা; কে জানে, তাহা কোন দিন ভঙ্গ হয় কি না? সে রহস্য মানবের বুদ্ধি ভেদ করিতে পারে নাই।

স্মৃতি-সৌধ এমন মনোরম করিয়া রচনা করিবার হয় ত আরও কারণ ছিল। রাজপ্রাসাদ বিজেতার অধিকৃত হইতে পারে—দুর্গপ্রাচীর ধূলিসাৎ হইতে পারে; কিন্তু কোন মুসলমান সমাধি-মন্দির নষ্ট করিবেন না—এ বিশ্বাস বিচলিত হইবার কোন কারণ কোন দিন মুসলমানের হয় নাই।

জীবনে যাঁহারা একসঙ্গে থাকিতেন, মরণেও তাঁহারা পরস্পরকে ত্যাগ করিতে চাহিতেন না। তাই অনেক স্মৃতি-সৌধে স্বামীর সমাধির পার্শ্বেই পত্নীর সমাধি রচিত হইত—প্রেম যে মৃত্যুঞ্জয়ী, তাহাই বুঝাইবার জন্য তেমন আয়োজন করা হইত।

কেবল তাহাই নহে—আবার বংশপতির সমাধির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে বংশের অন্যান্য লোকের—ভ্রাতার, পুত্রের, পৌত্রের শবও সমাহিত হইত—এক একটি স্মৃতি-সৌধ কালে এক একটি সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইত। নিরানন্দ--নির্জ্জন গৃহে এক এক পরিবারের বহু ব্যক্তির—এক এক বংশের বহু বংশধরের শব সমাহিত হইত। সেই সব স্মৃতি-সৌধ বেষ্টন করিয়া বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া পবন যেন হা-হুতাশ করিয়া ফিরিত; আর সেই উদ্যান-বেষ্টিত গৃহে মৃত্যুর ছায়ায় বসিয়া স্মৃতি সমগ্র বেষ্টনমধ্যে কারুণ্যের প্রভাব বিস্তার করিত।

দিল্লীতে যে সব স্মৃতি-সৌধ বিদ্যমান, সে সকলের মধ্যে সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিগৃহই সর্ব্বপ্রধান। পুরাণ কেল্লায় সোপানে পদস্খলনের পর চারি দিন মাত্র জীবিত থাকিয়া হুমায়ুনের প্রাণান্ত হয়। এই সমাধি-মন্দিরে তাঁহার শব
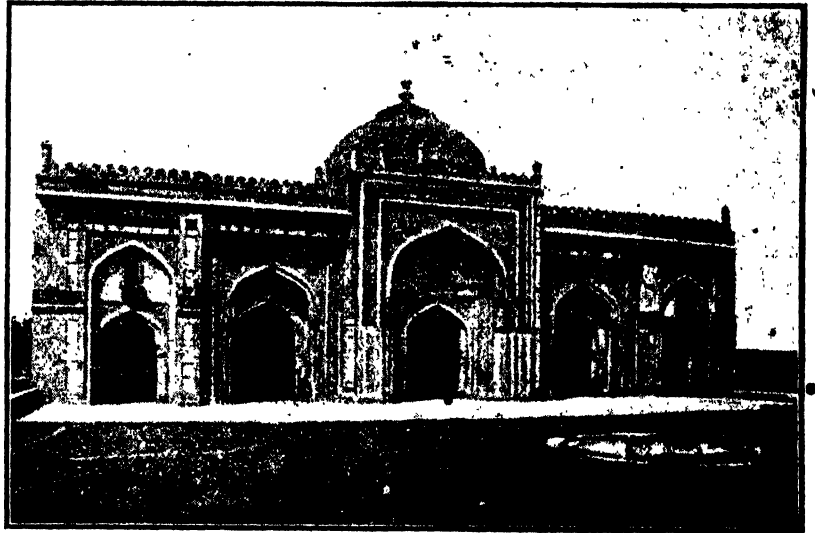
শের সাহের মসজেদ।

সমাহিত। তিনি জীবদ্দশায় এই সৌধের নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী হাজি বেগমের চেষ্টায় এই সৌধ সম্পূর্ণ হয় এবং সে কার্য্যে তাঁহার পুত্র আকবর বেগম সাহেবকে আবশ্যক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাজমহলে এই সৌধেরই নক্সা অনুকৃত হইয়াছিল—কিন্তু শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত—বিচিত্রবর্ণচিত্রিত তাজের যে কবিত্বময় সৌন্দর্য্য তাহাকে অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে, এ সৌধে তাহা নাই। কিন্তু ইহা জীবদ্দশায় নানারূপ দুর্দ্দশায় তাড়িত বীর সম্রাটের উপযুক্ত সমাধি—ইহার পৌরুষব্যঞ্জক গঠন সম্রাটের সমাধির উপযুক্ত। কারণ, তখন সম্রাটকে "শিয়রে তুরঙ্গ কটিবন্ধে অসি"

লইয়া নিদ্রা যাইতে হইত, বাহুবল ব্যতীত রাজ্যরক্ষা হইত না, দুর্ব্বল বাহুতে রাজদণ্ড পরিচালন করা যাইত না। হুমায়ুন ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেও কোন দিন শান্তি সম্ভোগ করিবার অবসর লাভ করেন নাই। বাবর বিজয়সেনা লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রয়োজন হইলে গঙ্গা ও সিন্ধু-প্রবাহ অতিক্রম করিয়া প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বাদকশান হইতে আফগানিস্থান, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান, রাজপুতানা ও বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্রাট হইয়া ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় দেহরক্ষা করেন। পুত্র হুমায়ুন পিতার কষ্টসহিষ্ণুতার ও রণানন্দের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই এবং তাহা বুঝিয়া শের সাহ সাম্রাজ্যজয়ের চেষ্টা করেন। শের সাহ বলিয়াছিলেন—"অদৃষ্ট সহায় হইলে আমি মোগলদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিব। যুদ্ধে বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহারা কোনরূপেই আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আমরা—আফগানরা আত্ম-কলহের জন্যই রাজ্য হারাইয়াছি। আমি মোগলদিগের মধ্যে থাকিয়া বুঝিয়াছি, তাহারা শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে না। তাহাদের নেতারা বংশগর্ব্বে ও পদগৌরবে মত্ত হইয়া শাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে না—অন্ধ বিশ্বাসবশে সব কাযের ভার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। এই সব কর্ম্মচারী সর্ব্বকার্য্যে হীন স্বার্থের দাস। লাভের প্রলোভনে তাহারা শত্রুমিত্রভেদ ভুলিয়া যায়।"

হুমায়ুনকে কয় বৎসর গুজরাটে ও মালোয়ায় যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল এবং এই সময় তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাহাই এখন পুরাণ কেল্লা নামে পরিচিত। তাহার পর শের সাহ তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলেন। শের সাহের মৃত্যুর পর নিশ্চিন্ত হইয়া হুমায়ুন অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার দেহের শেষ শয়নস্থান—এই স্মৃতি-সৌধ আজ বহু যাত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

কেহ কেহ এমন মতও প্রকাশ করিয়াছেন, নক্সার অবিমিশ্রতার ও গঠনের সৌন্দর্য্যের হিসাবে—ইহা অনিন্দনীয়, ইহাতে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, বরং অলঙ্কারের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাতে ইহার সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ না হইয়া গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিতই হইয়াছে।

কত দিন ইহার উদ্যান যত্নসংরক্ষিত ছিল, বলিতে পারা যায় না। তবে জানা যায়, উত্তরকালেও মোগল বাদসাহরা ইহা তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, পুত্র খসরুর সন্ধানে আসিয়া তিনি এই সমাধিসৌধে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় লোককে ভিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

স্মৃতি-সৌধের মধ্যস্থ গৃহে কেবল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি। এই সৌধের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের গৃহে সৌধের নির্ম্মাণকার্য্যে প্রধান উদ্যোগী—হাজি বিবির শব সমাহিত। অন্যান্য কোণের কক্ষগুলিতেও অনেক শব সমাহিত। সে সকলের মধ্যে সম্রাট জেহান্দর সাহের ও দ্বিতীয় আলমগীরের নাম জানিতে পারা যায়। কিংবদন্তী সাহজাহানের হতভাগ্য পুত্র দারার শবও এই সমাধি-সৌধে স্থান পাইয়াছিল। ভ্রাতৃহন্তা ঔরঙ্গজেবের দয়ায় তাঁহার কোন স্বতন্ত্র সমাধি নির্ম্মিত হয় নাই।

আর এক জন এই সৌধে সমাহিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর সাহ। বাহাদুর সাহ যখন সম্রাট, তখন সম্রাটের কেবল নাম আছে। তিনি ক্ষমতাহীন—ঐশ্বর্য্যহীন; কেবল দিল্লী দুর্গে সম্রাট বলিয়া পরিচিত। দিল্লীর দুর্গমধ্যে যে যাদুঘরে মোগলদিগের স্মৃতিজড়িত দ্রব্যাদি সংরক্ষিত, সেই যাদুঘরে বাহাদুর সাহের ও সাম্রাজ্ঞী জিন্নাতমহলের দ্রব্যাদি দেখিলেই তৎকালে সম্রাটের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার বিষয় বুঝিতে পারা যায়। বাহাদুর সাহ যখন "সম্রাট", তখন, বোধ হয়, তাঁহার স্মৃতি-সৌধ রচনার উপযোগী অর্থও ছিল না। সম্ভবতঃ সেই জন্য তিনি হুমায়ুনের এই স্মৃতি-সৌধের মধ্যে আপনার শবের জন্য স্থান সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। সিপাহী-বিপ্লবের পর ধৃত হইয়া তিনি ব্রহ্মে নির্ব্বাসিত হয়েন, এবং তথায় তাঁহার দেহান্ত হইলে, ব্রহ্মের ভূমিতেই তাঁহার শেষ শয়নস্থান রচিত হয়।

এই সিপাহী-বিপ্লবের সময় হুমায়ুনের স্মৃতি-সৌধে মোগল সম্রাট বংশের দুঃখপূর্ণ নাটকে শেষ অঙ্কে যবনিকাপাত হইয়াছিল। বাহাদুর সাহ যে বিশেষ চতুর বা উচ্চকাঙ্ক্ষ ছিলেন, এমন মনে হয় না। কিন্তু সাম্রাজ্ঞী জিন্নাতমহল, বোধ হয়, নুরজিহানের মত সাম্রাজ্য-শাসনের বাসনাচালিতা হইয়াছিলেন—হয় ত বা যমুনার কূলে তাজমহলের স্মৃতি তাঁহার চিত্তে মোগলবাদসাহদিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা জাগাইয়াছিল। তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া—পতি দ্বিতীয় বাহাদুর সাহকে আবার দিল্লীর দেওয়ানী-খাসে ভারত-সম্রাট

বলিয়া ঘোষণা করাইয়াছিলেন। সে দিন তিনি স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন নাই, সাত মাস যাইতে না যাইতে সেই দেওয়ানীখাসেই ইংরাজের কাছে পরাভূত বাহাদুর সাহের বিচার হইবে—শেষ মোগল সম্রাট "বিদ্রোহী" বলিয়া দণ্ডিত হইবেন।

সিপাহী-বিপ্লবের অবসানে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে লেফটেনাণ্ট হাডসন জানিতে পারে, সম্রাটের দুই পুত্র ও এক পৌত্র প্রাণভয়ে এই স্মৃতি-সৌধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হাডসন এই সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিতে

দিল্লী হইতে যে পথ কুতব মিনারে গিয়াছে, সেই পথের প্রায় মধ্যভাগে হুমায়ুনের স্মৃতি-সৌধের অনুকরণে রচিত একটি স্মৃতি-সৌধ লক্ষিত হয়। এই স্মৃতি-সৌধ অযোধ্যার নবাব উজীর সাফদার জঙ্গের সমাধি-মন্দির। ইনি সম্রাট মহম্মদ সাহের পুত্র আহম্মদ সাহের উজীর ছিলেন এবং পরোক্ষভাবে মোগলপ্রাধান্য নাশের হেতু হইয়াছিলেন। তিনি জাঠদিগের সাহায্য গ্রহণ করায় প্রতিপক্ষ মার্হাট্টাদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং জাঠের ও মার্হাট্টার লুণ্ঠনে মোগলদিগের
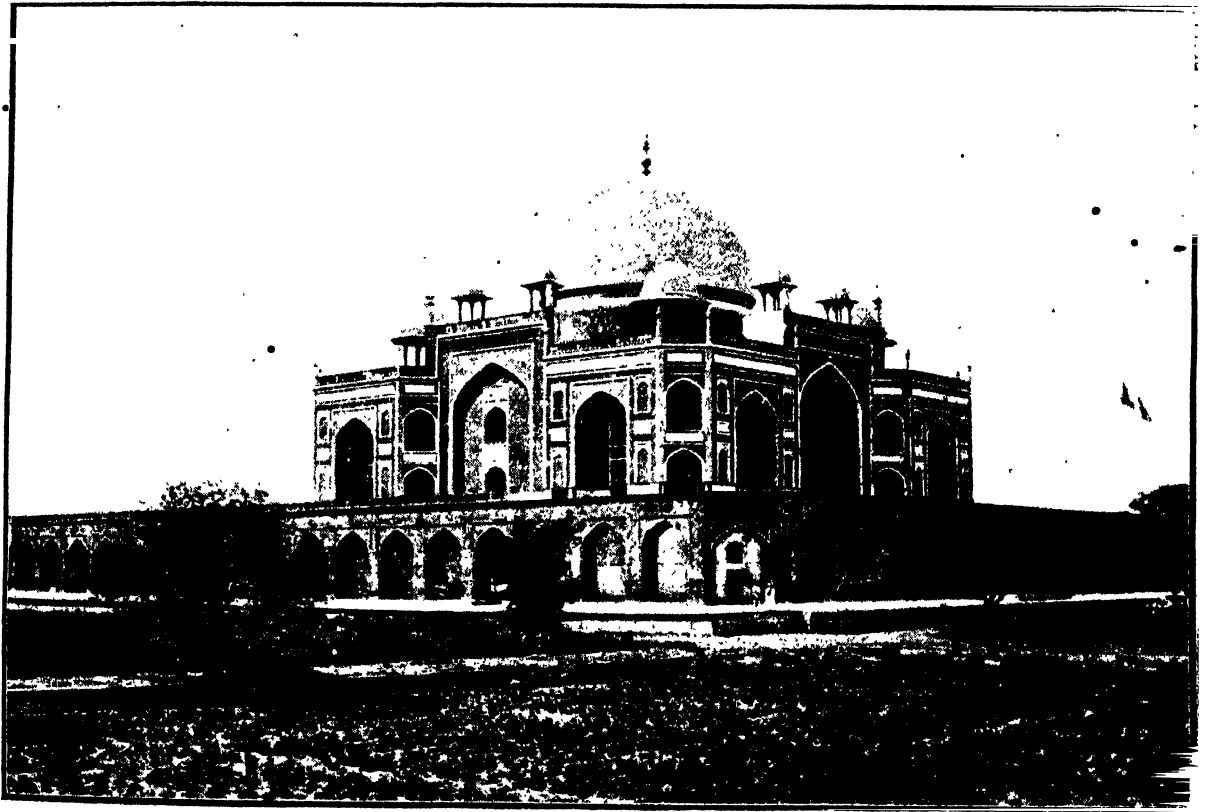
হুমায়ুনের স্মৃতি-সৌধ।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই—তথায় প্রস্তরে জালির কায করা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া গুলী করিয়া মারে এবং তাহার পর আপনার পৈশাচিক প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য শবগুলি অনাবৃত অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা কাল কোতয়ালীতে ফেলিয়া রাখে।

হুমায়ুনের স্মৃতি-সৌধের সহিত মোগল রাজবংশের শেষ এই স্মৃতি বিজড়িত—হুমায়ুনের শবও সেই ঘটনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল কি না—সে কথা আজ কে বলিতে পারে?

ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব নষ্ট হয়। অযোধ্যায় যে বংশ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, সাফদার জঙ্গ সেই বংশের প্রধান পুরুষ। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে—অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের কয় বৎসর মাত্র পূর্ব্বে সাফদার জঙ্গের মৃত্যু হয়। তখন ভারতবর্ষে চারিদিকে রাজনীতিক বিপ্লব—মোগলের ভাগ্যসূর্য্য তখন অস্তাচলে গমন করিয়াছে, কেবল আকাশে তখনও তাহার পূর্ব্বগৌরব-স্মৃতি রক্তরাগে শোভা পাইতেছে। যে বংশের বংশপতি

অসি-হস্তে বিদেশ হইতে আসিয়া এই সুদূর দেশে রাজ্য—সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন—যাঁহার বংশধরদিগের কীর্ত্তি-সৌধ আজও বিশ্ববাসীর বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে—যাঁহাদের বিলাসের বিবরণ কিংবদন্তী আজও বহন করিতেছে—সেই বংশ তখন "নামশেষ" অবস্থায় বিস্মৃতির অতলতলগত হইতেছে। জয়ের তরঙ্গচূড়ায় যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—পরাজয়ের তরঙ্গাঘাত তাহা ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছে—ইতিহাসের বেলাভূমিতে কেবল ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। তখন স্থাপত্য আর উন্নতির উচ্চ চূড়ায় সমাসীন নহে—তাহার অধঃপতনের চিহ্ন সর্ব্বত্র সপ্রকাশ। স্থাপত্য তখন

সাফদার জঙ্গের স্মৃতি-সৌধ।

মৌলিকতাবর্জ্জিত হইয়া অনুকরণে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সাফদার জঙ্গের স্মৃতি-সৌধ দেখিলে তাহা বুঝা যায়। সৌধের মধ্যে পলস্তারার কাযেই দৈন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—পাষাণে ক্ষোদিত চিত্রের স্থান পলস্তারা অধিকার করিয়াছে। শিল্প যখন মৌলিকতাবর্জ্জিত হয়, তখনই তাহার অধঃপতনের আরম্ভ।

এই সৌধশির হইতে উত্তরদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে পুরাতন যুদ্ধক্ষেত্র লক্ষিত হয়। এই ক্ষেত্রে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুর মহম্মদ খাঁর বাহিনী বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

এই সৌধের উপর হইতে দিল্লীর পুরপ্রাচীরে আজমীর সিংহদ্বারের দিকে চাহিলে জয়পুরের রাজা জয়সিংহের পর্য্য-বেক্ষণ-গৃহ বা যন্ত্রগৃহ লক্ষিত হয়। সাধারণ লোক ইহাকে "যন্ত্রমন্ত্র" বলে। জয়সিংহ গ্রহতারকা লক্ষ্য করিবার জন্য অন্যান্য স্থানের মত দিল্লীতেও তারাঘর নির্ম্মাণ করিয়া পর্য্য-বেক্ষণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে এই পর্য্যবেক্ষণগৃহ নির্ম্মিত হয় এবং ইহাকে জয়সিংহের জ্ঞান-লিপ্সার নিদর্শনও বলা যাইতে পারে। জাঠরা ইহার মূল্য বুঝিতে পারে নাই, তাই এই সব যন্ত্রেও আঘাত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। কিন্তু য়ুরোপের মহাযুদ্ধে যে সব প্রতীচ্য জাতি রীমসের গির্জ্জা, লুভেনের পুস্তকাগার ও ঈপের ক্লথহল নষ্ট করিতে পারিয়াছে, তাহাদের কার্য্যের তুলনায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাঠদিগের এই সব যন্ত্র নষ্ট করিবার চেষ্টা বিশেষ নিন্দার্হ বলা যায় কি না সন্দেহ। শত বর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতা মানুষের প্রকৃতিতে প্রকৃত পক্ষে কতটুকু পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ দেশের লোক সমাধি-সৌধ নষ্ট করিতে দ্বিধা বোধ করিত। বোধ হয়, সেই জন্যই বহু শতাব্দীর রণক্ষেত্র—বহু যোদ্ধার ভাগ্যনির্ণয়প্রান্তর দিল্লীতে আজও বহু উৎকৃষ্ট সমাধিমন্দির দর্শকের নয়নরঞ্জন করিতেছে—বহুদিনের বহু স্মৃতি বহন করিয়া এই শ্মশানের মধ্যে

দাঁড়াইয়া আছে। দিল্লীর প্রান্তরে বহু বার বহু যুদ্ধের বন্যা বহিয়া গিয়াছে—জেতার জয়ধ্বনিতে ও বিজিতের আর্ত্তনাদে এই প্রান্তর ধ্বনিত হইয়াছে—আগ্নেয়াস্ত্র ও অগ্নিশিখা বহু শিল্পনিদর্শন নষ্ট করিয়াছে—সে সব পরাভূত করিয়া এই সব স্মৃতি-সৌধে কত স্নেহ, কত প্রেম, কত ভালবাসা, কত শ্রদ্ধা এক এক যুগের শিল্পাদর্শে আপনাকে বিকসিত করিয়াছে আজ কে সে সকলের স্বরূপ নির্ণয় করিবে? সে সবও এই সব সৌধে সমাহিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের মত আজ বিস্মৃত হইয়াছে—আছে কেবল পাষাণের উপর পাষাণের খণ্ড—আর তাহারই উপর স্মৃতির লেপ।

গর্দ্দানমারী

১

বর্দ্ধমানের মধ্যে আছে যেথায় সেথায় মানুষমারার ঠাঁই
সবার সেরা গর্দ্দানমারী তুলনা তার এ দেশেতে নাই।
আমার ঘাড়ে পড়্‌লো সেবার রেল-লাইনের জরিপ করা ভার;
অজ্ঞাতে মোর তাম্বু আমার পাত্‌লে এনে পাড়ের কাছে তার।
দেশটা ত নয় পরিচিত, কিন্তু আমার লাগ্‌লো বড়ই ভাল
অশথ গাছের কচি পাতার রঙের খেলায় চোক্ জুড়িয়ে গেল।
সম্মুখেতে মস্ত দীঘি, স্বচ্ছ কাকের চোখের মত জল,
যেমন গভীর তেম্‌নি শীতল দিন-যামিনী করছে টল টল।
তাম্বু থেকে ঢেউ দেখা যায়, পরাণ জুড়ায় চাইলে তাহার পানে;
জল-বিহগের কলকলেতে স্নিগ্ধ জলের পরশ বহে আনে।

২

রাত্রি বড়ই মজায় কাটে, ঘুম ভাঙ্গিলে স্তব্ধ গভীর রাতে
ছোটে বিয়ের পাল্‌কী বুঝি হিপ্লো হিপ্লো শব্দ আসে বাতে;
বিস্ময় দেশ বর্দ্ধমানে দিন ক্ষণ নাই নিত্য কি হয় বিয়ে!—
ঘুমের ঘোরে আপনি ভাবি, দিনের বেলায় ব্যস্ত কাগজ নিয়ে।
ছিল আমার সঙ্গী জনেক বৃদ্ধ আমিন বর্দ্ধমানেই বাড়ী
জিজ্ঞাসিনু কারণ তারে, জাগ্‌লো মনে আগ্রহটা ভারি।
বৃদ্ধ হেসে বল্‌লে, হুজুর জানেন, এটা গর্দ্দানমারীর পাড়,
পথিকগণের এই পথেতে পূর্ব্বকালে যাওয়াই ছিল ভার।
কতই পথিক যায়নি বাড়ী মাতা-পিতা পথ চেয়ে তার ছিল
কতই শ্রান্তক্লান্ত হিয়া জলের তলে ঘুম পাড়ায়ে দিল।

৩

শুনেছি মোর পিতার মুখে, যুবক জনেক, সাহস তাহারি ভারি,
পরিণয়ের দিনটি নিকট গৃহের পানে চল্‌ছে তাড়াতাড়ি।
কাল্‌কে তাহার গায়ে হলুদ অন্ধকার এই রাত্রিটুকুন গতে
সময় নাহি—সময় নাহি—বিলম্ব আর চল্‌বে নাক পথে।
চল্‌ছে যুবা সঙ্গে পাইক, এইখানেতে থাম্‌তে হ'ল তাকে,
ছানলাতলা সলিল শীতল, বাসর-শয়ন এই দীঘিরই পাঁকে।
ওই শিবিকার শব্দ আসে তখন থেকে স্তব্ধ গভীর রাতে
সুদূর গ্রামে শব্দ শুনে পল্লীবাসী চম্‌কে উঠে তা'তে।
শুন্‌লে সাড়া পথিক-বধূ মধুসূদন নামটি জপে জেগে,
প্রবাসী সব ছেলের মাতা কল্যাণ বর মাগেন ছেলের লেগে।

৪

থামল আমিন, কি এক ব্যথায় চোকের পাতা উঠ্‌ল তাহার ভিজে
শুনে তাহার বর্ণনা যে অন্ধকারে চক্ষু মুছি নিজে!
বারেবারেই পড়্‌ছে মনে অভাগিনী সেই কনেটির কথা,
অচেনা সেই মাতা পিতার অরুন্তুদ মর্ম্ম-কাতরতা।
সন্দেহ হয়, হয় ত ছিলাম জন্মান্তরে আমিই যুবা সেই
তাইতে এত কর্‌ছে কাতর, অসম্ভব ত কিছুই এতে নেই!
অনুভূতির নিবিড় ব্যথা স্মৃতির মত জাগ্‌ছে আমার প্রাণে।
ওই যে আবার সেই সে ধ্বনি হিপ্লো হিপ্লো শব্দ আসে কানে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
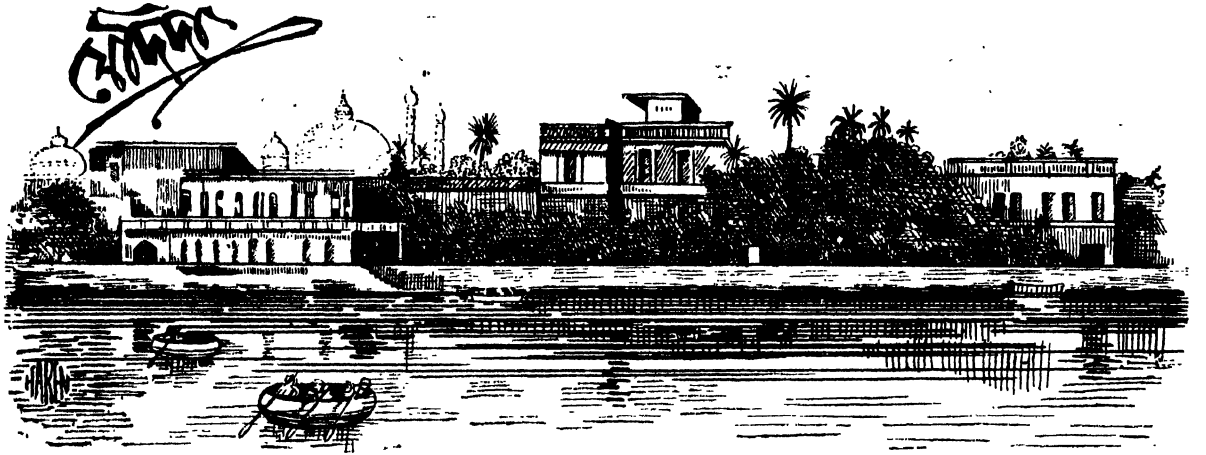
প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখী মধ্যাহ্ন। দীপ্ত-সূর্য্যকরে আকাশের নীলিমাও যেন বিবর্ণ। টাইগ্রীস নদীর দুই কূলে বাগ্দাদ সহরের শত মিনারের ও মসজেদের গম্বুজের চিক্কণ চিত্রিত ইষ্টক হইতে রবিকর যেন গলিয়া পড়িতেছে। পারাবতকুল গৃহের আলিসার ও গম্বুজের ফাঁকের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। পথে লোক অধিক নাই; কিন্তু দরিদ্রের দিন রাত—সকাল সন্ধ্যা বিচার করিলে চলে না; তাই ভারবাহী গর্দ্দভ চালাইয়া কেহ বা মসকে জল লইয়া, কেহ বা ইষ্টকাদি লইয়া যাইতেছে,—গর্দ্দভের গলরজ্জুবদ্ধ কাংস্যঘণ্টিকা ঠুন ঠুন করিয়া বাজিতেছে। নদীর ধারে দুই চারি জন আরব-রমণী দীর্ঘগল ধাতুপাত্রে জল লইতে আসিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য মুখ হইতে কাল বোরকার আবরণ সরাইয়া অঞ্জলিপুটে নদীর জল লইয়া মুখে দিতেছে—তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার বোরকায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। কিন্তু পথে ইহুদী রমণীদিগের বিচিত্রবর্ণের বাসসৌন্দর্য্য—জালের মত রেশমী অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সুরমা আঁকা নয়নের বিলোল কটাক্ষ—লক্ষিত হয় না। যে সব কাফিখানায় সকাল-সন্ধ্যায় ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা যায় না, সে সব কাফিখানা শূন্য। খিলান করা ছাতঢাকা বড় বড় বাজারেও কেমন তন্দ্রালস ভাব—শস্যের পটীতে সে হাঁকাহাঁকি; ফলের দোকানে সেই কাঁচা সোনার রঙ্গের বা রাঙ্গা লেবুর পশারিণীর সঙ্গে ক্রেতার রহস্যালাপ; সারি সারি দুম্বা ভেড়ার শবলম্বিত কশাইয়ের দোকানে সে দর কশাকশি; টকটকে ও চকচকে রঙ্গের রুমাল ও কাপড়ভরা দোকানে আরব, ইহুদী, কুর্দ্দ, কালদীয় মহিলার সমাবেশ; বাজারের চৌরাস্তার গম্বুজের নিম্নে দাঁড়াইয়া কাবাপরা পোদ্দারের টাকার ঝনঝনি, সে সব যেন কিছুক্ষণের জন্য স্তিমিত—স্তম্ভিত। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে উত্তাপের আতিশয্যে ইরাকে কায করা দুঃসাধ্য। কিন্তু মরুমধ্যে এই বাগ্দাদ সহর—আরব্য উপন্যাসের এই স্বপ্নপুরী—শ্যামশোভায় সুন্দর। বাগ্দাদের বাগানে তুঁত, লেবু, কমলা, আপেল, আঙ্গুর—এ সব খেজুরের অপেক্ষাও অধিক ফলে। বাগ্দাদের কাছে ইরাকের বড় বড় দুইটি নদী কাছাকাছি আসিয়া আবার দূরে গিয়াছে। টাইগ্রীসে জলের অভাব নাই—ইহার খর স্রোতঃ তীরের মত বলিয়া বিদেশীরা দাজলাকে টাইগ্রীস নাম দিয়াছিল। নদীর দুই কূলেই কেবল বান্ধান গোল ঘর; নদীর জল তাহাতে প্রবেশ করে, তাহার পর কপিকলে অথবা চাকাকলের চাকায় ঘোড়া বা গাধা যুতিয়া সেই জল তুলিয়া বাগানে দেওয়া হয়—সেই জলে বাগ্দাদ সহর ফুলে ফুলে শোভাময় হয়। এ সহর রক্ষণশীলতার কেন্দ্র হইলেও নূতনের প্রবাহ রোধ করিতে পারে নাই—কোন কোন বাগানে য়ুরোপে নির্ম্মিত পাম্পে জল তুলা হয়। অনেক ধনীর বাড়ীই নদীর কূলে—পোস্ত গাঁথিয়া নির্ম্মিত; বাগানের মধ্যে বাড়ী; বাগানে সাদা ও রাঙ্গা করবীতে গাছ নুইয়া পড়িয়াছে—অসময়েও গোলাব ফুটিতেছে—আঙ্গুরের লতায় নূতন পাতা—তুঁতের গাছে ধসর ঘুঘু ডাকে

সহর নদীর দুই কূলে অবস্থিত—তাই নদীর উপর দুইটি নৌ-সেতু। গ্রীষ্মে নদীতে বন্যা আসিয়াছে—অনেক স্থানে জল পোস্তের কাণায় কাণায় উঠিয়াছে। দুই সেতুর মধ্য-স্থলে—নদীর দক্ষিণ কূলে একটি প্রাসাদ; পোস্ত-গাঁথা জমীতে বৃহৎ উদ্যানের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আঙ্গুরের লতায় ঘেরা সারদাবের অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ কক্ষের হাওয়া-ঘর—তাহার পর বৃহৎ দ্বিতল গৃহ—অমল ধবল; চারি কোণে চারিটি মিনার, মিনারে পারস্যের গালিচার নক্সায় চিত্রিত মসৃণ ও উজ্জ্বল টালি বসান, মিনারের দুই থাকের মধ্যস্থলে বহু পারাবতের বাস। ইহাই আমীর আজীজের বাগ্দাদের বিলাস-গৃহ। আমীর আজীজ আরবিস্থানের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। তিনি সুচতুর, তাই পারস্যে ও তুর্কীতে বিরোধের সুযোগে তুর্কীর নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিলেও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতাই সম্ভোগ করিতেছেন। কোন পক্ষই তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করেন না—যিনি বলিবেন, তিনি তাঁহারই বিপক্ষে যাইবেন। অথচ তিনি যে প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, সেই প্রদেশের—তাঁহার রাজধানীর মধ্য দিয়া দুই রাজ্যেরই বাণিজ্যের পথ।

গ্রীষ্মকালে আমীর বাগ্দাদে আসিয়া থাকেন; তখন তাঁহার রাজধানীর গরম তাঁহার সহ্য হয় না। কি রাজধানীতে, কি বাগ্দাদে তাঁহার বাগান ও বাড়ী বড়; কেন না, তিনি দুইটি সামগ্রীর বড় অনুরাগী—কুসুম আর কামিনী। তাঁহার বাগানে দেশবিদেশের—আরবের, ভারতের, বিলাতের শত শত ফুলের গাছ। সে বাগান গোলাবের ক্ষেত্র—বেলার কুঞ্জ—করবীর কানন—কামিনীর ও কদম্বের কেয়ারী; আবার তাহাতে বিলাতী ভায়লেট, লইলাক—তাহাতে সূর্য্যমুখীর শোভা, অশোকের বীথি—তাহাতে চম্পকের সৌন্দর্য্য, রজনীগন্ধার সৌরভ। এই ত গেল গাছের ফুল—বাগানের শোভা। আমীরের গৃহের ফুল—শুদ্ধান্তের শোভাও তেমনই বিচিত্র। তুষারশুভ্রবর্ণা পারস্য-রমণী, তপ্তকাঞ্চনাভা কুর্দ্দ-কামিনী, দুগ্ধধবলবর্ণা আরবরমণী, গোলাবের আভা ইহুদী-ভামিনী; রক্তিমরাগসুন্দর কালদীয় নিতম্বিনী—এই সকলে আমীরের অন্তঃপুর পূর্ণ। তিনি সুরসিক—ঐ ফুলের নজীরে কামিনীর বিচার করেন। ফুল যেমন তুলিয়া আনিলে আর অধিক দিন ভাল থাকে না—ভাল লাগে না, রমণীও তেমনই হারেমে আনিলে আর অধিক দিন ভাল থাকে না—ভাল লাগে না। ফুল যেমন গৃহ সাজাইতে নূতন নূতন আনিতে হয়, রমণীও তেমনই। রমণীর যৌবনও ফুলের সৌরভসৌন্দর্য্যের মত দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। কিন্তু বাসি ফুল ফেলিয়া দেওয়া হয়—বাসি হইলে রমণীকে ফেলিয়া দেওয়া যায় না; তাই আমীরের বাড়ীও বড়; এই চল্লিশ বৎসরে যাহারা তাঁহার বিলাস-লালসা তৃপ্তির জন্য গৃহতরু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এই প্রেমহীন—সুখহীন কারাবাসে তাহারা প্রাচুর্য্য-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করে। বিলাসে, সজ্জায়, দাসীতে যদি নারীহৃদয়ের প্রেমতৃষ্ণা তৃপ্ত হইত, তবে সে তৃষ্ণা-তৃপ্তির সুযোগ তাহাদের ছিল। কিন্তু অনেকেরই হৃদয় ইরাকের মরুভূমির মত তৃষ্ণাতুর; অধিকাংশেরই সন্তানলাভ-সৌভাগ্যও হয় নাই। এমন অবস্থায় যাহা হয়, আমীরের শতরক্ষি রক্ষিত শুদ্ধান্তেও তাহাই হইয়াছে—মুক্তির জন্য ষড়যন্ত্র, গুপ্তপ্রেমের পাপলীলা, ফলে নরহত্যা—এ সবই হইয়াছে। কিন্তু আমীর মনকে বুঝাইয়াছেন, গোলাবে যেমন কণ্টক অনিবার্য্য, এ বিলাসে তেমনই এ সব ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং কণ্টকের জন্য গোলাব ফুল ত্যাগ করা আর এই সব ব্যাপারের জন্য বিলাস-লালসা বর্জ্জন করা সমানই নির্ব্বোধের কায। কুসুম আর কামিনী—ইহারাই পৃথিবীতে বেহেস্ত আনে অর্থাৎ ধরায় স্বর্গের সৃষ্টি করে—পরলোকের আশায় যাহারা ইহলোক অবহেলা করে, তাহারা যে মূর্খ, তাহা ত কবি ওমর খৈয়মই বলিয়াছেন—"নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও; বাকীর খাতায় শূন্য থাক্।" আমীর আজীজ এই মতাবলম্বী—তাই তিনি বিলাসবাসনা-পরিতৃপ্তির উপায় শিল্পী যেমন ভাবে শিল্পকৌশল অধ্যয়ন করে, তেমনই ভাবে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তাই তাঁহার বিলাসবাসনায় ইন্ধন যোগাইতে অনেক প্রজার গৃহে আনন্দের অবসান হইয়াছে। তাই তিনি ইরাকে প্রজার শঙ্কার কারণ।

আজ বৈশাখী মধ্যাহ্নে আমীর তাঁহার বাগ্দাদের বিলাস-গৃহে—সারদাবে বসিয়া ছিলেন। এই প্রদেশে সকল ধনীর গৃহেই সারদাব থাকে—গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন এই শীতল কক্ষে যাপিত হয়। আমীর আজীজের গৃহের এই সারদাব তাঁহার মত বিলাসীর উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত। একটিমাত্র বৃহৎ দ্বারে এই কক্ষের সোপানশ্রেণী শেষ হইয়াছে; দ্বাদশটি সোপান অতিক্রম করিলে হর্ম্যতলে উপনীত হওয়া যায়। কক্ষের এক দিকের প্রাচীর টাইগ্রীসের কূলে পোস্ত, তাহার উপর তিনটি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ—গ্রীষ্মকালে জল প্রায় সেই গবাক্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছে—যে বার বন্যা অধিক হয়, সে বার গবাক্ষ গাঁথিয়া বন্ধ করিতে হয়। কক্ষের ছাত নয়টি খিলান—মধ্যস্থ খিলানের মধ্যস্থল ছিদ্র করিয়া হাওয়া-ঘরের চোঙ্গ উঠিয়াছে—তাহাতে বহু ছিদ্র; সেই পথে কক্ষে বায়ু-চলাচল হয়। খিলান-গুলিতে নানারূপ ফল, ফুল, পাতা, লতা অঙ্কিত; পারস্যের যে সব নিপুণ শিল্পী বংশানুক্রমে গালিচার নক্সায় রঙ্গ মিলাইয়া সে কার্য্যে অশিক্ষিতপটুত্ব লাভ করিয়াছে, তাহারাই সে সব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। কক্ষপ্রাচীরে বহুমূল্য—কোমলবর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল গালিচা। হর্ম্ম্যতলে পুরু গালিচা—তাহার উপর জরীর কায করা মকমলের গদীমোড়া কয়খানি অনুচ্চ আসন; আর এক পার্শ্বে পুরু গদী। সেই গদীর উপর—কিংখাবের তাকিয়ায় অঙ্গভার রক্ষা করিয়া উত্তীর্ণ-প্রৌঢ়সীমা আমীর উপবিষ্ট। হাওয়া-ঘরের ছিদ্রপথে কৌশলে বিন্যস্ত মুকুরে প্রতিফলিত রবিকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে গালিচার গাঢ় বর্ণের উপর পড়িয়াছে; যেন আরব্য উপন্যাসের রাজকুমারী অভিমানে কণ্ঠাভরণ রত্নহার ছিন্ন করিয়া রত্নগুলি ছড়াইয়া গিয়াছে। আমীরের গদীর পার্শ্বে মর্ম্মরের চৌকীতে স্ফটিকের নারগিলা (ফুরশী)—তাহার মধ্যে গোলাবজল, আবলুসের নলিচার উপর আমারার সাবিয়ান শিল্পীর চিত্রিত কায করা রূপার কলিকায় মৃগনাভিগন্ধী তামাকু। রেশমের সূত্র ও জরী দিয়া মোড়া দীর্ঘ নলের মুখে তিনি এক একবার টান দিতেছেন; আর স্ফটিকের নারগিলার মধ্যে গোলাবজলে বুদ্বুদ উঠিতেছে। ঘরের চারি কোণে চারিটি রৌপ্যের মিনা-করা পুষ্পপাত্রে করবী, গোলাব প্রভৃতি কুসুম সজ্জিত—গন্ধে ঘরটি ভরপুর। গদীর উপরেই একটা বৃহৎ রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত বরফের মধ্যে স্বর্ণপাত্রে সরবৎ—তাহার উপর গোলাবের পাপড়ি ভাসিতেছে।

আমীরের গদীর পার্শ্বেই গালিচার উপর এক কিশোরী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দৃষ্টি ভূমিতলবদ্ধ—সে কাঁদিতেছে—অশ্রুতে তাহার নয়নশোভা সুরমা ধৌত হইয়া তাহার শ্বেত ওড়নায় মলিন বিন্দু অঙ্কিত করিতেছে। আমীর তাহাকে যতই সাদরে তাঁহার কাছে আসিতে বলিতেছেন, সে ততই কাঁদিতেছে। এই কুসুম আমীরের জন্য তাঁহার অনুচরর়া সিরিয়ান গৃহোদ্যান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। আমীর তাহাকে যতই সজ্জা ও আভরণ, দাসী ও ঐশ্বর্য্য, এ সকলের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সে ততই ক্ষোভে তরঙ্গতাড়িতা বেতসলতার মত কম্পিতা হইতেছে। দাসী তাহাকে কক্ষে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে—সে আপনাকে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন দেখিয়া কাতর হইতেছে। কি কৌশলে আমীরের অনুচরগণ তাহাকে এই গৃহে আনিয়াছে, সে কথা সে যতই মনে করিতেছে, ততই আমীরের প্রতি ঘৃণায় তাহার হৃদয় তিক্ত হইয়া উঠিতেছে—আর সেই আমীরের অন্তঃপুরিকা হওয়াই তাহার নিয়তি বুঝিয়া সে যেন সহস্র-বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। মানুষের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি সকল বিশ্বাস সে হারাইয়াছে।

এই সময় সারদাবের দ্বার মুক্ত হইল। এক যুবতী সোপানের উপর দেখা দিল। সে যে ইহুদী, তাহার বেশেই তাহা সপ্রকাশ। তাহার পোষাকের উপর একখানি ফিকা গোলাবী রেশমী চাদরের আবরণ—তাহাতে রক্তের মত লাল রঙ্গের চওড়া পাড়—তাহার মধ্যে গোটা গোটা সোনালী জরীর ফুল; সে আবরণ ইহুদী রমণীরা যেমন করিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া পরে, তেমন আর কোন জাতি পারে না—তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যেন আরও বর্দ্ধিত হয়। সেই আবরণের নিম্নে ফিকা নীল ফুলকাটা বাদামী রঙ্গের রেশমের গাউনের মত লম্বা জামা—পা পর্য্যন্ত লম্বিত; গোলাবী আভা-যুক্ত কণ্ঠের নিম্নে—পরিপূর্ণ-যৌবন দেহের উপর তাহা একটি হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার দিয়া আবদ্ধ—অলঙ্কারে দুইটি ঘুঘুপাখী পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। সেই গাউনের চওড়া "চিকণের" মধ্য দিয়া অঙ্গে অতি-পিনদ্ধ গাঢ় লোহিতবর্ণ সূতী কাপড়ের জামা দেখা যাইতেছে। চরণদ্বয় ফিরোজা রঙ্গের মোজায় আবৃত—মকমলের চটীজুতায় জরীর কাজ করা।

আমার আজীজ সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেদিদা * বেগম যে; না ডাকিতেই! আজ আমার বড় ভাগ্য।" তিনি হাসিলেন।

আমীরের কাছে দণ্ডায়মানা রোরুদ্যমানা কিশোরী ফিরিয়াও চাহিল না। তাহাকে দেখিয়া "বেদিদার" হৃদয়ে বিষম বেদনা বাজিয়া উঠিল। সে বেদনার কারণ দ্বিবিধ—প্রথম, এই কিশোরীর দুর্দ্দশায় সহানুভূতি—দ্বিতীয়, তাহার আপনার দুর্দ্দশার স্মৃতি। কিন্তু আজ সে মনের ভাব গোপন করিয়া আমীরকে ভুলাইতে আসিয়াছিল। নহিলে তাহার পক্ষে

* বেদিদার অর্থ নূতন।

মুক্তির মোকদ্দমার বুঝি আর কখন মুক্ত হইবে না—এই নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারলাভের শেষ আশাও বুঝি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। তাই "যেদিদা" হৃদয়োত্থিত ঘৃণার তরঙ্গমালা সংযত করিয়া একটু হাসিয়া কিশোরীকে দেখাইয়া বলিল, "আপনার ভাগ্য-পরিচয় ত আপনার সম্মুখেই। সে কথা কি আর বলিতে হয়?"

আমীর এত দিন কখন তাহার কাছে তিরস্কার ও ঘৃণা-ব্যঞ্জক বাক্য ব্যতীত আর কিছুই লাভ করেন নাই; আজ তাহার ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন; মনে করিলেন, "যেদিদা" তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছে—এত দিন লজ্জায় সে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে নাই, আজ এই কিশোরীর আগমনে ঈর্ষ্যা তাহার লজ্জা জয় করিয়াছে, তাই সে আপনার আদরলোপের শঙ্কাহেতু আপনি তাঁহার কাছে আসিয়াছে। তিনি হেনার পাতা দিয়া রঙ্গ করা দাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন—বলিলেন, "নামিয়া আইস। কিন্তু—আজ কি মনে করিয়া আসিলে?" শেষ কথাটায় শ্লেষের আভাসও ফুটিয়া উঠিল।

"যেদিদা" সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া বলিল, "আমীরের হারেমে যেদিদা দেখিতে আসিলাম।"

আমীর হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত! এবার তুমি আর 'যেদিদা' রহিলে না!"

যুবতী বলিল, "তাহাই বটে; কিন্তু দুনিয়ার নিয়মই এই—আজ যে নূতন, কাল সে পুরাতন; আপনিও এক দিন এই পৃথিবীতে নূতন ছিলেন, কিন্তু এই পঞ্চান্ন বৎসরে নিতান্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছেন—এখন অন্য স্থানে নূতন হইবার অপেক্ষা।" সে স্থানটা যে জাহান্নম (অর্থাৎ নরক), সে কথা যুবতী মনে জানিলেও মুখে বলিল না।

আমীর বলিলেন, "সে খোদার মর্জ্জি। এবার আমি তোমার নাম রাখিলাম—জোবেদা।"

"সে আপনার মর্জ্জি। কিন্তু নাম কেবল সনাক্ত করিবার জন্য। আশা করি, আপনাকে আমার নামের জন্য অত ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

আমীর উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি ত বড় অভিমানিনী। কিন্তু দেখ, আমীর আজীজের পুরাতন বেগমদিগের কাহারও কি কোন কষ্ট আছে? আমি সকলকেই সমান ভাবে রাখি; তাহাই কোরাণের নির্দ্দেশ।"

"ধর্ম্মে জনাবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা! কিন্তু আমার নাম লইয়া আপনি এত বিব্রত হইবেন না। আমার একটা নামও আছে।"

"হাঁ—কিন্তু সে নামটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বিশেষ ইহুদীদের মেয়েরা ভাল হইলেও তাহাদের নাম তত ভাল হয় না।"

"ভুলিবারই কথা বটে। যাহাদিগকে বড় বড় ব্যাপারের —নানা ষড়যন্ত্রের ভাবনা ভাবিতে হয়, নানা বিপদ্ ব্যর্থ করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে একটা ছোট কথা ভুলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।"

"সে নামটা কি?"

"রুথ।"

"ভাল, আমি এবার মনে রাখিব।"

"রাখিবেন।"

যে কিশোরী গালিচার উপর দাঁড়াইয়া কান্দিতেছিল, সে এ সব কথায় কর্ণপাত করিয়াছিল কি না, সন্দেহ। সে তেমনই অশ্রুপাত করিতেছিল। যখন আপনার দুঃখের মাত্রা অত্যন্ত অধিক হয়, তখন মানুষের মনে আর কোন চিন্তার স্থান থাকে না। যুবতী কিশোরীকে দেখাইয়া আমীরকে বলিল, "দেখিতেছি, বেচারা বড় কাতর হইয়াছে। এ পুরপ্রাচীর দৃঢ় ও সুরক্ষিত—ইহার মধ্যে জান্ যাইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্য হইতে পলায়ন অসম্ভব। তাই বলিতেছি, আজ ইহাকে এখন আদর হইতে অব্যাহতি দিয়া আপনার ভাগ্যচিন্তার অবসর দিলে হয় না?"

আমীর ভাবিলেন, রুথ চতুরা বটে; সে কিশোরীর প্রতি করুণার ছলে তাহাকে সরাইয়া আপনি আদর লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ঈর্ষ্যা এমনই ঔষধ! এইবার ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি বলিলেন, "তোমার আবেদন গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তুমি দেখিও—এ তোমার মত কঠিন হইবে না। ঐ যে ক্রন্দন, উহাই কোমলত্বের পরিচায়ক। তুমি এক দিনও কান্দ নাই—আর এত দিন একবার হাসও নাই।"

রুথ মনে মনে বলিল, "যে দিন তোমার মত মহাপাপীর জাহান্নম যাত্রার ব্যবস্থা করিতে পারিব—ইরাক হইতে দানব দূর হইবে—সেই দিন হাসিব।" প্রকাশ্যে সে বলিল, "তাহার কারণ কি জনাবের মত বুদ্ধিমান্ লোককেও বুঝাইতে হইবে? সূর্য্য যতক্ষণ আলো দেয়, ততক্ষণ তারায় আলো দেখা যায়

না; যেখানে আপনার হাসি ফুটিয়া থাকে, সেখানে কি আর কাহারও হাসি দেখা যায়?" এই কথা বলিয়া রুথ হাসিল।

আমীর দেখিলেন, রসিকা বটে। আর সে হাসিতে তাঁহার মনে হইল যেন, সহসা সারদাবের হাওয়াখানার আবরণ সরিয়া গিয়াছে—এক ঘর রৌদ্রে সেই স্বচ্ছান্ধকার সারদাব আলোকিত হইয়াছে। তিনি একবার রোরুদ্যমানা কিশোরীর দিকে চাহিলেন, আর একবার রুথের দিকে চাহিলেন। যে ফুল তিনি আজ অনেক কৌশলে হস্তগত করিয়াছেন, সেই নূতন ফুল অধিক সুন্দর, না এই যে পুরাতন ফুল পুরাতন হইয়াও নূতন—ইহার শোভা অধিক? এ ফুল তিনি আজ প্রায় ছয় মাস আহরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আজও তাহাকে সত্য সত্য লাভ করিতে পারেন নাই—সে নিকটে থাকিয়াও দূরে আছে—সে কেবল অসাধারণ সঙ্কল্প-দৃঢ়তাহেতু। সে যাহাই হউক, এবার তিনি তাহাকে পাইয়াছেন। আমীর ভাবিলেন, নারীপ্রকৃতি কতরূপই হয়! তিনি মনে করিতেন, তিনি নারীপ্রকৃতির সব রূপ সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সে অভিমান আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আদর—অনুনয়—প্রলোভন কিছুতেই তিনি তাহাকে বশ করিতে পারেন নাই, আজ ঈর্ষ্যা তাহাকে এমনই পরাভূত করিয়াছে যে, সে আপনি সাধিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে আসিয়াছে! নারীপ্রকৃতি সমুদ্রের মত বহুরূপী—আল্লা দুনিয়ার সব রহস্যের সার লইয়া রমণীর হৃদয় গড়িয়াছেন। আমীর উচ্চারণ করিলেন—"লাইলাহা এল্লাল্লা হো"—অর্থাৎ ঈশ্বর একমাত্র, এক বই ঈশ্বর নাই। হায় ধর্ম্ম, এ পৃথিবীতে ভণ্ডের হাতে তোমার যে লাঞ্ছনা হয়—ধর্ম্মদ্বেষীও তোমায় সে লাঞ্ছনা করিতে পারে না।

রুথ রোরুদ্যমানা কিশোরীকে ডাকিল।

আমীর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আমি বাঁদীকে ডাকিয়া উহাকে পাঠাইয়া দিতেছি; তোমায় যাইতে হইবে না।"

রুথ হাসিয়া বলিল, "কেন, ভয় করিতেছেন—সুদ আসল—দুইই যদি যায়?"

"সুদের কথা ইহুদীরা জানে—আমার কাছে উহা হারাম।"

"কিন্তু ইহুদীরা কি মূলে হাভাত করে?"

রুথ যে আসিবার সময় দূরে সংবাদবাহীর উষ্ট্র লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিল এবং কথার কথা বাড়াইয়া বাঁদী কখিদার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, আমীর তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সারদাবের দ্বার মুক্তই ছিল। বাঁদী আসিয়া সেলাম করিয়া জানাইল, রাজধানী হইতে দপ্তর আসিয়াছে।

আমীর তাহাকে বলিলেন, সে যেন কিশোরীকে তাহার ঘরে রাখিয়া দপ্তর লইয়া আইসে। রুথের দিকে চাহিয়া তিনি প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আজ তুমি আমার সরবৎ লইয়া আসিবে।" অর্থাৎ আজ তুমিই রাত্রিতে আহারান্তে পানপাত্র লইয়া আমার শয়নকক্ষে আসিবে।

রুথ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। সে জানিত, আমীর আজীজ যেমন বিলাসী, তেমনই রাজনীতিক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাশালী। দপ্তরের সংবাদ পাইলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি যখন বাগ্‌দাদে থাকেন, তখন প্রতিদিন উষ্ট্রের ডাক বসাইয়া রাজধানীতে সংবাদ গতায়াতের ব্যবস্থা থাকে। আমীর শ্যেনদৃষ্টিতে রাজনীতিক গগনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। আরবিস্থানে তাঁহার মত পাকা খেলোয়াড় অধিক নাই। আরবিস্থানের যে তরঙ্গভঙ্গভীষণ রাজনীতিপ্রবাহে অনেকের ভাগ্যতরী ডুবিয়াছে, তাহাতেই তরী ভাসাইয়া তিনি সাফল্যের বন্দরে উপনীত হইয়াছেন।

রুথ আজ এই খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; পণ—মুক্তি। জিতিলে মুক্তি—জীবনের সাফল্য—যৌবনের স্বপ্নসার্থকতা—প্রেমের স্বর্গ; হারিলে মৃত্যু—যন্ত্রণাময়—অত্যাচারভীষণ—নরক। কিন্তু সে খেলার উত্তেজনায় মত্ত হয় নাই—সে আশার উত্তেজনায় মাতিয়াছে। ভাবের বশে সে অভাবের কথা আর মনে করিতে পারিতেছে না। যদি মুক্তিলাভ না ঘটে, তবে মৃত্যুতে তাহার ভয় কি? তাই সে চাতুরীর পথ লইয়াছে—সঙ্কোচ ও সংস্কার দৃঢ়সঙ্কল্পে পরাভূত করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সারদাব হইতে আপনার কক্ষে যাইয়া রুথ আপনার শয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন যে প্রবল চেষ্টায় সে এতক্ষণ কায করিয়া আসিয়াছে, সে চেষ্টার অতি-দাহে তাহার হৃদয়ে শক্তির দীপ তৈলশূন্য হইয়াছে—এখন হৃদয়ে কেবল ধূমান্ধকার। এই ছয় মাস সে নরকে বাস করিয়াছে—মুহূর্ত্তের জন্য মস্তিষ্ক হইতে

যড়্‌যন্ত্র দূর করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ যেন সে আর পারিতেছে না। যাহার জন্ত সে নারীর সর্ব্বস্ব প্রাণান্ত যত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—সকল প্রলোভন পদদলিত করিয়াছে—সকল কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিয়াছে, আজ সে তাহাকে পাইবার সুযোগলাভের জন্যই সেই সর্ব্বস্ব মূল্যরূপে দিবার ছল করিতে যাইতেছে। কে তাহাকে বলিয়া দিবে—সে অপরাধিনী, কি না? দেবমন্দিরে উপনীত হইয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য যে পূজারিণী দেবতার নৈবেদ্য দিয়া মন্দিরপথে সারমেয়কে ছলিতে বাধ্য হয়, দেবতা কি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া, তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন? কে তাহার সন্দেহের অবসান করিবে? সে ভাবিতে লাগিল—ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, ভালবাসা—এ সব হৃদয়ের; এ সব নিত্য বস্তু—দেহ অনিত্য ও অসার। সুতরাং যাহার হৃদয় নির্ম্মল থাকে, সে দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারে। সে মুহূর্ত্তের জন্তও তাহার হৃদয়ের পবিত্রতা হারায় নাই; কোন দিন লালসায় বা প্রলোভনে তাহাতে আবিলতা স্পর্শিতে দেয় নাই। সে যে এত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে ত কেবল সেই পবিত্রতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্তই; আজ সে যে খেলা খেলিতে সাহস করিতেছে, সে-ও ত তাহারই জন্ত। তবে আজ তাহার মনে এ সন্দেহের চাঞ্চল্য কেন? হায় জীবনদেবতা, যৌবনের বাঞ্ছিত, নারীজীবনের সর্ব্বস্ব—যে তোমাকে পাইবার জন্য তাহার সব হারাইতেও প্রস্তুত, তুমি কি তাহার দৌর্ব্বল্য ক্ষমা করিয়া তাহাকে তোমার প্রেমে ধন্য করিবে না? তুমি ত অকরুণ নহ।

ফরিদা দাসী যখন রুথের কক্ষে প্রবেশ করিল, রুথ তখন দুই করে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া কান্দিতেছিল। ফরিদা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি হুকুম?"

এই ফরিদা দাসীর কথা পাঠককে একটু শুনিতে হইবে। যে পুস্তেকো পর্ব্বতমালা আরবিস্থানে পারস্তের সীমানির্দ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান, সেই পুস্তেকোর পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে এক মাসের একটি শিশু কন্যা লইয়া ফরিদার মাতা একটি শিশুকে স্তন্য দান করিবার জন্য আমীর আজীজের অন্তঃপুরে নীতা হইয়াছিল। এ স্থলে নীতা অর্থে ক্রীতা; কারণ, এ প্রদেশে দাসদাসী তৈজসপত্রের মত কিনিতে হয়; কাহার মূল্য কত লীরা (তুর্ক স্বর্ণমুদ্রা), তাহা পণ্যের ও ক্রেতার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে চুক্তি-বিবাহের চলন অত্যন্ত অধিক—দুই ঘণ্টা হইতে বিশ বৎসর—সব সময়ের চুক্তিতে বিবাহ হয়। সে বিবাহ সে স্থানে আইন-সঙ্গত ও সদাচার-সম্মত। যে কেহ যে কোন গ্রাম দিয়া যাইবার সময় কন্যার অভিভাবকের সঙ্গে দাম সাব্যস্ত করিয়া এমন বিবাহ করিতে পারে; নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর বিবাহবন্ধন আপনা আপনিই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ফরিদার মাতা তেমনই একটা চুক্তি-বিবাহে কন্যালাভ করিয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আমীরের অন্তঃপুরে আসিয়াছিল। সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু সে যখন অন্তঃপুরে আসিয়াছিল, তখন শিশু কন্যা ব্যতীত তাহার আরও সম্পদ ছিল; সে—তাহার রূপ। একমাত্র সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রদুহিতার সে রূপ বিকৃত হয় নাই। অথচ এরূপ ধনীর অন্তঃপুরে এই সম্পদই সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। আমীরের অন্তঃপুরে আসিবার পাঁচ বৎসর পরে ধাত্রীর গর্ভে ফরিদার জন্ম হয়। সে এই অন্তঃপুরেই জাত ও বর্দ্ধিত বলিয়া সে আর দাসীর মত কুণ্ঠিত-ভাবে থাকে না—অনেক বেগমের অপেক্ষা তাহার প্রতাপ অধিক। বিশেষ আমীর তাহাকে শৈশবাবধি স্নেহ করিয়া থাকেন—সময় সময় তাহাকে কন্যা বলিয়া সম্ভাষণও করিয়া থাকেন। এ স্নেহের প্রকৃত কারণ যাহাই কেন হউক না, ইহাতেই অন্তঃপুরে তাহার প্রতাপ প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে; দাস-দাসীরা তাহাকে ভয় করে, অনেক বেগমও তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে প্রয়াস করিয়া থাকেন। কারণ, এ সব স্থানে ভাল কেহ করিতে পারুক আর না-ই পারুক, মন্দ সকলেই করিতে পারে; তাহাতে আবার অন্তঃপুরে ফরিদাই আমীরের কাছে বাহিরের সব সংবাদ দেয় বলিয়া আমীরকে যখন তখন যে কোন কথা শুনাইবার সুযোগ তাহার যত অধিক, তত আর কাহারও নহে। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে অন্তঃপুর হইতে কোন বেগমের অন্তর্ধান ঘটে। সন্দেহহেতু ফরিদার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিষ পান করান হয়। এক দিন নিশীথে অন্তঃপুরে প্রধানা বেগমের অধিকৃত অংশের নিকটস্থ উদ্যানে দুই জন লোক চন্দ্রালোকে একটি গর্ত্ত খনন করে—প্রভাতে সে গর্ত্তের আর কোন চিহ্ন থাকে নাই। কিন্তু প্রধানা বেগম তদবধি সে মহল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। কারণ, প্রেতাত্মার সম্বন্ধে তাঁহার বড় ভয়। এই ঘটনায় ফরিদার মাতার ক্ষমতার অবসান হয় এবং বড় বেগমের কন্যার বিবাহের পর তাহাকে তাহার শ্বশুরালয় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ফরিদার প্রতি

আমীরের স্নেহের হ্রাস হয় নাই। সে পূর্ব্ববৎই অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বিরাজ করিতেছে। আশা করি, এই পরিচয়ের পর পাঠক আর মনে করিবেন না—ফরিদা ধীরা—সুশীলা—সৎস্বভাব-সম্পন্না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে হারেমের গুপ্ত পাপের শিক্ষাও পাইয়াছে ;—আর শিক্ষা পাইয়াছে—ক্ষুরধার কথার। ইহার উপর আবার তাহার বিশ্বাস, সে চতুরা ও সুন্দরী ; বিশেষ উজীরের পুত্র এক দিন তাহার দিকে চাহিয়া হাসা অবধি আপনার রূপের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস যেন আরও বাড়িয়াছে। রুথ এই ফরিদাকে তাহার খেলার অস্ত্র করিবে।

ফরিদা আসিয়া যখন বলিল, "আমাকে কি হুকুম ?" তখন রুথ চক্ষু মুছিল, উঠিয়া যাইয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, তাহার পর গালিচামোড়া মেঝেয় ফরিদার কাছে বসিয়া তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল। এই গৃহে নীত হইবার পর ফরিদার প্রভাব ও প্রতাপ বুঝিতে বুদ্ধিমতী রুথের বিলম্ব হয় নাই। সেই অবধি সে তাহার সঙ্গে সখীর মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। স্নেহে বনের পশুও বশ হয়, মানুষ ত কোন্ ছার। তাই ফরিদা আমীরের প্রতি রুথের অকরুণ ব্যবহারে বিস্মিতা হইলেও তাহার সঙ্গে সদ্ব্যবহারই করিত। তাহার মত রমণীর পক্ষে মনে করাই স্বাভাবিক যে, আমীর আজী-জের শতাধিক বেগমের মধ্যে এক জন হওয়াও সৌভাগ্য। কাযেই সে রুথের ব্যবহারে বিস্মিতা হইত। বিশেষ জন্মাবধি সে দেখিয়া আসিয়াছে, অনেক নবানীতা সুন্দরী প্রথমে যতই কেন বিলাপ করুক না, শেষে অদৃষ্টের সঙ্গে সপত্নীভাব পরিহার করিয়া এই জীবনেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। কেবল রুথে সে সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়াছে। সে যাহাই হউক, রুথ এতদিন তাহার সঙ্গে সখীবৎ ব্যবহার করিয়াছে বলিয়াই আজ সাহস করিয়া তাহাকে আপনার মনের কথা বলিতে সাহস করিল।

রুথ জানিত, ফরিদার বিশ্বাস—সে বড় বুদ্ধিমতী। সে তাহার সেই দৌর্ব্বল্যটুকু আপনার কাযে লাগাইবার জন্য প্রথমেই তাহাকে বলিল, এ কায অন্য কেহ—বাঁদী বা বেগম—চেষ্টা করিলেও করিতে পারিবে কি না, সন্দেহ ; কিন্তু ফরিদা ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিবে ; কেন না, দুনিয়ায় বুদ্ধিই বল, আর কিছুই কিছু নহে। ইহাতে ফরিদা যে সন্তুষ্ট হইল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই—যে ব্যাপারে তাহার ভগিনীকে জীবন দিতে হয়, সে ব্যাপারে সে হইলে কেমন করিয়া নিষ্কৃতি পাইত, তাহা রুথকে বুঝাইতে বসিল। তত কথার সময় তখন রুথের না থাকিলেও সে ধীরভাবে সব শুনিল এবং ফরিদার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাহাকে আপনার প্রস্তাব বুঝাইতে লাগিল।

রুথের প্রস্তাবে এক দিকে যেমন ফরিদার শঙ্কা জন্মিতে লাগিল, আর এক দিকে তাহার স্বভাবজ ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা তেমনই উত্তেজিত হইতে লাগিল। রুথের প্রস্তাব শুনিয়া সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। রুথ ভাবিল, তাহার শেষ আশাও বুঝি নির্ব্বাপিত হইল—ফরিদা তাহার কথায় সম্মত হইল না। যে নদীর খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে কাষ্ঠখণ্ড ধরিতে পায়—সেই অবলম্বন সহসা সরিয়া গেলে তাহার যে অবস্থা হয়, রুথের সেই অবস্থা হইল ; তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ততক্ষণে কিন্তু ফরিদার হৃদয়ে ষড়যন্ত্রের আকর্ষণ জয়লাভ করিয়াছে। সে বলিল, "তোমার জন্য যদি জান্ দিতে হয়, তাহাও দিব ; কেন না, তুমি আমাকে ভালবাস।"

রুথ ফরিদাকে সাগ্রহে বক্ষে টানিয়া লইল।

কিন্তু যাহাকে সংবাদ দিতে হইবে, তাহার পরিচয় প্রদান-কালে তাহাকে সনাক্ত করিবার চিহ্ন—তুর্কী টুপীর উপর সাদা ও সবুজ কাপড়ের পাগ্ড়ীর কথা রুথ যখন তিন চারিবার বলিল, তখন ফরিদা রাগ করিল। সে বলিল, "তুমি কি আমাকে বোকা ঠাহর করিয়াছ যে, একই কথা সাতবার বলিতেছ ? যদি তাহাই মনে কর, তবে বিশ্বাস করিয়া এমন কাযের ভার দিও না।"

রুথ বলিল, "আমার অপরাধ লইও না। যদি ভুলিয়া যাও, তাই বলিতেছিলাম।"

"ভুলিবার হইলে অনেক কথাই ভুলিতে পারি। আমি কি আর জানি না, সাদা পাগ্ড়ী মোল্লার, সবুজ সৈয়দের ?"

রুথ একটি অঙ্গুরী ও কাগজ ফরিদাকে দিল।

ফরিদা কাল বোরকায় অঙ্গ আবৃত করিয়া বাড়ীর বাহির হইল। দ্বারে হাবসী প্রহরী কোমরবন্ধে ছোরা ও পিস্তল ঝুলাইয়া—বন্দুক ঘাড়ে ফেলিয়া পাহারা দিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে যায় ?"

মুখের উপর হইতে বোরকার অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া ফরিদা বলিল, "মরণ্ ! আর কি ! চোখে দেখিতে পাও না ?"

প্রহরী রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তোমার দিকে চাহিতে পারি, এমন চোখ কি আমার আছে?"

"তবে ও দুইটায় শলা বিঁধাইয়া দিলেই পার"—বলিয়া ফরিদা চলিয়া গেল।

প্রথমেই সে উদ্যান যাইতে নদীর দ্বিতীয় সেতুতে উঠিল এবং দ্রুতপদে সেতু পার হইয়া তীরে অবতরণ করিল। তথায় সে বোরকার মুখাবরণ একটু সরাইয়া এদিকে ওদিকে চাহিয়া কাহার সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে অধিক সন্ধান করিতে হইল না—সে যাহার সন্ধান করিতেছিল, সে সেতুর মূলেই রেলে ভর দিয়া তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে ইহুদী যুবক—বেশ য়ুরোপীয়ের মত, অথচ মস্তকে তুর্কী টুপী—তাহার উপর সাদা ও সবুজ কাপড়ের পাগ্‌ড়ী। সে যে ইচ্ছা করিয়া—কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনজন্য এমন অসাধারণ শিরাবরণ পরিধান করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ফরিদা যুবকের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দায়ুদ হারুন?"

যুবক ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাহ?"

ফরিদা বলিল, "আমি কিছু চাহি না; আমি সংবাদ আনিয়াছি।"

"কাহার সংবাদ?"

ফরিদা অঙ্গুরী ও পত্র দিল।

যুবক অঙ্গুরীটি ভাল করিয়া দেখিল—চিনিল। সে অঙ্গুরীটি চুম্বন করিয়া পত্র খুলিল। পত্রে আমীর আজীজের বাগ্‌দাদের গৃহের একটি মোটা নক্সা—বাগানের পরে একটি গুপ্তদ্বারে একটি চিহ্ন—আর লিখিত, "রাত্রি দ্বিপ্রহর।"

যুবক ফরিদাকে নক্সার চিহ্ন দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই দ্বারে?"

ফরিদা বলিল, "হাঁ।"

যুবক অঙ্গুরী ফিরাইয়া দিল—ফরিদাকে একটি লীরা পুরস্কার দিল। তাহাদের কাছে যাহারা দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল, তাহারা মনে করিয়াছিল, ফরিদা ভিখারিণী। কিন্তু যুবককে লীরা পুরস্কার দিতে দেখিয়া তাহারা বুঝিল—এ ভিখারিণী যেমন তেমন ভিখারিণী নহে—তাহার ভিক্ষাও একটু অসাধারণ।

যুবক চলিয়া গেল।

ফরিদা সহরের বড় বাজারে প্রবেশ করিল।

তখন বাজার আবার জমিয়াছে—ক্রেতা, বিক্রেতা, দালাল, বেকার সকলেই ঐ বাজারে। পথের দুই পার্শ্বে দোকান। জুতার দোকানে ক্রেতা লাল চামড়ার বাগ্‌দাদী চটীজুতা পায় দিয়া দেখিতেছে; কাপড়ের দোকানে রমণীরা অবগুণ্ঠন সরাইয়া রঙ্গ মিলাইয়া কাপড় বাছিতেছে; দর্জ্জির দোকানে ইহুদী রমণী কার্ণিশের মত অবগুণ্ঠন তুলিয়া চাদর সেলাই করিয়া আবরণ প্রস্তুত করিতে দিতেছে; আরমাণী পুরুষ ও রমণীরা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে; মাংসের দোকানে ক্রেতা দর ঠিক করিয়া কিনিবার আগে এক টুকরা মাংস আগুনে ঝলসাইয়া চাকিয়া পরখ করিতেছে; তরকারীর দোকানে বৃদ্ধা আরব ও ইহুদী রমণীরা উচ্চস্বরে রশুনের বা কুমড়ার দর করিতেছে; ফলের দোকানে ছেলের ভীড়; পথের উপর দাঁড়াইয়া কাবা প্রভৃতি জামা-বিক্রেতারা আপনাদের পণ্যের উৎকর্ষ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে; পথের উপর বসিয়া আরবরমণী খেজুরপাতার ঝুড়ী হইতে ডিম তুলিয়া ডিমের মত সাদা হাতে খরিদদারকে দেখাইতেছে; লোক পথের উপর বসিয়াই ছোট ছোট কাচপাত্রে কফি পান করিতেছে। পথের উপর ঝুড়ী ঝুড়ী রুটী। কাষ্ঠবিক্রেতা যে পণ্যভার পৃষ্ঠে বহিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার তলে তাহাকে দেখাই দুষ্কর। মধ্যে মধ্যে গর্দ্দভের পৃষ্ঠে ভার চাপাইয়া বা গর্দ্দভে চড়িয়া লোক সেই ভীড়ের মধ্য দিয়াই যাইতেছে; তাহাদের "বালিক" (সাবধান) ধ্বনি শুনিয়া লোক সরিয়া যাইতেছে।

বাজারে প্রবেশ করিয়া ফরিদা দুইটা মোড় ঘুরিয়া এক বেণে-মসলার দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখের উপর হইতে বোরকার আবরণ সরাইয়া একটা মসলা চাহিল। "জিনিষ ভাল নহে"—"দর বেশী" প্রভৃতি অনেক কথার ও তর্কের পর সে এক কেরাণের (সিকি বা চৌআনী) জিনিষ কিনিল। জিনিষের মোড়কটা বোরকার মধ্যে কোমরবন্ধে রাখিয়া ফরিদা যখন দামের জন্য একটা মোহর ফেলিয়া দিল, তখন দোকানী বলিল, "এক কেরাণের মাল বেচিয়া লীরা ভাঙ্গাইয়া দিতে পারিব না।"

ফরিদা চড়া গলায় বলিল, "কেন, বাগ্‌দাদের বাজারে কি পোদ্দার নাই?"

দোকানী এক কেরাণের খরিদ্দারের কাছে এত কথা শুনিতে প্রস্তুত ছিল না; সে বলিল, "পোদ্দার ব্যবসা করে; বিনা বাট্টায় ভাঙ্গাইয়া দিবে না। বাট্টা কে দিবে?"

চোখের খেলায় ফরিদা ওস্তাদ ছিল। সে চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "যে এক কেরাণের মাল বেচিয়াছে, সে যে দিবে না, —যে লীরায় দাম দিয়াছে, সে-ই দিবে, ইহা সব মানুষই বুঝিতে পারে; কেবল গাদার বুদ্ধিতেই তাহা প্রবেশ করিবে না।"

ফরিদার রকম দেখিয়া দোকানী একটু রহস্যালাপের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না; বলিল, "তোমার ঐ হাসির বাট্টা পাইলে পোদ্দার চাহি কি অন্য বাট্টার দাবী না-ও করিতে পারে।"

ফরিদা জবাব দিতে যাইতেছিল, এমন সময় পথের অপর পারের দোকান হইতে দোকানী বলিল, "কি, সাদিক?" অপর পারে একখানা বড় গালিচার দোকানে বসিয়া প্রৌঢ়-বয়স্ক পারসী বণিক যেন নিতান্ত নিবিষ্টচিত্তে—তন্ময় হইয়া সোনার রঙ্গের স্ফটিকের মালা জপ করিতেছিল। দেখিলে মনে হয়, সে পরকালের চিন্তাই সার করিয়াছে—ইহকালে তাহার আর কোন আকর্ষণ নাই। সেই ভণ্ড সব শুনিয়া দোকানীকে বলিল, "কি, সাদিক?"

দোকানী বলিল, "এক কেরাণের জিনিষ বেচিয়াছি; লীরা ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে।"

"ভাল; আমার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

ঐ "পাঠাইয়া দাও" শুনিয়াই দোকানী বুঝিল, বণিক ফরিদার ক্ষুরধার কথা শুনিতে চাহে। সে ফরিদাকে লীরা দিয়া বলিল, "ঐ দোকানে ভাঙ্গাইতে পাইবে।"

বণিক লীরা লইয়া ভাঙ্গাইয়া দিল; দিয়া বলিল, "বাট্টা?"

ফরিদা জিজ্ঞাসা করিল, "কত?"

"সে ক। ত তোমার দোকানী বলিয়াছে।"

ফরিদা উ র দিল, "সে বাট্টা মানুষের জন্য। কিন্তু বাগ্‌-দাদের এ বাজারে ত গাদাই দেখিতেছি। তুমি কি বাট্টা লইবে বল।"

"আমি বাট্টা লইব না—আমার লীরা গাঁথান দরকার; বল ত বরং আমি কিছু বাট্টা দিতে পারি। কিন্তু মাপ করিও—একটা কথা বলিব, তুমি যে কেবলই গাদা দেখিতেছ, বোধ হয়, তোমার চোখ ঠিক নাই—ছানি কাটাইতে হইবে। তাহার আগে দিন কতক চোখে ভাল সুরমা লাগাইও।"

"তুমি কি দাওয়াইয়ের বেসাতীও কর, না কি? এবার ইস্পাহান হইতে আসিবার সময় কিছু ভাল সুরমা আনিও,—গালিচার অপেক্ষা অধিক বিকাইবে।"

"খরিদদারও ভাল মিলিবে।"

ফরিদা দোকানীকে এক কেরাণ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় দোকানী তাহাকে বলিল, "উনি না হয় নিজের গরজে ভাঙ্গাইয়া দিলেন,—বাট্টাটা আমি পাইতে পারি।"

ফরিদা মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "আর এক দিন দিয়া যাইব।"

দোকানী উত্তরে বলিল, "আমি ধারে কারবার করি না; অনাদায় লিখিলাম।"

[ক্রমশঃ।

ওমরের পথে।

মেল নিদ্রানিমীলিতনীলাব্জ-নয়ন,
প্রাচীমূলে ফুটে—হের, তরুণ তপন;—
আপনার ছায়াত্রস্তা কুরঙ্গিনী সম
অন্ধকার ধরা ত্যজি' করে পলায়ন।

সুপ্তিপরে চেতনার প্রথম আভাস—
বিহগ-বিরাবে তা'র স্বাগত-সম্ভাষ;
গলিত কাঞ্চন আভা পূর্ব্বমেঘজালে—
রঞ্জিত বিচিত্র বর্ণে উষার আকাশ।

গেছে কাল, লয়ে তা'র সুখ, দুঃখ, ভয়;
আজি এ নূতন ধরা—নব আলোময়;
সঞ্চিত আশঙ্কা আশা কাল ছিল যত—
অতীত অতলে কোথা পেয়েছে বিলয়।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সুখের আশায়,
কে ত্যজিবে বর্ত্তমান এ মর ধরায়?
আজ আমি আছি, আছে বিচিত্র এ ধরা-
কে জানে নিয়তি কাল লইবে কোথায়?

ভারতের তার্পিণ।
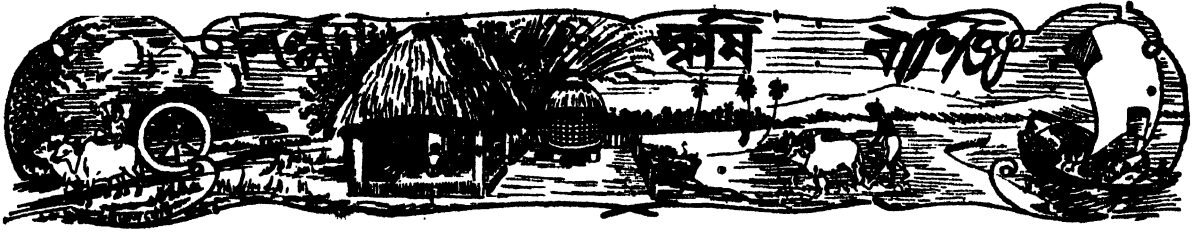
নিত্য ব্যবহারে আমরা অনেক জিনিষের উৎপত্তি ও অভিনবত্ব ভুলিয়া যাই। আজ কেরোসিনের আলো ঘরে ঘরে জ্বলিতেছে; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেরোসিন দ্রব্যটা কি, তাহা কয়জন জানিতেন? পাথুরিয়া কয়লা সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। আমাদের প্রবন্ধের বিষয়ীভূত তার্পিণের ঔষধার্থ ব্যবহার নিরক্ষর পল্লীবাসী পর্য্যন্তও অবগত আছে। তার্পিণের চলন কিন্তু প্রায় ইংরাজ শাসনের সমসাময়িক। পূর্ব্বে ইহা কেবল বিদেশ হইতেই আসিত। ভারতে তার্পিণ উৎপাদন নিতান্তই আধুনিক।

হিন্দুকুশ হইতে আরম্ভ করিয়া আসামের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় পর্ব্বত-শ্রেণীর ক্রোড়ে বিশাল উদ্ভিদ-সমষ্টির মধ্যে পাইন অন্যতম বৃক্ষ। হিমালয়ের স্থানবিশেষে এক এক জাতীয় পাইনের আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৬০০০ ফুট পর্য্যন্ত চিড় (Pinus longifolia) এবং তদূর্দ্ধে কায়ড়ু (Pinus excelsa) প্রভূত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। উত্তর-পূর্ব্ব হিমালয়ে এই দুই জাতীয় পাইনের স্থান খাসিয়া চিড় (Pinus Khasya) নামক অন্য পাইন জাতির দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। যে জাতীয় পাইনই হউক না কেন, সকলের কাণ্ডে ক্ষত হইলেই এক প্রকার নির্য্যাস বহির্গত হয়। এই নির্য্যাস গন্ধবিরোজা নামে পরিচিত। গন্ধবিরোজা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। পুত্তল-প্রতিমাদির সাজ সজ্জা যুড়িবার জন্য গন্ধবিরোজা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদেও গন্ধবিরোজার উল্লেখ আছে। গন্ধবিরোজাই তার্পিণ ও রজন উৎপাদনের কাঁচা উপাদান।

ভারতে যে তার্পিণ প্রস্তুত হইতে পারে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা কেহ মনে করিতেন না। তখন পার্ব্বত্য অঞ্চলে চিড় প্রধানতঃ কাষ্ঠরূপেই ব্যবহৃত হইত এবং স্বভাবলব্ধ সামান্য পরিমাণ গন্ধবিরোজা বাজারে বিক্রয় হইত; দেশে ব্যবহৃত সমস্ত তার্পিণ ও রজনই বিদেশ, প্রধানতঃ মার্কিণ হইতে আসিত। সরকারী বন-বিভাগের ইহা গৌরবের বিষয় যে, উক্ত বিভাগের কতিপয় কর্ম্মচারী বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতে তার্পিণ উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন। মার্কিণে Pinus Strobus নামক গাছ হইতে গন্ধবিরোজা সংগৃহীত হইয়া থাকে। সেই নিদর্শনে ভারতের চিড়-কায়ড়ুর কাণ্ডে কৃত্রিম ক্ষত করিয়া অথবা দাগ দিয়া নির্য্যাস নিঃসরণের ব্যবস্থা করা হয়। কতিপয় বৎসর পরীক্ষার ফলে জানিতে পারা যায় যে, চিড় ও কায়ড়ু হইতে যথেষ্ট পরিমাণে গন্ধবিরোজা পাওয়া যাইতে পারে এবং তার্পিণ ও রজন প্রস্তুতের জন্য উক্ত গন্ধবিরোজা সর্ব্বতোভাবে উপযোগী।

যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার গ্রীষ্মাবাসস্থল নৈনিতাল, বোধ হয় কেহ কেহ দেখিয়াছেন। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৩৫০ ফুট উচ্চ। নৈনিতাল হইতে আরও ১২ মাইল দূরে চিড়, কায়ড়ু, বাণ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পাদপপূর্ণ গিরিশৃঙ্গরাজি পরিবেষ্টিত হইয়া ভাওয়ালী নামক ক্ষুদ্র জনপদ অবস্থিতি করিতেছে। এই স্থানেই একটি ক্ষীণস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর তটে প্রথম তার্পিণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেসন কাঠগুদাম প্রায় ৩০ মাইল দূরে হইলেও এবং কারখানার আবশ্যক মাল-মসলাদি লইয়া যাওয়া ও তার্পিণ এবং রজন নিম্নদেশে আনয়ন করা বহু-ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও ভাওয়ালী চিড়, কায়ড়ু অরণ্যের কেন্দ্র বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ এই স্থানই তার্পিণ কারখানার জন্য মনোনীত করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্যবসায়িক হিসাবে তার্পিণ উৎপাদন পরীক্ষা আরম্ভ হইলেও ১৯১০-১১খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভাওয়ালীতে অপেক্ষাকৃত সামান্য মাত্রায় তার্পিণ ও রজন উৎপাদিত হইতেছিল। যে সময়ে বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম সূচনা হয়, সে সময়ে ভাওয়ালীর কারখানা সবে মাত্র ভারতের তার্পিণের বাজারে পরিচিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় চারিদিক্ হইতে বহুবিধ বিদেশীয় দ্রব্যাদির আমদানী যে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন। তার্পিণ সম্বন্ধেও তাহাই ঘটে। বিদেশীয়

তার্পিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভাওয়ালী কারখানা সেই সময় পরিসর বৃদ্ধি করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময় পুরাতন সামান্য কারখানার স্থলে বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং উৎপাদনের মাত্রাও সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম হইলেও ভাওয়ালী ভারতে একমাত্র তার্পিনের কারখানা নহে। প্রায় ১৯১০-১১ সালে লাহোরের সন্নিকটস্থ সাহাদ্রা নামক স্থানে একটি তার্পিণ-কারখানা খোলা হয়। বন্যাজলপ্লাবিত হইয়া উহার সমধিক ক্ষতি হওয়ায়, পরে ঐ কারখানা অনতিদূরবর্ত্তী জাল্লোতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাল্লো কারখানার কলকব্জা ফ্রান্সে প্রস্তুত। উহার উৎপাদনশক্তি ভাওয়ালীর কারখানা অপেক্ষা অনেক অধিক। বৎসরে প্রায় ২৪০০০ হন্দর গন্ধবিরোজা ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু প্রায় ১৮০০০ হন্দর মাত্র ব্যবহৃত হয়। এই দুইটি কারখানা ব্যতীত বেরিলিতে আর একটি কারখানা হইয়াছে। ইহাতে সম্যক্‌ভাবে কাজ চলিতে এখনও বিলম্ব আছে। এ স্থলে ইহা বলা প্রয়োজন যে, ভাওয়ালীর কারখানা শুদ্ধ সরকারী জঙ্গল হইতে সংগৃহীত গন্ধবিরোজায় চলে। জাল্লোতে চারি দিক্‌ হইতে গন্ধবিরোজা ক্রয় করা হয়। বেরিলির কারখানায়ও সেই প্রথা অনুসৃত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

যাঁহারা হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দীর্ঘ, সরল, সূচিকাকার পত্রবিশিষ্ট, গাঢ় হরিৎ চিড় এবং ঘন নীল কায়ড়ু বৃক্ষ দেখিয়াছেন। ইহাদের কাণ্ডত্বকে কীট দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে ক্ষত হইলে আঠার মত পদার্থ অর্থাৎ গন্ধবিরোজা বাহির হয় ও বায়ু-সংস্পর্শে অর্দ্ধ-কঠিন হইয়া যায়। স্বভাবতঃ যে পরিমাণ গন্ধ-বিরোজা উৎপাদিত হয়, তাহাতে তার্পিণ-কারখানা চলে না। সেই জন্য আমাদের দেশে ভাল খেজুরের রসের জন্য যেমন দাগ দেওয়া হয়, চিড় কায়ড়ু গাছেও সেইরূপ দাগ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে গন্ধবিরোজা বাহির করিয়া লওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব্ব হিমালয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে কুমাওন হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যে বহুবিস্তৃত চিড় ও কায়ড়ুর অরণ্য আছে, তাহার অতি সামান্য অংশই গন্ধবিরোজা নিষ্কাষণের কার্য্যে লাগিতেছে। কম করিয়া ধরিলেও সরকারী চিড় ও কায়ড়ু জঙ্গলের আয়তন ৬২৫ বর্গমাইলের কম হইবে না। তন্মধ্যে আপাততঃ কেবলমাত্র প্রায় ১০০ বর্গমাইল পরিমিত বনভূমি হইতে গন্ধবিরোজা সংগৃহীত হইতেছে। বৃটিশ-শাসিত ভারত ভিন্ন অনেক দেশীয় রাজ্যে ও জমীদারের জমীতে যথেষ্ট পরিমাণে চিড় ও কায়ড়ু আছে। উক্ত স্থানসমূহের আয়তন সমষ্টি করিলে প্রায় ৭০০ বর্গ-মাইল হইবে। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভারতে যে পরিমাণ তার্পিণ ও রজন উৎপাদিত হইতে পারে, এখন তাহার কিছুই হয় নাই। ১৫ লক্ষ গ্যালন * তার্পিণ ও ৪ লক্ষ হন্দর রজন ভারতে অচিরে উৎপন্ন হওয়া আদৌ বিস্ময়জনক নহে।

বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গন্ধবিরোজা হইতে তার্পিণ ও রজন প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণন অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তবে সাধারণ-ভাবে বলা যাইতে পারে যে, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাস ভিন্ন বৎসরের সব সময়েই চিড় হইতে নির্য্যাস সংগৃহীত হয়। গাছের বয়ঃক্রম, বৎসরের সময় ও স্থানবিশেষে নির্য্যাসের মাত্রার ইতরবিশেষ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ প্রায় ১৪টি বৃক্ষ হইতে ১ মণ গন্ধবিরোজা পাওয়া যায়। সদ্যঃ-সংগৃহীত গন্ধবিরোজায় পাতা এবং ত্বক্‌ ও কাঠের টুক্‌রা প্রভৃতি থাকায় ইহা পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। তাহাতে মণকরা ৩ হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত বাদ যায়। ১ হন্দর পরিষ্কৃত গন্ধবিরোজা হইতে ৩৫ সের রজন ও ১৫ সের তার্পিণ পাওয়া যায়। বাষ্পের সাহায্যে গন্ধবিরোজা চোলাই করা হয়। বলা বাহুল্য যে, প্রস্তুত সমস্ত তার্পিণ ও রজন এক প্রকারের নহে। গুণের তারতম্যে তার্পিণ ১, ২ ও ৩ নং শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। রজনও গুণ হিসাবে ৫ প্রকারের। তন্মধ্যে ফিকে বাদামী রঙ্গের রজনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

তার্পিণ ও রজন প্রস্তুতের লাভালাভও সব কারখানায় সমান নহে। গড়ে প্রস্তুত-খরচা মণকরা প্রায় ৪৸০ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম ৬৸০ হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তার্পিণ ও রজন হইতে গবর্ণমেণ্টের মোট আয় ৫,০৪,২৪৯৲ টাকা হইয়াছিল। তাহা হইতে খরচা বাদে আসল লাভ—১,৪৬,৭৭৪৲ টাকা। কারখানা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সরকারী ব্যয় হইয়াছে ১,৬১,৯০৫৲ টাকা। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তার্পিণের দর যুদ্ধের সময় অপেক্ষা কম হইলেও বিক্রয়ের মাত্রাধিক্য

---

* বিলাতী ওজন ও মাপের সহিত যাঁহারা পরিচিত নহেন, তাঁহাদের জ্ঞাতার্থে বলা যাইতে পারে:—১ টন—২৭।০ মণ; ১ হন্দর—১ মণ ১৪।০ সের; ১ গ্যালন—৫ সের।

হওয়ায় সরকারী লভ্যাংশ কম হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্রে গবর্ণমেণ্ট তার্পিণ ও রজন বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন ও উপযুক্ত কমিশন দিতেছেন।

ভারতে তার্পিণ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়া দেশের ধনাগমের অন্ততঃ একটি নূতন পথ মুক্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত তার্পিণ শিল্পের ক্রমোন্নতি হইয়া আসিতেছে। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা প্রতীয়মান হইবে—

খৃষ্টাব্দ	দেশে প্রস্তুত		বিদেশীয় (আমদানী)	
	তার্পিণ	রজন	তার্পিণ	রজন
	গ্যালন হিঃ	হন্দর হিঃ	গ্যালন হিঃ	হন্দর হিঃ
১৯০৭-০৮	১৬,০৩৬	৪৮৭০	৩,৩৩,৫০০	৭৬,৫২৫
১৯১৩-১৪	৫৮,৫০৩	২০,২২০	১,৯৩,৯৩৭	৪৪,৭০৮
১৯১৭-১৮	১,৩৬,০৫২	৪৫,৯৫০	৫০,০০	৩১,৪৯৬

এ স্থলে ইহা দেখা যাইতেছে যে, বিদেশীয় তার্পিণের আমদানী কমিয়া গিয়া আপাততঃ ১০০ ভাগের ১৫ ভাগে ও রজন ১০০ ভাগের ৪০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে, দেশে তার্পিণ ও রজন উৎপাদনের মাত্রা যথাক্রমে ৮ ও ১০ গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের পক্ষে ইহা বিশেষ আশাপ্রদ বলিতে হইবে। ভারতে তার্পিণ শিল্পের এখনও তরুণ অবস্থা। দেশে তার্পিণ ও রজনের অভাব পূরণ করিতেই এখনও অনেক দিন লাগিবে। বার্ণিস ও রং প্রভৃতির কারখানা দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে ; এই সমুদায়ের জন্য ও ঔষধার্থ প্রচুর পরিমাণে তার্পিণ প্রয়োজন হইবে। রজন সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। সাবান ও কাগজের কারখানায়, সুলভ মূল্যের বার্ণিস প্রস্তুতে ও গালায় ভেজাল দেওয়ার জন্য রজনের প্রধান ব্যবহার। এ সমুদায় দিকেও দেশের অভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং রজনের কাটতি কম হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্দেশীয় তার্পিণ ও রজন ষ্ট্রেট সেটল্‌মেণ্টস্, জাভা ও মলয়দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বেশ আদর লাভ করিয়াছে ও উক্ত দেশসমূহে কিয়ৎপরিমাণে মালও রপ্তানী হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য হওয়া উচিত—দেশের অভাবমোচন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গুণের তারতম্য অনুসারে কয়েক শ্রেণীর তার্পিণ ও রজন আছে। যখন এ দেশে প্রথম প্রস্তুত হয়, তখন অতি অপকৃষ্ট তার্পিণ ও রজনই হইয়াছিল। ভারতীয় ধন-বিভাগের ঔদাসীন্য এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের বর্ত্তমান প্রধান রসায়নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুত পূরণ সিংহের অকাতর অধ্যবসায়ে ও চেষ্টায় উক্ত তার্পিণ ও রজন পরিস্কৃত হইয়া ব্যবসায়ের উপযোগী হয়। কিন্তু এখনও ভারতের তার্পিণ মার্কিণের প্রথম শ্রেণীর তার্পিণের সমকক্ষ হয় নাই। পাইনের জাতিভেদেও তার্পিণের তারতম্য হয়, দেখা গিয়াছে। চিড়ের তার্পিণ রুসীয়, কায়ুর ফরাসী ও খাসিয়া চিড়ের তার্পিণ মার্কিণ নিম্নশ্রেণীর তার্পিণের সমতুল্য। কিন্তু ব্যবসায়ীর পক্ষে রুসীয় তার্পিণ অপেক্ষা চিড়ের তার্পিণ অধিক মূল্যবান্। কারণ, রুসীয় তার্পিণ কখন ঠিক এক রকমের হয় না ; চিড়ের তার্পিণের বিভিন্ন চালানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। তার্পিণ শিল্পের পরিসর-বৃদ্ধির সহিত উৎকর্ষতাও যে সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতের পুনরুত্থানের এই নবযুগে যতই নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, ততই ভাল। তার্পিণ শিল্পের এই শৈশব অবস্থাতেও ইহা হইতে প্রায় ২ লক্ষ টাকা লাভ হইতেছে এবং প্রায় ৩ হাজার শ্রমজীবী প্রতিপালিত হইতেছে। এইরূপ অপরাপর শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে এক দিকে যেমন দেশে ধনাগমের পথ প্রশস্ত হইবে, অন্য দিকে তেমনই বহু লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় হইয়া বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার অন্ততঃ আংশিক সমাধানও হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

কৃষি-কথা।

১

এই নাটক, উপন্যাস ও কবিতা-প্লাবিত দেশে ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী জাতিকে কৃষির কথা শুনাইতে যাওয়া দুরাশা কি না, জানি না। দুরাশা হইলেও জাতির প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া জাতিকে সে কথা শুনান প্রয়োজন—জাতিরও তাহা শুনা প্রয়োজন। এক দিন যে বাঙ্গালায় টাকায় আট মণ চাউল বিকাইত, যে বাঙ্গালার নীল লইয়া পৃথিবী চলিত, যাহার চা ও পাট আজিও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার পুষ্ট করিতেছে, সে বাঙ্গালার কৃষি-সম্পদকে তুচ্ছ করিলে চলিবে কেন? আমরা চাকুরী করিয়া বা ওকালতী করিয়া জীবন সার্থক মনে করিতেছি, আর দেশ-বিদেশ হইতে কৃষি-কুশল চাষী আসিয়া আমাদেরই চক্ষুর সম্মুখে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সোনা

ফলাইয়া আত্মোন্নতি করিতেছে, আমরা দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি। তাহাদের চাষে সোনা ফলিতেছে, আর আমাদের কৃষির দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহার কারণ-নির্ণয়ে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। পাশ্চাত্য জগতে—যেখানে অধুনা বিজ্ঞান-বলে সমস্তই সমাহিত হইতেছে, সেখানে ধনী ও বিদ্বজ্জন-হস্তে কৃষির ভার ন্যস্ত, আর এখানে দরিদ্র নিরক্ষর চাষীর দুর্ব্বল হস্তে সেই ভার দিয়া দেশ বেশ নিশ্চিন্ত আছে। যতদিন এ বিষয়ে দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি না পড়িবে, যতদিন তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে না নামিবেন, ততদিন আমাদের কৃষির উন্নতি সুদূরপরাহত।

হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত ও বদ্ধমূল করিতে হইলে কৃষি অপেক্ষা কোনও ব্যবসায় শ্রেষ্ঠতর বলিয়া আমার ধারণা হয় না। ইহার অপেক্ষা শান্তি ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধায়ক সম্মানের ব্যবসায় আর আছে বলিয়া আমি মনে করি না; ইহার সাধনায় হৃদয়ে যে স্বাবলম্বনের ভাব আইসে, তাহাতে মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার সুখময় পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। পল্লী-মাতার শ্যামাঞ্চলের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া কৃষক ধূলি-ধূম-ধূসরিত জটিল কলকজ্জাময় সহরের দিকে ও কর্ম্মকোলাহলময় ব্যবসা-ক্ষেত্রের অশান্ত উদ্দীপনার পানে এবং মস্তিষ্ক-আলোড়নকারী শরীর-মন-বিধ্বংসী "ইউনিভার্সিটীর" দিকে দৃষ্টিপাত করে, আর নিজের শান্তি স্বাধীনতা-বিধায়ক ব্যবসায়ের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হয় এবং হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু হায়! সে স্বাধীনতার ভাব, সে আত্মপ্রসাদলাভেচ্ছা কয় জনের হৃদয়ে আছে? তাই ভয়ে ভয়ে আজ কৃষির কথা লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি। আর "বসুমতী"-সম্পাদক মহাশয়ের কথায় বলিতে হয়—"অবসরে আনন্দ-প্রবাহের ভিতর বাঙ্গালীর কর্ম্ম-জীবন—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্ত্তে যথার্থ শিক্ষায় অর্থকরী বিদ্যার—বিশ্বজ্ঞানের প্রভায় অনুরঞ্জিত করিবার জন্য" আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

যাঁহারা বাঙ্গালা দেশের সহিত পরিচিত, তাঁহাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না, বাঙ্গালার শতকরা প্রায় ৯০ জন লোক কৃষিজীবী—কেহ কৃষিকার্য্য করে, কেহ কৃষিজ পণ্যের ব্যবসা করে, কেহ বা এই দুই শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে। এ অবস্থায় মার্কিণে যেমন হইয়াছিল, বাঙ্গালাতেও তেমনই করিতে হইবে—কৃষির উন্নতি করিয়া তাহারই লাভ হইতে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এ দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা না হইলে দেশের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হইবে না সত্য; কিন্তু শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিবার একমাত্র উপায় কৃষির লাভ বৰ্দ্ধিত করা। কৃষি-প্রধান দেশকে শিল্প-প্রধান করিতে সময়ও লাগিবে—ততদিন কৃষিই আমাদের প্রধান অবলম্বন থাকিবে। সুতরাং ভবিষ্যতে দেশ শিল্পপ্রধান হইবে আশা করিয়া বর্ত্তমানে কৃষিকে অবজ্ঞা করা কোন মতেই সুবুদ্ধির কাজ নহে।

য়ুরোপে ও মার্কিণে নানা উপায়ে কৃষির অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে—বহুলোৎপাদিকা কৃষির বিশেষ আদর ও অনুশীলন হইতেছে; জাপানও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নহে। আয়ার্লণ্ডে কৃষি-সমিতি সরকারী সাহায্য পরিহার করিয়াও দেশে কৃষির বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিয়াছে। কেবল আমাদের দেশেই কৃষির উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতেছে। ইহার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কারণ—"শিক্ষিত" লোকের কৃষি-বিমুখতা। কৃষিকার্য্যকে হেয়—মূর্খের কাজ বলিয়া যে কুসংস্কার এ দেশে আছে, তাহা আধুনিক—আমাদের চাকরীজীবী হইবার পর তাহার উদ্ভব এবং তাহাই পরোক্ষ-ভাবে আমাদের সর্ব্বনাশের অন্যতম কারণ। এই কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। দেশের শিক্ষিত লোককে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া সেই শিক্ষা কৃষির উন্নতিসাধনে সুপ্রযুক্ত করিতে হইবে—বুঝিতে হইবে, কৃষিতেই আমাদের উন্নতির উপায়—Back to the land ব্যতীত গতি নাই।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মল্লিক।

চরকা।

'মাসিক বসুমতীর' জন্ম-পত্রিকায় যে সকল বলবান্ গ্রহের শুভসঞ্চার দেখিলাম, তাহাতে জাতক যে শক্তিময়ী মূর্ত্তিতে প্রফুল্ল প্রাণে জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলা-কবিত্বাদি পাণ্ডিত্যে মণ্ডিতা হইয়া চিরজীবী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। এ শিশুর রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য চোরের বেড়ী, বাঘের নখ, আকন্দ-ডাল প্রভৃতি তুক্‌তাকের কোন প্রয়োজন নাই; তথাপি মায়ের মন বুঝে না, তাই বুঝি রক্ষা-কবচ-চ্ছলে শিশুর গলায় দোলাইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ শ্রীহীনা করিবার জন্য আমার নিকট প্রসূতি একটি আমড়ার আঁটি চাহিয়াছেন। আমার এক দিন একটি ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ী ছিল, তাহাতে সমুদ্রের ফেনা, পলাকাটি, হরিণের শিং, ময়ূরপুচ্ছ, আমড়ার আঁটি প্রভৃতি থাকিত বটে, কিন্তু বাজারে এখন যে রকম গরম গরম দাওয়াই চলিতেছে—পিল, মিক্‌শ্চার, প্লাষ্টার, ট্যাব্‌লইড, ইন্‌জেক্‌সনের যেরূপ আধিপত্য—তাহাতে অব্যবহারে ও অবহেলায় সেই ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ীটি ভাঁড়ারের কোন্ অন্ধকার কোণে যে লুকাইয়া গিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার মনের ভাবটাকে নিরলঙ্কার করিলে সাদা ভাষায় অর্থ এই হয় যে, যে সকল লেখক-লেখিকার উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম নামাবলী জন্ম-পত্রিকায় প্রকাশিত দেখিলাম, তাঁহাদের তেজোদীপ্ত মধুলিপ্ত লেখনীর সহজ-সঞ্চালন-শক্তি স্মরণ করিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। এই শিরোঘূর্ণনই কিন্তু আমার একটু উপকার করিল, ভাবের সহযোগে কল্পনায় ভাবের সঞ্চার হইল। অনেক ঘূর্ণমান বস্তর চিত্রই আমার হৃদয়ে উদয় হইল। যথা—পৃথিবী, কুলালচক্র, বিজলী-বীজন, কলুর ঘাণি, চড়কগাছ, **চরকা**—বস্! চরকার উপরই এখন লাইম্-লাইট্ পড়িয়াছে। সকলেই চরকা বেচিতেছে, সকলেই চরকা কিনিতেছে, কেহ নূতন চরকা আবিষ্কার করিতেছে, কেহ বা বাঙ্গালা চরকার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছে; চরকা কাহাকেও আনন্দিত করিতেছে, কাহাকেও বা আতঙ্কিত করিতেছে; চরকার নামে কেহ নাচিয়া উঠিতেছে, কেহ বা ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলন সময়ে এই চরকা একবার বাঙ্গালার ঝরকার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়াছিল; এবার সেই চরকা সমস্ত ভারতের মাথার ভিতর ঢুকিয়া "চরকী বাজীর" মত ঘুরিতেছে। আমরা চরকা ঘুরাই না ঘুরাই, চরকা আমাদিগকে বিলক্ষণ ঘুরাইতেছে; তাই আমি এই চরকা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব, মনে করিয়াছি।

এই চরকা আমার চোখে একটা নূতন জিনিষ নহে; কামারের দোকানের শাণের মত, গর্ভবতী মাকড়সার মত, যে আজকাল দুই চারিটা নূতন চরকা বাজারে বা লোকের কাঁধে দেখিতেছি, তাহা ছাড়া আসল খাঁটী বাঙ্গালা চরকা আমার কাছে একটা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা পেট্রিয়টিক গোছের নূতন জিনিষ নহে। বাল্যকালে জানিতাম, যেমন সকল বাড়ীতে হাঁড়িকুঁড়ি থাকে, ঘটী-বাটি থাকে, ধামা-কুলো থাকে, তেমনিই ঢেঁকি, ধুচুনি, চরকাও থাকে। এই শ্যামবাজারে আমার মামার বাড়ী, যে বাড়ীতে আমি ভূমিষ্ঠ হই, সেই বাড়ীতে একটা লম্বা রকের উপর প্রতি বৈকালে বেলা আড়াইটা তিনটা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ৭।৮ খানা চরকা চলিত। একাদশী প্রভৃতি উপবাসের দিন রান্নাবান্নার ল্যাঠা না থাকায় বিধবারা প্রায় দুপুরবেলা হইতেই চরকা কাটিতে বসিয়া যাইতেন। আমরা ছেলেরা তুলো উড়িয়া গেলে কুড়াইয়া আনিতাম; আমি সূতা জড়াইয়া দিব বলিয়া লাটাই লইয়া কাড়াকাড়ি করিতাম; অনেক সূতা প্রস্তুত হইত দেখিতাম, তবে তখন "ইকনমিক্‌" কথা কানে প্রবেশ করে নাই বলিয়া বেচিতেন কি বিলাইয়া দিতেন, যদি বেচিতেন, কাহাকে বেচিতেন বা কৎকে বেচিতেন, তাহা জানিতাম না বা জিজ্ঞাসাও করিতাম না।

মরা মানুষকে সশরীরে স্বগৃহে ফিরিতে দেখিলে লোকের যেমন আনন্দ হওয়া সম্ভব, এই চরকাকে ঘরে ফিরিতে দেখিয়া আমারও অনেকটা সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে। ঐ চরকার সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলেবেলার কত আদর করা ঝি-মা, দিদি-মা, পিসীমাকে চোখের সামনে মূর্ত্তিমতী দেখিতেছি! চরকাকে একটু ভয়ও করি; এখনও মনে হয়,

"হতভাগা ছেলে; কি করিস্, কি করিস্" বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন। এক সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই, শুধু ভারতে কেন, জগতের সর্ব্বত্রই কোন না কোন আকারে চরকার প্রচলন ছিল; কিন্তু আমি বাঙ্গালার কথাই জানি, বাঙ্গালার কথাই ভাবি। বাঙ্গালা দেশে চরকার মান্য—চরকার আদর বড় বেশী। চরকার গর্ব্ব করিয়া এই বাঙ্গালায় এক দিন কত ছড়া, কত গান রচিত হইয়াছে। হিন্দু উপকার পাইলে "থ্যাঙ্ক্ ইউ" বলে না, উপকারীর পূজা করে। সূর্য্য তাপ আলোক দেন, তাই হিন্দু সূর্য্য-পূজা করে; বৃষ্টির জলে তাহার ক্ষেত্র রসিয়া উঠে, তাই সে ইন্দ্র-পূজা করে; জ্যৈষ্ঠ মাসে পিপাসা নিবারণ করিয়া হিন্দু গঙ্গাপূজা করে; আর ছায়ায় বসিয়া পথশ্রান্ত পথিক শরীর জুড়ায় বলিয়া সে বটবৃক্ষের পূজা করে। সেইরূপ হিন্দু ঢেঁকী-চরকারও পূজা করে। "সভ্য" "শিক্ষিত" শক্তিমান্ লোকরা হিন্দুকে এইজন্য কুসংস্কারাপন্ন, মূর্খ, অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা ও বিদ্রূপ করে; তবুও হিন্দু পূজা করিতে ছাড়ে না, অচেতন উপকারীরও পূজা করে।

বাঙ্গালী ভগবান্‌কে "লজ্জা-নিবারণ" বলিয়া ডাকে; কৃতাঞ্জলিনত মস্তকে "লজ্জা নিবারণ কর" বলিয়া তাহার চরণে প্রার্থনা করে। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত প্রার্থনা—যেন ইহকাল পরকালে তাহার লজ্জা-নিবারণ হয়। আমরা বলি, হে ঈশ্বর, হে দয়াময়, হে পিতামাতা সখা! যেন এমন কাজ না করি, যাহাতে লজ্জা পাই; যেন এমন অভাব না হয়, যাহাতে লোকের কাছে লজ্জা পাই; যেন এমন অবস্থায় না পড়ি, যাহাতে লজ্জা পাই। গঙ্গাযাত্রার সময়েও প্রাচীন-প্রাচীনা ঘাটে শুইয়া শেষ জপ করিতে থাকেন আর কীর্ত্তনীয়ারা খোল-করতাল বাজাইয়া আগে আগে গাহিতে গাহিতে যান—"লজ্জা রাখো লজ্জা-নিবারণ হরি।" বঙ্গের মানব-মানবী এই লজ্জার হাত এড়াইবার জন্য আজীবন উৎকণ্ঠিত ও ব্যতিব্যস্ত। জ্ঞানোদয়ের পরেই বালক-বালিকার প্রথম লজ্জা-বোধ তাহার উলঙ্গাবস্থাদর্শন। লজ্জা-নিবারণের তাহার প্রথম প্রয়োজন বস্ত্র; সেই বস্ত্র সূতায় নির্ম্মিত হয়, চরকা সেই সূতার প্রসূতি; সুতরাং চরকা হইয়াছে আমাদের কাছে সমস্ত লজ্জা-নিবারণের নিদর্শন-স্বরূপ। যে দৈব প্রেরণায় গন্ধী বলিয়াছেন যে, চরকাই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, তাহা অতি সত্য। চতুর্দ্দিকে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে—আমরা যে অবস্থায় পতিত হইয়াছি, এ অবস্থায় আমরা লজ্জাবোধ না করিলে এবং সেই লজ্জা-নিবারণের জন্য দ্বেষ, হিংসাদি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-দেহে শুদ্ধ-বস্ত্রে শুদ্ধ-মনে একনিষ্ঠ সাধনায় প্রাণপণ না করিলে আমরা ইহ-পরকালে লজ্জার হাত হইতে নিস্তার পাইব না; চরকা আমাদের গৃহে গৃহে থাকিয়া অনবরত স্মরণ করাইয়া দিবে—"লজ্জা-নিবারণ কর, লজ্জা-নিবারণ কর।"

সাংসারিক মানবের জীবনে বিবাহ সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। দেহে ও আত্মায় একীভূত হইয়া নরনারী বিবাহের দিন হইতে প্রথম কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সেই পবিত্র মোহনীয় মুহূর্ত্তে দম্পতীকে জীবন-পথে লজ্জা-নিবারণ করিয়া চলিবার কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বাঙ্গালীর বিবাহে স্ত্রী-আচার-স্থলে একটি চরকা রক্ষিত হয়। চরকার প্রদর্শনে লজ্জা-নিবারণের ইঙ্গিতকে দৃঢ় ও দৃঢ়তর করিবার জন্য যেন বরণডালায় কুমারী-কন্যার হস্ত-প্রস্তুত কিঞ্চিৎ সূতা ও বরের হাতে একটি মাকু দেওয়া হয়। লজ্জা-নিবারণে প্রথম সহায় ভিন্ন চরকার আরও একটি গুণ আছে। চরকা মনের স্থিরতা ও একাগ্রতা সম্পাদনে অনেকটা সাহায্য করে। হিন্দু ও মুসলমানরা যেমন মালা ও তস্‌বির সাহায্যে ঈশ্বরের নাম জপ করেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধরা তেমনই উপাসনা-চক্র ঘুরাইয়া বুদ্ধদেবের আরাধনা করেন। উপাসনা-চক্র চরকার রূপান্তর। দৈবপ্রেরণা বুঝি তাই মহাত্মা গন্ধীকে দিয়া তাঁহার দেশবাসীদিগকে বলাইয়াছেন যে, প্রয়োজন থাক না থাক, ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোকই যেন প্রত্যহ কিছু সময় চরকার সেবায় অতিবাহিত করে।

চরকা অনেক কথা বলে গো—অনেক কথা বলে। চরকা বলে—"আমি তোমায় খেতে দেবো, পরতে দেবো, আমায় কিছু দিতে হবে না, খালি মাঝে মাঝে আমার টেকোয় একটু তেল দিও। সেই ত তেল খরচ কর—তেলা মাথায় তেল দাও, পায়াওয়ালার পায়ে তেল দাও—নিজের নাকেও সর্ষের তেল দাও—দিলেই বা আমার টেকোয় একটু তেল! কারো দুয়ারে যেতে হবে না, আমিই তোমায় ভাত দিব, কাপড় দিব।" চরকা বলে—"কাজ কি তোমার পরের কথায়, কাজ কি তোমার মোড়লী, কাজ কি তোমার ফোপর-দালালী,—তুমি আপনার ঘরে ব'সে আপনার চরকায়

আপনি তেল দাও!" সত্যই ত, সত্যই ত! "আপনার চরকায় আপনি তেল দাও!" প্রাচীন বাঙ্গালার কোন নিভৃত পল্লী-নিবাসী নিরক্ষর কৃষক-মুখ-নিঃসৃত এই জ্ঞান-বাণীর কি মূল্য আছে! খোঁজ গে তোমার বেদ-বেদান্ত, সাংখ্য-দর্শন; খোঁজ গে তোমার বেকন্, মিল, বেন্থাম্, সোফেনহার; কোথায় পাবে এ জীবন্ত মন্ত্র—"আপনার চরকায় আপনি তেল দাও।"

"England expects every man to do his duty" নেল্‌সনের এই মহাবাক্য ইংরাজ কথায় কথায় বলে। আমরাও আজকাল তার চোঁয়া-ঢেকুর তুলি; কিন্তু নিজেদের ঘরে যে একটা পুরাণ গোছের চাষার কথার ভিতর কি একটা নেশা-কাটানো, ঘুম-ভাঙ্গানো, জীবন্ত বিষহরী মন্ত্র রহিয়াছে, তাহা দেখি না। সকলেই বলে—"কি করবো, কোন্ পথে যাবো, কে আমাদের পথ দেখিয়ে নে যাবে, কাহার সাহায্যে আমরা স্বরাজ পাবো।" বাঙ্গালার চাষা বলিতেছে—"আপনার চরকায় আপনি তেল দাও, আপনি তেল দাও," তাতেই তোমার লজ্জা-নিবারণ হবে।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের গ্রামে চরকার কেন্দ্র।

পশ্চাদ্ভাগে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উপবিষ্ট

য়ুরোপের বর্ত্তমান সমস্যা।

ইংরাজ বলিলেন—"জেনোয়ায় চল।"

ফরাসী ঘাড় নাড়িলেন—"জাহান্নমে যাও। ভার্শাইল পরিত্যাগ করিয়া পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

জর্ম্মণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা যায় না। নিমন্ত্রণ পাইলে জেনোয়ায় কেন, যেখানে বল, যাইতে রাজি আছি।"

রুষ বলিলেন—"যাহা হউক্, এতদিন পরে অপাংক্তেয় বল্‌শেভিক যে তোমাদের পংক্তিতে আসন পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, ইহা মন্দ রহস্য নয়। তবে,—জেনোয়া কেন, বাপু? লণ্ডন হইলে স্বয়ং লেনিন্ সশরীরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন। আপাততঃ তাঁর শরীর কিছু খারাপ বটে। কিন্তু শুনিতেছি না কি যে, আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইবে, আমরা শান্ত ভালমানুষ কি না? খবরদার!"

পোল্ বলিলেন—"ফরাসী যখন বিমুখ, তখন আমার কি জেনোয়ায় যাওয়া উচিত? কিন্তু যাব কি যাব না, মিছে সে ভাবনা; যাইতেই হইবে। জর্ম্মণীর মার্ক তবু পদে আছে; আমার মার্ক আমাকে কি না বিপদে ফেলিয়াছে! আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে কি? ছোট-আঁতাতের সঙ্গে একযোটে মিলিয়া কাজ করিলে হয় না?"

চেকো-শ্লোভাক—"তা' বেশ ত; আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। জেনোয়ায় ছোট-আঁতাত ও পোলাণ্ড সম্মিলিত হইয়া কাজ করুক।"

যুগো-শ্লাভিয়া—"ঠিকই ত; আমরা পরস্পরের দুঃখ-কাহিনী ভাল করিয়া বলিতে পারিব।"

রুমানিয়া—"তা' বটেই ত। এখন আমাদের ছোট-আঁতাতের স্বার্থ ও পোলাণ্ডের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নহে। তবে দলে পুরু হওয়া মন্দ কি?"

অষ্ট্রীয়া—"আমি কি করি? আমার নাড়ী কাটিয়া যে কয়টি রাষ্ট্রশিশু আজ সদ্যোজাত গরুড়ের মত চন্দ্রলোকে অমৃতের সন্ধানে ছুটিতেছে, তাহারা কি এই বিনতারূপিণী দাসীবৃত্তিধারিণী পরমুখাপেক্ষিণীকে সঙ্গে লইতে আজ লজ্জা বোধ করিবে? কিন্তু আমার যে নান্যঃ পন্থাঃ।"

ইটালী বলিলেন—"জেনোয়ায় আসিবে? একটু সবুর কর। এখানকার রাষ্ট্রতন্ত্র প্রায় বিকল হইবার যোগাড় হইয়াছে। অমাত্যবর্গ এতই চঞ্চল যে, জেনোয়ায় কি কি বিষয় আমাদের তরফ হইতে কি ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা ত কাহারও দেখি না। আগে নিজের ঘর-করণা ঠিক না করিয়া আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের মিটমাট করিবার চেষ্টা বৃথা।"

পোঁয়াকারে মাথা তুলিলেন।—"তবু ভাল! য়ুরোপের জাহান্নমে যাওয়ায় বাধা পড়িল। আমার আপত্তির কথা আমি ঘরে বাহিরে খোলসা করিয়া জানাইতে দ্বিধা করি নাই; কিন্তু তোমার আপত্তি কি?"

জিয়োলিটির ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।—"জেনোয়ায় অষ্টবজ্র-সম্মিলন তোমার ভাল লাগিতেছে না কেন, তাহা আমি জানি। তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না যে, এই অষ্টবজ্র সম্মিলন না হইলে য়ুরোপ শাপমুক্ত হইবে না। নেপোলিয়নের মুখোস পরিয়া সভা জগতের রঙ্গমঞ্চের উপর তোমার আস্ফালনের ও তাণ্ডবের পশ্চাতে মার্শাল ফশএর অসির ঝণৎকার আট্‌লান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া সুদূর ওয়াশিংটনের কর্ণপটহে ধ্বনিত হইয়াছে। কুক্ষণে ব্রিয়াঁ লয়েড্ জর্জ্জের সঙ্গে গল্‌ফ্ ক্রীড়া করিলেন; প্যারী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই তিনি দেখিলেন যে, সেই খেলার ফটোগ্রাফ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাগজ-ওয়ালারা দেখাইল, কি কৌশলে সুচতুর ওয়েল্‌শ্ খেলোয়াড় সরল কেল্‌টকে পরাজয় স্বীকার করাইতেছে। ব্রিয়াঁ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তুমি তাঁহার আসন অধিকার করিয়া বসিলে। সভাজগৎ বুঝিল, এইবার পোঁয়াকারে—লয়েড্ জর্জ্জের দ্বৈরথ-যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ভার্শাইলের লয়েড্ জর্জ্জ, আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের লয়েড্ জর্জ্জ, জেনোয়া অভিযানের লয়েড্ জর্জ্জ আজ হঠাৎ রথ হইতে অবতরণ করিতেছেন না কি? পৃথিবী কি তাঁহার রথচক্র গ্রাস করিল? তাঁহার সারথি, প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যর জর্জ্জ ইয়ঙ্গার মূর্ত্তিমান্ টোরিবিদ্রোহের মত আজ বিমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। লয়েড জর্জ্জ [illegible]

নিষ্কণ্টক হইবে? 'ইংরাজ বলিতেছেন—তুমি যে-সে লোক নও; তুমি একটি মূর্ত্তিমান্ প্রোগ্রাম। তুমি জীবন্ত ভার্শাইল্!"

পোঁয়াকারে মৃদুভাবে বলিলেন—"তুমিও কি একটি প্রোগ্রাম নও? দুই বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, ১৯২০, খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন নিট্টি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে তুমি পনের দিনের মধ্যে নূতন রাষ্ট্র-সংসদ গঠিত করিলে। তদবধি ধনী ও নির্ধনের দ্বন্দ্বে তোমার হস্তক্ষেপ, তোমার কার্য্যপ্রণালী, তোমার কাটা-ছাঁটা প্রোগ্রাম···আর,—ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী নেপোলিয়নের নাম লইয়া শ্লেষ করিতেছেন! উত্তম!"

জিয়োলিটি ছাড়িবার পাত্র নহেন। "শ্লেষ করিব কেন? তুমি বোধ হয়, আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাও যে, তোমাদের তৃতীয় নেপোলিয়ন না থাকিলে আমাদের ইটালী রাষ্ট্র গঠিত হইত না। আমরা তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু তিনি তাঁহার সাহায্যদানের পরিবর্ত্তে যে দুইটি প্রদেশ দখল করিয়া লইলেন, তাহাদের সহিত আমাদের বহুকালের স্মৃতি জড়িত;—নীস্, গ্যারিবল্ডীর জন্মভূমি; আর স্যাভয়, আমাদের রাজবংশের কুলপরিচয় বহুযুগ ধরিয়া দিয়া আসিতেছে। জর্ম্মণীর কাছেও আমাদের রাষ্ট্রসংগঠন ব্যাপারে আমরা ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য।"

পোঁয়াকারে

বিদ্রূপের স্বরে পোঁয়াকারে বলিলেন—"তবু ভাল যে, এখনও জর্ম্মণীকে সুখ্যাতি করিবার লোক সভ্যজগতে অন্ততঃ এক জন জীবিত আছেন। তোমার ঐ ভদ্র জর্ম্মণীটি কিন্তু কোনও বিষয়ে ঋণ স্বীকার করিতে চাহেন না; তাই মহা-সংসদ্ (Supreme Council) এর এত মাথাব্যথা; তাই ক্যানে (Cannes); তাই জেনোয়া! ভার্শাইল্ সন্ধির সর্ত্ত সে নেহাৎ গরজে পড়িয়া কিছু কিছু মানিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু আমাদের ক্ষতিপূরণের সময় সে ক্রমাগত জবাব দিয়া আসিতেছে যে, সে সম্পূর্ণ অসমর্থ। গলা টিপিয়া জোর করিয়া যা' কিছু আদায় করা হইতেছে। টাকাকড়ি সম্বন্ধে তা'র যত কিছু চাতুরী, তা' আমাদের কাছে ধরা পড়িতেছে; কিন্তু লয়েড্ জর্জ্জ দেখিয়াও দেখিতেছেন না, ইহাই আমাদের আক্ষেপ। আবার ইংরাজী কাগজগুলাতে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, ফরাসীর পক্ষে তাহা মোটেই আরামপ্রদ নহে।
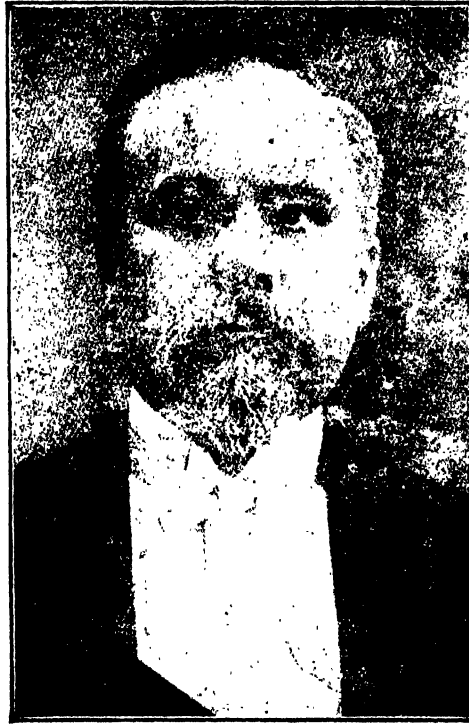
কাজেই আমাদের কাগজওয়ালারাও পাল্টা জবাব গাহিতেছে। ইংরাজ বলেন, আমরা আট লক্ষ সশস্ত্র সুসজ্জিত সৈনিক রাখিয়াছি, সমগ্র য়ুরোপকে নেপোলিয়নের মত পদতলে রাখিবার জন্য;—তুমিও ত নেপোলিয়নের মুখোস-পরা ইত্যাদি ভাষাপ্রয়োগ করিয়া ঐ রকমই ভাব প্রকাশ করিলে। যাক্, সে সব বোঝাপড়া ইংরাজের সঙ্গে আমাদের করিবার সময় আসিয়াছে; কিন্তু জেনোয়ায় নহে। জেনোয়া লয়েড্ জর্জ্জের কীর্ত্তি; যেমন হেগ্ ট্রিবিউন্যাল্ ছিল নিকোলাসের কীর্ত্তি; জেনীভা, উইল্‌সনের কীর্ত্তি; ওয়াশিংটন্ হার্ডিঙ্গের কীর্ত্তি। যে বল্‌শেভিক রুশিয়া পূর্ব্বতন রোম্যানফ্ বংশের আমলের সমস্ত ঋণ অস্বীকার করিয়া আমাদিগকে ভরাডুবি করিতে বসিয়াছে, তাহাকে না কি সাদরে জেনোয়া বৈঠকে আহ্বান করা হইয়াছে; জর্ম্মণীকেও না কি বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া দিবার আয়োজন করা হইতেছে! সে ক্ষেত্রে আমরা সব দিক্ না বুঝিয়া সহসা একটা ফাঁদে পড়ি কেন? যাক্, আমি কেবল নিজের কথাই বলিয়া যাইতেছি। আমরা

পরস্পর বৃথা কথা কাটাকাটি করিতেছি। তোমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার কি এতই জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে, যুরোপের এই দুর্দ্দিনে তুমি সকলকে আরও দিন কতক সবুর করিতে বলিতেছ?”

জিয়োলিট্টি বলিলেন,—“হইয়াছে বই কি! যুদ্ধশেষে ইটালী ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া দেখিল যে, বিজয়ী হইয়াও সে বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারিল না। এসিয়া ও আফ্রিকার জর্ম্মণ উপনিবেশে তা'র কোনও দাবী রহিল না। তুর্কী রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ডে ইংরাজ ও ফরাসী কোন এক কাল্পনিক নেশন-সঙ্ঘের (League of Nations) আদেশে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া সেই সমস্ত mandated territoryতে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ

ফশ।

করিলেন। গ্রীস কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের পাশে আসর জুড়িয়া বসিল; ইটালী কিন্তু দন্তস্ফুট করিতে পাইল না। এমন কি, তাহার বড় সাধের আড্রিয়াটিকের পথে পাঁচ জনে কাঁটা দিল। এ দিকে সাধারণ শ্রমজীবীর অন্নসংস্থান করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িল। দেশের মধ্যে বল্‌শেভিক-নীতির প্রচার বৃদ্ধি পাইল। লোকে ভাবিল, মস্কো-নীতির অনুসরণ করিলে সমাজ রক্ষা পাইবে। এই নবীন ভাব-মদিরা আমাদের সেনা-বিভাগকেও চঞ্চল করিল। তুমি অবশ্যই জান যে, নিট্টি-সংসদ্ তাড়াতাড়ি অনেক সৈন্য কমাইয়া দিলেন, পাছে রুশিয়ার মত একটা ভীষণ আকস্মিক বিপ্লব আসিয়া পড়ে। কিন্তু সোশ্যালিষ্টদিগের তাড়নায় নিট্টি-গভর্মেণ্ট টিকিল না। লণ্ডন ও প্যারী নগরীতে রাষ্ট্র-সচিবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আড্রিয়াটিক সমস্যার সমাধানের তিনি কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন,—ব্রিয়াঁর বিপক্ষে থাকিয়াও তোমার তাহা অবিদিত ছিল না। এই সমস্ত কূট রাষ্ট্রনীতিক তর্কবিতর্কের সূক্ষ্ম সূত্র ছিন্ন করিয়া কবিবর ডি-আনান্সিও কেমন করিয়া ফিউম্ দুর্গ দখল করেন, কেমন করিয়াই বা তিনি বড়-আঁতাত ও ছোট-আঁতাতের চাপে ফিউম্ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন, তাহাও তোমার অবিদিত নাই।”

নিট্টি

পোঁয়াকারে বলিলেন,—“হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। আরও জানি যে, ধনী ও নির্ধনের দ্বন্দ্ব মিট্‌মাট্ করিতে গিয়া তোমার গভর্মেণ্ট দেশের সমস্ত কল-কারখানা শিল্প-ব্যবসায়ের উপর ধনীর ও শ্রমজীবীর সমান কর্ত্তৃত্বাধিকার দাঁড় করাইয়া দিল। সোশ্যালিষ্ট পত্রিকা ‘অবন্তী’ তোমার জয় ঘোষণা করিল।”

জিয়োলিট্টি বলিলেন,—“সোশ্যালিষ্টদিগের মধ্যে দলাদলি আরম্ভ হইল। আরম্ভ গোল বাধাইল, একটা নবীন

ন্যাশনালিষ্ট দল—ফ্যাসিষ্টি। লড়াই বন্ধ হইয়া যাইবার পর বহু সেনানী স্থানে স্থানে ছোট বড় ক্লব স্থাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন; নাম হইল—Fasci dei Combattenti যোদ্ধৃ-সঙ্ঘ। গ্যাব্রীল ডি-আনাঞ্জিওর ফিউম্ অভিযানে ইহারাই দল ভারি করিয়াছিল। ধনী বণিক ও কলকারখানাওয়ালারা ইহাদের সাহায্যে সোশ্যালিষ্ট ও অন্যান্য শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন করিবার প্রয়াস পাইল। তোমরা ধনি-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে সমাজের সকল স্তরে কায়মনোবাক্যে মিলিত হইয়া তোমাদের দেশের লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছ;—দলাদলি বাদবিসংবাদ যত কিছু—জর্ম্মণীর নিকট হইতে ক্ষতি-পূরণস্বরূপ কতটা আদায় করা যায়; ইহাই তোমাদের একমাত্র আসল তর্কের বিষয়। আর আমাদের গত বৎসরে কল-কারখানায় রেলষ্টেশনে জাহাজে নৌকায় রক্তপাত ও বহ্নিবিভীষিকা! মিলান্, ফ্লরেন্স, ব্যারি, ট্রীষ্ট—সর্ব্বত্রই এই উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব! গত জুন মাসে আমাকে পদ-ত্যাগ করিতে হইল। বণমী নূতন ক্যাবিনেট্ গঠিত করি-লেন। তিনি নিজে সোশ্যালিষ্ট, কতকটা ফ্যাসিষ্টিদিগকে জব্দ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন। আবার এখন ক্যাবি-নেটে গোলমাল বাধিয়াছে। একটা পাকাপাকি মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত জেনোয়া মন্ত্রণা-সভায় আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিব না।…অথচ জেনোয়ায় যদি ভার্শাইলের গলদ সারিয়া লইবার চেষ্টা হয়—"

লয়েড জর্জ্জ।

বিদ্রূপের স্বরে পোঁয়াকারে বলিলেন,—ভার্শাইলের গলদ তোমার আমার দোষে হয় নাই; হঠাৎ জর্ম্মণীর প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত করুণা-পরবশ হইয়া একটা অনর্থের সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি যদি আমাদের সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে আমরা অতলে ডুবিয়া যাইতাম। কথাটা হয় ত আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু আমরা চার কোটি নরনারী প্রাণপণে জর্ম্মণীর গতিরোধ না করিলে, ইংরাজ আজ কোথায় থাকিতেন? যে জর্ম্মণী আমাদের দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া য়ুরোপের মধ্যে আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, তাহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যাহা প্রাপ্য, তাহা আদায় করিবার চেষ্টা করিলেই ইংরাজ বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। অথচ আমাদের অর্থকোষ শূন্য; কিন্তু টেক্সের উপর টেক্স বসাইয়াও আমরা এবার বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক রাখিতে পারিলাম না। গত মহাসমরে অন্যূন পঞ্চদশ লক্ষ ফরাসী যুবক হত ও পঞ্চ-বিংশতি লক্ষ সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। এখন যদি আমরা অধিকৃত রাইণ নদের তীরে লক্ষসংখ্যক কাব্রী সৈন্যের সমাবেশ করাইয়া শত্রুদমনে চেষ্টিত হই, তাহা হইলে কেন আমাদের প্রতি-বেশী পরম বন্ধুর গাত্রদাহ উপস্থিত হয়? কেন তাঁহারা আমাদের শত্রুপক্ষীয়ের অভি-যোগ নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিয়া বসেন? যে বল্‌শেভিক রুশিয়ার সঙ্গে কোনও প্রকার

মিত্রতাস্থাপনের চেষ্টা করা হইবে না,—ইংরাজের সঙ্গে এইরূপ সর্ত্ত আমাদের ছিল; কেন তাহার সহিত ইংরাজ বাণিজ্যসূত্রে গ্রথিত হইলেন,—অথচ আমাদের মতামত গ্রাহ্য করা সমীচীন বিবেচনা করিলেন না? রোমানফ্ বংশের বহুমূল্য হীরকাদি ইংরাজের বাজারে কেমন করিয়া প্রবেশ লাভ করিল? অথচ রোমানফের নামে ভূতপূর্ব্ব রুশিয়া গভর্মেণ্ট আমাদের নিকট হইতে ঋণ লইয়াছিল; আজ লেনিনের গভর্মেণ্ট সোজা বলি-য়াছে যে, জারের আমলের ঋণের জন্য ইহারা কিছুমাত্র দায়ী ।

প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্ম আহ্বান করা হইয়াছে? অথচ তুর্কীকে সে সভায় নিমন্ত্রণ করা হয় নাই;—কেন না, ইংরাজ বলিতেছেন, তুর্কী য়ুরোপের নহে; তুর্কী এসিয়ার রাষ্ট্র! সেই তুর্কীসাম্রাজ্য ভাং-চুর করিয়া যেটুকু আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখা হইল, সেটার জন্ম সৈন্য-সামন্তের উপর প্রভূত অর্থব্যয় করিতে না পারিলে অ্যাঙ্গোরাকে লইয়া কিছু বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। রাইণ নদের তটে ফরাসী সৈন্যরক্ষার খরচ জর্ম্মণী যোগাইতেছে। কিন্তু এই অদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে ঘরের কড়ি দিয়া সীমান্ত-রক্ষার চেষ্টা বেশী দিন না করিয়া যদি আমরা অ্যাঙ্গোরাকে খানিকটা বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া থাকি, তাহাতে লর্ড কর্জ্জনের মাথার টনক নড়ে কেন? বল্‌শেভিক রুশের সঙ্গে ইংরাজ বাণিজ্য করিবার ব্যবস্থা করিলেন আমাদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া; ইংরাজকে সম্পূর্ণরূপে না জানাইয়া অ্যাঙ্গোরার সহিত বোগ্‌দাদ রেলপথ ও সিলিশিয়া সম্বন্ধে যদি আমরা একটা সুব্যবস্থা করিয়া থাকি, তাহা কি এতই গর্হিত হইয়াছে? ভার্শাইলের উপর কারিগরি করিয়া গলদ দাঁড় করাইল কে? এখন জেনোয়ায় তাহার কতটা সারিয়া লইবার চেষ্টা করা হইবে? সভ্যজগতের রণসাজ খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ওয়াশিংটনে বৈঠক বসিল; স্থির হইল যে, বড় বড় যুদ্ধের জাহাজ আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আর কেহ নির্ম্মাণ করিতে পাইবে না, যা'র যা' আছে, তা'ও সম্পূর্ণ রাখা হইবে না; ইংরাজ, মার্কিণ ও জাপানীর নৌবহরের হার ৫: ৫: ৩ নির্দ্ধারিত হইল; আমরা বলিলাম, আমাদেরও বড় লড়াইয়ে জাহাজের সংখ্যা জাপানীর সমান করা হউক; কেহ তাহা সমর্থন করিলেন না; প্রায় অর্দ্ধেক করিয়া দাঁড় করান হইল,—৫: ৫: ৩: ১.৭৫; আমরা তাহাই মানিয়া লইলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর-বন্দরগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ও ব্যবসাবাণিজ্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য আমরা অধিকসংখ্যক ডুবজাহাজ চাহিয়াছিলাম; মিঃ ব্যালফোর অম্লানবদনে বলিলেন যে, আমরা ডুব-জাহাজ চাহিতেছি, ইংরাজের বাণিজ্যতরী ডুবাইয়া দিবার জন্য! আমাদের সে প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাত করিল না; পরন্তু মার্কিণের মনে আমাদের প্রতি অবিশ্বাস দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা হইল,—যে মার্কিণ লড়াইয়ে নামিয়াছিল ফরাসীকে শ্মশানচিতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। সে সময়ে আমি আমাদের প্রতিনিধি-চেম্বারকে যে কথা বলিয়াছিলাম, সে কথা তোমার মনে পড়ে কি?—America has entered the war because she will not see France on her funeral pyre,—সেই মার্কিণকে বিধিমত প্রকারে বিগড়াইবার চেষ্টা যাঁহারা করিলেন, আজ তাঁহাদের আহ্বানে আমরা জেনোয়া-বৈঠকে কেমন করিয়া যাই?"

জিয়োলিট্টি হাসিলেন—"তোমার এ অভিমান বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে না। একবার ঐ ওয়েল্‌শ ঐন্দ্রজালিক ভেল্কির মধ্যে তুমি আসিয়া পড়িলেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। বুলোঁ নগরে না তোমাদের শীঘ্রই দেখা-শুনা ও অনেক বিষয়ে আলোচনা হইবে?"

পোঁয়াকারে বলিলেন,—"তা' ত হবে; কিন্তু আগে হইতেই আমার একটা মন্তব্য লর্ড কর্জ্জনের নিকটে পাঠাইয়াছি; তাহাতে কোনও কথাই গোপন করি নাই। ভার্শাইল সন্ধির বড় কথাগুলার পুনরুত্থাপন যদি করা হয়, তাহা হইলে আমাদের জেনোয়ায় যাওয়া নিষ্ফল। ক্ষতিপূরণ বাবদে জর্ম্মণী কত টাকা দিতে বাধ্য, তাহা পাকাপাকি স্থির হইয়া আছে; রুশিয়াকে সভ্য য়ুরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, যদি সে আগেকার ঋণ স্বীকার না করে, সে সম্বন্ধেও আমাদের মতের দ্বৈধ ছিল না; পোলাণ্ড এবং ছোট-খাঁতাতের রাষ্ট্রগুলির যে সীমানা ভার্শাইলে স্থির হইয়া সাধারণ জনমত কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার কোনও প্রকার নড়চড় করা হইবে না। সাইলিশিয়ার সীমান্ত লইয়া জর্ম্মণী এখনও গোলযোগ করিতে প্রস্তুত। এই রকম অনেক গোলমালের কথা রহিয়াছে, যাহার সুমীমাংসা জেনোয়ায় হওয়া কঠিন। তাই আমি জেনোয়ার বৈঠক আপাততঃ তিন মাস স্থগিত রাখিতে বলিয়াছিলাম। ইংরাজী কাগজগুলা কিন্তু ইহারই মধ্যে হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাই ইংরাজ যখন বলিলেন,—'জেনোয়ায় চল,' আমি বলিলাম, 'জাহান্নমে যাও'।"

এই সমস্ত কথোপকথনের মধ্যে ইংরাজ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন; কিন্তু আর ধৈর্য্যরক্ষা করা অসম্ভব হইল। তিনি বলিলেন,—"সকলকে জেনোয়ায় উপস্থিত হইবার জন্ম অনুরোধ করিয়া আমি যে বিশেষ অন্যায় করিয়াছি, তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্বীকার করি,

আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমাদের আন্তরিক মিলনে বাধা দিতেছে; কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, সকলের সমবেত চেষ্টা না হইলে য়ুরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করা দুষ্কর। মার্কিণ আমাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে; এতদিনের স্তব্ধ এসিয়া আজ ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদের আচরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেছে; আফ্রিকায় নানা নবীন ভাব-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত তথাকার য়ুরোপীয় সভ্যতাভিমানী শ্বেতাঙ্গ নর-নারীর জীবন-তটে আছাড় খাইতেছে। সেই সভ্যতা-তরীখানি আজ বিষম হেলিতেছে, দুলিতেছে,- বুঝি বা ডুবিতেছে। এই য়ুরোপীয় সভ্যতার কোন্ এক গোপন স্তরে হয় ত প্রাচীন গ্রীসের শিল্পকলা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; রোমক নীতিশাস্ত্র আইন-আদালতের কঠিন কীলকে মানব-জীবন বিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু য়ুডীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের হাওয়া সেই নৌকার পাল স্ফীত করিয়া ধ্রুবতারার আলোকে আর তাহাকে চালিত করে না। এখন শিল্প-বাণিজ্য, আপিস, ব্যাঙ্ক যে সভ্যতার অঙ্গ, তাহার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে সোনা-রূপা ও কাগজের টাকার ধ্রুবত্বের উপর;—আন্তর্জাতিক দ্রব্য ও টাকা বিনিময়ের মধ্যে যদি কোথাও বিষম ফাঁক পড়িয়া যায়, তবেই সর্ব্বনাশ; এই exchange ও currency আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেই বিনিময় currency যদি বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে সবই গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। যুদ্ধের সময় য়ুরোপের সকলেই ঋণী হইয়াছিল মার্কিণের কাছে; এখন পর্য্যন্ত সে ঋণের বাবদে এক কিস্তিও টাকা দেওয়া কাহারও ঘটিয়া উঠিল না;—আসল ও সুদের হিসাব ভীষণ হইয়া উঠিতেছে।
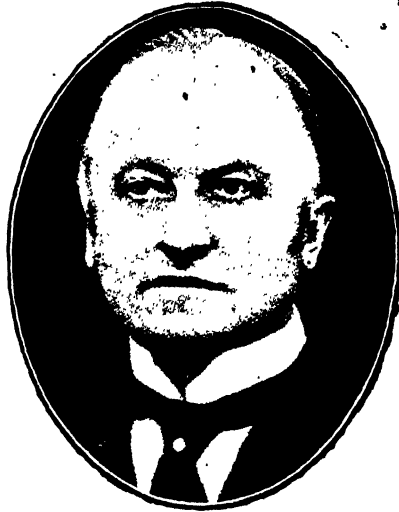
লর্ড কার্জ্জন।

তবুও হয় ত কিছু সুব্যবস্থা সম্ভবপর হইত, যদি আন্তর্জাতিক পরস্পর বিনিময়ের হার পূর্ব্বের মত অন্ততঃ মোটামুটি বজায় থাকিত। কিন্তু তাহা হইল না। ঘটনা-পরম্পরায় য়ুরোপের সমস্ত টাকা-কড়ির ব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। আমাদের গিনি (sovereign) ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব; লড়াইয়ের মাঝামাঝি মার্কিণ ডলারের কাছে তাহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইল। মার্কিণ স্পর্দ্ধাভরে বলিল—Henceforth the world will think in terms of dollars; তাহার কাছে আমাদের স্বর্ণমুদ্রার মূল্য পনের শিলিংএরও কম হইয়া গেল! বেগতিক দেখিয়া আমরা ফরাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া এক জন মার্কিণ ধনকুবেরকে আমাদের দালাল নিযুক্ত করিলাম। যত কিছু দ্রব্য অতঃপর আমেরিকায় ক্রয় করা হইল, ঐ দালাল সেগুলির মূল্য গিনিতে না দিয়া ডলারে দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এমন করিয়া কি বেশী দিন চলে? উত্তমর্ণ মার্কিণ যখন আমাদের স্বর্ণমুদ্রা উচিত মূল্যে গ্রহণ করিতে রাজি হইল না, তখন তাহাকে আন্তর্জাতিক বিনিময় currencyতে পূর্ব্বের মত খাড়া করিয়া রাখা গেল না। যুদ্ধের অবসান হইলে ভার্শাইলে আমরা পরাভূত শত্রুকে চাপিয়া ধরিলাম।

হার্ডিঞ্জ।

যে কয়লার দৌলতে গত শতাব্দীর প্রথমভাগে শিল্পবাণিজ্যে আমরা জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলাম, সেই কয়লা গত শতাব্দীর শেষভাগে জর্ম্মণীকে আমাদের চেয়েও বড় করিয়া দিল, এবং মার্কিণকে জর্ম্মণীর চেয়ে বড় করিয়া তুলিল।

হস্তান্তরিত করা হইল;—একটা ফরাসীকে ও অপরটা পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হইল। জর্ম্মণীর রহিল কেবলমাত্র ওয়েষ্টফেলিয়ার কয়লা। শিল্পবাণিজ্যে জর্ম্মণীকে সম্পূর্ণরূপে জখম করাই উদ্দেশ্য। সমস্ত বড় ও মাঝারি বাণিজ্যপোত কাড়িয়া লওয়া হইল। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল জর্ম্মণী বিজেতৃ-শক্তিপুঞ্জকে বৎসরে বৎসরে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইল, তাহা সুবর্ণমুদ্রা ভিন্ন অন্য কোনও রূপে দিলে গ্রাহ্য হইবে না; অর্থাৎ জর্ম্মণীর যত সোনা আছে, সে সমস্ত ভারে ভারে আমাদের শূন্য-কোষে অর্থাৎ আমাদের উত্তমর্ণ মার্কিণের বিপুল ধনাগারে নিয়মিত সময়ের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। যত কিছু জিনিষ সে রপ্তানী করিবে, সেগুলির উপর খুব কড়া শুল্ক বসাইয়া দেওয়া হইল। আর সমগ্র রাইণ নদের তটে ইংরাজ-ফরাসী-মার্কিণ পাহারা বসান হইল। তাহার খরচ জর্ম্মণী যোগাইতেছে। প্রবল শত্রুকে এইরূপে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া আমরা জয়োল্লাসে ভার্শাইল হইতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মিঃ লয়েড জর্জ্জ বলিলেন—এইবার জগতে গণতন্ত্র-রাষ্ট্রের আর কোনও বাধা থাকিবে না, the world will be made safe for democracy কিন্তু তিনি কি বুঝেন নাই যে, এ সন্ধি শুধু জর্ম্মণীর পক্ষে নয়, সমগ্র য়ুরোপের পক্ষে সাংঘাতিক হইবে? কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি না বুঝিয়া বাঘা ক্লেমাসাঁর কথায় সায় দিয়া গেলেন? ইটালীর তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী নিট্টি সম্প্রতি "শান্তিহীন য়ুরোপ" নামক যে পুস্তক রচিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৫এ মার্চ্চ তারিখে মিঃ জর্জ্জ ফরাসী প্রতিনিধিগণকে বিজয়োদ্ধত হইয়া জর্ম্মণীর প্রতি অবিচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণ-জাতীয় অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে অপর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হয়, ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেয় টাকা যাহাতে জর্ম্মণী এক পুরুষের মধ্যেই পরিশোধ করিতে পারে, যাহাতে তাহাকে পৃথিবীর কোনও হাটে ক্রয়-বিক্রয় করিবার বাধা দেওয়া না হয়, যাহাতে সে নিজের পায়ে ভর দিয়া পুনরায় দাঁড়াইতে পারে; মিঃ জর্জ্জ পুনঃ পুনঃ ফরাসীদিগকে তাহাই করিতে বলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—'য়ুরোপের বড় বড় দেশগুলাকে নৌ-বাহিনীদ্বারা অবরুদ্ধ রাখা ভাল হইতেছে না; জর্ম্মণীকে নেশন-সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হউক্। যদি জর্ম্মণীকে অত্যাচার-নিপীড়নে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলা হয়, তাহা হইলে, য়ুরোপের পক্ষে ভয়ঙ্কর হইবে।' ক্লেমাসাঁর পার্শ্বচরগণ যে জবাব দিলেন, তাহাতে মিঃ জর্জ্জের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তাঁহারা বলিলেন—'আপনি ভয় করিতেছেন যে, য়ুরোপে আমরা যে অবিচার করিতেছি, তাহাতে জর্ম্মণী ক্রুদ্ধ হইবে? তাহার প্রতি আপনারা যে অবিচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন,তজ্জনিত জর্ম্মণীর মর্ম্মান্তিক আক্রোশের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আপনারা তাহাকে বৈদেশিক সমস্ত হাট-বাজার হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহিতেছেন; তাহার উপনিবেশগুলা কড়িয়া লইতেছেন; তাহার নৌ-বাহিনী আত্মসাৎ করিতে প্রস্তুত। যাহা হউক, ও সব কথা কেন? মনে করুন না কেন যে, সুবিচারের অথবা অবিচারের জ্ঞান জর্ম্মণীর তিরোহিত হইয়াছে; আমরা সব সখা মিলিয়া যত ইচ্ছা অবিচার করিতে পারি।' বাদানুবাদ খুব হইল বটে; কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মিঃ জর্জ্জ শান্ত শিষ্ট ভালমানুষটির মত সন্ধির কাগজে সহি করিলেন; নিট্টিও সহি করিলেন।

"সে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা। জর্ম্মণীর সেনাদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। আমরাও ক্রমে ক্রমে বিদেশ হইতে অধিকাংশ সৈন্য ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে,—ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কর্ম্মক্ষম পুরুষ জর্ম্মণীর গ্রামে নগরে ছড়াইয়া পড়িল। রাজা নাই,—কিন্তু অরাজকতার লক্ষণ দেখা গেল না। নেপোলিয়নের এল্‌বা অথবা সেণ্ট হেলেনা, উইলহেল্‌মের এমারঙ্গেন্—ভাবুকের মনে কি কবিত্ব জাগাইয়া তুলে, জানি না; কিন্তু এই পঞ্চাশ লক্ষ জর্ম্মণ সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে, অন্নসংস্থানের কোনও উপায় তাহাদের নাই। পঁচিশ ছাব্বিশ লক্ষ বৃটিশ সৈন্যও দেশে ফিরিয়া দেখিল যে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া ভিক্ষাস্বরূপ ষ্টেটের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য লইয়া জীবনধারণ করিতে হইবে। কিন্তু ইংরাজের আশা ছিল, জর্ম্মণীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ বেশ মোটা টাকা মধ্যে মধ্যে পাইবে, তাহাতেই তা'র মুস্কিল আসান; কিন্তু জর্ম্মণীর কোনও আশা ছিল কি?

"দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর প্রায় কাটিয়া গেল। এখন

যাঁহারা মোটামুটি একটা হিসাব নিকাশ করিতে বসেন, তাঁহারা কোনও হিসাব মিলাইতে পারেন কি না, সন্দেহ। কেন পারেন না, তাহারও কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কার্য্য ও কারণের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড রহস্য-যবনিকা পড়িয়া রহিয়াছে;—মিসরের স্ফিংক্স-রহস্যের মত যে তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিবে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ফরাসীর বুদ্ধিতে সেই সমস্যা-সমাধানের যে উপায় সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, বাকি সমগ্র য়ুরোপ তাহা বাতুলতার পরিচায়ক বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। ফরাসী ভার্শাইল ছাড়িয়া এক পা যাইতে রাজী নহেন; মধ্য ও প্রাচ্য য়ুরোপ বলিতেছে, এবং আমরাও দেখিতেছি যে, ঐখানেই আমাদের সকলের মৃত্যুবাণ রহিয়াছে। অথচ ভার্শাইলের জন্য এক ফরাসীকে দোষ দিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়; য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ডের ও ইটালীর দায়িত্ব ফরাসীর অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। এই রহস্যময়ী সমস্যার উল্লেখ করিলেই বোধ হয়, ব্যাপারটা সকলের নিকটে সুস্পষ্ট হইবে। প্রথম দফা এই:—জর্ম্মণীর রাজ্য নষ্ট হইয়াছে, বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে;—উপনিবেশগুলি গিয়াছে; অধিকাংশ কয়লার খনিও গিয়াছে; কাগজের মুদ্রায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে, অথচ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে দফায় দফায় কিস্তিবন্দি করিয়া রেলের মালগাড়ী বোঝাই করিয়া স্বর্ণমুদ্রা মার্ক পশ্চিম সীমান্ত ছাড়াইয়া মার্কিণের কোষাগারে পৌঁছাইয়া দিতে হইতেছে। সমগ্র য়ুরোপই যখন মার্কিণের কাছে ঋণী, তখন সমস্ত সোনা তাহারই প্রাপ্য; কিন্তু এক কপর্দ্দকও সে স্পর্শ করিল না। বেল্‌জিয়ম্‌ ও ফ্রান্স কাঁদাকাটি করিতে লাগিল। আগে তাহাদিগকে না দিলে চলে না। যাক্‌, ও কথা এখন আলোচনা না-ই করিলাম। কিন্তু যে জর্ম্মণীর শিল্প-বাণিজ্য একেবারে জখম করা হইল, সে কেমন করিয়া এই ক্ষতিপূরণের টাকা যোগাইতে পারে? বিশেষতঃ ফ্রান্স বলিলেন,—'জর্ম্মণীকে বিশ্বাস নাই; সে সুযোগ পাইলেই ফাঁকি দিবে; তাহার নিকট হইতে প্রত্যেক পাই পয়সা আদায় করা চাই; যদি উহারা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে, তাহা হইলে আমাদের কাক্রী-সৈন্য রাইণ অতিক্রম করিয়া আরও দু' একটা প্রদেশ অধিকার করিতে প্রস্তুত আছে।' স্বদেশের মধ্যে অবাধ প্রচলনের জন্য যথেষ্ট-সংখ্যক স্বর্ণ-মুদ্রার যখন অভাব, আর চারিদিকে সে শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, তখন কোথা হইতে সহসা সে আলাদীনের দীপ পাইল, বলিতে পার কি? এক জন সেই আঁধার পুরীতে হঠাৎ সেই দীপ জ্বালিয়া দিল। ষ্টিন্‌স্‌ নামধেয় এক জর্ম্মণ কর্ম্মবীর বলিলেন—'এ আর বেশী কথা কি? আমাদের দেশে যেখানে যা' সোনা-রূপা আছে, বাহির করিয়া দাও। ওগুলাকে আগে বিদায় কর; আর আমাদের ষ্টেটের যত ছাপাখানা আছে, সবগুলা দিনরাত চালাইয়া দেওয়া হউক, কেবল অনবরত কাগজের মার্ক মুদ্রিত করা হউক। মুদ্রা ত দ্রব্য-বিনিময়ের সহজ উপায়-স্বরূপ; তা' আমাদের দেশের মধ্যে সোনা-রূপা না-ই রহিল, কাগ-জের টাকাতেই কাজ হইবে। যখন সোনায় আমাদের ঋণ-পরিশোধ করিতে হইবে, তখন সোনা চাই; অতএব আমাদের কাগজের মার্ক বিদেশে বিক্রয় কর।' রাশি রাশি মার্ক বিদেশের পোদ্দারের কাছে আসিল। এক পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ দু' শো, চার শো, ছ' শো, আট শো···সাড়ে চৌদ্দ শো'র উপর মার্ক দাঁড়া-ইল। গত সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেই জর্ম্মণী পঁচিশ কোটি পাউণ্ডের মার্ক বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় প্রথম কিস্তি ক্ষতিপূরণের দাবী মিটাইয়া দিল। এত মার্ক কিনিল কাহারা? যাহারা ভাবিল যে, এই সময়ে মার্ক কিনিয়া মজুত করিতে পারিলে, পরে যখন মার্কের মূল্য অধিক হইবে, তখন ছাড়িলেই প্রচুর লাভ হইবে। এক দিন না এক দিন অবশ্য মার্কের দাম চড়িবে। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল, মার্কের দাম চড়িল না। তখন

জিওলিট্টি

আমাদের দোকানী পশারী কারবারীরা হৈ-চৈ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, জর্ম্মণী পৃথিবীর হাটে সব চেয়ে সুবিধার দরে কেনা-বেচা করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া মার্কের দর চড়াইতেছে না। কেহ কেহ বলিল, সে নিজের দেশের মধ্যে মার্কের যে দর রাখিয়াছে, জর্ম্মণীর বাহিরে তদপেক্ষা অনেক কম দরে মার্ক ছাড়িতেছে; সুতরাং তাহার কারবার বাণিজ্য বেশ চলিতেছে; বিদেশ হইতে সে বহু জর্ম্মণ জিনিষ সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার পাইতেছে। ফরাসী বলিলেন, জর্ম্মণী আমাদিগকে ফাঁকি দিবার জন্য মার্ক লইয়া খেলা করিতেছে। সকলে বলিয়া উঠিলেন,—জর্ম্মণীর ছাপাখানাগুলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে সে আর কাগজের মার্ক ছাপিতে না পারে। জর্ম্মণ বলিলেন,—'সে কি কথা? কেহ কি ইচ্ছা করিয়া নিজের দেশের টাকার মূল্য কমাইয়া দেয়? ফাঁকি দিবার জন্য আমরা এমন কল পাতিয়াছি, যাহাতে সমগ্র নেশনটা দেউলিয়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এ রকম মনে করা কি বাতুলতা নহে? ফরাসীর যাত্রা ভঙ্গ করিবার জন্য জর্ম্মণী নিজের নাক কাটিতেছে, ইহা কি সম্ভবপর? মার্ক যখন কেহ লইতে চায় না, অথচ মার্ক বিক্রয় না করিলে reparation এর স্বর্ণমুদ্রা পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন মার্ক যে দরে অন্যে লইতে পারে, সেই দরে আমাদিগকে ছাড়িতে হইয়াছে; বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ছাড়িতে হইয়াছে; ইহাতে কিসে আমাদের চাতুরী প্রকাশ পাইতেছে, বুঝিতে পারি না।' আমরা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নই; বলিলাম—'যুদ্ধের পূর্ব্বে তোমরা আমাদের নিকট হইতে অনেক জিনিষ কিনিতে; এখন আমরা সেই সব এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারি, কিন্তু তোমরা অর্ডার দিতেছ না কেন? এখন তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে আমাদের আপত্তি নাই।' জর্ম্মণী উত্তর করিল, 'তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে আমাদেরই কি আপত্তি আছে? তবে একটা মস্ত বাধা এই যে, তোমরা কেহ আমাদের নির্দ্ধারিত মূল্যে মার্কের পরিবর্ত্তে জিনিষ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নও; অথচ তোমাদের পাউণ্ডের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিতে গিয়া আমাদের মার্কের এই দুর্গতি দাঁড়াইয়াছে। ধারে জিনিষ দিতে পার? খুব লম্বা ওয়াদায় ধার, long-term credit? যখন সামর্থ্য হইবে, মূল্য দেওয়া যাইবে।' কিন্তু তাহাতে আমাদের চলে কি? পোল্যাণ্ডের মার্ক, রুশিয়ার রুবল, অষ্ট্রীয়ার ক্রোণ কোন অতলে ডুবিয়াছে; ইটালীর লাইরার

ফরাসীর ফ্রাঙ্কের ও আমাদের পাউণ্ডের সঙ্গে ইহাদের কোনও সমতা রাখা অসম্ভব হইয়াছে। অথচ এই gold parity'র উপর আমরা এতকাল নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি; কোনও আকস্মিক ভূকম্পে আমাদের সেই চিরাভ্যস্ত gold parity নষ্ট হইয়া গেলে, আমাদের মনে হয়, যেন য়ুরোপীয় সভ্যতা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের জিনিষের কাট্‌তি য়ুরোপে একেবারে নাই বলিলেই চলে; কল-কারখানার কাজ বড়ই মন্দ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এ দেশে যে আমদানী রপ্তানী হইয়াছিল, ১৯২১ সালে তাহার ঠিক অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। ফরাসী যে সকল বিলাস-সামগ্রী স্বদেশে প্রস্তুত করে, তাহা জর্ম্মণীকে ক্রয় করিতে অনুরোধ করা হইল। জর্ম্মণী বলিল—আমাদের জীবনধারণের উপযোগী অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি কি দিয়া ক্রয় করিব, তাহার চিন্তায় আমরা আকুল; বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করা এখন অসম্ভব। বিজেতা ইংরাজ ও ফরাসী নিজ নিজ পণ্য লইয়া য়ুরোপের কোন হাটে বিকাইতে পারিতেছে না। জর্ম্মণীর নিকট হইতে ঠিক যে পরিমাণ টাকা পাইবার আশা করা গিয়াছিল, তাহা অবশ্যই কেহ আমরা পাইলাম না; সুতরাং বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার হিসাবে একটা আনুমানিক অঙ্ক বসাইয়া মিত্র-শক্তিদের মধ্যে কাহারও কাহারও বজেট ঠিক করিতে হইয়াছে। য়ুরোপের বর্ত্তমান সমস্যার এই দিক্‌টাই আমাদের সকলের চোখে পড়ে। দেখিয়া শুনিয়া মার্কিণ লেখকরা দূর হইতে বলিতেছেন,—'য়ুরোপ একটা প্রকাণ্ড হাসপাতাল; সকলেই শয্যাগত; কাহারও উঠিবার শক্তি নাই; আবার মজা এই যে, যদি কোনও কবিরাজ রোগের নিদান আবিষ্কার করিয়া আরোগ্য লাভের জন্য সুপরামর্শ দেন, তাঁহার ব্যবস্থায় কেহ কর্ণপাত করেন না। ইংরাজ ফরাসীকে দোষ দেন, ফরাসী ইংরাজকে দোষ দেন, এবং ইটালীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী নিট্টি ইংরাজ ও ফরাসী উভয়কেই দোষী বিবেচনা করেন।' আমাদের এই আঁতাৎ প্রায় কর্পূরের মত রাতারাতি উবিয়া যাইতেছে। কিন্তু বন্ধুবর পৌয়াকারে কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যে, ভার্শাইল্‌ই য়ুরোপের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে।"

পৌয়াকারে মুখ তুলিলেন—"ভার্শাইল্ য়ুরোপের সর্ব্বনাশ [illegible]

ইংরাজের চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল।…"যে চতুর্দ্দশ লুই, সুরম্য ভার্শাইল্ প্রাসাদ ও মর্ম্মর-নির্ঝর-সেবিত ত্রিয়ানং-কুঞ্জভবন রচিত করিয়াছিলেন, সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পরে আজ তিনি ক্লেমেঁসো পোঁয়াকারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতেছেন। এক দিন মদোদ্ধত লুই বলিয়াছেন—L'etat ? c'est moi, রাষ্ট্র ? সে ত আমি !' আজ তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি বলিতেছেন—'La Europa ? c'-est moi, য়ুরোপ ? সে ত আমি !"

দন্তে দন্ত নিপীড়ন করিয়া পোঁয়াকারে বলিলেন—"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে !' যে যুদ্ধে সমগ্র ফরাসী জাতি চিতারোহণ করিয়াছিল, সে যুদ্ধ বিলাসী সমুদ্রমেখলদ্বীপবাসী ইংরাজের মুখের অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটের ভস্মাগ্রটুকুও স্খলিত করিতে পারে নাই !"

ইংরাজ ধীরস্বরে বলিলেন—"যুদ্ধে পারে নাই সত্য ; কিন্তু ভার্শাইলের সন্ধিতে আমাদের পোড়া চুরুটের ছাই কেন, আস্ত চুরুট হইতেই আমরা একেবারে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। আমাদের পাদরী ডীন্ ইঞ্জ্ বলিতেছেন, আমাদের কিছুতেই রক্ষা নাই—যদি আমরা ভার্শাইলের মত সন্ধি-শর নিক্ষেপ করিতে থাকি—if we wage peace ; তাঁর এই ছোট্ট bon motটুকু তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে কি ?"

ব্রিয়াঁ।

বেগতিক দেখিয়া বেল্জিয়মের এমিল্ ক্যামেয়ার্ট মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন—"আপনারা নিজ নিজ দুঃখের কাহিনী বলিতেই ব্যস্ত। একবার আমাদের অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন দেখি। ফরাসী মনে করিতেছেন, তিনি সম্মুখে না দাঁড়াইলে ইংরাজ বাঁচিত না ; ইংরাজ ভাবিতেছেন যে, তিনি না দাঁড়াইলে ফরাসী বাঁচিত না। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রথম তিন সপ্তাহ আমরা যদি শত্রুর গতিরোধ না করিতাম, তাহা হইলে আপনারা উভয়ে কোথায় দাঁড়াইতেন ? আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখুন। আমরা কিন্তু পরস্পরের দোষ ধরিয়া চুল চিরিয়া বিচার করিতে বসা প্রয়োজন মনে করি না। সে প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডায় বিশেষ কোনও লাভ নাই, বরঞ্চ মনোমালিন্য আমাদের নিবিড় সখ্য-বন্ধন শিথিল করিয়া দিতে পারে। যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে ; এখন দেখিতে হইবে, কিসে সব দিক্ বজায় থাকে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, ১৯১৩ সালের প্রত্যেক দেশের লোকসংখ্যার অনুপাত ফ্রান্সের লোকক্ষয় গত যুদ্ধে শতকরা ৪·৬ হইয়াছে, ইংলণ্ডের ২·২ এবং আমাদের ২·৬। কাজেই ইংরাজের চুরুটের অগ্রভাগ হইতে ছাইটুকু পর্য্যন্ত খসিয়া পড়ে নাই, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের মোট লোকসংখ্যা পঁচাত্তর লক্ষ যুদ্ধের প্রাক্কালে ছিল ; এখনও তাহাই আছে বলিলে চলে। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা পূর্ব্বেও ছিল চার কোটি ; এখনও তাহাই আছে ;—এল্সাস্ লোরেণের লোকসংখ্যা হিসাবের মধ্যে ধরিয়া লইয়াও বিশেষ কিছু বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায় নাই। গ্রেট বৃটেনে চারি কোটির কিছু অধিক ছিল, অল্প কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এল্সাস লোরেণ ও সাইলিশিয়া বাদ দিলে জর্ম্মণীর লোকসংখ্যা এখন মোটামুটি ছয় কোটি ধরা যাইতে পারে। যুদ্ধের অবসান হইলে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছিলাম। প্রায় আটত্রিশ লক্ষ লোকের খাওয়া-পরার ভার ষ্টেট লইল। দেশের অর্দ্ধেক লোক কাজ খুঁজিতে ব্যস্ত ; কিন্তু কাজ দেয় কে ? বৎসর দেড়েকের মধ্যে কিন্তু অধিকাংশ নিষ্কর্ম্মা লোককে আর অকেজো অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইল না। দেশের পুনর্গঠনকার্য্যে সকলকে যথাসম্ভব নিয়োজিত করা হইল। ৪০,০০০ কিলোমিটর বাঁধান রাস্তার প্রায় পঞ্চমাংশ নষ্ট হইয়াছিল ; ৬,৬০০ কিলোমিটর

রেলপথের অর্দ্ধেকেরও বেশী বিধ্বস্ত হইয়াছিল; অধিকাংশ রেলগাড়ী যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহার কোনও খবরই আমাদের জানা ছিল না। ১৯১৯ এর মে মাসে আমরা জর্ম্মণীর দেয় টাকার প্রথম দশ কোটি পাউণ্ড পাইবার অধিকারী হইলাম। আমাদের মিত্র-শক্তিবর্গের নিকটে আমরা যত টাকা ঋণ করিয়াছিলাম, তাহা জর্ম্মণীর ঘাড়ে আপনারা চাপাইয়া দিয়া আমাদিগকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যের উপযোগী যত গরু ঘোড়া জর্ম্মণী আমাদের দেশ হইতে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি সে ফিরাইয়া দিল। ৪৭,০০০ বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২৪,০০০এরও অধিক পাকা বাড়ী, এবং ১২,০০০ অস্থায়ী কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমাদের কয়লার খনি-গুলাতে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার লোক কাজ করিত; ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইল এক লক্ষ উনষাট হাজার। পিতল-কাঁসার কারখানায় ১৯১৩ সালে ছিল এক লক্ষ সাইত্রিশ হাজার; সাত বৎসর পরে দাঁড়াইল এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার। এমনই করিয়া অধিকাংশ লোকের কাজ জুটিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আপনাদের গায়ে পড়িয়া এমন করিয়া আমি সহসা আমাদের নগণ্য ক্ষুদ্র দেশের কথা বলিতে বসিলাম কেন? ইংলণ্ডের চার কোটি নর-নারীর মধ্যে বিশ লক্ষ কর্ম্মক্ষম লোকের কাজ জুটিতেছে না। অনেক কল-কারখানার কর্তৃপক্ষীয়েরা বহু কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দিয়াছে; কতকগুলা কারখানা প্রায় বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছে। ইংলণ্ডের উভয়-সঙ্কট;—জর্ম্মণীর নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রা লইলেও বিপদ; ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দ্রব্যাদি লইলেও বিপদ। জর্ম্মণীর অনেকগুলি বাণিজ্য-পোত ইংলণ্ডের হস্তগত হইলে গ্রেট বৃটেনের নৌ-কারখানায় যতগুলি নূতন জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই অনাবশ্যক হইয়া পড়িল; সুতরাং কয়েক হাজার মিস্ত্রী ও কারিকরের চাকরী গেল। জর্ম্মণীর রং ইংরাজ কিছু পাইলেন; অমনই ইংরাজের নব-প্রতিষ্ঠিত রংএর কারখানা বাঁচাইবার জন্য নূতন আইন করিতে হইল। এ যেমন এক দিক্‌কার কথা; তেমনি আর এক দিক্ দেখুন। জর্ম্মণীর লোকসংখ্যা ছয় কোটি। যুদ্ধশেষে পঞ্চাশ লক্ষের অধিক সৈন্য ও সামরিক কর্ম্মচারী একেবারে কর্ম্মহীন বেকার হইয়া পড়িল। অন্নযোগাড়ের যোগাইবার জন্য যে সকল বড় বড় কারখানায় গোলা, বারুদ, গ্যাস, এরারোপ্লেন প্রভৃতি তৈয়ার করা হইত, সেখানকার লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর অন্নের উপায় রহিল না। কিন্তু ইহারই মধ্যে অধিকাংশ লোকের কাজ জুটিয়াছে; বোধ করি, কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ এখনও ষ্টেটের নিকট হইতে মাসহারা লইয়া জীবনধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে। এ প্রহেলিকা মন্দ নয়। এখন য়ুরোপের অন্ন-বস্ত্রের এই বিষম সমস্যার সমাধান কিসে হইবে?"

ইংরাজ বলিলেন—"তাই ত বলিতেছি, জেনোয়ায় চল; সকলে মিলিয়া একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

ফরাসী বলিলেন,—"একটু ভাবিবার কথা বটে। ওয়াশিংটন রাইণে পাহারা দেওয়ার খরচ বাবদ যে টাকা চাহিয়াছে, তাহা এখনই দিতে হইলে আমরা একটি পয়সাও পাই না। কিন্তু রুশিয়া…"

প্রেতের অট্টহাস্যের মত একটা অস্বাভাবিক শব্দ করিয়া রুশ বলিলেন,—"এখনও রুশিয়াকে তোমাদের পংক্তিতে বসিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিতেছ না? ত্রিশ বৎসরের নিবিড় সখ্যভাবের কি এই পরিণাম? রোম্যানফ্ বংশের পুঞ্জীভূত ঋণস্বীকার করিয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করি নাই বলিয়া তোমাদের এত আক্রোশ? পোলাণ্ডকে শিখণ্ডীর মত সম্মুখে খাড়া করিয়া তোমরা ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া আমার উপর শরনিক্ষেপ করিলে; রুশের বিরুদ্ধে রুশকে ক্ষেপাইয়া তুলিলে;—সেই য়ুডেনিচ-ডেনিকিন-কলচ্যাক-সংবাদ কতটা তোমাদের কাহিনীর সহিত জড়িত, তাহা তোমরা খুব জান। কি আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া তোমরা জলপথে স্থলপথে আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছ, বল দেখি? আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম? আজ ভল্গাপ্রদেশে দুই কোটি নর-নারী অন্নাভাবে মরিতেছে; কচিকচি ছেলে-মেয়েরা কেমন করিয়া বাঁচিবে, সে কথা ভাবিতে পারিতেছ না? সমগ্র ভল্গা-প্রদেশকে প্রেতপুরী করিল কে? কি বলিতেছ? ভল্গা-প্রদেশ হইতে আড়াই শ' মাইল দূরে ডেনিকিন ও কলচ্যাক লড়াই করিয়াছিল, অতএব তাহারা ওখানকার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী নহে? আড়াই শ' মাইলের মধ্যে তা'রা আসে নাই,—সত্য; কিন্তু ঐ প্রদেশের মানব-সমাজের বিচিত্র জীবন-প্রবাহ যে চারিদিকে এর ভিতর দিয়া

প্রবাহিত হইত,—বল দেখি, ভল্গার সেই মর্ম্মস্থানের উপর ডোনিকিন্ প্রমুখ কত 'শ্বেত'-চমূ-নায়ক পদাঘাত করিয়াছে? চেকো-শ্লাভাক আততায়ীরা যখন সামারা, কাজান, সারাটফ প্রভৃতি দখল করিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর একটা অত্যন্ত স্পর্দ্ধাসূচক ইস্তাহার জাহির করিল, তাহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইল যে, প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিক পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়াছেন যে, বলশেভিক রুষিয়াকে বিধ্বস্ত করার জন্য চেকো-শ্লাভাকের যে শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহার মূল্য-স্বরূপ নবীন চেকো-শ্লাভাক রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। যে সামাবায় এই ইস্তাহার জাহির হইয়াছিল, সেটা কোন্‌খানে জান কি? বাকুর পেট্রোলিয়ম তৈল, ডনেট্‌জএর কয়লা, ভল্গার গম, যব, ধান প্রভৃতি শস্য কে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল? তেল, কয়লা, শস্য আটকাইয়া কে আমাদের শিল্প-বাণিজ্য ছারখার করিয়া দিল? শিল্প গেল; মস্কো গভর্মেণ্ট শস্যের বিনিময়ে চাষাকে কাগজের রুবল ব্যতীত আর কিছু দিতে পারিল না। কৃষকের চাষ-আবাদ কমিয়া গেল। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। 'We spent £100,000,000 in causing it'—মিঃ ম্যাসিংহাম একখানা ইংরাজি কাগজে সম্প্রতি ইহা কবুল করিয়াছেন। আর ফরাসীর দায়িত্ব কত বেশী? কিন্তু পুস্কিণ, টুর্গেনিফ, টলষ্টয়, ডষ্টয়ভস্কির দেশকে নষ্ট করিতে কেহ পারিবে না। আমাদের পল্টাভার বিজয়োদ্ধত সুইডেন চিরনির্ব্বাণ লাভ করিল;—আর আমাদের মস্কো কি তোমরা ভুলিয়াছ? ...এবার আমাদিগকে বাদ দিয়া কেমন করিয়া এই ভাঙ্গা য়ুরোপ জোড়া লাগে, তাহা মস্কোর third international বিবেচনা করুন।"

জর্ম্মণ বলিলেন,—"আমি কাগজের ফানুস বানাইয়া গোটা য়ুরোপটাকে হাওয়ার উপর উড়াইতেছি,—আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ! কে আমাকে নগ্ন করিয়া জগতের রঙ্গমঞ্চে নিষ্ঠুরভাবে দাঁড় করাইল। বলশেভিক রুষিয়া রাজবংশের দপ্তর হইতে যে সকল গোপন কাগজ-পত্র প্রকাশিত করিয়াছে, তাহাতে কি এই মহাযুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ জর্ম্মণীকে দায়ী করা যায়? স্তাজনফ ও পোঁয়াকারের তখনকার পত্রাবলী কি সাক্ষ্য দিতেছে? এতকাল পরে সে দিন কেন মিঃ লয়েড জর্জ্জ ইংরাজকে বলিলেন,—We all tumbled into the war? তাই যদি হইল, তবে আমার স্কন্ধে reparationএর এই গুরুভার চাপান হইল কেন? এখানে সে সকল কথা তুলা নিষ্ফল; বিশেষতঃ যখন দেখিতেছি যে, যদিও পোঁয়াকারে জেনোয়ায় পদার্পণ করেন, তাঁহার এক পা ভার্শাইলে থাকিবেই থাকিবে।"

অষ্ট্রীয়া বলিলেন,—আমরা যদি জর্ম্মণ রাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের সব দিক্ বজায় না থাকুক, অন্ততঃ আমরা রক্ষা পাইতাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্যবিধাতারা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। জাতি হিসাবে আমরাও জর্ম্মণ; তবে এ মিলনে আপত্তি হইল কেন? গণনা করিয়া দেখা হইল যে, ছয় কোটি জর্ম্মণের সঙ্গে আমরা আশী নব্বই লক্ষ মিশিয়া গেলে ফরাসীর চার কোটি অপেক্ষা এত অধিক দাঁড়াইয়া যায় যে, পুনরায় যদি কখনও জর্ম্মণীর প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠে, তবেই সর্ব্বনাশ! এই কাল্পনিক ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কেহ আমাদের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না। যে পোল্যাণ্ড চেকো-শ্লোভাক ও যুগো-শ্লাভ ষ্টেট ফরাসীর বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই ফরাসীর আপদে বিপদে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে; তবে ভিয়েনাকে এমন করিয়া এক-ঘরে করিলে কেন? সমস্ত দেশ দুধ, রুটী, পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে হাহাকার করিতেছে; মার্কিণ ও ইংরাজ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেছেন। আমাদের ক্রোণমুদ্রা য়ুরোপের উপহাসের সামগ্রী হইয়াছে। কিসের জোরে আমরা অন্যের সহিত দ্রব্য-বিনিময় করিতে সাহস করি? জেনোয়ায় আমাদের কোনও উপায় স্থির করিবে কি না, বলিতে পারি না। আমাদের একুল ওকুল দুকুল গেল দেখিয়া আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে ল্যানায় সন্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। ফরাসী একটু খুসী হইলেন বোধ হয়; কিন্তু যাঁহারা জর্ম্মণ putsch এর দিকে ঝোঁক করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন। কার্ল্‌গেলেন, হ্যাপসবর্গ বংশের ইতিহাস এখন প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু হ্যাপসবর্গ ধুরন্ধররা আমাদের কি দশায় ফেলিয়া গেলেন?"

পোল্যাণ্ড বলিলেন,—"আমরা অষ্ট্রীয়া বা রুষিয়ার বিরোধী, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না। আমরা যদি বলশেভিক রুষিয়ার বিরুদ্ধে বৈরিভাব পোষণ করিতাম, তাহা হইলে সেনাপতি র‍্যাঙ্গেলের

অমন দুর্গতি বোধ করি হইত না। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট প্যাডারুস্কি ও মার্শাল্ পিল্সুড্স্কি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হেমন্তকালে বলশেভিক রুষিয়ার সহিত সন্ধি করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন; লয়েড জর্জ্জ ও ক্লেমেসোঁ কিছুতেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেন না। হয় ত ফরাসী আমাদের উপর কিছু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু আমাদিগকে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ ছিল না, এবং এখনও নাই। অষ্ট্রীয়ার বিরোধী হইব কেন? তাঁহার নাড়ী কাটিয়া যে চেকো-শ্লোভাক ও যুগো-শ্লাভ ষ্টেট দুইটি জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বত্র শ্লাভজাতির প্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধ-পরিকর; সেই শ্লাভ-সার্ব্বভৌমিকতা আমাদের জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের সহিত কিছুতেই মিশ খাইতে পারে না। আপনারা সকলেই ইহা জানেন বলিয়া আমি অসঙ্কোচে আজ আপনাদের সকলের সমক্ষে এ কথাটার উত্থাপন করিলাম। এই নবীন শ্লাভ-রাষ্ট্রগুলির সহিত মিলিত হইয়া নব-জাত পোল্যাণ্ড যে অষ্ট্রীয়ার অনিষ্টসাধন করিবার চেষ্টা করিবে, তাহা সহজে হইতে পারে না। স্বীকার করি, সেনাপতি কর্ফাণ্টির অভিযানে ও অন্যান্য কয়েকটা ব্যাপারে আমাদের প্রতিবেশী-দিগের সহিত কিছু অসদ্ভাব হইয়াছে; সে কেবল আমাদের রাষ্ট্রের সীমান্ত-রেখা পাকাপাকি স্থির করিয়া দেওয়া হয় নাই বলিয়া। আমাদের মার্ক মুদ্রা যে এক এক খণ্ড সাধারণ সাদা কাগজের চেয়ে কম মূল্যবান্, সে কথা পরিব্রাজক ডক্টর ডিলন্ সম্প্রতি য়ুরোপে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। এ অবস্থায় আমাদিগকে রণ-সাজে মণ্ডিত হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা কখন্ কি হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে! অদৃষ্টের এই পরিহাস হইতে জেনোয়া আমা-দিগকে নিষ্কৃতি দিবে কি? জেনোয়ায় আমরা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে চাহি না; ছোট-আঁতাতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একযোটে কাজ করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তাহাতে অন্য কাহারও বিশেষ কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারে না। আবার য়ুরো-পের ইতিহাসে পোল, শ্লাভ ও চেক্এর বিভিন্ন cultureকে জোর করিয়া কেহ একটা রাষ্ট্রীয় কটাহে চাপাইয়া অদ্ভুত সমন্বয়ের চেষ্টা করিলে হ্যাপ্স্বর্গের মত সফল-প্রযত্ন হইবেন না। নেশন হিসাবে আমাদের একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা আছে বটে; কিন্তু এখন সমগ্র য়ুরোপের একমাত্র সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—অর্থ-সমস্যা। এই ইকনমিক্ ব্যাধির নিরাকরণ করিতে না পারিলে ফল—"অপমৃত্যু।"

ইটালী বলিলেন,—"তাই ত দেখিতেছি! আর সবুর করা চলে না। জেনোয়া-সন্মিলনে আর কোনও বাধা-বিপত্তি না ঘটে, তাই আমাদের গভর্মেণ্ট ১০ই এপ্রিল বৈঠক বসিবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমাদের নিজের গোলমাল অনেকটা মিটিয়াছে। বণমী সরিয়া দাঁড়াইলেন; ফ্যাক্টো নূতন মন্ত্রি-সংসদ্ গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি এরই মধ্যে জেনো-য়ার তারিখ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, মার্কিণ আসিবেন না। মার্কিণ স্বর্ণস্তূপের উপর নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন। অনেকে মনে করেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে য়ুরোপকে তাঁহার স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিতে পারেন। যদি তিনি পঁচিশ ত্রিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা য়ুরোপের বাজারে চালাইতে দিতেন, তাহা হইলে য়ুরোপের অর্থ-বিনিময় ব্যাপারে পুনরায় gold parity ফিরিয়া আসিত; য়ুরোপ আবার ক্রয়-বিক্রয় করিতে সমর্থ হইত। য়ুরোপের এই সামর্থ্যহীনতা মার্কিণের পক্ষেও অনিষ্টকর হইয়াছে; মার্কিণের অনেক জিনিষ য়ুরোপ কিনিতে পারিতেছে না। ফলে সেখানেও দাঁড়াইয়াছে এই যে, বহু সহস্র কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কাজ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কাজ পাইতেছে না। কিন্তু তবুও মার্কিণ কোনও সর্ত্তে আপাততঃ য়ুরোপকে সোনা দিয়া সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক। য়ুরোপের কেহ কেহ বলিতে-ছেন,—'রূপকথার রাজপুত্রের মত মার্কিণ আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া মূর্চ্ছিতা য়ুরোপকে সোনার কাঠী স্পর্শ করাইয়া সঞ্জীবিত করিতে পারেন।' কিন্তু তিনি য়ুরোপের যে মূর্ত্তি দেখিতেছেন, তাহা কল্যাণময়ী নহে; তাহা ভীমা রাক্ষসী মূর্ত্তি। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত। পরিধানে এখনও যোদ্ধৃবেশ। তাই মার্কিণ ইতস্ততঃ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। য়ুরোপকে ভাল করিয়া জাগাইতে হইবে। জেনোয়া পারিবে না কি? দুর্দ্দিনের সখার মত মার্কিণ যে দিন য়ুরো-পের পার্শ্বে আসিয়া এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয় লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সে দিনের কথা তিনি কেমন করিয়া ভুলিলেন? এখনও য়ুরোপার দুঃখ-যামিনীর অবসান হয় নাই। হায়! তবে—

'থাকিতে যামিনী কেন
গুণমণি যেতে চায়!
ফিরাইলে যাত্রাভঙ্গ,
না ফিরালে প্রাণ যায়।'

* * * * *

উদ্যোগ পর্ব্ব সমাপ্ত হইল বটে; কিন্তু ইহার শেষভাগে ইটালীর যে lyrical mood জেনোয়া-যজ্ঞের আয়োজনকে ব্যর্থ হইতে দেয় নাই, সভা-পর্ব্বেও তাহা সমবেত সুধীজনের মনকে স্নিগ্ধ-মাধুর্য্য-রসে সিক্ত করিতে পারিয়াছে। পোঁয়াকারে নিজে না গিয়া বার্টুকে পাঠাইয়াছেন। বার্টুও Quay d' Orsay'র সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কাজ করিতেছেন না। ফরাসী গোড়া হইতে ধরিয়া বসিয়াছেন যে, ক্যানে বৈঠকে যে রকম স্থির করা হইয়াছিল, সেই রকম কাজ এ ক্ষেত্রে করিতে হইবে; অন্যথাচরণ হইলে ফরাসী সরিয়া পড়িবেন। সভাপতি ফ্যাক্টা মধুর ভাষায় সভার উদ্বোধন করিলে পর কতকগুলি কমিটী গঠিত হইল। রুশিয়া হইতে লেনিন আসিতে পারেন নাই;—তখনও তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে আততায়ীর বন্দুকের গুলী ডাক্তার বাহির করিতে পারেন নাই। কিন্তু বলশেভিক পররাষ্ট্র-সচিব চিচারিণ, লিট্‌ভিনফ ও ক্রাসিনকে সঙ্গে লইয়া জেনোয়ায় আসিয়াছেন। চিচারিণ বলিলেন,—"এ কমিটীতে জাপানকে বসিতে দেওয়া উচিত নয়; কারণ, সে এখনও আমাদের সাইবিরিয়ার অংশবিশেষ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে!" রুশিয়ার এ তেজোব্যঞ্জক উক্তিতে সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল। ভাইকাউণ্ট ইশিয়াই বলিলেন—"চিচারিণের সম্মতি থাকুক আর না-ই থাকুক, আমি এ কমিটী হইতে নড়িতেছি না।"...কিছুকাল পরে চিচারিণ বলিলেন—"ফরাসী এখনও রণ-সাজ পরিয়া আছে। ওয়াশিংটনে সে বলিয়াছিল যে, রুশিয়ার ভয়ে তাহাকে সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিতে হইয়াছে। বেশ কথা। আমরা অস্ত্রত্যাগ করিতেছি; তাঁহারা করিবেন কি?" ফরাসী কি একটা নূতন ওজর করিলেন। গোলযোগ বৃদ্ধি পায় দেখিয়া ফ্যাক্টা মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিলেন।

ফরাসী বলিলেন,—"রুশিয়া আগেকার দেনা শোধ করিবে ত?" রুষ বলিলেন,—"তা'তে আমাদের আপত্তি নাই। কেবল আপনাদের পাঁচ জনের চেষ্টায় আমাদের দেশে 'সাদা'র দল যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহার হিসাবটাও আপনারা মিটাইয়া দিবেন। বোধ হয়, তাহা হইলে আমাদের দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ সহজ হইবে।" বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! এ আবার কি! ইংরাজ, ফরাসী, জাপান গরম হইয়া উঠিলেন। খবরদার! ও সব কথা চলিবে না।... জর্ম্মণ চান্সেলর ওয়ার্থ একখণ্ড কাগজ লয়েড জর্জ্জএর হাতে দিলেন। রুষ-জর্ম্মণ মৈত্রী রীতিমত সন্ধি-সূত্রে গ্রথিত হইয়া গেল। এবার কিন্তু ইটালীর lyrical moodও কিঞ্চিৎ রৌদ্র হইয়া উঠিল। লয়েড জর্জ্জ বলিলেন,—"ক্ষুব্ধ জর্ম্মণীর সহিত ক্ষুধিত রুশিয়ার এ সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী। আর রাগ করা বৃথা।"

জেনোয়ার রঙ্গমঞ্চ কি রুশিয়ার জন্যই রচিত হইয়াছিল?

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

দারিদ্র্য।

তোমারে চিনিল শুক, উদ্ধব, অক্রূর,
সহর্ষে বরিল শীর্ষে রাজর্ষি জনক,
সেবিয়া হইল ধন্য নারদ বিদুর,
সর্ব্বস্বে কিনিল বলি, জিনিল সনক।
দাও তব নৈমিষের হরীতকী দু'টি
তোমার কাম্যক-ব্যথা চির-কাম্য প্রিয়,
তব বদরিকাছায়ে চিরদিন লুটি
তোমার দণ্ডক-দণ্ড চিরদিন দিও।
তোমার সন্তোষ-ক্ষেত্র ভারতের বুকে,
তোমার বৈশালী মন্ত্র নিশিদিন জপি,
তব বোধিদ্রুমচ্ছায়ে যেন রহি সুখে
তব তক্ষশিলা-বক্ষে সবি যেন সঁপি।
যদি কৃত্তিবাসে পাই দিবা অবসানে
চিরদিন র'ব আমি তোমার শ্মশানে।

শ্রীকালিদাস রায়।

ভিক্ষা।

১

পাটনা জংশন ষ্টেশনে যাত্রিপূর্ণ পঞ্জাব মেল দাঁড়াইয়া ছিল। উহা তখনই ছাড়িবে। প্রথম ঘণ্টা অনেকক্ষণ হইল আরোহীদিগকে সতর্ক করিয়া বাজিয়া গিয়াছে। যাহারা বিলম্বে টিকিট কিনিয়াছিল, স্থানের আশায় তাহারা ছুটাছুটি করিয়া এক কামরা হইতে অন্য কামরার দ্বারে ব্যগ্রভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু প্রত্যেক কক্ষই যাত্রীতে পরিপূর্ণ। পূজার অবকাশ শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাঁহারা অবসরযাপনের জন্য ছুটীতে পশ্চিমের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; তাঁহারা সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে ব্যগ্র, কাজেই গাড়ীতে তিলধারণের স্থান ছিল না।

গার্ড প্রজ্বলিত-বর্ত্তিকা হস্তে পশ্চাতের ব্রেকের কাছে দণ্ডায়মান। তাঁহার বাম হস্তে বাঁশী। গাড়ী ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই।

এমন সময় সাধারণ ভদ্র-পরিচ্ছদধারী এক বাঙ্গালী যুবক তাড়াতাড়ি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চকিতে গাড়ীর মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া সে পশ্চাদ্বর্ত্তী কাহাকেও ডাকিয়া বলিল, "মামা, এ দিকে আসুন। এখানে জায়গা আছে। চট্ ক'রে আসুন!"

একটি প্রৌঢ় হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে একটি কুলী একটা ট্রাঙ্ক, দুইটি ছোট বিছানার মোট ও একটি 'পোর্টমেণ্ট' লইয়া আসিতেছিল।

যুবক মুহূর্ত্তমধ্যে দরজার হাতল ঘুরাইয়া উহা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু সে কামরায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কক্ষমধ্যস্থ দুই জন শ্বেতাঙ্গ আরোহী ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দরজা চাপিয়া ধরিল; তাহার পর তীব্রস্বরে বলিল, "এই ও, ভাগো হিঁয়াসে! দোসরা কাম্‌রামে যাও।"

এইরূপে বাধা পাইয়া যুবক মুহূর্ত্তমাত্র সেই শ্বেতাঙ্গযুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বলিয়া উঠিলেন, "চল, বাপু, অন্য কামরা দেখি!"

যুবক তখন শান্তভাবে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল, "অন্য গাড়ীতে স্থান নাই। এই গাড়ীতেই আমরা যাইব। পথ

শ্বেতাঙ্গযুগল সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল,—"নেহি হোগা। নেটিভ্‌কো ওয়াস্তে দোস্‌রা কাম্‌রা হ্যায়। ভাগো, জল্‌দি।"

বৃথা বাক্যব্যয়ের তখন সময় ছিল না। শ্বেতাঙ্গযুগলের বলপ্রকাশ সত্ত্বেও, যুবক অবলীলাক্রমে দ্বার ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিল। তাহারা বাধা দিবার পূর্ব্বেই এক লম্ফে সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে প্রৌঢ়কে একরূপ টানিয়াই গাড়ীর মধ্যে তুলিল।

তখন গার্ডের হুইশিল্ বাজিয়া উঠিয়াছিল। হাত বাড়াইয়া মোটমাটগুলি ক্ষিপ্রতা সহকারে গাড়ীর মধ্যে টানিয়া লইয়া যুবক দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুলী পুরস্কারের আশায় গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল। একটা টাকা তাহার প্রসারিত হস্তে গুঁজিয়া দিয়া যুবক কামরার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্রুদ্ধ দানবের মত শ্বেতাঙ্গ আরোহিযুগল বলিয়া উঠিল, "ড্যাম্ নিগার!" পরক্ষণেই উভয়ে এক একটা বিছানার মোট তুলিয়া লইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিল। এই দৃশ্যে প্রৌঢ় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

যুবক গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খবরদার!"

সঙ্গে সঙ্গে সে দুই হস্তের সাহায্যে উহাদের নিকট হইতে বিছানার মোট দুইটি কাড়িয়া লইল। শ্বেতাঙ্গযুগল তখন মুষ্টি উদ্যত করিয়া ছুটিয়া আসিল। এক জন সন্নিহিত প্রৌঢ়ের স্কন্ধদেশ ধরিয়া বিষম ঝাঁকানি দিল। তিনি, "বাবা রে মলাম," বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

যুবক অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতা সহকারে অগ্রবর্ত্তী শ্বেতাঙ্গের কবল হইতে প্রৌঢ়কে সরাইয়া দিয়া "সাহেবকে" এমন ঠেলা মারিল যে, সে অপর ব্যক্তির ঘাড়ে পড়িয়া গেল। টাল সামলাইতে না পারিয়া উভয়ে হুড়াহুড়ি করিতে করিতে বেঞ্চের উপর চিৎ হইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তমধ্যে এই ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ট্রেণ তখন প্লাটফরম ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ত্বরিতগতিতে শ্বেতাঙ্গযুগল উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধে

বাঙ্গালীর হস্তে এমন অপমান? উভয়ের উচ্ছৃঙ্খল রসনা হইতে ভদ্রলোকের অশ্রাব্য কুৎসিত গালাগালি নির্গত হইতে লাগিল।

প্রৌঢ় বিবর্ণমুখে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিলেন। যুবক সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "এখনও চুপ কর বল্‌চি!" তাহার মুখে একটা কড়া রকমের গালাগালি আসিয়াছিল, কিন্তু সে রসনাকে বিপুল আয়াসে সংযত করিল।

অগ্রবর্ত্তী শ্বেতাঙ্গ তখন পুনরায় মুষ্টি উদ্যত করিয়া ছুটিয়া আসিল। যুবক অনায়াসে তাহার করপ্রকোষ্ঠ ধারণ করিয়া সবলে তাহাকে বেঞ্চের উপর বসাইয়া দিল।

প্রৌঢ় যুবককে পশ্চাদ্দিক্ হইতে আকর্ষণ করিলেন। "সাহেবের" সঙ্গে মারামারি বন্ধ করা প্রয়োজন বোধে তিনি তাহাকে টানিয়া আনিলেন।

যুবক দেখিল, শ্বেতাঙ্গযুগল কোট খুলিয়া ফেলিয়া জামার আস্তিন গুটাইতেছে। তাহারা একটা হাঙ্গামা না বাধাইয়া থামিবে না দেখিয়া যুবকও ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কোট ও সার্ট খুলিয়া ফেলিল। গাড়ীর উজ্জ্বল আলোকধারা তাহার নগ্ন পরিপুষ্ট দেহের উপর তরঙ্গ খেলিয়া গেল।

শ্বেতাঙ্গযুগল যুবকের লৌহকপাটবৎ সুদৃঢ়, বিশাল বক্ষোদেশ এবং পেশী ও শিরাবহুল ভীম বাহুযুগল দেখিয়া সহসা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সেই বলময়, লৌহদৃঢ় বাহুযুগল যে সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলও অনায়াসে ছিন্ন করিতে পারে, তাহাদের মত গোটাকয়েক ব্যক্তির মস্তক যে মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে, সেই ব্যায়াম-পুষ্ট দেহ দেখিয়া এমন অনুমান করিতে তাহাদের মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হইল না।

অপেক্ষাকৃত চতুর শ্বেতাঙ্গটি বিনা বাক্যব্যয়ে এক লম্ফে বাঙ্কের উপর তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গের সম্মুখে গিয়া তাহার স্কন্ধদেশে করপুট রক্ষা করিয়া যুবক বলিল, "এস? একা একা লড়িতে চাও? না একসঙ্গে দু'জনেই? আমি তা'তেও প্রস্তুত।"

শ্বেতাঙ্গটি তখন গর্ব্বিতভাবে বলিল, "কাঁধ ছেড়ে দাও।"

মধুরভাবে একটা ঝাঁকানি দিয়া যুবক বলিল, "তোমরা যে ভদ্রলোক নও, তা আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ হয়েও যে তোমরা এমন কাপুরুষ, এমন ইতর, তা জান্‌তাম না। বৃদ্ধের গায় হাত দিতে লজ্জা হ'ল না? এ গাড়ীটা কি তোমার পৈতৃক সম্পত্তি? আমাদের প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে। কিন্তু কোন গাড়ী খালি নাই দেখে, এই গাড়ীতে উঠেছি। তোমাদের তা'তে কোন ক্ষতি হয়নি ত। তা'র পর, কুৎসিত গালাগালি আমরাও যে না জানি, তা নয়। তবে আমরা ভদ্রসন্তান, ওগুলো উচ্চারণ কর্‌তে আমাদের বাধে। ভাল, এখন তোমাকে যদি এই জানালা দিয়ে বিছানার পুঁটুলির মত রেল-লাইনের উপর ফেলে দেই, কে তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পারে বল ত?"

ঝাঁকানির বেগে শ্বেতাঙ্গের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সত্যই এই বাঙ্গালীটা তাহাকে আরও অপমান করিবে না কি?

যুবক তাহার বাহু ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

সহসা সুমিষ্টকণ্ঠে কেহ বলিয়া উঠিল, "বাবু, বাবু! থাম!"

যুবক ফিরিয়া চাহিল। কামরার অপর পার্শ্বস্থ আসনের প্রতি এতক্ষণ তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই। সে আসনে যে অন্য কোনও আরোহী আছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশই সে এতক্ষণ পায় নাই। এখন সে চাহিয়া দেখিল, এক প্রসন্নমূর্ত্তি বৃদ্ধ ইংরাজ সেই আসনে বসিয়া আছেন।

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "বাবু, লোকটাকে ছাড়িয়া দাও। উহারা যেরূপ অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়াছিলাম। আমি বৃদ্ধ, তোমার পিতার বয়সী। আমি বলিতেছি, উহাকে ক্ষমা করিলে ভগবান্ তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন।"

মৃদু হাসিয়া যুবক বলিল, "ওরা যেরূপ কাপুরুষ, তাহাতে ওদের কিছু শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

বৃদ্ধ ইংরাজ বলিলেন, "বাবু, তোমাদের দেশের এক জন মহাত্মা প্রচার করিতেছেন, কাহাকেও হিংসা করিতে নাই। তুমি কি তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর না?"

যুবক বলিল, "ও! আপনি মহাত্মা গান্ধীর কথা বল্‌ছেন?"

"হাঁ! যীশুর জীবনের আদর্শ এই মহাপুরুষ যেমন বুঝিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীতে এমন আর কেহ বুঝেন নাই। তাঁহার সাধনা সার্থক হউক। তোমাদের ধর্ম্ম বলে, 'ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ।' কেমন, নয় কি?"

যুবক সবিস্ময়ে এই বৃদ্ধ ইংরাজের দিকে চাহিল। কে ইনি? ইনি সংস্কৃত ভাষাও জানেন!

সে ধীরে ধীরে পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাঙ্গকে ত্যাগ করিয়া আপনার সার্ট-কোট পরিধান করিল; তাহার পর তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, "আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি উহার কোন অনিষ্ট করতাম না। ততটা কাপুরুষ আমি নই। তবে একটু মজা দেখা যাচ্ছিল। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? মহাশয়ের পরিচয়—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি এক জন ধর্ম্মযাজক। তোমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন করিতেছেন। উহার গতি ও পরিণতি দেখিবার জন্য আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। মিষ্টার গান্ধী প্রকৃতই মহাপুরুষ!"

যুবক বৃদ্ধের অনুরোধে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। মাতুলও ভাগিনেয়ের পার্শ্বে স্থানগ্রহণ করিলেন। তাহার পর উভয়ের মধ্যে আলোচনা জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

যুবক বলিল, "মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বটে, কিন্তু তাঁহার অহিংস অসহযোগনীতির কথা আমি বুঝতে পারি না। বিশেষতঃ চরকার সাহায্যে ভারতবর্ষের মুক্তিলাভ ঘটবে, স্বরাজ হবে, তা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না।"

পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাঙ্গযুগল আগ্রহসহকারে এই আলোচনা শুনিতেছিল। ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "যুবক, তুমি কেন, তোমাদের দেশের অনেকেই পারেন না। কিন্তু ইংলণ্ডে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা তোমাদের গান্ধীর এই আন্দোলনকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন না। চরকার শক্তি এখনই ইংলণ্ডের পক্ষে প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা বুঝিয়া দেখিও।"

আলোচনা ক্রমে বিষয়ান্তর অবলম্বন করিল। অবশেষে বৃদ্ধ বলিলেন, "যুবক, তুমি কি কর? তোমার নামটি জানিতে পারিলে আমি সুখী হইব।"

সে বলিল, "আমার নাম সুধীরচন্দ্র রায়। আমি হাইকোর্টে ওকালতী করি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ভবিষ্যতে যদি কখনও দেখা হয়, তোমার নাম আমার মনে থাকিবে।"

২

সান্ধ্য-ভ্রমণ-শেষে সুধীরচন্দ্র হল ঘরের সম্মুখ দিয়া নিজের বৈঠকখানার দিকে যাইতেছে, এমন সময় পিতা হরকুমার বাবু ডাকিলেন, "সুধীর, একবার এদিকে এস ত!"

"আজ্ঞে, যাই" বলিয়া সুধীরচন্দ্র বৈদ্যুতিক আলোক-দীপ্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। একটা টেবলের পার্শ্বে হরকুমার বাবু কি একটা তালিকা লইয়া বসিয়া ছিলেন।

পিতা বলিলেন, "তোমার বন্ধুবান্ধবদের নামের তালিকাটা কোথায়?"

আজ সুধীর একটু বিমনাই ছিল। পিতার প্রশ্নে সে সহসা যেন চমকিয়া উঠিল; বলিল, "এবার ত আমি কোন লিষ্ট করিনি, বাবা!"

বিস্মিতভাবে বৃদ্ধ বলিলেন, "কেন? ২৫শে নবেম্বরের কথা ভুলে গেছ? আর ত বেশী দেরী নেই। এখন লিষ্ট না পেলে ত একটু অসুবিধা হবে!"

সুধীরচন্দ্র নত-দৃষ্টিতে বলিল, "এবার কোন বন্ধুবান্ধবকে আমি বলতে চাই না।"

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার পুত্রের দিকে চাহিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "কেন? কি হয়েছে?"

পুত্র গম্ভীরভাবে বলিল,- "অতগুলো টাকা শুধু শুধু ব্যয় ক'রে কোন লাভ নেই, বাবা।"

বিস্মিতভাবে পিতা আবার পুত্রের দিকে চাহিলেন। এমন কথা কোন দিন ত তিনি সুধীরের মুখে শুনেন নাই! তের বৎসর বয়স হইতে সুধীরচন্দ্র সিঁথির বাগান-বাটীর ভোজে প্রতিবারই কি উৎসাহই না প্রকাশ করিয়া আসিতেছে! আজ সহসা তাহার এ বৈরাগ্য কেন?

সুধীরের পিতা হরকুমার বাবু হাইকোর্টের এক জন খ্যাতনামা এটর্ণী। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই ব্যবসায় করিয়া সম্প্রতি পুত্রের হস্তে সে কার্য্যের ভার দিয়া অবসর লইয়াছেন। কলিকাতার অধিকাংশ বড় বড় ইংরাজ তাঁহার বন্ধু। হাইকোর্টের জজ হইতে আরম্ভ করিয়া লাট-দপ্তরের সেক্রেটারী, বড় বড় বণিক প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ এবং গণ্যমান্য বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি প্রতি বৎসর নবেম্বর মাসে একবার করিয়া সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী রাজপুরুষ ও ভদ্রলোকগণকে তাঁহার সিঁথির বাগান-বাটীতে ভোজ দিয়া আসিতেছেন।

পুত্র বড় হইলে তাহার পরিচিত ইংরাজ ও বাঙ্গালী বন্ধুবর্গও সে সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হইতেন। ইদানীং সুধীরচন্দ্রই সে বিরাট ভোজ-ব্যাপারের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিত। কিন্তু এবার সহসা তাহার এ ঔদাসীন্য কেন?

ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "লাভালাভের কথা ভেবে ত, বাবা, এ কাজটা করা হয় না! অনেক দিনের ব্যবস্থা, হঠাৎ বন্ধ করাই বা কেন?"

বিনীতভাবে পুত্র বলিল, "আপনার বন্ধু-বান্ধবদের অবশ্য আপনি নিমন্ত্রণ করতে পারেন; কিন্তু আমার কোন বন্ধুকেই আর এ ব্যাপারে আনতে চাই না। আমার এখন মনে হয় যে, এত দিন এ টাকাগুলো আমরা জলেই ফেলে দিয়ে এসেছি। তার বদলে যদি অন্য কোন সৎকাজে দেওয়া হ'ত!"

পিতা এবার স্থির দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, সে বলিষ্ঠ, সুন্দর আননে যেন একটা মৌন বেদনার ক্লিষ্ট রেখা বিদ্যমান। পুত্রকে তিনি চিরদিন বন্ধুর মতই দেখিতেন। পিতাপুত্রের মধ্যে বয়স বা সম্বন্ধের ব্যবধান কোন দিনই ছিল না। এই সন্তানটির গর্ব্বে তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। কি লিখাপড়া, কি ব্যায়াম, কি আলাপ-ব্যবহার, সকল বিষয়েই তাহার প্রতিভা বাল্যকাল হইতে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। তাহার শারীরিক শক্তিও তেমনই প্রচণ্ড। সঙ্গীতেও তাহার প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। সর্ব্বোপরি তাহার চরিত্রটি অনুকরণে যোগ্য। এমন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন কৃতী সন্তানের জন্য পিতার হৃদয় কি অনির্ব্বচনীয় সুখই না লাভ করিত! পিতামাতার প্রতি কি অবিচল ভক্তি,সহোদরার প্রতি তাহার কি অকৃত্রিম স্নেহ! এক কথায় এমন পুত্রের পিতা বলিয়া হরকুমার আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন।

কিয়ৎকাল স্থির দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া পিতা সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, বুঝেছি। রেলগাড়ীর সেই ব্যাপারটা থেকেই তোমার মতের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কেমন, না?"

সঙ্গী মাতুল মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ নিষেধ করা সত্ত্বেও ভাগিনেয়ের রেলগাড়ীর কীর্ত্তির কথা তিনি বাড়ীর সকলের কাছেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রৌঢ় সে দিন আপনাকে খুবই অপমানিত মনে করিয়াছিলেন; তাই তিনি শ্বেতাঙ্গযুগলের অভদ্র ব্যবহার ও পরিশেষে সুধীরচন্দ্রের নিকট তাহাদিগের শৃগালবৎ আচরণের কথাটা গোপন করিতে পারেন নাই।

লজ্জিতভাবে সুধীর বলিল, "আজ্ঞে, সে কথাটা মিথ্যা নয়। তবে আমি কাহারও উপর কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা-পোষণ ক'রে এ কথা বলিনি। আমার কথাটা এই যে, যাঁদের প্রচুর আছে, তাঁ'দের সেবায় টাকা ব্যয় না ক'রে, যারা প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করলে তার সার্থকতা আছে।"

"তা বটে। তবে এতদিনের একটা অনুষ্ঠান! হঠাৎ বন্ধ করলে একটা কথা উঠতে পারে ত, বাবা?"

সুধীরচন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমাদের টাকা, আমরা খরচ করবো, তার জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে কেন? আর, চিরকালই যে আমরা এমনভাবে খরচ ক'রে যাব, তারই বা ন্যায়সঙ্গত কোন্ যুক্তি আছে? যে দিন-কাল পড়েছে, তা'তে এ রকম ক'রে টাকা ব্যয় করাও শোভন নয়। যাঁদের ভরা পেট, তাঁদের জন্য অথবা বিদেশী ধন-কুবেরদের জন্য টাকা ব্যয় না ক'রে, আমাদের দেশের যারা না খেয়ে রয়েছে, বাবা, তাদের জন্য টাকাটা আমায় ভিক্ষা দিন!"

পিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশব্যস্তে বলিলেন, "ভিক্ষা কি রে, সুধীর? সব টাকাই ত তোর। যেমন ভাবে খরচ করতে চাস্ কর, বাবা! আমার কোন আপত্তি নেই।"

তাঁহার কণ্ঠ-স্বরে স্নেহ উছলিয়া উঠিল। সগর্ব্বে তিনি পুত্রের উন্নতশীর্ষ দেহের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; তাহার পর আবার বলিলেন, "গতবারে কত টাকা ভোজে খরচ হয়েছিল, মনে আছে?"

সুধীরচন্দ্র বলিল, "বোধ হয়, হাজার দশেক হবে।"

"আচ্ছা, টাকাটা তুমি কোথায় দিতে চাও?"

পুত্র বলিল, "সার প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দেব। খুল্‌নার দুর্ভিক্ষের কথা কাগজে পড়েছিলেন ত?"

"বেশ। ঐ দশ হাজার আর অতিরিক্ত পাঁচ হাজার এই পনের হাজার টাকার চেক্ কাল নিও।"

পুত্রের আননে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

৩

"অমন ক'রে আছিস্ কেন, বাবা? কি হয়েছে?"

প্রভাতে চা-পানের পর সুধীরচন্দ্র অন্যদিনের মত আজ বহির্ব্বাটীতে যায় নাই; অন্দরমহলে, তাহার মাতার বসিবার ঘরে একখানি খাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া ছিল।

মাতার প্রশ্নে পুত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। তাহার সদাপ্রসন্ন আননে সত্যই চিন্তার কালিমা-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুধীরচন্দ্র হাই তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাল লাগে না, মা, কিছুই যেন ভাল লাগে না!"

ব্যস্তভাবে মাতা বলিলেন, "কোন অসুখ করছে নাকি, বাবা?"

"না, মা, অসুখ করেনি। শরীর ভালই আছে।"

মাতা সস্নেহে বলিলেন, "তবে আবার কি হ'ল?"

কি যে হইয়াছে, তাহা নিজেই সে ভাল জানে না। তবে যে ভাবে সে দিন কাটাইতেছে, তাহা যে আর ভাল লাগিতেছে না, এই কথাটাই আজ কয়দিন ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছে।

বাতায়নপথে বাহিরের আকাশের দিকে ক্ষণিক চাহিয়া সে বলিল, "আমার আদালতে যেতে ইচ্ছে করে না, মা।"

"তা বেশ ত, যদি না হয়, আজ নাই বা গেলি।"

মাথা নাড়িয়া সুধীরচন্দ্র বলিল, "আজ ব'লে নয়। আর মোটেই যেতে ইচ্ছে নেই, মা।"

মাতা সবিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বলিস্ কি রে!"

"হ্যাঁ, মা, সত্যি বল্‌ছি, আমার আর এ ব্যবসা কর্‌তে মোটে ইচ্ছে নেই। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, মা, এত লেখাপড়া শিখে, রামের শ্যামের টাকা নিয়ে বড় মানুষ হওয়ায় কোন তৃপ্তি আছে কি? এক জন চাষী এতটুকু বিদ্যা না শিখেও যা উৎপন্ন করে, আমাদের মত যারা বিদ্যার জাহাজ, তারা তার হাজার ভাগের এক ভাগও পারে কি?"

মাতা প্রশংসমান দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কথা মিথ্যা নয়।"

সুধীরচন্দ্রের মাতা কিতাবতী বিদ্যার হিসাবে শিক্ষিতা মহিলা নহেন। তিনি কোন বিদ্যালয়ে কোন দিন পড়েন নাই। তবে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী মন্দ জানিতেন না। বাল্যকাল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত সুধীরচন্দ্র তাহার গৃহশিক্ষকের অনুপস্থিতিতে অনেক সময় মাতার নিকট হইতে সকল প্রকার শিক্ষায় সাহায্য পাইয়াছিল। তাহার ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান মাতার জীবনের আদর্শে সে লাভ করিয়াছিল। পুত্রের মনের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সুধীরচন্দ্র মাতার সতর্ক স্নেহ-দৃষ্টির ছায়ায় থাকিয়াই সকল বিষয়ে উন্নতি করিতে পারিয়াছিল।

সোৎসাহে সে বলিয়া চলিল, "এত লেখাপড়া তোমরা ত শেখালে; কিন্তু সে বিদ্যার সাহায্যে এক পয়সা মূল্যের জিনিষও কি উৎপন্ন কর্‌তে পার্‌ছি? জীবন ধ'রে কেবল অন্যের ধনভাণ্ডারের টাকা আমরা লুঠে আন্‌ছি বৈ ত নয়। নদীর এক কূল ভাঙ্গছে, অন্য কূল গড়ে উঠ্‌ছে, এইমাত্র প্রভেদ। দেশের ধনভাণ্ডারে আমরা এক পয়সাও সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌ছি না। এতে লাভ আছে কিছু কি, মা?"

স্থির দৃষ্টিতে মাতা পুত্রের দিকে চাহিলেন। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া কোন্ পথে সন্তানের মন ছুটিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা তোর ইচ্ছেটা কি, শুনি?"

সুধীরচন্দ্র কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে সহসা জননীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি কিছু উৎপন্ন কর্‌তে চাই। এর, তার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার থেকে অর্থ সঞ্চয় না ক'রে, প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে কিছু সঞ্চয় কর্‌তে চাই।"

মাতা তাহার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলেন কি না, বুঝা গেল না। সুধীরচন্দ্র বলিয়া চলিল, "আচ্ছা মা! আমাদের বিলাসপুর পরগণায় প্রায় একশ বিঘা জমী খাসে আছে। সে জমীটায় কাপাস-তুলার চাষ কর্‌লে কেমন হয়?"

"সে কথা আমি কি বুঝি, বাবা। তোমরা যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌লে পার।"

কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া সহসা উত্তেজিতভাবে সুধীর বলিল, "আচ্ছা, মা! বাবাকে ব'লে তুমি আমায় বিশ হাজার টাকা দেওয়াতে পার?"

"বিশ হাজার টাকা নিয়ে কি করবি?"

"একটা তাঁতের আর চরকার কারখানা খুলব। তাতে দু'পয়সা রোজগারও হবে, দেশের কাজও করা যাবে। সেটা ভাল নয় কি?"

দেশের মধ্যে যে মহা আন্দোলনের স্রোতঃ চলিতেছিল,

তাহার তরঙ্গ আসিয়া হরকুমার বাবুর অন্তঃপুরেও আঘাত করিয়াছিল। ভারতবর্ষের নরনারীমাত্রেরই হৃদয় তাহাতে অল্লাধিক পরিমাণে বিচলিত। সুধীরের মাতাও বাদ পড়েন নাই। তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "তা, সে ত ভালই হবে, বাবা। তবে ওঁর মত নিতে হবে। তুই একবার নিজেই বলিস্। আমিও বল্‌ব। টাকার ত অভাব নেই। কেন দেবেন না?"

সে কথা সত্য। এটর্ণী-প্রবর হরকুমার রায়ের বহু লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে মজুত। তাহা ছাড়া বাড়ীভাড়া বাবদে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইত। স্থানে স্থানে যে জমীদারী আছে, তাহারও বার্ষিক আয় আনুমানিক বিশ হাজার টাকা। পোষ্য-সংখ্যাও খুব অধিক নহে; স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ এবং কয়েকটি আত্মীয়। একমাত্র কন্যা বিভার বিবাহ ভাল ঘর-বর দেখিয়াই দিয়াছিলেন। কন্যাটি মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার নিকট থাকিত।

সুধীর হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, মা! তোমার এম্ এ, বি এল পাশ করা ছেলে এটর্ণীগিরি ছেড়ে চাষা আর তাঁতি হ'বে, তা'তে তোমার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না ত?"

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া মাতা বলিলেন, "ছেলের কথা শুন!"

সহসা একটি হাস্যময়ী সুন্দরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদা, তোমাদের সব কথা আমি আড়ি পেতে শুনেছি!"

মাতা ও পুত্র হাসিয়া উঠিলেন।

সুন্দরী বিভা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দাদা, এস না, তোমাকে একটা মজার জিনিষ দেখাই!"

ভ্রাতা ভগিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; অনেকগুলি কক্ষ অতিক্রম করিবার পর, নিম্নতলস্থ একটি প্রশস্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুধীরচন্দ্র এ দিকে কদাচিৎ আসিত। কারণ, সেই সুসজ্জিত, আলো-বাতাস-সেবিত অন্তঃপুরকক্ষে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া মাঝে মাঝে জটলা করিয়া থাকেন বলিয়া পুরুষরা সে দিকে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কখনও আসিতেন না। সুধীর বহুকাল এ অঞ্চলে আইসে নাই। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই একটা ঘর্ঘর শব্দ তাহার কানে গেল। সে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহারই গৃহলক্ষ্মী মনোরমা একাগ্রমনে চরকায় সূতা কাটিতেছে। সেই ঘরে আরও দুই তিন খানি চরকা। একটা ঝুড়িতে খানিকটা তুলা ও টেবিলের উপর দশ বার বাণ্ডিল সূতা।

সুধীরের পদশব্দ শুনিয়াই মনোরমা আরক্ত মুখে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। যেন অপরাধজনিত আতঙ্কের ছায়া সহসা সেই সুন্দর আনন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

ভগিনীর দিকে ফিরিয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে সুধীর বলিয়া উঠিল, "তোরা এ সব কি করেছিস্ রে?"

হাসিতে হাসিতে বিভা বলিল, "ঘোর ষড়যন্ত্র, দাদা! তোমরা সব এর বিরোধী। তাই বুঝেই গোপনে আমরা তোমাদেরই অন্তঃপুরে চরকা চালাচ্চি!"

সে সরল উচ্ছ্বসিত হাস্যে সুধীরের হৃদয় যেন আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল, "তাই ত দেখছি, বোন্! এ সব কবে এল? বাবা কিছু বলেন নি?"

"তোমাদের জানিয়ে কি করেছি? তোমরা থাক বাইরে, আপিসে। এ দিকে সেদিন 'দেশ-বন্ধুর' স্ত্রী ও ভগিনী আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। চরকা তাঁরাই দিয়ে গেলেন। তাঁদের কি উপেক্ষা করা যায়? বৌদি একটা নিলেন। মাও বাদ গেলেন না। আর আমিই বা ছাড়ি কেন? তাই তিন জনেই তোমাদের অগোচরে সূতা-কাটা আরম্ভ ক'রে দিয়েছি।"

এ দিকে মনোরমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিয়া উঠিতেছিল। সে শ্বশুর ও স্বামীকে যে ভাবে এত দিন দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হয় ত এই চরকার ব্যাপার লইয়া একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইতে পারে। বিভা বৌদিদির অবস্থাটা বোধ হয় কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "বাঃ বৌদি, তুমি শীতের দিনেও দেখি একেবারে ঘেমে গেছ! বাতাস দেব?"

সুধীরচন্দ্র ধীরে ধীরে চরকায় কাটা এক বাণ্ডিল সূতা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল; তাহার পর প্রসন্ন হাস্যে বলিল, "বাঃ রে! বেশ সরু সূতা ত! এ কার তৈয়ারী?"

বিভা বলিল, "বৌদিদির; আমি ১০০ নম্বরের পর্য্যন্ত সূতা কাটতে পারি। কিন্তু মা আর বৌদিদি দু'জনেই ১২০ নম্বরের সূতা কাটতে শিখেছেন। দু'মাসের চেষ্টায় এতটা হয়েছে, দাদা!"

"বলিস্ কি? দু'মাস ধ'রে তোরা এ ব্যাপার চালাচ্ছিস্, অথচ আমরা কেউ জানি নে!"

সুধীরচন্দ্র ধীরে ধীরে পত্নীর চরকার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া উহা পরীক্ষা করিয়া মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ও কি! তুমি অমন কর্‌ছ কেন? তুমি ভাবছ, আমি রাগ করব? ভুল, ভুল! আমি ভারি খুসী হয়েছি। মনো, তোমরা যে এমন চমৎকার সূতা তুলতে শিখেছ, এতে আমি গর্ব্ব বোধ কর্‌ছি।"

তাহার পর একটু থামিয়া সহাস্যে সে বলিল, "কিন্তু তোমার বাবা যদি জান্‌তে পারেন, বোধ হয়, তিনি এতে সুখী হবেন না। তিনি হয় ত এতে রাজদ্রোহের গন্ধ পেতে পারেন! কি বল?"

এতক্ষণে মনোরমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

"দাদা, তুমি আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি হবে? বৌদিদি তোমায় চরকায় সূতা তোলা শেখাবেন! রাজি আছ?"

হাসিতে হাসিতে সুধীর বলিল, "খুব। কবে থেকে বল্, আজই যদি শেখাতে চাস্, আমি রাজি!"

৪

সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর সুধীরচন্দ্র রাত্রির আহার শেষে লেপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাঘ মাস, খুব জোরেই শীত পড়িয়াছিল।

মাথার ধারের বৈদ্যুতিক আলোকটা জ্বালিয়া সে একখানা বই লইয়া পড়িতে লাগিল। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টাই সে সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকে। গল্পটা যখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে, এমন সময় পত্নী মনোরমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

দরজা বন্ধের শব্দে সুধীর মুখ তুলিয়া চাহিল। পত্নীকে দেখিয়া বলিল, "আজ মুখটা ভারি হাসি-হাসি যে?"

সহাস্যে মনোরমা বলিল, "কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আবার কোন্ দিন ঘরে আসি?"

"না, তা নয়। তবে আজ হাসির বহরটা যেন বেশী বলেই মনে হচ্ছে। তাই বল্‌ছি, ব্যাপার কি?"

মনোরমা স্মিত হাস্যে বলিল, "না, তেমন কিছু নয়। তবে আজ এ মাসের সূতার দাম ১৮৲ টাকা হাতে এসেছে; তাই বোধ হয়, তুমি খুসী-খুসী ভাব দেখ্‌ছ।"

সুধীরকুমার শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এ মাসে সূতা তুলে ১৮৲ টাকা তুমি পেয়েছ?"

"আমি ত কম। মার সূতার দাম ২২৲ টাকা হয়েছে। ঠাকুরঝি ১৭৲ টাকা পেয়েছে।"

"বটে! কোথায় সূতা বেচলে?"

"কেন? কংগ্রেস কমিটী যে সূতা কেনেন, তা জান না? আমরা সেখানেই পাঠিয়ে দেই।"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া সুধীর বলিল, "আচ্ছা, সূতা ত কাট; কিন্তু সংসারের কাজ কর কখন্?"

মনোরমা এবার আর উচ্চহাস্য রুদ্ধ করিতে পারিল না। কিন্তু পাছে শ্বশুর বা শাশুড়ীর কর্ণে তাহার হাস্যধ্বনি প্রবেশ করে, সেই জন্য সে কষ্টে আপনাকে সংবরণ করিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে স্বামীর একখানি হাত নিজের কর-প্রকোষ্ঠে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "ওগো! এটা বুঝলে না? সারা দিনই কি আমরা চরকা নিয়ে ব'সে থাকি? ঘর-সংসারের কাজ কর্‌বার পর যে সময়টা অবসর পাই, তখনই চরকা নিয়ে বসি। গল্পও চলে, কাজও হয়।"

সুধীর বলিল, "দেখ, ও টাকাটা তুমি আলাদা ক'রে রেখে দিও। আর এবার হ'তে তোমাদের চরকার সব সূতা আমি নেব। আমাদের তাঁতের কারখানায় মিহি সূতার বড় অভাব। বুঝলে, এ মাস থেকে তোমার, মা'র ও বিভার সব সূতা আমার চাই?"

"তা, বেশ। কিন্তু নগদ দাম দেবে ত?"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "আমার সবই নগদ। আমি ধারে কারবার করি না।"

তখন স্বামী স্ত্রী উভয়েই হাসিয়া উঠিল। সে হাস্যধ্বনি ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাসের মত মধুর ও পবিত্র।

কিয়ৎকাল নীরবতার পর একটু কুণ্ঠিতভাবে মনোরমা বলিল, "একটা কথা বল্‌ব, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

সুধীরচন্দ্র পত্নীর চম্পকাঙ্গুলী লইয়া খেলা করিতে করিতে বলিল, "তোমার কথা কবে রাখিনি বল, মনো?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া পত্নী বলিল, "আমাকে এক জায়গায় যেতে দেবে?"

সুধীরচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সব কথাটা খুলেই বল, তা না হ'লে বুঝব কি ক'রে, বল?"

মৃদু, স্নিগ্ধ কণ্ঠে মনোরমা বলিল, "নারী-কর্ম্মমন্দিরের সম্পাদিকা আজ এসেছিলেন।—পুরে একটা [illegible] হয়েছে।

সেখানকার মহিলারা চরকায় সুতা কাটা শিখতে চান। কিন্তু সেখানে শেখাবার কেউ নেই। সম্পাদিকা ও আরও তিন চারি জন মহিলা সেখানে যাবেন। আমাদেরও সঙ্গে নিতে চান। পর্দ্দানশিন মহিলা দুই চারি জন সঙ্গে থাকলে সেখানকার মহিলার দল আরও উৎসাহিতা হবেন। শুধু তাই নয়, দলের মধ্যে যাঁরা আছেন, খুব বেশী নম্বরের সরু সুতা চরকায় তাঁরা এখনও তুলতে শেখেন নি। ঠাকুরঝি ও আমাকে পেলে তাঁদের সুবিধা বেশী হবে। কি বল?"

সুধীরচন্দ্র পত্নীর প্রতি বিদ্রূপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। কথা শেষ হইলে সে হাসিয়া উঠিল; তাহার পর বলিল, "ও বাবা! তোমরা ত কম নও। শুধু চরকায় সুতা তোলা নয়! আবার দেশবিদেশে গিয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করবার জন্যও কোমর বেঁধে ব'সে আছ! তোমার বাবা শুনলে কি বলবেন, একবার ভেবে দেখেছ?"

মনোরমা অন্যমনে বলিয়া উঠিল, "বাবাকে অনেক দিন দেখি নি। দাও না আমায় ওঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে। ওখান থেকে ফিরে আসবার সময় বাবার কাছে দিনকতক থেকে আসব। বাবা যেখানে থাকেন, সেই দিকেই ত—পুর!"

সুধীরচন্দ্র নীরবে কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিল; তাহার পর বলিল, "দেখ, মনো, এতে আমার কোন অমত নেই। যে কাজের জন্য যেতে চাচ্ছ, তা'তে বাধা দেওয়া পাপ। বিশেষতঃ এখন নারীকেও পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য কর্ত্তে হবে। কিন্তু একটা কথা আছে, তোমরা চিরকাল অন্তঃপুরচারিণী; বাইরের বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতা ত তোমাদের নেই। আমি ত তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না। তা ছাড়া বাবার ও মা'র মত আগে দরকার।"

মনোরমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মা'র অমত নেই। ঠাকুরের মতও পাব। ঠাকুর-ঝি ও মা সে ভার নিয়েছেন। আর ঠাকুরজামাই যে আমাদের সঙ্গে যাবেন। তুমি কাজ ছেড়ে এখন যেতে পারবে না, তা আমরা জানি। সঙ্গে ঠাকুরজামাই থাকবেন, নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের পাঁচ সাতটি মহিলা ও আমরা যা'ব, কে আমাদের অপমান করবার সাহস পাবে? তা ছাড়া, তুমি যে এতদিন ধ'রে ভাণ্ডোর ডম্বল, ডেভেলপার শেখালে, তার কি কোন মূল্য নেই?" বলিয়াই সলজ্জ দৃষ্টিতে সে স্বামীর পানে চকিতে একবার চাহিল।

সুধীরচন্দ্র আবেগভরে বলিল, "মনোরমা, মা যদি মত দিয়ে থাকেন, বাবা যদি বাধা না দেন, তবে আমিও আপত্তি তুলব না। দেশের কাজে, দেশের নারী-শক্তিকে জাগিয়ে তোলা দরকার। তোমাদের প্রাণে যখন আপনা থেকেই সে ইচ্ছা এসেছে, তখন তা'তে যে বাধা দিতে চায়, সে অতি দুর্ভাগ্য। আমার খুব মত আছে। পারি যদি আমিও তোমাদের সঙ্গে গিয়ে সে দৃশ্য দেখে আসব।"

মনোরমা স্বামীর উদার, প্রশস্ত, লৌহকপাট-তুল্য বক্ষে মাথা রাখিয়া একবার চক্ষু নিমীলিত করিল।

৫

সমগ্র ভারতবর্ষ যে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল,—পুরে তাহার স্রোতের ধারা বিসর্পিত গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল। পূর্ণতোয়া নদীতীরে এই মহকুমার সহরটি অবস্থিত। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উহা একটি প্রধান কেন্দ্র। সহস্র সহস্র শ্রমজীবী সহরের নানা স্থান পূর্ণ করিয়া ছিল। বাণিজ্যস্থল বলিয়া বহু বৈদেশিকও কার্য্যোপলক্ষে এখানে বসবাস করিতেন।—পুর অন্যান্য জিলার মহকুমার মত নহে। এজন্য ইহার শ্রী দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এখানে ছিল সত্য, তবে এমনভাবে নহে যে, অন্যান্য স্থলের ন্যায় ১৪৪ ধারা এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ এখনও পর্য্যন্ত—পুরের স্বেচ্ছাসেবকগণ পিকেটিং অথবা অন্যান্য বিষয়ে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় দৃঢ়তা অবলম্বন করেন নাই। স্কুলের ছাত্রগণ এখনও বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে নাই। ব্যবহারাজীবরা আদালতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই রাখিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকগণের অধিকাংশ তখনও মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াই নিরাপদে অবস্থান করিতেছিলেন। শুধু শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিক্ষোভ দেখা যাইতেছিল।

এমনই সময়ে সহসা—পুরের নারী-সমাজে একটা চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই মহিলাবৃন্দ আপনাদের মধ্যে একটা ছোটখাট দলের সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় ছিলেন। জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পত্নী ও ব্যবসায়ীর ভগিনী চরকা শিখিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ব্যবসায়ীর গৃহে এক দিন সমগ্র সহরের মহিলাবৃন্দ আহূত হয়েন। খুলনার দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারের জন্য কিছু কিছু অর্থও সেই সভায় সংগৃহীত হয়।

ক্রমে নারীদিগের জন্য একটা চরকা ও বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প হইল। উহার জন্য মহিলারা নানাপ্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সহরের নারী-সমাজের সহসা এই জাগরণ পুরুষদিগের মধ্যেও অল্পাধিক পরিমাণে সংক্রমিত হইল।

ঠিক এমনই সময়ে এক দিন প্রভাতে সহরের নরনারী চমকিতভাবে শুনিল, কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর অধীনস্থ কুলী-সম্প্রদায়ের সহিত স্থানীয় পুলিসের সংঘর্ষ হইয়াছে। জনসাধারণ, বিশেষতঃ সহরের ভদ্র-সম্প্রদায়, ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ব্যাপারটা এই—মুসলমান-প্রধান এই পল্লী-সহরে খিলাফত ও কংগ্রেসের দলে বহুসংখ্যক শ্রমজীবী ছিল। একবার মহরম উপলক্ষে এ স্থানের দারোগার সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য জন্মে। মহকুমার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও তদানীন্তন পুলিস-ইনস্পেক্টার অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিতায় সে যাত্রা গোলযোগ বাড়িতে পারে নাই। কিন্তু দারোগার অশিষ্ট ব্যবহারের কথা মুসলমানগণ ভুলিতে পারে নাই। দারোগাও নিশ্চিন্ত ছিল না। সেও এই খিলাফতীদিগকে জব্দ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল।

সে সুযোগও উপস্থিত হইল। জনসাধারণের মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে একটা সালিশী-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সহরের সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে কাহারও সহিত কোন ব্যক্তির কোনপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইলে, গ্রামবাসীরা এই সালিশী-সমিতির নিকট দরবার করিত। মণ্ডলরা যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিত, উভয় পক্ষ তাহাই মানিয়া লইত।

অল্পদিন পূর্ব্বে একটা গ্রাম্য গোলযোগ সালিশী আদালতে মীমাংসিত হয়। বোধ হয়, দণ্ডিত ব্যক্তি সে ব্যবস্থা মাথা পাতিয়া লইতে পারে নাই, অথবা হয় ত দারোগারও গোপন ইঙ্গিতে সাহস পাইয়া সেই ব্যক্তি থানায় আসিয়া সালিশী মাতব্বরদিগের এক জনের নামে মারপিটের অভিযোগ করে। দারোগা তখন সদলবলে গিয়া সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া আনে। সেই যুবক আবার স্থানীয় কংগ্রেস-সমিতির এক জন স্বেচ্ছাসেবক।

সংবাদটা ঝড়ের মত বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সহরের যেখানে যত শ্রমজীবী ছিল, তাহারা এ সংবাদে অধীর হইয়া উঠিল। তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান। দলে দলে তাহারা থানার সম্মুখে আসিয়া সমবেত হইল এবং বলিতে লাগিল, তাহাদেরই নির্দ্দেশমত সালিশী ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা সকলেই অপরাধী। যখন এক ব্যক্তিকে হাজতে রাখা হইয়াছে, তখন তাহাদের সকলকেই জেলে দেওয়া হউক, অথবা উহাকে এখনই মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক।

মহকুমার হাকিম তখন কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র ছিলেন। অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত দেশীয় হাকিম এই ব্যাপারে আপনাকে বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিলেন। পূর্ব্বে যে জনপ্রিয় ইন্‌স্পেক্টার সেখানে ছিলেন, তিনি তখন অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন। নূতন যিনি ভার লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি স্থানীয় ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। সুতরাং কঠিন সমস্যার মীমাংসা করা দুরূহ হইয়া পড়িল।

দেশীয় হাকিম অবশেষে জামীন লইয়া বন্দীকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। আসামী দৃঢ়তা সহকারে বলিল যে, সে নিরপরাধে ধৃত হইয়াছে, সুতরাং জামীন সে দিবে না। সমস্যা গুরুতর হইতেছে দেখিয়া হাকিম স্থানীয় জেলে আসামীকে পাঠাইলেন। তখন তাহার অনুগামী হইবার জন্য শ্রমজীবীরা বাঁধভাঙ্গা বন্যাপ্রবাহের ন্যায় জেলের দিকে ছুটিল। দেশীয় হাকিম ধীরতা সহকারে কাজ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু দৃঢ়তা দেখাইতে পারিলেন না। তাহার ফলে হাঙ্গামা জটিল হইয়া উঠিল।

অবশেষে তিনি ব্যবস্থা করিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিলেন। জনতা তখন ক্ষুব্ধ—বিচলিত। স্থানীয় জননায়কগণ কোনও মতে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। দারোগার উপর শ্রমজীবিগণের দারুণ আক্রোশ ছিল; সে-ই সকল অশান্তির মূল, এই ভাবিয়া তাহারা তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন জনস্রোত থানার দিকে ছুটিল। দারোগাও আত্মরক্ষার জন্য বীরত্ব দেখাইল। তাহার ফলে উন্মত্ত জনতা থানার কোন কোন জিনিষ পুড়াইয়া দিল। দারোগা ইত্যবসরে অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। শ্রমজীবীরা তখন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

পল্লী সহরের সর্ব্বত্র এই নিদারুণ সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। ভদ্র অধিবাসীরা বিপদাশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তারযোগে সদরে সংবাদ গেল। সেই দিন সন্ধ্যায় মোটরযোগে

অতিরিক্ত সামরিক পুলিশ আসিয়া পৌঁছিল। জিলার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট "সাহেব" ও বাঙ্গালী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব ব্যানার্জ্জি ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলও স্বয়ং ছুটিয়া আসিলেন। সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

স্থানীয় মহিলাগিগেরও সেই দিন যে সভা হইবার কথা ছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। জনরব নানাপ্রকার আশঙ্কার কথা রটনা করিতে লাগিল। সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

৬

সহসা সংবাদ রটিল যে, মহিলাবৃন্দকেও গ্রেপ্তার করিবার জন্য আয়োজন হইতেছে। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট মহিলাদিগের নামের তালিকা প্রেরিত হইয়াছে। উৎসাহী পুলিস,—পুরের যাবতীয় আন্দোলন পিষিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যানার্জ্জি সাহেবও নাকি মহিলাদিগের এ ঔদ্ধত্য চূর্ণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। রমণী ঘরসংসারের কাজ লইয়া থাকিবে, দেশের কাজে তাহাদের এত মাতামাতি কেন?

সহরের প্রবীণগণ এই ব্যানার্জ্জি সাহেবকে উত্তমরূপেই চিনিতেন। এক সময়ে তিনি এখানেই ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। তখন—পুরের জনসাধারণকে কি উৎকণ্ঠাতেই না দিনযাপন করিতে হইত; এমন জবরদস্ত পুলিস কর্ম্মচারী কখনও এ দেশে আইসেন নাই। তাঁহাকে অপ্রসন্ন করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। নানা উপায়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূমিশায়ী করিয়া ছাড়িতেন। সম্মান ও অর্থের দিকে তাঁহার তুল্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। উপরওয়ালাদের সন্তুষ্ট করিবার তিনি প্রকৃষ্ট প্রণালীও নাকি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তাই ক্রমে ক্রমে অতি সহজে তিনি জিলার পুলিসকর্ত্তার পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে কর্ত্তব্যপরায়ণ ও নিমকহালাল কর্ম্মচারী, সে বিষয়ে সরকারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জনসাধারণ তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত এবং "শতহস্তেন বাজিনঃ" এই চাণক্য-নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সংস্রব হইতে দূরে থাকিত। অথচ রাজপুরুষগণের সঙ্গে তিনি ছায়ার ন্যায় বিচরণ করিতেন। সরকার এজন্য ব্যানার্জ্জি সাহেবের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, এবং বিগত বর্ষে রায়সাহেব উপাধিতে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এ হেন ব্যক্তি যখন মহিলাদিগের নামের তালিকা লইয়া তাঁহাদের চরকা-"ফোবিয়ার" প্রতিষেধক নির্ব্বাচনে অগ্রসর, তখন সহরের মাতব্বর মডারেট-সম্প্রদায়ও বিশেষরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কয়েক জন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যাপারটি ভাল করিয়া জানিবার জন্য অস্থায়ী মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গমন করিলেন। সেখানে রায়সাহেব বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। কথাটা উঠিতেই দেশীয় হাকিম মহোদয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, জনরব নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে।

রায় সাহেব প্রচণ্ড হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, কতকগুলি স্ত্রীলোককে ধরা হইবে বটে; কিন্তু তন্মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা নাই।"

তবে ত কথাটা সত্য! মধ্যপন্থীরা সম্ভ্রান্তশ্রেণীর অন্তর্গত বটে, সুতরাং তাঁহাদের পত্নী, কন্যাগণ হয় ত রেহাই পাইতে পারেন; কিন্তু তথাপি মহিলাদিগকে গ্রেপ্তারের পরামর্শ ত চলিতেছে! কি সর্ব্বনাশের কথা! রায় সাহেবের মত শ্রেণীবিভাগ করিয়া নারীর সম্মানের তারতম্য করিবার মনের অবস্থা তাঁহাদের তখনও হয় নাই। কাজেই নারীর সম্মান—তা সে সম্ভ্রান্ত অথবা দরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্তের ঘরেরই হউক না কেন—সর্ব্বত্রই সমান। অন্ততঃ তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা সেই প্রকারেরই ছিল। তাই তাঁহারা কয়েক জন সম্মিলিত হইয়া একটি পরামর্শ-সভার অনুষ্ঠান করিলেন। স্থির হইল, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি গবর্ণরের নিকট সশরীরে পৌঁছিয়া এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন এবং এমন ভাবে নারীর প্রতি জুলুম চলিলে দেশের মধ্যে অশান্তির অনল তীব্রতম তেজে জ্বলিয়া উঠিতে পারে, তাহা দৃঢ়তার সহিত বুঝাইয়া দিবেন।

কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পুলিস বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ণধারের সহিত দেখা করিয়া সব কথা তাঁহাকে জানাইলে ক্ষতি কি? তিনি ত এখন এখানেই উপস্থিত আছেন। বৃদ্ধ ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলই বা কি বলেন, শুনা যাউক না।

প্রস্তাবটি মন্দ নহে। তখন দুই জন মাতব্বর মডারেট

ডেপুটেশনে প্রেরিত হইলেন। উভয়েই পূর্ব্বে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। পুলিসের বড় কর্ত্তার সহিত তাঁহাদের জানা-শুনাও ছিল।

অযথা কালবিলম্ব না করিয়া উভয়ে ইনস্পেক্টার জেনারেলের বাংলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। "সাহেব" তখন একাই ছিলেন। তিনি উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভদ্রলোকযুগল সবিস্তারে তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন।

বৃদ্ধ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কই, আমি ত ইহার বিন্দুবিসর্গও জানি না! যাহা হউক, আপনারা আমাকে জানাইয়া ভালই করিয়াছেন। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। কোনও মহিলা, তা যে শ্রেণীরই হউন না কেন, কখনই ধৃত হইবেন না। আমি আপনাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি, আপনারা নির্ভাবনায় থাকুন।"

প্রতিনিধিযুগল "সাহেবকে" কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নিশ্চিন্তমনে বিদায় লইলেন। উহার অব্যবহিত পরেই রায় সাহেব ব্যানার্জ্জি মহোদয় স্থানীয় পুলিস ইনস্পেক্টারের সহিত তথায় দ্রুতগতিতে উপনীত হইলেন। বড় কর্ত্তা তাঁহাদিগকে বসিতে বলিয়া আগমনের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। রায় সাহেব বুঝাইয়া দিলেন, স্থানীয় নারীগণ দিন দিন বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিতেছে। তাহারা এঙ্গোরা ফণ্ডে চাঁদা দেয়, খুলনা দুর্ভিক্ষের জন্য টাকা তুলে, আবার চরকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া সূতা কাটিতে চাহে। ইহাতে দেশের মধ্যে শীঘ্রই ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইবে। এখন যদি কয়েকটি মহিলাকে গ্রেপ্তার করা যায়, তবে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। তাই তিনি একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। কলিকাতা হইতেও কয়েকটি মহিলা আসিয়াছেন। সকলেরই নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিতে হইবে। তিনিই তাহা করিতে পারিতেন। তবে স্বয়ং হুজুর যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছেন, তখন হুজুরের স্বাক্ষরই আইন অনুসারে অত্যাবশ্যক।

ইনস্পেক্টার জেনারেল ধীরভাবে রায় সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। তাহার পর ইনস্পেক্টারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বাহিরে গিয়া প্রতীক্ষা কর। রায় সাহেবের সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।"

সে ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ব্যানার্জ্জি, মহিলাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পরামর্শ তোমায় কে দিল? তোমার মতিভ্রম হইয়াছে। না, তাহা হইবে না। আমি এইমাত্র দুইটি ভদ্রলোকের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, কোন মহিলাকেই গ্রেপ্তার করা হইবে না। তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

রায় সাহেব বিস্মিত হইলেন। তাঁহার এত সাধের আয়োজন কে এমন করিয়া মাটী করিয়া দিল! আজ যে তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী চারিদিকে প্রচারিত হইত! শঙ্কিত নাগরিকগণ তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়া চমৎকৃত হইত। আর তাহা ছাড়া—যাউক। ভাগ্যে যখন তেমন সম্মানাদি নাই, তখন উপায় কি? তথাপি তিনি বড় কর্ত্তাকে জপাইতে ছাড়িলেন না; নানা রকম কারণ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু পুলিস বিভাগে কর্ম্ম করিয়া বুড়াও ঝানু হইয়াছিলেন, তিনি কিছুতেই মতের পরিবর্ত্তন করিলেন না।

তাহার পর একটা ড্রয়ার টানিয়া একখানা কাগজ বাহির করিয়া "সাহেব" বলিলেন, "রায় সাহেব, তুমি এখানকার মহিলাদের একটা তালিকা তৈয়ার করাইয়াছ। কিন্তু কলিকাতা হইতে যে সকল মহিলা আসিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় কিছু জান?"

রায় সাহেব বলিলেন, "সকলের জানি না। দুই এক জনের সম্বন্ধে জানি।"

"যাঁহারা খ্যাতনামা, তাঁহাদের পরিচয়ই জান। তাহা ছাড়া জান না? আমার গোয়েন্দা বিভাগ ইঁহাদের প্রত্যেকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে একখানা প্রতিলিপি পাঠাইয়াছে। এখানা তোমার কাছে রাখ, কাজে লাগিতে পারে।"

রায় সাহেব হাত বাড়াইয়া কাগজখানি লইলেন। চালটা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহার মেজাজটা ভাল ছিল না, কাজেই তখন পড়িবার প্রবৃত্তি ও অবকাশও হইল না। সযত্নে তিনি উহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

"সাহেব" বলিলেন, "কাল সকালে একবার দেখা করিও। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে গোটা কয়েক কথা বলিয়া যাইব।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া সেলাম বাজাইয়া, ক্ষুণ্ণমনে জিলার পুলিসের কর্ত্তা বাহিরে আসিলেন। ইনস্পেক্টার তাঁহার মুখ দেখিয়া ব্যাপার বুঝিল।

তখন নীরবেই উভয়ে "সাহেবের" বাংলা ত্যাগ করিলেন।

৭

আজ আর কোনও বিষয়ে রায় সাহেবের উৎসাহ ছিল না। সন্ধ্যার পরেই আলো জ্বালিয়া তিনি কিছুক্ষণ ধূমপান করিলেন। পুরাতন পরিচারক গোপাল মনিবের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝে দ্বারপথে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল।

পল্লী অঞ্চলে মাঘের শীত আরও দুর্জ্জয় বোধ হইতেছিল। রায় সাহেব টেবলের ধারে বসিয়া একখানি বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাও ভাল লাগিল না। আজ যেন কেমন এক প্রকার শ্রান্তি আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মনের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল।

বইখানি রাখিয়া দিয়া তিনি মহিলাদিগের নামের তালিকাটি বাহির করিলেন। উঃ! প্রায় পঞ্চাশটি নাম! তন্মধ্যে ধনসম্পত্তিশালী, সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলার সংখ্যাও কম নহে! কি আপশোষ! কি আপশোষ!

সকালবেলা "সাহেব" কলিকাতা হইতে সমাগতা মহিলাদের সম্বন্ধে যে কাগজখানি দিয়াছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পকেট হইতে সেখানা টানিয়া বাহির করিলেন, দেখাই যাক্ না। তাহারা কাহাদের ঘরণী!

সাতটি মহিলা আজ তিন দিন এখানে আসিয়াছেন। তন্মধ্যে দুই জনের নাম তিনি জানেন। কিন্তু বাকি পাঁচটি কে?

বৃদ্ধ একে একে নাম কয়টি পড়িয়া গেলেন। সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

"মনোরমা দেবী।" মনোরমা! এ কোন্ মনোরমা? না, না, নামের সাদৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইলে চলিবে কেন? এ নামের ত কত নারীই আছে!

বৃদ্ধের দৃষ্টি তাড়াতাড়ি পরিচয়ের অংশের দিকে ছুটিয়া গেল।

"বাবা! বাবা!"

বৃদ্ধ সর্পদষ্টের মত চম্‌কাইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। এ কাহার কণ্ঠস্বর! বীণাধ্বনিবৎ মধুর, অমৃতধারার ন্যায় পবিত্র, যাহা এ প্রাণগলান স্নেহের ধ্বনি যে তিনি অনেক দিন শুনেন নাই। এই সুদূর পল্লী সহরের প্রান্তে এ অপ্রত্যাশিত সম্বোধন কি তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার বলেই শব্দময় হইয়া উঠিল?

পুরাতন ভৃত্য গোপাল দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর আনন্দ-কম্পিত কণ্ঠে উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, "বাবু, দিদিমণি! দিদিমণি!"

বৃদ্ধ সবেগে চেয়ার ঠেলিয়া দ্বারের কাছে আসিতেই সম্মুখে বস্ত্রাবৃতা নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। প্রজ্বলিত আলোক-ধারা নবাগতার প্রসন্ন পদ্মের মত মুখের উপর ঝলসিয়া উঠিল। সত্যই ত, এ যে তাঁহার একমাত্র সন্তান, মনোরমা! তাঁহার আঁধার ঘরের মাণিক, পরলোকগতা পত্নীর সাধের কন্যা, জীবনের ধ্রুবতারা মনোরমা! এই কন্যাকে উপলক্ষ করিয়াই হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এত দিন সংসারে লীলাখেলা করিতেছিলেন। অর্থের প্রতি, সম্মান-প্রতিপত্তির প্রতি বিপুল আসক্তি; তাও এই মনোরমার জন্য। এই একটিমাত্র কন্যাকে সুখী করিবার জন্য তিনি না করিয়াছেন কি?

পত্নী এক বৎসরের শিশুকে রাখিয়া যখন পরপারে যাত্রা করেন, ইচ্ছা করিলে হীরালাল তখন আবার বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু মনোরমার মুখ চাহিয়া তিনি সে প্রলোভন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পর বুকে পিঠে করিয়া তিনি মাতৃহীনা কন্যাকে বড় করিয়াছিলেন। অবশ্য সে সময়ে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য গোপালও এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছিল।

তাহার পর কন্যাকে তিনি উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া ভাল-ঘরের সুশিক্ষিত পাত্রে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পরই তিনি পেন্সন লইতে পারিতেন; কিন্তু কন্যার জন্য আরও অধিক অর্থ-সঞ্চয় করিবার দুর্নিবার স্পৃহা তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে দেয় নাই। কন্যার অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু হীরালাল অর্থকেই পরমার্থ জ্ঞান করিয়া "অধিকন্তু ন দোষায়" হিসাবে কেবলই কন্যার জন্য অর্থ-সঞ্চয় করিতে করিতে—শেষে সেই নেশাতেই ভোর হইয়াছিলেন।

বালকের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তিনি পদলুণ্ঠিতা কন্যাকে তুলিলেন। তাহার পর পরম স্নেহে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "মা, তুই এখানে?"

পিতাপুত্রী তখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথম সাক্ষাতের বিপুল আনন্দ উভয়েরই অন্তরে মুখে উছলিয়া

উঠিতে লাগিল। কুশল প্রশ্ন করিতে করিতে টেবলের ধারে চেয়ারে উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন। গোপাল তখন তাড়াতাড়ি তাহার দিদিমণির জন্ম রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে গেল।

পিতা বলিলেন, "তুই এখানে কার সঙ্গে এসেছিস্, মা? আমাকে একটু খবর দিলিনি কেন?"

সহাস্য মুখে মনোরমা কহিল, "আপনি এখানে আছেন, যদি আগে জান্‌তাম, তা হ'লে লিখ্‌তাম বৈ কি! আমরা আজ তিন দিন এখানে এসেছি। চৌধুরী মহাশয়দের বাড়ীতে আমরা অতিথি।"

রায় সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। মনোরমা বলে কি? কন্যার দিকে ভাল করিয়া চাহিতে তাহার অঙ্গের খদ্দর-বেশ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তবে কি—? টেবলের উপর রক্ষিত পরিচয়ের তালিকাটির দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে পড়িলেন— "মনোরমা দেবী, সুধীরচন্দ্র রায়ের পত্নী। সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ও এটর্ণী হরলাল রায়ের পুত্রবধূ। রায় সাহেব হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের একমাত্র দুহিতা।"

অবাক্ বিস্ময়ে তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত কন্যার পানে চাহিয়া রহিলেন। উঃ! আর একটু হইলে কি সর্ব্বনাশই হইত! ভাগ্যে "সাহেব" ছিলেন! তাহার পর ভগ্নকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মা, তুই কি শেষে স্বদেশী বক্তৃতা দিয়ে দেশে দেশে বেড়াতে লাগ্‌লি? তোর শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সবাই তোকে এমনভাবে ছেড়ে দিলে?"

তেমনই মধুর হাস্যে মনোরমা বলিল, "তা'তে কোন দোষ আছে কি, বাবা? কোন মন্দ কাজ কি কর্‌ছি? আর অনুমতির কথা বল্‌ছেন? তা আমার শ্বশুর-শাশুড়ী মত দিয়েছেন। তবে বক্তৃতা কর্‌তে আমি আসিনি। চরকায় সুতা কাটা দেখাবার জন্যে, শেখাবার জন্যে এসেছি। আমার ননদ নন্দাইও সঙ্গে আছেন।"

হীরালাল নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তখন কি ঝটিকা বহিতেছিল।

নিতান্ত বিমূঢ়ভাবে তিনি সম্মুখের দীপাধারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মনোরমা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর ধীরে ধীরে পিতার কাছে আসিয়া তাঁহার রজত-শুভ্র কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে করিতে ডাকিল—"বাবা!"

সে স্নেহস্পর্শে বৃদ্ধের সমস্ত শরীর যেন স্নিগ্ধ হইয়া গেল, সুখাবেগে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। কন্যার মধুর পিতৃসম্বোধনে তাঁহার হৃদয়ে একটা অব্যক্ত আনন্দ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। বৃদ্ধ চোখ মেলিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, "কি মা?"

"আমায় একটা ভিক্ষা দেবেন, বাবা?"

ভিক্ষা! তাঁহার একমাত্র সন্তান, সংসার-মরুভূমির একমাত্র ওয়েসিস্-স্বরূপ কন্যা ভিক্ষা চাহিতেছে? তাঁহার যাহা কিছু, সবই যে তাহার! শুধু তাহারই জন্য তিনি এখনও প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাহাকে ভিক্ষা দিতে হইবে?

পিতা ব্যাকুলভাবে কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কি, মা? ভিক্ষা কি রে! সবই যে তোর, মনো! কি চাস্, বল্।"

মনোরমার মুখমণ্ডল সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা! খেটে খেটে আপনার শরীর মাটী হয়ে যাচ্ছে। এ বয়সে আর কেন? আপনি এখন অবসর নিন্, বাবা! আমি আপনার সেবা কর্‌ব। চলুন বাবা, কাশী যাই। আমি শ্বশুর-শাশুড়ীকে ব'লে কিছু-দিন আপনার সেবা কর্‌ব, বাবা! আর টাকার কি দরকার? আপনার যা আছে, পায়ের উপর পা রেখে রাজার হালে চ'লে যাবে, বাবা! তা ছাড়া পেন্সন ত পাবেন। এ বয়সে আপনি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবেন, সে আমার সহ্য হবে না। চলুন, কাশী যাই। এ ভিক্ষা আমায় দেবেন?"

বলিতে বলিতে মনোরমার মুখমণ্ডলে স্নেহময়ী মাতৃত্বের ছবি যেন ফুটিয়া উঠিল। বৃদ্ধ একবার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সেই মধুর, স্নেহব্যাকুল মুখচ্ছবি দেখিলেন, তাহার পর টেবলের উপর মাথা রাখিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মনোরমা পিতার মস্তকে, কেশে তেমনই ভাবে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সে আবার বলিয়া উঠিল, "বাবা!"

সহসা মাথা তুলিয়া তিনি কন্যার দিকে চাহিলেন। কন্যার মুখে আজ পরলোকগতা সাধ্বীর ব্যাকুলতাপূর্ণ দৃষ্টি, উদ্বেগ যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার মনে হইল, সুদূর, লোকাতীত রাজ্য হইতে কাহার কাতর প্রার্থনা যেন কন্যার কণ্ঠধ্বনিতে শব্দময় হইয়া উঠিতেছে! বৃদ্ধের উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্ক-মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তাঁহার যেন মনে হইল, বহু

অন্নপূর্ণা আজ ভিখারিণীর সাজে তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া রহিয়াছেন!

ব্যাকুলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কন্যার মস্তক বুকের উপর রাখিয়া তিনি বালকের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "মা! মা রে!"

* * * * *

প্রভাতে ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল ভ্রমণোপযোগী বেশভূষা করিয়া চা পান করিতেছেন, এমন সময় রায় সাহেব হীরালাল তথায় কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। "সাহেব" তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রায় সাহেব নমস্কার করিয়া "সাহেবের" সম্মুখে দাঁড়াইলেন। "সাহেব" একবার অপাঙ্গে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হীরালাল, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি। আমার সেলুন প্রস্তুত। শুধু তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। এখানকার কাজ একরকম মিটিয়াছে। যাহা বাকী আছে, তুমি শেষ করিও। ভাল কথা, মহিলাদের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ করিও না। বুঝিয়াছ?"

কলের পুতুলের ন্যায় রায় সাহেব ঘাড় নাড়িয়া গেলেন।

পকেট হইতে ঘড়ীটা টানিয়া লইয়া একবার দেখিয়া "সাহেব" আপন মনে বলিলেন, "ওঃ, এখনও দশ মিনিট সময় আছে। আর একটা কথা। আর মাসখানেক পরে আমি ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছি। সম্ভবতঃ আর ফিরিব না। বহুদিন পরিশ্রম করিয়াছি, এখন বিশ্রাম করিব। হয় ত তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা। তোমার কর্ম্মদক্ষতায় আমি সন্তুষ্ট আছি। যদি তোমার কোন প্রার্থনা থাকে, বলিতে পার; আমি সাধ্যমত তোমার উপকার করিতে ত্রুটি করিব না।"

হীরালাল "সাহেবকে" ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন, "সাহেব, আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। সেই জন্যই আমি বিশেষ করিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। যদি আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করেন, আমি যতদিন বাঁচিব, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।"

বলিতে বলিতে রায় সাহেব একখানি দরখাস্ত "সাহেবের" হস্তে প্রদান করিলেন।

"সাহেব" নিবিষ্টচিত্তে উহা পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি! তুমি পেন্সন চাও? কেন, তোমার অতিরিক্ত কার্য্যকাল কি শেষ হইয়াছে?"

হীরালাল বলিলেন, "আজ্ঞে, এখনও আরও দুই বৎসর আমি কাজ করিতে পারি। কিন্তু সাহেব, আর এ শরীরে সহ্য হইতেছে না। আমার তৃতীয়বারের অতিরিক্ত কার্য্যকাল আর পাঁচ দিন পরে শেষ হইবে। সেই সঙ্গেই আমায় রেহাই দিবেন, এই আমার প্রার্থনা। আপনি থাকিতে থাকিতে আমার ব্যবস্থা করিয়া গেলে কোন গোলযোগ হইবে না।"

"সাহেব" কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টিতে রায় সাহেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি। এখন অবসর লইলে কিছুকাল সরকারী বৃত্তি-ভোগের অবসর পাইবে। সেই আরামের লোভে যাইতে চাহিতেছ। বেশ, আমি তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলাম। নমস্কার রায় সাহেব, ভগবান্ তোমায় শান্তি দিন।"

"সাহেব" কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন—মেদিনীপুর।

ত্রয়োদশ অধিবেশন।

(২রা বৈশাখ ১৩২৯, শনিবার প্রাতঃকালে পঠিত)

সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

"যা কুন্দেন্দু-তুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবর-দণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥"

সর্ব্বাগ্রে এই সম্মিলন-সভার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে শরণ লইয়া কার্য্যারম্ভ করি। তাহার পর আপনারা এই অভাজনকে বর্ত্তমান ত্রয়োদশ সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির উচ্চ আসন প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, আমার যৎসামান্য সাহিত্যচর্চ্চার আশাতিরিক্ত পুরস্কার-বিধান করিয়াছেন, এই অযাচিত অচিন্তিত সম্মানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের পত্রে যখন নির্ব্বাচন-সংবাদ পাইয়াছিলাম, তখন এই সম্মান-লাভে একটা আত্মতৃপ্তি, একটা গৌরব অনুভব করি নাই, এ কথা বলিলে সাধারণ মানবমনের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা গোপন করা হয়; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অযোগ্যতা-স্মরণে—বিশেষতঃ পূর্ব্বগামী বিরাট্ পুরুষগণের সহিত তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া, লজ্জাভয়-জনিত অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম, এ কথা না বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয়। ইহা মামুলি বিনয়ের বাঁধা বুলি নহে,—হৃদয়ের অন্তস্তলে যাহা অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি, তাহাই অকপটচিত্তে প্রকাশ করিতেছি।

পরন্তু, নানা কারণে বিষাদ-কালিমা আমার সমগ্র হৃদয় পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। যে উৎসাহে, যে উদ্যমে, যে স্ফূর্ত্তিতে, যে আনন্দে, বহরমপুর, ভাগলপুর, ময়মনসিংহ, কলিকাতা ও বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনে 'গবেষণার নিমন্ত্রণ' গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং সভাসমক্ষে চটুল রচনা উপস্থাপিত করিয়া বাচালতার পরিচয় দিয়াছিলাম, সে উৎসাহ, সে উদ্যম, সে স্ফূর্ত্তি, সে আনন্দ নাই। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমার জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পারিবারিক জগতে যে মহাশোকে নিমজ্জিত হইয়াছি, সাধারণের সমক্ষে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণ-যবনিকা উত্তোলন করিবার অধিকার আমার নাই; কিন্তু সাহিত্য-জগতেও এই কয়েক বৎসরে যে সব বিয়োগদুঃখ অনুভব করিয়াছি, সে সকলের জন্যও হৃদয় ভারাক্রান্ত। সাহিত্য-সম্মিলনের প্রসঙ্গ উঠিলেই ঋষিকল্প মনীষী, ধীর অথচ উৎসাহশীল, কোমলহৃদয় অথচ দৃঢ়প্রকৃতি, প্রিয়ভাষী অথচ সত্য-সন্ধ, সাহিত্য-পরিষদের তথা সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণ-স্বরূপ রামেন্দ্রসুন্দরের অকালমৃত্যুজনিত শোক নবীভূত হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সহযোগী অক্লান্তকর্ম্মা পরিষদ্গতপ্রাণ ব্যোমকেশের স্মৃতিও উজ্জীবিত হয়। এই কর্ম্মিযুগল সাহিত্য-পরিষদ্ তথা সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে কিরূপ তদ্গতচিত্তে সময় ও শক্তিনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলীর কাহারও অবিদিত নাই; সুতরাং তাহার বাহুল্য-বর্ণনা করিতে চাহি না। কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গসুখলাভ করিয়া কি উৎসাহে, কি স্ফূর্ত্তিতে, কি আনন্দে সাহিত্য-সম্মিলন-উপলক্ষে দূরদেশে যাত্রা করিয়াছি, তাঁহাদিগের মধুর সংসর্গে কি ভাবে পথের কষ্ট ও প্রবাসের কষ্ট নিবারিত হইয়াছে, আজকার দিনে সেই কথাই কেবল মনে পড়িতেছে।

সাহিত্য-সম্মিলন-উপলক্ষে শুধু যে এই দুই জনের অভাবই তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি, তাহা নহে; গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সব সাহিত্য-সেবকের তিরোধান হইয়াছে

তাঁহাদিগের অভাবও এই আনন্দময় সম্মিলনের উপর বিষাদের ছায়াপাত করিতেছে। ভাগলপুরে তৃতীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি এবং সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বিদ্যাপতি-পদাবলীর প্রথম বাঙ্গালী সঙ্কলয়িতা ও সম্পাদক, সুধী ও সুবিচারক ৺সারদাচরণ মিত্র; চট্টগ্রামে ষষ্ঠ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি, বঙ্গ-ভারতীর একনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধক ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার; যশোহরে নবম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি, বিদ্বৎপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ; বিদ্যাব্রহ্মণ্যবিভূষিত ৺রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর; 'জ্ঞান ও কর্ম্মে'র ব্যাখ্যাতা পূতচরিত্র স্যার ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম্ম-সাধনা ও সাহিত্যসাধনায় সিদ্ধকাম পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী; 'নব্যভারত'-সম্পাদক ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ও তাঁহার অকালে জীবন-বৃন্তচ্যুত পুত্র ৺প্রভাতকুসুম; 'সুরভি ও পতাকা' এবং 'নবপ্রভা'র সম্পাদক ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়; 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুলেখক ও সদ্বক্তা ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি; 'ইংরাজের জয়,' 'শকুন্তলারহস্য,' ও 'বিদ্যাসাগর-চরিত'-প্রণেতা ও গীত-রচয়িতা 'বঙ্গবাসী'র ৺বিহারীলাল সরকার রায় সাহেব; সূক্ষ্মদর্শী নবীন সমালোচক ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী; 'নব্য-ভারত' ও 'ভারতবর্ষে'র লেখক, আমার পুরাতন ছাত্র ও অধুনাতন মিত্র ৺রসিকলাল রায়; 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'-প্রণেতা ৺প্রতাপচন্দ্র ঘোষ; গীতার পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ব্যাখ্যা-প্রণেতা ৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু; 'অনাথ বালকে'র স্রষ্টা ৺চন্দ্রশেখর কর; 'ভূপ্রদক্ষিণ'-কারী ৺চন্দ্রশেখর সেন; প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুর; সুকবি ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন ও ৺অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতির স্মৃতি এই উপলক্ষে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইঁহারা সকলেই যে সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়া সভ্য-মণ্ডলীর উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তথাপি এমন দিনে তাঁহাদিগকে ভোলা যায় না। তাঁহাদিগের অভাবে যে 'জননী বঙ্গভাষা' দরিদ্রা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের শূন্য স্থান যে শীঘ্র ও সহজে পূর্ণ হইবার নহে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আবার আজ এক মাস হইল, 'তপোবনে'র যুবক-কবি ৺জীবেন্দ্রকুমার দত্তের অকালে জীবনান্ত হইয়াছে। এ সংবাদে সভাস্থ সকলেই কাতর হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। জীবেন্দ্রকুমারের বীণায় ঝঙ্কার এখনও অনেকের কর্ণে বাজিতেছে; বিশেষতঃ সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে তাঁহার 'আমন্ত্রণ,' 'বাণীপ্রশস্তি,' 'মাঙ্গলিক,' 'শ্রদ্ধাহোম' প্রভৃতি আবেগ-পূর্ণ কবিতা আমাদিগের মধ্যে অনেকের শ্রুতিগোচর হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হৃদয় আরও গভীর অবসাদে মুহ্যমান। সাহিত্যের আসরে জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভাগের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। এইরূপ নানাকারণ জনিত ঘনঘোর বিষাদ-অবসাদের অন্ধতমসায় সভাপতির কর্ত্তব্যসাধনে আহূত হইয়া কবির কথায় না বলিয়া থাকিতে পারি না,—

"এ কি শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা?

*　　*　　*　　*

এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
এ যে বুককাটা দুঃখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম-বেদনা;

এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা ?
এসেছি কি হেথা যশের কাঙ্গালী,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি ?
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা ?"

তথাপি দেশের এই দুর্দ্দিনে, এতগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তি সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়াছেন, প্রাণের বাঁধন ও প্রাণের বেদনের টানে মায়ের ডাকে সকলে একত্র মিলিত হইয়াছেন, অনেক দিন পরে আমরা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবার, সৌহার্দ্দ-সূত্রে সংবদ্ধ হইবার শুভসুযোগ পাইয়াছি, ইহাতে কৃতার্থতাবোধ না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু বিষাদ-ভারাক্রান্ত মন লইয়া এরূপ বিদ্বজ্জন-সমাগমে তাঁহাদিগের শ্রবণযোগ্য প্রবন্ধ প্রকটন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। পূর্ব্বগামী প্রথিতযশাঃ সভাপতিগণের, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এই সুপণ্ডিতগণের গভীর জ্ঞান-গবেষণা, দেশজননী ও ভাষাজননীর সাত্ত্বিক সাধক সন্তান, 'সাগর-সঙ্গীতে'র কবি, দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের অপূর্ব্ব ভাব ও ভাষা-সম্পদ কোথায় পাইব ? যাঁহার উৎসাহ-বাক্যে ও বুদ্ধি-পরামর্শে সাহিত্যসাধনায় প্রণোদিত হইতাম, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে যাঁহাকে না শুনাইলে ভরসা পাইতাম না, যাঁহার পরিতোষ না হইলে আত্মপ্রত্যয় জন্মিত না, আমার সেই "guide philosopher and friend' রামেন্দ্রসুন্দরও নাই !

যাহা হউক, পূর্ব্বাপর একটা রীতি আছে যে, সভাপতিকে 'অভিভাষণ' পাঠ করিতে হয়, সেই রীতির অনুবর্ত্তন করিতেই হইবে। বিশেষ কোনও নূতন কথা বলিতে পারিব না ; যাহা বলিব, তাহাও সরস ও মনোজ্ঞ করিয়া বলিতে পারিব না। একে ত শক্তির অভাব, তাহাতে আবার অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সময় ও সুবিধা পাই নাই। শারীরিক অপটুতাও সুষ্ঠুভাবে কার্য্য নিষ্পাদনের অন্তরায় হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা পারি, তাহাই গুছাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব। সুধীবর্গ আমার বক্তব্য বিষয়ের অনুমোদন করিবেন কি না, জানি না। তথাপি যে কথাটি বহুদিন হইতে হৃদয়-মন আলোড়িত করিতেছে, প্রাণের ভিতর অহরহ অনুভব করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিব। ষোল বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যাপারে জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রভাতে যে কথা ক্ষীণস্বরে বলিয়াছিলাম, এখন আবার দেশের পূর্ণ-জাগরণের দিনে সেই কথা নূতন করিয়া নাড়া পাইয়া সাড়া দিতেছে ; এই শুভ অবসরে তাহা সাহিত্য-সম্মিলনের সমক্ষে প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বক্তব্য দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বহু সুলেখক সম্মিলনে পাঠের জন্য সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, সেগুলি শ্রবণ করিবার সুখ হইতে আপনাদিগকে অনেক ক্ষণের জন্য বঞ্চিত করিতেছি। এজন্য প্রবন্ধ-রচয়িতা ও শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। তবে আপনারা মনে রাখিবেন যে, মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচনের জন্য আপনারাই দায়ী। এখন আপনাদের কৃত কার্য্যের ফলভোগরূপ বিড়ম্বনা অনিবার্য্য।

সমস্ত কর্ম্মজীবন—সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল—শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, যতদিন কর্ম্মক্ষম থাকিব, ততদিন এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; সুতরাং যদি এই আসরেও শিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, তাহা হইলে আপনারা বোধ হয় বিস্মিত বা বিরক্ত হইবেন না। এরূপ 'talking shop' অর্থাৎ জাতব্যবসার কথা জাহির করা এ ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্য্যন্ত আপনারা যদি কথাগুলি ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করেন, তাহা হইলে সাহিত্য-সম্মিলনে শিক্ষার কথা উত্থাপন করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশের এই নব-জাগরণের দিনে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন এবং বিদেশী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিদেশী বিদ্যার বিস্তারের জন্য স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় যে আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র হইতে পারে না, এ কথা স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষাপ্রণালী জাতীয় জীবন-গঠনের পক্ষে নিষ্ফল হইয়াছে, প্রত্যুত ঘোরতর অমঙ্গলসাধন করিয়াছে, এই জন্য ইহার ও ইহার সংসৃষ্ট স্কুল-কলেজের বিলোপ-সাধন অবিলম্বে কর্ত্তব্য—এরূপ অভিমতও প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমে এই 'চরম'

অভিমতটির কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া পরে মূল কথার আলোচনা করিব।

বিদেশী শিক্ষার গুণ।

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলনে আমাদের অন্ততঃ তিনটি উপকার হইয়াছে। প্রথমতঃ, আজ যে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে, শুধু বাঙ্গালাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধন ও দেশাত্মবোধ জন্মিয়াছে, ইহা ইংরেজী সাহিত্য ও ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হলাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের ইতিহাস পাঠের ফল। পূর্ব্বপ্রথানুসারে নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, পুরাণ, স্মৃতি, নব্যন্যায় প্রভৃতির চর্চ্চা করিলে স্বজাতীয় জ্ঞানানুশীলন অব্যাহতভাবে চলিত বটে; কিন্তু শেকস্‌পীয়ার, মিল্টন, বার্ক, শেরিডান, স্কট, বায়রন, মিল, মেকলের রচনা-পাঠে যে স্বাধীনতাস্পৃহা ও দেশহিতৈষণা জাগিয়াছে, তাহার উদ্ভব হইত কি না সন্দেহ। জানি, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' আমাদের শাস্ত্রের কথা! কিন্তু বার্ক, বায়রন প্রভৃতির ওজস্বিনী বাণীই এই শাস্ত্রীয় শ্লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই কি? বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে আমরা নিজের অনেক অমূল্য দ্রব্য হারাইয়াছি বটে (সে কথা পরে বলিব), কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই বিদেশীয় জ্ঞানের প্রবল ধাক্কায় জাগিয়া উঠিয়া নিজের জিনিষ খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছি, নিজের অভাব-ত্রুটি, নিজের অবনতি-অবমাননা তীব্রভাবে অনুভব করিতে শিখিয়াছি, ইহা অস্বীকার করিলে ঘোরতর কৃতঘ্নতা হয়। এই বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষা যেমন এক দিকে মনের গোলামি (slave mentality) আনয়ন করিয়াছে, তেমনি অপর দিকে জাতীয়ভাবোধ (national self-consciousness) উৎপাদন করিয়াছে। মনে রাখিবেন, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট। মহাত্মা ৺রামমোহন রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তান না হইলেও এই বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার সুপক্ক ফল।

সেই জন্যই যখন গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংসৃষ্ট স্কুল-কলেজ ধ্বংস করিবার চেষ্টা প্রকট হইয়াছিল, তখন তাহাতে সায় দিতে পারি নাই—ঝুটা মারা যাইবার আশঙ্কায় নহে, মনের গোলামির প্রভাবেও নহে, অন্ধ বিদেশী সাহিত্য-প্রীতির খাতিরেও নহে, যত দিন জাতীয় শিক্ষার একটা প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা (scheme) খাড়া না হইতেছে এবং প্রয়োজনীয় মালমশলা সংগৃহীত ও সুসজ্জিত না হইতেছে (সে কথা পরে বলিব), তত দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রণালীর সংহার করিলে বিষম ভ্রম হইবে। তত দিন এই ইংরেজী সাহিত্যের এবং ইউরোপীয় ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিতর দিয়াই দেশাত্মবোধ উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় ইংরেজী সাহিত্য রাজাসনচ্যুত হইলেও একেবারে বর্জ্জনীয় নহে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্যগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে, জড়বিজ্ঞানে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রসাদাৎ সে সমস্ত একপ্রকার বিনা আয়াসে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানগণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। নিজেদের প্রযত্নে এই সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে আমাদের কত শতাব্দী লাগিত, কে জানে? এটা আমাদের কম লাভ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' বুঝাইয়াছেন,—'ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক-শিক্ষায় বড় সুপটু।...ইংরেজী শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।' (৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)। ইহার ফলে আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শুধু কৃতী ও বিচক্ষণ ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পাইয়াছি, তাহা নহে, ইউরোপীয় জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া সেই ভিত্তির উপর নব নব মৌলিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে ইউরোপীয় জাতিগণকেও চমৎকৃত করিয়াছেন, জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় এমন বৈজ্ঞানিকও পাইয়াছি। অতএব এই বিদেশজাত বিজ্ঞান বর্জ্জনীয় নহে, সাদরে গ্রহণীয়।

তৃতীয়তঃ, এই শিক্ষার ফলে ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশভাষায় একটা সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজী এবং তাহার মারফত ফরাসী, জার্ম্মাণ, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যের স্বাদ পাইয়া, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত একটা অভিনব ও বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আমাদের সাহিত্যের Renaissance অর্থাৎ নব-জীবন লাভ বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যগণও আদর করিয়া আমাদের এই

নূতন সাহিত্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন, ইহার রস গ্রহণ করিয়া আনন্দিত ও চমৎকৃত হইতেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইউরোপ-জয়বার্ত্তা আর আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণে এই সাহিত্যের কোনও কোনও অংশ বি ত হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর এই সাহিত্য যে পরম উপাদেয় বস্তু এবং ইহাতে যে যথেষ্ট মৌলিকত্ব ও নূতনত্ব আছে, সৌন্দর্য্য ও মহত্ব আছে, তদ্বিষয়ে অন্য মত থাকা উচিত নহে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন, ভূদেব, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্কিম-ভূদেব-চন্দ্রনাথ-পূর্ণচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কাব্য সমালোচনা, 'সামাজিক প্রবন্ধ,' 'উদ্ভ্রান্তপ্রেম,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'নীলদর্পণ,' 'জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি যে নকলনবিশী সাহিত্য, বা বিকৃত বিজাতীয় বিদেশীয় আদর্শে রচিত, এ কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। দেশে জ্ঞানপ্রচারের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য, যে সকল সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলিও এই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সুফল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তখন দেশীয় প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, আরবী, পারসী) ও প্রচলিত মাতৃভাষা একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দী হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। সুতরাং বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ষোল আনা অমঙ্গল সংসাধিত হয় নাই। অল্পমাত্রায়ও দেশীয় ভাষার প্রচলন থাকাতে মেকলে যে 'a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions in morals, and in intellect' বানাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই; এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও মাতৃভাষায় কতকটা জ্ঞান লাভ করার জন্যই এরূপ একটা নূতন সাহিত্য-গঠন সহজ ও সম্ভবপর হইয়াছিল।

বিদেশী শিক্ষার দোষ।

তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিব, এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্র হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আমলে বি, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, কয়েক বৎসর পরেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে স্থানচ্যুত করে। অনেক দিন হইতে সর্ব্বনিম্ন পরীক্ষায় ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ ও বাঙ্গালা রচনার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার (সাহিত্যের নহে) সামান্য একটু স্থান হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদের অনেক চেষ্টায় উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষায় রচনার স্থান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার উপর পাশ-ফেল নির্ভর করিত না। তাহার পর, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার হইল, তখন শুধু নিম্নতম পরীক্ষায় নহে, আই, এ, আই. এস, সি ও বি, এ পরীক্ষায়ও ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ ও বাঙ্গালায় রচনার পরীক্ষার প্রচলন হইল, ইহাতে পাশ না হইলে সমগ্র পরীক্ষায় পাশ হইবার যো নাই; নিম্নতম পরীক্ষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিষয়ক প্রশ্নপত্রের পরীক্ষার্থিগণ ইচ্ছা করিলে, মাতৃভাষায় উত্তর লিখিতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থাও হইল। (পরে ভূগোল ও স্বাস্থ্যরক্ষা এই দুইটা বিষয়ে উক্ত ব্যবস্থা মঞ্জুর হইয়াছে।) মনে রাখিতে হইবে, এই সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালায় শুধু অনুবাদ ও রচনার ব্যবস্থা হইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্য পরীক্ষার বিষয় হয় নাই; এবং রাজভাষায় (এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ পরীক্ষায়) কোনও পরীক্ষায় দুইখানি, কোনও পরীক্ষায় তিনখানি প্রশ্নপত্র, আর মাতৃভাষায় শুধু একখানি। ইহাতেই বুঝা যায়, মাতৃভাষার স্থান কত সঙ্কীর্ণ; আবার সকল বিষয়েই ও সকল পরীক্ষাতেই মাতৃভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই, শুধু নিম্নতম পরীক্ষায় দুই একটি বিষয়ে ইচ্ছাধীন। সে দুই একটি বিষয় সকল ছাত্রের অবশ্য-গ্রহণীয়ও নহে। সম্প্রতি এম্. এ পরীক্ষায়, ইংরেজী ভাষার ন্যায়, দেশভাষার সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব অন্যতম পরীক্ষণীয় বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও সভ্যতাতত্ত্ব আর একটি পরীক্ষণীয় বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (যদিও শেষোক্তটির বেলায় শিক্ষা ও পরীক্ষা ইংরেজী ভাষায়ই হইবে।)

কিন্তু ইহাতেই কি আমরা সন্তুষ্ট থাকিব? 'রাজভাষার

সহিত বঙ্গভাষার 'আলোচনা'র অধিকার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থায় পাইয়াছি, 'শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদলবাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে'—ইহাই কি যথেষ্ট? চৌষট্টি রকম বিদেশী বিদ্যার ভিড়ের মধ্যে দেশভাষা ও সাহিত্যের, এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও সভ্যতাতত্ত্বের মাথা গুঁজিবার মত একটু একটু স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বিদায়ক্ষণে—অন্তিমকালে হরিনামের ন্যায়—মুষ্টিমেয় ছাত্রকে ভারতের বাণী শুনান হইবে, এই ব্যবস্থায় জাতীয় গৌরবে উৎফুল্ল হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। পত্রের পশ্চাতে 'পুনশ্চের' ন্যায়, উইলের পশ্চাতে কডিসিলের ন্যায়, বিদেশীয় বিদ্যার লম্বা ফিরিস্তির পশ্চাতে দুই একটা জাতীয় বিদ্যা গুঁজিয়া দিলেই কি বিশ্ববিদ্যালয় 'জাতীয়' হইয়া দাঁড়াইল? জানি, অনেক ক্ষেত্রে 'পুনশ্চ' অংশে বা 'কডিসিল' অংশে দরকারী কথা থাকে। কিন্তু তথাপি তাহাকে মূল দলিল বলা যায় না। বিদেশী বিদ্যার চূড়ার উপর স্বদেশী বিদ্যার একটু ময়ূরপাখা চড়াইলেই মোহিত হইবার, ভক্তিরসে আপ্লুত হইবার বিশেষ কিছু নাই। তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বড় আক্ষেপেই বলিয়াছেন, 'সামান্যা দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটি কোণায় তাহাকে একটু ঠাঁই দিয়াছ মাত্র।' বাস্তবিক, ইহা মুষ্টিভিক্ষা-মাত্র, ন্যায্য প্রাপ্যের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ। এইটুকু রফায় কৃতার্থ হইলে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বদান্যতায় উল্লসিত হইলে, জাতীয়তার, দেশাত্মবোধের, জননী বঙ্গভাষা ও জননী জন্মভূমির অবমাননা করা হয়।

কেহ কেহ আবার ইহা অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত যুক্তির অবতারণা করেন—যেহেতু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আমাদেরই দেশীয় এক জন রাজপুরুষ, এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের শিক্ষার দপ্তর আমাদেরই দেশীয় শিক্ষাসচিবের হস্তে ন্যস্ত; অতএব এই বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এরূপ স্তোকবাক্যে আসল কথা ভুলিলে চলিবে না।

রাজনীতিক্ষেত্রে একটা জাতি অপর একটা জাতির অধীন হইলে তাহাকে পরাধীন জাতি বলে। কিন্তু যদি একটা জাতির স্ত্রী-পুরুষে শিক্ষার নামে বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য, বিদেশীয় ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, বিদেশীয় অর্থনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র (law), বিদেশীয় রাষ্ট্রনীতি, ও ধর্ম্মতত্ত্ব, বিদেশীয় ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র, বিদেশীয় গণিত ও বিজ্ঞান, বিদেশীয় ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও কৃষিবিজ্ঞান, বিদেশীয় শিল্প ও কলা, বিদেশীয় ভাষার অনুপান-সাহায্যে গলাধঃকরণ করিতে থাকে এবং নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত জ্ঞান-সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থাকে, তাহা হইলে জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনটা পর্য্যন্ত পরাধীন হইয়া যায় না কি? এরূপ শিক্ষার যে বনিয়াদেই গলদ, মনের গোলামি (slave-mentality) যে এরূপ শিক্ষার অপ্রতিবিধেয় পরিণাম, তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? শেক্স্পীয়ারের একখানি নাটকে দ্বিতীয় রিচার্ডের রাণী শত্রুকর্ত্তৃক ধর্ষিত স্বামীকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন,—

"What! is my Richard both in shape and mind
Transform'd and weekened? Hath Bolingbroke
Deposed thine intellect? Hath he been in thy
heart?"

আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-সম্প্রদায়েরও কি ঠিক সেই দশা নহে? এই যে উদাহরণ দিতেও বিদেশীয় সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হইল, এবং মাঝে মাঝে আভাঙ্গা বিদেশীয় শব্দ প্রয়োগ করিয়া বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা slave-mentalityর কুৎসিততর নিদর্শন আর কি আছে?

৭ম (কলিকাতা) সাহিত্য সম্মিলনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি; আমাদের পূর্ব্বগৌরব আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি।' এই আত্মবিস্মৃতির জন্য আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই দায়ী। আমরা নিজের জাতির অতীত-সম্বন্ধে বিরাট্ অজ্ঞতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছাত্রজীবনে নবপ্রচারিত 'বঙ্গবাসী'তে আমার তখনকার শিক্ষাগুরু খ্যাতনামা শিক্ষক ও লেখক ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম,—"ভারতবাসি, তুমি কাম্স্কটকার ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিতে পার, কিন্তু কৌশাম্বী বা রাজগৃহ কোথায় ছিল, তাহা তুমি বলিতে পার না।" কথা কয়টি আজও ভুলিতে পারি নাই। আমার মত বোধ হয় আরও অনেকের জ্ঞান এইরূপ 'একপেশে।' ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের নখদর্পণে, কিন্তু ভারতবর্ষে কখনও "বাৎস্যায়"প্রচলিত হইয়াছিল কি না, জিজ্ঞাসা করিলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার শক্তি দূরে থাকুক,

প্রশ্নটা বুঝিবার শক্তিও অধিকাংশ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর নাই। এইখানেই আসল গলদ।

প্রচলিত প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে গিয়া আমরা নিম্নশ্রেণীতে মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চ্চা করিবার সময়েও বিদেশীয় সাহিত্য-পুস্তকের অনুবাদ বা অনুকরণে রচিত পাঠ্যপুস্তক পড়িতে বাধ্য হই, সেগুলি বিদেশীয় দৃষ্টান্তে ও বিলাতী ভাবে পরিপূর্ণ। চরিত্রের আদর্শ, সদ্‌গুণাবলীর নিদর্শন সবই বিদেশীয় স্ত্রী-পুরুষের জীবন-চরিত হইতে, বিদেশের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। অবশ্য, মহত্বের দৃষ্টান্ত স্বদেশ বিদেশ যেখানেই পাইব, সেখান হইতেই সঙ্কলন করা উচিত বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, স্বদেশের দৃষ্টান্তের সংবাদ না লইয়া বিদেশের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয়। প্রভুভক্তি শিখিতে আমরা বীরবরের উপাখ্যান বা ধাত্রী পান্নার কার্য্য উপেক্ষা করিয়া কার্পেথিয়ান পর্ব্বতে দৃষ্টান্ত খুঁজিতে যাই। 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ' যে দেশের শাস্ত্রবাক্য, সে দেশে অতিথিসৎকারের দৃষ্টান্ত না খুঁজিয়া আফ্রিকায় ভ্রমণকালে কোন্ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ অসভ্য বর্ব্বরদিগের নিকট সদয় ব্যবহার পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করি; মাতৃস্নেহ বুঝিতে 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র গান এবং বৈষ্ণব কবিদিগের বাৎসল্যরসের পদাবলি ফেলিয়া কুপারের কবিতার শরণ লই ইত্যাদি। ইহার ফলে আমরা স্বদেশীয় আদর্শচরিত্রের পরিচয় পাই না এবং শৈশব হইতেই বিদেশীর উপর ভক্তিশ্রদ্ধায় আমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠে। রামায়ণ-মহাভারতের পরিবর্ত্তে গ্রীস ও রোমের পুরাণ-কথা (Lagends of Greece and Rome) ও বাইবেলের বৃত্তান্ত আমাদিগের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের পরিবর্ত্তে, অন্ততঃ তৎপাঠের পূর্ব্বে ইশপের কথামালা ইংরেজীতে বা বাঙ্গালায় আমাদের পরিজ্ঞাত হয়। ইহাই হইল প্রকৃত পরাধীনতা cultural conquest, বিদেশীয় সভ্যতা-কর্ত্তৃক দেশীয় সভ্যতার পরাভব; রাজনীতিক পরাধীনতা অপেক্ষাও বিষম।

তাহার পর একটু উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া বিদেশীয় সাহিত্য অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে ভাষাতত্ব, কাব্যকলা, নাট্যকলা প্রভৃতি শিখিতে হয়; এবং বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া বিদেশীয় গণিত, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখিতে হয়। বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করা যে কতদূর কঠিন ও অস্বাভাবিক ব্যাপার, তাহা আর নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে কি? আশা করি, সকলেই রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের', 'শিক্ষার বাহন' প্রভৃতি সুচিন্তিত সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পড়িয়াছেন। এমন কি, প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত জ্ঞানলাভ কঠিন বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া হয় কি না, তদ্‌বিষয়েও গভীর সন্দেহ আছে। অধিকাংশ স্থলেই ইহা মুখস্থ বিদ্যায় দাঁড়ায়। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র স্বাভাবিক প্রতিভা-প্রভাবে বিদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে। ফলতঃ তাহারা সাধারণ বিধির অন্তর্ভুক্ত নহে, বর্জ্জিত বিধির অন্তর্ভুক্ত।

তাহার পর অশেষবিধ বিদেশী বিদ্যা আয়ত্ত করিতে করিতে আমাদের ধারণা জন্মিয়া যায় যে, সকল বিষয়েরই উচ্চজ্ঞান বিদেশীর একচেটিয়া, আমাদের নিজের জাতির ভাণ্ডারে এ সকল কিছুই নাই। প্রধানতঃ যাঁহার কলমের জোরে এই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,সেই মেকলে 'সাহেব' দারুণ অবজ্ঞাভরে বলিয়াছেন,—'A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia!' আমাদের বিদেশী গুরুগোষ্ঠী আমাদের কর্ণে এই মন্ত্র দিয়াছেন যে, 'উচ্চ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশেষ কিছুই ছিল না, আর সামান্য যাহা কিছু ছিল, তাহা অপর প্রাচীন জাতিসকলের নিকট হইতে ধার করা! হিন্দুর জ্যোতিষ, নাট্যকলা, স্থাপত্য গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে গৃহীত, হিন্দুর অক্ষর-লিখন ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতে গৃহীত ইত্যাদি। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না, গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না, ইত্যাদি অনেক কথাই শুনা যায়।' বিদেশীর ও (বিদেশীর চেলা কোনও কোনও স্বদেশীর) মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমরা নিজের জাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছি, আমাদের হৃদয়ে একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আমাদের গৌরব করিবার মত নিজস্ব সম্পত্তি কিছুই ছিল না—থাকিবার মধ্যে ছিল রাশীকৃত আদিরসের কবিতা, পুতুলপূজার মন্ত্রতন্ত্র, ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজকে নাগপাশে বন্ধনের জন্য অশেষ-বিশেষ বিধিব্যবস্থা, নব্যন্যায়ের কচকচি আর জাতীয় জড়তার আকর মায়াবাদ! মেকলে 'সাহেব' রায় দিয়াছেন,—'I doubt whether the Sanscrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors!'

অথচ জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতবাসী শূন্য বখরাদার, এ কথা কোল, ভীল, সাঁওতালদিগের সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে ইহা কখনই সত্য নহে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলেও তর্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রে যে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, ইহা ত অবিসংবাদী সত্য; কিন্তু আমাদের নিজস্ব সেই জ্ঞান-সম্পৎ কি ইন্‌টারমিডিয়েট বা সাধারণ বি. এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে আয়ত্ত করিবার সুযোগ দেওয়া হয়? জ্ঞানের এই বিভাগে যে ভারতবর্ষের একটা অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা আছে, এ কথা কি উল্লিখিত ছাত্রবর্গ কখনও জানিতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত ('stupendous anomaly') উৎকট অব্যবস্থার কথা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিদেশীয় রাজপুরুষ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেক্‌টার, লর্ড রোনাল্ডসে, চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তথাপি ছাত্রবর্গ 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই রহিয়া গেল। এ অবস্থায় কি বলিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়?

[ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপহার।

নব বর্ষ।

তুমি ছিলে, বিশ্ব ছিল স্বজন-আগার
অযাচিতে স্নেহ প্রীতি
ঢালিয়া দিয়াছ নিতি,
কত ভাবে কত চিহ্ন রয়েছে তাহার।

নিবে গেল রাতারাতি
গৃহের উজল বাতি
প্রতিধ্বনি কাঁদি কাঁদি ঘুরে চারিধারে।

বিভব-সম্পদ-রাজি
আজি যেন ছায়াবাজী,
নির্ব্বাক্ বান্ধবকুল বেদনার ভারে।

অমঙ্গল-সমাচার
মুখে নাহি সরে কার,
বিয়োগের ছায়াপাতে সব গেল ঘুরে।

উৎসব-আনন্দ-হীন
গৃহ তমসায় লীন
বিষাদে কাঁদিয়া বায়ু ফিরে ঘুরে ঘুরে।

আগমনী বিসর্জ্জনে
মিশে গেল এক সনে;
বিচ্ছেদের ব্যবধান সহে নাকো প্রাণে।

সুখের সে সম্মিলন
আজি করে বরিষণ
নয়নে ব্যথার অশ্রু তার প্রতিদানে।

স্মৃতি আনে ধীরে ধীরে
ডুবে না বিস্মৃতি-নীরে
অতীতের সে কাহিনী নিশিদিন চিতে,

নব বর্ষ এল ফাঁকা
হৃদয়ে নৈরাশ্য মাখা
গত বরষের কথা জাগাইয়া দিতে।

তোমারে স্মরণ ক'রে
অশ্রুজলে আঁখি ভরে'
নূতন বরষ পুনঃ সাথী ক'রে নিতে।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

পানকৌড়ি

একবার আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে গেলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, কৃত্রিম জলাশয়ের সন্নিধানে পানকৌড়ি দলবদ্ধ হইয়া উড়িতেছে, অথবা বৃক্ষশাখায় বসিতেছে; কখনও বা জলে নামিয়া সঞ্চরণশীল ছোট ছোট মাছগুলিকে তাড়া দিতেছে,—ডুবিতেছে, উঠিতেছে, ভাসিতেছে; আশেপাশে ডাঙ্গায় বকগুলা অগ্রসর হইয়া পলায়মান মৎস্যযূথের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ের উপর দিয়া ধাবিত হইতেছে ও সুযোগমত তীক্ষ্ণ চঞ্চুর সদ্ব্যবহার করিতেছে। বর্ষায় যে পানকৌড়িশাবকগুলি জাত হইয়াছে, তাহারা উল্লাসভরে জলে নামিয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে নিমজ্জিত হইতেছে, আবার ভাসিয়া উঠিতেছে; ক্ষণপরে আবার উড়িয়া বৃক্ষশাখায় বসিয়া পক্ষবিস্তার করিতেছে। হয় ত বা দিনের বেলায় পানকৌড়ি ছোট ছোট দল বাঁধিয়া একেবারে চিড়িয়াখানা পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে গ্রামান্তরে উড়িয়া গেল; সন্ধ্যার পূর্ব্বে একে একে অথবা দলে দলে গড়েরমাঠের উপর দিয়া কতকগুলিকে বাগানের মধ্যে নিবাসবৃক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখা যায়; ইহার মধ্যে কোথায় তাহারা কি করিল, কি খাইল, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। এই ক্রীড়াশীল কৃষ্ণকায় বিহঙ্গের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পাঠকের কৌতূহল হয় না কি?

আলিপুরের চিড়িয়াখানার কথা যখন উঠিল, তখন এই পানকৌড়ি-উপনিবেশের যে একটা ঐতিহাসিক দিক্ আছে, সে কথার উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল, আলিপুরের বাগানের ক্ষুদ্র দ্বীপে কতকগুলি ক্রৌঞ্চ (Paddy bird) বসতি করিয়াছিল; তখন অন্য কোনও পাখী সেখানে থাকিত না। এমন সময়ে এক দিন এক দল নিশাচর বক—ওয়াক্ বক বা night-heron—তথায় আসিয়া দেখা দিল। পরবৎসর অধিক সংখ্যায় ঐ ওয়াক্ বক উপস্থিত হইল। তাহাদের সে স্থান পরিত্যাগ করিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কিছু দিন পরে তাহাদের অধিকাংশই উড়িয়া গেল। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে দলে দলে ওয়াক্ বক আসিয়া কোঁচবককে স্থানচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিল। এই সময়ে অনেকগুলা কালো কালো পানকৌড়ি কোথা হইতে আসিয়া উক্ত দ্বীপের কিয়দংশ দখল করিয়া বসিল। ধরুন, মোটামুটি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে ওয়াক্ পানকৌড়ির সংস্থান এইরূপ দাঁড়াইল। উভয়ে কতকটা নির্ব্বিবাদে কাছাকাছি বাসা বাঁধিয়া তদবধি ঘরকন্না করিতে লাগিল। পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনাও রহিল, কিন্তু তাহা বেশী নহে; কারণ, দিবাভাগে বিচরণশীল পানকৌড়ির সহিত নিশাচর ওয়াকের খাদ্যাদি বিষয় লইয়া দ্বন্দ্ব-সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। পানকৌড়ি দিনের বেলায় আহারের অন্বেষণে দূরে চলিয়া যাইত; আসন্ন সন্ধ্যায় যখন তাহারা নিবাসবৃক্ষে ফিরিয়া আসিত, তখন নিশাচর night-heronএর বাহির হইবার পালা। কাজেই উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ ঋতুবিশেষে নীড়রচনা-কালেই হইত; কারণ, তখন ওয়াক্ ও পানকৌড়ি কুলায়স্থিত ডিম্ব অথবা শাবক লইয়া ব্যস্ত থাকিত।

বিহঙ্গতত্ত্বের দিক্ হইতে এই সামান্য ইতিহাসটুকুর মধ্যে যে তথ্য নিহিত আছে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু ইহার প্রত্যেকটির হিসাব রাখিতে বাধ্য। পানকৌড়ির জ্ঞাতিসম্পর্কীয় এক দল গয়ের পাখী (Snake-bird) যখন আবার ১৮৯৬ সালে উড়িয়া আসিয়া ঐ ছোট বিহঙ্গ-দ্বীপের ইতিহাসকে কিছু জটিল করিয়া তুলিল, তখন বোধ করি, পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসুর কৌতূহলের সীমা রহিল না। এইরূপে ক্রৌঞ্চ বক, ওয়াক্ বক, পানকৌড়ি ও গয়ের এই কয় চিড়িয়ায় আলিপুরের চিড়িয়াখানার জীবজগতের এক অংশ বৈচিত্র্যময় ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

উপরে যে তথ্যের উল্লেখ করিলাম, তাহার প্রতি বিশেষ করিয়া এ স্থলে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নহে; তবে তিনি লক্ষ্য করিবেন যে, এই শ্রেণীর পানকৌড়ি (১) সরোবর, হ্রদ, বিল, তড়াগাদির পাখী,—সাগরাম্বুভক্ত নহে; (২) বিশেষ কোনও কারণবশতঃ ঋতুবিশেষে ইহারা কোনও কোনও স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে; (৩) ইহারা দলবদ্ধ হইয়া আনাগোনা করে; (৪) নীড়রচনা ও শাবকোৎপাদনকালে বকজাতীয় বিহঙ্গের সামীপ্য, উহাদের দাম্পত্য জীবনের বিরোধী নহে, বরং বক ও পানকৌড়ি পাশাপাশি গৃহস্থালী করে।

এই পানকৌড়ির 'বিলাতি' বৈজ্ঞানিক নামটি কিছু

কটুমটে, Phalacrocorax ; যে দুইটি গ্রীক শব্দের সংযোগে এই নাম-করণ হইয়াছে, তাহাদের অর্থ—ন্যাড়া কাক'; ন্যাড়া অর্থে বুঝিতে হইবে যে, উহার মাথায় সাদা সাদা পাত্‌লা লোমের ন্যায় পতত্র থাকায় দূর হইতে মাথাটা যেন bald দেখায়। ইহার ইংরাজী Cormorant প্রতিশব্দটি বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতরা বলেন যে, উহার অর্থ হওয়া উচিত জলের কাক। অতএব দেখা গেল যে, উভয় সংজ্ঞাতেই পাখীটা কৃষ্ণকায় বায়সকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মোটের উপর কিন্তু ইহার চেহারা আদৌ নয়ন-সুভগ নহে। দেহটা কালো; চঞ্চু অনেকটা লম্বা ও ইহার অগ্রভাগ নিম্নদিকে বঁড়শীর মত ঈষৎ বক্র; গলা লম্বা;—গয়েরের (Snake-bird) কিন্তু চঞ্চুর অগ্রভাগ সূচিকার মত তীক্ষ্ণ ও ঋজু, এবং কণ্ঠদেশ আরও বেশী সরু; আপাদমস্তক একটা জাড্য বা কাঠিন্য, এরূপ লক্ষিত হয় যে, যখন সে বৃক্ষশাখায় অথবা ভূমিতে বসে, তখন মনে হয় যেন, সে তাহার কঠিন অচপল পুচ্ছের উপর ভর দিয়া খাড়া হইয়া উর্দ্ধশির বসিয়া আছে। অন্য পাখীর ন্যায় বসিবার ভঙ্গী তাহার আদৌ দেখা যায় না। গলাধিকৃত মৎস্যাদি একেবারে পাকস্থলীতে সবগুলা প্রেরিত হয় না, মধ্যপথে গলার কাছে থলির মত একটা আধার আছে, যাহাতে কিছুক্ষণ মাছ পুরিয়া রাখা যায়। এই থলির কাছাকাছি অংশটা কিছু সাদা। মাথায় সাদা লোমের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—এই শুভ্রতা সন্তানজন্মকালেই দৃষ্ট হয়; ঐ সময়ে আবার উহার ঘাড়ের পাশেও পাতলা লোমের ন্যায় সাদা পালকের আবির্ভাব হয়। হাঁসের মত ইহার পা জোড়া, অর্থাৎ চর্ম্মবন্ধনী দ্বারা অঙ্গুলীগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। হংসজাতীয় পাখীগুলি সাধারণতঃ বৃক্ষশাখায় অথবা উচ্চ ভূখণ্ডে উপবেশন করে না; ইহারা কিন্তু স্বভাবতঃ নিবাস-বৃক্ষে অথবা গিরিগাত্রে নীড়রচনা করিয়া থাকে। জলাশয়ের উপর উড়িবার সময় পানকৌড়িকে কতকটা দূর হইতে কাল হাঁস বলিয়া মনে হয়,—কলিকাতার বাজারে উহাকে কাল হাঁস বলিয়া বিক্রয় করা হয়। উহার উৎপতনভঙ্গী লঘু ও ললিত নহে; সরোবর-বক্ষ হইতে ঈষৎ উচ্চে পানকৌড়ি যখন উড়িতে আরম্ভ করে, তখন তাহার গতি কতকটা হাঁসের মত বলিয়া মনে হইলেও একটু মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিলে কোনও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বর্ণবৈসাদৃশ্য ত আছেই; পানকৌড়ির পুচ্ছ অপেক্ষাকৃত লম্বা। তাহার পদদ্বয়ের অঙ্গুলীবিন্যাস হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, সে হাঁসের মত সন্তরণপটু; কিন্তু ইহার সন্তরণভঙ্গী অদ্ভুত ও বৈচিত্র্যময়। পক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া পানকৌড়ি সোজা জলের মধ্যে ডুব দেয়; তাহার পরে কতকটা যেন পুচ্ছের উপর ভর দিয়া পদদ্বয়ের সাহায্যে জলমগ্ন অবস্থায় দ্রুত সাঁতার দিতে থাকে। আবার যখন ভাসিয়া উঠে, তখন সশরীরে একেবারে জলের উপর হাঁসের মত ভাসিয়া উঠে না; আকণ্ঠ অথবা আবক্ষোনিমজ্জিত দেহে উর্দ্ধচঞ্চু হইয়া ভাসিয়া বেড়ায়। এই-ভাবে সঞ্চরণশীল গয়েরকে দেখিলে সহসা সর্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। তখন ইহার Snake-bird আখ্যার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। সন্তরণপটু পানকৌড়ি অল্প আয়াসেই মৎস্য শীকার করে, দল বাঁধিয়া কখনও কখনও স্বল্পতোয় জলাশয়ে ডুব দিয়া বহু মৎস্যকে এমন ভাবে আটক করিয়া ফেলে যে, তাহাদের এই Co-operative hunt বা সমবায় শীকার দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়া দেয়; পঙ্ক অথবা গর্ত্তমধ্যে লুকাইলেও মাছের নিস্তার নাই,—পানকৌড়ি তাহাকে বাহির করিবেই। এত বেশীক্ষণ এই পাখী জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকিতে পারে যে, তাহার ভক্ষ্য বস্তুকে কবলস্থ না করিয়া সে কিছুতেই সহজে জল হইতে উঠিবে না। আর তাহার সাঁতারের আর একটা বাহাদুরী এই যে, ঝটিকাক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষেও বড় বড় Cormorant স্বচ্ছন্দে ডুব দেয় ও ভাসিয়া বেড়ায়। জলমধ্যে সরোবরের অথবা খাল, বিল, নদীর তলদেশ প্রায় স্পর্শ করিয়া যখন সে সুদীর্ঘকাল ডুবসাঁতার কাটে, তখন জলের উপর বীচিভঙ্গ অথবা বুদ্‌বুদ্‌ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না, জলাশয়বক্ষ পূর্ব্বের মত শান্ত ও অচঞ্চল প্রতীয়মান হয়।

এমনই করিয়া পানকৌড়ি খাদ্যের চেষ্টায় মনের সাধে জল-কেলি করিয়া বৃক্ষশাখায় অথবা নিকটস্থ উচ্চ ভূখণ্ডে বা পর্ব্বত-গাত্রে উড়িয়া গিয়া বসে; ঈষৎ মুখব্যাদান করিয়া সে ধীরে সুস্থে গলাধিকৃত মৎস্য সম্পূর্ণরূপে গিলিবার উপক্রম করে। পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌ মিঃ লেগ্‌ দেখিয়াছেন যে, ভোরবেলায় পান-কৌড়ি জলে ডুবিয়া গলার থলিতে প্রচুর মৎস্য সংগ্রহ করিয়া প্রাতে ৭টার মধ্যেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাষাণের উপর উড়িয়া বসিয়া সেই মাছগুলিকে ভাল করিয়া খাইবার জন্য মুখব্যাদান করিতেছে। কেহ কেহ কিন্তু এই মুখব্যাদান ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া অনুমান করেন যে, অনেকক্ষণ জলমগ্ন থাকার দরুণ

পাখীটার নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায়, তাই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্ম সে জল হইতে উঠিয়া মুহুর্মুহুঃ হাঁ করিতে থাকে। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের চূড়ান্ত মীমাংসা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। গুরু-ভোজনের পর (পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রাতঃকালেই পানকৌড়ি পরিতোষ করিয়া পেট ভরিয়া খাইয়া লইবার চেষ্টা করে) সে বিশ্রাম করিতে বাধ্য। সাঁতার দিবার সময় তাহার মাথাটা ছিল উঁচু; এখন তাহা নিম্নদিকে সঙ্কুচিত। জলমধ্যে সন্তরণকালে তাহার পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত ও গুচ্ছবদ্ধ ছিল; এখন তাহা সম্প্রসারিত,—বোধ করি, সিক্ত ডানাগুলিকে রৌদ্রে ও বাতাসে এমন করিয়া শুকাইয়া লওয়াই নৈসর্গিক বিধি। জলমধ্যে সে এতক্ষণ ক্ষিপ্রগতিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছিল; এখন সে একপ্রকার স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হইয়া বসিয়া আছে। অপরাহ্নে আবার এই মৎস্যসংগ্রহ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি; এবং তাহার সান্ধ্য-ভোজনটা গুরুতর হইয়া যায়। তৎপরে দলবদ্ধ হইয়া নিবাস-বৃক্ষে তাহারা রাত্রিযাপন করে। এইখানে বলা আবশ্যক যে, কেবলমাত্র মৎস্যই পানকৌড়ির আহার্য্য নহে; চিংড়ি, কাঁকড়া, ভেক প্রভৃতিও বাদ যায় না। তবে মৎস্যই তাহার প্রধান খাদ্য।

কিন্তু পানকৌড়ির খাদ্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবার সময় তাহার যে হিংস্রস্বভাবের পরিচয়টুকু পাওয়া যায়, সেটুকু এই বিহঙ্গচরিত্রের অতি সামান্য অংশমাত্র। বাস্তবিক সে মহাকবি মিল্টনের মানসচক্ষুতে রুদ্রমূর্ত্তি সয়তানের প্রতিচ্ছবিরূপে কেন প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহা বলা দুষ্কর। সে যাহাই হউক, তাহার চরিত্রে যে কমনীয়তা আছে, তাহা স্ফুটতর হইয়া উঠে,—যখন পুংস্ত্রী পানকৌড়ির দাম্পত্য-লীলার সূচনা আরব্ধ হয়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী পানকৌড়িবিশেষের প্রেমাভিনয় দেখিয়া এক জন পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্ববিদ্ যে সুন্দর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি না। এরূপ চাক্ষুষ দর্শন আমাদের এখন পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি বলেন:—এমনই করিয়া পুরুষটা স্ত্রীপক্ষীর নিকটে প্রণয় নিবেদন করে;—যেখানে সে দাঁড়াইয়া থাকে, সেখান হইতে হয় ত সহসা সে এক লাফ দিয়া স্ত্রীপক্ষীর সম্মুখীন হয়; অথবা মন্থরগতিতে দু এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার কাছে ঘেঁসিয়া, তাহার লম্বা গলা ঋজুভাবে উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া অথবা ঈষৎ বক্রভাবে পশ্চাদ্‌ভাগে হেলাইয়া সে তাহার মাথাটা পশ্চাদ্দেশে এমনভাবে বিক্ষিপ্ত করে যে, ঐ মাথা ও গলা তাহার পৃষ্ঠদেশের উপরে ঋজু রেখার ন্যায় বিন্যস্ত থাকে। এই অবস্থায় সে ক্ষণে ক্ষণে মুখ হাঁ করিতে ও বন্ধ করিতে থাকে। পরক্ষণেই আবার সে যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া সম্মুখে ঢলিয়া পড়ে, তাহার বক্ষোদেশ পাষাণকে আলিঙ্গন করে; সেথায় অলসভাবে শয়ন করিয়া সে তাহার কঠিন পুচ্ছ পাখার ন্যায় ছড়াইয়া দিয়া নিজ পৃষ্ঠদেশের উপর অবনমিত করিয়া যেন আলস্য-মন্থরভাবে নিজ চঞ্চুপুট সাহায্যে পালকগুলিকে লইয়া খেলা করিতে থাকে। কিছুক্ষণ এইরূপ অবসাদ অথবা উচ্ছ্বাসের ভাব প্রকাশ করিয়া সে পুনরায় তাহার মাথাটা সম্মুখের দিকে ফিরাইয়া আনে; পরে পাঁচ সাত বার অগ্রপশ্চাৎ মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে। ঐ যে পাথরের উপর একেবারে শুইয়া পড়া, ঠিক স্ত্রীপক্ষীটির পুরোভাগে,—উহা দেখিয়া মনে হয়, যেন সে তাহার প্রণয়পাত্রীর পায়ে পড়িতেছে। স্ত্রীপক্ষীটি কিন্তু তখন হয় ত নিরপেক্ষভাবে উর্দ্ধনেত্রে আকাশের পানে তাকাইয়া আছে। পরে যখন পুংপক্ষীটি পূর্ব্ববর্ণিত বিচিত্র ভঙ্গীতে নিজ দেহ লীলায়িত করিতে থাকে, তখন হয় ত স্ত্রীপক্ষী তাহার পিছনে সরিয়া পড়ে,—পরে উহার দুর্দ্দশা দেখিয়া হয় ত ভদ্রতার খাতিরে একটু করুণা প্রকাশ করিয়া নিজ বক্রচঞ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা পুংপক্ষীর পালকগুলিকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকে। পুরুষটার সেই আলস্যমন্থর গতি ক্রমেই দ্রুততর নর্ত্তনে পরিণত হয়। এমনই করিয়া এই পক্ষিযুগলের দাম্পত্যলীলার প্রথম পর্ব্ব অভিনীত হয়।

এইবার তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনের পালা। কোথায় সে নীড় রচনা করিবে? কি দিয়াই বা করিবে? গিরিগাত্রে, বৃক্ষশাখায়, শরবনে অথবা কখনও কখনও শুধু ভূমির উপরে পানকৌড়ি তাহার বাসা রচনার ব্যবস্থা করে। সর্ব্বত্র যে একই প্রকার মালমসলার সাহায্যে নীড় রচিত হয়, তাহা নহে। পাথরের উপরে যে সকল জিনিষ আবশ্যক হয়, শরবনে হয় ত তাহার প্রয়োজন নাই; আবার গাছের উপরে বাসা করিবার জন্য কাকের মত পানকৌড়িও ঠোঁটের সাহায্যে কাটিকুটি ভাঙ্গিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করে (পানকৌড়িকে ত জলকাকও বলা হয়); স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়াই সাধারণতঃ বাসাটা তৈয়ার করে। অনেক সময়ে ঐ বাসা নূতন করিয়া তৈয়ার করিতে হয় না;—পূর্ব্বরচিত নীড়ই পরবৎসরে

পানকৌড়ির প্রেমালাপ।

উহারা বাসোপযোগী বলিয়া মনে করে এবং আবার সেথানে নূতন কিছু আয়োজন করিয়া গৃহস্থালী আরম্ভ করে। উপরি উপরি কয়েক বৎসর বাসাগুলা তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া, ক্রমশঃ উপকরণপ্রাচুর্য্যে সেগুলি কিছু বড় হইয়া যায়। বর্ষাঋতু স্ত্রী-পক্ষীর গর্ভাধানকাল। বাসাটা উহারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করে। অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ধাড়ি ও বাচ্ছাগুলা পুরীষাদি দূষিত পদার্থ সজোরে নীড়াভ্যন্তর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে। কাহারও কাহারও একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, পানকৌড়ি পূতিগন্ধময় পুরীষাদির সাহায্যে খড়কুটা, ঘাস প্রভৃতিকে সুকৌশলে জোড়া দিবার সুবিধা পায়। আমার 'পাখীর কথা' পুস্তকে পাখীর এইরূপ নিজ নীড় পরিষ্কৃত রাখার কথা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়াছি। পানকৌড়ি স্বভাবতঃ নিজের বাসাকে পরিষ্কার রাখে, যদিও তাহার গায়ে এমন দুর্গন্ধ যে, তাহা সহ্য করা কঠিন। কাছাকাছি অনেকগুলা পানকৌড়ি দল বাঁধিয়া গাছের উপরে বাসা নির্ম্মাণ করে বলিয়া সেই সব গাছতলায় একটা উৎকট দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

যথাকালে স্ত্রীপক্ষী ডিম্ব প্রসব করিলে দেখা যায় যে, মোটের উপর প্রায়ই ডিম্বসংখ্যা তিন, চার কিংবা পাঁচ। ডিমের উপরিভাগ খড়ির মত সাদা ও মোলায়েম। ডিম ফুটিয়া ছানা হইতে ঠিক চারি সপ্তাহ লাগে। পিতামাতা উভয়েই শাবককে আহার করায়;—কিন্তু সেই আহার করান'র বিশিষ্টতা এই যে, ধাড়ি পাখীটার মুখের ভিতরে বাচ্ছাগুলা আকণ্ঠ মাথা প্রবেশ করাইয়া গলনালী হইতে অর্দ্ধভুক্ত মৎস্যের অবশেষ টানিয়া খায়। এই ব্যাপারটা এত অদ্ভুত যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন ধাড়িটা ছানার মাথা গিলিতেছে। অন্যান্য পাখী আপন চঞ্চুর অগ্রভাগে খাদ্যসামগ্রী ধারণ করিয়া শাবকের মুখের ভিতর পৌছাইয়া দিলে তবে শাবক খাইতে পারে। পানকৌড়ির বেলায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। ছানাগুলা একটু বড় হইলে ধাড়িটা তাহাদের সম্মুখে ভুক্তাবশেষ বমন করিয়া ফেলে; শাবকরা তাহাই গলাধঃকরণ করে। ধাড়ি পাখী ছানাকে পিঠে করিয়া জলাশয়ের কাছে আনে এবং অল্পে অল্পে তাহাকে মাছ ধরিতে শিখায়।

পানকৌড়ি-পরিবারভুক্ত বিভিন্ন বিহঙ্গের অবয়বগত কিঞ্চিৎ প্রকারভেদ আছে। প্রধানতঃ ঋজুচঞ্চু ও বক্রাগ্রচঞ্চু এই দুই ভাগে উহাদিগকে বিভক্ত করা যায়। যাহারা ঋজুচঞ্চু, তাহাদের ঠোঁট সোজা ও তীক্ষ্ণাগ্র এবং ঠোঁটের অগ্রভাগের দুইপাশে ভিতরের দিকে করাতের মত দাঁত আছে। পূর্ব্বোক্ত "গয়ের" বা Snake bird এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই গয়েরের পতত্র এত সুন্দর যে, আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে কোন কোন জাতির শিরোদেশে ভূষণস্বরূপ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, ইহা বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র এই পাখীকে জলাশয়সমীপে দেখা যায়।

বক্রাগ্রচঞ্চু পাখীগুলার মধ্যে দুই শ্রেণীর পানকৌড়ি বাঙ্গালাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়;—তাহাদের মধ্যে যেটি আকারে বৃহত্তর, সেটিকে কদাচ দেখা যায়। ছোটটি সাধারণের কাছে পরিচিত। বড়টা সমুদ্রতীরে মাছ ধরিতে অভ্যস্ত হইলেও মাঝে মাঝে বড় বড় নদী-হ্রদ-সমীপেও বিচরণ করে। ছোটটা লবণাম্বু জলাশয় হইতে মৎস্য সংগ্রহ করিতে বিশেষ অভ্যস্ত নহে। আলিপুরের বাগানে ইহারা এবং ইহাদের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় "গয়ের" উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। বক্রচঞ্চুর ঠোঁটের ভিতর কিন্তু করাতের মত দাঁতকাটা ব্যবস্থা নাই।

পানকৌড়ি মানুষের পোষ মানে,—এ তত্ত্ব বোধ করি আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত নহে। চীনদেশে ধীবররা পানকৌড়ির সাহায্যে মাছ ধরে। পাখীটা যাহাতে মাছগুলা একেবারে গিলিয়া ফেলিতে না পারে, তজ্জন্য তাহার গলায় একটা রিং পরাইয়া দেওয়া হয়। কাহারও কাহারও মতে পানকৌড়ির পুরীষে guano প্রস্তুত হয়; কৃষিজীবী মানুষের কাছে তাহার মূল্য কম নহে। মৎস্যভুক্ বাঙ্গালীর দেশে পানকৌড়ির অপকারিতা খুব বেশী আমাদের চোখে পড়ে; কারণ, সময় নাই, অসময় নাই, সে ক্রমাগত মৎস্য সংহার করিয়া আসিতেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে মদ্‌গু পক্ষীর নাম পাওয়া যায় অমরকোষে ইহার কোনও বর্ণনা নাই, কেবল নামটি [illegible]ছে। টীকাকার "নামলিঙ্গানুশাসনে" ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন,- মজ্জতি মদ্‌গুঃ। জলকাকঃ। তিনি আরও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন—"মদ্‌গুঃ সলিলবায়সে।" "মদ্‌গুস্তু জলকাকঃ স্যাৎ" ইতি কেশবপদবৌ। সেন্টপিটার্সবার্গ অভিধানে উদ্ধৃত আছে—"নিমজ্জ্য যে মৎস্যান্ খাদন্তি তান্মদ্‌গুপ্রভৃতীন্।"

দেখা যাইতেছে যে, জলবায়স,জলকাক প্রভৃতি আখ্যা ব্যতীত অন্য কোনও বিশিষ্ট লক্ষণ পাওয়া গেল না। আর দেখা যাইতেছে যে, ইহারা জলমধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে। ইংরাজী Cormorant শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে Water Raven বা Sea Raven অর্থাৎ জলকাক বা সমুদ্রবায়স এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। মনিয়ার উইলিয়ামস্ মদ্গু অর্থে লিখিতেছেন—"a diver bird (a kind of aquatic bird or Cormorant)" বৈজয়ন্তী অভিধানের য়ুরোপীয় সম্পাদক অপার্টও এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু যাঁহারা পাখী লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা আজকাল সহসা কোনও পাখীকে কোনও বিশিষ্ট নামে অভিহিত করিতে কিছু সঙ্কোচ বোধ করেন, পাছে নামকরণে বৈজ্ঞানিক হিসাবে কোন ক্রটি দাঁড়াইয়া যায়। এই যে মদ্গুর ইংরাজী প্রতিশব্দ diver bird বা Cormorant বলা হইয়াছে, ইহাতে একটু গোল দাঁড়ায় এই যে, Cormorant বা পানকৌড়িকে পক্ষিতত্ত্ববিদ্ diver বলিয়া পরিচিত করিবেন না, যদিও সে জলে খুব ডুবিতে পারে। কারণ, Diver বলিতে একটা বৃহত্তর পক্ষি-পরিবার (Colymbidæ) বুঝায়; এই পরিবারভুক্ত প্রায় কোনও পাখীকেই ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না,—কেবল ইহাদের জ্ঞাতিসম্পর্কীয় "ডুবুরি" বা Grebes (Podicipelidæ) আমাদের নিকটে পরিচিত। সুতরাং পানকৌড়িকে সনাক্ত করিতে হইলে ইংরাজের কাছে diver বলিয়া পরিচয় দিলে চলিবে না। মদ্গু ও Cormorantএর স্বভাবগত ঐক্য লক্ষ্য করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, উহারা ভিন্ন নহে। আবার মদ্গুর আভিধানিক সংজ্ঞা জলকাক; Cormorant শব্দও যে বিশ্লেষণ করিলে জলকাক বুঝায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এবং এই Cormorant পক্ষীই আমাদের পানকৌড়ি।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

তূর্য্য-নিনাদ।

আজ ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরুলাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার,
আর্ত্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব—কে করে মুস্কিল আসান তার?

মন্দির আজি বন্দীর ঘানি,
নিজ্জিত ভীত সত্য, বদ্ধ, রুদ্ধ স্বাধীন বাণী,
সন্ধি-মহলে সন্দীর ফাঁদ গভীর আন্ধি-অন্ধকার,—
হাঁকিছে নকীব—হে মহারুদ্র, চূর্ণ কর এ ভণ্ডাগার!

রক্ত-মদের বিষ পান করি'
আর্ত্তি মানব; স্রষ্টা কাতর, সৃষ্টির তাঁর নির্ব্বাণ স্মরি'!
ক্রন্দন ঘন বিশ্বে স্বনিছে প্রলয়-ঘটার হুহুঙ্কার,—
হাঁকিছে নকীব—অভয় দেবতা, এ মহা-পাথার করহ পার!

কোলাহল-ঘাঁটা হলাহলরাশি
কে নীলকণ্ঠ গ্রাসিবে রে আজ দেবতার মাঝে দেবতা সে আসি!
উরিবে কখন্ ইন্দিরা, ক্রোড়ে শান্তির ঝারি সুধার ভাঁড়?
হাঁকিছে নকীব—আন ব্যথা-ক্লেশ-মন্থন-ধন অমৃত-ধার!

কণ্ঠ ক্লিষ্ট ক্রন্দন-ঘাতে,
অমৃত-অধিপ নর-নারায়ণ দারুময় ঘন মনো-বেদনাতে।
দশ-ভুজে, গলে শৃঙ্খল-ভার দশপ্রহরণ ধারিণী মা'র,—
হাঁকিছে নকীব—'এস জ্যোতির্ম্ময়ী,হও আবির্ভূতা যুগাবতার!'

মৃত্যু-আহত মৃত্যুঞ্জয়,
কে শোনাবে তাঁরে চেতন মন্ত্র? কে গাহিবে জয় জীবনের জয়?
নয়নের নীরে কে ডুবাবে বল বল দর্পীর অহঙ্কার?—
হাঁকিছে নকীব—সে দিন বিশ্বে খুলিবে আরেক তোরণ-দ্বার!

কাজী নজরুল ইস্লাম।

জাপানে ধানের ফশল।

জাপান খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বর্দ্ধিত করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে। সংপ্রতি তথায় ফরমোশা সরকার ধান্যের ফশল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ডুবো ও শুকো—দুই জমীতে মিলিয়া এখন ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ৫ শত ৬৭ একর জমীতে মোট ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ২৫ হাজার ১ শত ৮৬ বুশেল ধান্য উৎপন্ন হয়। এখন যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৫ কোটি ১৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ১ শত ৭৪ বুশেল ধান্য উৎপন্ন হইবে। সেচের ব্যবস্থা করিয়া ও জমীর উন্নতিসাধন করিয়া জমীর ও ফশলের পরিমাণ বাড়ান হইবে। তদ্ভিন্ন বাঁধ দিয়া ও জঙ্গল সাফ করিয়াও চাষের জমীর পরিমাণ বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে জমীতে ফশলের ফলনও শতকরা ২০ হিসাবে বাড়িবে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ফরমোশার জনসংখ্যা বাড়িয়া যাহাতে দাঁড়াইবে, তাহাতে ফশলের বর্দ্ধিত ফলনে দেশের লোকের আহার যোগাইয়া বৎসরে উদ্বর্ত্ত ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৩ শত ৮২ বুশেল ধান্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া অর্থলাভ করা সম্ভব হইবে। জাপান স্বাধীন দেশ; তথায় খাদ্য শস্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দেশের পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিয়া আবার বিদেশে ধান বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছে। আর এ দেশে? কবি গাহিয়াছেন:—

"চিরকল্যাণময়ী, তুমি ধন্য;
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

কিন্তু এখন যে অবস্থা, তাহাতে আমরা আপনারা না খাইয়া বিদেশে অন্ন দিয়া অর্থার্জ্জন করি। বাঙ্গালায় যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহা বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। অথচ তাহারই কতকাংশ বিদেশে না পাঠাইলে আমরা সংসার চালাইতে পারি না—ধানের বদলে পাটের চাষ করিতে বাধ্য হই। আর এ দেশে ফশলের ফলন পরিমাণ বাড়াইবার জন্য যে আবশ্যক চেষ্টা হইতেছে, এমন কথাও বলা যায় না। অথচ এ দেশে কৃষি-বিভাগও আছে—কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মিনিষ্টারও আছেন।

—

ইংলণ্ডে শবদাহ প্রথার বিস্তার।

ভারতবর্ষের প্রভাবেই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক, ইংলণ্ডে শবদাহ প্রথা ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতেছে। পূর্ব্বে লণ্ডনের ওকিং নামক স্থানেই একটি শবদাহের ক্ষেত্র ছিল, এক্ষণে গোল্ডার্সগ্রীণ ও নরউডে আরও দুইটি দাহক্ষেত্র হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ম্যাঞ্চেষ্টার, গ্লাসগো, লিভারপুল, হাল, লীডস, ব্রাডফোর্ড ও সেফিল্ড প্রভৃতি নগরে আরও ১১টি দাহস্থান আছে। সর্ব্বসমেত ১৪টি দাহস্থানে গত বৎসর ১ হাজার ৯ শত ২২টি মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব-বৎসরে ১ হাজার ৭ শত ৯৬টি দেহ দাহ হইয়াছিল। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, শবদাহের উপকারিতা ইংলণ্ডবাসী ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। লণ্ডনে দাহের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিয়া মনে হয়, শিক্ষিত সম্প্রদায় এই প্রথার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। লণ্ডনের ৩টি শবদাহস্থানে গত বৎসরে ১ হাজার ২ শত ২৪টি শবদাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; গোল্ডার্সগ্রীণে ৫ শত ৯৩টি, ওকিংএ ১ শত ৫৯টি এবং নরউডে ১ শত ৬২টি। ইহার পরই ম্যাঞ্চেষ্টারের স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। তথায় ২ শত ২৮টি শবদাহ ক্রিয়া হইয়াছিল। অন্যান্য নগরে নিম্নতন সংখ্যা ২৪টি ও উর্দ্ধতন সংখ্যা ৮৭টির অধিক নাই। কিন্তু প্রতি বৎসর দাহের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে কালে মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া ভূমির অপব্যবহারে ইংলণ্ডবাসী বিরত হইতে পারেন, এরূপ আশা দুরাশা নহে।

রেলের কথা।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে রেলের বার্ষিক বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়—

রেলে কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবীর সংখ্যা।

আমেরিকায়	২০৭২৯৭১
জার্ম্মাণীতে	৮২০৪৬১
রুসিয়ায়	৭৭১৯৩৩
বিলাতে	৭৬৩৩৫৯
ভারতবর্ষে	৭৫১৭৫২
ফ্রান্সে	৪৫৯৩০৮
কানাডায়	১৮৪৯৩৪
ইটালীতে	১৫৪৮৫৬

এঞ্জিনের সংখ্যা।

আমেরিকায়	৬৮৫৯২
জার্ম্মাণীতে	৩৫০২৫
বিলাতে	২৪১৬২
রুসিয়ায়	১৯৯৬৪
ফ্রান্সে	১৪৩৪৪
ভারতবর্ষে	৯৫
কানাডায়	৫৭৫৬
ইটালীতে	৫২২০

যাত্রীর সংখ্যা।

জার্ম্মাণীতে	১৭৯৭১৮৮০০০
বিলাতে	১৫৬৬৮৩৪০০০
আমেরিকায়	১২৫৩৩৯৬০০০
ভারতবর্ষে	৫৫৯২৪৬১০০০
ফ্রান্সে	৫৪১৩৪২০০০
রুসিয়ায়	১৯৫০১৭০০০
ইটালীতে	৮২৪০২০০০
কানাডায়	৫১৩০৬০০০

যাত্রী-গাড়ী।

জার্ম্মাণীতে	৮৬৮৭৩
আমেরিকায়	৫৬২৯০
বিলাতে	৫৪৮৫৩
ফ্রান্সে	৩১৬২৪
ভারতবর্ষে	২৪৯৫১
রুসিয়ায়	২০০৪৩
ইটালীতে	১০০২৪
কানাডায়	৬৩৭৬

মাল-গাড়ী।

আমেরিকায়	২৪৫৬৬০৭
বিলাতে	৭৮১৫১৮
জার্ম্মাণীতে	৬৯২০৫৩
রুসিয়ায়	৪৫০২৭৩
ফ্রান্সে	৩৭০৮০৬
কানাডায়	২০৯২৪৩
ভারতবর্ষে	২০১১৯৪
ইটালীতে	১০৩১১৭

—

বাঙ্গালার বন।

বাঙ্গালায় সরকারের সংরক্ষিত সর্ব্ববিধ বনের পরিমাণ ১০ হাজার ৬ শত ৯৮ বর্গ-মাইল। এই বন হইতে কাঠ, জালানী কাঠ, বাঁশ, বেত, হাতী প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া এক-বৎসরে সরকারের ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৩ শত ২১ টাকা আয় হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদিগের বিশ্বাস, উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইলে এই আয় অনেক বাড়িতে পারে। বর্ত্তমানে এই সব সংরক্ষিত বনে গোচরের নিয়ম কঠোর বলিয়া কেহ কেহ সে সকলের পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দেন। বিশেষ, অনাবৃষ্টির সময় যাহাতে সে সব বনে স্থানীয় লোকে গো-মহিষাদি চরাইবার অনুমতি পায়, তাহা করা কর্ত্তব্য—এমন মত অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন।

—

আত্মহত্যার বয়স।

কোন্ বয়সে লোক আত্ম-হত্যা করে, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য লণ্ডনে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বিবরণে প্রকাশ যে, ঐ বৎসরে লণ্ডন সহরে ৪ শত ৯৯ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কোন্ বয়সের লোকের মধ্যে কি পরিমাণ আত্মহত্যা দেখা গিয়াছে, একটি তালিকায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে :—

১০	হইতে	১৫ বৎসর বয়সে	১ জন
১৫	„	২০ „ „	৭ „
২০	„	২৫ „ „	১৯ „
২৫	„	৩৫ „ „	৬১ „
৩৫	„	৪৫ „ „	১০৮ „
৪৫	হইতে	৫৫ বৎসর বয়সে	১৪৬ জন
৫৫	„	৬৫ „ „	৯১ „
৬৫ বৎসরের উপর			৭৬ „

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মধ্যবর্ত্তী বয়সেই মানুষ আশায় নিরাশ হইয়া এরূপ মর্ম্মান্তিক ক্লেশ ভোগ করে যে, আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করে। কিন্তু এ তত্ত্ব সকল দেশ ও সকল সমাজ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। উল্লিখিত তালিকায় স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে কাহারা আত্মহত্যা অধিক করে, তাহার কোন হিসাব প্রদত্ত হয় নাই। লণ্ডনের লোকসংখ্যার তুলনায় প্রতি ৯ হাজার জনে ১ জন মাত্র আত্মহত্যা করিয়াছে। লণ্ডনের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ।

রাস্তায় জল দিবার মোটর-যান।
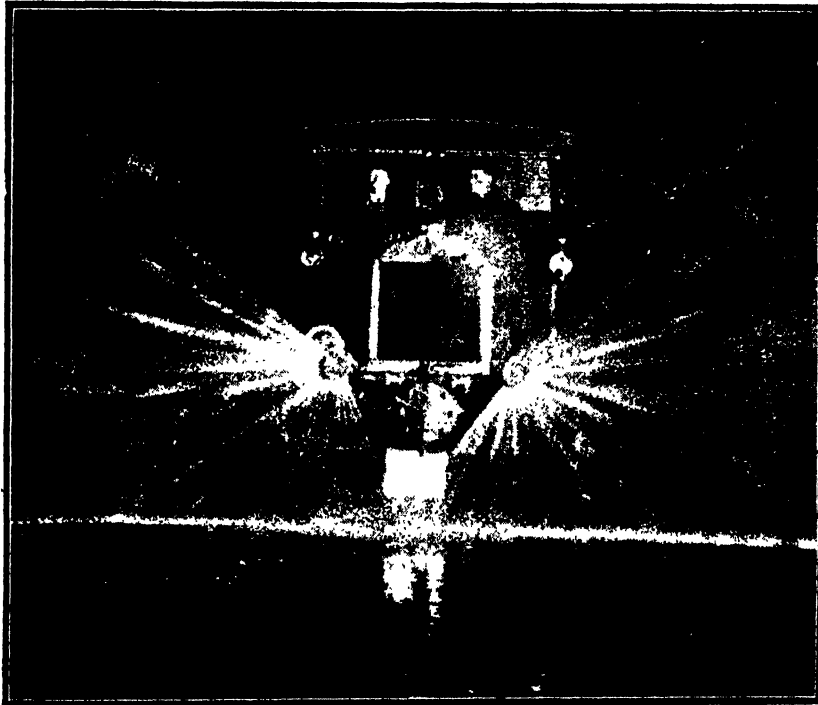
লণ্ডনের রাস্তায় জল দিবার জন্য এই মোটর-গাড়ী ব্যবহৃত হইতেছে।

এই গাড়ীর বেগ যত বর্দ্ধিত হয়, নিক্ষিপ্ত জলের বেগও তত বর্দ্ধিত হয়। জলের পরিমাণ ও বেগ কম করিতে হইলে মোটর ধীরে চালাইতে হয়।

অদৃষ্ট-পরীক্ষা

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চোগা-চাপকান পরিয়া, শামলা মাথায় দিয়া, নব্য উকীল শ্রীযুত হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ হাতে করিয়া হুগলি ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে পৌছিতেই এক্সপ্রেস ট্রেণখানি আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি কামরায় দুই জন ইংরাজ বসিয়া আছে, অন্যটি খালি; সুতরাং সেই খালি কামরাটিতেই তিনি উঠিয়া পড়িলেন। জানালাগুলি খুলিয়া, রুমাল দিয়া চামড়ার গদির ধূলা ঝাড়িয়া মনোমত স্থানটিতে বসিতেই ঘণ্টা হইল, গার্ডের সবুজ নিশান উড়িল, এঞ্জিনের বাঁশী বাজিল, ট্রেণখানি চলিতে আরম্ভ করিল। হেমন্ত বাবু তখন পায়ের জুতা খুলিয়া, ছিদ্রবহুল মোজা সংযুক্ত চরণ দু'খানি বেঞ্চির উপর ছড়াইয়া দিয়া, আরাম করিয়া বসিয়া, মক্কেলের উপহার কাঁচি সিগারেটের আধখালি একটি প্যাকেট বাহির করিয়া, সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

হেমন্ত বাবু বর্দ্ধমানে ওকালতী করিয়া থাকেন। আজ তিন বৎসর কাল আদালতে যাতায়াত করিতেছেন, কিন্তু উপার্জ্জন আশানুরূপ হইতেছে না। অথচ গৃহে স্ত্রী, দুইটি কন্যা, একটি বিধবা ভগিনী এবং বৃদ্ধা মাতা। বাড়ীখানি পৈতৃক, ভাড়া দিতে হয় না, তিন মাস অন্তর মিউনিসিপ্যাল টেক্স দিয়াই খালাস, ঐ যা একটু সুবিধা। কিন্তু কঠোর মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়াও, মাসে একশোটি টাকার কমে সংসারটি কিছুতেই চলে না। অথচ সব মাসে এই একশত টাকাও উপার্জ্জন হয় না—মাঝে মাঝে পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়। পরিবারস্থ কাহারও পীড়াদি হইলে, অথবা অন্য কোনওরূপ অভাবিতপূর্ব্ব দায় উপস্থিত হইলেও, পুঁজিতে হাত পড়ে। এই প্রণালীতে সেই পুঁজিও ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়াছে। হুগলিতে একটি মোকর্দ্দমা পাইয়া, আজ এখানে আসিয়াছিলেন; একদমে পঁচিশটি টাকা ফী পাইয়া মনটি আজ বেশ প্রফুল্ল। দশদিন পরে আবার তারিখ পড়িয়াছে, আবার আসিতে হইবে। মোকর্দ্দমাটি এখন কিছুদিন চলিলেই মঙ্গল।

ট্রেণ, ছোট ছোট ষ্টেশনকে গ্রাহ্য না করিয়া নিজ আভিজাত্য-গর্ব্বে ছুটিয়া চলিয়াছে। হেমন্ত বাবুর সিগারেট শেষ হইল, গোটা-দুই ছোট ষ্টেশনও পার হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া গোসল-কামরায় প্রবেশ করিলেন। হাতে মুখে জল দিয়া রুমালে মুখ মুছিতেছেন, এমন সময় উপরে জালতি-র‍্যাকের দিকে তাঁহার নজর পড়িল। দেখিলেন, ময়লা মোটা কাপড়ে দপ্তরের আকারে বাঁধা একটি পুলিন্দা। "কাহারও মোকর্দ্দমার কাগজ-পত্র নাকি?"—মনে এই ভাবিয়া পুলিন্দাটি তিনি নামাইলেন। গোসল-কামরা হইতে বাহির হইয়া, স্বস্থানে আসিয়া বসিয়া সেটি উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে লাগিলেন। পুলিন্দাটি খুলিবেন, অথবা ষ্টেশনে নামিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিবেন, ইহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে হইল, ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দেওয়ায় একটা বিপদ্ আছে। নিজ নাম-ধাম লিখাইয়া দিতে হইবে। পরে, যাহার পুলিন্দা, সে যদি বলে, উহার মধ্যে আমার এত টাকা ছিল, অথবা অমুক দ্রব্য ছিল, তাহা নাই, তখন? কি করিয়া আমি প্রমাণ করিব যে, উহা আমি আত্মসাৎ করি নাই? কামরায় এমন একটা সহযাত্রীও নাই যে, আমার সাধুতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। অবশ্য, প্রমাণ-ভার বাদীর উপরেই, আদালতে না হয় আমি মোকর্দ্দমা জিতিয়াই আসিলাম, কিন্তু বদ্‌নামটা ত হইবে! সুতরাং কি করা যায়? এ আপদ যেখানে ছিল, সেইখানেই রাখিয়া দিব কি? কিন্তু তাহাতে ফল কি হইবে? ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, গাড়ী সাইডিং-এ গেলে মেথর ঝাড়ু দিতে আসিয়া উহা পাইবে এবং ভিতরে কি আছে, দেখিবার জন্য গোপনে উহা বাড়ী লইয়া যাইবে। টাকা-কড়ি যদি কিছু থাকে, তবে তাহা অপহরণ করিবে; কাগজ-পত্র যাহা আছে, যথার্থ অধিকারীর পক্ষে সেগুলি যতই দরকারী হউক, ছিঁড়িয়া নষ্ট করিবে অথবা পোড়াইয়া ফেলিবে। আহা, যে বেচারী ইহা ফেলিয়া গিয়াছে, তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি যদি ইহা খুলি, তবে খুব সম্ভব প্রকৃত অধিকারীর নামধামের সন্ধান পাইব—তাহার জিনিষ,

তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিব। সুতরাং খুলিয়া দেখাই উচিত।

পকেট হইতে আর একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া, হেমন্ত বাবু দপ্তরের দড়ি খুলিতে লাগিলেন। বস্ত্রাবরণ উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল, আদালতের নীলাম ইস্তাহারী বৃহৎ মোটা ফরমে পুলিন্দাটি জড়ানো এবং দড়ি দিয়া বাঁধা। তাহা খুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন নোট—কেবল নোট—সমস্তই নোট—অন্য কাগজ-পত্র কিছুই নাই! নোটগুলি থাকবন্দি করিয়া সাজানো, এইরূপ দশটি থাক—প্রত্যেক খানি নোট ১০০৲ টাকার করিয়া;—দেখিয়া হেমন্ত বাবুর মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। ভয় হইল, এখনই বোধ হয় অজ্ঞান হইয়া পড়িবেন। নোটগুলি সেই অবস্থায় বেঞ্চির উপর ফেলিয়া হেমন্ত বাবু টলিতে টলিতে গোসল-কামরায় প্রবেশ করিলেন এবং জলের কল খুলিয়া পাগলের মত মাথায় জল দিতে লাগিলেন। গলার কলার ভিজিল, চাপকানের বুক ভিজিল, কিছু জল কামিজের ফাঁকে প্রবেশ লাভ করিয়া পৃষ্ঠে গিয়া পৌঁছিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ জলসেকের পর, কল বন্ধ করিয়া হেমন্ত বাবু রুমালে মাথা মুখ মুছিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র রুমাল, ভিজিয়া যায়, জল গালিয়া ফেলিয়া আবার হেমন্ত মাথা মুছেন। আয়নার নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলেন, চক্ষু দুইটি লাল টক্ টক্ করিতেছে, চুলের টেরি বিলুপ্ত হইয়া মাথাটি অসভ্য বন্য-জাতির অনুরূপ হইয়াছে। অঙ্গুলি-সাহায্যে চুলগুলি যথাসম্ভব ঠিক করিয়া লইয়া, হেমন্ত স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। নোটের একটি থাক গণনা করিয়া দেখিলেন, একশত খানি আছে—দশ হাজার টাকা। অন্য থাকগুলিও সেইরূপ মোটা দশটি থাক—লক্ষ টাকা।

নোটগুলি সেই নীলাম ইস্তাহারী কাগজে জড়াইয়া হেমন্ত নিজ ব্যাগের মধ্যে ভরিলেন। ময়লা মোটা কাপড়খানা জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

ট্রেণ যথাসময়ে বর্দ্ধমানে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমন্ত নামিয়া, ঠিকা-গাড়ী ভাড়া করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ প্রায় একমাসকাল পরে হেমন্ত বাবু শয্যাত্যাগ করিলেন—পথ্য পাইলেন। হুগলি হইতে ফিরিয়া, বাড়ী পৌঁছিয়া সেই রাত্রেই তাঁহার জ্বর হইয়াছিল; প্রবল জ্বরে তিনি দিন কয়েক অচেতন অবস্থায় ছিলেন। দিন পনেরো ষোল, অবস্থা খুব খারাপই গিয়াছিল; যমে মানুষে টানাটানি পড়িয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। তাহার পর হইতে একটু সুরাহা হয়। বর্দ্ধমানের সমস্ত বড় বড় ডাক্তার—মায় সিভিল সার্জ্জন "সাহেব" পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে—তা যাউক, প্রাণটা যে বাঁচিয়াছে, ইহাই পরম ভাগ্য বলিতে হইবে।

শিঙ্গী মাছের ঝোল সহ, পুরাতন চাউলের চারিটি ভাত খাইয়া হেমন্ত বিছানায় উঠিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া পাণ চিবাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার মা আসিয়া বলিলেন, "বাবা, এতদিন তোমায় বলিনি, এই অসুখে, আমার হাতে পুঁজি-পাটা যা ছিল, তা সমস্তই প্রায় খরচ হয়ে গেছে। এখন দিন চল্‌বে কি ক'রে, আমি সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে পড়েছি। কি যে হবে, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে!"—বলিয়া তিনি মুখখানি গম্ভীর করিয়া রহিলেন।

"গায়ে একটু বল পেলেই, আদালতে বেরুই আবার!"—বলিয়া হেমন্ত ঘরের কোণে আলমারিটির পানে চাহিল। সেদিন সে বাড়ী আসিয়াই ব্যাগটি আলমারির মধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছিল। কয়েক দিন পরে একটু জ্ঞান হইলেই, স্ত্রীর দ্বারা আলমারি খোলাইয়া, ব্যাগটি বাহির করাইয়াছিল; এবং স্ত্রী কার্য্যান্তরে গেলে, ব্যাগটি খুলিয়া দেখিয়াছিল, পুলিন্দাটি যেমন ছিল, তেমনই আছে। এ কয় দিন শুইয়া শুইয়া সে ভাবিয়াছে, যাহার টাকা, সে নিশ্চয়ই দুই এক দিন পরে সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে—সে বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাইলে, পুরস্কারের টাকাটা পাইবার উপায় হয়। কিন্তু বাড়ীতে খবরের কাগজ নাই—পাড়ার বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে, এত দিনের পুরাতন কাগজ এখন খুঁজিয়া পাওয়াও দায়—উকীল-লাইব্রেরীতে বড় বড় তিনখানি ইংরাজী দৈনিকের ফাইল আছে; যথাসম্ভব শীঘ্র লাইব্রেরীতে গিয়া সেগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার প্রলোভনও তাহার মনের মধ্যে বিষম

উৎপাত করিয়াছে—১০০৲ টাকার নোটের নম্বর আজকাল আর রাখা হয় না, ধরা পড়িবার তেমন আশঙ্কাও নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত হেমন্ত সে প্রলোভনকে দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ভাবিয়াছে, ছি ছি, ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া, এত লেখা-পড়া শিখিয়া, শেষে কি চোর হইব! তবে পুরস্কারের টাকাটা লইতে হইবে বৈ কি! সেই বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের টাকাটা কি পরিমাণ হইতে পারে, ইহাই শুইয়া শুইয়া এ কয় দিন সে চিন্তা করিয়াছে। যদি কোনও বিজ্ঞাপন না-ই বাহির হইয়া থাকে, তবে টাকা সম্বন্ধে কি করা উচিত—পুলিন্দা কুড়াইয়া পাওয়া সম্বন্ধে কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য হইবে কি না, ইহাও সে মনে মনে আলোচনা করিয়াছে; কিন্তু মস্তিষ্ক এখনও দুর্ব্বল, কোনও সিদ্ধান্তে সে উপনীত হইতে পারে নাই।

অন্ন পথ্য পাইবার চারি দিন পরে আদালতে যাইবার জন্য হেমন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইহা শুনিয়া জননী আসিয়া নিষেধ করিলেন—বলিলেন, "এখন এই দুর্ব্বল শরীর, হয় ত মাথা ঘুরে প'ড়ে যাবে—না-ই বা কাছারী গেলে বাবা! আরও ২।৪ দিন যাক্, শরীরে একটু বল পাও, তার পর বেরিও।"—স্ত্রী কমলিনী আসিয়া অনেক মিনতি করিলেন। হেমন্ত অনেক করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া, অভয় দিয়া, কাছারী যাত্রা করিল।

উকীল-লাইব্রেরীতে পৌঁছিলে, তাহার বন্ধু-বান্ধব তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া, আরোগ্যলাভের জন্য তাহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু ফাঁক পাইয়া, হেমন্ত লাইব্রেরী-ঘরে গিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া খবরের কাগজ-গুলির ফাইলের নিকট বসিল। যে তারিখে সে হুগলি হইতে ফিরিয়াছিল, সেই তারিখ হইতে ৮।১০ দিনের কাগজের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভগুলি তন্ন তন্ন করিয়া একঘণ্টাকাল খুঁজিল—কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও বিজ্ঞাপন সে দেখিতে পাইল না। এই পরিশ্রমে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মুখে কানে জল দিয়া, এক গেলাস জল পান করিয়া, গাড়ী ডাকাইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত নির্জ্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া রহিল।

হেমন্তর স্ত্রী আসিয়া, কাছে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে লাগিল, মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল,—এইরূপ ঘণ্টাখানেক শুশ্রূষার পর, সে কতকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

কয়েক দিন পরে পুনরায় কাছারী গিয়া পুলিস গেজেটের ফাইল, কলিকাতা গেজেটের ফাইল অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোনও সন্ধান মিলিল না। টাকা হারানোর কোনওরূপ বিজ্ঞাপন কেহ দেয় নাই।

মাসখানেক পরে হেমন্ত কলিকাতায় চলিয়া গেল; ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ঘুরিল, কারেন্সি আপিস, রয়াল এক্সচেঞ্জের নোটিস বোর্ডগুলি খুঁজিল, কিন্তু কোথাও কোনওরূপ সূত্র পাইল না।

অবশেষে, নিজের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া, একখানি প্রধান ইংরাজী সংবাদ-পত্রে এই মর্ম্মে সে বিজ্ঞাপন দিল—রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে একটি পুলিন্দা কুড়াইয়া পাইয়াছি। হারাইবার তারিখ, স্থান, পুলিন্দায় কি ছিল ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা সহ আবেদন করুন। বক্স নং অমুক, কেয়ার অব্ অমুক সংবাদ-পত্র, বিজ্ঞাপন দিয়া বৰ্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিল।

উপর্য্যুপরি ছয় দিন ধরিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল, কিন্তু সেই সংবাদ-পত্রের আফিস হইতে একখানি পত্রও হেমন্তের নিকট আসিল না।

তখন সে এ বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া, একদিন তাহার জননীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা জানাইয়া, টাকাটা এখন কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।

মা সমস্ত শুনিয়া, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, "অতগুলি টাকার লোভ, তুমি যে, বাবা, সংবরণ করতে পেরেছ, তাতে আমি বড় খুসী হয়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলের উপযুক্ত কাযই তুমি করেছ। এত করেও যখন টাকার মালিকের সন্ধান পেলে না, তখন একটা কায কর। টাকাগুলি কলকাতার কোনও ভাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে এস। ব্যাঙ্ক থেকে ঐ টাকার সুদ যা পাওয়া যাবে, তা তুমি স্বচ্ছন্দে নিজে ভোগ করতে পার, তাতে কোনও দোষ নেই—আমি তোমায় আজ্ঞা দিচ্ছি। যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন টাকার যথার্থ মালিক এসে উপস্থিত হয়, তখন ঐ আসল—ঐ সমস্ত টাকাটা তাকে তুমি ফিরিয়ে দিও।"

হেমন্ত, জননীর আদেশ অনুসারেই কার্য্য করিল। কয়েক দিন পরে কলিকাতায় গিয়া, একটি ভাল ব্যাঙ্কে টাকাটা গচ্ছিত রাখিয়া আসিল।

ছয় মাস অন্তর ২৫০০৲ টাকা সুদ আসিতে লাগিল। সেই টাকায় এবং নিজের উপার্জ্জনে হেমন্ত স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। ক্রমে ওকালতীতে হেমন্তের পশার জমিল; আরও কয়েকটি নাতি-নাতিনীর মুখ দেখিয়া তাহার জননী গঙ্গালাভ করিলেন; বড় মেয়েগুলির বিবাহ হইল, বড় ছেলেরা পাশ করিয়া কলেজে প্রবেশ করিল; হেমন্তের দেহখানি স্থূল হইল, মস্তকের অগ্রভাগে টাক পড়িল; পৈতৃক বাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া সে নূতন ইমারৎ প্রস্তুত করিল;—এইরূপে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাটিয়া গেল; কিন্তু ব্যাঙ্কে জমা সেই লক্ষ টাকার দাবীদার কেহ উপস্থিত হইল না! কিংবা তাহাকে আবিষ্কার করিবার কোনও সূত্রও হেমন্ত পাইল না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারত সরকারের বাজেট।
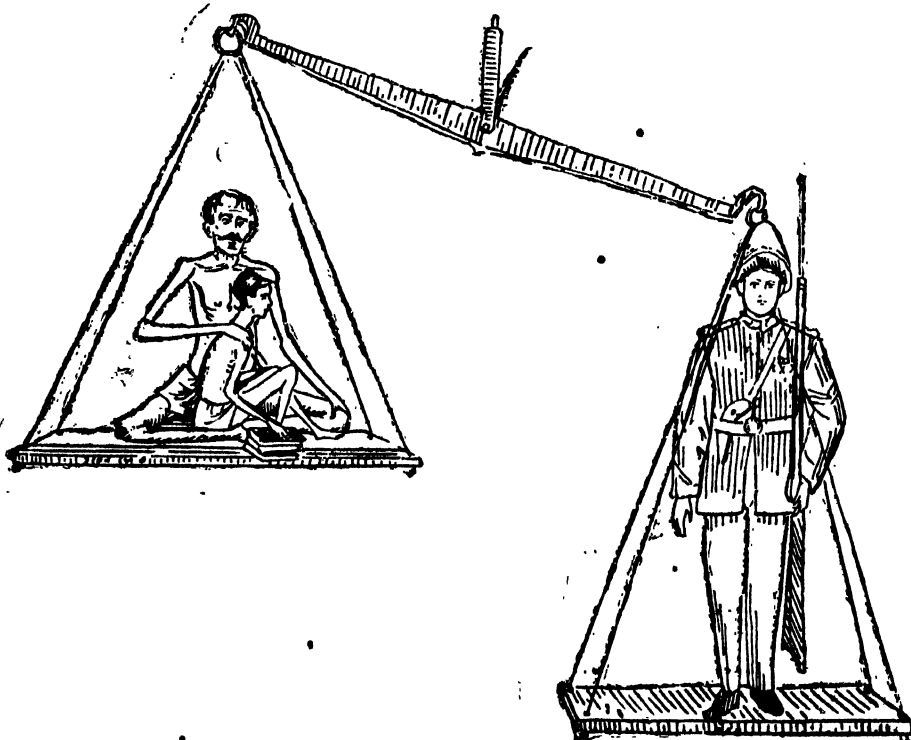
সামরিক বিভাগের বজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

ভারতের আয়-ব্যয়।

ভারত সরকারের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের যে হিসাব এবার পেশ হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়—আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় ৩১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা অধিক! ভারত সরকার বাজেটে যে হিসাব দেন, তাহার বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ২ বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া নিম্নে দেখান গেল :—

আয়	১৯২০—২১ খৃষ্টাব্দ	গত বৎসরের বাজেট	এবার বাজেট
কাষ্টমস … …	৩০,৯৭,৬৭,৪৬৯	৩৭,৭৩,২৮,০০০	৫১,৩২,৮৪,০০০
আয়কর … …	২০,৯১,৭৪,৪৩২	১৮,৫৮,০৭,০০০	২২,১১,৯৯,০০০
লবণের শুল্ক … …	৬,১৮,৭৯,৮১৩	৭,০০,৬৬,০০০	১১,৩৬,০৩,০০০
অহিফেন … …	৪,৫৩,৪০,৬১১	৩,৭২,৮৫,০০০	৩,০৯,৩০,০০০
বিবিধ … …	২,২৫,২৬,১১৯	২,৪৪,৮০,০০০	২,৩৫,৮৫,০০০
রেলের আয় … …	২৫,০১,৬১,১৬৪	২৭,২৫,৬৩,০০০	৩০,৮৫,৯৪,০০০
জলসেচের আয় … …	২,৯১,৫৮২	৪,২৪,০০০	৭,২২,০০০
ডাক ও তার বিভাগের আয় … …	১,৫২,৩,৯,৬২৭	২,০৮,৭৪,০০০	১,৬৫,২৮,০০০
সুদ … … … …	৩,৬৯,১৬,০৬৫	৩,৪৯,০৯,০০০	৮৪,৩১,০০০
শাসন-বিভাগের আয় … …	৭৩,১৯,৩৩৬	৭৬,৩৫,০০০	৮৬,৪৯,০০০
কারেন্সী, টাঁকশাল ও বাট্টা … …	২,৮৮,২২,৫৪৮	১৯,৭৩,০০০	২১,৭৫,০০০
সিভিল ওয়ার্কস … … …	১১,৩৩,২৫৮	১০,৩৮,০০০	১০,৯২,০০০
নানা বাব … … …	২,৬০,২৩,৯০১	৭,৫২,৭৬,০০০	৬৬,১১,০০০
সামরিক বিভাগের আয় … …	৬,৪৭,৮৬,৯৩৬	৪,১১,১০,০০০	৫,৮৪,৩৬,০০০
অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রাপ্য … …	৯,৮৩,০০,০০০	১২,৯৩,৭৫,০০০	৯,২০,৬৫,০০০
ঘাটতী … …	৩২,৩৩,১৩,২২০	… … …	২,৭১,৫৬,০০০
মোট …	৪,৯৪,৬৯,৯৬,৪৮১	১,২৮,৩১,৪৩,০০০	১,৪২,৩০,০০,০০০

এই মোট আয় করিবার জন্য ভারত সরকারকে রাজস্ব-বৃদ্ধির নূতন উপায় সন্ধান করিতে হইয়াছিল। এই সকল উপায় প্রধানতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

রেলে যাত্রীর ভাড়া বৃদ্ধি	৬ কোটি টাকা
ডাকমাশুল বৃদ্ধি	১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
শুল্কবৃদ্ধি	১৪ কোটি টাকার কিছু অধিক
আয়কর বৃদ্ধি	২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা
লবণের শুল্ক বৃদ্ধি	৪ কোটি টাকার কিছু অধিক

লবণের শুল্ক অতিদরিদ্রের উপর কর বসান। কিন্তু "গরজ বড় বালাই"—তাই অর্থসচিব অনায়াসে বলিয়াছিলেন —ইহাতে দরিদ্রের অসুবিধা হইবে না। রেলে যাত্রীর ভাড়া যুদ্ধের সময় এক দফা বাড়ান হইয়াছিল—এবার আবার শতকরা ২৫ টাকা অর্থাৎ টাকায় সিকি বাড়াইবার প্রস্তাব হয়। শুল্কবৃদ্ধির প্রস্তাব একটু বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইতেছে—

(১) পূর্ব্বে যে সব জিনিষের উপর শতকরা ১১ টাকা আমদানী শুল্ক ধার্য্য ছিল, সে সব জিনিষের উপর শুল্ক ১৫টাকা করা হইবে ;

(২) কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক ও এ দেশে কাপড়ের উপর শুল্ক—দুই-ই শতকরা ৪ টাকা বাড়ান হইবে ;

(৩) কলকব্জার উপর শুল্ক শতকরা ২ টাকা ৮ আনার স্থলে ১০ টাকা করা হইবে ;

(৪) বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ১৫ টাকার স্থলে ২৫ টাকা করা হইবে ;

(৫) দেশলাইয়ের উপর আমদানী শুল্কও দ্বিগুণ করা হইবে ; ইত্যাদি।

এত অভাব এবং এই অভাব পূরণ করিবার জন্য এই সব ব্যবস্থার কারণ—অত্যধিক সামরিক ব্যয়। সমর-বিভাগের ব্যয় প্রায় ৬২ কোটি টাকা! দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধনের জন্য প্রথমে যে দেশ সুরক্ষিত এবং ধনপ্রাণ নিরাপদ করা প্রয়োজন, তাহা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু রাজস্বের এত অধিক ভাগই যদি সামরিক ব্যয়ে যায়, তবে উন্নতিসাধনের জন্য আবশ্যক অর্থ আসিবে কোথা হইতে? অথচ সমর-বিভাগের কর্ত্তা জঙ্গীলাট বলিয়াছেন, ইহার কম টাকায় তাঁহার কিছুতেই চলিবে না। আর সমর-বিভাগের খরচ কমাইবার অধিকার ব্যবস্থাপক সভায় নাই। যদি স্বীকার করা যায়, বলশেভিকদল স্থলপথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেও পারে, তাহা হইলেও এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, দেশের লোককে দেশরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ব্যয় অনেক কম হয়। যে স্থলে দেশীয় সৈনিকের বেতন মাসিক ১৫ টাকা, সে স্থলে বিদেশীর বেতন প্রায় ১ শত টাকা! তদ্ভিন্ন গোরাদের কাপড়ের, বাসস্থানের, আহারের—সব ব্যয়ই অধিক।

জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে—একবার ১৯০২ খৃষ্টাব্দে, আর একবার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে গোরা সৈনিকদের বেতন বাড়ান হয় এবং তাহাতে বৎসরে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িয়া যায়। যুদ্ধের পর সৈনিক-সংখ্যা ৬ হাজার কম করা হইলেও খরচ বৎসরে ৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা পড়িয়াছে! বিদেশী সৈনিক-দিগের ব্যয়ভার বহন করা ভারতবর্ষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিদেশী শাসকসম্প্রদায় কিছুতেই বিদেশী সৈনিকের স্থানে ভারতীয় সৈনিক নিয়োগে সম্মত হইতেছেন না। বাস্তবিক ভারতরক্ষার জন্য ২ লক্ষ ৬১ হাজার সৈনিক রাখাও প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

সামরিক ব্যয় যেমন কমান হইবে না, সরকারের শৈল-বিহারের ও দিল্লীরচনার অনাবশ্যক ব্যয়ও তেমনই এক কপর্দ্দক কম করা হইবে না। কাযেই দরিদ্র ভারতবাসীর করভার কেবলই বাড়াইতে হইতেছে।

এবার ব্যবস্থাপক সভা কার্পাস-পণ্যের উপর আমদানী ও উৎপাদন শুল্ক, কলকব্জার উপর শুল্ক ও লবণের উপর শুল্ক বাড়াইতে অস্বীকার করিয়াছেন। ফলে দাঁড়াইয়াছে—ভারত সরকার যে নূতন কর সংস্থাপন করিয়া ২৯ কোটি টাকা আদায় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার কেবল ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিতে ব্যবস্থাপক সভা সম্মত হইয়াছেন—অবশিষ্ট ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ভারত-সরকার কি উপায়ে কুলাইবেন—বলা যায় না।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা দেশের প্রয়োজন ও অবস্থা বিচার করিয়া এই যে সাড়ে ৯ কোটি টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন, ইহাতেই বিলাতের 'টাইমস' পত্র ভয় দেখাইয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা যদি এমন ভাবে সরকারের কাযে বাধা দেন, তবে শাসন-সংস্কারে অধিকারদানের কথাটা আবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ যে সংস্কারে দেশের জাতীয় দলের তৃপ্তি হয় নাই এবং যাহার শত ত্রুটি আজ মডারেটদিগের দৃষ্টিতেও প্রতিভাত হইতেছে,

ইংরাজ হয়ত সে সংস্কারও প্রত্যাহার করিবেন। করিলে কেবল যে পার্লামেণ্টে প্রচারিত ভারতে ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য অস্বীকৃত হইবে, তাহাই নহে; পরন্তু সমগ্র দেশে জন কতক রাজা মহারাজা নবাব ব্যতীত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার লোক আর পাওয়া যাইবে না। আর সার ভ্যালেণ্টাইন চিরলও স্বীকার করিয়াছেন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সহযোগিতা বর্জ্জন করিলেই ভারতে বিদেশী সরকার পঙ্গু হইয়া পড়িবে। ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব মিষ্টার মণ্টেগু পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবার পরও বৃটিশ জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—ভারতে অনুসৃত শাসননীতির যেন পরিবর্ত্তন করা না হয়। কিন্তু যিনি যাহাই কেন বলুন না, 'টাইমসে'র কথায় বৃটিশ জনসাধারণের এক দলের মত বুঝা যায়। তাঁহাদের মতই যদি প্রবল হয়, তবে ভারতের যত ক্ষতি হউক বা না হউক, ইংলণ্ডের কতটা ক্ষতি অনিবার্য্য, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বাঙ্গালার আয়ব্যয়।

ভারত সরকারের যেমন, বাঙ্গালা সরকারেরও তেমনই আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক। বাধ্য হইয়া বাঙ্গালা সরকার যে ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াছেন, তাহার পরও আয় অপেক্ষা ব্যয় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অধিক হওয়ায় বাঙ্গালা সরকার নূতন কর আদায় করিয়া সে টাকা ওয়াশীল করিবার প্রস্তাব করেন :—

(১) আমোদপ্রমোদের উপর টেক্স,

(২) ষ্ট্যাম্পের হার বাড়ান,

(৩) কোর্ট ফীর হার বাড়ান,

অথচ ব্যয় যে আর কমান যায় না, এমন নহে। মন্ত্রীদের বেতন—শাসন-পরিষদের সদস্যদিগের সংখ্যা, শৈলবিহারের ব্যয়—এ সব কমান হয় নাই। কাযেই দেশের দরিদ্র প্রজার কর-ভার বাড়াইয়াও বাঙ্গালার উন্নতিকর কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। বাজেট পেশ করিবার সময় রাজস্ব-সচিব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন—প্রজার উন্নতিকর কোন ব্যবস্থা (any indications of a broad and generous programme for the improvement of the conditions of life in this Presidency) হয় নাই—কোনরূপে "তুকুড়ি সাতের খেলা রাখার" মত ভাবে নিতান্ত আবশ্যক খরচ কুলাইবার উপায় করা হইয়াছে।

অথচ এই সব খরচের মধ্যে অস্থায়ী কারাগার রচনা বাবদে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়। এই কারাগার রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য—মহিলাদিগকে প্রয়োজনে আবদ্ধ রাখা। যে দিন কলিকাতার কতিপয় মডারেট বড় লাট লর্ড রেডিংকে ভোজ দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন, সেই দিন বড়বাজারে খদ্দর বিক্রয় করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী এবং শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী ও

শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়েন। বাঙ্গালা সরকারের শাসন-পরিষদের প্রধান সদস্য সার হেনরী হুইলারের জ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং সে সম্বন্ধে সরকারী বিবরণে যে লিখিত হইয়াছিল—সান্ধ্য আহারের সময়ের পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে মুক্ত করা হয়—তাহাও যথার্থ নহে। তখন মহিলাদিগকে কারাগারে রাখিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। এতদ্ব্যতীত যুবরাজের কলিকাতায় আসিবার সময় সময়ে যে শত শত যুবককে আটক

শ্রীমতী সুনীতি দেবী।

রাখা হয় এবং সে জন্য খিদিরপুরের ডকে কারাগার করিলে তথায় বেবন্দোবস্তের যে বিবরণ প্রকাশ পায়—তাহাও যে-কোন সভ্য সরকারের পক্ষে কলঙ্কের কথা। সরকার যখন রাজনীতিক অপরাধীদিগের জন্য কারাগার রচনা করিতে টাকা চাহিলেন, তখন ব্যবস্থাপক সভা তাহাতে অস্বীকৃত হয়েন।

অন্যান্য ব্যাপারে সদস্যরা যেরূপ আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেও দৃঢ়তার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, সরকারকে ধর্ষণনীতি পরিহার করিবার জন্য তাঁহারা যে প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গ্রহণ করেন, সরকার তদনুসারে কাব না করিলেও তাঁহারা আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে পদত্যাগ করেন নাই। এবার তাঁহারা নূতন কর-সংস্থাপন নিবারণ করেন নাই। অধিকন্তু নূতন গভর্ণর দেশে পা দিবার পর ৩ দিনের মধ্যে তাঁহাদের কারাগাররচনার টাকা নামঞ্জুর করা নাকচ করিয়া দিলেও তাঁহারা মনে করেন নাই—তাঁহাদের আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ হইল এবং ব্যবস্থাপক সভা যে ক্ষমতাহীন, তাহা প্রমাণিত হইল।

ভারত-সচিব

ভারতে শাসন-সংস্কারের প্রবর্ত্তক মিষ্টার মণ্টেগু যে স্বার্থ-সর্ব্বস্ব ক্ষমতাপ্রিয় ইংরাজদিগের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, তাহা ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ভারত সরকারকে কালোপযোগী নহে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"এত দিন ইংরাজ ভারতবাসীকে যেরূপে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিয়াছেন (sheltered existence), তাহার পরিবর্ত্তন না করিলে ভারতবাসীর জাতীয় জীবন বিপন্ন হইবে," বর্ত্তমানে ভারতে জনগণ যে শান্তি সন্তোষ ভোগ করিতেছে, তাহাতে "জাতীয়তার উদ্ভব সম্ভব নহে।" যিনি এমন কথা বলেন এবং ইংরাজের প্রতিবাদ প্রহত করিয়া ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার বৃদ্ধি করিবার কথা বলেন, তিনি যে এত দিন ভারত-সচিব থাকিতে পাইয়াছেন, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। কারণ, শাসন-সংস্কার যেমনই কেন হউক না, তাহার প্রবর্ত্তনে অনেক ইংরাজ রাজনীতিকের ও রাজকর্ম্মচারীর বিশেষ আপত্তি ছিল। এবার তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে বড় লাট লর্ড রেডিং ভারত-সচিবকে ভারতীয় মুসলমানদিগের প্রার্থনা জানান—

(১) তুর্কীকে কনস্তান্তিনোপল ছাড়িয়া দিতে হইবে;
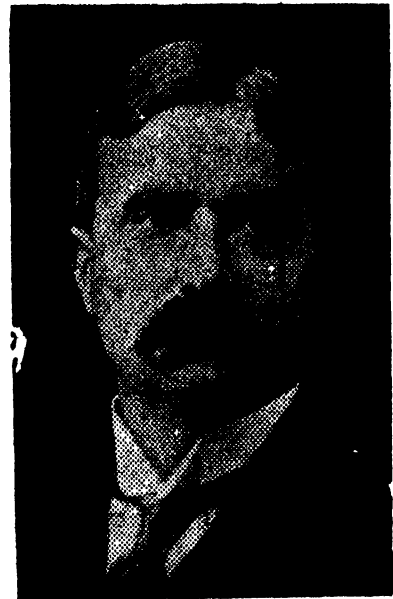
(২) তুর্কীর সুলতানকে ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দিতে হইবে;

(৩) সুলতানকে থ্রেস ও স্মার্ণা দিতে হইবে।

করিবেন! অবশ্য, ইহাতে হুকুম জারি হয় নাই—কেবল যে মুসলমানদিগের কাছে মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতই প্রকাশ পাইয়াছিল। মিষ্টার

মিষ্টার মণ্টেগু ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু।

যে পত্রে লর্ড রেডিং এই কথা জানান, মিষ্টার মণ্টেগু বৃটিশ মন্ত্রিসভার অনুমতি না লইয়া তাহা প্রকাশের উপদেশ দেন। তাহাতে লর্ড কার্জ্জন অসাধারণ ক্রোধ প্রকাশ করেন—ভারতের বড় লাট বৃটিশ মন্ত্রিসভার উপর হুকুম জারি লয়েড জর্জ্জ লর্ড কার্জ্জনকে অসন্তুষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। কাযেই মিষ্টার মণ্টেগুকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

পদত্যাগ করিয়া মিষ্টার মণ্টেগু বৃটিশ মন্ত্রিসভার যে সব গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রিসভার

সম্ভ্রম-হানি হইয়াছে। সে সভা কতদূর হীনতা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত, তাহা বুঝা গিয়াছে। লর্ড রেডিং কিন্তু পদত্যাগ না করিয়া আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন, বলিতে পারি না।

ও দিকে মন্ত্রিসভার ব্যবহার দেখিয়া বিলাতের অনেক

পরিবর্ত্তন করা হইবে না। কিন্তু বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে —লর্ড পিলের মন্ত্রণাসভার কোন য়ুরোপীয় সদস্য লিখিয়াছেন —নীতির পরিবর্ত্তন হইবে না বটে, কিন্তু—যাহা ছিল, তাহা আর থাকিবে না, অর্থাৎ ভারতবাসীকে অধিক অধিকার

লর্ড রেডিং।

রাজনীতিক ভারত-সচিবের পদ লইতে অস্বীকার করেন। লর্ড ডার্বি ও ডিউক অব ওয়েষ্টমিনিষ্টারকে সে পদ দিতে চাহিলে তাঁহারা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

পরিশেষে লর্ড পিল সে পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার খ্যাতি ইতঃপূর্ব্বে সাগরপারে শুনা যায় নাই।

এখন বৃটিশ রাজকর্ম্মচারীরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, মিষ্টার মণ্টেগু ভারতে যে শাসননীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার

প্রদানে আর আগ্রহ থাকিবে না। মিষ্টার মণ্টেগু যখন পদত্যাগ করেন, তখন তাঁহার মন্ত্রণা-সভার তিন জন ভারতীয় সদস্যের মধ্যে মিষ্টার দালাল ব্যতীত কেহ বিলাতে ছিলেন না। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু তদবধি বিলাতে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বন্ধুবান্ধবরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন, বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি একটি স্বতন্ত্র দল গঠিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

সাহিত্য-সম্মিলন

এবার মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। যাহাতে বাঙ্গালার সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যামোদী ব্যক্তিরা প্রতি বৎসর সম্মিলিত হইয়া সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির আলোচনা করিয়া তাহার উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, সেই জন্য সাহিত্য-সম্মিলন কল্পিত হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সম্মিলন চারি শাখায় বিভক্ত—(১) সাহিত্য, (২) বিজ্ঞান, (৩) দর্শন, (৪) ইতিহাস। সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করিলে ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধিবেশন হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন শাখার সভাপতি ভিন্ন ভিন্ন অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রত্যেক শাখায় কতিপয় প্রবন্ধও পঠিত হয়। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সাহিত্য-সম্মিলন আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নাই—তাহাতে বাঙ্গালী আশানুরূপ উৎসাহ দেখান নাই। এমন কি, মধ্যে মধ্যে এক এক বার অধিবেশন বন্ধও থাকে।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

এবার মেদিনীপুরে সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। এবার সম্মিলনের সাধারণ বা প্রধান সভাপতি—শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সূর্য্যকুমার অগস্তির অভিভাষণ পাঠের পর তিনি স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন।

যতীন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত ও বাঙ্গালার সমাজে সুপরিচিত হইলেও তাঁহার কোন অবদানে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক থাকিয়া, পরিষদের সেবা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের, গভর্ণমেণ্টের ও দেশের লোকের কর্ত্তব্যের আলোচনা করেন। দেশের লোকের "কর্ত্তব্যসাধন সম্পর্কে কি কি অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় এবং আশু কর্ত্তব্য," তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"ভাষার ভাব-সম্পৎ এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধিকল্পে এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে এবং যাহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ—নানা বিদ্যা-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত

ব্যক্তি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা; দেশীয় প্রাচীন কাহিনী ও প্রাচীন সাহিত্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান ও প্রচার করা ইত্যাদি আমাদের যাবতীয় কর্ত্তব্য আছে, তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ, উপযুক্ত লোকের প্রতি বিষয়ভেদে ভার দিবার ব্যবস্থা আপনারা করুন।"

দর্শনশাখার সভাপতির আসন শ্রীযুত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ যোগ্যতাসহকারে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এবার সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণে জাতীয় শিক্ষার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল। সে প্রবন্ধ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিরূপে শ্রীযুত চুণিলাল বসু "জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তিনি বলেন—"বর্ত্তমানকালে দেশে যে বিষম অশান্তি তাহার করাল প্রভাব দিন দিন বিস্তার করিতেছে, অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট তাহার একমাত্র কারণ না হইলেও উহা যে একটি প্রধান কারণ, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।" কাযেই "অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার একটা সন্তোষকর ব্যবস্থা হইলে দেশের অশান্তি বহুল পরিমাণে নিরাকৃত হইবে।" এই সমস্যা-সমাধানের "একমাত্র উপায়—দেশের মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞানের অনুশীলন ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রচার।"

অন্ন-সমস্যার কথায় তিনি অধ্যাপক শ্রীযুত দয়াশঙ্কর দুবের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—"১৯১১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা সাড়ে ২৪ কোটি ছিল। ইহার মধ্যে ৮ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের স্বচ্ছন্দে ভালরূপে আহার করিবার সুবিধা হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৬০ হাজার লোকের দেশজাত শস্য হইতে যথাপ্রয়োজনীয় খাদ্যসংগ্রহের অসুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার গণনামতে ঐ বৎসর ইংরাজাধীন ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের জন্য ১৭৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ১০ হাজার মণ শস্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে বৎসর ১৪৭ কোটি ৯৬ লক্ষ মণ মাত্র শস্য এ দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ভারতবাসীর অবশ্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষা ২৫ কোটি ৭৩ লক্ষ ১০ হাজার মণ শস্য কম ছিল।"

শ্রীচুণিলাল বসু।

দুবে মহাশয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরের হিসাব ধরিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরই ২৫ হইতে ৩০ কোটি মণ শস্যের অকুলান হইয়া থাকে।" অর্থাৎ "যথাপরিমাণ শস্যের অভাবে শতকরা ৬০ জন লোক, স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার ও কর্ম্মক্ষম থাকিবার জন্য তাহাদের প্রত্যহ যে পরিমাণ শস্যের অবশ্য প্রয়োজন, তাহা পায় না—তাহা অপেক্ষা শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ শস্য কম পাইয়া থাকে।"

এই অবস্থাতেও বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় এ দেশ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানীর বাধা দূর করিয়া রপ্তানীর পথ

পরিষ্কৃত করিয়াছেন এবং পাটের চাষ কমাইয়া সেই জমীতে ধানের চাষে কৃষককে উৎসাহিত করিবার চেষ্টার সমর্থন করেন না। ইহা বিবেচনা করিলেই চুণিবাবু বুঝিতে পারিবেন, কেন "সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন এবং "কর্ম্মক্ষেত্রে জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সমান অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছে" এবং ভারতবাসী স্বরাজলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহার পরিপন্থী বিদেশী ব্যুরোক্রেশী বা আমলাতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিতেছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।

এবার ইতিহাস-শাখার সভাপতিপদে শ্রীযুত অমূল্যচরণ ঘোষ বৃত হইয়াছিলেন।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি।

যে চট্টগ্রামে হিন্দু মুসলমান স্বরাজযজ্ঞে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন—যথায় অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ মৌলবী কাজেম আলী ও বিলাস-লালিত ব্যারিষ্টার শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত সহযোগিতাবর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়া বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন—সেই ত্যাগক্ষেত্র চট্টগ্রামে এবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। যাঁহার ত্যাগপুণ্যে বঙ্গদেশে অসহযোগ অনুষ্ঠান সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সেই কারারুদ্ধ নেতা শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী।

দাশের পত্নী—স্বয়ং বিদেশী আমলাতন্ত্রের দ্বারা লাঞ্ছিতা শ্রীমতী বাসন্তী দেবী এবার সভানেত্রী হইয়াছিলেন। এবার চট্টগ্রামের প্রাদেশিক-সমিতির অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ও সভানেত্রীর অভিভাষণে মিউনিসিপ্যালিটী হইতে ব্যবস্থাপক সভা পর্য্যন্ত কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ গ্রহণের কথা আলোচিত হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন সেন সংগঠন কার্য্যের কথা বলিয়া শেষে বলেন—

"সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে, আমরা মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও অধিকার করিব, কি না? এ সকলেই সদস্য নির্ব্বাচন হয় এবং সাধারণতঃ ইহাদের কার্য্যে সরকার বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন না। এ বিষয়ে আমরা আইরিশদিগের অনুকরণ করিতে পারি। * * * গত দ্বাদশ বৎসরে আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, সরকার কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪, ১০৭, ১০৮ প্রভৃতি ধারার দ্বারা এ দেশে সংগঠন কার্য্যের পথ বিঘ্নবহুল করেন। তাহার প্রতীকারকল্পে আমাদের পক্ষে এই সব স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হস্তগত করা প্রয়োজন।"

সভানেত্রীর অভিভাষণে উক্ত হইয়াছিল—"চারি দিকে গ্রাম্যসমিতি স্থাপন করিয়া দেশটাকে ছাইয়া ফেলিতে হইবে—ইউনিয়ন কমিটী, লোক্যাল বোর্ড, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি এই সকল সমিতির সাহায্যে নিজেদের হাতে আনিতে হইবে এবং সেই গুলির সাহায্যে জাতীয়ভাব প্রচার করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে কাউন্সিল পর্য্যন্ত দখল করিতে হইবে। কাউন্সিলে আসিয়া অসহযোগ-আন্দোলন পরিচালনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। যতদিন না আমাদের প্রাপ্য অধিকার স্বীকার করা হয়, ততদিন ভাল-মন্দ সমস্ত বিষয়েই কর্ত্তৃপক্ষকে বাধা দেওয়াই হয় ত আমাদের কাউন্সিলের কায হইবে। ভরসা করি, জাতীয় মহাসমিতির আগামী অধিবেশনে এই বিষয় ভাল করিয়া বিবেচিত হইবে।"

এই উক্তি লইয়া নানারূপ আন্দোলন হইয়াছে। সহযোগীরা বলিয়াছেন, অসহযোগীরা এখন আপনাদের ভুল বুঝিয়া আবার সহযোগের পথ লইতে চাহিতেছেন; এক দল অসহযোগী বলিয়াছেন, যতীন্দ্রমোহন ও শ্রীমতী বাসন্তী দেবী অসহযোগ অনুষ্ঠানের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমরা কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন কারণ পাই নাই। কেন না, কেহই কংগ্রেসের মতের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে বলেন নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন।

কংগ্রেসই জাতীয় মহাসমিতি এবং এ দেশে জাতীয় দলের ব্যক্তিমাত্রেই কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুসারে কায করিবেন।

বাঙ্গালায় রাজনীতিক আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে কংগ্রেসের প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হইতেছে। এ প্রসঙ্গে বাঙ্গালার কর্ম্মীদিগকে তাঁহাদের দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছি। অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভাবধি বাঙ্গালা যে কায করিয়াছে, তাহা উপেক্ষার যোগ্য নহে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র এত বড় এবং কাযও এত অধিক যে, বঙ্গদেশে আরও কর্ম্মীর ও আরও অর্থের প্রয়োজন। বাঙ্গালায় জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—

চরকার প্রচলনে এবং চরকা ও তাঁতের উন্নতিসাধনে আরও অবহিত হইতে হইবে—দেশের লোককে অসহযোগ আন্দোলনের স্বরূপ ও সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য আরও ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে—দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠার ও বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে—হিন্দু-মুসলমান-প্রীতি যাহাতে আরও দৃঢ় হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি যাহাতে আমরা সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হস্‌রৎ মোহানী।

রাজদ্রোহের অভিযোগে হসরৎ মোহানীর ২ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। হসরৎ মোহানী খিলাফৎ আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং স্বরাজ আন্দোলনে মহাত্মা গন্ধীর সহকর্ম্মী ছিলেন।

হসরৎ মোহানী।

আদালতে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি বিধিসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ পাইতে চাহেন। অন্যায় উৎপীড়ন ও অনাচারের স্থলেও আপনারা অত্যাচার বর্জ্জন করিয়া প্রতীকারের উপায় করা যায়, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। স্বরাজ-লাভের জন্য কোনরূপ অত্যাচার করা বা লোককে অনাচারে উত্তেজিত করা তাঁহার মতবিরুদ্ধ। স্বাধীনতার তৃষ্ণা—দেশ-মাতৃকার মুক্তিকামনা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সেই আকাঙ্ক্ষাই সকল দেশে লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। কাযেই যাঁহার হৃদয়ে সে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তিনিই যে অপরকে ঘৃণা করেন,—এ যুক্তি বিচারসহ নহে।

দায়রায় পাঁচ জন ভারতীয় জুরার আসামীকে নিরপরাধ বলিলেও বিচারক তাঁহার দণ্ডাদেশ দিয়াছেন। এ অবস্থায় দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে জুরার করায় সার্থকতা কি?

বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর।

লর্ড রোণাল্ডসের পর লর্ড লিটন বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আসিয়াছেন।

লর্ড রোণাল্ডসে স্বয়ং সুপণ্ডিত ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন এবং এ দেশের শিল্পে ও সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগও ছিল।
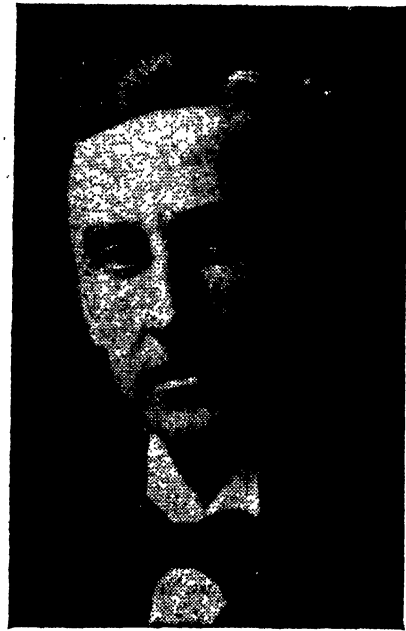
লর্ড লিটন।

তিনি এ দেশে আসিয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ লক্ষ্য করেন,—বৎসরে সাড়ে ৩ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু-মুখে পতিত হয় এবং তাহার প্রতীকারচেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয়, সে বিষয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য কোন কাযই করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিশেষ শাসন-সংস্কারে স্বাস্থ্য বিভাগের

ভার মন্ত্রীর উপর অর্পিত হওয়ায় তিনি যেন সে বিষয়ে কতকটা উদাসীন হইয়াছিলেন।

শাসনভারও তিনি কতকটা সার হেনূরী হুইলারের হস্তে স্বেচ্ছাসেবকসঙ্ঘ ও সভাসমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। শেষকালে তিনি ধর্ষণনীতিরই সমর্থক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

লর্ড রোণাল্ডসে।
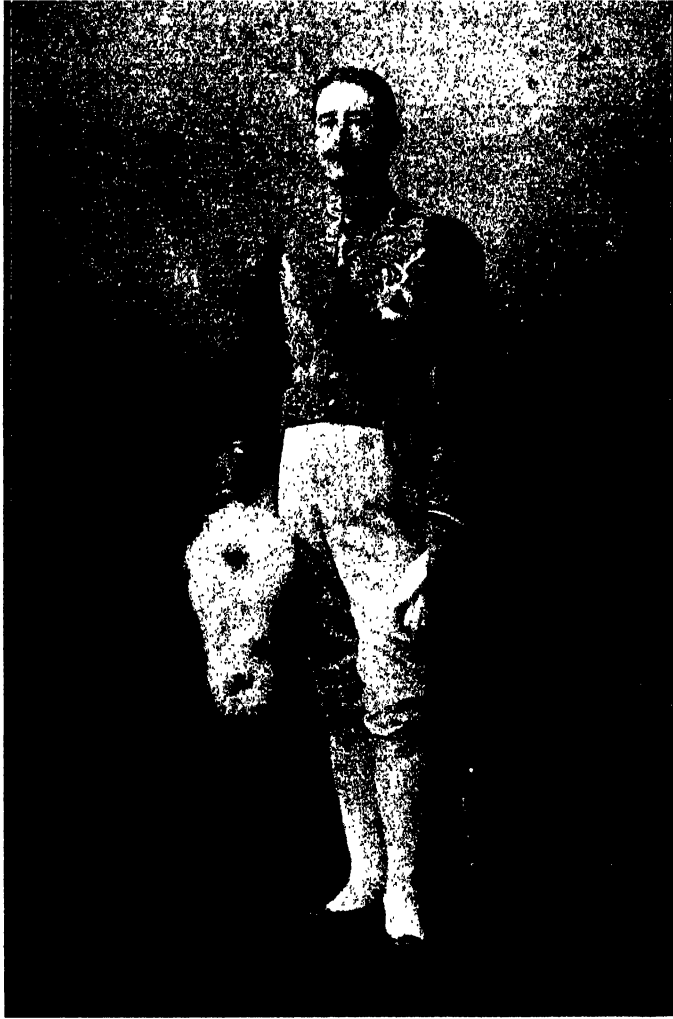
ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে মহিলারাজনীতিক-কর্ম্মীদিগের গ্রেপ্তার ও জেল হয়, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী বর্ষিত হয় এবং চাঁদপুরে কুলীদিগের উপর ও চট্টগ্রামে জনগণের উপর অনাচার হয়। তিনি

লর্ড লিটন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক লিটনের পৌত্র। ইঁহার পিতা ভারতবর্ষে বড় লাট ছিলেন এবং তাঁহারই শাসনকালে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়।

মহাত্মা গন্ধী।

নবভারতের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ অহিংস অসহযোগনীতির প্রবর্ত্তক মহাত্মা গন্ধী রাজদ্রোহের অভিযোগে ৬ বৎসরের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে যে গ্রেপ্তার করা হইবে, এ কথা জনরব বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই রটনা করিতেছিল। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইলে দেশবাসী কি করিবেন, সে উপদেশ তিনি দিয়াছিলেন। মহাত্মা
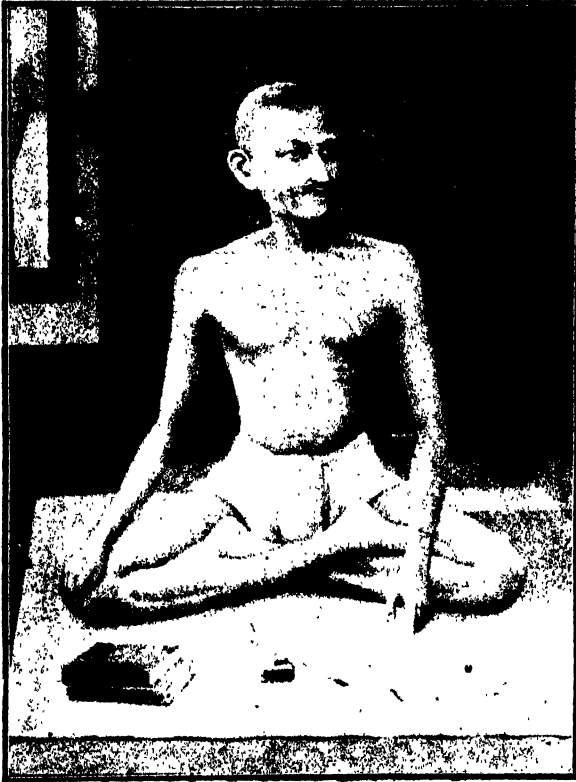
আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, কেবল একরারে তাঁহার মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির প্রতি দেশবাসীর অশ্রদ্ধার ভাব প্রচারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ আছে এবং 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' প্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই তিনি সে কায করিতেছিলেন। এমন কি, তাঁহাকে যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তিনি আবার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন; কিন্তু তিনি যে আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অহিংসাই তাহার মূল মন্ত্র।

কি কি কারণে তিনি দেশে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন, তাহাও তিনি আদালতে বিবৃত করেন এবং বলেন, আইনের ধারায় দেশে সন্তোষের সৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।—"যাহা আমি দেশবাসীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি এবং আইনের চক্ষুতে যাহা স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ, তাহার জন্য আমি পূর্ণ দণ্ড লইতে প্রস্তুত।"

তিনি জেলে যাইবার সময় দেশবাসীকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,—সকলে যেন স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করেন।

তিনি ইতঃপূর্ব্বে ভারতবাসীর স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের ১০টি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন :—

(১) এ দেশে বৃটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আমরা দেশের আবশ্যক বস্ত্র দেশেই উৎপন্ন করিতাম এবং বিদেশে বস্ত্র রপ্তানীও করিতাম।

(২) বলপূর্ব্বক অবলম্বিত উপায়ে এ দেশে চরকার উচ্ছেদ সাধিত হওয়ায় দেশের শতকরা ৮০ জন লোক অবসরকালে যে কায করিয়া অর্থার্জ্জন করিত, সে কায বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৩) ভারতের লোক যদি বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া স্বদেশে হাতের তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহা হইলে দেশে স্ত্রীলোকদিগের পবিত্রতারক্ষায় সাহায্য করা হইবে। ঘরে বসিয়া চরকা কাটা বন্ধ হওয়ায় মহিলারা বাধ্য হইয়া বাহিরে যে কায করিতেছেন, তাহাতে নানারূপ বিপদের সম্ভাবনা।

(৪) কলে যে কাপড় হয়, তাহা প্রাণহীন কবিত্বশূন্য।

(৫) কাযের অভাবে এ দেশে দারিদ্র্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

(৬) বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিলে বৎসর বৎসর ভারতে প্রায় ৬০ কোটি টাকা থাকিয়া যাইবে, অথচ তাহাতে শ্রমজীবিদলে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না।

(৭) বিদেশী কাপড়ের আমদানীতে আমাদের যত ক্ষতি হইয়াছে, আর কোন বিদেশী পণ্যের আমদানীতে তত ক্ষতি হয় নাই।

(৮) ১৮১৯-২০ খৃষ্টাব্দে এ দেশে বিদেশ হইতে যে ১ শত ৫৭ কোটি টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিদেশী কাপড়ের মূল্যই প্রায় ৬০ কোটি টাকা।

(৯) এই কাপড় রপ্তানী করায় ইংলণ্ড একান্ত স্বার্থপর হইয়াছে, জাপানও স্বার্থপর হইতেছে। জাপান হইতে যদি কাপড় আমদানী চলিতে থাকে, তবে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের

কাছে যেমন আত্মবিক্রয় করিয়াছে, জাপানের কাছেও তেমনই আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে।

(১০) কোন বিশাল দেশের পক্ষে খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা যেমন আত্মনাশকর, পরিধেয়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়াও তেমনই আত্মহত্যা করা।

মহাত্মা গন্ধী এ দেশে দেশসেবাকে ধর্ম্মের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং রাজনীতি দেশের জনসাধারণের আলোচ্য করিতে পারিয়াছেন।

—

সভা বন্ধ।

যুদ্ধের সময় যাহাই কেন হউক না, যুদ্ধের পর সভা বন্ধ —লোককে তাহাদের বক্তব্যপ্রদানে বাধাপ্রদান যে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিস্ময়ের বিষয়, যুদ্ধের পর সরকার সেই কায করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীমদনমোহন মালব্য।

বাঙ্গালায় বাঙ্গালা সরকার সভা করা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন দেখা গেল, কেবল বাঙ্গালার জাতীয় দলের সভাতেই যে সরকারের আপত্তি, এমন নহে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য পঞ্জাবে যাইয়া যে সব সভায় বক্তৃতা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, সে সব সভা পঞ্জাব সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

অথচ পণ্ডিতজী বড় লাটের বন্ধু এবং যাহাতে জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দের সহিত সরকারের একটা রফা বন্দোবস্ত হয়, সে জন্য বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। সে জন্য তিনি সিমলা, দিল্লী, কলিকাতা—ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় সিমলায় মহাত্মা গন্ধীর সহিত বড় লাটের সাক্ষাৎ ও বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা হয়। মোট কথা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য যে কোনরূপ রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা করিয়া দেশের লোককে রাজদ্রোহে বা অনাচারে উত্তেজিত করিতে পারেন, কাহারও এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিশেষ তিনি যে সব সভায় বক্তৃতা করিবেন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি—সাধারণ সভা নহে, কংগ্রেসের সমিতির সভা। সেইরূপ সভাকে সাধারণ সভা ধরিয়া লালা লজপৎ রায়কে গ্রেপ্তার করায় বিলাতের 'নেশান' পত্র জজের সে রায়কে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়—এ দেশে ব্যুরোক্রেশী ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভয় করেন না।

এবার যে পণ্ডিত মদনমোহনের মত সরকারের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর সুহৃদকেও সন্দেহহেতু বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইল না, ইহাতে দেশের লোক তাহাদের অধিকারের প্রকৃত পরিমাণ পরিমাপ করিতে পারিবে।

অতঃপর পণ্ডিতজী কি করিবেন? তিনি কি এখনও মনে করিবেন, সরকারের সহিত সহযোগিতা ব্যতীত জাতির উন্নতির অন্য পথ নাই? আশা করি, তিনিও এ কথা স্বীকার করিবেন যে, যে জাতি স্বাবলম্বী হইতে না পারে—সে জাতির অনন্ত দুর্গতি অনিবার্য্য। অসহযোগ আন্দোলন এই স্বাবলম্বনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বতোভাবে জাতিকে স্বাবলম্বী করাই—স্বরাজলাভ। তাহাতে হিংসা বা ঘৃণা নাই—আছে কেবল যে অধিকারে জাতির অধিকার জন্মগত—সেই অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

যাঁহার আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি লইয়া এই পত্রিকা প্রচারের সূচনা—তাঁহারই স্বধাম-প্রয়াণের সংবাদ লইয়া হৃদয়ভাঙ্গা হাহাকারে উৎসাহ অবসন্ন করিয়া যে এই পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা কল্পনাও করি নাই।

গত ১০ই চৈত্র শুক্রবার প্রাতে আমরা এই পত্রিকা প্রচারের আয়োজনের পূর্ব্বে পূজনীয় মহারাজের আশীর্ব্বাদ লইতে বাগবাজারের ভক্ত-চূড়ামণি বলরাম বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। মহারাজ তখন বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া শ্যামবাজারের পথ হইতে ফিরিয়াছেন; কিন্তু রোগের আক্রমণ তখনও প্রকট হয় নাই। চিরস্নেহশীল মহারাজ সেই দুর্ব্বল শরীরেও সদাহাস্যপ্রফুল্ল মুখে এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন ও কল্পনার সকল কথা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া শুনিলেন—হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্ন বদনে প্রকাশের অনুমতি দিলেন—আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন কে জানিত, তিনি কালরোগে আক্রান্ত—সেই তাঁহাকে শেষ দর্শন—সে সৌম্য-শান্ত-সদাহাস্যময় তেজোদ্দীপ্ত মূর্ত্তি আর বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইব না; তাঁহার তিরোভাবে শোকস্তব্ধ হৃদয় পাষাণে পরিণত করিয়া তাঁহার শেষ আদেশ পালন করিতে হইবে।

বেলুড়-মঠের গৌরব-চূড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ—ভক্তের হৃদয়-সিংহাসনের আদর্শদেবতা মহারাজ—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র রাখাল—মায়াত্যাগী কঠোর সন্ন্যাসী হইয়াও যিনি স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার আধারস্বরূপ ও সর্ব্বজীবে করুণাময় ছিলেন, তিনি অসংখ্য ভক্তের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া ২৭শে চৈত্র সোমবার রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার অলৌকিক স্নেহ, অপরিমেয় ভালবাসা, অসীম করুণা লাভে সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন; যাঁহারা সেই পুণ্য-জ্যোতির্ম্ময় সদাহাস্যরঞ্জিত মূর্ত্তি যুগযুগান্তরের তপস্যার ফলে দর্শন করিয়া তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হইয়াছেন; মর-জগতের ভাষায় তাঁহাদের হৃদয়ে এ বিয়োগ-ব্যথার শান্তি নাই। প্রিয়তম প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনাও এত কঠোর—এত মর্ম্মস্পর্শী নহে। ভক্ত-হৃদয়ের এ ব্যথা কেবল তিনিই প্রশমিত করিতে পারেন।

জানি, তিনি অবিনশ্বর—স্বয়ং ব্রহ্ম—তিনি অব্যয়—তিনি ব্রহ্ম হইতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে বিরাজমান, তাঁহার বিনাশ নাই—তিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, কিন্তু শোক-মুহ্যমান হৃদয় সে যুক্তি-তর্কে সান্ত্বনা মানিতে চাহে না। সে যে দর্শন আশায় ব্যাকুল!

রাখাল মহারাজ ধনীর সন্তান, ধনীর গৃহে বাল্যে বিবাহিত, মানুষ যাহাতে সুখী হয়, সংসারে বাল্যে তাহার কিছুর—বিলাসের কোন উপাদানের তাঁহার অভাব ছিল না; কিন্তু সে সকল অকিঞ্চিৎকর ভোগসুখ ধূলিমুষ্টির ন্যায় পরিহার করিয়া তিনি সুকঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শন করিয়াই তিনি বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া পরমহংসদেবের কোলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। উভয়ে উভয়ের দর্শনাশায় বহুদিন হইতেই যেন উৎকণ্ঠিত ছিলেন! যেন বহুদিনের বাঞ্ছিত হারান ধন—অমূল্যনিধি মিলিয়া গেল। সে মিলনে কত আনন্দের—কত স্নেহের অনাবিল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী-পাঠকের অবিদিত নাই। যে দ্বাদশ জন প্রথম পরমহংস-দেবের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। পরমহংসদেব মহারাজকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন—তাঁহার আদরের নাম ছিল রাজা—রাখাল রাজা। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহাকে রাজা বলিয়া মান্য করিতেন। রাখাল মহারাজ ও লাটু মহারাজ পরমহংসদেবের যত সঙ্গ ও যত সেবা করিয়াছেন, তত সঙ্গলাভ বুঝি আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

পরমহংসদেবের শরীরত্যাগের পর রাখাল মহারাজ সুকঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার সাধনার ইতিহাস তিনি সংগোপনে রাখিতেন—অহমিকা-প্রকাশের আশঙ্কায় তাহা কোন দিন প্রকাশ পাইতে দেন নাই। হিমালয়ের নিভৃত গুহায় তিনি দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন; বৃন্দাবনে মাধুকরী করিয়া দিনান্তে একখানিমাত্র রুটী খাইয়া ঈশ্বর-লাভের জন্য কৃচ্ছ্র সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুকঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ লাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই মহাজ্ঞানলাভজনিত কোনরূপ অভিমান—কোনরূপ গর্ব্ব তাঁহার ছিল না। শত-প্রযত্নে তিনি সে দিব্যজ্ঞান

সংগোপন করিতেন, সদা হাস্য-পরিহাস-রসিকতার সম্মোহন প্রভাব দিয়া আত্মগোপন করিতেন। সংসার-মোহাচ্ছন্ন কৌতূহলী মানব তাঁহার লোকাতীত স্থান—অলৌকিক শক্তির জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—মরজগতে ভালবাসার অমৃতের আস্বাদন পাইয়াছে। শান্তির পুলকধারায় তাহার মনে এক অনাবিল আনন্দের তরঙ্গ বহিয়াছে।

পরিচয় পাইত না—কিন্তু পাইত এক অপূর্ব্ব শান্তি। ত্রিতাপদগ্ধ মানব যখনই সংসার-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সেই সুধাকরের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তখনই তাহার অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়ের শোক-তাপ-জাড্য-অবসাদ বিদূরিত হইয়া তথায় এক দিব্য

আমেরিকাগমনের পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে বেলুড়-মঠের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। তাঁহার নেতৃত্বে—তাঁহার প্রাণপাত সাধনায়—অনুপ্রেরণায় আজ ভারতের প্রতিজনপদে অসংখ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ সংগঠিত হইয়াছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড়-মঠে অসংখ্য মুক্তিকামী যুবককে প্রতি বৎসর ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষা দিতেন। ৪।৫ বৎসর তাঁহাদিগকে কঠোর সংযমে নানা সাধনায় অভ্যস্ত করাইয়া প্রতি জন্মোৎসবে গুরু ব্রহ্মানন্দ অসংখ্য ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। তাঁহারাই তাঁহার নির্দেশক্রমে দিকে দিকে ভারতে—য়ুরোপে—আমেরিকায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া অসংখ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ—মিশন, সেবাশ্রম, সোসাইটী, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-শান্তিকেন্দ্র প্রভৃতি মানবমঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সকল কল্যাণ-উৎস হইতে মুক্তিকামী মানব শান্তি ও মুক্তি, জ্ঞান ও ভক্তিলাভে ধন্য হইতেছে। এই সকল সঙ্ঘের গুরু—নেতা—চালক মঙ্গলকল্পতরু ব্রহ্মানন্দ। তাঁহার অনুপ্রেরণা—সমন্বয়-নৈপুণ্য—সংগঠন-শক্তি পৃথিবীতে অতুলনীয়। বৌদ্ধযুগের পর ভারতে কোন ধর্ম্মমতের এমন কল্পনাতীত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই।

কিন্তু এত বড় বিরাট মানবমঙ্গলকর কর্ম্মের নেতৃত্ব করিয়াও স্বামী ব্রহ্মানন্দ এক দিনও তপস্যায় ক্ষান্ত হয়েন নাই। সাধনায় শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—বহুমূত্র ও অজীর্ণ রোগে জীর্ণ হইয়াছেন—সাধনার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, কিন্তু তপস্যার বিরাম নাই।

পুরীতে স্বাস্থ্যলাভের আশায় গিয়াছেন—শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, কিন্তু শশি-নিকেতনে তাঁহাকে সারারাত্রি বিনিদ্র হইয়া কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে দেখিয়াছি। কাশীতে সেবাশ্রমে অসুস্থ শরীরে সারারাত্রি ধ্যান করিতেন। পুরীতে দেখিয়াছি, হাস্যপরিহাসে রসরঙ্গের স্রোতের উজান বহিতেছে; কথায়, বিদ্রূপে, কৌতুকে হাসিয়া হাসিয়া আমরা অস্থির হইতেছি, তখনও মহারাজ বারান্দায় কপালে একটি আঙ্গুল ঠেকাইয়া দেবদুর্ল্লভ ভঙ্গীতে ঈষৎ বঙ্কিমঠামে নাচিতেছেন—অনুপমকণ্ঠে গাহিতেছেন—

"যাইতে সাগরে, আশা নগরে,
আশীষ তোমারে করি হে রায়।"

আবার কিছু পরে কি গম্ভীর—সমাধিমগ্ন। সে গম্ভীরতার কল্পনা হয় না—ভাষায় তাহা পরিস্ফুট হয় না।

পুরীর শশি-নিকেতনে তিনি দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। পুরীর জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না; কিন্তু বুঝি, উড়িষ্যায় শ্রীজগন্নাথদেবের অমোঘ প্রভাবের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠার বাসনায় তিনি এত দীর্ঘকাল পুরীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে হিন্দুর স্থাপত্যবিদ্যার পূর্ণপরিণতির ধ্বংসাবশেষস্থল, পুণ্যভূমি ভুবনেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ সগৌরবে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তীস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার শেষ কীর্ত্তি—শেষ নিদর্শন। এ কীর্ত্তির সম্যক্ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সাধারণকে কেবল ধরা না দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। যিনি যে ভাবের ভাবুক—যে রসের সাধক, সেই ভাবেই—সেই রসেই তাঁহাকে সম্মোহিত—বিস্মিত করিতেন। বিলাসী বাবুরা তাঁহার রঙ্গরসে অবাক্ হইত—সাহিত্যিক সাহিত্যরসে আপ্লুত হইত—রাজনীতিক রাজনীতি-সমস্যার মীমাংসা পাইত—সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীতবিদ্যার মূর্ত্ত-বিকাশ দেখিত—হাকিম ব্যবহারাজীবরা আইনের খেলা দেখিত—জীবন-সমস্যায় বিপন্ন ব্যক্তি অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর পাইত—সংসার-সুখ-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির আহার ও ভ্রমণের ব্যবস্থা হইত। আর ভক্তগণ দেখিতেন, জগতে অতুল—সেই রাতুল চরণ—ব্রহ্মজ্ঞানের প্রফুল্ল-কমল-প্রস্ফুরিত আনন্দহিল্লোলিত প্রশান্ত হৃদয়। এ জগতে কি তাহার তুলনা আছে—উপমা আছে? দর্শনে কত আনন্দ—সংসার-বিভ্রম—আত্ম-বিস্মৃতি। স্পর্শের কি সম্মোহিনী শক্তি—যেন একটা বৈদ্যুতিক স্পর্শ—কি পুলক-হিল্লোল—আনন্দের অনুভূতি সর্ব্বদেহে নৃত্য করিত আর বাক্যস্ফুরণশক্তিহীন জড়িত রসনা অজ্ঞাতে সেই মধুময় নামজপে ব্যস্ত হইত।

শরীর-ত্যাগের পূর্ব্বরাত্রিতে অপূর্ব্বভাবে বিভোর হইয়া সমবেত সন্ন্যাসী ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "আহা-হা! ব্রহ্ম-সমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ! ওঁ পরমাত্মনে নমঃ! একটি বিশ্বাসের পত্রে ভেসে চলেছি!"

বাঙ্গালীর বহু পুণ্যে ভারতে এমন নীরবকর্ম্মী মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি লীলা-অন্তে স্বধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। সেই শিশুর সারল্যমণ্ডিত সদাহাস্যরঞ্জিত, জ্ঞান ও প্রতিভাগঠিত দিব্যমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখ হইতে অপসারিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অনুপ্রেরণায়—আশীর্ব্বাদে

বাঙ্গালীর মন্ত্রসাধন সফল হইবে।

আগামী সংখ্যায় মহারাজের সুরঞ্জিত চিত্র ও জ্ঞান-প্রভান্বিত জীবনী প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শুভ ১লা বৈশাখ—শুক্রবার (১৪ই এপ্রিল)

মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন ;—প্রধান সভাপতি রায় শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুত এস্ কে অগস্তি ; সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞান-শাখার ডাঃ চুনিলাল বসু, ইতিহাস শাখার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; দর্শন-শাখার সভাপতি রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর।

চট্টগ্রামে রাজপথে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আপত্তি, শোভাযাত্রা ও জনতায় বাধা। লাহোরে কংগ্রেস-সভা বন্ধ, পুলিসের সভাস্থল অধিকার, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মুখ বন্ধ, পণ্ডিতজীর প্রতিবাদ। শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর সভাপতি সর্দ্দার খড়্গ সিংএর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। কলিকাতায় বাঙ্গালার ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্স। চট্টগ্রাম রেলষ্টেশন কাণ্ডে সরকারী সিদ্ধান্ত—গুর্খার অত্যাচার নয়—প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। ভুটানের মহারাণীর মৃত্যু-সংবাদ, সংবাদ তিন সপ্তাহ পরে পাওয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজের উকীল-সভার চণ্ডনীতিতে প্রতিবাদ। করাচী কারাগারে খাদ্যকষ্টের সংবাদ। সুলেখক ও সংবাদপত্র-সেবক পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের লোকান্তর।

২রা বৈশাখ—

দেরাদুনে ১৪৪ ধারায় জেলা কন্‌ফারেন্স বন্ধ। গনটুরে শ্রীযুত টি প্রকাশম্ প্রভৃতির রাজনৈতিক সভা বন্ধ। মৌলানা হসরৎ মোহানী কানপুরে গ্রেপ্তার। চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন—অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী। জাপানে প্রিন্স অব ওয়েলস্, সৈন্য-পরিদর্শন। স্বেচ্ছাসেবক সমিতিকে ঘরভাড়া দেওয়ার অভিযোগে শ্রীযুত পরমানন্দ আগরওয়ালা নামে পুরের এক ধনী গ্রেপ্তার।

৩রা বৈশাখ—

জেনোয়ার সভায় অসন্তুষ্ট রুষ প্রতিনিধিদের সভাত্যাগ। ই, আই, রেল ধর্ম্মঘটের অবসান।

৪ঠা বৈশাখ—

চট্টগ্রামে বঙ্গীয় আঞ্জুমান উলেমা সভা ও খেলাফৎসভা। জেনোয়ায় রুষ-জার্ম্মাণ সন্ধি। সুরাটের পূর্ব্বতন অসহযোগী মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্যদের নামে ১৭৯ হাজার টাকার ও তাহার সুদের দাবী। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে ছিন্দবড়ায় মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক সভা। গন্ধী টুপী পরায় রেঙ্গুনে পরীক্ষা-মন্দির হইতে ছাত্রের বহিষ্কার।

৫ই বৈশাখ—

প্রথম গন্ধী দিবস ; আমেদাবাদে শ্রীযুক্তা গন্ধীর খদ্দর বিক্রয়। ইটালি হাঙ্গামা উপলক্ষে দুই জন ফিরিঙ্গী সিভিল গার্ড গ্রেপ্তার। তুর্কী সন্ধি সর্ত্তে নিখিল ভারত খেলাফৎ কমিটীর প্রতিবাদ। জেনোয়ায় রুষ-সমস্যার আলোচনায় জার্ম্মাণদিগকে যোগদান করিতে নিষেধ। তেজপুরের নিকটে পানপুরের ঘাটে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যাইবার সময় মহিষদলের আক্রমণ হইতে কতকগুলি সঙ্গী মহিলাকে রক্ষা করিবার জন্য এক ব্রাহ্মণের নিজ প্রাণদান। আমীর বাহাদুর-কর্ত্তৃক কান্দাহারে একটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রকাশ, বাঙ্গালার ছাত্র বা সমাজে প্রতি তিন জনের মধ্যে দুই জনের স্বাস্থ্য খারাপ।

৬ই বৈশাখ—

আহিরীটোলার বালিকা বধূ-নির্য্যাতন মামলা আরম্ভ। রেঙ্গুনে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব নিষিদ্ধ। ফ্রী বার্ম্মার সম্পাদক ও মুদ্রাকরের কারাদণ্ড। পুনর্ব্বিচারে বিহারে রাজনৈতিক মামলাগুলির দণ্ড-হ্রাস। চীনে যুদ্ধের আশঙ্কা।

৭ই বৈশাখ—

কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন। মুলসীপেটায় সত্যাগ্রহীদের ১৪৪ ধারা অমান্য ; গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড। বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটীর গো-হত্যা বন্ধের প্রস্তাব। তুর্কী জাতীয় দল কর্ত্তৃক যুদ্ধ স্থগিতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত। সরকারী চণ্ডনীতিতে পঞ্জাব হাইকোর্টের ৫১ জন ব্যবহারাজীবের আপত্তি প্রকাশ। দার্জ্জিলিঙ্গে স্বামী বিশ্বানন্দ গ্রেপ্তার, জামীন দিতে অসমর্থ হওয়ায় [?] হাজত ; ভবঘুরে-গিরির অভিযোগ ; কার্য্যবিধির ৫৫ ধারা। সিরিয়ায় ফরাসী সেনা ও বিদ্রোহীদের তুমুল যুদ্ধ। মেদিনীপুরের সদং ও দশগ্রাম ইউনিয়নে পিউনিটিভ পুলিস বসাইবার আদেশ।

৮ই বৈশাখ—

ভারতের বয়কট আন্দোলনের জন্য ল্যাঙ্কাশায়ারের চারিটি বড় বস্ত্র-ব্যবসায়ী কোম্পানী দেউলিয়া। অ্যালিডে পার্কের সভায় নিখিল ভারত নেতাদের বক্তৃতা। আমেদাবাদে মৌলানা হসরৎ মোহানীর বিরুদ্ধে ১২১ ও ১২৪এ ধারার অভিযোগ। বর্দ্ধমান বেগুরাগড়ে সন্তোষ বেরা নামক এক ভৃত্য কর্ত্তৃক তাহার মনিব সপরিবারে নিহত, নগদে ও অলঙ্কারে বহু সহস্র টাকা অপহৃত, পুলিস-তদন্তে আসামী গ্রেপ্তার। গাইবাঁধায় টেক্স আদায়ে গুলী।

৯ই বৈশাখ—

"হিন্দুস্থানের" রাজদ্রোহ মামলায় সম্পাদকের অব্যাহতি ; ক্ষমা-প্রার্থনা। তিলক স্বরাজ-ভাণ্ডারে বোম্বায়ের লালজী ক্সিমজী কোম্পানীর শ্রীযুত শেঠ জীবরাম কল্যাণজীর লক্ষ টাকা দান। জেনোয়ায় রুসিয়াকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকার। আফগান মিশনের প্যারিসে উপস্থিতি। ইটালীয়ানদের এসিয়া-মাইনরের যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ ; তুর্কীদিগকে হটাইয়া গ্রীকগণ কর্ত্তৃক উহা অধিকার। ১৪৪ ধারা জারী করিয়া নওগাঁয় মেবার-পতনের অভিনয় বন্ধ। পঞ্জাব রেলপথে তৃষ্ণার্ত্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে জলদানে বাধা ; কংগ্রেসের

কর্ম্মীদের উপর পুলিসের ডাণ্ডা। শ্রীযুত শেঠ যমুনালাল বাজাজের অসহযোগী ব্যবহারাজীব সাহায্য-ভাণ্ডারে আবার লক্ষ টাকা দান।

১০ই বৈশাখ—

নিজাম রাজ্যে সৈন্যদলে অবাধ্যতা, ৩৫০ জন পদচ্যুত।

১১ই বৈশাখ—

অন্ধ্র দেশের অসহযোগী বিধবা ব্রাহ্মণ-মহিলা শ্রীযুক্তা দুব্বারি সুব্বাম্মা গারুর সশ্রম কারাদণ্ডে "মহিলা ভারত সভার" প্রতিবাদ। পঞ্জাব সিরোহী রাজ্যে গুলী, গ্রাম লোকশূন্য। সামরিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে আইরিশ লেবার দলের নির্দ্দেশ অনুসারে আলষ্টার ব্যতীত আয়ারলণ্ডের আর সর্ব্বত্র হরতাল। গৌহাটীর সহকারী পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ক্যালভার্টের অভিযোগে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা "অসমীয়া"র নামে মানহানির মামলা।

১২ই বৈশাখ—

বিলাত হইতে শ্রীযুত এইচ, এস, এল পোলকের প্রত্যাবর্ত্তন। সার্জ্জেণ্ট মানহানি মামলায় শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবীর সাক্ষ্য ও জেরা। সিচেলিস দ্বীপে নির্ব্বাসিত জগলুল পাশার স্বাস্থ্য-হানির জন্য কায়রোর ১৫০ জন ডাক্তারের সম্রাটের নিকট নিবেদন। ইটালি হাঙ্গামার সম্পর্কে ২ জন ফিরিঙ্গী সিভিল গার্ড, ২ জন ভূতপূর্ব্ব সার্জ্জেনের বিরুদ্ধে মামলা। ভাওয়াল মানহানি মামলায় সন্ন্যাসীর পক্ষপাতীর দণ্ড। "সৎ শ্রী আকাল" শব্দে লায়ালপুরে জনতার উপর লাঠী; ২০ জনের অধিক আহত।

১৩ই বৈশাখ—

সার্জ্জেণ্ট মানহানি মামলায় শ্রীযুক্তা হেমনলিনী ঘোষের [যাহার আহত হওয়ার সম্পর্কে এই মামলার উৎপত্তি] সাক্ষ্য ও জেরা। মৌলানা হসরৎ মোহানী দায়রা-সোপর্দ্দ; মৌলানাজী ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নে নিরুত্তর। কক্সবাজারে ভীষণ ঝড়। প্রেসিডেন্সী জেলে বিদ্রোহ; কারখানা ও গুদামগুলিতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড; ওয়ার্ডারদের গুলীবর্ষণ; অনেক কয়েদী হতাহত, কয়েকজনের জেলের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া পলায়ন; ওয়ার্ডারদেরও অনেকে কয়েদীদের আক্রমণে জখম। বিলাসপুরের কাজী ও স্থানীয় উসলাপুরের মালগুজার কাজী মহবুব বেগের গন্ধী টুপী স্থানীয় পুলিসের জেলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্মামকিন্স কর্ত্তৃক পদদলিত ও দগ্ধ করার অভিযোগ। মোপলা ট্রেণ দুর্ঘটনায় নিহত ৭০ জনের পরিবারবর্গের জন্য তিন শত টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ। জেনোয়ায় পাঁচ জন রুস গ্রেপ্তার।

১৪ই বৈশাখ—

শ্রীহট্ট গোলাপগঞ্জ থানার পুলিস জুলুম সম্বন্ধে বে-সরকারী তদন্ত-কমিটীর প্রমাণ-প্রয়োগ। উড়িষ্যার কণিকা রাজ্যে প্রজার প্রতি অনাচার; গুলীবর্ষণে অনেকে হতাহত। লক্ষ্ণৌয়ে মডারেট মজলিসে মহাত্মার প্রশংসা। স্বামী বিশ্বানন্দের অব্যাহতি; দার্জ্জিলিঙ্গ পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতি। কয়জন স্বেচ্ছাসেবকের বিচার উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলার বাহিরে জমায়েৎ লোকজন জয়ধ্বনি করায় হাকিম নিজে যাইয়া জনতাকে প্রহার করেন; এক জন কনষ্টেবল আদিষ্ট হইলেও এই কার্য্যে সাহায্য করে নাই, জনৈক সহকারী পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৫ই বৈশাখ—

শ্রীহট্ট, পাথরকাঁদী থানায় পুলিসের সংখ্যাবৃদ্ধি; খরচ অনাচারী [?] গ্রামবাসীর। আমেদাবাদের পূর্ব্বতন অসহযোগী মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯ জন সদস্যের বিরুদ্ধে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার দাবীতে নালিশ। পঞ্জাব মেল-দুর্ঘটনা সম্পর্কে হাবড়ায় এক জন ফায়ারম্যান গ্রেপ্তার। বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটী।

১৬ই বৈশাখ—

অসহযোগী নাদিয়াদ মিউনিসিপ্যালিটীর দশ জন সদস্যের বিরুদ্ধে ১৫ হাজার টাকার দাবীতে দেওয়ানী মামলা। রঙ্গার জেলে ডাঃ মামুদের নির্জ্জন কারাবাস। নূতন জামিন না দেওয়ায় শিলচরের ডেপুটী কমিশনারের আদেশে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্র "সুরমা"র অফিস ও মুদ্রাযন্ত্র তালা-চাবিবন্ধ। চীনে ঘরোয়া যুদ্ধ; পিকিনের ১২ মাইলের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ। সিংহলে "ইয়াং লঙ্কা লীগের" প্রস্তাব অনুসারে নিষ্ক্রিয় প্রতিকূলতা অবলম্বনে সিংহলী যুবকদের টেক্স প্রদানে অসম্মতি। প্রেসিডেন্সী জেল হাঙ্গামার সরকারী বিবরণ,—তৎক্ষণাৎ ৫ জনের মৃত্যু, পরে দুই জন আহতের প্রাণত্যাগ; ৪৬ জন বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়া হাঁসপাতালে; ওয়ার্ডারদের মধ্যে ৫ জনের আঘাত গুরুতর, তাহারা হাঁসপাতালে; আরও ২০ জন অল্প-স্বল্প আহত হইয়াছে এবং জেলার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও সামান্য আঘাত পাইয়াছেন। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা। ১৯ জন কয়েদী পলাইয়া গিয়াছে। জেনোয়ায় রুষিয়ার চরম পত্র; ঋণ না দিলে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ভয়প্রদর্শন। সাবিত্রী দেবীর কারামুক্তি।

১৭ই বৈশাখ—

কলিকাতায় নারী-শিক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক হিন্দু বিধবাশ্রম—বাণী-ভবনের প্রতিষ্ঠা। পিকিনে সামরিক আইন জারী। জেনোয়ার কাণ্ডে য়ুরোপে আবার যুদ্ধের আশঙ্কা। নাগপুর প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাব-কমিটী নিখিল ভারত কংগ্রেসের বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন স্থির করায় স্থানীয় জনসাধারণ ও নেতৃমণ্ডলী কর্ত্তৃক তাহার প্রতিবাদ এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের নূতন সদস্য-মণ্ডলী মনোনয়নের দাবী।

১৮ই বৈশাখ—

যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেসে আইন অমান্য প্রস্তাব। বোম্বায়ের এক শত মুসলমান নেতার ইস্তাহার—খদ্দর ও বয়কট সকল সমস্যার সমাধান করিবে। আয়ারল্যাণ্ডে নানা ব্যাঙ্ক আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহী দল কর্ত্তৃক প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দখল ও তাহা গ্রহণ করিয়া রসিদ প্রদান। মিত্রশক্তির প্রস্তাবে তুর্কী [কনষ্টাণ্টিনোপল] কর্ত্তৃপক্ষের স্পষ্ট জবাব; গ্রীকদের সরাইয়া লইবার, ধর্ম্মব্যাপারে খলিফার এবং বৈষয়িক ব্যাপারে তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষের স্বাধীনতার দাবী ও গ্রীসকে ক্ষতিপূরণপ্রদানে অসম্মতি।

১৯শে বৈশাখ—

আনাটোলিয়াতে শুক্রবারে কায-কারবার, দোকান প্রভৃতি আইনানুসারে বন্ধ। পঞ্জাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন প্রস্তাব। এলাহাবাদে মোটর-ডাকাতি; ৩ জন পুরুষ ও এক জন স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার। জেনোয়ায় সুবাতাস। স্মার্ণায় থাকিবার একান্ত ইচ্ছায় গ্রীকসৈন্যদলে বিদ্রোহ। বার্লিনে ৩০ জন আফগান ছাত্রের উপস্থিতি।

২০শে বৈশাখ—

আলিপুর জেলে দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় প্রভৃতি অসহযোগী বন্দী নেতাদের অসুবিধা। গুজরাট কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুন্নত সমাজের শিক্ষার জন্য ৯০০০ টাকা মঞ্জুর। দায়রায় মৌলানা হসরৎ মোহানীর বিচার শেষ; জুরীর রায়—মৌলানাজী নির্দ্দোষ।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী বৈদ্যুতিক-মুদ্রণ যন্ত্রে' শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

। 'শিল্পী'—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

ত্রস্তা।
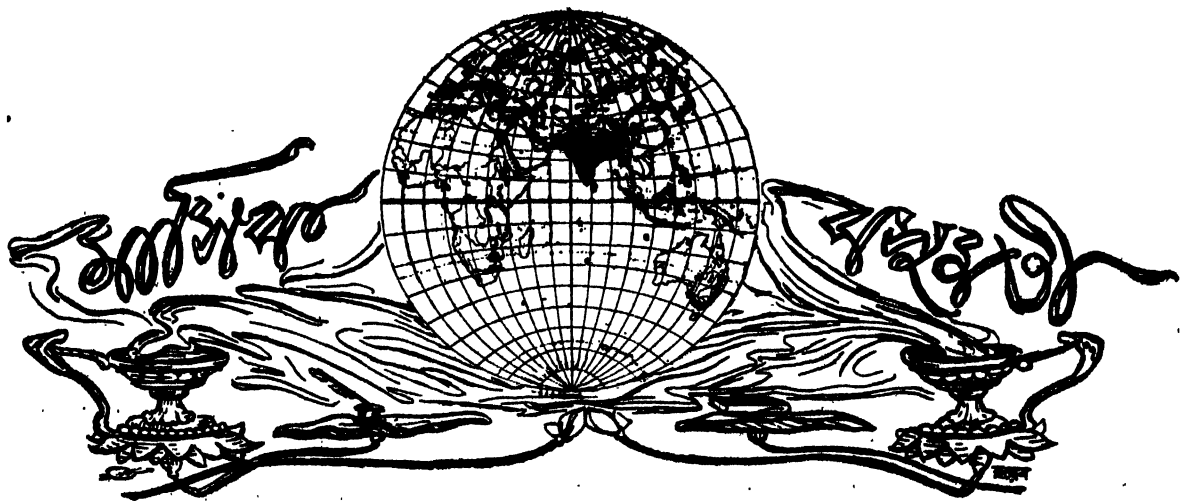
১ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ { ২য় সংখ্যা

নাট্যকলা।

ভারতচন্দ্রে পড়িয়াছিলাম :—

"চন্দ্র সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥"

আমাদের দেশে চৌষট্টিটা কলা ছিল, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। কলা বলিতে বুঝায় সূক্ষ্মশিল্প—কারিগরী—বাহাদুরী দেখান। লোকে চৌষট্টি উপায়ে আপনার বাহাদুরী দেখাইয়া দেশের লোককে খুসী করিতে পারিত—এ বড় সোজা কথা নয়। চৌষট্টি কলা কি, জানিবার জন্য বড় আগ্রহ হইল। নানা যায়গায় চৌষট্টি কলা খুঁজিতে লাগিলাম; অনেক যায়গায় চৌষট্টির ফর্দ্দ মিলিল, কিন্তু একটি ফর্দ্দ আর একটির সঙ্গে মিলে না। শেষে এক জন গ্রন্থকার বলিয়া দিলেন, চৌষট্টি ত মূল কলা মাত্র, ঐরূপ আট সেট চৌষট্টি কলা আছে। মনে মনে বুঝিলাম, ৫১২টি কলা সবশুদ্ধ আছে। আরও খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, টীকাকার আরও ছয়টি ফাউ দিয়া কলার নম্বর করিয়াছেন, ৫১৮টি। প্রথম চৌষট্টি শুনিয়াই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। যখন পড়িয়া দেখিলাম, ৫১৮ রকম কলা আছে, তখন যে কত আশ্চর্য্য হইলাম, বলিতে পারি না। আর যে দেশে ৫১৮টি কলা থাকিতে পারে, সে দেশের লোকের যে কতটা স্ফূর্ত্তি ছিল, তাহাও পরিমাণ করা যায় না।

কারণ, কলার চর্চ্চা কখন হয়? মানুষ জন্মিয়া অবধি চারিটি জিনিষ শিখে, আপনা আপনি শিখে, গুরুমহাশয়ের তাড়না না খাইয়াই শিখে, স্কুলে না যাইয়াই শিখে। সে চারিটি জিনিষের প্রথম হইতেছে আত্মরক্ষা। কিসে বাহিরের কেহ আমাকে মারিতে ধরিতে বা বধ না করিতে পারে, এটা ছেলেরাও আপনা আপনি শিখে। তাহার পর উদরের চিন্তা। কেমন করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবে—ইহার জন্য স্কুল-মাষ্টারের বড় একটা দরকার হয় না। তাহার পর দল বাঁধিয়া সমাজ বাঁধিয়া থাকা। মানুষ একা থাকিতে পারে না। পাঁচ জনের সঙ্গে বসা দাঁড়ান তার চাই; নহিলে সে হাঁপাইয়া উঠে। তাহার পর বংশরক্ষা,—ন্যায়রক্ষা, গোত্ররক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা। এই সবগুলি হইয়া গেলে তাহার পর ত স্ফূর্ত্তি, তাহার পর ত আনন্দ। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে তফাতে থাকিয়া, কিছুক্ষণ তন্ময় হইয়া, আর সব ভুলিয়া তবে ত আনন্দ। সেই আনন্দের জন্য কলা। আগে যে চারিটির কথা বলিলাম, সে ত সব প্রাণীই যেমন করে, মানুষও তেমনই করে—অসভ্য জঙ্গলীরাও করে, সভ্য নগরবাসীরাও করে। তবে নগরবাসীদের বিশেষ এই যে, তাহারা কলাবিদ্যায় প্রবীণ হয়, কেহ বা আপনাদের বাহাদুরী দেখাইয়া আমোদ করে, কেহ বা পরের বাহাদুরী দেখিয়া আমোদ করে। মানুষের মধ্যে জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম্ম যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহারা কলার সঙ্গে সঙ্গে এক এক ডোজ

উপদেশ দিতে আরম্ভ করে। যে কলায় না থাকে, সে যদি উপদেশ দিতে যায়, ধরা পড়িয়া যায়। আর ধরা পড়িলে কলারও আমোদ হয় না, উপদেশেও কোন কাজ হয় না। কিন্তু কলায় থাকিলে, যখন কাহারও লোককে তন্ময় করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন একটু আধটু মৃদু মন্দ উপদেশ দিলে তাহাতে বড়ই বেশী কাজ হয়। লোকে মনে করে, আমরা আমোদ করিতেছি, আনন্দে ভোর হইয়া আছি, অথচ ভিতরে ভিতরে তাহাদের মন ফিরিয়া যায়; শরীরে যে সব দোষ থাকে, সে সব আস্তে আস্তে সরিয়া যায়। মনটি নরম করিবার ক্ষমতা যাহাদের হাতে থাকে,তাহারা সে মনকে যেরূপে ইচ্ছা, সেইরূপে ফিরাইতে পারে। কুমোর আগে মাটী নরম করিয়া লয়,তাহার পর সে মাটীতে হাঁড়ি গড়ে,কলসী গড়ে,মালসা গড়ে, আবার দরকার হইলে দুর্গা গড়ে, কালীও গড়ে, কৃষ্ণ গড়ে,রাম গড়ে, আরও কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ গড়ে। কিন্তু মাটীটা প্রথম ছানা চাই, নহিলে কিছুই হয় না। মাটী শক্ত থাকিলে বা মাটীর ভিতর কাঁকর বা খোলা থাকিলে তাহা দিয়া কিছুই গড়া যায় না।

যাহারা কলাবিৎ বা কলাবৎ, তাহারা মন নরম করে। কিন্তু কি দিয়া নরম করে? মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, ইহার একটি না একটি অবলম্বন করিয়া মনের ভিতর প্রবেশ করে। কেহ বা চক্ষু আশ্রয় করে, কেহ বা কর্ণ আশ্রয় করে, কেহ বা জিহ্বা আশ্রয় করে, কেহ বা নাসিকা আশ্রয় করে, কেহ বা ত্বক্ আশ্রয় করে। যাঁহারা ছবি আঁকেন, তাঁহারা চক্ষুকে আশ্রয় করেন, আগে চক্ষুকে তন্ময় করিয়া মনের মধ্যে প্রবেশ করেন, মনকেও তন্ময় করিয়া আত্মাকে পরম সুখে নিমজ্জিত করেন। যাঁহারা গান করেন, তাঁহারা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশেন ও প্রাণ আকুল করিয়া দেন। যাঁহারা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় তৈয়ারী করেন, তাঁহারা জিহ্বাকে আশ্রয় করিয়া, মনকে তন্ময় করিয়া আত্মার তৃপ্তি করেন। যাঁহারা "গন্ধযুক্তি" বা পাঁচ রকম গন্ধ এক করিয়া নাসিকা-যোগে মনোহরণ করেন, তাঁহাদের কলাও বড় সামান্য নয়। যাঁহারা ফুলশয্যা করেন, "সংবাহন" বা গা-হাত টিপেন, তাঁহারা ত্বককে আশ্রয় করিয়া মনকে অভিভূত করেন, তাঁহাদের বিদ্যাও বড় সামান্য বিদ্যা নয়। ঐরূপে চৌষট্টি বল বা পাঁচশ আঠারই বল, কলাগুলি একটি না একটি ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া মন কোমল করে ও আত্মার তর্পণ করে।

এই সকল কলার মধ্যে নাট্যকলাটি একটি প্রধান কলা। ইহা চক্ষু ও কর্ণ এই দুইটি ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিতে পারে। সুতরাং ইহা মনকে অধিক পরিমাণে তন্ময় করিতে পারে এবং আত্মাকেও পরমসুখের আস্বাদ দিতে পারে। তাই যে সব দেশে নাটক আছে, থিয়েটার আছে, সে সব দেশেই, সকল কলার মধ্যে নাটকেরই আদর বেশী। কিন্তু পৃথিবীতে এমন যায়গা অনেক আছে, যাহারা নাটকের মর্ম্ম বুঝিতেই পারে না। তাহারা থিয়েটারের চেয়ে ষাঁড়ের লড়াই, কুঁকুড়ার লড়াই দেখিতে ভালবাসে। তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও।

অনেক সভ্য দেশেই নাটক আছে, আমাদের দেশেও ছিল,—বোধ হয়, সকলের আগেই ছিল। কারণ, আমাদের দেশে একটা শাস্ত্র আছে, তাহার নাম নাট্যশাস্ত্র। তাহা আর কোন দেশেই নাই। নাট্যশাস্ত্রেরও আগে আর একটা জিনিষ ছিল, তাহার নাম নাট্যসূত্র। আমাদের ভারতের সে কালের দস্তর এই যে, আগে সূত্র হয়, তার পর শাস্ত্র হয়। পাণিনি দুখানা নট-সূত্রের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তাহার আগেও নট ছিল, নাটক ছিল এবং নাটকের সূত্র ছিল। অনেক নাটক না হইলে তার জন্য সূত্র লেখা দরকার হয় না। সুতরাং সূত্রগুলা হবার পূর্ব্বেই দেশে অনেক নাটক হইয়াছিল এবং অনেক নটও হইয়াছিল। কত পূর্ব্বে জানি না, কিন্তু অনেক আগে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, নাট্যশাস্ত্রে লেখে, দেবতারা যখন অসুরদের হারাইয়া দিলেন, তখন একটু স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য তাঁহারা ধ্বজা গাড়িলেন। তার নাম ইন্দ্রধ্বজ। আর সেই ধ্বজার তলায় বসিয়া কেমন করিয়া অসুরদের হারাইয়াছিলেন, তাহাই দেখাইলেন। এক দল দেবতা সাজিলেন,এক দল অসুর সাজিলেন; কেমন যুদ্ধ হইয়াছিল,অসুররা কেমন হার হারিয়াছিল—সেই সব দেখাইলেন। অসুররা ভারী চটিয়া গেল। তাহারা বলিল, "আমরা হেরেছি, তাই ব'লে আমাদের ভেঙচান কেন? মার দেবতাদের।" তারা দেবতাদের নাটক ভেঙ্গে দিতে এল। ইন্দ্রের হাতে ছিল একটা বাঁশ; তাতে ছিল সাতটা ফাঁপ। তিনি তাদের এমন ঠেঙালেন যে, উপরের ফাঁপটা থেঁতলে গেল। অসুররা পলাইল। ইন্দ্র বলিলেন, "এই যে এক ফাঁপ থেঁতলান বাঁশ, এইটাই নাটকের দেবতা হ'ল।" তার পর দেবতারা ব্রহ্মাকে ডেকে নাটক দেখালেন, বিষ্ণুকে ডেকে সমুদ্রমন্থন নাটক দেখালেন, আর শিবকে ডেকে ত্রিপুরদাহ নাটক দেখালেন।

সব দেবতারা খুসী হয়ে যার যা ভাল জিনিষটি ছিল, সব দেবতা-দের দিয়া দিলেন। কেবল মহাদেব বলিলেন—"তোমাদের সব জিনিষই বেশ হয়েছে, তোমাদের একটা জিনিষ নাই। সেটা হচ্ছে নাচ। আমি আমার ওস্তাদ তণ্ডুমুনিকে ডেকে দিই, তোমরা তাঁর কাছে নাচ শিখ।" সেই অবধি নাটকে নাচ এল। এই ত আমাদের নাটক উৎপত্তির গল্প।

ইহার মানে বড় গভীর। দেব-অসুরের যুদ্ধ মানে বর্ষা ও শরতের যুদ্ধ, শীত ও বসন্তের যুদ্ধ। অনেক দেশে আবার শীত ও বর্ষা একই সময়ে হয়। তাই যখন বর্ষা গিয়ে শরৎ আসে, লোকে তখন খুব আমোদ করে। বন হ'তে একটা বড় গাছ কেটে নিয়ে আসে, সেটা গাঁয়ের মাঝখানে পুতে সেটাকে নানা রকমে সাজায়, এবং তার তলায় ব'সে ছেলে বুড়ো সব নাচে গায়, খুব আমোদ করে। যে সব দেশে বর্ষা বা শীতের প্রকোপ খুব বেশী, সে সব দেশেই এ উৎসবটা হয়ে থাকে। আগে খুব জমাট রকম হ'ত, এখন সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেটা কমে গিয়ে কেবল সাধারণ লোকের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশে ইন্দ্রের ধ্বজা শরৎকালের প্রথমেই সব যায়গায় উঠিত। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ইন্দ্রের পূজা ও ইন্দ্রের ধ্বজা বন্ধ করিয়া দেন। নেপালে এখনও ইন্দ্রযাত্রা হয়, ধ্বজা গড়া হয় না, কিন্তু ইন্দ্র একটা হাত খুব উচ্চ করিয়া রাখেন। মহীশূরে শুনিয়াছি, এখনও ইন্দ্রের ধ্বজা গড়া হয়।

তাই বলিতেছিলাম, যখন ইন্দ্রধ্বজার সঙ্গে নাটকের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তখন নাটক আমাদের দেশে খুবই পুরাণ। আমরা অন্য জাতির কাছ থেকে ইহা পাইয়াছি,এ কথা একে-বারেই সত্য নয়। সংসারে যত কিছু জিনিষের দরকার হয়, নাটকে সে সব দরকার হয়। শাস্ত্রকার এ কথা অনেককাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন। সুতরাং আমাদের নাটক যেটা, তা সত্য সত্যই নাটক ছিল—একটা ছোটখাট সংসার ছিল। ছোটখাট হইলেও সংসারের সব জিনিষই তাহাতে আছে। তাই দেবতারা যার যা ভাল জিনিষ ছিল, সব নটেদের দিয়া দিয়াছিলেন। আরও একটা কথা। এ সব ত বাহিরের জিনিষ—হাঁড়ি, কলসী, কুলা, ধুচুনি, খাটপাট—ভিতরের জিনিষের কথাও বলি। আমাদের বিশ্বাস, এখনকার অলঙ্কারে বলে, ৯টা বই রস নাই। ৯টা বই স্থায়ী ভাব নাই, ৩৩টা বই ব্যভিচারী ভাব নাই, ৮টি বই সাত্ত্বিক ভাব নাই। কিন্তু সে কালের শাস্ত্রকারেরা বলিতেন—ভাব অনন্ত। কত ভাব যে আছে, তার সংখ্যাও নাই, সীমাও নাই। সেইটাই সত্য কথা। তবে ৫০টা ব'লে এত আঁটাআঁটি কেন? ছেলেদের বুঝাবার জন্য, স্কুল-বইএর জন্য। আমাদের ইদানীংকার বইগুলি সবই পঠন-পাঠনের জন্য হইয়াছে—কেমন করিয়া ৯টা রস হইল, কেমন করিয়া ৯টা স্থায়ী ভাব হইল, সে কথা তাঁহারা একেবারেই বলিলেন না। কিন্তু পুরাণ বই পড়িলে সে ইতিহাস কিছু কিছু পাওয়া যায়, এবং পেলে বুঝা যায় যে, দু তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের মুনিরা নাটককে কত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। মনের যত রকম ভাব আছে, সবই নাটকে থাকিবে। সংসারে যত রকম জিনিষ আছে, সবই নাটকে থাকিবে। সুতরাং আমাদের নাটক একরূপ বিশ্বব্যাপী হইয়াছিল। যত দিন যাইতে লাগিল, নাটককে বরং ছাঁটিয়া কাটিয়া ছোট করা হইতে লাগিল, মাজিয়া ঘসিয়া বরং পরিষ্কার করা হইতে লাগিল, কিন্তু উহার বিস্তার কমিতে লাগিল। অলঙ্কারের মতে ত অনেক জিনিষ নাটকে তুলিতেই নাই—খাওয়া, ঘুমান, যুদ্ধ, মারামারি, মৃত্যু, এমন কি, চুমা খাওয়া পর্য্যন্ত নাটকে দেখাইতে নাই। লোক যত সভ্য হইতে লাগিল, কাটা-ছাঁটা তত বাড়িতে লাগিল। তা বাড়ুক—কিন্তু কাটা-ছাঁটা বাদে নাটক পূর্ব্বেও যেমন বিশ্বব্যাপী ছিল, এখনও সেই প্রকারই আছে।

এই যে বিশ্বব্যাপী নাটক, এ কখনও বন্ধ হয় নাই। থিয়েটার আমাদের দেশে যে কখনও বন্ধ হইয়াছিল, তা ব'লে ত বোধ হয় না। নট ব'লে এক জাতি বরাবরই ছিল, তারা নাটক করিত ও লিখিত। খুব সে কালে নাটক দশ রকম বই ছিল না। কিন্তু ভারতের যখন বড়ই দুর্দ্দিন, তখনই আমরা নাটিকা নামে একটা জিনিষ পাই; সে আবার আঠারো রকম। সব রকমের বই পাওয়া যায় না। কিন্তু যতই খোঁজ হইতেছে, ততই বেশী বেশী রকমের নাটক পাওয়া যাইতেছে। ভরসা আছে, ভালরূপ খুঁজিতে পারিলে, আটাইশ রকমের নাটকই পাওয়া যাইতে পারে।

প্রথম প্রথম ইন্দ্রধ্বজার তলায় ত নাটকই হইত,তার পর খোলা যায়গায় হইত, তার পর দেবতাদের মন্দিরের সামনে নাটমন্দির হইতে লাগিল—নাটমন্দিরের মাপ ১০৮ হাত। কেন ১০৮ হাত হ'ল, এর চেয়ে বড় হইল না? এর চেয়ে বড় হ'লে শুনাও যায় না, দেখাও যায় না। এই ১০৮ হাতেই শুনার পক্ষে বিষম ব্যাঘাত হইত। তাই নিয়ম হইয়াছিল,

দেবমন্দিরের সাম্‌নে নাটমন্দির বিকৃষ্ট হইবে অর্থাৎ ডিম্বাকার হইবে। ডিম্বাকার হইলে শব্দটা গমগম করে না, সব যায়গা থেকেই শুনা যায়। রাজার বাড়ীর নাট্যশালা ৬৪ হাত লম্বা, ৩২ হাত চেটাল হইবে। আর সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ীর নাট্যাগার ত্রিভুজ হইবে। প্রত্যেক ভুজের মাপ ৩২ হাত।

কিন্তু যখন পরহস্তগত হইয়া ভারতবর্ষ দরিদ্র হইয়া গেল, তখন আর পয়সা খরচ করিয়া এত বড় থিয়েটার-ঘর করা সহজ হইল না। সুতরাং খোলা যায়গায় আবার নাটক হইতে লাগিল। নাটক করার প্রবৃত্তি ত ঘুচে না। চৈতন্যের সময় শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাটক হইত। কিন্তু সে নাটক বিশ্বব্যাপী নয়. সেখানে কেবল নারায়ণের কথা লইয়াই নাটক হইত। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় একটা প্রকাণ্ড কুঁদ-ফুলের ঝাড় ছিল। বৈষ্ণবরা সকলে সাজিহাতে সেইখানে ফুল তুলিতে আসিত। নাচিয়া নাচিয়া গাহিয়া গাহিয়া ফুল তুলা হইত, সাজিতে ফুল রাখা হইত আর কৃষ্ণলীলার অভিনয় হইত। চৈতন্যদেব ভগবানের কাজ করিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে যাহার যে কাজ ভাল লাগিত, সে সেই কাজ করিত। কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতে করিতে তাঁহারা এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সময়ে সময়ে সপ্তপ্রহরী অষ্টপ্রহরী অভিনয় হইত। চৈতন্যদেব এমন আত্মহারা হইয়া যাইতেন যে, প্রহরের পর প্রহর চলিয়া যাইত, তবুও তিনি বুঝিতে পারিতেন না যে, তিনি মানুষ, তিনি শচীনন্দন, তিনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তিনি নারায়ণের যে অবতার সাজিতেন, মনে করিতেন, তিনি ঠিক সেই অবতার এবং সেই ভাবেই লীলা করিতেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা যাহা বলিলাম, সবই সংস্কৃত নাটকের কথা। চৈতন্যদেব তন্ময় অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার দলের যে সব নাটক আছে, সবই সংস্কৃতে লেখা। দক্ষিণদেশে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এখনও ভাসের নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। পুরীতে জগন্নাথ-মন্দিরে এখনও গীতগোবিন্দের অভিনয় হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রমে সংস্কৃত আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ভাষা নাটক আরম্ভ হইল।

বাঙ্গালা নাটক যে কবে আরম্ভ হইল, এখনও তাহার খোঁজ হয় নাই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, বাঙ্গালায় খোলা যায়গায় কতকটা যাত্রার মতন, কতকটা থিয়েটারের মতন একটা কিছু হ'ত। তাহার প্রমাণ এই যে, কতকগুলি বাঙ্গালী পণ্ডিত ২০০ বৎসর আগে নেপালে গিয়া ভূপতি মল্ল ও রাজিত মল্লের দরবারে খুব পসার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে নাটক করিতেন। অনেকে মুনি-ঋষি, সেকালের রাজা-রাজড়া, রাম, লক্ষ্মণ. ভরত,শত্রুঘ্ন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সাজিয়া আসিত,পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিত এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইত। তাই মনে হয়, তখন বাঙ্গালায়ও এইরূপই নাটক ছিল, বাঙ্গালীরা তাই নেপালে গিয়া চালাইলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশেও ভাষায় নাটক লেখা হইত। সাহজাহানের সময় এক জন জৈন সময়সার নামে একখানি নাটক হিন্দীতে লিখিয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ক্ষণিক বিকাশ।

চকিতে চপলা ঝলকিয়া গেল
উজলি' হৃদয় মোর;
চমকি' পরাণ চাহিয়া দেখিল—
নিবিড় আঁধার ঘোর!

ক্ষণিক বিকাশে বাড়ায়ে আঁধার
পশিল মরমে মোর।
কেন বা আসিল, কেন বা সে গেল—
কোথায় লুকাল চোর?

শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরী

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

[২]

জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আপনাদিগকে কোনও নূতন কথা শুনাইতেছি না। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর এই গোড়ায় গলদের কথা, শুধু আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কেন, বিদেশীয় মনস্বী স্যর জর্জ্জ বার্ডউড্, স্যর জন্ উড্‌রফ্ প্রভৃতি অনেকে অনেকবার বলিয়াছেন। আমি সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি; তবে শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল অনবরত বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনা করিয়া কর্ম্মজীবনের ব্যর্থতা-অনুভবে একটা আত্মধিক্কার জন্মিয়াছে, সেই কারণে আমার মন্তব্যগুলিতে, বোধ হয়, একটু অতিরিক্ত মাত্রায় তীব্রতা ও তিক্ততা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা আপনারা মার্জ্জনা করিবেন। যে সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে সময়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল। অর্থকরী বিদ্যা বলিয়াও বটে, রাজার জাতির জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধার জন্যও বটে, এবং জ্ঞানতৃষ্ণানিবারণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাবশতঃও বটে, দেশের লোকের এদিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইয়াছিল। ইহার ফলে আমরা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে পাইয়াছি। (যাঁহারা খাস বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামের এখানে উল্লেখ করিলাম না।) সুতরাং এই শিক্ষা যে একেবারে নিষ্ফল (failure) হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইঁহারা যে জাতির বংশধর, জ্ঞানচর্চ্চা সেই জাতির মজ্জাগত ছিল বলিয়াই এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য সুফল ফলিয়াছে। ইহা উর্ব্বর ক্ষেত্রের গুণে, বীজের গুণে নহে; মাটীর গুণে, আঁঠির গুণে নহে। 'চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ। ন শালেঃ স্তম্বকারিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে।'

যাহা হউক, এক্ষণে এই বিদেশীয় শিক্ষাদীক্ষার স্থানে দেশীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশময় একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু উন্নতি করিয়াছে, বিস্তর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে; সে সমস্ত এখন আর তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, সমস্ত জগতের সম্পত্তি। তাহা আত্মসাৎ করিবার শক্তি ও অধিকার সকল জাতির আছে। সুতরাং আমাদিগকেও সে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, নতুবা শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কিন্তু প্রথম হইতেই সেদিকে ঝুঁকিলে চলিবে না। আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত জ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে, জাতীয় শিক্ষার দ্বারা আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্‌বোধিত করিতে হইবে, আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, তাহা শিক্ষার্থীদিগকে জানাইতে হইবে, আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি উজ্জীবিত করিতে হইবে, আমাদের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হইবে, মনীষী রামেন্দ্রসুন্দরের কথায় 'মা'কে চিনিতে হইবে,' তাহার পর সেই বনিয়াদের উপর বিদেশীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া শিক্ষাসৌধের উচ্চতা ও পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞানের জাতিবিচার করিতে নাই। যে জাতির, যে দেশের কাছ হইতেই আসুক না কেন, জ্ঞানমাত্রই অর্জ্জনের, শ্রদ্ধার সহিত বরণের যোগ্য। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যবন অর্থাৎ গ্রীক্ প্রভৃতি জাতির নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই। সঙ্কীর্ণতা জ্ঞানলাভের পথে অন্তরায়। কথাটা খুব উদার, খুব সমদর্শিতাপূর্ণ, খুব শ্রুতি-সুখদ। কিন্তু উদারচিত্তে বিশ্বভারতী কর্ণগোচর ও হৃদ্‌গত করিবার পূর্ব্বে ভারতের নিজস্ব ভারতী কর্ণগোচর ও হৃদ্‌গত করা প্রয়োজন। 'আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন ক'রে তুল্‌তে হ'বে,' আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবির এই 'অন্তরের কামনা'য় আমরাও সায় দিই। কিন্তু তাঁহারই কথায় বলি, 'পরস্পরের স্বক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাক্‌লে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়।' আমরা যে নিজের জাতির বিশিষ্টতা হারাইয়া ভিন্ন জাতির শিক্ষাদীক্ষার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি, ইহা কি অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও অশোভন নহে? আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু স্যর জন্ উড্‌রফের

ভাষায় বলিব,—"To assimilate, one must first be a strong free personality...When the Indian Spirit has regained culturial freedom, by study and appreciation of its own inherited ancient and grand culture, and by the casting away of all unassimilated foreign borrowings, it may go where it will" অথবা বিদেশীর দোহাই-ই বা দিব কেন? আমাদের চিত্তরঞ্জনও বলিয়াছেন—'পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।...বৈদেশিক শিক্ষাদীক্ষার নিকট ভারতীয় সভ্যতার পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—ইহা রাজনীতিক অধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ভারতকে ইহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে।'

বড় আশার কথা, চিত্তরঞ্জনের এই মহতী বাণী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের কর্ণে পশিয়াছে। এই সে দিন কনভোকেশান-উপলক্ষে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—"India was, and is civilised. Western civilisation, however valuable as a factor in the progress of mankind, should not supersede, much less be permitted to destory, the vital elements of our civilisation" বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের (ঢাকায়) একাদশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস-লেখক খ্যাতনামা ভিন্‌সেন্ট স্মিথের কথা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—"Some day perhaps, the man in power will arise, who is not hidebound by the University traditions of his youth, who will perceive that an Indian University deserving of the name must devote itself to the development of Indian thought and learning, and who will care enough for true higher education to establish a real University in India." আমাদের দেশে এরূপ শক্তিধর পুরুষ স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেহ নাই। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গোড়ায় গলদ বুঝিয়াছেন, তখন কি আশা করিতে পারি না যে, তিনি ইহার আমূল সংস্কার করিয়া প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবেন? তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, মনে করিলে হেলায় এ কার্য্যসাধন করিতে পারেন। জানি না, কবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে; আমরা প্রথম জীবনে বিদেশী ধাত্রীর স্তন্যপানে সংবর্দ্ধিত হইয়াও প্রৌঢ়াবস্থায় প্রকৃত জননীর দর্শন পাইয়া জীবন সার্থক করিব।

দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কারের জন্য বহু অর্থব্যয়ে দুই দুইবার কমিশন বসিল, দ্বিতীয়বারের কমিশনে বিলাত হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করিয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার ফল মোটা মোটা কেতাবে লিপিবদ্ধ করা হইল। কিন্তু এই গোড়ায় গলদ কিছুতেই ঘুচিল না। নানাভাবে কতক কতক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া জাতীয় শিক্ষার কোনও কোনও অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে সন্তুষ্ট থাকা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধ আজও পশ্চিমদ্বারীই আছে, কেবল পূর্ব্বমুখো দুই চারিটা জানালা ফুটান হইয়াছে; সদর দরজা আজও পশ্চিমমুখো। এই সদর দরজাকে জানালায় পরিণত করিয়া পূর্ব্বমুখো সদর দরজা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তবে প্রকৃত গলদ ঘুচিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি যে, নবসংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে নিম্নতম পরীক্ষায় শুধু দুই একটি বিষয়ে ছাত্রবর্গ ইচ্ছা করিলে মাতৃভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, এরূপ অনুমতি যথেষ্ট নহে; এমন কি, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মধ্যপ্রদেশের সঙ্কল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অনুরূপ, নিম্নতম পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া আর সকল বিষয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ মাতৃভাষায় হইবে, এরূপ বিধিও যথেষ্ট নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চ নীচ সকল পরীক্ষায় সকল বিষয়েই (ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের বেলায়ও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইবার সঙ্গত কারণ দেখি না) মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, দেশভাষা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার-কার্য্যের উপযোগী নহে, এই কথাটা মেকলে "সাহেবের" আমলে সত্য ছিল বটে, কিন্তু এই দীর্ঘকাল ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে এ কথাটা আর এখনকার বাঙ্গালাভাষাসম্বন্ধে বলা চলে না। আজকাল ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সমালোচনা, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে

বহু সুলিখিত গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় রচিত হইতেছে। ইহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে উৎসাহ ও সহকারিতা পাইলে যে আরও দ্রুততর উন্নতি হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

যাহা হউক, যত দিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত না হইতেছে,তত দিন জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ। কেন না, আমাদের অতীত গৌরব-সম্বন্ধে নানারূপ তথ্যাবিষ্কার-কার্য্যে পরিষদ্ ব্যাপৃত, এবং এই সকল তথ্যই জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত উপাদান। কথায় বলে, যত মত, তত পথ। জাতীয় মহাসমিতি (Indian National Congress) একভাবে আমাদের জাতীয়তার ভাব উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন, দেশাত্মবোধ জাগরিত করিতেছেন, পরাধীনতাপাশবদ্ধ অবসন্ন হৃদয়ে উন্মাদনা-উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া উজ্জীবিত করিতেছেন; সাহিত্য-পরিষদও অন্যভাবে আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি উন্মেষিত করিয়া, এই কার্য্য করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির পথ অনেক সময়ে কঠোর, বিপৎসঙ্কুল, বিঘ্নবহুল; সাহিত্য-পরিষদের পথ সুগম, সরল ও নিরাপদ। এ পথে কোন প্রবল প্রতিকূল শক্তির সহিত সংঘর্ষ হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা বিদেশীর মুখে ক্রমাগত শুনিয়াছি যে, আমাদের গৌরব করিবার মত কিছুই নাই। সুখের বিষয়, এখন সুর কতকটা ফিরিয়াছে। বিদেশীর মুখে কিছুদিন হইতে এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে, আমাদের গৌরব করিবার মত জিনিষের অভাব নাই। ভারতের জ্ঞান, ভারতের সভ্যতা যে, 'তিব্বতচীনে ব্রহ্মতাতারে,' এমন কি আরও সুদূরে, প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল,ইহা আর এখন প্রাচ্যজাতিসুলভ কল্পনাপ্রসূত কবিকাহিনী নহে, Sylvan Levi প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ এখন এ কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছেন। এজন্য আমরা বিদেশী পণ্ডিতদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু এই সকল তথ্য আবিষ্কার করা আমাদেরই কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদের কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার নাই। এ ক্ষেত্রেও যদি আমরা পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকি, তাহা হইলে বড়ই লজ্জার কথা। যতক্ষণে বিদেশী আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃতিত্বের কথা আমাদিগকে দয়া করিয়া শুনাইবে, ততক্ষণে আমরা তাহা জানিব, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর আত্মাবমাননা আর কি হইতে পারে?

সুখের বিষয়, আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় শিক্ষিত লোক কিছু দিন হইতে আমাদের দেশের প্রাচীন গৌরব পরিজ্ঞাত হইবার জন্য প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে যত্নবান্ হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের এসিয়াটিক্ সোসাইটী ইহার সূত্রপাত করেন, কিন্তু উক্ত সোসাইটীতে বিদেশীর সংখ্যাই খুব বেশী ছিল, আমাদের দেশের ২।১ জন মাত্র এই পথ লইয়াছিলেন। এক্ষণে অবশ্য দেশের লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি হইয়া অবধি এই গবেষণাকার্য্যে দেশের কৃতবিদ্যসম্প্রদায়ের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা হইয়াছে। উত্তর-বঙ্গে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশেও এই শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে। আশা করি, অচিরেই এই ভিত্তির উপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। অতীত গৌরবের উদ্ধার করিয়া জাতীয় ভাবের উদ্‌বোধন করিতে পারিলেই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার আরম্ভ হয়। সাহিত্য-সম্মিলন যখন পঞ্চম বৎসরের শিশু, তখনই তৎকালীন সভাপতি 'বাঙ্গালার বিক্রমাদিত্য,' সাহিত্য ও সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যের উৎসাহদাতা, সাহিত্য-পরিষদের শ্রেষ্ঠ বান্ধব, মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় বলিয়াছিলেন, 'সাহিত্য-সম্মিলন জাতীয় জীবন-স্ফুরণের একমাত্র উপায়। সম্মিলনের সদুদ্দেশ্য এই যে,—সাহিত্যের উন্নতি-সম্বন্ধে আলোচনা ও তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনকল্পে উপায়-নির্দ্ধারণ।' সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই আজ সমবেত বিজ্ঞ সাহিত্য-সেবকগণের সমক্ষে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা-প্রণয়নের জন্য আমার এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার এমন প্রতিপত্তি (authority) নাই যে, তাহার জোরে আমার অনুরোধ রক্ষিত হইবে; তবে আপনাদেরই প্রদত্ত পদের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া বিনীতভাবে এই অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছি। সঙ্গত ও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে আপনারা অবশ্যই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, আমার এই ভরসা।

প্রস্তাব।

আমার প্রস্তাব এই যে, বিদেশী ও স্বদেশী পণ্ডিতবর্গের চেষ্টায় আমাদিগের প্রাচীনকালের যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত ও প্রকটিত হইয়াছে, সেগুলি অধিকাংশ স্থলেই কতকগুলি গবেষণাত্মক গ্রন্থে ও নানা বিদ্বৎসমিতির (Learned Society) প্রকাশিত জর্ণাল প্রভৃতিতে বিক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত আছে, জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে (যথা দর্শন, গণিত, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি) বিশেষজ্ঞ-গণকর্ত্তৃক সেগুলির একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রহ (systematized compilation) প্রস্তুত হউক। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের, তথা বাঙ্গালা দেশের এসিয়াটিক সোসাইটীর দেশীয় সভ্যগণের এবং বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগের বিদ্বদ্‌বর্গের হস্তে এই ভার ন্যস্ত হউক। সংস্কৃত, পালি, তথা আরবী, পারসী, এমন কি, চীনা, তিব্বতীয় প্রভৃতি সাধারণের দুরধিগম্য ভাষায় যে ভারতীয় জ্ঞান সঞ্চিত আছে, সে সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে হইবে। অদূর-ভবিষ্যতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ইহার সম্যক্ প্রয়োজন। তখন বিদ্যার্থিগণ প্রথমে স্বজাতির সঞ্চিত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া জাতীয় শিক্ষার পত্তন করিবে; তাহার পর, আধুনিক পাশ্চাত্যজগতে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি শিক্ষা করিবে ও এইরূপে তাহাদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

উভয় শ্রেণীর পুস্তকই দেশভাষায় লিখিত হইবে। এক্ষণে দেশভাষার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে এ কার্য্য অসম্ভব বা দুরূহ নহে; এবং শিক্ষা ও পরীক্ষাও মাতৃভাষায় হইবে, সে কথা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। সকল শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষা ও সাহিত্য রীতিমত শিক্ষা করিতে হইবে এবং হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত ও পালি ভাষা ও সাহিত্য, মুসলমানের পক্ষে আরবী ও পারসী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য হইবে।

স্বজাতির প্রাচীন গৌরবের আলোচনা করিলেই বিদ্যার্থি-গণ জ্ঞানের চরমসীমায় পৌঁছিবে না। শুধু অতীত আঁকড়াইয়া থাকিলে কোনও জাতি উন্নতিলাভ করিতে পারে না, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। সুতরাং পাশ্চাত্যজগতে যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভূত-পরিমাণে প্রসূত হইয়াছে, তাহা বিদ্যার্থিগণকে অর্জ্জন করিতে হইবে। আবার এই অর্জ্জিত জ্ঞানের ভিত্তির উপর নূতন নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর হইতে হইবে, মৌলিক গবেষণা-দ্বারা জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই উভয়বিধ জ্ঞানের ব্যবহারিক (applied) প্রয়োগে দেশের শিল্প, কলা, বাণিজ্য, কৃষির উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। (আশার কথা, জগদীশচন্দ্রের বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে ইহার সূত্রপাত হই-য়াছে।) তবেই আমরা জগতের মধ্যে একটা শ্রদ্ধেয় জাতি হইতে পারিব।

অবশ্য, যে সকল বিশেষজ্ঞ নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে এখনও অনেক দিন নিজ নিজ আবি-ষ্কৃত তত্ত্ব-সকল বিদেশী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, নতুবা সেগুলি জগতের বিশেষজ্ঞগণের গোচর হইবে না এবং তাহা না হইলে সেগুলির প্রকৃত মূল্য যাচাই করা যাইবে না। এক দিন পাশ্চাত্য-জগতেও বিশেষজ্ঞগণকে এই একই কারণে ল্যাটিন ভাষায় নিজ নিজ আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রচারিত করিতে হইত। সকলেই জানেন, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটন, তাঁহার 'প্রিন্‌সিপিয়া' ল্যাটিন ভাষায় লিখিয়াছিলেন, ইংরেজী ভাষায় নহে। তেমনই এখনও কিছুদিন আমাদিগের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতিকে ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতে পারে. যখন আর তাহার প্রয়োজন হইবে না। যাহা হউক, যতদিন এই নিয়মে চলিতে হইবে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সে সকল তত্ত্বের স্থূলভাবে পরিচয় দিবার জন্য মাতৃভাষায় সেগুলির প্রচারও অবশ্য-কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা দেশের, শুধু বাঙ্গালা দেশের কেন, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞা-নিক জগদীশচন্দ্র তাঁহার 'অব্যক্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া এই পথে অগ্রণী হইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানের বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থার জন্যও তিনি ধন্যবাদভাজন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণও এ বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; সে জন্য তাঁহারাও ধন্য-বাদভাজন। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ সরল ভাষায় বৈজ্ঞা-নিক তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর 'জিজ্ঞাসা,' 'কর্ম্মকথা,' 'যজ্ঞকথা,' 'বিচিত্র জগৎ,' 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' প্রভৃতি উপাদেয় [illegible]

প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রকে অপূর্ব্ব সঞ্জীবতা ও উর্ব্বরতা প্রদান করিয়াছে। মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত University Extension Lectures-এর ধরণের ব্যবস্থা শিক্ষিত সমাজে জ্ঞান-বিতরণের উৎকৃষ্ট উপায়, এই প্রসঙ্গে এ কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী নহেন, অথচ জ্ঞানতৃষ্ণা যাঁহাদিগের বলবতী, তাঁহারা এই উপায়ে প্রৌঢ়াবস্থায়ও নিজেদের যৌবনে অর্জ্জিত বিদ্যার অপূর্ণতার সংশোধন করিতে পারেন।

শুধু যে প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণার নীরস ক্ষেত্রে এই কার্য্য সীমাবদ্ধ, তাহা নহে। যেমন গণিত ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব কার্য্যে লাগাইয়া (Applied অর্থাৎ ব্যবহারিক-রূপে) জগতের বহু উপকার সাধিত হয়, সেইরূপ গবেষণালব্ধ তত্ত্বগুলিকে খাঁটি সাহিত্যের কার্য্যে লাগাইয়া সমাজের মঙ্গল-সাধন করা যায়। কেন না, খাঁটি সাহিত্যই ভাবসঞ্চার ও প্রচার-দ্বারা জাতির উদ্ধারের, পুনরুত্থানের সাহায্য করে। দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণায় এক নূতন আদর্শের সাহিত্য সৃষ্ট হইবে, আবার সেই সাহিত্যের প্রভাবে জাতীয়তার ভাব নব বল পাইবে। এইরূপে উভয়ে উভয়ের সহায় হইবে। সকল দেশেই সাহিত্য জাতীয় জাগরণের মূলে আছে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস-ক্ষেত্রে গবেষণার দ্বারা যে সব জাতীয় গৌরবের বৃত্তান্ত লব্ধ হইবে, সেই সব বৃত্তান্তের উপাদান লইয়া নূতন আদর্শের কাব্য-নাটক রচনা করিতে হইবে, তৎপাঠে জাতীয়তার ভাব, দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিবে। ইংলণ্ডের ইতিহাস-অবলম্বনে লিখিত সেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকাবলি দেশভক্তির ভাবে কিরূপ অনুপ্রাণিত, তৎপাঠে ইংরেজের হৃদয়ে দেশপ্রীতি কিরূপে সঞ্চারিত হয়, তাহা ইংরেজিশিক্ষিত ভারতবাসীরা জানেন। আমাদের কাব্য-নাটকেও সেই দেশপ্রীতির ধারা প্রবাহিত করিতে হইবে। বিলাতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা-কার স্যর ওয়াল্টার স্কটের আদর্শ ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র তাঁহাদের সময়ে দেশের ইতিহাস যতটা পরিজ্ঞাত ছিল, সেই উপাদানের কাঠামোর উপর কল্পনার তুলিকা বুলাইয়া কয়েকখানি ইতিহাসাশ্রিত আখ্যায়িকা লিখিয়া গিয়াছেন। এখনকার নূতন অনুসন্ধানের ফলে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি-সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাওয়া গিয়াছে, হয় ত তাহার আলোকে দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের অঙ্কিত চিত্রগুলির দোষত্রুটি লক্ষিত হয়, বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসের কষ্টি-পাথরে কষিলে সেগুলির কোনও কোনও অংশে খাদ ধরা পড়ে। তথাপি তাঁহারা দেশাত্মবোধ জাগরিত করিবার অমোঘ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। সেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ও স্যর ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাগুলিতেও এখনকার ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ গলদ বাহির করিয়াছেন; তথাপি সেক্সপীয়ার ও স্কট অতীতের উজ্জ্বল চিত্র সাহিত্য-মুকুরে প্রতিফলিত করিয়া অতীতের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছেন, এজন্য ইংরেজ জাতি উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতায় অবনত-মস্তক। দোষত্রুটি-সত্ত্বেও সেক্সপীয়ারের নাটক ও স্কটের আখ্যায়িকা সাহিত্যের অমূল্য-রত্ন। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত আখ্যায়িকাবলিও সেইরূপ আমাদের আদরের সামগ্রী, আমাদের সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকখানি নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের তিরোধানের পর আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার-কার্য্যে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেও কয়েক জন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদ্, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত গবেষণা-বিভাগের চেষ্টায় আশা করা যায়, আরও নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। এই সকল নূতন তথ্যের কাঁচা মালকেও বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র প্রভৃতির প্রণালীতে ঐতিহাসিক কাব্য-নাটকের উপাদানে পরিণত করিতে হইবে। যাঁহারা কল্পনাকুশল তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। সুখের বিষয়, খ্যাতনামা ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু শুষ্ক ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, নবাবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তির উপর কি প্রণালীতে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা রচনা করিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বহস্তে কল্পনার তুলিকা গ্রহণ করিয়া 'শশাঙ্ক', 'ময়ূখ', 'করুণা' 'ধর্ম্মপাল,' প্রভৃতি গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া সাধারণ পাঠক-

দিগকে ভারতের প্রাচীন গৌরবের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেছেন। আবার প্রত্নতত্ত্ববিশারদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বেণের মেয়ে' আখ্যায়িকায় প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরবের একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আশা করা যায়, উভয়েই আমাদিগকে আরও মুক্তহস্তে সাহিত্যরস পরিবেষণ করিবেন এবং তাঁহাদিগের আদর্শ অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা বা নাটক রচনা করিয়া সমাজের ও সাহিত্যের উপকার করিবেন। এই শ্রেণীর কাব্য-নাটক পাঠ করিলে পাঠক-সমাজের কাব্যপাঠ-জনিত আনন্দ-লাভ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের অতীত গৌরব-সম্বন্ধে সত্যজ্ঞানলাভে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষাও হইবে।

শুধু যে ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চের প্রধান পুরুষগণের শৌর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য ন্যায়পরতা ক্ষমাগুণ প্রভৃতির চিত্র-প্রদর্শনের জন্যই এই শ্রেণীর কাব্যনাটকের প্রয়োজন তাহা নহে। সাধারণ গৃহস্থ-জীবনের চিত্রও কাব্য-নাটকে অঙ্কিত হইবার প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই শ্রেণীর চিত্রেও আদর্শচরিত্রাঙ্কণে সমাজের মঙ্গল হয়। আজকালকার আখ্যায়িকাকারগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে বা অনুসরণে, Realism, Romanticism, Humanitarianism, Sex-problem, Criminology, Medical jurisprudence প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিক সামাজিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দোহাই দিয়া যে শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় থাকিলেও তাহার দ্বারা সমাজের প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার, পাশ্চাত্য সামাজিক প্রথার মোহাবিষ্ট বাঙ্গালীর নয়ন-সমক্ষে আমাদের প্রাচীন পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ ধরিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' তথা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা'য়, অঙ্কিত সম্পন্ন গৃহস্থঘরের আদর্শ 'কর্ত্তা' ও গৃহিণী, ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর', শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অদৃষ্টচক্র' ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি'তে অঙ্কিত পূতচরিত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী-কঙ্কণ', শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অনাথবন্ধু,' ৺চন্দ্রশেখর করের 'অনাথ বালক', ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বিশ্বনাথ,' ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'পূজার ফুল', ৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ক'নেবৌ' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' ও 'অনুপমা,' শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' প্রভৃতিতে অঙ্কিত আদর্শ যুবতী ও প্রৌঢ়া বিধবা এই সকল শ্রেণীর চিত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজের উপর পবিত্র প্রভাব বিস্তার করে। পল্লীজীবনের সুখ দুঃখ প্রভৃতির চিত্রাঙ্কন করিয়া পল্লীপ্রীতি সঞ্চারিত করারও এখন প্রয়োজন হইয়াছে। পল্লীসংস্কার, কুটিরশিল্প-প্রচলন, কৃষক ও শিল্পীদিগের মধ্যে প্রাথমিক-শিক্ষা-বিস্তার ইত্যাদি প্রচার-কার্য্য (propaganda work) কাব্য-নাটকের মারফত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। জড়জগতে যেমন তাড়িত-শক্তি মানবের নানা-কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে, সাহিত্য-জগতেও সেইরূপ কল্পনার চপলালোক সমাজের নানা মঙ্গল-বিধানে, নানা আদর্শস্থাপনে, নানা প্রশ্নবিচারে, নানা সমস্যা-সমাধানে, বিনিয়োজিত হইতেছে। অতএব নাটক ও আখ্যায়িকা-রচনা করিয়া সমাজের সুন্দর আদর্শ প্রচার করা ক্ষমতাশালী লেখকদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

ফরমায়েশে সাহিত্য গড়িয়া উঠে না, ফরমায়েশী সাহিত্যও উচ্চদরের হয় না, বিশেষতঃ কবিদিগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভা-স্রোতকে হুকুমে অন্য খাতে প্রবাহিত করা যায় না, মানস-সরোবরগামী হংসকে অন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র, এ সব কথাই জানি। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির অনুরোধের যে বিশেষ গুরুত্ব (weight) নাই, ইহাও বুঝি। তথাপি এই শ্রেণীর গুণী লেখকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিই যে, সমগ্র জাতির হৃদয়ে উদ্দীপনা আনিতে তাঁহাদিগের মত আর কে পারে? তাঁহাদিগের একটি মোহন চিত্রে, একটি অগ্নিময় ছত্রে যাহা হয়, তাহা শত শত প্রত্নতত্ত্বাত্মক গুরু-গম্ভীর গ্রন্থে হয় না। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই বলিতেছি, দেশমাতার দিব্য দিয়া তাঁহাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তাঁহারা গদ্যে পদ্যে, গানে গল্পে, বক্তৃতায় প্রবন্ধে, একটা বিরাট্ সাহিত্য প্রস্তুত করুন, তাহাতে দেশ-ভক্তির পূর্ণ উদ্দীপনা হউক। তাঁহাদিগের প্রসাদে জাতীয় মহাভাব আমাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জাতে মজ্জাতে, প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে প্রবেশ করুক। আমরা ধন্য হই।

শুনিয়াছি, ফরাসী দেশ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশে বিদ্যালয়ে দেশভক্তি শিক্ষা দেওয়া হয়। আমা-দেরও জাতীয় শিক্ষায় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল

কবিতা ও কাহিনীর প্রভাবে দেশভক্তির সঞ্চার হয়, সেই সকল কবিতা চয়ন করিয়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষা-সম্বন্ধে আমার শেষ কথা,—যে সুর প্রথমে মধুসূদনের কণ্ঠে 'রেখো মা দাসেরে মনে' 'শ্যামা জন্মদে' এই কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে; রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, কান্তকবি, কাব্যবিশারদ, গোবিন্দচন্দ্র রায় ও গোবিন্দচন্দ্র দাসের মিলিত কণ্ঠে যে সুর আরও উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, নরেন্দ্র দেব, হাবিলদার কাজি নজরুল, ইসলাম প্রভৃতি নব্যদিগের কণ্ঠে যে সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে, সেই সুর আরও পরিপুষ্টি লাভ করিয়া 'সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে' ভারতভূমির আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হউক। যেমন 'গঙ্গা-জলে গঙ্গা পূজা', তেমনই কবির কথায়ই কবিকে আহ্বান করি, *

জাগো কবি! জাগো কবি।
স্বপন-রচিত নন্দন হ'তে
হের এ ধূলার ছবি।
দীর্ঘ তমস আঁধার-অন্তে,
ঊষা হাসিতেছে পূরব প্রান্তে,
পশ্চাতে তা'র কিরণ-কান্ত
ওই ধ্বান্তারি রবি।
ময়ূখমেখলা ছড়ায়ে গিয়েছে
চির আঁধারের ভূমে;
অন্ধকারের বন্দীরা আজি
জেগেছে আলোর চুমে।

কনক বিজলী ছেয়েছে গগন,
ঘুমভাঙ্গা দল মেলেছে নয়ন
এ নব প্রভাতে রাঙা ও ভুবন
নব সুর কুঙ্কুমে।

বিশ্বভারতী-শ্রীকর-দীপ্ত
নিয়ে এস তব বীণা;
নিঃস্ব রিক্ত ভাইরা তোমার
জননী তোমার ক্ষীণা।

পেটে নাই ভাত, মুখে নাই কথা
বুকপোরা শুধু নিরাশার ব্যথা
চিরলুণ্ঠিতা বঞ্চিতা মাতা
মহারাণী আজি দীনা।

আনন্দ-পূত নন্দন হ'তে
আনো গান—আনো গান
দীপ্ত রঙীন রক্ত রাগিণী
শক্তি-সফল প্রাণ।

ভিখারীর দল হয়েছে বাহির
মুক্তির লাগি পাতিয়াছে শির
হে চারণ! হের হাসিছে মিহির
তোল তোল বীণা খান।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* নারায়ণ—ফাল্গুন ১৩২৮, 'কবির প্রতি' (দরবেশ-রচিত)।

স্মৃতি-সৌধ

(২)

আকবর মোগলসম্রাটদিগের উপযুক্ত সৌধ নির্ম্মাণে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। আগ্রায় তাঁহার রাজধানী ছিল, কিন্তু তিনি শেখ সেলিম চিস্তির নিকটে বাস করিবার অভিপ্রায়ে ফতেপুর সিক্রিতে এক বিরাট নগর নির্ম্মাণ করেন। আরম্ভ করেন। সমগ্র সাম্রাজ্যে যে স্থানে যে স্থপতি বা শিল্পী যশ অর্জ্জন করিয়াছিল, সেই স্থান হইতে তাহাকে আনিয়া এই পুরনির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ৯ বৎসর ৩ মাস ও কয় দিনের পর ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই দিল্লী
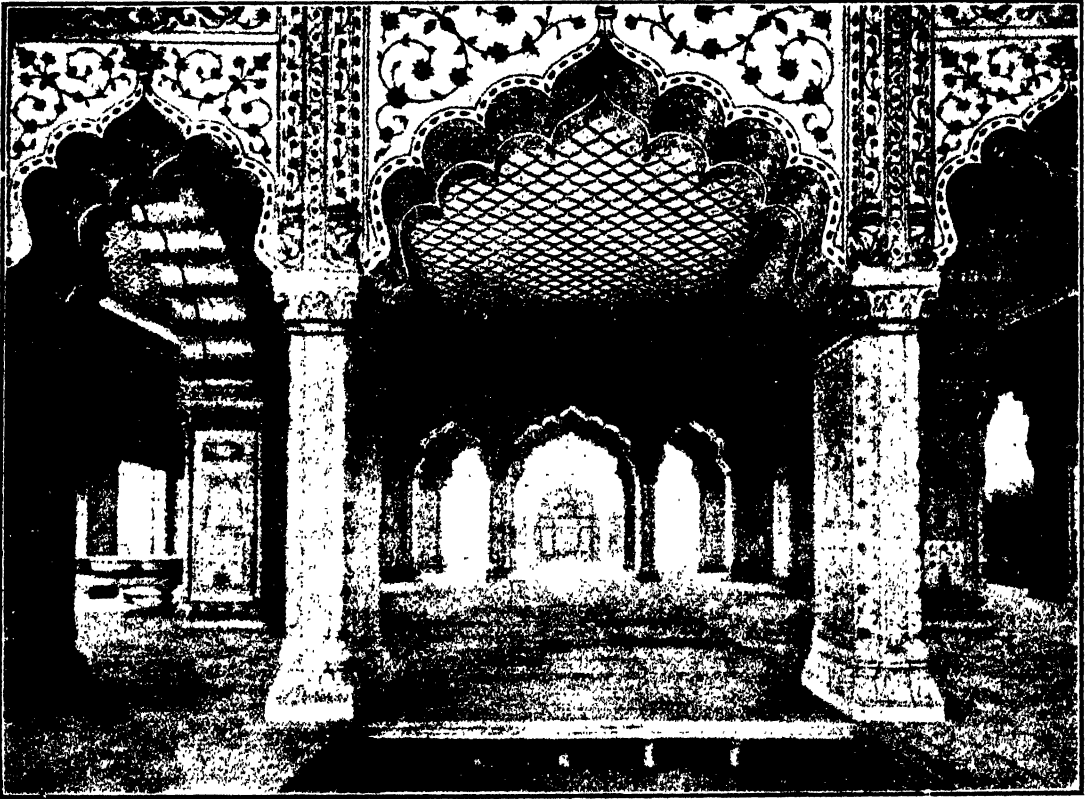
দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাস।

জলের অভাবে শেষে তাঁহাকে সে নগর ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। তিনি এমন ভাবে পুর নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, তাঁহার রাজধানী আগ্রাতেও সম্রাট শাহজাহানের সৌধতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় নাই। তাই তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে তিনি দিল্লীতে প্রাসাদ-রচনা আরম্ভ করেন। তিনি অনেক সন্ধানের পর যমুনার কূলে পুরাতন দিল্লীর উপকণ্ঠে নগর নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন এবং শুভ দিন দেখিয়া তথায় পুরনির্ম্মাণ রচিত হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট এই প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দরবার করেন। বিশেষজ্ঞ ফার্গুসন বলিয়াছেন, সমগ্র প্রাচীতে—হয় ত সমগ্র জগতে এই প্রাসাদ অতুলনীয় ছিল। এই প্রাসাদে দেওয়ান-ই-খাস গৃহে মর্ম্মরের বেদীর উপর ময়ূর-সিংহাসনে বাদশা উপবেশন করিতেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহ এই সিংহাসন লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার মূল্য—৯ কোটি টাকা। দেওয়ান-ই-খাস শ্বেত মর্ম্মরে রচিত—

প্রাচীরগাত্রে সোনালী কায। এই গৃহেই লিখিত আছে :—

"যগুপি স্বরগ থাকে এই মহীতলে—
এখানে—এখানে—তাহা—এখানে কেবল।"

এই কক্ষের চন্দ্রাতপ রৌপ্যনির্ম্মিত ও স্বর্ণখচিত ছিল। ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মার্হাট্টারা ইহা গলাইয়া ২৮ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল।

দিল্লী শাহজাহানের নামে পরিচিত হইলেও সম্রাটের শেষ জীবন আগ্রাদুর্গে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি পুত্র আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বন্দিদশায় ৮বৎসর কাল আগ্রা দুর্গে বাস করিয়া ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। সেই কয় বৎসর যমুনার পরপারে তাঁহার পত্নীর সমাধি-সৌধ তাজমহলের দিকে চাহিয়া—অরুণরাগরঞ্জিত প্রভাতে, রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে, বর্ণবৈচিত্র্য-বহুল সন্ধ্যায় ও নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না-ধৌত রাত্রিতে সম্রাট শাহজাহান মানুষের অদৃষ্ট সম্বন্ধে কি চিন্তা করিতেন, কে বলিতে পারে? ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয় পত্নীর মৃত্যু হয়। তাঁহার গর্ভে সম্রাটের ৮ পুত্র ও ৬ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন আগ্রাদুর্গে বন্দী, তখন তাঁহার অবশিষ্ট ৪ পুত্রের মধ্যে দারা, সুজা, মুরাদ নিহত—এক আওরঙ্গজেব পিতার রাজ্য কাড়িয়া লইয়া সম্রাট হইয়াছেন। অবশিষ্ট ২ কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা রোশিনারা তখন দিল্লীতে ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের কাছে। কেবল জ্যেষ্ঠা কন্যা—বাদশা বেগম জাহানারা পিতার সেবা করিতে তাঁহার নিকটে।

দিল্লীতে জাহানারা ও রোশিনারা দুই ভগিনীর সমাধি—দুই স্থানে বিদ্যমান।

টেভার্ণিয়ার।

শাহজাহান স্বভাবতঃ স্নেহশীল ছিলেন। বিদেশী বণিক টেভার্ণিয়ার বলিয়াছেন, তিনি রাজার মত প্রজা শাসন করিতেন না—পিতা যেমন করিয়া পুত্রকন্যা পালন করেন—তেমনই ভাবে প্রজাপালন করিতেন। স্নেহশীল সম্রাট যে আপনার সন্তানদিগকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু পুত্রগণ দূরে থাকিতেন এবং মোগল সম্রাটদিগের পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জাহানারা রূপে ও গুণে প্রধানা ছিলেন এবং তিনি পিতার পরিচর্য্যায় অবহিত থাকায় সম্রাটের সমধিক স্নেহ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে জাহানারা দারার ও রোশিনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্য লাভ করিলে রোশিনারার প্রভাব প্রবল হয়, আর জাহানারা পিতার বন্দিদশার অংশ লইয়া আগ্রায় বাস করেন।

মোগল শুদ্ধান্তের কথা বাহিরে বড় প্রকাশ পাইত না; যাহা প্রকাশ পাইত, তাহাও অনেক স্থলে বিকৃত—সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কূটবুদ্ধি আওরঙ্গজেব রাজ্যলাভ করিবার পর পিতৃদ্রোহী ভগিনীকে কতটুকু বিশ্বাস করিতেন—বলা যায় না; রোশিনারার প্রভাব কত দিন স্থায়ী হইয়াছিল, জানিবার উপায় নাই। যে ভ্রাতাকে সিংহাসনদানে তিনিই প্রধান সহায় ছিলেন, সেই ভ্রাতার রাজ্যলাভের পর তাঁহার প্রভাব কতটুকু ছিল—বলা অসম্ভব। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট নাই। আর আছে—দিল্লী দুর্গের বাহিরে উদ্যানমধ্যে রোশিনারার সমাধি। সমাধিসৌধ দেখিলে তাহা বিশেষ পুরাতন বলিয়া মনে হয় না—বোধ হয়, সংস্কারে তাহার

রোশিনারার সমাধি-মন্দির।

জন্য মোগল রাজকন্যাদিগের সম্বন্ধেও গুপ্তপ্রেমের—বিলাস-লালসার—নানা জনরব প্রচারিত হইত। সে সকলের সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণের উপায় নাই। বিশেষ মোগল সম্রাটদিগের একটি কুপ্রথা ছিল—সম্রাটপুত্রীর যোগ্য স্বামী পাওয়া যায় না বলিয়া, তাঁহারা অবিবাহিতা থাকিতেন। অথচ তাঁহাদের অর্থের অভাব ছিল না—সংযমের শিক্ষা ছিল না। জাহানারার তাম্বুলের ব্যয়ের জন্য সুরাটের রাজস্ব প্রদত্ত হইয়া ছিল। রাজান্তঃপুরে গুপ্তপ্রেমের ষড়যন্ত্রের কথা তখন যে দিল্লীতে প্রচারিত ছিল,সমসাময়িক বিদেশী পর্য্যটকদিগের বিবরণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বার্ণিয়ার জাহানারা ও রোশিনারা উভয়কেই লালসাপরায়ণা বলিয়াছেন এবং জাহানারার সম্বন্ধে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জাহানারা একবার কোন যুবককে স্বীয় কক্ষে আনাইলে সে কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হয়। শাহজাহান সহসা দুহিতার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং জাহানারা অনন্যোপায় হইয়া যুবককে স্নানের জন্য ব্যবহৃত

প্রাচীনত্বের চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে। এই সমাধির নিম্নে সম্রাট শাহজাহানের দুহিতা—সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভগিনী রোশিনারার শব সমাহিত—সেখানে প্রভাবপ্রতিপত্তির জন্য বড়যন্ত্র নাই, প্রেম ও লালসা নাই, শঙ্কা ও আশা নাই—"গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর সোপান।"

মোগল সম্রাটদিগের অন্তঃপুরে বিলাসের উৎস উৎসারিত থাকিত—রিরংসার অনলে সংযম দগ্ধ হইয়া যাইত। সেই

বৃহৎ কটাহের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। সম্রাট নানা কথার পর দুহিতাকে বলেন, তিনি স্নানে অবহেলা করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি কটাহের নিম্নে অগ্নি জ্বালাইবার জন্য খোজাদিগকে আদেশ দেন এবং অগ্নিতাপে হতভাগ্য যুবকের মৃত্যু হয়। তাহার পর নজর খাঁ নামক এক পারস্য-দেশীয় যুবক জাহানারার প্রশংসাভাজন হয় এবং শায়েস্তা খাঁ তাহার সহিত রাজপুত্রীর বিবাহের প্রস্তাবও করেন।

বিরক্ত হইয়া সম্রাট এক দিন দরবারে যুবককে একটি পান দেন। তাহাতে বিষ ছিল। বিষের ক্রিয়ায় দরবার হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পাল্‌কীতেই যুবকের মৃত্যু হয়।

রাজপুত্রীর কক্ষমধ্যে কটাহে জল গরম করা কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রাসাদের কক্ষগুলির আয়তনও বৃহৎ নহে—সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে কটাহের স্থানও হয় না। বিচিত্র-কারুকার্য্য-খচিত হামামই স্নানার্থ ব্যবহৃত হইত। সে কক্ষ গরম করিতে ১ শত ২৫ মণ জ্বালানী কাষ্ঠের প্রয়োজন হইত।

জাহানারার সম্বন্ধে বার্ণিয়ার আর যে কুৎসিত জনরবের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা লিখিতে সঙ্কোচ হয়। সম্রাট এই কন্যার প্রতি সমধিক স্নেহশীল ছিলেন এবং শেষে তিনিই রাজ্য-শাসন-কার্য্যে পিতার পরামর্শদাতা ছিলেন বলিয়া জনরব পিতাপুত্রীতে অবৈধ সম্বন্ধের কথাও ইঙ্গিত করিত। তাহার আভাস টেভা-র্ণিয়ার এবং মেনুসীও দিয়াছেন। কিন্তু মেনুসী সে জনরবে বিশ্বাস-স্থাপন করেন নাই।

জাহানারা প্রথমাবধি দারার পক্ষপাতী ছিলেন এবং দারাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শাহজাহানের অসুস্থ অবস্থায় যখন তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে দারা, পিতার ও ভগিনীর নিকট বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন। সে বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সে দিন সমরসজ্জায় বাহির হইয়াছিলেন—তাহার পর তিনি পথের ভিখারী হইয়া অনাহারে—অনিদ্রায় কষ্ট পাইয়া শেষে নিহত হয়েন। বিদায়ের দিন তাঁহার ফতেজঙ্গ নামক হস্তীতে আরোহণকালে দারা বলিয়াছিলেন—"যে দীন, সে ক্ষমা পাইবে—যে অহঙ্কারী, তাহার ভাগ্যে মৃত্যু আছে।"

পাছে কেহ পিতাকে বিষ প্রদান করে, এই জন্য জাহানারা আপনার তত্ত্বাবধানে পিতার আহার্য্য প্রস্তুত করাইতেন।

জাহানারার সমাধি।

আমীর ওমরাহ প্রভৃতি তাঁহার তুষ্টিসাধনের জন্য তাঁহাকে বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিতেন। টেভার্ণিয়ার বলিয়াছেন, কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সম্রাটের বিরাগভাজন হয়েন এবং সম্রাট তাঁহাকে তলব দেন। কিন্তু চতুর শাসনকর্ত্তা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সম্রাটের জন্য ৫০ হাজার মোহর এবং বেগম সাহেবা অর্থাৎ জাহানারা প্রভৃতির জন্য ২০ হাজার মোহর আগ্রায় পাঠাইয়া দেন। ফলে তিনি সদরে হাজির হইলে তাঁহাকে এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার পদে উন্নীত করা হয়।

এইরূপে জাহানারা প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পিতার অমূল্য মণিমুক্তাও তাঁহারই হস্তগত ছিল। আওরঙ্গজেব রাজা হইয়া পিতার ধনাগার হস্তগত করেন। মানরিক বলেন, তখন ধনাগারে ১৯ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬ শত ৬৬ টাকা ছিল। কিন্তু শাহজাহানের মণিমুক্তা পিতৃদ্রোহী পুত্রের হস্তগত হয় নাই। তাই আওরঙ্গজেব যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার শিরাবরণে একখানিমাত্র বহুমূল্য হীরক ছিল। তিনি সমারোহ সহকারে সিংহাসনে বসিবার জন্য পিতার নিকট কিছু মণিমুক্তা চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সাহজাহান ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া হামানদিস্তা আনিতে আদেশ দেন—তিনি মণিমুক্তা চূর্ণ করিয়া ফেলিবেন। প্রিয়তমা দুহিতা জাহানারার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি সে সঙ্কল্পে নিরত হইয়াছিলেন। শাহজাহান যদি মনে করিয়া থাকেন, জাহানারা আপনি পাইবেন বলিয়া সে সব মণিমুক্তা রক্ষা করিয়াছিলেন, তবে তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতী জাহানারা বিশেষ জানিতেন, পিতার নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইলেও যে ধনরত্ন আওরঙ্গজেব হস্তগত করিতে পারেন নাই, পিতার মৃত্যুর পর তাহা তিনি যেমন করিয়াই হউক হস্তগত করিবেন। তবুও যে বেগম সাহেবা সে সব নষ্ট করিতে দেন নাই, সে কেবল পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করিবার বাসনায়। এই ব্যাপারে তাঁহার নারীপ্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আওরঙ্গজেব তাঁহার স্নেহশীল পিতাকে বন্দী করিয়া কষ্ট দিয়াছেন—তাঁহাকে শত্রুজ্ঞানও করিয়াছেন—তিনি ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছেন—তবুও আওরঙ্গজেব তাঁহার ভ্রাতা—ভ্রাতা বলিতে আওরঙ্গজেব ব্যতীত আর কেহ নাই; পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তি—ধনরত্ন সবই আওরঙ্গজেবের প্রাপ্য। তাই তিনি তাঁহার ঘৃণাভাজন আওরঙ্গজেবের জন্য সেই মণিরত্ন সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জাহানারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর কারণ হইয়া—মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র আওরঙ্গজেব দিল্লী হইতে আগ্রায় উপনীত হয়েন। রাজত্বকালে শাহজাহান শাহজাহানাবাদ নগর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার সেই নগর দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং তথায় যাইবার জন্য পুত্রের অনুমতি প্রার্থনা করেন। পুত্রের আশঙ্কা হয়—তিনি করিপৃষ্ঠে—স্থলপথে যাইলে হয় ত প্রজারঞ্জক শাহজাহানকে দেখিলে প্রজারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবে। তাই তিনি পিতাকে জানাইলেন—যদি তিনি জাহানাবাদে যাইতে চাহেন, তাঁহাকে জলপথে যাইতে হইবে। এই উত্তরে শাহজাহান মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাঁহার মৃত্যুদিন আর বিলম্বিত হইল না। পিতার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব আগ্রায় আসিলে জাহানারা যথাযোগ্য সমাদরে ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করেন এবং পিতার ও আপনার সঞ্চিত মণিরত্ন আনিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। আওরঙ্গজেব ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তি সম্ভোগের অধিকার দেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের এই সন্তোষ আন্তরিক কি না বলা যায় না। তিনি জাহানারাকে সাহজাহানাবাদে লইয়া যায়েন। টেভার্নিয়ার লিখিয়াছেন যে, তিনি দেখিয়াছিলেন, হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জাহানারা আগ্রা হইতে যাইতেছেন।

তাহার পর জাহানারার কি হয়? টেভার্ণিয়ার লিখিয়াছেন, অল্পদিন পরেই সংবাদ প্রচারিত হয়, জাহানারার মৃত্যু হইয়াছে—লোক বলে, তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে নিহত করা হয়। কিন্তু শাহজাহানের মৃত্যুর পর কারাবদ্ধ ভগিনীকে ভয় করিবার আর কোন কারণই আওরঙ্গজেবের ছিল না। কোন কোন ঐতিহাসিকের বিশ্বাস, পিতার মৃত্যুর পর জাহানারা ১৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর পর দিল্লীর উপকণ্ঠে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধিপ্রাঙ্গণে তাঁহার শব সমাহিত হয়। জাহানারা দিল্লীতে একটি বৃহৎ ও সুরম্য সরাই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বার্ণিয়ার এই গৃহের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, বিদেশী বণিকরা দিল্লীতে আসিয়া এই গৃহে অবস্থান করিতেন। এখন সে গৃহের চিহ্নমাত্র

নাই। বর্ত্তমান দিল্লীর বাজারে যে স্থানে ঘণ্টাঘর অবস্থিত, জাহানারার সরাই সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিল।

আছে কেবল জাহানারার সমাধি। রোশিনারার সমাধি-সৌধ—কেবল মধ্যস্থলে যে স্থানে শব সমাহিত, তাহার উপর ছাত নাই—বর্ষার বারি, শীতের শিশির ও নিদাঘের রৌদ্র সেই স্থানে পতিত হয়। জাহানারার সমাধি সৌধ নহে—মর্ম্মরে আস্তৃত—আস্তরণের মধ্যভাগে মৃত্তিকার উপর তৃণ জন্মিয়াছে। উত্তরদিকে - শিয়রে মর্ম্মর-স্তম্ভে জাহানারার রচিত একটি কবিতা ক্ষোদিত—

"বহুমূল্য আবরণে করিও না সুসজ্জিত কবর আমার;
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীন-আত্মা জাহানারা সম্রাট-কন্থার!"

যে মোগল সম্রাট শাহজাহানের রাজধানীর তুলনা সমগ্র প্রাচীতে ছিল না এবং যাঁহার পত্নীর স্মৃতিসৌধ আজও বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে—তাঁহারই প্রিয়তমা কন্যা সমৃদ্ধির সুমেরুশিখরে অবস্থান করিয়া—মানবের ভাগ্য-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—

"তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ।"

পিতা শাহজাহান বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া শেষে পুত্রের দ্বারা বন্দী হইয়া জরাজীর্ণ জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন—রাজপুত্র দারা, সুজা, মুরাদ রাজ্যলোভে ভ্রাতা কর্ত্তৃক নিহত—আওরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বী ভগিনী রোশিনারাও তখন মৃত—মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে অন্তঃপুরে এক'জন যুবক ধরা পড়ায় তিনি ভ্রাতার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন—এই সব দেখিয়া বুদ্ধিমতী জাহানারা বুঝিয়াছিলেন—ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই—গৌরব গর্ব্ব করিবার নহে—মাটীর দেহ যখন মাটীতে মিশায়, তখনই কেবল ভোগ ও সম্ভোগ শেষ হয়। তাহার পর?—তাহার পর—পরপারে মানুষের দৃষ্টি যায় না। এই মানুষ আবার ধনজনের রূপযৌবনের গর্ব্ব করে? তাই তিনি আপনার সমাধিস্তম্ভের জন্য লিখিয়াছিলেন—যেন বহুমূল্য আবরণে তাঁহার কবর সুসজ্জিত করা না হয়—"তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ।" বুকের রক্তে অশ্রু মিশাইয়া বুঝি সম্রাটপুত্রী সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি এই কবিতায় লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই কথায় মানুষের গর্ব্বগৌরবের অসারত্ব যেন অক্ষয় অক্ষরে লিখিত হইয়াছে—সেলিখা কালের কঠোর করও মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না।

বন্ধুর পথে।

বাহির হ'লাম সেই সে নিশি ভোরে
　　আনন্দেতে একসাথেতে সবে,
এখানে এই বাঁকা পথের মোড়ে
　　এখন আমায় বিদায় নিতে হবে।

তোমরা যাবে সাম্‌নে সড়ক ধরি
　　গ্রাম নগরীর স্নেহের পরশ পেয়ে,
আতিথ্য ও আশীষ গ্রহণ করি
　　তরুর কুসুম পড়বে পথে ছেয়ে।

দেখতে পাবে কাণ্ডী ঝাঁপান হ'তে
　　দীন ভিখারীর দীন নয়নে চাওয়া,
দেখবে কঠিন পাকদণ্ডীর পথে
　　সঙ্গিহীনের নিরুদ্দেশে যাওয়া।

হেথায় মোরে বিদায় নিতে হবে
　　ভুলতে হবে সঙ্গে যাওয়ার সুখ,
সঙ্গী সরাই কিছুই নাহি রবে
　　প্রিয়ের বাণী পরিচিতের মুখ।

আস্‌ছে পবন তুহিন-কণা নিয়ে
　　ফুরিয়ে গেছে সমীর ফুরু ফুরু,
ভূর্জ্জবনের গভীর ছায়া দিয়ে
　　আজকে হ'তে মাত্র হ'ল সুরু।

আছে ভীষণ পথের সুখ ও দুখ
　　সিংহের ডাক অজগরের শ্বাস,
জটার ফাঁকে মলিন চাঁদের মুখ,
　　ধুস্তূর এবং কস্তূরীরি বাস।

আছে কেবল নিরাশ মাঝে আশা
　　উষ্ণতারি আভাস দারুণ শীতে,
অচেনাদের মধুর ভালবাসা
　　আস্‌ছে যেন আগ্ বাড়িয়ে নিতে।

দুঃখ যে আজ আনন্দকে টানে,
　　কাঁটার কুসুম বল্‌ছে হাবে ভাবে,
বন্ধুর পথ দীনবন্ধুর পানে
　　দিনের শেষে দীনকে লয়ে যাবে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বিড়াল-তপস্বী।

১

পচাডাঙ্গার পতিতপাবন ঘোষ মামলা-মোকর্দ্দমার চিন্তা ত্যাগ করিয়া যখন পরলোকের চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং আদালতের নথিপত্র ও দলীল-দস্তাবেজের দপ্তর ফেলিয়া 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন লোক তাঁহাকে বিড়াল-তপস্বী আখ্যা প্রদান করিল।

অবশ্য পতিতপাবন সহজে এমন উপাধিটা স্বীকার করিয়া লয়েন নাই, এবং স্বেচ্ছায় সাক্ষীর জবানবন্দীর নকলের ভিতর যে মধুর রসটুকু আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া স্বরূপ দাসের কড়চার দুর্ব্বোধ্য ভাব গ্রহণে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। বত্রিশ বিঘা লাখরাজ লইয়া জগন্নাথ হাজরার সঙ্গে যখন হকিয়তের মোকর্দ্দমা বাধিয়াছিল, তখন তিনি একবারও মনে করেন নাই যে, পঞ্চাশ বৎসরের মোকর্দ্দমার নেশার মায়া কাটাইয়া কোন দিন তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমের নেশায় বিভোর হইতে হইবে। তিনি কত বৈষ্ণব ভিখারীর টাকি কাটিয়া দিয়াছেন. কত বাবাজীর হরিনামের ঝুলি কাড়িয়া লইয়া বাজারের মাছের থলি করিয়াছেন, কিন্তু আজ যে তাঁহাকে নিজেই মাথায় টাকি রাখিয়া, সর্ব্বাঙ্গে গোপীচন্দনের ছাপ মারিয়া হরিনামের ঝুলি হাতে করিতে হইবে, ইহা কে জানিত! এক্ষণে পতিতপাবন বুঝিলেন, মানুষ যাহা মনেও করে না, তাহাও তাহাকে করিতে হয়; মানুষ না করিতে পারে, এমন কাজই নাই।

কুক্ষণে জগন্নাথ হাজরার লাখরাজ জমীগুলার উপর পতিতপাবনের লুব্ধদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। কুক্ষণে তিনি জগন্নাথের নিঃসন্তানা বিধবা ভ্রাতৃবধূকে "হাত করিয়া" জমীগুলা হস্তগত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই প্রয়াসের ফলে তাঁহার জীবনে এমন একটা অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহা জানিলে তিনি কখনই এই বত্রিশ বিঘা উর্ব্বর জমীর উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না।

তা দোষ যে পতিতপাবনের একার, তাহা নহে, জগন্নাথেরও একটু দোষ ছিল। সে বৎসর আশ্বিন মাসে মাঠের তৈরী ধানের গাছগুলা জলের অভাবে যখন শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইল, এবং কৃষকরা আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হতাশ হইয়া পড়িল, তখন পতিতপাবন মাঠ-পুকুরের জল আনিয়া ধানগুলাকে বাঁচাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। জলসেচনের সব ঠিক হইয়া গেল, কিন্তু জগন্নাথ হাজরা গোলযোগ বাধাইয়া তাঁহার সে উদ্যোগ পণ্ড করিয়া দিল। পুকুর হইতে পতিতপাবনের জমী একটু দূরবর্ত্তী; মাঝে জগন্নাথ হাজরার জমী। জগন্নাথের জমীতে নালা কাটিয়া জল আনিতে হইবে। জগন্নাথ কিন্তু নিজের জমীতে নালা কাটিতে দিল না; কবে পতিতপাবন জমীদারের সহিত মোকর্দ্দমায় তাহার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়াছিলেন, সেই আক্রোশের বশে জগন্নাথ নিজের জমীর উপর দিয়া জল লইয়া যাইতে আপত্তি করিল। পতিতপাবন অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, জগন্নাথের হাতে পর্য্যন্ত ধরিলেন, জগন্নাথ কিন্তু কিছুতেই রাজি হইল না। একটু জলের অভাবে পতিতপাবনের জমীর ধানগুলা দাঁড়াইয়া শুকাইতে লাগিল। পতিতপাবন ছটফট করিতে লাগিলেন, এবং সেই রৌদ্র-শুষ্ক ক্ষেতভরা ধানগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জগন্নাথ হাজরার এই জমীগুলা যদি হাত কত্তে পারি, তবেই চাষ ক'রবো, নয় তো এই পর্য্যন্ত।" পতিত-পাবন জগন্নাথের জমীগুলা হাত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সুযোগ মিলিল—জগন্নাথের বিধবা ভ্রাতৃবধূ জ্ঞানদা পতিতপাবনের সঙ্কল্পসাধনে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ হইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর জগন্নাথ বিধবা ভ্রাতৃবধূকে সাদরেই গৃহে স্থান দিয়া রাখিয়াছিল; সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েকে যতটুকু খাটিতে বা কষ্ট ভোগ করিতে হয়, জ্ঞানদাকে তাহার বেশী একটুও খাটিতে বা কষ্ট পাইতে হয় নাই। পতিত-পাবন লোক লাগাইয়া তাহাকে কান-ভাঙ্গানী দিতে আরম্ভ করিলেন এবং নানা প্রকারে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তাহার সর্ব্বস্ব জগন্নাথ ভোগ করিতেছে, এবং তাহাকে দাসী-বাঁদীর মত খাটাইয়া মারিতেছে; এখন তাহার খাটিবার শক্তি আছে বলিয়াই ভাত-কাপড় দিতেছে, যে দিন সে-শক্তি না থাকিবে, সে দিন দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। এই সময়ে যদি সে নিজের ভবিষ্যৎ সংস্থান গুছাইয়া লইতে

পারে, তবেই রক্ষা, নতুবা ইহার পর তাহাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে।

মেয়েমানুষ—আপনার পরিণাম-চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িল। সে জগন্নাথের কাছে বিষয়ের ভাগ চাহিল। জগন্নাথ কিন্তু ভাগ দিল না, পরন্তু শত্রুপক্ষের উত্তেজনায় মেয়েমানুষের এমনভাবে নাচিয়া উঠা যে ভাল নহে, ইহাই তাহাকে বুঝাইয়া দিল। জ্ঞানদা কিন্তু বুঝিল না। সে পতিতপাবনকে সহায়স্বরূপ পাইয়া জমী-জায়গা চুল চিরিয়া ভাগ করিয়া লইতে উদ্যত হইল। জগন্নাথ তাহাকে উপদেশ দিল, তিরস্কার করিল, বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবার ভয় দেখাইল। জ্ঞানদা ভয় পাইল না, সে ভাসুরের নামে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া দিল। পতিতপাবন মোকদ্দমার খরচ চালাইতে লাগিলেন।

বছরখানেক মোকর্দ্দমা চলিল। জগন্নাথের বিস্তর টাকা খরচ হইয়া গেল; পতিতপাবনেরও খরচ বড় কম হইল না। গ্রামের পাঁচ জন ভদ্রলোকে এই গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য উভয়কেই পরামর্শ দিলেন। জগন্নাথ সে পরামর্শ শুনিল, পতিতপাবন কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, জ্ঞানদাও না। ভদ্রলোকরা মীমাংসার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া নিরস্ত হইলেন।

জগন্নাথ কিছুতেই যখন পারিয়া উঠিল না, তখন সে পতিতপাবনের নাম সংযোগে জ্ঞানদার নামে একটা কুৎসিত অভিযোগ গ্রামে প্রচার করিয়া দিল। এমন কি, এই সকল কথা লইয়া আদালতে পর্য্যন্ত হাস্য-পরিহাস চলিতে লাগিল। মেয়েমানুষ সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তাহার সুনামের মর্য্যাদার উপর বিন্দুমাত্র আঘাত সহিতে পারে না। সুতরাং এ আঘাতে জ্ঞানদা মর্ম্মাহত হইল; সে মোকর্দ্দমা হইতে নিরস্ত হইবার জন্য পতিতপাবনকে অনুরোধ করিল। পতিতপাবন কিন্তু তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, তাহাতে এখন নিবৃত্ত হইবার উপায় নাই। এখন নিবৃত্ত হইলেও যে কথাটা রটিয়াছে, তাহা কখনই চাপা পড়িবে না; লাভের মধ্যে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে মাত্র। জগন্নাথের ঘরে তাহার আর স্থান নাই, অপরেও ভিখারী বলিয়া তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু সম্পত্তিটা যদি উদ্ধার করা যায়, তবে পয়সার জোরে কেহই তখন মুখ তুলিয়া একটা কথা কহিতে পারিবে না।

জ্ঞানদাও ইহাই বুঝিল, এবং সে পতিতপাবনের উপর নির্ভর করিয়া নিজের বিরুদ্ধে কুৎসিত অভিযোগটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু বেশী দিন সে এইরূপে হাসিয়া উড়াইতে পারিল না; ক্রমে যখন গ্রামে মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল, এবং চারিদিক্ হইতে উপহাসের তীব্র বাণগুলা আসিয়া ঘরের ভিতরেও তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল, তখন জ্ঞানদা না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না; সে আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া, কি উপায়ে এই ভীষণ লোক-নিন্দার হাত হইতে উদ্ধার পাইবে, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইল।

পরিশেষে এক দিন জ্ঞানদার অর্গলবদ্ধ স্বগৃহমধ্যে তাহার প্রাণহীন দেহটা রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় বিলম্বিত দেখিয়া গ্রামের লোক চমৎকৃত হইল, পতিতপাবন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। পুলিস আসিল, জ্ঞানদার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হইল। পতিতপাবন জগন্নাথের ঘাড়ে দোষটা চাপাইবার চেষ্টা করিলেন; তিনি ইহাই প্রমাণিত করিতে চেষ্টিত হইলেন যে, জগন্নাথ প্রতিহিংসার বশে ভ্রাতৃবধূকে খুন করিয়া এইভাবে রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু এ অভিযোগ প্রমাণিত হইল না, আত্মহত্যাই স্থিরীকৃত হইল। জগন্নাথ নিষ্কৃতি লাভ করিল।

জ্ঞানদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোকর্দ্দমার অবসান হইল। লাভের মধ্যে পতিতপাবনের তিন চারি শত টাকা গেল। টাকাগুলার জন্য পতিতপাবন মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন।

শুধু যে টাকাগুলার শোকই তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিল, তাহা নহে; জ্ঞানদার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুটাও তাঁহার মর্ম্মস্থলে গিয়া তীব্রভাবে আঘাত দিল। এই বিধবার মৃত্যুর জন্য তিনি যে অনেকটা দায়ী, এই চিন্তাটাকে তিনি কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না। এক একবার মনে হইত, কিসের দায়িত্ব? তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা সে বহিতে পারিল না, কাজেই আত্মহত্যা করিয়া সে বোঝা নামাইয়া দিল; সুতরাং তাহার মৃত্যুর জন্য পতিতপাবন নিজে একটুও দায়ী হইতে পারেন না।

কিন্তু তাহার এই কলঙ্কের মূল কে? মূল ত তিনিই। তিনি যদি স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিধবাকে উত্তেজিত না করিতেন, যদি মোকর্দ্দমা বাধাইয়া এতটা গোলযোগের সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে ত জ্ঞানদা এমন দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইত না, তাহা হইলে ত সে এমনভাবে গলায় দড়ী দিয়া আত্মহত্যা

করিতে যাইত না? যখন কলঙ্কের সূচনা হয়, তখনই ত জ্ঞানদা নিবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু স্বার্থহানির আশঙ্কায় পতিতপাবন নিরস্ত হইতে পারেন নাই, স্তোকবাক্যে তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলেই বিধবার এইরূপ নির্ম্মম আত্মহত্যা। সুতরাং তাহার আত্মহত্যার জন্য পতিতপাবনই ত সম্পূর্ণ দায়ী। ওঃ, স্ত্রী-হত্যার দায়িত্ব! কথাটা মনে হইলেই পতিতপাবন অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেন। জ্ঞানদার রজ্জুবিলম্বিত প্রাণহীন দেহটা যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দুলিতে থাকিত। উঃ, কি ভীষণ মূর্ত্তি সে! সুন্দরী যুবতীর তেমন সৌন্দর্য্যময় দেহটা ঠিক কাঠের মত শক্ত হইয়া বাতাসে দুলিতেছিল, হাত দুইটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘাড়টা বাঁকিয়া গিয়াছে, চোখ দুইটা চক্ষু-গহ্বর হইতে যেন ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। ওঃ, সেই চোখ দুইটা কি ভীষণ! তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই পতিত-পাবনের মনে হইয়াছিল, সেই ভয়ানক চোখ দুইটা দিয়া জ্ঞানদা তাঁহাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। একবার সেই চোখের দিকে চাহিয়াই পতিতপাবন ভয়ে ভয়ে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার সে দিকে ফিরিয়া চাহিতে সাহস করেন নাই। পতিতপাবনের মনে হইত, সেই দেহটা নিয়ত যেন তাঁহার সম্মুখে পার্শ্বে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর বজ্রকঠোরস্বরে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে—'পাষণ্ড! তোর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।'

পতিতপাবনও বুঝিলেন, এই স্ত্রীহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তথাপি তিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি দলীল-দস্তাবেজ, রায়ের নকল, সাক্ষীর জবানবন্দী—সব একটা সিন্দুকে পূরিয়া চাবী লাগাইলেন, এবং চাবীটা পুকুরের জলে ফেলিয়া দিলেন; তাহার পর অনেক ভাবিয়া পাপতাপহারী শ্রীহরির চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

লোক কিন্তু এত কথা বুঝিল না; মামলাবাজ জালিয়াৎ পতিতপাবন ঘোষকে হরিনামে মত্ত দেখিয়া, তাঁহার এই হরি-প্রেমের অন্তরালে যে কোন একটা ভীষণ দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহা সহজেই অনুমান করিয়া লইল এবং তজ্জন্য তাঁহাকে 'বিড়াল-তপস্বী' আখ্যা প্রদান করিল।

২

"শুক কহে শুন ওহে পাণ্ডু-অলঙ্কার।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তুমি অতি চমৎকার॥
মায়ায় মোহিত হয়ে কাটায় জীবন।
নাহি চিন্তে ম'লে আর না হবে মরণ॥
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু নাহি জানি মনে।
ভবার্ণবে ভাসে সদা মিথ্যা নাহি গণে॥
বিফল ভবের আশা জানিবে হৃদয়ে।
যত আশা কর তত আশাই বাড়িবে॥
ওহে রাজা তাই বলি করহ শ্রবণ।
ইন্দ্রিয়েরে বশ কর ঘুচাতে বন্ধন॥
যদি কর মনোরথ সে অভয় পদ।
শুন শুন কৃষ্ণ নাম ধ্বংসিবে বিপদ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন কর মজ কৃষ্ণ নামে।
পাপ তাপ দূরে যাবে সে নামের গুণে॥
স্ত্রীহত্যা গোহত্যা আদি যত পাপ করে।
নামের গুণেতে জীব সর্ব্বপাপে তরে॥"

"দাদা মহাশয়!"

চমকিতভাবে ভাগবত হইতে মুখ তুলিয়া পতিতপাবন উত্তর দিলেন, "কে, নেত্য?"

"হাঁ দাদামশায়, আমি।"

চোখের চশমাটা খুলিতে খুলিতে পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর, কি মনে ক'রে নেত্য?"

নেত্য বলিল, "অনেক কথাই মনে ক'রে এসেছি, কিন্তু তোমার সময় আছে কি?"

ঈষৎ হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "অসময়টাই বা কি এমন দেখ্‌লে?"

সহাস্যে নেত্য বলিল, "তোমার শত্রু যে, তার অসময় হোক, তবে তুমি এখন পুঁথিপত্র আর জপতপ নিয়েই ব্যস্ত কি না, তাই বল্‌ছি।"

মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "ব্যস্ত এমন কিছুই নয়, নেত্যমণি, তবে একটা কাজ নিয়ে থাকৃতে হবে ত?"

"এই সব ছাড়া তোমার কি আর কাজ নাই?"

"আছে, তবে কাজের মত কাজ তেমন নাই।"

"এইগুলোই কি কাজের মত কাজ?"

"ধস্তে গেলে তাই বটে। তবে হয়ে ওঠে না।"

"হয় না কেন?"

"মন হয়েছে পাপ,—সে বাজে কাজের দিকে যতটা ঝুঁকে পড়ে, আসল কাজের দিকে তার এক বিন্দুও ঝোঁক দেয় না, বুঝেছ?"

"বুঝেছি" বলিয়া নেত্য কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল; তার পর সে একটু দুঃখগম্ভীরস্বরে বলিল, "তবে তুমি তোমার আসল কাজই কর, আমি এখন উঠি।"

নেত্য উঠিবার উপক্রম করিতেই পতিতপাবন একটু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "উঠচো যে, কি বল্‌তে এসেছিলে, বল না।"

মুখখানাকে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া নেত্য বলিল, "থাক্, সে বাজে কাজ।"

মৃদু-গম্ভীর হাস্যসহকারে পতিতপাবন বলিলেন, "তোমার কাজ হাজার বাজে হলেও আমার কাছে তা মস্ত আসল কাজ; তা কি জান না, নেত্যমণি?"

"সত্যি নাকি" বলিয়া নেত্য মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথাটা কি, নেত্যমণি?"

নেত্য বলিল, "অপর কিছু নয়, শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস্ কত্তে এসেছি।"

"কি কথা?"

নেত্য একটু ভাবিয়া যেন বিষাদগম্ভীরস্বরে বলিল,"বলি, আমরা দেশে বাস কর্‌বো, না দেশ থেকে উঠে যাব?"

পতিতপাবন বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে নেত্যর মুখের দিকে চাহিলেন। নেত্য বলিল, "গাঁয়ের সকলেই তোমার মত আসল কাজ নিয়ে ব্যস্ত নয়, তারা বাজে কাজই বেশীর ভাগ করে।"

"তা করে" বলিয়া পতিতপাবন সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন করিলেন। নেত্য নতমুখে বসিয়া নখ দিয়া মাটী খুঁটিতে লাগিল। পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা কি করেছে নেত্য?"

নেত্য বলিল, "এমন কিছু করে নি, তবে আমি যাতে দেশে না থাকি, তারই যোগাড় করেছে।"

"তারা তা হ'লে নেহাৎ বোকা" বলিয়া পতিতপাবন মৃদু হাসিলেন এবং নেত্যর মুখের উপর একটা সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুমি গেলে দেশে থাক্‌বে কি? গাঁখানা যে অন্ধকার হয়ে যাবে।"

মৃদু হাসিয়া নেত্য বলিল, "তা গাঁয়ের সকল লোক ত তোমার মত চালাক নয়, দাদামশায়; তারা যে আলো ছেড়ে অন্ধকারে থাক্‌তেই ভালবাসে।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক পতিতপাবন বলিলেন, "পেঁচার স্বভাবই ঐ রকম বটে।"

বলিয়াই তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নেত্য মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। একটু পরে সে মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "জগুকাকার কাছে বাবা শ'দুই টাকা দেনা ক'রে গিয়েছিলেন, না?"

পতিতপাবন বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ, সেই তোর বিয়ের সময়, না?"

কথাটা বলিতেই পতিতপাবনের মুখখানা যেন একটা বিষাদের গম্ভীর ছায়ায় অন্ধকার হইয়া আসিল। নেত্য তাহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ রক্তমুখে উত্তর করিল, "সে টাকার ত এক পয়সাও শোধ যায় নি। জগুকাকা বল্‌ছেন, সে টাকা এখন সুদে আসলে সাড়ে তিন শো হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

পতিতপাবন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাড়ে তিন শোই হোক, আর সাড়ে তিন হাজারই হোক, সে টাকা এখন দেবে কে?"

নেত্য। ওঁরা বলছেন, আমাকেই দিতে হবে।

পতিত। তোমাকে দিতে হবে? তুমি দেবে কোথা হ'তে?

নেত্য। না দিতে পারি, আমাদের ঘটী-বাটি, ঘর-ভিটে বেচে আদায় কর্‌বে।

ঈষৎ রোষগম্ভীরকণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "কে আদায় কর্‌বে? জগা হাজরা?"

নেত্য বলিল, "তাঁর কাছেই ত দেনা।"

পতিতপাবন কোন উত্তর করিলেন না। সায়াহ্নের সূর্য্য তখন গাঢ় সিন্দূররাগে পশ্চিম আকাশটাকে রঞ্জিত করিয়া দিতেছিল। সেই রক্তরাগমণ্ডিত আকাশপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পতিতপাবন নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নেত্য জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কি বল, দাদামশায়?"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "আমি আর কি বল্‌বো, নেত্য; ধার করলেই শুধতে হয়। তবে জগা হাজরারও একটু বিবেচনা করা উচিত ছিল, তুমি টাকা দেবে কোথা হ'তে? মা নাই, বাবা নাই, শ্বশুর-বাড়ী—"

বলিতে বলিতে পতিতপাবন হঠাৎ থামিয়া গেলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটা ঢোক গিলিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "শ্বশুরবাড়ী—সেখানেও তিন কুলে কেউ নাই। অনাথা বিধবা, কোন রকমে কষ্টে স্বষ্টে সাত বছরের ভাইটিকে মানুষ কচ্চে, তার ওপর জুলুম!—নেহাৎ পয়সাখোর হাড়ী না হ'লে কেউ এ রকম জুলুম কত্তে পারে না, নেত্য।"

ঘৃণায়, ক্ষোভে পতিতপাবনের ললাট কুঞ্চিত হইল। নেত্য বলিল, "এখন উপায় কি? যার কাছে যাই, সে-ই বলে, আমরা কি করবো।"

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "আমিও বোধ হয় তার বেশী কিছু বল্‌তে পার্‌বো না।"

নেত্য কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া হতাশ-বিবর্ণ মুখখানা তুলিয়া বলিল, "তবে আমি এখন যাই।"

"এস" বলিয়া পতিতপাবন সম্মুখপতিত ভাগবতখানার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। নেত্য উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পতিতপাবন পুনরায় চোখে চশমা লাগাইয়া পুঁথির পাতা উল্‌টাইয়া পড়িতে লাগিলেন—

"মায়ারে করিতে নাশ চাহি আত্মজ্ঞান।
তাহে সত্য জনার্দ্দন বেদের প্রমাণ॥
কৃষ্ণভক্তি বিনা নাহি লভে আত্মজ্ঞান।
আত্মরূপে সেই কৃষ্ণ নিত্য বর্ত্তমান॥
ভাব সেই জনার্দ্দন হৃদয়-আসনে।
অন্তিমে বিলীন হবে তাঁহার চরণে॥"

পড়িতে পড়িতে পতিতপাবন থামিয়া গেলেন, পড়িতে যেন ভাল লাগিল না। তিনি পুঁথি মুড়িয়া, চোখের চশমা খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

জগা হাজরার কি নিষ্ঠুরতা—কি আক্কেল! একটা অনাথা বিধবার যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া টাকা আদায় করিবে—তাহাকে পথে বসাইবে। কিন্তু উপায় কি? উপায় কি কিছুই নাই? পতিতপাবন ঘোষ কি ইহার কোন উপায়ই করিতে পারে না? সে এই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের মধ্যে কত কাণ্ড করিয়াছে, কত 'হয়'কে 'নয়'—'নয়'কে 'হয়' করিয়া দিয়াছে, কত লোকের হকের ধন কাড়িয়া লইয়াছে, কত নির্দ্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জেলে পাঠাইয়াছে, আর জগা হাজরার এই টাকা কয়টা উড়াইয়া দিতে পারে না? মনে করিলে খুব পারে। উহার জাল সই-করা একটা রসিদ—খতখানা খোয়া গিয়াছে বলিয়া রসিদ লিখিয়া দিতেছে। খতের নম্বরটা দিতে পারিলে ভাল হয়। সেটাই বা কি এমন দুঃসাধ্য ব্যাপার? রেজেষ্টারী আপিসে খোঁজ করিলেই ত নম্বর পাওয়া যায়। তারিখটা জানা নাই, কিন্তু জগার বিবাহের সন মাসটা ঠিক মনে আছে—তের শো সাত সাল, ফাল্গুন মাস। এই তের শো সাত সালের ফাল্গুন মাসটাকে পতিতপাবন জীবনে ভুলিতে পারিবে না। সুতরাং একটু চেষ্টা করিলেই জগা হাজরার দাবীটা এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

হয় সব, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? আবার সেই মামলা-মোকর্দ্দমা, সেই আদালত আর ঘর, সেই উকীল মোক্তার সাক্ষী শমন। এ দিকে নিজের শমন যে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপায় কে করিবে? নেত্য? হরি হরি! এই নেত্যকে লইয়া এক দিন কি ভোগাই না ভুগিতে হইয়াছে! তাহাকে তৃতীয়পক্ষরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইয়া কি অপমান, কি লাঞ্ছনা, কি উপহাসটাই না সহিতে হইয়াছে! ঐ নেত্যর বাপ কালী হাজরা দশ জনের সাম্‌নে পতিতপাবনের মুখের উপর বড় গলা করিয়া বলিয়াছিল, "তোমার মত বুড়োর হাতে মেয়ে দেওয়ার চাইতে মেয়ের গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবিয়ে দেওয়া ভাল।" তাহার কথা শুনিয়া পতিতপাবনের মনে হইয়াছিল, ইহা অপেক্ষা নিজের গলায় কলসী বাঁধিয়া পতিতপাবনের জলে ঝাঁপ দেওয়া খুব ভাল। ওঃ, সে সময়ে কালী হাজরা কি নির্ম্মমভাবে তাঁহার মাথাটা হেঁট করিয়া দিয়াছে। লোক তাঁহার নামে কত গান বাঁধিয়াছে, বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো বলিয়া কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছে! সে বিদ্রূপের জ্বালায় পতিতপাবন বোধ হয় এক মাস ঘরের বাহির হইতে পারেন নাই। জীবনে পতিতপাবন ঘোষের অপমান সেই প্রথম—সেই শেষ।

সেই কালী হাজরার মেয়ে—সেই নেত্যর জন্য পতিত-পাবন আবার কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইবে;—পরকালের ভাবনা ছাড়িয়া আবার মোকর্দ্দমার ভাবনা ভাবিতে যাইবে! যে

মামলার নেশা ছাড়াইয়া মনকে কৃষ্ণ-প্রেমের নেশায় বিভোর করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, কৃষ্ণ ছাড়িয়া, নাম ছাড়িয়া, তপ জপ সব ফেলিয়া রাখিয়া আবার সেই ছাই নেশার কূপে মনটাকে ডুবাইয়া দিবেন? কখনই না।

সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু তখন দিগন্তের কোলে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় আকাশের নীলিমা ম্লান হইয়া আসিতেছিল। অদূরে কে গলা ছাড়িয়া গাহিতেছিল—

"চুল হ'লো তোর শণলুটি।
কবে আর বল্‌বি রে ভাই, অধমতারণ নাম দু'টি।"

পতিতপাবন পুঁথি খুলিয়া হরিনামের মালা লইয়া বসিলেন এবং জপের গভীরতার মধ্যে সেই তের শো সাত সালের ফাল্গুন মাসটাকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা কিন্তু সফল হইল না, জপে মন বসিল না; নেত্যর সেই হতাশবিবর্ণ মুখখানা আসিয়া তাঁহার মনটাকে যেন জাল রসিদখানার দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। দূরে গায়ক তখনও গাহিতেছিল—

"গোঁসাই বলে মায়াজালে ঘেরেছে তোর দেহটি;
কখন্ বল্‌বি হরি বিষয় নারী ঢেকেছে সেই ভাবনাটি।
চুল হ'লো তোর শণলুটি।"

পতিতপাবন নিশ্বাস রোধ করিয়া যেন প্রাণের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ পূর্ব্বক ঘন ঘন মালা ঘুরাইতে লাগিলেন।

৩

তিন দিন যাবৎ সকালে সন্ধ্যায় দুপুরে তিনবার করিয়া হাতের মালা খুব ঘন ঘন ঘুরিলেও মালাছড়ার সঙ্গে মনটা যখন একবারও ঘুরিতে চাহিল না, তখন পতিতপাবন এই অবাধ্য মনটার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং যেন খুব রাগত ভাবেই নেত্যর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "নেত্য!"

নেত্য গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিল; হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল; ব্যস্তভাবে উত্তর দিল, "কেন দাদামশায়?"

ঈষৎ উচ্চস্বরে পতিতপাবন বলিলেন, "কেন কি? টাকাটার উপায় কিছু হ'লো?"

নেত্য ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আমি আর কি উপায় কর্‌বো?"

রাগে চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তবে কে উপায় কর্‌বে—আমি? বেশ, তোমার চাইতে আমার মাথাব্যথা এত বেশী না কি?"

নেত্য সে কথার কোন উত্তর দিল না; সে নতমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং একখানা আসন আনিয়া দাওয়ার উপর পাতিয়া দিল। আসনখানার দিকে কঠোর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভ্রূভঙ্গী সহকারে পতিতপাবন বলিলেন, "আর আদর ক'রে আসন দিতে হবে না। আমি এখানে বস্‌তে আসি নাই, শুধু কি কর্‌লে, তাই জান্‌তে এসেছি।"

নেত্য বলিল, "যখন এসেছ, তখন ব'সো না।"

মুখ মুচকাইয়া পতিতপাবন বলিলেন, "বস্‌বার আমার সময় নাই। বেলা হয়ে যাচ্ছে, এর পর পূজো আহ্নিক আছে। তোমার ঘরে ব'সে দিন কাটালে তো আমার চল্‌বে না।"

নেত্য একটু হাসিল; বলিল, "আমি কি আর দিন কাটাতে বল্‌ছি, দাদামশায়, তবে গরীবের ঘরে যখন এসেছ, তখন দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় কি?"

তাহার হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানার দিকে চাহিতেই পতিতপাবনও একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি অগ্রসর হইয়া থপ্ করিয়া আসনখানার উপর বসিয়া পড়িলেন, এবং হাস্য-গম্ভীর মুখে বলিলেন, "কি জান, নেত্য, আমার আর এ সব ভাল লাগে না। এতকাল বিষয়-আশয়, মামলা-মোকর্দ্দমা নিয়ে কাটিয়েছি, কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি, সুখ একটি দিনের তরেও পাই নি। এক একটা মামলায় জয়ী হয়ে মনে হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা বুঝি আমার পায়ের তলায় এসে পড়েছে। কিন্তু সে কতক্ষণ? মদের নেশাটা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই ফূর্ত্তি, ঘোরটুকু কেটে গেলেই সব ফাঁক। তখন মনে হয়, কি ঝকমারীর কাজ!"

নেত্য বলিল, "তাই বুঝি ঝকমারীর কাজ ছেড়ে আসল কাজ ধরেছ?"

সহাস্যে পতিতপাবন বলিলেন, "সে কথা বড় মিছে নয়, নেত্য। বাস্তবিক সুখ যদি কিছু থাকে, তবে ঐ হরিনামেই আছে। আহা, 'হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' আর কোন গতি নাই, নেত্য, কোন গতি নাই। হরি হে, পার কর!"

পারের কর্ত্তার উদ্দেশে পতিতপাবন দুঃখসূচক গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অদূরে দাঁড়াইয়া নেত্য খুঁটীর গায়ে টোকা দিতে লাগিল। পতিতপাবন বিষাদগম্ভীর মুখে কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে কি করবে বল দেখি, নেত্য ?"

নেত্য বলিল, "তুমি যেমন ব'লে দেবে, তাই করবো।"

একটু ভাবিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "এর মধ্যে তোমার জগু কাকার কাছে গিয়েছিলে ?"

নেত্য বলিল, "গিয়ে কি হবে ?"

ঈষৎ উষ্ণস্বরে পতিতপাবন বলিলেন, "গিয়ে একটু কাঁদা-কাটা করলে দেনাটা রেহাই দিতে পারে।"

নেত্য। হাজার কাঁদা-কাটা করলেও তা দেবে না।

পতিত। না দেয়, পায়ে ধর।

নেত্য। পায়ে মাথা কুটলেও কিছু হবে না।

রোষতীব্রকণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "পায়ে ধ'রে কিছু হবে না, কাঁদাকাটা ক'রে কিছু হবে না, তবে কি মামলা-মোকর্দ্দমা করবে ? মোকর্দ্দমা চালাবে কে শুনি ?—আমি ?—আমার দ্বারা ও সব আর হবে না, নেত্য, তাতে ভালই বল আর মন্দই বল।"

ঈষৎ ব্যথিত কণ্ঠে নেত্য বলিল, "আমি তোমাকে ভাল মন্দ কিছুই বলিনি, দাদামশায়।"

ক্রোধে মুখখানাকে বিকৃত করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "বলতে পার না, তবে আমার কাছে গিয়েছিলে কেন ?"

একটু রাগতভাবে নেত্য উত্তর করিল, "ঝকমারী করেছি।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পতিতপাবন রাগে যেন ফুলিতে লাগিলেন। নেত্যর মুখেও ক্রোধের রক্তিমরাগ ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুখটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল।

পতিতপাবন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ক্রোধগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ঝকমারী তুমি কর নি, নেত্য, ঝকমারী করেছি আমি। সেধে তোমাকে পরামর্শ দিতে এসে, আমি দু'শো-বার—হাজারবার ঝকমারী করেছি।"

কথাটা শেষ করিয়াই পতিতপাবন ঝড়ের মত বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ীর বাহিরে আসিতেই সম্মুখে জগন্নাথ হাজরাকে দেখিয়া পতিতপাবন যেন একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গিয়েছিলেন, ঘোষজা মশাই ?"

পতিতপাবন বলিলেন, "নেত্য একবার ডেকেছিল।"

"পরামর্শ কর্ত্তে না কি ?"

জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথের ঠোঁটের কোণে যে একটু শ্লেষের হাসি ফুটিয়া উঠিল, তাহা পতিতপাবনের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তিনি জোর গলায় "হাঁ" বলিয়াই পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

বাড়ী ফিরিয়া পতিতপাবন আজ্ঞামাত্র তামাক না পাইয়া চাকরটাকে গালি দিলেন; বাড়ীর ভিতর গিয়া বিধবা ভগিনী সুভদ্রাকে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত দর্শনে পিণ্ডদানের জন্য এত ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই বলিয়া তিরস্কার করিলেন: তাহার পর এই জ্বালাযন্ত্রণাপূর্ণ সংসারপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীহরির নিকট ব্যগ্রতা জ্ঞাপন করিয়া স্নান করিতে চলিলেন।

স্নানান্তে পতিতপাবন পূজায় বসিলেন। সে দিন পূজা শেষ হইতে এত অধিক সময় লাগিল যে, তাহাতে সুভদ্রা পর্য্যন্ত বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে রান্না শেষ করিয়া পূজার ঘরের দরজায় উঁকি দিয়া দেখিল, পতিত-পাবন তখনও বসিয়া মালা ঘুরাইতেছেন। সুভদ্রা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বেলা যে আড়াইপ'র গড়িয়ে গেল, দাদা!"

পতিতপাবন ফিরিয়া তাহার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর পুনরায় মুখ ফিরাইয়া মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। সুভদ্রা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

আরও খানিক পরে পূজা শেষ করিয়া পতিতপাবন যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার চোখে মুখে ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র নাই; একটা পরিপূর্ণ শান্তি ও প্রফুল্লতা আসিয়া তথায় বিরাজ করিতেছে। সুভদ্রা বলিল, "একে-বারে অবেলা ক'রে ফেললে, দাদা ? খাবে কখন্ ?"

স্নিগ্ধ কোমল স্বরে পতিতপাবন বলিলেন, "এই যে এবার খাচ্চি। বেলাটা একেবারেই গিয়েছে বটে। তা তুই ত এতক্ষণ খেয়ে নিলে পারতিস্।"

চোখে মুখে খুব একটা বিস্ময়ের ভাব আনিয়া সুভদ্রা

বলিল, "কও কথা! দাদা, তোমাকে ফেলে আমি আগে খেয়ে নেব? আমার কি পোড়া পেটের এতই জ্বালা?"

পতিতপাবন হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না, সুবি, আমারি পোড়া পেটের জ্বালা বেশী। এখন এক মুঠো দে দেখি, জ্বালার শান্তি করি।"

"দাদার এক কথা" বলিয়া সুভদ্রা তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া দিল। পতিতপাবন গিয়া খাইতে বসিলেন।

মনের সকল বিরক্তি—সকল চাঞ্চল্য দেবতার চরণে সমর্পণ করিয়া, অন্তরে একটা পরিপূর্ণ শান্তি লইয়া পতিতপাবন বেশ স্বচ্ছন্দচিত্তেই তপ জপ লইয়া দিন কাটাইতেছিলেন, কিন্তু কয়েক দিন পরে যখন সংবাদ পাইলেন, জগন্নাথ হাজরা মৃত কালী হাজরার নামে সাড়ে তিন শত টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করিয়াছে, তখন তাঁহার মনের শান্তিটা যেন তিরোহিত হইবার উপক্রম করিল।

৪

পতিতপাবন শুধু যে মানসিক চাঞ্চল্যটুকু দূর করিবার জন্যই দেবতার চরণে কাতর প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহা নহে, সেই সঙ্গে তিনি নেত্যকেও অন্তর হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। কে নেত্য যে, তাহার জন্য এত উদ্বেগ—এত ব্যাকুলতা? সে পরস্ত্রী, বিধবা; তাহার জন্য এতটা চাঞ্চল্য দোষের কথা—পাপের কথা নহে কি? লোকই বা কি বলিবে? মামলা-মোকর্দ্দমা ছাড়িয়া তিনি তপজপে মনোনিবেশ করিয়াছেন, ইহাতেই লোক কত কথা কহিতেছে; সাক্ষাতে না বলুক, পরোক্ষেও 'বিড়াল-তপস্বী' বলিয়া উপহাস করিতেছে। ইহার উপর যদি তিনি নেত্যর সহিত ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করেন, তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া জগা হাজরার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি নিজেই কি লোকের পরিহাসসূচক বিড়াল-তপস্বী আখ্যাটাকে সার্থক করিয়া দিবেন না? লোক কি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া উপহাসের অট্টহাসি হাসিবে না? তিনি কি বলিয়া সে অট্টহাসির প্রতিবাদ করিবেন?

তা ছাড়া তিনি দেবতার নিকটেই বা কি কৈফিয়ৎ দিবেন? জীবনের ম্লান অপরাহ্ণে অসার সংসার-চিন্তাকে পরিহার করিয়া পরকালের চিন্তাকেই সার করিয়া লইয়াছেন, সম্মুখে বিশাল ভবসিন্ধুর ভীমতরঙ্গ দেখিয়া তাঁহা পার হইবার আশায় ভব-কাণ্ডারীর চরণ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, সেই দেবতাই বা কি বলিবেন? আরে ভণ্ড! মনের ভিতর পরস্ত্রীর—একটা সুন্দরী বিধবার চিন্তা লইয়া, 'ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ' বলিয়া আমার কাছে মুক্তি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিস্,—মনে ভারী পাপের বোঝা, আর হাতে হরিনামের মালা লইয়া আমাকে প্রবঞ্চনা করিতে উদ্যত হয়েছিস্? দূর হ' পাপিষ্ঠ, তোর কোন কালে মুক্তি নাই—কোন কালে উদ্ধার নাই! দেবতার এই কঠোর অনুজ্ঞার উত্তরে পতিতপাবন কি বলিবেন?

কি করিব, ঠাকুর, মানুষের বিপদ্ দেখিয়া কি স্থির থাকা যায়? আ রে দয়ার অবতার! তুই আমাকে দয়া ভিক্ষা দিতে আসিয়াছিস্? জগতে বিপন্ন কি আর কেহ নাই? ঐ যে তোর পাড়াতেই রামজয় মুখুজ্যে কন্যাদায়ে অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ঐ যে মিথ্যা বাকী খাজনার দায়ে জমীদার রেজো মাইতির যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া লইতেছে। ঐ যে ধনা তেলী, রমা বারুই অন্নাভাবে উপবাসে দিন কাটাইতেছে! কৈ, তাহাদের জন্য তো তোর দয়ার দ্বার উন্মুক্ত হয় না? তোর যত দয়া বুঝি এই সুন্দরী বিধবাটির উপর! ধিক্!

এত শক্তি কোথায় পাইব দেবতা যে, জগৎশুদ্ধ লোকের উপর দয়া প্রদর্শন করিব? দুঃখীর দুঃখ দর্শনে দয়া হয় বটে, সকলের দুঃখ দূর করিবার সামর্থ্য কোথায়? সকল বিপন্নকে সাহায্য করিতে অক্ষম বলিয়া একটা বিপন্নকেও বিপন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হইব না কি?

বেশ একটি বিপন্ন বাছিয়া লইয়াছিস্ প্রবঞ্চক, যে তোর দরজায় আসিয়া সাহায্য ভিক্ষা করে না, বরং সাহায্য করিবার জন্য যাহার দরজায় গিয়া তুই মাথা খুঁড়িয়া মরিস্। আর কাল গদা চাঁড়ালের মা খাইতে পায় না বলিয়া তোর কাছে দুই গণ্ডা পয়সা ভিক্ষা চাহিলে তুই তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলি! সে বুড়ী—সে চাঁড়ালের মেয়ে, সুতরাং তোর দয়ার পাত্রী নয়। আরে মূর্খ, তুই কাহাকে বিপন্ন জ্ঞানে সাহায্য করিতে উদ্যত হয়েছিস্? ঐ নেত্যর জন্য এক দিন তুই কি লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলি? এমন কি, ইচ্ছা ও ক্ষমতা সত্ত্বেও ঐ ধিক্কারে তোর আর সংসার-ধর্ম্ম করা হইল না। ঐ নেত্য তোর ইহকালের শত্রু,

পরকালের পথে বিষম কণ্টক। তোর যদি কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে, তবে এখনও সাবধান হইবি।

পতিতপাবন সাবধান হইলেন, এবং নেত্যর স্মৃতিটাকে পর্য্যন্ত অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সুতরাং জগন্নাথ হাজরা মামলা রুজু করিয়াছে শুনিয়া পতিতপাবন চুপ করিয়া রহিলেন। একটা অশান্তি আসিয়া মনটাকে উৎপীড়িত করিলেও তিনি পূজা-আহ্নিক, তপ-জপ আর পুঁথিপত্রের ভিতর সে অশান্তিকে ডুবাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ করিতে থাকিলেন।

৫

"জগু কাকা আমাদের নামে মামলা রুজু করেছে, শুনেছ, দাদামশায়?"

পুঁথি হইতে মুখ না তুলিয়াই পতিতপাবন উত্তর করিলেন, "শুনেছি।"

তাঁহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দর্শনে নেত্য শুধু আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, একটু সঙ্কুচিত হইল। সে পরামর্শ লইতে আসিলেও অতঃপর কি বলিয়া পরামর্শ চাহিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। পতিতপাবনও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া গম্ভীর মুখখানা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারি পরামর্শ নিতে কি আমার কাছে এসেছ?"

মৃদু হাসিয়া নেত্য বলিল, "তা নয় তো কি এমন সময় তোমার সঙ্গে হাসি-তামাসা কত্তে এসেছি?"

গম্ভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক পতিতপাবন বলিলেন, "এলেও হাসি-তামাসার বয়স আমার আর নেই, নেত্য! আর পরামর্শ—তা গাঁয়ে তো আরও অনেক লোক আছে?"

"তারা সকলেই তোমার কাছে আস্‌তে পরামর্শ দেয়।"

"কেন?"

"কি জানি।"

পতিতপাবনের আশঙ্কাটা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি নতমুখে মুদিত নেত্রে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

"দাদামশায়!"

নেত্যর মুখের উপর সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বেদনাজড়িত কণ্ঠে পতিতপাবন বলিলেন, "আমাকে মাপ কর, নেত্য, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মামলা-মোকর্দ্দমার কথায় আর থাক্‌বো না।"

নেত্য মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। পতিতপাবনের বুকটাকে কাঁপাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

হায় রে লোকনিন্দা! মামলা-মোকর্দ্দমা না করিলেও পতিতপাবন কি এই বিপদ্ হইতে নেত্যকে রক্ষা করিতে পারেন না? সাড়ে তিন শত টাকা মাত্র—এই টাকাটা ফেলিয়া দিলেই সব গোল মিটিয়া যায়! কিন্তু গোল মিটে না, বরং আরও বাড়ে। এতগুলা টাকা দিয়া একটা নিঃসম্পর্কীয়া বিধবাকে সাহায্য করা—এই সাহায্যের মধ্য হইতে লোক খুঁজিয়া খুঁজিয়া এমন একটা মন্দ উদ্দেশ্য বাহির করিবে—যাহাতে পতিতপাবনের গ্রামে মুখ দেখান ভার হইবে, আর নেত্যকেও হয় ত দেশত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ অনাথার আর কোন উপায়ই নাই। পতিতপাবনের বুকের ভিতর একটা আলোড়ন উপস্থিত হইল। তিনি পূজার ঘরে গিয়া, রাধাকৃষ্ণের পটের সম্মুখে মাথা কুটিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হে ঠাকুর, মূর্খ আমি, আমাকে রক্ষা কর—পথ দেখাইয়া দাও।"

সেই দিন রাত্রিতে পতিতপাবন সুভদ্রাকে বলিলেন, "এখানে আর ভাল লাগ্‌ছে না, সুবি, বৃন্দাবনে যাবি?"

দাদামাত্র-সম্বল সুভদ্রার ইহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, বরং যথেষ্ট আগ্রহই ছিল। সুতরাং সে আহ্লাদে বলিল, "কেন যাব না?"

"তবে পোঁটলাপুঁটুলী বাঁধ্।"

"কবে যাবে?"

"যত শীগ্‌গীর হয়। জমীজায়গাগুলোর বন্দোবস্ত কত্তেই যা দেরী।"

সুভদ্রা সানন্দে পোঁটলা বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

৬

গোঁসাই আকুলি বলিলেন, "শুনেছ হে ঘোষজা, জগন্নাথ হাজরা যে কালী হাজরার ঘর-ভিটে ক্রোক দিয়েছে।"

গম্ভীরভাবে পতিতপাবন উত্তর দিলেন, "বটে!"

সহানুভূতির কোমল স্বরে আকুলি মহাশয় বলিলেন, "আহা! অনাথা মেয়েটা, তার ওপর অপোগণ্ড ভাইটি আছে। জগন্নাথের কি একটু ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নাই?"

পতিতপাবন বলিলেন, "এত ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ্‌তে গেলে কি দেনা-পাওনার কারবার চলে?"

মাথা নাড়িয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "তা বটে, তবে কি জান ভায়া, মেয়েটার মুখের দিকে চাইলে বড্ডই কষ্ট হয়। ঘর-ভিটে গেলে দাঁড়াবে কোথায়? জগন্নাথের ত একটু বিবেচনা করাও উচিত ছিল?"

পতিতপাবন বলিলেন, "কালী হাজরারও বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, টাকাটা ধার কচ্চি, শোধ দেব কোথা হ'তে।"

আকুলি মহাশয় বলিলেন, "কথাটা ঠিক; বোকামী ক'রে গেছে কালী নিজে। বোকামী নয় ত আর কি বল্‌বো? তখন যদি তোমার হাতে মেয়েটাকে দিত, তা হ'লে এই দেনাটাও হ'ত না, আর মেয়েটাও বিধবা হয়ে ঘরে থাক্‌ত না। তখন কত বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু শুন্‌লে কি? ওঃ, তোমার কি লাঞ্ছনাটাই না করেছে! ফলও হয়েছে তেমনই,—মেয়ে বিধবা হ'ল, দেনার দায়ে ঘর-ভিটে বিকিয়ে গেল। অধর্ম্মের ফল যাবে কোথায়? এই জন্যই বলে—ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাং গতিঃ।"

বলিয়া আকুলি মহাশয় জোরে মাথাটা একবার নাড়িলেন। কিন্তু তাঁহার এই সহানুভূতিপূর্ণ কথায় পতিতপাবনের মুখে বিন্দুমাত্র হর্ষচিহ্ন দেখা গেল না, বরং তাহা আরও গভীর বিষাদের ছায়ায় যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। অগত্যা আকুলি মহাশয়কে এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য কথা পাড়িতে হইল। ঘোষজা বৃন্দাবনবাসী হইবে শুনিয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দুঃখিত হইয়াছে, এবং গ্রামের মস্তকস্বরূপ ঘোষজাকে হারাইয়া তাহারা যে কি প্রকারে গ্রামে বাস করিবে, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখিত হইয়াছেন আকুলি মহাশয় নিজে। এমন কি, কথাটা শুনিয়া অবধি তাঁহার আহার-নিদ্রায় ব্যাঘাত পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। আজ কয় রাত্রি ধরিয়া তাঁহার চোখে ঘুম নাই। কাল গৃহিনী এরূপ অনিদ্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গৃহিনীর নিকট ঘোষজার বৃন্দাবনবাসকেই অনিদ্রার কারণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে গৃহিনী পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, তিনি যেন কালই গিয়া ঘোষজাকে এরূপ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

এইরূপে ঘোষজার সম্ভাব্য বিরহের আশঙ্কায় বিস্তর দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক আকুলি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা ভায়া, যাচ্চো কবে?"

পতিতপাবন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "ঠিক নাই।"

এত সহানুভূতি প্রকাশের পরও যখন ঘোষজার গাম্ভীর্য্য কিছুতেই অপসৃত হইল না, তখন আকুলি মহাশয় অগত্যা বিষণ্ণচিত্তেই উঠিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি যাহার সাক্ষাৎ পাইলেন, তাহারই নিকট পতিতপাবনের কথা উত্থাপন করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, পতিতপাবন ঘোষের বৃন্দাবনবাসের সম্ভাবনা সর্ব্বৈব মিথ্যা। বেটা বিড়াল-তপস্বী কি একটা মতলব সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই কথাটা রটাইয়া দিয়াছে।

বিড়াল-তপস্বীর সেই গুহ্য মতলবটি কি, তাহা জানিবার জন্য অনেকেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে দিনপাত করিতে লাগিল।

৭

"দীনের দিন গেল হে হরি।
আমি ভজন সাধন কখন্ করি।"

শারদ প্রভাতের সুবর্ণ আলোক শিশিরসিক্ত সেফালিকাপত্রের উপর পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছিল; তলায় ভিজা ঘাসের উপর বিস্তৃত শ্যামশয্যায় মণির ন্যায় রাশি রাশি ফুল বিছাইয়া পড়িয়া ছিল; আকাশে বাতাসে আগমনীর আনন্দ-সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। সেই আনন্দ-সঙ্গীতের মধ্যে প্রভাত-কিরণ-মণ্ডিত নীল আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পতিতপাবন গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিলেন—

"প্রভাত শর্ব্বরী হ'লে মনে করি
তুলসী কুসুম চন্দন করি;
তাতে হয় না মনোযোগ, এমনি মায়াযোগ,
শুধু ভূতের বেগার খেটে মরি।
দিন গেল হে হরি।"

গোঁসাই আকুলি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "চুপ ক'রে ব'সে আছ যে, ঘোষজা? ওদিকে ব্যাপার কি, শুনেছ?"

বিস্মিতভাবে পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার?"

আকুলি মহাশয় বলিলেন, "জগন্নাথ ত ডিক্রীজারি ক'রে কালী হাজরার ঘর-ভিটে নীলামে কিনে নিয়েছে। আজ আবার প্যায়দা সঙ্গে নিয়ে ঘরের ঘটী-বাটি টেনে বা'র কচ্চে।"

অতিমাত্র বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া পতিতপাবন আকুলি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। আকুলি মহাশয় বলিলেন, "শুন্‌ছি না কি মেয়েটাকে বাড়ীর বা'র ক'রে দেবে। ঠিকই হবে, এখন পথে পথে ভিক্ষা; যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল। তোমার নিশ্বাস হাড়ে হাড়ে ফ'লে গেল; ঘোষজা, হাড়ে হাড়ে ফ'লে গেল। দাঁড়িয়ে দেখতাম, শ্রাদ্ধ কত দুর গড়ায়; তা মিত্তিরদের বাড়ীতে চণ্ডী আছে, বেলা হয়ে যা'বে। যাক, সকলই তারার ইচ্ছা।"

আকুলি মহাশয় চলিয়া গেলেন; পতিতপাবন স্তব্ধ নিস্পন্দ-ভাবে বসিয়া রহিলেন। প্রভাতের আলো তাঁহার চোখে যেন ঝাপসা ঠেকিতে লাগিল। ওঃ! নেত্যর ঘরের ঘটী-বাটি টানিয়া বাহির করিতেছে! তার পর এই অনাথা বিধবাকে টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিবে! তাহার পর? পতিত-পাবনের মাথার শিরাগুলা যেন টন্ টন্ করিয়া উঠিল। ভগবান্, এই কি তোমার বিচার? এই অনাথাকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য কি তোমার নাই? পতিতপাবনের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল; দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াই-লো। গলায় তুলসীর মালা ছিল, সেটাকে টানিয়া ছিঁড়িলেন; কপালে বাসি চন্দনের ফোঁটা ছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিলেন; তাহার পর উর্দ্ধশ্বাসে কালী হাজরার বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

তখন পেয়াদা ঘরের ঘটী বাটি থালা বাসন বাহির করিয়া উঠানের মাঝখানে স্তূপীকৃত করিয়াছে; লেপ, বালিশ, বিছানা, চাল-ডালের হাঁড়ী পর্য্যন্ত বাহির করিয়া আনিতেছে। নেত্য দরজার এক পাশে ভাইটির হাত ধরিয়া মরার মত বিবর্ণমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পতিতপাবন পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিলেন এবং উচ্চ সতেজ কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি, নেত্য, এ বাড়ী-ঘর গিয়েছে, আমার বাড়ী-ঘর তো আছে। সুবি একা আমার সেবা পেরে ওঠে না; আজ থেকে দু' বোনে এই বুড়ো ভাইটার সেবা-যত্ন করবি, চল্।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পতিতপাবন নেত্যর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাড়ীর বাহির হইলেন। সমবেত জন-বৃন্দ অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

দরজার কাছে জগন্নাথ দাঁড়াইয়া ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঘোষজা মশায়, নেত্য কি তোমার বৃন্দাবনবাসের সঙ্গিনী হবে?"

তাহার মুখের উপর ভ্রূকুটীপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পতিত-পাবন বলিলেন, "আমার সাতপুরুষে কখন বৃন্দাবনবাসী হয় না।"

পতিতপাবন দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। বিড়াল-তপস্বীর উদ্দেশে উপস্থিত সকলেই মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

* * * *

সুভদ্রাকে সম্বোধন করিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "আজ আর পূজোর যোগাড় করবার দরকার নেই, সুবি, মালাছড়াটা দে তো, আগে ফেলে দিয়ে আসি।"

নেত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, দাদামশায়, এবার সত্যি সত্যি বিড়াল-তপস্বী সাজ্‌বে না কি?"

জোরে মাথা নাড়িয়া পতিতপাবন বলিলেন, "তাই সাজ্‌বো, তবু যার একটুও বিচার নেই, অনাথাকে রক্ষা ক'র-বার ক্ষমতা নেই, তাকে আর ডাক্‌ছি না।"

তাঁহার মুখের উপর সহাস্যদৃষ্টি স্থাপন করিয়া নেত্য বলিল, "ছি দাদামশায়, তুমি বুদ্ধিমান্ হয়ে এতটা ভুল বুঝেছ? কে বল্‌লে অনাথাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা ভগবানের নেই?"

"তা হ'লে ভগবান্ তোকে রক্ষা কর্‌লেন না কেন?"

"এই তো আমাকে তিনি রক্ষা করেছেন, তোমার কাছে আশ্রয় দিয়েছেন।"

পতিতপাবন বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নেত্যর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নেত্য বলিল, "তিনি কি আর লাঠী ঘাড়ে নিয়ে কাউকে রক্ষা কত্তে যান? এই রকমে তোমার মত বিড়াল-তপস্বীকে দিয়েই বিপন্নকে রক্ষা ক'রে থাকেন।"

আনন্দের হাসি হাসিয়া পতিতপাবন বলিলেন, "ঠিক বলেছ, নেত্য, তিনিই ত তোমাকে রক্ষা করেছেন! আমি অহঙ্কারে নিজে কর্ত্তা সেজে ব'সে আছি। হাজার হৌক, বিড়াল-তপস্বী ত! আসল তপস্বী না হ'লে তাঁকে চিন্‌তে পার্‌বো কেন?"

পতিতপাবন উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। নেত্যও হাসিতে হাসিতে বলিল, "আসল তপস্বী হয়ে কাজ নাই; দাদামশায়, তুমি এই রকম বিড়াল-তপস্বীই থাক।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মুক্তি ও ভক্তি

২

পূর্ব্বপ্রবন্ধে মুক্তির কথা বলিয়াছি, এইবার ভক্তির কথা বলিব।

ভক্তির আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে তাহার ঐতিহাসিক আলোচনা আবশ্যক ; তাহার পর ভক্তির স্বরূপ ও তাহার প্রয়োজন প্রভৃতির আলোচনা করা যাইবে।

মুক্তি ও তাহার উপায় কি ? তাহাই প্রধানভাবে বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত আস্তিক দর্শনশাস্ত্র-সমূহ হইতে ভক্তিশাস্ত্র কোন্ সময় হইতে পৃথক্ হইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃজনগণের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ঠিক নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কারণ, এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই বলিলেও চলে। কিন্তু তাই বলিয়া এ বিষয়ে আলোচনা স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এইরূপ আলোচনা দ্বারা বিশেষ লাভ এই হইবে যে, ভক্তিশাস্ত্র যে ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান উপাদান এবং ভারতে খ্রীষ্টীয়ান্ প্রভৃতি বৈদেশিক ভক্তিবাদ প্রচারের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যাইবে।

বর্ণাশ্রমী হিন্দুর সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা-পদ্ধতির মূল শ্রুতি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ সাধনের বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ, ধর্ম্ম-সংহিতা ও মহাভারতাদি ইতিহাসের দ্বারা জানিবার পূর্ব্বে ঐ সকল পুরাণাদি-বর্ণিত সাধন-তত্ত্বের অল্প বা বিস্তৃতভাবে নির্দ্দেশ শ্রুতিতে আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য বিশ্বাসী হিন্দুমাত্রের ঔৎসুক্যের উদয় হয় এবং সেই ঔৎসুক্যবশতঃ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দু যদি দেখে, ঐ সকল সাধনতত্ত্বের প্রামাণিকতা শ্রুতির উপর নির্ভর করিতেছে না, তখন সে সহস্র লৌকিক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও সেই সকল সাধনতত্ত্বকে অবিশ্বাসবশতঃ উপেক্ষা করিতে অণুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করে না। তাই ভক্তিশাস্ত্রের ঐতিহাসিক আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রমাণশিরোমণি শ্রুতির মধ্যে এই ভক্তিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ভক্তিরূপ সাধনবিষয়ে কিরূপ উল্লেখ আছে, তাহা অগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। আমার মনে হয়, ভক্তিরূপ সাধনমার্গ শ্রুতিই আমাদিগকে অতি স্পষ্টভাবে সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে--- ঋক্‌সংহিতার মধ্যে অনেকগুলি এরূপ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগের স্বারসিক অর্থের উপর নির্ভর করিলে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, ঐ সকল মন্ত্র স্পষ্টভাবে ভক্তি, ভক্তির ফল ও ভক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন, সেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবত্তত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

ঋক্‌সংহিতার ভক্তিমাত্রপরত্ব প্রতিপাদনের জন্য মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ 'মন্ত্রভাগবত' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে ঋক্‌সংহিতার মন্ত্র বলিয়া যে কয়টি মন্ত্র এই বিষয়ে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি প্রকৃতোপযোগী হইবে বলিয়া অগ্রেই উল্লেখ করা যাইতেছে—

"যস্মিন্ বিশ্বানি কাব্যা—
চক্রে নাভিরিব শ্রিতা।
ত্রিতং জূতী সপর্য্যত।"
"ব্রজে গাবো ন সংযুজে
যুদ্ধে অশ্বা অযুক্ষত
নভন্তামন্যকে সমে।"

এই মন্ত্র দুইটির ব্যাখ্যা নীলকণ্ঠ যেরূপ ভাবে করিয়াছেন, তদনুসারে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ হয়, যথা—শকটের চক্রে তাহার নাভিপ্রদেশ যেমন একদেশস্থিত হইয়া আপনা অপেক্ষা বৃহৎ চক্রকে স্পর্শ করিয়া থাকে, সেইরূপ সকল কাব্যই যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি জগৎকারণ গুণের বিস্তারকারী অর্থাৎ প্রেরয়িতা সেই পরমেশ্বরকে তোমরা বুঝিয়া সপর্য্যা বা উপাসনা কর। সেই পরমেশ্বর তাঁহার পিতা অর্থাৎ পিতৃভাবে রাগানুগা ভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত ভক্তের প্রীতির জন্য ব্রজে যেমন গোচারণ করিয়া থাকেন, সেইরূপই আবার রণক্ষেত্রে (সখ্যভাবের উপাসক ভক্ত অর্জ্জুনাদির প্রীতির জন্য) অশ্বসমূহের পরিচালনাও করিয়া থাকেন। এইরূপ গোচারণ ও অশ্বপরিচালনাদিরূপ

নরলীলা তিনি কেন করিয়া থাকেন, তাহার উত্তর শ্রুতিই দিতেছে—"নভন্তাং অন্যকে সমে" 'উপাসকগণের সকল প্রকার কুৎসিত শত্রুসমূহের বিনাশ হউক,' এইরূপ ইচ্ছা করিয়াই সেই ভগবান্ এই সকল নরলীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন।

তাই ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।"

সেই অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ অথচ গুণাত্মা ভগবানের নররূপে প্রকাশ মনুষ্যগণের পরম মঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে।

যাহাই হউক, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, পরম করুণাময় জগদীশ্বর সগুণ ও সাকার হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন এবং সেই পরমপুরুষের সগুণ ও সাকার স্বরূপই অর্চ্চনা বা পূজার বিষয় হইয়া ভক্তির আলম্বন হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রধানতম আলম্বন শ্রীভগবানের সাকারতত্ত্ব শ্রুতিমধ্যে নাই বলিয়া যাঁহারা নিরাকার পরমেশতত্ত্বকে একমাত্র উপাস্য বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত যে সর্ব্বথা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা এই প্রকার শ্রুতি দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্যবস্থাপিত হইল।

সর্ব্বথা শ্রুতিমূলক এই ভক্তিবাদ ভক্তগণের প্রকৃতি ও অধিকারানুসারে সেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ রসমূর্ত্তি পরব্রহ্মের নানাপ্রকার অভিব্যক্তি বা অবতারকে অবলম্বন করে বলিয়া নানা সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে।

শ্রুতির কর্ম্মবহুল ব্রাহ্মণভাগ ও মন্বাদি ঋষি-প্রকাশিত ধর্ম্মশাস্ত্র অধিকারানুসারে যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ করে, তাহাদের অনুষ্ঠানে স্বভাববশতঃ রাগদ্বেষাদি-পরিচালিত চঞ্চলচিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারিলে, মানব ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য উপাসনার যাথার্থ্য ও উপকারিতা বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকে; বিশুদ্ধচিত্ত না হইলে কোন মানবই পরব্রহ্মের রসরূপতা-প্রকাশক ভক্তিশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনার অধিকারী হয় না। সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকটে ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ ও অসঙ্গতার্থ বলিয়া প্রতীত হয়; আর বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকট ঐ সকল শাস্ত্র একই প্রয়োজনের সাধন বলিয়া অধিকারীর সংস্কার ও সাধনসামগ্রীর অপেক্ষায় বিভিন্ন প্রকার হইলেও ফলতঃ একই হইয়া যায়। তাই মহিম্নঃ স্তুতিতে কথিত হইয়াছে—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

তাৎপর্য্য এই যে—বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈবাগম, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবমত—এই সকল পথ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও এবং তত্তন্মতের প্রতি আগ্রহপর ব্যক্তিগণ এইটিই পরম সাধন, ইহাই হিতকর, অপরটি নহে, এই প্রকারে কোলাহল করিতে থাকিলেও জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত বাসনার প্রভাবে রুচিসমূহের বৈচিত্র্যবশতঃ কেহ কুটিল, কেহ বা সরল পথ অবলম্বন করিয়া থাকে; কিন্তু যেই যে পথ দিয়া যাউক না কেন, সমুদ্রের উদ্দেশে বিভিন্ন পথে ধাবমান নদীসমূহের গন্তব্য যেমন এক সমুদ্রই হয়, সেইরূপ ঐ সকল সাধনার পথে বিচরণশীল সাধকগণের তুমিই মহেশ্বর, একমাত্র গন্তব্য বা চরম বিশ্রামস্থান হইয়া থাক। আস্তিক হিন্দুগণের পরম আদরের ধন এই উপাসনাতত্ত্ব-প্রতিপাদক ভক্তিশাস্ত্র ভক্তসম্প্রদায়ের পঞ্চবিধত্ববশতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে;—গাণপত্য, সৌর, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পাঁচ প্রকার উপাসক-সম্প্রদায় ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্রকে যথাক্রমে গণপতিতন্ত্র বা গাণপত্যাগম, সৌরতন্ত্র বা সৌরাগম, তন্ত্র বা আগম, শৈবাগম এবং পঞ্চরাত্র এইরূপ বিভিন্ন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই পাঁচ প্রকারের উপাসনা শাস্ত্রের মধ্যে প্রথম দুইটি—গণপতিতন্ত্র ও সৌরাগম এক্ষণে বিরলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছে, ঐ দুইটি উপাসনামার্গের প্রতিপাদক গ্রন্থ পূর্ব্বকালে রাশি রাশি থাকিলেও এক্ষণে তাহার অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, শেষোক্ত তিনটি মতের গ্রন্থসমূহের সংখ্যা খুব বেশী, এখনও ঐ সকল মতের বহু প্রামাণিক গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত থাকিলেও যাহা আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল মতের প্রবর্ত্তন ও প্রসারণ বিষয়ে আবশ্যক ঐতিহাসিক গবেষণা এখন আর অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। শৈবাগম ও শাক্ততন্ত্র লইয়া ঐতিহাসিক আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইলেও এই প্রবন্ধের অতিবিস্তারভয়ে তাহা না করিয়া কেবল শেষোক্ত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তপর পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র বিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বা

প্রেমভক্তিবাদের সহিত পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ; সুতরাং তাহাই এই প্রবন্ধের প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থই দুই ভাগে বিভক্ত হয়, যথা—পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়। এই সাধারণ নিয়মানুসারে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিও উক্ত দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থসমূহ—সাক্ষাৎ উপাস্যদেবতা বা উপাস্যদেবতার উপাসক কোন দেবতাবিশেষ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে কিংবা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভাবে আবিষ্ট ভক্ত মুনি বা ঋষির হৃদয়ে প্রথমে ভগবদিচ্ছাশক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হইয়া পরে সম্প্রদায়হিতার্থে তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলি এই প্রকার নহে; কারণ, ইহারা পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থগুলির তাৎপর্য্য বর্ণন করিবার জন্যই রচিত হইয়াছে। স্মার্ত্তসম্প্রদায়ে ধর্ম্মসংহিতা ও কল্পসূত্রগুলির সহিত পরবর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধগুলির যেরূপ উপজীব্যোপজীবকভাব সম্বন্ধ, প্রকৃতেও উক্ত দুই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিরও সেইরূপ সম্বন্ধই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থগুলি 'সংহিতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই সংহিতাগুলি পদ্যে রচিত—ঐ সকল পদ্যও শতকরা নিরানব্বই অংশ অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত।

সংহিতাসমূহ পটল বা অধ্যায় নামক ভাগসমূহে নিবদ্ধ। ঐ সকল সংহিতা আবার তন্ত্র এই নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে আবার এই সকল সংহিতা বা তন্ত্রকাণ্ড এই নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। অহির্বুধ্ন্য সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত সংহিতাপ্রচারকালে পাঞ্চরাত্রিক সম্প্রদায়ে ভাগবতসংহিতা, কর্ম্মসংহিতা ও বিদ্যাসংহিতা প্রভৃতি বহু সংহিতা এবং পাশুপতসম্প্রদায়ে পতিতন্ত্র, পশুতন্ত্র ও পাশতন্ত্র প্রভৃতি বহু তন্ত্রগ্রন্থ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচরিত হইয়া আসিতেছিল।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপজীব্যস্বরূপ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র যে কত বৃহৎ, তাহা ঠিক করিয়া বিচার করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এই সম্প্রদায়ের প্রমাণস্বরূপ মূল সংহিতাগ্রন্থগুলি এখনও সম্পূর্ণভাবে সাধারণের হস্তগত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই।

কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে নারদপঞ্চরাত্র নামে একখানি সংহিতা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও তাহা যে বাস্তবিক উক্ত নামে প্রসিদ্ধ প্রমাণগ্রন্থ নহে, প্রত্যুত উহা একখানি কল্পিত সুতরাং ভাগবত সম্প্রদায়ের অগ্রাহ্য, তাহা স্বর্গীয় রামগোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় (Encyclopedia of Indo Aryan Reserch III, 6, p, 40-41) অতি সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসিদ্ধি এই যে, এই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ে ১০৮খানি সংহিতা প্রচলিত ছিল।

কপিঞ্জল সংহিতায় ১০৬খানি ঐরূপ সংহিতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, পদ্মতন্ত্রে কিন্তু ১১২খানি সংহিতার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুতন্ত্রে ১৪১খানি সংহিতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ দিকে হয়শীর্ষসংহিতায় কেবল ৩৪খানি সংহিতারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণের ৩৯ অধ্যায়ে কিন্তু ২৫খানি পাঞ্চরাত্র সংহিতার নির্দ্দেশ আছে। ইহা ছাড়া এসিয়াটিক সোসাইটী কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, পূর্ব্বোক্ত নারদপঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে সাতখানি অধিক সংহিতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ব্রহ্মসংহিতা, শৈবসংহিতা, কৌমারসংহিতা, বাশিষ্ঠসংহিতা, কপিলসংহিতা, গৌতমীয়সংহিতা ও নারদীয়সংহিতা।

কপিঞ্জলসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা, পদ্মসংহিতা, হয়শীর্ষসংহিতা ও অগ্নিপুরাণে যে কয়খানি পাঞ্চরাত্রসংহিতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়—পাঠকগণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১।	অগস্ত্য	সংহিতা	১৬।	উত্তরগার্গ্য	সংহিতা
২।	আঙ্গিরস	„	১৭।	উদঙ্ক	„
৩।	অচ্যুত	„	১৮।	উপেন্দ্র	„
৪।	অধোক্ষজ	„	১৯।	উমামাহেশ্বর	„
৫।	অনন্ত	„	২০।	উপগায়ন	„
৬।	অনিরুদ্ধ	„	২১।	ঔশনস	„
৭।	অম্বর	„	২২।	কাণ্ব	„
৮।	অষ্টাক্ষরবিধান	„	২৩।	কাপিঞ্জল	„
৯।	অহির্বুধ্ন্য	„	২৪।	কলিরাঘব	„
১০।	আগ্নেয়	„	২৫।	কাত্যায়ন	„
১১।	আত্রেয়	„	২৬।	কাপিল	„
১২।	আনন্দ	„	২৭।	কাম	„
১৩।	অরূপ	„	২৮।	কার্ষ্ণেয়	„
১৪।	ঈশান	„	২৯।	কেশব	„
১৫।	ঈশ্বর	„	৩০।	কালিন্দী	„

৩১। কাশ্যপ সংহিতা
৩২। কণ্ব „
৩৩। কৌষেয় „
৩৪। কৌমার „
৩৫। ক্রতু „
৩৬। ক্রৌঞ্চ „
৩৭। খগেশ্বর „
৩৮। গণেশ „
৩৯। গরুড় „
৪০। গরুড়ধ্বজ „
৪১। গর্গ „
৪২। গালব „
৪৩। গোবিন্দ „
৪৪। গৌতমীয় „
৪৫। জনার্দ্দন „
৪৬। জমদগ্নি „
৪৭। জয়াখ্য „
৪৮। জয়োত্তর „
৪৯। জাবাল „
৫০। জৈমিনীয় „
৫১। জ্ঞানার্ণব „
৫২। তত্ত্বসাগর „
৫৩। তন্ত্রসাগর „
৫৪। তার্ক্ষ্য „
৫৫। তেজোদ্রবিণ „
৫৬। ত্রিবিক্রম „
৫৭। ত্রৈলোক্যমোহন „
৫৮। ত্রৈলোক্যবিজয় „
৫৯। দক্ষ „
৬০। দত্তাত্রেয় „
৬১। দধীচ „
৬২। দামোদর „
৬৩। দুর্গা „
৬৪। দৌর্ব্বাসস „
৬৫। দেবল „
৬৬। দয়ানদীয় „
৬৭। ধ্রুব সংহিতা
৬৮। নলকুবর „
৬৯। নারদীয় „
৭০। নারসিংহ „
৭১। নারায়ণীয় „
৭২। নৈর্ঋত „
৭৩। পক্ষি „
৭৪। পঞ্চ প্রশ্ন „
৭৫। পদ্মনাভ „
৭৬। পদ্মোদ্ভব „
৭৭। পর „
৭৮। পরম „
৭৯। পরাশর „
৮০। পাণিনীয় „
৮১। পাদ্ম „
৮২। পরমেশ্বর „
৮৩। পারিষদ „
৮৪। পারাবত „
৮৫। পাবক „
৮৬। পিপ্পল „
৮৭। পুণ্ডরীকাক্ষ „
৮৮। পুরাণ „
৮৯। পুরুষোত্তম „
৯০। পুলস্ত্য „
৯১। পৌলব „
৯২। পুষ্টি „
৯৩। পৈঙ্গল „
৯৪। পৌলহ „
৯৫। পৌষ্কর „
৯৬। প্রদ্যুম্ন „
৯৭। প্রশ্ন „
৯৮। প্রহ্লাদ „
৯৯। প্রাচেতস „
১০০। বলভদ্র „
১০১। বার্হস্পত্য „
১০২। বৃহদ্ভার্গব „
১০৩। বৌধায়ন সংহিতা
১০৪। ব্রহ্ম „
১০৫। ব্রহ্মনারদ „
১০৬। ভাগবত „
১০৭। ভারদ্বাজ „
১০৮। ভার্গব „
১০৯। মধুসূদন „
১১০। মহাপুরুষ „
১১১। মহাপ্রজ্ঞা „
১১২। মহালক্ষ্মী „
১১৩। মহাসনৎকুমার „
১১৪। মহীপ্রশ্ন „
১১৫। মহেন্দ্র „
১১৬। মাৎস্য „
১১৭। মাধব „
১১৮। মানব „
১১৯। মরীচি „
১২০। মায়া „
১২১। মায়াবিভব „
১২২। মার্কণ্ডেয় „
১২৩। মাহেন্দ্র „
১২৪। মল „
১২৫। মেদিনীপতি „
১২৬। মৈত্রেয় „
১২৭। মৌদ্‌গল্য „
১২৮। যজ্ঞমূর্ত্তি „
১২৯। যম „
১৩০। যাজ্ঞবল্ক্য „
১৩১। যোগ „
১৩২। যোগহৃদয় „
১৩৩। রাঘবীয় „
১৩৪। লক্ষ্মী „
১৩৫। লক্ষ্মীনারায়ণ „
১৩৬। লক্ষ্মীপতি „
১৩৭। লাঙ্গল „
১৩৮। বরাহ „
১৩৯। বসু সংহিতা
১৪০। বহ্নি „
১৪১। বাগীশ „
১৪২। বামদেব „
১৪৩। বামন „
১৪৪। বায়ু „
১৪৫। বারুণ „
১৪৬। বাল্মীকি „
১৪৭। বাশিষ্ঠ „
১৪৮। বাসুদেব „
১৪৯। বাহ্নিক „
১৫০। বিরিঞ্চি „
১৫১। বিশ্ব „
১৫২। বিশ্বামিত্র „
১৫৩। বিষ্ণু „
১৫৪। বিষ্ণুতত্ত্ব „
১৫৫। বিষ্ণুতিলক „
১৫৬। বিষ্ণুযোগ „
১৫৭। বিষ্ণুরহস্য „
১৫৮। বিষ্ণুবৈভব „
১৫৯। বিষ্ণুসদ্‌ভাব „
১৬০। বিষ্ণুসম্ভব „
১৬১। বিষ্ণুসার „
১৬২। বিষ্ণুসিদ্ধান্ত „
১৬৩। বিষ্বক্‌সেন „
১৬৪। বিহগেন্দ্র „
১৬৫। বৈকুণ্ঠ „
১৬৬। বৈখানস „
১৬৭। বৈভব „
১৬৮। ব্যাস „
১৬৯। বৈহায়স „
১৭০। শক্র „
১৭১। শর্ব্ব „
১৭২। শাকটায়ন „
১৭৩। শাকলেয় „
১৭৪। শাণ্ডিল্য „

১৭৫।	শাতাতপ সংহিতা	১৯৪।	সনন্দ সংহিতা
১৭৬।	শান্তি „	১৯৫।	সর্ব্বমঙ্গল „
১৭৭।	শিব „	১৯৬।	সাত্বত „
১৭৮।	শুকরুদ্র „	১৯৭।	সমন্বয় „
১৭৯।	শুক্র „	১৯৮।	সারস্বত „
১৮০।	শেষ „	১৯৯।	সোম „
১৮১।	শৌনক „	২০০।	সৌমীয় „
১৮২।	শ্রী „	২০১।	সৌর „
১৮৩।	শ্রীকর „	২০২।	স্কান্দ „
১৮৪।	শ্রীনিবাস „	২০৩।	স্বায়ম্ভুব „
১৮৫।	শ্রীপ্রশ্ন „	২০৪।	হয়শীর্ষ „
১৮৬।	শ্রীবল্লভ „	২০৫।	হরি „
১৮৭।	শ্বেতকেতু „	২০৬।	হারীত „
১৮৮।	সংবর্ত্ত „	২০৭।	হিরণ্যগর্ভ „
১৮৯।	সঙ্কর্ষণ „	২০৮।	হৃষীকেশ „
১৯০।	সত্য „	২০৯।	কাশ্যপোত্তর „
১৯১।	সদ্বিষ্ণু „	২১০।	পরমতত্ত্বনির্ণয়প্রকাশ „
১৯২।	সনক „	২১১।	পদ্মসংহিতা তন্ত্র
১৯৩।	সনৎকুমার „	২১২।	বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা

এই সকল সংহিতা গ্রন্থের অধিকাংশই দক্ষিণ-ভারতের সুপ্রসিদ্ধ তাঞ্জোর লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট হস্তলিখিত পুস্তকালয় ও আডিয়ার থিয়োসফিকাল লাইব্রেরীতে সংগৃহীত রহিয়াছে।

এই ২১২খানি সংহিতার মধ্যে কেবল এগারখানিই সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

১। ঈশ্বরসংহিতা　(তেলিগুলিপি)
২। কপিঞ্জলসংহিতা　(ঐ)
৩। পরাশরসংহিতা　(ঐ)
৪। পদ্মতন্ত্র　(ঐ)
৫। বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা　(ঐ)
৬। বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা　(দেবনাগরলিপি)
৭। ভারদ্বাজসংহিতা　(তেলিগু)
৮। লক্ষ্মীতন্ত্র　(ঐ)
৯। শ্রীপ্রশ্নসংহিতা　(ঐ)
১০। বিষ্ণুতিলকসংহিতা　(তেলিগু)
১১। সাত্বতসংহিতা　(দেবনাগরী)

এই সকল পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র কোন্ সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন; কিন্তু এই জাতীয় গ্রন্থ বা মত যে মহাভারত রচনাকালেও প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মধ্যে একটি নারদীয় নামে আখ্যাত অধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সে সময়ও ভারতে একান্ত অবিদিত ছিল না। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বের ৬৬ অধ্যায়ের শেষ ভাগে—"প্রযুক্ত সাত্বতবিধি" এই শব্দটিও এই বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।

এই কারণে ইহা নিশ্চিতভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, মহাভারত রচনার পূর্ব্বেও ভারতে এই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সেই সময় কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই। এই সকল পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা—

১। দর্শন বা তত্ত্বনির্ণয়
২। মন্ত্রবিচার—
৩। যন্ত্রবিচার
৪। মায়াযোগ　(ব্যবহারিক)
৫। যোগ　(আধ্যাত্মিক)
৬। মন্দিরনির্ম্মাণ
৭। প্রতিষ্ঠাবিধি　(মন্দির ও দেবপ্রতিমা)
৮। সংস্কার　(নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্ম)
৯। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম
১০। উৎসব।

কিছু দিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজ আদৈর লাইব্রেরী হইতে অহির্বুধ্ন্য সংহিতা নামে একখানি পাঞ্চরাত্র সংহিতাও মুদ্রিত হইয়াছে—পূর্ব্বোল্লিখিত ১১খানি সংহিতা ও অহির্বুধ্ন্য সংহিতানুসারে এই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অবলম্বিত দর্শনশাস্ত্রের পরিচয় আগামী বারে দিবার চেষ্টা করিব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

আর্য্যগণের জন্মভূমি।

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষই আর্য্যগণের আদি জন্মভূমি। আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষরা যে অন্য কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ভারতবর্ষে অর্থাৎ পঞ্চনদ বা সপ্তসিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি প্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। (১) ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধুপ্রদেশকে "দেবকৃত যোনি" বলা হইয়াছে। (ঋগ্বেদ ৩।৩৩।৪) ইহার অর্থ এই যে, উক্ত প্রদেশকেই পরমেশ্বর আর্য্যগণের আদি উৎপত্তিস্থলরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি মনুও পরে এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তদ্দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
(মনু ২।১৭)

অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে অভিহিত হয়।

সকল দেশই দেবতার অর্থাৎ পরমেশ্বরের নির্ম্মিত। কিন্তু ঋগ্বেদের "দেবকৃত যোনি" ও মনুসংহিতার "দেবনির্ম্মিত দেশ" এই দুই পদের বিশেষ অর্থ এই যে, আর্য্যগণ এই দেশকেই তাঁহাদের আদি জন্মভূমি বলিয়া জানিতেন ও বিশ্বাস করিতেন; এই কারণে তাঁহারা ইহাকে "দেবকৃত যোনি" ও "দেবনির্ম্মিত দেশ" বলিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ আর্য্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ সপ্তসিন্ধুপ্রদেশে বা পঞ্জাবেই রচিত হইয়াছিল। এই ঋগ্বেদে আর্য্যগণের নব্যপ্রস্তরায়ুধ যুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। ইন্দ্রের বজ্র প্রথমে প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল। (ঋগ্বেদ ৭।১০৪।৫ ও ২২; ২।১৪।৬ ইত্যাদি) পরে তাহা অস্থিনির্ম্মিত হইয়াছিল। (ঋগ্বেদ ১।৮৪।১৩)। সর্ব্বশেষে যখন আর্য্যগণ ধাতু ব্যবহার অবগত হইয়াছিলেন, তখন ইন্দ্রের বজ্র স্বর্ণনির্ম্মি (ঋগ্বেদ ১।৫৭।২; ১।৮৫।৯; ৮।৫৭।৩; ১০।২৩।৩), "হারী বা তাম্র-নির্ম্মিত (১০।৯৬।৩) এবং "আয়স" বা লৌহনির্ম্মি হইয়াছিল। পশুর সূক্ষ্মাগ্র শৃঙ্গ-সমূহও তীরের ফলকরূ ব্যবহৃত হইত (ঋগ্বেদ ৭।৭৫।১১)। ঋগ্বেদে চর্ম্মের ব এবং চর্ম্মনির্ম্মিত জলপাত্র, মধুপাত্র, দধিপাত্র এবং সো পাত্রেরও বহু উল্লেখ দেখা যায়। এই সমস্তই যে প্রস্তরায়ু যুগের নিদর্শন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব দেখা যাই তেছে যে, সেই প্রাচীন যুগ হইতেই ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ রচি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ঋগ্বেদে "পূর্ব্বসমুদ্র ও "পশ্চিমসমুদ্রে"র উল্লেখ আছে (ঋগ্বেদ ১০।১৩৬।৫) এই পূর্ব্বসমুদ্র যে পঞ্জাবের বা সপ্তসিন্ধুপ্রদেশের অব্যবহি পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল, তাহা আমি অন্যত্র প্রমাণিত করিয়াছি। (২)

ঋগ্বেদে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সরস্বতী নদী ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার কালে সমুদ্রে নিপতিত হইত। (ঋগ্বেদ ৭।৯৫।২)। সেই সমুদ্র এখন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রমাণের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যে সময়ে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ রচিত হয়, সেই সময়ে পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগ হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমস্ত গাঙ্গেয় প্রদেশ সমুদ্র-মগ্ন ছিল, এবং আধুনিক রাজপুতানারও অধিকাংশ ভাগ সমুদ্রাধিকৃত ছিল। অর্থাৎ সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ বা পঞ্জাব দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ছিল, এবং পঞ্জাবে এক আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতির বাস ছিল না।

ঋগ্বেদে কৃষ্ণকায় দাস ও দস্যুদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহারা যে অনার্য্য জাতি ছিল না, পরন্তু আর্য্যভাষী ছিল এবং আর্য্যগণের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ছিল, তাহাও আমি অন্যত্র প্রমাণিত করিয়াছি। (৩) ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার কালে "পঞ্চজন" বা "পঞ্চকৃষ্টি" নামে পাঁচটি আর্য্যশাখা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু

---

[১] "I must, however, begin with a candid admission that, so far as I know, none of the Sanskrit books, not even the most ancient, contain any distinct reference or allusion to the foreign origin of the Aryans." Muir's Original Sanskrit Texts Vol. II. P. 322 (1871).

[২] Rigvedic India, Ch. I and II.

[৩] Rigvedic India, Ch. VII.

অন্যান্য আর্য্যশাখাসমূহ অসভ্য যাযাবর অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া গো-মেষ-মহিষাদিসহ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত এবং কৃষিকার্য্য-নিরত গৃহবাসী আর্য্যগণের পশু ও ধনাদি লুণ্ঠন করিয়া লইত। এই কারণে আর্য্যগণ তাহাদিগকে "দাস," "দস্যু," "অসুর" প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন, এবং তাহাদিগকে সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ হইতে তাড়াইবার জন্য তাহাদের সহিত অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। কালক্রমে বহু অসভ্য আর্য্যশাখা সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া গান্ধারদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া যায় এবং এসিয়ার পশ্চিমাংশে যাযাবর অসভ্য মঙ্গোলীয় বা তুরাণীয়-গণের সহিত মিলিত হইয়া য়ুরোপে প্রবিষ্ট হয়। এই মিশ্রিত জাতিসমূহই য়ুরোপে আর্য্যভাষা ও হীন আর্য্যসভ্যতা লইয়া যায়। (৪) সপ্তসিন্ধুনিবাসী অসভ্য যাযাবর আর্য্যগণ কোথাও স্থায়িভাবে বাস না করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত বলিয়া তাহাদের গাত্রবর্ণ গৃহবাসী কৃষিনিরত আর্য্যগণের গাত্রবর্ণ অপেক্ষা মলিনতর ছিল। এই কারণে তাহাদিগকে ঋগ্বেদে কৃষ্ণকায় বলা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আর্য্যগণ প্রত্নপ্রস্তরায়ুধ ও নব্যপ্রস্তরায়ুধ যুগ হইতে সপ্তসিন্ধুপ্রদেশেই বাস করিতেছিলেন। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন যে, সপ্তসিন্ধুপ্রদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগে হিমালয়ের পাদমূলে অত্যাধুনিক যুগে (Pleistocene epoch) সমুদ্র ছিল। (৫) এই সমুদ্র কোন্ সময়ে তিরোহিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। তবে ইহা যে হিমালয়ের পাদমূলে প্রায় ১৩ হাজার ফীট হইতে প্রায় ২০ হাজার ফীট পর্য্যন্ত গভীর ছিল, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুত ভি, বি, কেটকার বলেন যে, প্রায় দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সমুদ্র বিদ্যমান ছিল। এই কথা সত্য হইলে ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার কাল দশ সহস্র বৎসরের পূর্ব্ব হইতে লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল, এইরূপ অনুমান করিতে হয়। এইরূপ অনুমান ঋগ্বেদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণসমূহের ও আর্য্যগণের প্রাচীন কিংবদন্তীর সহিত অসঙ্গত নহে। আর্য্যগণ ঋগ্বেদকে বহু প্রাচীন, এমন কি, অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করেন।

(৪) Rig-Vedic India ch. VIII.

(৫) Wadia's Geology of India P. 248.

ভারতবর্ষের মধ্যে সপ্তসিন্ধুপ্রদেশেই যে প্রথম জীবোৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। (৬) সুতরাং এই প্রদেশেই জীবের ক্রম-বিকাশ ও বিবর্ত্তন হইয়া সর্ব্বপ্রথমে মানবের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আর্য্যগণের বিশ্বাস যে, তাঁহারা এই সপ্তসিন্ধুপ্রদেশেই প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই প্রদেশেই আর্য্য সভ্যতার প্রথম বিকাশ হইয়াছিল।

বিলাতের রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে (Royal Institution) সম্প্রতি সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার আর্থার কীথ (Professor Arthur Keith) একটি বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন যে, বহু ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে ভারতের উত্তর সীমান্তপ্রদেশই মানবের আদি জন্মভূমি ছিল। (৭) মিসর ও মেসোপোটেমিয়ার পূর্ব্বেও, পারস্য, ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কেম্বোদিয়া প্রভৃতি দেশে নিগ্রোজাতীয় মানব বাস করিত। আফ্রিকা হইতে ওশ্যানিয়া পর্য্যন্ত প্রায় ৬ হাজার মাইল্ বিস্তীর্ণ ভূভাগে নিগ্রোজাতীয় মানবগণের বাসভূমি ছিল। উত্তরদিক্ হইতে অন্যবংশীয় মানব আসিয়া এবং হিমালয়ের পশ্চিমভাগ হইতে ককেশস্-জাতীয় মানব ভারতসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া এই কৃষ্ণকায় নিগ্রোজাতীয় মানবগণকে অপসারিত করে। (৮)

অধ্যাপক কীথ যে সমুদায় প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তৎসমুদায় এখনও আমরা দেখি নাই বা আলোচনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হই নাই।

(৬) Manual of the Geology of India P. 109 Also Imp. Gaz. of India Vol 1. P. 53. (1907).

(৭) "Many modern authropologists place the cradle-land of humanity near or within the Northern Frontier of India."

(৮) "The evidence, he (Dr. Keith) maintained, was now complete to show that long before Egypt or Mesopotamia, Persia, India and Further India were occupied by Negro races. At this remote period a wide belt of humanity, some 6000 miles in length, linked the Negroes of Africa with their robust cousins in Oceania. The disruption of then Asiatic black belt was brought about by inroads of races from the North. West of the Himalayas men of the Caucasian type pressed downwards to the shores of the Indian Ocean, there replacing almost completely the original Negroid inhabitants of Arabia."

কিন্তু তাঁহার উক্তি পাঠ করিয়া বুঝিতেছি যে, তিনি ভারতের উত্তরসীমান্ত প্রদেশকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া বিশ্বাস করেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, তাহা আর্য্যমানবেরও আদি জন্মভূমি বটে। কিন্তু এই প্রদেশে নিগ্রোজাতীয় মানব সর্ব্বপ্রথমে বাস করিত এবং পরে ককেশস্‌জাতীয় মানবগণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করে, তাঁহার এই উক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিল। গাঙ্গেয় প্রদেশ ও রাজপুতানার অধিকাংশ ভাগে সমুদ্র বিদ্যমান থাকায় সপ্তসিন্ধুনিবাসী মানবের সহিত দাক্ষিণাত্যনিবাসী মানবের কোনও সংযোগ ছিল না। আমরা ঋগ্বেদোক্ত প্রমাণসমূহ হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, আর্য্যগণ প্রায় লক্ষ বৎসরাধিককাল সপ্তসিন্ধুপ্রদেশে বাস করিতেছেন। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশের সহিত এবং পশ্চিমদিকে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের সহিত সংযুক্ত ছিল। দক্ষিণদিকেও তাহা অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। (৯) এই বিশাল ভূভাগে নিগ্রোজাতীয় মানব বাস করিত। পরে কোনও ভয়াবহ নৈসর্গিক উৎপাতে এই মহাদেশের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়া গেলে, অবশিষ্ট দেশসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তদধিবাসী মানবগণও এক এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া যায়। কিন্তু নিগ্রোজাতীয় মানবগণ এইরূপে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইলেও অনেক স্থলে তাহাদের বংশগত ও ভাষাগত সাদৃশ্য রক্ষা করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য আদিম অধিবাসিগণের ভাষার সহিত মাদ্রাজ উপকূলের মৎস্যজীবিগণের ভাষার সাদৃশ্য আছে। (১০) প্রশান্ত মহাসাগরের কতিপয় দ্বীপনিবাসী অসভ্যগণের ভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার সাদৃশ্য আছে। সিংহলদ্বীপের বেদ্দাগণের সহিত মালয় উপদ্বীপের সাকাই ও সেমাংগণের (Sakais and Semangs) বংশগত সাদৃশ্য আছে। ইহাদের সহিত আবার দাক্ষিণাত্যের কাদির (Kadir), পাণ্যান (Paniyans) ও কুরম্বগণেরও আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। ভারতের মুণ্ড ভাষা, নিকোবর দ্বীপের নিকোবর ভাষা, আসামের খাসি ভাষা, উত্তর-ব্রহ্মদেশের পালং ওয়া ও রিয়াং ভাষা, মালয় উপদ্বীপের সাকাই ও সেমাং ভাষা ও মন্‌খমের ভাষা সমূহের মধ্যে বংশগত সাদৃশ্য আছে। স্মিড্‌ট্ (Schmidt) এই ভাষাগুলিকে Austo-Asiatic অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন।

এই দক্ষিণ মহাদেশই প্রকৃত প্রস্তাবে নিগ্রোজাতীয় মানবের আদি বাসভূমি ছিল। সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ বা ভারতের উত্তরসীমান্তপ্রদেশ কস্মিন্‌কালেও নিগ্রোদের বাসভূমি ছিল না। এই প্রদেশ কেবল আর্য্যজাতিরই আদি বাসভূমি ছিল এবং এই প্রদেশ হইতেই আর্য্যসভ্যতা য়ুরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ডাক্তার কীথ যদি ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার কালে উত্তর-ভারতের জলস্থলের বিভাগ ও ভৌগোলিক আকারের বিষয় আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে, ভারতের উত্তর-সীমান্তপ্রদেশকে কখনই নিগ্রোজাতির আদি বাসভূমি বলিতেন না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আকার সৃষ্টির সময় হইতে একই প্রকার আছে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি উপরোক্ত ভ্রান্ত মতে উপনীত হইয়া থাকিবেন।

ডাক্তার কীথ আগ্রার পশ্চিমে একটি নদীগর্ভে প্রায় ৩০ ফীট নীচে একটি মানব-করোটী প্রাপ্ত হইয়া ও তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অধুনা পঞ্জাব প্রদেশ হইতে সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত যে সকল মানব দৃষ্ট হয়, তাহাদের করোটীর সহিত পূর্ব্বোক্ত করোটীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তদ্দারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, বহু প্রাচীনকালে পঞ্জাবেও এই জাতীয় মানব বাস করিত। পঞ্জাবের অব্যবহিত পূর্ব্বদিকের পূর্ব্বসমুদ্র তিরোহিত হইলে দক্ষিণাপথের বহু মানবশাখা উত্তর-ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং নদীগর্ভ হইতে প্রাপ্ত করোটীর সহিত আধুনিক ভারতবাসিগণের করোটীর সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র নহে। উক্ত করোটী সম্ভবতঃ বহু প্রাচীন নহে। ডাক্তার কীথও বলিয়াছেন যে, ইহার প্রাচীনত্ব অসংশয়িতরূপে জানা যায় নাই। অতএব, এই একটি করোটী হইতে কোনও বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। (১১)

[ ] Wallac's "The Geographical Distribution of Animals etc." P. 76—77 and 328—329; also H. F. Blanford's papes in the 'Quarterly Journal of the Geological Society" Vol. XXXI (P. 534—540). Haeckel's "History of Creation" Vol. I. P. 360—61 and Vol. II. P. 325—26.

[১০] Ency- Brit. Vol. III. P. 778 (9th Ed.)

(১১) "Quite recently, Sir Arthur said, he had examined a human skull dug up in a river-deposit to the

ভারতের উত্তর-সীমান্ত প্রদেশে মানবাকৃতিবিশিষ্ট বানর-জাতীয় বহু জীবের অস্থি ও কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও মানবের কঙ্কাল বা অস্থি পাওয়া যায় নাই। (১২) যদি নিগ্রোজাতীয় মানবের উৎপত্তি এই স্থানে হইয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বহু মানব-কঙ্কাল পাওয়া যাইত। কিন্তু ইহা আর্য্যগণের জন্মভূমি থাকায়, এবং আর্য্যগণের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল হইতে শবদাহ প্রথা বিদ্যমান থাকায়, মানবের কঙ্কাল বা অস্থি পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। এতদ্দ্বারাও এই প্রদেশকে আর্য্যগণেরই জন্মভূমি বলিয়া বিশ্বাস হয়। আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্যভাষা কিরূপে য়ুরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত আলোচনা মৎপ্রণীত "Rig-Vedic India" নামক পুস্তকে করিয়াছি। সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

west of Agra at a depth of 30 feet. The depth at which a skull was found in such a deposit gave a very uncertain clue to its antiquity, but in this particular case the find was of great interest, for the specimen so brought to light was still the prevailing type throughout the dense population which extends from the Punjab to Ceylon."

(২) "The finds of fossil remains of extinct kinds of anthropoid apes had been numerous on the Northern frontiers of India, but so far no traces of fossil man had been discovered."

উদ্ভট-সাগর।

চাতক-পক্ষী মেঘের নিকটে আপনার দুঃখ জানাইয়া কহিতেছে :—

যাচিতোঽসি ন জলায় কেবলং
কিন্তু মেঘ তব দানমানতঃ।
নীরমস্তি জলধৌ হ্রদে নদে
চাতকোঽস্তি ন ভয়াচ্ছিরোনতেঃ॥

হে মেঘ! তোমার কাছে করি নিবেদন,
না করি প্রার্থনা শুধু জলের কারণ।
কণামাত্র জল যদি কর মোরে দান,
তবেই আমার বাড়ে পরম সম্মান।
নদে হ্রদে সমুদ্রেও জল আছে বটে,
কিন্তু নাহি যেতে চাই তাদের নিকটে।
চাতক খাইলে জল মাথা হেঁট্ করি'
কুলের কলঙ্ক তার চিরদিন ধরি'!

পণ্ডিত লোকের কি কি ৮টি গুণ আবশ্যক, তাহা কবি এই শ্লোকে নিরূপণ করিতেছেন :—

গর্ব্বং নোদ্বহতে ন নিন্দতি পরং নো ভাসতে নিষ্ঠুরং
প্রোক্তং কেনচিদপ্রিয়ঞ্চ সহতে ক্রোধঞ্চ নালম্বতে।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রমনেকলক্ষণযুতং সন্তিষ্ঠতে মূকবদ্
দোষাংশ্ছাদয়তে গুণান্ বিতনুতে পাণ্ডিত্যমষ্টাগুণম্॥

না রাখেন অহঙ্কার মনে কদাচন,
না করেন পরনিন্দা ভুলেও কখন,
কদাপি নিষ্ঠুর বাক্য না আনেন মুখে,
কটু কথা শুনিয়াও রন্ মহাসুখে,
ক্রোধকেও মনে কভু না দেন আশ্রয়,
বোবা রন্ জানিয়াও শাস্ত্র-সমুদয়,
দেখিলে পরের দোষ করেন গোপন,
দেখিলে পরের গুণ করেন কীর্ত্তন,
যথার্থ পাণ্ডিত্য-লাভ হইয়াছে যাঁর,
এই অষ্ট গুণ নিত্য থাকিবে তাঁহার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

মিলন-রাত্রি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ময়দানে ছোটখাট বেশ একটি ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। রাজকুমারীকে এদিকে আসিতে দেখিয়া সকলেই—এমন কি, পাহারাওয়ালারাও—তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তখন বালকের গান থামিয়াছে। শরৎকুমার দুই এক জন সেবক সহ তাহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতেছেন; সে মাঝে মাঝে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া উঠিতেছে। রাজকুমারীকে দেখিয়া সে অস্পষ্ট ক্রন্দনের স্বরে আবার 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া উঠিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী সাশ্রু-নয়নে তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া নিকটে দণ্ডায়মান পুলিস দুই জনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"দেখ, বীরপুরুষ তোমরা, ভাল ক'রে এর দিকে চেয়ে দেখ। ছেলেটির ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত চেহারা দেখে কৃতার্থ হও, আনন্দ অনুভব কর; তোমাদের এই কীর্ত্তি ইতিহাস গাথায় অমর অক্ষরে লিখিত থাক্‌বে।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্রোধ-উত্তেজিত শ্লেষপূর্ণ এই তিরস্কার-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে না বুঝিলেও ইহার মর্ম্ম তাহাদের হৃদয়ে পৌঁছিল। এক জন পাহারাওয়ালা তাহার লজ্জাবনত দৃষ্টি হাতের লাঠির উপর স্থাপিত করিল; অন্য জন উদ্ধত ক্রোধে বালকের দিকে চাহিল। জ্যোতির্ম্ময়ী আবার বলিলেন,—"যাকে তোমরা এমন ক'রে জখম করেছ—সে কি তোমাদের শত্রু? না, তোমাদেরই এক জন ভাই?" 'ভাই'—কথাটা খুব জোরের সহিতই জ্যোতির্ম্ময়ী উচ্চারণ করিলেন। "ভাই হয়ে ভাইয়ের প্রতি এমন নির্য্যাতন? কেন—কি জন্য? সে আমাদের অন্নপূর্ণা দেশমাতাকে ভক্তিভরে বন্দনা করেছিল, তার এই অপরাধে? হায় রে দুর্ভাগিনী মাতৃভূমির হতভাগ্য সন্তান তোমরা! তোমাদের শত ধিক্!"

রাজকুমারী অতঃপর বালকের সেই পটি-বাঁধা মুখের দিকে কিছুক্ষণ করুণ কাতর নয়নে চাহিয়া থাকিয়া, মর্ম্মভেদী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা সেই অনুতপ্ত পাহারাওয়ালাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"বল ত ভাইয়া, একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি; ঘরে কি তোমার মা আছেন?"

সে সবিস্ময়ে উত্তর করিল,—"আছেন মা-জি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন,—"তোমরা লাঠির ঘায়ে ছেলেটির দেহে যে রক্তধারা ছুটিয়েছ, ঘরে গিয়ে দেখ গে তোমার মায়ের বক্ষপাঁজরার মধ্যে ঐ রক্ত জমে গিয়েছে, বেদনায় তিনি ছটফট করছেন।"

পাহারাওয়ালার মাতা বহুদিন হইতে শূলরোগে পীড়িত, জ্যোতির্ম্ময়ীর কথায় সে শিহরিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিতে লাগিলেন,—"এই ক্ষতবেদনা থেকে তখনি মাত্র তিনি শান্তিলাভ করবেন—যখন তুমি ভক্তিভরে 'বন্দে মাতরম্' ব'লে উঠবে।"

সহসা ভিড়ের মধ্য হইতে অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিল,—"এ গীত কি অন্নপূর্ণা মাতাজির বন্দনা! তা ত নয়—বাঙ্গালী লোকের এ রাজ-বিরোধ ঘোষণা!"

জ্যোতির্ম্ময়ী সচকিতে সেই দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন,—"ভুল কথা! বাঙ্গালী লোক রাজবিরোধী নয়। বৃটিশ সরকারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অনুগত প্রজা তাহারা।"

এই কথায় একাধিক পাহারাওয়ালা অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"তবে বাঙ্গালী লোক ম্যাজিষ্টরের হুকুম মান্‌ছে না কেন?"

উত্তর হইল,—"সরকার কি ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমাদের ধর্ম্মে হাত দিতে হুকুম দিয়েছেন? মাতৃ-বন্দনা মাতৃ-পূজা আমাদের ধর্ম্ম। রাজ-অনুরোধে কি ধর্ম্ম ত্যাগ করা যায়, তোমরাই বল, ভাইয়া।"

প্রশ্নকারী পুলিস হতবুদ্ধি নিরুত্তর হইয়া পড়িল। আকাশে আবার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠিল। পূর্ব্বোক্ত অনুতপ্ত পাহারাওয়ালার ইচ্ছা হইতে লাগিল—এই বন্দনা গানে সেও যোগদান করে—কিন্তু বাক্য স্ফূর্ত্ত হইল না।

অশ্বের গ্যালপ শব্দ শ্রুত হইল—অদূরে অশ্বারোহী পুলিসকর্ত্তার মূর্ত্তি দেখিয়া পাহারাওয়ালার মনের গতির দোলা অন্যদিকে ফিরিল। যখন অশ্বারোহী নিকটে আসিয়া

থামিলেন, তখন অন্যান্য পুলিসদলের মত সেও সমতেজে উন্নতমস্তকে সৈনিক প্রথায় প্রভু-বন্দনা করিল।

"পুলিস-সাহেব" জ্যোতির্ম্ময়ীর পরিচিত;—কত সময় তাঁহার পিতার ভোজ-নিমন্ত্রণ-টেবলে অতিথি হইয়া একত্র আহার করিয়াছেন। তিনি টুপী খুলিয়া রাজকুমারীকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, রাজকুমারী প্রতিব্যবহারে মাথা নোয়াইয়া ভদ্রতা রক্ষা পূর্ব্বক বালককে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখুন দেখি, আপনার লোকেরা এই নিরীহ বাচ্ছাটির কি অবস্থা করেছে। আপনার আজ্ঞাতেই অবশ্য এরূপ ঘটেছে!" পুলিস-কর্ত্তা দেখিলেন—সত্যই বড় বাড়াবাড়ি পীড়ন হইয়া পড়িয়াছে। আর এরূপ মারপিটে যে তাঁহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না, জনসঙ্ঘের ব্যবহার হইতে ইতঃপূর্ব্বেই তাহা বুঝিয়া তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন এবং পুলিস-শাসন বন্ধ রাখিয়া—তাঁহাদের মতে উত্তেজনার যিনি মূলীভূত কারণ, তাঁহাকে অর্থাৎ সভাপতি মহাশয়কে বন্দী করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিবার হুকুম আনিয়াছিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীর কথায় "very sorry, very sorry" বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "এখন এ দুঃখ আপনার মৌখিক, কিন্তু এক দিন এজন্য সত্যই আপনাদের sorry হতে হবে—আর এই 'বন্দে মাতরম্' গীত শুনে আপনারাও এক দিন সম্মানভরে মাথা নোয়াবেন; এই আমার ভবিষ্যদ্বাণী।"

"পুলিস-সাহেব" একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উপহাসের ভাবে মাথা নোয়াইলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী নিজের দলবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বল ভাই সকলে 'বন্দে মাতরম্'।" সকলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠিল—"সাহেব" তাহা নিবারণের কিছুমাত্র প্রয়াস না পাইয়া নিস্তব্ধে চলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন—Poor thing! I wish she was not trapped into this dangerous pit. Thousand curses to that—leader.

প্রেসিডেণ্ট বন্দিরূপে ম্যাজিষ্ট্রেটের সমীপে আনীত হইলেন। "সাহেবের" অপর্য্যাপ্ত কটূক্তি তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। শিরোভূষণরূপে তাহা ধারণ করিয়া তখনকার মত রাজ-জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি সভায় ফিরিয়া আসিলেন। রাজা প্রেসিডেণ্টের সহবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

ইতোমধ্যে কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সভামণ্ডপের এক পার্শ্বে গালিচা-শয্যার উপর শতাধিক আহত বালক—কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া আছে,—সকলেরই পার্শ্বে তাহাদের নিশান। সভা বসিবার পূর্ব্বে যখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠিল, তখন যাহারা শুইয়াছিল, তাহারাও নিশান উঠাইল, যাহার এক হাতে আঘাত লাগিয়াছিল—সে অন্য হাতে নিশান তুলিয়া ধরিল—দর্শকদিগের নয়নে জাতীয় জীবনের কর্ত্তব্য-পথ যেন উহাতে মুক্ত হইয়া গেল। রাজকুমারী আহত বালকদিগের নিকটেই বসিয়া ছিলেন; তাঁহার নয়নে অশ্রু—হৃদয়ে তপ্ত বেদনা; কিন্তু আশাপূর্ণ গর্ব্বোচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখশ্রী দীপ্তোজ্জ্বল।—'রণ-মত্ততার মধ্যে জীবনদান সহজ; কিন্তু ন্যায় কর্ত্তব্যের অনুরোধে শস্ত্রবলের সহিত নিরস্ত্র প্রাণপণ যাহারা করিতে পারে, তাহাদের জাতীয় মহত্ত্ব জগতে অতুলনীয়, এবং এই মহৎ জাতির ভবিষ্যৎ যে অতি সমুজ্জ্বল, তাহাতে সন্দেহ নাই।' এইরূপ চিন্তার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ীর নয়ন যেন সাগ্রহে কাহার অন্বেষণ করিতেছিল—কিন্তু তাহার দর্শন পাইল না।

গান আরম্ভ হইল,—এ গানটি জ্যোতির্ম্ময়ীরই রচনা।

১

কেমন ক'রে বল্‌ব তোরে ভালবাসি কত,
মা গো ভালবাসি কত!
কিছু ত দেখি না মধুর তোমার রূপের মত!
চাঁদ কি ধরে তত আলো— তুমি যত জ্যোতি ঢালো!
তব পদ-কোকনদে পারিজাত অবনত!
জননী গো জন্মভূমি নমস্কার শত শত!

২

হাসিতে নয়নে তব মণি-রত্ন ঝরে;
নয়নের অশ্রুকণা প্রাণ-দাহ করে।
তুমি মা গৌরব-স্মৃতি, নয়নে আনন্দ-প্রীতি
সকল সুখের নিদান তুমি, দুঃখ-সহন ব্রত।
জননী গো জন্মভূমি নমস্কার শত শত!

৩

শুনেছি ত্রিদিবে দেবী রূপে অতুলনা;
তুমি কি বিতর সেথা তব বিভাকণা?

মুকুট তব শশি-রবি ; তাই ত তারা মোহন ছবি—
তব হিম-নিকেতনে নন্দন কল্পনাহত।
জননী গো জন্মভূমি নমস্কার শত শত!

৪

ষড় ঋতু, মা, তোমার বীণার ঝঙ্কার ;
নব নব রাগে কিবা বাজে চমৎকার!
শীত গ্রীষ্ম বরষায়, বসন্তের পাখী গায়,
শ্যাম-কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ফোটে ফুল অবিরত!
জননী গো জন্মভূমি নমস্কার শত শত!

৫

সাগর চরণ বন্দে গর্জ্জন তরঙ্গে—
বক্ষে গঙ্গা স্তন্য-সুধা ঢালিছে অভঙ্গে।
অঞ্চলে ভরিয়া ধান্য সবে বিতরিছ অন্ন—
তোমাতে হয়েছি ধন্য দয়াময়ি, বঙ্গ-মাতঃ!
জননী গো জন্মভূমি নমস্কার শত শত!

গানের পর বক্তৃগণ একের পর একে তাঁহাদের বক্তব্য-প্রসঙ্গের মধ্যে অদ্যকার এই অত্যাচার-কাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত করিতে লাগিলেন। বৃটিশ ন্যায়ভক্ত পুরুষেরও বিশ্বাস শিথিলমূল হইয়া পড়িল,—তাঁহারা লজ্জাদুঃখে ম্রিয়মাণ নতমুখ হইয়া রহিলেন, যুবকদিগের শিরায় শিরায় উত্তেজনার একটা স্তব্ধ আলোড়ন চলিল।

বক্তৃতার শেষে গায়কগণ দ্বিতীয় গান ধরিল—

১

ভাই রে চিরদিন কি শিশুর মত রবে?
পলতে ঝিনুক ফেলে দিয়ে চুমুক ধর্‌বে কবে—
ও ভাই, চুমুক ধর্‌বে কবে?
কাঁদ্‌লে শুধু চল্‌বে না ত, পাষাণ তাহে গল্‌বে না ত,
কাঁদুনিতে বাঁধুনি দাও ভাবার মহা ভাবে—
জগৎ তখন বুঝবে কথা মুখের দিকে চাবে;
মানুষ হতে হবে তোমার যোগ্য হতে হবে।

গানের দ্বিতীয় কলি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনির মধ্যে রাজার সহিত প্রেসিডেণ্ট মণ্ডপে আগমন করিলেন। সভামধ্যে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল—বিজয়ী বীরের ন্যায় সমাদৃত হইয়া যখন তিনি আসন গ্রহণ করিলেন, তখন পূর্ব্বের অসমাপ্ত গান পুনরায় গায়কগণ গাহিতে আরম্ভ করিল—

২

বিধাতারে দোষো কেন—ভাগ্যে হাতে ধর;
ভাল ক'রে বাঁচবে যদি কষ্ট বরণ কর,
ফুঁয়ে কাঁটা ওড়ে না ভাই, চেষ্টা নিষ্ঠা সাধনা চাই,
এক চাণকের দেশে মিল্‌বে লক্ষ চাণক যবে—
জগৎ তখন চিন্‌বে তোরে আদর ক'রে লবে।
মানুষ হ'তে হবে রে, ভাই, যোগ্য হ'তে হবে।

৩

পড়্‌তে পড়্‌তে তবু ওঠো, জ্ঞানের পথে এগিয়ে ছোটো,
ছোট বড় ছেলে মেয়ে সঙ্গে লও গো সবে,
মিল বাতাসে বাঁধলে পালে, মহা শক্তি পাবে হালে,
নাবিক হয়ে চল্‌বে বেগে জাতির মহার্ণবে—
ধ্রুবতারার শুভ আলো পথ দেখাবে ভবে—
মানুষ হ'তে হবে তোমার যোগ্য হ'তে হবে!
পলতে ঝিনুক ছেড়ে দিয়ে চুমুক ধর্‌বে কবে—
ও ভাই, চুমুক ধর্‌বে কবে?

সুরে, কথায় গানটি সকলের মর্ম্মস্থলে গিয়া পৌঁছিল। গায়কদিগকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মডারেট প্রেসিডেণ্ট মহাশয় উত্তেজিত জনগণের শান্তিপ্রলেপস্বরূপ অভিভাষণ আরম্ভ করিলেন,—

হে ভ্রাতাভগিনীগণ! আমাদের কর্ত্তব্য যেন প্রতিশোধ-স্পৃহায় মলিন হইয়া না যায়। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্র স্মরণ কর—তদ্দ্বারা আমরা তাঁহার বৃটিশ প্রজার সহিতই সমাধিকার লাভ করিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, আমাদের মধ্যে এই যে জাতীয় জীবন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, ইহাও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-দীক্ষার ফলে! এ জন্য যেন আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকি। আমাদের সম্বন্ধে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের শাসন-প্রণালীর যে সকল ক্ষুণ্ণতা আছে এবং স্থলবিশেষে রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে আমরা যে সকল কঠোর আচরণ পাই, সে জন্য যেন আমরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ন্যায়তন্ত্রতার উপর বিশ্বাস না হারাই। অন্যায়ের জয় চিরদিন থাকে না; বৈধ আন্দোলন দ্বারাই আমরা ক্রমশঃ এই সকল অযথা বিধিব্যবস্থার প্রতিবিধান এবং রাজপুরুষদিগের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে পারিব। তবে এ জন্য যে চেষ্টা নিষ্ঠা সাধনা চাই, ইহা ঠিক।

"যে আইনবিধির প্রতিবাদের জন্য আজ আমরা সকলে এখানে মিলিত হইয়াছি, উক্ত বিধি আমাদিগকে সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে—তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; এবং এ জন্য এক পক্ষে গভর্ণমেণ্টই আমাদের ধন্যবাদভাজন। কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা কল্পনার বিষয় ছিল, বঙ্গবিভাগের প্রসাদে আজ তাহা সত্য ঘটনা। আজ আমরা সপ্তকোটি বাঙ্গালী এক হইয়া, সমস্বরে এই বিধির প্রতিবাদ করিতেছি! এই বজ্রনিনাদ বধির গভর্ণমেণ্টকেও যে অচিরে জাগাইয়া তুলিবে, ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। আমাদিগের অদ্যকার কষ্টস্বীকার নিষ্ফল হইবার নয়—ঐ যে আমাদের আহত বালকগণ—উহাদিগের দেহ-বহির্গত রক্ত-সলিল দ্বারা আজ আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি পত্তন হইয়াছে,—আমাদের মিলন উদ্দেশ্য আজ পূর্ণমাত্রায়"—

ওষ্ঠাগত বাক্য বন্ধ রাখিয়া এইখানে সহসা তাঁহাকে থামিতে হইল। "পুলিস-সাহেব" আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের একখানি অনুজ্ঞাপত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ;—"এই কন্‌ফারেন্স সভা বন্ধ করিতে আমি আদেশ করিতেছি। আজ্ঞা পালিত না হইলে গুর্খা সৈন্য দ্বারা সভাভঙ্গ করিয়া দিতে বাধ্য হইব।"

বলা বাহুল্য, অতঃপর সভা বন্ধ করাই নেতৃগণ যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট জয়োৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রাজপুরুষদিগের এই দমননীতির পরিণাম কিরূপ বিষময় হইয়া উঠিল—ইহার ফলে এনার্কিজম্ কিরূপ দেশবিস্তৃতি লাভ করিল, ইতিহাস তাহার ব্যাখ্যা করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজ-ম্যানেজার শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা অণুভার বিবাহ—অগ্রহায়ণের দ্বিতীয় সপ্তাহে। * রাজা অতুলেশ্বর এই বিবাহ উপলক্ষে কন্‌ফারেন্সের দুই চারি দিন পরেই শেষ কার্ত্তিকে সদলবলে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন।

অনেক দিন পরে, রাজসমাগমে মাণিকতলাপ্রাসাদ জনাকীর্ণ সহরশোভা ধারণ করিয়াছে।

রাজকুমারী আসিয়াছেন শুনিয়া হাসি যথাসত্বর এক দিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল। তাঁহাদের প্রথম দর্শন প্রণয়িযুগলেরই মত, আধোবাধো আনন্দের ভাবে তাঁহারা পরস্পরকে চাহিয়া দেখিলেন। অণুভা তাঁহাদের এই মৌন-মিলন হাস্য-মুখরিত করিয়া তুলিল। হাসি-গানে, সরস গল্পে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্নবেলা যেন চকিতে কাটিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ীর বালসুলভ চপলতা আজ সখীদের সহবাসে অবাধ স্রোতে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মাস অগ্রহায়ণ, চারিটা বাজিতে না বাজিতে রৌদ্রের আভা নিস্তেজ হইয়া পড়িল, দিনের আলো সায়াহ্ন-ম্লান হইয়া আসিল। অণুভা বলিল, "চল্, ভাই রাণি দিদি, আমরা নৌকায় বেড়িয়ে আসি।"

হাসি এই প্রস্তাবে খুবই খুসী হইয়া উঠিল। তিন সখীতে তাড়াতাড়ি সান্ধ্য-বেশভূষা সারিয়া লইয়া, ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় অনাদি আসিয়া হাজির হইল। রাজকুমারী আহ্লাদের সুরে বলিলেন, "এই যে, অনাদি-দা! কি মনে ক'রে? তা বেশ বেশ; তুমিও চল ভাই আমাদের সঙ্গে, আমরা কিন্নর হ্রদে নৌকাভ্রমণে চলেছি।"

অণুভা বলিল, "হ্যাঁ, নৌকাডুবি হ'লে আমাদের তা হ'লে আর ভয় ভাবনার কোন কারণ থাকবে না। জান, ভাই হাসি, ইনিই আমাদের সেই কুমার অনাদি-দা, যাঁর সঙ্গে সে দিন তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারিনি ব'লে মনে আক্ষেপ রয়ে গেছে। ইনি আমাদের—হাসি দিদি, বুঝ্‌লে, অনাদি-দা?"

"বুঝেছি, ঠাকরুণ! তোমার আর অত ক'রে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই

অনাদি সহাস্যে এই কথা অণুভাকে বলিয়া অতঃপর হাস্যজনক গম্ভীরভাবে হাসির দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখুন হাসি দিদি, কুমারটুমার আমি নই; অত বড় হুম্‌রো-চুম্‌রো লোক আমাকে ঠাওরাবেন না, আমি সামান্য অনাদি, বুঝ্‌-লেন ত?"

অনাদির এই অসঙ্কোচ আত্মীয়তাপূর্ণ আত্মপরিচয়দান হাসির খুবই ভাল লাগিল। বক্তার বাক্যের সহিত চেহারারও সে মিল দেখিল।

অনাদির বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, অথচ প্রখরতাহীন স্নিগ্ধ

* 'ধর্ম্মবাণী' দেখ।

কোমল এবং তরুণ মুখশ্রী উগ্রতালেশশূন্য সরল-মাধুর্য্য-মণ্ডিত।

প্রশস্ত ললাট বলিতে যাহা বুঝায়, অনাদির কপালে বিধাতা সে কপাল আঁকেন নাই। তথাপি সে নিতান্ত ক্ষুদ্র-ভালও নহে, অধিকন্তু কপালমূলে কার্য্যকারণবোধক ঢিবি দুইটা উঁচু হইয়া উঠিয়া মুখখানি বুদ্ধিশ্রীযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। চুলগুলি হালফ্যাসানে, সীঁথির দুই পাশ হইতে তুলিয়া আঁচড়ান,—কিন্তু তৈলসিক্ত সযত্ন পারিপাট্যের অভাবে তাহা মাথার উপর ঠিক আটিয়া বসে নাই, তাহার কতকগুলা দিগ্‌ভ্রষ্টভাবে এদিকে ওদিকে সরিয়া পড়িয়াছে। হাসির ভাই শচীনও এইরূপ করিয়া চুল আঁচড়ায়, কিন্তু এ জন্য বোনটির নিকট হাস্য-বিদ্রূপের বদলে কোন দিন একটা প্রশংসাবাক্য লাভ করে নাই। আজ কিন্তু অনাদির মাথায় এ ফ্যাসানটা হাসির নেহাৎ অপছন্দ হইল না।

অনাদির নাসিকাও তীক্ষ্ণতাবিহীন, খাট না হইলেও আদপেই কবির উপমেয় শুকচঞ্চুতুল্য সুদীর্ঘ নহে। মুখের মধ্যে সেরা তাহার চক্ষু, প্রকৃতই সে পদ্মপলাশলোচন এবং কমলপাপড়ি দুইটার মত সর্ব্বদাই তাহা যেন হাসিতেছে। এ সম্বন্ধে সে হাসির ঠিক জুড়িদার।

অনাদির চিবুক বিশেষরূপে মাতুলক্রম ঈষদ্দীর্ঘ, ওষ্ঠাধর সুঠাম প্রফুল্ল এবং দেহগঠনও মামার তরুণ বয়সের অনুরূপ ছিপছিপে পাতলা। মোটের উপর প্রসাদপুর রাজ-বংশের একটা আদর্শ ছাপ তাহার সমস্ত মূর্ত্তিতেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, রাজার এই বৈমাত্রেয় ভাগিনেয়টিকে তাঁহারই দ্বিতীয় সংস্করণ বলিলে খুব একটা অত্যুক্তি হয় না। তবে অতুলেশ্বরের মূর্ত্তিতে, সারল্যের সহিত তাঁহার স্বকীয় সম্পত্তি যে একটি অনুপম গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত, অনাদির চেহারায় এই ভাবটিরই একান্ত অভাব। বয়ো-বৃদ্ধি সহকারেও যে এই স্বভাবচঞ্চল বালক এক দিন মাতুলের উক্ত শ্রীসম্পদের অধিকারী হইতে পারে, তাহাকে দেখিয়া —অন্ততঃ এখন দেখিয়া,—সে সম্ভাবনাটুকু কাহারও মনে উদয় হয় না।

অনাদির দৈহিক সবল রূপ এক দিকে যেমন মুখের সরল-শ্রীকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তাহার ওষ্ঠা-শ্রিত যৎসামান্য গোঁপের রেখাপাত স্বাভাবিক বালভাবের সহিত মিলিয়া তাঁহার প্রকৃত বয়ঃক্রমকে ক্যামারা-চিত্রের ন্যায় লোকনয়নে ক্ষুদ্রতর—অপ্রকৃতরূপে প্রতিফলিত করি-তেছে। অনাদির বয়স বাইশ, কিন্তু হাসি তাহাকে সমবয়স্ক ভাবিয়া তাহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিল।

সাজ-সজ্জা এই রাজবংশীয় যুবকের একেবারেই সাদা-সিধা। পরিধানবস্ত্রে নিপুণ ভৃত্যের বহু শ্রমসাধ্য আলম্বিত কোঁচার পত্তন বা পিরাণে গিলার কুঞ্চন নাই। সদ্যঃধৌত মোটা ধুতী পিরাণের উপর তাহার গায়ে একখানা আলোয়ান মাত্র জড়ান, তাহাতেই তাহাকে গ্রীকমূর্ত্তির ন্যায় সুন্দর মানাই-য়াছে। বেমানান হইয়াছে কেবল তাহার পায়ে দেশী মোটা চামড়ার দেশী মুচির গড়া চটী জুতাজোড়া। ইহাদের পায়ের আগায় টানিয়া টানিয়া অনভ্যস্তপদে সে যখন চটাপট চলে, তখন হাস্যসংবরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। রাজ-কুমারী তাহার পায়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমরা ভাই, নৌকাযাত্রায় চলেছি, গঙ্গাযাত্রার অভিপ্রায় ত আমাদের নেই। তুমি যদি এই চটী প'রে নৌকায় উঠতে যাও, তা হ'লে আজ আমাদের অতলে তলাবার বিশেষ সম্ভাবনা।"

অনাদি হাসিয়া বলিল, "কখনো না,—দেখে নিও।"—

"না ভাই, আমি দেখতে চাইনে, সে সখ আমার মোটেই নেই। আচ্ছা, তোমাকে যে সে দিন জুত এক জোড়া দিলুম—পরবে না কখনো ?"

"পরব—পরব। অত বাহারে জুত কি আটপৌরে পরবার জিনিষ ? তোমার বিয়ের দিন পরব।"

"দেখ অনাদি-দা—জ্বালিও না বলছি। বাহারে জুত না পরতে চাও, তা হ'লে দরোয়ানি মোটা নাগরা পর। তোমার এ চটীর চেয়ে সেও ঢের ভাল ?"

"দেখ ভাই রাজকুমারী দি, আর যা বলতে হয় বলো, আমার চটীর নিন্দে কোরো না, সেটা আমার প্রাণে সইবে না, জান ত, বিদ্যাসাগর মশায় এই চটীজাতকে পায়ের স্পর্শে মানুষ ক'রে দিয়ে গেছেন।"

অনাদির বলিবার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিল—হাসি জুতাধারীর সৎসাহসে জুতার প্রতিও শ্রদ্ধাকৃষ্ট নয়নে চাহিল। অণুভা অনাদির কথার উত্তরে কহিল—"আর আমাদের কুমার বাহাদুর—মহত্তর জুত ধারণ ক'রে মানুষ হবার চেষ্টা করছেন!"

"আর তোমরা পাঁচ জনে মিলে আমাকে বাঁদর নাচাবার চেষ্টা করছ। ধন্য ধন্য।"

অনাদির এই কথার উত্তরে অণুভা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই হাসি কহিল, "কুমার সম্বোধন আপনি পছন্দ করেন না দেখছি, অনাদি-দা বলেই কি তবে আপনাকে ডাকব?"

অনাদির অমায়িকভাব-ভণিতায় প্রথম দর্শনেই তাহার প্রতি যে আত্মীয়তাভাবের উদ্রেক হইয়াছিল, সহাস্য স্নিগ্ধমধুর স্বরে তাহা ব্যক্ত করিয়া হাসি এই প্রশ্ন করিল। অনাদি তাহার উত্তরে প্রফুল্লভাবে কহিল, "এ অনাবশ্যক প্রশ্ন হাসিদিদি! আমি ত আপনাকে হাসিদি বলতে আপনার অনুমতির অপেক্ষা রাখিনি।"

রাজকুমারী কহিলেন, "বেশ করেছ, তুমি মস্ত বীরপুরুষ! এখন শ্রীজুতাসহ চরণ জোড়াটি বাড়াও দেখি। যে রকম গল্প ফেঁদেছ, এইখানেই দেখছি, আমাদের তুমি স্তম্ভাকৃতি দান করবে।"

"তাই না কি? তাই না কি? আমি কি মশয়দের দাড় করিয়ে রেখেছি না কি? যেতে হবে কোথায়? জলকে? তবে আস্‌তে আজ্ঞে হোক।"

বলিতে বলিতে পদদাপে সিঁড়ির ঘরটা সজাগ করিয়া তুলিয়া, সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল, "ওঃ, আসল কথাটা বলতে যে একেবারেই ভুলে গেছি। হরিরাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। সে গাড়ীবারান্দায় অপেক্ষা করছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "কিন্তু তার সঙ্গে যদি এখন দেখা করি—তা হ'লে আজ আর নৌকায় যাওয়া হবে না। এমনিতেই দেরী হয়ে পড়েছে। তুমি তাকে ব'লে এস, ভাই, যে, সন্ধ্যা-বেলা দেখা করব এখন। ব'লেই কিন্তু তুমি শীঘ্র চ'লে এস, আমরা সকলে মিলে অন্দর-পথে ঘাটযাত্রা করব—বুঝলে ত?"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সে চটাপট নামিয়া গেল। রাজকুমারী সিঁড়িপথে দাঁড়াইয়াই সখীদের সহিত গল্প সুরু করিয়া দিয়া কহিলেন, "আমার হরিরামকে যদি দেখ, হাসিদি, খুবই তোমার হাসি পাবে; কিন্তু তার গল্প যদি শুনতে চাও"

হাসি ব্যগ্রভাবে বলিল, "শুনব, শুনব।"

"তা হ'লে কিন্তু হাসিটাকে কিছুক্ষণ চেপে রাখ্‌তে হবে —নইলে তার গল্প জমবে না।"

"আমি ঠিক বলছি রাজকুমারি মোটেই হাসব না তখন।"

বলিয়া সে খানিকটা খুব হাসিয়া লইল। রাজকুমারীও হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ! এখনই তা হ'লে হাসির ফোয়ারাটাকে নিঃশেষ ক'রে নেও। তার পর হরিরাম যখন সনাতন চৌধুরী ঠাকুরের ধর্ম্মব্রিজ্ঞার বিশদ ব্যাখ্যা করবে, তখন সমজদার শ্রোতার মত গম্ভীরভাবে সে কথা শুনে যেও। তবে আত্মরক্ষার্থ এইটুকু আগে থাকতে ব'লে রাখি যে, শুনতে শুনতে যদি নিদ্রারোগে ধরে আমাকে কিন্তু তখন দায়ী করো না।"

অণুভা বলিল, "না হাসিদি, রাজকুমারীর কথায় ভয় পেয়ো না—হরিরামের গল্প তোমার ভালই লাগবে।"

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "আমার কিন্তু সত্যি ভাই তার গল্প শুনলেই ঘুম পায়। যা হ'ক, সন্ধ্যাটাও তা হ'লে এইখানেই কাটাচ্ছ? আহারান্তে রাতে তার পর আমি নিজেই তোমাকে পৌঁছে রেখে আসব—এই ঠিক রইল, কেমন?"

হাসি এ কথার কোন উত্তর না দিতে দিতে কুন্দ পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "রাজকুমারি?"

রাজকুমারী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "এই যে কুন্দদি, আমরা নৌকায় যাচ্ছি—আপনিও চলুন না?"

কুন্দ সে কথার কোন উত্তর না করিয়া কহিল "একবার এ দিকে আসবে? একটা কথা আছে।"

"গোপন কথা না কি?" বলিতে বলিতে রাজকুমারী কিছু দূরে সরিয়া কুন্দের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুন্দ তাঁহাকে চুপে চুপে যে কথা বলিল, তাহাতে তাঁহার মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর হইয়া পড়িল, দু'জনে দু'এক মুহূর্ত্তকাল কথাবার্ত্তা হইবার পরে কুন্দ বিদায় গ্রহণ করিল, রাজকুমারী সখীদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া হাসিকে বলিলেন, "আজ ভাই একটা বিশেষ দরকারে আমায় ঘরে থাকতে হবে—অনাদি-দা এসে তোমাদের নৌকায় নিয়ে যাবেন।"

রাজকুমারী নৌকাভ্রমণে যাইতে পারিবেন না শুনিয়া সকলেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। হাসি বলিল,—"আমারও ত ভাই নৌকায় যাওয়া হবে না। পরশু যে গায়েহলুদ, সে কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। কত যে গোছগাছ করার আছে। আমি না গেলে মা, দিদিমা সকলেই খুব রাগ করবেন।"

রাজকুমারী তাহাকে আর থাকিতে পীড়াপীড়ি না করিয়া কহিলেন, "হাঁ, সত্যিই ত; পরশু যে অণুদিদির গায়ে

হলুদ। আজ তা হ'লে ছেড়ে দিচ্ছি হাসিদি—পরশু কিন্তু হলুদ নিয়ে তোমায় নিজেরই আস্‌তে হবে। নইলে হলুদ-স্নান জম্‌বে না, তার পর আমরা দু'জনে মিলে কনে সাজাব, এই সর্ত্তে ছাড় পেলে, এইটি মনে রেখো।"

হাসি বলিল—"আচ্ছা, বেশ, নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌লুম, কিন্তু ফুলশয্যার দিন তোমারও ভাই কনে সাজাতে আস্‌তে হবে—আস্‌বে ত, ভাই? কথা দাও।"

"গায়ে হলুদের সাজ ত দাদা দেখতে পাবে না, ফুলশয্যার সাজ দাদার মনে ধরান চাই।"

অণুভা রাগের ভাণ করিয়া সলজ্জে কহিল—"যাও, আমি সাজতে চাইনে।"

রাজকুমারী হাসিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিলেন। ইতোমধ্যে অনাদি আসিয়া জুটিল। রাজকুমারী তাহাকে কহিলেন—"অনাদি-দা, আজ আর ভাই নৌকাভ্রমণ হলো না। আমার মোটর গাড়ীবারান্দায় আছে—তুমি প্রহরী হয়ে হাসিদিকে বাড়ী পৌছে এস দেখি।"

অনাদি স্ত্রীলোকের অস্থিরচিত্ততা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কূটমন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত গাড়ীবারান্দায় আসিয়া মোটর-চালকের পার্শ্ব গ্রহণ করিল। রাজকুমারী ও অণুভা হাসিকে মোটরে চড়াইয়া দিয়া উভয়ে ভিন্ন পথে গৃহাভিমুখী হইলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ব্যবহার-পার্থক্য।
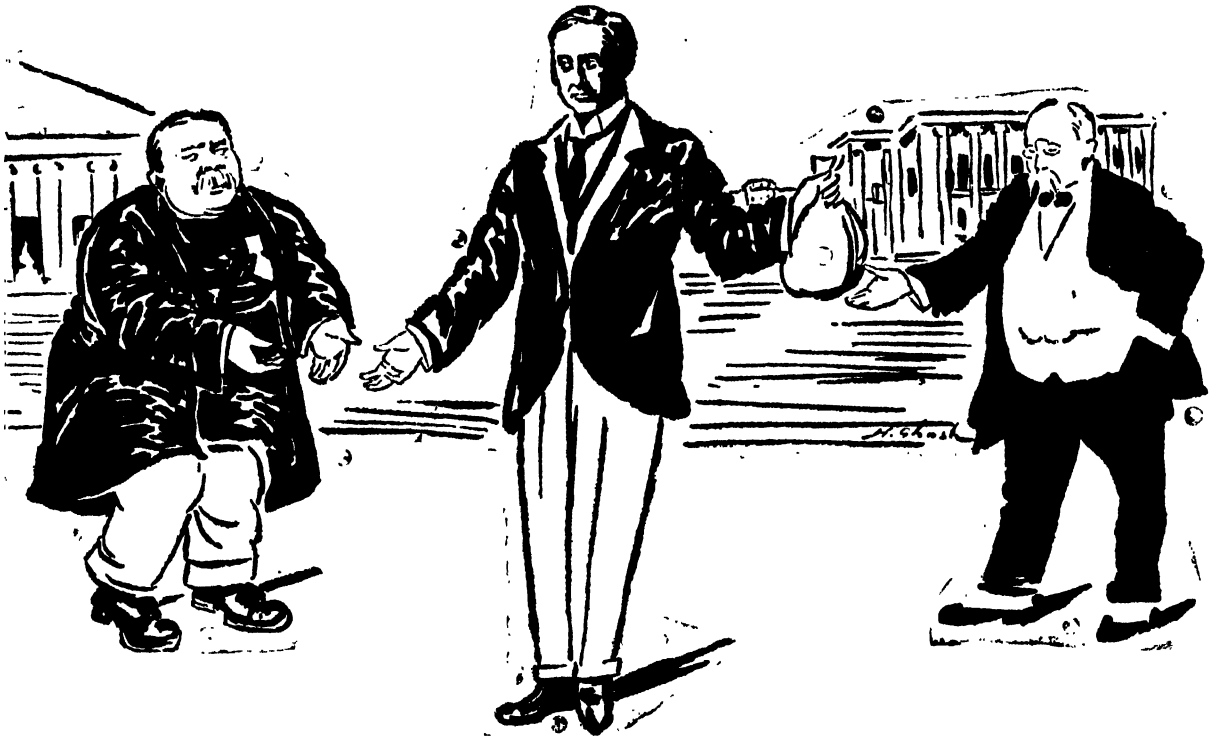
আশুতোষ—ঢাকার বেলায় আদর ক'রে দিচ্ছ টাকার তোড়া,
আমার বেলায় নিদয় কেবল—দিচ্ছ কিছু থোড়া।

শিল্পী—শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুমারী।

আলিপুরে পক্ষিনিবাস।

বাঙ্গালা ভাষায় নূতন গবেষণা।

রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলন সভায় * আমি বলিয়াছিলাম যে, "আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, তত দিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না।" এ কথা বলিবার একটু কারণ ছিল; তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে আমাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে, যদিও অৰ্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে, তবু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হয় নাই কেন? আমি বলিয়াছিলাম, একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, সে সকলের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা, এই জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। * * * সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থ-ব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞানশিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদীতে ও সরোবরে, তরু-কোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞানপিপাসুর যে, কত প্রকার সম্বন্ধ বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাঙ্গালার দয়েল, বাঙ্গালার পাপিয়া, বাঙ্গালার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে?

এতদিন পরে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান্ সত্যচরণ লাহার 'পাখীর কথা' † আমাকে যেন এক নূতন আশার বাণী শুনাইয়াছে। পুস্তকখানি পাইয়াই আমি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিলাম। পড়িতে পড়িতে যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে এমন অভিভূত হইলাম যে, কিছুকালের জন্য আমার প্রিয় রসায়নশাস্ত্র-চর্চ্চার কথা বিস্মৃত হইতে হইল। আমাদের দেশে যাঁহারা ধনীর সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের "কর্ম্মহীন সুদীর্ঘ অবসরে" কি প্রকারে কালাতিপাত করেন, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। বহিখানি পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহার রচয়িতার দৈনন্দিন জীবনের atmosphere (বেষ্টনী) ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিজ্ঞান সাধনার অনুকূল। ইচ্ছা হইল, একবার স্বচক্ষে তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া আসি। যে পক্ষিভবনে (aviary) তাঁহার সযত্ন-সংগৃহীত বিহঙ্গগুলি উদ্যানমধ্যে পালিত হইতেছে, তাহা দেখিবার জিনিষ; যে লতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে ময়ূরগুলি বিচরণ করিতেছে, তাহা দর্শকের চক্ষু এড়াইতে পারে না। পুষ্প-ভবনে বিচিত্র বিদেশী পরগাছা (orchid) শোভা পাইতেছে। স্বতন্ত্র বড় বড় পিঞ্জরে ছোট বড় পাখী সেবা পাইতেছে। তাঁহার পাঠাগারের ও বসিবার ঘরের দেওয়ালে তাঁহারই নির্দ্দেশ-মত অঙ্কিত বড় বড় চিত্রে পাখীর জীবনলীলা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কাচের আলমারীর মধ্যে নানা বিহঙ্গ-শব Stuffed হইয়া যেন জীবন্তভাব ধারণ করিয়া আছে;—শুনিলাম, তাহার অনেকগুলি শ্যাংহাই হইতে আনীত। জীবন্ত পাখী সম্মুখে রাখিয়া তাহার চিত্রকর যে ছবিগুলি আঁকিয়াছেন, তাহা কোনও পাশ্চাত্য পাখীর ছবি অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। আমি দেখিলাম যে, আমার অনুমান মিথ্যা নহে। বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে।

য়ুরোপে দেখা যায় যে, যাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের সীমান্ত-রেখা নিজ নিজ প্রতিভাবলে সুদূর-প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহারা একটা-না-একটা খেয়াল বা নেশার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতেই আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। হোয়াইট্ (White) এর Natural History of Selbourne পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেমন করিয়া এক জন মধ্যবিত্ত পাদ্রী কতকগুলি বিহঙ্গের হাবভাবস্বভাব (habits) ও জীবন-কাহিনী সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। Swallow জাতি কি প্রকারে নীড় রচনা করে এবং কোন্ সময়ে তাহারা ইংলণ্ডে আইসে এবং শীতের প্রারম্ভে জীবন রক্ষার্থ কোথায় চলিয়া যায়;—

* সভাপতির অভিভাষণ, সন ১৩২৫

† পাবলিসার বেঙ্গল বুক কোম্পানী কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

এই সকল বিচিত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া বিহঙ্গতত্ত্ববিদগণের মধ্যে তিনি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া জনসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। আমাদের "পাখীর কথা" রচয়িতা যথার্থই বলিতেছেন—"তত্ত্বলাভের তীব্র বাসনা য়ুরোপীয় বালকবৃন্দকে যে কেবল দেশীয় পক্ষীর পালন-ব্যাপারে লিপ্ত রাখিতেছে, তাহা নহে ; তাহারা বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নানাবিধ বিদেশীয় পক্ষীকে সাবধানে ও সযত্নে স্বদেশে আনয়ন পূর্ব্বক অনভ্যস্ত প্রকৃতি-প্রতিকূল জল-বায়ু কৃত্রিম উপায়ে অভ্যাস করাইয়া কৃত্রিম খাদ্যাদির সাহায্যে উহাদিগের পুষ্টি সাধন করিয়া বৈদেশিক পাখীগুলির জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পাইতেছে। এমন কি, কোন কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু কেবল বৈদেশিক পক্ষিপালনে নিযুক্ত থাকিয়া ধারাবাহিকরূপে উহার জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।"

য়ুরোপবাসীদিগের মধ্যে যাহারা পুরাকালে ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিস্এ প্রবেশলাভ করিয়া উচ্চপদস্থ হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চাঙ্গের পক্ষিতত্ত্ববিদ্ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ইঁহারা সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও স্ব স্ব খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া অবসরমত ভারতবর্ষের নানা জাতীয় বিহঙ্গের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। যে মিষ্টার হিউমকে (A. O. Hume) আমাদের ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের জন্মদাতা বলিয়া সকলেই জানেন, তিনি যে পাখীর বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়া য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অল্প লোকই জ্ঞাত আছেন। তাঁহার রচিত Nests and Eggs of Indian Birds নামক বৃহৎ পুস্তকের উল্লেখমাত্র করিলেই যথেষ্ট হইবে। স্বনামখ্যাত ডগলাস্ দেওয়ারের (Douglas Dewar) নাম পক্ষিবিজ্ঞান বিভাগে সুপরিচিত।

মিষ্টার হিউম।

যে সকল মনীষী প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে আপনাদিগকে উৎসৃষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে বসিলে স্বতঃই হিউবারের (Huber) কথা মনে পড়ে। ইনি প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং মক্ষিকাতত্ত্ববিদ্ বলিয়া বিদ্বজ্জনসমাজে প্রথিতনামা। যৌবনকালে ইনি চক্ষুরত্ন হইতে বঞ্চিত হয়েন ; কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর চক্ষুস্বরূপ হইয়া মধুমক্ষিকা-জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেন। সেই মনস্বিনী নারীর পরীক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া তদবলম্বনে হিউবার অনেক বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 'Natural History of the Bees' নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। এই যে আজকাল আমরা কথায় কথায় Queen bee, Drone, মৌমাছি ও পিপীলিকা জাতির republicএর কথা এতটা জানি, তজ্জন্য ইহার নিকটে আমরা কৃতজ্ঞ ; কারণ, ইনি এক জন প্রধান পথিপ্রদর্শক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক একটি খেয়াল পোষণ করিতে না পারিলে অনেক সময় জীবন মধুময় হয় না। স্যর জন লাবক্ (Sir John Lubbock, পরে Lord Avebury) এক জন ধনী শ্রেষ্ঠীর সন্তান এবং প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তাঁহার এই কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যেও তিনি 'Ants, Bees, and Wasps' নামক এমন একখানি বই লিখিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কি বিপুল ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে গ্রন্থকর্ত্তা পিপীলিকা ও মক্ষিকাগণের জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই খেয়াল আছে বলিয়াই তিনি পুস্তকান্তরে Pleasures of Life ও Beauties of Life নিপুণ ভাবে চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হেনরী ক্যাভেণ্ডিসের

নাম জড়বিজ্ঞানে অদ্বিতীয়। ইনি ইংলণ্ডের অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ কৌলীন্য-মর্য্যাদাসম্পন্ন এক জন ডিউকের পুত্র (Duke of Devonshire); ইনিও এক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, পার্থিব সুখ-সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আজীবন পরীক্ষাগারে (Laboratory) কালাতিপাত করেন এবং নিউটনের ন্যায় তদ্গতচিত্ত হইয়া জড়তত্ত্বের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছেন। সংসারধর্ম্ম করিবার অবসর পর্য্যন্ত ইনি পায়েন নাই। এক দিন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের জনৈক প্রতিনিধি সহসা তাঁহার পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্! ব্যাঙ্কে আপনার এক কোটী টাকা মজুদ; আপনি আদেশ করিলে আমি তাহা সুবিধামত খাটাইবার বন্দোবস্ত করি।" সাধকের তপোভঙ্গ হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আগন্তুকের প্রতি এমন ভ্রূকুটীকুটিল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন যে, সে ব্যক্তি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। আবার বৎসরান্তে ব্যাঙ্ক তাঁহার টাকার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে, তিনি বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন—"দেখ, যদি তুমি ফের আমাকে বিরক্ত কর, তাহা হইলে তোমার কাছ থেকে প্রত্যেক পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত তুলে নে'ব (Look here Sirrah ! If you trouble me again, I shall withdraw every farthing from your Bank)। আভিজাত্যাভিমানী Salisbery সেসিল-বংশধরগণ (House of Cecil), মারলবরোবংশীয়েরা (The Churchills) ও অন্যান্য অনেক বড় বড় কুলপতি বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনীতিকুশলতায় কাহারও অপেক্ষা এখন ন্যূন নহেন। ধনবান্ চিকিৎসকের সন্তান চার্লস ডার্বিন (Charles Darwin) বহু বৎসর পরিশ্রম করিয়া বিবর্ত্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ আজীবন এই রকম একটি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা, একনিষ্ঠ সাধক হইয়া বিজ্ঞানানুশীলনে রত থাকা কেবল য়ুরোপেই দেখা যায়। তবে জাপানও য়ুরোপের পদানুসরণ করিতেছে।

এই ত গেল য়ুরোপীয়ের কথা। এ সকল কথা আমি তুলিতাম না, যদি আজ আমার মনে একটু আশার সঞ্চার না হইত। আমাদের দেশের অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যেও এই সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর কথা উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন। দর্শন, কাব্য, গদ্য সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র-বিদ্যা,অর্থাৎ যাহা কিছু কলাবিদ্যা নামে অভিহিত, সমস্তই ঠাকুর বাড়ী হইতে উৎসারিত হইতেছে। আহ্লাদের বিষয়, কলিকাতার প্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের মধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় কায়মনোবাক্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন; শ্রীযুত ভবানীচরণ নিপুণ চিত্র-শিল্পী হইয়াছেন; শ্রীমান্ সত্যচরণ পক্ষিবিজ্ঞানে ভারতবাসীর পথিপ্রদর্শক হইলেন।

এত দিন আমাদের দেশের পাখীর তথ্য জানিতে হইলে বিদেশী গ্রন্থ উদ্ঘাটন করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। শতাধিকবর্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষা এতদঞ্চলে প্রচলিত হইলেও প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান ও জীবতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের রুচি আদৌ স্ফুরিত হয় নাই। এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, পুরাতন হিন্দু কলেজের প্রথিতনামা অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে 'পক্ষিবিবরণ' নামক ৬৬০ পৃষ্ঠা-পরিমিত একখানি গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এই ৮৭ বৎসরের মধ্যে এ দিকে কাহারও মন যায় নাই। আবহমান কাল হইতে হতভাগ্য বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েরা কেবলমাত্র মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ বিদ্যাকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে। ফলে এতদিন এ দেশীয়ের মস্তিষ্ক এক প্রকার অসাড় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে যে দুই একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ইতঃপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহা প্রায়ই ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদমাত্র, এমন কি, মক্ষিমুক্ষী নকল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সত্যচরণের 'পাখীর কথা' সে দলের নহে। গ্রন্থকার স্বয়ং নানা শ্রেণীর পাখী প্রতিপালন করিয়া তাহাদের habits দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, মাতোয়ারা হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার বহু নিদর্শন এই পুস্তকের মধ্যে, এবং বোম্বাই এর ও বিলাতের নানা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় দিয়াছেন। বুলবুল পাখীর Albenism ও Melanism লক্ষ্য করিয়া এই বিচিত্র রহস্যময় বর্ণ-বিপর্য্যয়ের সম্যক্ পরিচয় ইনিই সর্ব্বপ্রথমে পক্ষিবিজ্ঞান জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই সমস্ত খণ্ডপ্রবন্ধের কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিলেও গ্রন্থকারের এই প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকে পাখী সম্বন্ধে যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও ইংরাজ পণ্ডিতও এ দেশীয় পালিত অথবা বন্য-বিহঙ্গের পরিচয় এমন ভাবে দিবার চেষ্টা করেন

নাই। পাখী পুষিতে হইলে কি কি করা চাই, পোষা পাখীর পর্য্যবেক্ষণ কিরূপ হওয়া উচিত, আবদ্ধ অবস্থায় প্রসূত বর্ণ-সঙ্করের বন্ধ্যাত্ব দোষ থাকে কি না, পাখীর সহজ সংস্কারের পশ্চাতে কোনরূপ বিচার-বুদ্ধি আছে কি না, কৃত্রিম পক্ষি-গৃহে নীড়স্থ ডিম্বগুলি হইতে একই সময়ে কি উপায়ে শাবক বাহির করিতে হয়,—এই সমস্ত অত্যন্ত কৌতূহল-প্রদ রহস্যময় ঘটনার বিবৃতি ও আলোচনা অন্যান্য বহু অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে যথাতথ পুস্তকের প্রথম ভাগে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। তরুণ গ্রন্থকারের লিপিচাতুর্য্যও বিশেষ প্রশংসার্হ। দ্বিতীয়ভাগে ব্যবহারিক পক্ষিতত্ত্ব-বিষয়ক এমন অনেক কথা সুনিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে এবং বোধ হয়, কৃষিজীবী বাঙ্গালীর উপকারে আসিতে পারে। তৃতীয়ভাগে কালিদাস-সাহিত্যে বিহঙ্গ-পরিচয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে শুক, সারী, চক্রবাক্, কুররী প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাখীকে সনাক্ত (identify) করিবার জন্য গ্রন্থকার যে, কেবল সংস্কৃত সাহিত্য ও অভিধান মন্থন করিয়াছেন, তাহা নহে; য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞগণের রচনা হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কবিবর হেমচন্দ্র সেক্‌সপীয়ারকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।" অবশ্য মানব-প্রকৃতি বর্ণনায় ইংরাজ কবি অতুলনীয়; কিন্তু আমার বোধ হয় যে, nature বা নিসর্গচিত্র অঙ্কনে ভারতের কবির সমকক্ষ কেহ নাই। আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই যে, মহাকবি কালিদাস বিহঙ্গজাতির স্বভাব-চরিত্র, যাযাবরত্ব প্রভৃতি এত সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষায় এই পুস্তক প্রচারিত করিয়া মাতৃভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছেন। আশা করি, নবীন লেখক ornithologyর নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়া আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকিবেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

আকাঙ্ক্ষা।

আমি চাহি না তমাল যমুনার কূলে
শ্যামশোভা হেরি যা'র,
ব্রজে শ্যাম-বিরহিণী রাধিকার আঁখি
বরষে নয়ন-ধার।

আমি চাহি না কদম বরষা বরষে
ফুলে ফুলে ফুলময়;
যা'র ছায়াঘেরা মূলে শ্যামের বাঁশরী
রাধা সুরে সাধা রয়।

আমি চাহি না মাধবী মলয়-সোহাগে
বিকচ কুসুমহার;
যা'র দলিত কুসুম জানায় গোকুলে
গোপিকার অভিসার।

আমি রোপিব তুলসী, দিব জল-ঝারা,
সাঁঝে দীপ দিব মূলে;
সে যে দেবতার পায় সঁপে আপনায়
প্রেমে আপনায় ভুলে।

গুহামধ্যে।

৫

ক্ষুদ্র শিশু যেন কি বুঝিতে পারিয়াছে; বুঝিয়া শঙ্কিত হইয়াছে। নহিলে আজ আমাকে সে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না কেন? আহ্নিককার্য্য করিব, সে ঘাড়ে পিঠে কোলে উঠিয়া আমার জপ, তপ, সব গোলমাল করিয়া দিতে লাগিল। কোলে রাখিলে কাঁধে উঠিতে চায়, কাঁধে করিলে পিঠে ঝুলিবার জন্য যেন ব্যস্ত হয়, পিঠে রাখিলে আবার কোলে শুইবার জন্য ব্যাকুলতা দেখায়।

ভুবনের মা'র এত স্নেহ—এমন বুকে-করিয়া-মানুষ-করা সে যেন ভুলিয়াছে—অকৃতজ্ঞার মত তার সমস্ত মমতা আমাকে ঢালিয়া দিবার জন্যই যেন সে আজ সঙ্কল্প করিয়াছে। "বা—বা—বা!" কতবার ভুবনের মা'র কোলে দিতে গেলাম, সে দু'টি কচি বাহু দিয়া আমাকে জড়াইয়া রহিল; কোলে দিলে আবার ঝাঁপাইয়া আমার কোলে আসিল।

"বা—বা—বা!" ভুবনের মা কাছে দাঁড়াইয়া আমার এ দুর্দ্দশা দেখিতেছিল, দেখিয়া যেন বিপুল সুখানুভব করিতেছিল।

"আমি কি আজ আহ্নিক পর্য্যন্ত করতে পাব না, ভুবনের মা?"

"তা আমি কি করব, বাবা?"

"একটু নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে এস।"

"অপর ঘরে নিয়ে যাও" বলাই আমার উচিত ছিল। মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে কতকটা আমি আত্মহারারই মত হইয়াছিলাম, কি বলিতে কি বলিলাম।

ভুবনের মা শুনিয়াই চমকিতার মত উত্তর করিল—"রাস্তায়?"

"ও ঘরে বলতে রাস্তায় বলেছি।"

অন্য ঘরে উপস্থিত হইতে না হইতেই গৌরী যাইবার পথেই কাঁদিয়া উঠিল। ভুবনের মা তাহাকে ভুলাইবার কত চেষ্টা করিল—তাহাতেও যখন তার রোদনের নিবৃত্তি হইল না, তখন বৃদ্ধা সত্য সত্যই তাহাকে পথে লইয়া গেল। ধার্ম্মিকা বৃদ্ধা আমার দুরবস্থাটা বুঝিয়াছিল। সে দেখিল, গৌরীর অত্যাচারে আমার সন্ধ্যা-আহ্নিক কিছুই ত করা হইল না!

পথে লোকজনের যাতায়াত দেখিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে শান্ত হইতে পারে। অনুমানে নির্ভর করিয়া ভুবনের মা তাহাকে বাড়ীর সম্মুখের পথে ভুলাইতে লইয়া গেল। শিশু ভুলিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুক্ষণ তার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম না।

এই সময় যথাসম্ভব সত্বর জপকার্য্য সারিতে গিয়া দেখিলাম, আমি অশক্ত। মালার দুইটা বীজ ঘুরাইতে গিয়াই বুঝিলাম, গৌরীই আমার ধ্যান, আমার জপ, আমার তপস্যা। ওই ক্ষুদ্র শিশুই আমার মনের সমস্তটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রাণপণ চেষ্টায় ইষ্টচিন্তা করিতে গিয়া আমি কেবল বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ গৌরীর সঙ্গে জড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম না, কখন্ কেমন করিয়া সেই দূর অতীতের আমার ভস্মীভূত সংসার—আমার বাড়ী, ঘর, স্ত্রী সমস্ত যেন নূতন জীবনে জাগিয়া আমার পলক-বদ্ধ দৃষ্টিকে আক্রমণ করিল। সর্ব্বশেষে আসিল, গৌরীর মূর্ত্তি ধরিয়া—"বা—বা—বা" মুখ হইতে নূতন উচ্চারিত পিতৃ সম্বোধনের চেষ্টায় চঞ্চল অধর দুটি লইয়া তাহার সেই মায়ের বুকের স্পন্দন-রহিত প্রাণশূন্য কন্যা। সেই উচ্চারণের ভিতর হইতে সে যেন আমাকে শুনাইতে লাগিল, —"বা—বা—বা—আমার মা ম'রে গেছে, কেবল বাবা তুমি আছ – তুমি আমাকে ফেলে দিয়ো না।"

জপ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। এ কি মায়া, না দয়া? গৌরি, গৌরি, মা আমার, এই মালা হাতে ইষ্টমন্ত্র জপিতে গিয়া একবার যে বলিতে পারিতেছি না, তুমি আমার নও। পৃথিবীর যেখান হইতে সেখানেই যাই না কেন, তোমার স্মৃতি-পুত্তলী বুকে করিয়াই যদি আমাকে পথ চলিতে হয়, তা হইলে কেমন করিয়া আমি সন্ন্যাসী হইব?"

"বা—বা—বা"—আয় গৌরী আয়।

"জপ সাঙ্গ হ'ল কি, বাবা?"

"হয়েছেই মনে ক'রে নাও।"

"আজ এ এমনটা কেন করছে, বুঝতে ত পারছি না।"

"আমি বুঝেছি।"

"কি বল দেখি, বাবা—এখানে সেখানে নিয়ে কোথাও আমি একে শান্ত করতে পারলুম না!"

কোশা, কুশি, মালা—সমস্ত উঠাইয়া গৌরীকে কোলে লইলাম। কোলে আসিয়াই আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া অতি অবসাদে যেন সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু তার ঘন-কম্পিত অভিমানের নিশ্বাস, তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানির অজস্র স্পন্দন আমাকে আকুল করিয়া তুলিল।

"জপ বুঝি শেষ করা হয়নি?"

"না।"

"তা আমি তোমার কথাতেই বুঝেছি। হাজার কাঁদলেও আমি আর একটু পরে আসতুম। একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বলেই ত আমাকে আসতে হ'ল।"

"কে তিনি?"

"তাঁকে ত আর কখন দেখিনি।"

"কোথায় তিনি?"

"পথেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে সঙ্গে করেই আনছিলুম। তুমি আহ্নিক করছ শুনে তিনি আমাকে বললেন, তাঁর আহ্নিক শেষ হ'ল কি না, আগে দেখে এস।"

গৌরীকে কাঁধে লইয়াই আগন্তুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। অন্য অন্য দিন গৌরী সে সময় ঘুমাইয়া থাকে—আজ সে আমার কাঁধে—এখনও ঘুমায় নাই। কিংবা যদিই সে ঘুমাইয়া থাকে,কাঁধ হইতে তাহাকে নামাইতে আমার সাহস নাই, পাছে কাঁচা ঘুমে জাগিয়া আবার সে গোলমাল করে।

বাহিরের দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখি—"এ কি আপনি? ব্রজমাধব বাবু?"

"আপনার আহ্নিক সারা হয়েছে?"

"আপনার কি বিশেষ কোনও দরকার আছে?"

"কিছু প্রয়োজন আছে। অবশ্য সেটার জন্য কাল এলেও একেবারে যে চলতো না, এমন নয়।"

এক জন ঐশ্বর্য্যশালীর প্রয়োজন আমার কাছে! সঙ্গে আলো লইয়া মাত্র একটি চাকর। ভাবে বোধ হইল, অনেকটা গুপ্তভাবেই তাঁর আসা। কারণ জানিবার আমার কৌতূহল হইল। আমি তাঁহাকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলাম।

৬

আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া এবার গৌরী ঘুমাইয়াছে। ভুবনের মাও একটু অবকাশ পাইয়া ভগবানের নাম লইতে বসিয়াছে। পাছে নাড়া-চাড়ায় ঘুম ভাঙ্গিয়া আবার শিশু কাঁদিয়া উঠে, এই জন্য আমারই আসনের এক প্রান্তে সাবধানে তাহাকে শোয়াইয়া, নিজেই আর একটা আসন পাতিয়া ব্রজমাধব বাবুকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বসিলেন না—বলিলেন, "খুকী আপনার স্থান দখল করেছে, আপনিই ওই আসনে বসুন।"

প্রদত্ত আসনে বসিবার বৈধতা যত প্রকারে বুঝান যায়, বুঝাইতেও যখন তিনি বসিতে চাহিলেন না, তখন অগত্যা আমাকেই সেই আসন গ্রহণ করিতে হইল। আমার সম্মুখে মেঝের উপরেই ব্রজবাবু বসিলেন। তাঁরই বামে আমার পূর্ব্বাসনে নিদ্রামগ্না গৌরী—এখনও থাকিয়া থাকিয়া ঘনঘুম ভেদ করিয়া তার অভিমানের আবেগ নিশ্বাস-কম্পনে উথলিয়া উঠিতেছে।

আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাহার অত্যন্ত দীনতায় আমার মনে আধ্যাত্মিকতার অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই রাত্তিরে বাসা খুঁজে এসেছেন। পথের পরিচয় কে দিলে?"

"আপনারই গুরুদেব—সাধুবাবা।"

"আপনি ত সেইখানেই আমাকে দেখেছেন!"

"তখন পরিচয় পাই নাই। আপনি চলিয়া আসিবার পর আমি আবার সেখানে গিয়েছিলাম। তিনিই আমাকে ব'লে দিলেন।"

"কি প্রয়োজনে আগমন, বলুন।"

"আমাকে দীক্ষা দেবার জন্য সাধুবাবাকে অনুরোধ করতে হবে।"

"আমাকে?"

"আপনাকে।" বলিয়া ব্রজনাথ বাবু দীনতাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

"আমি যে বাবু, আপনার কথা বুঝতে পারলুম না!"

"আমি তাঁর কাছে দীক্ষার প্রস্তাব করেছিলুম। তিনি আপনার নাম ক'রে বললেন, তার কাছে যাও, সে যদি আমাকে অনুরোধ করে, তা হ'লে তোমাকে দীক্ষা দিতে আমার আপত্তি থাকবে না।"

"এ যে আরও বড় হেঁয়ালি হ'ল, বাবু! আমি অনুরোধ কর্‌ব, তবে তিনি আপনাকে দীক্ষা দেবেন!"

"এই ত তিনি বল্‌লেন।"

"কিছুক্ষণ নীরবে, কাঠের পুতুলের মত ব্রজবাবুর সম্মুখে বসিয়া এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। ব্যর্থ চেষ্টায় তাঁহাকে বলিলাম—"বেশ, দুই জনে এক সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব।"

"কাল কখন্ আপনার সময় হবে বলুন?"

গৌরী এই সময় ধীরে ক্রন্দনের একটি সুর ধরিয়াই যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"বল্‌ছি" বলিয়াই গৌরীকে ঘনঘুমে আচ্ছন্ন করিতে আমি তার মাথায় ধীরে চাপড় দিতে আরম্ভ করিলাম। ব্রজবাবুও একবার স্থিরনেত্রে সেই বালিকার মুখের পানে চাহিলেন।

আমি বলিতে লাগিলাম—"এখনও আপনার কথা আমার হেঁয়ালির মত ঠেক্‌ছে। আমি আপনার জন্য কি অনুরোধ কর্‌ব, বুঝতে পার্‌ছি না, তবে আপনি যখন মিথ্যা বল্‌ছেন না—তখন আমি যাব। সকালবেলায় পার্‌বো না—বিকালে।"

"বিকালে অনেক লোক সেখানে উপস্থিত থাকেন। আমি চাই কিছুক্ষণের জন্য নির্জ্জনতা।"

"দীক্ষা নেবার অভিপ্রায় জানাবেন, তাতে নির্জ্জন হবার এত কি প্রয়োজন?"

ব্রজবাবু কি যেন উত্তর দিতে গিয়া নিবৃত্ত হইলেন, কহিতে কহিতে কথাগুলা যেন তাঁর ঠোঁট দু'টায় আবদ্ধ হইয়া গেল।

"বুঝ্‌তে পেরেছি, গুরুদেবকে বল্‌বার এমন কতকগুলি আপনার কথা আছে, যা লোকের কাছে বল্‌তে আপনার সঙ্কোচ হবে। কোনও কিছু বিষম ভুলের কাজ।"

"আছে" বলিয়াই ব্রজবাবু মাথা হেঁট করিলেন।

আমি তাঁর অবনত মুখের পানে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলাম। দেখিয়া বোধ হইল, কি যেন একটা প্রচণ্ড অনুতাপের জ্বালা তাঁর মুখের উপর লীলা করিতেছে। বলিলাম—"বুঝেছি। তবে মহাপুরুষের চরণাশ্রয় নেবার সদ্‌বুদ্ধি সত্যই যদি আপনার জেগে থাকে, তা হ'লে সংসারীর দুর্ব্বলচিত্ত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে চল্‌বে না। লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, সত্যপথ অবলম্বনের তিনটি প্রচণ্ড বাধা। আমার বোধ হয়, আপনি আজ একটা শুভ সুযোগ হারিয়ে ফেলেছেন। জোর ক'রে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে অন্তরটা উন্মুক্ত ক'রে দেওয়াই আপনার উচিত ছিল।"

ব্রজমাধব মুখ তুলিয়া একটা যেন বিপুল হতাশার দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিলেন। আমি তাঁর মনের অবস্থাটা তাঁর দৃষ্টির ভিতর দিয়া বেশ দেখিতে পাইলাম। তবু আমাকে বলিতে হইল—"সাধুসঙ্গ জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন বটে, কিন্তু তাঁর কৃপালাভ জীবনের এক সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় মুহূর্ত্তেই ঘটে থাকে। সে মুহূর্ত্ত একবার চ'লে গেলে হয় ত সারা জীবনের মধ্যে আর ফিরে আস্‌বে না।"

"তবে কি তাঁর কৃপা আমার ভাগ্যে হবে না?"

"আমি এর উত্তর দিতে পার্‌লুম না।"

"পারেন, দিলেন না।"

"না, বাবু, আমি আপনাকে প্রতারণার বাক্য বল্‌নি। সাধু মহাপুরুষদের ক্রিয়া-রহস্য আমাদের মত সংসারীর পক্ষে বুঝা বড় কঠিন। কঠিন বল্‌ছি কেন, অনেক সময় বুঝা অসম্ভব।"

"তবে তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন কেন?"

ব্রজবাবুর কথায় একটু উত্তেজনার ভাব দেখিলাম। সেটা যেন লক্ষ্য না করিয়া আমি বলিলাম—"এ পাঠানর রহস্য, আপনাকে সত্য বল্‌ছি, আমি এক বিন্দু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"আপনি তা হ'লে অনুরোধ কর্‌ছেন না?"

ঠিক এমনই সময়ে গৌরী খুঁৎ খুঁৎ করিয়া উঠিল। উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমার অনেক বিবেচনার প্রয়োজন হইয়াছিল। শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিবার মত তাঁর প্রশ্ন নয়। ব্রজনাধব বাবুকে সেই বিকালের পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। তাঁর নাম পর্য্যন্ত কখন শুনি নাই। তাঁর বাড়ী পাবনায়, আমার বাড়ী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রামে। কাশীতে উভয়েই উপস্থিত না থাকিলে কখনও কোন কালে আমাদের পরস্পরের দেখারই সম্ভাবনা থাকিত না। তাঁর প্রকৃতি, চরিত্র আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এরূপ লোকের জন্য গুরুর কাছে আমি কি অনুরোধ করিব? ব্যাপার বৈষয়িক নয়, আধ্যাত্মিক। বিষয়ীর চক্ষুতে ব্যাপারটা তুচ্ছ হইলেও, যে ধর্ম্মপথে চলিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার কাছে দীক্ষার ব্যাপার ত তুচ্ছ

নয়! এ পথে চলিবার একটা ভুলে কখন কখন সারাজীবনের চলা নিষ্ফল হইয়া যায়।

গুরুদেব আমাকে সন্ন্যাস দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এ কি তবে আমার সন্ন্যাস-গ্রহণ-যোগ্যতার পরীক্ষা?

খুঁৎ খুঁৎ করিয়া গৌরী উত্তর দেওয়ার দায় হইতে আপাততঃ আমাকে রক্ষা করিল। "বল্‌ছি" বলিয়াই আমি গৌরীকে কোলে উঠাইলাম। উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার জাগরণের ভাব দেখাইল। কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম—"তোর আজ মতলবটা কি বল্ দেখি? ধ্যান, জপ ত পণ্ড ক'রে দিলি, বাবুর সঙ্গে কথা কব, তাও কি করতে দিবি না?"

"মেয়েটি আপনার কে?"

"কাশীস্থান, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ দেব কেমন ক'রে, বাবু!"

"এমন সুন্দর শিশু আমি অল্পই দেখেছি।"

"এটি আমার কেউ, এ কথাও বলতে পারি না; কেউ নয়, এ কথাও বল্‌তে পারি না।"

"আমি মনে করেছিলুম, আপনার কন্যা।"

"কন্যা; আমিও ত মনে কর্‌তে চাই। সীতা যদি জনকের কন্যা হন, তা হ'লে গৌরীই বা আমার কন্যা হবে না কেন? কুড়িয়ে পাওয়া কন্যার বাপ হয়েও জনক জীবন্মুক্ত রাজর্ষি। কিন্তু এ রাক্ষসী যে আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব খেয়ে দিলে! কন্যা বল্‌তে যে আমার ভয় হয়!"

"আপনি একে কুড়িয়ে পেয়েছেন?" বলিতে বলিতে ব্রজনাথ, সতৃষ্ণ ভাবে গৌরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আমি দেখিলাম, দেখিতে গিয়া তাঁর শরীর যেন স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। এ বালিকার জন্মের সঙ্গে এ স্পন্দনের কিছু সম্পর্ক আছে নাকি? আমি বলিলাম—"কুড়িয়ে পেয়েছি।"

ব্রজমাধবের মুখের উপর দিয়া দেখিতে দেখিতে কতকগুলা কালিম তরঙ্গ খেলা করিয়া গেল।

উভয়েই আমরা কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক্। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল—গৌরীকে লাভ করিবার অবস্থা হঠাৎ মনে জাগিয়া উঠিয়াছে!

ব্রজমাধব বলিলেন,—"কাল তা হ'লে আস্‌ব কি?"

কথা আমি শুনিয়াও শুনিলাম না। গৌরীকে পরিত্যাগের কথা মনে আনিতেই আমার হৃদয় ভার হইয়া উঠিতেছে। আমি পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের অনুসরণে বলিলাম—"ব্রজমাধব বাবু, সে এক ইতিহাস কথা। সদ্যোজাত শিশু কোলে বসুদেব যখন নন্দগৃহে চলেছিলেন, তখন কি প্রকৃতি তার চেয়েও ভীষণ অবস্থা ধরেছিল?"

প্রাণ যেন বুকের কোন্ নিভৃত দেশে লুকাইয়া দারুমূর্ত্তির মত আমার পানে ব্রজমাধব চাহিয়া রহিলেন।

দেখিয়া, জোর করিয়া হৃদয়ের আবেগ স্থগিত করিলাম। "আর বলব না, বাবু! ব'লে অনর্থক আপনার প্রাণে কষ্ট দেব না। শুনে দেখ্‌ছি, আপনারও করুণার প্রাণ উথ্‌লে উঠ্‌ছে। বলতে গেলে এর মা-বাপের উপর আমার রাগ হয়—তাদের শাপ দিতে আমার ইচ্ছা হয়। আমি একে কুড়িয়ে পেয়েছি। না—না—চুরী করেছি। আপনি ত শুনেছেন, ওই যে গুরু বললেন—চুরী! তার ফলে এই আমার অবস্থা!" বলিতে গিয়া অঙ্কস্থ শিশুর গোলাপ-বর্ণ পা দু'খানি হইতে মুখখানি পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। আমার চোখেরই ভ্রম, না দুষ্ট মেয়েটার দেয়ালা—তার ঘুমন্ত মুখখানা একবার হাসিতে ভরিয়া উঠিল—তারা দু'টা একবার দীপ্ত হইয়া আবার ঘুমের লহরে ডুবিয়া গেল।

"ব্রজমাধব বাবু, এ আমার দয়া না মায়া?"

অর্দ্ধ-নিরুদ্ধকণ্ঠে ব্রজমাধব উত্তর করিলেন—"দয়া।"

আমি মাথা নাড়িলাম। "তবে ছাড়্‌বার কথা মনে উঠ্‌তেই আমি পাগলের মত হয়ে যাচ্ছি কেন?"

"ছাড়্‌বেন কি?"

"ছাড়্‌বো না?"

"না—না! দয়া ক'রে যখন এটিকে একবার বুকে তুলে নিয়েছেন।" বলিয়াই ব্রজমাধব একটি অঙ্গুলী দিয়া অতি সন্তর্পণে গৌরীর চিবুক স্পর্শ করিলেন।

"ছাড়্‌বো না?"

"কিছুতেই না। এই কন্যার ভরণ-পোষণের সমস্ত ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব—ভালরূপ ব্যবস্থা—আমি অঙ্গীকার করছি।"

"না ছাড়্‌লে যে আমি চোর হব!"

"চোর? পৃথিবীতে এমন পাষণ্ড কেউ নেই, যে আপনাকে ওই হীন কথা বলবে।"

আমি হাসিলাম—"গুরু যে বল্‌লেন, ব্রজমাধব বাবু! আপনি ত শুনেছেন! শুনে বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? আজ প্রথম এ আমাকে বাবা বল্‌বার চেষ্টা করেছে, হয় কাল, নয় পরশু বল্‌বে;—বল্‌বেই। বল্‌বার এমন চেষ্টা আর কোনও শিশুতে দেখেছি ব'লে আমার মনে হয় না। একবার যখন সে সুস্পষ্ট আমাকে বাবা ব'লে ডাক্‌বে, সে পিতৃ-সম্বোধনে আমি কেমন ক'রে উত্তর দেব?"

"কেন দেবেন না? স্বয়ং বিশ্বনাথ এসে আপনাকে উত্তর দিতে নিষেধ কর্‌লেও আপনি শুন্‌বেন না। আপনি এ শিশুর বাপ, মা, শরণ—ভগবান্।"

"উত্তর দিলেই ত চোর হব, ব্রজনাথ বাবু! গুরুর বাক্য ত মিথ্যা হ'তে পারে না!"

ব্রজমাধব স্তব্ধের মত বসিয়া রহিলেন। তাঁর আর একটা কথার প্রতীক্ষা—আর একবার—কেবলমাত্র একটিবারের মত এখন যদি ব্রজমাধব আমাকে বলেন, আপনিই এর পিতা, তা হ'লেই বুঝি চোর হওয়া থেকে আমি রক্ষা পাই। ব্রজমাধব কিন্তু একটা নিশ্বাসের শব্দ দিয়াও আমার সাহায্য করিলেন না।

"বাবা! রাত ঢের হয়েছে, খুকীকে আমার কাছে দিয়ে যাও।"

"তুমি এসে নিয়ে যাও। আমি বাবুর সঙ্গে কথা কইছি।"

ভুবনের মা গৌরীকে লইয়া ঘরের বাহিরে যাইতেই ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি কে?"

"তিনিই ওই শিশুর মা, বাপ, শরণ ও ভগবান্। গৌরী যে এই এগারো মাস বেঁচে আছে, সে কেবল ওই মমতাময়ীর কৃপায়।"

"আপনার কি স্ত্রী নাই?"

"এক সংসার—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—রোগ উদরস্থ করেছে, আর এক সংসার গ্রাস করেছে অগ্নি। সন্ন্যাসী হব ব'লে দেশত্যাগ করেছিলুম—বিশ্বনাথের আশ্রয়ে এসে লাভ কর্‌লুম ওই কন্যা।"

"আপনাকে কিছুতেই ওটিকে ত্যাগ করতে দেব না।" ব্রজমাধব উঠিলেন।

"কাল বিকালে কোথায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব?"

"আমিই আপনার কাছে আস্‌ব।"

দ্বার পর্য্যন্ত আমি তাঁর অনুগমন করিলাম। বিদায়-গ্রহণের সময় তিনি বলিলেন—

"আমি ইচ্ছা করছি, আপনার ওই কন্যাকে—"

"থাক্, কাশীতে প্রতিশ্রুতি কর্‌বেন না। মনের ইচ্ছা এখন মনেই রাখুন।"

৭

ভুবনের মা'কে ত অন্তরের কথা গোপন করিলে চলিবে না! কিন্তু কেমন করিয়া তার কাছে গৌরী-ত্যাগের কথা তুলিব? কি প্রকারেই বা ত্যাগ করিব? এক জনকে ত সমর্পণ করিতে হইবে! শিশুর বাপ মা? এই এগারো মাস পরে কেমন করিয়া তাদের খুঁজিয়া বাহির করিব? সন্ধানের সুযোগ যদিও কিছু থাকিত, তা বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। যদি কিছু থাকিত—সুযোগ ছিল, সেই এগারো মাস পূর্ব্বে—যে সময় এই শিশুকে আমি লাভ করি। এখন যেন বোধ হইতেছে, ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিই সে সুযোগ ত্যাগ করিয়াছি। সমাজ-শাসন—কেহই ত এখন আমার গৌরীর মা-বাপ হইবার অপরাধ স্বীকার করিবে না! তবে কার হাতে আমি বা-বা বলা এগারো মাসের গৌরীকে তুলিয়া দিব?

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। গভীর অন্তর্যাতনায় আমি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। শয্যাত্যাগ করিয়া ছাতে উঠিলাম। চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না—গঙ্গার একরূপ উপরেই আমার বাসা—পূর্ব্বপারে, কাঞ্চন-কান্তি নদী-সৈকত—চাহিতেই মনে হইল, যেন চঞ্চল বায়ু-তরঙ্গ গৌরীর রূপোল্লাস তীরভূমি হইতে গঙ্গার বুকে ছড়াছড়ি করিতেছে। দূর ছাই, গুরুর কাছে না গিয়া দেখিতেছি আমার নিস্তার নাই।

"বাবা!"

নীচে নামিয়া উত্তর করিলাম—"কেন ভুবনের মা? গৌরী কি আবার জেগেছে?"

"না।"

"তার কি কোন অসুখ করেছে?"

"বালাই!"

"কি জন্য আমাকে ডাক্‌লে?"

"তুমি আজ ঘুমুতে পারছ না কেন?"

"কেন পারছি না, বল্‌তে পার, ভুবনের মা?"

"বাবাজীর কাছ থেকে এসে অবধি তুমি কেমন ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছ ?"

"তুমি মিছে বলনি—আমার মনটা হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠেছে।"

"কেন হয়েছে, বুঝ্‌তে পেরেছি। মেয়েটা দিন দিন তোমাতে বড় ন্যাওটো হয়ে পড়্‌ছে।"

"তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছ।"

"আজ তাকে শান্ত করতে আমি হার মেনে গেলুম।"

"কি করি, ভুবনের মা, দুটো সংসার পেটে পুরে আমি যে কাশীতে এসেছি !"

"আজ তুমি ঘুমোও।"

"গুরু বল্‌লেন, তোমার সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় এসেছে।"

"এ ত ভাগ্যের কথা, বাবা। এসে থাকে, নেবে।"

"কেমন ক'রে নেবো ?"

"সে আমি কি ক'রে বল্‌ব, বাবা ?"

"গৌরী ?"

"তার ভাবনা যে জন্মকাল থেকে ভেবে আস্‌ছে, সেই ভাব্‌বে।"

ভুবনের মা'র উত্তরে আমি কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। মা, বাপ, আশ্রয়—সমস্তই বলিতে একমাত্র যার অধিকার, তার মুখ হইতে হঠাৎ এরূপ নির্ম্মমতার কথা শুনিবার প্রত্যাশা আমি করি নাই। তবু তার মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি গৌরীকে ছাড়্‌তে পার, ভুবনের মা ?"

"পারি না পারি, এক দিন ছাড়্‌তেই ত হবে, বাবা !"

আরে ম'ল, বুড়ী বলে কি ! আমি ত মনে করিয়াছিলাম, কোন গতিকে আমিও যদি মেয়েটাকে ছাড়িতে পারি, এ বুড়ী পারিবে না। আমি ত শুধু নিজের জন্য অস্থির হই নাই, ভুবনের মা'র জন্যও হইয়াছি। এত স্নেহ সন্তানের প্রতি কোন মায়েরও যে আমি কোন কালে দেখি নাই !

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল—"তোমার এক ছেলে এক মেয়েকে একবার ছেড়েছি—তার পর সেই সর্ব্বনাশীটাকে ছেড়েছি—তার মা কে—" আর ভুবনের মা বলিতে পারিল না।

"তুমি তাদের ছেড়েছো কই, ভুবনের মা, তারাই তোমাকে ছেড়েছে। এও যদি সেই রকম ক'রে তোমাকে ছাড়ে, তবেই ত তুমি ছাড়্‌ পাবে।"

"বালাই, ওকে এবারে ছাড়্‌তে দেব কেন—আমি ছাড়্‌বো—আমাকে ছাড়ার শোধ নেব।"

"বেঁচে থাকতে ?"

"আমি আর ক'দিন বাঁচব ?"

যে যার মনের ভাব বুঝিয়া লইলাম ; বুঝিয়া কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিলাম। ভুবনের মাও কিছুক্ষণ নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল ; তার পর বলিল—"আজ ঘুমোও—রাত্রি অনেক হয়েছে।"

তার কথায় বোধ হইল, বৃদ্ধা আমার পূর্ব্বেই গৌরীর ভবিষ্যতের আশ্রয় খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়াছে, বুঝি সে সন্ধান পাইয়াছে। "আজ ঘুমোও, মানে কি ভুবনের মা ?"

"আজ আর ও কথা কেন, বাবা ? যা জিজ্ঞাসা কর্‌বার, কাল ক'র।"

"বল্‌তে কি বাধা আছে ?"

ভুবনের মা উত্তর দিল না। দিল না বলিতেছি কেন, দিতে পারিল না। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া আমি বলিলাম—"বেশ, কালই জিজ্ঞাসা কর্‌ব।"

বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছি, ভুবনের মা বলিয়া উঠিল—"তোমার কাছে গোপন কর্‌বার কি আছে, বাবা ! তবে সমস্ত না জেনে বল্‌তে যাব, কাশীস্থান, কি বল্‌তে কি ব'লে অপরাধী হব, তাই তোমাকে আজ আর কিছু বল্‌ছি না। আজ সে আসেনি, কালও যদি সে না আসে ?"

এ "সে" যে কে, আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। এই এগারো মাসের মধ্যে এক দিন তার চরণ দু'টিমাত্র দেখিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজও পর্য্যন্ত মেয়েটি কি গৌরীকে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে ?"

"শুধু আজ সকালে আসেনি, বাবা ! এই এগারো মাসের মধ্যে এক দিনের জন্যও তার আসার কামাই ছিল না।"

"বুঝেছি, ভুবনের মা, তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত কর্‌বার ব্যবস্থা কর।"

"নিশ্চিন্ত বিশ্বনাথই কর্‌বেন।"

বাস্তবিক, তার পর শুইতে গিয়া এমন ঘুমাইয়া পড়িলাম যে, জাগিয়া দেখি, গৌরী আমার আগে জাগিয়াছে। [ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

সাধুর প্রকৃত জীবন-চরিত তাঁহার সাধনা। লাবণ্যে ঢল ঢল, মধুভরে টল টল, সৌরভে বিভোর, ঐ যে ফুলটি ফুটিয়াছে, উহার ক্ষুদ্র, ক্ষণিক কুসুম-জীবনের অন্তরালে যে কত অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষ লুকাইয়া আছে, তাহা সাধারণ দৃষ্টির গোচর নহে। যে অলৌকিক ভগবদ্‌ভক্তি, অনন্তনির্ভর, উদার বিশ্বপ্রেম, অপূর্ব্ব লোক-হিতৈষণা, সুদৃঢ় সত্য-সঙ্কল্প; ত্যাগ, তিতিক্ষা, বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাসের যে সজীব ছবি আমাদের অন্তরে অপরিমেয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার বৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে সকলের পশ্চাতে যে কি কঠোর তপ, উগ্র সাধনা, কি অক্ষুণ্ণ শ্রান্তিশূন্য প্রয়াস অজ্ঞাতবাস করিতেছে, বহির্দ্দৃষ্টে তাহার কোন আভাসই পাওয়া যায় না। যে প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি আজ আমাদের হৃদয়ের প্রীতি ও পূজা আকর্ষণ করিতেছে, এক দিন তাহার নিভৃত অন্তস্তলে নরত্ব ও দেবত্বের যে কি প্রাণপণ দ্বন্দ্ব, ভোগ-তৃষ্ণায় ও আত্ম-বঞ্চনায় কি দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম, উদ্দীপনায় ও অবসাদে কি দারুণ ঘাত-প্রতিঘাত সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার করুণ রহস্য একমাত্র অন্তর্যামীই অবগত। নরত্বের গৌরবে সমুজ্জ্বল, দেবত্বের সৌরভে সুশীতল, মহত্বের বৈভবে মহীয়ান্

স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মস্থান।

ঐ আত্মজয়ী পুরুষপ্রবরকে নিরাশার অমানিশায়, মনোভঙ্গের তীব্র বেদনায় সময় সময় যে কত আকুল অশ্রুপাত, ব্যাকুল আত্ম-নিবেদন, কাতর প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল, সর্ব্বদর্শী বিধাতা তাহার একমাত্র সাক্ষী। সাধু বা সাধকজীবনের এই নেপথ্য-কাহিনী চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এই জন্যই সে ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু রসাল ফল কেমন করিয়া সুপরিপক্ক হয়, তাহা অজানা থাকিলেও তাহার রসাস্বাদনে কোন বাধা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, "অত হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি আম খাও।"
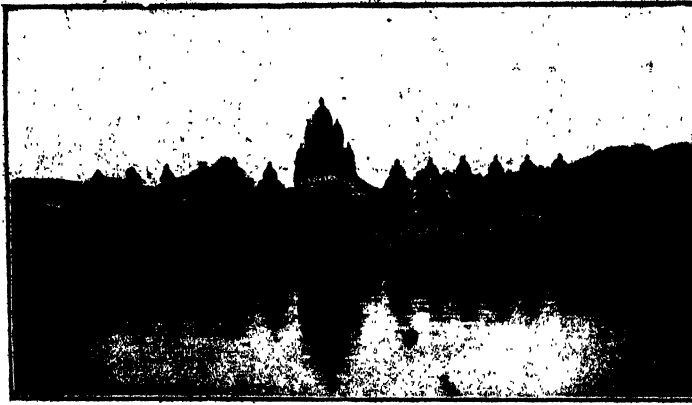
দক্ষিণেশ্বর মন্দির।

সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রাখাল—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—মাতৃহীন হইলে আনন্দমোহন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "রাখাল নিত্যসিদ্ধ, জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্য-সাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, এর আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা—যেন পাতাল-ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়।" পাতাল-ফোঁড়া শিবকে সংসারী করিবার জন্য আনন্দমোহন, কৈশোর অতিক্রম না হইতেই আজন্ম ভগবদ্‌ভক্ত পুত্রের বিবাহ দিলেন। কোন্নগরের স্বনামখ্যাত মিত্রগোষ্ঠীতে রাখালচন্দ্রের বিবাহ হইল। পিতা ভুলেও ভাবেন নাই যে, যে সম্বন্ধ-সূত্রে মানবের মায়া-বন্ধন দৃঢ়তর
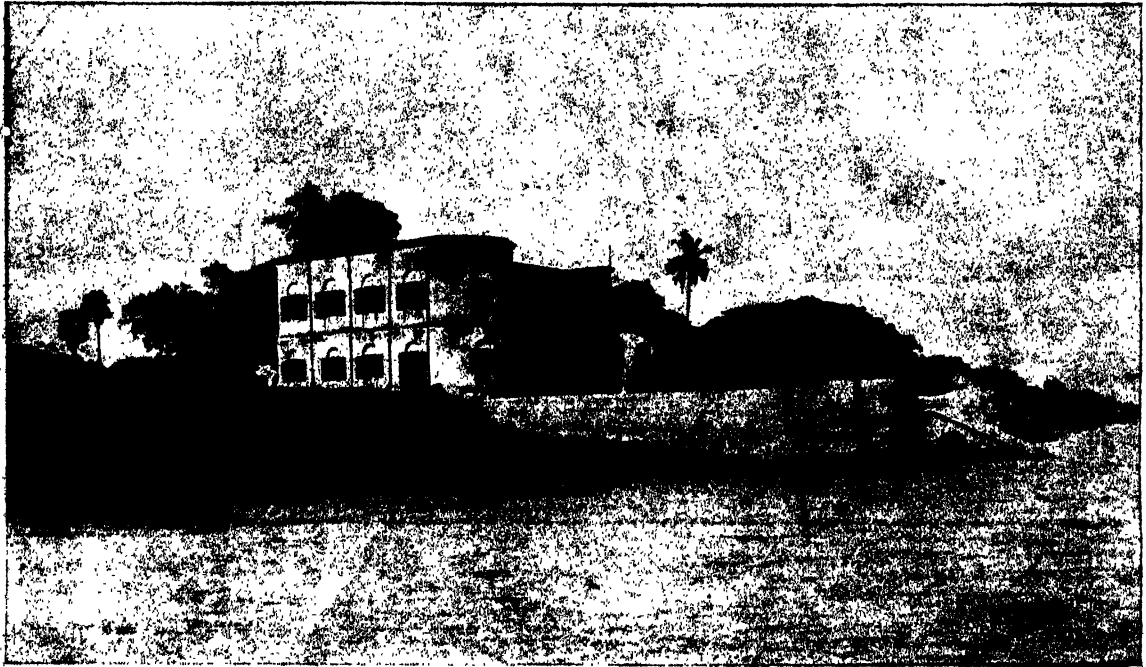
বেলুড় মঠ।

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সন ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান—বসিরহাটের নিকট শিকরা গ্রাম; পূর্ব্বনাম—রাখালচন্দ্র। পিতা ৺আনন্দমোহন ঘোষ

হয়, সেই সূত্র ধরিয়াই পুত্র তাঁহার জীবনের মহান্ আদর্শ লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন ছেদন করিবে।

যে পরিবারে রাখালচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা ভক্তের

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

সংসার। তাঁহার শ্বশ্রুঠাকুরাণী পূর্ব্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রিতা, পুত্রকন্যাসহ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেবদর্শন করেন। রাখালচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ শ্যালক মনোমোহন ভগিনীপতির ভগবদ্‌ভক্তি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া এক দিন তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে লইয়া আসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "মা, ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-সত্ত্ব ত্যাগী ভক্ত ছেলে আমার কাছে সর্ব্বক্ষণ থাকে। এক দিন দেখি, মা একটি ছেলে এনে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, এইটি তোমার ছেলে। আমি ত ভয়ে শিউরে উঠ্‌লাম। মা আমার ভাব দেখে হেসে বল্‌লেন, সাধারণ সংসারীভাবের ছেলে নয়, ত্যাগী মানস-পুত্র। রাখাল আস্‌তেই চিন্‌তে পার্‌লাম, এই সেই।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ [যৌবনে]

রাখালচন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ "গোবিন্দ, গোবিন্দ" বলিতে বলিতে মহাভাব-সমাধিতে মগ্ন হইয়া যাইতেন; অপার স্নেহময়ী জননীর যত্নে তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতেন। রাখালচন্দ্র তখন যৌবনোন্মুখ হইলেও স্বভাবে শিশু ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার সহিত শিশুবৎ ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু এই অপূর্ব্ব বাৎসল্যের খেলা আনন্দমোহন প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিলেন না। পুত্র শ্বশুরবাড়ী যায়, দুই তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়া আসে! প্রথম প্রথম আপত্তি ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। সুযোগ পাইলেই পুত্র

গুরুভ্রাতৃগণসহ স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

সাধুর কাছে পলাইয়া যায়। আনন্দমোহন বিষয়ী লোক, বিষয়সংক্রান্ত নানা কাজে তাঁহাকে ঘুরিতে হয়, পুত্রকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতে পারেন না। বালককে আটক করিবার নিমিত্ত পিতা অবশেষে বাধ্য হইয়া ফাটকের নিয়ম অবলম্বন করিলেন। বাধা পাইয়া বালকের মন রুদ্ধ স্রোতের ন্যায় অধিকতর বেগবান্ হইয়া উঠিল।

এ দিকে সর্ব্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ মানসপুত্রের জন্য মায়ের কাছে কাঁদিয়া আকুল, "মা, আমার রাখালরাজকে এনে দে।" দৈবের আশ্চর্য্য বিধানে আনন্দমোহন এই সময় এক কঠিন মোকর্দ্দমায় লিপ্ত হইলেন। কাগজপত্র দেখিয়া কলিকাতার শ্রেষ্ঠ উকীল-ব্যারিষ্টার মত প্রকাশ করিল, জিতের কোন সম্ভাবনাই নাই। আনন্দমোহন তথাপি জিদ্ ছাড়িতে পারিলেন না, নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও মোকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন; শত্রু ত উৎপীড়িত হইবে! আইন-জীবীদিগের সকল অনুমান ব্যর্থ করিয়া আনন্দমোহনের অতিমাত্র দুরাশা যাহা কল্পনা করিতে সঙ্কুচিত হইত, তাহাই ঘটিল। হারের বাজি জিত হইল। মোকর্দ্দমা-মামলায় সুদক্ষ আনন্দমোহন বুঝিলেন,এ অঘটন-ঘটনা নিশ্চিত দৈবকৃপা, পুত্রের সাধুসঙ্গের ফল। এখন হইতে রাখালচন্দ্রের সকল বাধা দূর হইল। পিতা তাঁহার রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ অবাধ আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আনন্দমোহন ভাবিতে লাগিলেন, এ সাধু কে? দেখিবার জন্য এক দিন স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। রাখালরাজকে সর্ব্বদা কাছে পাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দমোহনকে সবিশেষ যত্ন করিলেন। পুত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "আহা, দেখ, দেখ, আজ কাল রাখালের কি চমৎকার ভাব হয়েছে! ওর মুখপানে চাও, দেখ্‌তে পাবে, ঠোঁট নড়ছে, অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম জপ করে কি না! যদি বল, বিষয়ীর ঘরে জন্ম, জন্ম থেকে বিষয়ী লোকের সঙ্গ, তবু এমন কেমন ক'রে হয়? তার মানে আছে। ছোলা যদি আবর্জ্জনাতেও পড়ে, তবু সেই ছোলাগাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। তা রাখাল যে এখানকে এসে, তাতে কি আপনকার অমত আছে?"

আনন্দমোহন দেখিলেন, এখানে অনেক উকীল, কৌন্‌সুলী, হাকিমের সমাগম হয়,বিষয়াশয় সম্বন্ধে সদ্‌যুক্তি করিবার বিস্তর সুবিধা; আর তাঁহার পুত্রের দ্বারাই সে সব সুযোগ সংযোগ হইবার সম্ভাবনা; বলিলেন, "সে কি, মশায়, রাখাল ত আপনারই ছেলে। আপনার কাছেই থাক, তবে মাঝে মাঝে দু'এক দিনের জন্য আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

পিতার অনুমতি পাইয়া রাখালচন্দ্র এখন আর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ-ছাড়া হইতে চাহেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া মাঝে মাঝে বাড়ী পাঠাইয়া দেন; কিন্তু রাখাল চক্ষুর অন্তরাল হইলে হৃত-শাবক বিহঙ্গের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। রাখালও গৃহে গিয়া তিষ্ঠিতে পারেন না।

ইতিমধ্যে রাখালের শ্বশ্রূঠাকুরাণী এক দিন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, সঙ্গে রাখালের বধূ; কন্যার সংসর্গে রাখালের ভগবদ্‌ভক্তির কোনরূপ অনিষ্ট হইবে কি না, জানিবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বধূর লক্ষণসকল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, কন্যা সুলক্ষণা, ঈশ্বরলাভে স্বামীর সহায়তা করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বরে। বালিকাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া পাঠাইলেন, টাকা দিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিতে।

এ দিকে পিতাপুত্রে অপূর্ব্ব প্রীতির খেলা চলিতে লাগিল। সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল-জ্ঞানে কখন "গোপাল, গোপাল" বলিয়া তাহার মুখে আহার তুলিয়া দেন, কখন ব্রজের ভাবে বিভোর হইয়া তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া নেন। অন্য কেহ কথা না শুনিলে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শাসিত হয়, কিন্তু রাখাল অবাধ্য হইলে তাঁহার আনন্দ। আহারান্তে এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরে রাখাল, পান সাজ না, পান নেই যে।"

রাখালরাজ সুস্পষ্ট উত্তর দিলেন, "পান সাজ্‌তে জানি নি।"

"সে কি রে! পান সাজ্‌বি, তার আবার জানাজানি কি? যা, পান সেজে আন্!"

"পার্‌ব না, মশায়!"

শ্রীরামকৃষ্ণ ত হাসিয়াই আকুল। কিন্তু অন্য কেহ তাঁহার মানসপুত্রকে সামান্য একটি ফরমাস্ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিতেন, "আহা, ও দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস্ নি। ওর বড় কোমল-স্বভাব।"

অথচ কল্যাণের জন্য, এই কোমল-স্বভাবকে আঘাত করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। এক দিন রাখালের খুব ক্ষুধা পাইয়াছে, এমন সময় কালীমন্দির হইতে প্রসাদী মাখন আসিল। বালক-স্বভাব ক্ষুধিত রাখালরাজ কাহাকে কিছু না বলিয়াই মাখনের ডেলাটি তুলিয়া লইয়া গালে ফেলিয়া দিলেন। পুত্রের আচরণ দেখিয়া পিতা তিরস্কার করিলেন, "তুই ত ভারি লোভী! এখানে এসে কোথায় লোভ-টোভগুল ত্যাগ কর্‌বি; না, আপনি তুলে নিয়ে খেলি।" শ্রীরাম-কৃষ্ণের তিরস্কারে মাখনের ডেলা রাখালরাজের গলায় বাধিল। তাহার বিবর্ণ গণ্ডযুগল দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। দোষ দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল-রাজকে স্বয়ং শাসন করিতেন, কিন্তু অন্য কেহ দোষের কথা তুলিলে বলিতেন, "রাখালের দোষ ধর্‌তে নাই, ওর গলা টিপলে দুধ বেরয়!"
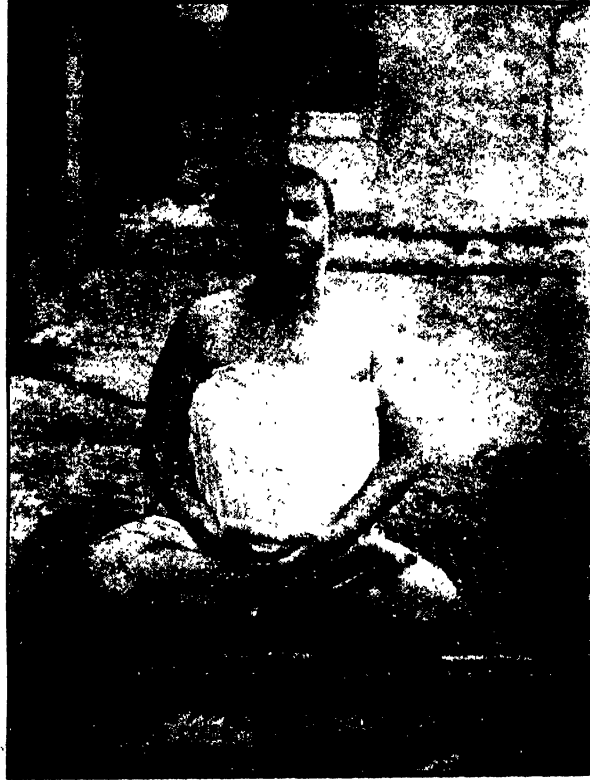
স্বামী ব্রহ্মানন্দ [ধ্যানস্থ]

শ্রীরামকৃষ্ণের অপরিসীম আদরে রাখালরাজ ভাবিতেন, ইনি নিজস্ব আমার। তাঁহার প্রীতির ধনকে পাছে কেহ কাড়িয়া লয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার মন ভক্ত সমাগমে কখন কখন অভিমান ও ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কেহ অণুমাত্র অনাদর বা উপেক্ষা প্রদর্শন

স্বামী ব্রহ্মানন্দ [আনন্দবিভোর]

স্বামী ব্রহ্মানন্দ [সমাধিমগ্ন]

করিলে অসহ্য ক্রোধে রাখালরাজ অধীর হইয়া উঠিতেন। কোন ব্রাহ্মগৃহে এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিমন্ত্রণ হয়। রাখালরাজ সঙ্গে ছিলেন। ভজনান্তে ভোজনের ব্যাপার। কর্তৃপক্ষ আত্মীয়-স্বজন লইয়াই ব্যস্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কৈ রে, কেউ ডাকে না যে!"

রাখাল মনে মনে এতক্ষণ উষ্ণ হইতেছিলেন। যথাসম্ভব ক্রোধ ও কণ্ঠ চাপিয়া বলিলেন, "চ'লে আসুন, মশায়! দক্ষিণেশ্বরে যাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আরে রোস্! পয়সা নেই, খালি ফাঁকা রোখ! এত রাত্রে খাই কোথা, আর গাড়ী-ভাড়াই বা দেয় কে? রোখ কর্‌লেই হয় না।"

রাখাল তথাপি কহিলেন, "চলুন, মশায়, সেখানে যা হয় হবে এখন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি লুচি না খেয়ে যাব না।"

নিষ্ফল ক্রোধে রাখাল বসিয়া বসিয়া ফুলিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের ডাক পড়িল। আহারান্তে গাড়ীতে আসিতে আসিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তা নয় রে! তোরা সাধু-ভক্ত, কিছু না খেয়ে গেলে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। গৃহস্থের বাড়ী গেলে, কিছু না দেয়, এক গ্লাস জল কি একটা পান চেয়ে খেয়ে আস্‌বি।"

এমনি করিয়া দিন বহিতে লাগিল। দিনে দিনে রাখাল-রাজের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। অন্তরে ভক্তির পূর্ণ জোয়ার, অনুরাগের একটানা স্রোত। অনুক্ষণ যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন! জপ করিতে করিতে বালক বিড়-বিড় করিয়া বকে! গুরুসেবার দিকে আর লক্ষ্য নাই। শ্রীরাম-কৃষ্ণ বলিতেন, "রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জল দিতে হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন, রাখাল আর সংসারে আসক্ত হইবে না। কিন্তু তথাপি বলিতেন, উহার ভোগের এখনও সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় নাই, একটু বাকি আছে। মাঝে মাঝে বাড়ী যাইবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতেন। রাখাল বলি-তেন, "সংসার আমার আলুনি লাগে। সময় সময় তোমাকেও আমার ভাল লাগে না।" এই ভাবে প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল। বধূ এখন বয়স্থা। শ্বশুরালয় হইতে নিমন্ত্রণ আসে, জামাতা প্রত্যাখ্যান করেন। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিনী-গণ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছে এক দিন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "জামাই কি শেষে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে?" ভক্তিমতী শ্বশ্রূ পরম আগ্রহে উত্তর দিলেন, "আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে!"

এ দিকে রাখালরাজের শরীর ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়িল তিনি বায়ু-পরিবর্তনের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। প্রথম প্রথম শরীর একটু সুস্থ বোধ হইল, বিভোর হইয়া বৃন্দাবন-দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ব্রজের মাধুর্য্যময় সৌন্দর্য্যে ব্রজের রাখাল আজ যেন পূর্ব্বস্মৃতির উদ্দীপনে চিত্তহারা। সেই যমুনা—কৃষ্ণধ্যানে শ্যামাঙ্গিনী—শ্যামগুণগানে বিভোরা! ভৃঙ্গগুঞ্জনমোদিত সেই নিকুঞ্জ, নীল-তমালপুঞ্জ অনিল-হিল্লোলে দুলিতেছে! প্রেমের পুলকে পাখী গাইতেছে, শিখী নাচি-তেছে! রাখালরাজ তাঁহার জনৈক গুরুভাইকে পত্র লিখিলেন, "এ বড় উত্তম স্থান, আপনি আস্‌বেন—ময়ূর-ময়ূরী সব নৃত্য কর্‌ছে—আর নৃত্যগীত, সর্ব্বদাই আনন্দ।" কিন্তু আবার তাঁহার অসুখ হইল—বৃন্দাবনের জ্বর। শ্রীরাম-কৃষ্ণের মহা ভাবনা হইল। তিনি বলিতেন, "রাখাল সত্য-সত্যই ব্রজের রাখাল। যে যেখান হইতে আসিয়া শরীর ধারণ করে, সেখানে গেলে প্রায় তাহার শরীর থাকে না।" অশ্রুধারে ভাসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীচণ্ডীমায়ের নিকট আবেদন করিলেন, "মা, কি হবে! তাকে ভাল ক'রে দে! সে যে ঘর-বাড়ী ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছে।" অন্যান্য ভক্তগণের নিকট রাখালের অসুখের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ময়ূর-ময়ূরী এখন কেমন নাচ দেখাচ্ছে!"

কয়েকমাস পরে রাখালরাজ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া গৃহ-বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "রাখাল এখন পেন্‌সেন্ খাচ্ছে।" প্রাক্তনের ফলে রাখালের একটি পুত্র হইল। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে কাল ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে। ভক্তগণ প্রাণপণে গুরুসেবা করিতেছেন। রাখাল-রাজ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। অপর সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিতেছে দেখিলে এখন আর তাঁহার মনে ঈর্ষা বা অভিমানের উদয় হয় না। বলিতেন, "সদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু। উনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন?"

এ দিকে ভক্তগণের প্রাণপণ সেবা ব্যর্থ করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণের ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাখালরাজ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "আপনি বলুন, যাতে আপনার দেহ থাকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

যাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া গুরু-সেবায় রত হইয়াছিলেন, রাখালরাজ ভিন্ন প্রায় অপর সকলেই কুমার-ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু রাখালরাজের স্ত্রী-পুত্র বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "রাখাল এখন বুঝেছে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে; কিন্তু বুঝেছে, সব মিথ্যা, অনিত্য। ও আর সংসারে ফিরে যাবে না।"

তাহাই হইল। পিতার ঐশ্বর্য্য, রূপযৌবনশালিনী ভার্য্যা, সুকুমার কুমার—সংসারের যাহা কিছু মোহকর আকর্ষণ—পুনরায় বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। সেখানে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু মঠে যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহার মন নির্জ্জন নর্ম্মদাকূল লক্ষ্য করিয়া নিঃসঙ্গ তপশ্চরণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাখালরাজ আবার বাহির হইয়া গেলেন। এই সময় হইতেই কঠোর তপস্যার সূচনা। নিঃশব্দে সময়স্রোত বহিতেছে, একনিষ্ঠ তাপস ধ্যানমগ্ন। দিন-রাত্রি আসিতেছে, যাইতেছে; ঋতুর পরিবর্ত্তনে পৃথিবী কখন কুসুমিত যৌবনে হাসিতেছে, কখন
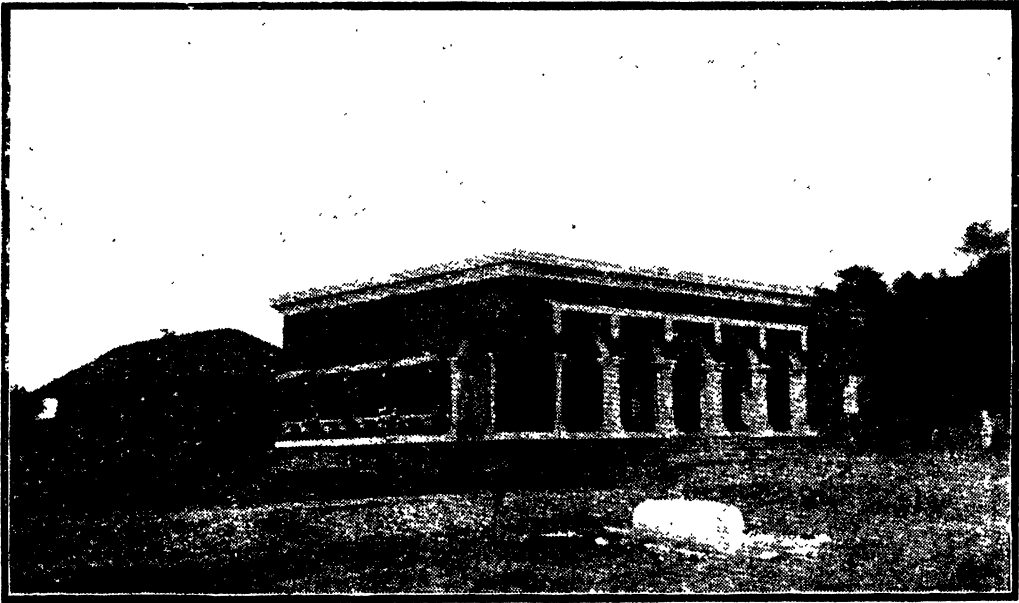
ভুবনেশ্বর মঠ।

তৃণজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া ব্রজের প্রেমিক রাখাল বিশ্বপ্রেমে আত্মোৎসর্গ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বত্যাগী মানসপুত্রের কথা মনে হইলে অন্তরে স্বতঃই জগৎপূজ্য শাক্যসিংহের স্মৃতি স্ফুরিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর পুত্রকে গৃহে ফিরাইবার জন্য আনন্দমোহন পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিলে রাখালরাজ বলিয়াছিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট ক'রে আসেন? আমি বেশ আছি। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।"

জীবনের আরাধ্য দেবতাকে হারাইয়া রাখালরাজের হৃদয় নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শূন্য হৃদয় লইয়া তিনি অশ্রুধারে ভাসিতেছে; কখন তুষারধবল বৈধব্যবেশ ধারণ করিতেছে। কিন্তু আমাদের তরুণ সন্ন্যাসীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। নিরন্তর জপ-ধ্যান-তপস্যায় জীবনযাপন; কখন মাধুকরী, কখন আকাশবৃত্তি অবলম্বন। কিছু যুটিল ত আহার, নহিলে উপবাস। কখন বৃন্দাবন, কখন হরিদ্বার, কখন জ্বালামুখীতে—এইরূপ অদ্ভুত তপস্যায় বর্ষের পর বর্ষ কাটিতে লাগিল। এই সময় রাখালরাজ বিপত্নীক হইলেন।

অতঃপর শ্রীনরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বেলুড়-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরিচালন-সভার সভাপতি হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আসে।" ভক্তের

জনতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যাহারা আশা লইয়া আসে, তাহারা প্রেমিক রাখালের ভালবাসায় ভুলিয়া যায়। আনন্দময় ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "গুরু-মহারাজ যত ভালবাসতেন, তত কি বাপ-মা ভালবাসে? আমরা তাঁর কি করেছি যে, এত ভালবাসা?" শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রীতির শিক্ষা, প্রেম-দীক্ষা তিনি মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হন নাই। যে বিশ্বপ্রেম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি দায়াদরূপে পাইয়াছিলেন, যে প্রেম ব্রজের মূলধন, প্রেমিক রাখাল তাহা আচণ্ডালে বিলাইয়াছেন।

কিন্তু কলুষিত সংসারে এ প্রেমের খেলা চিরদিন চলে না। এমন এক দিন আসে যে, নন্দনের পারিজাত ঝরিয়া পড়ে, আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া যায়। ইদানীং স্বামী ব্রহ্মানন্দ অধিকাংশ সময় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বর-মঠে যাপন করিতেন। শিবক্ষেত্র এই গুপ্ত বারাণসীতে আদর্শ-মঠ-প্রতিষ্ঠা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে উদ্দেশ্য অসম্পন্ন রাখিয়াই তিনি কোন্ মহাকার্য্যে অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

গত ২৪শে মার্চ্চ শুক্রবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। এই পীড়ার প্রভাব অষ্টাহ পর্য্যন্ত থাকে। তার পর বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত হয়। অহরহঃ অঙ্গদাহ এবং তৃষ্ণার প্রতীকারের জন্য তাঁহার সন্ন্যাসী সেবকগণ ব্যস্ত হইলে ব্রহ্মানন্দ ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, "সহনং সর্ব্বদুঃখানাং অপ্রতীকারপূর্ব্বকম্।" কবিরাজ ঔষধ সেবনের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "শিবই সত্য, ঔষধ মিথ্যা।"

ভুবনেশ্বর মঠের উপর ব্রহ্মানন্দের প্রাণ পড়িয়া ছিল। দেহরক্ষার তিন চারি দিন পূর্ব্বে কোন সেবককে তিনি বলিয়াছিলেন, "কল্‌কাতা ভারি ঘিঞ্জি, ময়লা; ভুবনেশ্বরের বাতাস বিশুদ্ধ, সেইখানে আমাকে নিয়ে চল।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আপনি এখন বড় দুর্ব্বল, যেতে পারবেন কি?"

"তিন চার দিনে পারব, কি বল?"

এমনি করিয়া এক পক্ষ কাটিল। হতাশা হইতে আশা সঞ্চয় করিয়া সেবকগণ প্রাণপণ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মানন্দের কোন ভক্ত আকুল হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কিসে ভাল হবেন, বলুন।"

রাখালরাজ কোন উত্তর দিলেন না। ভক্ত পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কি, বলুন?"

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।"

শনিবার রাত্রিতে সেবকগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "কখন কখন তোমাদের বকেছি; কিছু মনে কোর না। আমার মনে হয়, তোমাদের কল্যাণের জন্যই বলেছি।"

"আপনি বাপ—" বলিতে বলিতে নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসীদিগের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"আমি বাপ নই, তোমরাই আমার বাপ।" তার পর সেবকগণের মুখে হতাশের ভাব দেখিয়া বলিলেন, "ভয় পেয়ো না। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।"

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "আমার শরৎ কই রে? তারক দা? আমার গঙ্গা ভাই?" *

গুরু-ভাইদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দের মন সহসা এক অজানা রাজ্যে উধাও হইয়া গেল; বলিলেন, "রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই! ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু—কৃষ্ণ এসেছ? আমাদের এ কৃষ্ণ—কষ্টের কৃষ্ণ নয়, এ গোপের কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সময় বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার ওপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখ্‌লাম। তার ভিতর বালগোপাল মূর্ত্তি, সখা রাখালের হাত ধরে নৃত্য করছেন।"

কিছুক্ষণ পরে রাখালরাজ আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি ব্রজের রাখাল, আমায় নূপুর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচ্‌ব।"

ব্রহ্মানন্দের গুরুভ্রাতারা বুঝিলেন, সময় সন্নিকট, শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, "ব্রজের স্বপ্নে ব্রজের রাখালের জীবনাবসান হইবে।" স্বপ্ন চলিতে লাগিল, "এবারের খেলা শেষ হ'ল! কৃষ্ণ কৃষ্ণ! আহা, পীতবসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্ম সমুদ্র—বিশ্বাসের বটপত্র একটি ধরে ভেসে যাচ্ছি। ঠাকুরের পা-দুখানি কি সুন্দর! দেখ দেখি! একটি কচি ছেলে আমার গায় হাত বুলুচ্ছে, বল্‌ছে, আয়!"

ব্রহ্মানন্দ পরক্ষণেই মহাধ্যানে নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

---

* স্বামী সারদানন্দ, শিবানন্দ, অখণ্ডানন্দ।

ধ্যানে পরদিন অহোরাত্র কাটিল। তৎপর দিবস সোমবার, ১৪ই এপ্রেল, রাত্রি আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় সে মহা-ধ্যান মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়া গেল। পরদিন নন্দনের পারিজাত চন্দনলিপ্ত করিয়া অনলে আহুতি দেওয়া হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

সরিফাকুলীন গ্রামে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-উৎসবে সমবেত ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ।

পল্লবের প্রার্থনা।

(সেখ সাদীর ভাবাবলম্বনে)

গোলাপগুচ্ছে পল্লব হেরি' কহিল ডাকি
শাহাজাদী তার প্রিয় সহচরী আসমানীরে,
"গুলের সঙ্গে পাতাগুলো কেন আনিলি, সাকী?
ফুলদানী হতে তুলে তুলে সব ফেলেছে ছিঁড়ে।"

পল্লবগুলি নিঃশ্বসি' কয়, "রাজ-দুলালী
আনেনিক সাকী, আমরা এসেছি ফুলের সাথে;
বে-দরদী তুমি, আমাদের তাই দিতেছ গালি,
সাকীরে বলিছ ছিঁড়িয়া ফেলিতে নিঠুর হাতে।

"নাহিক মোদের সুষমা গন্ধ, যাইনি ভুলি',
সঙ্গে থাকিয়া ফুলের সুষমা বাড়াই তবু,
সুদিনে তাহার উৎসব মোরা জমায়ে তুলি
দুর্দ্দিনে মোরা সখীরে মোদের ছাড়ি না কভু।

"আজিকে সখীর বড় দুর্দ্দিন,—মরণ দশা,—
কনক আধারে বৃথাই আদরে বাঁচাতে চাও,
প্রহরের লাগি' কেন ঘুচাইবে চির ভরষা
ফুলদানে তার সাথে আমাদের মরিতে দাও।"

শ্রীকালিদাস রায়।

ডুবুরি।

যে কর্ম্মক্লিষ্ট কলিকাতা সহরে মানুষের সহিত মানুষের স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে কোনও রকমে আত্মরক্ষা করিয়া একটু অবসর খুঁজিয়া লইয়া আমরা আজ এই বাগানে দীঘির পাড়ে বৃক্ষচ্ছায়ার অন্তরালে দীর্ঘ দিবসটি অতিবাহিত করিলাম, মুক্ত প্রকৃতির এই প্রাঙ্গণে সেই কলিকাতার কথা সহজেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। পত্রের মর্ম্মর, বিহঙ্গের কূজন, অদূরে বেণুবনের ভিতর দিয়া প্রথম শীতের মৃদু পবনহিল্লোল আমাদের চিত্তকে প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্য্যের প্রতি এমন অনায়াসে আকৃষ্ট করিয়াছে যে, এতক্ষণ ভাল করিয়া কোনরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা হয় নাই। ঐ বেণুবনের পশ্চাতে বিলের মধ্যে ঐ যে সিতবক্ষ পুচ্ছহীন ক্ষুদ্র বিহঙ্গটি অসঙ্কোচে এতক্ষণ কেলি করিতেছে,উহাকে চিনিতে পারিয়াছ কি ? প্রকৃতির সমস্ত রূপ-রসের সঙ্গে উহার লাস্যলীলা কেমন সুন্দররূপে খাপ খাইয়াছে! উহাকে হংস বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না। হংসের পুচ্ছ আছে, ইহার পুচ্ছ নাই বলিলেই চলে; হাঁসের ঠোঁট চ্যাপ্‌টা,ইহার চঞ্চু সরু ও তীক্ষ্ণাগ্র। যতক্ষণ সে জানিতে পারে না যে,মানুষ কাছে আছে,ততক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সন্তরণ করে; পরক্ষণেই নিঃশব্দে জলমধ্যে সহসা অন্তর্হিত হয়, আবার হঠাৎ সে ভাসিয়া উঠে,—ঠিক যেখানে ডুব দিয়াছিল, সেখানে না হইতে, পারে,কিন্তু অনতিদূরে,—প্রায় পাঁচ মিনিটকাল আমাদের দৃশ্যপথ হইতে সে জলগর্ভে অদৃশ্য হইয়া ছিল। ইহার দিকে একটু অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর, অথবা ঈষৎ শব্দ কর, অমনই ইহার শ্বেত-ধূসর দেহখানি অবলীলাক্রমে জলের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। হংসের পলায়ন-রীতি এরূপ নহে। আততায়ী মানুষের সান্নিধ্য পরিহার করিবার জন্য সে জলমগ্ন হয় না; একেবারে জল হইতে ঈষৎ উর্দ্ধে উঠিয়া পুরোভাগে কিছুদূর উড়িয়া গিয়া আবার জলে নামিয়া আসে ও সাঁতার দিতে থাকে। হাঁসের সঙ্গে যেমন ইহার কোন জ্ঞাতিত্ব নাই, মজ্জনশীল পানকৌড়ির সঙ্গেও তেমনই ইহার কোন জ্ঞাতি-সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় না। হাঁসের ও পানকৌড়ির পদাঙ্গুলী-চতুষ্টয় চর্ম্মবন্ধনীর দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে পরস্পর সংশ্লিষ্ট; ইহার সম্মুখস্থ অঙ্গুলীত্রয়ের চর্ম্মবন্ধনী যেন অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে; আগাগোড়া জুড়িয়া থাকে না। এই জন্য পানকৌড়ি ও হংস প্রভৃতি 'Web-footed' বিহঙ্গকে সংস্কৃত সাহিত্যে "জালপাদ" আখ্যায় বিশেষিত করা হইয়াছে। পানকৌড়ির পুচ্ছ কঠিন পালকবিশিষ্ট,—এত কঠিন যে, সময়ে সময়ে তাহার উপর ভর দিয়া পাষাণগাত্রে অথবা উচ্চ ভূখণ্ডে সে বিশ্রাম করে। কিন্তু এই মোরগশিশুর মত জলচর পাখীটি প্রায় পুচ্ছহীন; বাঙ্গালার চব্বিশ
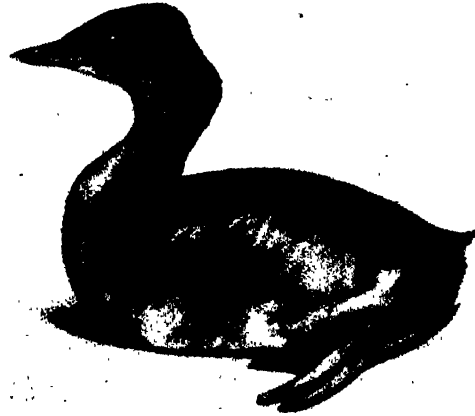
ডুবুরি।

পরগণার জলাশয়ে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার নাম ডুবুরি।

মোরগশিশুর সহিত উহার সাদৃশ্য কেবল ঐটুকু,—ঐ পুচ্ছহীনতা ও দেহের ক্ষুদ্রতা। কিন্তু ভূমির উপর মোরগের ছানা যেমন স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে, পরিণতবয়স্ক ডুবুরি সেরূপ পারে না। বন্ধনীযুক্ত পদাঙ্গুলী তাহার ভূমিতে বিচরণের বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়; সহজেই তাহার পদ-স্খলন হইবার সম্ভাবনা হয়; একবার পড়িয়া গেলে পুনরায় উঠিতে তাহাকে একটু বেগ পাইতে হয়। কিন্তু জলমধ্যে ইহার পদদ্বয় সন্তরণের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। এই জন্য ইহার স্বভাব এই যে, সে হ্রদ, সরোবর, নদী, এমন কি, কূপের মধ্যে বিচরণ করিতে ভালবাসে। প্রায়ই দুই একটি সঙ্গী লইয়া সে দিনযাপন করে; কচিৎ ৮।১০টি ডুবুরিকে একই জলাশয়ে ছোট ছোট দল বাঁধিয়া খেলা করিতে দেখা যায়।

এই ডুবুরি যে বিহঙ্গ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাহার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নাম Podicipedidae। ইংরাজের নিকট ইহারা Grebe নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নামকরণ দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, পদাঙ্গুলীর গঠন ও বিন্যাস দেখিয়া সমগ্র পরি-বারের একটা সাধারণ নাম রাখা হইয়াছে। অঙ্গুলীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অন্যান্য পাখীর মত ইহার নখর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণাগ্র নহে,—অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও স্থূল। চঞ্চু সরল ও তীক্ষ্ণ; পক্ষদ্বয় ক্ষুদ্র। পুচ্ছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালক লোমগুচ্ছা-কীর্ণ। ইহাদের সকলেই জলে ডুব দিতে ও ডুবিয়া থাকিতে এত পটু যে, এ বিষয়ে ইহাদের সমকক্ষ আর কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; হংস, পানকৌড়ি প্রভৃতি সকলকেই হার মানিতে হয়। সাধারণতঃ মৎস্য, কীটপতঙ্গ, শঙ্খশম্বুক, কর্কট, চিংড়ি, এমন কি, জলজ উদ্ভিদ ইহাদিগের ভক্ষ্য। কাহারও কাহারও পাকস্থলী হইতে ছিন্ন পালকও পাওয়া গিয়াছে;—বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে, অন্যান্য পাখীর উদরে বালুকা-কণা যেমন তাহাদের খাদ্য পরিপাকের সহায়তা করে, বোধ হয়, এ ক্ষেত্রে এই পতত্রখণ্ড সেইরূপ উপকারে আইসে। পাখী-গুলার হজমশক্তিও এত অদ্ভুত যে, এই ভুক্ত পালকের কোনও অবশেষ তাহারা উদ্গার করে না। মাংসাশী পাখীরা ভুক্তা-বশেষ অস্থিখণ্ডগুলা কিন্তু উদরসাৎ করিয়া রাখিতে পারে না, উদ্গার করিয়া ফেলে।

এ ত গেল সমস্ত Grebe পাখীর একটা সাধারণ পরিচয়। কিন্তু আরও একটু ভাল করিয়া ইহাদিগকে জানিতে হইলে শুধু যে আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের ডুবুরি লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারা যাইবে, তাহা নহে। বাঙ্গালার বাহিরে ভারতবর্ষের অন্যত্র আরও দুইটি বিভিন্ন Grebe বিহঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়,—কখনও কখনও তাহারা কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়; সুন্দরবনেও উহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর পাখী দেখা গিয়াছে। এই অপেক্ষাকৃত স্বল্প-পরিচিত পাখী দুইটির বিশিষ্ট শারীরিক লক্ষণানুসারে নামকরণ হইয়াছে;—একটি কৃষ্ণচূড় ডুবুরি (The Great Crested Grebe), অপরটি পীত কর্ণ-রেখ ডুবুরি (The Eared Grebe)। দেহের ক্ষুদ্রতা বশতঃ বাঙ্গালার ডুবুরিকে ইংরাজ Little Grebe আখ্যা দিয়াছেন। দৈর্ঘ্যে কৃষ্ণচূড় ডুবুরি প্রায় দুই ফুট হইবে; পীতকর্ণরেখ এক ফুটের উপর। আর আমাদের ছোট ডুবুরি নয় ইঞ্চির অধিক নহে। ইহাদের সকলেরই মাথা কালো, পেট সাদা, সর্ব্বাঙ্গের পালক রেশমের মত কোমল, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলের ও পেটের। স্ত্রীপুংপক্ষীর মধ্যে বর্ণের কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। তবে বর্ষার প্রাক্কালে যখন তাহাদের শাবক-জনন-সম্ভাবনা হয়, তখন উভয়ের বর্ণের একই রকম পরিবর্ত্তন ঘটে। শীত ঋতুতে আবার উভয়ের দেহের আগেকার রং ফিরিয়া আইসে। যে পাখীটার (Eared Grebe) নেত্রদেশ হইতে একটা পীতাভ রেখা তাহার ঘাড় পর্য্যন্ত বিলম্বিত হয়, তাহার সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এত অল্প যে, তাহা এখন আলো-চনা-সাপেক্ষ নহে; তবে এইটুকু দেখা গিয়াছে যে, শীতকালে তাহার ঐ কর্ণরেখা অমন স্পষ্টভাবে প্রকটিত থাকে না। ইহারা যাযাবর।

কৃষ্ণচূড় ডুবুরিও যাযাবর; শীতকালে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া নানাস্থানে বিচরণ করে। যাযাবর হইলেও, বর্ষা ঋতুতে আসন্ন গর্ভাধানকালে কতকগুলা পাখীকে এ দেশেই নীড় রচনা করিয়া ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা গিয়াছে। এত অধিক পরিমাণে দেখা গিয়াছে যে, অনুমান করা যাইতে পারে যে, ক্রমশঃ ইহাদের যাযাবরত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে এবং ইহারা Little Grebe ডুবুরির মত স্থায়িভাবে এ দেশে থাকিয়া যাইবে। ইহাদের কৃষ্ণচূড়া স্ত্রীপুং-নির্ব্বিশেষে শিরো-দেশে শোভা পায়।

এই শিরোভূষণের একটু বিশিষ্টতা আছে। প্রাগ্‌মিথুন-কালেই নবোদ্ভেদিত কোমল পালক ও পাৎলা লোম গুচ্ছবদ্ধ

হইয়া কৃষ্ণচূড় ডুবুরির মাথা বেষ্টিত করিয়া থাকে। এই পালকগুলি উভয়ের মিলাকাঙ্ক্ষার উত্তেজনায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে; স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই এইরূপ রোমাঞ্চ হয়। কৃষ্ণচূড় Grebeএর এই পাৎলা পালকগুচ্ছের erectile-প্রবণতা তাহার দাম্পত্যলীলার একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু ইহার জ্ঞাতিসম্পর্কীয় কোনও পাখীর এই শারীরিক লক্ষণ দেখা যায় না। কেন দেখা যায় না, তাহার সদুত্তর এখন পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই। বোধ করি, সমস্ত Grebe পাখীগুলিকে আরও ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ না করিলে এই রহস্য সম্বন্ধে শেষ কথা বলা যাইবে না। সে যাহা হউক, কৃষ্ণচূড় ডুবুরির মিলনব্যাপার অত্যন্ত কৌতুকাবহ। একজন পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসুর এই দাম্পত্যলীলা দেখিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ হইয়াছে। কেমন করিয়া স্ত্রীপুংপক্ষীর প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত হয় এবং সেই প্রথম পরিচয়ে উভয়ে কি করে, তাহা তিনি বর্ণনা করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যাহা লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। উভয়ে নিজ নিজ রূপের বাহার দেখাইবার জন্যই যেন ব্যস্ত হইয়া উঠে;—এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই রূপের পসরা লইয়া সম্মুখে আসা আরম্ভ হয়, উভয়ের যৌন-সম্মিলনের পরে! আহার অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গ্রীবা ঊর্দ্ধে উন্নমিত করিয়া নববিকশিত পতত্রগুচ্ছ ও রোমাবলী স্ফীত করিয়া তুলে। পরক্ষণেই তাহারা হেলিয়া দুলিয়া পরস্পরের উদ্দেশে দ্রুতবেগে মাথা নাড়িতে থাকে; ক্রমশঃ এই মস্তক-সঞ্চালন মন্দীভূত হইয়া আইসে, আবার সবেগে চলিতে থাকে। কিয়ৎকাল এই বিচিত্র শারীরিক প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবার পর, পাখী দুইটা পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া যায় ও আহার করিতে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়ে, যেন বিশেষ কিছু ঘটনা ইতঃপূর্ব্বে তাহাদিগকে বিচলিত করে নাই। কখনও কখনও বা বিদায়ের প্রাক্কালে এবং পূর্ব্ববর্ণিত মস্তকসঞ্চালনের অবসরে উহারা ধীর মন্থর গতিতে এক প্রকার অত্যন্ত কৌতুকাবহ পক্ষপ্রসাধন ব্যাপারের অভিনয় করিবার ছলে তাহাদের পৃষ্ঠদেশস্থ পতত্রাবলীর মধ্যে নিজ নিজ চঞ্চু প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়; কিন্তু বাস্তবিক কোনও প্রসাধন-কার্য্য সম্পাদিত হয় না। তাহার পর আবার তাহাদের দেখা হইলে স্ত্রী-ডুবুরি জলে ডুব দিল; মুহূর্ত্তমধ্যে পুং-পক্ষী তাহার অনুগমন করিল। স্ত্রী পক্ষী ভাসিয়া উঠিলে দেখা গেল যে, ৩০।৪০ হাত দূরে পুং-পক্ষীটাও ভাসিয়া উঠিয়াছে; প্রত্যেকেই জলাশয়গর্ভ হইতে লতাপাতার গুচ্ছ চঞ্চুপুটে তুলিয়া আনিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রথমটা জলের উপর স্তরে যেন নিজদেহ লীন করিয়া কিছুক্ষণ শয়ান থাকে; পরস্পরকে দেখিবামাত্রই উভয়ে উভয়ের দিকে বেগে ধাবিত হয়। যখন মাত্র দুই হাত তফাৎ থাকে, তখন দুইজনে সহসা নিজ নিজ দেহ জল হইতে খাড়া করিয়া সরল যষ্টির মত উত্তোলিত করে, কিন্তু তাহাদের ঠোঁট ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে উন্নমিত না হইয়া ঠিক যে অবনমিত হয়, তাহা নহে—পুরোভাগে প্রসারিত হইয়া জলের সহিত সমান্তরালরেখ (parallel) হইয়া থাকে।
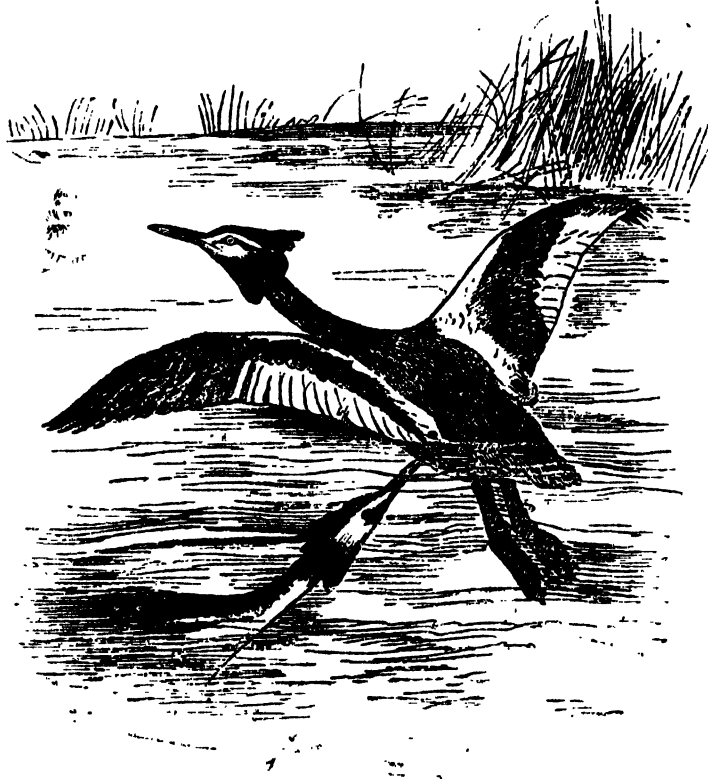
কৃষ্ণচূড় ডুবুরি।

তখনও তাহাদের চঞ্চুপুটে সেই লতাপাতার গোছা রহিয়াছে। এই অবস্থায় তাহারা এত কাছাকাছি আইসে যে, তাহাদের বুকে বুকে ঠেকিয়া গেলে মনে হয়, যেন তাহারা আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া উচ্ছ্বাস-ভরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে জলের উপরে হেলিতে দুলিতে থাকে। ইত্যবসরে ঐ খড়কুটা-পাতালতা চঞ্চুভ্রষ্ট হয়। আবার তাহাদের বিচ্ছেদ ও খাদ্যান্বেষণচেষ্টা। কখনও কখনও ইহাদের মিলনের বিষম অন্তরায় ঘটিয়া যায়। ঈর্ষ্যাবশতঃ হয় ত কোনও খণ্ডিতা নায়িকা অথবা বিফলপ্রযত্ন নায়ক জল-গর্ভ হইতে লক্ষ্য করিয়া স্ত্রী অথবা পুংপক্ষীটির উদর চঞ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা অতর্কিত ভাবে বিদারিত করিবার চেষ্টা করে। মিঃ সেলুস (Edmund Selous) স্বয়ং এই ব্যাপার দেখিয়া এই টর্পেডো কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। অনেক সময় ঐ প্রেমিকযুগল এত সতর্ক থাকে যে, অন্য একটা ডুবুরি পাখীকে ডুবিতে দেখিলেই তাহাকে আততায়ী সন্দেহ করিয়া উড়িয়া স্থানান্তরে সরিয়া যায়।

বাসা করিবার উপযোগী কাঠীকুটি লতাপাতা সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাদিগকে অন্যত্র কোথাও যাইতে হয় না। জলাশয়ের তলদেশ হইতে ঠোঁটে করিয়া স্ত্রীপুরুষ উভয়েই তাহা আনয়ন করে ও জলের উপরেই ভাসমান নীড় রচনা করে। কোথাও কোথাও একটা গাছের ডাল জলের উপর আসিয়া পড়িলে সেই জলস্পৃষ্ট বৃক্ষশাখায় উক্ত নীড় সংলগ্ন হইতে দেখা গিয়াছে। অন্যান্য ডুবুরি পাখীর নীড়নির্ম্মাণও এইরূপ হইয়া থাকে। নীড়াভ্যন্তরস্থ ডিম্বাধার জলের সহিত সমতল বলিলেই চলে। জলাশয়ে প্লবমান তৃণ-পত্রাদির মধ্যে এই অযত্নবিন্যস্ত নীড় ভাসিতে থাকে; উহা যে সর্ব্বদাই জল-সিক্ত, তাহা বলা বাহুল্য। কখনও কখনও পাশাপাশি অনেক-গুলা ডুবুরির বাসা একত্র রচিত হইতে দেখা যায়। বর্ষাকালে ইহারা এ দেশে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া গৃহস্থালী করে। ডিম্ব-গুলির সংখ্যা সচরাচর চার পাঁচটি, কখনও কখনও ততোধিক দেখা গিয়াছে; উহাদের বর্ণ প্রথমটা শুভ্র থাকে, পরে অল্প সময়ের মধ্যেই নানাপ্রকার বিচিত্র বর্ণের দাগ ডিম্বগাত্রে এমন বর্ণ-বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত করে যে, উহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে, ডিম্বগুলি লতাপাতা তৃণগুল্মাদি দ্বারা আবৃত থাকায় উহা-দেরই কবোষ্ণ তাপে সেইগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার নৈসর্গিক রীতি বশতঃ তাহাদেরই সংস্পর্শে এই দাগ ধরিয়া যায়। বর্ষা ঋতুতে জলের মধ্যে ডিম ফুটাইবার উপযোগী তাপ কোথা হইতে আইসে,—বিশেষতঃ যখন অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, দিনের বেলায় প্রায় পুং অথবা স্ত্রীপক্ষী নীড়মধ্যে থাকে না—ইহা পর্য্যালোচনা করিলে কোনও একটি থিওরির আশ্রয় লইতে হয়। গলিত লতাগুল্মাদির উপর সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হইলে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়, সেই উষ্ণতাটুকুই ডুবুরির ডিম ফুটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। শাবক বাহির হইতে ২০।২১ দিন লাগে। উহাদের গাত্রচর্ম্ম অন্যান্য অনেক সদ্যোজাত বিহঙ্গশিশুর ন্যায় একেবারে অনাবৃত থাকে না; একটা লোমশ আবরণ তাহাদের দেহের নগ্নতা ঢাকিয়া রাখে। পৃষ্ঠদেশে কাল কাল লম্বা রেখা; উদরদেশ শুভ্র; এই সাদায় কালোয় মিশিয়া উহাদিগকে নানা নৈসর্গিক উৎপাত হইতে রক্ষা করে। লতাগুল্মশরাদি বেষ্টনীর সঙ্গে শাবকের এই বর্ণবৈচিত্র্য এমন আশ্চর্য্যরূপে খাপ খাইয়া যায় যে, জলচর অথবা খেচর শত্রু সহসা তাহাদিগকে দেখিতেই পায় না। ছানাগুলি জন্মিবামাত্রই ডুব দিতে পারে কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও তাহাদের সন্তরণপটুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই; কিন্তু ধাড়িগুলা কিছুদিন উহাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া চলাফেরা করে; চলাফেরা করিতে করিতে উহাদিগকে ডুবিতে শিখাইবার জন্য মাঝে মাঝে পিঠ হইতে জলে ফেলিয়া দেয়। যত দিন পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে ডুবিতে না শিখে, তত দিন সহসা কোনও আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইলে ধাড়িরা ছানাগুলিকে ডানার ভিতরে লইয়া জলমধ্যে ডুব দেয়। অল্পসময়ের মধ্যে তাহারা ডুব দিতে শিখে।

কৃষ্ণচূড় ডুবুরির স্বভাব (habits) সম্বন্ধে যত কিছু বলা হইল, তাহার অধিকাংশই বাঙ্গালার ক্ষুদ্রকায় ডুবুরির জীবনবৃত্তান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের মিলন, নীড়রচনা, ডিমে তা দেওয়া, সদ্যঃপ্রসূত শাবককে আহার যোগান ও ডুব দিতে শিখান ইত্যাদি ব্যাপারের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উভয়ের মধ্যে আকারগত বৈলক্ষণ্য ও বর্ণের তারতম্য আছে বটে, কিন্তু উহারা প্রায় একই নিয়মে জীবনযাপন করে। উহাদের উড়িবার রীতিও প্রায় একই রকমের। তবে ছোট ছোট ডুবুরিকে অধিকতর বেগে আকাশপথে বহুদূর উড়িয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। উড়িবার সময় ইহার পা দুইটা পিছনে লম্বাভাবে ছড়ান এবং গলা সম্মুখে প্রসারিত হয়। ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উঠিবার প্রথম চেষ্টা ইহাদের পক্ষে কিছু কষ্টকর। ইহাদের খেচরত্ব অপেক্ষা

জলচরত্বটাই অধিকতর স্বাভাবিক। জলনিমজ্জনে ইহাদের অসাধারণ পটুত্বের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অগাধ জলে সাঁতার ত অনেক পাখীই দেয়; কিন্তু জল লইয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে কৌতুক করা ইহাদের মত আর কাহারও অভ্যাসগত বলিয়া মনে হয় না। যখন ইহাদের বুকের পালক পরিষ্কার করা প্রয়োজন হয়, তখন ইহারা চিৎসাঁতার দেয়; ডুব সাঁতার দিতে দিতে ডাহিনে বামে কাৎ হইয়া ডানা ও পায়ের সাহায্যে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে খানিক দূর চলিয়া যায়, আবার হয় ত ভাসিয়া উঠে। কখনও কখনও এমন অনায়াসে ইহারা স্রোতের উপর গা ভাসাইয়া দেয় ও নিঃশব্দে জলমধ্যে অন্তর্হিত হয় যে, দর্শকের ধারণাই হয় না যে, ইহারা সেখানে নাই, কেবল জলের ঈষৎ আবর্ত্ত দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয় যে, পাখী সেইখানে ডুব দিয়াছে। কখনও বা ইহাদের ডুব দিবার রীতি দেখিলে পানকৌড়ির জলনিমজ্জন-রীতি মনে পড়ে;—ভঙ্গীটা সেইরূপ, তবে একটু জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। পানকৌড়ির মত ইহারা জলে ঝাঁপ দিতে পারে বটে, কিন্তু তত বেগে নহে।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।
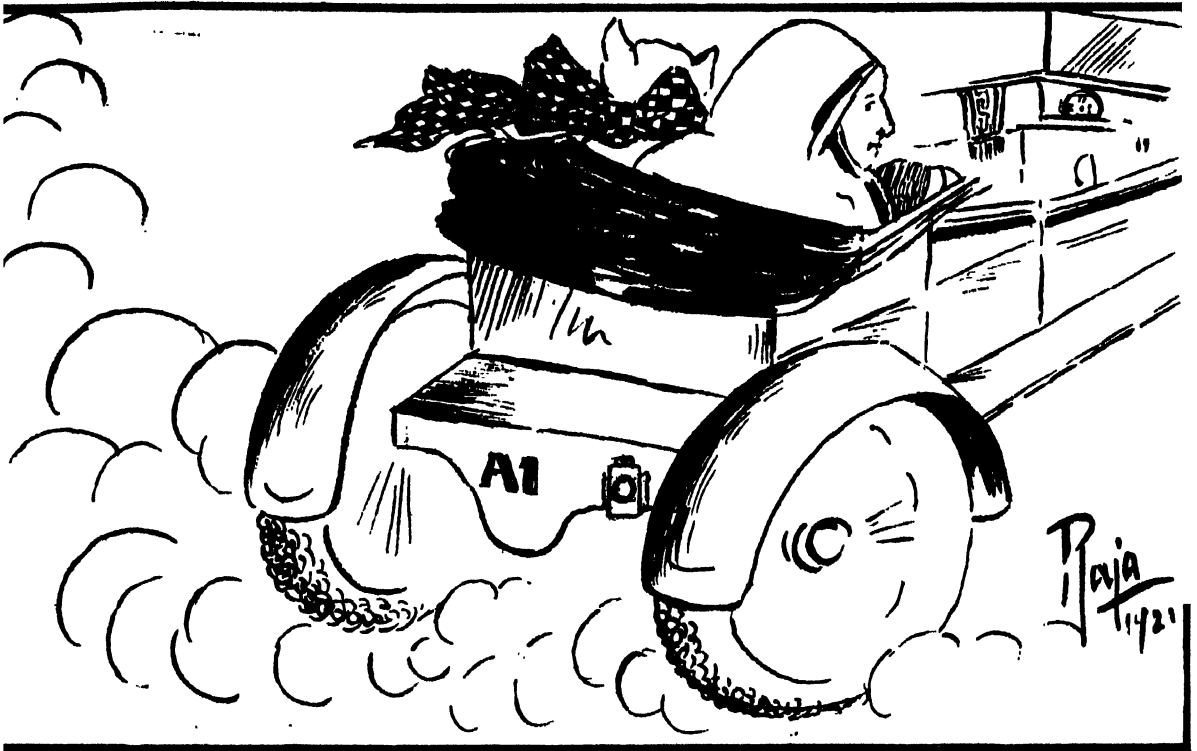
উড়িয়ে ধূলা অভ্রভেদী রথে,—
ঐ যে তিনি, ঐ যে উনি, বাহির হলেন পথে।

শিল্পী—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ।
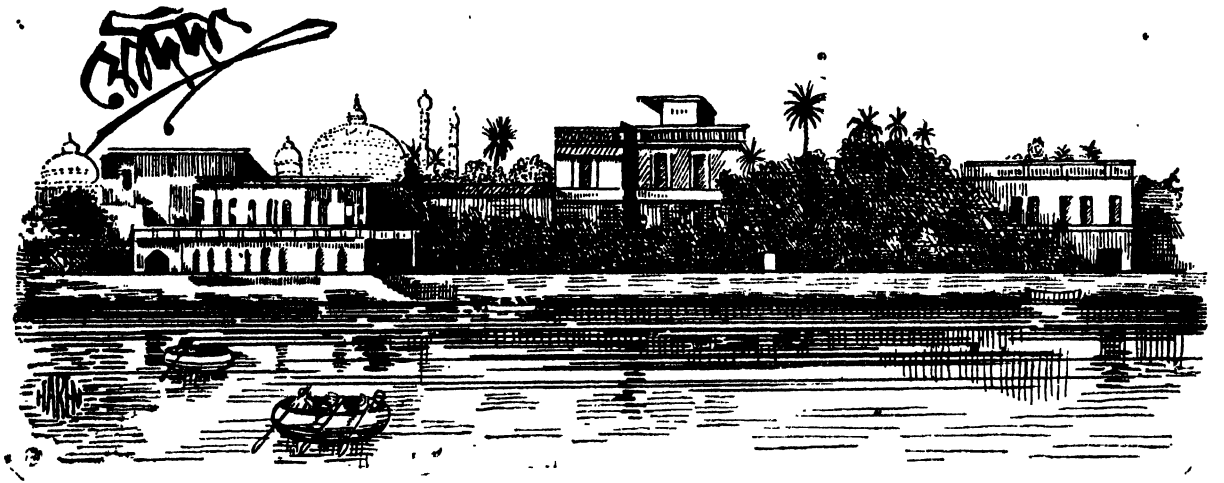
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুসজ্জিত বৃহদায়তন কক্ষে অত্যুচ্চ পালঙ্কের উপর আমীর আজীজ সুপ্ত। কক্ষের এক কোণে একটি অষ্টকোণ কাষ্ঠাসনে রূপার বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছে; বাতির কাচের আবরণের উপর লাল রেশমী কাপড়ের ঢাকা দেওয়া—তাহার মধ্য দিয়া অতি সামান্য আলোক কক্ষের অন্ধকার একটু স্বচ্ছ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কক্ষের হর্ম্ম্যতলে গালিচার উপর বসিয়া রুথ ভাবিতেছে। তাহার সোনালী পাড় দেওয়া মুগী রঙ্গের আচ্ছাদন-চাদর পার্শ্বে পড়িয়া আছে—কেশরাশি দুইটি কুঞ্চিত বেণীবদ্ধ হইয়া দুই স্কন্ধের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়াছে—অঙ্গে ফিরোজা রঙ্গের গাউন। সে আশৈশব সব কথা ভাবিতেছে।

রুথ যে ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,সে পরিবারে কখন অর্থের অভাব হয় নাই। তাহার এক শাখা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাগদাদে আসিয়া ব্যবসার পত্তন করেন। তখনও বাগদাদ শ্রীহীন নহে, পরন্তু প্রাচীর ও প্রতীচীর ব্যবসার সিংহদ্বার—সেই দ্বারপথেই সে ব্যবসা যাইত। সেই জন্যই ইরাকের মরুমধ্যে খালিফদিগের এই স্বপ্ন-পুরীর রচনা—আরব্যোপন্যাসের এই মায়া-কাননের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। যে দেশের যে কিছু বহুমূল্য পণ্য, এই বাগদাদের বাজারে বেচাকিনা হইত। সুতরাং এই সহর তখন ইহার শত আকর্ষণে ব্যবসায়ীদিগকে আকৃষ্ট করিত।· আর এই পথের অধিকারলাভ কামনা রুসিয়ার সম্রাট পিটারকে ও য়ুরোপজয়ী নেপোলিয়নকে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে উদ্যোগী করিয়াছিল। বাগদাদে আসিয়া ইহুদী পরিবারের সমৃদ্ধিবৃদ্ধি হয়—সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে জনসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতে থাকে ও বিদেশে ব্যবসার সুবিধার সংবাদও আসিতে থাকে। ইহুদীরা ব্যবসায়ী জাতি—স্বদেশচ্যুত হইয়া তাহারা সকল দেশে ব্যবসার বাজারে প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়াছে। আজও তাহাদের সে প্রাধান্য-গৌরব বিলীন হয় নাই। তাই পরিবারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার হইতে বিদেশযাত্রা আরম্ভ হয়। আজও কনস্তান্তিনোপলে, প্যারিসে, লণ্ডনে—এই বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বাস করেন। অনেক রাষ্ট্রবিপ্লবেও তাঁহারা লিপ্ত হইয়াছেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে এই বংশেরই এক জন বাগদাদ হইতে পারস্যের কোন সহরে যাইয়া স্বতন্ত্রভাবে মহাজনী কারবারের পত্তন করেন। রুথের পিতা তাঁহারই প্রপৌত্র।

এই মহাজন পরিবার ধনের জন্য সে সহরে সম্মানিত ছিলেন। এ সব দেশে ইহুদীর সম্মানও কেবল অর্থের জন্য; নহিলে—মুসলমানগণ ইঁহাদিগকে ঘৃণাই করেন। কিন্তু যখন টাকার জন্য দেশের শাসককেও ইঁহাদিগের দ্বারস্থ হইতে হয়, তখন সে ঘৃণা অনেক সময় কার্য্যসিদ্ধির জন্য গোপন করিতে হয়। ইহুদীরাও তাহা বুঝে—ঘৃণার মাশুল তাহারা লাভে "উশুল" করিয়া লয়। সেই জন্যই ইহুদীর সুদখোর অখ্যাতি এত বাড়িয়াছে। সে জানে, ঐ টাকার জন্যই তাহার আদর, সে ঐ টাকাটাই তাহার ক্ষমতার পরিচায়করূপে ও শক্তির

উৎসরূপে ব্যবহার করে। যে দেশ সুশাসিত নহে এবং যথায় রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট নহে, তথায় রাজাকে বা শাসককে—শাহকে বা শেখকে যখন তখন এই সব মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়; রাজ্যের কার্য্যে টাকার প্রয়োজন—সবুর সহে না, অথচ রাজকোষ অর্থশূন্য—কাজেই ইহুদী মহাজনরা টাকার কল্পতরু হয়েন। কিন্তু ইহাতে সময় সময় মহাজনদিগকে নানা অত্যাচারও সহ্য করিতে হয়। শাহ বা শেখ যখন যত টাকা চাহেন, তখনই তত টাকা দিতে দ্বিধা করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া বা অত্যাচার করিয়াও আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। যে স্থানে শাহ বা শেখ অনাচারী, তথায় অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী হয়।

রুথের পিতার ভাগ্যে তাহাই হইয়াছিল। শেখ একাধিকবার তাঁহাকে অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া অনেক টাকা লইয়াছিলেন—বিনিময়ে শেখের দরবারে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছিল। শেষে এইরূপে টাকা লওয়াটা কিছু ঘন ঘন হইতেছিল। বৃদ্ধ মহাজন তাহাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেও স্থানত্যাগের কল্পনা করেন নাই; কারণ, এই সহরে চারি পুরুষের বাস ও ব্যবসা মান ও পরিচয়। সে কল্পনা করিয়াছিল আর এক জন, সে দায়ুদ হারুণ।

রুথের পিতার সন্তানের মধ্যে ঐ এক কন্যা। প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহার বন্ধ্যা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী ঐ এক কন্যা রাখিয়া পরলোকগত হইলে তিনি ব্যবসায়ে ও কন্যার পালনে কাল কাটাইতে থাকেন। দায়ুদ হারুণ সেই সহরে এক দরিদ্র ইহুদীর ভাগিনেয়। তাহার পিতামাতা বোম্বাই সহরে থাকিতেন। প্লেগে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দায়ুদ মাতুলালয়ে আসিয়াছিল। বৃদ্ধ মহাজন তখন রুথের জন্য পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন—মনের মত পাত্র পাইতেছিলেন না। তিনি এই সুশিক্ষিত, শিষ্ট ও চতুর যুবককে দেখিয়া তাহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া আপনার কাছে রাখিয়া আপনার ব্যবসায়ে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসাব্যাপারে সে বৃদ্ধের সর্ব্বপ্রধান—একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিল। এ দিকে যুবক দায়ুদের সঙ্গে কিশোরী রুথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রেমে পরিণতি লাভ করিল। তাহারা প্রেমে ধরায় স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ মহাজন তাহাদের বিবাহ দিয়া মনে করিলেন, তাঁহার কায শেষ হইল।

এই সময় শেখের অর্থের অভাব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল—বাড়ীর জন্য ও বিলাসের জন্য বিপুল ব্যয়ে রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল আর যখন তখন বৃদ্ধ মহাজনের উপর হুণ্ডী আসিতে লাগিল। প্রতিবাদ করিলে অপমানিত হইতে হয়। বৃদ্ধ "নসিব" বলিয়া সব সহ্য করিতেন। কিন্তু দায়ুদ তাহা পারিত না। সে ইংরাজ-শাসিত বোম্বাইয়ে পালিত, ইংরাজী ভাবে দীক্ষিত। সে এ সব অনাচার ও অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। বিশেষ শেখের কাছে এই সব পাওনা সত্য সত্যই কোনকালে আদায় হইবে কি না, সন্দেহ। দায়ুদ স্থান ত্যাগ করিয়া বোম্বাই সহরে যাইবার প্রস্তাব করিল। বৃদ্ধবয়সে পরিচিত পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ স্বভাবতঃই প্রবল হয়। তাই রুথের পিতা প্রথমে এই প্রস্তাবে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কিন্তু যুক্তির দ্বারা অপরকে নিজ মত গ্রহণ করাইবার ক্ষমতা দায়ুদের ছিল। তাহার কথায় শেষে বৃদ্ধও আর সে প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। ব্যবসার যে বেড়াজাল গুটান তিনি অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, বাহিরের লোককে আপনাদের উদ্দেশ্য জানিতে দিবার পূর্ব্বেই দায়ুদ যে কৌশলে সে জাল গুটাইয়া লইল, তাহাতে পাকা ব্যবসায়ী বৃদ্ধও হারি মানিলেন। তাহার পর দায়ুদ যখন লোককে তাহাদের সঙ্কল্প জানিতে দিল, তখন ব্যবসায়ীর লেনদেনে ও হুণ্ডীতে সে অধিকাংশ অর্থ বোম্বাইয়ে পাঠাইয়া দিয়াছে।

তখন যাত্রার আয়োজন হইল। বাড়ী ও আসবাব বিক্রয় করিয়া অত্যজ্য জিনিষ মাত্র সঙ্গে লইয়া বাগদাদের বন্দরে আসিয়া ইংরাজ ব্যবসায়ীর জাহাজে যাইতে হইবে। বাগদাদ পর্য্যন্ত যাইতে প্রথমে মরুভূমি অতিক্রম করিতে হইবে—সুতরাং ভারবাহী উষ্ট্র সংগ্রহ করিয়া সকলে এক দল ব্যবসায়ীর সঙ্গে যাত্রা করিলেন। অ-শাসিত ও কু-শাসিত দেশে লোক দলবদ্ধ হইয়া পথ চলে।

সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যাত্রীর দল পথ অতিবাহিত করিল। সমস্ত পথ দায়ুদ তাহার উষ্ট্রটি রুথের উষ্ট্রের পার্শ্বে রাখিয়া তাহার সঙ্গে কত কথা বলিতে বলিতে চলিল—ঐ দিকে যে বালুস্তূপ দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে সহর ছিল, আরব-বিজয়-বাত্যায় তাহা মরুভূমির ধূলিতে মিশিয়া গিয়াছে—ঐ যে দূরে খেজুর গাছ ও জল দেখা যাইতেছে, উহা মৃগতৃষ্ণিকামাত্র। মধ্যাহ্নে একখানি গ্রামে বিশ্রামের পর সূর্য্যকরের প্রখরত্বহ্রাস হইলে তাঁহারা আবার চলিতে

লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় সকলে একটি সহরে পৌছিলেন—সে আমীর আজীজের রাজধানী। এই স্থান হইতে ভারবাহী উষ্ট্র ছাড়িয়া গর্দ্দভ লইতে হইবে—বৎসরের এ সময় এ পথে আর উষ্ট্রের প্রয়োজন হয় না।

ভৃত্যদল রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল। শ্রান্তা রুথ শ্রান্ত পিতার সঙ্গে গালিচা বিছাইয়া বসিল। দায়ুদ পান্থশালার প্রাঙ্গণে গর্দ্দভের ঠিকাদারের সঙ্গে ভারবাহী পশুর ভাড়া ঠিক করিতে গেল। এমন সময় পান্থশালার অধিকারী বা কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া দুই জন রাজকর্ম্মচারী তথায় আসিল। তাহারা সকল যাত্রীর নাম ও পরিচয় লিখিয়া লইয়া গেল; কিন্তু রুথের পিতার পরিচয়ই ভাল করিয়া লইল। তখন রুথ বা তাহার পিতা তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাহারা আমীরের কর্ম্মচারী—প্রতিদিন পান্থশালা পর্য্যবেক্ষণ করে ও সঙ্গে সঙ্গে আমীরের গৃহোদ্যানের জন্য উপযুক্ত কুসুমের সন্ধান করে। আমীর যে পান্থশালার জন্য এই গৃহ প্রদান করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—পুণ্যসঞ্চয় ও বিলাস-লালসা-তৃপ্তির উপায়বিধান। এই পথে যাত্রীরা কাজমেনে, কারবালায়, মক্কায় ও মদিনায় যায়। তাহারা এই পান্থশালায় বিশ্রাম করিবে। আর যাত্রীর মধ্যে সুন্দরী থাকিলে তাহারা ছলে—বলে—কৌশলে আমীরের হারেমে নীতা হইবে। রুথকে দেখিয়া আমীরের কর্ম্মচারী দুই জন পরস্পরের দিকে চাহিল—অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময়ের পর তাহারা তাহার পিতার পরিচয় লইল। তিনি কোথায় যাইতেছেন, কেন যাইতেছেন, যুবতী তাঁহার কে, সে বিবাহিতা কি না, তাহার স্বামী কোথায়—তাহারা এই সব প্রশ্ন করিল। উদ্দেশ্য—ছল—বল—কৌশল কোন্ অস্ত্র এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাহা বুঝিয়া লওয়া।

প্রত্যুষে যাত্রীরা আবার যাত্রা করিল। তাহারা নগরদ্বারের বাহিরে যাইলে অদূরে তূর্য্যনিনাদ শ্রুত হইল—সঙ্গে সঙ্গে পথের দুই দিক্ হইতে সশস্ত্র দস্যুদল আসিয়া যাত্রীদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদিগকে অস্ত্রব্যবহারোদ্যত দেখিয়া যাত্রীরা কেহ আর অস্ত্র গ্রহণ করিতে সাহস করিল না। তাহারা রুথের পিতার দলটিকে রাখিয়া আর সব দল ছাড়িয়া দিল—সে সব দলের লোক আল্লার নাম করিতে করিতে দ্রুতগতি চলিয়া গেল। তখন সেই দ্বিশতাধিক সশস্ত্র দস্যুর দলপতি বলিল, সে আমীর আজীজের কর্ম্মচারী, আমীরের জন্য রুথকে লইতে আসিয়াছে—বিনা আপত্তিতে দিলে কাহারও কোন ক্ষতি করিবে না, আপত্তি করিলে প্রাণ লইবে। স্তম্ভিত পিতা এই বিষম অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবারপূর্ব্বেই সে আসিয়া রুথের গর্দ্দভটি ধরিল, মুহূর্ত্তমধ্যে দায়ুদ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কিন্তু সেই দ্বিশতাধিক দস্যুর মধ্যে সে একা কি করিবে? দস্যুদলপতি বলপূর্ব্বক রুথকে গর্দ্দভপৃষ্ঠ হইতে নামাইলে সে চীৎকার করিয়া বলিল, "দায়ুদ, আমাকে হত্যা কর।" দায়ুদ পিস্তল বাহির করিয়া আবার খাপে পূরিল; বলিল, "তুমি মরিলে ত সব শেষ। তুমি বাঁচিয়া থাক—বক্ষে এই কণ্টক লইয়া আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। তোমার উদ্ধার-সাধন আর এই পিশাচের নিপাত আমার জীবনের ব্রত হইল। ভয় করিও না—এ ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে।"

দস্যুরা রুথকে লইয়া গেল। সে শুনিতে পাইল, তাহার পিতা বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন, "আমার সর্ব্বস্ব লইয়া আমার কন্যাকে ফিরাইয়া দাও।" সে চীৎকার সে আজও জাগিয়া শুনিতে পায়—স্বপ্নে তাহা শুনিয়া ভীত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া অশ্রুবর্ষণ করে।

তাহার পর বড় দুঃখে এই পাপপুরীতে তাহার ছয় মাস কাটিয়াছে—এ ছয় মাস অশ্রুসিক্ত, হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু সে আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই। দায়ুদ বলিয়াছে, তাহার ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। দায়ুদের কথা কখন মিথ্যা হইতে পারে না। রুথের কাছে দায়ুদের কথাই দেবতার বাণী। রুথ আশায় বুক বাঁধিয়া আছে। সে আমীরের অনুনয়, আদর, ভীতিপ্রদর্শন, প্রলোভন সব ঘৃণায় পদদলিত করিয়াছে—কেবল দায়ুদের পথ চাহিয়া আছে। ছয় মাস এমনই ভাবে কাটিয়াছে; কিন্তু তাহার আশাদীপ ম্লান হয় নাই—দায়ুদ আসিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করিবে।

আজ সে রাজপথে দায়ুদকে দেখিতে পাইয়াছে। সেও যেমন এই ছয় মাস কেবলই দায়ুদের সন্ধান করিয়াছে, দায়ুদও তেমনই হয় ত কতবার তাহাকে দেখা দিবার কত চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কাহারও চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। দায়ুদ তাহার বেশে যে বৈশিষ্ট্য করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই রুথের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য। আজ সে রাজপথে তাহাকে দেখিতে পাইয়া, সকল বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া তাহাকে সঙ্কেত করিয়াছিল, তাহার পর ফরিদাকে দিয়া তাহাকে সংবাদ দিয়াছে। আর আজ সে আপনার উদ্দেশ্যসাধনজন্যই এই ছয় মাসের অনুসৃত

পথ ত্যাগ করিয়াছে। এই ছয় মাসের মধ্যে আমীর আজীজ এক দিনও তাহার নিকট ঘৃণা ও তিরস্কার, গালি ও অভিসম্পাত ব্যতীত আর কিছুই লাভ করেন নাই। আজ সে তাঁহাকে হাসি দিয়াছে। আজ যখন সে দায়ুদের সন্ধান পাইয়াছে, তখনই আমীরের জন্য নূতন কুসুম আনীত হইয়াছে। তাই শঙ্কিতা হইয়া সে স্বয়ং আমীরের কাছে গিয়াছিল—তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য। এ পর্য্যন্ত তাহার ষড়যন্ত্র সফলই হইয়াছে। দায়ুদ তাহার পত্র পাইয়াছে। ফরিদার আনীত মাদক দ্রব্য সে আমীরের সরবতে মিশাইয়া দিয়াছে—আমীর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নিয়মিত দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসে সে বুঝিয়াছে, আমীর অজ্ঞান। এখন সে তাঁহার উপাধানতল হইতে চাবি লইবে—ফরিদা প্রাসাদের গুপ্তদ্বার মুক্ত করিবে—দায়ুদ সেই পথে আসিবে।

আজ রুথের মনে কত কথা—কত ব্যথা, কত আশা—কত আশঙ্কা! সে এই ছয় মাস জাগিয়া ও ঘুমাইয়া যে পিতার সেই বিকৃত কণ্ঠের শেষ চীৎকার শুনিয়াছে—"আমার সর্ব্বস্ব লইয়া আমার কন্যাকে ফিরাইয়া দাও"—যে চীৎকার সর্ব্বক্ষণ তাহার কর্ণে তপ্ত শলাকার মত অনুভূত হইয়াছে—যে পিতার বক্ষে ফিরিয়া যাইবার জন্য অপহৃতা কন্যার এত ব্যাকুলতা, সে পিতা মৃত কি জীবিত—তিনি তাহার শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কি তাহারই মত আশায় জীবন্মৃত অবস্থায় জীবিত আছেন, তাহাও সে জানে না। তিনি কোথায়—তিনি কেমন আছেন? আর দায়ুদ—তাহার জীবনসর্ব্বস্ব—তাহার হৃদয়-দেবতা, সে তাহার জন্য কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে—সে ত তাহাকে আবার সেই প্রেমের নন্দনে স্থান দিবে—আদরে সোহাগে তাহার এই হৃদয়ক্ষত দূর করিয়া দিবে? কিন্তু আজ যে তাহার মন হইতে সেই সন্দেহই ঘুচিতেছে না। কাল পর্য্যন্ত তাহার মনে এ সন্দেহের কোন কারণই ছিল না—সে যে রুথ দায়ুদের সঙ্গচ্যুত হইয়াছিল, সেই রুথই তাহার বক্ষে ফিরিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আজ সে তাহাকে পাইবার পথ মুক্ত করিবার জন্যই আমীরের কাছে ধরা দিয়াছে—পাপিষ্ঠের আদরে অন্য দিনের মত পদাঘাত করে নাই। ইহাতে তাহার হৃদয়ে যে বেদনা বাজিয়াছে, দায়ুদের হৃদয়েও কি সেই বেদনা বাজিবে? তাহাতে কি তাহার প্রতি দায়ুদের ভাবান্তর হইবে? আজ সেই ভাবনাই তাহাকে পীড়িত করিতেছে। ভাবনায় ভাবনা বাড়ে—এত দিন সে যাহা মনেও করিতে পারে নাই, আজ তাহাই তাহার মনে হইয়াছে—সে যে এই দীর্ঘ ছয় মাস পাপপুরীতে পাপের স্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে পারিয়াছে—সে যে সেই দায়ুদেরই ধ্যানে কাল কাটাইয়াছে, দায়ুদ তাহা বিশ্বাস করিবে ত? আজ যে সে আমীরের আদর গ্রহণ করিয়াছে, তাহা কি অপরাধ? বেদনা রোদনে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছিল; রুথ কষ্টে আপনাকে সংযত করিল।

তাহার পর রুথ ভাবিল, সে ত বিশ্বাসহন্ত্রী হয় নাই—তাহার মনে ত কোন পাপ নাই! আর দায়ুদ—দায়ুদ যদি তাহার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবে, তবে আজ দেখা দিবে কেন—আজ এই পুরে প্রবেশের বিপদ জানিয়াও প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হইবে কেন? এই চিন্তায় তাহার মনের ভার একটু লঘু হইল। সে স্থির করিল, সে সব কথা দায়ুদকে বলিবে—তাহার পর দায়ুদ তাহার কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিবে। যাহা হইবার হইবে—সে ত দায়ুদকে দেখিতে পাইবে—সে ত পিতার সংবাদ পাইবে।

রুথ উঠিল—সুপ্ত আমীরের শয্যার কাছে গেল। রেশমের আবরণমধ্যগত অন্ধকারময় আলোক আমীরের মুখে পড়িয়াছে। রুথের মনে হইল, সে মুখে পাপের মূর্ত্তি ফুটিয়া আছে—সে যেন সয়তানের মুখ। আমীরের প্রতি প্রবল ঘৃণার একটা বিষম বন্যা যেন তাহার হৃদয়ে বহিয়া আসিল। আজ যদি সে দায়ুদের সাক্ষাৎ পাইবার আশা না করিত, তবে সে সেই বন্যার বেগচালিতা হইয়া কি করিত—কি করিতে পারিত, কে বলিতে পারে? নিকটেই আমীরের পিস্তল তরবার ছিল। মানুষের জীবন লইতে কতক্ষণ?

রুথ সতর্কতা সহকারে উপাধানতল হইতে চাবির গুচ্ছ বাহির করিয়া লইল, তাহার পর অতি সাবধানে দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে অন্ধকার পথের ঘরে আসিল—দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। দীর্ঘ দালান অন্ধকার। রাত্রিতে আমীরের কক্ষ ব্যতীত আর কোন কক্ষে—বিশেষ পথের ঘরে আলো জ্বালা নিষিদ্ধ। গুপ্ত-ঘাতুকের ছুরিকা কখন্ কোথা হইতে আক্রমণ করে, কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু রুথ জানিত, ফরিদা দ্বারের পার্শ্বেই নিদ্রার ভাণ করিয়া থাকিবে। রুথের স্পর্শে ফরিদা উঠিয়া দাঁড়াইল। রুথ তাহাকে চাবি দিয়া বলিল, "আমার ঘর কোন্ দিকে?"

ফরিদা রুথকে তাহার কক্ষে রাখিয়া চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ।

নল-কূপ (TUBE WELL)

প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ যে বৎসর চৈত্র বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হয় না, সে বৎসরে পল্লীগ্রামে জলকষ্টের পরিসীমা থাকে না। এ বৎসরে সময়োচিত বৃষ্টির অভাবে দেশের সর্ব্বত্রই, বৃহৎকায়া স্রোতস্বিনী ব্যতীত, যাবতীয় নদ, নদী, খাল, বিল, তড়াগ, কূপ প্রভৃতি সমস্ত জলাশয়ই প্রখর সূর্য্যতাপে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এমন কি, নদীবহুল পূর্ব্ব-বঙ্গেরও অনেকানেক স্থানে উপযুক্ত পানীয় জল একেবারেই নাই। গৃহস্থের কুলবধূগণ প্রতিদিন দুই তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এক কলস পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া আনিতেছেন। কর্দ্দমযুক্ত পঙ্কিল দুর্গন্ধময় জলে লোকের স্নান, রন্ধন ও অন্যান্য গৃহকার্য্য কোন মতে সম্পন্ন হইতেছে এবং অনেকে সেই জলই পান করিতে বাধ্য হইতেছে। পরিষ্কৃত পানীয় জলের অভাবে দেশের নানাস্থানে ওলাউঠা, রক্তামাশয় প্রভৃতি জলবাহী ভীষণ সংক্রামক রোগ দেখা দিয়াছে এবং বহুলোক এই সকল রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

জলের অভাবে দরিদ্র কৃষকগণ সময়োচিত কৃষিকার্য্য বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। ভবিষ্যতের ভাবনায় কাতর হইয়া তাহারা দিবারাত্রি আকাশের পানে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কূপ বা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা হিন্দুমাত্রেরই নিকট প্রধান পুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। সম্পত্তিশালী পুরুষ বা রমণীমাত্রেই সুবিধামত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণ লোকের হিতকামনায় জলাশয়-খননের ব্যবস্থা করিতেন। এখনও অনেক স্থানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ই,সংস্কারাভাবে বিকৃতাবস্থাপন্ন হইয়াও, দেশের লোকের পিপাসা নিবারণ করিতেছে। এখন লোকের পুণ্যকার্য্যের প্রবৃত্তি ভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছে—জলাশয়প্রতিষ্ঠার প্রতি লোকের সেরূপ আগ্রহ লক্ষিত হয় না।

যত্ন ও সংস্কারাভাবে অধিকাংশ জলাশয়ই বর্ষা ব্যতীত অন্য ঋতুতে প্রায় জলশূন্য অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। কত জলাশয় জলজ গুল্মলতাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণ অনেকেই এখন পল্লীবাস উঠ সহরে বাস করিতেছেন, সুতরাং অর্থাভাব বশতঃ দরিদ্র পল্লী-বাসিগণ গ্রামস্থিত জলাশয়গুলির পঙ্কোদ্ধার করিতে একান্ত অসমর্থ। বিশেষতঃ "ভাগের পুকুর" হইলে, সকল সরিকের খরচের অংশ বহন করিবার অক্ষমতা হেতু অথবা জ্ঞাতি-বিরোধ-নিবন্ধন উহার সংস্কারসাধন সহজসাধ্য হয় না। তদুপরি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পানীয় জল যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন, দেশের সাধারণ লোকের মনে এই ধারণা এখনও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয় নাই। মলিন জলের অপকারিতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাহারা নানা অপকার্য্য দ্বারা গ্রামের জলাশয়গুলির জল অপবিত্র করিতে এবং বিনা সঙ্কোচে পুনরায় তাহাই পানীয়রূপে ব্যবহার করিতে কখনই সাহসী হইত না। সুতরাং অর্থাভাব ব্যতীত জনসাধারণের অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত সংস্কার জলাশয়গুলির সংস্কারপক্ষে আর একটি প্রতি-কূল কারণ।

যদি পল্লীগ্রামের দীঘি, পুষ্করিণী ও কূপগুলির পঙ্কোদ্ধার করতঃ পুনরায় গভীর করিয়া তাহাদিগকে খনন করা যায়, যদি জলাশয়গুলিকে সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে জল বিশুদ্ধ করিয়া লইবার যথারীতি ব্যবস্থা করা যায়, যেখানে জলাশয়ের অভাব, তথায় যদি নূতন জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়, যদি শুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোঽধিক জলাশয় পৃথক্ করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে দেশের বর্ত্তমান বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব কালে দূর হইবার আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু পল্লীগ্রামগুলির বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া বহু সময়সাপেক্ষ। বিশেষতঃ পানীয় জলের বিশুদ্ধিরক্ষা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা প্রয়োজন, যতদিন পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের মনে তাহা অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া দৃঢ় সংস্কার না জন্মে, ততদিন পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জলপ্রাপ্তির আশা এক প্রকার দুরাশা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

তবে পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিবার কি কোন উপায় নাই? ইহার

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, উপায় অবশ্যই আছে। এ স্থলে একটিমাত্র উপায়ের উল্লেখ করা গেল। বিজ্ঞানের সাহায্যে এই উপায় আবিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীর অনেক দেশের জলকষ্ট নিবারিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা শুদ্ধ যে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে সংগৃহীত হইতেছে, তাহা নহে; এই উপায়ে সংগৃহীত জলের সেচন দ্বারা কত বহুবিস্তৃত মরুপ্রায় ভূমিখণ্ড নয়নাভিরাম শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া তদ্দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা সংসাধিত হইয়াছে! এই জল কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া শিল্প-বাণিজ্যেরও অশেষ উন্নতিসাধন করিতেছে। নল-কূপের প্রতিষ্ঠাই এই উপায়।

নল-কূপের প্রতিষ্ঠা দ্বারা যে কোন সময়ে যত্র তত্র বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহের ব্যবস্থা বিশেষ সুগম হইয়াছে। নল-কূপগুলির ক্রিয়া এক হইলেও উহাদিগের গঠন সম্বন্ধে অল্পবিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রকারের নল-কূপ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং যাহা অল্প খরচে এবং অল্পায়াসে ভূমির মধ্যে প্রোথিত করিতে পারা যায়, তাহা আবিসিনীয় নল-কূপ (Abyssinian Tube Well) নামে পরিচিত। এ স্থলে ইহার একটি চিত্র প্রদত্ত হইল। বহুখণ্ডে নির্ম্মিত একটি সুদীর্ঘ লৌহ-নল মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া এই নল-কূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রত্যেক খণ্ড অপর খণ্ডের সহিত স্ক্রুপের পেঁচের দ্বারা সংবদ্ধ। সর্ব্বনিম্ন নলখণ্ডের তলদেশ সূচল এবং এই অংশের গাত্রের কিয়দংশ (৩।৪ হাত পরিমিত স্থান) বহু ছিদ্রবিশিষ্ট। নলটি যথাস্থানে প্রোথিত হইলে এই সকল ছিদ্র দ্বারা কেবলমাত্র ভূগর্ভের গভীর প্রদেশ হইতে জল নল-কূপের মধ্যে প্রবেশ করে, অন্য কোন পথ দিয়া বা অন্য কোন স্থান হইতে নলের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য নল-কূপের জল সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে।

পাছে মাটী, বালি, কাঁকর প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া ছিদ্রগুলির মুখ অবরুদ্ধ করিয়া দেয়, তন্নিবারণের জন্য নিম্নস্থিত নলের সছিদ্রাংশ তারের একখানি সূক্ষ্ম জাল্‌তির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। নলের নিম্নভাগ সূচল বলিয়া উহার শীর্ষদেশে কপিকল সংলগ্ন হাতুড়ির দ্বারা আঘাত করিলে উহা ক্রমশঃ মাটীর নীচে বসিয়া যায়। এইরূপে একটির পর আর একটি নল স্ক্রুপের পেঁচ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটি সুদীর্ঘ নল প্রস্তুত হয় এবং হাতুড়ির আঘাত দ্বারা উহাকে মাটীর গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে প্রোথিত করা হয়। নলটি এইরূপে প্রোথিত হইয়া ভূমির জলবাহী স্তরে পৌঁছিলে তলদেশস্থ ছিদ্র দিয়া ভূগর্ভ-সঞ্চারিত জল নলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উহা নলের উদ্ধভাগে ক্রমশঃ উঠিতে থাকে। পরে নল কূপের উর্দ্ধমুখের সহিত একটি পম্প (Pump) যোগ করিয়া হাত বা কলের সাহায্যে উহা হইতে যদৃচ্ছা জল উত্তোলিত হইয়া থাকে।
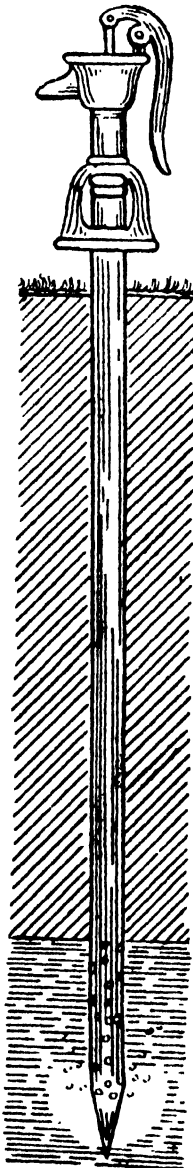
আবিসিনীয় নল-কূপ

কোন কোন নল-কূপের মুখ দিয়া আপনা হইতেই সতেজে জল বাহির হইয়া থাকে। জল উত্তোলন করিবার জন্য পম্পের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এরূপ কূপকে ইংরাজীতে আর্টিসিয়ান্ ওয়েল্ (Artesian Well) কহে। ফ্রান্সের অন্তঃপাতী আর্টয়েস্ (Artois) নামক স্থানে এই প্রকার নল-কূপ প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই স্থানের নাম হইতে ইহার নামকরণ হয়।

ভূগর্ভস্থ জলবাহী স্তরের গভীরতার পরিমাণ অনুসারে নল-কূপটি দৈর্ঘ্যে বড় বা ছোট হইয়া থাকে। এ স্থলে জলবাহী স্তর সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা প্রয়োজন

বাঙ্গালা দেশের মত যে স্থানের জমী খুব সরস, তথায় ১০।১২ হাত মাটী খুঁড়িলেই জল উঠিতে দেখা যায়। জমীর সকল অংশের মধ্য দিয়া জল সহজে প্রবাহিত হইতে পারে না। বালুকাময় স্তরের মধ্য দিয়া জল স্বচ্ছন্দে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এঁটেল মাটীর বা প্রস্তরময় স্তরের মধ্য দিয়া জল সহজে প্রবাহিত হইতে পারে না। কঠিন মৃত্তিকা বা প্রস্তরময় স্তর

জলের গতি একেবারে রোধ করে। সুতরাং কোন জমীতে সাধারণ কূপ খনন করিতে অথবা নল-কূপ বসাইতে হইলে উহার স্তর-গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। বৃষ্টির জল ধরাবক্ষে পতিত হইলে উহার অধিকাংশ ভাগ নদ-নদীর আকারে নিম্নগামী হইয়া সমুদ্রবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিয়দংশ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবস্থাবিশেষে পুনরায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া প্রস্রবণে পরিণত হয়, অপরাংশ কঙ্কর-বালুকাময় আল্‌গা ভূস্তরের মধ্য দিয়া অন্তঃসলিলরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। ভূগর্ভস্থিত এই অন্তঃসলিল স্তরকে জলবাহী স্তর কহে। ইহা স্থানবিশেষে স্বল্প বা অধিক গভীর হইতে পারে। ভূমির well কহে। ভাল করিয়া বাঁধাইয়া লইলেও এরূপ কূপের জল কখনই বিশুদ্ধ হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, বৃষ্টির জল ভূমির উপর পতিত হইলে উহার কিয়দংশ শোষিত হইয়া নীচের দিকে নামিবার সময় ভূমধ্যস্থিত নানাবিধ দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রথম জলবাহী স্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং কূপের চতুঃপার্শ্বস্থ বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে যে কিছু ময়লা সঞ্চিত থাকে, তাহাও ঐ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জল-সরানি (Percolation) দ্বারা ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কূপের তলদেশস্থিত এই স্তরে সঞ্চিত হয়। সুতরাং এরূপ কূপের জল কখনই পানের উপযোগী হইতে
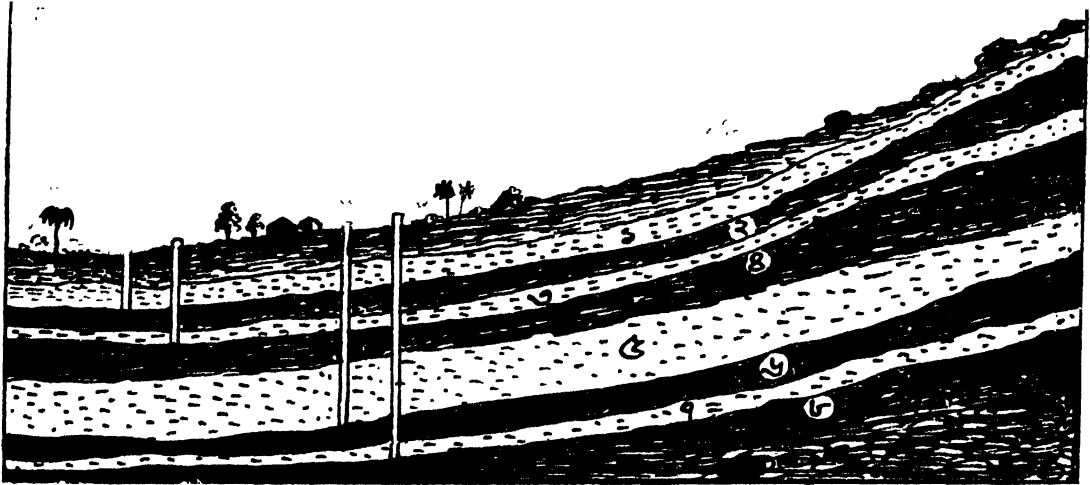
১। প্রথম জলবাহী স্তর—জল অবিশুদ্ধ ও অব্যবহার্য্য।
২, ৪, ৬, ৮। জলরোধক স্তর।
৩, ৭। জলবাহী স্তর—জল নির্ম্মল, কিন্তু অপ্রচুর।
৫। জলবাহী স্তর—জল নির্ম্মল ও প্রচুর
প্রতি জলবাহী স্তরে এক একটি নল-কূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মধ্যে এরূপ জলবাহী স্তর একাধিক সংখ্যায় অবস্থিতি করে এবং স্থানভেদে উহাদের গভীরতার পরিমাণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি দুইটি জলবাহী স্তরের মধ্যে একটি জলরোধক স্তর অবস্থিত থাকে। একটি জলবাহী স্তর হইতে অপরটিতে পৌছিতে হইলে মধ্যবর্ত্তী জলরোধক স্তর ভেদ না করিয়া তথায় উপস্থিত হওয়া যায় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নিম্ন বাঙ্গালা দেশে ১০।১২ হাত জমী খুঁড়িলেই জল উঠে অর্থাৎ আমরা প্রথম জলবাহী স্তরে উপস্থিত হই। জল উঠিলেই অনেকে কূপ-খনন কার্য্য স্থগিত রাখেন, সুতরাং এ দেশের কূপ সচরাচর ১৫।১৬ হাতের অধিক গভীর হয় না। এরূপ স্বল্প-গভীর কূপকে ইংরাজীতে Shallow পারে না। অতএব কূপ খনন করিতে অথবা নল-কূপ বসাইতে হইলে প্রথম জলবাহী স্তর ছাড়িয়া আরও গভীর প্রদেশে যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় জলবাহী স্তর অবস্থিত আছে, তথায় উপস্থিত না হইতে পারিলে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইবার আশা করা যায় না।

প্রথম জলবাহী স্তরের নিম্নে একটি জলরোধক কঠিন স্তর অবস্থিত থাকে, উপরের জল এই স্তর ভেদ করিয়া নীচে যাইতে পারে না। স্থানবিশেষে এই স্তরের গভীরতা কম বেশী হইয়া থাকে। এই স্তর ভেদ করিয়া নিম্নদিকে গমন করিলে কঙ্কর ও বালুকাময় আর একটি জলবাহী স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই দ্বিতীয় জলবাহী স্তর এবং ইহার মধ্য

দিয়া যে জলধারা প্রবাহিত হয়, তাহা নির্ম্মল। এই জলের মধ্যে খনিজ পদার্থের পরিমাণ অনেক সময়ে কিঞ্চিদধিক থাকিলেও তন্মধ্যে কোন সংক্রামক রোগের বীজ অবস্থিতি করিতে দেখা যায় না। সুতরাং উহা পানের উপযোগী হইয়া থাকে। কূপের তলদেশ এই স্তরে পৌঁছিলে তাহা প্রায় কখন শুষ্ক হয় না এবং কূপটি পাকা করিয়া বাঁধাইয়া, উহার পাড় উচ্চ করিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখিলে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডের জল-নিকাশের সুব্যবস্থা করিলে এই কূপের জল সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকিবার সম্ভাবনা। এরূপ কূপকে ইংরাজীতে Deep well কহে। তবে আমাদিগের অসাবধানতা ও কদভ্যাসহেতু গভীর কূপের জলও অনেক সময়ে সংক্রামকতাদুষ্ট হইয়া পড়ে; কিন্তু নলকূপের জল বারমাস জল থাকে এবং সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলে উহার জল নির্ম্মল থাকিবার সম্ভাবনা।

গভীর কূপ সম্বন্ধে যে নিয়ম, নল-কূপ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানেই ২৫ হইতেই ৪০ ফীট্ দীর্ঘ নল-কূপ বসাইলেই জল পাওয়া যায় এবং ইহা বসাইতে ১০০৲ টাকার অধিক ব্যয় হয় না। কিন্তু এরূপ নল-কূপের জল প্রায়ই বিশুদ্ধ হয় না এবং উহা হইতে বার মাস প্রয়োজনমত জল পাওয়া যায় না। নল-কূপটি, যেমন করিয়া হউক, দ্বিতীয় জলবাহী স্তরে না পৌঁছিলে উহার জল বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং উহার স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না। নল-কূপ আরও অধিক গভীর করিয়া বসাইলে উহার জলের

১। ভূপৃষ্ঠস্থিত স্তরমুখ (Outcrop)। ২। জলরোধক স্তর। ৩। জলবাহী স্তর। ৪। আর্টিসিয়ান্ নল-কূপ।

কখন দূষিত হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। ইহার কারণ পরে প্রদর্শিত হইবে।

এইরূপে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়া যাইলে জলবাহী ও জলরোধক স্তর একটির পর আর একটি বিন্যস্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। জলবাহী স্তর যত গভীর প্রদেশে অবস্থিত হইবে, তন্মধ্যে প্রবাহিত জল ততই নির্ম্মল এবং উহা যত পুরু (Thick) হইবে,তন্মধ্যস্থিত জলের পরিমাণও তত অধিক হইবে। এই জন্য কূপ খনন করিবার সময়ে প্রথম জলবাহী স্তর ছাড়িয়া দিয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গভীরতর প্রদেশে অবস্থিত পুরু জলবাহী স্তরে উপস্থিত না হওয়া যায়, ততক্ষণ খনন-কার্য্য শেষ করা উচিত নহে। কূপ গভীর হইলে তাহাতে বিশুদ্ধতা ও প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জলবাহী স্তর যত পুরু হয়, উহার মধ্যে জল তত অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। নল-কূপের তলদেশ এইরূপ একটি পুরু স্তরে প্রোথিত হইলে উহা কখন শুষ্ক হইবার আশঙ্কা থাকে না।

বেঙ্গল্ কেমিকাল্ ও ফার্ম্মাসিটিউকাল্ ওয়ার্কসের মাণিকতলা ও পাণিহাটীর কারখানায় যে কয়টি নল-কূপ বসান হইয়াছে, তাহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ ফীট্ এবং ব্যাস ২॥০ ইঞ্চি। ইহাদিগের প্রত্যেকটি হইতে ঘণ্টায় প্রায় ৪০০০ গ্যালন্ (১ গ্যালন = ৫ সের) বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাইতেছে। এই জল

পানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সে দিন মাননীয় সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার বেণ্টলী পাণিহাটীর নল-কূপ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ইহার কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন। ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট্ সরকারী স্বাস্থ্য পরীক্ষাগারে এই নল-কূপের জল পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে,ইহা কলিকাতার কলের জল অপেক্ষা কোন বিষয়ে অপকৃষ্ট নহে এবং পানের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। তাঁহার মন্তব্য বেঙ্গল্ কেমিক্যালের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম্. এ মহাশয়ের অনুমতি লইয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"CHEMICALLY :—

The water is a moderately hard one, containing 14 parts per 100,000 of temporary. and 6 parts per 100,000 of permanent hardness. This is about the same or a little over the hardness of water supplied to Calcutta. The other figures of chemical analysis indicate no impurity whatever.

BACTERIOLOGICALLY :—

The water gives 120 colonies per C. C. and no faecal bacilli in 60 C. C., indicating a water of exceptional bacteriological purity.

The water chemically and bacteriologically is an excellent one and fit to drink without any treatment of any sort."

(Sd.) A. D. STEWART, Major, I. M. S,
Director of Bengal Public
Health Laboratory.

আমেরিকার ডাকোটা প্রদেশস্থ একটি নল-কূপের দৈর্ঘ্য ৭৫০ ফীট্ এবং উহার ব্যাস ৭ ইঞ্চি। এই কূপ হইতে এত তেজে জল নির্গত হয় যে, উহার মুখ খুলিয়া রাখিলে জল ৬০ হাত ঊর্দ্ধে উঠিতে দেখা যায়। এই কূপ হইতে দিনে ১১৫০০০০০ গ্যালন্ জল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন নল-কূপের জল বেঙ্গল্ কেমিক্যালের কারখানার যাবতীয় বয়লারে (Boiler) এবং বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার জন্যও ব্যবহৃত হইতেছে। বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলার কারখানা "বাদা"র (Salt Lake) ধারে অবস্থিত বলিয়া এখানকার খাল, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল অতিশয় লোণা এবং পানের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। পূর্ব্বে এই জল কারখানার বয়লারের জন্য ব্যবহৃত হইত এবং জলের দোষে মরিচা ধরিয়া বয়লার্গুলি অল্পদিনের মধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত। এখন নল-কূপের জল বয়লারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া সমস্ত অসুবিধা ও অপব্যয় নিবারিত হইয়াছে। কারখানার লোক এই জল এখন পানীয়রূপে ব্যবহার করিতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, সাধারণ কূপ ও নল-কূপের মধ্যে সাদৃশ্যই বা কোথায় এবং পার্থক্যই বা কি।

সাধারণ কূপ, ইট-সুরকি বা পোড়ামাটীর বেড় দ্বারা বাঁধান ভূগর্ভস্থিত একটি নলবিশেষ। ইহার গভীরতা ১০।১৫ হাত হইতে ৪০।৫০ হাত পর্য্যন্ত এবং ইহার ব্যাস ৩ হাত হইতে ৮ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

নল-কূপও একটি ভূমধ্যে প্রোথিত সুদীর্ঘ নল, তবে নলটি লৌহনির্ম্মিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬ হাত হইতে ৫০০ হাত বা প্রয়োজন হইলে ততোঽধিকও হইতে পারে এবং ইহার ব্যাস ১ হইতে ১৫।১৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার নিম্নাংশে কতকগুলি ছিদ্র থাকে।

উভয় কূপেরই জল তলদেশ হইতে উত্থিত হয়। সাধারণ কূপের সহিত নল-কূপের সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। এক্ষণে দেখা যাউক, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি।

সাধারণ কূপ বাঁধান হইলেও অনেক সময়ে গাঁথনির মধ্যে ফাঁক থাকে এবং পুরাতন হইলে গাঁথনির নানাস্থানে গর্ত্ত ও চিড় দেখিতে পাওয়া যায়। চতুঃপার্শ্বস্থ জমী হইতে ময়লা জল ভূমির মধ্যে শোষিত হইয়া এই সকল গর্ত্ত ও চিড় দিয়া কূপের মধ্যে পতিত হয়। পুনশ্চ, এই সকল গর্ত্তের মধ্যে নানাবিধ গাছ-পালা জন্মিয়া জলকে অপরিষ্কার করে। কূপের মুখ সাধারণতঃ খোলা থাকে বলিয়া ধূলি, কুটা, ময়লা, আবর্জ্জনাদি বাহির হইতে কূপের মধ্যে পতিত হয় এবং যাহারা জল উত্তোলন করে, তাহাদের দেহ, বস্ত্র ও পাত্রসংলগ্ন ময়লা জলের সহিত মিশ্রিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব আমরা যতই সাবধান হই না কেন, সাধারণ কূপকে অপবিত্রতার হস্ত হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কিন্তু নল-কূপ সম্বন্ধে আমরা এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। ইহার নিম্নদেশে যে ছিদ্র থাকে, কেবল তাহার মধ্য দিয়া ভূগর্ভস্থ গভীর জলবাহী স্তর হইতে নির্ম্মল জল নলমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, নলের লৌহময় গাত্র ভেদ করিয়া বা অন্য কোন স্থান হইতে ময়লা জল নল-কূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। নল-কূপের মুখ পম্পের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া বাহিরের ধূলা, কুটা, আবর্জ্জনা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং পম্প্ দ্বারা নলের মুখ হইতে জল বাহির করিয়া লইতে হয় বলিয়া কোনরূপ ব্যক্তিগত বা অঘটিত স্পর্শ-দোষ এই জলে ঘটিতে পারে না, সুতরাং ইহা সর্ব্বদা সংক্রামক রোগবীজশূন্য থাকে। নল-কূপের জল ব্যবহার করিয়া কখন কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং সাধারণ কূপের জলের ন্যায় গভীর নল-কূপের জল ছাঁকিয়া বা ফুটাইয়া পান করিবার প্রয়োজন হয় না।

নল-কূপের জল, স্নেহময়ী মাতা ধরিত্রীর বক্ষোনিঃসৃত পবিত্র, সুশীতল, স্বাদু, স্বাস্থ্যপ্রদ স্তন্যধারারূপে তৃষিত মানবের পিপাসা নিবারণ করে ("Pure, cool, sparkling, wholesome water from the bosom of Mother Earth."—Tube Well)।

বেঙ্গল্ কেমিক্যাল্ ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ নল-কূপ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা নল-কূপ নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত করিতেছেন এবং নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহা বসাইতেছেন। ভূমির মধ্যে তাঁহারা যন্ত্রসাহায্যে গভীর ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে নল-কূপ প্রবেশ করাইয়া দেন এবং নল-কূপ প্রোথিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা মৃত্তিকার প্রত্যেক স্তর পরীক্ষা করিয়া যে জলবাহী স্তর হইতে স্থায়িভাবে প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মল জল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সেই পর্য্যন্ত নলের নিম্ন মুখ নামাইয়া দেন; সুতরাং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত নল-কূপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকে না। বর্ত্তমান সময়ে দেশের নানা স্থানে নল-কূপ বসাইবার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। আশা করা যায় যে, তাঁহাদের এই অভিজ্ঞতা ও কার্য্যকুশলতা দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব বিশিষ্টভাবে দূর করিতে সমর্থ হইবে।

নল-কূপ বসাইবার ব্যয় উহার গভীরতা ও ভূমির গঠন অনুসারে অল্প বা অধিক হইয়া থাকে। মৃত্তিকা কঠিন হইলে নল-কূপ বসাইবার ব্যয় অধিক হয়। কোন কোন স্থানে লৌহ-নলটি ৬০।৭০ হাত দীর্ঘ হইলেই উহা হইতে ভাল জল পাওয়া যায়, আবার কোথাও বা মাটীর ৪০০।৫০০ হাত নীচে না যাইলে ভাল জল পাওয়া যায় না। নিম্ন-বঙ্গদেশে নল-কূপটি সাধারণতঃ ১৩০ হইতে ১৫০ হাত গভীর হইলেই উহা হইতে নির্ম্মল জল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ একটি নল-কূপ বসাইতে হইলে তাহার আনুমানিক ব্যয় বেঙ্গল্ কেমিক্যাল্ ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কসের প্রকাশিত "টিউব্ ওয়েল" নামক পুস্তিকায় যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

নল-কূপের ব্যাস	প্রতি ঘণ্টায় কত জল পাওয়া যাইবে	আনুমানিক ব্যয়
২॥০ ইঞ্চি	৩০০০ গ্যালন্ (৩৭৫ মণ)	৪০০০৲ টাকা
৪ "	৭০০০ " (৮৭৫ ")	৭৫০০৲ "
৬ "	১৪০০০ " (১৭৫০ ")	৮০০০৲ "

নল-কূপের ব্যাস ২॥০ ইঞ্চি হইলেই উহা হইতে যথেষ্ট জল পাওয়া যাইতে পারে। ইহা পল্লীগ্রামে সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই বাটীর মধ্যে, গ্রামে গ্রামে এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশে পানীয় জলের এবং কৃষিকার্য্যের জন্য সেচন-জলের অভাব বহুল পরিমাণে দূর হইবার কথা। মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটী এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড-সমূহের মনোযোগ এ বিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। নল-কূপের পম্পের মুখ, বহুমুখ-যুক্ত একটি চৌবাচ্চার সহিত যোগ করিয়া দিলে, চৌবাচ্চার প্রত্যেক মুখ হইতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের জল আহরণ করিবার সুবিধা হয়; পল্লীগ্রামে এইরূপ ব্যবস্থায় লোকের বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

চীন ও জাপানে, ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য বংশনির্ম্মিত একপ্রকার নল-কূপ বহুদিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মাটীতে ছিদ্র করিয়া বংশনির্ম্মিত নল-কূপ তন্মধ্যে নামাইয়া দিতে হয়। এরূপ নল-কূপ প্রতিষ্ঠা করিতে বেশী খরচ পড়ে না। আমাদের দেশে এরূপ নল-কূপের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইলে কৃষি-কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবার কথা।

বঙ্গদেশে নল-কূপ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নূতন নহে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গের স্থানে স্থানে কতকগুলি নল-কূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তদানীন্তন প্রাদেশিক সানিটারি কমিশনর এই সকল নল-কূপের জল পরীক্ষা করিয়া উহা পানের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাব ও অপব্যবহার হেতু উহাদিগের অধিকাংশই ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং তদবধি ঐ প্রদেশের লোকের নল-কূপের প্রতি আস্থা কমিয়া যায়। জলবাহী স্তরের বালি যত সূক্ষ্ম হয়, ততই নল-কূপের ছিদ্রগুলি বালুকণা দ্বারা বুজিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ছিদ্রগুলি বুজিয়া গেলে নল-কূপ হইতে আর জল পাওয়া যায় না; উহাকে তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া পুনরায় প্রোথিত করিলে আবার জল পাওয়া যাইতে পারে। এই জন্য নল-কূপ প্রোথিত করিবার সময়ে স্তরের গঠন-পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। বেঙ্গল্ কেমিক্যাল্ নল-কূপ প্রতিষ্ঠার সময়ে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত নল কূপগুলির ক্রিয়া অতি সুন্দরভাবে চলিতেছে।

কলিকাতার দক্ষিণে হরিনাভি, বারুইপুর প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি ছোট ছোট নল-কূপ বসান হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি এখনও জল দিতেছে, অপরগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটির প্রতিষ্ঠায় প্রায় ১০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে।

এ বৎসরে কলিকাতা সহরেও বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ময়লা জলের অভাবে লোকের পাইখানা, নালী, নর্দ্দামা প্রভৃতি যথোচিত পরিষ্কৃত হইতেছে না; ইহা সহরের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক। তদুপরি এই দারুণ গ্রীষ্মে সমস্ত দিন ভাল জল পাওয়া যায় না বলিয়া লোকের স্নানাহার ও পানের সবিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ইহার সুব্যবস্থা করিতে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী আইনতঃ, ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। মিউনিসিপ্যালিটী হইতে জলাভাব নিবারণের জন্য কতকগুলি নল-কূপ বসাইবার প্রস্তাব হইতেছে। সে দিন গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি নল-কূপের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই কূপ হইতে প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০০ গ্যালন্ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাইতেছে। এই কূপটি ৪১১ ফীট্ গভীর করিয়া বসান হইয়াছে সুতরাং ইহার জল কখন শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। *

কলিকাতার আশেপাশে শতকরা প্রায় ৯০টি জুট্‌মিলে (Jute Mill) এইরূপ নল-কূপ বসান হইয়াছে এবং ঐ সকল মিলের লোক এই জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া বিবিধ সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে অনেকটা মুক্তিলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালায় যেখানে জলকষ্ট, সেইখানেই নল-কূপের প্রতিষ্ঠা হইলে দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইবে।

শ্রীচুণিলাল বসু।

* "TUBE WELLS.—There was an interesting demonstration of the utility of tube wells in Calcutta yesterday, when a gathering of Municipal officers and business men inspected a tube well installed in the Great Eastern Hotel by Mr. G. C. Scott, of 6, Russel Street, Calcutta. This tube has been fixed as the Municipal supply is not sufficient to meet requirements. The tube is capable of 15,000 gallons per hour, while the total depth bored is 411 ft. Mr. Scott has installed about 200 wells, over 90 per cent. of the jute mills and factories from Budge-Budge to Kanchrapara now drawing their drinking water from tubes. They are installed in varying capacities from 500 to 15,000 gallons per hour and the cost is from Rs. 1,500 to Rs. 10,500."—The Statesman, 27th May, 1922.

বিদ্যা "অমূল্য ধন।"

হ স্মরণ হয় না, বোধ হয় যেন, ছেলেবেলায় অক্ষয়কুমার ত্তর চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম—"বিদ্যাশিক্ষা করিলে কের হিতাহিতজ্ঞান জন্মে।" এ হিতাহিতের অর্থ যদি হয় যে, কাহারও কোনও অহিত করিব না, সর্ব্বদা জগ- র হিতসাধনের জন্যই নিযুক্ত থাকিব, তাহা হইলে আমরা ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি এবং করাইতেছি, তাহাতে হিতের এ তাৎপর্য্য একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। শু হয় ত, দুই দশ জন শিক্ষিত ব্যক্তি পরের হিতসাধনরূপ র্ব্বাধের কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবনের দিন ক'টা লোকসানে টাইয়া দেন, কিন্তু বিদ্যালয় হইতে এক শত ক্রোশ দূরে কলেও এ দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহাদের নিশ্চয়ই হইত। আর বনরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, কূল প্রতিকূল নির্ব্বাচনশক্তির যে জ্ঞান তাহা মনুষ্য পক্ষা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির যে বেশী আছে তাহাতে নও সন্দেহ নাই। কুকুর বা পিপীলিকা সামাজিক ন্ত্রণে যাইলে তাহাদিগের নিজের বৈবাহিক মহাশয়রা সিয়াও যদি করযোড়ে সজোরে উপরোধ করেন, তাহা লেও তাহারা পেটভরার উপর এক দানা বেশী মতিচুরও ণ করে না।

বর্ত্তমান যুগে শুধু এ দেশে নহে জগতের সর্ব্বত্রই বিদ্যার াকেনা যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে লোক প্রাণপণে ম পুরুষের হিতসাধনেরই অথবা যাহাকে সে আপাততঃ জের হিত বলিয়া বিবেচনা করে তাহারই জন্য চেষ্টা পাই- ছে এবং সেই হিতটা আপনার দিকে এত অধিক পরি- ণ টানিতে চেষ্টা করে যে আর পাঁচ জনের হিত কাড়িয়া লইলে তাহাদের হিতের মাত্রা গলা-গলি হয় না। অধ্যা- ক যখন দেখেন যে মাসিক বেতনে তাঁহার বেশী হিত তেছে না, তখন তিনি নোট-বহি লিখেন, তাহাতে ছাত্রের ন্ত্রাশক্তিকে পঙ্গু করিয়া তাহার অহিত ঘটাইলেও পুস্তক- ক্রয়লব্ধ অর্থে নিজের হিতটা বেশ বাড়াইয়া তুলেন। কিল যখন আইনের প্যাঁচে সোজা মামলায় বত্রিশ বিলাতি কড়ী বাহির করিয়া এবং মুলতুবীর পর মুলতুবী ঘটাইয়া [illegible]

সেণ্ট্রাল এভেনিউর উপর তেতালা কোঠার ছাতে দাঁড়াইয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দিকে হাত বাড়াইয়া উকিল বাবুর বিদ্যালাভের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে থাকে। এইরূপে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সওদাগর প্রভৃতির রোল্‌স্ রয়েস্‌, ল্যাণ্ডো, জমীদারী, ভাড়াটে বাড়ী, হীরা মতি জহরৎ সবই অশিক্ষিতের দারিদ্র্যের উপর বিদ্যার আধিপত্য দেখাইয়া দেয়। বিজ্ঞান শুধু অজ্ঞানকে দূর করে না, অনেক সময়ে অজ্ঞানীকে পেটেও মারে। চরকা তাহার সেবিকাকে বস্ত্র দিত, অনেক সময়ে সেবিকার সংসারের অন্ন বস্ত্র দুই-ই যোগাইত; সহস্রবাহু কাপড়ের কল বিদ্যার মুদ্গর প্রহারে চরকাকে বধ করিয়া তাহার সেবিকার পুত্র-পৌত্রকে মজুর বা ভিখারী করিয়াছে। এই সভ্যতার বিজ্ঞান বড় বড় অন্য উপাধি পাইলেও 'দীনবন্ধু' নামে কখনই ভূষিত হইতে পারে না। আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদরা বলেন বটে কলে প্রস্তুত ব্যবহার্য্য সামগ্রী কত সুলভে বিক্রয় হয়, ইহাতে গরীবের কত সুবিধা; কিন্তু সে কি সুবিধা ব'লে সুবিধা —কিনিবার পয়সা নাই সুতরাং মোটেই খরচা নাই। গত দুই বৎসরের মধ্যে যাঁহারা এই বঙ্গদেশের সুদূর পল্লী- গ্রামের অবস্থা একটু লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে অনেক ভদ্র গৃহস্থের কুললক্ষ্মীকে লজ্জানিবারণের জন্য রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিতে হইত।

বিদ্যাবলে আবিষ্কৃত কলকারখানা এক শত জনকে ধনী করে, এত ধনী করে যে তাহাদের প্রত্যেককে কোটিপতি বলিলেও যেন অবজ্ঞা করা হয়, আর লক্ষ লক্ষ নরনারীকে কাঙাল-কাঙালিনী করে; অশিক্ষিত বেচারারা ঐ এক শতের মোট বয় কাঠ কাটে জল তোলে অথবা জুতা সাফ করে। সাধারণ ডাকাতেরা লাঠির জোরে পরস্বাপহরণ করে আর শিক্ষিত ব্যক্তি বুদ্ধির কৌশলে ঐ কার্য্য সমাধা করেন; সাধারণ ডাকাতের জন্য পুলিস আছে আর এই Intellectual dacoityর বাহবা পৃথিবীশুদ্ধ অজ্ঞানের foolish মুখ হইতে নির্গত হয়; বিদ্যাবন্ত বধকর্ত্তাকে তার বধ্যও বাহবা না দিয়া থাকিতে পারে না। এক শত টাকার [illegible]

বলিয়া থাকেন, "হারি আর যাই করি আমার উকিল ক্রশে আসামীকে যে নাস্তানাবুদ করেচে, তার চরিত্তিরের কথা যে রকম আদালতে বার ক'রে দিয়েচে তাতেই আমার টাকা উঠে গেছে।"

আগে বলিয়াছি, দুই দশ জন নির্ব্বোধকে বাদ দিলে জগতের বুদ্ধিমান সাধারণ এখন বিদ্যার্জ্জন করেন আপনাকে বড় করিবার জন্যই। পদে প্রতাপে সম্ভ্রমে মর্য্যাদায় ঐশ্বর্য্যে মাৎসর্য্যে ভোগে এমন কি রোগেও আপনাকে প্রতিবেশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিদ্যা বিদ্বানের পেটে ঢুকিয়া কামড়াইতে থাকে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাধককে যে শক্তিপ্রদান করে তাহাতে তাহার উচাটন ও মারণ প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী হয়; কামনার বিরাম নাই, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই; আর মারণ—ভাতে মারা ত আছেই, তাহার উপর বেশী নয় গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই মানুষ মানুষকে প্রাণে বধ করিবার কত রাসায়নিক কত যান্ত্রিক উপায়ই না সৃষ্টি করিয়াছে!

সমগ্র সভ্যজগতে বিদ্যাবিস্তারের ফল ত' হইল এই। তাহার পর আমাদের এ দেশের, বিশেষ বঙ্গদেশের কথা। প্রথমে ইংরাজ আসিল, তাহার ধোপদস্ত সফেদ্ রঙ্ দেখিয়াই আমরা মোহিত হইলাম, প্রাণ বিলাইয়া দিলাম, যুগযুগান্তরের শ্যামরূপের মোহিনী ভুলিয়া ধবলের কবলে আত্মসমর্পণ করিলাম। 'সাহেব' বলিল "তোমরা মূর্খ আছ," আমরা বলিলাম "আজ্ঞা হাঁ।" 'সাহেব' বলিলেন, "আমরা তোমাদের লেখা-পড়া শিখাইব বিদ্বান করিব;" আমরা বলিলাম, "যে আজ্ঞে।" তাহার পর একটা ঘোঁট বসিল, তাহাতে জনকতক 'সাহেব' রহিলেন, ও জনকতক মাথাল মাথাল বাঙ্গালীও রহিলেন। তর্ক এই, আমরা কোন্ বুলি বলিয়া বিদ্বান্ হইব। জনকতক সাহেবের মত যে আমরা যেমন জাতিগত অভ্যাসে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করি, সেই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্টাই একটু ভাল করিয়া করিতে শিখি, তাহার পর নিজের ডানা নাড়িয়া কখন বা মাটীর ধান-কুড়াগুলি খুঁটিয়া খাই, আর কখন বা গাছের কলটা আস্টায় ঠোকর মারি। আর জনকতক 'সাহেবের' মত হইল, না আমরা "রাধাকৃষ্ণ" বলিতে শিখি; পাখীর ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ পাখী-ই বুঝে, ও ত' স্বাভাবিক, ও ত' আর বিদ্যা নয়; বিদ্যা হ'ল "রাধাকৃষ্ণ" বলা। অধিকাংশ বাঙ্গালী বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের 'রাধাকৃষ্ণ-ই' বলাও;" তাঁহারা যুক্তি দেখাইলেন যে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিলে আমাদের কোনও লাভ নাই, নিজের ডানায় ভর দিয়া চিরকালটা উড়িয়া বেড়াইতে হইবে, একটা গাছটাছ দেখিয়া নিজের বাসা নিজেই বাঁধিতে হইবে, আপনার আহার্য্য আপনিই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহার উপর ঝড় আছে, বৃষ্টি আছে, কুকুরের দাঁত ও বিড়ালের পেটও আছে; কিন্তু "রাধাকৃষ্ণ" বুলি শিখিলে আমরা দরে বিকাইব, সৌখীন লোক আমাদের কিনিয়া লইবে, চক্চকে পিতলের তারঘেরা খাঁচার ভিতর আমাদের বাসা দিবে, ছোলা দিবে ছাতু দিবে পিড়িং দিবে কোন্ না দু-এক দিন পাতের কেক ভাঙ্গা বিস্কুট ভাঙ্গাও দিবে; পাঁচ জনকে ডেকে আমাদের দেখাইবে, বুলি শুনাইবে। সুতরাং ধার্য্য হইল আমরা রাধাকৃষ্ণ বুলি-ই শিখিব। শঙ্করাচার্য্য যেমন শিবস্তোত্র লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, মেকলেও তেমনই অমর হইয়াছেন বাঙ্গালী-স্তোত্র লিখিয়া। সেই কলের দেশের মেকলে বলিলেন, "দাও বাঙ্গালীকে বিদ্যার কলে ফেলে।" আজ এক শত বছরের উপর সেই বিদ্যার কল চলিতেছে। যেমন জাঁতার ময়দার কল ঘুচিয়া এখন রোলার মিল হইয়াছে, তেমনই ইংরাজী বিদ্যার পুরাণ কল বদলিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়রূপ রোলার মিল হইয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন নূতন ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া তাহারও স্ক্রুটা চাকাটা রড্টা পিষ্টন্টা বদলিয়া দেন—আর কল হইতে বাঙ্গালীর ছেলেরা একের নং, দুয়ের নং, তিনের নম্বরের ময়দা আটা সুজি ভুসি হইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িয়া বস্তাবন্দী হয়। বিদ্যা মাথার গুদামের ভিতর হরেকরকমের পুরাণ আস্বাব ভরিয়া দিতেছে। আমরা চলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, উড়িতে ভুলিয়া গিয়াছি, খুঁটিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ঠোক্রাইতেও ভুলিয়া গিয়াছি। ক্ষেতের ধান, বনের ফল, ঝরণার জল, সকলের আস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছি; কেবল শিকল পায়ে দাঁড়ে বসিয়া বলিতেছি "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ" আর এক-একবার গুমোরে পর্গুলা ফুলাইয়া তুলিতেছি। প্রথম দশ বিশ বৎসর দু'দশটা পাখী এক রকম দামে বিকাইত মন্দ নয়, তাহার পর ষ্টীমার দেখা দিল, সুয়েজ খাল খুলিল, Bird of Paradise, Macaw, Magpie, Canary, আরও কত কি আমদানী হইল; তাহারা কেহ শিশ্ দেয়, কেহ গান করে, কেহ বলে 'পলি পলি'; আর এ দিকে হাজার হাজার "রাধাকৃষ্ণ" বলা টিয়ে গলি গলি; সুতরাং দু

আনা জোড়াও হাটে বিকায় না; কিনিলেও খাইতে দেয় বোরো ধান—দুটা ছোলাও আর মিলে না। এক ত' সর্ব্বনেশে অহং সব মানুষের মনের মধ্যে বসিয়া তাহাদের নাস্তানাবুদ করিতেছে, তাহার উপর ইংরাজী শিখিয়া আমাদের অহংটা একেবারে সাত হাত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই কারণ নাই, কেন না ইংরাজীতে আমি-জ্ঞাপক আই (I) টা বড় অক্ষরে (capital এ) লিখিতে হয়; পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় লিখন-প্রণালীতেই বোধ হয় এ নিয়ম নাই।

দশটায় হাজির পাঁচটায় ছুটী, বেশ-ভূষা বেশ পরিপাটী; চেয়ার টেবল সাজিয়ে রাখা মাথার উপর টানা পাখা; কোনও হাঙ্গাম নাই কোনও দায়িত্ব নাই; ঝঞ্ঝাটের মধ্যে 'সাহেবকে' একটু কোমর নোয়াইয়া সেলাম দেওয়া, চাপরাশীকে চাচা বলা; কাজের মধ্যে একটা carried over থেকে আর একটা carried over পর্য্যন্ত ঠিক দেওয়া,কিসের হিসাব কত হিসাব তার ঠিক-ঠিকানার দরকার নাই, আর না হয় 'সাহেবের' draft করা চিঠির নকল করা (তা মৃত মক্ষিকার দেহস্পর্শের ছোপটুকু পর্য্যন্ত); তার উপর মাস গেলেই মাহিনা, নগৎ কর্‌করে টাকা। এমন শান্তিপূর্ণ সুখের স্বর্গ ছাড়িয়া কে যায় চাষের ক্ষেত তদারক করিতে, কে বসিয়া দোকানের পিঁড়িতে দাঁড়ী ধরে, কে যায় গতর খাটাইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ-লোকসানের বনের ভিতর দিয়া অন্নসংগ্রহের অর্থ খুঁজিতে? "রাধাকৃষ্ণ" বুলি বলিতে শিখিয়া আরও একটা ভারি রকম লাভ হইল; পক্ষিসমাজে বুলি-বলা পাখীরা একটা বড় রকম নূতন জাতি হইয়া দাঁড়াইল, সে জাতের নাম হইল Babu (ব্যাবু) যার বাপ কোনও ব্যাবুকে কামাইতে আসিয়া ফরাসের উপর পা দিলে ব্যাবু খাপ্পা হইয়া তাহাকে দূর দূর্ করেন, তারই ছেলে জুতা পায় দিয়ে ঘরে ঢুকিয়া "Good morning,Sir, hope I'm not intruding" বলিলেই ব্যাবু অমনই তাহাকে হাত বাড়াইয়া সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া তাকিয়ার ধারে বসিতে দেন, সুতরাং তাঁতি তাঁত ছাড়িয়া, কুমোর চাক ছাড়িয়া, বেণে বেসাতি ছাড়িয়া, কামার হাতুড়ি ছাড়িয়া, ছুতোর র‍্যাঁদা ছাড়িয়া পড়িতে বসিল—"I am up রাধাকৃষ্ণ, you are in রাধাকৃষ্ণ," আর একেবারে পৈতৃক জাত ছাড়িয়া হইয়া গেল—ব্যাবু! এখন উমেদারী গুদামে এত ব্যাবু জমিয়াছে যে ব্যাবুরা বস্তা পচা হইতেছে তার বাবু নামে একটা দুর্গন্ধ উঠিয়াছে। 'অক্সফোর্ডে ও কেম্‌ব্রিজে যে মহানৈবেদ্য সাজান হয় তাহারই কুচো নৈবেদ্য লইয়া এ দেশে সরস্বতীপূজা আরম্ভ হইল। সকল বিদ্যারই একটু একটু করিয়া আমাদের গলাধঃকরণ করান হইল, বিদ্যার আর কিছুই বাকি রহিল না;—

> "কোন শাস্ত্র নাহি হয় তাঁর অগোচর।
> চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর॥
> বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
> 'নোক্‌রি' বিদ্যা সেই ক্ষণে শিখিলেন রাম॥"

ডিগ্রিধারী দেশী মস্তিষ্ক উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার স্মৃতিকক্ষায় যদি কেহ যোগদৃষ্টি নিপাতিত করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে,সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিদ্যার কি বিচিত্র সম্ভারই সেখানে স্তূপীকৃত রহিয়াছে! একটা ঠ্যাং ভাঙ্গা সাহিত্যের উপর একটা ঘাড় ভাঙ্গা সায়েন্স,আড়কাটায় টাঙান খানিকটা ধূলা পড়া লজিক্, এক কোণে একখানা অঙ্কের কঙ্কাল, আরও কত কি কত কি—ব্লটিং ছাপার উপর সব হরপ কি বুঝা যায়! সে মস্তিষ্ক দেখিলেই বহুবাজার ষ্ট্রীটের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিষের দোকান মনে পড়ে; দু'খানা গদিছেঁড়া কৌচ্, দোকানদার বল্‌ছে "এ আসল এড্‌মণ্ডের বাড়ীর, আর কারুর দোকানে পাবেন না।" খানকতক হাতভাঙ্গা পিঠ-ভাঙ্গা কেদারা—একেবারে খাস আমেরিক্যান্, যেন এমার্সনের মাঝখানকার দেড় chapter; গোটা কতক ডবল্‌উইক্ কেরোসিন ল্যাম্প,গ্লোবটা ফাটা, স্ক্রু ঘুরালে পল্‌তে উঠে না,কিন্তু আসল আস্‌লারের বাড়ীর; দুইটা চীনের ফুলের টব; মস্ত এক বাণ্ডিল ছাতা-ধরা ম্যাটিং; একখানা উইয়ে-খাওয়া জাপানী স্ক্রীন্; চাকা-ভাঙ্গা বাইসাইকল, ফুটো ফুটবল্, সেজের পায়া, প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ ছেঁড়া টানা-পাখা ও ১৮৯৩ সালের থ্যাকারের ডাইরেক্টারী। এরূপ দোকানের বেসাতী কত দিন চলে? তাই বহুবাজার ষ্ট্রীটের পূর্ব্বাংশে প্রায় বাজারের সীমানার পর হইতেই আরম্ভ করিয়া হজুরীমলস্ ট্যাঙ্ক লেনের মোড় পর্য্যন্ত এক দিন সারি সারি যে Secondhand conglomeration এর দোকান ছিল তাহার প্রায় একখানিও আর দেখা যায় না; ঐ ষ্ট্রীটের পশ্চিমাংশে ঐরূপ দোকান দু' পাঁচখানা আজও

পেন্‌সনের অপেক্ষায় প্রাচীন জীবন কোনও মতে রক্ষা করিয়া আছে।

এই সেকেণ্ডহাণ্ড বিদ্যার অসারত্ব ও নিরর্থকতার কথা এখন ছেলেরা বুঝিতেছে, যুবকরা বুঝিয়াছে, অভিভাবক পদে প্রতিষ্ঠিত প্রৌঢ় প্রাচীনরাও বুঝিয়াছেন। উকীল অনেক দিন বুঝিয়াছিলেন যে, শাম্‌লা আর মাম্‌লা আনে না; তাই গাউন্ পরিলেন, কিন্তু তা'তেও টাউনের খরচ চলে না; ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে, মোটর চলিলেও চলিতে পারে কিন্তু 'এম্ বি'র বিদ্যা কম্পাসে মোটে-ই চলে না; 'এম্ এ'র শেষ ভরষা (যদি ডেপুটী করিয়া দিবার জন্য M. L. C কি সরকারী ব্যারিষ্টার শ্বশুর না থাকে) মফঃস্বলের ষাট টাকার মাষ্টারী [চালের দাম দশ টাকা মণ, ছেলের দুধ টাকায় আড়াই সের]; বি. এ দেখিতেছেন বিয়ের বাজারেও পাশ আর রঙের তাস ব'লে বেশী দিন ধর্ত্তব্য হইবে না, কিন্তু তবু ছাত্রের বন্যা ল' কলেজের গেট মেডিকেল্ কলেজের গ্যালারী আর্ট কলেজের হল ভাসাইয়া দিতেছে। কি করে, কোথায় যায়, আর অন্য পথ নাই। শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইয়া একখানা টিকিট কিনিয়া নৈহাটীতে নামিয়া আর একখানা আড়ংঘাটা পর্য্যন্ত—সেখান হইতে কুষ্টিয়া—অবশেষে গোয়ালন্দ; সেখানে নামিয়া বেচারী দেখে সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত ভীষণ তরঙ্গাকুল পদ্মা, খান তিন চার সেকেলে খেয়া নৌকা মাত্র আছে, তাহাতে এত লোক উঠিয়াছে যে গলুইএর কাছ পর্য্যন্ত যাত্রী দাঁড়াইয়া, একটা ছোট ছেলেরও পা রাখিবার জায়গা নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আজ বৎসর কয়েক ধরিয়া একটা কথা উঠিয়াছে যে, আমাদের কলেজ খুলিয়া কমার্সিয়াল এডুকেশন্ দাও, ভোকেশ্যনাল্, টেক্‌নিক্যাল্ এডুকেশন্ দাও। ক্লাইব ষ্ট্রীটের ক'জন 'ছোট সাহেব' কোন্ কলেজের কমার্সিয়াল ডিগ্রি পাইয়া ভারতে আসিয়া আপনাদের ভাগ্যের ডিক্রিজারী করিতেছেন, কুবেরকে কবরে পাঠাইয়া যক্ষরাজের রত্নাসন কোন্ গ্রন্থগত বিদ্যার দক্ষতায় স্বীয় আয়ত্তে আনিতেছেন তা জানি না, কলেজী বিদ্যার কথা কলেজী মাথাই বুঝিতে পারে, সে মাথা আমার নাই।

এ প্রস্তাবের আলোচনা সময়ান্তরে করিবার চেষ্টা করিব, আপাততঃ যে বিদ্যা চলিতেছে তাহা যে "অমূল্যধন", তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝা গিয়াছে; বাজারে এ বিদ্যার মূল্য এখন ঘোর সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

বিরহে।

মিলনে তোমার পাইনি যা আমি
বিরহে তাহার সকলি পাই,
আজি সখি তুমি জুড়ে বসে আছ
মম মানসের নিখিল ঠাঁই।

আজি তুমি সখি নহ অকরুণ
আঁখি-যুগ তব নহে রোষারুণ
আজি নহ তুমি মানিনী ভামিনী
আজিকে নয়নে ভ্রূকুটি নাই।

আজি নহ তুমি মনের বাহিরে,
মানস-বৃন্তে রয়েছ ফুটি
প্রেম দেবতার সেবা অপরাধে
কর নাক আজ হাজার ত্রুটি।

শিশির-সিক্ত নয়নোৎপল
করুণায় আজ করে ছল ছল,
আজিকে তোমার প্রতি বিন্দুটি
আমার জীবনে পেয়েছি তাই।

শ্রীকালিদাস রায়

"তোমার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে!"

দিগন্ত-প্রসারিত প্রশান্ত মহোদধির উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ আত্মনিমগ্ন জাপ্ সহসা চমকিয়া উঠিলেন। অলক্ষিতে বন্ধুবর মার্কিণ তাঁহার চেয়ারের পশ্চাতে কখন্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। ঈষৎ হাস্যের রেখা তাঁহার অধরপ্রান্তে বিলীয়মান। "ভাই জাপ্, তোমার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। লর্ড নর্থক্লিফ্ তোমার পিছনে বড় লাগিয়াছেন।"

"সমুদ্রে যা'র শয়ন, তা'র শিশিরে ভয় কি, ভাই! আর শনির কথা বলিতেছ,—শনি যদি আমার তুঙ্গস্থ হ'ন, তা' হ'লে আমার ভয় কি? আর তিনি যদি আমার রন্ধ্রগত হ'ন, তা'তেই বা ভয় করিলে চলিবে কেন?"

ক্ষুদ্র টেবলের উভয় পার্শ্বে দুই বন্ধু উপবেশন করিলেন। প্রস্ফুট চন্দ্রমল্লিকার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে এই রকম সমুদ্রতীরে জাপানী বন্ধুর গৃহে আতিথ্যলাভ ভিন্ন সম্ভবপর হয় না।

মার্কিণ বলিলেন,—"তোমার এই ক্রিস্তান্থিমাম্ কোন্ এক গোপন রহস্যপুরের বার্ত্তা আমার কাছে বহন করিয়া আনে, তাহা আমাদের এই অত্যন্ত নীরস স্যাক্সন ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এইমাত্র যে-কথা বলিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিলাম, এই ফুলটি প্রায় তাহা আমাকে বিস্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।"

জাপ্ চেয়ারে একটু হেলিয়া বসিলেন। "এত দিন তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করিয়াও জানিতে পারি নাই যে, তুমি একটি নীরব কবি।"

"কবিত্ব আমার ধাতুতে আছে কি না, সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকিলেও এটা ঠিক যে তোমার ঐ ক্রিস্তান্থিমাম্—"

"গেইশা নর্ত্তকীকে স্মরণ করাইয়া এক অপূর্ব্ব মায়াপুরীর রহস্যময় কক্ষে তোমার চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়।" উভয়ের কলহাস্য অদূরবর্ত্তী সমুদ্রবীচিভঙ্গে মিলিয়া গেল। দাসী আসিয়া উভয়ের জন্য দুই পেয়ালা কাফি রাখিয়া দিল।

মার্কিণ বলিলেন,—"এই পীনোন্নত প্রশান্ত পয়োধিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া একাকী ভোগ করিবার বাসনা তোমার আমার মনে জাগিয়াছিল। তখন সবে তুমি পরিত্যক্তজরা হইয়া নবযৌবন লাভ করিয়াছ; আমিও আমার মনরো-নীতি-শাসিত গৃহস্থালীর মধ্যে আমার লালসাশিখাকে গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তোমার এই নবীন যৌবনলাভের পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়ে কি?"

"মনে পড়ে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেছ? আজিকার মত এইরূপ সন্ধ্যার প্রাক্কালে কতদিন তোমার কাছে সেই গল্প করিব মনে করিয়াছি; কিন্তু কখনও তাহা হইয়া উঠিল না। মনে হইত, বোধ হয় তোমার ভাল লাগিবে না।"

"আমারও কত দিন মনে হইয়াছে, একবার সেই কথা পাড়ি; কিন্তু পাছে তোমার মনে আঘাত লাগে, এই ভয়ে ও কথা তুলিতে গিয়াও তুলি নাই। কিন্তু বাস্তবিকই এমন সময়ে আর ঈর্ষ্যা-দ্বন্দ্ব-কলহের ভাব থাকিতে পারে কি? বিশেষতঃ ওয়াশিংটনের চতুঃশক্তি-সমন্বয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব ঘু'চিয়া গিয়াছে। তাই আজ অসঙ্কোচে সেই পুরাতন প্রসঙ্গের উত্থাপন করায় কিছুমাত্র দোষ দেখিতেছি না।"

"আমাদের গল্পের প্রথম নায়ক তোমাদের কাপ্তেন পেরি।"

"হাঁ। প্রেসিডেণ্ট ফিলমোর কমোডোর পেরিকে আজ্ঞা করিলেন,—'তুমি চারখানি জাহাজ লইয়া জাপানে গিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে নিপ্পন্ গভর্মেণ্টের নিকট হইতে এই অনুমতি লাভ করিবার চেষ্টা কর যে, যেন দু' একটা জাপানী বন্দরে অথবা ক্ষুদ্র, এমন কি, জনহীন দ্বীপেও আমরা আমাদের

জাহাজের জন্য কয়লা মজুত করিবার ব্যবস্থা করিতে পাই, এবং মার্কিণ নাবিকগণ অসহায় হইলে তাহাদের জন্য সুব্যবস্থা করিতে পারি।' প্রেসিডেন্ট ফিল্‌মোর পেরির হাতে একখানি পত্র দিলেন তোমাদের সম্রাটের নামে।"

"ঠিক বলিয়াছ; কিন্তু সম্রাট তখন রাজধানী কিওটোতে বাস করিতেছিলেন। বাস্তবিক চিঠিখানা লিখা হইয়াছিল শোগান্ গোষ্ঠীপতিকে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে পত্রখানি শোগানের হস্তগত হইল। তা'র পর—"

"আহা, আসল মজার কথাটি বাদ দিতেছ কেন? শোগান্ পেরিকে একখানা রসিদ দিলেন। তা'তে লিখা ছিল যে, মার্কিণ দূতের উচিত ছিল,নাগাসাকি বন্দরে তাহার চিঠি লইয়া অপেক্ষা করা; নাগাসাকি বন্দর ব্যতীত অন্য কোথাও বিদেশীয়ের সহিত আমরা দেখাশুনা করি না। তবে চিঠি না লইয়া দূতকে ফিরাইয়া দিলে তাহার অপমান করা হয়, এই জন্য যেডোতেও চিঠিখানা লওয়া হইল।"

কাপ্তেন পেরি।

দু'জনেই হাসিয়া উঠিলেন। জাপ্ বলিলেন,—"শোগান-দিগের আবাসস্থান ছিল যেডো।...যাক্। কিন্তু পরদিন এক বিজ্ঞ মোড়ল তোমাদের সঙ্গে কারবার করার বিরুদ্ধে আমাদের গভর্মেন্টের কাছে যে আবেদন করিয়াছিলেন, ইতিহাস হিসাবে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে।"

আলমারির ভিতর হইতে জাপ্ একখণ্ড পুরাতন কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—"শুন; আবেদনের ভাষা ও যুক্তি-তর্ক কেমন চমৎকার!"—

১। আমাদের দেশের যে সকল বীর বিদেশে জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তাঁহাদের শৌর্য্যগাথায় আমাদের ইতিহাস পুরাণ পরিপূরিত। বিদেশীর অস্ত্র-ঝনৎকার এ দেশের পবিত্র ভূমিতে কখনও শ্রুত হয় নাই। যে ভূমিতে আমাদের পিতৃপুরুষগণ চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন, সে ভূমিতে বর্ব্বর সৈন্যের পদাঘাতের অপমান আমরাই যেন প্রথম ভোগ না করি।

২। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম বর্জ্জনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও কোনও কোনও পাপী ঐ কুনীতির আশ্রয় লইয়াছে। এখন যদি মার্কিণকে আমরা বন্ধুভাবে গ্রহণ করি, ঐ ধর্ম্মটা নিশ্চয়ই মাথা তুলিবে।

৩। কি! পশম, কাচ, ও ঐ রকম কতকগুলা তুচ্ছ নগণ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আমরা আমাদের স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, লৌহ প্রভৃতি বহু অত্যাবশ্যক দ্রব্য হস্তান্তর করিয়া বাণিজ্য করিব! ওলন্দাজদিগের সহিত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য-বিনিময়ও এতদিন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

৪। সম্প্রতি রুশিয়া ও অন্যান্য বহু দেশ হইতে আমাদের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিবার জন্য আবেদনপত্র আসিয়াছে; কিন্তু তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। মার্কিণকে প্রশ্রয় দিলে তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়া চলিবে কি?

৫। বর্ব্বরদিগের কূটনীতি এই যে, প্রথমে তাহারা ব্যবসা করিবার ছলে একটা দেশে প্রবেশ করে; তা'র পরে তা'দের ধর্ম্মটা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে; পরে দলাদলি বাদবিসংবাদ জাগাইয়া তুলে। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার দ্বারা আপনারা পরিচালিত হউন। মহাচীনের অহিফেন-সমর হইতে যে শিক্ষালাভ করা যায়, তাহা অবজ্ঞা করিবেন না।

৬। ওলন্দাজ পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমাদের সমুদ্র পার হইয়া বিদেশীর সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করা উচিত। ইহা খুবই বাঞ্ছনীয় হইত, যদি আমাদের বীর পূর্ব্বপুরুষগণের

বংশধরগণ তাঁহাদের মত কর্ম্মক্ষম ও পরাক্রমশালী হইতেন। কিন্তু বহুকাল শান্তিতে থাকিয়া তাঁহাদের কার্য্যকরী শক্তি লুপ্ত হইয়াছে।

৭। বন্দরে এখন পেরির যে জাহাজগুলা রহিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সতর্কভাবে কাজ করা প্রয়োজন মনে করিয়া বহুদূর হইতে সামুরাই রাজধানীতে সমবেত হইয়াছে। তাহাদিগকে হতাশ করা কি ভাল হইবে?

৮। নাগাসাকির নৌবাহিনীসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় এবং পররাষ্ট্রসম্বন্ধীয় সমুদায় ব্যাপার কুরোদা ও নবেশিমা কুল-পতিদ্বয়ের উপর ন্যস্ত আছে। নাগাসাকি বন্দরের বাহিরে একটা বৈদেশিক শক্তির সহিত এই আলাপে তাঁহাদের চিরা-গত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। এই প্রবল বংশ-দ্বয় বিশেষ কৃতজ্ঞতাসহকারে ইহা স্বীকার করিয়া লইবে না।

৯। বন্দরের বর্ব্বরগুলার দাম্ভিক ব্যবহারে নিরক্ষর জনসাধারণও ক্ষুব্ধ হইয়াছে। যদি এমন কিছু দেখান না হয় যে, গভর্মেণ্ট তাহাদের বিরক্তিতে সহানুভূতি প্রকাশ করি-তেছে, তাহা হইলে গভর্মেণ্ট তাহাদের শ্রদ্ধা হারাইবে।

১০। বহুকাল শান্তিতে থাকিয়া আমরা তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছি। কবে এই মূঢ় জাতির জাগরণ হইবে? এখন কি সেই শুভমুহূর্ত্ত আসে নাই?

"এখন শুনিলে ত এই দশ দফা? সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের অবস্থা কি ছিল, এই আবেদনপত্র হইতে তাহার কিছু আভাস তুমি নিশ্চয়ই পাইলে। কিন্তু আমাদের মত একটা প্রাচীন জাতির পক্ষে সত্তর বছর কতটুকু সময়! ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর পেরির দৌত্য সফল হইল। দুইটি বন্দরে মার্কিণদিগের গতিবিধির সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। চারি বৎসরের মধ্যে মার্কিণ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, রুশ, ফরাসী ও পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত বাণিজ্যসন্ধিসূত্রে আমরা আবদ্ধ হইলাম।

"কিছুদিনের মধ্যে আমাদের দেশে বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দুই জন ইংরাজ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নিহত হইল। আমাদের নিকট হইতে খেসারৎ চাওয়া হইল। সহসা চার্লস রিচার্ডসন নামধেয় জনৈক ইংরাজ আমাদের মহাপ্রতাপান্বিত সৎসুমা বংশ-শিরোমণিকে অপমান করিল। শিমাজু সবুরো পাল্কিতে চড়িয়া যাইতেছিলেন। রিচার্ডসন অশ্বপৃষ্ঠে পাল্কির পাশ দিয়া উন্নতশির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। শুনিয়াছি, অন্য ইংরাজ তাহাকে বারণ করিয়াছিল। সে অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে না কি বলিয়াছিল—'আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না। আমি চীনেতে চৌদ্দ বছর কাটিয়েছি; এই সব নেটিভগুলোর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, আমি খুব জানি।' সে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল না; মস্তকও অবনমিত করিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল।

"ইংরাজ ইহার প্রতিশোধ লইলেন। কামান দাগিয়া আমাদের একটা বড় নগর তাঁহারা ধ্বংস করিলেন। ইংরাজের সঙ্গে আমাদের এই রকমে প্রথম পরিচয় হইল। ঠিক প্রথম পরিচয় হইল বলিলে ভুল হইবে। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ গভর্মেণ্টের প্রথম দূত ও প্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিনকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত আমাদের একটি প্রশস্ত সুন্দর প্রাচীন দেবমন্দিরে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম। এমনই করিয়া ইংরাজের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়ের প্রথম অঙ্কের উপর যবনিকা পড়িয়া গেল। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের গল্পটা ত এখনও শেষ হইল না।

"আবার বিদেশীয়দিগের সহিত গোলমাল বাধিল। তোমাদেরও কিছু বোধ হয় ক্ষতি হইয়াছিল। পাঁচ জনে মিলিয়া আমাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদে অনেক টাকা আদায় করিয়া লইল। কিন্তু তোমার মহৎ চরিত্রের—"

"এঃ, বেশ লোক ত তুমি! একেবারে আমার মহৎ চরিত্রের কথা আনিয়া ফেলিলে! আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আন্তর্জাতিক আচারে ব্যবহারে আমাদের কাহারও চরিত্রে লেশমাত্র মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না। তখ-নও পাইত না,—আজ এই ওয়াশিংটন জেনোয়া জেনিভার দিনেও নয়। বেশ তুমি গল্প বলিতেছিলে, হঠাৎ রসভঙ্গ কর কেন? আমি ভাবুক নহি; কল্পনাপ্রবণতার মধ্যে যদি কিছু দৌর্ব্বল্য থাকে, তা' বোধ করি আমাতে নাই। আমার মনে হইতেছিল যেন, কোন এক সুদূর অতীতে এই রকম আর এক আসন্ন সন্ধ্যায় এই কলম্বন মহাম্বুধিতীরে একাকী দণ্ডায়মান ছিলাম। যেন আমারই নাম ছিল কমোডোর পেরি; যেন ঐ চঞ্চল জলধি তা'র কল কল ছল ছল ভাষাতে আমার

ডাকিল—চল্ চল্ চল্; মনে হইল যেন সে ঐ মন্দ্রস্বরে অনাদিকাল হইতেই ডাকিতেছিল; যেন কোথায় উহার বুকের মাঝে সাত রাজার ধন একটি মাণিক লুক্কায়িত ছিল, —তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে; যেন তোমাদের এসিয়ার কবি রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত কোন এক অচলায়তন দুর্গ-মধ্যে রুদ্ধ ক্লিষ্ট মানবাত্মা গুমরিয়া গুমরিয়া ক্রন্দন করিতেছিল, তাহাকে মুক্তি দিতে হইবে, বাহিরে আনিতে হইবে, যেন আমি সাগরের আহ্বান ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তাই যখন সে ডাকিল—চল্ চল্ চল্, আমি মূঢ়ের মত প্রশ্ন করিলাম ওরে রহস্যময়, আমায় কি করিতে হইবে, বল্ বল্ বল্; যেন সে খল্ খল্ করিয়া পিছু হঠিতে লাগিল, আর আমি মোহাবিষ্টের মত তাহার অনুসরণ করিয়া তরণীতে উঠিয়া বসিলাম, যেন কোন এক প্রত্যূষে কোন এক অপরূপ রূপকথার রাজ্যে আমার তরীখানি ভিড়িল; যেন পরক্ষণেই সেই সহস্রস্বর্ণ-দেউলশীর্ষ রাজপুরীর সিংহদ্বার আমার তর্জ্জনী-সঙ্কেতে খুলিয়া গেল; যেন—"

"ক্ষমা কর ভাই, দেখো, যেন তোমার কবিত্বপ্রবাহের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে এই অত্যন্ত গদ্যময় নিরীহ জীবটির প্রাণ-সংশয় না হয়। আর এক পেয়ালা কাফি হইলে মন্দ হয় না,—কি বল? কিন্তু আমাকে তুমি আসল কথাটা ভুলাইতে পার নাই। তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলাম, তুমি বাধা দিয়া তোমার কবিপ্রতিভার ফেনিল উচ্ছ্বাসে সমস্তটা ঘুলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে।...ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ প্রাপ্ত টাকা সকলেই নিশ্চিন্তমনে আত্মসাৎ করিলেন; কিন্তু উনিশ বৎসর পরে তুমি তোমার অংশের সমস্ত টাকা আমাদিগকে ফিরাইয়া দিলে! কেমন? আমাদের প্রথম পরিচয়ের কাহিনীটা কেমন লাগিল?"

"কেমন লাগিল তাহা যদি আমি আমার এই অত্যন্ত নীরস ভাষায় বর্ণনা করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তুমি আবার গদ্য-পদ্যের উল্লেখ করিয়া পরিহাস করিবে। কিন্তু যদি বলি—'আচ্ছা, তা'র পর?' তাহা হইলে বোধ হয় আপত্তি করিবার তোমার কিছু নাই।"

"তা'র পরে কেমন করিয়া শোগানের হাত হইতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্খলিত হইল, এবং কিরূপেই বা আমাদের সমস্ত নেশনের ইতিহাস নবীন সম্রাট মৎসুহিতোর জীবনের সহিত জড়িত হইয়া গঠিত হইয়াছে, সে সব ত তোমার জানা আছে। সে সব কথা লইয়া মধ্যে মধ্যে আমরা আলোচনা করিয়াছি।"

সম্রাট্ মৎসুহিতো।

"হাঁ, সে কথা এখন থাক্। কিন্তু রুশের সহিত তোমাদের যুদ্ধ-কাহিনীটা একবার বল না। সঙ্গে সঙ্গে কাফির এই দ্বিতীয় পেয়ালার সদ্ব্যবহার করা যাক্।"

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে সেই দীপালোকিত কক্ষে বসিয়া দু'জনে কিছুকালের জন্য অন্য সকল বিষয় বিস্মৃত হইলেন। সেই ক্রিস্যান্থিমাম-গুচ্ছ পবন-হিল্লোলে দুলিতে লাগিল।

"আমরা ফরাসীর কাছে অস্ত্র-বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। য়ুরোপীয়দিগের মত পোষাক-পরিচ্ছদ ও কেশবিন্যাস আমাদের একটা ফ্যাশন দাঁড়াইল। ফরাসীও খুব আগ্রহ সহকারে আমাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইতে লাগিল। এমন সময়ে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। ফরাসী সৈনিক পুরুষগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে ফরাসীর রণকৌশলের উপর আমাদের আর শ্রদ্ধা রহিল না। যুদ্ধের অবসানে জার্ম্মাণ সেনাপতি মেকেল আমাদের দীক্ষাগুরু হইলেন। আজ ভক্তিবিনম্র চিত্তে সেই মৃত মহাত্মার উদ্দেশে আমাদের নেশনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ও কি? তোমার মুখে মৃদু হাসির রেখা!"

"ভাবিতেছি, সাধে কি তোমার উপর শনির দৃষ্টি

পড়িয়াছে? সে দিন লর্ড নর্থক্লিফ অষ্ট্রেলিয়াবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তোমরা প্রাচ্য জর্ম্মণ! কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয় তবে।"

"শিষ্য কি কখনও সর্ব্বতোভাবে গুরুর মত হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে? বিশেষতঃ আমাদের ইতিহাস ইহার পরে এত জটিল হইয়া গেল যে, কালক্রমে এক দিন আমরা ভারতবর্ষের পৌরাণিক সব্যসাচীর মত আচার্য্যকেই ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিলাম। আমার নবজীবনের প্রারম্ভেই ত তুমি দেখিলে, আমার জন্মপত্রিকার অন্তরাল হইতে শনি বক্রদৃষ্টি করিতেছেন! কিন্তু উহার কথা পরে হইবে। আমরা উৎসাহের সহিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিলাম।

"এইবার আমরা আমাদের ঘরের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার অবসর পাইলাম। আমরা দেখিলাম যে, রুশ শনৈঃ শনৈঃ সমস্ত সাইবিরিয়া দখল করিয়া বসিয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাহারা কোরিয়ার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, একেবারে প্রায় আমাদের দ্বীপপুঞ্জের সম্মুখে; অল্পদিনের মধ্যেই ব্লাডিবোষ্টক নগরী স্থাপিত করিয়া তথায় একটি প্রকাণ্ড নৌবাহিনীরক্ষার ব্যবস্থা করিল। যে রুশিয়া য়ুরোপের কুত্রাপি বারো মাসের ব্যবহারোপযোগী জলপথ ও বন্দর পায় নাই—বল্‌টিক্ সাগরেও নয়, ভূমধ্যসাগরেও নয়,—সে এই মহাসাগরের উপর এমন একটি স্থান অধিকার করিল, যেখান হইতে অন্ততঃ বছরের মধ্যে সাত মাস তাহাদের রণতরী অথবা বাণিজ্যতরণী অবাধে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিবে; চার পাঁচ মাস মাত্র বরফে তাহাদের গতিরোধ করিবে। কিন্তু কোথায় মস্কো, পিটর্স্‌বর্গ—আর কোথায় ব্লাডিবোষ্টক! ইহাদের পরস্পরের সংযোগবিধান না করিতে পারিলে চলে না। রেল পাতিতে হইবে। টাকা কোথায়? মিত্র ফরাসী—ত্রিশ কোটি পাউণ্ড কর্জ্জ দিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে রুশ সম্রাট আজ্ঞা দিলেন, সাইবিরিয়ার উপর দিয়া রেল পাতা হউক। চার হাজার মাইল রেলপথ প্রস্তুত করিতে রুশের পূর্ত্তবিভাগ উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। দুই দিক্ হইতেই কাজ আরম্ভ হইল; পশ্চিমে উরাল পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে পাতর কাটিয়া রেল বসান হইল,—আর পূর্ব্বে ব্লাডিবোষ্টকে প্রথম মাটী কাটিলেন যুবরাজ নিকোলাস। কখনও কি তিনি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে, এই রেলেরই একটি অতি ক্ষুদ্র শাখায় উরাল পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত গণ্ডগ্রামে তাহাকে সবংশে নিহত হইতে হইবে!

"তখন বার্লিনে আমাদের রাজপ্রতিনিধির সহচর Attache ছিলেন সেনাপতি ফুকুশিমা। তাঁহার কার্য্যকাল ফুরাইয়া আসিলে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বার্লিন হইতে ব্লাডিবোষ্টক কত হাজার মাইল দূর বল ত? তিনি এই সমস্ত পথটি অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করিলেন! তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, রুশিয়ার এই নূতন রেলপথটা আগাগোড়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, কোথায় কি আয়োজন হইতেছে, সামরিক উপযোগিতা ইহার কিরূপ, তাহা নিজের চোখে দেখা প্রয়োজন;—কারণ, এক দিন এই রুশের সঙ্গে আমাদের বলপরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে জর্ম্মণীর প্রান্তসীমা অতিক্রম করিলেন, সমগ্র য়ুরোপীয় রুশিয়া পার হইয়া উরাল পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। এবার তাঁহার অশ্বের গতি মন্দীভূত। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দীর্ঘ বিসর্পিত লৌহবর্ম্মের দুই ধারে অনেকগুলি গ্রামে রুশ আসিয়া চিরস্থায়িত্বের বন্দোবস্ত করিয়াছে। রেল কুর্গাণ গ্রামের পাশ দিয়া ওমস্কের সহিত টোমস্কের সংযোগবিধান করিয়া বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ দিয়া দূরে বন্ধুর গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। হ্রদ ও নদনদীগুলিতে কত ষ্টীমার চলাফেরা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা কিরূপ,তাহা তিনি একপ্রকার হিসাব করিয়া লইলেন। যে দিন তিনি স্বদেশে পদার্পণ করিলেন, সে দিন সমস্ত নেশন যেন আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিল।

"পরবৎসর ঘটনাচক্রে চীনের সহিত আমাদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। চীন আমাদিগকে অতিশয় ঘৃণার চোখে দেখিত। লাই-হাং-চাং রুশের সহিত মিতালি করিতে প্রস্তুত ছিলেন; রুশের হাতে মাঞ্চুরিয়া এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন; কিন্তু কোরিয়ায় আমাদের প্রতিপত্তি-বিস্তারের চেষ্টা করিলেই তিনি ত বাধা দিতেনই, রুশও বাধা দিত; এক হিসাবে চীনের মধ্যে লর্ড সল্‌স্‌বেরির sphere of influence নীতি সকলেই মানিয়া লইয়াছিল। ক্রমশঃ উহা আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইল। তোমরা দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেছিলে; কিন্তু তখন তোমরা কিছু বলিতে পার নাই। ওয়াশিংটনে ও জেনোয়ায় তোমরা মুখ

ফুটিয়া কথা কহিয়াছে। এখন সকলের চোখ আমাদের উপরে পড়িয়াছে,—যেন চীন এখন একমাত্র আমাদের sphere of influenceএর অন্তর্গত।

"১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পরাজিত চীন শিমনোসেকিতে আমাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ফর্ম্মোজা ও সমগ্র লিয়াও-টং প্রদেশ এবং কিছু টাকা পাওয়া গেল। রুশ চমকিয়া উঠিল। পোর্ট আর্থর জাপানীর হইল! মাঞ্চুরিয়া—সাইবিরিয়ার রেল···কোরিয়ার প্রান্তভাগে ইয়ালু নদীর তীরে বিপুল বন-সম্পত্তি—এ সকল রক্ষা হইবে কিসে? ফরাসী চঞ্চল হইল। সে বোধ হয় ভাবিল যে, আমরা আর্থর বন্দরে থাকিলে তা'র ত্রিশ কোটি টাকা মারা যাইবে। যে জর্ম্মণীকে আমরা গুরুর মত ভক্তি করিতাম, সেও বিরূপ হইল। ইঁহারা তিন জনেই আমাদিগকে পরামর্শ দিলেন যে, চীনের খাস দখল হইতে এসিয়া ভূখণ্ডের জমি কাড়িয়া লইলে ভাল হইবে না। আমরা অগত্যা লিয়াও-টং প্রদেশ ছাড়িয়া দিলাম; অদূরবর্ত্তী ওয়াই-হাই-ওয়াই দ্বীপ হইতেও প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তিন বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই শুনিলাম যে, চীন গভর্মেণ্ট রুশিয়াকে লিয়াও-টং প্রদেশটা নিরানব্বই বছরের জন্য ইজারা দিলেন। আমরা বুঝিলাম, বিনা যুদ্ধে আমাদের নিপ্পন দ্বীপপুঞ্জের সমীপবর্ত্তী সাগরপারে সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমিও রুশিয়ার কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিব না।

"ইংরাজও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া ওয়াই-হাই-ওয়াই দখল করিয়া তথায় বৃটিশ পতাকা উড়াইয়া দিলেন। জর্ম্মণী চীনকে জানাইলেন যে, তাঁহার দু'জন নিরীহ মিশনরীকে চীনেরা হত্যা করিয়াছে, অতএব উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না হইলে এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। চীন টাকা দিতে চাহিল। জর্ম্মণী গায়ের জোরে কিয়াও-চাও বন্দর আয়ত্ত করিয়া সমগ্র শান্-টাং প্রদেশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিল। অল্পদিনের মধ্যেই আর্থর বন্দরকে রুশিয়া এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিল; কিয়াও-চাও বন্দরও প্রশান্ত মহাসাগরে জর্ম্মণীর প্রবল প্রতাপের পরিচায়ক সুরক্ষিত দুর্গরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। ইহাদের নিকটে ওয়াই-হাই-ওয়াইএর তেজ ম্লান হইয়া গেল। আমরা নির্ব্বাক্ হইয়া আমাদের ঘরের অতি নিকটে য়ুরোপের এই বিপুল নাবরিক আয়োজন দেখিতে লাগিলাম; আর একটী একটী করিয়া দিন গণিতে লাগিলাম। চীন কিন্তু ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিল না। আমাদের এই প্রশান্ত মহাসাগরের টর্ণেডো ঝটিকার ন্যায় একটা বিপ্লবের ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া আমরা সেই বক্সার-বিদ্রোহ দমন করিলাম।

"কিন্তু ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম, বলিতে পারি না। জর্ম্মণ সেনাপতি কাউণ্ট্ ফণ্ ওয়াল্ডারসীকে আমরা সকলেই এই অভিযানের অধিনায়ক বলিয়া মানিয়া লইলাম। কৈশর উইলহেল্ম্ প্রিন্স হেন্‌রিকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন—'তুমি চীনে যাইতেছ; দেখিও, আমার জর্ম্মণ সেনা এমন ভাবে যেন কাজ করে, যাহাতে জর্ম্মণীর নামে সমগ্র এসিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। আর একটি কথা,—কাহাকেও বন্দী করিও না, কাহারও প্রতি করুণা প্রকাশ করিও না!'···মার্কিণও ত তখন আমাদের সঙ্গে অনেকটা জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ করি, তুমি সে কথা একেবারে ভুলিয়া যাও নাই। কেন না, এ ক্ষেত্রেও তোমার বদান্যতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। চীনের প্রদত্ত খেসারতের টাকা তুমি ফিরাইয়া দিয়াছ।"

জাপ্ চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। এই ছবিটি আর কখনও দেখিয়াছ কি? উইলহেলম্ শিল্পীকে ডাকাইয়া এই ছবি নিজের তত্ত্বাবধানে অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার বিকৃত-মস্তিষ্কজাত পীতভীতি চিত্রে কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে দেখ। সমুদ্রতীর···দূরে লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশমার্গ আচ্ছন্ন করিয়াছে···ঐ সাগরব্যোমব্যাপী অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কে যেন মৌন ধ্যানমগ্ন···এ দিকে পর্ব্বতশিখরের প্রান্তদেশে স্বর্গলোক হইতে দেবদূত মাইকেল অবতীর্ণ! তাঁহার বিশাল বক্ষ যেন প্রলয়-নিঃশ্বাসে স্পন্দিত হইতেছে; পক্ষদ্বয় বিস্ফারিত; সমগ্র খৃষ্টীয় শক্তিপুঞ্জের প্রতি তাঁহার প্রদীপ্ত দিব্য চক্ষু নিবদ্ধ; বাম হস্ত ঐ অগ্নিময় পূর্ব্বদিগন্তের দিকে প্রসারিত; দক্ষিণ হস্তে জলন্ত হুতাশনপ্রতিম অসি ধারণ করিয়া তিনি দণ্ডায়মান! অগ্রণী ফরাসী শক্তিরূপিণী বীরাঙ্গনা, দক্ষিণ হস্তে আয়ুধধারিণী, ত্রস্তা, চকিত-নয়না, আভরণহীন বাম হস্তের দ্বারা যেন চক্ষু ঈষৎ আবৃত করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে জর্ম্মণী, বিস্ফারিতলোচনা; শিরোদেশে অবেণীসংবদ্ধ কেশরাশির উপর উপবিষ্ট পক্ষিরাজ ঈগল; দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবদ্ধ নিষ্কোষিত অসি; দক্ষিণ পদ

যেন অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে নিজ দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া, বাম হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া রুশিয়া দণ্ডায়মানা। রুশিয়ার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অষ্ট্রীয়া নিজ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বৃটানিয়ার বাম প্রকোষ্ঠ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া যেন বলিতেছেন—'এস, আমাদের সঙ্গে এস।' উহাদের উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া—ইটালি; তাঁহার কটিদেশে অসি ঝুলিতেছে।…শূন্যে দেখ, খৃষ্টের ক্রশ ঝুলিতেছে।

"এই অমূলক আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া উইলহেলম্ আমাদিগকে অত্যন্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এসিয়ার পীত জাতি যাই বলুন, ইংরাজ আমাদের সহিত রীতিমত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। হাউস্ অব্ লর্ডস্‌এ যখন পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড ল্যান্সডাউন্ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই সন্ধির কথাটি প্রকাশ করেন, তখন লর্ড রোজ্‌বেরি ঘৃণার সহিত বলিয়াছিলেন—'ইংরাজ কি এতই হেয় যে, পৃথিবীর পথে ঘাটে অলিতে গলিতে ঘুরিয়াও সে একটি ভদ্র খৃষ্টান মিত্র পাইল না! একটা পীত জাতির সহিত মিত্রতা করিতে হইল! এই সন্ধির একটা সর্ত্ত এই ছিল যে, উভয় পরাক্রমশালী মিত্রের মধ্যে কোনও একটি যদি এসিয়ায় একাধিক আততায়ী কর্ত্তৃক

পীতাতঙ্ক।

কি য়ুরোপের পক্ষে এতই ভয়ঙ্কর হইয়াছে! বরঞ্চ ঘটনা-পরম্পরায় যাহা দাঁড়াইল, তাহাতে মনে হইল যে, এসিয়ার শ্বেতাতঙ্ক বাস্তবিকই ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এক প্রকারে সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া এতদিন পরে আজ সেই কৈশরি পীতাতঙ্কের এক অভিনব ইংরাজী সংস্করণ দেখিতেছি মাত্র। জর্ম্মণ্যভাব দমন করিতে গিয়া ইংরাজ ঐ ভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। লর্ড নর্থক্লিফের এই ধার-করা জিনিষ দেখিয়া আমরা বিচলিত হইব কেন?… জর্ম্মণী আক্রান্ত হন, তাহা হইলে মিত্রশক্তি আক্রান্তকে সাহায্য করিবেন। তখন এসিয়া ভূখণ্ডে ইংরাজের ও আমাদের একমাত্র আশঙ্কার বিষয় ছিল—রুশিয়ার নাতিগূঢ় দুরভিসন্ধি। যদি রুশিয়া ইংরাজকে অথবা জাপানকে একাকী আক্রমণ করেন, তাহা হইলে ইংরাজ অথবা জাপানকে একাকীই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে; মিত্রশক্তি শুধু দেখিবেন, যেন আর কেহ রুশিয়ার সঙ্গে যোগ না দেয়। যদি আর কেহ রুশিয়ার সাহায্যকল্পে এসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন,

তাহা হইলে আমরা দুই বন্ধু মিলিত হইয়া যুদ্ধ চালাইব। এইরূপে য়ুরোপের মত এসিয়াতেও দুই পরস্পর-বিরোধী সশস্ত্র শক্তিপুঞ্জ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল।

"সাইবিরিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রুশিয়ার রেলপথ তখন নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। ব্লাডিবোষ্টক বন্দরে একটি প্রকাণ্ড নৌ-বাহিনী অবস্থিত। এ দিকে মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে, লিয়াও-টংএর প্রান্তভাগে আর্থর বন্দর ও ড্যাল্‌নি নগর দুর্ভেদ্য ব্যূহে পরিণত হইল। বাকি ছিল কেবল সাইবিরিয়ার রেল-লাইনের সঙ্গে আর্থর বন্দরের সংযোগ;—তাহাও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সংঘটিত হইল। মাঞ্চুরিয়ার এই রেলপথ নির্ম্মাণের সময় বহু সুদক্ষ জাপানী এঞ্জিনীয়র স্বরূপ গোপন করিয়া দীনবেশে চীনা কুলী মজুরের মত কাজ করিয়া উক্ত রেলপথের সমস্ত খুঁটিনাটি, যত কিছু গোপন রহস্য জানিয়া লইল।

"এমন সময়ে কোরিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমায় ইয়ালু নদীর তীরে রুশের সহিত আমাদের গোল বাধিল। আলেক্সিফ তখন প্রাচ্য রুশিয়ার রাজপ্রতিনিধি। তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাঁহার অনুচরগণ বলিল,—'আমরা এই প্রকাণ্ড জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করিবার জন্য আসিয়াছি; মনের মধ্যে আমাদের অন্য কোনও দুরভিসন্ধি নাই।' আমরা বলিলাম—'বেশ; আমরা তা'তে আপত্তি করিব কেন? কিন্তু তোমরা যে ইয়ালু নদীর এ পারে কোরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিতেছ! সমস্ত জঙ্গলটাই কি তোমাদের দরকার?' রুশ আমাদের কথায় কান দিল না, আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা বলিলাম—'তবে এক বন্দোবস্ত করা যাক্;—কোরিয়ার পশ্চিম অংশে তোমরা থাক, পূর্ব্বার্দ্ধে আমরা থাকি।' আমাদের এ আবেদনও রুশিয়া গ্রাহ্য করিল না।

"যুদ্ধ বাধাইবার জন্য রুশ যখন বদ্ধপরিকর; তখন আমরাও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম না। ইংরাজকে বলিলাম—'জর্ম্মনী ও ফরাসীর উপর নজর রাখিও; রুশের বিষয় তোমাকে ভাবিতে হইবে না।' ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি রুশিয়ার রাজধানী হইতে আমাদের রাজপ্রতিনিধি চলিয়া আসিবার সময় ইংরাজ প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের হস্তে সমস্ত কাগজপত্র রাখিয়া আসিলেন; বলিলেন, 'জাপানের মিত্রের যাহা কর্ত্তব্য,আপনি করিবেন।' টোকিও হইতে রুশ-রাজপ্রতিনিধিও বিদায় লইলেন; বিদায়কালে ফরাসী রাষ্ট্রপ্রতিনিধিকে সকল কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলেন। তখনও কিন্তু যুদ্ধ-ঘোষণা প্রচারিত হয় নাই। সম্রাট টোগোকে সমগ্র নৌ-বাহিনীর নায়কত্বে বরণ করিলেন।

এড্‌মিরাল টোগো।

"পরদিন ৬ই ফেব্রুয়ারি। টোগো সমস্ত টর্পেডো-বাহিনীকে আদেশ দিলেন যে, তাহারা যেন এলিয়ট দ্বীপপুঞ্জে তাঁহার সহিত মিলিত হয়। মনে রাখিও, তখন ডুব-জাহাজ আবিষ্কৃত হইয়াছিল বটে,কিন্তু তখনও সমুদ্রগর্ভে তাহার নিরাপদ কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে সকলেরই ঘোর সন্দেহ ছিল। টর্পেডো-বোট রণতরী জলের উপর দিয়াই চলিত। এখনকার মত এয়ারোপ্লেনও তখন ছিল না।

"৮ই ফেব্রুয়ারি, রাত্রিকাল—ঘন অন্ধকার। আমাদের চারখানি টর্পেডো-বোট সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া আর্থর বন্দরাভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। টোগো তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'আজ তোমাদের উপর আমাদের দেশের সমস্ত ভাল মন্দ নির্ভর করিতেছে। মনে রাখিও, তোমাদের দেশকে আর তোমাদের সম্রাটকে। তোমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিব পোর্ট আর্থর হইতে ত্রিশ মাইল দূরে এলিয়ট দ্বীপপুঞ্জে।' ফিরিতে পারা যাইবে কি না, সে ত পরের কথা; এখন ত কার্য্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা যাক্। দূরে দুইখানা বৃহত্তর রুশ ক্রুজার পাহারা দিতেছিল! তাহাদিগকে কেমন করিয়া এড়াইয়া যাইবে? আজিকার দিনে এই কার্য্যের গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। গত মহাসমরে জর্ম্মণ ডুব-জাহাজ ডয়র্টশল্যাণ্ড কীল্ খাল

হইতে বাহির হইলা ডুব দিয়া, আট্লাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া,একেবারে এই তোমাদের মুল্লুকে ভাসিয়া উঠিল; চকিত ইংরাজ ভাবিল যে, জাহাজখানা যদি ফিরিতে চেষ্টা করে, তবে সে নিশ্চয় ধরা পড়িবে। কিন্তু আবার একডুবে মহাসাগর পার। কিন্তু আমি ১৯০৪এর কথা বলিতেছি, ১৯১৪'র নহে।

"ক্রুজার দুইটার নজর পড়িল—টর্পেডো-বোট কয়খানির উপর। দীপ্ত তাড়িতালোকে প্রশ্ন হইল—'কে তোমরা? কোথা হইতে আসিতেছ?' আমরা রুশিয়ার এই গোপন কোডের ভাষা শিখিয়া লইয়াছিলাম;—রুশ-সেনানীর অজ্ঞাতসারে আমাদের গুপ্তচররা রুশিয়ার এই রহস্যময় সাঙ্কেতিক ভাষার কোড অপহরণ করিয়াছিল। কাজেই টর্পেডো-বোট হইতে উত্তর দিতে বিলম্ব হইল না—'আমরা ডালনি হইতে আসিতেছি, সেখানকার সব মঙ্গল।' রুশ ভাবিল, এরা আমাদের লোক; বোধ করি, আজ দুর্গেশপত্নীর জন্মোৎসবে যোগ দান করিবার প্রবল বাসনা এই গভীর নিশিতে ইহাদিগকে ঘরছাড়া করিয়াছে। তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল। অন্ধকারে টর্পেডো-বোটগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল।

"দূরে দুর্গশিখর আলোকমালায় বিভূষিত। অ্যাডমিরাল্ ষ্টোয়েসেলের পত্নীর জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব। ছোট বড় সমস্ত রণতরীর ছোট বড় কর্ম্মচারীরা আজ সন্ধ্যার পর হইতে আনন্দে মত্ত। আসন্ন বিপদের লেশমাত্র আশঙ্কা কাহারও মনে ছিল না; নহিলে অত্যন্ত মোটামুটি সাধারণ বিষয়েও সতর্ক হওয়া কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করে নাই কেন? বন্দরের বাহিরে বীচিভঙ্গবিহীন উপকূলে বড় বড় তরীগুলি নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। টর্পেডো-বোটগুলি তাহাদের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে সবগুলা টর্পেডো প্রক্ষিপ্ত হইল। ভীমদর্শন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রণতরী,—রেটভিজান্, পল্টাভা, জার্উইচ প্যালার্ডা বিদীর্ণ দ্বিখণ্ডিত-তলদেশ হইয়া সেই স্বল্পতোয় উপকূলের তটদেশে অর্দ্ধনিমজ্জিতাবস্থায় হেলিয়া পড়িল। আনন্দোৎসবের কি দশা হইল, জানি না। নিমেষের মধ্যে বজ্রনির্ঘোষে দুর্গপ্রাচীর হইতে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। টর্পেডো-বোটগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

"পরদিন অতি প্রত্যূষে আমাদের একটি ক্ষুদ্র নৌ-বাহিনী কোরিয়ার চেমল্‌ফো বন্দরে দুইখানি ছোট রুশ-জাহাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। সেখানে তখন ইংরাজের, ফরাসীর, জর্ম্মণীর, ইটালীর ও তোমাদের এক একখানা জাহাজ ছিল। সকলেই রুশ কাপ্তেনকে বারণ করিল তিন মাইলের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে। রুশ কিন্তু বারণ শুনিল না; বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ দিতে প্রস্তুত। আমাদের জাহাজগুলি ক্ষিপ্রগতিতে তোমাদের বর্ণমালার এস্ (S) অক্ষরের মত ব্যূহ রচনা করিয়া সেই দুখানা জাহাজকে দূর হইতে ঘিরিয়া গোলাগুলী বর্ষণে তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। রুশ-কাপ্তেন কোনওপ্রকারে জাহাজ দু'খানাকে বন্দরে ফিরিয়া লইয়া ডুবাইয়া দিলেন। মজ্জমান নাবিকগুলিকে তোমরা সকলে জল হইতে উঠাইলে। আমরাও অনেকগুলিকে উঠাইলাম। ও দিকে পোর্ট আর্থরের অনতিদূরে টোগোর অধিকাংশ জাহাজ পাহারা দিতে লাগিল। চার পাঁচ খানি বড় ক্রুজারকে তিনি জখম করিলেন। ব্লাডিবোষ্টক হইতে রুশের জাহাজ যাহাতে বাহিরে আসিতে না পারে, তজ্জন্য টোগো অ্যাড্‌মিরাল্ কামিমুরাকে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই রকমে আমাদের যুদ্ধ আরব্ধ হইল। আর কি শুনিবে?"

অ্যাডমির্য়াল কামিমুরা।

জাপ্ চুপ করিলে মার্কিণ চমকিয়া উঠিলেন। "আর কি শুনিব? বোধ করি, আরও যাহা শুনিবার আছে, তাহা তোমার বর্ণিত বীর্য্যকাহিনী অপেক্ষা কম বিস্ময়কর নহে।"

জাপ্ হাসিলেন। "তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলে, আমাদের দীক্ষাগুরু জর্ম্মণ সেনাপতি মেকেল্-এর ভবিষ্যদ্বাণী। বৃদ্ধ সেনাপতির কয়েক জন বন্ধু যখন আমাদের

নৌ-সমর-কুশলতার প্রশংসা করিতেছিলেন, তিনি নাকি বলিয়াছিলেন—'একটু অপেক্ষা কর; জাপ্-সৈন্যের রণকৌশল জগৎকে স্তম্ভিত করিবে।'

"ইতোমধ্যে সেনাপতি কুরোকি প্রথম সৈন্য-বিভাগের অধিনায়ক হইয়া চেমাল্‌ফো বন্দর দিয়া কোরিয়ায় প্রবেশ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি কোরিয়া হইতে সমস্ত রুশ-সৈন্য বিতাড়িত করিয়া, ইয়ালু নদী পার হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিলেন। সংবাদ আসিল যে, রুশিয়ার সমর-সচিব কুরোপ্যাট্‌কিন্ মাঞ্চুরিয়ায় প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিলেন।

জেনারেল কাউন্ট ওকু।

"কয়েক দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বাহিনীর অধিনায়ক সেনাপতি ওকু লিয়াওটং ভূখণ্ডের এক প্রান্তে অবতীর্ণ হইলেন। আর্থর দুর্গ দখল করা তাঁহার উদ্দেশ্য। বন্দরের মুখে কয়েকখানা পুরাতন জাহাজ ডুবাইয়া ছিপি আঁটিয়া দিয়া টোগো অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।"

মার্কিণ বলিলেন—"ও বিদ্যাটি বোধ হয়—" তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে না দিয়া জাপ্ বলিলেন—"হাঁ, ওটা তোমাদের দেখিয়া আমাদের শিক্ষা। কিউবায় কেমন করিয়া তোমাদের লেফ্‌টেনাণ্ট হব্‌সন্ সান্টিয়াগো বন্দরের মুখে জাহাজ ডুবাইয়া স্পেনের নৌ-সেনাপতি অ্যাড্‌মিরাল সার্ভেরাকে তোমাদের অ্যাড্‌মিরাল্ ডিউয়ির কাছে আত্মসমর্পণ করাইতে বাধ্য করাইয়াছিল, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলাম। আর্থর বন্দরের সম্মুখে যিনি হব্‌সনের অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আমরা শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিতেছি।" মার্কিণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে? টোগো?" জাপ্ বলিলেন,—"না; লেফ্‌টেন্যাণ্ট হিরোসি। গভীর নিশায় যখন আর্থর দুর্গও সুপ্তিমগ্ন বলিয়া বোধ হইল, হিরোসি কয়েকখানি জীর্ণ তরী লইয়া বন্দরাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দুর্গপ্রাচীরের চঞ্চল তাড়িত আলোক তাঁহাদের উপর নিপতিত হইল। পরক্ষণেই গোলাবৃষ্টি। হিরোসি কালবিলম্ব না করিয়া পাথর-বোঝাই ভাঙ্গা নৌকাগুলা একে একে জলমগ্ন করিলেন। কিন্তু বোধ হয়, ঠিক যে জায়গায় সেগুলাকে ডুবাইবার তাঁর ইচ্ছা ছিল, সেখানে ডুবাইতে পারেন নাই। স্রোতের বেগ অপেক্ষাকৃত প্রবল হওয়ায় দু' একখানি নৌকা ঠিক মাঝখানে ডুবিল না, পার্শ্বে গিরিগাত্রে ঠেকিয়া হেলিয়া রহিল। এখন হিরোসির ক্ষুদ্র তরীখানির উপর গোলা পড়িতে লাগিল। ছোট ছোট দু'খানি লাইফ্-বোট জলে নামাইতে তিনি আদেশ দিলেন। সহচর নাবিকগুলিকে ঐ দুইখানি নৌকায় জোর করিয়া উঠাইয়া দিয়া তিনিও একখানিতে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্মরণ হইল যে, তরবারি তাঁ'র ক্যাবিনে রহিয়া গিয়াছে। তিনি আবার তাঁ'র জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। তরবারি লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। তিনি বলিলেন,—'কই? আমাদের এঞ্জিনীয়রকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? তাঁ'কে কি জাহাজে ফেলিয়া আসিলাম?' নাবিকদিগের বিষম আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত মজ্জমান জাহাজখানাতে ফিরিয়া গেলেন। নিমেষের মধ্যে একটা শেল্ পড়িয়া তাঁহার দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিল। তাঁহার দেহাবশেষ যতটুকু পাওয়া গেল, তাহা লইয়া সমস্ত টোকিও নগরী নগ্নপদে মৌনশ্রদ্ধায় অবনতমস্তকে সমাধিস্থ করিল।

"যুদ্ধের পূর্ব্বে হিরোসি কিছুকাল রুশিয়ার রাজধানীতে অভিজাত সমাজের মধ্যে পরম সমাদর লাভ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি মল্ল-যুদ্ধ দেখিতে গেলেন। ইতর ভদ্র অনেক লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। ভীমকায় রুশীয় মল্লগণের ক্ষিপ্রতায় ও ভুজবলে সকলে চমৎকৃত হইল। সহসা দেখা গেল যে, এক খর্ব্বকায় জাপানী প্রাঙ্গণমধ্যে মল্লগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। আহার ক্ষীণ

দেহযষ্টি দেখিয়া তাহারা হাসিয়া উঠিল। তাহার বন্ধুগণ তাহাকে ফিরিয়া আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। যুবকের খর্ব্বদেহ দেখিয়া সকলে যেন কিছু আমোদ বোধ করিল। তিনি বলিলেন,—'আপনারা আমাদের দেশের যুযুৎসু দেখেন নাই, তাই এই সকল পালোয়ানের কুস্তিতে বাহবা দিতেছেন।' তিনি একে একে চার পাঁচটি পালোয়ানকে এমন জখম করিলেন যে, তাহারা অকুণ্ঠিতভাবে পরাভব স্বীকার করিল। সকলে বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া গেল। জনতা ক্রমশঃ কমিয়া গেলে একটি প্রবীণ ভদ্রলোক আনন্দে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন,—'যুবক, তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার এই তিনটি কন্যাও তোমার প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি ইহাদের মধ্যে একটিকে বিবাহ কর। দেখ, তিনটিই সুন্দরী; তুমি কাহার পাণিগ্রহণ করিবে, বল।' যুবক অত্যন্ত বিচলিত হইলেন; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, 'এখন ক্ষমা করিবেন; কাল আপনাকে উত্তর দিব।' পরদিন অপরাহ্নে ঐ প্রবীণ ভদ্রলোকটি বোধ করি হিরোসির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে একখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। তাহাতে লিখা ছিল,—'মহাশয়, আপনার প্রস্তাবে আমি পুলকিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছি। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমার চিত্ত চঞ্চল ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ মনকে সংযত করিলাম। আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, রুশ-রমণীর পাণিগ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আজ না হয় কাল, আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। রুশ-রমণীকে বিবাহ করিয়া যদি আমি আমার জন্মভূমির বিপদকালে কর্ত্তব্যবিমুখ হই! আপনার কন্যাকে এমন অশান্তি হইতে ভগবান্ রক্ষা করুন। আমার চিত্ত আজ উদ্‌ভ্রান্ত। আমি চলিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।' রুশিয়া হইতে হিরোসি স্বদেশে ফিরিলেন।···নিস্তব্ধ নিশীথে, আর্থর বন্দরের মুখে তাঁহার জীবনলীলার পর্য্যবসান হইল।

জেনারেল কাউন্ট নগি।

"আজ এইখানে এই যুদ্ধ-কাহিনী সমাপ্ত করি। কেমন করিয়া তৃতীয় বাহিনীর সেনাপতি নড্‌জু মাঞ্চুরিয়ার রেলপথে রুশ-সেনার গতিবিধি বন্ধ করিলেন; কেমন করিয়া মার্শাল ওয়ামা কুরোপ্যাট্‌কিনকে পদে পদে পরাজিত করিলেন; কেমন করিয়া সেনাপতি নগি'র হস্তে ষ্টোয়েসেল আর্থর দুর্গ সমর্পণ করিলেন; কি উপায়ে নবাগত রুশ-নৌবাহিনীকে টোগো চুশিমা-সমীপে জলমগ্ন করিলেন, সে সকল কথা বিবৃত করিতে আজ আর ইচ্ছা হইতেছে না। শেষে তোমরা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলে। পোর্ট আর্থর ও

ফিল্ড মার্শাল মারকুইস্ নডজু।

ফিল্ড মার্শাল প্রিন্স ওয়ামা।

ট্যালিয়েনওয়ান্ আমরা ফিরাইয়া পাইলাম। স্যাখালীন্ দ্বীপের দক্ষিণার্দ্ধ আমাদের হস্তগত হইল। মাঞ্চুরিয়া রেলের কিয়দংশও রুশ আমাদিগকে দিতে বাধ্য হইলেন।...আজ কয় দিন হইল, গত ৩১এ মে, আর্থর বন্দর হইতে সমস্ত লড়াইয়ে জাহাজ সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। আর উহাকে naval base করা হইবে না। কিসের কি পরিণাম হইল দেখ।

"গত মহাসমরে রুশ ও জর্ম্মণ অধঃপাতে গিয়াছে। কিয়াওচাউ হইতে ব্লাডিবোষ্টক্ পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্রতটে আমরা শান্তিরক্ষা করিতেছি। দক্ষিণে মার্শ্যাল ও কেরোলাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে জর্ম্মণীকে তাড়াইয়া আমরা ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়াছি বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ার গাত্রদাহ হইতেছে। লর্ড নর্থক্লিফ্ তাহাদের মুখরোচক কথাই বলিয়াছেন। কোরিয়া শনৈঃ শনৈঃ কত উন্নত হইয়াছে, তাহা তুমি জান।"

মার্কিণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন–"দেখ, আমাদের এই প্রশান্ত মহাসাগরের শান্তি-বৈঠকে তোমার আসা চাই। তুমি না এলে, এই হনোলুলু যজ্ঞ শিবহীন হবে। চীন, শ্যাম, বোর্ণিও, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি অনেককেই আমাদের ওয়াশিংটন গভর্মেণ্ট আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে আমরা কোনও কর্ত্তৃত্ব করিবার স্পর্দ্ধা করি না।" তিনি বিদায় হইলে পরে জাপ্ দেরাজের ভিতর হইতে একখানি ছোট নোট বুক্ বাহির করিয়া তাহাতে ডায়ারি লিখিলেন,—'মার্কিণ আজ খুব সরল বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া ইংরাজের সম্বন্ধে আমার মনের ভাব জানিতে আসিয়াছিলেন। আমি আমাদের দেশের একটু ইতিহাস শুনাইয়া ও দুই পেয়ালা কাফি পান করাইয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলাম।'

* * * * *

মার্কিণ সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আলোকস্তম্ভ হইতে তাড়িতালোক অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিচ্ছুরিত হইয়াছে। সহসা কে যেন তাঁহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। আগন্তুককে দেখিয়া বলিলেন,—"তুমি এখানে?" "আমি অনেক দিন হইতেই তোমার পিছু লইয়াছি। উইলসন্ যে দিন হইতে স্ব-তন্ত্রীকরণের কথা তুলিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমি তোমার দ্বারে করাঘাত করিতেছি। কিন্তু তোমার সাড়া পাই না। ওয়াশিংটনে তোমাদের চতুঃশক্তি-সম্মিলন ব্যাপারও কিছু দূর হইতে দেখিলাম; সেখানেও তোমার নাগাল পাইলাম না। জেনোয়ার বড় ব্যাপারটার সঙ্গেই যখন তুমি কোনও সম্পর্ক রাখিলে না, তখন আমাদের নিপীড়িত-প্রাচ্য জাতি-সম্মিলনের খবর বোধ করি তুমি কিছু রাখিতে ইচ্ছা কর না। চীনের দিকে অনেক দিন হইতেই তুমি নজর রাখিয়াছ, কিন্তু আমার দিকে কখনও ভাল করিয়া তাকাও নাই। এখন দেখিতেছি, জাপের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব কিছু অতিরিক্ত মাত্রায়।"

"সে কথায় তোমার কাজ কি? আমি তোমাকে লক্ষ্য করি নাই, কেমন করিয়া তুমি বুঝিলে? আমি তোমাকে কয় বৎসর দেখিতেছি,—তুমি ন্যাশনলিষ্ট্ কোরিয়ার মূর্ত্তিমান্ বিদ্রোহ। আমার কাছে কি চাও?"

"কিছু চাই না। শুধু আমাদের কথাটা একবার তোমাকে শুনাইতে চাই।" "আর পারি না। য়ুরোপের ছোট বড় সকলেই দিনান্তে একবার আমাকে তাহাদের নিজ নিজ কাহিনী শুনাইতে ব্যস্ত। এইমাত্র জাপ্ কত কথাই বলিল। তোমার জন্যই তা'র যত মাথাব্যথা। তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া শুনিলাম, তোমরা শনৈঃ শনৈঃ উন্নত হইতেছ?"

"আমরা অত্যন্ত অবনত ছিলাম বুঝি? আমাদিগকে উন্নত করাইতে কে তাহাদিগকে ডাকিয়াছিল?" "না হয় তা'দের নিজেরই একটু স্বার্থ ছিল। কিন্তু সে ত তোমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। আর তোমরা কি নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিতে পারিতে? জাপানের অধিকারভুক্ত না হইলে তোমরা রুশের হাত এড়াইতে পারিতে কি?" "হয় ত পারিতাম না; কিন্তু সে কি এত খারাপ হইত? এ যে আমাদের সমস্ত জাতিটাকে নষ্ট করিতেছে।"

মার্কিণ বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি স্বীকার কর কি না যে, দশ বার বছর আগে,—এই ধর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন তোমরা জাপ্ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে,—তোমাদের দেশে বড় রাস্তা পাঁচ শ' মাইলের বেশী ছিল না। কেমন, ঠিক কি না?"

উত্তর হইল—"তা হ'বে।

মার্কিণ—"এই কয় বছরের মধ্যে আট হাজার মাইল রাস্তা পাকা হইয়াছে।"

উত্তর—"উহাদেরই সৈন্যের ও রাজকর্ম্মচারীদের

যাতায়াতের সুবিধা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের কতটুকু সুখ বাড়িল ?

মার্কিণ—"এঃ, দেখিতেছি, তোমরা সহজে স্বীকার করিবে না যে, তোমাদের সুখী হওয়া অন্ততঃ উচিত ছিল। নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ?"

উত্তর—"তা'তে আমাদের সুখ বাড়িয়াছে কি ?"

মার্কিণ—"তোমাদের কোনও কুঠী ফ্যাক্টরি ছিল না; এখন দেখ, আট শত ফ্যাক্টরি বিরাজ করিতেছে। সেখানে কত হাজার কোরিয়াবাসী জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, বল দেখি ?"

উত্তর—"হুঁ; জাপ্-এর ফ্যাক্টরিতে আমরা কুলি-মজুর কেরাণীর কাজ করিতেছি। আমাদের সুখী হওয়া উচিত ছিল !"

মার্কিণ—"কৃষিকার্য্য কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, বল দেখি ? ফলের চাষ, তুলার চাষ, বীটচিনি, তামাকু, রেশমের গুটিপোকা—"

উত্তর—"এ সব কি আমাদের ছিল না ? আমাদের দুই কোটি নর-নারীর অভাব-মোচন হইয়াও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানী হইত না কি ?"

মার্কিণ—"অবশ্যই কিছু হইত। কিন্তু উদ্যমশীল জাপ্-এর হাতে এ সমস্ত কতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, বল দেখি ? যে পাহাড়ের গাত্রে একটিও গাছ ছিল না, সেখানে লক্ষ লক্ষ বড় গাছ মাথা তুলিয়াছে—"

উত্তর—"হুঁ; আর যে দেশে লক্ষ লক্ষ নর-নারী সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-করণা করিতেছিল, সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া সহস্র সহস্র কর্ম্মক্ষম বলিষ্ঠ পুরুষ চীনে, মাঞ্চুরিয়ায়, সাইবিরিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; বলশেভিক রুশিয়ার সহিত যোগ দিয়া ভ্লাডিবোষ্টকের নিকটে পাঁচ ছয় শত জাপ্‌কে বন্দী করিয়াছে।"

মার্কিণ—"তোমাদের রাজা ও মন্ত্রিবর্গ যদি মানুষের মত হইতেন, যদি তাঁ'রা স্বদেশের কল্যাণকামনায় নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে এ সব ঘটিত না। জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাবান্ নানাগুণালঙ্কৃত রাজনীতিজ্ঞ মার্কুইস্ ইটোকে তোমাদের দেশ শাসন করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। তিনি সব দিক্ লক্ষ্য করিয়া সুশাসন করিতেছিলেন, ইহা সকলের মুখেই শুনিয়াছি। বোধ করি, তুমিও অস্বীকার করিবে না যে, তিনি কায়মনোবাক্যে তোমাদের মিত্র ছিলেন। কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি তোমাদের বৃদ্ধ সম্রাট তিন জন দূতকে হেগ্ শান্তি-সভায় পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে য়ুরোপ তোমাদের কথায় কান দেয়। কেহ কিন্তু তোমাদের অভয় দিল না। জাপ্ তোমাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিতে লাগিল। তোমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও তাহা ভাল লাগিল না। কোরিয়ার একমাত্র বন্ধু মার্কুইস্ ইটোকে কোন কাপুরুষ হত্যা করিল। ফলে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২২এ আগষ্ট তারিখে কোরিয়া রীতিমত জাপ্ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। তোমাদের কেহ কেহ মনে করিয়াছিল যে, জাপ্-দিগকে খুন করিলেই স্বাধীনতার পথ সরল ও সুগম হইবে। এখন বোধ হয়, তাঁহারা তাঁহাদের বিষম ভুল বুঝিতে পারিতেছেন।"

প্রিন্স ইটো।

উত্তর—"কিন্তু জাপান যে পথ অবলম্বন করিল, সেটা যে বক্র ও কুটিল, তাহা সে স্বীকার করুক আর না-ই করুক, বিদেশের [illegible]জকগণ জাপানের সরকারী কাগজ হইতেই তাহা প্রমা[illegible]রিতেছেন। তুমি যে সে-সব লেখা পড় নাই, তাহা বলিতে পার না। ইটোর মৃত্যুর পর, দুর্দ্দান্ত সৈনিক পুরুষ কাউণ্ট [illegible] আসিয়া পুলিসের ও সৈন্যের সাহায্যে

কোরিয়াবাসীদিগকে জাতিচ্যুত করিয়া জাপ্-এর এক অভিনব সংস্করণ করিবার চেষ্টা করিলেন। একটা কথা মনে রাখিও;—সে বিজেতা, আর আমরা পরাভব স্বীকার করিয়া তাহার অধীনে আসিয়াছি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। অথচ তাহারা আমাদের মাতৃভূমির নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিল। জাপ্ তোমাকে এইমাত্র বলিয়াছে যে, আমরা শনৈঃ শনৈঃ উন্নত হইতেছি! এক জন মার্কিণ পরিব্রাজক, মিঃ আলেকজাণ্ডার পাউয়েল্, সম্প্রতি আমাদের দেশ পর্য্যটন করিয়া কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই রাত্রির অন্ধকারে, এই সমুদ্রতীরে, তাঁহার ভাষায় তোমাকে শুনাইতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার মন্তব্যটা মোটামুটি শুন।—

জেনারেল টেরাউচি।

প্রথমতঃ,—আইনের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করা হইল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সমস্ত দেশের মধ্যে কুড়িখানি সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত; তন্মধ্যে ১৮টি জাপানী ভাষায়, একটি ইংরাজী ভাষায়, আর একটি আমাদের মাতৃভাষায়।

দ্বিতীয়তঃ,—বিদ্যালয়ে, আপিসে, আদালতে, জাপ্ ভাষার প্রাধান্য হইল। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলি ঐ ভাষায় মুদ্রিত করা হইল। শিক্ষকগণের অধিকাংশই জাপানী, অথবা জাপ্-ভাষাবিদ্ কোরিয়ান্। তাঁহারা যখন অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহাদের কোমরে তরবারি ঝুলিত। স্বদেশের ইতিহাস পড়ান একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যাহারা বিদেশে পড়িতেছিল, উহাদিগকে আর দেশে ফিরিতে দেওয়া হইল না। যদি কাহাকেও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও বিশেষ শাস্ত্রে পারদর্শিতালাভের জন্য পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইত, সে সহজে ইতিহাস, বার্ত্তাশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি অথবা আইন অধ্যয়ন করিতে পাইত না।

তৃতীয়তঃ,—কোনও ধর্ম্মসভায় পাঁচ জনের বেশী লোক উপস্থিত হইতে হইলে পুলিসের অনুমতি লওয়া প্রয়োজন। ‘এগোও এগোও খৃষ্টের সেনা’ গীতটি পুলিস বন্ধ করিয়া দিল; কারণ, ইহাতে সেনা অগ্রসর হওয়ার কথা আছে। এক জন পাদরী ছেলেদের ধূমপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য এক বক্তৃতা করেন; তজ্জন্য তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া আদালতে দাঁড় করান হইল। সরকারী উকিল বুঝাইলেন যে, সিগারেটের বিরুদ্ধে মতপ্রচার করা, অর্থাৎ গভর্মেণ্টের একটা একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কথা কহা, অর্থাৎ গভর্মেণ্টের ক্ষতি করা, অর্থাৎ গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া রাজদ্রোহ নয় ত কি?

চতুর্থতঃ,—অধিকাংশ জাপ্ সামাজিক আচরণে আমাদিগকে তাহাদের পায়ের তলার ধূলা অপেক্ষা অধিকতর নীচ মনে করিতে লাগিল।

পঞ্চমতঃ,—অধিকাংশ জমি কাড়িয়া লইয়া জাপ্দিগের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। মিঃ পাউয়েল বলেন,—‘যখন আমি শুনি, কোনও জাপানী বলিতেছে যে, তাহারা কোরিয়ার উপকারের জন্য তথায় প্রবেশ করিয়াছে, তখন ইংরাজদের রাজা প্রথম জর্জ্জএর একটা গল্প আমার মনে পড়ে। হ্যানোভর হইতে ইংলণ্ডে তিনি পদার্পণ করিয়া তাঁ'র নূতন প্রজাদিগকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষায় বলিলেন,—‘I am here for your own good—for all your goods.’

“এমনই করিয়া বছরের পর বছর অতিবাহিত হইল। শেষে আমাদের নেতৃবর্গ স্থির করিলেন, জাপানীর প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হইয়া তাঁহারা এমন একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে প্রজাবর্গের দিক্ হইতে কিছুমাত্র বলপ্রয়োগ বা লেশমাত্র রক্তপাত না হয়। আদেশ হইল যে, কাহারও প্রতি কোনও প্রকার জুলুম করা যেন না হয়; পুলিসের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইবে। অম্লানবদনে মার খাইতে হইবে, জেলে যাইতে হইবে, এমন কি, জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এক দিনে, একই সময়ে, সমস্ত গ্রামে, নগরে, দুই কোটি নর-নারী একেবারে জাপ্ সরকারের দিক্ হইতে মুখ

ফিরাইয়া দাঁড়াইবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সিংহাসনচ্যুত বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইল। মাসখানেক পরে, তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোক রাজধানী সাউল্ নগরীতে আগমন করিল। সমবেত দুই লক্ষ লোকের সম্মুখে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া তেত্রিশ জন নেতা স্বদেশের স্বাধীনতাবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া পুলিসকে টেলিফোনে খবর দিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহারা জেলে যাইতে প্রস্তুত। তাঁহারা ধৃত হইলে, কেহ পুলিসের প্রতি কিছুমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ করিল না।

"তখন ভার্সাইল্ সন্ধিপত্রে সহি করিবার জন্য জাপ্ প্রতিনিধি প্যারী নগরীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কোরিয়ার জাপ-কাহিনী প্রচারিত হইলে পাছে তাঁহার ক্ষতি হয়, এই জন্য জাপ্ গভর্মেণ্ট শাসন-ব্যবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন করিলেন। যথাসময়ে ভার্সাইল্-সন্ধি জাপ্ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২০এ আগষ্ট তারিখে জাপ্-সম্রাট তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন যে, বিদ্যালয়ে, শিল্পে ও রাজকার্য্যে কোরিয়াবাসীকে জাপানীর সমান অধিকার যেন দেওয়া হয়; আরও জানান হইল যে, কালক্রমে সমস্ত বিষয়ে আমাদিগকে জাপ্-এর সহিত সমান বিবেচনা করা হইবে।

"কিন্তু আমাদের জাতিগত নিগূঢ় শক্তি আমাদিগকে আমাদের গন্তব্য স্থানে এক দিন পৌছাইয়া দিবে। অনেক দিন তোমাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছি। এখন বুঝিয়াছি, ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ। তবে আমাদের দুঃখে তোমাদের সমবেদনা আছে, শুনিলে সুখী হইব।

"আর একটি কথা শুনিয়া রাখ। এটি আমাদের বড় সাধের, বড় আশার কথা। এক দিন হিমালয়ের পরপারে ভারতবর্ষের গৌতম বুদ্ধ ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া অহিংসা ধর্ম্ম প্রাচ্য জগৎকে শিখাইয়াছিলেন। আজ সেখানে আর এক জন মহাপুরুষ অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করিবার মহামন্ত্র সাধন করিয়া স্বরাজলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য কঠোর ধ্যানে বসিয়াছেন। তোমাদের ওয়াশিংটন জেনোয়া হেগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নাই। যিনি আমাদের সুপ্ত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করাইয়া শক্তি-উপাসকদিগের হাত হইতে মুক্তি দিবেন, তাঁহার বাণীর জন্য আমরা উন্মুখ হইয়া আছি।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

বিদায়াশ্রু।

বিধুমুখী সখি, এ কি এ কি দেখি
কপোলে গড়াল চোখের জল।
গলিল যে হিয়া কোথা গেল, প্রিয়া,
এত গরবের বুকের বল ?

বলেছিলে, সখি, বিদায়ের ক্ষণে
রহিবে অটল দেহে প্রাণে মনে,
হাসিমুখে হায় দানিবে বিদায়
এবে হেরি সব মুখের ছল।

বড় ছিল ভয় বিদায় সময়
শুষ্ক নয়ন হেরিতে হবে,
সারা পথ মম ধূ ধূ মরুসম
মৃগতৃষ্ণায় জ্বলিতে র'বে।

আহা, সখি, আঁখি মুছ না মুছ না,
প্রিয় শোচনার ও শুভ সূচনা
বয়ানে ঢেলেছে নয়ানে গলেছে
মধু মিলনের সুখের ফল।

শ্রীকালিদাস রায়

লণ্ডনের আলো ও অন্ধকার

ঐশ্বর্য্যের ও দারিদ্র্যের, প্রাচুর্য্যের ও অভাবের, ধর্ম্ম মন্দিরের ও পাপের অসামঞ্জস্য লণ্ডন সহরে যত অধিক, তত আমি আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। ভারতবর্ষের কথা না হয় না-ই ধরিলাম। বাগদাদে বা কায়রোয়, রোমে বা প্যারীতে—এমন অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু সৌধারণ্য লণ্ডনের বাহ্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার পাপ সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। লণ্ডনের রাজপথে জনস্রোতঃ নদীতে জলস্রোতেরই মত অবিরাম গতি; রাজপথ প্রশস্ত—মধ্যে মধ্যে মর্ম্মরের তোরণ—স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের মূর্ত্তি। পথের দুই পার্শ্বে সমুচ্চ সৌধ। কোন কোন রাজপথে সৌধের সৌন্দর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। যিনি ইংরাজকে দোকানদারের জাতি বলিয়াছিলেন, তিনি, বোধ হয়, জাতির রাজধানী দেখিয়াই সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এক একটা রাস্তায় কেবলই দোকান। আবার কোন কোন দোকানে নাই এমন জিনিষ নাই—জামাজুতা হইতে কাগজ কলম—এমন কি, ফুলফল পর্য্যন্ত একই দোকানের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে পাওয়া যায়; এমন কি, দোকানের মধ্যে ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত আছে। কাযেই সে সব দোকান দোকান না বলিয়া বাজার বলিলেই সঙ্গত হয়। সহরের যে সব পাড়ায় এই সব দোকান—সে সব পাড়া দেখিলে কেহ মনে করিতেও পারে না—লণ্ডনে দারিদ্র্য আছে।

লণ্ডনের শোভা সৌধ অপেক্ষাও বাড়িয়াছে—খোলা যায়গায়। এত বড় সহর—যে সহরে জমী কাঠা হিসাবে না বিকাইয়া ফুট হিসাবে বিকায়, সে সহরে লোক যে এত বড় বড় খোলা যায়গা রাখিয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। শুনা যায়, বুদ্ধের কোন ভক্ত তাঁহার জন্য জেতবন কিনিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলে সে সম্পত্তির অধিকারী বলিয়াছিলেন, যত স্বর্ণমুদ্রায় জেতবনের ভূমি আস্তৃত করা যায়, তিনি মূল্যস্বরূপ তত স্বর্ণমুদ্রা লইবেন। লণ্ডনের জমীর দাম সেইরূপ—সেই জন্যই আর দ্বিতল ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিলে খরচ পোষায় না—সপ্ততল অষ্টতল গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে—আবার একতল ভূমির নিম্নে থাকে। যে সহরে জমীর দাম এত অধিক, সে সহরে যাহারা স্বাস্থ্যের ও শোভার জন্য বড় বড় ফাঁকা যায়গা রাখে, তাহাদের প্রশংসা করিতে হয়।

সহরের সৌধারণ্যের মধ্যে খোলা যায়গার শ্যামশোভায় নয়ন তৃপ্ত হয়। জলের অভাব নাই—মেঘ ও বৃষ্টি যখন তখন দেখা যায়—কাযেই খোলা যায়গায় সুকোমল মরকতবর্ণ শষ্পাস্তরণ—মধ্যে মধ্যে বৃক্ষবীথি—বেড়াইবার ও অশ্বারোহণের পথ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কলিকাতায় সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য—ময়দান বা গড়ের মাঠ। আর আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সহরের স্থানে স্থানে যে কয়টি উদ্যানবেষ্টিত জলাশয় আছে, সে কয়টিও চিত্তাকর্ষক। লণ্ডনের বিরাট মাঠ হাইড পার্কেও জলাশয় আছে—তাহার নাম সার্পেণ্টাইন।

হাইড পার্কের উপরেই হাইড পার্ক হোটেলে আমাদের বাসা ছিল। হোটেলটি আমাদের মত সংবাদপত্রসেবকের পক্ষে অনধিগম্য—পাছে "গোলালোক" হোটেলে ভীড় করে, সেই জন্য হোটেলে বাসের ও আহার্য্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক ধার্য্য করা হইয়াছে। বিলাতী সরকার আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন আহারের হিসাবে প্রায় সাড়ে ২৮ টাকা ও বাসের হিসাবে প্রায় ২৫ টাকা দিতেন। পানের জন্য স্বতন্ত্র দিতে হয়। বাহিরে যে লিমনেড ৪ আনায় পাওয়া যায়, এ হোটেলে তাহার জন্য ১২ আনা দিতে হয়। আমি অবসর পাইলেই হাইড পার্কে বেড়াইতে যাইতাম। মাঠে ভেড়া চরিতেছে—যুদ্ধের সময় লোককে সবজী করিতে উৎসাহ দিবার জন্য এক স্থানে একটু সবজীবাগ করা হইয়াছে। দলে দলে লোক—হাসিতেছে, গল্প করিতেছে, বেড়াইতেছে, বেঞ্চে বা তৃণের উপর বসিতেছে। বহু নর-নারী বালক-বালিকা অশ্বপৃষ্ঠে ব্যায়াম করিতেছে। ঘোড়ায় চড়া ইংরাজ নর-নারীর অতি প্রিয় ব্যায়াম। লণ্ডনে ঘোড়া রাখা ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু অন্যদিকে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াও ইংরাজরা চড়িবার জন্য ঘোড়া রাখিয়া থাকেন। আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করা যে মানুষের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এবং ব্যাধি-মন্দির দেহ যে ভারমাত্র,তাহা তাহারা বিশেষরূপে বুঝে। কিন্তু ইংরাজদিগের মধ্যে প্রকৃত সুন্দরীর অভাব—বিশেষ তাহাদের বর্ণে ফরাসীদিগের শিল্পিসুলভ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাব লক্ষিত

হয়। অনেকের দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি নাই—চক্ষু যেন কাচে নির্ম্মিত; কাহারও কাহারও মুখে ভাবের অভাব। কেহ মেদাধিক্যে শ্রীহীন; কেহ বা অতিকৃশ। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে সময় সময় অশ্বপৃষ্ঠে দুই এক জন অসাধারণ সুন্দরী দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের বর্ণের কমনীয়তা ও দেহের লাবণ্য ফুলের কথা মনে করাইয়া দেয়, দৃষ্টিতে সাগরের গভীরতা ও রহস্য নিহিত; ব্যবহারে অনাবিল রমণীসুলভ ভাব—যেন পৃথিবীর কালিমা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, যেন তাহারা সেক্সপীয়রের নাটকের নায়িকা—কবির কল্পনা-রাজ্য হইতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে।

হাইড পার্ক [সার্পেন্টাইন]।

এই হাইড পার্কে নানারূপ সভাসমিতি হয়। খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজকরা পার্কে খৃষ্টের গুণকীর্ত্তন করেন এবং মানুষকে পাপপথ ত্যাগ করিয়া পুণ্যপথের পথিক হইতে সদুপদেশ দেন। এই পার্কে সমসাময়িক রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা-সভা হয়। সময় সময় মারামারিতে সভা শেষও হয়। আমাদের দেশে যে খৃষ্টান পাদরীরা কলিকাতার বাগানে এক এক স্থানে জমা হইয়া বক্তৃতা দেন, সে ঐ বিলাতী ব্যবস্থার অনুকরণে। সে বড় বেশী দিনের কথা নহে। জেনারল-বুথের "মুক্তিফৌজের" নরনারীরা যখন প্রথম গেরুয়া কাপড় ও লাল জামা পরিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসিয়া গান গাহিতেন—

"ঈশা মেশায়া মেরে পাঠায়া
মাৎ দেরী কোরো
মাৎ দেরী কোরো"

তখন চানাচুর-বিক্রেতা হইতে স্কুলের ছেলে পর্য্যন্ত সকলে বিস্মিত হইয়া ভীড় করিত। তাহার পর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় হইতে এইরূপ খোলা যায়গায় সভা করা সাধারণ হইয়া পড়ে। আর টাহলরাম গঙ্গারাম নামক এক জন যুবক সে বিষয়ে বাঙ্গালীর পথিপ্রদর্শক। হাইড পার্কে বক্তাকে শ্রোতৃবৃন্দের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়, কখনও বা অন্যরূপ লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হয়।

সন্ধ্যার পর হাইড পার্কে নানাজাতীয় লোক আসিয়া জুটে—তখন পুণ্য অপেক্ষা পাপের প্রভাব অধিক লক্ষিত হয়। এই পার্ক তরুণ-তরুণীর অভিসারক্ষেত্র হয় এবং অনেক রমণী আসিয়া প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া রাখে। পাপ অনেক সময় সঙ্কোচের আবরণ পর্য্যন্ত ফেলিয়া দেয়—লজ্জা লজ্জা পাইয়া পলায়ন করে।

হাইড পার্ক লণ্ডনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পার্ক। সহরে আরও অনেক পার্ক আছে এবং হাইড পার্ক সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, প্রায় সকল পার্ক সম্বন্ধেই তাহা বলা যায়। রিজেন্টস্ পার্ক অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পল্লীতে অবস্থিত। গাড়ীর চক্রঘর্ঘর শব্দ বা লোকের কোলাহল এই পার্কে শ্রুত হয় না। এ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে শারীরিক শ্রম প্রয়োজন; ঘণ্টায় দুই তিন বার বারিবর্ষণ হইতেছে—বাতাসে মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে—ঘাস আর্দ্র—বৃক্ষপত্র হইতে বৃষ্টির জল টপটপ করিয়া পড়িতেছে। যদি ঘরে বসিয়া থাকিতে হয়, তবে অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি জালিয়া রাখিতে হয়, নহিলে শরীর অসুস্থ হয়—"ভার ভার" বোধ হয়। কিন্তু

বাহিরে গেলে শরীর সুস্থ বোধ হয়—শ্রম করিতে ইচ্ছা হয়। তাই লোক বলে, ইংরাজ বালিকা সপ্তাহে যত পথ অতিক্রম করে, রোমান বালিকা বৎসরে তত পথ অতিক্রম করে না। বেড়াইলে বাহিরের হাওয়ায় ত্বকের বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

এই পার্কে বৃক্ষবাটিকায় নানাবর্ণের পরগাছায় ফুল ফুটিয়া আছে—ফুলের পাঁপড়িগুলি যেন বালকের মত কোমল ও মাংসল। তাহার মধ্যে তালজাতীয় বৃক্ষও রক্ষিত, এই সব বৃক্ষবাটিকায় রক্ষী নাই—অথচ কেহ দ্রব্যাদি অপহরণ করে না। ইহাতে জাতির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে। যাহা জাতির সম্পত্তি, সমগ্র জাতি তাহা আপনার মনে করিয়া সযত্নে রক্ষা করে।

এই পার্কের মধ্যে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের স্মৃতি-সৌধ—মেমোরিয়াল। একটি অনতিবৃহৎ উচ্চচূড় গৃহ—চারিদিক্ খোলা—মধ্যস্থলে প্রিন্সের মূর্ত্তি। নিম্নে চারি কোণে চারি মহাদেশের প্রতীক ক্ষোদিত। গৃহটি শিল্পের হিসাবে উৎকৃষ্ট বলা যায় না। সাম্রাজ্ঞী বৎসর বৎসর ইহাতে স্বর্ণলেপ (গিল্ড) দিবার জন্য টাকা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সৌধে স্বর্ণলেপ প্রাচীর রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীলাম্বরতলেই শোভা পায়—বিলাতের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন মেঘান্ধকার অম্বর-তলে তাহা ম্লান দেখায়—সে সৌন্দর্য্য শ্রীহীন বোধ হয়।

এই সব খোলা যায়গায় লণ্ডনের শোভার বিকাশ—আর লণ্ডনের পাপ, লণ্ডনের শ্রীহীনতা, লণ্ডনের মলিনতা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—দরিদ্রপল্লীতে—সে "ইষ্ট এণ্ড।" আমার প্রবীণ অধ্যাপক মিষ্টার পার্সিভ্যালের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে এক জনও যে সংবাদপত্রসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাতে তিনি আনন্দানুভব করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে উপদেশ দেন—" 'ইষ্ট এণ্ড' দেখিয়াছ—আবার দেখিও—ভাল করিয়া দেখিও। ইহাদের সমাজের দুষ্ট ক্ষত দেখিতে পাইবে—বুঝিতে পারিবে, সে ক্ষত কিরূপ দুষ্ট।" তাহাই বটে।

লণ্ডনের ভদ্রপল্লীতে বা ব্যবসাকেন্দ্রে রাস্তা কাঠ দিয়া বাঁধান - স্থানে স্থানে গলিগুলা পিচ দেওয়া। "ইষ্ট এণ্ডে" রাজপথ কেবল ইষ্টকাস্তৃত—এ দিকে গাড়ী বড় চলে না। আর সব রাস্তা পরিষ্কার—এ পল্লীতে রাস্তা অপরিষ্কার—আবর্জ্জনা রাস্তার উপর পড়িয়া আছে। বোধ হয়, লোকগুলার এমনই অভ্যাস যে, যখন তখন রাস্তায় আবর্জ্জনা ফেলিয়া যায়। বাস যান হইতে নামিয়া পল্লীর প্রবেশপথেই পাহারাওয়ালারা সাবধান করিয়া দেয়—"ঘড়া সাবধান—টাকার ব্যাগ সাবধান" (Take care of your watch, Sir. Take care of your purse, Sir) মোড়ে মোড়ে পাহারাওয়ালা এইরূপে সতর্ক করিয়া দেয়। কারণ, পদে পদে বিপদ—পুরুষ ও নারী সকলেরই বেশ মলিন—সকলেরই মুখে চক্ষুতে অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত ও লালসাপ্রবণতার ফল—বিকৃত ভাব। দেখিলে ভয় হয়। তাহাদের ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই। পুরুষরা অনায়াসে ঘড়ী বা ব্যাগ কাড়িয়া লইতে পারে—খুন করিতে পারে; জেলের ভয় তাহারা করে না। রমণীরা জীর্ণ ও ধূম-মলিন গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া মলিন বস্ত্রে ভিক্ষা চাহে—পুরুষদিগকে

রিজেন্টস পার্ক।

কি আবার অনুস্যূত হইবে না? ভারতবাসী কি তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর—তাহার সভ্যতার উপকরণে—তাহার উন্নতির সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া জগতে সেই বৈশিষ্ট্যই জয়যুক্ত করিতে পারিবে না? পারিবে—তাই আজ তাহার মনে আবার মুক্তিকামনা দেখা গিয়াছে—তাই দূরাগত বংশীরবের মত মধুর আগমনী সঙ্গীত শ্রুত হইতেছে—

"উঠ, মা, উঠ, মা, বাঁধ, মা, কুন্তল,
ঐ এল ঈশানী।"

দেশী ও বিলাতী

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক — "মশাই, খদ্দর পরেন না কেন?"

কালো 'সাহেব' — "বড্ড যে পুরু।"

স্বেচ্ছাসেবক — "কিন্তু গায়ের গরম কাপড় কি আরও পুরু নয়?"

কালো 'সাহেব' — "কি বোকা! এ যে বিলাতী।"

স্বেচ্ছাসেবক — "ওঃ! তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, আপনারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর সকলেরই ভক্ত।"

অদৃষ্ট-পরীক্ষা।
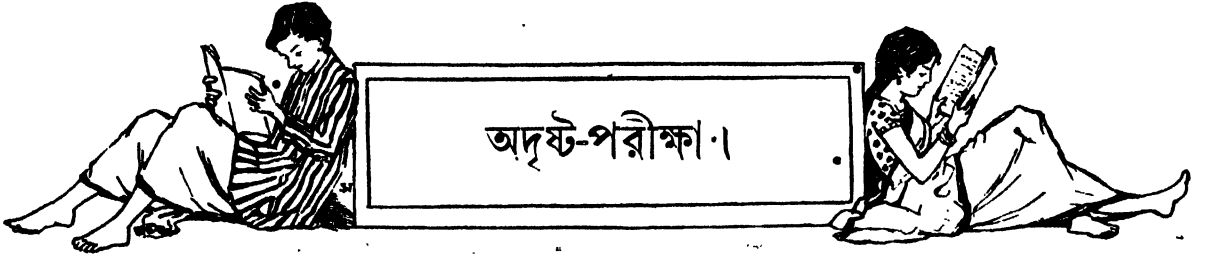
(গল্প)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার। বেলা ৭টার সময়, অন্তঃপুরে বসিয়া হেমন্ত বাবু চা-পান করিতেছিলেন, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, আপিসঘরে একটি বাবু দেখা করিবার জন্য অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। হেমন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মক্কেল ?" ভৃত্য বলিল, "বগলে ত কাগজপত্র কিছু দেখ্‌লাম না।"—"আচ্ছা, বস্‌তে বল্‌"—বলিয়া হেমন্ত বাবু চা-পানে রত হইলেন।

চা-পানান্তে, কিয়ৎকাল তামাকু-সেবন করিয়া, হেলিতে দুলিতে মন্থরপদে তিনি আপিসঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এক জন খর্ব্বকায় প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি বেঞ্চির উপর বসিয়া ছিলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুগ্মকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম।" হেমন্ত বাবু আশীর্ব্বাদ-সূচক হস্তসঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "দেওয়ানজী, কলকাতা থেকে কবে এলেন ? বাবু ভাল আছেন ত ? বসুন বসুন।"

উভয়ে উপবেশন করিলে আগন্তুক বাবুটি বলিলেন, "আজ্ঞে, আজ ভোরের ট্রেণেই এসে পৌচেছি। আবার আজই ফিরে যেতে হবে। বাবুজী একটা বিশেষ কাযে আপনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন।"

হেমন্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন,"স্বয়ং দেওয়ানজীকে পাঠিয়েছেন, কাযটা তা হলে গুরুতর বলুন !"

লোকটির নাম হরিহর দত্ত,—ইঁহার মনিব শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়,এই জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামের জমিদার। আসলে ইঁহারা জমিদার নহেন, বর্দ্ধমান রাজ-এষ্টেটের পত্তনীদার—কিন্তু লোকে জমিদার বলিয়া থাকে। আজ প্রায় বিশ বৎসর হইতে ইন্দ্রবাবু কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই বসবাস করিতেছেন।— ম্যালেরিয়ার ভয়ে জমিদারীতে আসা প্রায়ই ঘটে না।

হেমন্ত বাবু ইঁহার এষ্টেটের বাঁধা উকীল। শুধু উকীল নহেন,—বন্ধু। বাল্যকালে উভয়ে যখন একত্র স্কুলে পড়িতেন, সেই সময় হইতেই দুই জনে অকৃত্রিম প্রণয়। যৌবনেও সেই বান্ধবতা অব্যাহত ছিল। ওকালতীর প্রথম অবস্থায়, সেই দুঃখের দিনে, হেমন্ত কতবার ইন্দ্রবাবুর নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন। তাহার পর ইন্দ্রবাবু কলিকাতাবাসী হইলেন। তখন হইতে দেখা-সাক্ষাৎ কমিল। হেমন্ত বাবু এখনও কলিকাতা গেলে, মামলা-মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কোনও পরামর্শ না থাকিলেও, ইন্দ্রবাবুর বাটীতে গিয়া মাঝে মাঝে দুই এক ঘণ্টা যাপন করিয়া থাকেন।

দেওয়ানজী বলিলেন, "আপনি ত জানেনই, দেনাপত্রে আমরা এদানী বড়ই জড়ীভূত হয়ে পড়েছি। বাবুজী এতদিন খরচপত্র খুব দরাজ হাতেই করে এসেছেন। এষ্টেটের যা আয়, তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ কর্‌তেন। টাকাকে টাকা জ্ঞান কর্‌তেন না। আমি মাঝে মাঝে বুঝিয়েছি, কিন্তু চাকর মনিব সম্বন্ধ, বেশী কিছু বল্‌তেও পার্‌তাম না। ফলে —যা হবার তাই হয়েছে। মেরে কেটে বড় জোর লাখ দেড়েক টাকা ত আয় ; তাতে আর কত সয় বলুন ! দেনার জ্বালায়, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হবার যোগাড়। কিন্তু এইটুকু সুখের বিষয় যে, এত দিনে বাবুর সুবুদ্ধি হয়েছে। খরচপত্র একদম কমিয়ে দিয়েছেন। বাড়ীতে 'সাহেব'-ভোজন বন্ধ হয়েছে ; তিনখানা মোটর গাড়ী ছিল, তার দু'খানা বেচে ফেলেছেন ; বাড়ীতে রাণীমা'র, কুমারদের আটপৌরে ব্যবহারের জন্যে এখন মিলের কাপড় কেনা হচ্চে,—অধিক আর কি বল্‌বো,—নিজে এখন O. H. M. S. খাচ্চেন !"

শুনিয়া, হেমন্ত বাবুর মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "এ সব ত গেল ভূমিকা। আসল কথাটা কি ?"

দত্তমহাশয় বলিলেন, "বল্‌ছি। আসল কথার জন্যেই ত এসেছি। পাওনাদারেরা যোট বেঁধে এখন নালিশ করা সুরু করেছে। তিনটে ডিগ্রী হয়ে গেছে—এখনও টাকা দাখিল কর্‌তে পারা যায় নি। আরও গোটা চার পাঁচ মামলা ঝুল্‌ছে। এরা সব দোকানদার—বেশীর ভাগই 'সাহেব' দোকানদার।

কিছু হ্যাণ্ডনোটও আছে—কেউ কেউ উকীলের চিঠিও দিয়েছে। কিছুদিন হ'ল, এক জন ত বাড়ী বয়ে এসে, চাকর-বাকর কর্ম্মচারীদের সাম্‌নেই বাবুজীকে অপমান করে গেছে। সেই দিন বাবুজী প্রতিজ্ঞা করেছেন, 'এক শালার এক পয়সাও আর বাকী রাখ্‌বো না—সমস্ত মিটিয়ে দেব—তাতে যদি আমার সমস্ত এষ্টেট বিক্রী করতে হয়, সো ভি আচ্ছা'।"

হেমন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেনার পরিমাণ সবশুদ্ধ কত হবে?"

"আমরা হিসেব করে দেখেছি, এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা হলেই সমস্ত দেনা মিটে যায়—কারু এক পয়সাও আর বাকী থাকে না। সেই টাকাটার এখন প্রয়োজন। টাকাটা তোল্‌বার জন্যে, বাবুজী স্থির করেছেন, তাঁর জমিদারীর দুই একটা মহাল বিক্রী করে ফেল্‌বেন।"

হেমন্ত বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "একেবারে বিক্রী করে ফেল্‌বেন? তার চেয়ে বন্ধক রেখে—"

"আমরাও সেই পরামর্শই বাবুজীকে দিয়েছিলাম। আগে আগে কোন পাওনাদার এ রকম নালিশ টালিশ করে ব্যতিব্যস্ত কর্‌লে, আমরা অন্য কোথাও থেকে টাকাটা ধার করে এনে সেটা মেটাতাম। কিন্তু বাবুজী সে দিন ঐ রকম অপমানিত হওয়ার পর, পৈতে ছুঁয়ে শপথ করেছেন, ধার আর তিনি কর্‌বেন না—তাতে যদি ছেলেপিলে নিয়ে উপবাস কর্‌তে হয়, সো ভি আচ্ছা। সুতরাং, কিছু সম্পত্তি বিক্রী করা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।"

হেমন্ত বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে বলিলেন, "খদ্দের কেউ ঠিক হয়েছে?"

"আজ্ঞে না। কল্‌কাতার ধনীরা, পাড়াগাঁয়ের জমিদারী বড় কিন্‌তে চায় না। চাইলেও, দর অসম্ভব কম বলে। বাবুজী এই কাযটির জন্যে আপনার উপরেই ভার দিতে চান। এ জেলায় আপনার ত অনেক বড় বড় মক্কেল আছে—কোথাও যদি—"

হেমন্ত বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "খদ্দের—অবশ্য—আমি ঠিক করে দিতে পারি। কিন্তু, এটা যে বড়ই দুঃখের বিষয় হ'ল, দেওয়ানজী!"

দেওয়ানজী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, সে ত বটেই! কিন্তু উপায় কি? বছরে সাত আট হাজার টাকা—হয় ত আরও বেশী—আয় কমে যাবে। কিন্তু আবার এও ভাবি, শরীরের যে অঙ্গে একটা দুষ্ট ক্ষত হয়েছে, সে অঙ্গটা কেটে ফেলে, বাকী দেহটা যদি সুস্থ নিরাময় হয়, প্রাণটা যদি বাঁচে,—তবে সেই কি একটা কম লাভ? দুই একটা মহাল গিয়ে, বাকী সম্পত্তিটি যদি বজায় থাক্‌বার উপায় হয়—এই ঘটনা থেকে বাবুজী যদি স্থায়িভাবে নিজেকে সংশোধন কর্‌তে পারেন,—তা'হলে দুঃখ কর্‌বার কিছু নেই।"

হেমন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ কোন্ মহাল বিক্রী হবে, কিছু স্থির হয়েছে কি?"

"না, স্থির এখনও কিছু হয় নি। যে কিন্‌বে, তার সুবিধার উপর কতকটা নির্ভর কর্‌ছে ত! এই একটা লিষ্টি আমি এনেছি।"—বলিয়া দেওয়ানজী তাঁহার পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া উকীল বাবুর হাতে দিলেন। অতঃপর দুই জনে, মহালগুলির সম্ভাবিত মূল্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

বেলা দশটা বাজিলে দেওয়ানজী উঠিলেন। হেমন্ত তাঁহাকে সান্ধ্যভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারান্তে হেমন্ত বাবুর গাড়ী তাঁহাকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিবে; তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, আপিস-কক্ষে বসিয়া তামাকু-সেবন করিতে করিতে জন দুই মক্কেল বিদায় করিয়া, রবিবাসরিক দিবানিদ্রার জন্য হেমন্ত বাবু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে টেবলের উপরকার বহি কাগজগুলা সাজাইয়া রাখিতেছেন। কমলিনী এখন আর সেই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ক্ষীণকায়া যুবতী নাই। অবয়বে প্রৌঢ়া জননীর লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে। দেহখানি, বড় উকীলের গৃহিণীর যেরূপ স্থূল হওয়া উচিত,—সেইরূপই হইয়াছে। হেমন্ত পালঙ্কে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খাওয়া হল?"

"হ্যাঁ, এই কতক্ষণ খেয়ে উঠলাম"—বলিয়া গৃহিণী স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, "বস তবে। যতক্ষণ ঘুম না আসে, একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্।"

আদালত খোলা থাকিলে, পশারওয়ালা উকীলগণের পত্নীরা, ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন ভিন্ন স্বামীর সহিত বিশ্রম্ভালাপের আর বড় সুযোগ পান না। প্রাতে কাক ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপিসগৃহে মক্কেলের আবির্ভাব; বেলা দশটা বাজিলে অন্দরে আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া বাবুর আদালত-যাত্রা; আদালত হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যাকালে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর আবার মক্কেলের উপদ্রব—তাহাদের 'বয়ান' শুনিতে শুনিতে ও কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে বাবুর রাত্রি দশটা বাজিয়া যায়—এগারোটাও বাজে; তাহার পর অন্তঃপুরে আসিয়া ঠাণ্ডা লুচি ভোজনের পর শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে শয্যালিঙ্গন—দাম্পত্য আলাপের একান্ত সময়াভাব।

পুত্র, কন্যা, জামাতা প্রভৃতির প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার পর গৃহিণী বলিলেন, "আজ সকালে নরেন্দ্রপুরের দেওয়ান এসেছিল, ওঁদের জমিদারী নাকি কিছু বিক্রী হবে?"

"হ্যাঁ। তুমি কোথায় শুন্‌লে?"

গৃহিণী একটু হাসিয়া, মাকড়ি দুলাইয়া বলিলেন, "আমার কি চর নেই? ঘরে বসে বসেই আমি অনেক খবর রাখি গো! কত টাকায় বিক্রী হবে?"

"লাখ্ টাকার উপর। এক লাখ বিশ হাজারের কম নয়। কেন, কিন্‌বে না কি? কেনো ত কওলা মুসাবিদা বাবদ আমার ফীজের টাকা এই বেলা কিছু বায়না দাও।"—বলিয়া হেমন্ত হাসিলেন।

গৃহিণী এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, নির্জ্জন দেখিয়া 'এই নাও' বলিয়া একটি পাণ স্বামীর মুখে গুঁজিয়া দিলেন।

দাম্পত্য-লীলা শেষ হইলে গৃহিণী বলিলেন, "দেখ, ঐ জমিদারীর আমাদের কিছু কিনে নিলে হয় না? আমার অনেক দিনের সাধ, কিছু জমিদারী সম্পত্তি আমাদের হয়। ছেলেরা বড় হয়ে উঠ্‌লো, ওরা বেঁচে থাক্, সকলেই যে বেশী লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার ক’র্‌তে পারবে, এমন ভরসা কি? কিছু ভূসম্পত্তি থাক্‌লে খাওয়া-পরার ভাবনাটা থাক্‌বে না।"

হেমন্ত গড়্‌গড়ার নল মুখ হইতে খুলিয়া বলিলেন, "সে ত সব বুঝি। কিন্তু অত টাকা কোথা পাব? এতদিন যা রোজগার কর্‌লাম, মেয়েদের বিয়ে দিতে আর এই বাড়ীখানি কর্‌তেই ত গেল। খানকতক কাগজ যা আছে, তা'তে কি আর জমিদারী খরিদ হয়?"—বলিয়া হেমন্ত বাবু গড়্‌গড়া টানিতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "কেন, ব্যাঙ্কে আমাদের যে লাখ টাকা জমা রয়েছে, সেই টাকা, আর ঘরে যে কাগজ আছে, তাতে ত হয়ে যায়।"

হেমন্ত স্ত্রীর মুখ পানে চাহিলেন।

কমলিনী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "দেখ, ও টাকা ভগবান্ তোমাকে দিয়েছেন, ও তোমারই টাকা। নইলে আজ পঁচিশ বছর কেউ কি তার খোঁজ করত না? ও টাকা স্বচ্ছন্দে তুমি নিজের ব'লে মনে কর্‌তে পার, তাতে কিচ্ছু অন্যায় হবে না।"

হেমন্ত বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু—মা যে ব'লে গেছেন, ও টাকা রেখে দিতে,—যার টাকা, সে যদি কোনও কালে উপস্থিত হয় ত তাকে দিতে।"

গৃহিণী বলিলেন, "মা বলেছিলেন, তাঁর আজ্ঞা পঁচিশ বছর তুমি ত প্রতিপালন কর্‌লে! যখের ধন ত নয় যে, চিরজীবন ঐ টাকা তোমায় আগ্‌লে ব'সে থাক্‌তে হবে?"

হেমন্ত বাবু নীরবে গড়্‌গড়া টানিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "কিন্তু ধর, কেউ যদি এসে টাকাটা দাবী করে।"

গৃহিণী বলিলেন, "শুধু দাবী কর্‌লেই ত হবে না। ভাল রকম প্রমাণ ত চাই। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আইনকানুনের কিছুই বুঝিনে, কিন্তু তোমাদের মুখেই ত শুনি যে, দিন যত যায়, কোন বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া ততই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এক আধ বচ্ছর নয়, পঁচিশ পঁচিশ বচ্ছর কেটে গেছে!"

"তা ঠিক।"—বলিয়া হেমন্ত গড়্‌গড়ার নল ফেলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। গৃহিণী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া, তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে, হেমন্ত মুদিত-নয়নে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! এক লক্ষ টাকা যার হারিয়ে গেল, পঁচিশ বৎসরকাল সে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত কর্‌লে না!—এ রকম আশ্চর্য্য ঘটনা আমি ত কখনও শুনিও নি।"

গৃহিণী বলিলেন, "ও কি? তুমি এখনও ঘুমোও নি বুঝি? আমি ভেবেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছ।"

হেমন্ত উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "ঘুমের পথ কি আর তুমি রেখেছ, গিন্নি!"

"কেন, আমি কি কর্‌লাম?"

"মাথায় প্রলোভনের আগুন জ্বেলে দিয়েছ যে!"

গৃহিণী একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "অন্যায় ত আমি কিছু বলিনি। আমার কি দোষ ?"

হেমন্ত হাসিয়া বলিলেন, "তোমার দোষ কিছু না। বাইবেলের গল্প শোন নি ? সর্পরূপী শয়তান ইডেন্ বাগানে এসে, বহু কষ্টে, মানব-মাতা ঈভ্‌কে নিষিদ্ধ ফলটি খাইয়েছিল। তার পর ঈভ্ কিন্তু অতি সহজেই, আদমকে সেই ফল খেতে রাজী করেছিলেন। সেই ঈভের বংশেই তোমার জন্ম ত !"

গৃহিণী বলিলেন, "পোড়া কপাল আর কি ! আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, ঈভের বংশে আমার জন্ম হতে যাবে কেন ? তুমি শোও, ঘুমোও।"

হেমন্ত বলিলেন, "সে হবে এখন ; লোহার সিন্দুক খুলে ব্যাঙ্কের বইখানা বের করে আন ত।"

গৃহিণী বই আনিয়া দিলেন। হেমন্ত বাবু চশমা চোখে দিয়া দেখিলেন, কয়েকদিন হইল, সেই লক্ষ টাকার শেষ ডিপজিটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে ; পুনরায় ডিপজিটের পত্র লেখা হয় নাই- অর্থাৎ টাকাটা যেদিন খুসী তুলিয়া লওয়া যায়।

ব্যাঙ্কের বহি সিন্ধুকে ফেরৎ পাঠাইয়া হেমন্ত বাবু আবার শয়ন করিলেন। কিন্তু ঘুম আসিল না, বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "কি করি ? দারিদ্র্যের অবস্থায় যে প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলাম, এখন স্বচ্ছলতায় সেই প্রলোভনের হাতে আত্ম-সমর্পণ করব কি ?"

এইরূপ নানা চিন্তায় বেলা তিনটা অবধি কাটিল। হেমন্ত বাবু তখন উঠিয়া, আপিস-কক্ষে গিয়া দেওয়ানজী-প্রদত্ত সেই বিক্রের গ্রামগুলির তালিকাখানি দেরাজ হইতে বাহির করিলেন। প্রত্যেক গ্রামের হস্তবুদ জমা, আগ্রামী খরচা, বর্দ্ধমানরাজকে দেয় বাৎসরিক খাজনা, মুনাফা প্রভৃতি তাহাতে লেখা আছে। বর্দ্ধমান জেলার সার্ভে ম্যাপ দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল, তিনি তাহাতে বিভিন্ন গ্রামগুলির অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাকালে দেওয়ানজী পুনরাগত হইলে, হেমন্ত বাবু তাঁহাকে বলিলেন, "দেখুন, খদ্দের আর কোথায় খুঁজে বেড়াব ? আমি নিজেই কিনে নেবো মনে করছি। (তালিকা বাহির করিয়া) এই বাঁশডাঙ্গা আর খাসবেড়িয়া গ্রাম দু'খানি লাগাও আছে—এই দু'খানি, যদি এক লাখ বিশ হাজারে আপনারা দেন ত আমি কিনে নিতে রাজী আছি।"

এত শীঘ্র খরিদ্দার স্থির হইবে, দেওয়ানজী তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। একটু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "সব টাকাটা—কিন্তু নগদ চাই। কেন না—"

হেমন্ত বাবু বলিলেন, "সে জন্যে চিন্তা নেই। সব টাকাটা এক সঙ্গেই দেবো।"

দেওয়ানজী বিস্মিত-নয়নে হেমন্ত বাবুর পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রথম প্রথম সেই দুই টাকা ফীজের অবস্থা হইতেই উকীল বাবুকে তিনি দেখিয়া আসিতেছেন ; বৎসরের পর বৎসর অল্পে অল্পে কেমন করিয়া পশার বাড়িয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাও তিনি জানেন ; কিন্তু এক সঙ্গে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিবার ক্ষমতা যে ইঁহার হইয়াছে, এটা দেওয়ানজীর জানা ছিল না।

পক্ষকাল পরে গৃহিণীর আশা পূর্ণ হইল। হেমন্ত বাবু জমিদার হইলেন—বাঁশডাঙ্গা ও খাসবেড়িয়া গ্রামদ্বয়ের মালিক হইলেন। এই উভয় গ্রামে অনেক ঘর গোয়ালার বাস। অল্প মূল্যে খাঁটি গব্যঘৃত, ক্ষীর, ছানা, দধি সেখান হইতে আসিতে লাগিল—গৃহিণীর স্থূলদেহ স্থূলতর হইয়া উঠিল।

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে। এক দিন প্রাতে হেমন্ত বাবু হঠাৎ টেলিগ্রাম পাইলেন, কলিকাতায় তাঁহার বন্ধু ও মক্কেল ইন্দ্রভূষণ বাবু মৃত্যুশয্যায় শায়িত ; হেমন্ত বাবুর সহিত তিনি অন্তিম-সাক্ষাৎ কামনা করেন।

হাতের মোকর্দ্দমাগুলির কাগজপত্র জুনিয়র উকীল বাবুকে বুঝাইয়া দিয়া, আহারান্তে সেই দিনই হেমন্ত বাবু কলিকাতাযাত্রা করিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সৌধকিরীটিনী জেনোয়া

জেনোয়া বন্দরের দৃশ্য

সমগ্র সভ্যজগতের দৃষ্টি এখন জেনোয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সৌধকিরীটিনী নগরীতে য়ুরোপের ভাগ্য পরীক্ষিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিকগণ য়ুরোপীয় সমস্যা-সমাধানের জন্য এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরীতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

পৃথিবীতে যত দেশ আছে, তন্মধ্যে ইটালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য স্বপ্রকাশ। ইংরাজীভাষায় একটি চলিত কথা আছে যে, খাস লণ্ডনবাসীর পক্ষে জগৎটা দুই ভাগে বিভক্ত—লণ্ডন নগরী, আর পৃথিবীর অন্যান্য অংশ। খাস লণ্ডনের কোনও বাসন্দা যদি লণ্ডন ছাড়িয়া ম্যাঞ্চেষ্টার, ডর্ব্বান্, বোম্বাই অথবা ব্রাইটন্ প্রভৃতি অন্য কোনও নগরে গমন করেন, তাঁহার মনে হইবে, তিনি রাজধানী ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক আব-হাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। ফ্রান্স সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

কিন্তু এ বিষয়ে ইটালীরই বৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণ। ইটালীর প্রত্যেক প্রসিদ্ধ নগর আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। প্রত্যেক নগরের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। রোম, ফ্লোরেন্স, মিলান, ভিনিস্, জেনোয়া প্রত্যেক নগরীরই স্বতন্ত্র ইতিহাস, স্বতন্ত্র জনশ্রুতি, স্বতন্ত্র সভ্যতা, শিল্পসাহিত্য এবং জাতীয় বিশিষ্টতা আছে। এমন আর কোনও দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাজা চতুর্দ্দশ লুই প্যারী নগরীতেই সমগ্র ফরাসীদেশকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র ইটালী রোমে কেন্দ্রীভূত হয় নাই। রোম হইতে ফ্লোরেন্সের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

রোমনগরী বহু পুরাতন। ইহার আঁকাবাঁকা রাজপথের উপর দিয়া মহাশব্দে ট্রামগাড়ী অবিশ্রান্ত চলিতেছে। প্রাচীন সভ্যতাগর্ব্বদীপ্ত নাগরিকগণকে দেখিলেই যেন মনে হয়, তাহারা পরিশ্রান্ত অথচ চঞ্চল।

ফ্লোরেন্স প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে লোকবিমোহিনী। এখানকার রাজপথসমূহ কোলাহলবর্জ্জিত, শান্তি-স্নিগ্ধ। জনসাধারণের প্রকৃতি মধুর ও কোমল; তস্কানরা এখনও পঞ্চদশ শতাব্দীর নাগরিকগণের ন্যায় ললিতকলার বিশেষ অনুরাগী।

ভিনিসীয়গণ ইদানীং ভোগী ও কিছু অসংযতচরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী যে সকল মহানগরীর অতীত কীর্ত্তি আছে, তত্রত্য জনসাধারণ কি প্রায়ই এমন অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে?

মিলান অতি বৃহৎ নগর। নগরের সর্ব্বত্র পরিচ্ছন্নতা বিদ্যমান, আধুনিক ভাবে নগরটি গঠিত। শ্রমশিল্পের উন্নতি

ও বিস্তারহেতু মিলানের রাজপথগুলি সুবিন্যস্ত। অধিবাসীরা পরিশ্রমী, উদারনীতিক ও যুক্তিমার্গগামী। মিলানের অপেরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

জেনোয়ার অধিবাসিগণ বণিকবৃত্তিপরায়ণ এবং সমুদ্রের একান্ত ভক্ত। এমন সমুদ্রপ্রিয় জাতি বোধ হয় আর নাই। খৃষ্টজন্মের চারি শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই জেনোয়ার বন্দর সুপ্রসিদ্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য জেনোয়াবাসীর একটা বিশেষ খ্যাতি আছে। ক্রুসেড্ বা ধর্ম্মযুদ্ধের যুগে জেনোয়া একটি প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানেই সমুদ্রগামী অর্ণবপোতসমূহ সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হয়। প্রাচ্যজগতের প্রতীক উপাসনার বিরুদ্ধে বীরগণ এই জেনোয়াবন্দর হইতেই সমরাভিযান করেন। ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে জেনোয়া ভূমধ্যসাগরে আধিপত্যলাভের জন্য ভিনিসের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বিজয়মাল্য ভিনিসের গলদেশেই বিলম্বিত হইয়াছিল। জেনোয়া সে প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

প্যালাৎজো বলবি (সোপান)

প্রাচীনযুগে দক্ষিণ-রুশিয়া, সিরিয়া, সাইপ্রেস, মরক্কো এবং কনস্তান্তিনোপলে জেনোয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জেনোয়াবাসিগণ ললিতকলায় পারদর্শী নহে। বিশ্ববিশ্রুত ইটালীয় ললিতকলার ভাণ্ডারে জেনোয়ার দান নিতান্তই তুচ্ছ। কোনও একটা বিশিষ্ট কলা-শিল্প জেনোয়াতে নাই, কখনও ছিল না। কোনও চিত্র-শিল্পী অথবা ভাস্কর কেহই জেনোয়াতে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যেই জেনোয়াবাসিগণ সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে।
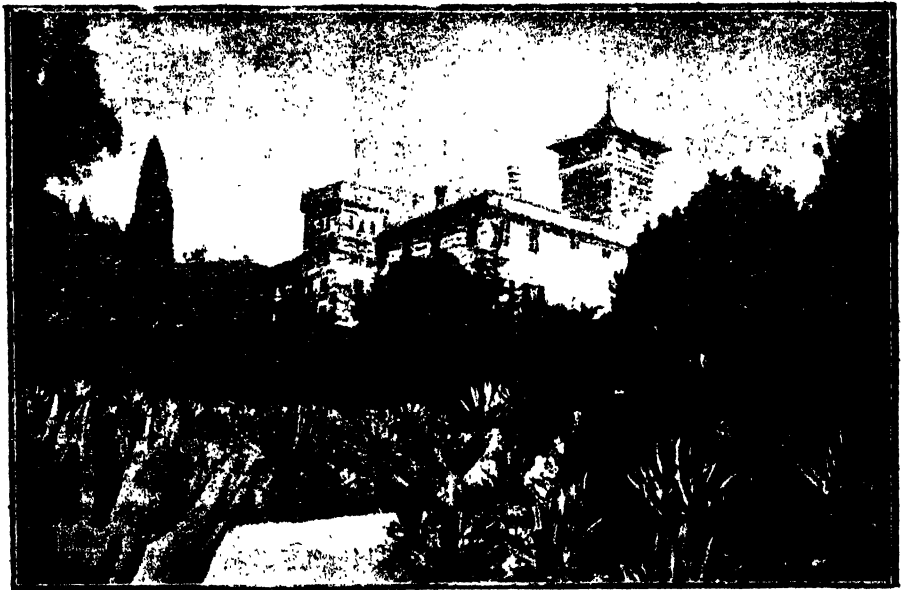
লর্ড কার্জ্জের বাসগৃহ।

জেনোয়া সত্যই সৌধকিরীটিনী। প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাসমূহের জন্য এই নগরীর বিশেষ খ্যাতি আছে। কিন্তু

তত্রত্য রাজপথসমূহের ব্যবস্থা ভাল নহে। নগরের সম্মুখ-ভাগে প্রসারিত সমুদ্র, অন্যান্য অংশ শৈলমালায় পরিবেষ্টিত। নগরের পুরাতন অংশ, পূর্ব্বতন বন্দরের পশ্চাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারভাবে অবস্থিত। ধূমধূলি-মলিন অসংখ্য চিম্‌নি ও মাস্তুল-কণ্টকাকীর্ণ হইয়া বন্দরটি শোভা পাইতেছে। নগরের আধুনিক অংশ, দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত; পূর্ব্বপ্রান্ত শৈলশ্রেণী-পরিবেষ্টিত।

নগরের পুরাতন অংশের রাজপথগুলি অসমতল, উচ্চনীচ, সঙ্কীর্ণ, বক্র এবং সোপানাবলীবিশিষ্ট। পথগুলি কোথা হইতে কোন্ অতলে নামিয়া আবার কোথায় গিয়া উঠিয়াছে, সহজে তাহা অবধারণ করা যায় না। নম্বর দেখিয়া এই বিচিত্র অংশের কোনও বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা স্থানীয় লোক ব্যতীত বিদেশীয়ের সাধ্যায়ত্ত নহে। নগরের এই অংশের মধ্য দিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটি-মাত্র সোজা রাস্তা আছে। এই পথের নাম "ভিয়া বল্‌বি।" কিন্তু যেখানে অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, নগরের সেই অংশে পথটি আসিয়া "পিয়াজা দে ফেরারি"র সঙ্গে মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে। ক্রমে পথটি "পিয়াজা আনন্‌জিয়াতায়" গিয়া আবার মিশিয়া গিয়াছে। ট্রামগাড়ী "পিয়াজা কর্‌-ডেটো" পর্য্যন্ত থাকায় পথিককে অসুবিধায় পড়িতে হয় না; নহিলে নবাগতের পক্ষে পদব্রজে পথ চিনিয়া যাওয়া একান্তই অসম্ভব। বিশাল "ভিয়া রোমা" হইতে "পিয়াজা দে ফেরারি" পর্য্যন্ত ট্রামের পথ আছে। এইখানে রঙ্গালয়, ডাকঘর, ডিউকের প্রাসাদ প্রভৃতি অবস্থিত।

প্যালাজো স্তান ভিয়া ডিও।

রাত্রিকালে "পিয়াজা" শত শত উজ্জ্বল আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কাফিখানা, হোটেল প্রভৃতিতে আনন্দের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে।

নগরের আধুনিক অংশের রাজপথগুলি অপেক্ষাকৃত

ভাল। এই অংশে আসিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, নগরটিকে সুগঠিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু রেলষ্টেশনটি নগরের উত্তর-পশ্চিমভাগে অবস্থিত বলিয়া প্রথমেই জেনোয়ার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। প্রথম দৃষ্টিপাতে মনোহারিণী জেনোয়ার সুন্দর দৃশ্যগুলি নয়নপথে পতিত হয় না। যদি ট্রামের পরিবর্ত্তে কেহ পদব্রজে "ভিয়া গ্যারিবল্ডি" অবলম্বন করিয়া নগরের দিকে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে জেনোয়ার সৌন্দর্য্যের কিছু কিছু তিনি উপভোগ করিতে পারিবেন। কারণ, এই পথের ধারেই জেনোয়ার বণিকরাজগণের বিচিত্র সৌধমালা অবস্থিত। পাশাপাশি অনূন দ্বাদশটি সুবৃহৎ অট্টালিকা পথিকের দৃষ্টিগোচর হইবে। প্রাসাদগুলি যেমন বৃহৎ, তেমনই সুদৃশ্য। কেহ কেহ বলেন, মাইকেল এঞ্জেলোর শিষ্য গ্যালিয়াজো এলেলি নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ভাস্কর ঐ প্রাসাদগুলির অধিকাংশ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, বার্টলোমি উবিয়ান্‌কাই অনেকগুলি হর্ম্ম্যের নির্ম্মাতা। অল্প পরিসরের মধ্যে প্রাসাদগুলি নির্ম্মিত হওয়ায় ভাস্করের নির্ম্মাণকৌশল বেশ বুঝিতে পারা যায়। কোন কোন প্রাসাদের সোপানাবলী ও প্রবেশ-প্রাঙ্গণের সৌষ্ঠব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

জেনোয়ার সুবৃহৎ প্রাসাদ "প্যালাজো ডোরিয়া" কিন্তু "ভিয়া গ্যারিবল্ডি" পথের ধারে অবস্থিত নহে। উহা রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চাতে বিদ্যমান। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "প্যালাজো ডেল্ য়ুনিভার্সিটা" নামক সুবৃহৎ অট্টালিকাটি "ভিয়া বলবি"'র ধারেই নির্ম্মিত। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে বার্টলোমিউ বিয়ান্‌কা উহা নির্ম্মাণ করেন। প্রাসাদে প্রবেশমাত্রেই যে প্রাঙ্গণটি দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহার সৌন্দর্য্য যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই নাটকীয় ভাবপূর্ণ। সম্মুখবর্ত্তী সোপানাবলীর উভয়পার্শ্বে দুইটি সিংহমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। আবার কিছু দূরে যাইবার পর পুনরায় আর একপ্রস্থ মনোহর সোপানাবলী।

এই অট্টালিকার বিপরীত দিকে "রাজকীয় প্রাসাদ।" ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে লম্বার্ডির প্রসিদ্ধ ভাস্কর ক্যান্‌টোন্ ও ফ্যান্‌কোন্ উহা নির্ম্মাণ করেন। উহার সোপানাবলী ও অলিন্দ অতি চমৎকার। উপরতলের কক্ষ হইতে বন্দরের বিচিত্র শোভা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সৌধমালা ছাড়া জেনোয়ার আর একটি স্থান দর্শনীয় আছে। তত্রত্য সমাধিক্ষেত্র অতি চমৎকার। পর্য্যটকগণ কোনও নগরে গিয়া সাধ করিয়া অবশ্য সমাধিক্ষেত্র দেখিতে যায়েন না। জেনোয়ার সমাধিক্ষেত্র সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। জেনোয়াবাসিগণের শিল্পকলা বা বিদ্যার্জ্জনের জন্য যতটা আগ্রহ না আছে, হাঁসপাতাল, সমাধিক্ষেত্র অথবা দয়ামমতা-জ্ঞাপক অনুষ্ঠানের জন্য তদধিক আগ্রহ আছে। এ সকল কার্য্যে তাহারা মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। নগরের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে প্রায় দেড় মাইল দূরে, শৈলসমাকীর্ণ স্থানে সমাধিক্ষেত্র—"ক্যাম্পো স্যান্টো" অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। স্থানটি অসমতল। সোপান বাহিয়া কিয়দ্দূর উঠিতে হয়। খানিকটা সমতল স্থান আছে বটে, কিন্তু ক্রমেই তাহা ঢালু হইয়া গিয়াছে। সমাধি-ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে গম্বুজ-বিশিষ্ট একটা গোলাকার স্তম্ভ। কতিপয় স্মৃতিস্তম্ভে ভাস্কর-শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

নানা দেশের সমবেত প্রতিনিধিবর্গ।

বেকার লোকের সংখ্যা।

নিউ সাউথ ওয়েল্‌স উপনিবেশে ৪০,০০০ বেকার লোক আছে। অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য উপনিবেশে বেকার লোকের সংখ্যাও প্রায় ঐরূপ; কোথাও কিছু কম, কোথাও কিছু বেশী। গ্রেট বৃটেনে ঐ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ১,৭৫০,০০০ এবং আমেরিকায় ৬,০০০,০০০ বেকারের বাস।

—

ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন।

ইংলণ্ডের সাফোক কৌণ্টীর হার্ডউইক নগরের মিষ্টার টমাস কোরী মিলনার কালাম নামে জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি আজীবন বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বেরি সেণ্ট এডমাণ্ডস্ (Bury St. Edmunds) নগরের মেয়র হইয়াছিলেন। সম্প্রতি মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সংগৃহীত নিম্ন-বর্ণিত স্মৃতি-চিহ্নগুলি উক্ত নগরকে উইলে উপহার দিয়া গিয়াছেন :— ডিউক অব ওয়েলিংটন ও আইজাক নিউটনের মস্তকের কেশগুচ্ছপূর্ণ তিনটি লকেট। সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের কেশগুচ্ছ একখানি ফ্রেমে বাঁধান। (সম্রাট যে একখানি ছুরী ব্যবহার করিতেন, তাহাও তিনি ঐ সঙ্গে দিয়াছেন।) প্রিন্স চার্লস ষ্টুয়ার্টের সংগৃহীত অনেকগুলি তরবারি, ভোজালী, পুরাতন ওয়েষ্টকোট, বিনামা, জলপাত্র ইত্যাদি। টমাস বফোর্ট, ডিউক অফ এক্সিটারের মস্তকের কেশগুচ্ছ। রিচার্ড প্লাণ্টাজিনেট, ডিউক অফ ইয়র্কের হস্তলিপি।

কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের জন্য তিনি প্রখ্যাতনাম্নী উপন্যাস-রচয়িত্রী সার্লট ব্রণ্টের (Charlotte Bronte) কেশগুচ্ছ, মাদাম দে পম্পাডুরের (Madame de Pompadour) হস্ত-লিপি এবং অন্যান্য বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির চিত্তাকর্ষক স্মৃতিচিহ্ন দিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত National Portrait Gallery নামক চিত্রাগারের তিনি অনেকগুলি ঐতিহাসিক চিত্র দিয়াছেন।

মূল্যবান পত্র।

বিলাতের বার্ডেট-কুট্‌স্ বংশের পারিবারিক পুস্তকালয় বিক্রয় উপলক্ষে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের লিখিত ৬ শত খানি পত্র বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার সিকাগো নগরের মিষ্টার ব্যারেট নাম এক ব্যক্তি ঐ পত্রগুলি ২১৫৬ পাউণ্ড বা ৩২,০০০ টাকার অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন। মিঃ ব্যারেট খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহে বিশেষ অনুরাগী।

—

পৃথিবীতে কত চিনি জন্মে।

সম্প্রতি কোন এক প্রসিদ্ধ চিনি-ব্যবসায়ী, ১৯২১ খৃষ্টা-ব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ বীট ও ইক্ষুজাত চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সকল দেশের উৎপন্ন চিনির হিসাব হইতে স্থির করিয়াছেন,১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে বীট ও ইক্ষুজাত চিনি ১৬,৫৮২,৫৬০ টন জন্মিয়া-ছিল; ইহার পূর্ব্ব-বৎসরে ১৬,৫৯০,৬৮৬ টন জন্মিয়াছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে, গত বৎসরে পৃথিবীতে ৮,১২৬ টন চিনি কম উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বীট-চিনি পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা গত বৎসর অনেক অধিক জন্মিয়া-ছিল। কিন্তু ইক্ষুজাত চিনির পরিমাণ হ্রাস হওয়াতেই গড়-পড়তায় চিনির পরিমাণ কম হইয়াছে। গত বৎসর ইক্ষুর চিনি ১১,৬০৭,৮৬০ টন জন্মিয়াছিল, পূর্ব্ব-বৎসর ১১,৯১৬,০৬৯ টন জন্মিয়াছিল, সুতরাং ৩০,৯০,০৯ টন ইক্ষুর চিনি কম উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব বৎসরের ৪,৬৭৪,৬১৭ টনের স্থানে ৪,৯৭৫,৫০০ টন বীট-চিনি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ৩,০০,৮৮৩ টন অধিক বীট-চিনি জন্মিয়া ছিল। এই হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে মোটের উপর ৮১২৬ টন চিনি এবার কম হইয়াছে।

আমোদ-প্রমোদে ব্যয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরা থিয়েটার নাচ, সিনেমা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদে ৪,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছিল। ভিক্টোরিয়া উপনিবেশে মাত্র দুইটি ঘোড়দৌড়ের মাঠে গত বৎসর ২৪ দিন ঘোড়দৌড় হয়। এই কয় দিনে সাড়ে ৭ লক্ষ লোক উহা দেখিতে গিয়াছিল। ভিক্টোরিয়ায় ৭৫০গুলি ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া আছে এবং তাহাদের সওয়ারের সংখ্যা ৪২০ জন। কাহারও কাহারও মতে অষ্ট্রেলিয়ার লোক নাচ, গান ও সিনেমা প্রভৃতি রঙ্গালয়-সংক্রান্ত আমোদ-প্রমোদে বৎসরে ১২০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করে।

পাপের প্রবাহ।

চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ সার উইলিয়াম অশ্লার বলেন, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রায় ৬০ হাজার লোক নানারূপ ঘৃণিত ব্যাধিতে জন্মের মত কাযের বাহির হইয়াছে। খ্যাত-নামা ইংরাজ চিকিৎসক সার আর্চডেল রিড বলেন, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েলসের প্রতি দুই জন ব্যক্তির এক জন না এক জন ঐ শ্রেণীর একটা না একটা রোগে আক্রান্ত এবং এমন গৃহস্থ নাই, যাহাদের বাড়ীর একজনও ঐরূপ রোগগ্রস্ত নহেন। মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেরিডিথ এটকিন্সন বলেন, অষ্ট্রেলিয়ায় ঐরূপ সংক্রামক ব্যাধির জন্য তথাকার আর্থিক ক্ষতির বার্ষিক পরিমাণ ৫ কোটি পাউণ্ড। অন্যান্য দেশও এ বিষয়ে ফেলা যায় না।

—

বিবাহ-বিচ্ছেদ।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা শতকরা ৫৫ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ইহার হার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। গ্রেট ব্রিটেনের বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আদালতে সহস্র সহস্র মোকর্দ্দমা দায়ের দেখিতে পাওয়া যায়। গত বৎসর এক জন মাত্র ইংরাজ বিচারক ১০৫ মিনিটে ৯২টি দম্পতীকে বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ১,৩২,০০০টি বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে। যুক্তরাজ্যের নেভাডা ষ্টেটে ৩টি বিবাহের মধ্যে দুটি ছিন্ন হইয়াছে এবং কোন কোন ষ্টেটে ৫টি বা ৬টি দম্পতীর মধ্যে একটি বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী ওয়েলডন 'সানডে পিকটোরিয়াল' পত্রে এক প্রবন্ধে লিখেন—আদালতের একটি অধিবেশনে ৯ শত ৩৫টি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা ছিল এবং তাহার মধ্যে ৭ শত ৩২টি একতরফা। তিনি ইহাতে বিশেষ শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—

বানান শিক্ষা।
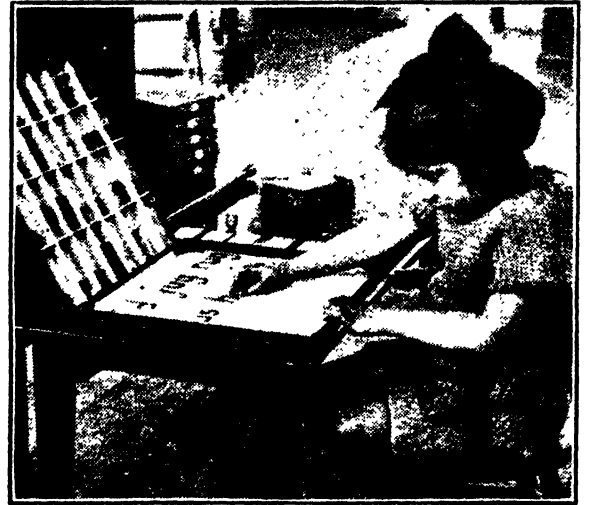
আজকাল বালকবালিকাদিগকে সহজে বানান শিক্ষা দিবার নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। তাস খেলিয়া বানান শিক্ষা তাহারই অন্যতম।

—

অপূর্ব্ব ছদ্মবেশী নারী।

কাব্য ও নাটকে অনেক পুরুষবেশী নারীর কাহিনী আছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যথাকালে তাঁহারা স্বাভাবিক নারী-প্রকৃতির পরিচয় দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়া-ছেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোন নারী পুরুষের ছদ্মবেশে জীবন-যাপন করিয়াছেন, এরূপ কথা প্রায় শুনা যায় না। ডাক্তার জেমস্ ব্যারী নামধারিণী এক নারী আজন্মকাল পুরুষবেশে

থাকিয়া পুরুষেরই ন্যায় লিখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালে বৃটিশ সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া এরূপ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তিনি সৈনিক হাঁস-পাতালের ইন্‌স্পেক্টার জেনারলের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা বা চালচলনে এক দিনের জন্যও তাঁহাকে কেহ পুরুষ ব্যতীত নারী বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধিস্তম্ভে উল্লিখিত উপাধি লিখিত হয়। মৃত্যুর এক বৎসর পরে এক ব্যক্তি সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করেন যে, মৃত্যুকালীন পীড়ার সময় তিনি চিকিৎসিত হইতে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, তিনি নারী ছিলেন এবং সে কথা সমর আফিসে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। সংবাদপত্রে এই কথা প্রকাশিত হইলে উল্লিখিত সমর-বিভাগ হইতে কোন প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নাই; সুতরাং ডাক্তার ব্যারী যে নারী ছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডে কেন্সল গ্রিন সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ আছে। কি জন্য তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কাল আত্মগোপন করিয়া পুরুষবেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা দুর্ভেদ্য রহস্যজালে আবৃত।

—

রুশিয়ার দেবমন্দিরে স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত প্রতিমা।

আমাদিগের দেশের ন্যায় য়ুরোপে ক্যাথলিক ও গ্রীক চর্চ্চের অন্তর্গত ধর্ম্মমন্দিরসমূহে সুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত দেব-প্রতিমা সকল নানা রত্নমণ্ডিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্প্রতি মস্কৌ নগরের একখানি পত্রে এই সকল প্রতিমার বিষয় ও সে সকলের অলঙ্কারের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পেট্রোগ্রাডের কাজান কেথিড্রেল নামক মন্দিরে ঈশাজননী মেরীর এক প্রতিমা আছে। তাহা খাটি সোনা পিটিয়া প্রস্তুত এবং তাহার ওজন ১০ পাউণ্ড। প্রতিমাখানি ১৬৬৫ খানি বড় হীরায় ও ১৪৩২ খানি ক্ষুদ্র হীরকে মণ্ডিত। তদ্ব্যতীত উহা ৬৩৮ খানি চুণি, ৭ খানি নীলা ও ১৭৭ খানি অন্যান্য রত্নে পরিশোভিত। প্রতিমার কণ্ঠে একগাছি হীরকহার দোদুল্যমান। তাহার ঔজ্জ্বল্য অন্ধকারেও দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ পেট্রোগ্রাড নগরের সেণ্টপিটারস্‌ ও সেণ্টপলস কেথি-ড্রেলে "জিরুশালেমের পবিত্র নারী" নামে মেরীমাতার যে মূর্ত্তি আছে, তাহা নিরেট সোনায় গঠিত। সেণ্ট আইজ্যাকের মন্দিরে ভক্তগণ-প্রদত্ত অলঙ্কারের সংখ্যা ২১৫ খানি। উহার সোনার ওজন ৭০ পাউণ্ড এবং রূপার ওজন তাহার তিন গুণ। তথায় একটি রূপার বেদী আছে, তাহা দুই হন্দর বা প্রায় তিন মণ রূপায় নির্ম্মিত। ইহা ভিন্ন আরও অনেক মূল্য-বান্ উপহার-সামগ্রী আছে। এই সকল দেবমন্দির ব্যতীত রুশিয়ার নানা স্থানে আরও অনেক মন্দির মঠ আছে, সে সব দেবালয় ভূতপূর্ব্ব রাজবংশধরদিগের নিকট হইতে বহুকাল ধরিয়া কত যে মূল্যবান্ উপহার পাইয়া আসিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মধ্যে অনেক মন্দিরের বিগ্রহ ও তাহাদিগের অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। কাজান ধর্ম্মমন্দিরে সেণ্ট-পিটার প্রভৃতি চারিজন "প্রেরিত পুরুষের" রৌপ্য-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি ছিল। উহা ডন কসাকগণ গড়াইয়া দিয়াছিল। বিগত বিদ্রো-হের সময় তাহ চুরী হইয়া গিয়াছে। গজনীর মামুদ যেমন সোমনাথ-মন্দির হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বার্লিনের কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ—বলশেভিকগণ সেইরূপ এই সকল মন্দিরের মূর্ত্তি ও তাহার অলঙ্কার সকল আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদিগের অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

—

অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক কীর্ত্তি।

বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবনী-শক্তির প্রভাবে অসাধ্য-সাধন হইয়া থাকে। সংপ্রতি আমেরিকার "Ontario Hydro-Electro Power Company"র চেষ্টায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নায়েগ্রা জলপ্রপাতকে রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে প্রদীপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিক-গণ অশ্বক্ষুরাকৃতি (Horse-shoe fall) প্রপাতটিকে সম্পূর্ণ-রূপে আলোকিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু সমস্যাটি এমনই কঠিন যে, কোনও মতেই এতদিন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ, নানাভাবে এই প্রপাতধারার গতি ও জলকণাসমূহের অবস্থা পর্য্য-বেক্ষণের পর বহু চেষ্টায় আলোকপাতযন্ত্র এমন স্থলে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, যেথান হইতে সমগ্র প্রপাতের বিপুল ধারার উপর আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। Ontario Power Companyর বিদ্যুতের কারখানাবাটীর ছাত হইতে আলোকপ্রবাহ বিক্ষিপ্ত হইলে

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে স্থির করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিতে থাকেন। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়াতে সেইখানেই

নায়েগ্রাপ্রপাত।

বিদ্যুতের ব্যাটারী সংস্থাপিত হইয়াছে। এখান হইতে সমগ্র প্রপাতটিকে অবাধে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বিদ্যুতের কারখানাবাটীর ছাত ব্যতীত "টেবল্ রক্ হাউস্"এর উপরেও আর এক প্রস্থ বৈদ্যুতিক ব্যাটারী সংস্থাপিত করা হইয়াছে। কারণ, সময়ে সময়ে বায়ুর গতি ও জলকণাসমূহের অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন ঘটে যে, প্রপাতের শীর্ষদেশ, বিদ্যুতের কারখানাবাটীর ছাদ হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না। "টেবল্ রক্ হাউসে"র উপর সংস্থাপিত বিদ্যুতাধার হইতে সকল সময়েই আলোকপ্রবাহ নিক্ষেপের বিশেষ সুবিধা। ঝড়বৃষ্টি হইলেও এখান হইতে প্রপাতের শীর্ষদেশ কোনও সময়েই অদৃশ্য হইতে পারে না, তাই তথায়ও আলোপাতযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে।

পরীক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, এই স্থান হইতে আলোকরশ্মি নিক্ষিপ্ত হইলে প্রপাতের দুই সহস্র ফুট বিস্তৃত জলধারাকে আলোকিত করা যায়। এখানকার সলিলপ্রাচীরের উচ্চতাও ১৫৮ ফুট। আলোকিত ক্ষেত্রের পরিধি ৩১৬,০০০ তিন লক্ষ ষোল হাজার বর্গ-ফুট।

আলোকপাতযন্ত্রের প্রধান ব্যাটারীর সহিত ৮১টি সার্চ-লাইট সংযুক্ত। উহা আবার নয় অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশে তিনটি করিয়া থাক; প্রতি থাকে তিনটি করিয়া ল্যাম্প।
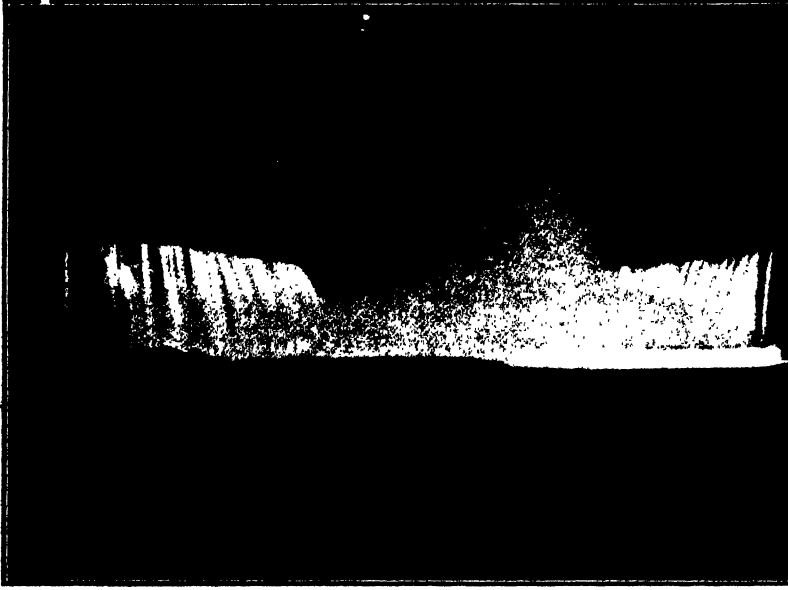
আলোকরশ্মি প্রক্ষেপের এমনই সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে যে, প্রপাতের শীর্ষদেশ সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সে দৃশ্য অতি চমৎকার। সমুজ্জ্বল আলোক-প্রবাহে প্রপাতের জলধারা হীরকের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে। আর মনে হয়, ঠিক মধ্যস্থল হইতে যেন ধূম্র-উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে।

বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখে যখন যুবরাজ (প্রিন্স অব ওয়েলস্) নায়েগ্রা প্রপাত দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় জলপ্রপাতকে আলোকিত করিবার প্রথম ব্যবস্থা হয়।

—

দেনা-পাওনা।

দেনা—	পাওনা—
আমেরিকা যুক্তরাজ্যের নিকট ইংলণ্ডের দেনার পরিমাণ—৯৭২০০০০০০ পাউণ্ড বা ১৪৫৮,০০০০,০০০৲	ইংলণ্ডের পাওনা, ফ্রান্সের নিকট—৫৭২৫২৪৫০০পাউণ্ড বা ৮৫৮,৭৮,৬৭,৫০০৲
	ইংলণ্ডের পাওনা, ইটালীর নিকট ৫০২০৭৪৯৫২ পাউণ্ড বা ৭৫৩,১১,২৪,২৮০৲
	ইংলণ্ডের রুশিয়ার নিকট পাওনা ৫৬,৭৮,৯২,০০০ পাঃ বা ৮৫১,৮৩,৮০,০০০৲
মোট—১৪৫৮,০০০০,০০০৲	২৪৬৩,৭৩,৭১,৭৮০৲

—

সলিল-সৌধ।

পরীরাজ্যের আজগুবী কাহিনী নহে। আমাদের এই লোকবিমোহন ভারতবর্ষেই এই বিচিত্র প্রাসাদ বিদ্যমান। যদি কেহ কোনও দিন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরে গমন করেন, তাহা হইলে এই "সলিল-সৌধ" তাঁহার নয়নগোচর হইবে। বর্ত্তমানে যে স্থলে উজ্জয়িনী নগরী অবস্থিত, তাহার প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণে একটি গ্রাম আছে। লোক তাহাকে "কালয় দে" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই প্রাসাদটির জন্যই উক্ত গ্রামের প্রসিদ্ধি ও সমাদর। কবির চিরপ্রিয় সিপ্রা নদী এই গ্রামের কাছে এমনই অসাধারণ ভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে যে, দেখিবামাত্র দর্শকের চিত্ত বিস্ময়ে ও পুলকে অভিভূত হইয়া পড়ে। দর্শনমাত্রেই মনে হয় যেন, নদীর তটভাগ প্রবাহের বেগে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে রূপান্তরিত হইয়াছে। স্রোতোধারার বাম প্রশাখাটি অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত। স্তরে স্তরে পাতর সাজাইয়া একটি সুপ্রশস্ত বাঁধ-নির্ম্মিত হইয়াছে। তদুপরি কক্ষসমূহ অবস্থিত। সবই প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই কক্ষগুলির নাম "তা-খানা।" রেলিংঘেরা দীর্ঘ গৃহরাজি পশ্চিম দিকে অবস্থিত। নিম্নতলের প্রস্তর-রচিত স্থানের উপর অনেকগুলি উদ্যানসমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রমোদ-শিবির বিদ্যমান। গ্রীষ্মকালে গৃহগুলি সুখশীতল রাখিবার জন্য সুব্যবস্থা আছে। কক্ষগুলির উপরিভাগ "খস" তৃণ-নির্ম্মিত মাদুরের দ্বারা সমাচ্ছাদিত। নদীর জলের ধারা বহুসংখ্যক প্রণালী-পথে আসিয়া সর্ব্বদা তৃণাচ্ছাদনগুলিকে আর্দ্র রাখে। প্রস্তর-রচিত নিম্নতলের উপর দিয়া অসংখ্য বিচিত্র-দর্শন স্রোতোধারা খাতসমূহে সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া ক্রমে প্রপাতধারার ন্যায় ঝরঝর্ শব্দে নিম্নে গড়াইয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে আশপাশের চারিদিক সর্ব্বদাই সলিলসিক্ত থাকে।

সলিল-সৌধ।

প্রাসাদটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থিত। উহার চূড়া অত্যুচ্চ ও গম্বুজাকার; প্রাসাদের চতুর্দ্দিক্ বিরাট প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। জনশ্রুতি বলে যে, পূর্ব্বে এখানে একটি হিন্দু

মন্দির বিদ্যমান ছিল, উত্তরকালে মালবের মুসলমান নৃপতিগণ উহাকে বর্ত্তমান আবাসভবনে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। ইতিহাসও এই জনশ্রুতির সমর্থন করিয়া থাকে। প্রাসাদের সন্নিহিত প্রদেশে প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রেলিংবেষ্টিত কক্ষশ্রেণী ও উদ্যান-বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রমোদ-শিবিরগুলি পরবর্ত্তী গাঢ় রক্তবর্ণের প্রস্তরও ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাসাদ, প্রমোদ-শিবির এবং রেলিং-বেষ্টিত কক্ষগুলি গোয়ালিয়ার মহারাজের ব্যয়ে সুসংস্কৃত ও বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সিন্ধিয়া মহারাজ এই মনোহর প্রাসাদে অবসরকাল যাপন করিয়া থাকেন।

—

আনামরাজ্যের ওঁকার মহামন্দির।
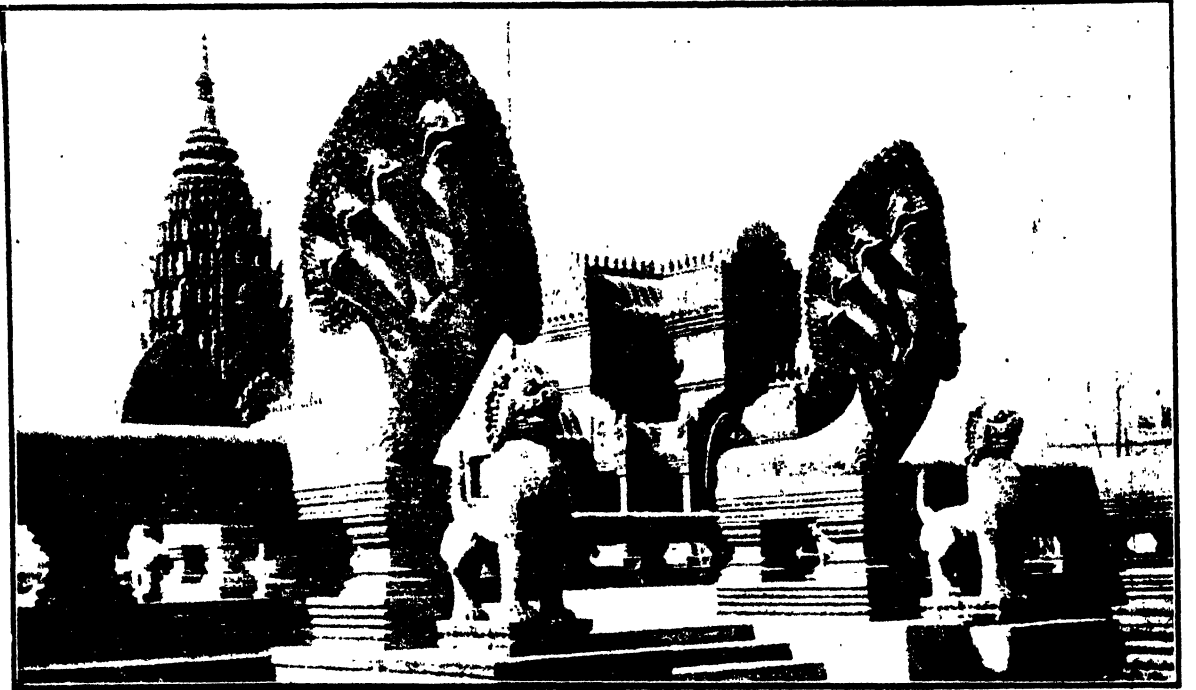
কালে বিনির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। প্রমোদ-শিবিরগুলির গাত্রে ফারসী লেখমালা উৎকীর্ণ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি সম্রাট আকবরের সময়ের। কারণ, উক্ত উৎকীর্ণ লিপির নিম্নে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ এই তারিখটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রেলিং-পরিবেষ্টিত একটি দীর্ঘাকার গৃহের প্রাচীরে উৎকীর্ণ আর একটি লিপি পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, উল্লিখিত প্রাসাদ ও তাহাকে সলিল-বিধৌত করিবার ব্যবস্থা সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেই হইয়াছিল। কিন্তু জনশ্রুতি বলে যে, মালব সুলতানদিগের সময়েই প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রমোদ-শিবিরগুলির সম্মুখভাগ "বেলে পাথর" দ্বারা গঠিত। কিন্তু অন্যান্য অংশ কঠিন কৃষ্ণ-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত। কোথাও কোথাও লাল ইট, শ্বেত প্রস্তর ও

ফরাসী ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী।

যে অবধি ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদবধি উহার অধীনস্থ দেশসমূহেও সেই শাসননীতি প্রচলিত হইয়াছে। ফ্রান্সের অধীনস্থ দেশসমূহের শাসনকেন্দ্র ফ্রান্সে হইলেও ফরাসী জাতির কোন বিশেষ অধিকার নাই— গৌরাঙ্গ শ্যামাঙ্গ ভেদাভেদ নাই। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা ১০ কোটিরও অধিক। সেই কোটি কোটি ঔপনিবেশিক প্রজার সুখসমৃদ্ধিবৃদ্ধিকল্পে ফরাসী সাধারণতন্ত্র সর্ব্বদাই সচেষ্ট। সেই সকল দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গত মে মাসের প্রথমে ফ্রান্সের মার্সেইয়া (Marscelles) নগরে একটি বিরাট ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী

খোলা হইয়াছে। আবার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তদপেক্ষাও বড় একটি মহাপ্রদর্শনী খুলিবার জন্য এখন হইতে আয়োজন হইতেছে। মার্সেইয়ার বিরাট প্রদর্শনী দেখিবার জন্য আনামের অধিপতি ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তিনি য়ুরোপ-যাত্রা করেন নাই। মার্সেইয়া প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তথায় এক একটি বিভিন্ন অট্টালিকা অথবা শিবির এক একটি ঔপনিবেশিক রাজ্যের শিল্পসম্ভার প্রদর্শনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে অট্টালিকায় যে দেশের শিল্পসামগ্রী

প্রদর্শনী গৃহ।

প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই অট্টালিকাটি সেই দেশের স্থাপত্য-রীতিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। হিন্দু-চীন (Indo-China) ও পশ্চিম-আফ্রিকার দ্রব্যসামগ্রী যে দুইটি ভবনে সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহার চিত্র প্রকাশিত হইল। একটি ভবন হিন্দু-চীনের জন্য নির্দ্দিষ্ট। উহা আনামরাজ্যের ওঁকার মহামন্দিরের প্রতিকৃতি। মন্দিরের দ্বারদেশ একটি সিংহ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত এবং ঐ দেশের পৌরাণিক নাগরাজের মূর্ত্তি মন্দির-গাত্রে অঙ্কিত। চিত্রের দক্ষিণভাগে পশ্চিম-আফ্রিকার প্রসিদ্ধ প্রাসাদের চিত্র। উহাতে ঐ প্রদেশের সামগ্রী সকল সংরক্ষিত হইয়াছে।

—

কীট-পতঙ্গের মহারণ।

জগৎকে ধ্বংস করিবার জন্য জীবমাত্রেই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা তাই পাশাপাশি চলিতেছে। সংপ্রতি মিঃ লিফ্রয় (Mr. Lefroy) নামক জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত লণ্ডনের "রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনে" বক্তৃতার দ্বারা ও চিত্রের সাহায্যে বিশ্বের কীট-পতঙ্গের ভীষণ রণের কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয় এই যে, মানুষ মনে করে, এই বিশ্বে সে-ই প্রধান জীব, তাহার শক্তির নিকট পৃথিবীর যাবতীয় জীব অবনত। ইহা যথার্থ নহে ; প্রকৃতপক্ষে কীট-পতঙ্গই বিশ্বের রাজা। তাহাদেরই প্রভাব অপ্রতিহত।

বক্তা চৌদ্দটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া তাঁহার বক্তব্যটি

বিশদ করিয়াছেন। প্রত্যেক দৃষ্টান্তই অল্পবিস্তর রোমহর্ষক। তাঁহার প্রথম উদাহরণটি ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষেই প্রযোজ্য। এক জাতীয় ঘুণপোকা তুলার ভীষণ শত্রু। উহা কার্পাস বৃক্ষকে অতি ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। ২০ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করা সত্বেও এ পর্য্যন্ত উক্ত কীটের আক্রমণ হইতে বৃক্ষসমূহকে রক্ষা করিবার কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইল না। ইদানীং উক্ত কীটের আক্রমণ এমনই ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে তূলার চাষ সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিতে হইবে।

জনৈক প্রসিদ্ধ মার্কিণ বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আর ৫ বৎসর পরে আমেরিকায় তূলার চাষ আদৌ থাকিবে না। যদি তাহা ঘটে, তবে পৃথিবীতে বাৎসরিক ৭০০০০০০ সত্তর লক্ষ গাঁইট তুলা কম পড়িয়া যাইবে। তখন তূলার বাজারের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। মিঃ লিফ্রয় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যদি ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র-ব্যবসায়কে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তবে সমগ্র বৃটিশ-সাম্রাজ্যমধ্যে বিপুলভাবে কার্পাসের চাষ আরম্ভ করিতে হইবে।

কার্পাস পোকাই যে পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্ট কীট, তাহা নহে। আর্জেন্‌টাইন্ প্রদেশস্থ পিপীলিকাই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু। বিগত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এই কীট ইংলণ্ডে উপনীত হয়। তাহার পর অর্দ্ধ-পৃথিবী এখন ইহার অধিকারভুক্ত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই পিপীলিকা সমগ্র স্পেনদেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আর্জেণ্টাইন্ প্রদেশে এই ক্ষুদ্র কীট ছোট ছোট বহু শিশুকে পর্য্যন্ত উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে; ম্যাডিরিয়াস্থিত পক্ষীজাতিকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছে। কুলায়স্থিত পক্ষিশাবকগুলির উড়িবার শক্তি জন্মিবার পূর্ব্বেই এই ভীষণ পিপীলিকাশ্রেণী তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলিত। এইরূপে সে দেশ এখন একেবারে পক্ষিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যে যে স্থলে এই পিপীলিকার আধিপত্য জন্মিয়াছে, তত্রত্য কমলা অথবা কফির চাষ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

অনেক সময় ইহারা স্বয়ং ধ্বংসকার্য্যে রত হয় না। অন্যান্য কীট-পতঙ্গ যাহাতে বৃক্ষলতাদির ধ্বংসকার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে পারে, ইহারা তাহার উপায় করিয়া দেয়। সবুজবর্ণের এক জাতীয় মক্ষিকা আছে, এই পিপীলিকারা তাহাদের বিশেষ বন্ধু। মানুষ যেমন গরু পোষে, ইহারা ঠিক তেমনই ভাবে সবুজ মক্ষিকাগুলিকে প্রতিপালন করে। তাহাদের বাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, পীড়া হইলে চিকিৎসা করে, এমন কি, শত্রুর আক্রমণ হইতে মক্ষিকাকুলকে রক্ষা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। এই পিপীলিকাগুলি সর্ব্বভুক্; ইহারা মানবজাতির ভীষণ ব্যাধিগুলিও স্থান হইতে স্থানান্তরে ছড়াইয়া দিয়া থাকে। বক্তা বলেন যে, লণ্ডনে এই পিপীলিকা বড় আরামের বাসস্থান নির্ণয় করিয়া লইতে পারে।

মিঃ লিফ্রয় কতকগুলি বিস্ময়জনক ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মক্ষিকা ভারতবর্ষে প্লেগের প্রবর্ত্তক এবং তাহারই ফলে ৭০ লক্ষ প্রাণী তথায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসরে প্রায় এক হাজার শিশু মক্ষিকা-বাহিত উদরাময় রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে মক্ষিকার সংখ্যা যেরূপ প্রচুর ছিল, বর্ত্তমানেও তাহাই আছে। উহারা টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ সংক্রামিত করে।

বক্তা বলেন যে,মেসপোটেমিয়াতে যে প্রণালী অনুসারে এখন স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে মক্ষিকা-বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

এক জাতীয় কীটের জন্যই রুশিয়ায় টাইফস্ পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব। যদি মানুষ সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে না পারে, তবে বহু জাতি পৃথিবীর বক্ষ হইতে এই পীড়ার প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

এই সকল বিভীষিকাপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনার পরও মিঃ লিফ্রয় হতাশ হয়েন নাই। তিনি আশার বাণীও শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, মানুষ বুদ্ধিমান্ জীব, তাহার প্রতিভা আছে, সুতরাং অন্ধ কীট-পতঙ্গের সহিত মহারণে মানুষ নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। মানবজাতির আবির্ভাবের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কীট-পতঙ্গরা ধ্বংসকার্য্যে রত রহিয়াছে, আর সবে ১০ বৎসরমাত্র কৃষিবিভাগ হইতে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং নৈরাশ্যের কোনও হেতু নাই।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলের ওক্‌কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছাত যে জাতীয় গুবরেপোকার দৌরাত্ম্যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, সেই পতঙ্গই এখন সেণ্টপল ধর্ম্মমন্দিরের ছাত ধ্বংস করিতেছে। অনেক ধর্ম্মমন্দির ও প্রাচীন অট্টালিকা এই পতঙ্গের প্রভাবে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

ব্যবসায়ে বর্ণভেদ

বোম্বাইয়ের ভারতীয় সওদাগর সভার প্রস্তাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সওদাগরী সভার প্রতিনিধিরা বড় লাটের কাছে ডেপুটেশনে গিয়াছিলেন,—উদ্দেশ্য, ভারত সরকারকে ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে বলা। ইঞ্চকেপ কমিটী গঠনের পর এই অনুরোধের কারণ ঠিক বুঝা যায় না। তবে ডেপুটেশনের যে কয় জন সদস্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জন ও বড় লাট এই সম্মিলিত ডেপুটেশনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন। যেন এই ডেপুটেশনেই প্রমাণ হইল, এ দেশে বিদেশী ও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া একই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। যেন এ দেশের শিল্প নষ্ট করিবার জন্য বিগাতে আইন প্রণয়ন এবং বিলাতী শিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য এ দেশে শিল্পের উপর কর সংস্থাপন, সে সব অতীতের কথা; তাহার পর নূতন তপন "নূতন জীবন করিল বপন।" কিন্তু এসোসিয়েটেড প্রেস ডেপুটেশনের সদস্যদিগের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও বর্ণভেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে।—প্রথমে য়ুরোপীয়দিগের ও পরে ভারতীয়দিগের নাম দেওয়া হইয়াছে:—(১) এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের সভাপতি মিষ্টার রোডস, (২) বোম্বাই চেম্বারের সভাপতি মিষ্টার নেলসন্, (৩) আপার ইণ্ডিয়া চেম্বারের সভাপতি মিষ্টার জোনস্, (৪) ব্রহ্ম চেম্বারের পক্ষে সার ই, হলবার্টন, (৫) পঞ্জাব চেম্বারের পক্ষে মিষ্টার পি, মুখোপাধ্যায়, (৬) বোম্বাই ভারতীয় চেম্বারের সভাপতি মিষ্টার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, (৭) বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বারের পক্ষে শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, (৮) কলিকাতা মাড়োয়ারী সভার পক্ষে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান কিন্তু ফিসকাল কমিশনে পুনঃপুনঃই বলিয়াছিলেন, এ দেশে ব্যবসার ক্ষেত্রে বর্ণগত বৈষম্য বিদ্যমান। এ দেশে পাটকলের শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মকর্ত্তারা ভারতীয় দালালের মারফৎ পাট কিনেন না। মিষ্টার সোয়ান সরকারী রিপোর্টেই বলিয়াছেন, এ দেশে বিদেশীদের ব্যাঙ্ক হইতে স্বদেশী কারবারের কোনরূপ অর্থ-সাহায্য লাভ হয় না।

দেবীবাবুর কথায় যখন ইংরাজ বণিকরা উষ্ণ হইয়া উঠেন, তখন বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব কমার্স পূর্ব্ববঙ্গ রিভার ষ্টীম সার্ভিস কর্ত্তৃক তাঁহাদের নিকট লিখিত একখানি পত্র কমিশনের কাছে পাঠাইয়া দেন।

তাহাতে ব্যবহার-বৈষম্যের কথা প্রতিপন্ন করা হয়। যখন রাজা শ্রীনাথ রায় প্রভৃতি ২ খানা ষ্টীমার ও ৪ খানা ফ্ল্যাট লইয়া কারবার আরম্ভ করেন, তখন পাটকলওয়ালারা তাঁহাদের জাহাজে আনীত পাট কিনিতে আপত্তি করিতেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা কারবার যৌথ করিয়া জাহাজের ও ফ্ল্যাটের সংখ্যা বাড়াইলেন এবং য়ুরোপীয় কোম্পানীর সঙ্গে তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল, তখনই পাটকলওয়ালারা তাঁহাদের জাহাজের পাট কিনিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা কলে কলে ফিরিলেন—কোন ফল হইল না; প্রতিযোগী রিভার ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর মিষ্টার ম্যাকেঞ্জি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমার কোম্পানীকে তোমাদের ম্যানেজিং এজেণ্টস্ কর; নহিলে তোমরা তিষ্টিতে পারিবে না।" আবার পূর্ব্ববঙ্গের ষ্টীমার কোম্পানীর জাহাজ য়ুরোপীয় কোম্পানীর জাহাজেরই মত হইলেও তাহাতে বীমার হার বাড়াইয়া দেওয়া হইল। শেষে সার আর্ণেষ্ট (এখন লর্ড) কেবলের চেষ্টায় বীমার হার আবার কমাইয়া সকলেরই এক দর করা হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের ষ্টীমার কোম্পানীর কর্ত্তারা শেষে সরকারের দ্বারে দরখাস্ত দিয়াও প্রতীকার পারেন নাই।

সরকার শ্বেতাঙ্গ সওদাগর সভাকে যে সব অধিকার ও যেরূপ সম্মান দান করেন, কোন ভারতীয় সওদাগর সভাকে তাহা দিয়াছেন কি? যদি না দিয়া থাকেন, তবে বড় লাট মুখে যাহাই কেন বলুন না, দেশের লোক এক কথায় মনে করিবে না—ব্যবসার ক্ষেত্রে বর্ণগত বৈষম্য দূর হইয়া গিয়াছে।

ব্যয়-সঙ্কোচ

বিলাতে যুদ্ধের জন্য সরকারকে অনেক টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে এবং ব্যবসাও আর পূর্ব্ববৎ লাভজনক নহে; সেই জন্য সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ করিবার উদ্দেশ্যে এক অনুসন্ধান সমিতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সেই গেডিস সমিতি নানাদিকে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যদিও সরকার সব বিষয়ে সমিতির নির্দ্ধারণ মানিয়া লয়েন নাই, তবুও কতকগুলি নির্দ্ধারণ অনুসারে কায করিয়াছেন। গেডিস কমিটীর অনুকরণে এ দেশেও এক কমিটী গঠিত হইল। লর্ড ইঞ্চকেপ তাহার সভাপতি। লর্ড ইঞ্চকেপ কিছু কাল এ দেশে সওদাগর ছিলেন; তাহার পর বিলাতেও সরকারের জন্য কায করিয়াছেন। ভারত সরকারের বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এই ইঞ্চকেপ কমিটী ভারত সরকারের কোন্ কোন্ ব্যয় এখনই কমান যাইতে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দিবেন। সমিতি ব্যয়ের আলোচনা করিতে পারিবেন। কিন্তু কি করা হইবে না হইবে, সে বিষয়ে ভারত সরকারই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

লর্ড ইঞ্চকেপ।

ভারত সরকারের ব্যয় কমাইবার বিষয় অনুসন্ধান করিতে যে সমিতি নিযুক্ত হইল, তাহার জন্য অবশ্যই অনেক টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে। ফল সে ব্যয়ের অনুরূপ হইবে কি না—তাহা পূর্ব্বে বলা যায় না। কিন্তু আমরা জানি, এবার ব্যবস্থাপক সভায় সামরিক ব্যয় কিছু কমাইবার প্রস্তাব হইলে জঙ্গীলাট স্পষ্ট বলিয়াছিলেন—তাহা হইবার নহে। ভারতের ব্যয়ের হিসাব দেখিলে বুঝা যায়—"অর্দ্ধেক মা ষষ্ঠী, অর্দ্ধেক ছাই গোষ্ঠী"—সামরিক বিভাগের ব্যয়ই অতিরিক্ত অধিক। যদি সে দিকে ব্যয় কমান অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে জনকতক কেরাণী মারিয়া "রাই কুড়াইয়া বেল" করা যাইবে কি? ওদিকে বিলাতে লর্ড মেষ্টন বলিয়াছেন, করভার লাঘব করা যাউক আর না যাউক—ভারতে বৃটিশ সৈনিক কমান হইবে না। অর্থাৎ দেশীয় সৈনিকরা ইংরাজের জন্য প্রাণপাত করিলেও লর্ড মেষ্টন তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন।

এ অবস্থায় ইঞ্চকেপ কমিটীর কায কিরূপ হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। তবে ব্যয়সঙ্কোচ না করিলেও আর উপায় নাই। সার ষ্ট্যান্‌লী রীড লিখিয়াছেন—গোযানের দেশে বহুমূল্য রোলস রয়েস মোটর গাড়ী চালান যায় না, ব্যয়সঙ্কোচ না করিলে ভারত সরকারের আর উপায় নাই। সামরিক ব্যয়, দিল্লীরচনা, শৈলবিহার—এ সব সম্বন্ধে ইঞ্চকেপ কমিটী কি লোকমত গ্রহণ করিবেন?

কমিটীতে ভারতীয় সদস্যনিয়োগ ব্যবস্থায় আমরা আরও নিরাশ হইয়াছি। বাঙ্গালা হইতে সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সদস্য হইয়াছেন। লর্ড সিংহের মত সার রাজেন্দ্রও সরকারের Prize boy। তিনি বড় ব্যবসায়ী—সে হিসাবে তিনি বাঙ্গালীর গৌরব হইতে পারেন; কিন্তু ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ভারত সভা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে সমিতির সদস্য নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এ কার্য্যে ভূপেন্দ্র বাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না। তিনি কয় বৎসর ইণ্ডিয়া আফিসে ভারত-সচিবের পরামর্শ-পরিষদের সদস্য থাকিয়া ভারত সরকারের সকল বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ভারত-সচিব মিষ্টার মণ্টেগুর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থায় তাঁহাকে কমিটীর সদস্য না করায় যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ত্যাগ করা হইল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইঞ্চকেপ কমিটী কেবল ভারত সরকারের ব্যয়ের আলোচনা করিবেন। প্রাদেশিক সরকার সমূহে যে অমিতব্যয়িতার বন্তা আসিয়াছে, তাহা কি অবজ্ঞাত হইবে?

—

বৈকুণ্ঠনাথ সেন

গত ৩০শে বৈশাখ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালায় এক জন অজাতশত্রু কর্ম্মবীরের তিরোভাব হইয়াছে। মফঃস্বলে ওকালতী করিয়া সমগ্র দেশে এমন প্রভাব আর কেহ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলায় কাটোয়া মহকুমায় আলমপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত কিন্তু দরিদ্র বৈদ্য-পরিবারে বৈকুণ্ঠনাথের জন্ম হয়। পিতা বহরমপুরে চাকরী করিতেন। তথায় বালক বৈকুণ্ঠনাথ বিদ্যাভ্যাস করেন এবং প্রতিভার সহিত একাগ্রতার ও শ্রমশীলতার সংযোগে বিদ্যালয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন।

দারিদ্র্যের অনলে বৈকুণ্ঠনাথের চরিত্রের শ্যামিকা দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং তিনি ব্যয়কুণ্ঠ না হইয়া উপযুক্ত কার্য্যে অর্থব্যয়ে মুক্ত-হস্ত ছিলেন। জনহিতকর অনুষ্ঠান-মাত্রেই তাঁহার সহানুভূতি ছিল এবং তিনি কোন অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হইলে বাক্যব্যয় অপেক্ষা অর্থব্যয় করিয়াই তাহার অধিক সাহায্য করিতেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি যখন যাযাবর করা স্থির হয়, তখন তিনিই বহরমপুরে তাহার প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন এবং তাহার পর কটকে অধিবেশন না হইলে একবার ও বরিশালে অধিবেশন ভঙ্গের পর আর একবার বহরমপুরে অধিবেশন করান।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন বাঙ্গালার রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবল দলাদলি দেখা দেয়, তখন হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে বৈকুণ্ঠনাথ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আর কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশনে মিসেস আনী বেসাণ্ট সভানেত্রী হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি কংগ্রেসে, কন্ফারেন্সে ও সভাসমিতেতে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। সে সব শব্দাড়ম্বরপূর্ণ অন্তঃসারশূন্য নহে, সকলগুলিতেই যুক্তি আছে।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন।

দীর্ঘকাল বহরমপুরে সাধারণের সর্ব্ববিধ কার্য্যে তিনিই নেতা ছিলেন। জিলা বোর্ডে, মিউনিসিপ্যালিটীতে ও ব্যবস্থাপক

সভায় তিনি অকাতরে আপনার মূল্যবান্ সময় দিয়াছেন। লর্ড কার্মাইকেল যখন বাঙ্গালায় জিলা বোর্ডে বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া ফল কিরূপ হয়, দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বর্দ্ধমানে রাজা বনবিহারী কাপুরকে ও বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথকে দুই জিলায় সেই পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। রাজা বনবিহারী অসম্মতি জানান; কিন্তু দেশের কার্য্যে বৈকুণ্ঠনাথের আলস্য ছিল না, তাই তিনি বৃদ্ধ বয়সেও সেই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহারই কার্য্যের ফলে শেষে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র জিলা বোর্ডে বে-সরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি বিশেষভাবে "স্বদেশী" ছিলেন। তাঁহার আচার ব্যবহার সবই স্বদেশী। স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি স্বদেশী-পণ্য-ব্যবহার-বিষয়ক এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। মিষ্টার (পরে সার) ফিরোজসা মেটার চেষ্টায় সে উদ্যোগ ফলপ্রসব করে নাই।

তাঁহার মত সামাজিক ও স্নেহশীল বাঙ্গালী আজকাল দুর্লভ। আপনার গ্রামের উন্নতিকল্পে তিনি মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি গ্রামে একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া চাঁদনীর দুই পার্শ্বে পিতার ও মাতার নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং পানীয় জলের জন্য আর একটি পুষ্করিণীও করিয়া দিয়াছেন। গ্রামে স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা তাঁহার অসামান্য কীর্ত্তি। তিনি প্রতি বৎসর কয় মাস গ্রামে কাটাইতেন। তখন গ্রামে নিত্য উৎসব হইত।

তিনি দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয়ী হইয়াছিলেন; তাই আজীবন বহু ছাত্রকে গৃহে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এইরূপে তিনি বঙ্গদেশে পাঁচ শতেরও অধিক পরিবারে অন্ন-সংস্থানের উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

তিনি বঙ্গদেশে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা এ দেশে দিন দিন দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। তাহার অনুসরণ করিলে বাঙ্গালী মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

স্বামী বিশ্বানন্দ

স্বামী বিশ্বানন্দকে লইয়া সরকারের যেন সাপের ছুঁচা গেলা হইয়াছে। যুবরাজের কলিকাতায় আগমনের সময় কলিকাতায় স্বামীজীকে একবার গ্রেপ্তার করিয়া কয় দিন হাজতে রাখা হয়। তাহার পর তাঁহাকে যেমন অতর্কিতভাবে

স্বামী বিশ্বানন্দ।

গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তেমনই অতর্কিতভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তখন কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, সরকার হয় ত তাঁহার গ্রেপ্তারে কয়লার খনিতে শ্রমজীবীদিগের চাঞ্চল্যের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কারণ, কয়লার খনিতে যে সব

শ্রমজীবী কায করে, তাহাদের উপর স্বামী বিশ্বানন্দের অসাধারণ প্রভাব। তাঁহার গ্রেপ্তারে পাছে কয়লার খনিতে শ্রমজীবিচাঞ্চল্য হয়, সেই জন্য গ্রেপ্তার হইয়া তিনি শ্রমজীবীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—কেহ যেন ধর্ম্মঘট না করে।

ইহার পর স্বামী বিশ্বানন্দ দার্জ্জিলিং যাইলে তথায় তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারের কয় দিন পূর্ব্বেই 'ইংলিশম্যান' ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের ব্যাপার লইয়া বলিয়াছিলেন—কয়লার খনি অঞ্চল হইতেই যত অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়িতেছে—অতএব সে অঞ্চল পরিষ্কার করিতে হইবে—clear the coal-fields. এই উক্তির সহিত স্বামী বিশ্বানন্দের গ্রেপ্তারের কোন সম্বন্ধ ছিল, কি না—বলিতে পারি না।

তবে সে বারও স্বামী বিশ্বানন্দের বিরুদ্ধে কোন মোকর্দ্দমা উপস্থাপিত করা হয় নাই।

এই যে ধরা ও ছাড়া, ইহাতে লোক কি মনে করিতেছে এবং কি মনে করিতে পারে? যথেষ্ট কারণ না থাকিলে লোককে গ্রেপ্তার করা ও হাজতে রাখা অর্থাৎ তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা কি সরকারের পক্ষে গৌরবের বিষয়?

গুজরাট প্রাদেশিক সমিতি

বাঙ্গালায় যেরূপ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী এবার প্রাদেশিক সমিতির সভানেত্রী হইয়াছিলেন, গুজরাটে তেমনই মহাত্মা গন্ধীর পত্নী শ্রীমতী কস্তুরী বাই গন্ধী প্রাদেশিক সমিতির সভানেত্রীর কায করিয়াছেন।

তিনি গুজরাটবাসীদিগকে স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, মহাত্মা গন্ধী গুজরাটবাসীকে ৩টি বিষয়ে অবহিত হইতে বলিয়াছেন—

(১) স্বদেশী
(২) অহিংসা
(৩) অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন

তিনি আশা করেন, গুজরাটবাসীরা এই ৩ বিষয়ে সফলকাম হইবেন।

প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে ভাল সূতা কাটা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ কাযের জন্য স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন। কংগ্রেসের অন্যান্য কাযের জন্যও কর্ম্মীর প্রয়োজন।

তিনি গুজরাটের মহিলাদিগকে বলিয়াছেন—তাঁহারা এবার উল্লেখযোগ্য কোন কাযই করেন নাই। প্রাচীন কাল হইতেই বস্ত্রবয়ন মহিলাদিগের কায ছিল। যে দিন হইতে তাঁহারা এই কায ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই

মহাত্মার পত্নী।

দেশে অন্নকষ্ট ও নানা দোষ প্রবেশ করিয়াছে। "চম্পারণে ও মাদ্রাজে আমি এরূপ মহিলা দেখিয়াছি, যাহাদের দেহ আবৃত করিবার মত বস্ত্র নাই—করিবার কোন কাযও নাই। যে সব স্থানে স্ত্রীলোকদিগের করিবার কায আছে, সে সব স্থানেও তাঁহাদিগের কম দুরবস্থা নহে। মহিলাদিগকে যখন গৃহের বাহিরে যাইয়া কায করিতে হয়, তখন তাঁহাদের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। চরকায় সূতা কাটা ছাড়া মহিলাদিগকে আর কোন ভাল কায দেওয়া দুষ্কর। অবস্থাপন্না মহিলারা যদি তাঁহাদের দরিদ্র ভগিনীগণের জন্য বেদনা অনুভব করেন—তাঁহাদের চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে চরকায় সূতা কাটা আরম্ভ করুন।"

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পুত্র পণ্ডিত জহরলাল পিতার আদর্শানুসরণ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং কারাদণ্ড ভোগও করিয়াছিলেন। কারামুক্ত হইয়া আসিয়া তিনি পুনরায় কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্রতী হইয়া পুনরায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি

বলিয়াছেন, যাহাতে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন, অর্থাৎ তাঁহারা যে বিদেশীয় বস্ত্রের ব্যবসা

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু।

করিবেন না, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, সেই জন্য তিনি "পিকেটিং" করিতেছিলেন। কাহাকেও ভয় দেখান তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাহা অহিংস অসহযোগীর কায নহে। শুনা যাইতেছে, পণ্ডিতজী রাজনীতিক আসামী হইলেও এবার তাঁহাকে রাজনীতিক আসামীর কোনরূপ সুবিধা দেওয়া হইতেছে না। সকল সভ্য দেশেই রাজনীতিক আসামীদিগের সম্বন্ধে কারাগারে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়।

বধূনির্য্যাতন

সম্প্রতি কলিকাতার পুলিস আদালতে বধূনির্য্যাতনের একটি মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। স্বামী নগেন্দ্র ভাদুড়ী—তাহার মাতা জ্ঞানদা ও ভগিনী প্রতিভারাণীর সাহায্যে বালিকা স্ত্রী আনন্দময়ীকে বিশেষ নির্য্যাতন করিত। তাহারা ছাতে একটি পায়রার ঘরে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিত ও তাহার গায় তপ্ত লৌহের সেক দিত! তাহাদের এরূপ করিবার কারণ, আনন্দময়ী যাহা বলিয়াছে, তাহা লিখিয়া লেখনী-কলঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না—সে পাপপথের পথিক হইতে অস্বীকার করাতেই না কি তাহার এই লাঞ্ছনা। আনন্দময়ীর পিতা সংবাদ পাইয়া যখন পুলিসের সাহায্যে কন্যার উদ্ধার-সাধন করেন, তখন তাহার বাঁচিবার আশা অতি ক্ষীণ। হাঁসপাতালে চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় সে আরোগ্যলাভ করিয়াছে—তাহার অঙ্গে বন্ধন ও সেকজনিত ক্ষত শুকাইয়াছে। বিচারে নগেন্দ্রের দুই বৎসর এবং জ্ঞানদার ও প্রতিভার এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আনন্দময়ী।

এই মোকর্দ্দমায় যে সব কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে স্তম্ভিত হইতে হয়। সমাজের যে দুষ্টক্ষত ইহাতে দেখা গিয়াছে, তাহার ঔষধ কি? এ সব ব্যাপার চাপা দিয়া—গোপন করিলে সমাজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হয় না। পূর্ব্বে সমাজ-শাসন বলিয়া যে ব্যবস্থা এ দেশে ছিল, তাহা দণ্ডবিধি আইনের ধারার অপেক্ষা অধিক কার্য্যকর হইত; কারণ, সে শাসন সমাজে সামাজিকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত এবং তাহা এড়াইবার উপায় ছিল না। এখন সে শাসন আর নাই—সমাজের ও পরিবারের গঠন ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সমাজে পাপ নিবারণের এবং মহিলাদিগের নির্য্যাতন নিবারণের উপায় চিন্তা করা সামাজিকমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

গত ২৫শে বৈশাখ 'এডুকেশন গেজেটের' পরিচালক, বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফাণ্ডের সভাপতি, দেশপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ং সুলেখক মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বারাণসীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

তিনি ২২শে বৈশাখ চুঁচুড়ার বাড়ী হইতে গৃহদেবী অন্নপূর্ণাকে কাশীতে লইয়া তথায় প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩শে তিনি পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। ২৫শে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুকুন্দ বাবু পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বদেশীর ভক্ত ছিলেন। "তাঁহার গৃহে বিলাতী জিনিষ ঢুকিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আত্মীয় স্বজনের উপর নিষেধ ছিল, উপহার উপঢৌকনাদিতেও যেন তাঁহারা বিদেশী দ্রব্য তাঁহার গৃহে প্রেরণ না করেন।"

"বঙ্গ-বিচ্ছেদের বহুবর্ষ পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য ও দুষ্প্রাপ্য স্বদেশী শিল্পের ব্যবহার তিনি সপরিবারে করিয়া আসিতেছিলেন। খদ্দর পরা তাঁর বাড়ীতে আজ নূতন নয়। যেখানে যখন যে স্বদেশী শিল্পের বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে, দ্বিধাহীন ভাবে শেয়ার কেনা বা সাহায্য দান করিয়াছেন, 'টিউটিকোরিন' 'কেশর সুগার' ইত্যাদিতে অনেক টাকাই লোকসান হইলেও তিনি পুনশ্চ নূতন কার্য্যে অর্থ নিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বলিতেন, 'দেশের কার্য্যে দেশের লোক ক্ষতির ভয় পাইলে কায হইবে কেন? দশটা গেলেও দুইটা ত টিকিবে'।"

মুকুন্দ বাবু স্বয়ং সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে তিন খণ্ড 'সদালাপ' 'নেপালী ছত্রী', 'ভূদেব-চরিত' এবং 'অনাথবন্ধু' বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'অনাথবন্ধুতে' তিনি দেখাইয়াছেন,—কি ভাবে স্বদেশীর প্রচার হইলে ও কি ভাবে দেশসেবা করিলে প্রকৃত মঙ্গল হয়। 'নেপালী ছত্রী'—নেপালরাজ্যের মনোরম ইতিহাস। তাঁহার আরও কয়খানি পুস্তক লিখিত হইয়া আছে—আজও প্রকাশিত হয় নাই।

তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন; হিন্দুধর্ম্মের উদারতা তিনি

গ্রহণ করিয়া জীবনে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, মুসলমানদিগকে তিনি আদর করিতেন এবং বলিতেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব বিশেষ প্রয়োজন। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার মত বিশেষ উদার ছিল। তাঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী সুরূপা দেবী (ইন্দিরা দেবী) ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যে আজ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, সে তাঁহারই প্রদত্ত শিক্ষার ও উৎসাহের ফলে।

ভূদেব বাবু তাঁহার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় যে সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, মুকুন্দ বাবুর কর্ত্তৃত্বে তাহা সেই সৎকার্য্যেই সুপ্রযুক্ত হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান

কলিকাতায় আজ যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আছে, তাহা প্রায় ২ শতাব্দীর পরিবর্ত্তনের ফল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম ১ জন মেয়র ও ৯ জন অলডারমন লইয়া এক কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মিষ্টার হলওয়েল এক সময়ে কর্পোরেশনের কর্ত্তা ছিলেন। প্রথমাবধিই কর্পোরেশনের কর্ত্তৃত্ব কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারীর

রাজা হৃষীকেশ লাহা।

উপর ন্যস্ত ছিল। তাহার পর বহু বৎসরের চেষ্টায় কর্পোরেশনে নির্ব্বাচিত কমিশনার প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। সে প্রথা কখন বা উৎসাহিত, কখন বা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। তবে এ পর্য্যন্ত কোন বে-সরকারী লোককে চেয়ারম্যান করা হয় নাই; পাকা সিভিলিয়ান বাছিয়া কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করা হইয়াছে।

শাসন-সংস্কারে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ এক জন মন্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছে। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে বিভাগের কর্ত্তা। তিনি মন্ত্রী হইবার পর প্রথম এক জন বাঙ্গালী সিভিলিয়ানকে পাকা চেয়ারম্যান করা হইয়াছে। তিনি—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। গুপ্ত মহাশয় অসুস্থ হইয়া ছয় সপ্তাহের ছুটী চাহিলে সুরেন্দ্রনাথ কমিশনারদিগের মধ্যে এক জন বে-সরকারী লোককে চেয়ারম্যান করিবেন স্থির করিয়া রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহাকে সে পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই পদগ্রহণ করিলে আর সব পদ ত্যাগ করিতে হয়। রাজা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এক জন কর্ম্মকর্ত্তা, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শের সভাপতি, জমীদার সভার সম্পাদক, ২৪ পরগণা জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, পোর্ট-ট্রাষ্টের ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সদস্য ইত্যাদি। তিনি সে সব পদ ত্যাগ করিতে

অস্বীকৃত হইলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে সে পদ দিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

মল্লিক মহাশয় আলীপুরের উকীল। তিনি ব্যবস্থাপক সভার মন্ত্রীদের বেতন হ্রাসের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তিনি কনষ্টিটিউশনাল ক্লাবের দলেও নহেন। এই কনষ্টিটিউশনাল ক্লাব একটি রহস্য। কোন মাড়োয়ারী (কি কারণে বলা যায় না) তাঁহার একটি প্রাসাদোপম গৃহ ছাড়িয়া দিয়াছেন। তথায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের থাকিবার ব্যবস্থা আছে। তাহার জন্য যে টাকা দিতে হয়, তাহা নামমাত্র। তবে সে ব্যবস্থার খরচ কে যোগায়? আর কেনই বা যোগায়? সে রহস্য এক দিন জানা যাইবে এবং তখন অনেক "বিখ্যাত" লোকের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে।

মন্ত্রীদিগের হাতে—অর্থাৎ সরকারের হাতে চাকরী ও উপাধি আছে। প্রয়োজনে সে সকলের সদ্ব্যবহারও হয়।

ছয় সপ্তাহের চাকরীতে মল্লিক মহাশয়ের যোগ্যতার ও স্বাধীনতার পরিচয় দেশের লোক অবশ্যই পাইবার আশা করেন। আর বোধ হয়, মল্লিক মহাশয়ের কার্য্যের সাফল্যের উপর ভবিষ্যতে কর্পোরেশনে বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিয়োগও অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে।

রাজপথে

চেয়ারম্যান (স্বগত)

স্বাধীন ব্যবসা—ভয় নাহি কোন কাজে;—
এ কি বাদ্য! কে আনিল পিঞ্জরের মাঝে?
কার্জ্জন যাচিল যাহা, আমি তাই পাই!
সংসারে কি এক ছাড়া আর পথ নাই?

রাজনীতিক বন্দীর মুক্তি

ভারতের নানাপ্রদেশে যে সকল কর্ম্মী অসহযোগনীতি অবলম্বন করিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহ কেহ মুক্তি পাইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে দেশপূজ্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করিতে হয়। যে সকল কাশ্মীরী পণ্ডিত যুক্তপ্রদেশে বাস করেন এবং সে প্রদেশে বিশেষ সম্মানিত, পণ্ডিতজী তাঁহাদিগের

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

চিররঞ্জন দাশ।

অন্যতম। ব্যবহারাজীব হিসাবে তাঁহার আয় যেমন অসাধারণ ছিল, ব্যয়ও তদনুরূপ ছিল। তাঁহার বিলাসিতার কথায় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ফ্রান্সে তাঁহার জামা কাচা হইত। দীর্ঘ জীবন এইরূপ বিলাসে অভ্যস্ত থাকিয়া পণ্ডিতজী জীবনের সায়াহ্নে মহাত্মা গন্ধীর আদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি বিলাসবর্জ্জিত জীবনযাপন করেন এবং দেশের কাযে আপনাকে উৎসৃষ্ট করেন। আজ ধর্ষণনীতির ফলে ভারতের নানাপ্রদেশে নেতারা কারাবদ্ধ। আমরা আশা করি, পণ্ডিতজী আবার নেতার স্থান অধিকার করিবেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে ভারতের উন্নতির পথ [illegible]।

বাঙ্গালায় শ্রীমান্ চিররঞ্জন দাশ প্রভৃতি কয় জন কর্ম্মীর কারাবাস শেষ হইয়াছে।

আসামের জননায়ক শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন অসুস্থ বলিয়া কিছুদিনের জন্য মুক্তি পাইয়াছেন।

তরুণরাম ফুকন।

যাঁহারা বলেন, রাজনীতিক আসামীদের প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করা হয় না, তাঁহারা নিম্নে প্রদত্ত চিত্রখানি লক্ষ্য করিবেন; রাজনীতিক বন্দীদিগকে কিরূপে চোর-দস্যুর মত বান্ধিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে।

প্রচণ্ড চণ্ডনীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কমিটীর মত এই যে, নিজেদের দাবী অনুযায়ী কার্য্য করাইয়া লইবার জন্য আইন অমান্য আরম্ভ করা প্রয়োজন। সুতরাং এই কমিটী প্রাদেশিক কমিটীগুলিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে গঠনমূলক কার্য্য

আসামে রাজনীতিক বন্দীর প্রতি ব্যবহার।

সম্পূর্ণ করিবেন। তখন আইন অমান্য বা এই জাতীয় অন্য কোনরূপ পন্থা গ্রহণ করা হইবে। (খ) সভাপতিকে অনুরোধ করা হউক, তিনি এমন কয়েক জন ভদ্রলোককে নির্ব্বাচিত করুন, যাঁহারা দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিবেন।

পণ্ডিত মতিলাল, ডাঃ আনসারী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত রামভুজ ও স্বামী সত্যদেব প্রভৃতি এখনই আইন অমান্যে অনুমতি দেওয়ার অনুকূলে বক্তৃতা করেন

কংগ্রেস কমিটী

৮ই জুন অপরাহ্নে লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে কারামুক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু আইন অমান্য প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রস্তাবটি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে (এই লক্ষ্ণৌয়েই ৬ই জুন) স্থির হয়। প্রস্তাবটি এই :—

(ক) এই পর্য্যন্ত কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে দেশবাসী তাদৃশ উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই। সমস্ত আক্রমণমূলক কার্য্য স্থগিত রাখা সত্ত্বেও সরকার দেশের নানা স্থানে

প্রতিনিধিদের এইরূপ মতবৈধের ফলে উল্লিখিত মূল আইন অমান্য প্রস্তাব সম্বন্ধে ছয়টি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল। কয়টি বাঙ্গালার পক্ষ হইতে ও একটি পণ্ডিত মালব্যজীর। ৯ই তারিখের অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহনের সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—৩০শে সেপ্টেম্বরের স্থানে ১৫ই আগষ্ট তারিখে আইন অমান্য বা সেইরূপ অন্য কোন উপায় স্থির হইবে।

গত ৫ই জুন লক্ষ্ণৌয়ে সেণ্ট্রাল খিলাফৎ, জমিয়ৎ-উলেমা ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সম্মিলিত অধিবেশনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা ও আবশ্যক মন্তব্য গৃহীত হয়। লোকের আত্মরক্ষার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটা কিছু করা যে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়ে সকলেই একমত হইয়াছেন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর উপর কর্ত্তব্য স্থির করিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছে। সভায় আর একটি বিষয়ের আলোচনা হয়;—সমস্ত বিলাতী দ্রব্য বয়কট। এখন কেবল বিলাতী বস্ত্র বয়কট চলিতেছে, ভবিষ্যতে বিলাতের সকল প্রকার জিনিষই বয়কট করা হইবে। সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত না হইলেও অধিকাংশই এ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের জন্য যদি জাপান, যুক্তরাজ্য বা জার্ম্মাণীর দ্বারস্থ হইতে হয়, তাহাও ভাল; তথাপি এক পয়সার বিলাতী জিনিষও ক্রয় করা হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নূতন ব্যবস্থার পর ভাইস-চান্সেলার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তখন সকলেই তাঁহার সে চেষ্টার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানারূপ বিদ্যার পঠনপাঠনব্যবস্থা করেন। সে কায যে ব্যয়সাধ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আশুতোষ স্বয়ং যেমন চেষ্টা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তেমনই এমন আশাও করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট আবশ্যক অর্থ দিতে কার্পণ্য করিবেন না। ইহার পর পাটনায় ও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কমিয়া গিয়াছে। তাহার পর শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পর হইতে দেশীয় মন্ত্রীর অধীন শিক্ষাবিভাগও হাত গুটাইয়াছেন। কাযেই পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস অচল হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যেই অধ্যাপকদিগকে বেতন দেওয়া কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ বাঙ্গালা সরকার ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা ঢালিতে কার্পণ্য করিতেছেন না। ঢাকায় টাকা দিয়া তথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু কলিকাতা হইতে যদি
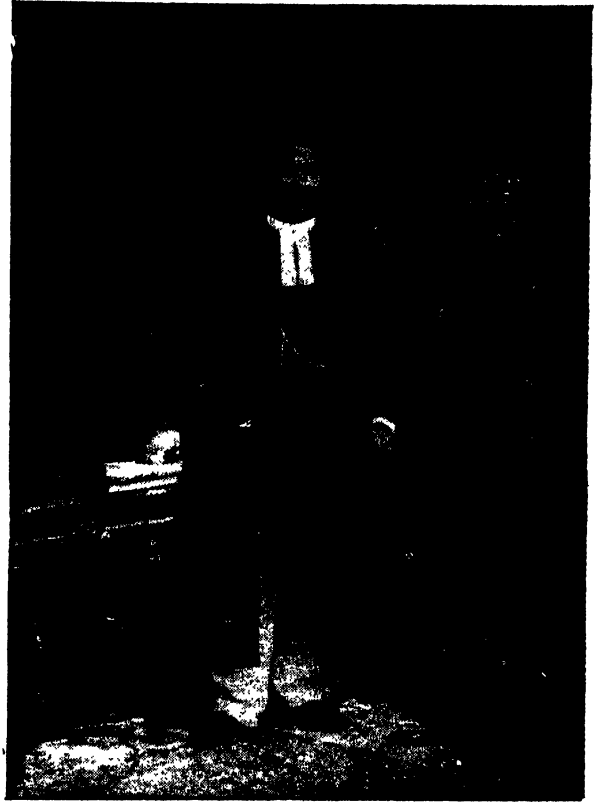
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাদানব্যবস্থা উঠিয়া যায়, তবে তাহার সমর্থনে কাহার কি বলিবার থাকিতে পারে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় যদি কোন দোষ থাকে, তাহার সংশোধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই জন্য—বা অন্য কোন কারণে—বিদ্যাশিক্ষার সর্ব্বনাশসাধন সমর্থিত হইতে পারে না।

মাসপঞ্জী

২১শে বৈশাখ—

সারদাপীঠের জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য কলিকাতায়; খেলাফৎ কমিটী কর্ত্তৃক হাবড়ায় আদর অভ্যর্থনা। গোপ-সমিতির সিদ্ধান্ত—সদস্যরা দুষ্ট গোয়ালাদের ধরাইয়া দিবেন। রাজদ্রোহের অপরাধে হসরৎ মোহানীর ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড; যুদ্ধচালনার সাহায্য করার অভিযোগের বিচার হাইকোর্টে হইবে। কক্সবাজারে শাহ বদিউল আলামের ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। আয়ারলণ্ডে যুদ্ধ স্থগিত। ইটালীর সহিত কনস্তান্তিনোপলের চুক্তি। জেনোয়ায় ফরাসী বেলজিয়মে মিতালী।

২২শে বৈশাখ—

পেশোয়ারে পণ্ডিত মালব্যজীর বক্তৃতা বন্ধ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের তৃতীয় সম্পাদক শ্রীযুত শশাঙ্কজীবন রায়ের এবং স্বদেশী বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাঃ বীরেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের কারামুক্তি। লক্ষ্ণৌ জেলে স্বামী ভাস্কর তীর্থের পূজিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিত্র জোর করিয়া স্থানান্তরিত করণ; প্রতিবাদে রঙ্গ আয়ারের ঠাণ্ডা গারদ।

২৩শে বৈশাখ—

বিহারের শ্রীযুত রাজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মানহানির মামলার প্রত্যাহার। নিখিল ভারত উলেমা সভার সম্পাদকের রাজদ্রোহ সভা বন্ধের আইনে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। কোলাপুরের মহারাজের পরলোকগমন। জেনোয়ায় রাজনীতিক মহলে চাঞ্চল্য; ইংলণ্ড ইটালীর মিলন, ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের বিচ্ছেদ আশঙ্কা। এলাহাবাদে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল নেহেরুর নামে ক্রোকী পরোয়ানা; শ্রীযুক্তা নেহেরুর স্বামী যে ১০০ শত টাকা অর্থদণ্ড দেন নাই, তাহার জন্য ইতিপূর্ব্বে আর একবার বৈদ্যুতিক পাখা ক্রোক করা হয়, কিন্তু পুলিস পাখা হইতে ৫৫৲ টাকার বেশী তুলিতে পারে নাই। এবার ২৫৲ টাকার একটি ঘড়ি ১৫৲ টাকায় ও পণ্ডিতজীর কন্যার নিজস্ব ৪০০৲ টাকা দামের একটি অরগ্যান ৩০৲ টাকার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অরগ্যানটি বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় বসাইয়া বাজাইয়া লওয়া হয়। লেলোরে শ্রীমতী এথিরাজম্মার [১৮৮ ধারার আসামী] মামলা; হেড কনষ্টেবলের সাক্ষ্য মিথ্যা। বোম্বায়ে লিবারেল কন্‌ফারেন্স; সভাপতি শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মুখে মহাত্মার ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রশংসা; ভারতবাসীর স্বরাজ-লাভ আকাঙ্ক্ষায় লর্ড মেষ্টনের কারণ প্রদর্শন। পারস্য কর্ত্তৃপক্ষের রাজস্ব ও পূর্ত্ত বিভাগে ১২ জন মার্কিণ পরামর্শ-দাতা নিয়োগের সঙ্কল্প। এলাহাবাদে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল নেহেরুর পত্নীর নামে ক্রোকী পরোয়ানা; পণ্ডিত শ্যামলালের জরিমানার ১০০৲ টাকার মধ্যে বাকী ৪৫৲ টাকা, ৪০০৲ মূল্যের একটি অরগ্যান [সেটি আবার পণ্ডিতজীর কন্যার] ও ২৫৲ টাকা মূল্যের একটি ঘড়ি ক্রোক করিয়া আদায়। পূর্ব্বে যে বৈদ্যুতিক পাখা ক্রোক করা হয় প্রকাশ, তাহাতে ৫৫৲ টাকার বেশী আদায় হয় নাই।

২৪শে বৈশাখ—

আসামের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সার বীটসন বেল বিলাতে যাজকের কার্য্যে দীক্ষিত। অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকারের য়ুরোপে কোন য়ুরোপীয় মহিলার সহিত বিবাহ। হিন্দী পত্র "স্বতন্ত্র"-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ীর কারামুক্তি।

২৫শে বৈশাখ—

খাজনাবন্ধে পঞ্জাবে হাঙ্গামা; ৯ জন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক জখম। লেলোরে দুইটি মহিলা কর্ম্মীর নামে ১৮৮ ধারার মামলা। আমেদাবাদে মিউনিসিপ্যাল টেক্স বন্ধের ব্যবস্থা। বোম্বাই প্যারেলে অগ্নিকাণ্ডে বি বি সি আই রেলের ৬০ হাজার টাকা ক্ষতি। গন্ধী-পত্নীর স্বামিসন্দর্শনে বাধা। মেবারে পুলিসের অনাচারে তিন শত মহিলা দলে দলে আইন অমান্যে অগ্রসর; পুলিস হতভম্ব। এলাহাবাদ হাইকোর্টে পরাজিত নিজ মক্কেলের হস্তে উকীলের প্রহার লাভ। বস্তীতে পুলিস জুলুমের অভিযোগ; কংগ্রেস অফিসে অগ্নিপ্রদান, বহু কংগ্রেস কর্ম্মী আহত। কটকে পণ্ডিত গোপবন্ধুর প্রতি চতুর্থবার ১৪৪ ধারা; কটক জেলা পরিভ্রমণ করিয়া সভা, জনতা বা আন্দোলনের ব্যবস্থা, তাহার অনুষ্ঠান, তাহাতে বক্তৃতা ও যোগদান করা এবং অসহযোগ আন্দোলন চালান বা চালাইতে সাহায্য করা নিষেধ। বরিশালে শ্রীমতী গোলোকমণির নামে একটি মহিলার ৩৪১ ধারায় ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড। প্রেস আইন উঠিয়া যাওয়ায় দিল্লীর কতকগুলি সংবাদপত্রের জামীনের টাকা ফেরৎ দিবার আদেশ। গন্ধী টুপী পরিয়া আদালতে যাওয়ায় গন্টুরে ৩ জনের দণ্ড।

২৬শে বৈশাখ—

বেলজিয়ামে বৃটিশ রাজ-দম্পতী। টাঙ্গাইলে ১৪৪ ধারা, সহরের পাঁচ মাইলের মধ্যে এক মাসের জন্য সভাবন্ধ। চিকাগোর ইউনিটী পত্রিকায় মহাত্মার সমাদর, মহাত্মার আন্দোলনে বিশ্বমানবের মহাপ্রাণের নব উদ্বোধন। বোম্বাই, গিরগাঁও পুলিস আদালতে কোন বৃদ্ধ হাকিমকে প্রহার করার অপরাধে কাপ্তেন আমারের দুই শত টাকা জরিমানা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এল প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় বেগম সুলতানা মুয়াজিদ জাদা কর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার; মহিলাটি মুসলমান হইলেও হিন্দু আইনেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম উৎকল মহিলা, কুমারী নির্ম্মলা নায়কের বিলাত হইতে স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত উচ্চ জ্ঞানলাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন। কলিকাতায় গুণ্ডার গুলিতে হেড কনষ্টেবল জখম। বড়লাটের পদত্যাগ আশঙ্কার প্রতিবাদ। ফ্রান্স ব্রিটেনের বিচ্ছেদ পাকাপাকি নয়, সাময়িক মনোমালিন্য।

২৭শে বৈশাখ—

মধ্যপ্রদেশের নামজাদা মডারেট সার বিপিনকৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক খদ্দর.

আন্দোলনের প্রশংসা। মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটীতে দুইটি প্রস্তাব;—ভবিষ্যতে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় তাড়ির জন্য আর নগদ জমা দেওয়া হইবে না; সহরের মহিলা ও শিক্ষিত সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য একজন ভারতীয় মহিলাকে সরকার মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য মনোনীত করিলে ভাল হয়। অন্ধ্রদেশে কুটীর-শিল্পে টেক্স ধার্য্য ও তাহা আদায় করিবার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ। আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ। জেনোয়ায় রুসিয়ার ১০০ কোটী ডলার ঋণের দাবী, নতুবা পূর্ব্ব ঋণ গ্রাহ্য হইবে না। জার্ম্মাণী তাহার অবশিষ্ট জেপ্লিনগুলি মিত্রপক্ষকে না দিয়া ধ্বংস করার জন্য নব্বই লক্ষ স্বর্ণ মার্ক ক্ষতিপূরণের দাবী; রাজদূত-সভার সিদ্ধান্ত। স্বত্বাধিকারী হাতেওয়ার মহারাজ বাহাদুরের ইচ্ছা অনুসারে বাঁকীপুরের ইংরেজী দৈনিক এক্সপ্রেসের প্রচার বন্ধ। কলিকাতায় হেড কনষ্টেবলের আততায়ী গুণ্ডা—শেখ হিন্দু গ্রেপ্তার। যশোহরে তিন জন কংগ্রেস কর্ম্মীর উপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যশোহর ত্যাগের নোটিশ; আদেশ অমান্যে এক জন ফৌজদারী সোপর্দ্দ। যশোহরের জেলা খেলাফৎ কমিটীর সহকারী সম্পাদকের রাজদ্রোহ অপরাধে সাত মাস সশ্রম কারাদণ্ড। বেপুরের পরমানন্দ আগরওয়ালার পাল্টা জবাব। ডেপুটী কমিশনারের বিরুদ্ধে নালিশ। মুলসীপেটার ব্যাপারে সত্যাগ্রহী অধ্যাপক পরাঞ্জপে, ডাঃ ফাড়কে ও শ্রীযুক্ত দামলের কারাদণ্ড। অন্ধ্রদেশে কুটীর-শিল্পের উপর টেক্স। ঢাকায় ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। প্রেসিডেন্সী জেলের দুই জন পলাতক কয়েদী ধরা পড়ায় তাহাদের কারাদণ্ড।

২৮শে বৈশাখ—

মেবার, মঙ্গলগার পুলিস ৫ জন পুরুষ ও ১১টি স্ত্রীলোককে খোস-খেয়াল মত গ্রেপ্তার করায় ৫০০ মহিলা দলে দলে [প্রতি দলে ২৫ জন] গ্রেপ্তার হইতে অগ্রসর; তখনই বিনাসর্ত্তে সকলকে মুক্তি প্রদান; মহিলাগণ কর্ত্তৃক সভা করিয়া আপত্তিজনক খদ্দর প্রস্তাব গ্রহণ। ভারতের অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে ভারত সরকারের মতামত ভারত-সচিবের নিকট প্রেরিত ও বিলাতে প্রকাশিত হইবার পর ভারতে তাহার প্রচার। বিহার জেলে দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে মৌলবী খুরশেদ হোসেনের অনুযোগ; ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ, অপমান, কোরাণের অসম্মান, বক্সার জেলে কোন "স্বামী"র কান মলিয়া দিবার আদেশ, স্বামীজীর ঠাণ্ডা গারদ। লায়লপুরে জনতা "সৎ-শ্রী-আকাল" শব্দ করিয়া পুলিসের হাতে প্রহৃত হওয়ায় স্থানীয় ব্যবহারাজীবদের প্রতিবাদ ও বড়লাটের নিকট তদন্ত প্রার্থনা। কেনিয়ার সুপ্রিম কোর্টে স্থানীয় অধিবাসীদের অদ্ভুত সামাজিক প্রথার সমর্থন; লোকান্তরিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী-পুত্রে কনিষ্ঠের অধিকার স্বীকৃত; বাদী সাবালক না থাকায় [বয়স ১৪ বৎসর] সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষার আদেশ; ভ্রাতৃবধূর বয়স ৩৫ বৎসর। অম্বালা জেলে অব্যবস্থার প্রতিবাদে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায়োপবেশন। মুলসীর সত্যাগ্রহ মামলায় নাগপুরের কয়জন নেতা ও মাওলা মণ্ডল প্রভৃতিদের কারাদণ্ড। ভীলদমনে গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিমুখে। নেলোরে শ্রীমতী যথিরাজ অম্মার ১৮৮ ধারার মামলায় হেড কনষ্টেবলের সাক্ষ্য মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত। লক্ষ্ণৌ জেলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সরান সম্পর্কে সরকারী প্রতিবাদ; দেওয়ালে ছবি টাঙ্গান জেল-নিয়মের বিরোধী; ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এলাহাবাদে মহাত্মার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত দেবীদাস গন্ধী গ্রেপ্তার; অভিযোগ সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ [৪] ও দণ্ডবিধির ১১৭ ধারার। তাঁহার শেষ বাণী—খদ্দর পরিধান কর। বস্তীর প্রহার ব্যাপারে সরকারী প্রতিবাদ। যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেসের যে ৫৫ জন সদস্যকে এলাহাবাদে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁহারা এখন লক্ষ্ণৌ জেলে; তাঁহাদের মধ্যে এক জন যুবকের মৃত্যু, চিকিৎসার অব্যবস্থার অভিযোগ; কয়েকজন রাজনৈতিক কয়েদীর জেলের মধ্যে সর্দ্দী-গর্ম্মী। লক্ষ্ণৌ জেলে পিতা পণ্ডিত মতিলালের সহিত দেখা করিতে যাইলে শ্রীযুত জহরলাল নেহেরুর গ্রেপ্তার; অভিযোগ-দণ্ডবিধির ১২৪এ ও ৫০৬ ধারা। বীডনবাগান ও মীর্জ্জাপুর পার্কে সারদাপীঠের জগদ্গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যজীর বক্তৃতা; স্বরাজের আদর্শ ভারতেরই নিজস্ব, স্বরাজ আন্দোলন রাজদ্রোহ নহে। ইটালী ও আফগানিস্থানে সন্ধি। রোমের পোপের সহিত রুসিয়ার সন্ধি; রুসিয়ায় ক্যাথলিক মিশনগুলি রক্ষার ব্যবস্থা, রুসিয়া কর্ত্তৃক ধর্ম্ম সংক্রান্ত স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে, পোপও গীর্জ্জা-সংক্রান্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু লক্ষ্ণৌ হইতে নৈনিতালে স্থানান্তরিত। সিরাজগঞ্জ জেলে দাঙ্গা। কলিকাতা চিৎপুর রোডে একটি বিধবা কায়স্থ কন্যার পুনর্ব্বিবাহ।

২৯শে বৈশাখ—

সীতাপুর জেলায় দণ্ডনীতি পরিচালনার ফলে বহু গ্রাম লুঠ ও প্রহারের সংবাদ; খদ্দর পরা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদিগকে অস্ত্র প্রদান, আরবদের আপত্তি। এঙ্গোরা সাহায্য-ভাণ্ডারে দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের অর্থসাহায্য, তন্মধ্যে নানাস্থানে খেলাফৎ কমিটী। যশোহরের জেলা বোর্ড ৫০ হইতে ২০০ পাতকুয়া কাটাইয়া পানীয় জলের অভাব দূর করিবেন, স্থির করিয়াছেন। পঞ্জাব, আনন্দপুরে যোধিসিংহ সিং নামক কোন গণ্য মান্য শিখ জমীদারের অনুপস্থিতিতে জোর করিয়া পুলিসের অন্দরে প্রবেশ, মহিলারাও পরে বাটী হইতে বহিষ্কৃত। আফগানিস্থানে জাল করা অপরাধে প্রাণদণ্ড। বোম্বায়ের মুসলমান নেতা শেঠ হাজী সিদ্দিক মোহাম্মদ ক্ষত্রি সাহেবের ভবনে দুইটি বিবাহ উপলক্ষে সৎকার্য্যে চার হাজার টাকা দান। মাদ্রাজের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হেয়েলী গ্রীষ্মাতিশয্যে সন্ধ্যার পর বাসায় ধুতি পরেন ও খড়ম পায়ে দেন। দেবীদাস গন্ধীর ১৮ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড, আওরাণ নামক স্থানে বক্তৃতা দিয়া লোকজনকে অপরাধী করিতে সাহায্য করার অপরাধ সাব্যস্ত; শ্রীযুক্ত গন্ধী জনগণকে স্বেচ্ছাসেবক হইতে বলিয়াছিলেন; তিনি আদালতে অপরাধ স্বীকার করেন, জবানবন্দীতে বলেন, তাঁহার বিশ্বাস, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কারাদণ্ডেই স্বরাজ লাভ হইবে, তিনি কঠোরতম দণ্ডের প্রার্থনা করেন। দেবীদাসের বিচার দেখিতে গিয়া তাঁহার সাতজন সহকর্ম্মী—কংগ্রেস ও খেলাফৎ সম্পাদকদের গ্রেপ্তার। জহরলাল লক্ষ্ণৌ হইতে এলাহাবাদে। মণ্টগোমারী জেলে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর পঞ্জাবলাট সমীপে উক্ত জেল-পরিদর্শনের অনুমতি প্রার্থনা; ঐ সঙ্গে ডেরাগাজীখাঁ জেল পরিদর্শনে ইচ্ছা; উহার পরিদর্শনে আপত্তি। ৮৪ জন পঞ্জাব সিবিলিয়ান শাসন-সংস্কার ব্যবস্থার কাযা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া পেন্সনের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। বিহারে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের জন্য গুলজারবাগের সরকারী স্বাস্থ্যবিদ্যালয়ের কবিরাজদিগকে আবশ্যক শিক্ষা প্রদান। কলিকাতা খেলাফৎ কমিটীর প্রধান প্রচারক মৌলবী সৈয়দ মানজুর আলি রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার। জেনোয়ার সম্মিলিত পক্ষের মীমাংসা প্রস্তাবে রুসিয়ার উত্তর;—যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণ মানিয়া লইতে ও বিষয়সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার স্বীকার করিতে অসম্মতি; রুসিয়ায় বৈদেশিকদের হস্তক্ষেপের ক্ষতিপূরণ করিলে ঋণ স্বীকার করা যাইতে পারে; আর্থিক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে কমিশন নিয়োগে সম্মতি। গ্রীক্-তুরস্ক-যুদ্ধে রুসিয়া নিরপেক্ষ থাকিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। রুসিয়ার প্রত্যুত্তরে ইটালী ও ইংলণ্ডের এখনও আশা, কিন্তু ফ্রান্স-বেলজিয়ামের ভিন্ন মত। কলিকাতায় দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে মোটর ডাকাতি, বীটের কনষ্টেবলের উদ্দেশ্যে গুলীবর্ষণ; ৬ হাজার টাকা ক্ষতি।

৩০শে বৈশাখ—

পুলিসের আদেশে মাদারীপুরে বাড়ীওয়ালা কর্ত্তৃক কংগ্রেস অফিস

উঠাইয়া লওয়ার নোটিস। জেনোয়ায় জনরব, নিপীড়িত ব্যক্তিসঙ্ঘ বা লীগ অব অপ্রেস্‌ড নেশনস্‌ ভারতে এক লক্ষ মশার পিস্তল ও সঙ্গীন এবং দশ কোটী টোটা সমুদ্রপথে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কোহাট সহরে রোজা-কারী মুসলমান সমাজের প্রার্থনায় বিবাহে বাইনাচ বন্ধ। রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের লোকান্তর। মার্কিণে ব্যয়সঙ্কোচ কমিটিতে সাক্ষ্য-দানকালে সমর-সচিব বলিয়াছেন, মার্কিণের স্থায়ী স্থল-সৈন্যের সংখ্যা দেড় কোটির কম করা যাইতে পারে না; কারণ, রুস-জার্ম্মাণ মিতালী। এলাহাবাদে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে জহরলাল, কেশদেব মালব্য ও আর সাত জনের মামলা আরম্ভ, দম্মাহাটার মোটর ডাকাতিতে মোটর চালক, অন্য ১৩ জন হিন্দুস্থানী ও একজন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার; খানাতল্লাসীতে রিভলভার বাহির। বেলজিয়াম হইতে সম্রাট-দম্পতীর প্রত্যাবর্ত্তন।

৩১শে বৈশাখ—

ব্রহ্মের ভাবী ব্যবস্থাপকসভা বয়কটের প্রস্তাব। সবরমতী জেলে মৌলানা হস্‌রৎ মোহানীর কয়েদীদের সহিত মেলা-মেশায় বাধা। ফরিদপুরের মিউনিসিপ্যাল এলেকায় গো-বধ বন্ধের প্রস্তাব। পাঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মিঞা ফজলাল হকের পক্ষ হইতে লাহোরের "দেশ" পত্রের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার নোটিশ। বিচারাধীন আসামীদের হাতে হাতকড়া দেওয়া ও তাহাদের সম্মান অসম্মানের প্রতি স্থানীয় সরকার কর্ত্তৃক পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ। লাহোর জেলে প্রায়োপবেশন। ম্যানিলায় যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্‌; পোলো খেলিতে গিয়া বল লাগিয়া আহত। সম্রাট-দম্পতীর বেলজিয়াম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

মান্দ্রাজের "কোয়ামী রিপোর্ট" পত্রের সম্পাদক ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেও প্রবন্ধ লেখকের নাম না বলায় ৯ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড; মোপলা হাঙ্গামা সংক্রান্ত দুইটি প্রবন্ধ রাজদ্রোহপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছিল। পারস্যে উরুমিয়া অঞ্চলে খুর্দ্দগণের বিদ্রোহ। চীনে উভয় পক্ষই প্রবল। শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা। শিমলা হইতে মান্দ্রাজ ও সিংহল হইয়া যাইবেন।

২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে বৈশাখ [১২ই, ১৩ই ও ১৪ই মে] বোম্বায়ে হাকিম আজমল খাঁর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন; কয়েকটি মন্তব্য—দেশে জাতীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য হাকিম আজমল খাঁ, ডাঃ আনসারী, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও অধ্যক্ষ শিডবাণীকে লইয়া একটি কমিটী গঠন; আমেদাবাদের অন্ত্যজ কার্য্যালয়ে আরও ১৭৩৮১৲ টাকা সাহায্য [পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল ৫০০০৲]; আমেদনগর অনুন্নত শ্রেণীর আশ্রমের জন্য ৫০০০৲ ও মান্দ্রাজের অনুন্নত শ্রেণীর জন্য ১০০০০৲ টাকা বরাদ্দ; খদ্দর প্রচলনের জন্য ১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ; বাজেট—কারীগরী শিক্ষায় ৫০০০, বিক্রয় বিভাগে ২ লক্ষ, উৎপন্ন বিভাগের অফিস ২০ হাজার, কংগ্রেস সংবাদ সরবরাহে এক লক্ষ ও বিভিন্ন প্রদেশে ঋণ ১৩৫৫০০০৲ টাকা। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জার্ম্মাণীর প্রথম রাজদূত গমন। শিয়ালকোটের অতিরিক্ত পুলিস লাইনের ২০ জন কনষ্টেবল পদত্যাগ করায় আদালতে অভিযুক্ত; কয়েক মিনিটের বিচারে প্রত্যেকের তিন মাস কারাদণ্ড। রঙ্গপুরে দম্পতী-কলহে পুত্রবতী যুবতীর কেরোসিনে আত্মহত্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ,—

এলাহাবাদে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নক্সের আদালতে পণ্ডিত জহরলালের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন;—[১] সভাস্থলে বক্তৃতায় পিকেটিং সাহায্যে বস্ত্র ব্যবসায়ের ক্ষতি করিবার ভয় প্রদর্শন, [২] উক্ত বক্তৃতায় পিকেটিংয়ে সকলকে সাহায্য করিতে বলায় ভয় প্রদর্শনে সাহায্য, [৩] পিকেটিং ব্যবস্থায় ও এলাহাবাদের টাউন কংগ্রেসকে সাহায্য। শ্রীযুক্ত কে, ডি, মালব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ—টাকা আদায়ের জন্য ভয় প্রদর্শন, টাকা আদায়ে সাহায্য। চট্টগ্রামের হায়দার আলীদের দলে স্থানীয় রেল ষ্টেশন হাঙ্গামা মামলায় জ্যোতিঃ-সম্পাদক শ্রীযুত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর অব্যাহতি; মৌলবী সিরাজুল হকের পুনর্ব্বিচারের ব্যবস্থা। হেগে দুইটি স্বতন্ত্র কমিশন বসাইবার প্রস্তাবে রুসিয়ার আপত্তি। ম্যানিলা হইতে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের লেবাউন যাত্রা। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির পদ গ্রহণে লর্ড লিটনের সম্মতি। আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষিত সম্মেলনে জাতি-সংঘ কর্ত্তৃক কলিকাতার অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় [১] নিযুক্ত; বিভিন্ন দেশের দশ জন নীতিবিদ্‌ মিলিয়া আন্তর্জ্জাতিক সমস্যায় সৎপরামর্শ দিয়া পরস্পরের সাহায্য করিবেন। তুর্কীদের দ্বারা ১০ হাজার গ্রীক হত্যার সংবাদে বৃটিশ কর্ত্তৃক অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগের সঙ্কল্প। রাজনৈতিক কারণে বিলাসপুর মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্ব্বাচিত সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণে বাধা। এলফ্রেড থিয়েটারে অভিনয়ের মহলায় অভিনেতা লালুমলের মৃত্যু; সীসার নলে বিদ্যুৎ চালনায় দুর্ঘটনা। চাঁদপুর থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে পলাতক আসামী গ্রেপ্তারে গুর্খা ও সশস্ত্র পুলিসের আবির্ভাব; পুরুষদের গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন কয়েক জনের বাটী যাইয়া জিনিষপত্র ক্রোক। চাঁদপুরের আলগি ও চর-দুকিয়া ইউনিয়নে সশস্ত্র পুলিসের আবির্ভাবে অসহযোগী চৌকীদার ও দফাদারগণের আবার কম্মগ্রহণ; কয় দিন ধরিয়া ঐ অঞ্চলে এক জনও চৌকীদার বা দফাদার ছিল না।

২রা জ্যৈষ্ঠ,—

দম্মাহাটা মোটর ডাকাতি সম্পর্কে একজন পশ্চিমা গ্রেপ্তার, তাহার নিকট হইতে কিছু টাকার উদ্ধার। সার্ভেণ্ট মানহানি মামলায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত ও নরেন্দ্রনাথ শেঠের সাক্ষ্য ও জেরা। রায়পুরে ধাম্ত্রী তহশীল কংগ্রেসের সম্পাদক ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভ্য, পণ্ডিত নারায়ণ রাও মেঘার কারাদণ্ডে তাঁহার ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধা জননী আদালতে আসিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ ও স্বহস্তে পুত্রের বিদায় সজ্জা। হেগসভায় মার্কিণের যোগদানে অসম্মতি। আবার সাইলিশিয়ার সমস্যার সমাধান, পোল জার্ম্মাণ সন্ধি। আহিরীটোলার বালিকা বধূর নির্য্যাতন মামলায় বধূর জেরা আরম্ভ। কানপুরের মৌলানা মহম্মদ ইয়াশিনের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড; মৌলানাজীর জবানবন্দীতে প্রকাশ, দারোগার রিপোর্ট ও তাঁহার বক্তৃতা—দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস, সাক্ষী চার জনের দুই জন সভায় ছিল না, দুই জন উর্দ্দু জানে না। শিয়ালকোটের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ। কাবুল বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রথম বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ। বলশেভিকদের ব্যাঙ্ক নোট প্রচারের চেষ্টায় মান্দ্রাজে এক জন আফগান প্রজা অভিযুক্ত। বিলাতে শিক্ষকদের পেন্সন-ভাণ্ডারে মাহিনার শতকরা ৫ ভাগ কাটিয়া রাখিবার প্রস্তাব মহাসভায় অগ্রাহ্য; সরকার পক্ষের পরাজয়। মজঃফরপুর মিউনিসিপ্যালিটীতে মুসলমান পর্ব্ব দিন ব্যতীত অন্য সময় গো-বধ বন্ধের প্রস্তাব।

৩রা জ্যৈষ্ঠ,—

নাটালের "হিন্দী" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত ভবানীদয়ালের সহধর্ম্মিণী জগরাণী দেবীর লোকান্তর সংবাদ; জগরাণী ১৯১৩-১৪ অব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সংগ্রামে পূজনীয়া শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গন্ধীর নেতৃত্বে অন্যান্য প্রবাসী ভারত-মহিলার সমভিব্যাহারে দেড় বৎসরের শিশু-সন্তান ক্রোড়ে লইয়া কারাবরণ করেন। আঙ্গোরাতে আফগান আমীরের উপস্থিতি ও অভ্যর্থনা। ইটালীতে আফগান দূত। আফগানিস্থানে তুর্কী অধ্যাপক। কাবুলে আঙ্গোরার প্রতিনিধি। নূতন করিয়া টাকা আমানত রাখিয়া "সুরমা" পত্রের পুনঃপ্রকাশ। ডিব্রুগড় জেলা কংগ্রেস কমিটীর প্রধান কর্ম্মী পণ্ডিত শিবচরণ শর্ম্মা [মাড়োয়ারী] পিকেটিং করিয়া গ্রেপ্তার। আসামের সুপ্রসিদ্ধ অসহযোগী নেতা [ব্যারিষ্টার] শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন শিলচর জেলে অসুস্থ হইয়া পড়ায় সরকার কর্ত্তৃক তাঁহার ছয় মাসের "ছুটী" মঞ্জুর ও চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় প্রেরণ। বড়বাজার কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, হিন্দী দৈনিক ভারতমিত্রের প্রধান সম্পাদক

পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণজী গার্দ্দের ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর একদিন পূর্ব্বে অব্যাহতি। এলাহাবাদের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের প্রকাশের জন্য ন্যাশান্যালিষ্ট জার্ণাল কোম্পানীকে নিখিল-ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর ২৫ হাজার টাকা ঋণ প্রদান। লাহোর মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক মসজিদ ভঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের আপত্তি, ছয় জন মুসলমান গ্রেপ্তার।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ,—

দ্বিতীয় গন্ধী দিবস [১৮ই মে]। সিন্ধু, হায়দ্রাবাদে 'গারলস্ কলেজ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব; ভাই শ্যামদাসের লক্ষ টাকা দান। বাঙ্গালী সৈন্য লইয়া টেরিটোরিয়াল দল গঠন; দুইটি কোম্পানী পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। পল্লী-স্বাস্থ্য উদ্ধারে যশোহরে মথুরাপুরে উন্নতিবিধায়িনী সমিতি নামে যৌথ কোম্পানীর চেষ্টা; বন জঙ্গল পরিষ্কার, খানা-ডোবা ভরাট, স্নান ও পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ। রাণাঘাটে সূতার ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার আয়োজন; মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। আগামী সেশন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস উঠিয়া যাইবার কথা; টাকার অনাটন। জেনোয়ায় তুর্কী প্রতিনিধির যোগদানের [?]সংবাদ। ইটালী হইতে তুর্কীদের সমরোপকরণ সংগ্রহের চুক্তি, তহবিল তসরূপে সিমিংটন কক্স কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারের কারাদণ্ড। পণ্টাসে গ্রীকগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান; বৃটিশ মহাসভার সংবাদে অবিশ্বাস, স্মার্ণায় গ্রীকদের অত্যাচারে ফ্রান্সের তদন্ত প্রস্তাব; তুর্কী অত্যাচারের তদন্তে বৃটিশকে সাহায্য করিতেও সম্মতি। তুর্কী অত্যাচারে আঙ্গোরার প্রতিবাদ। ইটালীও বৃটিশের তদন্ত প্রস্তাবে সম্মত; কেবল মার্কিণ অসম্মত। ভারত সরকার কর্ত্তৃক টেলিফোনের শুল্ক-বৃদ্ধির সংকল্প। মাদ্রাজের কংগ্রেস প্রচারিকা শ্রীমতী বালা সরস্বতী অনুসূয়ার সরকারী চণ্ডনীতিতে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা; মহিলাটি জেলে যাইবার জন্য বিশেষ জেদ প্রকাশ করিলেও এক ব্যক্তি তাঁহার জরিমানা জমা দিয়া দেয়; পুলিস জোর করিয়া জরিমানা আদায় করিয়া লইবে জানিয়াও মহিলাটি জেলে যাইতে চাহিয়াছিলেন। এলাহাবাদে "গন্ধী-দিবসের" শোভাযাত্রায় বাধা। রুসিয়ায় সমরায়োজনের জনরব; কোয়েম্বাটুর জেলে "গন্ধী-পুণ্যাহ।" দিল্লীতে "গন্ধী-পুণ্যাহ" স্বদেশী ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর।

৫ই জ্যৈষ্ঠ—

এলাহাবাদ পিকেটিং-মামলার রায়; পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক শত টাকা অর্থদণ্ড, জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাস। পণ্ডিত কেশদেও মালব্য এবং খুদরগর খাঁরও ঐরূপ দণ্ড, অবশিষ্ট ছয় জন আসামীর ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড, বিকল্পে আরও দুই মাসের কারাদণ্ড। অসহযোগ আন্দোলনে শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের উন্নতি ও সাফল্যকামনা। সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে লাহোরে তিন জন শিখের পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড। জলন্ধর জেলে প্রায়োপবেশন। আপীলে ভাওয়াল মানহানি মামলার পুনর্ব্বিচারের আদেশ। রেঙ্গুনে রাজনৈতিক সভার শোভাযাত্রা, সভাপতিকে হত্যা-চেষ্টার সরকারী প্রতিবাদ; জনতাকে ভয় দেখাইবার জন্য গুলীবর্ষণ; লোকটার পাশ কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। জেনোয়ায় বিরোধ স্থগিতের প্রস্তাবে সম্মতি; রুসিয়া ও কয়টি ছোট রাজ্যের সর্ত্ত। জমিয়ৎ উলেমার আদেশ অনুসারে সিউনীতে মুসলমান দারোগার পদত্যাগ। এসিয়ামাইনরে উভয় পক্ষের অত্যাচারের তদন্তের জন্য লণ্ডন মোস্লেম লীগের দাবী। ১৯২১ অব্দের এপ্রিল হইতে ২২ অব্দের মার্চ্চ পর্যন্ত এক বৎসরে জার্ম্মাণীর সীমান্তে কাষ্টম-কমিশনররা ৬৮৬০০০০ পাউণ্ড আদায় করিয়াছে; জার্ম্মাণীতে অবস্থিত বৃটিশ সেনার জন্য ঐ অর্থ হইতে ৬১০৫০০০ পাউণ্ড গ্রহণ করা হইয়াছে; অবশিষ্ট জমা আছে। বেলিয়াঘাটার এক জন ডাক্তার, তাঁহার পুত্র ও আর দুই জন ভদ্রলোককে অপ্রয়োজনে গ্রেপ্তার ও হাজতে প্রহার করায় স্থানীয় থানার দুই জন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনিবার নিমিত্ত পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ। আগরার জেলা জেলে রাজনৈতিক কয়েদীর মৃত্যুর পর শবানুগমনের শোভাযাত্রায় বাধা। আগরার কংগ্রেস অপিস হইতে প্রত্যহ পুলিস কর্ত্তৃক স্বরাজ পতাকা গ্রহণ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পিকেটিংয়ে আবার গ্রেপ্তারের ধুম, মহকুমা হাকিম মিঃ এলিস কর্ত্তৃক একজনের গণ্ডে চপেটাঘাত। বিক্রমপুর, ইচাপুর হাইস্কুলের শিক্ষক পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর কেরোসিন সাহায্যে প্রাণত্যাগ। আলিগড়ের জাতীয় মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পত্নী বেগম আবদুল মজিদ খাজার সম্পাদকতায় হিন্দু নামক সাপ্তাহিক উর্দ্দু পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প ও শ্রীযুত আবদুল মজিদ খাজা এখন আগ্রা জেলে। ১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৯-২০ পর্য্যন্ত বিদেশী সূতার আমদানী হ্রাস পাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরে শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়িয়াছে; বিদেশী কাপড়ের আমদানীই ক্রমেই কমিতেছে; ১৯১৪-১৫ অব্দের তুলনায় ১৯২১-২২ অব্দে অর্দ্ধেকেরও কম।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—

বেলঘরিয়ায় সশস্ত্র ডাকাতি; ডাকাত ও গ্রামবাসীতে লড়াই; তিন জন গ্রামবাসী আহত। দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের পরিবারবর্গ কর্ত্তৃক কংগ্রেস ও খেলাফতের কাযের জন্য সংগৃহীত "স্বদেশ সেবা ভাণ্ডারে"র হিসাব প্রকাশ; ৫৩২৭২৲ টাকা মজুদ। "বাঙ্গালার কথা" রেজেষ্ট্রী করাইবার আদেশ। কাইসার-ই হিন্দ ডাক জাহাজে লাহোরের সুলতান, বিকানীরের মহারাজা, স্যার শিবস্বামী আয়ার ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায়ের বিলাত যাত্রা। তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গোপন দান পাঁচ হাজার টাকা; দাতা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। সার্ভেণ্ট মানহানি মামলায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত জবানবন্দী; আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা আরম্ভ; মামলার পুলিস রিপোর্ট নিরুদ্দেশ। মাদ্রাজের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের তিন জন কর্ম্মচারী এজেণ্টের পদে উন্নীত; মাদ্রাজে ভারতবাসীর এই প্রথম এ পদ লাভ। এলাহাবাদে শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী দেবীর সভানেত্রীত্বে স্থানীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ও খেলাফতের সম্মিলিত অধিবেশন; পণ্ডিত মালব্যজীর সভায় যোগদান। জেলা কমিটীর নির্দ্দেশ অনুসারে বোম্বায়ে সাত শত বন্দীর কারামুক্তি। লেডী রোণ্ডার লর্ড সভায় প্রবেশে আপত্তি। দক্ষিণ আয়ারলণ্ডে সিনফিন্ ও স্থানীয় সরকারের সম্মিলিত শাসনের প্রস্তাব। ইংলিস চ্যানেলে পি এণ্ড ও কোম্পানীর ভারতগামী ডাক জাহাজ "ইজিপ্ট" ফরাসী জাহাজ 'সিনের" সহিত সংঘর্ষে কুড়ি মিনিটের মধ্যে জলমগ্ন; আশী জন মাল্লা, তন্মধ্যে ত্রিশ জন য়ুরোপীয় এবং পঞ্চাশ জন যাত্রী নিরুদ্দেশ; দশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সোনারূপা জলসই। আঙ্গোরার প্রতি বৃটিশের বর্ত্তমান নীতিতে নিখিল ভারত মোসলেম লীগের প্রতিবাদ। নর্ম্মদা বিভাগে গোণ্ডা জাতির মধ্যে কংগ্রেসের গঠন কার্য্য। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু জরিমানার টাকা প্রদান না করায়, জিনিষপত্র ক্রোক করিয়া তাহা আদায় উদ্দেশ্যে নেহেরু ভবনে পুলিশের পদার্পণ; জোর করিয়া তালা ভাঙ্গিবার সঙ্কল্প; ১০০৲ টাকার জন্য ২৫০৲ টাকার জিনিষ ক্রোক। রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের পর-লোকগমনে বহরমপুরে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সভা; শোক প্রকাশ, স্মৃতি-রক্ষার জন্য কমিটী নিয়োগ। আফগান প্রতিনিধিদের য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন; সদলবলে শ্রীযুক্ত শেঠ ছোটানী কর্ত্তৃক অভিনন্দন। ফতেপুরে মহাত্মা গন্ধীর জয়ধ্বনিতে চল্লিশ টাকা অর্থদণ্ড; স্বেচ্ছাসেবক দলকে প্রহার।

শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর সৌজন্যে। "শঙ্খ"—ফটো আর্টিলিয়ার।

দণ্ডাদেশে মহাত্মা।

১ম বর্ষ } আষাঢ়, ১৩২৯ { ৩য় সংখ্যা
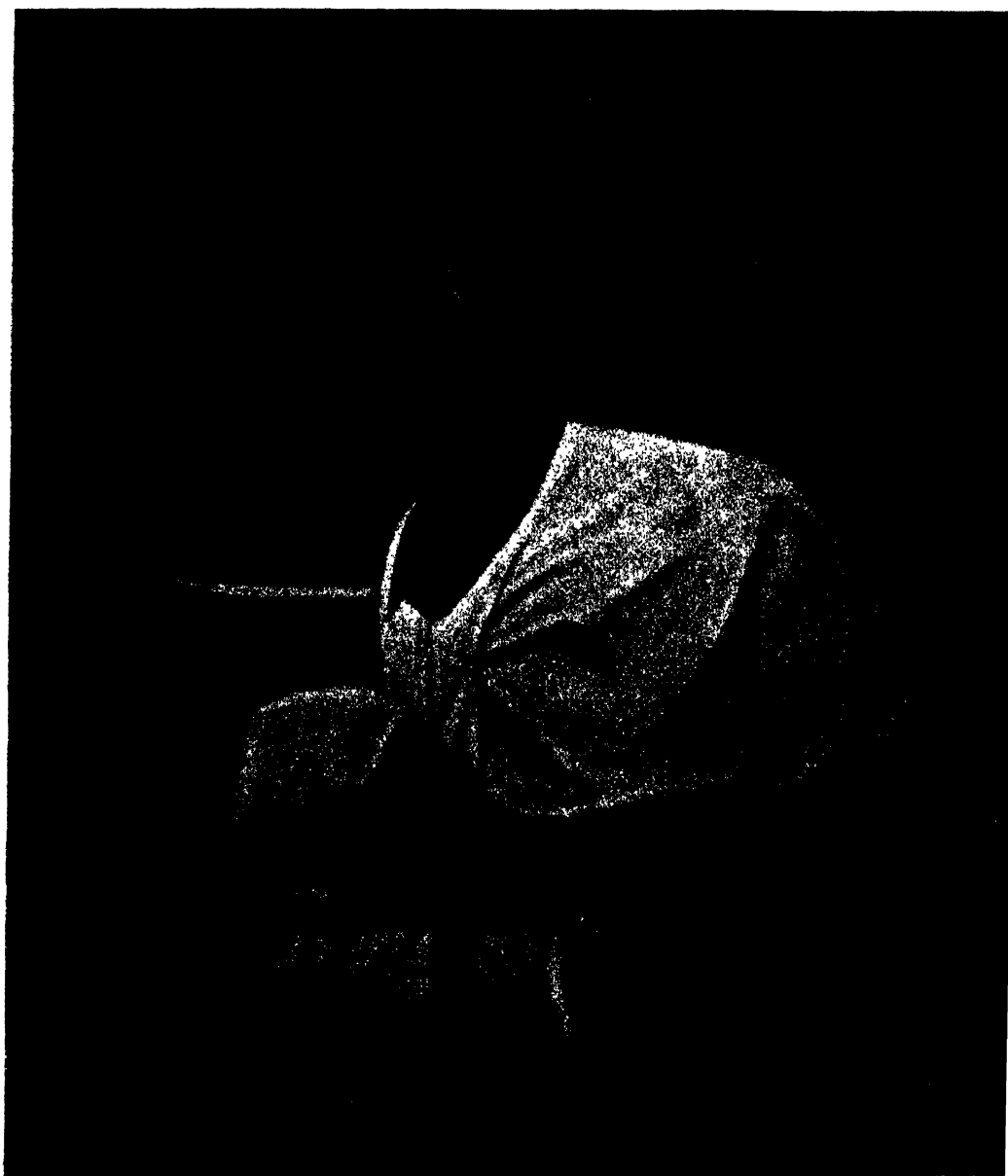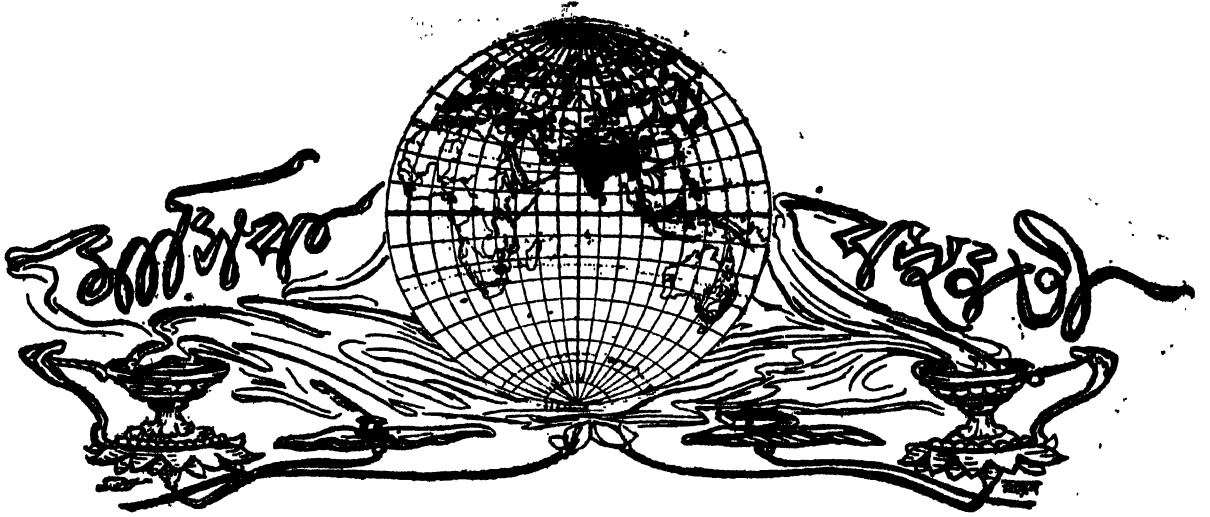
সভ্যতার মাপকাঠি

অনেকেই বলিয়া থাকেন, ভারতবাসীর বাসবসত, চলা-ফেরা, পোষাক-পরিচ্ছদ নিম্নস্তরের। দুঃখের বিষয়, এ বিশ্বাস এখন শুধু বিদেশীদের নহে, আমাদের নিজেদের ভিতরও বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে। দেশের যুবকবৃন্দ, যাঁহারা আমাদের ভাবী আশা-ভরসার স্থল, বিশেষতঃ যাঁহারা অর্থনীতিতে কৃতিত্বলাভপ্রয়াসী, তাঁহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেই শিক্ষিত, সুতরাং নিঃসন্দেহে জীবনধারণের চাল খাট বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ, এই সংস্কারকে একটা ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা ভারতের সভ্যতার গূঢ় রহস্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, এমন বৈদেশিক অর্থশাস্ত্র-লেখক যে ভারতের নিন্দা করিবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের দেশীয় কোন লেখকের গ্রন্থেও ঐরূপ ভাব সন্নিবিষ্ট দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলাম। এই সব পুস্তকই ত আমাদের যুবকদের রামায়ণ, মহাভারত বা কোরাণ হইতে চলিয়াছে! ফলে, কলেজের ছাত্ররা প্রায়ই চাল-চলনে উচ্চস্তরের সভ্যতার পরিচয় দিতে সচেষ্ট, আর তাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই অনুভব হয় যে, বর্ত্তমান সভ্যতা (যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিকল অনুকরণ), তাহাদিগের প্রায় অস্থিমজ্জাগত হইতে চলিল। এখন কোন দেশের সভ্যতা বিচার করিতে গেলে আমরা দেখি, কত সাবান, কত প্রসাধনের দ্রব্য, কত কাচ, কত মাইল রেলের রাস্তা সে দেশে ব্যবহৃত হয়। এই সকল সভ্যতার গ্লানিকর আদর্শেই যুবকরা পাঠ্যাবস্থা হইতে বিকৃত হইতে থাকে; অথচ এ আদর্শ তাহাদের নিজের নহে। দুঃখের বিষয়, যাঁহারা অর্থনীতির দোহাই দিয়া ভারতের সভ্যতাকে নিম্নস্তরের বলিয়া থাকেন, তাঁহারা জীবনযাপনের মাপেই সভ্যতার স্থান নির্দ্দেশ করেন। ব্যবহারিক জীবনে অভাবের সৃষ্টি না করিলে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য স্পৃহা হয় না। এ যুক্তির মূল্য কি, তাহা একটু সমাহিতভাবে বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ধর, কৃষকরা তাহাদের শান্ত গ্রাম্য জীবনে কতকগুলি নূতন অভাবের সৃষ্টি করিল। এখন, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষকরা ক্ষেত্রকর্ষণে কেহই অবহেলা করে না। কিন্তু তাহাদের আপ্রাণ চেষ্টাতেও সে অভাবের কিয়দংশও মোচন হয় না—বর্ত্তমান সভ্যতার উচ্চ চাল-চলনের আদর্শ ত দূরের কথা! অবসরসময়ে চরকা কাটিলে তুমি বলিবে, ইহাতে আমরা আদিম ও অসভ্যতার যুগে যাইয়া পৌছাইব। যে অভাব ভোগে কখনও মোচন হয় না, যাহা দিনের পর দিন বাড়িতেই থাকে, যাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর অশান্তি ও অতৃপ্তি আনিয়া অধিকাংশকেই উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে, যে উচ্চ জীবনের মাপকাঠি অনুযায়ী বাস করিতে গিয়া বাহ্যিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত দ্রব্য যেন জীবনের অবশ্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে দাঁড়াইয়াছে,

তাহাতে কি জীবনে প্রকৃতই সুখ হয়? তাহাতে কি জীবনের প্রকৃত যাহা মূল্যবান্, সেই আত্মপ্রসাদ দেয়? তাহাতে কি প্রকৃতই জীবনের যে সব উচ্চ অঙ্গ—সে সকলের বিকাশ করে? উপনিষদে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিষ কি, তাহার একটা নির্দ্দেশ আছে—"যস্মিন্ বঃ উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতি স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি"—অর্থাৎ যাহার অভাবে তোমার দেহ আবর্জ্জনাবিশেষ, সেই পরমপদার্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের উপর আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব, ইহাই প্রাগুক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। কিন্তু ঐ সূত্র সভ্যতার মাপেও প্রযুজ্য। আহার-বিহার অভিধানের সামগ্রী যদি কোনও মানুষের অধিকার হইতে কাড়িয়া লওয়া যায়, তাহার পর তাহার যাহা থাকে, তাহা যদি আবর্জ্জনাস্বরূপ প্রতীয়মান না হয়, তবে বুঝিবে, উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত মনুষ্যত্ব ছিল। তোমার বসন-ভূষণে তোমার জীবনের মাহাত্ম্য নহে। তোমার দেহ যত কম চাহে, তোমার উচ্চ জীবনের পথ তত প্রশস্ত। তোমার সজ্জিত পোষাক, তোমার পমেড্-চর্চ্চিত দেহের নীচে যে ক্লেদ, তাহাতে কি তোমায় সুখ দিতে পারে? মোটা খদ্দর, খড়ম বা বাঁশের ছাতায় তোমার প্রকৃত মর্য্যাদা লুকাইয়া রাখিতে পারে না। কি কৃষিব্যবব্যসায়ে, কি কলকারখানা-শিল্পশালায়, কি বিভিন্ন প্রণালীর জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্রে, মোটা ভাতকাপড়ের সঙ্গে যদি চিত্তকে মহদ্‌ভাবরাশিতে উদ্বুদ্ধ করিতে পার, তবেই সুখ—তবেই আত্মপ্রসাদ। আজ আধুনিক সভ্যতার কশাঘাতে পাশ্চাত্যদেশসকল জর্জ্জরিত। মুক্তিফৌজের "সেনাপতি" বুথ, ডিকিন্‌সন্ ইত্যাদি পশ্চিমদেশীয় সমাজহিতৈষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারখানাগুলিকেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়াছেন। যে নৈতিক ও দৈহিক অবনতির দৃশ্য তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখনও ভারতে অবর্ত্তমান। সে বড় ভীষণ! এখন প্রশ্ন স্বতঃই হয়, তবে কি শিল্পবাণিজ্যমাত্রই দোষাবহ? বিজ্ঞানসেবার ফলে যে সব অদ্ভুত আবিষ্কার মানুষ করিয়াছে, সে সকলের প্রয়োগে সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভের প্রয়াস কি গর্হিত? এই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিখিল চিন্তাপ্রবাহের ফলে আজ এক বিপুল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা কি চূর্ণ করিতে হইবে? এ প্রশ্নের মীমাংসা সামান্য উদাহরণে বুঝান যায়। যেমন দেহের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবের জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অবয়বের বৃদ্ধি চাই, তেমনই ইন্দ্রিয় বা অবয়ব-বিশেষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি দোষের ও ক্লেশের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। যে নখ তোমার অবয়বের অংশবিশেষ, তাহাও সমধিক বৃদ্ধি পাইলে, দেহ ক্ষত করিয়া বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি করে। যে ইন্দ্রিয় প্রকৃতির জীবনীশক্তির রহস্যের মূলে, তাহার অনাচারে জগতের সমস্ত দুর্দ্দশার জন্ম। যে বুদ্ধিবৃত্তি জীবনের প্রত্যেক কাযেই প্রয়োজন, যাহার অভাবে লোক পঙ্গু না হইয়াও বিকলেন্দ্রিয়, সে বুদ্ধিবৃত্তি অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ হইয়াও যদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সমতা না রাখিতে পারে, তবে তাহাকেও ফলে উন্মত্ত খ্যাতি লাভ করিতে হয়। এই নিয়ন্ত্রিত আত্মোন্নতি, জ্ঞানকর্ম্মের সাম্য, যোগী ও কর্ম্মীর সমাবেশ মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ মার্গ। পশ্চিমদেশে এই সাম্যের অভাবই বর্ত্তমান দুঃখের মূলীভূত কারণ। শ্রমজীবী ও তাহার প্রভুতে আজ এই যে সংঘর্ষ, তাহা ইহারই অভিব্যক্তি নহে কি? ভারত আজও সে মাপ-কাঠিতে কাহারও কাছে হীন নহে। তাহার বল্কলে ক্ষোভ নাই, বিদ্যার পূজা আছে; দারিদ্র্যে ঘৃণা নাই, সহৃদয়তা আছে; মৃত্যুতে বিষাদ আছে, কিন্তু নিরাশা নাই। যে দেশের চরম আদর্শ আত্ম ও তত্ত্বজ্ঞানলাভ, যে দেশের কর্ম্মীর আদর্শ গর্ডন, ক্লাইভ নহে, কিন্তু কর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণ, সে দেশের কামনা ও সাধনা, সে দেশের ধর্ম্ম ও সভ্যতা যে য়ুরোপীয় জ্বালাময়ী সভ্যতার মাপকাঠিতে পরিমাপ হয় না, তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? এই পশ্চিমের স্রোতে অতর্কিত-ভাবে গা ঢালিয়া, ভারতযুবক! তোমার নিজস্ব ভুলিও না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

পতিত ডাক্তার।

(নক্সা)

১

পতিত গুপ্ত যে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, এ কথা অবশ্যই গুপ্ত ছিল না; কিন্তু তাঁহার ধাতের ভিতর যে বৈদ্যবিদ্যাও গুপ্ত ছিল এ কথা তাঁহার মন ফিস্ ফিস্ করিয়া তাঁহাকে ছেলেবেলা হইতেই শুনাইত। "জাতি ব্যবসায়টা" তাঁহার বট্‌-ঠাকুর্দার অংশেই পড়িয়াছিল, তাঁহার পুত্রপৌত্ররা এখনও নাড়ী টেপেন, বড়ী বাঁটেন, গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দেন। পতিতের পিতামহ শম্ভু গুপ্ত সেয়ানা ছিলেন, শার্‌বরণ সাহেবের স্কুলে একটু ইংরাজী পড়িয়াছিলেন এবং একখানা ভকাবুলারি প্রায় মুখস্থ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে রকম ঘোড়ায়চড়া ডাক্তারী এ দেশে আসিয়া টগাবগ টগাবগ ছুটিতেছে, তাহার সহিত পাল্লা দিতে কবিরাজের পাল্কী সহজে পারিবে না; তাই তিনি পাঁচনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া পাঁচনবাড়ি হস্তে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, অর্থাৎ একটি ছোট স্কুল খুলিয়া কলিকাতার কয়েকটি ছেলেকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখন "সাহেব" সওদাগররা এ দেশের মঙ্গলার্থ নূতন বাণিজ্য খুলিয়াছেন; সাহেব কিনিবে ধান,তূলা,তিসি,আর বাঙ্গালী কিনিবে বোতল, গেলাস, শিশি। উভয়েই ক্রেতা, উভয়েই বিক্রেতা; সুতরাং পরস্পরে একটু কথাবার্ত্তা না কহিলে চলে না, তাই তখনকার বুদ্ধিমান বড়মানুষ বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষার দু' দশটা লবেজ্ শিখিয়া লইবার জন্য একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখনকার লোকের ভিতর কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমরা যখন পশ্চিমে যাই তখন আমরাই ত জোড়াতাড়া দিয়া এক রকম ক'রে হিন্দী কয়ে সে দেশের লোকের সঙ্গে কাজ চালাই,তাহারা কিছু আমাদের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য বাঙ্গালা শেখে না, তবে সেই প্রথম আমদানীর সাহেবরা কেন বাঙ্গালা শিখিয়া দেশের লোকের সঙ্গে কথা কহিলেন না? কর্ত্তারা কেন তাড়াতাড়ি ইংরাজী পড়িতে গেলেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। এ দেশ ব্রাহ্মণ-সেবার দেশ,ব্রাহ্মণের ক্রিয়ার ভাষা (Court-langauge) সংস্কৃত—বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইবার সময় ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ান সংস্কৃতে, কায়স্থ হইতে মুচি পর্য্যন্ত নরনারী বালকবালিকা, বুঝুক না বুঝুক, পুরুত-ঠাকুরের মুখে 'আব্রহ্ম ভুবনালোকা' শুনিয়া 'আবোম্ বোম্ ভুবুনে ধোপা' বলিয়া পিতৃপিণ্ডদান করিয়া থাকে; সুতরাং যখন দেশের লোক দেখিল যে, যে ব্রাহ্মণ ক্রোরপতি শূদ্রের মস্তকে কর্দ্দমলিপ্ত পদতল স্থাপন করিলেও শূদ্র আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই স্বীয় পৃষ্ঠ ধনুকাকারে পরিণত করিয়া দুই হাতে সাহেব দেখিলেই সেলাম করেন, তখন আর বুঝিতে বিলম্ব রহিল না যে,এ দেশে হাট্‌ধারী এক নূতন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন—যিনি পৈতাধারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর বর্ণ। পৈতাধারী ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা বমন করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু ব্রাহ্মণপূজ্য হাটধারী শ্বেতকায় ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই ব্রহ্মার ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া ধরাধামে লীলা করিতে আসিয়াছেন; অতএব উঁহার মুখ-নিঃসৃত ভাষা দেবভাষারও উপরে, সুতরাং উপদেবভাষা। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, বঙ্গভাষার হাড় নাই, কেবল "যে আজ্ঞে" "আস্‌তে আজ্ঞা হউক" "নিবেদন করছি" "সেবকশ্রী" এই গোছ কতকগুলা খোলো খোলো মাংস, মাটীতে পড়িয়াই গড়াগড়ি দেয়, উঠিয়া দাঁড়াবার শক্তিটুকুও নাই; আর ইংরাজী বুলি—কি জবরদস্ত, হাড়ে মাসে পেশীতে যেন অসুর অবতার! "ড্যাম্" "ডেভিল্" "গেট্ আউট" "ডোণ্ট কেয়ার্" যে জাত চেয়ারে বসিয়া এই রকম বুলি বলিতে 'ডেয়ার' করে, তার 'পেয়ার' কি দুনিয়ায় পাওয়া যায়; সুতরাং প্রণামপিপাসী ভক্ত বাঙ্গালী এই ব্রাহ্মণপূজ্য ব্রাহ্মণের ভাষা শিক্ষার অভিলাষে নিজ নিজ বংশ-প্রদীপগণকে শার্‌বরণ সাহেবের স্কুলে, বেচারাম মাষ্টারের স্কুলে, শম্ভু গুপ্তের স্কুলে এবং ঐরূপ অন্য অন্য ইংরাজী বিদ্যার দোকানে পাঠাইতে লাগিলেন এবং অনেকে নিজেরাও ঘরে বসিয়া ভকাবুলারি মুখস্থ করিতে সুরু করিলেন। শম্ভু মাষ্টার দিনের বেলা ছেলেদের লইয়া স্কুল করিতেন, আর সন্ধ্যার পরে বাড়ী বাড়ী গিয়া দু' চারিজন বাবাকে ভকাবুলারি মথন করাইয়া আসিতেন। ক্রমে হিন্দু

কলেজ, কুইন্স কলেজ, গৌরমোহন আড্ডির স্কুল প্রভৃতি গোরা ইঞ্জিনিয়ারে চালান ময়দার কল স্থাপিত হইল, বেচারাম মাষ্টার, শারবরণ সাহেব, শম্ভু গুপ্ত প্রভৃতির হাতে-ঘুরাণ জাঁতার অস্তিত্ব লুপ্ত হইল। শম্ভু বাবুর ছেলে ব্রজনাথ দিন-কতক পিতার স্কুলে মনিটারী করিয়াছিলেন, স্কুল উঠিয়া যাওয়ার পর ম্যাক্‌সোয়ালো কোম্পানীর হৌসে ওজন-সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এ কার্য্যে সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার সম্পর্ক সামান্যই ছিল; গুদাম-সরকার, ওজন-সরকার, মুহুরীরা মুৎসুদ্দির অধীন;—ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ I come running running from Baghbazar to the Laldighi, Sir, stair get up asthma-to asthma-to, Sir তবুও is the ten ring five minute become, what I am can do, Sir? Please kindly beg your pardon another one time, Sir, গোছ ইংরাজী বলিতে পারিলেও মুৎসুদ্দির অধীনে বাঙ্গালা দপ্তরই থাকিত। এই মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ান এ দেশে কোম্পানীর আমলের এক নূতন সৃষ্টি; এই মুৎসুদ্দি না থাকিলে এ দেশে ইংরাজ সওদাগরের সওদাগরী চলিত কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। তখন এত বড় বড় সব ব্যাঙ্ক ছিল না—দেশী মহাজনরা দেশীয় অন্যান্য লোকের সহিত সাহেব-দিগকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দৈবপুরুষ ভাবিলেও তাঁহারা যে ব্রাহ্মণেরই ন্যায় নিঃস্ব, আশীর্ব্বাদ-মাত্র-সম্বল, এইরূপ একটা ধারণা করিয়াছিলেন। মহাজনরা ভাবিতেন যে, এও কোং সাহেবদিগের পিঠে কোট আর মাথায় হ্যাট মাত্রই ভরষা, জাহাজ চড়িলেই সব ফর্সা; সুতরাং সরাসরি সাহেবকে কেহই ধারে মাল দিতেন না। মুৎসুদ্দি হইতেন ধন-খ্যাতি-লব্ধ অট্টালিকাবাসী সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী, তাঁহারা guarantee (দায়ী) হইলে মহাজন মাল ছাড়িত। আব-শ্যক হইলে মুৎসুদ্দিরা বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার, এমন কি, লক্ষ দেড় লক্ষ টাকাও মহাজনদিগকে বা সাহেবের অন্য প্রয়োজনসাধনার্থ ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতেন। সাহে-বের জন্য সংগৃহীত মালের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য গুদাম সংক্রান্ত কেসিয়ার হইতে সরকার পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মচারীই নিজের লোক বাছিয়া নিযুক্ত করিতেন; তাহারা আফিস হইতে মাহিনা পাইত, কিন্তু তাহাদের কার্য্যতৎপরতার ও সততার জন্য দায়ী থাকিতেন মুৎসুদ্দি। সাহেবরা মাল চালান দিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে মহাজনদের পাওনা মুৎসুদ্দির হাতেই দিতেন এবং এই guarantee থাকার দায়িত্ব গ্রহ-ণের জন্য মুৎসুদ্দিরা সাহেবের নিকট টাকায় এক আনা দেড় আনা হারে দস্তরি পাইতেন। মুৎসুদ্দিদের অন্যান্য বাবেও আয় মন্দ ছিল না। কলিকাতা ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ অনেক স্থানের বর্ত্তমান ধনিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ এই মুৎসুদ্দিগিরি করিয়াই বড়মানুষ হইয়া গিয়াছেন।

বিলাতী আমদানী মালও মুৎসুদ্দিরাই বাজারে কাটাইতেন এবং অনেক সময়ে ব্যাপারীর দেনার জন্য সাহেবের কাছে guarantee থাকিতেন। মুৎসুদ্দিরা বড়মানুষ হইতেন বটে; দোলদুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া করিতেন, অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করি-তেন, বহু লোক ও আত্মীয়কে অন্ন দিতেন, অনেকে এমন বড়মানুষ হইয়াছিলেন যে, চারি পুরুষ শুইয়া দুই হাতে খরচ করিয়াও আজও সে টাকা ফুরাইতে পারেন নাই। অনেকের প্রপৌত্ররা সেই বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে আজও ল্যাণ্ডো জুড়ি যুতিতেছেন, মোটরের ভেঁপু টিপিতেছেন, বিলিয়ার্ড টেবিল কিনিতেছেন। কিন্তু যে সাহেবদের মুৎসুদ্দি হইয়া তাঁহারা এত ধনী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থের তুলনায় মুৎসুদ্দিদের লব্ধ অর্থ অকিঞ্চিৎকর। সাহেবরা পাইতেন যেখানে দশ বার লাখ টাকা, মুৎসুদ্দি পাইতেন সেখানে এক লাখ দেড় লাখ টাকা। অথচ মুৎসুদ্দি মধ্যে না থাকিলে সাহেবের আমদানী একখানা বনাত, এক থান ফরাসী ছিট, একটা ছাতা বা এক ঝাঁকা চীনা মাটীর বাসন বাজারে বিক্রয় হইত না; বা এক গাড়ী তিসি, এক মণ কুসুমফুল, এক বোট চাউল, এক বস্তা তুলা, এক তোলা গালা হাট-খোলা বেলেঘাটা হইতে ওজন হইয়া বা বাঁকুড়া আজিমগঞ্জ হইতে চালান আসিয়া সাহেবের গুদামে উঠিত না। ঐ মুৎসুদ্দি যদি পায়ের গোড়ালী অবধি চাপকান-ঝোলানো মাথায় পাট-করা পাগ্‌ড়ী বাঁধা কালা রঙ্গের বাঙ্গালী না হইয়া—হ্যাটকোটধারী সাদামুখ সাহেব হইতেন তাহা হইলে ম্যাক্‌সোয়ালো প্রভৃতি কোম্পানীকে তাঁহাদের বক্‌রা-দারীতে লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় থাকিত না; এবং এই বাঙ্গালী মুৎসুদ্দিরা যদি তখন বলিতেন যে, আমাদের বখরাদার করিয়া লও, নতুবা বাজার guarantee হইব না, তাহা হইলে সওদাগর সাহেবরা যে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতেন, তাহা তাঁহারাই জানিতেন। কিন্তু অবক্তপ্রতিপাল্য সেবকশ্রী

বাঙ্গালীর সাধ্য কি যে তাহা বলে! "কে দেবে আগুনে হাত, কে ধরিবে ফণী!"

সাহেব যে মনিবের জাত! Kite and Crowর এণ্ড কোং হবেন ঘোষ, বোস, মৈত্র, শীল, মল্লিক! যেমন ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় শূদ্রের "ওঁ" উচ্চারণ নিষেধ, সেইরূপ আতঙ্কের আজ্ঞায় সাহেবের কাজে বাঙ্গালীর "কোং" হওয়া নিষেধ। ম্যাক্‌সোয়ালোর হৌসের মুৎসুদ্দি ছিলেন বাবু বদনচন্দ্র শীল; ইনি আরও তিন চারিটা বড় বড় হৌসের মুৎসুদ্দিগিরি করিতেন। কলিকাতায় তখন তাঁহার খুব প্রতিপত্তি —খুব টাকা। ব্রজনাথ হৌসে মাসে মাহিনা পাইতেন আট টাকা, কাঁটায় পাওনা তিসি, গম, ছোলা, তুলা, সোরা চুটকির দোকানে বেচিয়া দিন বার চৌদ্দ আনা পাইতেন, হয় ত পূরা এক টাকাও পাইতেন; ইহা ছাড়া হেড ওজন সরকার নিজ বুদ্ধি-কৌশলে যাহা উপরি লাভ করিতেন তাহা হইতে assistant ব্রজনাথকে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দিলেও মাসে মোট ঠিক দিয়া চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা দাঁড়াইত; সুতরাং ব্রজনাথের আয় মাসে তখনকার বাজারের একটা মুন্সেফের মাহিনার বেশী দাঁড়াইত। কাল হইল, চাকরী করার বছর আষ্টেক পরে ব্রজনাথের একবার জ্বরবিকার হইয়া। তখন ব্রজনাথ হেড ওজন-সরকার হইয়াছেন ও তাঁহার পাওনাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রোগের প্রথম অবস্থায় ব্রজনাথের জ্যেঠতুতো ভাই অধর কবিরাজ মহাশয় তাঁহার চিকিৎসার ভার লইলেন। অধর পিতার কাছে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পিতৃবন্ধু তালতলার এক প্রসিদ্ধ বৈদ্যের নিকটেও তিন চারি বৎসর যাতায়াত করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র ও রোগ-নির্ণয় শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঔষধের উপকরণ—সকল রকম পত্র,বল্কল,মূল, কাষ্ঠ প্রভৃতি বা ধাতব, জান্তব অনেক পদার্থ চিনিয়া লইবার চক্ষু তাঁহারও ছিল না, তাঁহার পিতা বা অধ্যাপক কাহারও ছিল না। কবিরাজ মহাশয় বেদেকে বলিয়া দিলেন—"অর্জ্জুন-কাষ্ঠ আনিও;" বেদে সুঁদরী কাষ্ঠ আনিয়া দিল, তাহাই ঢেঁকিতে কুট্টিত হইয়া চূর্ণাকার ধারণ করিল। বৈদ্য বলিলেন, তেউড়ির মূল আনিতে, বেদে ঢোল-কল্‌মীর মূল চালাইয়া দিল। অনেক উপকরণ সম্বন্ধেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং শাস্ত্রোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও তাহার ফল না দেখিয়া কবিরাজ মহাশয়রা অনেক সময়ে ধাঁধায় পড়িয়া যান। ইহার উপর আবার ঔষধ প্রস্তুতকারী ছাত্রের এবং উড়িষ্যাবাসী ভৃত্যেরও অনবধানতা এবং দৌরাত্ম্য আছে; সুতরাং অনেক স্থলেই অট্টালিকাচূর্ণ বটিকা এবং ছুঁচুন্দারপুরীষমোদক প্রস্তুত হইয়া যায়। পীড়িত ভ্রাতার জন্য অধরকবিরাজ প্রথমে সামান্য জ্বর ভাবিয়া বৈদ্যনাথ-বটিকা,মৃত্যুঞ্জয়রস প্রভৃতি জ্বরান্তক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু জ্বর ক্রমে একটু বাঁকা দাঁড়াইল—রোগীর চক্ষু যৎকিঞ্চিৎ রক্তাভ হইল, কথাবার্ত্তারও দু'একটা গোলমাল হইতে লাগিল। ব্রজনাথের পরিবার কিছু উতলা হইয়া পড়িলেন, বালক পুত্র পতিতকে দিয়া ভাসুরকে বলাইলেন যে,বট্‌ঠাকুর হাতটাত দেখুন, এ সব ব্যায়রামে একটা ডাক্তারকে দেখাইয়া ওষুধ দেওয়াইলে ভাল হয়। ছোটবৌয়ের বট্‌ঠাকুর ভাবিলেন যে, পাওনাও নাই থোওনাও নাই, মিছিমিছি দায়িত্ব ঘাড়ে করি কেন? শেষ কি বাড়ীর ভিতরে একটা বদ্‌নাম কুড়াব? তাই তিনি পাড়ার রাধিকা ডাক্তারকে আনাইলেন। ডাক্তার আসিতেই বাড়ীতে চিকিৎসার একটা সরগরম পড়িয়া গেল। তিনি নাড়ীস্পর্শ করিলেন; তখন বগলে গুঁজিবার কাঠি হয় নাই, কিন্তু শিঙে ছিল, সেটা বুকে বসাইলেন, পিঠে বসাইলেন, ব্রহ্মতালুতে হাত দিয়া মুখটা সিঁটকাইলেন, কাগজ-কলম চাহিলেন; প্রিস্কৃপ্‌সন্ লিখিলেন এক দফা একটা মিক্‌স্‌চার, এক দফা ছটা পাউডার, এক দফা এক বাক্স পিল, পিঠে মালিস করিবার একটা লোসন্, বুকে বসাইবার একখানা বেলেস্তারা। একেবারে "সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ;" অন্দর বাহিরে দুই জায়গাই ঔষধের ব্যবস্থা হইল; তার উপর মাথায় দিবার জন্য বরফ ও অডিকোলন আনাইতে বলিলেন। খই বাতাসা যা ঘরে ছিল, ছেলেরা জল খাইতে পাইল, রোগীর জন্য আসিল দুধ, সাগু, আরারুট, বিস্কুট। তখন প্রায় সকল বাঙ্গালী ডাক্তারই এক রকম কাটা গাড়ী ব্যবহার করিতেন; একখানা পাল্কীগাড়ীর আধখানা কাটিয়া লইলে যেরূপ অবস্থা হয়, এও সেইরূপ; সাধারণ শিক্ষিত লোক তামাসা করিয়া সে গাড়ীর নাম দিয়াছিল "পিলবক্স।" ডাক্তার বাবু হাত পাতিয়া দুটি টাকা লইয়া পিলবক্সে চড়িলেন, তখনকার প্রায় সকল ভাল ভাল বাঙ্গালী ডাক্তারই দুই টাকার অধিক ভিজিট লইতেন না। সেকালে কবিরাজ মহাশয়কে প্রথম দিনে এক টাকা ও আরোগ্যস্নানের পর পাঁচ টাকা দেওয়ার পরিবর্ত্তে ডাক্তারকে প্রতি ভিজিটে দুই টাকা ও তদ্ভিন্ন ঔষধের দামও

দুইটাকা তিনটাকা চারটাকা দেওয়া গৃহস্থরা কষ্টকর মনে করিতেন, এখন দুই টাকা ভিজিট লইলে ডাক্তারের স্বসমাজে জাতি যায়, রোগীও তাঁহাকে হাতুড়ে মনে করে। ডাক্তারবাবু আবার বৈকালে আসিলেন, রোগীকে দেখিয়া মুখ একটু গম্ভীর করিলেন; বলিলেন ভয় নাই তবে একটু ভোগাবে। এইরূপে চিকিৎসা চলিতে লাগিল, এগার দিনের দিন রোগ বেশী বৃদ্ধি পাইল, মাথায় অনবরত বরফ বসান হইতেছে, তথাপি চক্ষুর্দ্বয়ের লালভাব কমিতেছে না, রোগী আচ্ছন্ন অবসন্ন হইয়া আছে। ব্রজনাথের পরিবার সজলনয়নে পুত্রের মারফত ডাক্তারবাবুকে এক জন সাহেব ডাক্তার আনাইবার জন্য মিনতি করিলেন। পরদিন বেলা এগারটা দশ মিনিটের সময় ব্রুহামের জুড়ি ব্রজনাথের দরজায় দাঁড়াইল। বাড়ীর সম্মুখে পাড়ার লোকজন আসিয়া জমিল, দু' চার জন বাড়ীর মধ্যেও প্রবেশ করিলেন। সাহেব ডাক্তার রাধিকা ডাক্তারের প্রিস্ক্রপ্‌সন্ চাহিয়া দেখিলেন; বলিলেন, চিকিৎসা ঠিকই হইতেছে। একখানা প্রিস্ক্রপ্‌সনে রাধিকা শুধু Acid Nit. dil. দিয়াছিলেন, সাহেব সেটা বদলাইয়া Acid Nitmur. dil. করিয়া দিলেন আর একখানায় রাধিকার Ipecac র সঙ্গে সাহেব একটু Tinct,Tolu জুড়িয়া দিলেন; বলিলেন খাওয়া ঠিক হচ্ছে না, support ভাল করিয়া দেওয়া চাই, তাই ঘণ্টায় ঘণ্টায় Vinum Gallicie ও Decoct Carnis ব্যবস্থা করিয়া কুলমর্য্যাদার স্বরূপ ষোল টাকা লইয়া ব্রুহামস্থ হইলেন। এইরূপে রোগ ও চিকিৎসকের হাতে প্রায় ৪১ দিন ভুগিয়া ব্রজনাথ out of danger হইলেন। ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধের দাম, পথ্যের খরচ, বরফ আনা-আনির ধুমধামে পাঁচ ছয় শত টাকা বাহির হইয়া গেল। বরফ তখন আজকালকার মত সুপ্রাপ্য ছিল না মুটে-মজুরে তখন বরফ চিবাইয়া খাইতে পাইত না; এ দেশের কথা দূরে থাক্, য়ুরোপেও বোধ হয় তখন বরফের কল প্রস্তুত হয় নাই। কলিকাতায় এখন যেখানে ছোট আদালত আছে, তাহার দক্ষিণপশ্চিম পার্শ্বে একটা বাড়ী ছিল তাহার নাম Ice House বা বরফগুদাম; ঐ বাড়ীটি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণমেণ্ট বিনা ভাড়ায় এক আমেরিকান কোম্পানীকে ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন, সর্ত্ত ছিল যে বার মাস তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে বরফের সরবরাহ রাখিতে হইবে, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রেতার বরফ কিনিতে পারিবে, সাধারণ মূল্য দু' আনা সের, মজুত মাল কমিয়া আসিলে নেহাত চার আনা পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারিবে, ইহার উপর কখনও নহে। আমেরিকা হইতে জাহাজের ballast রূপে এই বরফ কলিকাতায় আসিত, বড় বড় মোটা মোটা লম্বা থাম, দুজন বা চার জন মুটে মাথায় করিয়া তাহা গুদামে তুলিত। সাহেবরা প্রায় সকলেই বরফ ব্যবহার করিতেন; সৌখীন বড়লোক বাঙ্গালী বাবুরা, যাঁহারা গাড়ী চড়িয়া আফিসে যাইতেন বা বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইতেন, বাড়ী আসিবার কালে অবস্থা অনুসারে এক সের বা দুই সের বরফ কিনিয়া আনিতেন; সে বরফে বেশ একটু সুন্দর স্বাদ ছিল, এত শীঘ্র সে বরফ গলিয়া যাইত না। বেলা পাঁচটার পর বাড়ীতে এক সের বরফ আনিলে তাহা কম্বল জড়াইয়া যত্ন করিয়া রাখিতে পারিলে পরদিন বেলা দেড়টা দুইটা পর্য্যন্ত কিছু মজুদ থাকিত, এক টুক্‌রা এক গেলাস জলে ফেলিয়া দিয়া সে জল ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়ার পরও আর দুই তিন বার তাহাতে জল ঢালা বেশ চলিত। তখন ভারতবর্ষে আপেল জন্মাইবার বন্দোবস্ত ছিল না, মাঝে মাঝে আমেরিকা হইতে বরফের সঙ্গে আপেল আমদানী হইত, সে আপেল আকৃতিতে বড়, সিঁদুরের মত রাঙ্গা, সুঘ্রাণে ভরা এবং স্বাদে অতি মধুর। ঐ বরফ গুদামেই প্রথমে এ দেশে কেরোসিন্ তেলের আমদানী হয়। সে সময় সাধারণ গৃহস্থ-বাড়ীতে কম্বল-বাঁধা বরফ ঢুকিলেও তাহার পরে সাহেব ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলে পাড়ার লোক ভাবিত খাট আসিবার আর বিলম্ব নাই।

একটু আগে বলিয়াছি যে, কাল হইল ব্রজনাথের জ্বর-বিকার হইয়া; ব্রজনাথের সেই রোগভোগের সঙ্গে যদি ভবকারাগার ভোগের মিয়াদও শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার পরিবারের সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া যাইত বটে, তবে ঘরে কিছু অন্নসংস্থান থাকিত; কিন্তু ব্রজনাথের এক রোগ সারিয়া আর এক বিষম রোগ ধরিল। ঔষধরূপে ব্রজনাথকে যখন প্রথম প্রথম গ্যালিসাই দেওয়া হয়, তখন তিনি এক প্রকার বেহুঁসেই থাকিতেন; কিন্তু রোগের মধ্যাহ্নের পর বেলা অবসানে যখনই গ্যালিসাইয়ের ড্রামটুকু গলাধঃকরণ করিতেন, তখনই তাহার বৈদ্যুতিক প্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্র্যাণ্ডির আনন্দদায়িনী শক্তির যৎকিঞ্চিৎ আভাসও পাইতেন। রোগ সারিবার পর বাকী এক্‌সা নম্বর ওয়ানটুকু বোতলেই রহিল, ডাক্তার রোগীর জন্য

দুই বেলায় দুই আউন্স করিয়া রবার্টসন্স পোর্টের ব্যবস্থা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বদ্‌লাইবারও পরামর্শ দিলেন। মুৎসুদ্দি বদন বাবু বেড়াইতে যাইবার জন্ত ব্রজনাথকে আরও দুই মাসের ছুটী দিলেন; নানা মুনির নানা মতের পর বর্দ্ধমানেই বেড়াইতে যাওয়া স্থির হইল। এখন যিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই জরের রোগী শরীর সারিতে বর্দ্ধমান যাইতেছে শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিবেন; কিন্তু যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন কলিকাতা অঞ্চলের বাঙ্গালী বাবুরা রোগান্তে বা সখে চুঁচড়া চন্দননগর শ্রীরামপুর বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানেই বেড়াইতে যাইতেন। তখন সবে বৎসর চারি পাঁচ মাত্র রেল খুলিয়াছে, ম্যালেরিয়া তখনও বর্দ্ধমানের নিকট হইতে স্বাস্থ্যনিবাসের সম্মান কাড়িয়া লইয়া বর্দ্ধমানকে শ্মশানাদপি ভয়াবহ করিয়া তুলে নাই। ১৮৬৪।৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের বর্দ্ধমান, আর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের বর্দ্ধমান নন্দনে ও কুম্ভীপাকে তফাৎ। আর একটি কারণেও বর্দ্ধমান দেখিবার প্রবৃত্তি ব্রজনাথের মনের মধ্যে একটু প্রবল ছিল; তাঁহার পিতা কোন প্রতিবেশী ধনী বন্ধুর সহিত তাঁহার পিনেশে চড়িয়া সন ১২৩০ সালে বর্দ্ধমান বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের বর্দ্ধমান অবস্থানকালে লোকপ্রসিদ্ধ ৩০ সালের ভয়াবহ বন্যা বর্দ্ধমান অঞ্চলকে ভাসাইয়া দেয়; ব্রজনাথ পিতার নিকট সেই বন্যার গল্প অনেকবার শুনিয়াছিলেন; শম্ভুনাথ বলিতেন বন্যার সময় তাঁহারা পিনেশেই ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পিনেশ যে কোথায় উধাও হইয়া ভাসিয়া যায়, কিরূপে একটা বন্যা-গঠিত জল-প্রপাতের নিকট সেই পিনেশ চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে যাইতে কেবলমাত্র সঙ্গে সরকারী রক্ষক সরিফের সার্জ্জন সাহেবের নাবিক-বিদ্যাকৌশলে রক্ষিত হইয়া কোন অজানা গ্রামে ধান্তক্ষেত্রমধ্যে আটকাইয়া যায়, এই সব কথা বৃদ্ধ শম্ভুনাথ সকলের নিকটেই সর্ব্বদা গল্পচ্ছলে বলিতেন। সে কালের কলিকাতার বড়লোকরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বা অন্ত কোন স্থানে বেড়াইতে যাইতে হইলে খরচা জমা দিয়া সরিফের নিকট আবেদন করিলে রক্ষকরূপে এক জন গোরা সার্জ্জন সঙ্গে পাইতেন। শম্ভু গুপ্ত মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গী সার্জ্জনের অনেক প্রশংসা করিতেন। তদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্রের কবিতা ও গোপাল উড়ের যাত্রা তখনকার লোকের কল্পনার উপর এতটা আধিপত্য করিয়াছিল যে, অনেকেই বিদ্যাসুন্দর সংক্রান্ত ঘটনা সত্য বলিয়া মনে করিতেন এবং ব্রজনাথ বর্দ্ধমানে গেলে হীরা মালিনীর মালঞ্চ ও সুন্দরের স্বহস্তে ক্ষোদিত সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইবেন এ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। দিন দেখিয়া ব্রজনাথ কাপড়-চোপড় থালা-ঘটি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাঁধিয়া লইয়া শ্রীদুর্গা স্মরণে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন; অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের সঙ্গে ঔষধরূপে সেই বোতলস্থ আধখানা ব্রাণ্ডি ও আর দুই বোতল পোর্ট-ও লইলেন। বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়া আট দিন পরে তাঁহার শরীর দিন দিন ভাল হইতেছে, বেশ বল পাইতেছেন, ক্ষুধা খুব বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া বাড়ীতে বেয়ারিং পত্র লিখিলেন। যদিও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই ভারতবর্ষে আধ আনা টিকিটের ডাক প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি তখনকার অনেকের মনে সন্দেহ ছিল যে, টিকিট-মারা চিঠি মারা যায়, কিন্তু বেয়ারিং চিঠি ঠিকানায় পৌছান সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এটা যে ঠিক কুসংস্কার তাহা বলা যায় না; এখনও অনেক গ্রামে চিঠি পাঠাইতে হইলে, সেখান হইতে ডাকঘর দুই মাইল তিন মাইল যদি তফাৎ হয়, তবে বেয়ারিং পত্র দেওয়াই সুপরামর্শ। বর্দ্ধমানের জলহাওয়ার গুণে ব্রজনাথের শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সেই স্ফূর্ত্তিকে অধিকতর বৃদ্ধি করিবার পিপাসা তাঁহার মনে ততই প্রবল হইতে লাগিল এবং সেই পিপাসা তিনি মিটাইতে লাগিলেন—বোতল হইতে গ্লাসে ঢালিয়া, গ্লাস হইতে বদনে ঢালিয়া। এখন আর মেজর গ্রান নাই, সকাল সন্ধ্যাও নাই; রাত্রি দশটা এগারটা অবধি ঔষধ প্রথমে এক ঘণ্টা অন্তর, তার পর তিন কোয়ার্টার—আধ ঘণ্টা—এক কোয়ার্টার অন্তর চলিতে লাগিল; ক্রমে কলিকাতা হইতে আনীত পোর্ট গ্যালিসাই বোতলরূপ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া ব্রজনাথের উদর-গোলোকধামে প্রস্থান করিলে, বর্দ্ধমানে তেমন বিলাতী জিনিষের সুবিধা না পাইয়া ব্রজনাথ দশ আনা বোতল দোয়াস্তার শরণাপন্ন হইলেন। কংগ্রেস হইবার বহু পূর্ব্বেই স্বদেশী ভাব ব্রজনাথের প্রাণে প্রবেশ করিয়াছিল। আসল কথা, কঠিন বিকাররোগ আরোগ্য করিবার ছলে ডাক্তাররা ব্রজনাথের ধাতুর মধ্যে যে নূতন রকম রোগের একটি বীজ পুতিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি ক্রমে এক জন মাতাল হইয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই মাস পরে এক দিন রাত্রি আটটায় সময় ব্রজনাথ যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন

তাঁহার স্ত্রী স্বামীকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেখিয়া যেমন হৃষ্ট হইলেন, নিকটে গিয়া তাঁহার ঢুলুঢুলু নেত্র দর্শনে ও মুখনিঃসৃত দুর্গন্ধ আঘ্রাণে তেমনই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ব্রজনাথ আফিস যাইতে লাগিলেন, কাজও করিতে লাগিলেন; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরেন না, রাত্রি নয়টা দশটা, কোন কোন দিন বা এগারটা বারোটার সময়েও জড়িতকণ্ঠে "পটে, ডওজা কোল্" বলিয়া কড়া নাড়িতে থাকেন; চাদরের খুঁটে রাস্তার কাদা, জামায় বাজারের তরকারীর ছোপ, মেজাজ রুক্ষ। পূর্ব্বে প্রত্যহ আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া ব্রজ উপরি-পাওনাটা স্ত্রীর হাতে দিতেন, আজকাল সে টাকা চাহিলে বলেন, "এখন কি আর সে কাল আছে, উপরি সব উঠে গেছে, সাহেবরা আপনারা কাঁটায় আস্তে আরম্ভ করেছে, দু' আনা চার আনা যা পাই তা জল খেতেই কুলায় না।" এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিল। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত অর্থের উপর টান পড়িয়াছে। এখন মাঝে মাঝে দিনের বেলাও চলে; আফিস প্রায়ই কামাই হয়, তাহাতে আফিসের যত ক্ষতি হউক না হউক, ব্রজনাথের আয় ও আয়ু-ক্ষয়ই অধিক পরিমাণে হইতে লাগিল। ব্রজকে ক্রমে অসুস্থ হইতে দেখিয়া এক দিন তাঁহার জ্যেঠতুত ভাই বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অতি বিমর্ষভাবে বলিলেন,—"ভায়া! করেছ কি? এ যে উদরীর লক্ষণ দেখ্‌ছি!" ভয়ে ব্রজ হাঁ করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার স্ত্রী দরজার আড়ালে শিহরিয়া উঠিলেন, ব্রজ শয্যাশায়ী হইলেন। জল ও লুণ বন্ধ করিয়া তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

পতিত গুপ্তের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া কোথথেকে তা'র কুলজী ঘাঁটিতে বসিয়া গেলাম! অসভ্য বুড়াদের ওটা একটা চিরকেলে দোষ, যদি কোন একটা লোকের কথা পড়িল, অমনই তার পিতামহ বাপনান্ হইতে আসিয়া কবে কলিকাতায় বাস করেন, ছোকরার পিসীর বিয়ে হয়েছিল মুলোজোড়ে. এই রকম সব বায়নাক্কা সুরু করিয়া দেয়। পতিত পড়াশুনা করিতেছিল এক রকম মন্দ নয়, বেচারী মুস্কিলে পড়িল থার্ড ক্লাসে উঠিয়া। সেখানে Geometry ও Algebra রূপ সরস্বতীসরোবরের দুইটি হাঙ্গর কুম্ভীর হাঁ করিয়া ভীষণ দন্ত দেখাইয়া তাহাকে একেবারে ভড়্‌কাইয়া দিল। সে ইংরাজী গ্রামারে would, could, should, have, has, had কোন রকম করিয়া চালাইয়া যাইতেছিল, ইতিহাসের মামুদ অফ্ গিজনী ১৪ই অক্টোবর কাবাব খাইয়াছিলেন, ১৫ই নয়, এটা এক রকম মুখস্থ রাখিয়াছিল। যদিও পতিত বরাহনগর কলিকাতার উত্তরে কি দক্ষিণে জানিত না, তথাপি ক্যামেস্কাটকার ল্যাটিচিউড্‌টা ঠিক মনে রাখিতে পারিত এবং Clift's Geography হইতে "The Bengalis are cunning, intelligent, cowardly and avaricious" গড়্‌গড়্ মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিত; অঙ্ক কসার সময় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক প্রভৃতিরও সার্থকতা এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনও বেশ বুঝিতে পারিত, কিন্তু Algebra ও Geometry দেখিয়া সে একেবারে অবাক্! (a+b) 2 ইত্যাদি এ গোষ্ঠীর পিণ্ড গিলিয়া আমি কি করিব? আর equilateral triangle একটা কাটি কেটে তিন দিক মেপে দেখলেই চুকে যায়, তার জন্য দুটো circle আঁক, হ্যান্ কর, ত্যান্ কর, এ সব কেন? মাষ্টার মশাই প্রতিদিন একটা করিয়া নূতন পড়া দেন, ব্ল্যাক্‌বোর্ডে figure এঁকে propositionটা কসে ফেলেন, তার পর next dayর জন্য আর একটা proposition পড়া করে আস্‌তে বলেন; Algebra বা Geometryর ভিতর যে কি রস আছে, কি মিষ্টতা আছে, অঙ্কের মত গণিতের ঐ দুই বিভাগ ছাত্রের কর্ম্মজীবনে কোথায় কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যে আবশ্যক, তাহা মাষ্টারি মস্তিষ্কে একেবারে প্রবেশ লাভ-ই করে নাই। সুতরাং Geometry ও Algebraকে আঁকড়াইয়া পতিত ঐ থার্ড ক্লাসেই একাধিকক্রমে তিন বৎসর অবস্থিতি করিল; যে বার ঐ স্কুল হইতে তাহার সহপাঠী ও ভ্রাতা অধর কবিরাজের তৃতীয় পুত্র second divisionএ Entrance পাশ হইয়া Medical Collageএ ভর্ত্তি হইল, সেবার ব্রজনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্রের বিদ্যারথের চক্র একেবারে দঁকে বসিয়া গিয়াছে, আর অগ্রসর হইতেছে না। তখন তিনি বদন বাবুকে ধরিয়া করিয়া ঐ Macswallow কোম্পানীর আফিসেই পতিতকে despatch clerk করিয়া দিলেন। পতিত লেফাপার শিরোনামা লিখিতে লাগিল, ডাকের টিকিটের হিসাব রাখিতে লাগিল আর মাসে ১৫টি করিয়া টাকা আনিয়া মায়ের হাতে দিতে লাগিল। মন কিন্তু পতিতের একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল! যে ডাক্তার হইবার আশা সে বাল্যকাল হইতে হৃদয়ে

পোষণ করিয়া আসিতেছিল, যে আশার বলে সে একদিনও স্কুল কামাই করিত না, রাত্রি জাগিয়া পড়া মুখস্থ করিত, সে আশার মঙ্গলপ্রদীপ একেবারে নিবিয়া গেল। পতিত ছেলেবেলায় ডাক্তারী ডাক্তারী খেলা করিত; টিফিনের পয়সায় কচুরি জিলিপি না খাইয়া বেণের দোকান হইতে সোডা, এসিড্ কিনিয়া আনিয়া সে আলাদা আলাদা বাটিতে গুলিত এবং ভাই বোন্ ও খেলুড়ীদের সামনে ঐ দুইটা জল মিশাইয়া চোঁ চোঁ শব্দে ফুটাইয়া তাহাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত। জলপানির পয়সা জমাইয়া সে তার্পিণ কিনিত, পিপারমেণ্ট কিনিত, টিন্‌চার্ আইডিন্ কিনিত এবং অবস্থানুসারে ক্রীড়া-সঙ্গীদিগের উপর ঐ সকল ঔষধের ব্যবস্থা চালাইত। পাড়ার এক নাপিত ডাক্তারের নিকট সে একখানি ভাঙ্গা বেল্‌কার চাহিয়া লইয়া তাহার দ্বারা ভাইবোনের পাকা পাঁচড়া উস্‌কাইয়া দিয়া অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিত। একবার সে একটা পাকা বেল কাটাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, বেল পচিয়া তাহাতে যে পোকা ধরিল, তাহাই তাহার খেলাঘরের জোঁক হইল। পতিত মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিত ডাক্তারকে; সে যখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ে, তখন শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হয়েন। ইনিই হাইকোর্টের প্রথম দিশী জজ, বাড়ীর সকলে এ কথা আলোচনা করিত। পতিত ভাবিত, আমায় যদি জজ করিয়া দেয় ত' আমি সে পদ লইব না, আমি ডাক্তার হইব। পাড়ার কাহারও পীড়া হইলে পতিত আগে তথায় ছুটিয়া যাইত, ডাক্তারকে খবর দিবার লোকের অভাব হইলে, পতিত সেই মধুর ভার আনন্দে লইয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটিত; ডাক্তার আসিলে তাঁহার উঠা-বসা, দাঁড়ান, নাড়ী টেপা, জিব দেখা, শিঙে বসান, প্রিস্কৃপ্‌সন্ লেখা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ক্রিয়া অতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিত। দাগে দাগে ঠিক ঔষধ ঢালিয়া রোগীকে খাওইবার ভার পাইলে পতিতের চিত্ত প্রফুল্ল হইত এবং গরম জলে হাত পোড়াইয়াও সে ফোমেণ্ট করিত, পুল্‌টিস্ বসাইত। পল্লীস্থ সকলেই এই জন্য পতিতকে ভালবাসিত ও তাহার সুখ্যাতি করিত; কিন্তু অদৃষ্টের বক্রদৃষ্টি ভেষজ-ধ্যান-পরায়ণ পতিতকে কেরাণীর কেদারায় বসাইয়া দিল, মর্ম্মান্তিক বেদনা বুকে বহন করিয়া পতিত কলম পিষিতে লাগিল।

Entrance পাশ না করিলে Medical Collegeএ প্রবেশ করিতে দেয় না, এই বিধি সয়তান কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিয়া পতিতের বিশ্বাস জন্মিল; সে ভাবিত, ওবাড়ীর সুধোর চেয়ে আমি কি কম ইংরিজি জানি যে, আমি Anatomy, Materia Medica বুঝিতে পারিব না? ডাক্তারীতে Geometryর এত কি দরকার? তখন Campbell School স্থাপিত হয় নাই, Medical Collegeএর ভিতরই একটা বাঙ্গালা ও একটা উর্দ্দু বিভাগ ছিল, ডাক্তার প্রসন্ন মিত্র, তামিজ খাঁ, কানাইলাল দে প্রভৃতি তখন তথায় শিক্ষকতা করিতেন; পতিত ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালা বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিত, কিন্তু সেরূপ Native ডাক্তারীতে পতিতের ততটা আস্থা ছিল না। সেখান হইতে যাহারা পাশ হইত, তাহারা বাঙ্গালায় প্রিস্কৃপ্‌সন্ লিখিত, Governmentএর কাছে ৫।৭ বছরের একরারনামা লিখিয়া দিলে তবে একটি ১৫।২০ টাকার চাকুরী পাইত, তাও দূরদেশে গণ্ডগ্রামে। সে ডাক্তারী পতিতের উচ্চাভিলাষের নিকট অতি হেয়। যাহা হউক, রোগী পরিচর্য্যার পূর্ব্বাভ্যাস পতিত পরিত্যাগ করিল না, পাড়ার লোকও পতিতকে পরিত্যাগ করিল না। অমন সাগ্রহ সখের সেবা পতিত ভিন্ন আর কে করিবে? পল্লীস্থ দুঃখী গৃহস্থরা পতিতকে বলিতেন, "বাবা, তুমি আমাদের পতিতপাবন।" গোঁফের রেখা বেশ স্পষ্ট দিয়াছে, সুতরাং ভাঙ্গা বেল্‌কার দিয়া কলাগাছ অস্ত্র করা ও বেলের আটার সঙ্গে পোকার জোঁক বসানর খেলা আর চলে না; তখনও ডাক্তার দুর্গাদাস করের চিরপ্রসিদ্ধ Materia Medica বাহির হয় নাই, পাড়ার নাপিত ডাক্তারের বাড়ীতে শিবচন্দ্র কম্মকার প্রণীত একখানি চলনসই বাঙ্গালা Materia Medica ছিল, পতিত ডাক্তার জ্যেঠার বাড়ী গিয়া মাঝে মাঝে তাহা পড়িত এবং একখানি খাতা করিয়া আপন মনে নানাবিধ প্রিস্কৃপ্‌সন্ লিখিত এবং অন্য ডাক্তারের প্রিস্কৃপ্‌সন্ দেখিলেই ঐ খাতায় নকল করিয়া রাখিত।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

হিমালয়-অভিযান

মানবের বুদ্ধি, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং একনিষ্ঠ সাধনার ফলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। এমন এক সময় ছিল, যখন আল্‌পস্, মণ্টব্লাঙ্ক, ককেসস্, আন্‌ডিস্ প্রভৃতি পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ মনুষ্য-শক্তিকে উপহাস করিত। তখন সকলেই জানিত, এ সকল গিরিশৃঙ্গ দুরধিগম্য,—তথায় মানবের পদাঙ্ক পতিত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু সাধনার বলে উহাদের দুরধিগম্য শিখরশীর্ষে মানবের বিজয়-বৈজয়ন্তী এখন উড্ডীন হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে শুধু ভারতবর্ষের বিরাট, বিশাল হিমাচলের তুষার-কিরীটী, অভ্রভেদী চূড়া, গৌরীশঙ্কর এতদিন মানবের সকল প্রচেষ্টাকেই উপহাস করিয়া আসিয়াছে। কোনও মানুষই এ পর্য্যন্ত তুষার-প্রাচীর ভেদ করিয়া হিমালয়ের তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু আর বোধ হয় হিমগিরির সে গৌরব থাকে না।

ইতঃপূর্ব্বে বহুবার হিমাচলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিগত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডবলু ডবলু গ্রেহাম্ দুই জন সুইটজারল্যাণ্ডবাসী পথি-প্রদর্শক সমভিব্যাহারে কাব্রু শিখর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত শৃঙ্গ ২৪ হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কার্ল দীনার মধ্য-হিমালয়ের প্রায় ১৯ হাজার ফুট পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সার্ মার্টিন্ কন্‌ওয়ে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রধান তুষারস্তূপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

তাহার পর বিগত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুলক্ ওয়ার্কম্যান্ সস্ত্রীক পর্ব্বতারোহণ করিয়া পাঁচটি নূতন শৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। দুইটি পথিপ্রদর্শক সহ শ্রীমতী বুলক্ ওয়ার্কম্যান্ প্রথম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। উহার উচ্চতা ২৫,৮০৪ ফুট হইবে। উল্লিখিত ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, ডাক্তার ও শ্রীমতী বুলক্ ওয়ার্কম্যান্ হুংগানগর ও হিস্পার তুষার নদীর উৎস আবিষ্কারকল্পে পর্ব্বতারোহণ করেন।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারেন নাই। তাই গত বৎসর হইতে হিমালয়-অভিযান আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। চির-রহস্যময়, দুর্ভেদ্য হিমালয়ের তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিবার জন্য বিগত বর্ষে কর্ণেল হাউয়ার্ড বারি বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। কতিপয় সাহসী ও দৃঢ়চেতা সহচরসহ তিনি হিমালয়-জয়ে পর্ব্বতারোহণ করিতে থাকেন।

সহচরবৃন্দ সহ কর্ণেল হাউয়ার্ড বারি।
বামদিক হইতে দাঁড়াইয়া—উলাষ্টন, কর্ণেল হাউয়ার্ড বারি, হেরন্, রেবরন্;
বসিয়া—মেলরি, হুইলার, বুলক ও মর্শেড।

বহু বাধা-বিঘ্ন জয় করিয়া কর্ণেল বারির নেতৃত্বে এই বীর-বাহিনী গত বৎসর বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিগত বর্ষের ২১শে মে তারিখে, মেলরি, সমরভেল্ এবং নর্টন্ নামক কর্ণেল বারির তিন জন সহচর ২৬,৮০০ ফুট পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। উহার পূর্ব্ব রাত্রিতে মর্শেড্, সমরভেল্, মেলরি ও নর্টন্ ২৫,০০০ ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে আরোহণ করার পর তথায় শিবিরসন্নিবেশ করেন।

বর্ত্তমান বর্ষে নূতন উদ্যমে আবার অভিযান আরব্ধ হইয়াছে। এবার জেনারল ব্রুস্ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সহচরবৃন্দের মধ্যে তাঁহার একটি ঘনিষ্ঠ যুবক আত্মীয় আছেন। তাঁহার নাম, কাপ্তেন ব্রুস্। অক্সিজেনের ভার পড়িয়াছে কাপ্তেন ফিঞ্চের উপর। এই সাহসী বীর না কি শেষ পর্য্যন্ত দলের সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিবেন, এইরূপ পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা হইয়া আছে।

বিগত ১৪ই মে তারিখে জেনারেল ব্রুস্ পর্ব্বতারোহণ-সংক্রান্ত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে কৌতূহল-পূর্ণ বিবিধ সংবাদ আছে। হিমালয়ের ১৬,৮০০ ফুট উদ্ধস্থিত রঙ্গবক্ তুষার-নদীর তীরে সন্নিবিষ্ট কেন্দ্রশিবির হইতে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আমরা ক্রমেই অগ্রসর হইতেছি। ঋতু এখন আমাদের অনুকূল থাকায় দলের সকলেই বেশ উৎফুল্ল। উৎসাহের সহিত সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত। অবশ্য, নানা অনিবার্য্য কারণবশতঃ পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা নিরূপিত স্থানে পৌছিতে পারি নাই বটে; কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। অন্যান্য অবস্থা এখন পর্ব্বতারোহণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইলেও রাত্রিকালের শৈত্য অত্যন্ত অধিক। হিমালয়ের উত্তরাংশের সহিত পূর্ব্বাংশের ঋতুর পার্থক্য বড়ই বিচিত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরা এখন বসন্ত ঋতু উপভোগ করিতেছি। আমাদের সহচরবর্গ এখন যেখানে অবস্থান করিতেছেন, এই বিশ্বের মধ্যে তাহার উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এখনও পর্য্যন্ত একখানি তুষার-শিলার পতন কেহ দেখেও নাই বা শুনেও নাই। সত্য বলিতে কি, বিরাট তুষার-স্তূপ সুদৃঢ় পাহাড়ের মত অচল অটলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু কয়েক শত মাইল দূরে—হিমালয়ের পশ্চিমাংশের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। য়ুরোপের পর্ব্বতমালার সহিত হিমালয়ের পশ্চিমাংশের ঋতুর সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ সে অঞ্চলে, বৎসরের এই সময়ে পর্ব্বতারোহণ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

"আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইবে, হিমাদ্রির পূর্ব্বভাগ আবিষ্কারের পক্ষে, সর্ব্ববিধ অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনুকূল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। পর্ব্বতের উচ্চতর স্থানে নৈসর্গিক অবস্থা বিঘ্নবর্জ্জিত হইলেও এখানে শীত অত্যন্ত অধিক। শৃঙ্গমালা অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব বলিয়া বৃষ্টির প্রাবল্য এখানে অত্যধিক। হিমালয়ের পূর্ব্বভাগে বর্ষা—অন্য স্থানের তুলনায় অগ্রে দেখা দেয় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। গ্রীষ্মকালই পর্ব্বতারোহণের সম্পূর্ণ উপযোগী। এই সময়ে আবিষ্ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য; কিন্তু গ্রীষ্ম ঋতুতে এখানে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এ সকল অঞ্চলে বর্ষা প্রবলই থাকে। তাহার পর হেমন্তের আবির্ভাবে আকাশ নির্ম্মল হইলেও প্রবল শীতবায়ু বহিতে থাকে; তাহাতে আবিষ্কারকের পক্ষে উচ্চতর স্থানে আরোহণ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৎসরের মধ্যে মাত্র দুইটি মাসই পর্ব্বতারোহণের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু ডাক্তার লংষ্টাফের মতে মাত্র এক মাসই ঠিক উপযুক্ত সময়। তাহার বেশী সময় এ অঞ্চলে আবিষ্কারের উপযোগী নহে।

"পূর্ব্ববার দ্রব্যাদি বহনের ও শিবিরসন্নিবেশ প্রভৃতির জন্য আমরা কুলীর অভাবে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম। সে জন্য বাধ্য হইয়া এবার আমরা ৯০ জন স্থানীয় তিব্বতীয় কুলী নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি, কুলীর সমস্যাই ক্রমে জটিল হইয়া উঠিতেছে। ৯০ জনের মধ্যে মাত্র ৪৫ জন শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়াছিল। দুই দিন পর্য্যন্ত তাহারা বেশ কায করিয়াছিল; কিন্তু তৃতীয় দিবসে তাহারা আমাদিগকে জানাইল যে, তাহাদের খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম। নীচেয় নামিয়া খাদ্যাদি আহরণ করিয়া তাহারা আবার ফিরিয়া আসিবে, এইরূপ অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইয়া জামিন রাখিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করা দূরে থাকুক, তাহারা সোজা স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। খারটা উপত্যকাভূমিতে তাহাদিগের বাস। এখান হইতে ঐ স্থানের দূরত্ব ৩০ মাইলেরও অধিক। অবশ্য এরূপ ঘটনা এ অঞ্চলে নূতন নহে। এসিয়ায় পর্য্যটকগণকে প্রায়ই এমন অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ বিপৎপাতে প্রকৃতই আমরা বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছি। উপায়ান্তর না দেখিয়া, অন্যান্য কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত ছিল, সকলেই এখন দ্রব্যসম্ভার বহনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। বিগত ৫ই মে তারিখে, কর্ণেল ষ্ট্রট, মেজর মর্শেড্, মেজর নর্টন ও ডাক্তার লংষ্টাফ রংবক্ তুষার-নদীর পূর্ব্বভাগ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অভিযান সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। তাঁহারা শিবিরসন্নিবেশের উপযোগী একটি স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন।

পূর্ব্বরংবকের মোহানার সন্নিকটে আমরা ইতোমধ্যেই কতিপয় প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়াছি। তন্মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রসদ ও তাম্বু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। এই শিবির হইতেই আমাদের আবিষ্ক্রিয়ার কায আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বরংবক্ উপত্যকা ও প্রধান রংবক্ উপত্যকার সংযোগ স্থলের উপরই আমাদের এই শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানের উচ্চতা ১৭ হাজার ফুট। বিগত ৬ই মে আবিষ্কারকগণ, পূর্ব্বরংবক্ তুষার-নদীর পূর্ব্বতীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। গত বৎসর মেজর হুইলার যে স্থানে পৌঁছিয়া পূর্ব্বরংবক্ তুষার নদী ও বিয়াট তুষার-নদীর কোথাও বা শৃঙ্গসমূহ শির উচ্চ করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গভীর খাত বিদ্যমান। তুষার-শৃঙ্গগুলি মর্ম্মর-প্রস্তরবৎ সুকঠিন। খাতগুলি শুষ্ক তুষারময়। এই স্থান হইতে পর্য্যটকগণের দৃষ্টির সম্মুখে এভারেষ্টের অভ্রভেদী চূড়া সুস্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল। সে দৃশ্য যেমনই চমৎকার, তেমনই মহান্। আমাদের দল উৎসাহভরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ 'চ্যাংলা' শৃঙ্গের দৃশ্য দর্শকদিগের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইল। তাহার অনতিদূরে চ্যাংসি শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৪,৭৩০ ফুট। বেলা সাড়ে বারোটার সময় আমাদের দল সেখানে উপনীত হয়েন। ২১হাজার ফুট উর্দ্ধস্থিত স্থানে আমাদের তৃতীয় শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভারবাহকগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালই আছে। শুধু এক ব্যক্তি পার্ব্বত্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছে।

"এ দিকে আমাদের প্রধান শিবিরের কুলীরা পলায়ন করায়, কাপ্তেন ক্রুসের নেতৃত্বে আর এক দল তৃতীয় শিবির অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এই দলে মিঃ মেলরি, ডাক্তার সমরভেল্ এবং কতিপয় ভৃত্য আছে।

সূর্য্যাস্তে এভারেষ্টের দৃশ্য।
গ'র্‌টা উপত্যকা হইতে ২৫ হাজার ফুট উচ্চস্থানের দৃশ্য।

এভারেষ্ট শৃঙ্গের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের আবিষ্কারকগণ ক্রমে সেই স্থানে উপনীত হয়েন। এইখানে আমাদের দ্বিতীয় শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এ স্থানের উচ্চতা ১৯,৩৬০ ফুট। তার পর আমাদের দল দুরতিক্রম্য তুষার-নদীর উপর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন।"

"সে দিন দ্বিতীয় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরদিবস আবার অভিযান আরব্ধ হইল। মর্শেড্ ইতোমধ্যে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়ায় প্রধান তুষার-নদী আবিষ্কৃত হইল। এই তৃতীয় শিবিরে পৌঁছিয়া মিঃ মেলরি ও ডাক্তার সমরভেল্ উত্তরদিকের পথ আবিষ্কার করিবার জন্য যাত্রা করিবেন। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে ঠাণ্ডা লাগিয়া সকলেরই ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে। অনেকগুলি দেশীয় পরিচারক ইতোমধ্যে শয্যাশায়ী হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গগণের মধ্যেও অনেকে এই রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পান নাই। এতদ্ব্যতীত দলের অন্যান্য অবস্থা খুবই আশাপ্রদ।"

জেনারল ক্রুসের উল্লিখিত বর্ণনা-বহুল পত্রের পর ফারিজঙ্গ হইতে ১৪ই জুন তারযোগে সংবাদ আসিয়াছিল যে,

কাপ্তেন ফিঞ্চ ও কাপ্তেন ব্রুস্, জনৈক গুর্খা সমভিব্যাহারে এভারেষ্ট শৃঙ্গের ২৫,৫০০ ফুট পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া তথায় শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক দুই রাত্রি বাস করিয়াছেন। তাহার পর অক্সিজেনের সাহায্যে তাঁহারা ২৭,২০০ ফুট পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন,এ সংবাদও আসিয়াছিল। এভারেষ্ট শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। তন্মধ্যে ২৭,২০০ ফুট পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাকি রহিল আর ১,৮০০ ফুট মাত্র। এই পথটুকু আরোহণ করিতে পারিলেই দুর্জ্জয় হিমগিরির উন্নত শীর্ষের উপর মানবের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইতে থাকিত।

গত বর্ষে কর্ণেল হাউয়ার্ড বারি ২৩,০০০ ফুট পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। জেনারল ব্রুস্ এখন সেই স্থানেই শিবিরসংস্থাপন করিয়া তথা হইতেই এভারেষ্ট শৃঙ্গের অবশিষ্ট অংশে আরোহণের চেষ্টা করিয়াছেন।

কাপ্তেন ফিঞ্চ ও কাপ্তেন ব্রুস্ গুর্খাসহ যেরূপ উচ্চতর স্থানে দুই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কোনও মানব তত্দূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া কখনও এক রাত্রিও বাস করিতে সমর্থ হয় নাই। ইঁহারা অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, ইহ. অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এভারেষ্ট-যাত্রিগণ যে পরিমাণ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার পর এভারেষ্ট শৃঙ্গে উঠিতে আর তিনটি মাত্র উচ্চ শৃঙ্গ অবশিষ্ট—.

১ম। মাকালু শিখর, ইহার উচ্চতা – ২৭,৭৯০ ফুট।

২য়। কাঞ্চনজঙ্ঘা—২৮,১৪৬ ফুট।

৩য়। গড্ উইন্ অষ্টিন—২৮,২৫০ ফুট।

ইহার পরই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশিখর—এভারেষ্ট।

ইহার পর সংবাদ আসিয়াছে, আর ১ শত ফুট অর্থাৎ ২৭ হাজার ৩ শত ফুট আরোহণের পর বাধ্য হইয়া আরোহীরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এভারেষ্ট-চূড়ায় মানুষের পদার্পণ এবারও হইল না।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

গোদাবরী-তীরে।

মনে পড়ে কত কথা গোদাবরী-তীরে,
এই কি সে চিরশ্রুত পুণ্য জনস্থান ?
কি স্মৃতি মেঘের মত আসে মোরে ঘিরে,
স্বপ্নরাজ্যে পথহারা আত্মহারা প্রাণ!
গোদাবরি! তোমার এ চিররম্য কূলে
লুটাইত অযোধ্যার মুকুটের মণি,
সেই স্মৃতি, সেই ব্যথা আজো কি গো ভুলে
তোমার কোমল মৃদু কুলু-কুলু ধ্বনি ?
সে কি ভুলিবার কথা ?—দিবস-যামিনী
জ্বলে স্মৃতি-রত্ন-দীপ চির-অন্ধকারে।
এ তীর্থে দেবতা তুমি জনক-নন্দিনি!
জাগ্রত তোমার পূজা কি ভক্তি-সম্ভারে!
কি স্নিগ্ধ! পবিত্র আহা গোদাবরী-বারি।
গোমুখী-গঙ্গার সম চিরতাপহারী!

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

মুক্তি ও ভক্তি।

৩

এই অতিবিস্তৃত বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রেও কিন্তু মুক্তি-কেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ভক্তি ও জ্ঞান সেই মুক্তির সাধন বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এই বিষয়ে ন্যায়, বৈশেষিক ও বেদান্ত প্রভৃতি আস্তিক দর্শন-শাস্ত্রের সহিত মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। তবে পরমাত্মার স্বরূপ ও সৃষ্টিক্রম ইহাতে যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রচলিত দার্শনিক মতের সহিত পাঞ্চরাত্র মতের বিশেষ বৈষম্যই দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং এক্ষণে তাহারই আলোচনা সংক্ষেপে করা যাইতেছে।

এই পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের প্রচলিত প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে অহির্বুধ্ন্য সংহিতাখানি বড়ই প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই গ্রন্থখানি যে কাশ্মীরে প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত ছিল, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। এই সংহিতাখানি—অহির্বুধ্ন্য অর্থাৎ শ্রীমহেশ্বর নারদকে উপদেশ করেন—নারদের মুখে শুনিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি পরে ভারদ্বাজ নামক ঋষিকে ইহার উপদেশ করিয়াছেন। অহির্বুধ্ন্য শ্রুতি-প্রসিদ্ধ একাদশ রুদ্রের অন্যতম।

শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়—

"অহির্বৈ বুধ্নিয়োঽকাময়ত ইমাং প্রতিষ্ঠাং বিন্দেয়" ইতি।

এই মন্ত্রে বুধ্নিয় অহি এই শব্দ দুইটি রুদ্রদেবতাকে নির্দ্দেশ করিতেছে। বুধ্নিয় ও বুধ্ন্য একই অর্থের বোধক; এই কারণে অহির্বুধ্ন্য এই শব্দটিও যে ভগবান্ রুদ্রেরই পরিচায়ক, তাহা শ্রুতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা এই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র শ্রীরুদ্রকে উপদেশ করেন এবং নারদ তাহা পরে শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের মধ্যে প্রচারিত করেন, এ কথা বিশদভাবে মহাভারতেও কথিত হইয়াছে,—

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে পঞ্চরাত্রপ্রকরণে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে—

"ময়াশিষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা মাং যজ্ঞমযজৎ পুরা।
ততস্তস্মৈ বরান্ প্রীতো দদাবহমনুত্তমান্॥
মৎপুত্রত্বং চ কল্পাদৌ লোকাধ্যক্ষত্বমেব চ।
এষ মাতা পিতা চৈব যুষ্মাকঞ্চ পিতামহঃ॥
ময়ানুশিষ্টো ভবিতা সর্ব্বভূতবরপ্রদঃ।
অস্যৈব চাত্মজো রুদ্রো ললাটাৎ যঃ সমুত্থিতঃ॥
ব্রহ্মানুশিষ্টো ভবিতা সোঽপি সর্ব্ববরপ্রদঃ।"
(শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ৩৪৯ অধ্যায়)

"ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদসমন্বিতম্।
সাংখ্যযোগকৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্।
নারায়ণমুখোদ্গীতং নারদোঽশ্রাবয়ৎ পুনঃ।
ব্রহ্মণঃ সদনে তাত যথা দৃষ্টং যথা শ্রুতম্॥"
(শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ৩৪৮ অধ্যায়)

এই শ্লোক কয়টির যথাক্রমে তাৎপর্য্যার্থ এই যে –

নারায়ণ কহিতেছেন,—"আমি পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, ব্রহ্মা যজ্ঞরূপধারী আমাকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, আমি তাহাতে প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে বহু উৎকৃষ্ট বর দিয়াছিলাম, সেই বরসমূহের মধ্যে একটি বর এই যে, কল্পের আদিতে ব্রহ্মা আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন এবং তিনি লোকসমূহের অধ্যক্ষ হইবেন। সেই ব্রহ্মাই তোমাদের মাতা ও পিতা এবং তিনিই তোমাদের পিতামহ। আমারই উপদেশানুসারে ব্রহ্মা সকল লোককে বরদান করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মার ললাট হইতে আবির্ভূত, সুতরাং ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত রুদ্র ব্রহ্মার নিকট হইতে এই পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের উপদেশ পাইবেন এবং তিনিও সকল প্রাণীকে বরদান করিতে সমর্থ হইবেন।"

"চারিটি বেদের সহিত সম্মিলিত এই পঞ্চরাত্ররূপ মহোপনিষদ্; সাংখ্য ও যোগের সিদ্ধান্তও ইহার অনুকূল। এই পঞ্চরাত্র প্রথমে শ্রীনারায়ণের মুখ হইতে উদ্গীত হয়, পরে ব্রহ্মলোকে যেমন দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তদনুসারে নারদ পরে অন্যান্য ঋষিগণকে শুনাইয়াছিলেন।"

উল্লিখিত মহাভারতের বচন কয়টির দ্বারা বুঝা যায় যে, পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রও বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়। কারণ, সাক্ষাৎ নারায়ণই ইহার আদি বক্তা, ইহা ব্রহ্মলোকে প্রচারিত

হইয়াছিল—সে স্থান হইতে ইহা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ ইহা মনুষ্যলোকে ঋষিগণের মধ্যে প্রচারিত করেন—সেই ঋষিগণের অন্যতম দুর্ব্বাসা ঋষি ভরদ্বাজ ঋষিকে ইহা শুনাইয়াছিলেন; সুতরাং এই অহির্বুধ্ন্য সংহিতা পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশিষ্ট প্রমাণগ্রন্থরূপে সমাদৃত হইবার যোগ্য। এইবার দেখা যাউক, অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় ভক্তি-শাস্ত্রের উপজীব্য যে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, তদ্বিষয়ে কি কথিত হইয়াছে।

প্রলয়কালের শেষভাগে অথবা ব্রহ্মরাত্রির শেষ যামার্দ্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর ইচ্ছাবশতঃ বৈষ্ণবী শক্তি জাগরিত হইয়া থাকেন। এই জাগরণ বা উন্মেষ কি ভাবে হইয়া থাকে, তাহার পরিচয় অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় এই ভাবে পাওয়া যায়—

"প্রসুপ্তাখিলকার্য্যং যৎ সর্ব্বতঃ সমতাং গতম্।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাবাসমনাহতম্॥ ২
পূর্ণ-স্তিমিত-ষাড়্গুণ্যমসমীরাম্বরোপমম্।
তস্য স্তৈমিত্যরূপা যা শক্তিঃ শূন্যস্বরূপিণী॥ ৩
স্বাতন্ত্র্যাদেব কস্মাচ্চিৎ কচিৎ সোন্মেষমৃচ্ছতি।
আত্মভূতা হি যা শক্তিঃ পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ॥ ৪
দৈবী বিদ্যুদিব ব্যোম্নি কচিদুদ্দ্যোততে তু সা।"

অহির্বুধ্ন্য সংহিতা, ৫ম অধ্যায়।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—"সমস্ত কার্য্যই যাঁহাতে প্রলয়-কালে 'প্রসুপ্ত' বিলীন হইয়াছিল, যিনি সর্ব্বতোভাবে সমতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি সকলের আবাস ও 'অনাহত' নির্বিকার—যাঁহার পূর্ণ ছয়টি গুণ তৎকালে স্তিমিত-ভাবে বিদ্যমান ছিল—নির্বাত আকাশের সহিত যাঁহার সেই সময় তুলনা হইতে পারে, সেই নারায়ণই পরব্রহ্ম, সেই পরব্রহ্মের স্তৈমিত্যরূপ যে শক্তি, তাহার স্বরূপ—শূন্যতা (কার্য্য-সমূহের অপ্রকটাবস্থাই শক্তির শূন্যতারূপ)। কোন সময়ে কোন অনির্ব্বচনীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবেই সেই ব্রহ্মশক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে, সেই শক্তি কিন্তু পরব্রহ্ম হরিরই আত্মভূত। মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশে যেমন দৈবী বিদ্যুতের বিকাশ হইয়া থাকে এবং সেই বিদ্যোতমানা শক্তিও আকাশের যেমন আত্মভূত হইয়া থাকে—সেইরূপই পরমাত্মা হরিতে তাঁহারই স্বাতন্ত্র্যবশতঃ শক্তির বিদ্যোতন বা উন্মেষ হইয়া থাকে।"

এই "স্তিমিতষাড়্গুণ্যরূপা" পরব্রহ্মের আত্মভূতশক্তিই বৈষ্ণবী শক্তি বা লক্ষ্মী। পরব্রহ্ম হরির সহিত এই বৈষ্ণবী শক্তি বা লক্ষ্মীর সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাও অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় এই ভাবে কথিত হইয়াছে—

নারদ উবাচ।

"ষাড়্গুণ্যং তৎ কথং ব্রহ্ম স্বশক্তিপরিবৃংহিতম্।
তস্য শক্তিশ্চ কা নাম কথং বৃংহিতমুচ্যতে॥"

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ষাড়্গুণ্য' (জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ এই ছয়টি গুণের সমষ্টি অথচ নিত্য আধার) স্বরূপ যে পরব্রহ্ম, তিনি আবার কিরূপে শক্তি দ্বারা 'পরিবৃংহিত' উপচিত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন? আর তাঁহার সেই শক্তিরই বা কি স্বরূপ, যে শক্তি দ্বারা 'বৃংহিত' উপচিত বলিয়া তিনি ব্রহ্ম শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন?—

অহির্বুধ্ন্য উবাচ।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যা অপৃথক্ স্থিতাঃ।
স্বরূপে নৈব দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কার্য্যতস্তু তাঃ॥
সূক্ষ্মাবস্থা তু সা তেষাং সর্ব্বভাবানুগামিনী।
ইদন্তয়া বিধাতুং সা ন নিষেদ্ধুং চ শক্যতে॥

সকল ভাববস্তুরই শক্তিনিচয় অচিন্ত্য হইয়া থাকে। যখন বস্তু স্বরূপেই বিদ্যমান থাকে, তখন তাহার শক্তিনিচয় লক্ষিত হয় না; কিন্তু বস্তু যখন কার্য্যে পরিণত হয়, তখনই তাহার শক্তিনিচয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেই কার্য্যসমূহের কারণগত যে সূক্ষ্মাবস্থা এবং সকল ভাবপদার্থেই বিদ্যমান থাকে, তাহারই নাম শক্তি—সেই শক্তিকে তাহার আশ্রয় হইতে পৃথক্ করিয়া প্রতিপাদন করিতে কেহই পারে না, সেইরূপ তাহাকে নাই বলিয়া অপলাপ করিবার সামর্থ্যও কাহারও নাই।

এই কয়টি শ্লোক দ্বারা জগৎকারণ ও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় অতি বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। জগৎপ্রসবিনী বিষ্ণুশক্তির—জগৎকারণ বিষ্ণুর এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রেমভক্তিবাদের মূল ভিত্তিস্বরূপ—ইহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি ভক্তাচার্য্যগণও এই ভেদাভেদবাদেরই অবলম্বন বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তবে ঐ সকল পূর্ণ দ্বৈতবাদিগণের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐকমত্য বা অনৈকমত্য কি কি কারণে হইয়া পড়িয়াছে, তাহার

আলোচনা যথাসময়ে করা যাইবে। আপাততঃ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের সৃষ্টি-তত্ত্ববিষয়ে দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃত প্রসঙ্গে এই শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর সম্বন্ধ কি? তাহা বিচার দ্বারা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ ত শক্তির সত্তা একেবারেই উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন, বহ্নি হইতে দাহ হয়, সুতরাং বহ্নি দাহরূপ কার্য্যের কারণ—ইহা নির্ব্বিবাদে সকলেরই স্বীকার্য্য; কিন্তু এই কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ শক্তি বলিয়া যে কারণে একটি অতিরিক্ত ধর্ম্ম আছে, তাহা ত কোন প্রকার প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। শক্তিই যদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আবার শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ কি? তাহা ভেদ বা অভেদ, এই প্রকার বিচারের অবসর কোথায়? ইহা কি কাকের কয়টা দাঁত আছে, তাহার গণনার জন্য প্রয়াসের ন্যায় নিষ্ফল প্রয়াস নহে?

আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণের এই প্রকার সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শক্তিবাদী পূর্ব্বমীমাংসকগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, শক্তির খণ্ডন করা এই ভাবে হইতে পারে না। কারণ, কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা কারণে শক্তি নামক একটি ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণবলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া পড়ি। যদি বল, সেই প্রমাণ কি—তাহার উত্তরে শক্তিবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, শক্তি স্বীকার না করিলে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তিই সম্ভবপর হয় না। নৈয়ায়িকের মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, অসৎ কার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? কার্য্যের সহিত কারণের কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ কারণ হইতে কার্য্য হইবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। যেহেতু, তাহা হইলে যে কোন বস্তু হইতে যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে। মাটীর সহিত ঘটের সম্বন্ধ না থাকিলেও যদি মাটী হইতে ঘট হয়, তবে মাটীর সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা হইতে ঘটের ন্যায় পৃথিবীর সকল কার্য্যই উৎপন্ন হয় না কেন? এই জন্য কারণের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ একটা আছেই, ইহা মানিতেই হইবে। তাহাই যদি মানিলে, তবে কিরূপে বলিবে যে, উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কার্য্য একেবারে গগন-কুসুমের ন্যায় অসৎ? গগন-কুসুমের সহিত যেমন কোন সদ্‌বস্তুর সম্বন্ধ অসম্ভব, সেইরূপ অসৎকার্য্যের সহিত সৎকারণেরও সম্বন্ধ অসম্ভব। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে যাঁহারা অসৎ বলিয়া থাকেন, সেই আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ কোন প্রকারেই কার্য্য ও কারণের মধ্যে অপেক্ষিত সম্বন্ধ কি, তাহা স্থির করিতে পারেন না। এই কারণে বলিতে হইবে, কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না—কিন্তু তাহা সূক্ষ্মভাবে কারণেই লীন ছিল; সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে যে নিজ কারণে অবস্থিতি, তাহাই কারণে শক্তি নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কার্য্যের সহিত কারণের ইহাই সম্বন্ধ, অর্থাৎ যে কার্য্য যে কারণে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই কারণ হইতে সেই কার্য্যই উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে।

এই অখণ্ডনীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তটিকে সংক্ষেপে ও সরলভাবে বুঝাইবার জন্যই অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় ভগবান্ মহেশ্বর নারদকে বলিতেছেন—

"সূক্ষ্মাবস্থা হি সা তেষাং সর্ব্বভাবানুগামিনী।"

ইহার অনুবাদ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

এই শক্তি, পরিচ্ছিন্ন কারণে ব্যষ্টিভাবে নিবিষ্ট থাকিলেও অনন্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের অনাদি ও অনন্ত কারণরূপ সচ্চিদানন্দময় ষাড়্‌গুণ্য-বিগ্রহ মূল কারণ নারায়ণে সৃষ্টির পূর্ব্বে অনাদিকাল হইতে অবস্থিত সমষ্টিশক্তিই বিশ্বপ্রপঞ্চের অব্যক্তাবস্থা, ইহারই—নাম পরা বিষ্ণুশক্তি। সাত্বত-সংহিতা, ঈশ্বর-সংহিতা, কপিঞ্জল-সংহিতা, পরাশর-সংহিতা, পদ্মতন্ত্র, বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা, ভারদ্বাজ-সংহিতা, লক্ষ্মীতন্ত্র, বিষ্ণুতিলক-সংহিতা ও শ্রীপ্রশ্ন-সংহিতা প্রভৃতি পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের একমাত্র আদিকারণ নারায়ণে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত প্রপঞ্চরূপ সেই পরা বিষ্ণুশক্তি বা লক্ষ্মীর স্বরূপ এই ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। কি কারণে সেই পরা বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী এই নামে অভিহিত হয়, তাহারও কারণ অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় এইরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"জগত্তয়া লক্ষ্যমাণা সা লক্ষ্মীরিতি গীয়তে।"

(সেই পরা বিষ্ণুশক্তি—সৃষ্টিকালে জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া তাহার নাম লক্ষ্মী।)

আবার প্রপঞ্চের সকল আকার সঙ্কুচিত হইয়া তাহাতে অবস্থিত বলিয়া তাহাকে কুণ্ডলিনীও বলা যায়, যথা—

"জগদাকারসংকোচাৎ স্মৃতা কুণ্ডলিনী বুধৈঃ।"
অহির্বুধ্ন্যসংহিতা। ৩।১২

ভিন্ন ভিন্ন পাঞ্চরাত্র সংহিতা গ্রন্থে এই পরা বিষ্ণুশক্তির বহু নামের নির্দ্দেশ আছে, পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য কয়েকটি নাম প্রদর্শিত হইতেছে,—আনন্দা, স্বতন্ত্রা, নিত্যা, পূর্ণা, শ্রী, পদ্মা, কমলা, বিষ্ণুশক্তি, বিষ্ণুপত্নী, বিষ্ণুমায়া, বৈষ্ণবী, অনাহতা, পরমানন্দসংবোধা, গৌরী, মহী, জগৎপ্রাণা, মন্ত্রমাতা, প্রকৃতি, মাতা, শিবা, তরুণী, তারা, সত্যা, শান্তা, মোহিনী, ইড়া, রতি, রম্ভী, বিশ্রুতি, সরস্বতী ও মহাভাসা প্রভৃতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হ্লাদিনীশক্তির স্বরূপ-বিচার-কালে বিষ্ণুশক্তির এই নামগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হইবে বলিয়া এই কয়টির এই স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা গেল।

এইবার সেই পরা বিষ্ণুশক্তির উন্মেষ (যাহা জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে হয় বলা হইয়াছে) কয় প্রকার, তাহাই দেখা যাউক।

"লক্ষ্মীময়ঃ সমুন্মেষঃ স দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
ক্রিয়াভূতিবিভেদেন"
(অহির্বুধ্ন্যসংহিতা)

(নারায়ণের সেই লক্ষ্মীময় সমুন্মেষ ক্রিয়া ও ভূতি এই দুই প্রকারে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে)

ভূতিরূপ যে সমুন্মেষ, তাহার স্বরূপ কয় প্রকার, তাহার পরিচয় যথা—

"ভূতিঃ সা চ ত্রিধা মতা
অব্যক্তকালপুংভাবাস্তেষাং রূপং প্রবক্ষ্যতে।"

(অব্যক্ত, কাল ও পুরুষরূপে প্রকটিত হয় বলিয়া সেই সমুন্মেষ তিন প্রকার হইয়া থাকে। এই অব্যক্ত, কাল ও পুরুষের স্বভাব কি, তাহা পরে বলা যাইবে)

ক্রিয়াময় সমুন্মেষ কি প্রকার, তাহার নির্দ্দেশ এইরূপ দেখা যায়—

"ক্রিয়াখ্যো যঃ সমুন্মেষঃ স ভূতিপরিবর্ত্তকঃ।
লক্ষ্মীময়ঃ প্রাণরূপো বিষ্ণোঃ সঙ্কল্প উচ্যতে॥
স্বাতন্ত্র্যরূপ ইচ্ছাত্মা প্রেক্ষারূপঃ ক্রিয়াফলঃ।
উন্মেষো যঃ সুসঙ্কল্পঃ সর্ব্বত্রাব্যাহতঃ কৃতৌ॥
অব্যক্তকালপুংরূপাং চেতনাচেতনাত্মিকাম্।
ভূতিং লক্ষ্মীময়ীং বিষ্ণোঃ সর্গে সংযোজয়ত্যয়ম্॥
অব্যক্তং পরিণামেন কালং কলনকর্ম্মণা।
পুরুষং ভোজনোদ্যোগৈঃ সর্গে সংযোজয়ত্যয়ম্॥"

এই যে ক্রিয়া নামক সমুন্মেষ, তাহাই ভূতিরূপ সমুন্মেষের পরিবর্ত্তক; ইহা লক্ষ্মী, ইহা প্রাণস্বরূপ এবং ইহাই বিষ্ণুর সঙ্কল্প বলিয়া (শ্রুতিতে) নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিষ্ণুর স্বাতন্ত্র্যই এই সমুন্মেষের মূল বা নিদান, প্রেক্ষা (প্রকৃষ্ট ঈক্ষণ) ইহার স্বরূপ, ক্রিয়া ইহার পরিণাম, এই শোভন সঙ্কল্প সকলপ্রকার কার্য্যসম্পাদনে অব্যাহত, বিষ্ণুর লক্ষ্মী-ময়ী যে ভূতিশক্তি, তাহাকে এই সুসঙ্কল্পরূপ ক্রিয়াময় সমু-ন্মেষই প্রকটিত করিয়া থাকে, এই ক্রিয়াময় সমুন্মেষই সৃষ্টি-কালে অব্যক্তকে পরিণামের সহিত কালকে কলন (অর্থাৎ লয়করণরূপ) ক্রিয়ার সহিত এবং পুরুষ অর্থাৎ জীবসমূহকে ভোগবিষয়ে উদ্যোগের সহিত যুক্ত করিয়া থাকে।

এই ক্রিয়াময় সমুন্মেষই পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তে সুদর্শন এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুদর্শনের সুদর্শনত্ব কি?

"সর্ব্বত্রাব্যাহতত্বং যৎ তৎ সুদর্শনলক্ষণম্।"
(অহির্বুধ্ন্যসংহিতা)

(এই সঙ্কল্পরূপ ক্রিয়া সমুন্মেষের যে সর্ব্বত্র অব্যাহত-ভাব, তাহাই ইহার সুদর্শনত্ব)

এই সুদর্শনের স্বরূপপরিচয়প্রসঙ্গে সংহিতাকার আরও বলিতেছেন—

"সোঽয়ং সুদর্শনং নাম সঙ্কল্পঃ স্পন্দনাত্মকঃ।
বিভজ্য বহুধা রূপং ভাবে ভাবেঽবতিষ্ঠতে॥
(অহির্বুধ্ন্যসংহিতা)

এই সেই সুদর্শন নামক সঙ্কল্প, স্পন্দনই ইহার স্বরূপ, এই সুদর্শনই নানাপ্রকার রূপে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

ক্রিয়া-সমুন্মেষরূপ এই সুদর্শনের সত্তা প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে কি ভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাহার নির্ণয় অগ্রে করা যাইতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

যুদ্ধের লগ্ন।

(পঞ্জাবী মহাভারতের এক পৃষ্ঠা)

শুনা যায়, বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাবে মহাভারতের যেরূপ প্রচার ছিল, আজকাল সেরূপ নাই। এখন মন্দিরে মন্দিরে, ঘরে ঘরে, তিথি-পার্ব্বণে তুলসী-রামায়ণেরই কথা হইয়া থাকে। তাই আধুনিক পঞ্জাবের লোকজ্ঞানে কুরু-পাণ্ডবের মোটামুটি যুদ্ধ-কাহিনী পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যাস-রচিত মহাভারতের মূল বা অনুবাদের অনুশীলন তেমন দেখা যায় না। বরঞ্চ মহাভারতের যে সকল উপাখ্যান বাঙ্গালা দেশে অত্যন্ত প্রচলিত, পঞ্জাবে তাহা প্রায়ই অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন তথ্য বলিয়া গণ্য হয়। ভাগবতের কৃপায় কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্যে মহাভারতের কোন কোন অংশমাত্র এখানে লোক-বিদিত। এইটিই নিয়ম বলিয়া ধারণা হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এক দিন ইহার ব্যত্যয়ের প্রমাণ পাইয়া বড় বিস্মিত হইলাম।

পঞ্জাবে মাতৃভাষার পরিরক্ষক আজকাল গ্রাম্য দরিদ্র ও "ইতর" লোকরা। অমৃতসর ও লাহোরের যে আধুনিক প্রসিদ্ধ কথক, সে জাতিতে পরামাণিক। একবার এক মাস ধরিয়া আমার পরিচিতা কোন স্ত্রী নেহালচাঁদের মন্দিরে তাহার কথকতা করান। মন্দির লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। লাহোরের আর এক মন্দিরে প্রতি দ্বাদশী তিথিতে মেয়েরা চাঁদা করিয়া তাহার কথকতা করায়। তাহার রচিত অনেক পঞ্জাবী কবিতা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। গুরুদাস-পুরের সন্নিকটে আমাদের গ্রামে এক গ্রাম্য কবি আছে—আমাদের প্রজা, সে জাতিতে মেথর।

পঞ্জাবের অনেক গ্রামে হিন্দু মেথররা আজকাল ইসাই ধর্ম্মভুক্ত। কিন্তু তাহারা নামে ইসাই, কাজে কর্ম্মে আগে-কারই মত ইতর হিন্দু। আমাদের কবিবরের নাম শাহানা মল। শাহানা একে মেথর, তায় কাণা, তায় উপর তোৎলা। এই ত্রিগুণাত্মক কবির বছরে একবার করিয়া আমাদের লাহোর-গৃহে শুভাগমন হয়। সে না জানে লিখিতে, না পারে পড়িতে, কিন্তু দেবী সরস্বতীর তাহার প্রতি অদ্ভুত কৃপা। সর্ব্বদাই নূতন নূতন "ব্যাৎ" বা "কবিৎ" রচনা করিতেছে, নূতন আখ্যায়িকা ছন্দোবদ্ধ করিতেছে এবং আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছে। তাহার স্বকীয় কাব্য-রসের নমুনা ভবিষ্যতে কোন দিন আপনাদের সমীপে উপস্থিত করিব। আজ তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত পঞ্জাবী মহা-ভারতের একটি পালা যথাযথ অনুবাদ করিয়া শুনাইব। এটি শাহানা মলেরও শ্রুতিপরম্পরায় লব্ধ। পঞ্জাবে ঝিব্বর নামে এক সৎশূদ্রজাতি আছে। সম্ভবতঃ ইহারা প্রাচীন 'ধীবর'জাতি; কিন্তু অধুনা 'কাহার'-মধ্যে গণ্য। পঞ্জাবের হিন্দু-গৃহে জল তোলা ও বাসন মাজার কাজ ঝিব্বরদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কপূরথলার নিকটস্থ আয়নাবালী গ্রামের ভাণ্ডর ঝিব্বরের মুখে শাহানা মল এই মহাভারত শ্রবণ করে। কিন্তু ইহার ভণিতা হইতে জানা যায়, ইহার রচয়িতা দ্বারকাদাস নামে কোন কবি। ইহা কথকতার ছাঁদে গদ্যে ও পদ্যে মিশ্রিত। অশিক্ষিত ইতর লোকদের মুখে মুখে ইহার সংস্কৃত শব্দ সকল বিকৃত হইয়া গিয়াছে, স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু প্রাকৃত পঞ্জাবীর নিদর্শনস্বরূপ শাহানা মলের উচ্চারণই বজায় রাখিলাম।

ব্যাসের উদ্যোগপর্ব্বের এক অংশের মর্ম্ম লইয়া এ পালাটি রচিত। সমুদ্রে ও কূপে যত প্রভেদ, ব্যাসের আখ্যায়িকায় ও ইহাতে ততই প্রভেদ। কিন্তু এ কূপের যে নিজস্বটুকু, তাহা অবহেলার সামগ্রী নহে—সাহিত্য-রসে রসিক শ্রোতা উহা উপলব্ধি করিবেন।

অথ কথারম্ভ :—

১

কিষণ মহারাজ পাণ্ডবদের দৌত্য স্বীকার করিয়া সন্ধির জন্য জলযোধনের নিকট আসিলেন। জলযোধন বসিয়া রহিল উচ্চে, মহারাজ বসিলেন নীচে। সন্ধির কথা পাড়িতে জলযোধন বলিল,—"তুই আমাদের সন্ধি করবার কে? আমাদের সন্ধি করাবেন রাজারা। সন্ধি করান চতুর্ভুজ কাশীওয়ালা, সন্ধি করান মহীপতি প্রয়াগওয়ালা, সন্ধি করান শঙ্করের বেটা গিরিচাঁদ ও বীরচাঁদ। সন্ধি করাতে আসুন

কুলুওয়ালা রাজা, সন্ধি করান রাজা দ্রুপদ। আমাদের সন্ধি করাবেন রাজা উজ্জলা, রাজা বৃহস্পতি, রাজা সনীতম্। আমাদের সন্ধির সঙ্গে তোর কি? যা, গিয়ে নন্দমহলে গরু চরা, টক ঘোল খেগে যা, আর গোয়ালিনীদের সঙ্গে ইয়ারকি দে।"

[কবি দ্বারকা দাসের মৌলিকতা পাঠককে স্বীকার করিতেই হইবে! তিনি ব্যাসের অন্ধ অনুকরণকারী নহেন।]

"এ বঙ্গারৎ অগাদি কাজন্ রাজে
তু ব্যাপারি দহিদা হ্যাফ কানু সাজে
কনক বো'রা নেই লগনা পেটপাচেতে নাগে
গোয়াঁ বাচ্ছে চারণাঁ নেই দে জবাব।

আমাদের এ বেগার রাজারা উঠান। তুই দইয়ের ব্যাপারী এত অহঙ্কার তোকে সাজে না। পেটে যতটুকু সয়, ততটুকু খেলে পেট ভার হয় না। যা, যা, গরু-বাছুর চরাগে যা, আর জবাব দিতে হবে না।"

কিষণ লঘু হইয়া অপমান মাথায় লইয়া বাহিরে আসিলেন।

২

জলযোধন হুকুম জারি করিল—কেহ যেন মহারাজকে গৃহে না রাখে, "যে রাখিবে, তারই সর্ব্বনাশ করিব।" মহারাজ ভাবিলেন,—"আর ত কেহ স্থান দিবে না, বিদুর আমার পরম ভক্ত, তারি কাছে যাই, সে রাখিবে।" এই ভাবিয়া বিদুরের বাড়ী গেলেন। তা সে দিন বিদুরের বাড়ী অন্ন ছিল না, আর তার পুত্র মরিয়া গিয়াছিল। বিদুর স্ত্রীকে বলিলেন, "আজ কিষণ আমাদের গৃহে এসেছেন, কাঁদিস্‌নে। উনি চ'লে যান, তখন যত খুসী কাঁদিস্। এখন ক্ষেতে গিয়ে ছেঁড়া-খোঁড়া শাক-পাতা যা প'ড়ে পাস্ কুড়িয়ে নিয়ে আয়, তাই এঁকে খেতে দেব।"

বিদুরণী ঘর হইতে বাহির হওয়ামাত্র ঈশ্বর-কৃপায় সম্মুখেই সরষের শীষ দেখিতে পাইল। তাহাই আনিয়া হাঁড়িতে চড়াইল। কিন্তু ঘরে নুণ ছিল না। নিজের চুল ছিঁড়িয়া দড়ি বিনাইল, সেই দড়ি বাজারে বেচিয়া নুণ কিনিয়া আনিল। তার পর ঠাঁই করিল তিনটি, আর তিন থালে শাক বাড়িল।

মহারাজ বলিলেন, "ওহে বিদুর, চতুর্থ থালিও সাজাও—তোমার পুত্রের জন্য—ডাক তা'কে।"

বিদুর স্ত্রীকে আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন,—"একবার বাইরে থেকে হোয়ে আয়; এসে বল্‌বি, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেল্‌তে খেল্‌তে কোথায় দৌড়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

বিদুরণী সেইরূপ করিতে মহারাজ বলিলেন,—"আমি ডাকি তা'কে?" বলিতে বলিতে সবাই দেখে, ছিন্ন কন্থার ভিতর বসিয়া বালক খেলা করিতেছে। মহারাজ বলিলেন, —"বিদুর, তুমি যে বলেছিলে, ছেলেদের সঙ্গে বাইরে চ'লে গেছে? কৈ, এই ত ঘরের মধ্যেই রয়েছে।"

বিদুর প্রসাদ নিবেদন করিয়া গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিলেন,—"নাথ, তোমার মহিমা তুমিই জান।"

"ভীলন্‌কে বের সদামাকে সত্
ঠাকুর রুচ রুচ ভোগ লাগাবে
জলযোধনকে মেওয়া তেয়াগে
সাগ বিদুরকা খাবে।"

৩

তার পরদিন জলযোধন সিপাইদের ডাকিয়া বলিলেন,—"কিষণ কাল বিদুরের ঘরে রাত কাটিয়ে থাক্‌বেন। সেখানে গিয়ে তাঁর বেইজ্জতি কর।"

"বড়েভ বেল প্রভাত বিদর সোঁ টুয়ে স্বামী
মগরো পায়েন্দা চানচাক কিথে চলেয়া নামী
কিষণ ঐসি লীলাধারী হোরই পরে গ্রামী
ওনাকু দ্রপ আপ'রচ্, কোই রহন আরামী।
পয়না দাপন্ চিগাবুৎ, ফের ধর্ত্তি মানী
গহকে মর গয়ে আপ'বিচ, রাজাদে
বড়ে বড়ে অভিমানী।"

প্রভাতবেলায় বিদুরের গৃহে থেকে স্বামীজী বেরোলেন। হঠাৎ পিছনে ডাকাত পড়ল,—"কোথায় যান হে মশায়?" কিষণ এমনি লীলা ধারণ করলেন, নিজে রইলেন তফাৎ। তারা আপোষে মারামারি করিল। রাজার বড় বড় অভিমানী কাল দণ্ড ধরিয়া প্রথমে চোখে সরষে ফুল দেখিল, তার পর ধরণী আশ্রয় করিল।

৪

মহারাজা ফের জলযোধনের কাছে আসিলেন। সে তাঁকে অভিভাষণ করিল না। কুকুরের মৃত্যু যখন ঘনাইয়া আসে, মস্‌জিদ অপবিত্র করে। মহারাজ ভাবিলেন,—"এ ত কথাই

কয় না, আমিই কই।" বলিলেন,—"শুন হে রাজা জলযোধন, আমাকে পাণ্ডবেরা পাঠিয়েছেন।"

"কেষ্ণে রাম রাম চরণি কপটায়ে
নারদ ভীখম্ পরশ রামজি না বোগনে পায়ে,
তেরে কিত্তে আন গুণ কিষণ আপ শুনায়ে,
দে ছড় জগ্ন, পঞ্চ পিণ্ড বসন্ তেরি তর ছায়ে,
দ্বারকা দাস যে গাউন্দা মহাভারত গায়ে ॥" *

জলযোধন নিরুত্তর রহিল। তখন মহারাজ ভীমসেনের কাছে গিয়া বলিলেন,—"তোমাদের হিস্‌সে দেবে না হে।" ভীমসেন কহিলেন,—"আর একবার আমাদের হয়ে যান।" বারের বার তিনবার! মহারাজ ফের গেলেন। গিয়া বলিলেন,—"ওহে জলযোধন, ওদের পাঁচখানা গ্রাম দিয়ে ফেল।"

এইবার জলযোধন উত্তর দিল। বলিল,—"কোন্ কোন্ গ্রাম চায়?"

"দিল্লী এক, লাহোর দুই, পেশোর তিন, কাশ্মীর চার, মুলতান পাঁচ।"

[অর্থাৎ দিল্লী ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্জাব, নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সেস, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশ এই পাঁচটিমাত্র জায়গা।]

কিষণের কথা শুনিতে শুনিতে রাগে জলযোধনের মাথার টিকি নড়িয়া উঠিল, পা থেকে তপ্ত আগুন মাথা দিয়া বাহির হইতে লাগিল,—"তোর মতন কপট কুবুদ্ধি কখন দেখি নাই,—" এই কটুক্তির সহিত হুকুম দিল,—"ধর্ ওকে, বেহায়া কালাকে ঠিক ক'রে দে।"

কিষণ চলিয়া আসিলেন। লোক বলিল,—"হে জলযোধন, বিপরীত করলে, মহারাজকে ফিরালে, বড় যুদ্ধ বাধবে। এ সেই মহারাজ—যে হিরণ্যকশিপুর গায়ের চামড়া তুলে ফেলেছিল; এ সেই মহারাজ—যে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে মেরেছিল; এ সেই মহারাজ—যে তিন পাদে বলিকে বেঁধেছিল। তোমার দশাও তাই হবে।"

এ দিকে মহারাজ পথে যাইতে যাইতে কর্ণ যে পাণ্ডবদের ভাই, কিন্তু কুরুদের দিকে ছিল, তাকে গিয়া বলিলেন,—"ভাইয়েদের দিকে হও হে।"

কর্ণও উত্তর দিলেন,—"ওঁদের কপালে ত নিত্যি উপোস, আমিও না খেয়ে মর্‌ব?"

কিষণ মহারাজ বারংবার কর্ণকে বুঝাইলেন,—"কর্ণ, কেন জনম খোয়াবে? পাণ্ডবরা তোমার আপন ভাই, তাদের পক্ষ নাও।" কিন্তু মহারাজের একটি কথাও কর্ণের মনে বসিল না। পাণ্ডবদের নিকট ফিরিয়া গিয়া মহারাজ বলিলেন,—"অর্জ্জুন, তোমরা হিস্‌সে পাবে না ভাই, যুদ্ধ আরম্ভ কর।" অর্জ্জুন কহিলেন,—"মহারাজ আমাদের যুদ্ধের লগ্ন দেখে দিন।"

কিষণ উত্তর দিলেন,—"আজকের মত পাঁজি-পুঁথি কৌরবেরা নিয়ে গেছে, তোমাদের কাল দেখে দেব।"

অর্জ্জুন বলিলেন,—"হে মহারাজ, চার বেদ, চব্বিশ মন্তর, ষট্ শাস্তর, আঠার পুরাণ, গঙ্গাগঙ্গোত্রী, ঐং ক্রীং শ্রীং ক্লীং ষট্‌কর্ম্মন্, সন্ধ্যা-তর্পণ, নব্বই কান্নসি, পনের তিথি, সাত বার, সাতশ সত্তর—এত যে শাস্তর, এ সবই নিয়ে গেছে, সবই দিয়ে ফেলেছ?"

"হাঁ, সবই দিয়ে ফেলেছি। তোমাদের কাল দেব।"

কাল যখন আসিল, মহারাজ অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিলেন, —"এই শুন ভাই যুদ্ধের লগ্নের কথা। আমি যখন মাঠের মধ্যে বিজন স্থানে ঘুমোব, ঘুম ভাঙ্গতেই সেই মুহূর্ত্তে যার প্রতি আমার দৃষ্টিপাত হবে, সে-ই যুদ্ধে জয়লাভ করবে। চল, তোমাদের খাতিরে আজ আমি মাঠে গিয়েই শুয়ে থাকি। দেখ, কে শুভ মুহূর্ত্ত নিতে পারে।"

কথা রটিয়া গেল। মহারাজ গিয়া বিজন মাঠে শয়ন করিয়া রহিলেন। জলযোধন খবর পাইয়া রাতারাতিই কিষণজির শিয়রে গিয়া বসিয়া রহিল। পাণ্ডবরা কেহ আসিল না।

পরদিন প্রভাতে সূর্য্য যখন আকাশে দশ গজ মাত্র চড়িয়াছে, অর্জ্জুন আসিয়া মহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পায়ের তেলোয় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রথম দৃষ্টি পদপ্রান্তে উপবিষ্ট অর্জ্জুনের উপর পড়িল।

---

* রাম রাম বলিয়া নমস্কার করিলেন। নারদ, ভীম, পরশুরাম যে যে সকল মহাপুরুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিছু বলিতে পারিলেন না। কিষণ কহিলেন,—"তোমার গুণপন্না দেখাও। পাঁচখানা গ্রাম ওদের ছেড়ে দাও, তোমার ছত্র-ছায়ে বাস করুক, দ্বারকাদাস মহাভারত-কথা রচিয়া গায়।"

জলঘোধন ক্রোধে দুই হাতে সজোরে কিষণের মাথায় থাপ্পড় মারিয়া বলিল,—"যাঁ যা, জোর ক'রে ওদের দর্শন দিবি, ত দিগে যা। ওরা না হয় পাঁচ জন ছিল, ছ' জন হ'ল। তাতে কি? কাঁকড়াবিছের একখানা পা খস্‌লে খোঁড়া হয়ে যায় না। ওই ছোঁড়াদের প্রতি পক্ষপাত কর্‌লি বটে, কিন্তু ওরা তোর মান খোয়াবে। আমার সিংহসম ভাইদের সঙ্গে ওদের তুলনা? তারা এমন বলীয়ান্, পৃথিবীকে তুলে আকাশে ছুড়ে মার্‌লে আকাশ ভেঙ্গে যায়। বাহুবল যার, সেই সবল।"

•

গাওয়া বলে সদা সকল গল্প আখ্যে শুনাই
দ্বারকা দাস গাউন্দা মহাভারত পাই।

রাগে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে জলঘোধন চলিয়া গেল। অর্জ্জুন প্রভুর কৃপাদৃষ্টিলাভে ধন্য হইল।

শ্রীসরলা দেবী

কেরাণী

১

হাকিম হুকিম নও কো তুমি বড়াই তোমার নেইক কিছু,
নিত্য বিপুল কার্য্যভারে আপনি মাথা হয় যে নীচু।
সহগুণের মূর্ত্তি তুমি, গর্ব্ব করা সরম ভাবো,
কলম পেশা তোমার নেশা আবশ্যক ও আরাম তব।
ঠাট্টা করে নাট্যশালায়, হৃদয়বিহীন গ্রন্থকারে,
ভ্রূক্ষেপও নাই কার্য্য করো, আফিস-ঘরের অন্ধকারে।
নিত্য কর্ম্মী, পরিশ্রমী, হও কি তুমি নিন্দনীয়,
দুখ-সায়রের ভোমরা তুমি প্রশংস্য ও বন্দনীয়।

২

ধীর তোমাদের ধৈর্য্যগুণে বিশাল শাসনযন্ত্র চলে,
বীজের মত হও যে হারা বনস্পতির চরণতলে।
ঘুরায় কঠিন জাঁতার চাকা তোমার প্রবল শ্রমের বারি,
তোমার গড়া দ্রব্য চালায় অন্য লোকে 'লেবেল' মারি।
তোমার রচা কাব্য হতে, তোমার নামই হারায় গোলে,
নিত্য তোমার মন্দিরেতে অন্য লোকে নিশান তোলে।
কষ্টে ধরা হরিণ তব, ভাবছো তুমি রাজায় দেবে,
দস্তখতের শরটি হেনে তোমার খেলাৎ অন্যে নেবে।

৩

অধিকার ত কর্ম্মে তোমার, নাইক ত হাত কর্ম্মফলে,
ভক্ত এবং বিশ্বাসী বই, এই ভরসায় আর কে চলে।
মস্ত গৃহের ভাবনা ভাবো, ভেয়ের পড়া, মেয়ের বিয়ে,
সন্তোষই যে অমৃত তা, বুঝতে পারি তোমায় দিয়ে।
তুমিই জ্ঞানী আদর্শ লোক, মহাকবির চাতক সম,
ঠিক রেখেছ দুদিক্ তুমি, স্বভাব তোমার অনুপম।
দীন তুমি তাই ডাক্‌তে পার, নিত্য দীনবন্ধু ব'লে,
নয়ন-নীহার ঢাল্‌তে পার, তাঁহার চরণপদ্মতলে।

৪

দীর্ঘ দিবস কার্য্য করি, সন্ধ্যাবেলা তোমার ছুটী,
যাও বলাকা গৃহের পানে একসাথেতে সবাই জুটি।
গৃহস্থালীর নানান জিনিষ, ছেলের খাবার খেলনা কেনো,
পাষাণপুরীর নীরস পথের আধেক শোভাই তোমরা জেনো।
ক্ষুদ্র দুখের সুখের কথায় মধুর তোমার হাস্য গানে,
তুলসীতলার দীপের আলো, সন্ধ্যামণির গন্ধ আনে।
বক্ষে তোমার নিত্য আঁকা শান্ত-গৃহের পুণ্যছবি,
তোমায় দেখে সসম্ভ্রমে রয় দাঁড়িয়ে পল্লী-কবি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সেকালের পূজার খরচ।

এখনকার কালে দেশে দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবনযাত্রা ক্রমেই পরম কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অহর্নিশি "ত্রাহি মধুসূদন" ডাকিতেছে, প্রাণ সকলেরই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য, আমরা অপর দেশের কথা বলিতেছি না। হয় ত তুলনায় ভারতের বাহিরে দ্রব্যাদির মূল্য আরও অধিক হইতে পারে; কিন্তু ভারতের দারিদ্র্যের অনুপাতে, ভারতের নিত্য অভাব অনাটনের অনুপাতে, এ দেশের সহিত অন্য দেশের মূল্যবৃদ্ধির তুলনা করা যায় না। এ দেশে লোকের গড়-পড়তা আয়ের সহিত অপর দেশের আয়ের তুলনা হইতে পারে না। এ দেশের মৃতকল্প শিল্পবাণিজ্য প্রতীচ্যের সহিত তুলিত হইতে পারে না। সুতরাং শিল্প-বাণিজ্যের প্রকৃত অভাবে—কেবল কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের কারকারবারে যে ধনাগম হয়, তাহা প্রতীচ্যের কোটিপতির ব্যবসায়-বাণিজ্যের আয়ের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এ দেশে এখন লোক ব্যবসায়-বাণিজ্যে অল্প-বিস্তর মন দিতেছে বটে, কিন্তু এ দেশে ব্যবসায়ে লাখ দু'লাখ টাকা নিয়োগ করাটাই মস্ত কথা। আর প্রতীচ্যে ?—সে তুলনা না করাই ভাল।

বাঙ্গালার কথাটাই ছোট করিয়া ধরা যাউক না। বাঙ্গালীর মুখে আগে যে হাসি দেখিয়াছি, এখন আর তেমন প্রাণ-খোলা হাসি দেখিতে পাই না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অস্বাস্থ্য ও অভাব। বাল্যকালে ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে দুর্গাপূজায় যে আনন্দ, যে স্বচ্ছলতা, যে প্রফুল্লতা দেখিয়াছি, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। আমাদেরই স্বগ্রামে, বসিরহাটের পার্শ্ববর্ত্তী দণ্ডীরহাট গ্রামে, আমাদের বাটীতে যে দুর্গোৎসব দেখিয়াছি, এখন তেমনটি দেখিতে পাই না। কেন পাই না, তাহার কারণ অন্বেষণ করা, economic গবেষণা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল সে সময়ের ও এ সময়ের অবস্থার তারতম্যের কথা উল্লেখ করিতেছি।

তাহারও পূর্ব্বে—১২৫৬।৫৭ সনে, ইংরাজী ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৭০।৭২ বৎসর পূর্ব্বে দেশের লোকের অবস্থা আরও স্বচ্ছল ছিল। গৃহস্থের গোলা-ভরা ধান, বাগান-ভরা তরকারী, পুকুর-ভরা মাছ এবং গোয়াল-ভরা গাভী, কবি-কল্পনা নহে। এ সব ত আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। কেবল আমাদের ঘরে নহে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাকাদি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরেই দেখিয়াছি। তাহার পূর্ব্বে পল্লী-গৃহস্থের কিরূপ অবস্থার স্বচ্ছলতা ছিল এবং কিরূপ অল্পব্যয়ে বৃহৎ ক্রিয়া-কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত, আজ তাহার যৎসামান্য পরিচয় দিব।

বস্তুতঃ আমি ১২৫৬ সনের একখানি খরচের খাতা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। খাতাখানির কাগজ, মলাট, কালির অঙ্কপাত সকলেরই দেশী উপকরণে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের কথা, এই ৭২ বৎসরের পুরাতন কাগজ এখনও যেন সে দিনের কাগজ বলিয়া ভ্রম হয়, কালির দাগ এখনও যেন সজীব রহিয়াছে। কি উপকরণে তখন এমন মজবুত ও কাল-সহ কালি প্রস্তুত হইত, তাহাই বোধ হয়, এখন এ দেশের অনেক লোক জানে না।

এই খাতাখানিতে ৭২ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ঘরে দুর্গোৎসবের খরচের হিসাব আছে। পূজার সময় দ্রব্যাদির মূল্য স্বভাবতঃই কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ বহু দ্রব্য কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে দণ্ডীরহাটে লইয়া যাইতে হইত; সে হিসাবেও যে মূল্যের হিসাব এই খাতা হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে, উহা সাধারণ বাজার মূল্য নহে। তাহা হইলেও হিসাবটা একবার দেখুন, আর এ কালের সহিত মিলাইয়া হা হুতাশ করুন :—

(ক) ফলমূলাদি :—		/৮ সের পটোল	।০
৯৭টা ঝুনা নারিকেল	১৲	১৪টা বাতাবি লেবু	৵২০
২০টা ডাব নারিকেল	।০	ছয় পণ কাঁঠালি কলা	।৵১০
৭টা চাল কুমড়া	/১৫	দুই পণ মর্ত্তমান কলা	।৵১০
৪টা (প্রকাণ্ড) মানকচু	৵০	৩০ গাছা আক	।/০

৪টা আনারস ৵৹
/৩ সের পানিফল /১৬

(খ) বেণে মশলা :—

সুপারি /২ ।১০
ছোট এলাইচ /০ছটাক ৵১০
বড় ঐ /।০ পোয়া ৵১০
ধনের চাউল /১ সের /১০
দারুচিনি /০ ছটাক /০
খদির /১ সের ৵০
লবঙ্গ ৵০ আধ পোয়া /১০
কর্পূর /০ ছটাক /১৫
জিরে /৵০ পোয়া ৵০
মরিচ /৵০ পোয়া ৵০
সার চন্দন ।৵০ পোয়া ৵০
রক্তচন্দন /॥০ সের /৫

(গ) খাদ্যদ্রব্য :—

চিনি /৪ সের ৵০
ময়দা ॥০ মণ ১।৵০
গব্যঘৃত /৭॥০ সের ৩৲
সর্ষপ তৈল ।৪ সের ২৲
লবণ /৮।০ সের ৵০
দুগ্ধ ।৭ সের ১৲
বালাম চাউল ১/০ মণ ১/০
পূজার জন্য ঘৃত /৫॥০ ২৲
অন্য বাবদে ঐ /৬॥০সের ১॥০
গুড় /৪ সের /১০
মধু /২॥০ সের ৵১৫
মিছরি /৩॥০ সের ১৲

(ঘ) মিষ্টান্নাদি :—

সন্দেশ ।০ সের ৩৲
মিঠাই /৭॥০ সের ১৲
খাসা দধি ॥০ মণ ৵০
ওলা /৩।০ ১৲

(ঙ) শস্যাদি :—

আতপ তণ্ডুল প্রস্তুতের জন্য
৮ আড়ি ধান্য ৪৲
খই প্রস্তুতের জন্য
১ আড়ি ধান্য ॥০
চিঁড়া প্রস্তুতের জন্য
১ আড়ি ধান্য ।/০
ছোলা /৫ সের ৵১০
কাল কলাই ১/ মণ ॥৵৫
মুগ কলাই ॥০ মণ ॥৵১০
অড়হর কলাই ॥০ মণ ৵০
খেঁসারি কলাই ।০ সের ।০
ছোলার দাইল ।৫ সের ।৵০
সাদা বুট /৭॥০ সের ।/০
বরবটি /২॥০ সের /১৫

(চ) কুমারসজ্জা :—

কলিকা ২৫টা ‹১০
প্রদীপ ২৫টা ‹১০
বড় খুলি ১খানা ৵১০
খুরি ২০০ ৵০
কলসী ৫টা /৫
ভস্থরী ১১টা ৵০

তিজেল হাঁড়ি ১৬টা /১৫
মালসা ২৫টা ‹১৫
মালসী ৪০টা ‹১৫
সরা ৪০ খানা ‹১৫
টাটি ১৫০ /১৫

(ছ) ধামা ৪টা ।৵০
চেঙ্গারী (ওড়া) ২খানা ৵১০
দড়ি /৫ সের ।৵০

(জ) স্বর্ণ-রৌপ্যাদি :—

সোনা ভরি ১৪৲
ঐ মজুরি ৵০ আনা
হইতে ১।০ পর্য্যন্ত
৩খানা সভারিণ ॥৵০ওজন হিঃ
দর ১০৲ হিঃ ৩০৲

(ঝ) বস্ত্রাদি :—

দেশী তাঁতের ১০ হাত
প্রমাণ শাটী ১ খানা ॥৵০
৮ হাত ঐ ১ জোড়া ৵০
১০ হাত শাদা ধুতি
১ জোড়া ১৵০
ঐ উড়ানী ১ খানা ॥৵০
৩ বপুর ১০ হাত শাটী
৩ খানা ॥৵১০ হিঃ ১৵১০
সাদা ভুনি ১ খানা ॥৵০

১ জোড়া বিনামা ১৲
" " ৵০
" " ॥৵০
" " ।৵০

(ঞ) জ্বালানী :—

রাত্রের রোশনাই বাবদ
নারিকেল তৈল /৬॥০ ১৲
মোম বাতি /১॥০ সের ১॥৵০
১টা আমগাছ মায় কাটাই
খরচা ১।৵০

(ট) মজুরী :—

কলিকাতা হইতে দণ্ডীরহাট
নৌকা ভাড়া (২॥০ দিনের
পথ) ১৵৫
দণ্ডীরহাট হইতে কাশীধাম
নৌকা ভাড়া ৬৲
চাকরের বেতন ১।০
একদল যাত্রা মোক্তাফুরণ ১৯৲

(ঠ) প্রাতে জ্ঞাতি ভোজন
(১৫০ জনের) বাবদ :—

মৎস্য ৫৲
উৎকৃষ্ট বাঁকতুলসী চাউল
১/ এক মণ ১৵০
তরিতরকারি ॥৵১০
দুগ্ধ ।৬ সের ৵১০
দধি ১/ মণ ২॥০

খাতা হইতে মাত্র কয়টি হিসাব উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহা ব্যতীত আরও অনেক দ্রব্যের তৎকালীন মূল্য ঐ খাতা হইতে নির্দ্ধারণ করা যায়। বাহুল্য ভয়ে উহা এই সংখ্যায় সন্নিবেশিত করিলাম না।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অণুভাকে বিবাহ-যৌতুক দিবার অভিপ্রায়ে রাজকুমারী নিজের এক ছড়া দামী মুক্তার মালা কুন্দবালাকে সঙ্গে আনিতে বলেন। যে ট্রাঙ্কের মধ্যে কুন্দ তাহা আনিয়াছিল, আজ সেটা খুলিয়া দেখিল—মালার মখমল কেসটি যথাস্থানে আছে, কিন্তু তন্মধ্যে জিনিষটি নাই। অথচ ট্রাঙ্কের চব্‌স্-কল ঠিক বন্ধই ছিল, চোর-যাদুকর তালা-চাবি, কল-কব্জা না ভাঙ্গিয়াই জিনিষটি হস্তগত করিয়াছে, এ কি ইন্দ্রজাল! ভয়ে কুন্দবালার প্রাণ উড়িয়া গেল। এই সংবাদ জানাইতেই কিছু পূর্ব্বে সে রাজকন্যার নিকট গিয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীর সজ্জাগৃহের পার্শ্বেই তাঁহার অলঙ্কার-বস্ত্রাদি রক্ষার ঘর। হাসিকে বিদায় দিয়া তিনি সেই ঘরে আসিয়া দেখিলেন,—লৌহ-সিন্দুকের দরজা খোলা,—তাহার নিকটে নীচে কার্পেটের উপর বসিয়া, সম্মুখে গহনার বাক্স রাখিয়া, গহনাগুলা কুন্দ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতেছে। দাসী-বাঁদি আর কাহাকেও সেখানে না দেখিয়া রাজকুমারী বুঝিলেন, কুন্দবালার এ অতিরিক্ত সাবধানতা! মনে মনে ইহাতে তিনি একটু হাসিলেন, এবং কুন্দ তাঁহাকে দেখিবার অগ্রেই তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়া—গহনাগুলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"মালাছড়া কি পেলেন, কুন্দদি ?"

কুন্দ সচকিতভাবে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে বিষণ্ন নয়নে চাহিয়া উত্তর করিল,—"না ; পাওয়া গেল না।"

"আপনি ভুলে খালি 'কেস'টাই ট্রাঙ্কে পোরেন নি ত ?"

"না রাজকন্যা, না। আর তা' হ'লে ত এই গহনাগুলার মধ্যেই সে ছড়াটাও থাকত,—তাও ত নেই। কিন্তু আমি ঠিক জানি, আমি ভুল করিনি। গহনার বাক্সটা রঘুবীরের জিম্মায় দেবার সময় মতির মালাছড়াও কেসে পূরে—আলাদা এই ট্রাঙ্কের মধ্যে রাখি। আজ রঘুবীর যখন বাক্সটা দিলে, তখন ভাবলুম্—মালাছড়াও এই সঙ্গে সিন্দুকে তুলে ফেলি ; ও মা, ট্রাঙ্ক খুলে দেখি,—কেসের মধ্যে মালা নেই! অথচ ট্রাঙ্কটা ঠিক বন্ধই ছিল।"

"আশ্চর্য্য ব্যাপার! আচ্ছা, কুন্দদি, কাপড় গোছাবার সময় জিনিষটা চুরী যায়নি ত ?"

কুন্দেরও সেই সম্ভাবনা মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু গোপন রহস্যজালে জড়িত হইয়া এ কথা প্রকাশ করিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। রাজকুমারীর উত্তরে সে একটু থতমত খাইয়া থামিয়া থামিয়া কহিল,—"আশ্চর্য্য কি, হতেও পারে।"

রাজকুমারী কহিলেন,—"আচ্ছা, আপনি যখন বাক্স গোছাচ্ছিলেন, সেখানে তখন আর কে কে ছিল—বলুন ত ?"

কুন্দ শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিল,—"শশী দাসী ত ছিলই, আর—আর,—হ্যাঁ—হ্যাঁ, নতুন ঝিও ছিল।"

"নতুন ঝি কে ? জগর মা ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই,—আর কেউ ছিল ব'লে ত মনে পড়্‌ছে না।"

"শশী আর জগর মা ? শশী ত খুবই বিশ্বাসী দাসী, একটি পিন্‌ও মাটীতে কুড়িয়ে পেলে সে তুলে রাখে। জগর মা একটু হ্যাকা ধরণের লোক বটে,—তবে চোর ব'লে ত তা'কে মনে হয় না। তবু একবার তা'কে ডাক্‌তে বলুন ত।"

নতুন ঝি আসিয়া রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কহিল,—"ডাক্‌তেছেন ? কেন্ গো মা,—মুই পাশের ঘরে কাজ করতে নেগেছিনু,—সইমা যেতে বল্লে,—তাই চ'লে গেছনু।"

সে কথা কহিলেই রাজকুমারী হাসেন। আজ এখন হাসিটা চাপিয়া, গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"কলকাতায় আস্‌বার সময় এই বাক্সের মধ্যে একগাছি মতির মালা তোলা হয়েছিল, মনে আছে ত ?"

"মতির মালা! সে কি হেন দ্রব্যি? কই, মুই ত, মা চক্ষেও দেহিনি!"

কুন্দ বলিয়া উঠিল,—"মিথ্যাবাদী মাগী, দেখিস্ নি বলছিস্? আমার হাতের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্। এই জিনিষটা তুই-ই ত ট্রাঙ্কে পুরেছিলি,—শশী তখন অন্য কি কাজে বাইরে গিয়েছিল, তুই তখন একলা আমার কাছে ছিলি।"

কুন্দ হাতের মখমল কেস্‌টি তাহাকে দেখাইল।

জগর মা বলিল,—"এই অপূর্ব্ব দ্রব্যি! এটিরে সেদিন দেহেছি ত। এনারেই আপনারা কও মতির মালা?"

কুন্দ রাগিয়া বলিল,—"ন্যাকামি দেখ, নিশ্চয়ই তবে তুই নিয়েছিস্।"

রাজকুমারী আর হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না, উচ্চহাস্যে কহিলেন,—"না 'ওনাট্রা' মতির মালা নয়,—ওরই মধ্যে সে 'দ্রব্যি'টা ছিল।"

"মুই সে সব জানিলাম না বাপু—মুই কার জিনিষ-পত্তর যেন্‌টা যেথায় রইছে—দেহি—লও।"

ক্রন্দন ভাণে নাকিসুরে সে এই কথা বলিল। আসল কথা—রাজকন্যার হাসিতে তাহার কান্নাটা জমিতেছিল না।

কুন্দ বলিল—"ও সব মায়াকান্না রাখ্, কারে মালাছড়া দিয়েছিস্, কবুল কর্। নইলে পুলিসের গুঁতোতে এখনি চেতনা জন্মাবে।"

জগর মা এইবার সত্য সত্য সচীৎকারে কাঁদিয়া কহিল,—"ওরে বাপু রে—পুলিসের মার। জান্ যে গেলক রে? পসনায়ে যহন ডাণ্ডার ঘা দিইল—সে যে জমীনকে পড়িলো, আর ত উঠলক না। হায় হায়! কি মার্ রে? মুই ত সে দ্রব্যি চক্ষে দেখিনি, মা,—হেঁই মা,—পায়েরে রাখ্ মা,—তুই জগদম্বে।"

রাজকুমারী এবার কষ্টে হাসিটা থামাইয়া লইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি,মারধোর কিছু হবে না, তুমি সত্যি কথাটা বল। মতির মালার আর দাম কি? তুমি যদি বল সেটা কাকে দিয়েছ—তোমাকে একশ টাকা বক্‌সিস্ দেব—[illegible] সোনার হার গড়িয়ে দেব।"

"তোমায় পায়ে ধরি কইছি, মা,মুই কিছু জান্‌তাম না,—মুই কিচ্ছুতে হাত লাগাইনি; ওনারা পুর্‌তেছিল—আমি দেখতে নেগেছিনুক।"

রাজকুমারী কহিলেন,—"ওনারা কে?"

উত্তর হইল—"তা মুই বল্‌তে নারিক,—এই সই-মা,—শশে ঠাকরুণ,—আর—আর—"

"আরও কেউ ছিল নাকি?"

"হ্যাঁ গো মা, ছ্যাল বই কি, একটা পুরুষ মানুষও ছ্যাল। শশে যহন ওধারকে গেলক, তহন সেনাডা আসিই ত সব ভর্ত্তি কর্‌লে।"

এই কথাটাই এতক্ষণ কুন্দ চাপিয়া গিয়াছিল। সেই পুরুষমানুষ আর কেহ নহে, তাহার আত্মীয় সন্তোষকুমার। গুরুদেবের কি সংবাদ লইয়া সে তখন কুন্দের সহিত দেখা করিতে আসিয়া উপযাচকরূপে কুন্দকে বাক্স সাজাইবার সহায়তা করে।

রাজকুমারী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—"পুরুষমানুষ ত কেউ ভিতরে আসে না। পণ্ডিত মশায় এসেছিলেন নাকি, কুন্দদি!"

কুন্দর গলা শুকাইয়া গেল—মাথা খারাপ হইয়া গেল—কি বলিবে, কি ঢাকিবে, ভাবিবারও যেন শক্তি রহিল না। অস্পষ্ট গুঞ্জনে সে কহিল,—"পুরুষমানুষ! কই আসেনি ত কেউ! ওঃ—"

কুন্দ সহসা অব্যাহতি লাভ করিল,—দ্বারদেশ হইতে একজন দাসী নেপথ্যে খবর দিল—"ডাক্তার বাবু আস্‌ছেন।"

রাজকুমারী বলিলেন,—"এইখানেই আস্‌তে বল তাঁকে।"

তাঁহার আদেশবাক্যধ্বনি বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতে শরৎকুমার আসিয়া হাজির হইলেন। নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন,—"আপনার কি কোন গহনা হারিয়েছে, রাজকুমারি?"

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "হারিয়েছে, আপনি কি চুরী করেছেন নাকি?"

"অসম্ভব কি? দেখুন দেখি—এই মতির মালা আপনার কি না?"

রাজকুমারী বিস্ময়-প্রফুল্ল-স্বরে উত্তর করিলেন,—"সত্যিই ত! এ যে আমারি হারান মালা? কোথায় পেলেন আপনি, বলুন, বলুন।"

"এক জন এসে আমাকে দিয়ে গেল।"

"না না, বলুন না,—ডাক্তারদা—বড্ড কৌতুহল হচ্ছে?"

"সত্যি বল্‌ছি,—ভেল্কি বাজিতে পেয়েছি।"

জগর মা এই সময় ডাক্তারের কাছাকাছি আসিয়া মালা-গাছা দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল—"এই দেক, মা—যা কইনু, তা সত্যি কি না।" বলিয়া চোখ মুছিয়া স্বাভাবিক স্বরে ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"মশাই গো—দেহেন, বিচার করেন,—আপুনি কর্‌লে চুরী—আঁর এনারা মুইরে কইছে চোর—কি মারটাই মারছিলক গো!" জগর মা সম্ভাবিত পুলিসের মার অঙ্গে অনুভব করিয়া পুনরায় নাকিস্বরে উহু উহু করিয়া উঠিল।

কুন্দ রাগিয়া কহিল,—"আহা, আহা, ম'রে যাই, বড্ড লেগেছে; এসো—এসো—পিঠে হাত বুলিয়ে দিই।"

রাজকুমারী ও শরৎকুমার হাসিতে লাগিলেন। এইরূপ অপ্রত্যাশিত রহস্যসহানুভূতিলাভে সহজেই জগর মা'র কান্না থামিয়া গেল। সে প্রশান্তভাবে কহিল—"হাস্‌তেছেন—আপুনকারা—তা হাসির বার্ত্তা কি এনাটা,—কউন ত মশাই? দেহুন বাবু—মুই পই পই করিক কইনু—পুরুষ মানুষ লইছেক—কেউ পিত্যয় গেলক না,—কইলেক—মার দিবে পুলিস আনি। এহন আপুনি খুলি কও সব কথা।"

রাজকুমারী সহাস্যে কহিলেন, "এঁকেই তুমি কাপড় গোছাতে দেখেছিলে বুঝি জগর মা?"

"পিত্যয় কর মা—এই ছ' চক্ষে দেহেছি। হাঁ গো—মালা-চোর, কথা কও না ক্যান্? রঙ্গ দেহ! পরায়ে দেবার গো বুঝি ইচ্ছা! তা দাও গো—পরায়েক দাও—"

শরৎকুমার যে রাজকুমারীর বাগ্‌দত্ত বর—এ খবর রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে; জানেন না কেবল তাঁহারা দুই জনে।

দাসীর এই বাক্যে উভয়েই সলজ্জ অনুরাগে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারী বিগত পূর্ব্বাহ্নে যখন সখীদিগের সহিত রহস্যালাপে রত ছিলেন, সেই সময় রাজপরামর্শ-গৃহে গুপ্ত বিচার-সভা বসিয়াছিল। রাজার অনুপস্থিতিকালে প্রসাদপুরের হাতিয়ারশালা হইতে অস্ত্র-শস্ত্র চুরী গিয়াছে, অস্ত্রশালার অধ্যক্ষাদি সহ দেওয়ান কুঞ্জ বাবু এই সংবাদ লইয়া আজ প্রাতঃকালে কলিকাতায় আসিয়াছেন। আপাততঃ বিচার-গৃহে রাজার নিকট তিন জনমাত্র উপস্থিত ছিলেন;—দেওয়ান, অস্ত্রাধ্যক্ষ এবং শ্যামাচরণ।

রাজা অতুলেশ্বর অস্ত্রাধ্যক্ষ কৃষ্ণনাথ বাবুর উদ্দেশে কহিলেন, "চোরাই অস্ত্রের যে তালিকা দেখ্‌ছি, সংখ্যা ত এর নিতান্ত কম নয়। এক দিনে যদি এত হাতিয়ার চুরী গিয়ে থাকে ত ডাকাতী হয়েছে বলুন।"

উত্তর হইল—"না ধর্ম্মাবতার, এক দিনে নয়, ক্রমশঃ—অল্পে অল্পে চুরী গিয়েছে, সেই জন্য গোড়াতেই এ ব্যাপারটা আমরা ধর্‌তে পারিনি।"

"কিন্তু আপনার প্রধান কর্ত্তব্যই ত 'ওয়াকিবহাল' থাকা। একখানা অস্ত্রের স্থান শূন্য হলেই ত এক জন হুঁসিয়ার অধ্যক্ষের সেটা নজর করা উচিত।"

দেওয়ান এবং শ্যামাচরণ উভয়েই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরবে এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। কৃষ্ণনাথও বুঝিলেন, এই অভিযোগবাক্য তাঁহার প্রতি অযথা আরোপিত হয় নাই।

রাজা পুনরায় কহিলেন, "আমি কল্‌কাতায় আসা পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ এই চুরী চলেছে। আর আপনারা টের পেলেন কবে?"

দেওয়ান বলিলেন, "বিগত পরশু প্রাতঃকালে আমি নৌগ্রাম তদারক থেকে প্রসাদপুরে ফিরে এসে এ খবর পাই।"

কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "আমরা জেনেছি, তা'র পূর্ব্বরাত্রে, যে রাত্রে খ্যাতনামা সনাতন ধনুক দেওয়াল থেকে নীচে প'ড়ে যায়।"

রাজা দেওয়ালে আলম্বিত ধনুর্দ্ধারী সনাতন রায় চৌধুরীর প্রতিকৃতির দিকে সচিন্তনয়নে চাহিয়া আপন মনেই যেন কহিলেন—"বন্দুক, তলোয়ার চুরীর অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু অত বড় ধনুকটা সরাবার উদ্দেশ্য কি হ'তে পারে?"

শ্যামাচরণ এতক্ষণ নীরব-ঔৎসুক্যে ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, রাজার এই প্রশ্নে তিনিও অনেকটা অন্যমনস্ক-ভাবেই মৃদুস্বরে কহিলেন, "এতেই এ মামলা বেশী জটিল হয়ে উঠেছে।"

দেওয়ান বলিলেন, "হরিরাম যা—বলে—তাতে—"

রাজা দেওয়ানকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, "হরিরামের কথা—তার পালায়, তার মুখেই শোনা যাবে। আপনার কি মনে হয়, কৃষ্ণনাথ বাবু?"

রাজা বিচারাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন জাজিম আস্তরণ-বিস্তৃত এজলাস-গৃহে। তাঁহার দক্ষিণে বামে শ্যামাচরণ ও দেওয়ান, আর সম্মুখভাগে উপবিষ্ট ছিলেন অস্ত্রাধ্যক্ষ,—ইঁহার উপরেই বিচারকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির তেজ পূর্ণ-মাত্রায় নিপতিত হইতেছিল। সময়ে সময়ে তাহা অসহ্য বোধ করিয়া কৃষ্ণনাথ দৃষ্টি অবনত করিতেছিলেন। রাজার প্রশ্নে অস্ত্রাধ্যক্ষ একবার ঢোক গিলিয়া অবনতমুখে উত্তর করিলেন, "আমার মনে হয়, ধনুক হরণ চোরের উদ্দেশ্য ছিল না, সম্ভবতঃ অন্য অস্ত্র গ্রহণকালে ধাক্কা লেগে ধনুকটা নীচে প'ড়ে গিয়েছিল।"

এ অনুমান রাজার মনে লাগিল না, কিন্তু সংক্ষেপ "হুঁ" শব্দে তাঁহার মনোগত মন্তব্য শ্রোতৃবর্গের অনুমানগ্রাহ্য রাখিয়া তিনি পুনরায় জেরা আরম্ভ করিলেন, "আপনার জবানবন্দী থেকে এইটুকু বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, হাতিয়ারশালা যে ক্রমেই শূন্য হয়ে পড়্‌ছে, ধনুক নীচে পড়ার পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত আপনারা তা' ধরতেই পারেন নি। আচ্ছা, আমি কলকাতায় এলে পর অস্ত্রশালায় পাহারা দেওয়া কি বন্ধ হয়ে পড়েছিল?"

উত্তর হইল—"আজ্ঞে না, পাহারার কোন দিন কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি।"

"তা হ'লে চোরেরা দেখ্‌ছি সম্মোহনবিদ্যা-পটু! যে সব হাতিয়ার চুরী গেছে, তার মধ্যে তলোয়ার, বন্দুকও ত নিতান্ত কম নয়; প্রহরীদের চোখে ধূলো দিয়ে সেগুলো অনায়াসে বার ক'রে নিয়ে যাওয়াও ত কম বাহাদুরীর কাজ নয়!"

"আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, সদর দরজা দিয়ে চুরী হয় নি। লাইব্রেরীঘর ও হাতিয়ারশালার মধ্যে যে দরজা আছে, সেখান দিয়েই চোর যাতায়াত করেছে, আর অস্ত্র নামিয়ে দিয়েছে পিছনের জানালা দিয়ে—বাঁশবাগানের জঙ্গলে।"

"কিন্তু লাইব্রেরীর পথে অস্ত্রশালায় প্রবেশাধিকার ত নিষিদ্ধ। বিশেষ কারণ ছাড়া সে দরজা ত সচরাচর বন্ধ থাকারই কথা। আজকাল কি সেটা খোলা থাকে?"

অস্ত্রাধ্যক্ষ জড়সড় হইয়া কহিলেন, "খোলা থাকে না—তবে ছেলেরা লাইব্রেরীঘরে এসে যদি কেউ অস্ত্রশালা দেখতে চায় ত খোলা হয়ে থাকে। এটা ত আদেশবিরুদ্ধ নয়।"

"কিন্তু চৌরকার্য্যে অবসর প্রদান করা ত সে আদেশের গূঢ় তাৎপর্য্য নয়। ছেলেরা পাঠাগারে পড়্‌তে এলেও তাদের উপর অলক্ষ্যে পাহারা দেওয়ার জন্য আপনার অধীনে একাধিক সহকারী নিযুক্ত আছেন। তাঁরা কি কেউ কর্ত্তব্যপালন করেন না? ছেলেরা কেহ পাঠাগারে এলে বা অস্ত্রাগার দেখ্‌তে চাইলে তাঁরা কি সঙ্গে উপস্থিত থাকেন না?"

অধ্যক্ষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে উত্তর করিলেন—"থাকেন বই কি—থাক্‌বারি ত কথা—তবে কোনো সময় যদি কেহ কর্ত্তব্যভঙ্গ ক'রে থাকেন—তা ত বল্‌তে পারিনে; ভদ্র-নামধারী ছেলেদের সব সময় ত অবিশ্বাস করা যায় না।"

"কিন্তু নিয়মপালন ও অবিশ্বাস করা এক কথা নয়। আপনার প্রধান সহকারী কে?"

"সন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তী।"

"বিশ্বাসী লোক?"

"খুবই বিশ্বাসী,—কেবল বিশ্বাসী নন, তিনি কর্ম্মপটু এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। তিনিই ত সর্ব্বাগ্রে প্রাণের মায়ামমতা ত্যাগ ক'রে চোর ধরতে যান।"

অস্ত্রাধ্যক্ষ এইবার রাজার মুখের দিকে চাহিয়া বেশ সোৎসাহে এই কথাগুলি বলিলেন। রাজা প্রশ্ন করিলেন—"চোর ধরা পড়েছে?"

"না, ধর্ম্মাবতার। সন্তোষকে পিস্তলের গুলীতে জখম ক'রে সে চ'লে যায়।"

"সন্তোষ ছাড়া আর কেহই কি তখন চোরের কাছে এগোতে সাহস করে নি? প্রসাদপুর তা হ'লে দেখ্‌ছি এত দিন ধ'রে কাপুরুষের দলই পোষণ করছে।"

অস্ত্রাধ্যক্ষ পুনরায় অবনতমুখে দুই হাতের আঙ্গুলগুলা একত্র সংলগ্ন পূর্ব্বক মোচড়াইতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে না, তা বলছিনে, ধর্ম্মাবতার; ধনুকের শব্দ পেয়েই আর সকলে অস্ত্রশালায় ঢুকেছিল, চোর কিন্তু তখন লাই-ব্রেরীঘরে এসে পালাবার চেষ্টা করছিল—সন্তোষ প্রথমে এই ঘরে এসে তা'কে ধরতে গিয়ে নিজে জখম হয়ে পড়ে। তা'র পর গুলীর শব্দে অন্য লোক সেখানে গিয়ে আর তা'র দেখা পায়নি।"

"সন্তোষের আঘাত কি সাংঘাতিক ?"

"তা ত বোঝা যায় নি। হাঁসপাতালে সে রকম বিজ্ঞ ডাক্তার ত এখন কেহ নেই, যে তা তিনি ঠিক বুঝ্তে পারেন। তবে রোগীকে অচেতন অবস্থাতেই দেখে এসেছি। ডাক্তার শরৎ বাবু যদি তাঁ'কে চিকিৎসা করেন, তা হ'লে বোধ হয় এ যাত্রা সে রক্ষা পেতে পারে।"

"আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি কর্‌ব।" অতঃপর দেওয়ানের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—"কোতোয়ালিতে কি এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে ?"

এই প্রশ্ন হইতে পাঠক বুঝিতেছেন, প্রসাদপুরে কোতোয়ালি নামধেয় একটা কার্য্যবিভাগ এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলমান আমলের ভূতপূর্ব্ব করদ রাজাদিগের সেই ক্ষমতা-গৌরব-নিলয় বর্ত্তমানে অনুষ্ঠানঠাটরূপেই বর্ত্তমান। যে স্থলে পূর্ব্বে প্রকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজ-কোতোয়াল বহু সৈন্যের অধ্যক্ষরূপে সহররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিতেন, সেই স্থল এখন সৈন্যনিবাসের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র একটি আদালতঘর মাত্র। অঙ্গুলিগণ্য শস্ত্রধারী প্রহরীর অধিনায়ক রাজ-কোতোয়ালের অধুনা প্রধান কাজ গোয়েন্দাগিরি—অর্থাৎ প্রসাদপুরের ফৌজদারী ঘটনাবলী ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের হুকুমে পুলিসকে তিনি জানাইতে বাধ্য। তবে কোন্ ঘটনা পুলিসকে জানাইতে হইবে, রাজার তাহা নির্ণয় করিবার অধিকার আছে। সাধারণতঃ ফৌজদারী সংক্রান্ত সামান্য ঘটনাবলীর বিচার কোতোয়ালি হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া যায়। জটিল মোকর্দ্দমাই পুলিসের গোচর করা হয়। নহিলে গভর্ণমেণ্ট রাজাকে দায়ী করিতে পারেন।

রাজার প্রশ্নে দেওয়ান উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, কোতোয়ালিতে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে পুলিসকে সংবাদ দেওয়া হবে কি না—তা আপনার অনুমতিসাপেক্ষ।"

রাজা বলিলেন,—"এ ঘটনাটা পুলিসকে জানান উচিত মনে হয়। কি বলেন, শ্যামাচরণ বাবু ?"

শ্যামাচরণ বাবু এতক্ষণ মৌনভাবে বিচার-প্রশ্নোত্তর শুনিয়া যাইতেছিলেন, রাজার জিজ্ঞাসায় উত্তর করিলেন,—"হাঁ, উচিত বই কি। তাহা ছাড়া এই চুরীর কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা উচিত।"

রাজা বলিলেন,—"তা ঠিক, সে ভার আপনার উপরই থাক্।"

এই বলিয়া রাজা পুনরায় অস্ত্রাধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"সন্তোষ ত আহত, অন্য সহকারী কেহ আপনার সহিত এখানে এসেছেন ?"

"এক জন ত রাজা বাহাদুরের সঙ্গে আগেই কলকাতায় আসেন—"

রাজা ধৈর্য্যবিচ্যুত স্বরে কহিলেন,—"সে কথা আমার মনে আছে, কিন্তু আমার ত মনে হয়, দুই জনের অধিক সহকারী রাজ-সরকার থেকে বেতন পেয়ে থাকেন।"

অধ্যক্ষ শুষ্ককণ্ঠে ঢোক গিলিয়া জড়সড়ভাবে উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, তিনি হাজির আছেন—কিন্তু—"

কৃষ্ণনাথের বক্তব্য শেষ না হইতেই রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—"এ সম্বন্ধে তাঁ'র বক্তব্য কি, আমি শুন্‌তে চাই। তাঁ'কে ডাকা হোক্।"

কৃষ্ণনাথ ইহার পর আর দ্বিতীয় কথা কহিতে সাহস করিলেন না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তৃতীয় সহকারী জহরলাল পাত্র রাজসমীপে আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজা প্রত্যভিবাদন পূর্ব্বক জহরলাল পাত্রকে কহিলেন,—"এত অস্ত্র চুরী গেল, আর আপনারা কেউ কিছু জানেন না ?"

পাত্র মহাশয় আস্তে আস্তে দুই একবার কাসিয়া গলাটা সাফ করিয়া লইয়া অবনতমুখে ভীতকণ্ঠে কহিলেন,—"ধর্ম্মাবতার, আমি সে সময় ছুটীতে বাড়ী গিয়েছিলাম।"

রাজা অস্ত্রাধ্যক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"কই, আমাকে ত সে কথা শুনান হয় নাই ? আপনি ছুটী দিয়েছিলেন ?"

উত্তর হইল, "না, এ রকম ছোট-খাট বিষয়ে সন্তোষই আমার হয়ে কাজ করে।"

"সন্তোষ আপনাকে ছুটী দিয়েছিল ?"

জহরলাল রাজপ্রশ্নের এই উত্তরে কহিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ।"

"কবে ফির্‌লেন প্রসাদপুরে ?"

"চুরী প্রকাশের পরদিন। ফিরেই কলকাতায় রওয়ানা হয়েছি।"

"তা হ'লে চুরীর বিষয় বিশেষ কিছুই জানেন না আপনি?"

"না, ধর্ম্মাবতার।"

"তবে আর আপনার এখানে থাকার প্রয়োজন নেই।"

জহরলাল যেন এতক্ষণ গভীর জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছিলেন, সহসা মুক্তিলাভ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলেন। যাইবার সময় রাজাকে নমস্কার অভিবাদন করিতে পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। রাজাবাহাদুর কণ্ঠাগত হাস্য সবলে দমন করিয়া দেওয়ানকে কহিলেন—"এইবার হরিরাম সর্দ্দারকে ডাকা হউক।"

হরিরাম আসিয়া তাহার বর্শাসংযুক্ত লাঠি রাজপদতলে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম পূর্ব্বক উঠিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল।

রাজা কহিলেন—"হরিরাম, তুমি দেখ্‌ছি খুবই অসমর্থ হয়ে পড়েছ—তোমার চোখের উপর দিয়ে এতগুলা হাতিয়ার চুরী গেল, আর তুমি কি না দেখ্‌তেই পেলে না?"

হরিরামের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, বাল্য হইতে রাজসরকারের কার্য্যে সে জীবনপাত করিতেছে, কিন্তু এমন দুর্নামভাগী আর কখনও হয় নাই। সে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—"ধর্ম্মাবতার, ভয়ে কব—না নির্ভয়ে কব?"

রাজা কহিলেন—"নির্ভয়েই কও।"

করযোড়ে সে উত্তর করিল—"এ সব রায়মশায়েরই ষড়যন্ত্র, ধর্ম্মাবতার! আর 'সইকারী' যিনি হইছেন—তিনি তেনার চর।"

"এ রকম তোমার মনে হয় কেন?"

"যত রাজ্যির চেনা অচেনা 'ছালে' পাঠশালায় ঢোকে, হাতিয়ারশালায় মজলিস্ করে—মুই রোজ দুই চক্ষে দেহেছি। ধর্ম্মাবতার ভাবিলেন, মুই কাণা হইছি—তা হই নাই,—ধর্ম্মাবতার! মুই পই পই এ কথা কয়ে আস্‌ছি—তা কানে নেয় না ধর্ম্মাবতার।"

কৃষ্ণনাথ এবার নির্ভীক সবলকণ্ঠে হরিরামের প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন—"মিথ্যা বল্‌ছে ধর্ম্মাবতার! আমাকে কোন দিন এ কথা জানায়নি।"

হরিরাম কহিল—"তোমারে না—তানারে—ওগো তানারে—তোমার সইকারীকে জানাইছি। তোমারে কইব কি; কইতে তিনি কি জানে; না তোমার এক দিন দেখা পাইছি। তুমি ত তেমার হাতে শখ [illegible] লেগেছিলে!"

এ সত্য কথার প্রতিবাদ তিনি কি করিবেন, কৃষ্ণনাথ খুঁজিয়া পাইলেন না। হরিরাম আবার কহিল,—"বিচার করেন ধর্ম্মাবতার,—কয় কি না তানারে কইনি! 'কর্ত্তার দেহা পালি ত তেনারে কইব,—দরোজা আগল দেওয়া মোর কাজ, মুই দু দণ্ড খাতি যাই—আর দৌড়ি ফিরি,—মুই তেনারে খুঁজি কহন—ধর্ম্মাবতার, বিচার করেন। সইকারীকে ত যহন তহন এ বাক্যি বলছি,—তিনি মোরে খালি ঘুসি উচোচ্ছে—বল্‌তে নেগেছে—'আমার উপর কর্ত্তা হইছ তুমি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় বাক্যি তোমার—কর্ত্তারে বলি—তোমারে দূর কর্‌ব—তবে আমার নাম সইকারী।' ধর্ম্মাবতার—আপুনি নেই—আমার মা জননী নেই; মহারাণী তপ-জপ নিয়া আছেন,—তাঁকে এ সব কথা কওয়া নিষেধ—দাওয়ান বন্দরে গেছেন—কি ক'রে যে দিন কাটায়েছি—তা ধর্ম্ম জানেন।"

রাজা হরিরামের দীর্ঘ বক্তৃতায় বাধা না দিয়া নীরবে শুনিতে লাগিলেন। হরিরাম বলিয়া চলিল—"সইকারী আমারে ঘুসি উচায়ে কি পার পাত? না; ধর্ম্মাবতার, মুই অমন দশটা সইকারীকে থাপ্পরে গুঁড়া করি দেতাম; কিন্তু ধর্ম্মাবতার—যে রকম আদেশ দিইছেন—তা ত মানি চলতি হবে। সইকারী মোর কর্ত্তা—তার অঙ্গে হাত তুলি এ আদেশ নেই, মোর বুক ফাটি উঠ্‌ল রাগে—তবু মুই তার বাক্যি সয়ে গেনু। এখন বিচার করেন, ধর্ম্মাবতার।"

সভা নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল—হরিরামের প্রতি বাক্য সত্যের প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া সন্তোষকে দোষী প্রমাণ করিয়া দিল। রাজা কিছু পরে বলিলেন,—"তোমার আর কিছু বলার আছে?"

হরিরাম বলিল—"আছে ধর্ম্মাবতার,—শেষ কই নাই এখুনো। যখন দেয়ালের ধনুক নীচে পড়িলো—তহন মুই হাতিয়ারশালার দরোজা ভিড়াতে নেগেছি—তহনো তালা-চাবি পড়েনি,—ছালিয়া যানারা পাঠশালায় ছিল, তানারা সব সেই চলি গেল। কি ভীষণ আওয়াজ সে,—মোর দে কাঁপি উঠিলো; ধনুক-ঘরে আসি দেহি, কেউ কোথাও নেই; পাঠশালার দরোজা খোলা; সেহানে ঢুকি দেহি—সইকারী অচেতন পড়ি আছে আর গোঁ গোঁ কর্‌তি নেগেছে—তহনি

আর সব্বাই আইল; ধরাধরি করি তানারে নিল হাসপাতাল—আর কর্ত্তাবাবুরে খবর গেল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুন্ছি, সহকারী চোর ধর্তে গিয়ে গুলীর আঘাতে জখম হন; এ বিষয়ে তুমি কি জান?"

হরিরাম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—"সইকারী চোর ধর্তি গিয়া জখম হইলো? কেনারা বল্লে? চোর আর কোন্টাই নয় ধর্ম্মাবতার; তেনাই চোর! ধনুক ধরা সোজা কি না; তার মধ্যে সনাতন চৌধুরী, রায়-বংশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি থুইছে—তাতি হাত দিয়া উনি পার পাবে? ধনুক দেবতা ওনার ওই দশা করিলো।"

রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি গুলী করার শব্দ শোননি?"

"না, ধর্ম্মাবতার—সে ভীষণ আওয়াজ শোনেলাম; পিস্তলের আওয়াজ নয়।"

"তুমি বল্ছ—ধনুক পড়ার শব্দের কথা, কিন্তু তার পরে অন্য শব্দ পাও নি?"

"না, ধর্ম্মাবতার!"

রাজা তখন কৃষ্ণনাথকে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি বল-ছেন গুলীর শব্দ শুনে এরা লাইব্রেরীঘরে যায়, হরিরাম ত তা বলে না।"

কৃষ্ণনাথ বলিলেন,—"হরিরাম ধনুক দেখ্তেই ব্যস্ত ছিল, অন্যেরা শুনেছে।"

"যে শুনেছে, সে উপস্থিত আছে?"

"আজ্ঞে, আছে।"

রাজা তখন হরিরামকে বলিলেন,—"তুমি এখন যেতে পার।"

"যে আজ্ঞা ধর্ম্মাবতার" বলিয়া সে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্ব্বক তাহার বর্শাযষ্টি হস্তে গ্রহণ করতঃ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"ধর্ম্মাবতার,এরা মিথ্যা কইছে,সেই চোর,চোর আর কোনোটা নয়—আপুনি বিচার করেন।" বলিয়া ক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া গেল।

অতঃপর অন্য প্রহরী দুই জন আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে, পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়াই তাহারা লাইব্রেরীঘরে যায়, এবং সেখানে গিয়া সন্তোষকে অচেতনাবস্থায় দেখিতে পায়।

সাক্ষ্যগ্রহণের পর তাহাদিগকে বিদায়দান পূর্ব্বক রাজা অন্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্তোষের শরীরে কোন্-খানে গুলী লেগেছে?"

বিপদে পড়িলেই কৃষ্ণনাথের আঙ্গুল মোচ্ড়ানি পায়, তিনি আঙ্গুল মোচড়াইতে সুরু করিয়া কহিলেন,—"আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, সে খবরটা আমি ঠিক জানিনে, মনে হচ্ছে, বুকের পাশে।"

"গুলী বার করা হয়েছে কি না, তা জানেন?"

"আজ্ঞে না, সে খবরটাও ঠিক দিতে পার্ছিনে। রাত্রে তা'কে হাসপাতালে পৌছে দেবার পর তা'কে আর দেখিনি, পরদিন ভোরবেলাতেই কি না এখানে রওয়ানা হয়েছি।"

"বেঁচে আছে কি মরেছে—সে খবরটা জানেন?"

রাজা বেশ একটু তীব্রস্বরে এই প্রশ্ন করিলেন। ইহার উত্তরে দেওয়ান কহিলেন,—"আজ্ঞে, 'তার' পেয়েছি, সন্তোষ বেঁচেই আছে। আর আশা করি, শরৎবাবু গেলে তা'কে শীঘ্রই সারিয়ে তুল্তে পারবেন।"

রাজা কহিলেন,—"সন্তোষই এ বিচারে প্রধান সাক্ষী। তা'র জবানবন্দী পেলে সহজেই এ বিচার নিষ্পত্তি হ'তে পার্ত। আপাততঃ আমি প্রসাদপুর যাওয়া পর্য্যন্ত বিচার মুলতুবী থাক। আপনারা আজই সেখানে চ'লে যান, গিয়ে বেশ ভাল ক'রে তদন্ত করুন; এমন কি, সন্তোষ মারা গেলেও যেন সেই তদন্তফলে সত্যাসত্য নির্ণয়ের সুবিধা পাওয়া যায়।"

দেওয়ানের প্রতি এই অনুজ্ঞা করিয়া রাজা কৃষ্ণনাথকে কহিলেন,—"পুনর্বিচার পর্য্যন্ত আপনি suspend হলেন। কুঞ্জবাবু, আপনি হাতিয়ারশালার দ্বিতীয় সহকারী তারা-নাথকে আপাততঃ এই কার্য্যে নিযুক্ত করবেন।"

এই বলিয়া রাজা বিচারাসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। অন্যান্য সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণনাথ উঠিয়া করযোড়ে কহিলেন,—"আমি ত জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কোন দোষই করি নাই, ধর্ম্মাবতার!"

রাজা কহিলেন,—"জ্ঞানতঃ না করুন, অজ্ঞানতঃ আপনি পূর্ণমাত্রায় অপরাধী। নিজের গুরু দায়িত্বভার সন্তোষের উপর ফেলে রেখে আপনি যদি নিশ্চিন্ত না থাক্তেন, তা হ'লে আমার ত মনে হয়, এ চুরী ঘটতেই পার্ত না। এরূপ কর্ত্তব্য-অবহেলা কি অপরাধগণ্য নয়?"

কৃষ্ণনাথ কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"এবারকার মতন মার্জ্জনা করুন, ধর্ম্মাবতার!"

রাজা কহিলেন,—"সত্যকথা বল্তে কি, আপনাকে

গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে রাখতে আর আমার সাহস হয় না। যা হউক, এখনও ত বিচার নিষ্পত্তি হয় নাই। যথাসময়ে এ বিষয় আমি ভেবে দেখব। আপনি যদি দোষমুক্ত হন, আপনার উপর পুনরায় যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন কর্‌তে পারি, তা হ'লে এ কাজ না হোক, অন্য কাজও আপনি পেতে পার্‌বেন।"

অটল রাজমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ইহার পর কৃষ্ণনাথের আর বাক্য নিঃসারিত হইল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

উদ্ভট-সাগর।

কোন বিরহিণী রমণী মদনের শরে বিদ্ধ হইয়া মদনকে অনুনয় করিয়া কহিতেছেন, "হে মদন! মহাদেব তোমার শত্রু; এই হেতু আমাকে মহাদেব মনে করিয়াই কি শরবিদ্ধ করিতেছ? মহাদেবের সহিত আমার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও আমি মহাদেব নহি।" কবি এই ভাবটি নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশেষ দক্ষতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন :—

ফণী নায়ং বেণীকৃতকচকলাপো ন গরলং
গলে কস্তূরীয়ং শিরসি শশিলেখা ন কুসুমম্।
ইয়ং ভূতির্নাঙ্গে প্রিয়বিরহজন্মা ধবলিমা
পুরারাতিভ্রান্ত্যা কুসুমশর কিং মাং ব্যথয়সি॥

মাথায় যা দেখিতেছ, তাহা নয় ফণী,
কেশগুলি জড়াইয়া বাঁধিয়াছি বেণী।
গলায় গরল নয়,—কস্তূরী-লেপন,
শিরে নয় শশি-লেখা,—কুসুম শোভন।
দেহে যাহা দেখিতেছ, ভস্ম তাহা নয়,
বিরহ-চিন্তায় দেহ ধবলিমময়।
হর নই,—বিরহিণী আমি রে মদন!
তবে কেন এত মোরে করিছ পীড়ন?

কোন বিরহিণী রমণী মদনকে নিন্দা করিয়া কহিতেছেন :—

মনো বন্ধো দত্তঃ প্রিয়তমমনোঽমূল্যবসুনা
স্মরঃ সাক্ষী লভ্যং প্রতিদিনমিদং নূতনবয়ঃ।
ন লব্ধং তদ্‌বিত্তং নিজমপি গতং যচ্চ তদভূ-
দয়ং সাক্ষী কস্মান্নিরবধি জনো মাং ব্যথয়তি॥

প্রিয়তম-মনোরূপ মহামূল্য ধন
পাইব বলিয়া মোর বাঁধা দিনু মন।
প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এ নব-যৌবন
সুদ দিব,—এ কথাও হইল তখন।
এই সব বন্দোবস্ত যখন হইল,
মদন-নামক এক সাক্ষী তথা ছিল।
সেই ধন না পেলাম, আশা ছিল যার,
আমারো নিজের ধন না ফিরিল আর।
যা হবার তাহা হ'ল, কি করিব তার,
শত্রুতাও নাহি কিছু তাহায় আমায়।
কিন্তু কি কারণে সেই সাক্ষীটা মদন
নিরবধি করিতেছে মোরে নিপীড়ন!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

(২)

হুগলী জেলার ভিতর দিয়া বর্দ্ধমান হইতে পুরী যাইবার পথের উপর ঐ যে ছায়া-নিবিড় গ্রামখানি আতপতপ্ত পথিকের তৃষিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, উহাই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি —কামারপুকুর। গ্রামখানি পূর্ব্বে সমৃদ্ধ ছিল; কোথাও জীর্ণ মন্দির, কোনখানে ভগ্ন স্তূপ, স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত দেবালয়, তাহার পরিচয় প্রদান করে।

বুধুই মোড়লের শ্মশান।

গ্রামের পশ্চিমদিকে বিস্তীর্ণ গোচরভূমি। তাহার কোলে কোলে আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাকে পাকে আমোদর নদ বহিয়া গিয়াছে। এই আমোদর হইতে "ভূতির খাল" প্রবাহিত। ইহারই কোলে, কামারপুকুর পল্লীর উত্তর-পশ্চিম কোণে, "ভূতির খাল" নামে শব-দাহন স্থান। গ্রামের ঈশান কোণ অধিকার করিয়া "বুধুই মোড়ল" নামে অপর এক মহা-শ্মশান বিদ্যমান। দক্ষিণে রাণীগঞ্জ হইতে কলিকাতা আসিবার রাস্তা। পূর্ব্বোক্ত বর্দ্ধমানের পথ, পল্লীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে এই রাস্তাকে খণ্ডিত করিয়া, পুরী-অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

গ্রামের অভ্যন্তর-দৃশ্য অতীব মনোহর—যেন পল্লী-লক্ষ্মীর বিলাস-নিকুঞ্জ। বৃক্ষে বৃক্ষে ফুল, লতায় লতায় মঞ্জরী; ফুলে ফুলে ভ্রমরের মেলা, প্রজাপতির খেলা; তলে তৃণ-গুল্ম; মাথার উপর ঘন-পল্লবিত শাখায়-প্রশাখায় বিচিত্র চন্দ্রাতপ রচনা। স্থানে স্থানে কমল-নিলয়, মৃণাল-জালময় ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয়। ভৃঙ্গের গুঞ্জনে, বিহঙ্গের কূজনে, অনিল-বিলসিত তরুপত্রের নিঃস্বনে গ্রামখানিকে যেন নিরন্তর স্বপনের আবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

কঠোর জীবন-সংগ্রামের কোলাহল-বিরল, শান্তির এই নিভৃত তপোবন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান। পাপ-তাপ-পীড়িতা

পৃথিবীতে আসিয়া এই অলৌকিক তাপস যে দীন-কুটীরে প্রথম নয়ন উন্মীলন করেন, তাহার অদূরে বায়ু ও ঈশান-কোণে দুই মহাশ্মশান। সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে, সর্ব্ববৈভব-বিরাগী, বিভূতি-ভূষণ মহেশ্বরের মন্দির। সম্মুখের মন্দির—যুগীদিগের শিবালয়; দক্ষিণপার্শ্বের দেউল—গোপীলালের শিবালয়; বামদিকে কিছু নিম্নে বুড়োশিবের মন্দির অবস্থিত। ইহারই পূর্ব্বভাগে গাজনতলা ও গাজনপুকুর।

যুগীদিগের শিবালয়ের পশ্চাতে হাল্‌দার-পুকুর। বাল্যকালে বয়স্যদিগের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ এই পুষ্করিণীতে স্নান-সন্তরণ করিতেন। এই হাল্‌দার-পুকুরের পার্শ্বে পশ্চিমাংশে "লক্ষ্মীজলা" নামক ধান্যজমী—পরিমাণ এক বিঘা দশ ছটাক—এই দীন পরিবারের একমাত্র জীবিকা-সম্বল। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম যথাসময়ে এই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে "জয় রঘুবীর" বলিয়া কয়েকগুচ্ছ ধান্য রোপণ করিতেন। অবশিষ্ট কার্য্য কৃষকরা সম্পন্ন করিত। যে ফসল হইত, তাহাতে কষ্টে-সৃষ্টে গৃহদেবতা রঘুবীরের সেবা, ক্ষুদিরামের সংসার ও অতিথি-সৎকার নির্ব্বাহ হইত। "লক্ষ্মীজলা"র অনতিদূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে "ভূতির খাল" শ্মশান।

পূর্ব্বদিক্ দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-ভবনের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলে প্রথমেই চোখে পড়ে, প্রাঙ্গণপারে ৺রঘুবীরের পর্ণাচ্ছাদিত শ্রীমন্দির। এই প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে, তৎকালীন ঢেঁকিশালে, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার দক্ষিণপার্শ্বে, অন্তঃপুর-প্রাচীরের বাহিরে, বৈঠকখানা ঘর। তাহার অগ্নিকোণে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্ত-রোপিত একটি আম-গাছ আছে।

ভূতির খাল।

সদাচারনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মপরায়ণ, দেবভক্ত এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের পূর্ব্ববাস ছিল—কামারপুকুরের পশ্চিমে আমোদর নদ-পারে দেরেগ্রাম। ইঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন এবং ইঁহাদের পূর্ব্বাবস্থাও বেশ স্বচ্ছল ছিল। দেড়শত বিঘা জমী-জমা পল্লীগ্রামের গৃহস্থের পক্ষে বিশিষ্ট সম্পত্তি। কিন্তু গ্রামের জমীদার ক্ষুদিরামের উপর বিরূপ হইয়া তাঁহাকে

সর্ব্বস্বান্ত করেন। শ্রীভগবানের উপর অনন্ত-নির্ভরপরায়ণ ক্ষুদিরাম তাহাতে বিচলিত হইলেন না, কামারপুকুরে আসিয়া বাস করিলেন। এখানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। অনুরক্ত ভক্তকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আপনি আসিয়া তাহার কুটীরে উদিত হইলেন। ক্ষুদিরাম এক দিন গ্রামান্তর হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে একান্ত শ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করেন। চারিদিকে বিজন প্রান্তর, মুক্ত বায়ুর অবাধ বিহার—কে যেন তাঁহার চোখের পাতায় নিদ্রার ভার ঢালিয়া দিল। চক্ষু মুদিতেই ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখিলেন, দূর্ব্বাদল-শ্যামকান্তি এক সুকুমার শিশু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছে, "অনাদরে অনাহারে আমি এখানে অনেক দিন রয়েছি, আমাকে ঘরে নিয়ে চল।"

হায়, এতদিন কোথায় ছিল, এই বুকের নিধি, অমূল্য রতন? ক্ষুদিরাম দরবিগলিত ধারে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন, "প্রভু, আমি যে বড় গরিব! আমার কি আছে যে, তোমায় দিব? আমার হৃদয়ে ভক্তি নাই, ঘরে অন্ন নাই, পদে পদে তোমার সেবার ত্রুটি হবে।"

অদ্ভুত বালক প্রসন্নহাস্যে সুন্দর মুখ সুন্দরতর করিয়া বলিল, "ত্রুটি নিলে ত?"

ক্ষুদিরাম সে প্রাণারাম শিশুকে বুকে লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিস্ময়াবিষ্ট ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক
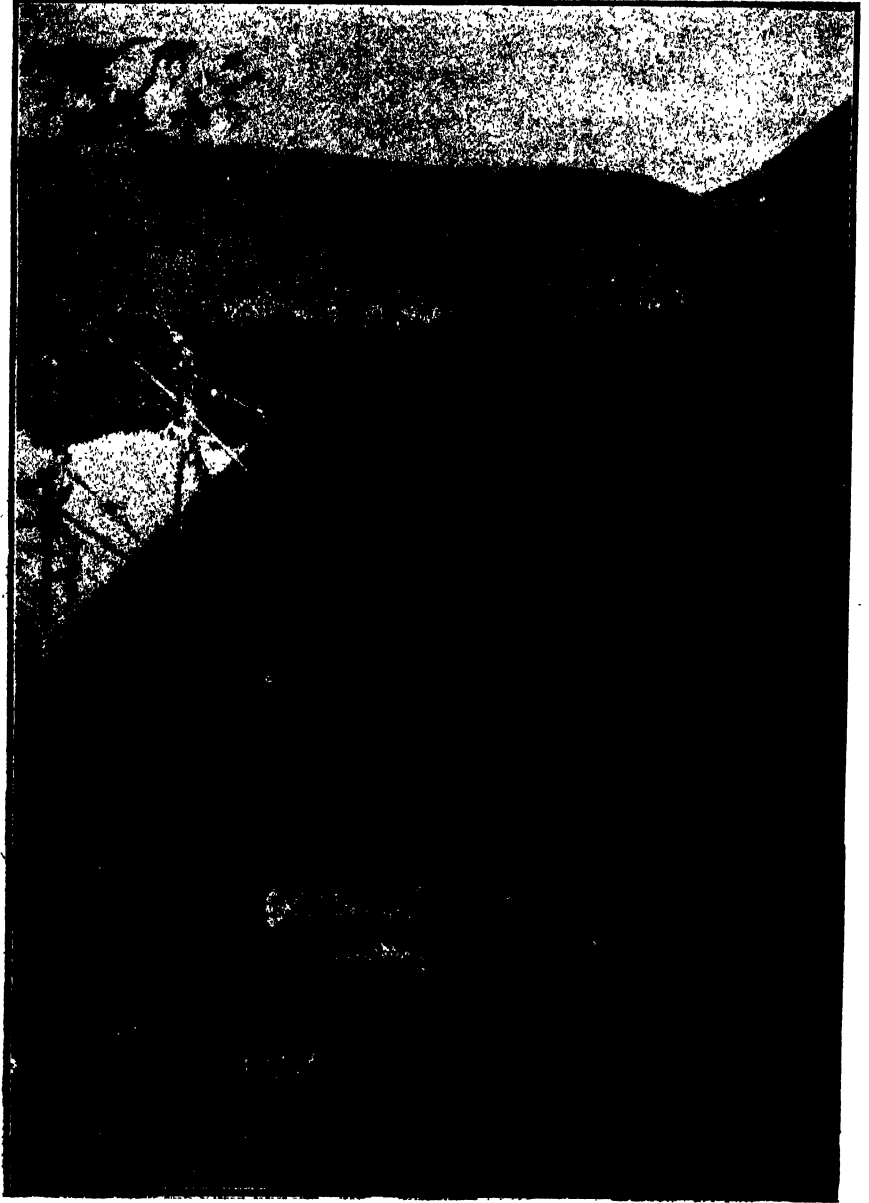
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান।

সুরম্য শালগ্রাম শিলা—সর্পের বেষ্টনে বিস্তৃত ফণার তলে বিরাজমান। ভক্তির আবেগ-কম্পিত, ধীর গম্ভীর স্বরে "জয় রঘুবীর" বলিয়া, ব্রাহ্মণ হস্ত প্রসারণ করিতেই সর্প

অন্তর্হিত হইয়া গেল। ক্ষুদিরাম সে নয়নাভিরাম শিলা বুকে তুলিয়া লইয়া অশ্রুধারে সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন।

দরিদ্রের সংসারে যখন দ্বিতীয় দেবঅতিথি আসিয়া উদিত হইলেন, ক্ষুদিরাম তাঁহার নামকরণ করিলেন, গদাধর। দৈন্যের এই পুণ্যাশ্রমে গদাধরের বাল্যদিনগুলি নির্ম্মল জাহ্নবী-ধারার ন্যায় অনাবিল প্রবাহে বহিতে লাগিল। সুচারুরূপে বাক্যস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদিরাম দেবশিশুর মুখে দেবভাষা দিয়াছেন। সেই বয়সেই অদ্ভুত অনুকরণ-দক্ষ বালক পিতার ন্যায় ভাবে গদগদ হইয়া দেব-দেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তব বন্দনা আবৃত্তি করে। শিশুর অসামান্য স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া ক্ষুদিরাম বুঝিলেন, পুত্র শ্রুতিধর। কিন্তু দিনে দিনে গদাধর বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতা পঞ্চম বর্ষ বয়সে পুত্রকে লাহা-বাবুদের নাট-মন্দিরের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

যে দুর্নিবার শক্তি এই শক্তিধর পুরুষের জীবনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার অদ্ভুত আকর্ষণ। গদাধরের সূতিকাগারেই তাহার অলৌকিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সুদীর্ঘ বিরামের পর পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে শ্রীমতী চন্দ্রা যখন আবার অন্তর্বত্নী হইলেন, তখন সেই মধ্যবয়সে গুর্ব্বিণীর দেহে অলোকসামান্য রূপলাবণ্য যেন মধ্যাহ্ন-গরিমায় ঝলমল করিয়া উঠিল। প্রতিবাসিনীগণ সে অলৌকিক রূপ দেখিয়া, কানাকানি করিতে লাগিলেন—“না, জানি কে আসিয়াছে”! সরল-স্বভাবা, শত্রুমিত্রের সমহিতৈষিণী, আত্মপর-ভেদজ্ঞান-রহিতা, সর্ব্বজনে স্নেহশীলা, দেব-দ্বিজ-রতা, অতিথিসৎকারপরায়ণা এই সাধ্বী রমণী পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ বনিতার বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাঁহার কল্যাণের নিমিত্ত সকলে উতলা হইয়া উঠিলেন,—নারীর এই চরম সঙ্কটে ‘মাগী’ এখন ভালয় ভালয় উদ্ধার পেলে হয়! পরে যে দিন উষা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুভ শঙ্খ-রোলে সে মঙ্গল-বারতা গ্রামময় প্রচারিত হইল, ক্ষুদিরামের ক্ষুদ্র কুটীর জনতায় টল-মল করিতে লাগিল। সদ্যোজাত কুমারকে দেখিবার জন্য রমণীগণের সে কি সোৎসুক আগ্রহ! প্রতিবেশিনীগণ পরম-প্রীতির উচ্ছ্বাসে বার বার চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিলেন, আহা, ধনী কামারিণীর কি ভাগ্য! ধাত্রী হয়ে ছেলে কোলে ক'রে বসেছে! এমন চাঁদ-পানা ছেলে! ওগো, দেখ, দেখ, যেন ছ'মাসের শিশু! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক! শিশু দেখিয়া সকলে নিশ্চল নেত্রে চাহিয়া রহিল—চোখও ফিরে না, গৃহে ফিরিতে মনও সরে না! ক্রমে শিশুর শশিমুখে হাসি বিকাশিল। যে কোলে পায়, সে আর নামাইতে চায় না! দিনে দিনে গদাই পল্লীর প্রাণ-স্বরূপ হইয়া উঠিল। প্রতিবেশিনীগণ দিনে দশবার ছুটিয়া আসেন—গদাইকে দেখিবার ও তাহার মুখের একটা মিষ্ট কথা শুনিবার জন্য। যাঁর ঘরে যে মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত

ঈশানকোণে অবস্থিত পুষ্করিণীর পাড় হইতে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কামারপুকুরের কুটীর।

হয়, অঞ্চলে বাঁধিয়া আনেন—স্বহস্তে গদাইএর মুখে তুলিয়া দিবার নিমিত্ত। পিতার কাছে শেখা স্তব আবৃত্তি করিয়া, হাব-ভাব-ভঙ্গী রঙ্গ-রসের অভিনয় দেখাইয়া অদ্ভুত অনুকরণ-দক্ষ বালক মমতাময়ী, অপরিমেয় স্নেহশালিনী প্রতিবেশিনীগণের ঋণ কথঞ্চিৎ শোধ করেন। কিন্তু পল্লী-মহিলারা মনে ভাবেন, তাঁহারাই গদাইএর নিকট ঋণী হইয়া গৃহে ফিরিতেছেন। গদাই কখন্ পাঠশালা হইতে গৃহে ফিরিবে, সকলে প্রতীক্ষায় থাকিতেন।

পাঠশালায় গিয়া গদাধর বর্ণাক্ষর সকল সহজেই আয়ত্ত করিল। অলৌকিক মেধাবী বালক যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিত, শিখিতে বিলম্ব হইত না। গুরু মহাশয় ছাত্রের অদ্ভুত স্মরণ-শক্তির পরিচয় পাইয়া মনে মনে আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিলেন। শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হইয়া অনেক ছাত্র তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু এমন প্রিয়দর্শন, সুকুমার, সরল, সত্যনিষ্ঠ, সুমধুর-স্বভাব, সুমিষ্টভাষী, অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন বালক আর কখন তাঁহার নয়ন-গোচর হয় নাই। কিন্তু গুরু-মহাশয়ের চক্ষু কপালে উঠিল সেই-দিন, যেদিন প্রথম সহজ 'শুভঙ্করী' শিক্ষার সূত্রপাত হইল। গণিতের কুটিল জটিলতায় বালক একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যায়! যেন কোন দুর্গম গোলকধাঁধাঁর ভিতর পথ হারাইয়া উঠে! বালক ও শিক্ষক বিহ্বল দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখাবলোকন করেন! গুরু-মহাশয় কিন্তু ছাত্রকে তাড়না করিতে পারেন না—আহা, ননীর পুতলী!
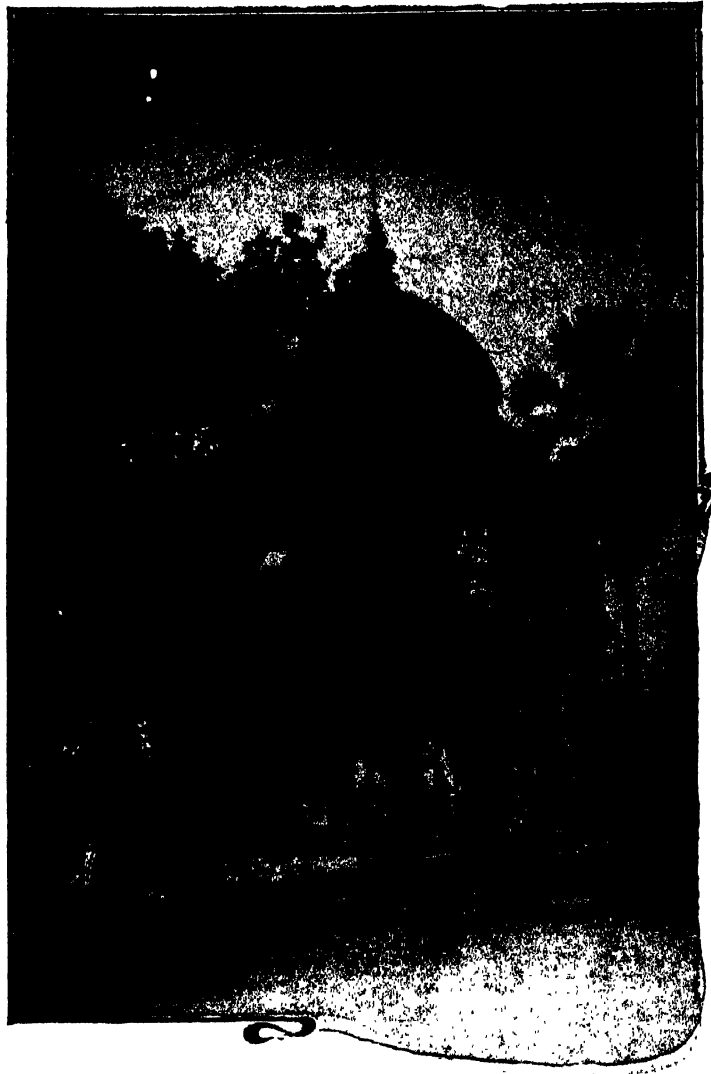
ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে অবস্থিত যুগীদিগের শিবমন্দির।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

কার্পাস। *

এই পুস্তকখানির অনেক গুণ। ইহা বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ, ইহাতে ঐতিহাসিক গবেষণার অভাব, ইহা সহজবোধ্যভাবে ও সরলভাষায় লিখিত। ইহার সর্ব্বপ্রধান গুণ,ইহা সময়োপযোগী।

বাঙ্গালায় যখন স্বদেশী আন্দোলন উদ্ভূত হয় এবং বাঙ্গালা হইতে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হয়, তখন আমরা বিদেশী বস্ত্রবর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু সে বার সে "বয়কট" রাজনীতিক অস্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং যে রাজনীতিক কারণে তাহার উদ্ভব, সেই কারণের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার তিরোভাব হয়। সে বার বিদেশী-বস্ত্রবর্জ্জন স্থায়ী করিবার আবশ্যক চেষ্টা হয় নাই। সেই জন্যই সে বার আমরা এ দেশে কার্পাসের চাষ বাড়াইতে চেষ্টা করি নাই। এবার আমরা অন্য কারণে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি—এবার আমাদের আন্দোলনের ভিত্তি—স্বাবলম্বন। কাযেই এবার এই অনুষ্ঠানকে স্থায়ী করিতে হইলে যে কার্পাসের চাষও বাড়াইতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। দুঃখের বিষয়, যে বাঙ্গালায় পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা সরু সূতা হইত, সেই বাঙ্গালা হইতেই কার্পাসের চাষ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে এবং বিদেশীর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমরা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছি যে, এ দেশে দীর্ঘতন্তু কার্পাস উৎপন্ন হয় না—যে কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহাতে মোটা সূতাই হইতে পারে;—কাযেই মিহি কাপড়ের জন্য আমাদিগকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিতে হইবে। অথচ এই বাঙ্গালায় উৎপন্ন কার্পাসে যে সরু সূতা হইত, তহোতে যে কাপড় হইত, তাহার তুলনা ছিল না। ভারতবর্ষেই যে কার্পাসের চাষ ও ব্যবহার সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ হয়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। হেরোডোটাসের গ্রন্থে লিখিত আছে,—"ভারতবর্ষে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, যাহাতে পশম ফলে এবং ভারতবর্ষীয় লোকরা তাহা হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে। এই পশম মেষের পশম অপেক্ষা সুন্দর ও উত্তম।" প্রাগৈতিহাসিক যুগে মিশর ভারতবর্ষের নিকট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে দক্ষিণ য়ুরোপে কার্পাসের চাষ প্রচলিত হয় নাই। প্রথমে তুলায় কাগজ প্রস্তুত হইত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ভারতীয় কার্পাস-বস্ত্রের অনুকরণে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ হয়। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দেও ম্যাঞ্চেষ্টারে যে "কার্পাসবস্ত্র" (Manchester cottons) প্রস্তুত হইত, তাহা ভারতীয় বস্ত্রের অনুকরণে পশমে রচিত হইত। ভারতীয় কার্পাসবস্ত্রের বহুল প্রচলনে বিলাতের পশমী কাপড়ও অচল হয় দেখিয়া ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে পার্লামেণ্ট ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী ও ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য আইন করেন।

এই পুস্তকের ভূমিকায় পূর্ব্বকালের কথায় বলা হইয়াছে, "তখন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র, পল্লীতে পল্লীতে প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে ঘরে কার্পাসের চাষ হইত। তখন কি ইতর কি ভদ্র সকল গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরাই চরকার সাহায্যে কোমল অঙ্গুলির নিপুণ চালনায় অতি সূক্ষ্ম কার্পাস-সূত্র প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারিতেন। অধিকন্তু যে স্ত্রীলোক চরকায় সূতা নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম হইতেন, সমাজে তাঁহাকে বিশেষরূপ অপদস্থ হইতে হইত।" তখন আমাদের কার্পাস-বস্ত্রে কেবল যে আমাদেরই আবশ্যক অভাব দূর হইত, তাহা নহে; পরন্তু ইহা বিদেশে রপ্তানী করিয়া আমরা লাভবান্ হইতাম। এখন আমাদের লজ্জা ম্যাঞ্চেষ্টার নিবারণ করে। এ অবস্থার নিবারণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষ।

এ দেশে আজকাল পাটের চাষ হইতেছে। পাটের চাষে অনেক অসুবিধা। প্রথমতঃ, ইহার বিক্রয় বিদেশে অধিক, কাযেই বিদেশে প্রয়োজন কম হইলেই পাটের চাষে লোকসান হয়; দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে স্বাস্থ্যনাশ হয়। পাট না পচাইলে আঁশ পাওয়া যায় না—সেই পচাজলে মশকের বংশবৃদ্ধি হয় এবং সেই জল পান করিয়া লোক পীড়িত হয়। তুলার কাটতি দেশেই হইবে এবং তুলার চাষে কোনরূপে স্বাস্থ্যহানি হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যে সব জমীতে পাটও হয়, কার্পাসও হয়, সে সব জমীতে কার্পাসের চাষ করিলে লাভ হয়।

পূর্ব্বে বাঙ্গালাতেই ভাল কার্পাসের চাষ হইত। "জগদ্বিখ্যাত ঢাকাই, মলমল, জামদানি, আবরোঁয়া, বদনখাস

* শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, টি, আই (ম্যাঞ্চেষ্টার) ও শ্রীমতিলাল সাহা প্রণীত। মূল্য ১।০ টাকা। কলিকাতা, ৬৫ নং এজরা ষ্ট্রীট—ব্রস পার্টনাস এণ্ড কোং র নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রভৃতি বস্ত্র এবং শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, কলমে, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানের ধুতী, শাড়ী ও চাদর এই দেশের কার্পাস হইতেই প্রস্তুত হইত। এই সমস্ত কার্পাস্ যেমন সুন্দর ও সূক্ষ্ম ছিল, ইহাদের সূতা ও কাপড়ও তদ্রূপ মিহি এবং সুন্দর হইত।" ১৭৮৯—১৭৯০ খৃষ্টাব্দেও খাস বাঙ্গালায় কত কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সরকারী বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইল :—

জিলা	কার্পাসের নাম	পরিমাণ
বীরভূম	ভোগ	বীরভূমে ৪০,০০০মণ
		বিষ্ণুপুরে ১০,০০০মণ
বর্দ্ধমান	নরমা, মুড়ি ও ভোগ	৫০,০০০ মণ
যশোহর	দেশী ও সুন্দর	২৪,০০০ মণ
ময়মনসিং	মিহি ও মোটা কার্পাস	
মুর্শিদাবাদ	নরমা এবং ভোগ	৪,০০০ মণ
		৬,০০০ মণ
নদীয়া	বীচ ও ভোগ	২০,০০০ মণ
পূর্ণিয়া	মোটা কাপড়ের জন্য কার্পাস উৎপন্ন করা হইত।	৮,০০০ মণ
রাজসাহী	চার রকম	
রঙ্গপুর	চিন্‌টিয়া	৩৭৫ মণ
শ্রীহট্ট	নরমা ও ভোগ	৪০,০০০ মণ
ত্রিপুরা	ভোগ	৩০,০০০ মণ
মেদিনীপুর	কুক্রয়া, মুখি ও ভোগ	১৯৭৯॥০ মণ ইত্যাদি।
শান্তিপুর		৩,৫০০ মণ
চট্টগ্রাম	নরমা ও ভোগ	১২,৫০০ মণ ৬,০০০ মণ
মালদহ	বুড়ি, ভোগ ও মুরমা	৪২,৫০০ মণ

এ দেশে নানারূপ কার্পাস জন্মে। সে সকলের মধ্যে গাছ কার্পাস অন্যতম। "ইহার ঢেঁড়ীগুলি লম্বাটে।"—"এই জাতীয় একই কার্পাস-গাছ হইতে উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তূলা পাওয়া যায়। ইহার তন্তু বেশ সুন্দর ও মোলায়েম এবং ইহা দুধের মত সাদা। প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে এই কার্পাস গাছের চাষ করিলে ইহা হইতে অনায়াসে বেশ ভাল সূতা চরকার সাহায্যে কাটিতে পারেন। এইরূপে অল্পায়াসে নিজেদেরও অভাব মোচন হইতে পারে এবং দেশেরও টাকা বাহিরে যাইতে পারে না।"

কিন্তু বাঙ্গালার পক্ষে ঢাকার ফেটী কার্পাসের চাষই, বোধ হয়, বিশেষ লাভজনক। ইহার ফলনও অধিক। "ইহার তন্তু যেমন মিহি, তেমনই সুন্দর। ইহার বীজ খুব যত্নের সহিত রক্ষা করা হইত। বৎসরে দুইবার করিয়া ইহার চাষ হয়। একবার অক্টোবর নভেম্বর মাসে, আর একবার এপ্রিল কি মে মাসে বীজ বপন করা হয়। প্রথম চাষের ফসল এপ্রিল মাসে এবং দ্বিতীয় চাষের ফসল অক্টোবর মাসে সংগ্রহ করা হয়। এই গাছ অত্যন্ত কোমল এবং উচ্চে ২০ ইঞ্চি হইতে ৩০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। ইহা একবার মাত্র ফল দেয়। তাহার পর গাছ মরিয়া যায়। * * এই কার্পাস হইতে ৫০০।৬০০ নম্বরের সূতা পর্য্যন্ত কাটা যায়।" পুস্তকে প্রকাশ, ঢাকার কৃষি-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখিলে এই বীজ পাওয়া যায়। একবার অল্প বীজ পাইলে তাহা হইতে চাষ করিয়া বীজ সংগ্রহ করা যায়। "ক্ষেত্রের মধ্যে যে গাছগুলি বেশ তেজাল এবং ফলশালী ও যাহাদের তন্তুগুলি দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হয়, সেই গাছগুলি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের বীজই ব্যবহার করিলে কার্পাসের উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া প্রথম জাত বীজই ব্যবহার করিতে হয়; কেন না, সেগুলি অধিকতর পুষ্ট হয়। গাছে ফুল ফুটিবার পর ৪০ দিন হইতে ৬০ দিনের মধ্যে ঢেঁড়ীগুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পাকিলেই ফাটিয়া যায়। এক একটি ঢেঁড়ীতে তিনটি হইতে পাঁচটি কোষ থাকে এবং প্রত্যেক কোষমধ্যে সাতটি হইতে দশটি বীজ থাকে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, অতি অল্প গাছ হইতেই যথেষ্ট বীজ সংগৃহীত হইতে পারে।

ঢেঁড়ী পাকিবামাত্র কার্পাস চয়ন করা প্রয়োজন,—নহিলে তূলার সঙ্গে ধূলা-বালি মিশিয়া যাইতে পারে এবং রৌদ্রে তন্তু শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইয়া যায়।

দোআঁশ মাটীই কার্পাস চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, জমী ভাল করিয়া "পাট" করা প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন যে জমীতে কার্পাসের চাষ করা হইবে, তাহাতে ভালরূপ সার দিতে হয়। "জমীতে সার প্রয়োগ না করিলে তুলা ভাল হয় না এবং তুলা ভাল না হইলে সুতাও পরিষ্কার হয় না। * * * আজকাল গোবর, খৈল, অস্থিচূর্ণ, সুপারফস্ফেট, সোরা প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। সোরা ভাল সার। তাহার পর গোবর-সার। তাহার পর ঘুঁটের ছাই। গোবর-সার সস্তা। ইহা একর প্রতি ৮।১০ গাড়ী আবশ্যক করে। কাঁচা গোবর-সার কদাচ প্রয়োগ করা উচিত নহে। ইহা দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার অধিক হয়। আধপচা গোবর-সারই প্রশস্ত। কার্পাস চাষের দুই তিন মাস পূর্ব্বে এই গোবর-সার দিতে হয়। * * * অস্থিচূর্ণ সারে কার্পাসের ফসল বাড়ে, তাহা ছাড়া ইহাতে তন্তুও দীর্ঘ ও শক্ত হয়। অস্থিচূর্ণ একর প্রতি ৮।১০ মণের অধিক আবশ্যক করে না। * * * রেড়ীর খৈল, সরিষার খৈল, কার্পাসবীজের খৈল, ক্ষার ইত্যাদি পদার্থেও অস্থিময় সার যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। খৈল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ইহা কয়েক দিন জলে ভিজাইয়া রাখা দরকার। ইহাতে খৈলের ঝাঁজ মরিয়া যায়। * * * এই সমস্ত সার ছাড়া পচা পাতা, পুকুরের পচা পানা, পাঁক, নীলের সিটি, মলমূত্র, আবর্জ্জনাদি সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। * * * পচা পাতা, পাঁক ও কাঁচা গোবর এঁটেল মাটীতে মিশ্রিত করিলে তাহা কার্পাস চাষের উপযোগী হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া বেলে মাটীতে উক্ত দ্রব্য সমূহ মিশ্রিত করিলেও জমী বেশ চাষোপযোগী হয়।" কার্পাসের বীজ ও বীজের ময়দাও খুব ভাল সার। বীজে ও বীজের ময়দায় যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে।

এই স্থলে বলা যাইতে পারে, কার্পাসবীজে তেল আছে; য়ুরোপে এই তৈল রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। ঘানীতে বীজ পিষিয়া তৈল বাহির করিবার পর যে খৈল থাকে, তাহা গো-মহিষাদির পুষ্টিকর খাদ্য। সুতরাং খৈল গবাদিকে খাইতে দিলে দুধ যেমন বাড়ে—তাহাদের গোবরও তেমনই উৎকৃষ্ট সার হয়। কার্পাস চয়ন হইয়া গেলে পাতা-সমেত গাছগুলি জমীতে চষিয়া দিলে বা পোড়াইয়া দিলেও ভাল সারের কায হয়।

গাছ-কার্পাস।

এ দেশে যে সব স্থানে চিনি প্রস্তুত হয়, সে সব স্থানে চিনি করিবার জন্য ব্যবহৃত শেয়ালাও খুব ভাল সার হয়। পানা ও পাঁক তুলিয়া ক্ষেত্রে দিলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাবৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীও পরিষ্কার হয়।

বীজবপনের প্রণালী দুই প্রকার:—

(১) ছিটাইয়া বুনা।

(২) আইল বা জুলীতে বপন।

আজকাল স্থানে স্থানে রোয়া আবাদও চলিতেছে। "যথেচ্ছ ছড়াইয়া ছিটান বুননীতে বীজ বুনিলে বীজ

সম-অন্তরালে পতিত হয় না; সুতরাং ইহাতে বীজ অধিক লাগে। তাহা ছাড়া গাছগুলি কোথাও ঘন, আবার কোথাও পাতলা ভাবে জন্মে বলিয়া সমস্ত গাছ সমভাবে বর্দ্ধিত হয় না। ছিটান বুননীতে একর প্রতি প্রায় ৫ পাউণ্ড হইতে ১০ পাউণ্ড বীজ লাগে; কিন্তু আইল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে ১ পাউণ্ড মাত্র বীজ আবশ্যক হয়। বীজ বপন করিবার অন্ততঃ ১৫ দিন আগে আইল প্রস্তুত করা উচিত। * * * * আইলে বীজ বপন করিতে হইলে ৪।৫ ফুট অন্তর আইল প্রস্তুত করিতে হয়। ৪।৫ ফুট ব্যবধানে আইল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, গাছগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ সময়ে গাছগুলির কোন অনিষ্ট হইতে পারে না এবং কাপাস চয়নকালেও কোন অসুবিধা হয় না। * * * বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছ বাড়িলে যে গাছগুলি বেশ তেজাল হয়, সেইগুলি রাখিয়া বাকি গাছগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়।" কার্পাসের বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে উষ্ণতা প্রয়োজন। আইলের মাটী শীঘ্র গরম হয় বলিয়া বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে। তাহা ছাড়া ইহাতে মাটী বসিয়া গিয়া শীঘ্র জমাট বাঁধে না এবং বর্ষায় গাছগুলি জলে ডুবিয়া যাইতে পারে না। তবে যে সব অঞ্চলের জমী অত্যন্ত শুষ্কপ্রকৃতির, সে সব অঞ্চলে ছিটান বুননী করাই ভাল; কারণ, তাহাতে গাছগুলি ক্ষেত্রের চারিদিকে এবং অপেক্ষাকৃত ঘনভাবে জন্মে বলিয়া গাছের ছায়ায় জমী শীতল থাকে; সুতরাং অত্যধিক উত্তাপেও জমী সহজে রসশূন্য হয় না।

কার্পাস-বৃক্ষ।

মাদ্রাজ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত বাঙ্গালাতেও জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ হইতে শ্রাবণ মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত বীজ বপন করা সঙ্গত।

বীজপ্রাপ্তির প্রসঙ্গে আমরা সরকারী বীজ সরবরাহের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এ কথাটা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ—যাঁহারা আমাদের জেতা, তাঁহারা ব্যবসায়ী জাতি; ভারতবর্ষে যদি প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয় এবং সেই তুলা এ দেশেই বস্ত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়,তাহা হইলে বিলাতের বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য হইবে। এই বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ-রক্ষার জন্য ভারত সরকারকে এ দেশে উৎপন্ন কার্পাস পণ্যের উপর শুল্ক বসাইয়া ভারতবাসীর প্রতি অনাচার করিতে হইয়াছে। ভারত সরকার ইচ্ছা করিলেও সে অনাচারের প্রতীকার করিতে পারেন নাই। এই ব্যবস্থায় প্রবন্ধের প্রথমাংশে উল্লিখিত ১৭০০ খৃষ্টাব্দের আইনের অবশেষ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ভারতবর্ষে ইংরাজ সরকার দেশে কার্পাসচাষের সহায়তা করিলে হয় ত বিলাতের ব্যবসায়ীরা তাহাতে আপত্তি করিবেন। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে সরকারের উপর নির্ভর না করিয়া উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ—চাষের শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি কাযের জন্য দেশের লোকেরও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে প্রতিষ্ঠিত—কৃষি-সমিতি (Irish Agricultural Organisation Society) আমাদের আদর্শ হইতে পারে।

আমরা যদি এ দেশে এইরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষকদিগকে উপদেশ ও উপকরণ দিয়া সাহায্য করি, তবে অল্পদিনের মধ্যেই দেশের শ্রী সাধিত হইতে পারে। সমিতির কাযে আপনাদের সুবিধা বুঝিতে পারিলে কৃষকরা আপনারাই আসিয়া তাহাতে যোগ দিবে।

আজকাল আমরা বুঝিয়াছি, আবশ্যক তুলা উৎপন্ন করাই আমাদের বস্ত্রসমস্যা সমাধানের প্রথম উপায়। সে জন্য কার্পাসচাষে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। আলোচ্য পুস্তক বাঙ্গালার লোককে সেই অভিজ্ঞতা লাভে আবশ্যক সাহায্য প্রদান করিবে।

আমের ধূমধাম।

আমের বাজার সস্তা, পোস্তায় পচিছে বস্তা,
রাস্তায় রাস্তায় দেখি আঁটি গাদাগাদি।
বোম্বাই পেয়ারাপুলি, চুষে ফেলে দেয় কুলী,
আধুলিতে মধুকুলি ক'রে সাধাসাধি।
চুণাখালি রাজহেটে, বৃন্দাবনি বেঁটে বেঁটে,
পেটে পুরে আশ মিটে মজা লোটে লোক।
মধুর সিঁদুরে রাঙা, চেপ্‌টা কপাট ভাঙা,
রামকলা ঢেঙা ঢেঙা বাবুদের ঝোঁক।
ল্যাংড়া চেঁংড়াভরা, মালদয়ে দামে মরা,
ফজ্‌লি জুড়ায় জিব্ দেখিতে ডাগর।
ফলেছে গোপালে ধোপা, এবারে বড়ই তোফা,
বোঁম্বাশ গোলাপখাস রসের সাগর।
মাদ্রাজী দরাজ দরে, গরজে দে যায় ঘরে,
ঘরে ঘরে চাল্‌তাখাস, বিশ্বনাথ মুখো।
সস্তায় অবস্থা ভুলে, কেনে লোক দেনা তুলে;
খরচে সহরে লোক খুব ডাকাবুকো।
সাত সিকা মণ 'কোক্', বাদাম ন'টাকা থোক্,
এক ঢোক্ দুধে প্রায় এক আনা পড়ে।
উঠেছে দাঁড়ীর ফেরে, আলু পাঁচ আনা সেরে,
ঘি তেলে বেড়েছে ভেল দাম গেছে চড়ে।
সন্দেশের দিতে ভুল, হোমোপ্যাথি রবিউল্,
খদ্দরে ভদ্দর সাজি সাত টাকা জোড়া।
ট্রামের বাড়িছে ভাড়া, উপায় নাহিক ছাড়া,
বাবুয়ানা ক'রে ক'রে হয়ে গেছি খোঁড়া।
দয়া করে ভগবান্, দেছেন অমৃত দান,
দুধ ক্ষীর চিনি মেলে খেলে এক আম।

ভাত খাও আধপেটা, রেখো না আঁ
মিটিবে খিদের জ্বালা—জিভের আরাম।
শুনি বহরমপুরে, আরো কোথা দূরে দূরে
বাজারে হাজার মিলে দিলে ষোল আনা।
যশোরে পচিছে পড়ে; কেমনে আনিবে ফোড়ে?
কচুরি পাণায় হায় নদী নালা কাণা।
জল পড়ে গুঁড়ি গুঁড়ি, শাশুড়ী ভেজেছে মুড়ি,
ঝুড়ি পেড়ে গোটা কুড়ি নাও বউ তুলে।
মাখন মাখান হাতে, রস করে ঢাল পাতে,
ফলার গলায় গেলে ভাত যাবে ভুলে।
মেয়েরে পাঠাও তত্ত্ব, করে রাখ আমসত্ত্ব,
শিশুর সুপথ্য হবে মিশে দুধে ভাতে।
বলিয়া ফেলেছি ভুলে, দুধ কোথা এ গোকুলে?
যেটুকু রেখেছ তুলে বাবু খাবে 'চা'তে।
আবার বছর ষোলো, ফলিবে না থোলো থোলো,
খেয়ে নে লো দিয়ে নে লো যত সাধ মনে।
লুকায়ে একেলা খেলে, সেঁটে ধরে পেটে গেলে,
কাঙালে বিলালে ফল ফল যে ভোজনে।
দোহাই বিজ্ঞান বাবা, আমেতে মেরো না থাবা,
ক'রো নাক প্রিসার্ভের পথ আবিষ্কার;
জাহাজ চড়িলে ম্যাঙ্গো— পছন্দ করিলে অ্যাঙ্গো,
তাম্রেতে পাব না বঙ্গে আম্রের সু-তার।
কালা মেঘে ঘনঘটা— একটি বিদ্যুৎছটা,
মাগ্‌গির বাজারে এই সস্তা মিঠে আম।
ডাবের ভিতরে জল, গাছে ধরে মধুফল,
এখনো সোনার অঙ্গ মম বঙ্গধাম॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

তপস্যার ফল।

(গল্প)

১

সুদৃশ্য ও মূল্যবান্ সান্ধ্যবেশে সজ্জিত পুত্রকে ডাকিয়া মাতা বলিলেন, "ওরে সুকু, সত্যেন্ এখনও এল না কেন? তা'কে ভাল ক'রে বলেছিলি ত?"

ব্যস্তভাবে সুকুমার নীচে নামিতেছিল। সে চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "হ্যাঁ, মা, আমি নিজে তা'কে বিশেষ করেই ব'লে এসেছি। তা'র একটা জরুরী কাযে একটু দেরী হবে; কিন্তু সে নিশ্চয় আস্‌বে।"

মাতার প্রসন্নমুখ আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকারকে নির্ব্বাসিত করিয়া সমগ্র বাড়ীটা বিদ্যুতের প্রদীপ্ত আলোক-বিকাশে ঝলমল্ করিয়া উঠিয়াছিল। তৃণশ্যামল, বিস্তৃত প্রাঙ্গণের বুকের উপর আলোর ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। নিম্নতলের সুসজ্জিত কক্ষগুলি ফুলের ঘন-সুগন্ধে আমোদিত। প্রাচুর্য্যের মাধুর্য্যধারা সকল বিষয়েই যেন কানা ছাপাইয়া উঠিতেছিল; শুধু সমাগত নরনারীর পরিমিত কলহাস্য ও আলাপনের মৃদুগুঞ্জন বৈদ্যুতিক পাখার রূঢ়শব্দকে অতিক্রম করিতে পারিতেছিল না।

মিঃ রায় স্বনামধন্য কৃতী ব্যারিষ্টার। তাঁহার একমাত্র পুত্র সুকুমার, এম, এ, পাশের পর পৈতৃক ব্যবসায় শিখিবার জন্য বিলাতে যাইতেছে; সেই জন্যই আজ প্রীতি-ভোজের বিপুল আয়োজন। মিঃ রায় শুধু প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব নহেন, প্রচুর পৈতৃক বিষয় ও ধন-সম্পত্তিরও মালিক। অর্থোপার্জ্জন না করিয়াও সুকুমার পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্বে পরম-সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত; কিন্তু মিঃ রায় অত্যন্ত কর্ম্মপ্রিয়; অলস জীবন-যাত্রার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। পুত্র ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে তাঁহার "পশার" ও প্রতিপত্তির প্রভাবে সহজে সাফল্যলাভ করিতে পারিবে, এই আশায় তিনি সুকুমারকে বিলাতে পাঠাইতেছিলেন।

মিঃ রায় প্রতীচ্য-সভ্যতা, বিলাসিতা ও আদব-কায়দার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। যদিও বিলাত হইতে আসিবার পর, পিতার আদেশানুসারে তিনি স্বগ্রামে গিয়া যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন এবং এ পর্য্যন্তও হিন্দু-সমাজের বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লয়েন নাই, তথাপি আহারে ব্যবহারে—জীবন-যাত্রার প্রণালীতে তিনি য়ুরোপীয় প্রথাই বহুলাংশে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বড় একটা দেশে যাইতেন না, দেশের সাধারণ লোকের সহিত সংস্রবও রাখিতেন না। কলিকাতার বিরাট সমাজে সবই অবাধে চলিয়া যায়, সুতরাং প্রতিবাদের কোনও আশঙ্কাই ছিল না। মিঃ রায় একটা বিষয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন—বিংশ শতাব্দীতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত থাকায় প্রধান লাভ এই যে, সকল সম্প্রদায়ে অবাধে মিলা-মেশার ইহাতে বিশেষ সুবিধা; বাধার বালাই আদৌ নাই। বিশেষতঃ বৈবাহিক ব্যাপারে হিন্দু-সমাজই প্রশস্ত। অতএব যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই।

সহধর্ম্মিণীকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সভ্যতায় দীক্ষিত করিতে না পারিলেও আংশিকভাবে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। তবে পুত্র ও কন্যাকে তিনি মনের মত করিয়াই গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

পুত্র সুকুমার ও কন্যা অরুণাকে তিনি আধুনিকভাবে উচ্চশিক্ষা দিয়াছিলেন। কন্যাকে অবরোধের উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টনে তিনি ঘিরিয়া রাখেন নাই; বাহিরের আলোকে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। ম্যাট্রিক্ পাশের পর সে দস্তুরমত ডায়োসিসন্ কলেজে এবার আই, এ পড়িতেছিল। সে পিয়ানো বাজাইত; গৃহ-প্রাঙ্গণে ব্যাড্‌মিন্টন্ খেলিত; মোটরে চড়িয়া প্রত্যহ মাঠে বা [illegible] বাহির হইত, সুকুমার

সেবন করিতে যাইত। তবে মিঃ রায় তাহাকে অবাধ সম্মিলনে যাইতে দিতেন না। সেটা জন্মগত কুসংস্কার অথবা গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়—কাহার প্রভাবে, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

২

নিমন্ত্রিত মহিলাগণকে কুমারী অরুণা সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছিল। মাতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য তাহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। অরুণার কিশোর দেহ সমুজ্জ্বল বসন ও রত্নালঙ্কারের সমাবেশে মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছিল। বসন্তের রাণীর মত লোকমোহিনী সেই সুন্দরীর বর বপুর দিকে সকলেই ক্ষণিক মুগ্ধনেত্রে চাহিতেছিল—বিশেষতঃ সুকুমারের নবীন বন্ধু-বৃন্দ।

মিঃ রায় অদূরে ভদ্র-মহোদয়গণের সহিত আলাপে নিমগ্ন।

সহসা হল-ঘরের মধ্যে হারমোনিয়ম বাজিয়া উঠিল। মধুরকণ্ঠে কেহ গাহিয়া উঠিল—

"রেখ মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে—"

বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া সুকুমার নবাগত কয়েকটি বন্ধুর সহিত সোৎসাহে আসন্ন বিলাত-যাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। গানের ঝঙ্কার তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, "এই যে সত্যেন্ এসেছে!"

বন্ধুবর্গসহ সে সুসজ্জিত হল-ঘরে প্রবেশ করিল। নিমন্ত্রিত নরনারীও তথায় সমবেত হইতেছিলেন। আজিকার আসরে সত্যেন্দ্ররই গান গাহিবার কথা ছিল। পরিচিতগণের মধ্যে সুরতানলয়যোগে আর কেহ তেমন চমৎকার গাহিতে পারিত না বলিয়াই আজ বিশেষরূপেই এই ভারটি তাহার উপর দেওয়া হইয়াছিল।

সে তখন গাহিতেছিল—

"সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ ;
মধুহীন করো নাক তব মনঃ-কোকনদে।"

গায়কের তরুণ, সুন্দর আননে ভাবের গাম্ভীর্য্য, তন্ময়তা, রাগিণীর রূপ যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। মুগ্ধভাবে শ্রোতৃবর্গ গান শুনিতে লাগিল। সুকুমার দেখিল, গায়কের পার্শ্বে তাহার মাতা ও ভগিনী দাঁড়াইয়া। সন্তানের অঙ্গে অতি সাধারণ পরিচ্ছদ। সেই সুবেশ-সুবেশা নরনারীর মধ্যে তাহাকে নিতান্তই দীন-হীনের মত দেখাইতেছিল।

তরুণ-কণ্ঠের মধুস্রাবী সঙ্গীতে সকলেই প্রীত হইলেন। একে একে সত্যেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও কান্তকবির কয়েকটি উৎকৃষ্ট গান গাহিবার পর সে আসন ত্যাগ করিল।

জনৈক হ্যাটকোটধারী মাননীয় অতিথি প্রশ্ন করিলেন, "ছোক্‌রাটি কে হে?"

মিঃ রায় বলিলেন, "তুমি চেন না বুঝি? আমাদের প্রতিবেশী অনাদিবাবুর ছেলে।—কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক অনাদিবাবুর নাম শুনেছ ত? তিনি এখন পেন্সন নিয়েছেন। ওর নাম সত্যেন্। ছেলেটি বড় ভাল। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বরাবরই ফার্ষ্ট হয়ে আস্‌ছে। এবার বি, এস্‌ সি, দেবে।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "তবে ত দেখ্‌ছি ছেলে ভালই। কিন্তু বেশ-ভূষাটা অসভ্যের মত কেন? হাঁটুর কাছে কাপড় উঠেছে। ভদ্র-সমাজে একটু ভাল কাপড়-চোপড় প'রে আসা উচিত। জামাটাও ত বিশ্রী!"

মিঃ রায় সহাস্যে বলিলেন, "ওটা সত্যেনের খেয়াল। দেশী সূতার কাপড় ছাড়া ও পরে না। ওর বাবাও তাই ; ভারী স্বদেশী।"

অরুণা ইতোমধ্যে কখন্ পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তিনি লক্ষ্যও করেন নাই। সত্যেন্দ্রর সম্বন্ধে পিতা ও পিতৃ-বন্ধুর আলোচনার সবটাই সে শুনিতে পাইয়াছিল। পিতার শেষ বক্তব্য শুনিয়া মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যেরূপ মুখভঙ্গী করিলেন, তাহা অরুণার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

সকলেই যখন গল্প-গুজবে ব্যস্ত, তখন অরুণা ধীরে ধীরে মাতার সহিত কথোপকথনে রত সত্যেন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বাস্তবিক আজিকার এই উৎসব-সভায় অমন জঘন্য দীনবেশে সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সেও বিরক্ত হইয়াছিল। বাড়ীতে কি একখানা তাঁতের কাপড়ও ছিল না? ফরিদপুরের জোলার তৈয়ারী ছিটের কাপড়ের জামা পরিয়া কোনও ভদ্র-সমাজে, উৎসব-সভায় কোন ভদ্র-সন্তান কি আসিয়া থাকে? বহরমপুর বা আসামের রেশমী, এণ্ডি অথবা মুগার চাদরের দাম দিতে সত্যেনদা'র পিতা নিশ্চয়ই

অসমর্থ নহেন। তবে অমন একখানা বিশ্রী মোটা চাদর—না, এ বড়ই বাড়াবাড়ি!

আশৈশব ক্রীড়া-সঙ্গী, প্রতিদিনের সহচর, প্রতিবেশী সত্যেন্দ্রকে একটু উষ্মার সহিতই সে কথাগুলি শুনাইয়া দিল; সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে বেশ-ভূষার প্রতি লক্ষ্য রাখা যে প্রত্যেক ভদ্র-সন্তানের অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য, এ কথাটা সে একটু রূঢ়ভাবেই বলিয়া ফেলিল। বেশের দৈন্য যে উচ্চাভিলাষহীনতার পরিচায়ক, সংসারে যাহারা শ্রী ও স্ত্রী লাভ করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে এমন ঔদাসীন্য, নির্লিপ্ততা যে আদৌ শোভন নহে, এ কথাটা বলিতেও সে ছাড়িল না।

কথাগুলি অন্যের অশ্রাব্য স্বরে বলিয়াই অরুণা লঘু ও দ্রুতগতিতে অন্যদিকে চলিয়া গেল। তাহার মাতা কন্যার এই আকস্মিক উত্তেজনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হইল সত্যেন্দ্রনাথ। স্বদেশের বেশ-ভূষার প্রতি অরুণার এমন বিরাগ ও বিদ্বেষ কেন? সত্যেন্দ্র ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইল; কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করিল না; শ্রীমতী রায়ের দিকে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল।

সত্যেন্দ্রকে দুই চারিটা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া মিসেস্ রায় কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্র তখন নিজের বেশ-ভূষার দিকে চাহিয়া দেখিল। কই? তাহার কাপড়, জামা, চাদর ত মলিন অথবা ছিন্ন নহে! তবে হাঁ, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব বা বিলাসিতার প্রকাশ তাহাতে নাই। তাহার বেশ-ভূষা নিতান্তই আড়ম্বরবিহীন—কোঁচার প্রান্তভাগ ভূমি-চুম্বনে বিরত এবং ভৃত্যের নিপুণ-হস্তের প্রসাধন-কৌশলের চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। এটা কি অপরাধ?

ভোজনাগারে অতিথিবর্গ সমবেত হইতেছিলেন। সুকুমার সকলকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছিল। সত্যেন্দ্র এ বিষয়ে বন্ধুকে সাহায্য করিতে লাগিল। সে তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে, সুকুমার সত্যেন্দ্রকেও বসিবার জন্য হাত ধরিয়া টানিল। সত্যেন্দ্র মৃদু হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "সুকুমারদা! তুমি ভুলে যাচ্ছ, আজ যে ৩০শে আশ্বিন! আজ ত আমার উপবাস।"

সুকুমার বলিয়া উঠিল, "তুই কি এখনও সে সব পাগ্‌লামী ছাড়্‌তে পারিল্‌নি? তাজা বাঙ্গালা ত অনেকদিন আগে জোড়া লেগে গেছে! এখন ত ৩০শে আশ্বিন কেউ 'অব্‌জারভ' করে না। সব তাতেই তোর বাড়াবাড়ি!"

সত্যেন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিল, "কিন্তু আমি করি। অনেক দিনের অভ্যাস, এখন ছাড়্‌তে পার্‌ছি না।"

অরুণার সঙ্গে মাতাও সেই দিকে আসিতেছিলেন। কথাটা শুনিয়া শ্রীমতী রায় বলিলেন, "তা বেশ ত। ওকে পীড়াপীড়ি কর্‌বার দরকার কি? প্রত্যেকের মত ও বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে, বাবা।"

অরুণা একবার তীব্র-দৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রর পানে চাহিল। তাহার পর গম্ভীরভাবে সে ভোজনাগারে প্রবেশ করিল।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘুরিয়া ফিরিয়া, কে কি পাইল না পাইল, তাহার তদ্বির করিতে লাগিল।

৩

বিলাতী মেলের চিঠি দেখিয়াই সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি উহা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু পড়িতে গিয়াই সে বুঝিল, উহা তাহার জন্য লিখিত নহে। খামের উপর তাহারই শিরোনামা আছে সত্য; কিন্তু পত্রখানি অন্যের উদ্দেশ্যে লিখিত। মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে সে বুঝিল, সুকুমার বিলাত্ হইতে এ পত্র মিঃ রায়কে লিখিয়া ভ্রমক্রমে তাহার শিরোনামাযুক্ত খামে ভরিয়া পাঠাইয়াছে। সুতরাং আজিকার মেলে তাহারও একখানা পত্র নিশ্চয়ই আসিয়াছে। সেখানা হয় ত মিঃ রায় পাইয়াছেন। সুকুমার বিলাত হইতে প্রায়ই তাহাকে পত্র লিখিত।

পরের পত্র পড়ার অভ্যাস সত্যেন্দ্রের ছিল না। সে উহা সযত্নে ভাঁজ করিয়া খামের মধ্যে রাখিতে যাইবে, এমন সময় এক স্থলে তাহার নামের উল্লেখ দেখিয়া সে একটু কৌতূহলী হইল। এই দীর্ঘ পত্রে সুকুমার তাহার পিতার নিকট তাহার সম্বন্ধে কি লিখিয়াছে?

"হাঁ" ও "না"র দ্বন্দ্বে অবশেষে "হাঁ"ই জয়লাভ করিল। সে তাড়াতাড়ি সবটাই পড়িয়া ফেলিল। পড়িতে পড়িতে তাহার সুগৌর মুখমণ্ডল ক্ষণে আরক্ত ক্ষণে ম্লান হইতে লাগিল।

অরুণার সহিত তাহার বিবাহের কথা লইয়া বোধ হয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা হইয়া থাকিবে। তাই সুকুমার লিখিয়াছে, "সত্যেন্ খুবই ভাল ছেলে সন্দেহ নাই। সে যে এম্, এস্ সিতেও প্রথম হইবে, তা ত আমি জানিতাম। মা

যে সত্যেনকে বড়ই স্নেহ করেন, সে ত খুবই স্বাভাবিক। ওর দিকে বরাবরই তাঁর টান আছে। কিন্তু সত্যেনের সঙ্গে অরুণার মিলনটা সুসঙ্গত হইবে না। অরুণাকে যে ভাবে লালন-পালন করিয়াছেন, তাহাতে সাদা-সিধা মধ্য-বিত্ত পরিবারে তাহাকে আদৌ মানাইবে না। সত্যেনকে আমিও খুব ভালবাসি; কিন্তু তাহার চাল-চলন, জীবন-যাত্রার প্রণালী আমাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র। অরুণা ইহাতে সুখী হইতে পারিবে না। আপনার যুক্তিই ঠিক। প্রচুর ধন-সম্পত্তি না থাকুক, অন্ততঃ কোন সিভিলিয়ানের সঙ্গে অরুণার বিবাহ হওয়া উচিত। এখন তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। মা'কে বুঝাইয়া রাখিবেন। অরুণার বয়স ত মোটে সতের। এখনই ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? আমি ফিরিয়া গেলে ধীরে সুস্থে সব ব্যবস্থা করা যাইবে।"

সত্যেন্দ্র আর পড়িতে পারিল না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস-সহ সে পত্রখানি খামের মধ্যে ভরিয়া রাখিল।

হাঁ, অরুণাকে লাভ করা তাহার পক্ষে দুরাশামাত্র। শুধু সে ধনীর সন্তান নহে বলিয়াই যে সে উপেক্ষিত হইতেছে, তাহা নহে; ভোগ-বিলাসে সে স্পৃহাহীন, ইহাই তাহার প্রধান অপরাধ! স্বদেশের পরিচ্ছদে সে দেহ আবৃত করে, দেশ-মাতৃকার প্রতি তাহার ভক্তি আছে, এই জন্যই সে ধনীর দুলালীর যোগ্য পাত্র নহে!

সত্যই ত; ভাঙ্গা বাঙ্গালা জোড়া লাগিবার পর তাহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহই ত তাহার মত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভরে দেশ-মাতার মোটা কাপড়ে অঙ্গ আচ্ছাদিত করে না! এখন ত বিদেশী বস্ত্রের প্রচলন পুরাদমেই হইতেছে। তবে এতদিন সে যাহাকে পবিত্রতম কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাহা পালন করার ফলেই কি সে এখন অন্যতম প্রার্থনীয় কাম্যফল হইতে বঞ্চিত হইতেছে?

সত্যেন্দ্র ভাবিতে লাগিল।

এই সুকুমার তাহার বাল্য-সহচর, অরুণা তাহার শৈশবের ক্রীড়া-সঙ্গিনী। পাশাপাশি দুইটি বাড়ীর অধিবাসীদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। মাতৃহীন সত্যেন্দ্র শ্রীমতী রায়ের নিকট হইতে মাতৃস্নেহ লাভ করিয়াছে। দিন ও রাত্রির অধিকাংশ সে মিঃ রায়ের বাড়ীতেই কাটাইয়াছে। তাঁহার বিশাল উদ্যানে তাহাদের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কত দীর্ঘ মধুর দিবস ও সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার ইতিহাস সত্যেন্দ্রর মনের পৃষ্ঠায় গভীরতম রেখাচিত্রে অঙ্কিত নাই কি?

শ্রীমতী রায়ের ভাবভঙ্গী ও কথার ইঙ্গিতে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে এমন বুঝিয়াছিল যে, অরুণার সহিত তাহার মিলন একান্ত অসম্ভব নহে। আবাল্য-সহচরীকে জীবন-সঙ্গিনী-রূপে পাইলে যে তাহার জীবন সার্থক হইবে, তাহা সে বুঝিত। তাই সে সাফল্যলাভের জন্য আপনাকে সকল প্রকারে গড়িয়া তুলিতেছিল। তাহার অন্তরের এই গোপনীয় ও পবিত্রতম বিষয়টি সে বাক্য, ব্যবহার বা ইঙ্গিতেও কখনও প্রকাশ পাইতে দেয় নাই। অরুণা তাহার অনুরাগিণী কি না, তাহা জানিবার জন্যও কোনও দিন সে এতটুকু অধীরতা প্রকাশ করে নাই। সে তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হইতে শুনিত, তাহাতেই পরিতৃপ্ত ছিল।

বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে চিন্তার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হাঁ, পত্রখানি মিঃ রায়কে দিয়া আসাই সঙ্গত। সে অনিচ্ছাক্রমে পত্রখানা যে পড়িয়াছে, তাহাও সে অস্বীকার করিবে না। তাহার চিরপোষিত আশালতা সমূলে ছিন্ন হইয়া গেল সত্য; তবে—

বিমূঢ়ভাবে আবার সে আসনে বসিয়া পড়িল। করতলে মস্তক রক্ষা করিয়া সে আপনার ভবিষ্যতের আলোকহীন, উৎসাহশূন্য, নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবিতেছিল কি?

ঘড়ীতে টং টং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল। বোধ হয়, তখন তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে চমকিতভাবে সোজা হইয়া বসিল। সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে জামা গায় দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

৪

"এস সত্যেন্, ব'স ব'স। হাঁ, ভাল কথা, তোমাকে সুকুমার বিলাত থেকে একখানা পত্র লিখেছে, আমার নামের খামে ভুল ক'রে পাঠিয়েছে। পত্রখানা আমি খুলে ফেলেছিলাম।"

মৃদুহাস্যে মিঃ রায় পত্রখানা সত্যেন্দ্রর হস্তে অর্পণ করিলেন। সত্যেন্দ্র পকেট হইতে তাহার নামের পত্র বাহির করিল। কম্পিত হস্তে সে উহা মিঃ রায়কে দিয়া বলিল, "আমায় মাপ করবেন, আমিও না জেনে—"

বাধা দিয়া সহাস্যে মিঃ রায় বলিলেন, "ওঃ, বুঝেছি! তা তুমি অত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? দোষ ত তোমার নয়। আমিও ত না জেনে তোমার চিঠি খুলেছিলাম। তুমি ব'স দেখি, বাবা।"

সত্যেন্দ্র সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া প্রবাসী বন্ধুর সংক্ষিপ্ত পত্রখানা পড়িল। পরীক্ষায় সাফল্যলাভের জন্য সে সত্যেন্দ্রকে সুদূর সাগরপার হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছে।

মিঃ রায় তখনও পত্রপাঠে নিবিষ্ট। সত্যেন্দ্র একবার গোপন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য্যের স্তব্ধ ছায়া দেখিয়া সে আবার চক্ষু নামাইয়া লইল। তাহার পর আবার যখন সে মিঃ রায়ের দিকে চাহিল, তখন সে দেখিল, তিনি স্থিরদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছেন।

আরক্তমুখে সত্যেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "আমায় ক্ষমা করবেন, পত্রখানা আমি প'ড়ে ফেলেছি!"

প্রশান্তকণ্ঠে মিঃ রায় বলিলেন, "তাতে তোমার কোন অপরাধ নেই, সত্যেন্।"

কক্ষমধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সে নীরবতা এমনই গাঢ় যে, সত্যেন্দ্র তাহার বক্ষস্পন্দনের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল।

আনত মস্তক তুলিয়া সত্যেন্দ্র মিঃ রায়ের প্রতি পুনরায় চাহিবামাত্র তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "এখন তুমি আইন পড়্‌বে, না অন্য কোন লাইনে যাবে; কি ঠিক করেছ?"

সত্যেন্দ্র সহসা বলিয়া ফেলিল, "আপনি আমায় কি পরামর্শ দেন?"

"আমি?—আমি ত উপযুক্ত বিচারক নই! তোমার বাবার কি মত?"

"আজ্ঞে, তিনি এখনও কিছু বলেন নি। তবে—" বলিয়াই সে একটু থামিল। তার পর পুনরায় আবেগভরে বলিয়া ফেলিল, "আমার ইচ্ছা, বিলাতে যাব।"

"বিলাতে যাবে?—ব্যারিষ্টার হ'তে?"

কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র উৎসাহ অথবা আগ্রহের পরিচয় না পাইয়া সত্যেন্দ্র যেন মুসড়িয়া পড়িল। তাহার বুকের মধ্যে সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হইল।

অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া সে বলিল, "ইচ্ছা আছে, সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষাটা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

"ওঃ!" বলিয়াই মিঃ রায় নিবিষ্টভাবে সত্যেন্দ্রনাথের আরক্ত, সুগৌর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর পূর্ব্ববৎ উৎসাহশূন্য কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার বাবার এতে মত আছে?"

দৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে সত্যেন্দ্র বলিল, "বাবার মত কি হবে, তা জানি না। তবে তাঁর অমত হ'লে স্বর্গ-সাম্রাজ্যের সম্ভাবনার আশাও আমায় ত্যাগ করতে হবে।"

উভয়ের নয়ন মিলিত হইল। মিঃ রায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টির বেগ সহিতে না পারিয়াই কি সত্যেন্দ্র চক্ষু পুনরায় নত করিল?

"ভালই কথা। তোমার উন্নতি হ'লে আমাদেরও আনন্দ।"

এইবার তাঁহার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন আবেগ ও ঔৎসুক্যের একটা অতি মৃদু ঝঙ্কার কি সত্যেন্দ্র অনুভব করিতে পারিয়াছিল? অথবা উহা তাহারই মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র?

সত্যেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বক্ষের মধ্যে যে কথা গুমরিয়া উঠিতেছিল, তাহা ত প্রকাশ করা যায় না।

"একটু দাঁড়াও, সত্যেন্।"

স্তব্ধভাবে সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার পার্শ্বে আসিয়া, স্কন্ধদেশে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "তুমি সুকুমার ও অরুণার অন্তরঙ্গ বাল্যসুহৃদ্। যদি তুমি বিলাত যাও, তবে তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের আগে আমি তাহাদের, অন্ততঃ অরুণার বিবাহ দিব না। বিলাত যাইবার আগে এ কথাটুকু তোমার জানা দরকার।"

কৃতজ্ঞ নয়নে সত্যেন্দ্র মিঃ রায়ের দিকে চাহিল।

এই সময় বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল যে, মিসেস্ ও মিস্ রায় মোটরে বসিয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। সান্ধ্য-বায়ু সেবনে তাঁহারা প্রত্যহই এই সময়ে বাহির হইয়া থাকেন।

উভয়ে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। শ্রীমতী রায় সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "এই যে, সতু! আমাদের সঙ্গে মোটরে একটু বেড়িয়ে আসবে চল না।"

পূর্ব্বে শত শতবার সে ইঁহাদের সহযাত্রী হইয়াছে। প্রস্তাবটি আদৌ নূতন নহে। কিন্তু আজ সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তাহার দিকে তীক্ষদৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা অরুণা বলিয়া

উঠিল, "উনি কি ঐ রকম বেশে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন, তাই বুঝি ভাব্‌ছেন? তা সত্যি, আমি কিন্তু ওরকম কদর্য্য বেশ আদৌ পছন্দ করি না। এত লেখাপড়া শিখেও যে মানুষ এমনতর,তা'র কি কোন দিন কিছু হয়; তুমিই বল দেখি, মা?"

সত্যেন্দ্রর মুখমণ্ডল সহসা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। আজ উত্তরে সে কোনও কথা যেন খুঁজিয়া পাইল না। কি বলিবে? বলিবার কি আছে?

শ্রীমতী রায় কন্যার দিকে তীব্রদৃষ্টিপাত করিয়া, সত্যেন্দ্রকে বলিলেন, "তা হোক্, তুমি এস ত, বাবা।"

সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া, "জরুরী কায আছে" বলিয়া সে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। ব্যথাটা আজ বড় জোরে তাহার বক্ষে বুঝি বাজিয়াছিল, তাই মোটরে উপবিষ্টা, লোকমোহিনী অরুণার কৌতুকহাস্য-বিকসিত মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না।

৮

"বাবা!"

অধ্যয়নরত পিতা স্থির ও প্রসন্নদৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিলেন। পুত্রের সুন্দর আননে চিন্তার ক্লিষ্ট রেখা দেখিয়া অনাদি বাবুর স্নেহ-প্রবণ কোমল হৃদয় দুলিয়া উঠিল।

চশমাটা খুলিয়া, বইখানি মুড়িয়া টেবলের উপর রাখিয়া তিনি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কি, সতু, তোমার কিছু বল্‌বার আছে?"

নতশীর্ষে, মৃদুকণ্ঠে সত্যেন্দ্র বলিল, "আমায় বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস্ পড়্‌তে যেতে দেবেন. বাবা?"

প্রৌঢ় অধ্যাপক স্থিরদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল পুত্রের আননে আলোক ও অন্ধকারের লীলা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সংসার বন্ধনের একটিমাত্র স্মৃতি এই সত্যেন্দ্র। সারাজীবন ধরিয়া, মাতৃহীন পুত্রকে তিনি মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সে তাঁহার আদরের দুলাল, বংশের গৌরব, জীবনের অবলম্বন। পিতাপুত্রে কোন ব্যবধানই ছিল না। তাহার দৈনন্দিন জীবনের কোন ঘটনাই স্নেহশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। পুত্রের হৃদয়টি তাঁহার কাছে দর্পণবৎ ছিল। কিন্তু মুখে তিনি কোনও দিন পুত্রকে কোনও প্রশ্ন করেন নাই, প্রয়োজনও ছিল না। তাঁহার স্নেহ, মমতা ভালবাসার কেন্দ্র একটি, সে-ই জানে, কোন প্রশ্ন না করিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্নেহপাত্রের মনের লুকান কথাটা পর্য্যন্ত দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছবির মত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

কয়েক দিন পূর্ব্বে মিঃ রায়ের সহিত নিভৃত আলাপের কথা বোধ হয় প্রৌঢ়ের মনে পড়িল। নিমীলিত নেত্রে তিনি কিয়ৎকাল ভাবিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র ব্যগ্রভাবে পুনঃ পুনঃ পিতার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

প্রশান্তস্বরে অনাদি বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু বিলাতে ঠিক ভাবে থাক্‌তে পার্‌বে, সতু?"

সত্যেন্দ্র বোধ হয় কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, তাই সে একটু বিস্মিতভাবে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

তেমনই শান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে পিতা বলিলেন, "সেখানে নানা রকমের প্রলোভন; বড়ই পিচ্ছিল পথ; কি জানি, আমার সতু যদি পড়িয়া যায়!"

সত্যেন্দ্রর মুখমণ্ডলে যেন সিন্দূরের রক্তরাগ ছড়াইয়া পড়িল। সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে, বাবা, আমি সব জয় কর্‌তে পার্‌ব।"

"তা তুমি পার্‌বে—তবু বাপের মন। আর ত আমার কেউ নেই!"

সত্যেন্দ্রর নয়নযুগল আর্দ্র হইয়া আসিল। সে বলিল, "তবে থাক্, বাবা—আমি যাব না।"

মৃদুহাস্যে পিতা বলিলেন, "না, সতু,তোমার জীবনের পথে আমি অন্তরায় হব না। তুমি জয়মুকুট লাভ ক'রে বাঞ্ছিত ফল অর্জ্জন কর, এর চেয়ে বড় কামনা আমার আর কিছু নেই। আমি কয়েক দিন থেকেই তোমাকে বিলাতে পাঠাবার আয়োজন ক'রে রেখেছি। যাতে শীঘ্র তুমি পাশপোর্ট পাও, তারও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মাসে তুমি তিন শ করে টাকা পাবে, তাতেই সেখানকার খরচ চালিয়ে নিও।"

সত্যেন্দ্র বিস্মিত হইল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও বিলাতে যাইবার চিন্তা তাহার মনে উদিত হয় নাই, এ দিকে তাহার পিতা গোপনে গোপনে তাহার বিলাতযাত্রার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন! অথচ সে জানিত,তাহার পিতা অপরিণত বয়সে বিলাতযাত্রার বিশেষ বিরোধী ছিলেন।

সত্যেন্দ্র বলিল, "তিনশ টাকা আমায় দিলে আপনার চল্‌বে কিসে, বাবা? আপনি ত মোটে—"

বাধা দিয়া পিতা বলিলেন, "সে জন্য তোমার কোন চিন্তা কর্তে হবে না, বাবা।—কোম্পানীর সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত হয়েছে, আমি এক বৎসরের মধ্যে তিনখানা বই লিখে দেব, তার জন্য তারা আমায় তিন হাজার টাকা 'রয়ালটি' দেবে। এক হাজার অগ্রিম পেয়েছি, তাতে তোমার জাহাজ ভাড়া, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি হয়ে যাবে। টাকার জন্য তোমায় ভাব্‌তে হবে না।"

সত্যেন্দ্র মুগ্ধ হইল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, তাহার বিলাতযাত্রার জন্য পিতার এত আগ্রহ কেন?

অনাদিবাবু চশমা-জোড়া তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "একটা কথা আছে, তোমার বিলাতযাত্রার কথাটা একবার মিঃ রায়কে জানিয়ে দিও।"

সত্যেন্দ্রনাথ উৎসাহভরে বলিল, "তাঁকে একটু আগেই আমি ব'লে এসেছি যে, বাবার মত পেলে আমি বিলাতে যাব।"

"ও:!" বলিয়াই পিতা মুহূর্ত্তমাত্র পুত্রের পানে চাহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তবে তুমি প্রস্তুত হ'তে থাক।"

সত্যেন্দ্র পিতার কক্ষ ত্যাগ করিলে, প্রৌঢ় যুক্তকরে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। সত্যেন্দ্র যদি তখন ফিরিয়া আসিত, তবে দেখিতে পাইত, তাহার পিতার সৌম্য আননে একটা পবিত্র দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর তাঁহার নয়নপল্লবে মুক্তাবিন্দু ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছে।

৬

কোথা দিয়া বৎসর চলিয়া গিয়াছিল, সত্যেন্দ্র তাহার কোনও সন্ধানই রাখে নাই। এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে পরীক্ষা শেষ করিতে হইবে বলিয়া সে উগ্র তপস্তায় রত হইয়াছিল। দেশে অথবা বিদেশে—পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, তাহার কোনও সন্ধানই সে রাখিত না। আহার, অত্যল্প নিদ্রা ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় নিত্যকর্ম্মগুলি ছাড়া আর সকল সময়েই সে একাগ্রমনে অধ্যয়ন করিত। একটিমাত্র বৎসরের মধ্যে তাহাকে সাফল্যলাভ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাহার ধ্যানের একমাত্র বিষয়। সে কাহারও সহিত বড় একটা মিশিত না, অধ্যয়নের বিষয় ছাড়া প্রসঙ্গান্তরের আলোচনায়ও যোগ দিত না। অনেক কথা অনেক সময় তাহার কানের মধ্যে প্রবেশ করিত বটে, কিন্তু মনের রুদ্ধদ্বারের কাছে আসিয়া সবই ফিরিয়া ফিরিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে পিতার নাতিদীর্ঘ পত্রের উত্তরে সে আপনার অধ্যয়নের ইতিহাস লিখিয়া প্রবাস-জীবনের সহিত দেশের যোগসূত্র রক্ষা করিত মাত্র। সে যখন বিলাতে, সেই সময় সুকুমারও দেশে ফিরিয়াছিল। পঁহুছা সংবাদ দেওয়া ছাড়া সে মিঃ রায় অথবা সুকুমারকে বড় একটা পত্র লিখে নাই। অবকাশই তাহার ছিল না। তবে অরুণার স্মৃতি? হাঁ, সেটা ত তাহার সঙ্গের সাথী। সেই স্মৃতিই ত তাহাকে তপস্যায় শক্তি প্রদান করিত।

এমনই ভাবে, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সে সিবিল সার্ভিস্ পরীক্ষা প্রদান করিয়া শেষ দিন বাসায় ফিরিতেই নিদারুণ দুঃসংবাদে তাহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার কোন আত্মীয়ের পত্রে সে জানিতে পারিল, তাহার স্নেহময় পিতা স্বর্গধামে যাত্রা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার জীবন-বিমার পঁচিশ হাজার টাকা তিনি উইল করিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছেন। পিতা যে এত টাকার জীবন-বিমা করিয়াছিলেন, তাহা এ যাবৎ সত্যেন্দ্রর অগোচরই ছিল।

পিতৃশোকে অধীর সত্যেন্দ্রনাথ তিন দিন ঘরের বাহির হয় নাই। মৃত্যুকালে সে পিতার সেবায় বঞ্চিত হইল বলিয়া নিজেকে সহস্রবার ধিক্কার দিল। হায়! কেন সে বিলাতে আসিয়াছিল!

ক্রমে শোকের প্রথম আঘাত সহ্য হইয়া গেলে সে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া উদাস প্রাণে নানাস্থানে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইল। অবশেষে এক দিন সে জানিতে পারিল, প্রশংসার সহিত সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বোম্বাইয়ের কোনও জিলার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নিযুক্তও করিয়াছেন। এই সাফল্যের সংবাদে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তি পাইতেন, তাঁহাকে মনে করিয়া সত্যেন্দ্র অশ্রুপাত করিল।

সুকুমার ও মিঃ রায়কে এতদিন পরে সাফল্যলাভের সংবাদ দিয়া সত্যেন্দ্র জানাইল যে, শীঘ্রই সে কলিকাতায় যাইতেছে।

* * * *

গাড়ী-বারান্দায় ট্যাক্সি আসিবামাত্র, য়ুরোপীয় বেশে সজ্জিত সত্যেন্দ্রনাথ লাফাইয়া নীচে নামিল। সে কবে আসিবে, এ সংবাদ কাহাকেও দেয় নাই। গ্রাণ্ড হোটেলে আসবাবপত্র

রাখিয়া সে সোজা মিঃ রায়ের বাটী আসিয়াছিল। দুই জন বাঙ্গালী ভৃত্য তাড়াতাড়ি "সাহেবের" কাছে ছুটিয়া আসিল। মিঃ রায়ের উর্দ্দীপরা তক্মাধারী চাপরাশীর পরিবর্ত্তে এ সব কাহারা? তবে কি মিঃ রায় এখানে এখন থাকেন না?

কিন্তু বহুক্ষণ তাহাকে সন্দেহ-দোলায় থাকিতে হইল না। তাহার চিরপরিচিত লাইব্রেরী-ঘর হইতে ধুতিপরা পাঞ্জাবী-গায় একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাহিরে আসিলেন। সত্যেন্দ্র মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে মিঃ রায়কে চিনিল। কিন্তু বিস্ময়ে তাহার কণ্ঠ হইতে একটি শব্দমাত্র বাহির হইল না। সর্ব্বদা য়ুরোপীয় বেশে সজ্জিত মিঃ রায়ের এ কি পরিবর্ত্তন! সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে?

মিঃ রায় সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া বলিলেন, "সত্যেন্, তুমি কখন্ এলে? এস, বাবা, এস!"

বাহুবন্ধনে সত্যেন্দ্রকে বাঁধিয়া প্রৌঢ় বলিলেন, "তোমার সাফল্যের সংবাদে বড়ই খুসী হয়েছি, বাবা। আজ তোমার বাবা, আমার বন্ধু অনাদিবাবু নেই, সেই যা দুঃখ। চল, ভিতরে যাই।"

সত্যেন্দ্র চলিতে চলিতে বলিল, "সুকুমারদা কোথায়?"

"সুকুমার? সে ত এখানে এখন নেই! মফঃস্বলে গেছে।"

"মফঃস্বলে? কোন কেসে বুঝি?"

"না, না, সে প্রোপাগাণ্ডা ওয়ার্কে গেছে।"

"প্রোপাগাণ্ডা?"

"ওঃ! তুমি কোন খবর রাখ না বুঝি? তা রাখ্বেই বা কেমন ক'রে? এক বৎসর দেশ-ছাড়া, আবার পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলে। ভারতবর্ষে যে ঘোর অসহযোগ আন্দোলন চল্ছে। সে তাই দেশের মধ্যে খদ্দরপ্রচার কার্য্যে লেগে গেছে।"

সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতই এ সকলের কোন সন্ধান রাখিত না। এক বৎসরের অবকাশে দেশের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন? সে চাহিয়া দেখিল, মিঃ রায়ের পরিধানে খদ্দর, গায় খদ্দরের পাঞ্জাবী।

সত্যেন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "সুকুমারদার বিয়ে হয় নি?"

মিঃ রায় বলিলেন, "সুকুমার এখন বিয়ে কর্তে রাজি নয়। তা ছাড়া আমি ত তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, শুভ কায তুমি না আসা পর্য্যন্ত হবে না। বিশেষতঃ তোমার বাবার কাছেও আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, তুমি সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিয়ে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত অরুণাকেও কোথাও বিয়ে দেব না। সে প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছি।"

সত্যেন্দ্র এতকাল পরে অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইল। তাহার অন্তরের গোপনতম কথাটি তাহার পিতারও অগোচর ছিল না! এমন পিতা হইতে আজ সে বঞ্চিত!

ততক্ষণে মিঃ রায় দ্বিতলে উঠিয়াছিলেন। সম্মুখের বারান্দায় ও কাহারা? সত্যেন্দ্র রুমালে চক্ষু মুছিয়া লইল। না, তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই। মোটা বস্ত্রে অঙ্গ আবৃত করিয়া মা ও মেয়ে চরকায় সূতা কাটিতে ব্যস্ত।

"চেয়ে দেখ, কে এসেছে?"

শ্রীমতী রায় কোট-প্যাণ্টধারী সত্যেন্দ্রের সুগঠিত ও সুন্দর মুখখানি দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। বিলাতের জল-বায়ুর গুণে তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বাড়িয়াছিল। সহাস্যমুখে তিনি তাহার নত মস্তকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কুমারী অরুণাও সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল। চির-পরিচিত, আলুথালু বেশধারী সত্যেন্দ্রনাথকে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে কি সুন্দর মানাইয়াছিল, সে কি তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল?

কিছুক্ষণ আলাপের পর মিঃ রায় কার্য্যান্তরে নীচে নামিয়া গেলেন। শ্রীমতী রায় অতিথি-সৎকারের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন।

অবনতমুখে অরুণা তখনও চরকা চালাইতেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ আরক্তমুখে নিম্নস্বরে বলিল, "এতদিন পরে কি আমি যোগ্যতা অর্জ্জন কর্তে পেরেছি, অরুণা? আমাদের মিলন-পথের প্রধান অন্তরায় কি দূর হয়ে যায়নি?"

অরুণা তখনও নতমুখে কায করিয়া যাইতেছিল। সহসা মুখ তুলিয়া দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "মিলন-পথের ব্যবধান যে আরও বেড়ে গেছে, সত্যেন বাবু!"

কি নিদারুণ কথা! সত্যেন্দ্রর মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না; স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "কেন, অরুণা, কেন?"

তেমনই প্রশান্ত ও উত্তেজনাশূন্য স্বরে অরুণা বলিল, "ম্যাঞ্চেষ্টার, লণ্ডন প্রভৃতির সঙ্গে কি চট্টল, কলিকাতা একাসনে বসতে পারে? বিশেষতঃ আমার বাবা ও দাদা

আদালতের কায ছেড়ে দেশের কাযে যোগ দিয়েছেন, আর আপনি—অসম্ভব সত্যেন বাবু, অসম্ভব!"

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা সত্যেন্দ্রর হৃদয়ঙ্গম হইল। তবে এক বৎসর ধরিয়া সে এ কি করিল? অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যাহাকে লাভ করিবার জন্য সে আপনার বহু প্রার্থনীয় জীবনের পবিত্রতম ব্রতও ভঙ্গ করিয়াছে, আজ সেই অপরাধেই কি তাহার এই শাস্তি?

উদ্‌ভ্রান্তস্বরে সত্যেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "কিন্তু সে ত তোমারই জন্য, অরুণা! তোমাকে খুসী করিবার জন্য, তোমার দাদা ও বাবাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজেকে ভিন্ন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছি!"

ক্ষুদ্র করপল্লব-যুগল যুক্ত করিয়া, মিনতিপূর্ণ, কোমল ও মৃদুকণ্ঠে অরুণা বলিল, "তাঁদের জন্য আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। আমাকেও আপনি ক্ষমা করুন!"

টুপীটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া, গায়ের কোট, ওয়েষ্টকোট প্রভৃতি খুলিতে খুলিতে সত্যেন্দ্র বলিয়া ফেলিল, "তোমাদের বাড়ী খদ্দরের কাপড়, চাদর বেশী আছে? আমায় ভিক্ষা দেবে?"

অরুণা স্নিগ্ধদৃষ্টি তুলিয়া সত্যেন্দ্রর পানে চাহিয়া বলিল, "আছে; কিন্তু—"

"কিন্তু নয়, অরুণা। ও সব আমি শুনতে চাই না। বাবার পঁচিশ হাজার টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে কি আমাদের সংসার চালাতে পারব না?"

চরকা ফেলিয়া অরুণা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দীর্ঘায়ত, সজল, কৃষ্ণতার নয়নের দৃষ্টিতে সত্যেন্দ্র কি দেখিল, তাহা সে-ই জানে।

সেই সময় জলখাবারের থালা লইয়া শ্রীমতী রায় ডাকিলেন, "সত্যেন্, একটু জল খাবে এস।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ঈদ।

পূরব গগনে আলোক ভাতিল
বিগত যামিনী চতুর্থ যাম।
মস্‌জিদে ঐ ধ্বনিছে স্তোত্র —
"কুম্ কুম্ ইয়া হাবীবি কাম্‌তা নাম।"
অমরা হইতে উষার কিরণ,
ধরার তিমির করিয়া হরণ,
আসিছে করিতে ঈদ-সম্ভাষণ,
বিদায় আজিকে "রমজান"
পুলকে পূরিল সারাটি বিশ্ব
পুলকে পূরিল মোস্‌লেম-প্রাণ।
আয় দেশবাসী ভুলি ভেদজ্ঞান
বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, ইহুদি, খৃষ্টান
এ আনন্দদিনে সবাই সমান
ভুলি আত্মপর ধরি করে কর
হৃদয়ে হৃদয়ে গলায় গলায়
মিলি সবে মোরা হয়ে একপ্রাণ!
আজি শুভদিনে যাচি তব ঠাঁই
কাতরকণ্ঠে হে ভগবান্।
ভারতের ঈদ ধন্য হ'ক আজি
দূর করি দাও দুঃখ দৈন্যরাজি
এ দগ্ধ হৃদয়ে দেহ ঢালি শান্তি —
ঘুচাও আঁধার ঘুচাও এ ভ্রান্তি
দূর করি দাও সব হাহাকার
দূর করি দাও সব পাপভার
হউক সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ
ধন্য হ'ক ঈদ পুণ্য হ'ক ঈদ
হে ভগবান্।

সাদত আলী খাঁ।

নারীর বৈশিষ্ট্য।

নারীর প্রতিভা।

জলে না নামিতে পাইলে সাঁতার শিখা যায় না, এ কথা সকলেই জানে। সুযোগ, সুবিধা বা অবসর না পাইলে যে মানুষের চিত্তবৃত্তির সম্যক্ স্ফুরণ, পুষ্টি বা পরিণতি হয় না, ইহাও সকলে জানে। অবশ্য, ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য থাকিলে কখনও কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়, কিন্তু সাধারণতঃ ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই জন্য সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে লোক বলিয়া থাকে,—গোবরে শালুক ফুটিয়াছে বা সোনার ডালে আম ফলিয়াছে। অবশ্য, ইহাতে ঘটনার অসাধারণত্বই সূচিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ জগতের বহু স্থানেই দেখা যায়, শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহাতে এমন ধারণা হওয়া উচিত নহে যে, নারী স্বভাবতঃই শিক্ষা-গ্রহণে পুরুষের সমকক্ষ নহে। সকল দেশে অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়, সুযোগ, সুবিধা বা অবসরের অভাবে নারীর শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, অথবা পুরুষ যে পরিমাণে যে অবসর প্রাপ্ত হয়, নারী তাহা প্রাপ্ত হয় না। নতুবা নারী উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে যে পুরুষের সমকক্ষ হয় না, অথবা পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতা অর্জ্জন করে না, এ কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

আমাদের দেশের কথা বলি। অতীতের খনা, লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, উভয়ভারতী প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রমুখা বিদুষী শিক্ষিতা মহিলার অভাব নাই। ইঁহারা মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ ও অনুশীলন ব্যাপারে যে কোনও শিক্ষিত পুরুষের সমকক্ষতার দাবী করিতে পারেন এবং বোধ হয়, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে তাঁহাদিগকে যোগ্যতায় হিসাবে পরাস্ত করিতেও পারেন। আর এক জন অসাধারণ মনস্বিনী মহিলার কথা উল্লেখ করিতেছি—তিনি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

ইংরাজী পদ্য সাহিত্যে কুমারী তরু দত্তের নাম সুপরিচিত। এই বাঙ্গালী বালিকা মাত্র ২১ বৎসর বয়সে পরলোক প্রয়াণ

করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ অল্পবয়সের মধ্যেই যে অমূল্য রচনা-সম্পদে ইংরাজী ভাষাকে শোভাসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবন-চরিত-লেখক ইংরাজ মনীষীই বলিয়াছেন যে, তাহার জন্য সমগ্র ইংরাজ জাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার হৃদয়-দ্রাবী মিষ্ট মধুর রচনা শেলি ও কীট-সের রচনার সহিত তুলিত হইতে পারে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও এই কুসুমকোমলা বাঙ্গালী বালিকা তরু দত্তেরই মত বালিকাবয়স হইতে অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী। তাঁহার কথা লেডী মুয়ের ম্যাকেঞ্জী এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী।

"আট বৎসর কাল আমি ভারতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। আট বৎসর ভারতের লজ্জা-নম্রা কোমলা মহিলাদের সুখ-দুঃখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মনোরাজ্যের অন্তস্তলের মোহিনী প্রতিকৃতি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। প্রজাপতিটির মত সুন্দর কোমল—স্পর্শের ভর সহে না, মিহি রেশমী ওড়নায় আচ্ছাদিত লজ্জারক্ত মুখখানি বাহিরের জগতের কঠোর দৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না,—এমন কত ভারতীয় মহিলার সহিত মিশিবার সৌভাগ্য আমি অর্জ্জন করিয়াছি। তাহাদের কুসুমপেলব করপল্লব স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছি,আমার মত বিদেশিনী নারীর স্পর্শে সে করপল্লব থর থর কাঁপিয়াছে—আমার মনে হইয়াছে, আমি বুঝি পরী-রাজ্যে উপনীত হইয়াছি।

কুমারী তরু দত্ত।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

"এক দিন অপরাহ্ণে আমি বোম্বাইয়ের প্রায় তাবৎ সম্ভ্রান্ত ভারতীয় মহিলাকে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। নিমন্ত্রিতারা আসিতেছেন, আমি বারান্দায় বসিয়া আছি, সম্মুখে অনন্তবিস্তার মহাসমুদ্রে কত জাহাজ যাইতেছে আসিতেছে, আমি সেই দিকে চাহিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই অপূর্ব্ব মিলনের কথা ভাবিতেছি. এমন সময়ে দেখিলাম, এক খানি সুন্দর ক্ষুদ্র মূর্ত্তি হাসি হাসি মুখে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে—সেই মূর্ত্তির চোখে মুখে প্রতিভার অপূর্ব্ব দীপ্তি যেন উষার অরুণরাগের আভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভাবসমুদ্রের সুমধুর তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে—সে সরোজিনী নাইডু। যখন কবি সরোজিনী তাঁহার স্বরচিত এক একটি

কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন আমি তন্ময় হইয়া গেলাম। তাঁহার মত এত সুন্দর করিয়া ভারতীয় নারীর অবরোধের কথা আমাদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই। কবির প্রাণমনোহর রচনায় তিনিই আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, এই অবরোধে পুরুষের নিষ্ঠুরতার সম্পর্ক নাই, পিতা ও স্বামী প্রেমের দ্রব্যকে সযত্নে সঙ্গোপনে পৃথিবীর ঝড়ঝাপ্টার সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিয়াছেন, ইহাই অবরোধ-প্রথা।"

আমাদের সমাজ ও দেশাচারের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা বিদেশিনী নারীর উপর এ প্রভাব বিস্তার করিতে সামান্য

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

পরীক্ষা।

প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কেবল যে অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী বঙ্গমহিলা, তাহা নহে, তিনি স্বদেশপ্রেমিকা, স্বদেশমাতা, সর্ব্বজনপূজিতা দেশকর্ম্মিণী। কেবল কর্ম্মিণী নহেন, তিনি নেত্রীও বটে। যে শিক্ষার সুযোগ, সুবিধা ও অবসর পাইয়া শ্রীমতী সরোজিনী আজ ভারতবাসীর গৌরব, সেই শিক্ষা পাইলে অন্য ভারত-মহিলাও যে সে স্থান অধিকার করিতে পারেন না, তাহা কে বলিতে পারে ?

শিক্ষা পাইলে বাঙ্গালী মহিলা তাহার কেমন পরিচয় দিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত আরও অনেক বঙ্গ-মহিলাও দেখাইয়াছেন। ইঁহারা কেবল বিদুষী নহেন, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশনেতৃত্ব করিবার শক্তিও ধারণ করেন।

যাঁহারা আমাদের ঘর-সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কর্ত্রী—যাঁহাদের ইঙ্গিতে কটাক্ষে সুবৃহৎ হিন্দু-মুসলমান-পরিবার সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয়—যাঁহারা গৃহের লক্ষ্মী, যাঁহাদের অভাবে বাঙ্গালীর গৃহ লক্ষ্মীছাড়া, তাঁহারা যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল বাতাস পাইলে রাজনীতির বিপৎসঙ্কুল তুফানে জননায়কত্বের কর্ণধারণ করিতে পারেন না, এমন মনে হয় না। আমরা মাত্র দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিব। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, শ্রীমতী কস্তূরী বাই গন্ধী, বেগম মহম্মদ আলি, মাননীয়া বাই আম্মা, শ্রীমতী স্বরূপ-রাণী নেহরু,—ইঁহাদের মধ্যে যে কেহ জন-নায়কত্ব করিবার উপযুক্ত প্রতিভার দাবী রাখেন।

সুতরাং প্রাচীনের চাঁদ সুলতানা, অহল্যা বাই বা রাণী ভবানীর মত এখনও যে ভারত-মহিলা প্রতিভার বহুবিসারী ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতার দাবী করিতে পারেন না, এমন কথা বলা যায় না। তবে কথা এই, পুরুষ এ বিষয়ে যতটা সুযোগ, সুবিধা ও অবসর পায়েন, নারী ততটা প্রাপ্ত হয়েন না, তাই পুরুষ ও নারীর এই অসমান অধিকারভোগের ব্যবস্থা।

অধিকারের সমতা ।

কিন্তু যদি এই অসমান রেখার ব্যবধান দূর করিয়া দেওয়া হয়—যদি নারীকেও সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার-লাভের সুযোগ দেওয়া হয়—তাহা হইলে তাহাতে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় কি না, তাহাই জিজ্ঞাস্য। আমাদের সমাজে—কেবল আমাদের সমাজে কেন, জগতের সকল দেশে, সকল সমাজে সৃষ্টির আদিকাল হইতে পুরুষ ও নারীর কার্য্যের ধারা পৃথক্—অধিকারও পৃথক্ বলিয়া মানিত হইয়া আসিয়াছে; পুরুষ ও নারীর আকৃতি-প্রকৃতি পৃথক্ বলিয়াই এই পৃথকত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিংবা কোনও স্বেচ্ছাচারমূলক বিধানে এই পার্থক্য অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা যায় না। ব্যবস্থাদাতা ও স্মৃতিকার সকল দেশেই পুরুষ; সুতরাং পুরুষ স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে, নিজে সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্বভার লইয়াছে এবং নারীকে সেবার ভার দিয়াছে,—এই ভাবের অভিযোগের কথা শুনা যায়। স্বার্থপর পুরুষ সকল দেশেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চার অধিকার নিজে রাখিয়া নারীকে a ministering angel thou বা সেবার স্বর্গদূত বলিয়া তোষামোদ করিয়া সকল বিষয়ে অধীন ও সেবাদাসী করিয়া রাখিয়াছে,—ইহাই চূড়ান্ত অভিযোগ।

কিন্তু সত্যই কি তাই? ইহা কি স্বার্থপর পুরুষের কৃত ব্যবস্থা? একটু ভাবিয়া দেখিলে—একটু মূল অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে, এ অভিযোগ সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। নারীর নারীত্ব হইতেও একটা বড় জিনিষ আছে—

নারীর মাতৃত্ব ।

সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে মাতৃত্বের সম্মান বড় উচ্চে। শুনিয়াছি, জগতে খৃষ্ট-ক্রোড়ে ম্যাডোনা মূর্ত্তি অথবা নন্দদুলাল-ক্রোড়ে যশোদা মূর্ত্তির মত সুন্দর মূর্ত্তি আর নাই। গণেশ-জননী গৌরী জগজ্জননী,—সে স্নেহময়ী জননী মূর্ত্তির পদতলে ভক্তি-শ্রদ্ধায় মাথা আপনি লুটাইয়া পড়ে। এ মাতৃত্বের ব্যবস্থা পুরুষ করে নাই। কিন্তু সেই মাতৃত্বের সম্পর্কে নারীর যে কয়টি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে ত সেবা-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা অনুসূচিত করে। অথচ সেই সেবায় কি অধীনতার ছাপ অঙ্কিত আছে, না নারীর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত গৌরবের ও আদরের ছাপ অঙ্কিত আছে? অন্য দেশে কি বলে জানি না, আমাদের দেশে প্রচলিত কথা এই যে, মাতৃত্ব নারীকে দেবীর আসনে উন্নীত করে। সেই মাতৃত্বের আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্য—duties and obligations নারীকে সেবাধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া প্রতিভা-বিকাশের অবসর বা সুযোগ দেয় না, এমন হইতে পারে, কিন্তু পুরুষ

স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে সেই সেবার বোঝা চাপাইয়া প্রতিভা-বিকাশের অবসর দেয় না, এ কথা কোনও রূপেই স্বীকার করা যায় না।

সেবা-ধর্ম্ম—নারীর ধর্ম্ম।

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধকালে বিশ্ববিশ্রুত কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল—যাঁহার চিত্র কবি নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের সুভদ্রার আদর্শ—স্বয়ং যাচিয়া আহত সৈনিকের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া এ যাবৎ কত শত যুদ্ধে কত নারীই না এই সেবাধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন! গত জর্ম্মণ যুদ্ধকালে বড় বড় সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ঘরের মহিলা সংসারের ভোগ-বিলাস তুচ্ছ করিয়া রণক্ষেত্রে আহতের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিভা-বিকাশের অবসরে কেহ বাধা দেয় নাই, তাঁহারা প্রাণের টানে আহত আর্ত্তের সেবায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ছুটিয়াছিলেন। **ইহা রমণীর ধর্ম্ম**—দয়া, কোমলতা, পর-সেবা, পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গের ইচ্ছা, এ সব রমণীর রক্তমাংসের সহিত বিজড়িত। এ কথা যাঁহারা না বুঝেন, তাঁহারা নারীকে জানেন না, নারীকে বুঝেন না।

বহু আহত সৈনিক হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে বলিয়াছে, নারীর কোমল হস্তস্পর্শে তাহাদের জ্বর-বিচ্ছেদ হইয়াছে, নারীর স্নেহমাখা মিষ্ট মধুর তাড়নায় তাহারা অতি তিক্ত কটু ঔষধও বিনা আপত্তিতে শিষ্ট শান্ত বালকের মত গলাধঃকরণ করিয়াছে.—এমন কি, কেবলমাত্র নারী সেবিকার মধুর দয়ার্দ্র মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকে নবজীবনী শক্তি লাভ করিয়াছে। নারীর এ প্রভাব কত বড় গৌরবের, কত বড় মহত্ত্বের পরিচায়ক, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। দুষ্ট স্বার্থান্ধ পুরুষ নারীর প্রতিভা দাবিয়া রাখিবার নিমিত্ত নারীর হৃদয়ে এই অমূল্য সেবা-ধর্ম্মের ভাব জাগাইয়া দেয় নাই, উহা নারী-হৃদয়ে সুধা-প্রস্রবণের ন্যায় স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে—জগতের অন্তকাল পর্য্যন্ত উৎসারিত থাকিবে।

বাহিরের ঝড়-ঝাপ্‌টা।

বাহিরের ধূলিমলিন ঝড়ঝাপ্টা হইতে নারী সযত্নে রক্ষিতা হয়েন বলিয়াই যে তিনি পরাধীনা, এমন নহে। এই ধূলি-মলিন পাপপঙ্কিল কঠোর জগতের সংস্পর্শে নারী যত অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন, ততই সংসারের কঠোরতা আরও ভীষণাকার ধারণ করিতেছে। অন্ততঃ নারীর সমান অধিকারের সর্ব্বপ্রধান দাবীদার মার্কিণের বহু লেখকের রচনায় এই ধারণা ফুটিয়া উঠিতেছে। কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে নারী শান্তিদায়িনী—রসহীন সাহারার অনন্ত-বিস্তার বালুকারাশির মধ্যে সুজল সুফল ছায়াশীতল ওয়েশিস; সুতরাং তাঁহাকে কঠোরতার দুর্দ্দান্ত প্রতিযোগিতা হইতে দূরে রাখিয়া পুরুষ স্বয়ং কঠোরতার সমস্ত বোঝা মাথা পাতিয়া ধারণ করিয়াছে,—এই ভাবটা সকল দেশে সকল সময়েই মানুষের চিন্তার ধারার সহিত জড়ান মাখান আছে। শক্তিরূপিণী মাতৃজাতি নারী যে ভার-সহনে অক্ষমতাহেতু এইরূপ হইয়াছেন, এমন কথা বলিতেছি না। নারী নানা ক্ষেত্রে পুরুষের সহধর্ম্মিণী, পত্নীরূপে সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী—সংসারের ঝড়ঝাপ্টায় তাঁহারও অধিকার আছে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা সংসারের কঠোরতার মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা অধিক চরিত্রের দৃঢ়তা, অদ্ভুত আত্মত্যাগ এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়াছেন। সকল দেশের দরিদ্র অথবা নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী, পুরুষের মত সংসার-পরিচালনের জন্য পরিশ্রম করে—ব্রহ্মদেশে নারীই সংসার-সংগ্রামে উপজীবিকা অর্জ্জন করে, পুরুষ বসিয়া খায়। প্রাচ্যের কোনও কোনও জাতির এবং মিশর ও তুর্কীর মধ্যবিত্ত বা সম্পদ্‌সম্পন্ন গৃহস্থের নারী সংসারের ঝটিকাবর্ত্ত হইতে দূরে রক্ষিত। য়ুরোপ ও মার্কিণে এখন মধ্যবিত্ত সংসারের রমণী পুরুষের মত অন্নসংস্থান করিয়া থাকে।

মাতৃত্বের গৌরব

এ সকল কথা সত্য। তাহা হইলেও উহার মধ্যে একটু কিন্তু আছে। নারীর যে মাতৃত্ব-গৌরব শ্রেষ্ঠ ভূষণ, সেই মাতৃত্বের দাবীতে নারীর সেবাধর্ম্মই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ, অবকাশ ও অবসরসাপেক্ষ। ইহা পুরুষের কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা নহে, ইহা নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নারী-চরিত্রে ইহা অস্থি-মজ্জাগত। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইব—

মিসেস হেনরী উডের 'ইষ্টলিন' উপন্যাস সকলেই পাঠ করিয়াছেন। লেডী ইসাবেল এই উপন্যাসের প্রধানা নায়িকা; বস্তুতঃ তাঁহার চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থের

অন্যান্য চরিত্র চলে ফিরে, হাসে কাঁদে। লেডী ইসাবেল শিক্ষিতা সম্ভ্রান্তা কোমলা স্নেহপ্রবণা রমণী। তিনি পাপের প্রলোভন এড়াইতে পারেন নাই, গৃহত্যাগিনী হইয়াছিলেন; কিন্তু বংশগত শিক্ষা-দীক্ষা পাপ-সহবাসেও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই যখন পাপিষ্ঠ সার ফ্রান্সিস লেভিসন তাঁহাকে পাপের আর এক নিম্নস্তরে নামাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তখন পাপিনী হইয়াও তিনি নারীত্ব মর্য্যাদাজ্ঞানে দীপ্ত হইয়া সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন,—"I am Lord Mount Severn's daughter." কিন্তু এই নারীত্ব মর্য্যাদাজ্ঞানগর্ব্বদৃপ্তা রমণীও **মাতৃত্ব-গৌরবকে নারীত্ব-মর্য্যাদাজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন।** যখন এই কুলত্যাগিনী স্নেহময়ী রমণীর স্নেহপ্রবণ প্রাণ পুত্রকন্যার জন্য কাঁদিয়া উঠিল, তখন তিনি হৃদিতন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেলেও নারীত্ব-মর্য্যাদা ও আত্মসম্মানকে বলি দিয়া মাতৃত্বের দাবীর ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন—পরিত্যক্ত পতিগৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন—কেবল **পুত্রকন্যাকে দেখিবার আশায়।** নারীর ৩২ নাড়ীর টান এই স্থানে। লজ্জা, ভয়, মান, কিছুই জ্ঞান থাকে না—মাতৃত্বের দাবী এমনই প্রবল। পুত্রকন্যাকে **মায়ের সেবা দিবার জন্য** তাঁহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল—সে চুম্বকের টান তিনি এড়াইতে পারেন নাই।

আর এক দিক্ দিয়া আর একটা দৃষ্টান্ত দিব। পতিগত-প্রাণা সাধ্বী ভ্রমরকে যখন পাপিষ্ঠ গোবিন্দলাল ত্যাগ করিল, তখন ভ্রমর স্বামীকে গুরুগম্ভীর দুই চারিটা কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া শেষ বিদায় লইয়া আসিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল, "ওরে সোনার খোকা! তুই কোথা গেলি রে! আমি কালো, আমায় ত্যাগ করিল, তোকে ত ত্যাগ করিতে পারিত না।" ভ্রমরের একটি খোকা হইয়া মুকুলেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই এই বিনাইয়া কাঁদা। এই যে মাতৃত্বের দাবী দিয়া স্বামীর উপর অভিমান প্রকাশ (বাঙ্গালা কথায় ঝালঝাড়া), ইহা কি চমৎকার! অসাধারণ মেধাবী বঙ্কিমচন্দ্র নারী-চরিত্রের এই অপূর্ব্ব সুন্দর মধুময় দিকটি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া এমনভাবে তাঁহার নিপুণ তুলিকায় এই চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহা হইলে দেখুন, মাতৃত্বের পরম গৌরবোজ্জ্বল অধিকারের দাবী নারীর অস্থিমজ্জাগত কি না। ভ্রমর নিজের রূপের জোরে স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিবার স্পর্দ্ধা করে নাই, সে নিজের গুণের দাবীতেও স্বামীকে ধরিয়া রাখিবার স্পর্দ্ধা করে নাই; **কিন্তু দাবী করিয়াছিল মাতৃত্বের।**

বলিতে পারেন, ভ্রমর অশিক্ষিতা হিন্দুকুলবধূ, তাহার নিকট মাতৃত্বই সব, নারীত্ব কিছু নহে। কিন্তু শকুন্তলা ত অশিক্ষিতা ছিলেন না। তাঁহার পদ্মপত্রে কবিতা-রচনা, রাজার সহিত বাক্যালাপ, রাজসভায় রাজাকে ভর্ৎসনা,—সবই তাঁহার সুশিক্ষার পরিচয় প্রদান করে। অথচ এই সুশিক্ষিতা শকুন্তলাও রাজা দুষ্মন্তকে ভর্ৎসনাকালে বলিয়াছিলেন,—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" পুরুষ পুত্ররূপে জায়া-গর্ভে জাত হয়েন, অতএব তুমি আমার অবমাননা করিও না। এখানেও শকুন্তলা **মাতৃত্বের দাবী দিয়া** রাজার চৈতন্য উৎপাদন করিতেছেন।

একটা গল্প মনে পড়িল। এক অশীতিপর বৃদ্ধের গঙ্গাযাত্রা করান হইতেছে। বৃদ্ধের পুত্রপৌত্রাদি তাঁহাকে খট্টায় শয়ান করাইয়া গঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করিতে ভূমি হইতে খট্টা উত্তোলন করিয়াছে, কেহ নাম শুনাইতেছে, কেহ বলিতেছে, "আহা, পুণ্যের শরীর! কি চমৎকার গেলেন!" ইত্যাদি। হঠাৎ বৃদ্ধ ক্ষীণস্বরে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেখো, বাবা, যেন মিত্তিরদের নামে ২নং মামলাজারিতে গাফিলি না হয়। আর ঐ ভট্‌চায্যিদের বাড়ী যে কটা ধান দাদন দেওয়া আছে, তা এবার উশুল কর্‌তেই হবে।" পুত্র দুঃখিত হইয়া বলিল, "থাক্, ওর জন্যে এখন ভাবতে হবে না, এখন পরকালের কাজ করুন—" বৃদ্ধ কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, "বাপ রে, তাও কি হয়। পরকালে গিয়ে যে তা হ'লে ঘুম হবে না।"

স্নেহপ্রবণা নারীর সন্তানের প্রতি এমনই টানের কথা কত শুনা যায়। নারী সকল কর্ত্তব্য ফেলিয়া সন্তানের সেবা অগ্রে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, স্বয়ং শরীরের অযত্ন করিয়া সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে যত্নবতী হয়েন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এমন দেখা গিয়াছে, নারী সন্তানের জন্য প্রাণদানও করিয়াছেন। সুতরাং মাতৃত্বই যে নারীর প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহা তাঁহার স্বভাবই বুঝাইয়া দেয়।

কেবল সন্তানের জন্য নহে, নারী (গৃহিণী) স্বামীর জন্য, আত্মীয়-পরিজনের জন্য, পোষ্যকুটুম্বগণের জন্য কি অসাধারণ

সহিষ্ণুভাবে সেবাধর্ম্ম পালন করেন, তাহা সংসারী মাত্রেই বিলক্ষণ বুঝেন। আমাদের দেশে গৃহিণী ভৃত্য, পরিজন ও অতিথি-আগন্তুককে না খাওয়াইয়া নিজে খাদ্য স্পর্শ করেন না, এ কথা কে না জানে? এই সেবার জন্য নারীর জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়। গৃহদেবতার পূজা ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও নিত্য-কর্ম্ম পালনেও কতকটা সময় ক্ষেপণ হয়। ইহার মধ্যে অবসর করিয়া লইয়া নারী মানসিক বৃত্তির অনুশীলনে মনোভিনিবেশ করিতে পারেন।

প্রতীচ্যে কি হয়?

অনেকে বলিবেন, মাতৃত্বের দাবী এ দেশে যতটুকু, প্রতীচ্যে তত নাই। আমরা বলিব, মাতৃত্বের দাবী সর্ব্বত্রই সমান, তবে সেবা-ধর্ম্ম পালনে ইতর-বিশেষ আছে বটে। বিলাতের দৃষ্টান্ত দিই। সেখানে 'হাজিফ' (Housewife) গৃহিণীকে (মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঘরের) সংসারের আহার-বিহারের সকল ব্যবস্থাই করিতে হয়। একাধারে তিনি রাঁধুনী, দাসী, ধোপানী, মেথরাণী, দরজী ইত্যাদি। সেবাধর্ম্মে এখানে কে কম কে বেশী বলা দায়। তবে সে দেশের প্রথামত রোগ হইলে পরিবারভুক্ত লোককে (যথা স্বামী পুত্রকে) হাঁসপাতালে পাঠান—বড়মানুষের ঘরের হইলে এক ঘণ্টা হাঁসপাতালে স্বামীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সংবাদপত্রে সেই খবর লেখান, পুত্রের বিবাহ হইলে পুত্রপুত্রবধূকে নিজের সংসার পাতাইতে পাঠাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি ব্যাপারে সেবাধর্ম্মের অভাব দেখা যায় বটে। সে অভাবের ফলে অবসরের অপেক্ষাকৃত অধিক সুযোগ ঘটে। বিশেষতঃ প্রতীচ্যে নারী অধিক বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে শিক্ষার সুযোগ পাইয়া থাকেন। পরন্তু সমাজে মিশামিশির ফলে অভিজ্ঞতালাভেরও কতকটা সুযোগ ঘটে। এই সকল পারিপার্শ্বিক কারণে প্রতীচ্যে নারী শিক্ষার অধিক সুযোগ পাইয়া থাকেন।

ইহার ফল কি?

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে প্রতীচ্যের নারীর বহু কুসংস্কার এবং সামাজিক ও পারিবারিক আবর্জ্জনা দূর হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নৈতিক উন্নতি সমপর্য্যায়ে সাধিত হয়, এমন কথা বলিতে পারি না। লণ্ডন গ্রামসের অথবা বস্তীর বালক-বালিকা অথবা বয়স্ক নর-নারী আমাদের দেশের ঐ শ্রেণীর নর-নারী অপেক্ষা শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে; কিন্তু তুলনায় সমালোচনা করিলে কাহার নৈতিক চরিত্র ও ধর্ম্মজ্ঞান অধিক প্রশংসনীয়, তাহা উভয় দেশের সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতিতে জানা যায়। এ দেশের সরকার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও য়ুরোপীয়ান সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যে চরিত্রগত রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতেও উহার আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব যে চরিত্রোৎকর্ষহীনতার মূল, এমন কথা স্বীকার করা যায় না।

এ সম্বন্ধে এক বিশিষ্টা প্রতীচ্য নারীর অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। লেখিকা আমাদের পূর্ব্ববর্ণিতা লেডী মূয়ের ম্যাকেঞ্জী। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারীকে তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলিতেছেন:—

"যদিও আমি ভারতীয় নারীকে শান্ত, কোমল ও লজ্জা-বিজড়িত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তথাপি আমি তাঁহাদের তেজোব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব (strong personality) স্বীকার না করিয়া পারি না। বহুকাল আচরিত দেশাচার অনুসারে তাঁহাদের দৃষ্টি স্বীয় পরিবার, স্বামী ও পুত্র-কন্যার উপর নিবদ্ধ হয়; ফলে বহু প্রতীচ্যের নারী অপেক্ষা তাঁহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও গভীরতা পরিলক্ষিত হয়। আমরা নানা বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলি—বিসর্পিত করিয়া ফেলি। এই আত্মিক শক্তিক্ষয়ের ফলে আমাদের মধ্যে অনেকে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের কবলগত হইয়া পড়েন, হিন্দু-মহিলা যে শান্তির, যে তৃপ্তির, যে মিলন-সুখের (harmony) রসাস্বাদনে অধিকারিণী হইয়া থাকেন, আমরা উহা হইতে বঞ্চিত হই। তাহার উপর তাঁহারা পরম ধর্ম্মপ্রবণা (intensely religious) এবং যখন তাঁহারা বিবাহিতা হয়েন, তখন আমাদের খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীরা (nuns) যেমন অবগুণ্ঠন গ্রহণ করেন—বাহিরের পৃথিবীর সুখ-দুঃখ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তেমনই বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখকেই নূতন জীবনের সার বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহারা নিজের সুখ, নিজের আনন্দ গ্রাহ্য করেন না, পরিবারের লোককে সুখী ও আনন্দিত করিতে পারিলেই তাঁহারা কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল বলিয়া মনে করেন।"

এই যে প্রাচ্য নারীর শান্তি ও তৃপ্তির নিমিত্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা, প্রতীচ্যের নারীর জীবনের রহস্য ইহাতেই উদ্ঘাটিত

হয়। শিক্ষাই বলুন, অভিজ্ঞতাই বলুন, আর যাহাই বলুন, মনের শান্তি ও তৃপ্তির নিকট কিছুই নাই। যদি প্রতীচ্যের নারী শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এই শান্তি ও তৃপ্তির জন্য হা-হুতাশ করেন, তবে সেই শিক্ষা সুফলপ্রদ হইয়াছে, কিরূপে বলা যাইতে পারে? তবেই কি বুঝিতে হইবে না যে, নারীত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মাতৃত্বের যে প্রধান উপকরণ সেবা-ধর্ম্ম, সেই **সেবা-ধর্ম্ম পালনেই তৃপ্তি ও শান্তি এবং উহার অভাবেই বুক-জোড়া অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার হাহাকার, অশান্তি ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের উৎপাত?**

প্রতীচ্যের শিক্ষিতা বিদুষী মহিলা মোটর চড়েন, মজলিসে যায়েন, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখেন, রোমান্স পড়েন, নিত্য নূতন ফ্যাসানমত সাজপোষাকে সাজিয়া থাকেন,—তথাপি একটার পর একটা নূতন sensation বা হুজুগও ত তাঁহার মনে তৃপ্তি আনিয়া দিতে পারে না, বরং 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব' আকাঙ্ক্ষার অনল আরও বাড়াইয়া দেয়! সর্ব্বাপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতায় অধিক আলোকিত মার্কিণের fast womenরা ত নিত্য নূতন sensation না পাইয়া জল-ছাড়া সফরীর মত হাঁপাইয়া উঠেন। **ইহা প্রকৃত শিক্ষার ফল নহে,** ইহাকে আমরা শিক্ষা বলিতে পারি না। এ শিক্ষায় জীবন-সংগ্রামে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতাপরীক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে। সে আকাঙ্ক্ষা নিন্দনীয়, এমন কথা বলিতেছি না, তবে সে শিক্ষা যে প্রকৃত শিক্ষা নহে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। **যে শিক্ষায় নারীর মাতৃত্বের প্রধান উপকরণ সেবা-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নারীকে** পুরুষের যথার্থ সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী জীবনসঙ্গিনী করিয়া গড়িয়া তুলে, উহাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলি, এবং সে শিক্ষালাভের নিমিত্ত সেবা-ধর্ম্ম পালনের পর অবসরমত সকল নারীকেই যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য। কেবল নারী যত্নবতী হইলে হইবে না, পুরুষকেও নারীর সেই শিক্ষায় সর্ব্বতোভাবে সহায়ক, বন্ধু ও উপদেষ্টা হইতে হইবে। সেই শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া নারী যদি পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে ত আনন্দের কথা। উহাতে সংসারের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল, দেশের মঙ্গল নিশ্চিতই সাধিত হইবে।

সেই শিক্ষার স্বরূপ কি?

নারীত্ব ও মাতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন আছে, এ কথা এ দেশে কখনও অস্বীকৃত হয় নাই। প্রাচীন আর্য্য পুরাণ-কথায় নারী-চরিত্র চিত্রাঙ্কণে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি কেবল উহা হইতে সাবিত্রীর উপাখ্যান উপহার দিতেছি:—

সাবিত্রী দেবীর বরে রাজা অশ্বপতির সর্ব্বসুলক্ষণা এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। রাজা তাঁহার নামকরণ করিলেন সাবিত্রী। ক্রমে তাঁহার যৌবনকাল উপস্থিত হইলে সেই রূপগুণযুতা তেজঃপুঞ্জকলেবরা কন্যাকে দেখিয়া কেহ তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইতে সাহসী হইলেন না। রাজা স্বয়ং বলিলেন, "মা! তোমার সম্প্রদান-কাল উপস্থিত, অথচ কেহ তোমায় বরণ করিতে সাহসী হইতেছে না, আমার নিকট তোমায় প্রার্থনাও করিতেছে না। অতএব তুমি স্বয়ং তোমার গুণসদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর, তোমায় অনুমতি দিলাম।"

এখানে কয়টি কথা বিশেষ লক্ষ্য করিবার। বিবাহ হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে প্রধান ধর্ম্ম-কার্য্য। এমন গুরু কার্য্যের ভার রাজা কন্যার উপর অর্পণ করিলেন কেন? সাবিত্রী যৌবনশালিনী এবং শিক্ষিতা, তাঁহার ভালমন্দের বিচারশক্তি জন্মিয়াছিল। তাই রাজা এই ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিলেন। তাহার পর রাজা আদেশ দিলেন, গুণসদৃশ পতি অন্বেষণ কর। রাজা জানিতেন, "কন্যা বরয়তে রূপম্।" অথচ বলিলেন, গুণসদৃশ পতি গ্রহণ কর। অর্থাৎ হে সাবিত্রি! তোমার যেমন গুণরাশি বিদ্যমান, তুমি যেমন আচার, বিনয়, বিদ্যা, কুলশীলাদিতে সম্পন্না ও শিক্ষিতা, সেইরূপ বিদ্বান্, শিক্ষিত, কুলশীলসম্পন্ন পতি নির্ব্বাচন কর।

তাহার পর গল্পে আছে, সাবিত্রী নানা দেশ পর্য্যটনের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র সত্যবান্ই তাঁহার মনোনীত পতি। নারদ ঋষি গণনা করিয়া বলিলেন, এক বৎসর পূর্ণ হইলে সত্যবানের মৃত্যুযোগ আছে। রাজা সেই ভীষণ কথা শুনিয়া সাবিত্রীকে অন্য পতি নির্ব্বাচন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী বলিলেন,—

"অংশ অর্থাৎ পৈতৃক বিষয়ের বিভাগ নির্ণয় করে গুটি, সেই গুটি একবার হস্তচ্যুত হইলে আর ফিরে না। লোক কন্যাকে একবার প্রদান করে, 'দান করিলাম' এ কথাও একবার বলে,—এই তিন বিষয় একবারই হইয়া থাকে।"

সাবিত্রী অংশ অর্থাৎ পৈতৃক বিষয়ের ভাগ নির্ণয় করার গুটি ফেলার কথা, পরন্তু কন্যাকে একবার সম্প্রদানের কথা জানিতেন। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন, কেন না, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে এ কথা জানা যায় না। সীতা যেমন রামায়ণে বার বার বলিয়াছেন, "আমি ঋষিদের মুখে শুনিয়াছি," "আমি গুরু-পরিজনদের মুখে শুনিয়াছি," সেই ভাবে সাবিত্রী শিক্ষিতা হইয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, তিনি পুঁথির তাড়া বগলে করিয়া মোটর 'বাসে' কালেজে যায়েন নাই। না গেলেও যে শিক্ষা সম্পন্ন হয় না, এমন কথা বলিতে পারি না।

শিক্ষা যে ভাবেই হউক, সফল হইলেই শিক্ষা। বর্ত্তমানে সে ভাবে ঋষি-তপস্বী, গুরু-পুরোহিত, অথবা পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের নিকট অথবা কথকতা, রামায়ণগান শ্রবণে শিক্ষা পাইবার অসুবিধা হইয়াছে, এ কথা সত্য; কিন্তু সে জন্য বর্ত্তমান-কালোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য কি না, বিবেচ্য। আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, নারীর শিক্ষাদান কি ভাবে হইলে নারীত্ব ও মাতৃত্ব আমাদের সভ্যতানুযায়ী গড়িয়া উঠিবে? আমাদের কথা, যে ভাবে নারীত্ব ও মাতৃত্বের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এ দেশে নারীকে শিক্ষিত করা হইয়াছে, সেই ভাবে নারীর শিক্ষাব্যাপারকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। হইতে পারে, কালে তাহা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা কালের দোষ, শিক্ষার নহে। যাহাতে সেই শিক্ষাকে কালোপযোগী করিয়া নারী-চরিত্র গঠনে আমরা সফলকাম হই, এখন আমাদের উহাই করা কর্ত্তব্য।

আধুনিক কালে প্রতীচ্যের অনুকরণে প্রাচ্যেও নারীকে কালেজী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা মন্দ, এমন কথা বলিতেছি না। তবে ইহাতেই যে নারীর প্রকৃত শিক্ষালাভ হয়, তাহা স্বীকার করি না। পুঁথির তাড়া বগলে মোটর-'বাসে' চড়িয়া কালেজে গেলে—নানা শ্রেণীর শিক্ষার্থিনীর সহিত মিলা-মিশা করিলে—ব্যায়াম ও খেলা-ধূলায় যোগদান করিলে নারীর ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভ হয়, নারী কর্ম্মকুশল, ক্ষিপ্রগতি, সপ্রতিভ ও স্বাবলম্বী হয়, এ কথায় সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু নারী উহাতে প্রকৃত শিক্ষালাভ করে অথবা সুস্থ ও সবল হইয়া সংসার-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। আমাদের কথা নহে, প্রতীচ্যের কোনও সমাজতত্ত্বজ্ঞ খ্যাতনামা লেখক প্রাচীন ও আধুনিক কালের নারীর তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—

"She (the Victorian woman) was not an athlete but so far as endurance goes her granddaughter (the Modern Woman) cuts a poor figure beside her. To begin with, grandmother had no nerves. She did not know what the word meant. If you had talked before her of a 'rest cure', you might just as well have been talking Chinese."

অর্থাৎ তখনকার (প্রাচীন কালের) নারী ব্যায়ামাদি আধুনিক শিক্ষা পাইতেন না বটে, কিন্তু আধুনিক নারীর মত কথায় কথায় মূর্চ্ছা যাইতেন না, তাঁহাদের সহ্য করিবার ক্ষমতা অত্যধিক ছিল।

লেখক আরও একটা কথা বলিয়াছেন,—

"And when grandmother married in her teens or early twenties, she looked forward with perfect equanimity to the beating of a round dozen of children. That her descen dant, with all the alleviation of modern science, thinks differently, is the complaint of patriotic publicists."

অর্থাৎ প্রাচীন কালের (ভিক্টোরিয়া যুগের) নারীরা অল্পবয়সে বিবাহ করিতেন এবং বহু সন্তান-জননী হইবার আশা পোষণ করিতেন; উহাতে তাঁহারা কখনও ভীত হইতেন না। কিন্তু আধুনিক নারী সন্তান প্রসব করিবার কথা ভাবিয়া বিবাহ করিতে চাহেন না; অথচ এখন বিজ্ঞান প্রসব-যন্ত্রণাকে কত লঘু করিয়া ফেলিয়াছে! দেশ-প্রেমিক লেখকগণ বর্ত্তমান নারীর এই সন্তানধারণে বিতৃষ্ণা দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তীব্র অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

বুঝিয়া দেখুন, যে শিক্ষায় নারীকে মাতৃত্বের ভয়ে ভীত হইতে হয়, সেই শিক্ষাকে কিরূপে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

এ দেশের প্রসূতি।

অল্পদিন পূর্ব্বে একখানি বিজ্ঞাপন কোন সূত্রে অন্তঃপুরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে লিখিত ছিল, "ঔষধ ও পথ্যের অভাবে বাঙ্গালা দেশে প্রতি বৎসর তিন লক্ষ শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে।" এই মৃত্যু নিবারণের জন্য রেডক্রস সমিতির শিশু-মঙ্গল বিভাগ কলিকাতায় একটি সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় দরিদ্র শিশু ও প্রসূতিদিগকে দুগ্ধ দেওয়া হইবে এবং তাহাদের চিকিৎসাও করা হইবে।

বিজ্ঞাপনখানি পাঠ করিয়া লজ্জানুভব করিলাম। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর নিবারণসাপেক্ষ শিশুমৃত্যুসংখ্যা তিন লক্ষ, আর তাহার প্রতীকারের জন্য যে সমিতি উপায় করিতেছেন, সে সমিতি বিদেশীদিগের দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ আমাদের জাতীয় ক্ষতি নিবারণের চেষ্টাও বিদেশীরা করিতেছেন—আর আমরা অনায়াসে নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া আছি! এই আমরাই আজকাল বলি—কাপড়ের জন্য আমরা আর বিদেশীর উপর নির্ভর করিব না; আপনারা চরকা কাটিয়া যে সূতা প্রস্তুত করিব, তাহাতেই হাতের তাঁতে আমাদের কাপড় বুনা হইবে! কেহ হয় ত আমাদের দারিদ্র্যের দোহাই দিয়া আমাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা ঢাকিতে চাহিবেন—আমরা দরিদ্র, আমরা এ সব কায করিব কেমন করিয়া? তাঁহারা কেবল আত্মবঞ্চনা করেন। কারণ, এই যে টাকা, ইহা বিদেশী সমিতির বিদেশী পরিচালকরা বিদেশ হইতে আনিবেন না—এ দেশে এ দেশের লোকের কাছ হইতেই সংগ্রহ করিবেন। তবে "গাঁয়ের ফকির ভিক্ষা পায় না"—বিদেশীরা না চাহিলে আমাদের দেশের এই সব লোকের টাকা বাহির হয় না। ইহা আমাদের আরও লজ্জার কথা।

বিজ্ঞাপনে মোটামুটি বলা হইয়াছে, বাঙ্গালায় বৎসরে তিন লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয়। গত-পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, বৎসরে বাঙ্গালায় ১৬ লক্ষ ৪১ হাজার ১শত ১১ জন লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৭ শত ৬৫ জনের বয়স ১০ বৎসরের কম এবং ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩ শত ৭০টি শিশু বৎসর না পুরিতেই জননীর বুক খালি করিয়া—গৃহ নিরানন্দ করিয়া চলিয়া যায়। এক কলিকাতায় সে বৎসর ৬ হাজার শিশুর মৃত্যু হয়—প্রতিদিন ১৬টি শিশুর মৃত্যু হয় এবং সে ১৬টির মধ্যে ১৪টির মৃত্যুর কারণ গৃহস্থের ও ধাত্রী প্রভৃতির অজ্ঞতা। এ বিষয়ে আবার মুসলমানদিগের দুর্দ্দশা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কলিকাতায় মুসলমানদিগের শতকরা ৭৫টি শিশুর মৃত্যু হয়। শিশু-মৃত্যুর এই আধিক্যে জাতির যে অপকার হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া সামাজিকগণ ইহার প্রতীকার-চেষ্টা যে করেন না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয় ও লজ্জার কথা। যাঁহারা রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য ব্যাকুল ও সে জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতেছেন, তাঁহারা যে জাতির এই অপকারের দিকে দৃষ্টি দেন না, ইহার কারণ কি?

এই মৃত্যুর কারণ কি?—অস্বাস্থ্যকর স্থান, অল্প ও অপুষ্টিকর আহার, আবরণের অল্পতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ধাত্রীর দোষ, প্রসবের পূর্ব্বে প্রসূতির যত্নের অভাব, জননীর শিশুপালনে অজ্ঞতা—ইত্যাদি। দারিদ্র্য যে স্থানে স্থানে সূতিকাগারের অস্বাস্থ্যকরতার এবং আহারের ও আবরণের অল্পতার কারণ, তাহা স্বীকার করিলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, অজ্ঞতা, অবহেলা ও কুসংস্কার এ অবস্থার জন্য বিশেষ দায়ী।

ধাত্রীদিগকে ও জননীদিগকে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের উপযোগিতা প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছিল। তখন সেই জন্য যদু বাবুর 'ধাত্রীশিক্ষা' ও গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর 'মাতৃশিক্ষা' সরল ভাষায় রচিত ও প্রচারিত হয়। একান্ত পরিতাপের বিষয়, ৫০ বৎসর পরে আজ দেশের লোক রাজনীতিক আন্দোলনে যত ব্যস্ত—এ দিকে তত মনোযোগী নহেন।

শ্বশুরবাড়ীতে যে অনেক সময় প্রসূতির আবশ্যক সেবা-শুশ্রূষা হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। এ জন্য দায়ী;—সমাজ। মেয়ে জন্মগ্রহণ করিলেই বাড়ীর লোকের মুখ অন্ধকার হয়, মা আপনাকে নিতান্ত অপরাধী মনে করেন। তাহার পর মেয়ের অসুখে বাড়ীর লোক বলেন, "এ মেয়ে—মরিবে না।" সে যে অনাদরের, সেই বিশ্বাস বাল্যকাল হইতে বালিকার মনে বদ্ধমূল হয়। তাহার পর শ্বশুরবাড়ীতে সে "পরের মেয়ে।" অধিকাংশ গৃহেই শাশুড়ী মা নহেন—শাশুড়ী মাত্র। সেই জন্য প্রসবের পূর্ব্বে জননীর দেহ দুর্ব্বল হয় এবং ফলে শিশুও দুর্ব্বল হয়। এই দৌর্ব্বল্যই অনেক শিশুর অকালমৃত্যুর কারণ এবং এই দৌর্ব্বল্য হইতেই অনেক প্রসূতির দেহে ক্ষয়রোগ আশ্রয় লাভ করে।

আমাদের সব অবজ্ঞা ও কুসংস্কার সূতিকা-ঘরে ফুটিয়া উঠে। দরিদ্রের ঘরের অভাব—কিন্তু ধনীর বাড়ীতেও সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘরটিই আঁতুড় ঘরের জন্য ব্যবহৃত হয়—পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে উঠানে, আঁস্তাকুড়ের কাছে দরমাঘেরা ঘরই এই জন্য ব্যবহৃত হইত—এখনও হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে যে এক হাজার ৭শত ৯১টি শিশু জন্মিবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে মারা গিয়াছিল, তাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী—আঁতুড় ঘর; ঘরের মেঝে সেঁতসেঁতে—ঘরে বাতাস চলাচলের পথ অতি অল্প—রৌদ্র সে ঘরে উঁকি মারিতেও পায় না। যে স্থানে উঠানে আঁতুড় ঘর বাঁধা হয়, সে স্থানে বর্ষাকালে অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রসূতি অশুচি—তাই বাড়ীর লোক তাহাকে স্পর্শ করে না। আঁতুড়ের বিছানা ফেলিয়া দেওয়া রীতি—তাই যত মলিন ছিন্ন শয্যাদ্রব্য আঁতুড়ে ব্যবহৃত হয়। অথচ আঁতুড় ঘরেই পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। আমি দেখিয়াছি, কোন শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে প্রসূতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়াও কেহ তাহাকে ধরিতে যায় নাই—সকলেই আঁতুড়ের ঝিকে ডাকিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছে।

এই কলিকাতায় কোন ইহুদী ডাক্তার মহিলা আমাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। কলিকাতার কোন অতি প্রসিদ্ধ—কোটিপতি মাড়োয়ারীর বাড়ীতে তাঁহাকে প্রসব করাইবার জন্য ডাকা হয়। তিনি যাইয়া দেখেন, মেঝেয় একখানা ময়লা ছেঁড়া চাদর মোড়া বিছানায় প্রসূতি শুইয়া আছে। বিছানাটি চমৎকার—মেঝের উপর পুরু করিয়া ছাই ঢালিয়া তাহারই উপর চাদর বিছান! প্রসবের পর তিনি চাহিয়াও একখানা ফরশা কাপড় পাইলেন না। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তিনি আফিসঘরে বাড়ীর কর্ত্তার কাছে যাইয়া বলিলেন, "আপনি কি মানুষ খুন করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছেন?" সেখানে অন্য লোক ছিল। কর্ত্তা লজ্জিত হইয়া অন্দরে আসিলেন এবং তিনি কাপড়ের আলমারী খুলিলেই ডাক্তার কয়খানা ফরশা কাপড় টানিয়া লইলেন। তিনি আঁতুড় হইতে আসিয়া কাপড়ের আলমারী ছুঁইয়া দিলেন বলিয়া বাড়ীর মেয়েরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চেঁচাইতে লাগিল। বাড়ীর কর্ত্তার ইংরাজ সমাজেও গতায়াত আছে—তিনি সরকারের কাছে 'খেতাবও পাইয়াছেন। কাযেই এমন কথা বলা যায় না যে, দারিদ্র্যই সকল স্থানে আঁতুর ঘরের ও প্রসব-ব্যবস্থার অব্যবস্থার জন্য দায়ী।

আবার যে ঘরে বিশুদ্ধ বাতাসের অত্যধিক প্রয়োজন, সেই ঘরে দিন-রাত্রি অগ্নি রাখা হয়। তাহাতে কেবল যে বায়ু দূষিত হয়, তাহাই নহে; পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধূমে শ্বাস-কষ্ট অনুভূত হয়। তাপ নহিলে নাকি প্রসূতির ও প্রসূতের শ্লেষ্মা যাইবে না! শিশুকে স্নান করাইবার নামে গৃহিণীরা শিহরিয়া উঠেন। তাপটি তাঁহারা ছেলের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া বিবেচনা করেন। তাই আঁতুড় ঘর হইতে প্রসূতি বাহিরে আসিলে শিশুকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে দেওয়া হয়। গল্প আছে, এক জন য়ুরোপীয় সওদাগর ভাবিয়া পাইতেন না, গরমের দিনে যখন খসখসের ভিজান পর্দ্দা-টাঙ্গান ঘরে টানাপাখার নিম্নে বসিয়াও তিনি কষ্টভোগ করেন, তখন সরকাররা কেমন করিয়া রৌদ্রে ঘুরিয়া কায করে। এক দিন কাযে তিনি দেশীপাড়ায় যাইয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন—ছেলেদের তেল মাখাইয়া পিঁড়ির উপর রৌদ্রে রাখা হইয়াছে। তাঁহার মনে হয়, ভবিষ্যতে সরকার করিবার জন্যই ছেলেগুলিকে রৌদ্র অভ্যাস করান হইতেছে। আফিসে যাইয়া তিনি মুৎসুদ্দীকে বলিয়াছিলেন, "হাম দেখা, কেইসা সরকার বানাতা।" শিশু-মৃত্যুর কারণ, বোধ করি, আর একটি এই আগুনের সেঁক। প্রথম হইতে যদি ঘরের দ্বার-জানালা খুলিয়া রাখা হয়, তবে শিশুর ঠাণ্ডা সহ্য করিবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়—সহসা ঠাণ্ডা লাগিয়া সে অসুস্থ হয় না এবং খোলা যায়গায়—বাতাসে থাকিলে তাহার যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া যায়। অথচ এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার এবং উপদেশ দিলে সে উপদেশ অনুসারে কায করিবার প্রবৃত্তি আমাদের সমাজে অল্পই লক্ষিত হয়। তাহার একমাত্র কারণ—অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। আর এই অজ্ঞতার ও কুসংস্কারের জন্যই আমাদের দেশে আঁতুড়ঘর অনেক ক্ষেত্রে যমালয় হয়—সূতিকাগারেই নানারূপ ব্যাধি সংগ্রহ করিয়া অনেক শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করে এবং জননীর জীবন দুঃখময় করিয়া যায়।

বহুদিন হইতে এরূপ ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে কেন? যাঁহারা সেকালের সবই ভাল দেখেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, যাহাতে সুস্থ ও সবল ছেলেরাই বাঁচিয়া থাকে—দুর্ব্বলগুলি বাদ পড়ে, সেই জন্যই এমন ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল—বিকলাঙ্গ ও দুর্ব্বল

শিশুগুলিকে মারিয়া ফেলা হইত। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন গ্রীসে লোক সুস্থ ও সবল ব্যতীত আর কাহাকেও সুন্দর দেখিত না—তাই সৌন্দর্য্যের উপাসক তাহারা দুর্ব্বল ও বিকলাঙ্গ ছেলেগুলিকে মারিয়া ফেলিত। তেমন "সৌন্দর্য্য-বোধ" আমাদের দেশে কখন ছিল না—আসিয়াও কায নাই। পরুষ পুরুষরা যদি বা বিদেশী আদর্শের অনুকরণে সে "সৌন্দর্য্য-বোধ" অভ্যাস করেন, আমরা স্ত্রীলোকরা—যাহারা ১০ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া সন্তানকে কোলে লইয়া সব কষ্ট ভুলিয়া যাই—যাহারা কাণা ছেলেকেও পদ্মলোচন মনে করি—তাহারা সে "সৌন্দর্য্য-বোধ" দূর হইতেই পরিহার করিব। অন্তঃপুরে তাহার প্রবেশ করিবার অধিকার আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না।

এই সব সেকেলে ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। সেকালের ব্যবস্থা কেবল সেকালের বলিয়াই যে তাহার অনুকরণ করিতে হইবে, এমন কথা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। সেকালে হয় ত কাঁচির একান্ত অভাবে চেঁচাড়ী দিয়া প্রসূতের নাড়ী কাটা হইত। এ কালে কাঁচির অভাব নাই, তবুও কোন কোন বাড়ীতে চেঁচাড়ী ছাড়া কাঁচি ব্যবহৃত হয় না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়—"বরাবর যা হয়, সে-ই ভাল।" সেকালে চেঁচাড়ীখানা সদ্য কাটিয়া আনা হইত—একালে তাহা অনেক দিন আগেই সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। এই চেঁচাড়ী ও অশোধিত কাঁচি আশ্রয় করিয়া ধনুষ্টঙ্কারের বীজ কেমন করিয়া শিশুর দেহে প্রবেশ করে, তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না।

আঁতুড়ঘরে পরিচ্ছন্নতার কত প্রয়োজন, তাহা আমরা বুঝিলে সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মৃত্যুর হার কমিয়া যায়—গৃহে গৃহে সন্তান-শোকাতুরা জননীর আর্ত্তনাদ আর এখনকার মত প্রবল হইতে পারে না। তাহাতে যে লাভ, তাহা কি কেবল জননীর—না সমস্ত জাতির? অথচ এ দিকে দেশের লোকের উপযুক্ত মনোযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না।

যদি বঙ্গদেশে শিশু-মৃত্যুর হার কমাইয়া জাতির বলবৃদ্ধি করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে প্রসূতির যত্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, আর সূতিকাগারের অব্যবস্থা দূর করিতে হইবে। যে জননী সংসারে পুত্র বা কন্যা আনিয়া দেন, তাঁহার স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, তাঁহার মন প্রফুল্ল থাকে—তাহা করা গৃহস্থের বিশেষ কর্ত্তব্য। আর প্রসূতের স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা না করিলে তাহাকে হারাইবার সম্ভাবনা কত অধিক, তাহা কি আমরা দেখিয়াও শিখিব না? আর কাহারও জন্য না হউক—সন্তানের জন্যও জননীর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যে গৃহে সংসারের আলো—ভবিষ্যতের আশা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে গৃহ ঠাকুরঘরের মত পরিষ্কার রাখাই কর্ত্তব্য। নহিলে শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়—সে ক্ষতি তাহার সমস্ত জীবনেও পূরণ হয় না।

আমি বলিয়াছি, আমাদের সব অবজ্ঞা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার সূতিকা-ঘরে ফুটিয়া উঠে। সেই ঘরের সংস্কার সর্ব্বপ্রথম করণীয়।

সে জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। সে জন্য গৃহের মহিলাদিগকে আবশ্যক শিক্ষা দিতে হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা শিক্ষার গর্ব্ব করেন, সেই পুরুষদিগকেও শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

শ্রীমনোরমা ঘোষ।

জীবনের সার্থকতা।

(ইংরাজী ভাবালম্বনে)

যে জীবন বটসম সৌন্দর্য্যের মন্দির বিদারি',
জনমি', সহস্র বর্ষ মূলশাখাপ্রশাখা বিস্তারি'
শুষ্ক জীর্ণ হয়ে শেষে রন্ধনের যোগায় ইন্ধন
সুদীর্ঘ হলেও, ধন্য স্পৃহনীয় নহে সে জীবন।
তা'র চেয়ে যে জীবন অব্জসম পঙ্কে জন্ম লভি'
শুধু দিনেকেরো তরে স্ফুটচিত্তে পূজে প্রেম-রবি—
বাগ্দেবতা ইন্দিরার পাশাপাশি রচে সিংহাসন
এ মর বিশ্বের মাঝে চরিতার্থ ধন্য সে জীবন।
সৌন্দর্য্যের মন্দিরের পূজারী যে দিনেকেরো তরে
ধ্বংসধর্ম্মী দিগ্‌জয়ীর চেয়ে সেও ধন্য ধরা প'রে!
সুন্দরে যে নাহি বন্দে ব্যর্থ তা'র বিরাট প্রসার
চঞ্চল-জীবন-পদ্ম যোগ্য সদ্ম চঞ্চলা পদ্মার।

শ্রীকালিদাস রায়।

৮

ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখি, গৌরী হামাগুড়ি দিয়া সমস্ত বারান্দাটায় ছুটাছুটি করিতেছে; এক একবার, যে ঘরে ভুবনের মা থাকে, সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া ভিতরের দিকে চাহিতেছে। তাহার দৃষ্টি উপরে উঠিতেছিল। মনে হইল, ঘরের ভিতরে কাহারও মুখের পানে সে চাহিতেছে।

আমি ডাকিলাম—"ভুবনের মা!"

আমার কণ্ঠস্বরে বালিকা আমার কাছে ছুটিয়া আসিল, এবং পিতৃসম্বোধনের প্রয়াস করিল। ঘরের ভিতর হইতে কোনও উত্তর আসিল না।

বালিকাকে কোলে উঠাইয়া আবার ডাকিলাম—"ভুবনের মা! ভুবনের মা, ঘরে আছ?"

"তিনি স্নানে গিয়েছেন।"

সেই পাঁচ মাস পূর্ব্বে দেখা নারীর মধুর কণ্ঠ! আজ তাহার সঙ্গে আমার কথা কহিতে হইবে। কহিতেই হইবে। আমার অনুমান সত্য কি না বুঝিবার প্রয়োজন। আমি বলিলাম—"মা! আমাকেও যে স্নানে যেতে হবে। আজ আমার উঠ্‌তে অসম্ভব বেলা হয়েছে।"

"ওকে রেখে যান।"

গৌরীকে কোল হইতে ভূমিতে রাখিতে গেলাম। বালিকা তাহার চিরপ্রথামত আমার গলা জড়াইয়া ধরিল; হাত ছাড়াইতে কাঁদিয়া উঠিল। আমি ডাকিলাম, "মা!" উত্তর পাইলাম না। "আমাকে এ বিপদ্ থেকে মুক্ত কর। আমি তোমার সন্তান—সন্ন্যাসী। সন্তানের কাছে তার মা আস্‌বে—সঙ্কোচ কেন?"

মা যেন তাঁহার সঙ্গে আমার সন্তান-সম্বন্ধ আগে স্থির করিয়া লইলেন, তাহার পর বাহিরে আসিলেন; নহিলে এ কি দেখিলাম! এই কি কবি-কল্পিত রূপ—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা—পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী? মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা প্রবল শক্তিতে ঝঙ্কৃত স্পন্দন আমার সর্ব্বশরীরকে এক মুহূর্ত্তে অবশ করিয়া দিল। গৌরী নিজের হাত ছুটি দিয়া আমার গলা ধরিয়া আত্মরক্ষা না করিলে, বোধ হয় বারান্দায় পড়িয়া যাইত।

মা বুঝি আমার অবস্থা বুঝিলেন; যথাসম্ভব সত্বর আমার নিকটে আসিয়া গৌরীকে আমার কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন।

মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়াই যথাশক্তি আত্মগোপন করিয়া আমি বলিলাম—"মা! ভুবনের মা'র ফিরে আসা পর্য্যন্ত তোমাকে যে অপেক্ষা করতে হবে।"

"আপনি কখন্ ফির্‌বেন?"

"ঠিক বলা অসম্ভব।"

"ভুবনের মা আমাকে ব'লে গেল, আপনি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন।"

"জিজ্ঞাসা করব অনেক কথা। তুমি কি আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে?"

মা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন। পা হইতে মাথা—কাঞ্চন-গৌরীর সেই পাঁচ মাস পূর্ব্বের দেখা চরণ—অঙ্গুলি-গুলাই যেন বিশ্ব-শিল্পীর রচনার কথা শুনাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে. পা হইতে মাথা—যেমন দেখা, সর্ব্বশরীরে অমনই আবার শিহরণ আসিল। গৌরী এই সময় স্তন্যপানের ব্যাকুলতায় তাঁহার বক্ষের বসন লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

ভাগ্যে মর্য্যাদাবোধ তখনও অবশিষ্ট ছিল। মনে মনে

বারংবার মাতৃশব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"বিকালে আস্‌তে পার্‌বে কি ?"

"আপনি আসুন।"

* * * * *

প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কমণ্ডলু হাতে ঘর হইতে বাহির হইতেছি, উপর হইতে আমাকে দেখিয়াই বুঝি গৌরী ডাকিয়া উঠিল—"বা-বা-বা !"

"চুপ, পিছু ডাকিস্‌নি, হতভাগী !"

দেখিব না দেখিব না করিয়া উপরদিকে চাহিতেই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল। সেই কনক-চম্পকদাম-গৌরী—কোলে কনক-চম্পক-কোরক গৌরী !

৯

মা, মা, মা! গঙ্গাগর্ভে বার বার ডুব দিলাম। প্রতি নিমজ্জনে মাতৃ-নাম উচ্চারণ করিলাম। কই, রূপ-মোহ ত ধৌত হইল না! অন্নপূর্ণার মন্দিরে—কই মা, তোমার রূপের সঙ্গে সে-রূপ মিলাইতে যাই—মিলিতে মিলিতে সে আবার মাথায় মোহ ঢালিয়া তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসে কেন ?

এ দেবতা সে দেবতার মন্দিরে ঘুরিয়া বেলা দশটা অতীত করিয়াও যখন চিত্ত শান্ত করিতে পারিলাম না, তখন অনন্যোপায়—ঘরেই ফিরিলাম। সেরূপ চঞ্চল-চিত্ত লইয়া গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমার সাহস হইল না। বাড়ীর দ্বারের কাছে উপস্থিত হইতেই দেখি, ভুবনের মা বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছে।

"বাড়ীর দোর খুলে রেখে কোথায় গিয়েছিলে, ভুবনের মা ?"

"মেয়েটিকে একটু এগিয়ে দিতে গিয়েছিলুম।"

"এতক্ষণ সে ছিল ?"

"তোমারই ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল।"

"আমি যে তাকে বিকালে আসতে বলেছিলুম।"

"বিকালে তার ঘর থেকে বেরুনো বড় কঠিন।"

"সকালে তবে কেমন ক'রে আসে সে ?"

"স্নান কর্‌তে আসে, সেই সময় এ বাড়ী একবার হয়ে যায়।"

"কতক্ষণ সে গেছে ?"

"এই যাচ্ছে।"

"তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পার ?"

ভুবনের মা আমার মুখের পানে চাহিল মাত্র।

"যদি বেশি দূর না গিয়ে থাকে, তাকে আর একবার আন্‌তে পার্‌লে ভাল হয়।"

ভুবনের মা নড়িল না। কতকগুলা লোক এই সময় আমার বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত অগত্যা আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। ভুবনের মা আমার মুখ দেখিয়া আমার ভাবান্তর কি লক্ষ্য করিয়াছে ? লোকগুলা চলিয়া গেলে সেই সুন্দরীকে ফিরাইয়া আনিবার কথা আবার যে-ই আমি তুলিয়াছি, অমনই ভুবনের মা আমাকে তিরস্কার করিবার জন্যই যেন বলিয়া উঠিল—"ছি বাবা !"

"ছি, মানে কি, ভুবনের মা ?" তাহার ওই ক্ষুদ্র কথাটিতেই আমার ক্রোধ হইয়াছে।

"আর পথে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে চল।"

"তা তো যাবই, কিন্তু তোমার ও কথা বল্‌বার অর্থ কি ?"

"সে ত রোজই আস্‌ছে। যদি কিছু তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার থাকে, কাল কর্‌লে চল্‌বে না ?"

আমি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভুবনের মা আমার অনুসরণ করিল। প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন করিতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গৌরী ?"

"অনেকক্ষণ ধ'রে মাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

হাত পা ধুইয়া একটি হুঁকা হাতে বারান্দায় বসিয়াছি, গৌরী কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে উঠাইতে আমি ভুবনের মা'কেই আদেশ করিলাম। সে নীচে আমার রন্ধনের উদ্যোগে ব্যস্ত ছিল। বলিল—"আমার হাত জোড়া।"

সুতরাং আমাকেই গৌরীকে তুলিয়া আনিতে হইল। কিন্তু তাহাকে বুকে তুলিয়া আজ তেমন তৃপ্তি পাইতেছি না কেন ? গৌরীরও যেন আমার কোলে উঠিতে তেমন আগ্রহ নাই। কোলে বসিয়া ব্যাকুলার মত এক একবার সে চারিধারে চাহিতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহার দৃষ্টি কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার বৃদ্ধাকে ডাকিলাম—"হাত খালি হ'ল, ভুবনের মা ?"

ভুবনের মা উপরে আসিয়া উত্তর করিল—"কি বল। আমি এইবারে একবার বিশ্বনাথ দর্শনে যাব মনে কর্‌ছি।"

"তা হ'লে একেও সঙ্গে নিয়ে যাও।"

"তুমি রাখ্‌তে পার্‌বে না ?"

"আমি পারব না কেন—এ যে সেই মেয়েটিকে খুঁজছে ?"

"রোজই খোঁজে, আজ একটু সে বেশী নাড়া-চাড়া ক'রে গেছে কি না !"

"এটি কি তারই, ভুবনের মা ?"

"এ কি আর বুঝ্‌তে বাকি থাকে, বাবা !"

"তুমি কি জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছ ?"

"না।"

"এই এতকালের ভিতর এক দিনও কি জান্‌বার চেষ্টা করনি ?"

"কি জন্য করব ? জিজ্ঞাসা করলে সে যদি স্বীকার না করে ? কাশীতে আমি তার পাপের কারণ হব ? এক পাপ ঢাক্‌তে আর এক পাপ—আমার দরকার কি, বাবা !"

"কিন্তু এবার যে জান্‌তেই হবে, ভুবনের মা !"

বেশ, কাল ত সে আস্‌বে, তুমিই জিজ্ঞাসা ক'র।

"কাল সে আস্‌বে ?"

"বরাবরই ত আস্‌ছে—একদিন মাত্র আস্‌তে পারে নি।"

"কেন আসে নি, জিজ্ঞাসা করেছিলে ?"

"এই যে বল্লুম, বাবা, যদি ঠিক উত্তর না দেয় ?"

"ভুল হয়েছে, ভুবনের মা, এখন দেখ্‌ছি তোমারই কাশী-বাস সার্থক। আমি এখানে বিশ্বনাথকে তামাসা করতে এসেছি।"

বৃদ্ধা কোনও কথা কহিল না। ভাবে বোধ হইল, আমার সুখ্যাতি করা তাহার ভাল লাগিল না।

"তা হ'লে আমি কি করব ?"

"জানবার ?"

"আমাকে যে জান্‌তেই হবে।"

"কাল এলে জিজ্ঞাসা ক'র।"

"তুমি যে কি বল্লে !"

"সে কথা এখনও ধ'রে রেখেছ, বাবা ! এ শিবস্থান বটে—এক দিকে যেমন এ স্থানের তুলনা নেই, অন্যদিকেও সেইরূপ—তুলনা নেই। তোমার সম্বন্ধে, যতদূর জানি, আজও পর্য্যন্ত কেউ কিছু অন্যায় বলতে পারে নি। যাতে কথা উঠতে পারে, এমন কায করবার দরকার কি, বাবা !"

"কিন্তু ভুবনের মা, আমার বয়স ষাট বৎসর।"

ভুবনের মা শুধু হাসিল।

"এখনও কি আমাকে তোমার সন্দেহ হয় ?"

"আমার না হ'তে পারে, লোক কিন্তু হিসেব ক'রে নিন্দা করে না। কত সাধু সন্ন্যাসী এখানে অপবাদের হাত এড়াতে পারেন নি।"

"থাক্‌, আর তোমার সুখ্যাতি করব না, ভুবনের মা, তুমি চ'টে যাবে। গৌরী থাক্‌, তুমি বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে ফিরে এস।"

গঙ্গাস্নান করিয়া, অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের আশ্রয় লইতে গিয়াও চিত্তের যে শান্তি পাইলাম না, ভুবনের মা'র এক কথাতেই আমার তাহা লাভ হইয়া গেল—আমি আবার প্রকৃতিস্থ হইলাম।

শান্তচিত্তে গৌরীকে খানিকটা আদর করিলাম। সে তাহার স্তন্যদায়িনীর উদ্দেশে এদিক্‌ ওদিক্‌ দেখা ভুলিয়া গেল।

১০

এক হাতে একটি মিষ্টান্ন, অন্য হাতে একটি খেলানা দিয়া, নিত্য যেমন করিয়া থাকি, গৌরীকে বসাইয়া সবেমাত্র রন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছি, বাহিরে সেই কণ্ঠ উঠিল—"কই গো মা।"

বুকটা আবার গুর্‌ গুর্‌ করিয়া উঠিল। এ কি বিপদে পড়িলাম ! আমার বয়স যে ষাট বৎসর ! আর আমার প্রথমা কন্যা জীবিত থাকিলে বয়সে ওই মেয়েটিরই মত যে হইত ! উত্তর দিবার বৃথা চেষ্টা, মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, গৌরী প্যাঁড়া, ঝুম-ঝুমি ফেলিয়া একটা উল্লাস-সূচক ধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আবার গৌরীকে কোলে লইয়া আকাঙ্ক্ষার দৃশ্য আমার সম্মুখে দাঁড়াইল।

"এসো।" আমি "মা" বলিতে ভুলিলাম।

"মা এখনও ফিরে আসেন নি ?"

"তার সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছে ?"

গৌরী আবার স্তন্যপানের জন্য ব্যাকুলতা দেখাইল।

"বাবা, একটু অপেক্ষা করুন ; আমি এখনি ফিরে আস্‌ছি"—বলিয়াই গৌরীর হাতটা ধরিয়া তাহার স্তন্যপানের ব্যাকুল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে করিতে সুন্দরী উপরে চলিয়া গেলেন।

আমি কোন কথা না বলিয়া বসিয়া বসিয়া কেবল তাহার সেই চেষ্টাজনিত দৈহিক চাঞ্চল্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম।

তাহার সঙ্কোচাধিক্যে আমার মনে বিরক্তির উদয় হইল। আমি স্থির করিয়াছিলাম, সে-ই গৌরীর গর্ভধারিণী। বালিকার উপর এত স্নেহ তাহার জননী ব্যতীত আর কাহাতে সম্ভব হইতে পারে? এই নষ্টচরিত্রা আমার মত বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকেই এতটা সঙ্কোচ কেন দেখাইবে? কথার কৌশলে সে কথাটা রহস্য করিয়া শুনাইতে আপত্তি কি? আসুক ঐ গৌরীর মা ফিরিয়া।

তখন আমি আপনার মনের ভাব তলাইয়া বুঝিতে পারি নাই। রূপের বহ্নি যে জরা-শুষ্ক মানুষকেও দাহ করিতে পারে, অভিজ্ঞতার অভাবে—আর বোধ হয়, আপনার বৈরাগ্যগর্ব্বেই তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। হায় মানুষ! কিন্তু তাহা বুঝিতেও বিলম্ব হইল না।

একটু পরেই শান্ত গৌরীকে বুকে করিয়া তিনি যখন আবার ফিরিলেন—আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন—তখন তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাঁহার সমস্ত মনটা স্কন্ধন্যস্তমস্তক বালিকার উপর—নিরর্থক দৃষ্টি সে যেন আকাশে তুলিয়া ধরিয়াছে।

তখন যেন অন্ধকারে বিদ্যুদালোকে আমি আমার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিলাম—এ কি বহ্নিদাহ!

গুরু আজ আমাকে ঘনান্ধকারে প্রচণ্ড পতন হইতে রক্ষা করিয়াছেন। নহিলে কোথায় থাকিত আমার সন্ন্যাস, কোথায় থাকিত আমার মনুষ্যত্ব—সম্মুখে কবি-কল্পিত রূপ-রাশি লইয়া আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসা দৈহিক বলহীনা নারী! আমি তাহাকে, কথায়, সাহসিকতায়, চরিত্র-হীনা নিশ্চয় বুঝিয়া, আমার অসৎ চিন্তাগুলাকে অসঙ্কোচে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমার মনুষ্যত্ব? কোন্ চুলায় পড়িয়া ভস্ম হইত, তোমরাই আমার হইয়া কল্পনা কর। কল্পনা করিতে এ অতি বার্দ্ধক্যেও আমার মাথা ঘুরিয়া যায়।

আমাকে বাক্‌শক্তিহীন বুঝিয়াই বুঝি গৌরীকে কাঁধ হইতে কোলে নামাইয়া তিনি কথা কহিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি, তখন বুঝিতে পারি নাই, গৌরীর মুখের উপর যশোদার মমতায় সংবদ্ধ হইয়াছে।

"আপনি আমাকে কি বল্‌বেন?"

"সে কি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোন্‌বার। শুনতে গেলে কিছুক্ষণ বসতে হবে।"

"কায়েত মেয়ে যে এখনও এলো না।"

"সে যদি আর নাই আসে?"

"আপনি কি বল্‌বেন, আমি বুঝেছি?"

এই সময়ে একটা অযোগ্য কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। আমার সৌভাগ্য ছিল, মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতে রমণী আবার বলিয়া উঠিলেন,—"এ মেয়েটাকে আপনি আর রাখ্‌তে চান না।"

চিত্তের বর্ব্বরতায় একটা আঘাত পড়িল। সে আঘাতের গুরুত্ব তখন ভাল রকম বুঝিতে না পারিলেও আপনা হইতেই আমার কথার গতি ফিরিয়া গেল,—"কেমন ক'রে জান্‌লে?"

"কায়েত মেয়ের মুখে শুনেছি।"

"মুক্তিলাভের জন্য কাশীতে এসেছিলুম—"

"আবাগী কোত্থেকে এসে আপনাকে বাঁধনে জড়িয়েছে।"

"আবাগীর দোষ কেন দিচ্ছ?"

"তবে আপনার অদৃষ্টকেই দোষ দিতে হয়।"

"ও কথার কোনও অর্থ নেই, অদৃষ্টকে তুমিও দেখনি, আমিও দেখিনি যখন।—তোমার? মুখ নীচু ক'রে থাকলে চলবে না।"

সুন্দরী মুখ তুলিলেন, মাথার কাপড়, ইচ্ছাপূর্ব্বকই যেন, অপসারিত করিয়া দাঁড়াইলেন। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার সীমন্তের সিন্দূর অগণ্য কর্কশ ইঙ্গিতে আমাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল।

"তুমি এর মা নও?"

"এগারো মাস মাই-দুধ খাওয়ালুম"—টপ্‌টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু বক্ষস্থ গৌরীর মাথার উপর পতিত হইল।

তবু মনের সন্দেহ! আমি বলিলাম—"তা তো আমিও জানি। তুমি কি একে গর্ভে ধর নাই?"

"না, বাবা!"

আর এক শিহরণ। তবুও আমি অবিশ্বাসের হাসি হাসিলাম।

"আপনিই এর বাপ মা।"

"কথায় আমাকে মুগ্ধ করতে এসো না, বাছা।"

"মুগ্ধ কর্‌তে বলিনি, বাবা; মন যা বল্‌ছে, তাই বল্‌ছি।"

"বাপ না হয় হলুম, যখন মেয়েটা 'বাবা' বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, তখন দু'দিন পরে বল্‌বেই। মা'টাও কি আমাকে সেই অপরাধে হ'তে হ'বে?"

ঈষৎ বিরক্তির ভাবে রমণী বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি বল্‌তে চান কি?"

"কি বল্‌তে চাই, তুমি কি বুঝতে পার্‌ছ না।"

"বুঝতে পার্‌ছি না যে, বাবা!"

আমার মনের দুষ্টামী যেন প্রচণ্ড আঘাতে পিষিয়া গেল। এই এক কথাতেই আমার মাথা ঠাণ্ডা হইল। আমি বলিলাম,—"তুমি কি মা, আমার কথায় আর কোন কথার আভাস পেয়েছ?"

"কি বল্‌তে আপনার ইচ্ছে, স্পষ্ট ক'রে বলুন। সন্ন্যাসী আপনি, ঘুরিয়ে কথা বলছেন কেন?"

"আমি মনে করেছিলুম, তুমিই ওর মা।"

"না।"

"এখনও মনে কর্‌ছি।"

"আর মনে কর্‌বেন না। স্থান কাশী, আপনি সাধু, কথায় অবিশ্বাস করেন কেন?"

"তবে কি আমাকে বুঝতে হবে, ওই অভাগিনীর উপর দয়ায় তুমি এই দীর্ঘকাল তাকে স্তন্যপান করাচ্ছ?"

"তা বল্‌তে পারি না। আগে যদিও বল্‌তে পার্‌তুম, এখন একবারেই পারি না।"

"মেয়েটা কি, মা, এতই মায়াতে তোমাকে জড়িয়েছে?"

"নইলে চোরের মত এখানে আস্‌ব কেন, আর এমন কথাই বা শুন্‌ব কেন?"

মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিলাম।

রমণী বলিতে লাগিলেন—"অন্ততঃ ন' মাস আগে হ'তে আমার এখানে না আসা উচিত ছিল। দয়া আর কেমন ক'রে বল্‌ব, বাবা! সকালের প্রতীক্ষায় সারারাত ছট্‌ফট্‌ করি, ছেলেকে মাই-দুধ থেকে বঞ্চিত ক'রে সূর্য্য উঠতে না উঠতে ছুটে আসি। কেন আসি?"

"এ হেঁয়ালির উত্তর আমি কেমন ক'রে দেব, মা! তবে, আর মিথ্যা কইব কেন, আমি অপরাধ করেছি। যদিও করেছি তোমাকে না বুঝে, তবু অপরাধ, গুরু অপরাধ। অপরাধ শুধু তোমার কাছে নয়, করেছি আমার ইষ্টের কাছে।"

"না, বাবা, আপনি মহাত্মা।"

"আর রহস্য ক'র না মা! তুমি যেই হও, সন্ন্যাসী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়ে, তোমার মনে আঘাত—ইহপরলোকে এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই।"

"আমি আপনার কন্যা—আমি কিছু মনে করিনি, বাবা!"

"তোমাকে কন্যা বলবার অধিকার আমি কোথায় রাখলুম, মা!" আমার চোখে জল আসিল।

আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন রমণী বলিয়া উঠিলেন, —"মেয়েটা দিন দিন বড়ই দুরন্ত হয়েছে। এই দেখুন, এক মাই খেয়েছে, আর এক মাইয়ের কি দুর্দ্দশা করেছে।" বলিয়াই, এখন জোর করিয়াই বলি না, আমার মা তাঁহার বক্ষে গৌরীর নখ-চিহ্ন দেখাইলেন। গৌরী তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া আবার ঘুমাইয়াছে।

"তুমি অদ্ভুত মেয়ে, মা, তুমি প্রহেলিকা। গৌরীকে ঘরে শুইয়ে এখন যাও। ক্ষমা আমার চাইতে সাহস নেই, যদি তোমার অহেতুক দয়াতে তোমার এ বু'ড়া মতিচ্ছন্ন ছেলেকে ক্ষমা ক'রেই থাক, অন্য যে কোনও সময় আস্‌তে ইচ্ছা কর, এস। একা এস না। তোমার এ পাগ্‌লামী সংসারের লোক বুঝবে না। সত্য বল্‌ছি, মা, আমিও এখনো বুঝতে পারিনি।"

"না, আর থাক্‌ব না, বাবা!"

ঘুমন্ত গৌরীকে উপরে শোয়াইয়া, আমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া প্রস্থানের পূর্ব্বে মা বলিলেন,—"এখন আসি, বাবা! বোধ হয়, কাল আর আমি আস্‌তে পার্‌ব না।"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

১১

ভাবিলাম, প্রথম প্রায়শ্চিত্ত আজ উপবাসে করিব। দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত, গুরুর চরণে শরণাপন্ন হইয়া সন্ন্যাস লইব। এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে ভিতরে যে অপবিত্রতা সঞ্চয় করিয়াছি, যুগব্যাপী সাধনার ফল দিয়া পূর্ণ করিলেও বুঝি এ জীবনের আর মূল্য হইবে না। এখানে ত আমি ভিন্ন আর কেহ নাই, ভুবনের মা এখনও ত আসে নাই—উঃ! নিজের কাছেই

নিজের এত লাঞ্ছনা! বসিয়া বসিয়া অসংখ্য কাশীবাসীর রূপ কল্পনায় আঁকিলাম, কিন্তু তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেই আমার চক্ষু নত হইল। তাহাতেই কি ছাই লাঞ্ছনার নিবৃত্তি আছে? হেঁটমাথাতেই বুঝিতে পারিলাম, চারিদিক্ হইতে তাহারা আমার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কেমন করিয়া পথে বাহির হইব? গুরুকে দেখিতে যাইবার কথা মনে উঠিতেই সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

অথচ এ রমণী এখনও পর্য্যন্ত আমার কাছে প্রহেলিকা। এই এত দিন সে গৌরীকে স্তন্যপান করাইতেছে, অথচ সে গৌরীর মা নয়! তাহার সীমন্তে সিন্দুর, সদ্যোজাত শিশুকে সেই বিষম দুর্য্যোগে পরিত্যাগ—তেমন পিশাচীর নিষ্ঠুর কার্য্য সে করিতে যাইবে কেন?

তবে কোথা হইতে সে গৌরীর অস্তিত্ব জানিতে পারিল? কেন, এমন নিত্য নিয়ম-সেবার মত এই শিশুকে সে মাতৃস্নেহ ঢালিয়া দিতে আসিল? এ কি দয়া? মা যে বলিলেন, না! মায়া? যদি তাই হয়, এ মায়া কাহার উপরে? শিশুর, না যে অভাগী এই অভাগীকে গর্ভে ধরিয়াছে, তাহার উপরে?

জানিতে বিপুল কৌতূহল জাগিতেছে। কিন্তু জানিতে আমার অধিকার নাই। জানিবার উপায়—অনুসন্ধান করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

উনুনটাকে পিছনে রাখিয়া যোগস্থের মত বসিয়া আছি, ভুবনের মা আসিল। আমাকে নিশ্চিন্তের মত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এরই মধ্যে রান্না শেষ ক'রে ফেলেছ বাবা?"

"আজ রাঁধবো না, ভুবনের মা?"

"কেন?"

"তোমার অন্ন তুমিই আজ পাক ক'রে নাও।"

"খাবে না কেন? শরীর কি ভাল নয়?"

"তুমি আস্তে এত দেরি করলে কেন?"

"সে কথা পরে বল্‌ছি। তুমি খাবে না কেন?"

"প্রাচিত্তির করব।"

"কিসের?"

"প্রায়শ্চিত্ত আর কিসের? পাপের।

"তোমার কথা কিছুই ত বুঝতে পারছি না।"

"বোঝবার দরকার নেই—রাঁধো, খাও।"

"সে মেয়েটি কি আবার এসেছিল?"

"এসেছিল।"

"হুঁ! আমারই মরণ। আবাগী সঙ্গে আস্‌তে চেয়েছিল গো! আমি তাঁকে অপেক্ষা করতে ব'লে কেদারনাথ দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। এত ভিড়—কে এক কোন্ দেশের রাজা এসেছিল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—ভাল ক'রে দেখতেও পেলুম না, মাঝখান থেকে কোথা হ'তে কি হয়ে গেল।"

"তারে আবাগী বল্‌লে কেন, ভুবনের মা?"

ভুবনের মা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। সে গৌরীর তত্ত্ব লইল। আমিও সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি কি তাকে গৌরীর মা-ই ঠিক করেছ?"

"মা নয়?"

"আমি না দেখি, তুমিও কি তার সিঁথের সিঁদুর দেখনি?"

"তাই দেখে তুমি মনে করেছ? ও রকম সিঁদুর মাথায় এখানে অনেক আছে, বাবা!

"এত কাল তার মাথায় সিঁদুর দেখেছ, অথচ তাকে অভাগিনী সন্দেহ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ?"

"তা যা বলেছ, এমন শান্ত মেয়ে আমি কমই দেখেছি, বাবা। এক দেখেছিলুম আমার ছোট মা। ভাব্‌তুম, হা বিশ্বনাথ, এমন মেয়ের এমন দুর্দ্দশা হ'ল কেন?"

"তবে? তাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে কি দোষ হ'ত, ভুবনের মা? এ সন্দেহ করার চেয়ে তাতে কি বেশী পাপ হ'ত?"

ভুবনের মা'র মুখ চূণ হইয়া গেল। উপর হইতে গৌরী কাঁদিয়া উঠিল।

"তুমি খাবার উদ্যোগ কর, আমি যাচ্ছি।"

"তুমি খাবে না, আমি পোড়ামুখে অন্ন দিব!"

"আমাকে উপলক্ষ ক'র না—আমি তার অমর্য্যাদা করেছি, অসৎ কথা শুনিয়েছি।"

"এইবারে তাকে জিজ্ঞাসা করব, বাবা!"

"আর কি তার দেখা পাবি, বুড়ী!"

"তুমি কি তার এমন অমর্য্যাদা করেছ?"

"করিনি বল্‌লে মিছে হয়—তবে ক্ষমা পেয়েছি, ভুবনের মা! কিন্তু বোধ হচ্ছে, মা আর এখানে আস্‌বেন না।"

গৌরী উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল। উভয়েই আজ

তার মুখে সর্ব্বপ্রথম মাতৃনাম উচ্চারিত হইতে শুনিলাম। উভয়েই যে যার মুখের পানে একবার চাহিলাম মাত্র।

১২

ভুবনের মাও সে দিন আমারই মত উপবাসী রহিল। আমার বহু অনুরোধেও সে আহার করিল না। বলিল,—"বাবা! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, আমার নেই?"

সে দিন কেহই আমরা ঘর হইতে বাহির হইলাম না। গৌরী আজ অস্থির হইয়াছে।

পরদিন মা আসিবেন না বলিয়াছেন, আসিলেন না। আমি আর কয় দিন প্রায়শ্চিত্ত করিব? সে দিন আহার করিয়া, যদিই মেয়েটার মমতায় মা চলিয়া আসে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিলাম। আজ গৌরী সমস্ত দিনটাই সময়ে অসময়ে কাঁদিয়াছে। ভুবনের মা সে দিনও আহার করিল না। বারংবার আমার সাগ্রহ অনুরোধে সামান্য একটু ফল-জল মুখে দিয়া রহিল। সে আগে গৌরীর মা'র সঙ্গে দেখা না করিয়া মুখে অন্ন তুলিবে না। যদি সে আর না আসে? এ প্রশ্নের বৃদ্ধা উত্তর দেয় নাই।

পরদিন—কই, আজিও ত মা আসিলেন না! মনে মনে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাই কি বাস্তবিক হইল!

ভুবনের মা'র আজিও ফল-জল। তবে কি বুড়ী মরিবে? তাহার জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম। সে যদি মরে, গৌরীকে আমি কেমন করিয়া বাঁচাইব!

তাহার পর উপরি উপরি দুই দিন—মা যখন আসিলেন না, বৃদ্ধাও দেখিতে দেখিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মায়ের তত্ত্ব আমাকে লইতেই হইবে। গৌরী যদিও অনেকটা শান্ত হইয়াছে, তথাপি থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠে। আমার মন বলে, বাক্‌শক্তিহীন শিশু সকরুণ রোদনে তার স্তন্যদায়িনীর উদ্দেশে আবেদন প্রেরণ করিতেছে।

ভুবনের মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাগা, একবার সন্ধান ক'রে দেখলে হয় না?"

"কোথায় তাকে খুঁজবে, বাবা! এই সরু-গলি-ভরা সহর,—তার ওপর পৃথিবীর লোক আসা-যাওয়া করছে।"

"এগারো মাস তার সঙ্গে আলাপ করলে, পরিচয় না নিয়েছ, কোথায় থাকে, এটা জানলেও কি দোষ হ'ত, ভুবনের মা?"

ভুবনের মা চুপ করিয়া রহিল—তাহার কথা কহিবার শক্তিও যেন ক্রমে লোপ পাইতেছে। মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলাম। বাস্তবিকই ত! এই জনপূর্ণ কাশী, এই অসংখ্য অসূর্য্যম্পশ্য গলিভরা বিশ্বনাথের নগর—ইহার ভিতরে এক জন পরিচয়হীনা কুলাঙ্গনাকে খুঁজিয়া বাহির করা যে অসম্ভবের অসম্ভব!

তবু একবার খুঁজিব। মর্ম্মবেদনায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। "ভুবনের মা! গৌরীকে রাখতে পারবে?"

গৌরীকে সারাটা বছর সে-ই ত রাখিয়া আসিতেছে। এই কয় দিন দুর্ব্বল অবস্থাতেও গৌরীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে সে ক্লান্তি বোধ করিতেছে না। তবে এরূপ প্রশ্ন তাহাকে করিলাম কেন?

বৃদ্ধা বুঝিল, এ প্রশ্ন কেন করিতেছি। সে বলিল,—"মা'কে খুঁজে না পেলে তুমি ঘরে ফিরবে না?"

"তাই মনে করছি।"

"ও রকম মনে করতে নেই, বাবা।"

"তুমি যে ম'লে! আমার মনে হয়, আমার অনুরোধে তুমি ফল জল মুখে দাও, গলাধঃকরণ কর না।"

"পোড়া পেট আছে, খাই বই কি।"

"তবে মরতে বসেছ কেন?"

"আর কত দিন বাঁচতে বল?"

"তুমি মর আর বাঁচ, আমাকে বেরুতেই হবে, যদি তার সন্ধান না পাই, আর আমি এ বাড়ীতে—"

"কর কি, কর কি, বাবা, কাশী—যা রাখতে পারবে না, সে সঙ্কল্প ক'র না।"

"আমার যে কাশীতে বাস অসম্ভব হয়েছে, ভুবনের মা! বুঝতে পারছ না, চারদিন আমি চৌকাঠের বাইরে পা দিতে পারলুম না। তুমি বুড়ো মানুষ, তাতে কদিন না খেয়ে মরমর, আমার আহারের জন্য হাটবাজার ক'রে আনছ, আমি বেহায়ার মত ব'সে ব'সে দেখছি।"

"বেশ, সকাল হ'লে মা-গঙ্গায় ঘাটগুলো একবার দেখে এসো দেখি।"

কথাটা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করিয়াই সে অপরিচিতা আমার বাসায় আসিয়া থাকে,

এইটাই আমার তখন মনে ধারণা হইল। যদি দেখিতে পাই, স্নানবেলায় গঙ্গার কোন না কোনও ঘাটে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। এক দিনে না পাই, দুই দিন, দশ দিন— এক মাস পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান করিব। কাশীতে যদি তাঁহাকে থাকিতে হয়, আমার জন্য মা কি স্নান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবেন ?"

"প্রতিদিন তিনি কোন্ সময় আস্‌তেন, ভুবনের মা ?"

"প্রায়ই সূয্যি না উঠ্‌তে উঠ্‌তে। কোন কোন দিন একটু বেলা যে হ'ত না, এমন নয়, কিন্তু সে কদিচ্।"

"বেশ, তাই কর্‌ব।—ঘাটে ঘাটেই খুঁজ্‌ব।"

ক্ষণেক নীরব রহিয়া বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল— "আমার জন্যই কি তাঁকে খুঁজ্‌বে ?"

"না বল্‌লে মিছে হয়, তবে গৌরীর জন্যও বটে। তাঁর কথার ভাবে বুঝেছিলুম, গৌরীকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। আমার কথা ক'বার দোষে তিনি সে কথা পাড়্‌তে পার্‌লেন না।"

"তুমি কি গৌরীকে ছাড়্‌তে পার্‌বে ?"

"পার্‌ব কি, ভুবনের মা ? ছাড়্‌তেই হবে।"

নিরুত্তর বৃদ্ধার চক্ষু এতদিন পরে সিক্ত দেখিলাম।

সারারাত্রি চোখের পলক ফেলিতে পারিলাম না। যে সময় নিত্য উঠি, সেই সময়েই শয্যাত্যাগ করিলাম এবং গৌরী উঠিবার পূর্ব্বেই মায়ের অন্বেষণে ঘর হইতে বাহির হইলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

এস।

কোথা তুমি, কোথা আজি চিত্তচোর রাধিকার ?
জ্বালালে বিরহ-জ্বালা ; কে জ্বালা জুড়াবে তা'র ?
চুরি করি কিশোরীর সুনীল নিচোল-শোভা,
এখনো যমুনা বহে কূলে কূলে মনোলোভা ;
তীরে বংশীবট-শাখে বিহগ বিরাব করে'—
হেরি নভে শ্যাম শোভা শিখীরা কলাপ ধরে ;
তমালের শাখা' পরে মাধবী—ললিতালতা—
যমুনার কলকলে উঠে প্রেম-ব্যাকুলতা ;
ধেনুচরা বনে বনে পবন শ্বসিয়া ফিরে—
তোমারে খুঁজিছে ব্রজ তোমার যমুনাতীরে।
সেই বৃন্দাবন আছে—তুমি নাই ব্রজেশ্বর—
তোমার বিরহে ম্লান পুলকিত চরাচর।
তুমি মুক্তি, তুমি প্রেম, তুমি নিখিলের গতি ;
রাধার সাধনকুঞ্জে—এস, তা'র প্রাণপতি।

স্মৃতি-সৌধ।

(৩)

ারতবর্ষের সিংহাসন লইয়া যে কত বিবাদ—কত রক্ত-াত—কত নরহত্যা—কত পাপানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তাহা ্বির করিয়া বলা যায় না। রাজ্যলাভলালসা মানুষকে যে ব কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছে, নৈতিক হিসাবে সে সব কান্ত গর্হিত। মোগল সম্রাটরা সমগ্র ভারতে প্রভুত্ব-্রতিষ্ঠাচেষ্টা করিবার পূর্ব্বেও এ দেশে বহু বিদেশী রাজা ইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দিল্লীতে তাঁহাদের কাহারও াহারও সমাধিসৌধ আছে। ল্লীর উপকণ্ঠে—কুতবমিনার ইতে প্রায় ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে াগলকাবাদ—ভগ্নাবশেষে পর্য্য-সিত হইতেছে। তথায় তোগলক হ ও তাঁহার হত্যাকারী পুত্র াহিত। ১৩২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই নগর র্মিত হয়। কিন্তু মহম্মদ তোগ-় দৌলতাবাদে রাজধানীরচ-র ভ্রান্ত চেষ্টায় তোগলকাবাদ াগ করেন। বোধ হয়, পানীয় লর ও স্থানটির অস্বাস্থ্যকরতাও ই রাজধানীত্যাগের কারণ ে। আজ তোগলকাবাদের প্রাচীর ও সৌধসমূহ তৃণলতা-্রসমাবৃত হইয়া ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

তোগলকাবাদ।

১২৮৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান বলবনের মৃত্যু হয়। তিনি ক্রীতদাসরূপে রাজপ্রাসাদে নীত হইয়া ভিস্তী হইতে ক্রমে ই সুলতান হইয়া দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন—রাজবংশে তিনি সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার মৃত্যুর পর কর্ম্ম-ারীরা তাঁহার পৌত্র কৈকোবাদকে সিংহাসনে উপবিষ্ট ান। কৈকোবাদ বিলাসে স্বাস্থ্য নাশ করিয়া যখন শয্যায়, তখন এক জন ঘাতুকের পদাঘাতে তাঁহার মৃত্যু । তখন ভারতের নানা স্থানে—বাঙ্গালা প্রভৃতি সুবায় খিলজীরা প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা সেনাপতি জালাল-উদ্দীনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। খিলজীবংশ ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার মধ্যে আলাউদ্দীনই ২০ বৎসর রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।

জালাল-উদ্দীন সরল ও আড়ম্বরহীন ছিলেন এবং বিদ্বজ্জনের সমাদর করিতেন। তাঁহার অনুচররা এ সব ভালবাসিত না—কাযেই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীনই বিদ্রোহীদিগের নেতা হয়েন। এক দিন নিরস্ত্র সুলতান যখন আলাউদ্দীনকে আদর করিতেছিলেন, তখন কৃতঘ্ন জামাতার সঙ্কেতে আক্রান্ত হয়েন এবং তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করা হয়। তাঁহার শুভ্র কেশ জামাতার পদচুম্বন করে। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে এইরূপ নৃশংস কার্য্য করিয়া আলাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মৃত সুলতানের পরিবারবর্গকে অভয় দান করিয়া অন্ধ করেন এবং মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া লোকের মুখ বন্ধ করেন। তিনি স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইতে

ছড়াইতে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁহার শাসন-পদ্ধতির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কোন সৈনিক কুচকাওয়াজে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার ৩ বৎসরের বেতন জরিমানা হয়। আমি মদ্যপ ও মদ্যবিক্রেতাদিগকে গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া থাকি। কেহ যদি পরস্ত্রীগমন করে, তবে আমি এমন ব্যবস্থা করি যে, সে আর সেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না—ব্যভিচারিণীকে নিহত করা হয়। ভালমন্দবালবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে রাজদ্রোহীরা নিহত হয় এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ সর্ব্বস্বান্ত হয়। কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিলে তাহার প্রতি যষ্টি ও সাঁড়াশী প্রযুক্ত হয় এবং সে গৃহীত অর্থ না দেওয়া পর্য্যন্ত শৃঙ্খল অবস্থায় কারাবদ্ধ থাকে। রাজনীতিক অপরাধীদিগকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়।"

সেই সময় হইতেই মোঙ্গলরা উৎপাত করিতে আরম্ভ করে; একবার তাঁহার রাজধানীও আক্রমণ করে। তাহাদিগকে বশীভূত রাখিবার জন্য আলাউদ্দীনকে বহু সৈন্য রাখিতে হয়। তখন সৈনিকের বেতন ২ শত ৩৪ তঙ্কা নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহাতে এই বেতনে সৈনিকরা স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, সেই জন্য সুলতান খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। মণ হিসাবে দর এইরূপ স্থির করা হয়—

গম	...	...	প্রায় তিন আনা
যব	...	...	প্রায় দেড় আনা
চাউল	...	...	প্রায় দুই আনা

তদ্ভিন্ন ডাউল, শাকসব্জী, পশুখাদ্য প্রভৃতির দামও বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কেহ সে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

মোঙ্গলদিগকে পরাভূত করিতে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা তোগলক সাহ বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আলাউদ্দীন কঠোর শাসক ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই রাজ্যে অসন্তোষ-বিস্তার হয় এবং চারিদিকে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। এই অবস্থায় ১৩১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুলতানের প্রিয়পাত্র কাফুর প্রভুর দুই পুত্রকে নিষ্ঠুরভাবে অন্ধ করিয়া তাঁহার ৬ বৎসর বয়স্ক এক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং ক্ষমতা পরিচালন করিতে থাকে। কিন্তু ৫ সপ্তাহ কাটিবার পূর্ব্বেই সে নিহত হয়। বহু রক্তপাতের পর আলাউদ্দীনের পুত্র বিলাসী মুবারক সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুবারকের বিলাসলালসা যেন তৃপ্ত হইত না। তিনি যেমন নির্লজ্জভাবে বিলাসলালসা তৃপ্ত করিতেন, প্রজারাও তেমনই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে থাকে। রাজদরবারে বারাঙ্গনাদিগের এত আদর হয় যে, পূর্ব্বে যে রূপসীর মূল্য ৩০ টাকা মাত্র ছিল—এখন তাহার জন্য ৩ হাজার টাকা দিতে হইত। আলাউদ্দীনের যেমন এক জন প্রিয়পাত্র ছিল—মুবারকেরও তেমনই এক জন প্রিয়পাত্রের অভাব হয় নাই। তাহার নাম রাখা হয়—খসরু খাঁ। সে গুজরাটের হীনজাতীয় হিন্দু। রাজসভায় উলঙ্গ পারিষদদিগের নির্লজ্জ ব্যবহার সাধারণ ঘটনা হইয়া উঠে। মুবারক লোকের দেহ হইতে চর্ম্ম উৎপাটন করিবার দণ্ডও দিতে আরম্ভ করেন। শেষে ১৩২১ খৃষ্টাব্দে খসরু মুবারককে সংহার করে ও স্বয়ং নাশিরুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করে। ইতিহাসে তাহার অত্যাচারের তুলনা নাই। মুবারকের হত্যার ৩ দিন পরে খসরু বলপূর্ব্বক তাহার বিধবাকে বিবাহ করে। রাজপরিবারের মহিলাদিগকে বিলাইয়া দেওয়া হয়। "নিষ্ঠুরতায় ও রক্তপাতে আকাশ লোহিত হইয়া উঠে।" হিন্দু মুসলমান সকলেই তাহার অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। তখন যদি কোন রাজপুত চেষ্টা করিতেন, তবে তিনি স্বজাতীয়দিগের সম্মিলিত চেষ্টায় সিংহাসন লাভ করিতে পারিতেন। তখন হিন্দু নৃপতিরা সম্পূর্ণরূপে মুসলমান সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কোন হিন্দু এই হীনজাতীয় খসরুর সহায়তা করিতে পারেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্জাবের শাসক তোগলক মোঙ্গলদিগকে বারবার পরাভূত করিয়াছিলেন। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে ইবন-বতুতা মুলতানে কোন মসজেদে লিখিত দেখিয়াছিলেন—"আমি (তোগলক) ২৯ বার তাতারদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছি।" মুসলমানরা তাঁহাকেই নেতৃপদে বরণ করিলে, তিনি খসরুকে আক্রমণ করেন। খসরু পরাজিত ও নিহত হইলে তোগলক বলেন, "রাজবংশের বংশধর কে আছে—লইয়া আইস; তাহাকে সিংহাসন প্রদান করিব।" কিন্তু কাহাকেও না পাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনিই ১৩২১ খৃষ্টাব্দে সুলতান হয়েন।

তিনি সুলতান হইয়া সপ্তাহকালমধ্যে সর্ব্ববিধ অনাচার দূর করিয়া শৃঙ্খলা ও শান্তিস্থাপন করেন। সিংহাসনে আরোহণের দিন তিনি আলাউদ্দীনের ও মুবারকের আত্মীয়স্বজনগণের সন্ধান করিয়া মহিলাদিগের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং আলাউদ্দীনের দুহিতাদিগকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করেন। যাহারা মুবারকের হত্যার ৩ দিন পরেই খসরুর সহিত তাহার বিধবার বিবাহ দিয়াছিল, সুলতান তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে দণ্ডিত করেন। তিনি রাজস্ব এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট করেন যে, কৃষকরা অধিক পরিমাণ শস্যোৎপাদনে মনোযোগী হয় এবং করভার দুর্ব্বহ বিবেচনা না করে।

তাহার পর তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হয়েন। এই সময় লক্ষ্মণাবতী হইতে কয় জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে জানান —তথায় প্রজারা, বিশেষ মুসলমানরা বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইতেছে। এই কথা শুনিয়া সম্রাট উলুগ খাঁকে রাজধানীতে রাখিয়া লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ত্রিহুতে উপনীত হইলেই লক্ষ্মণাবতীর শাসক সুলতান নশীরুদ্দীন আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। সোনারগাঁ'র শাসক বাহাদুর শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পরাভূত হয়েন এবং তাঁহার গলদেশ রজ্জুবেষ্টিত করাইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আনয়ন করা হয়।

তিনি তোগলকাবাদ রচনা করেন এবং তথায় আপনার সমাধির জন্য কল্পনা করিয়া এক রম্য সৌধ গঠিত করান। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার শব তথায় সমাহিত হয়। তাঁহার মৃত্যু অতি শোকাবহ ঘটনা। তিনি লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সংবাদ পাইয়া উলুগ খাঁ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তোগলকাবাদ হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে আফগানপুরে একটি অস্থায়ী আগার নির্ম্মাণ করান—তথায় রাত্রিযাপন করিয়া বিশ্রামান্তে সুলতান পরদিন শোভাযাত্রা করিয়া সমারোহে রাজধানীতে আসিবেন। সুলতান অপরাহ্ণে তথায় উপনীত হইলেন। আহারের পর অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যখন হস্ত-মুখ প্রক্ষালনের জন্য বাহিরে আসিলেন, তখন সেই অস্থায়ী গৃহের ছাত পড়িয়া গেল। কেহ বলেন, বজ্রপাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদের ষড়যন্ত্রে এই ঘটনা ঘটে এবং কিংবদন্তী ইহার সহিত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার নাম বিজড়িত করিয়াছে। আপনার দেহ দিয়া তিনি এক পুত্রকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই অবস্থায় তাঁহার শব পাওয়া যায় ও তাঁহার নির্ম্মিত স্মৃতি-সৌধে সমাহিত হয়।

তোগলকের সমাধি-সৌধ

নিজামুদ্দীন মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিল্লীতে তাঁহার দরগা মুসলমানের পবিত্র তীর্থ। প্রাচীন দিল্লীর ইতিহাসে রাজাদিগের সহিত এই সব ক্ষমতাশালী ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার বিবাদের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। তোগলকাবাদের ভগ্নস্তূপে ও দরগার পুষ্করিণীতে তাহার কিম্বদন্তী বিজড়িত। কিম্বদন্তী এই যে, তোগলক তাঁহার রাজধানী রচনার জন্য নিজামুদ্দীনের শ্রমজীবীদিগকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়েন। সাধু তখন দীপালোকে নিশাকালে পুষ্করিণী খননের কায চালাইতে লাগিলেন। বিরক্ত হইয়া সুলতান আদেশ প্রচার করিলেন—কেহ সাধুকে তৈল বিক্রয় করিতে পারিবে না। কিন্তু সাধুরই জয় হইল
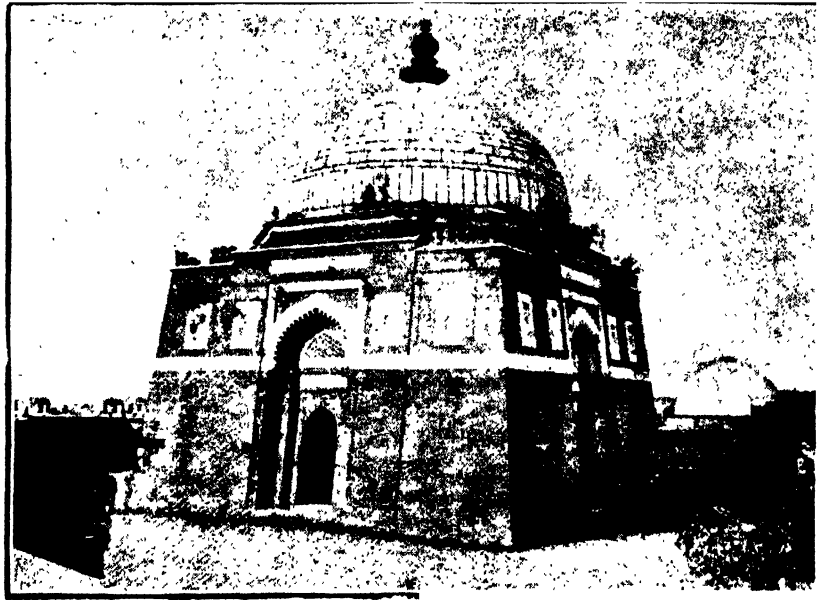
—অর্থাৎ ধর্ম্মবল যে বাহুবল অপেক্ষা প্রবল, তাহাই প্রতিপন্ন হইল; সাধুর প্রার্থনায় পুষ্করিণীর জল হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল এবং সেই আলোকে শ্রমজীবীরা নিশাকালে পুষ্করিণী খনন করিতে লাগিল। সুলতান তখন অভিসম্পাত করিলেন—পুষ্করিণীর জল তিক্ত হইল। সাধুর অভিসম্পাত তোগলকাবাদে বর্ষিত হইল—

ইয়া বাসে গুজার
ইয়া রহে উজার

এ নগর গুজারের বাসভূমি হউক বা পরিত্যক্ত হউক।

সুলতান যখন সাধুকে দিল্লীছাড়া করিবেন ভয় দেখান, তখন সাধু বলিয়াছিলেন—"হনোজ দিল্লী দূরস্ত"—দিল্লী এখনও দূরপথ। সুলতানের আর দিল্লীতে আসা হয় নাই। কিংবদন্তী, সাধুর উপদেশে তোগলকের পুত্র মহম্মদ তোগলক ষড়যন্ত্র করিয়া আফগানপুরে পিতৃহত্যা করেন।

দরগার প্রবেশদ্বারে যে তারিখ আছে, তাহাতে দেখা যায়—উহা ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। পথের পার্শ্বে একটি পুরাতন পাঠান সমাধি এবং একটি দ্বিতল মসজেদ। উত্তরে সম্রাট সাহজাহানের প্রেমপাত্রী বাই কোকালদের সমাধি। আর সম্মুখে বাওলী বা পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণী লইয়া সাধুতে ও সুলতানে বিবাদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহার নাম "চশমা দিল খুসা"—মনোমুগ্ধকর উৎস। পার্শ্বের সৌধচূড়া হইতে পারিতোষিকলোভে বালকরা এই পুষ্করিণীর জলে লাফাইয়া পড়ে। পুষ্করিণীর পূর্ব্বাংশে জলের মধ্যে একটি খিলান দেখা যায়। কিংবদন্তী—এই পথে একটি ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করা যায়; সাধু কিছুদিন তাহাতে বাস করিয়াছিলেন।

নিজামুদ্দীনের সমাধি-সরোবর।

পুষ্করিণীর পরে যে দ্বার, তাহা ফিরোজশা তোগলক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তাহার পর আর একটি দ্বার অতিক্রম করিয়া দরগার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। মধ্যে একটি বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ—স্নিগ্ধ ছায়া বিতরণ করিতেছে। নিকটে একটি অষ্টকোণ বৃহদাকার মর্ম্মর-পাত্র। আজমীরে মসজেদের বৃহৎ বৃহৎ রন্ধন-পাত্রের মত এই পাত্রও সময় সময় দুগ্ধে ও মিষ্টান্নে পূর্ণ করা হয়।

দ্বারের পর এক পার্শ্বে একটি মিলন-গৃহ বা মজলিসখানা। জনরব, ইহা সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রাঙ্গণমধ্যে সাধুর সমাধি। তাহার পার্শ্বেই জমাতখানা মসজেদ। ইহার স্থাপত্য প্রথম পাঠান যুগের। ইহা সম্রাট ফিরোজশাহের সময়ের বলিয়া বোধ হয় না, বরং গঠনসাদৃশ্যে মনে হয়—ইহা আলাউদ্দীনের সময়ের—আলাই দরজার মত। তবে ফিরোজ হয় ত ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে বহু ভক্ত এই সমাধি-সৌধের সংস্কার করায় পুরাতন সৌধের আর বড় কিছু অবশিষ্ট নাই। বাহিরে বিস্তৃত বারান্দা—ছিদ্র করা মর্ম্মর-প্রাচীর দিয়া আলোক সমাধিকক্ষে প্রবেশ করিয়া—সে কক্ষে যেন গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার করে। বারান্দার ছাত মিষ্টার ক্লার্ক কর্ত্তৃক পুনর্গঠিত হয়। মধ্যে সমাধি—মর্ম্মরের বৃতিবেষ্টিত। সমাধির উপর ঝিনুকের কায করা কাষ্ঠের আবরণ থাকে।
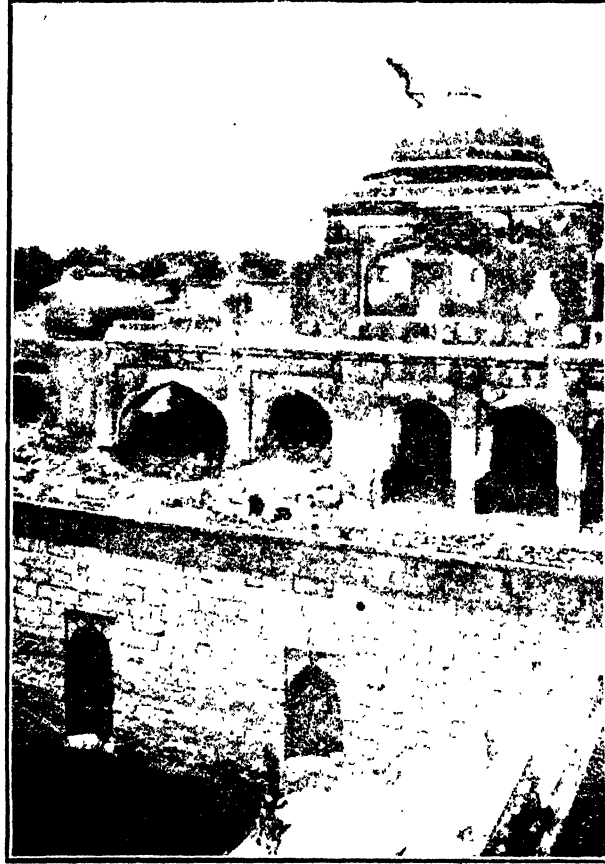
এই দরগার মধ্যেই একটি আসন আছে—সাধু বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত ও উপদেশপ্রার্থীদিগকে লইয়া তথায় বসিয়া কথোপকথন করিতেন।

এই দরগা মুসলমানদিগের নিকট অতি পবিত্র স্থান। এই দরগায় "দীন-আত্মা" সম্রাট-কন্যা জাহান-আরার তৃণাস্তৃত সমাধি অবস্থিত। তদ্ভিন্ন এই দরগায় আরও এত সমাধি বিদ্যমান যে, ইহাকে সমাধিক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতি-সৌধের অলিন্দে বসিয়া মৌলবীরা কোরাণ পাঠ করেন। আজ কয় শতাব্দীর ব্যবধানে এক দিকে তোগলকাবাদের ধ্বংসাবশেষ ও পুষ্করিণীমধ্যে তোগলকের স্মৃতি-সৌধ—আর এক দিকে দিল্লীর উপকণ্ঠে নিজামুদ্দীনের সমাধি দেখিলে মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সাধুর সেই কথাই মনে পড়ে—"হনোজ দিল্লী দূরস্ত"—মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—মানুষ যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করিতে পারে না—
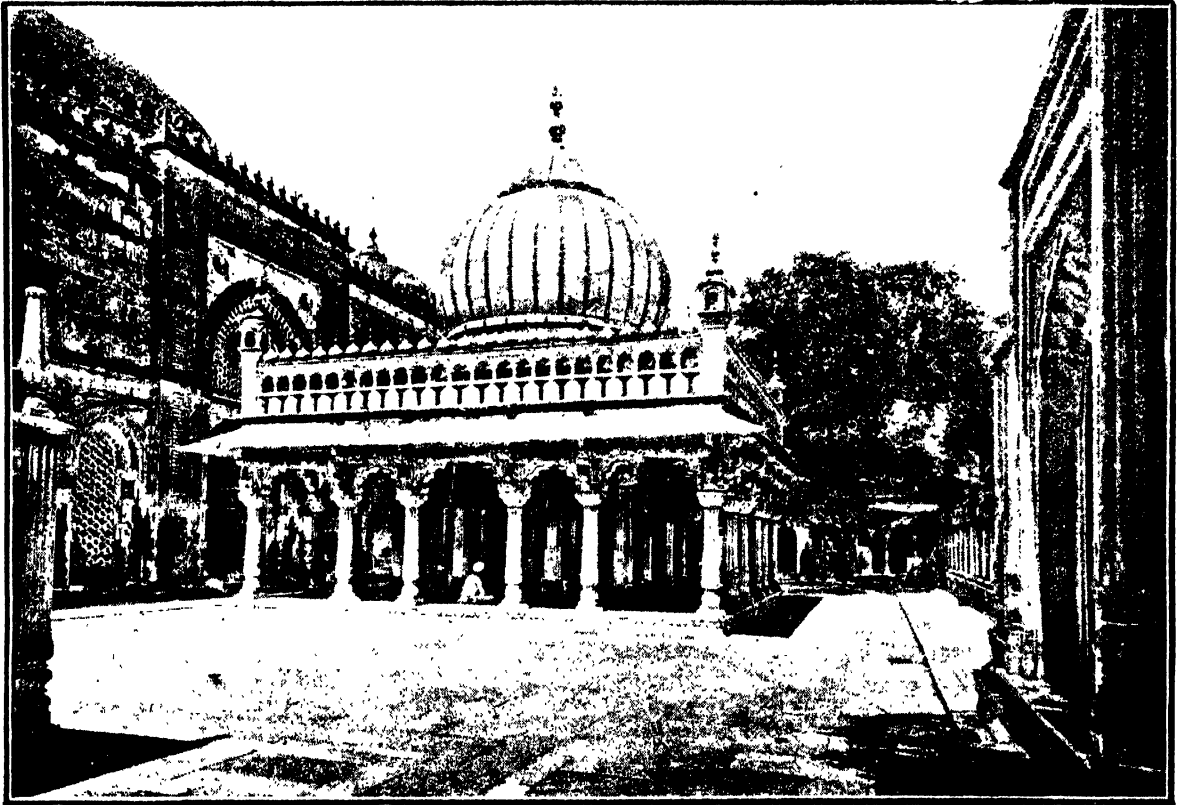
নিজামুদ্দীনের সমাধি-সৌধ

এই সকল সমাধির মধ্যে আমীর খসরুর সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কবির কবিত্ব বিশেষ আদৃত এবং ইঁহাকে "শর্করাজিহ্ব তুতী" বলা হইত। ইনি নিজামুদ্দীনের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

আজ দিল্লীর উপকণ্ঠে দরগার মধ্যে নিজামুদ্দীনের শব সমাহিত। ভক্তদল তাঁহার সমাধির উপর কুসুম স্থাপন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন—প্রণামীও দিয়া থাকেন। সেই

বংশের মর্য্যাদা কিংবা ক্ষমতা-গৌরব,
সৌন্দর্য্য ও ধন করে যাহা কিছু দান—
অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর তরে অপেক্ষিছে সব;
গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর সোপান।
উচ্চ স্মৃতি-চিহ্ন কিংবা প্রতিমূর্ত্তি তা'র—
ফিরে কি আনিয়া দিবে শূন্য দেহে প্রাণ;
শীতল—চেতনহীন শবদেহ যা'র—
এই স্মৃতি-সৌধতলে রয়েছে শয়ান?

ফোনোগ্রাফ।

অলৌকিকে বিশ্বাস এমনই আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ যে, অনেক অসম্ভব কথা বা ঘটনা আমরা সহজে মানিয়া লই, কোন সংশয় বা তর্ক উপস্থিত করি না। এই যে আকাশবাণী কথাটা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, ইহার অর্থ কি? অশরীরী বাণীই বা কি? দেহশূন্য বাক্য কি কল্পনা করা যায়? আকাশবাণী অর্থে এই বুঝায় যে, যাঁহার বাণী, তিনি দৃষ্টির অগোচর, কেবল তাঁহার উচ্চারিত কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। দেহ নাই, কণ্ঠ নাই, অথচ কণ্ঠ-নিঃসৃত কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। মৃত্যু আগত হইলে জীব নীরব হয়, কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়। বাক্য অমর, এ কথা শরীর সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে, কেন না, শরীর ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বর। ঋষিরা নাই, বেদ রহিয়াছে; বাল্মীকি নাই, রামায়ণ রহিয়াছে। কীর্ত্তি অমর, প্রতিষ্ঠা অমর, মানুষের দেহ অথবা দেহের কোন প্রক্রিয়া অমর নহে। মানুষের কণ্ঠের স্বর অথবা তাহার মুখের কথা তাহার মৃত্যুর পর শুনিতে পাওয়া যায় অথবা রক্ষা করিতে পারা যায়, ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে? মানুষের কণ্ঠস্বর অবিনাশী অথবা দীর্ঘস্থায়ী, এ কথার অর্থ কি? মুখের কথা, কণ্ঠের স্বর দেহের প্রক্রিয়া মাত্র। যেমন আমরা অঙ্গভঙ্গী করি, হস্ত-পদ চালনা করি, অপর ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য করি, সেইরূপ কণ্ঠ দ্বারা শব্দ করি। মানুষ যখন মরিল, তখন কণ্ঠ স্তব্ধ হইল, আর সে কণ্ঠ হইতে কোন শব্দ নির্গত হইবে না। অতএব যদি বলা যায় যে, মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে শৈশবের অভ্যস্ত ভূত-প্রেতের কথা মনে করিয়া কিছু আতঙ্ক হয়।

এখন দেখিতেছি, আধুনিক বিজ্ঞানের বলে কণ্ঠের স্বর দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া রক্ষা করা যায়। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মারকোনির তারশূন্য টেলিগ্রাফ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কীর্ত্তি, ফোনোগ্রাফ জগদ্বিখ্যাত এডিসনের আবিষ্কার। এই যন্ত্র দ্বারা মানুষের কণ্ঠস্বর, পাখীর গান, রেলের বাঁশী, যে কোন শব্দ ধরিয়া রাখা যায়, আবার ইচ্ছামত যন্ত্রমুখে বাহির করা যায়। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আবিষ্কর্ত্তা কি অভিপ্রায়ে এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষ হইতে উত্তর হইতে পারে যে, লোক ইহার সদ্ব্যবহার করে, এই তাঁহার আশা। ফলতঃ কোন নূতন আবিষ্কার অথবা সৃষ্টির অভিপ্রায় আর কিছুই নয়, মানুষের মঙ্গল কিংবা আনন্দ সাধনা। তবে মানুষকে হত্যা করিবার নানা যন্ত্র এ শ্রেণীর নয়। ফোনোগ্রাফ মানুষের কণ্ঠকে অশরীরী করিয়াছে। আজ আমেরিকায় কেহ গান করিলে দুই মাস পরে কলিকাতায় বসিয়া গ্রামোফোনে সকলে সেই গান শুনিতে পারে। ইহা ত বড় মজার কথা! ফোনোগ্রাফ গ্রামোফোনে লোকের কৌতুক উদ্রিক্ত হইল। পেশাদার নায়ক-নায়িকাদিগের গান, হাসির কথা ও ছড়া টাকা দিয়া গ্রামোফোনের জন্য ক্রয় করা হয়। যেখানে মজলিস, সেখানেই গ্রামোফোনের শব্দ শোনা যায়—খেয়াল, টপ্পার লহর, হাসির গট্‌রা, ভাঁড়ামি যাহা চাও, তাহাই পাইবে। এই জন্য কি ফোনোগ্রাফের আবিষ্কার হইয়াছিল?

এক রাত্রিতে গ্রামোফোনের শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। এক জন প্রসিদ্ধ গায়কের গান নিস্তব্ধ নিশীথে শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিল। এই গায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল, কিন্তু ইনি এখন পরলোকে। অথচ ইঁহার মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতে কত লোক মুগ্ধ হইবে! সঙ্গীতে ইঁহার যশ ছিল, কিন্তু ইঁহার অন্য কোন কীর্ত্তি নাই; ইঁহার ফোটোগ্রাফ কিংবা প্রতিমূর্ত্তি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, অমুকের কণ্ঠ বড় চমৎকার, কিন্তু ইনি দেখিতে কেমন ছিলেন?—সে সময় ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি কেহ দেখাইতে পারিবে না। এই এক নূতন রকম যশ, নূতন ধরণের স্মৃতিচিহ্ন। চিত্রকরের চিত্রিত অথবা ভাস্করের ক্ষোদিত কোনরূপ প্রতিকৃতি নাই, আছে কেবল বিজ্ঞানকৌশলে রক্ষিত কণ্ঠস্বর। ইহাই ত অশরীরী বাণী! যে শরীর হইতে, যে কণ্ঠ হইতে এই সঙ্গীত-লহরী নিঃসৃত হইয়াছিল, সে শরীর ও সেই কণ্ঠ বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু বায়ুস্তরে তরঙ্গায়িত মধুর কণ্ঠস্বর অপূর্ব্ব কৌশলে শত শত বৎসর রক্ষিত হইবে। গান আছে, গায়ক

নাই; কণ্ঠের আলাপ, স্বরের, রাগিণীর মূর্চ্ছনা আছে, কণ্ঠ নাই।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হয়, লোকে সেই সকল প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি স্মরণ করে। কবি, চিত্রকর, বাগ্মী, রাজনীতিবিশারদ, রাজা, রাজপ্রতিনিধি, সেনাপতি প্রভৃতির চিত্র বা মূর্ত্তি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কতক যথাযথ, কতক কল্পিত। প্রাচীন কালের মহাকবি কিংবা মহাযোগীর চিত্র কল্পনা মাত্র। কেন না, সেকালে ফোটোগ্রাফ ছিল না, চিত্রবিদ্যাও সবিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে নাই। তথাপি যীশু খৃষ্ট অথবা সেক্ষপীয়রের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, হয় ত বা ইহাঁরা দেখিতে এইরূপই ছিলেন। যে সকল প্রখিতনামা ব্যক্তি এখন জীবিত আছেন, তাঁহাদের অনেকের চিত্রই আমরা দেখিয়াছি, চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য ঘটে নাই। যে সকল ক্ষমতাশালী বা ক্ষণজন্মা ব্যক্তি ইহলোকে আছেন কিংবা পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই। তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলে কি আমরা সবিশেষ আনন্দ ও চরিতার্থতা লাভ করি না? চিত্র যদি কেবল ব্যঙ্গচিত্র হইত, শক্তিশালী অথবা রূপশালী নরনারীর চিত্র অঙ্কন না করিয়া কেবল কৌতুক-বিদ্রূপের জন্যই চিত্রের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে তাহাতেই কি আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম? এডিসনের যেরূপ প্রতিভা, তিনি চিরকাল যেরূপ গম্ভীর-প্রকৃতির লোক, তাহাতে তিনি ফোনোগ্রাফের অপব্যবহারে যে সন্তুষ্ট, এরূপ কখনই মনে হয় না। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি এই অপূর্ব্ব যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন—কেবল কি লোক হাসাইবার জন্য আর নটনটীর সঙ্গীত বাদ্য রক্ষা করিবার জন্য? যদি কোন লোকবিশ্রুত বাগ্মী বা ক্ষমতাবান্ পুরুষের কণ্ঠস্বর ফোনোগ্রাফে তুলিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সে অনুরোধ অস্বীকার করেন কেন? কারণ, ফোনোগ্রাফ গ্রামোফোন তামাসাবিদ্রূপের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে, ইহার দ্বারা লোকশিক্ষার কোন অঙ্গ রক্ষিত বা সাধিত হয় না। যে ফোনোগ্রাফে পেশাদার সাধারণ নটীর ও ভাঁড়ের কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া যায়, সে যন্ত্রে যশস্বী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের কণ্ঠস্বর দিতে স্বীকৃত হইবেন কেন?

তবে কি এই অপূর্ব্ব বিজ্ঞান-যন্ত্রের এই পরিণাম হইবে, ইহার দ্বারা আর কোন শ্রেষ্ঠতর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না? এরূপ অবশ্য দেখা গিয়াছে যে, কোন বিচিত্র যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় এক, মানুষের ব্যবহারের ফলে দাঁড়ায় আর। এয়রোপ্লেন বিমানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য আকাশপথে বায়ুবেগে ভ্রমণ করা, কিন্তু সেই এয়রোপ্লেন হইতে বোমা ফেলিয়া যদি শত সহস্র প্রাণী হত্যা করা যায়, তাহা হইলে কে নিবারণ করিতে পারে? ফোনোগ্রাফে খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের কণ্ঠস্বর রক্ষা করিবার কথা, কিন্তু যদি কেবল ঠাট্টা-মস্করার জন্য ঐ যন্ত্রের ব্যবহার হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতীকার কি? সিনেমায় নট-নটীগণ কথা কহিবে, অনেক দিন হইতে সে চেষ্টা হইতেছে; যদি সফল হয়, তবে গ্রামোফোনের সাহায্যে হইবে। এই যে বিজ্ঞানের নূতন নূতন কৃতিত্ব, ইহা কি কেবল আমোদেরই অঙ্গীভূত হইবে, ইহা হইতে কি লোকশিক্ষার কোন উপায় হয় না?

এত কাল লোক জানিত, মানুষ যায়, তাহার সঙ্গে তাহার দেহের সমস্ত প্রক্রিয়া যায়। মানুষ মরিল, তাহার চক্ষুর দৃষ্টি গেল, কর্ণের শ্রবণশক্তি গেল, কণ্ঠের স্বর গেল, পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল। তাহার মানসিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের দীর্ঘস্থায়িত্ব হইতে পারে, তাহার রচিত গ্রন্থ, দর্শন, বিজ্ঞান, তাহার লোক ও ধর্ম্মশিক্ষা, তাহার অঙ্কিত চিত্র কিংবা তাহার হস্তনির্ম্মিত মন্দির প্রাসাদ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু দৈহিক কোন প্রক্রিয়া কেমন করিয়া রক্ষা করিতে পারা যায়? সেই অঘটন এখন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে উপকথায় যেমন কোন দৈত্যের প্রাণ তাহার শরীরের বাহিরে রক্ষিত হইত, সেইরূপ মানুষের কণ্ঠের স্বর এখন তাহার কণ্ঠের ও দেহের বাহিরে রক্ষা করিতে পারা যায়; যাহার কণ্ঠস্বর, তাহার মৃত্যু হইলেও সে স্বর স্তব্ধ হইবে না, ইচ্ছামত শুনিতে পাওয়া যাইবে।

শুধু মজা-তামাসার সামগ্রী না হইয়া ফোনোগ্রাফ বা গ্রামোফোন যদি লোকশিক্ষার জিনিষ হইত, তাহা হইলে মানুষের কত উপকার হইত! ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে যদি কেহ বলিত যে, মানুষের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় এবং ইচ্ছামত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে লোক তাহাকে বাতুল মনে করিত। এখন ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, যেমন অন্য সামগ্রী অনেক দিন তুলিয়া রাখা

যায়, তেমনই মানুষের গলার আওয়াজ বা অন্য কোন শব্দ অনেক দিন রাখিতে পারা যায়।

ভারতে বেদের প্রথম আবির্ভাব, প্রভাত আকাশে, স্বচ্ছ কলনাদিনী স্রোতস্বিনী-তটে, অথবা হোমাগ্নির প্রজ্বলিত লোলায়মান শিখার সমক্ষে মধুর গম্ভীর স্বরে ঋক্ ও সামগান আমরা কল্পনা করি। সে বেদ অদ্যাবধি রহিয়াছে, কিন্তু সে ঋষিকণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়াছে। ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত দেখিয়া যখন বাল্মীকির কণ্ঠ হইতে ছন্দোবদ্ধ বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল, তখন তাহা শুনিতে কেমন হইয়াছিল? লব-কুশই বা রাজসভায় কিরূপ কণ্ঠে রামায়ণ গান করিয়াছিলেন? যদি ঋষি গৌতমকৃত ন্যায়ের ব্যাখ্যা কোন যন্ত্রে আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে বুধমণ্ডলী সে কণ্ঠ আজ শুনিতে পাইতেন। শাক্যসিংহের উপদেশ, যীশু খৃষ্টের Sermon on the Mount যদি কোন যন্ত্রে আবদ্ধ করিয়া রক্ষিত হইত, তবে আজ লোক সেই মহাপুরুষদ্বয়ের মহাবাক্য তাঁহাদের নিজের কণ্ঠস্বরে শুনিতে পাইত!

অতীতের অনুশোচনা নাই, কিন্তু যাহার অস্তিত্বই ছিল না, তাহার জন্য ক্ষোভ করা বৃথা। সেকালে মহাপুরুষরা ছিলেন, কিন্তু ফোনোগ্রাফ ছিল না। এখন ফোনোগ্রাফ আছে, কিন্তু সে সকল মহাপুরুষ নাই। মানিলাম। কিন্তু এখনও ত অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন—যাঁহাদের কণ্ঠস্বর ভবিষ্যতে লোকের মনোরঞ্জন ও প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিবে। ফোনোগ্রাফ ও গ্রামোফোনে এমন লোকের কণ্ঠস্বর রাখা যায় না কেন? ইতঃপূর্ব্বেই ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেই কথাটা মিটিয়া যায় না। ফোনোগ্রাফ ও গ্রামোফোন ব্যবসার সামগ্রী। যে সকল রেকর্ডে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের কণ্ঠস্বর থাকিবে, বাজারে তাহা না বেচিলেই হইবে। কোন বিজ্ঞান বা সাহিত্য-মন্দিরে এই সকল রেকর্ড রাখা যাইতে পারে, শিক্ষিত শ্রোতারা সময়ে সময়ে সমবেত হইয়া শ্রবণ করিতে পারেন। এখন যে সকল প্রতিভাবান্ ও যশস্বী ব্যক্তির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে কাহার না ইচ্ছা করে? অথচ ফোনোগ্রাফ ও গ্রামোফোনের অপব্যবহার হওয়াতে তাঁহাদের কণ্ঠ ঐ যন্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রামোফোন যন্ত্রের নট-নটীদের গান শুনিবার জন্য অধিক কুতূহলী হইবে, না প্রেসিডেণ্ট উইলসন ও লয়েড জর্জ্জের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিবে? যাহারা গ্রামোফোন যন্ত্র ও রেকর্ড বিক্রয় করেন, তাঁহারা এ কথা ভাবিতে না পারেন, কিন্তু চিন্তাশীল লোকের পক্ষে ইহা ভাবনার কথা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অভয়

(গান)

ভরসা মায়ের চরণ-তরণী, আমরা এবার হবই পার,
ভয় গেছে দূরে অভয় পেয়েছি, মাভৈঃ বাণী শুনেছি মা'র;
বীর-প্রসবিনী জননী মোদের, বীর-সন্তান আমরা বীর;
বিলাসে ব্যসনে ধরেছিল জরা, নত হয়েছিল উচ্চ শির;
জানি না কাহার চরণ-পরশে, উজলি উঠিল পূরবাকাশ;
মোহ-মদিরার নেশা গেল ছুটে, তামসী নেশার হইল নাশ;
জাগিল স্মৃতিতে পূরব গরিমা, আর কি জীবনে কালিমা রবে?
দাঁড়া রে সকলে 'জয় মা' বলিয়া তোদের বিজয় হবেই হবে।

শ্রীমুকুন্দ দাস।

আদর্শ ধনী।

। অস্কার ওয়াইল্ডের 'মডেল মিলিয়নেয়র্' গল্পের অনুবাদ। ।

আর্থিক দৈন্য থাকিলে পুরুষের দৈহিক অথবা মানসিক সৌন্দর্য্য কোনও কাযেই আসে না। বরং তাহা বিড়ম্বনার কারণ হয়! প্রণয়ের ব্যবসা ধনী লোকেরই একচেটিয়া কারবার, গরীবের নয়। দরিদ্র কেন রমণীর ভালবাসা পাইবার স্পর্দ্ধা করিবে? সে কেবল বড়লোকের জন্য হৃদয়ের শোণিত দিয়া খাটিবে, আর তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যে কোনও মতে কুক্কুরের ন্যায় জীবন ধারণ করিবে। আধুনিক সভ্যতার ইহাই—প্রকৃত তথ্য ও নিষ্ঠুর সত্য। কিন্তু হিউগি আরস্কিনের মাথায় এ ধারণা কিছুতেই আসিত না। আহা! বেচারা! মস্তিষ্ক-সম্পদে সে যে বড় সম্পন্ন ছিল, তাহা নহে। সে জন্মে কখনও কোন স্মরণ-যোগ্য মৌলিক কথা কহে নাই। যাহাতে কাহারও মনে বেদনা জন্মে, এমন কথাও সে কখনও কাহাকেও বলে নাই। কিন্তু তাহার চেহারাখানি খুবই সুন্দর ছিল। চুলগুলি সোনালি রঙ্গের—ঈষৎ কুঞ্চিত; মুখখানি যেন কুঁদে কাটা, চক্ষুর্দ্বয় নীলাভ ধূসর বর্ণের। পুরুষ-সমাজে যেমন তাহার আদর ছিল, রমণী-সমাজে ঠিক তেমনই; বরং ততোঽধিক। পুরুষের যাহা দরকার, সে সব গুণই তাহার ছিল। সে কেবল একটা জিনিষ জানিত না - কেমন করিয়া টাকা রোজগার করিতে হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে সে তাহার পরলোকগত পিতার সম্পত্তির ভিতর পাইয়াছিল একখানি পুরাতন মরিচাধরা তরবারি ও পঞ্চদশ খণ্ডে সমাপ্ত একখানি জীর্ণ পেনিনসুলার যুদ্ধের ইতিহাস। হিউগি তরবারিখানিকে আরসির হুকে ও বইগুলিকে কতকগুলি ছিন্ন-পত্র মাসিকপত্রিকার সহিত অনাড়ম্ভাবে ঘরের এক কোণে একটি শেল্‌ফে তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। তাহার এক বৃদ্ধা খুড়ী মরিবার সময় তাহাকে দুই শত মুদ্রা বার্ষিক আয়ের একটু সম্পত্তি দিয়া যায়েন। সেই টাকাতেই হিউগির কোনমতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। পয়সা রোজগারের জন্য হিউগি সব রকমের কাযই একটু আধটু চেষ্টা করিয়া দেখিতে কসুর করে নাই। ছয় মাস সে কোম্পানীর কাগজের বাজারে ঘুরে। কিন্তু, প্রজাপতি কেন যণ্ড ও ঋক্ষের দলে মিশিতে পারিবে? ছয় মাসের কিছু অধিককাল সে চায়ের কারবার করিয়া দেখিল। 'পিকো' ও 'সুচং' এই দুই রকমের চায়ের তফাৎ কি, তাহা ঠিক করিতেই তাহার মাথা বেজায় গুলাইয়া গেল। তাহার পর কিছুদিন সে শেরি মদের ব্যবসায় করিল। তাহাও তাহার ভাল লাগিল না। অবশেষে সে সব ছাড়িয়া দিয়া একটি আসল অকম্মা স্ফূর্ত্তিবাজ বেকার ফুলবাবু হইয়া বসিল।

উপসর্গের উপর উপসর্গ। গণ্ডের উপর বিস্ফোটক, রোগের উপর রোগ, তাহার হৃদয়ে অলক্ষিতে একটু ভালবাসার বীজ উপ্ত হইয়া তাহার কর্ম্মভোগের মাত্রাটাকে আরও একটু বাড়াইয়া তুলিল। তাহার প্রণয়িনীর নাম ছিল, লরা মার্টন। লরার পিতা ভারতবর্ষে সৈনিক-বিভাগে এক জন কর্ণেল ছিলেন। ভারতে থাকিবার সময়েই অতিরিক্ত সূর্য্যতাপে তাঁহার মেজাজ একটু "খরিয়া" গিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া তাহার ঝাঁজ কমিল না। লরা হিউগিকে খুব ভালবাসিত। হিউগিও লরাকে এত ভালবাসিত যে, লরার পায়ে কাঁটা ফুটিলে, সে তাহা দাঁতে করিয়া তুলিয়া দিতেও সঙ্কোচ বোধ করিত না। তাহাদের জোড়া বেশ মানানসইই হইয়াছিল। কিন্তু একটি কপর্দ্দকেরও সঙ্গতি তাহাদের ছিল না। কর্ণেল হিউগিকে একটু ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু বিবাহের নামেই তিনি তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিতেন।

মাঝে মাঝে উপদেশ-ব্যপদেশে তিনি হিউগিকে বলিতেন, "তার জন্য এত ব্যস্ত কি বাপু! আগে দশ হাজার খানেক পাউণ্ডের যোগাড় কর, পরে ও সব কথা।" দশটি কাণাকড়ি যোগাড় করা হিউগির পক্ষে কষ্টকর; দশ হাজার পাউণ্ড সে কোথা হইতে পাইবে? এই ভাবনায় সে দিশাহারা হইয়া যাইত। সান্ত্বনার জন্য সে মাঝে মাঝে লরার সঙ্গে আলাপের আশ্রয় লইত।

একদিন প্রাতে সে বিষণ্ণ মনে হল্যাণ্ড পার্কের (যাহার সন্নিকটে মার্টন পরিবার বাস করিত) অভিমুখে যাইতেছিল। পথিমধ্যে তাহার অন্যতম সুহৃদ এল্যান ট্রেভরের সহিত

একবার দেখা করিতে হিউগির ইচ্ছা হইল। ট্রেভরের ব্যবসায় ছিল চিত্র অঙ্কন ও বিক্রয়। আজকাল অনেকেই অন্য কাযে অপারগ হইলে ছবি আঁকে। কিন্তু ট্রেভর সেরূপ প্রাণহীন 'পটুয়া' মাত্র ছিল না। সে ছিল এক জন প্রকৃত শিল্পী। ট্রেভর দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল না। মোটা-সোটা, একটু চাষাড়ে চাষাড়ে শরীর! মুখখানি ব্রণে ভরা। লাল রঙ্গের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কিন্তু তুলিতে সে ফুল ফুটাইয়া দিত। তাহার আঁকা ছবি বাজারে খুব দরে বিক্রয় হইত। হিউগির উপর তাহার আকর্ষণের কারণ, প্রথম অবস্থায় ছিল, হিউগির সুন্দর চেহারা। ট্রেভর সময়ে সময়ে বলিত, "যাহাদের চেহারা সুন্দর,যাহাদিগকে দেখিলে শিল্পীর হৃদয়ে কলানুমোদিত প্রীতি সঞ্জাত হয়, যাহাদের সহিত কথায়-বার্ত্তায় শিল্পী তাহার ভাব-প্রবণ হৃদয়ে প্রকৃত আনন্দ অনুভব করে, সেই সব লোকের সঙ্গেই শিল্পীর ভাব থাকা উচিত। সুচেহারার পুরুষ ও সুরূপা নারীর দ্বারা জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্ততঃ হওয়া উচিত।" যাহা হউক, হিউগির উপর ট্রেভরের আকর্ষণের কারণ প্রথম সূত্রপাতে চোখের নেশা হইলেও, হিউগির প্রফুল্লতা, উদারতা, সদাশয়তা ও মানসিক সম্পদই পরে তাহাদের পরস্পরকে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ করে। সেই জন্য, হিউগির নিকট ট্রেভরের চিত্রাগারের দ্বার সর্ব্বদাই অবারিত থাকিত।

হিউগি যখন ট্রেভরের চিত্রশালায় প্রবেশ করিল, ট্রেভর তখন একখানি জীবন্ত-আকারের দারিদ্র্যের ছবিতে তাহার কলাকুশল শেষ তুলিকা চালনা করিতেছিল। যে আদর্শ দেখিয়া সেই চিত্রটা অঙ্কিত হইতেছিল, সেই ভিক্ষুকটিও তখন চিত্রকরের অদূরে একটি মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছিল। সে লোকটি বৃদ্ধ। তাহার মুখের চামড়া লোল ও কুঞ্চিত এবং তাহার চেহারা ভয়ানক দুঃস্থ অবস্থার পরিচায়ক। তাহার পরিধেয় জীর্ণ, ছিন্ন ও মলিন। তাহার জুতাজোড়ার তলা ভয়ঙ্কর মোটা ও সর্ব্বাঙ্গে তালি লাগান। সে এক হাতে একটি স্থূল লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অন্য হাতে তাহার ব্যবহার-জীর্ণ টুপীটিকে চিৎ করিয়া দীনভাবে ভিক্ষা চাহিতেছিল।

হিউগি তাহাকে দেখিয়াই বিস্মিতভাবে অনুচ্চ স্বরে কহিল, "কি হু-বহু আদর্শ!"

হিউগির কথা শুনিয়া ট্রেভর উচ্চ হাসিয়া কহিল, "ঠিক বলিয়াছ, হিউগি! আমারও সেই মত। এ রকম ভিখারী রাস্তা-ঘাটে খুব কমই দেখা যায়। দৈন্যের প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি। তোমার দিব্য হিউগি!• যদি রেম্‌ব্রাণ্ট (র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো প্রভৃতির ন্যায়,' পৃথিবীর মধ্যে এক জন নাম-জাদা চিত্রশিল্পী) এমন নিখুঁৎ আদর্শ পাইতেন, তবে একখানা জিনিষের মত জিনিষ আঁকিয়া যাইতে পারিতেন।"

হিউগি কহিল, "আহা! দেখ না, গরীব ভিখারী বুড়ার মুখে কি কষ্টেরই চিহ্ন। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, শিল্প-জীবী তোমাদের কাছে, ঐ দরিদ্রের দুর্দ্দশা-ক্লিষ্ট মুখই তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়।

ট্রেভর উত্তর করিল, "নিশ্চয়! যদি ঐ গরীবের প্রসন্ন-মুখ দেখ, তা হ'লে তোমার কি মনে হয়?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া হিউগি আস্তে আস্তে গিয়া একখানি আসনে উপবেশন করিল ও ধীরে ধীরে কহিল, "আচ্ছা এল্যান! একখানি চিত্রের জন্য আদর্শ কি পায়?"

"আদর্শের পারিশ্রমিক ঘণ্টায় এক শিলিং।"

"আর তোমাদের প্রাপ্য?"

"এই ছবিখানির জন্য আমার প্রাপ্য দুই হাজার।"

"দুই হাজার পাউণ্ড?"

"না। দুই হাজার গিনি। চিত্রকর, কবি ও চিকিৎসক তাহাদের পারিশ্রমিক গিনি হিসাবে লয়।"

"তাহা হইলে, আমার বিবেচনায়, এই আদর্শদের তোমাদের সঙ্গে একটা বখ্‌রা থাকা উচিত। কারণ, ছবি ভাল হওয়া না হওয়ার উপর তোমাদের হাত যতটা, যাহাদিগকে দেখিয়া তোমরা ছবি আঁক, তাহাদেরও হাত তাহার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।"

ট্রেভর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "হাঁ! হাঁ! তোমার মতে মুড়ি-মিছরির সমান দর। না? যত কষ্ট সব উহাদের। আর আমাদের মেহনৎটার কোনও দামই নাই! এই দেখ না, এক যায়গায় ঠায় দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে তুলি করিয়া একটু একটু রং দিতে দিতে, হাত-পা একেবারে ধরিয়া যায়। তোমার কি? মুখে আসিল বলিয়া দিলে। কিন্তু আমি তোমাকে বলিতেছি যে, শিল্প কোনও কোনও সময়ে এমন কষ্ট-কল্পনায় দাঁড়ায় যে, তখন অতি নিপুণতম কলাকেও ধান-কাটা পাটকাটার চেয়ে কঠিন কায ব'লে মনে হয়। যাউক্— ও সব কথা থাকুক। তুমি এখন একটু চুপ ক'রে ব'সে,

তাম্রকূট সেবন কর। আমি এই ছবিখানা শেষ করিয়া লই।"

ইহার কিছুক্ষণ পরে, এক জন ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে, এক জন ছবির ফ্রেমওয়ালা ট্রেভরের সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন।

ট্রেভর তখনই তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেল। যাইবার সময় হিউগিকে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "খবরদার হিউগি! পলাইও না, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব।"

ট্রেভর চলিয়া যাওয়াতে, সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক চিত্রকরের আদর্শ যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রামের অবসর পাইয়া খিন্নভাবে পার্শ্বস্থ কাষ্ঠাসনে একটু উপবেশন করিল। সে এমন করুণ দৃষ্টিতে হিউগির পানে চাহিতেছিল যে, তাহার মুখ-চোখের বিষণ্ণভাব দেখিয়া হিউগির চোখে জল আসিল। সে অন্যমনস্কভাবে তাহার নিজের পকেট হাতড়াইয়া দেখিল কি আছে। একটি সভারিণ ও কয়েকটি পয়সামাত্র হিউগির সম্বল। সে মনে মনে ভাবিল, "এই মুদ্রাটির ও পয়সা কয়টির দরকার আমার চেয়ে ঐ গরীব ভিক্ষুক বৃদ্ধটিরই বেশী। আমি না হয় দশ পোনর দিন গাড়ী ঘোড়া না চড়িয়া পায়ে হাঁটিয়াই বেড়াইব।" আপন মনে এইরূপ জল্পনা-কল্পনা করিয়া সে ধীরে ধীরে সেই ভিক্ষুক বৃদ্ধের নিকটে গেল এবং তাহার হস্তে সেই মুদ্রা কয়টি গুঁজিয়া দিল।

ভিক্ষুকও একটু চমকিয়া উঠিল। একটি ক্ষীণ হাসির রেখা তাহার ম্লানমুখে ফুটিয়া উঠিল। সে সসম্ভ্রমে কহিল, "মহাশয়! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

ট্রেভরও সেই সময়ে ফিরিয়া আসিল। হিউগি তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু কি জানি কেন, সে যেন তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য নিজের হৃদয়ে একটু লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিল। সেই দিন, সমস্ত দিন সে লরার ওখানেই অতিবাহিত করিল; তাহার এই অমিতব্যয়িতার জন্য লরার নিকট একটু তিরস্কারও পাইল। অবশেষে অর্থাভাবে অগত্যা পদব্রজেই সে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

সেই দিনই রাত্রি এগারটার সময় হিউগি "প্যালেট্" ক্লাবে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল যে, ট্রেভর তাহার আগেই আসিয়াছে এবং ক্লাবের ধূমপান-কক্ষে বসিয়া অজস্র মদ চালাইতেছে।

হিউগি উপবেশন করিয়াই ট্রেভরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন এল্যান! তোমার সেই ছবিখানা সারা হইয়াছে?"

ট্রেভর উত্তর দিল, "সারা! বাঁধান পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। হাঁ! ভাল কথা। তুমি আজ একটা মস্ত বড় বিজয় লাভ করিয়াছ। সেই প্রাচীন ভিক্ষুক আদর্শটি তোমার উপর অতিরিক্ত রকম অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁর আগ্রহাতিশয্যে আমাকেও একটু বেহায়া হইতে হইয়াছে ও প্রসঙ্গক্রমে অনেকগুলা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিতে হইয়াছে—যথা তুমি লোকটা কে, কোথায় থাক, তোমার আয় কি, তুমি কি কাযকর্ম্ম কর, বা করিতে ইচ্ছুক ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

হিউগি সাশ্চর্য্যে কহিল, "সে কি এল্যান! এই সব কথা তুমি সত্যি সত্যি তাহাকে বলিয়াছ? তাহা হইলে নিশ্চয় বাড়ী ফিরিবার মুখে, সে আবার আমায় ধরিবে। না! না! তুমি নিশ্চয় আমাকে পরিহাস করিতেছ। আহা! বেচারা বড়ই গরীব। সে যথার্থই দয়ার পাত্র। আহা! তাহার পরিধেয় এমন জীর্ণ যে, তাহার গাত্র হইতে খসিয়া পড়িবে মনে হইতেছিল। আমার অনেক পুরাণ কাপড় আছে। সে যদি লয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে দিতে পারি। বেচারা পরিয়া বাঁচিবে।"

ট্রেভর কহিল, "যাহাই বল, হিউগি! সেই ছেঁড়া পোশাকেই কিন্তু লোকটিকে খুব ভাল মানাইয়াছিল। তাহাকে ফ্রক্‌কোট পরাইয়া দিলে, আমার চোখে একদম্ বে-মানান হয়। তুমি যাহাকে ছেঁড়া নেকড়া বলিতেছ, শিল্পীর চোখে তাহাই স্থানকাল ও পাত্রানুসারে সুসঙ্গত; সুতরাং তাহা রাজ-পরিচ্ছদের চেয়েও অধিকতর মূল্যবান্। আর যে জিনিষটাকে তুমি দারিদ্র্য বলিতেছ, আমি তাহাকে কলা-সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠতম সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছি। যাউক, ভাল, আমি তাহাকে তোমার এই সাধু সঙ্কল্পের কথা বলিব।"

হিউগি প্রশান্তভাবে কহিল, "এল্যান! তোমরা, অর্থাৎ কলাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বড় হৃদয়হীন।"

ট্রেভর উত্তর করিল, "বাস্তবিক, হিউগি, তুমি যাহা বলিলে, তাহা খুব ঠিক। শিল্পীর মস্তিষ্কই তাহার হৃদয়। আর এক কথা, আমরা জগৎকে যেমন ভাবে দেখি, লোককেও তেমনই ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করি। প্রকৃতির উপর কলম চালাইতে আমরা চেষ্টা করি না। সে কথা যাক্, এখন

তোমার লরা আছে কেমন, তাহাই বল। বুড়া ভিখিরী যে তাহার কথা শুনিবার জন্ত একেবারে পাগল !"

হিউগি একটু বিরক্তভাবে কহিল, "সে কি! তুমি লরার কথাও তাহার কাছে বলিয়াছ না কি ?"

হাসিতে হাসিতে ট্রেভর কহিল, "নিশ্চয়! সে যখন অত আগ্রহের সঙ্গে শুনিতে চাহিল, তখন বলিব না? সব কথা তাহাকে বলিলাম। বুড়া কর্ণেলের কথা; দশ হাজার পাউণ্ডের জন্য লরার সঙ্গে তোমার বিবাহ আটকাইয়া আছে, সে সব কথা।"

রাগে হিউগির মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধভাবে সে কহিল, "এই সব ঘরোয়া কথা, সেই বুড়া ভিখিরীর কাছে বলা, তোমার একেবারে সঙ্গত হয় নাই।"

মুচকি হাসিয়া ট্রেভর কহিল, "বন্ধু! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। যাহাকে তুমি বুড়া ভিখিরী বলিতেছ, তিনি কে, তাহা জান? তিনি য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বহু ক্রোরপতিদিগের অন্যতম। তিনি ইচ্ছা করিলে কালই সমস্ত লণ্ডন সহরটা কিনিয়া ফেলিতে পারেন, এবং সেই মূল্য দিবার জন্য, তাঁহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকাই যথেষ্ট; তাঁহার এক কপর্দ্দকও কর্জ্জ করার প্রয়োজন হয় না। য়ুরোপের প্রত্যেক দেশের প্রধান প্রধান নগরেই তাঁহার প্রাসাদতুল্য আবাস রহিয়াছে। স্বর্ণাধারে তাঁহার ভোজ্য পাচিত ও পরিবেশিত হয়। য়ুরোপের যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাই তিনি।"

হিউগি চীৎকার করিয়া কহিল, "তুমি কি বলিতেছ? তুমি ক্ষেপিলে না কি, ট্রেভর?"

ট্রেভর কহিল, "আমি কি বলিতেছি? শুনিবে? যিনি কাল ছবির জন্ত আদর্শের মঞ্চে ভিক্ষুকের পরিচ্ছদে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কে? তিনিই সুবিখ্যাত বহু ক্রোরপতি ব্যারণ হাউসবার্গ।—আমার এক জন বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহার যখন যে কোনও ছবির দরকার হয়, তাহা তিনি আমারই নিকট হইতে প্রস্তুত করেন। ভিক্ষুকের বেশে ছবি তোলান তাঁহার একটা খেয়াল। কিন্তু এ কথাও আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তাঁহাকে তাঁহার ভিক্ষুকের বেশে অতি সুন্দর মানাইয়াছিল। তাঁহারই বা বলি কেন? ঐ ভিক্ষুকের সাজটি আমারই। আমিই স্পেন্ হইতে ঐ পুরাতন জীর্ণ পোষাকটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম।"

হিউগি যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে কিছুক্ষণ অবাক্‌ভাবে থাকিয়া কহিল, "উনি ব্যারণ হউস্‌বার্গ? কি পাপ! আমি যে তাঁহাকে একটা সভারিণ দিয়াছি।" এই কথা বলিয়া হিউগি অবসন্নভাবে আসনে বসিয়া পড়িল।

ট্রেভর হাসিতে হাসিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "সভারিণ দিয়াছ! সে গিয়াছে। আর তাহা ফিরিয়া পাইবে না।"

হিউগি একটু বিরক্তভাবে কহিল, "তোমার কিন্তু আমাকে একটু আগে এ কথা বলা উচিত ছিল। তাহা হইলে আর আমি এ মূর্খামীটা করিতাম না।"

ট্রেভর কহিল, "সত্য বলিতেছি, হিউগি! তুমি যে আমার চিত্রশালায় যাইয়া দানছত্র খুলিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। বিশেষ, চিত্রাগারের কোনও নিভৃত কোণে কোনও সুন্দরী যুবতী আদর্শের ওষ্ঠচুম্বনের মূল্যস্বরূপ একটি সভারিণ তোমার পকেট হইতে বাহির হওয়াটা, আমি বরং সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতে পারি, কিন্তু একটি বৃদ্ধ তোবড়ান-মুখ ভিক্ষুকের ভাগ্য যে এরূপ সুপ্রসন্ন হইবে, আমি তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। আরও একটা কথা, ব্যারণ হাউসবার্গ সেখানে যেরূপ সাজে ছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় সেখানে দেওয়াটা যুক্তি-সঙ্গত নহে। হয় ত, তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন।"

হিউগি কহিল, "কিন্তু, তিনি আমাকে কি আহাম্মকই ঠাওরাইলেন!"

ট্রেভর কহিল, "কিছু না! বরং তুমি চলিয়া আসিবার পরে, তিনি খুব আমোদ করিতে লাগিলেন। আনন্দ তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। আমি সে সময়ে বুঝিতে পারি নাই, ব্যাপারটা কি; তিনি কেন তোমার সম্বন্ধে এতটা আগ্রহ দেখাইতেছেন। এখন আমি সব জলের মত বুঝিতে পারিতেছি। ভয় নাই; ভাই, তিনি তোমার ও সভারিণটি একটা কোনও লাভজনক ব্যবসায় লাগাইয়া দিয়া, ছয় মাস অন্তর অন্তর টাকার সুদটা তোমার কাছে ডাকে পাঠাইয়া দিবেন।"

হিউগি আকুলভাবে কহিল, "ঠিক হইয়াছে। আমি যেমন হতভাগা আহাম্মক, তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। এখন একটু নিদ্রার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন, চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আর অন্ত উপায় নাই। যাউক, ভাই! যাহা হইবার হইয়াছে। ট্রেভর, এখন তুমি এ কথা ঘুণাক্ষরে অন্ত কাহাকেও জানিতে দিও না। আমি তাহা হইলে লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না।"

"পাগল আর কি! এতে লজ্জা কি? এত বরং তোমার দানশীলতা গুণেরই পরিচয়, ও কথা ছাড়িয়া দাও। এখনই উঠিয়া পলাইও না। আর একটা চুরুট ধরাও। আর প্রাণ খুলিয়া যত চাও লরার গল্প কর।"

হিউগি কিন্তু কিছুতেই আর ট্রেভরের কোনও কথা শুনিল না। সে আর তথায় রহিল না; সটান ক্লাব হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তাহার হৃদয় অত্যন্ত চিন্তাকুলিত। ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ট্রেভরের পেটে খিল ধরিবার উপক্রম হইল।

পরদিন প্রভাতে হিউগি সবেমাত্র প্রাতর্ভোজনে বসিয়াছে, এমন সময়ে, তাহার ভৃত্য আসিয়া তাহার হস্তে একখানি কার্ড দিল। কার্ডে আগন্তুকের নাম ও পরিচয় এইভাবে লেখা ছিল,—"মঁসিও গুস্তেভি নডিন্, মঁসিও লি হাউসবার্গের সেক্রেটারী।" লিখনটুকু পাঠ করিয়াই হিউগি মনে করিল যে, আগন্তুকের এই অপ্রত্যাশিত আগমনের প্রয়োজন অন্য কিছুই নহে—গত কল্য ট্রেভরের চিত্রশালায় যে ধৃষ্টতাটুকু করিয়াছি, সেইজন্য আমাকে দুই কথা শুনান। যাহা হউক, হিউগি আগন্তুককে উপরে লইয়া আসিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিল।

চোখে সোনার চশমা-আঁটা এক জন পক্ককেশ বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঈষৎ ফরাসী সুরে কহিলেন, "আমি কি মঁসিও আর্স্কিণের সাক্ষাৎকারলাভে সম্মানিত হইতেছি?"

হিউগি মস্তক নমিত করিয়া আগন্তুককে নমস্কার করিল।

আগন্তুক কহিলেন, "আমি ব্যারণ হাউস্বার্গের নিকট হইতে আসিতেছি। ব্যারণ এই—"

আগন্তুকের কথা শেষ না হইতেই হিউগি থতমত খাইয়া কহিল,—"মহাশয়, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, ব্যারণ কেন আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি আমার ধৃষ্টতার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমি সে সকল কিছু জানি না। ব্যারণ এই চিঠিখানি আমার হাতে আপনাকে পাঠাইয়াছেন।" এই কথা বলিয়া একখানি গালা-মোহর-করা চিঠি, তিনি হিউগির হাতে দিলেন।

চিঠিখানির উপরেই স্পষ্ট অক্ষরে লেখা, "হিউগি আর্স্কিণের সহিত লরা মার্টিনের বিবাহে, এক জন বৃদ্ধ ভিখারীর প্রদত্ত সামান্য যৌতুক।" পত্র খুলিয়া হিউগি সাশ্চর্য্যে দেখিল, —একখানি দশহাজার পাউণ্ডের চেক্!

এই বিবাহে এল্যান ট্রেভর হইলেন বরকর্ত্তা। বিবাহ-ভোজে ব্যারণ নিজে উপস্থিত হইয়া দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেই বিবাহ-সভায় আমন্ত্রিতদিগের সমক্ষে এল্যান নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "ধনীর আদর্শ জগতে বিরল বটে, কিন্তু আদর্শ ধনী তাহার চেয়েও বিরল।"

শ্রীমনোমোহন রায়।

ক্ষণিক ভুলে

কবির ক্ষণিক ভুলে—
লেখাভরা তাঁর পাতাটি খাতার
লুটায় তরুর মূলে।

উপর হইতে ফুলের পাঁপড়ি
কালির আখর হেরি,
হাসিয়া ঢলিয়া ভুরু বাঁকাইয়া
বলে—"কি রূপেরি ছিরি!"

সুগম্ভীর স্বরে খাতার আখর
পাতার কুসুমে কয়—
"হেস না, হেস না, গরবিনি এত—
গরব ভাল ত নয়।

দু'দণ্ডের রূপ চেয়ে না দেখিতে
চকিতে তোমার ঝরে;
তখন, বল ত গুণ-কীর্ত্তনে
কে রাখে অমর ক'রে?"

"তুমি সেই জন! পেনু দরশন—
ভাগ্য আমার ভাল;"—
নমি বলে ফুল, বিস্ময়ে আকুল
"কালো যে জগৎ আলো।"

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।
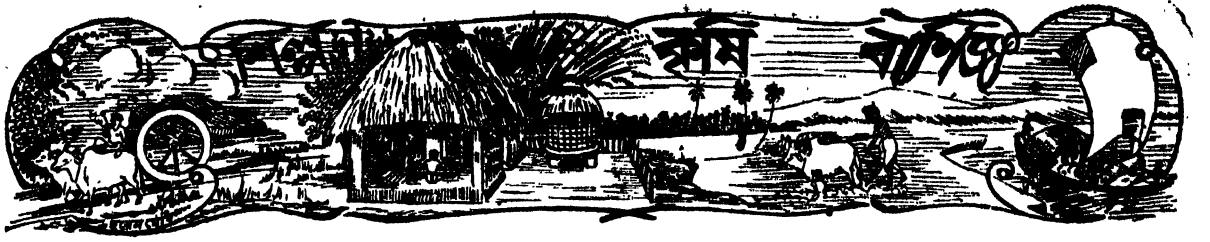
নারিকেল।

একাধারে আহার্য্য ও পানীয়ের সমাবেশ নারিকেল ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন ফলে আছে বলিয়া জানা নাই। কথিত আছে, বক্তিয়ার খিলিজি যখন বঙ্গদেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালার অবস্থা জানিবার জন্য তিনি পূর্ব্বে কয়েকজন গুপ্তচর পাঠাইয়াছিলেন। এই চরেরা তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "বঙ্গদেশ কিরূপ দেখিলে?" উত্তরে তাহারা বলিয়াছিল, "জাঁহাপনা! খোদাতালা বাঙ্গালা দেশের প্রতি এরূপ সুপ্রসন্ন যে, তিনি তথাকার অধিবাসীদিগের জন্য বৃক্ষশিরে ফলমধ্যে এক এক খণ্ড রুটি ও এক এক পেয়ালা সরবৎ রাখিয়া দিয়াছেন।" বলা বাহুল্য, উহারা নারিকেল দেখিয়াই এইরূপ কথা বলিয়াছিল। বাস্তবিক এক নারিকেল হইতে মানুষের যত প্রকার প্রয়োজন সাধিত হয়, আর কোন ফল হইতে সেরূপ হয় না। একমাত্র নারিকেলের শাঁস হইতে লাড়ু, রসকরা, চন্দ্রপুলি, মনোহরা প্রভৃতি কত উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। আবার ঐ শাঁস হইতে তৈল, মাখন, ঘৃত প্রভৃতি সামগ্রী উৎপন্ন করা যায়। নারিকেলের ত্বক্ হইতে সূত্র বাহির করিয়া তদ্দ্বারা নানা আকারের রজ্জু প্রস্তুত করা হইয়া থাকে; এমন কি, বড় বড় জাহাজ বাঁধিবার কাছি পর্য্যন্ত নারিকেল-দড়ীতে প্রস্তুত হয়। যে কঠিন আবরণমধ্যে নারিকেলের জল ও শস্য থাকে, তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া অনেক স্থলে পানপাত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, হালুইকরেরা চিনির রস নাড়িবার জন্য ও গৃহস্থেরা দুগ্ধ জ্বাল দিবার জন্য উকড়ী তৈয়ার করে; বৃহদাকার নারিকেলের ঐ মালা সাধু-সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাপাত্ররূপে ব্যবহার করেন; আর উহা দ্বিখণ্ডিত না করিয়া, একটি ছিদ্রের পথে শাঁস কুরিয়া বাহির করিয়া সম্পূর্ণ খোলটিতে হুঁকার খোল তৈয়ার হয়। কেবল ফলটি এতগুলি ব্যবহারে লাগে। তাহার পর নারিকেল গাছের শাখা, যাহা সচরাচর "বালদো" নামে অভিহিত হয়, তাহা ও তৎসংলগ্ন পাতা জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। আর পাতার শিরগুলি চাঁচিয়া বাহির করিলে উত্তম সম্মার্জ্জনী বা ঝাঁটা তৈয়ার হয়। অনেকে অবগত আছেন, নারিকেল গাছে যখন ফুল হয়, তখন তাহা একটি নৌকাকৃতি আবরণে ঢাকা

নারিকেল গাছ।

থাকে; ফুল হইতে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারিকেল ফল বা "মুচির" আবির্ভাব হয়, তখন সেই আবরণটি ফাটিয়া যায় ইহাকে চুমারি বলে। ঐ চুগারি জলে ভিজাইয়া সরু সরু করিয়া চিরিয়া বেড়া বাঁধিবার রজ্জুরূপে ব্যবহৃত হয়। এ দেশে নারিকেল গাছ ছেদন করা নিষিদ্ধ, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যে সকল গাছ ফলহীন হয়, তাহা ছেদন করিয়া সুন্দর ডোঙ্গা প্রস্তুত করা হয়। এইরূপে দেখা যায়, নারিকেল বৃক্ষের কোন অংশেরই অপচয় হয় না।

এ দেশে এই নারিকেল গাছের উৎপত্তি সম্বন্ধে উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। কুক বলেন, নারিকেলের আদি জন্মস্থান আমেরিকায়। পরে সমুদ্রজলে ভাসিয়াই হউক, অথবা আদিম যুগের লোক-দিগের দ্বারাই হউক, উহা প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপে নীত হয়, ক্রমে আবার সেইরূপ প্রণালীতে ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপ-পুঞ্জে উহা আনিয়া আবাদ করা হয় ও তৎপরে উহা ভারতবর্ষে আনীত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, নারি-কেল এই দেশেরই ফল, পরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও স্পেন দেশীয় পর্য্যটকরা উহা আমেরিকা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে লইয়া গিয়া থাকিবেন। জুমেল নামক য়ুরোপীয় উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ভারতবর্ষই নারিকেলের উৎ-পত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কসমাস (Cosmas) নামক এক ভ্রমণকারী ষষ্ঠ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে নারিকেল দেখিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো পোলো (Marco Polo), ইহাকে Indian nut নামে তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া-ছেন। কিন্তু যখন আমরা 'অমরকোষ' অভিধানে এই ফলের উল্লেখ দেখিতে পাই, তখন অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এ দেশে নারিকেল ছিল, সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। সংস্কৃতকোষ গ্রন্থে নারিকেল নানা নামে অভিহিত। যথা :— লাঙ্গলী, রসফলঃ, সুতুঙ্গঃ, স্কন্ধতরুঃ, দাক্ষিণাত্যঃ, ত্র্যম্বকফলঃ ইত্যাদি। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানেই নারিকেল জন্মিয়া থাকে, এই হেতু উত্তর-ভারতে নারিকেল বৃক্ষ নাই; সেই জন্যই বোধ হয়, উহা অভিধানে "দাক্ষিণাত্য" বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকিবে। নারিকেলের ত্বক্ উন্মোচন করিলে উহার আবরণে মহাদেবের ত্রিনেত্রের ন্যায় তিনটি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধারণতঃ উহা নারিকেলের "চোখ" বলিয়া অভিহিত হয়, এই জন্য অভিধানেও উহাকে "ত্র্যম্বক" নামে পরিচিত করা হইয়াছে। নারিকেল শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করিলেও উহা যে ভারতবর্ষেরই ফল, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রতীতি হয়। যথা :—নার (জল) + ইক = নারিক + ইড় (গমনে বা সঞ্চারে) অর্থাৎ যাহার মধ্যে জলের সঞ্চার হয়। তাহার পর যখন আমরা দেখি, এই ফল হিন্দুর মাঙ্গ-লিক ফলমধ্যে পরিগণিত, তখন আর ইহার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে সংশয় করিবার কোন হেতুই থাকে না। এ দেশে বিদেশজাত কোন ফলই মাঙ্গলিক দ্রব্যরূপে অথবা ব্রতানু-ষ্ঠান প্রভৃতির উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয় না। দ্বারদেশে বা দেবতাসমীপে মঙ্গলঘট ও পূর্ণপাত্র স্থাপন করিলে তদুপরি শীর্ষসমেত নারিকেল রাখা চিরাগত প্রথা। নারিকেল একটি ব্রতফল বলিয়া পরিগণিত। অনন্তব্রত প্রভৃতি অনু-ষ্ঠানে চৌদ্দফল ও দূর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী প্রভৃতি ব্রতে আট ফল নয় ফলের মধ্যে নারিকেল একটি প্রধান ফল। পূর্ব্বে রাজ-পুতদিগের মধ্যে প্রথা ছিল, কন্যাপক্ষ-প্রদত্ত নারিকেল গ্রহণ করিলে তাহা বিবাহের বাগ্‌দান বা প্রতিশ্রুতি বলিয়া বিবে-চিত হইত। রাজদর্শনকালে নারিকেল ফল উপহার প্রদানও একটি পুরাতন প্রথা; নারিকেলের ভারতে জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ নানা প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

এ দেশীয় বৈদ্যকগ্রন্থে নারিকেল ও তাহার জলের নানা গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'ভাবপ্রকাশে' নারি-কেলের এইরূপ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে :—

নারিকেলফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনম্।
বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাতপিত্তাস্রদাহনুৎ॥

কোমল নারিকেল পিত্তজ্বর ও মূত্রদোষ দূর করে, আর ঝুনা নারিকেল গুরু, পিত্তহারী, বিদাহী, বিষ্টম্ভি ইত্যাদি গুণ-সম্পন্ন। 'রাজনির্ঘণ্টে' ইহা দীপন, বলকর, বৃষ্য ও বীর্য্যবর্দ্ধক গুণবিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 'রাজবল্লভে'—"বালস্য নারিকেলস্য জলং প্রায়ো বিরেচনম্‌" ইত্যাদি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই এ দেশে যে নারিকেল গাছ বিদ্যমান আছে ও ইহার গুণাগুণও পরীক্ষিত হইয়াছিল, ঐ সকল গ্রন্থের উক্তি উহার আর একটি প্রমাণ।

নারিকেল প্রধানতঃ উষ্ণপ্রধান দেশের সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানেই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে বড়
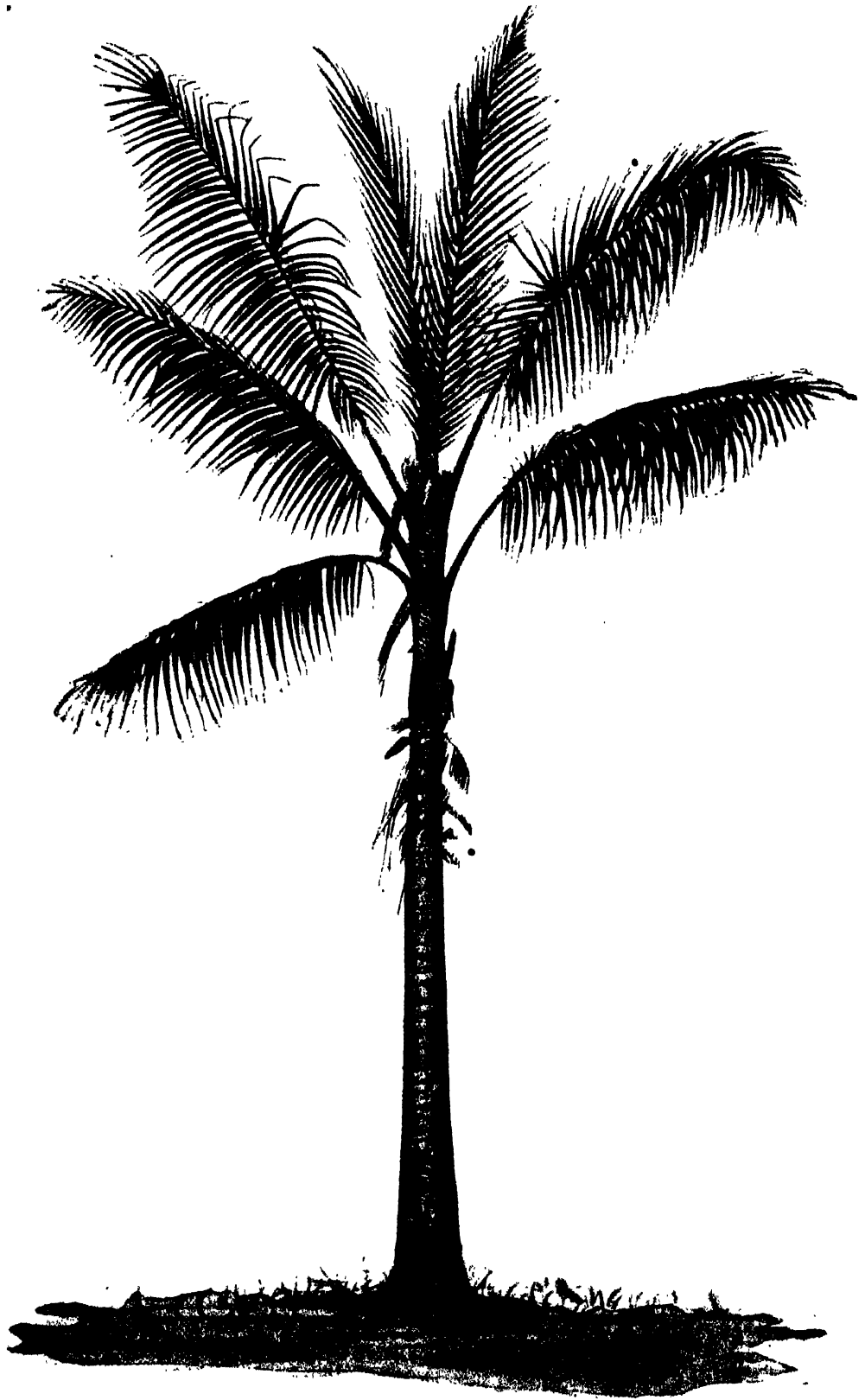
নারিকেল বৃক্ষ

বড় নদীর উভয় কূলে ইহা জন্মিয়া থাকে, এমনও দেখা যায়। বাঙ্গালায় বঙ্গোপসাগর হইতে দুই শত মাইল দূর পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরস্থ স্থানে নারিকেল গাছ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাজ বা বোম্বাই প্রদেশে সমুদ্রকূলে ৫০ হইতে ৮০ মাইলের অধিক দূরে ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার মহীশূরে উহার দ্বিগুণ দূরবর্ত্তী স্থানেও নারিকেল পূর্ণ গৌরবে বিরাজমান। পশ্চিম-বঙ্গে বর্দ্ধমানের পর আর বড় নারিকেল গাছ দেখা যায় না, কিন্তু উত্তর-বঙ্গে সমুদ্র হইতে ৩০০ মাইল দূরে দিনাজপুর ও জলপাইগুড়িতে এই গাছ যথেষ্ট দেখা যায়। শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চলেও ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গের নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জিলায় যেরূপ অধিক পরিমাণে নারিকেলের আবাদ হইয়া থাকে, সেরূপ বাঙ্গালার আর কোথাও দেখা যায় না। তবে দাক্ষিণাত্যের তুলনায় বাঙ্গালা দেশের নারিকেলের আবাদ নগণ্য বলা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা দেশে নারিকেল গাছ আম, কাঁঠালের ন্যায় বাগানের আওলাত। এই হেতু এ দেশে যে পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হয়, তাহা স্থানীয় লোকদিগের প্রয়োজনে নিঃশেষিত হয়! কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মালাবার ও করমাণ্ডল উপকূলে এবং সিংহল, আন্দামান, নিকোবর প্রভৃতি ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপসমূহে নারিকেল একটি প্রধান ফশল। ঐ সকল স্থানে উহার রীতিমত আবাদ হয়; তথায় নারিকেলের শস্য, ত্বক্ প্রভৃতি হইতে নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য বহু কারখানা আছে। অধুনা য়ুরোপ ও আমেরিকায় নারিকেলের শুষ্ক শস্য, (যাহাকে বাঙ্গালায় খড়ুরী নারিকেল বলে এবং য়ুরোপীয়দিগের নিকট যাহা Copra বলিয়া পরিচিত) এরূপ প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে যে, সে জন্য অধিক পরিমাণে নারিকেলের আবাদ প্রয়োজন হইয়াছে। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপের ৯টি ডিষ্ট্রিক্টে ৪০৯৩২২ টন নারিকেল-শস্য এ দেশ হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ইহার আদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই জন্য কোন কোন য়ুরোপীয় ধনী এ দেশে নারিকেলের আবাদ করিবার উদ্দেশ্যে যৌথ কারবার খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই একটি লাভজনক ব্যবসায়ের প্রতি আমাদের দেশবাসিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা সংক্ষেপে ইহার আবাদের প্রণালী এবং ইহা হইতে যে সকল সামগ্রী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত হইতেছে, সকলের অবগতির জন্য একে একে তাহা বিবৃত করিতেছি। এই একটি ধনাগমের পথে যদি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদিগের এই আলোচনা সার্থক বলিয়া মনে করিব।

বালুকাযুক্ত সরস ভূমিতেই নারিকেল গাছ ভালরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শুষ্ক ভূমি নারিকেল বৃক্ষ রোপণের অনুকূল নহে। যদি কোথাও বালুকাযুক্ত ভূমির অভাব হয়, তাহা হইলে সেই ভূমির যে যে স্থানে গাছ বসাইবে, তাহাতে সার দেওয়ার মত বেশ করিয়া বালুকা মিলাইলে গাছ বৃদ্ধি পাইবার পক্ষে কোন ক্ষতি হইবে না। আমাদের বাঙ্গালা দেশে সচরাচর নারিকেল গাছে কোনরূপ সার দেওয়া হয় না। গাছ ভূমি হইতে যে রস সংগ্রহ করে, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু সার দিলে গাছ যেমন সতেজ ও সবল হয়, তেমনই প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। লোণা চূণ বা লোণা ক্ষার নারিকেল গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। গোবর সারও মন্দ নহে, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, অধিক পরিমাণে গোবর সার দিলে গাছে এক প্রকার পোকা লাগে, তাহাতে গাছের শক্তি নষ্ট হয়। নারিকেল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে ঘুঁটের ছাই ছড়াইয়া দিলেও গাছ বেশ সতেজ হয়।

সকলেই অবগত আছেন, নির্দ্দিষ্ট স্থানে নারিকেল গাছ রোপণ করিবার পূর্ব্বে উহা কোন একটি ছায়াযুক্ত সেঁতসেঁতে স্থানে চারাইতে হয়। পরিপুষ্ট পক্ক বা ঝুনা নারিকেল বাছিয়া তাহার বোঁটা বা শীষের দিকটা বাহিরে রাখিয়া উহা মাটীতে পুতিয়া রাখিতে হয়। বর্ষারম্ভ হইবার সময়ই উহা চারাইতে দেওয়া ভাল। কয়েক মাস পরেই উহা হইতে 'কল' বাহির হয় এবং ক্রমে সেই কল বৃক্ষাকার ধারণ করে। কোথাও এক বৎসর, কোথাও বা দুই বৎসর কাল ঐ চারাগুলি বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হয়। যবদ্বীপ ও ভারতমহাসাগরস্থ অন্যান্য দ্বীপে নারিকেলগুলির কল বাহির হইলে তাহা তুলিয়া গৃহস্থগণ আপন আপন গৃহের চালের ছাঁচে ঝুলাইয়া রাখে। ইহাতে উহা খোলা বাতাস ও ছাঁচের জল পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ নারিকেলে কল বাহির হইবার এক বৎসর কোথাও বা দুই বৎসর পরে উহা

নির্দ্দিষ্ট বাগানে রোপণ করা হয়। প্রত্যেক গাছ যাহাতে পরস্পর হইতে ২৫ কি ৩০ ফুট দূরে থাকে, এইরূপ ব্যবধানে উহা রোপণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উহা যথেষ্ট রৌদ্র ও বায়ু পাইয়া প্রচুর পরিমাণে ফল প্রসব করিতে সমর্থ হইবে। পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসরের মধ্যে নারিকেল গাছ ফল ধারণ করিয়া থাকে। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া পূর্ব্বোক্তরূপে সার দেওয়া প্রয়োজন। জল, বায়ু ও মৃত্তিকার গুণানুসারে নারিকেল বৃক্ষ ফল প্রসব করে। প্রথম প্রথম এক একটি গাছে ১০টি হইতে ২৫টি নারিকেল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এক একটি গাছে বৎসরে ৮০ হইতে ১০০টি ফল উৎপন্ন হয়, কিন্তু ২০০ হইতে ৩০০ ফল প্রসব করে, এরূপ গাছ দাক্ষিণাত্যে বিরল নহে। ইহাতে এক বিঘা জমীর গাছে বৎসরে ১৬ শত হইতে ১৭শত নারিকেল পাওয়া যাইতে পারে। নারিকেল গাছ একবার বড় হইলে ইহার জীবনের আর কোন আশঙ্কা থাকে না। বজ্রপাত বা অন্য কোন দুর্ঘটনা না হইলে এক একটি ৭০, ৮০, এমন কি, ১শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। অনেকে পিতামহ প্রপিতামহের রোপিত বৃক্ষের ফল ভোগ করিতেছেন, এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

পীড়িত নারিকেল গাছ।

বাঙ্গালায় সচরাচর তিন প্রকার নারিকেল দেখিতে পাওয়া যায়। (১) হরিতবর্ণ, (২) ঈষৎ লালবর্ণ এবং (৩) শ্বেতবর্ণ। শ্বেত নারিকেলের জল বিশেষ বিশেষ রোগীর পক্ষে উপকারী এবং উহার শস্য "নারিকেলখণ্ড" প্রভৃতি কবিরাজী ঔষধ প্রস্তত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ও ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপ-পুঞ্জে নানা আকার ও নানা বর্ণের নারিকেল আছে। ডাক্তার সর্ট নামে এক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ৩০ প্রকার নারিকেল দেখিয়াছেন। আর এক জন বিশেষজ্ঞ বলেন, যবদ্বীপে ২৫ প্রকার নারিকেল আছে, তন্মধ্যে তিনি ১৮টির নাম করিয়াছেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ৪০ প্রকার নারিকেল ফলের কথা শুনা যায়। জুমেল (Jumelle) ও ফার্মিংগারের (Firminger) মতে ভারতবর্ষে ৭ প্রকার নারিকেল আছে। তন্মধ্যে করোমাণ্ডলে ব্রাহ্মণ নামে এক জাতীয় নারিকেল আছে, তাহা পীতাভ লোহিতবর্ণ। কানারায়

ডিম্বাকৃতি একপ্রকার নারিকেল জন্মে, তাহার ত্বক্‌ও নাকি বড় কঠিন। নিকোবর দ্বীপে দীর্ঘাকৃতি ও অধোভাগ সূচাল একপ্রকার নারিকেল জন্মে, তাহার খোলে উৎকৃষ্ট হুঁকা প্রস্তুত হয়। "রাজ-নারিকেল" (King-Cocoanut) নামে দাক্ষিণাত্যে একপ্রকার নারিকেল আছে। তাহা সচরাচর দেখা যায় না, কোন কোন ধনীর বাগানে সখ করিয়া রোপণ করা হয়। ইহার ফলগুলির বর্ণ স্বর্ণাভ এবং গাছগুলি ২০ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। উপরে যে ব্রাহ্মণ নারিকেলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার জল যেমন সুমিষ্ট ও সুপেয়, শস্ত তেমন হয় না। এমন কি, তাহার ত্বক্ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রশি বা দড়ি প্রস্তুত হয় না। যে নারিকেলের শস্য ভাল ও ছোবড়ায় উৎকৃষ্ট দড়ি প্রস্তুত হয়, তাহার অধিক আদর।

পীড়িত নারিকেল গাছের চিকিৎসা।

নারিকেলের শস্য, খোল, ছোবড়া ইত্যাদি হইতে ইদানীং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নানাপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। নারিকেল গাছে সার দেওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনই অতিরিক্ত সার দেওয়া না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অধিক পরিমাণে সার দিলে নারিকেল গাছে নানা জাতীয় কীট আক্রমণ করে এবং তাহাতে গাছের ফল-প্রসবশক্তি নষ্ট হয়। এক জাতীয় কীট গাছের পাতা ও ফুল নষ্ট করে। অভিজ্ঞগণ বলেন, এইরূপ কীটের উপদ্রব হইলে গাছে লবণ-জল ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়। কয়েক বৎসর হইতে নারিকেল বৃক্ষের একটি নূতন রোগ হইয়াছে। কোন কোন প্রাণীর রোগবিশেষে যেমন তাহাদিগের অঙ্গ হইতে রক্তক্ষরণ হয়, নারিকেল গাছেরও ঠিক সেইরূপ হয়। ঐ রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে নারিকেল গাছের কাণ্ডের স্থানে স্থানে ত্বক্ ফাটিয়া যায় এবং তাহা হইতে লোহিতাভ রস নির্গত হয়। ক্রমে ঐ রস শুকাইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয়। সেই শুষ্ক বা জমাট রস চাঁচিয়া ফেলিলে দেখা যায়, গাছের ত্বক্ জীর্ণ হইয়াছে এবং তাহা কিয়ৎপরিমাণে পীতাভ। ক্রমে গাছের নানাস্থানে এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উহার আর ফল হইবার আশা থাকে না। রোগ হইলে মানুষের যেমন মাথার চুল উঠিয়া যায় ও পশুদিগের লোম ঝরিয়া যায়, নারিকেল গাছের এই রোগে ক্রমে উহার শিরস্থ শাখাপত্রও শুকাইয়া যায়। মান্দ্রাজের সরকারী উদ্ভিদ-রোগতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত এস, সুন্দররমণ এম, এ একখানি পুস্তিকায় এই রোগের নিদান ও উহার চিকিৎসা-প্রকরণ বিবৃত করিয়াছেন। কয়খানি চিত্র সেই পুস্তক হইতে গৃহীত।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

মৃত্যুর পরের জীবন।

থিয়সফিষ্ট লেডবীটার সাহেব "লাইফ্ আফ্‌টার ডেথ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

(১) খৃষ্টানদিগের মধ্যে মৃত্যু সম্বন্ধে কাল কাপড়, কাল ক্রেপ, কাল পাড়ের খাম ও চিঠির কাগজ, কাল পোষাক পরা, শোকপ্রকাশক অনুচর (মোর্নার্স) কাল ঘোড়ার গাড়ী, কাল রংয়ের শবাধার প্রভৃতির দ্বারা মৃত্যুকে একটা ভীষণ শোকের ব্যাপার করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীন জাতিরা মৃত্যু সম্বন্ধে অধিক বুঝিতেন বলিয়া কম শোক করিতেন।

প্রকৃত দেহীর প্রতি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান দ্বারা—শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং অনিত্য দেহেরও শ্রদ্ধার সহিত বিধিপূর্ব্বক দাহ, কাঙ্গালী ভোজন, হরি-সংকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি হিন্দু অনুষ্ঠান কতই পবিত্রতর, শান্তিদায়ক এবং সুন্দর! ঐ সময়ে ঋষিদিগের সাত্ত্বিক আহার, ব্যবহার এবং আচারে শোক-তমোগুণের কার্য্য কম করিয়া দেয়। পরলোকে বিশ্বাস এই পুণ্যভূমিতে এত দৃঢ় যে, এ দেশের সতীগণের সহমরণে যাওয়া আইন দ্বারা নিবারণ করিতে হয়।

পরলোক সম্বন্ধে খৃষ্টানীমত এবং থিয়সফির অর্থাৎ কতকটা ভেজাল দেওয়া হিন্দুয়ানীর মত কি, তাহা জানাইবার জন্য এই প্রবন্ধ ইংরাজী অবলম্বনে লেখা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই সাধু হিন্দুয়ানী নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম। ইউরোপীয়ের দ্বারা তাহা নিখুঁত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু উহা দ্বারাও ভারতেতর স্থানে উপকার হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(২) পাশ্চাত্যদেশে বালক-বালিকারা যেমন ভয়-উৎপাদক গল্পের আলোচনায় নিজেদের ভীত করিয়া রাখে, সেইরূপ তথায় সর্ব্বসাধারণেও মৃত্যু সম্বন্ধে নিজেদের চিত্তকে ভীত করিয়াছে। মৃত্যু স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী অবস্থা, উহার পর আমাদেরও আলোকের রাজ্য আছে, ভয়ের নহে। বরং সত্য উন্নততর জীবনপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ।

(৩) সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন, "যে স্থান হইতে কোন পথিক ফেরে না।" কিন্তু বহুকাল হইতেই প্রেতাত্মার দর্শন দেওয়া সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য লোক-প্রমাণ সকল পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সার্ অলিভার লজ্, বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার বালফুর, সার উইলিয়ম ক্রুপস্ প্রভৃতি সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটীতে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করার পর ঐ বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে। ষ্টেড সাহেবের 'রীয়েল ঘোষ্ট ষ্টোরিজ্' (প্রকৃত ভূতের গল্প) গ্রন্থেও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। 'নব্য স্পিরিচুয়ালিষ্ট' দ্বারাও অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। সমস্তই মিথ্যা এবং মত্ততা যে নহে, তাহা আমি নিজের প্রত্যক্ষ হইতে জানি। একটু সময় ও পরিশ্রমব্যয়ে সকলেই এ কথা বুঝিতে পারেন।

এতদ্ভিন্ন (থিয়সফিষ্টরা তাহারই অধিকতর আদর করেন) নিজের ভিতর হইতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান হইতে পারে। সকল মনুষ্যের মধ্যেই অনেক সুপ্ত শক্তি আছে। ঐ সকল শক্তির উদ্বোধন করিলে, মৃত্যুর পরে অদৃশ্যরাজ্য প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। কতিপয় থিয়সফিষ্টের তাহা হইয়াছে—প্রত্যেক পাঠক নিজের ঐ সুপ্ত শক্তির উন্মেষচেষ্টা নিজের তৃপ্তির জন্য করিতে পারেন। 'বাইবেলে বলে' বলিয়া থিয়সফিষ্ট তৃপ্ত হন না—নিজেও প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করেন।

[ব্রহ্মবিদ্যায় মহাত্মাদিগকে ত্রিকালজ্ঞ করিয়া থাকে। ইহা হিন্দু বিশ্বাস করেন এবং যোগীদিগের উক্তিতে উহা কেহ কেহ লক্ষ্য করিবার সুবিধাও পাইয়াছেন। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভের প্রায় চারি মাস পূর্ব্বে ইহা ঘটিবে, তাহা কাহারও মুখে শুনা যায়। দূরবর্ত্তী স্থানে কোন গর্ভিণীর সন্তান গর্ভমধ্যেই মরিয়া গিয়াছে, ইহা কোন মহাত্মা বলিয়া দিয়া সত্বরে লেডী ডাক্তার দ্বারা প্রসব করানর উপদেশে গর্ভিণীকে রক্ষা করিয়াছিলেন—কোন মৃতব্যক্তিকে সূর্য্যলোক ভেদ করিয়া যাইতে দেখার কথা কেহ বা বলিয়াছেন। এইরূপ অনেক বিষয় অনেকেরই মনে পড়িবে এবং সুপ্ত-শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করিবে।]

(৪) মনুষ্য জীবিতাবস্থায় যেরূপ বুদ্ধি ও বাসনা লইয়া থাকে, মৃত্যুর পর ঠিক তাহাই থাকে। জীবের বাসনা এবং কার্য্যই তাহার মৃত্যুর পরের অবস্থা প্রস্তুত করে; কর্ম্মের

বাহির হইতে পুরস্কার বা তিরস্কার আসিতে হয় না। শুভকার্য্যে সুখের অবস্থা, অপকর্ম্মে অশান্তির কষ্ট, নিষ্কাম বৈধধর্ম্মে ভিতর হইতে পূর্ণ শান্তি। ইহজীবনের ধারাবাহিক গতি পরলোকে ঠিক চলিতে থাকে। আমরা আমাদের প্রিয়তমদিগকে মৃত্যুর দ্বারা হারাই না; * উহাদের দেখিতে পাইবার শক্তি সাধারণতঃ আমাদের নাই—এই মাত্র।

যাহারা বিশেষ পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে দেহ থাকিতেই স্বীয় লিঙ্গদেহের (এষ্ট্রাল বডি) দিকে দৃষ্টি দিয়া থাকেন, তাঁহাদের শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া দেখা যায় যে, সাধারণ লোকের মধ্যেও সুপ্তাবস্থায় মৃতদিগের দর্শনলাভ হইয়া থাকে। কখন কখন তাহাদের সহিত সাক্ষাতের কথা অল্প পরিমাণে স্মৃতিতে থাকে, তখন আমরা বলিব যে, স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। নিদ্রাবস্থায় স্থূলদেহের বন্ধন হ্রাস হইলে প্রীতির আকর্ষণে লোকে মৃত প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করায় নিদ্রাবস্থায় লিঙ্গদেহ দ্বারা তাহা পারে, জাগ্রতাবস্থায় স্থূলদেহের জন্য তাহা পারে না। *

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

* পূজ্যপাদ আমার পিতৃদেব তাঁহার "হারাধন"গুলিকে ঠিক এই ভাবেই হারাইয়াও একেবারে হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহার পিতা, আমার পিতামহদেবকে তিনি সকল আপদে ও সম্পদে সর্ব্বদাই স্মরণ করিতেন। জীবনের প্রত্যেক জটিল মুহূর্ত্তেই তাঁহার আদেশবাণী তাঁহার মানসমধ্যে তিনি সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিতে শুনিয়া সেই উপদেশানুসারে চলিয়াছেন এবং সর্ব্বদা সফলপ্রযত্নও হইয়াছেন। যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার নয়, তাহা কতকটা পূর্ব্বাহ্লেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, আমার তৃতীয় ভ্রাতা ৺সোমদেবের [যাহার স্মৃতি স্মরণে ৺পিতৃদেব সোমদেব-সৎকর্ম্ম-ভাণ্ডার, নামক দান-ভাণ্ডার স্থাপন করেন] দীর্ঘ রোগভোগের সময় নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়া বলিতেন, "এবার বাবাকে ডেকে উপায় জিজ্ঞাসা করচি, কিন্তু মনের মধ্যে যেন তাঁর প্রত্যাদেশ পাইতেছি না।"

আমার দুটি পরলোকনিবাসী ভাইয়ের সম্বন্ধেও পিতৃদেব এইরূপে নিজের মনের মধ্য হইতে যেন সান্নিধ্য অনুভব করিতেন। শরীর ও মনের যে কোন যন্ত্রণার মধ্যে কত সময় চমকিত হইয়া বলিয়াছেন, "সোম, গণি যে বলিল, 'বাবা! আমরা তো রয়েছি, কেন এত দুঃখ করচেন!' বলিতেন, "আমি যেন দেখিতে পাই যে, মা অন্নপূর্ণার পদতলে ভাস্বরমূর্ত্তিতে আমার পিতৃদেব বসিয়া আছেন, আর তাঁর দু পাশে তেমনি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আমার দুটি ছেলে বসিয়া বাবার সঙ্গে কথা কহিতেছে।" মৃত্যু মুহূর্ত্তে বলিয়াছিলেন—

"বাবা! আমার কায যদি শেষ হইয়া থাকে, নিজে এসে আমায় তোমার কাছে নিয়ে যাও।"

* এই অসমাপিত প্রবন্ধটি পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের কতকগুলি অসমাপ্ত রচনার মধ্য হইতে প্রাপ্ত।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

উন্মেষ।

আজিকে আমার হৃদয়-কুসুম ফুটিল রে,
　　ফুটিল মোহের গহনে।
সুরভি তাহার ধূপের মতন ছুটিল রে,
　　প্রভাত আলোক দহনে।

কোন দিকে তার নাহি বন্ধন,
নাহিক অভাব নাহি ক্রন্দন,
দেবতার পদে আশ্রয় মাগি' উঠিল রে,
　　প্রীতি-চন্দন বহনে॥

কোথায় বিষাদ—কোথায় বিষাদ—
চারিদিকে শুনি　　আরতির ধ্বনি—
চারিদিকে আশীর্ব্বাদ,

এমনি মধুর আরতি-আশীষে
এক হ'য়ে মোরে যেতে হবে মিশে,
তবেই পুলক তবেই বিকাশ ঘটিল রে,
　　শিশির-স্নিগ্ধ পবনে॥

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের মত-বিরোধ।

১

নন্‌-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের মতভেদ থাকা উচিত কি না, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তা যে আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; অতএব তা অস্বীকার করেও কোন ফল নেই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেস যে দিন নন-কো-অপারেশন গ্রাহ্য করে, সেই দিনই এ সত্য অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কংগ্রেসী বাঙালীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কংগ্রেসের এই নূতন প্রোগ্রামের বিপক্ষে ছিলেন।

তার পর, অর্থাৎ নাগপুর কংগ্রেসের পর এ দলের ভিতর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ জন কয়েক অসহযোগ ব্রত অবলম্বন করেন। বাদবাকী সকলে ও ব্যাপার থেকে আল্‌গা হয়ে থাকেন।

যাঁরা নন-কো-অপরাশনে যোগ দেন নি, তাঁরা যে সকলে ও আন্দোলন থেকে একই কারণে স'রে দাঁড়িয়েছিলেন, তা অবশ্য নয়। আমাদের সকলের মনও এক নয়, চরিত্রও এক নয়। অতএব এটা অনায়াসে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, যে ব্রত অবলম্বন কর্‌তে হ'লে, চিন্তার ও জীবনের চিরাভ্যস্ত পথ ত্যাগ কর্‌তে হয়, সে ব্রত গ্রহণ কর্‌বার পক্ষে কারও বাধা ছিল মনের, কারও বা চরিত্রের, আর অধিকাংশ লোকের একসঙ্গে ও দুয়ের।

এ সত্য স্বীকার কর্‌তে কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই। সাধারণতঃ মানুষের মতামতের পিছনে তার বিচারবুদ্ধি ততটা থাকে না—যতটা থাকে তার চরিত্র, তার রাগ-দ্বেষ, আর তার চিরকেলে অভ্যাস। হৃদয়ের ও উদরের কথাকে মস্তিষ্কের বেনামীতে চালিয়ে দেওয়ার অভ্যাসও যে মানুষের আছে, তা সে-ই জানে, যে মানুষের কথার পিছনে তার মন দেখতে চায়। যাঁরা নন্‌-কো-অপারেশন আন্দোলনের দর্শকমাত্র ছিলেন, তাঁরা সকলে যে একমন নন, তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কেন না, যাঁরা ও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরাও সকলে একমন নন। আমি নিজ কানে নন্‌-কো-অপারেশনের অন্ততঃ পঞ্চাশ রকম ব্যাখ্যা শুনেছি, যা সব পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। ও ব্যাপারের ঔদরিক ও আধ্যাত্মিক ভাষ্যকারের সঙ্গে কার পরিচয় নেই? আর যাঁরা নন্‌-কো-অপারেশনের একটি নিয়মও একদিনের জন্যও পালন করেন নি, অথচ উক্ত মতের গোঁড়া ভক্ত তাঁদের সংখ্যা অসংখ্য। এ শ্রেণীর লোকের মতামত যে অকিঞ্চিৎকর, তা বলাই বাহুল্য। নন-কো-অপারেশন যে একটা কর্ম্মের পদ্ধতি, শুদ্ধ জ্ঞানের কিংবা ভক্তির বিষয় নয় ও মতানুসারে কায না করে ও মত গ্রহণ করার যে কোনই সার্থকতা নেই, এই সহজ কথাটা মনে রাখলে বাঙলার বহু লোক সকাল সন্ধ্যে ওকালতী ক'রে, রাত্তিরে দুর্দ্দান্ত অসহযোগী হয়ে উঠতেন না। গত ১২ই ফেব্রুয়ারি বার্দ্দোলীতে যে রিজলিউসান পাস হয়, তার ফলে এঁদের মুখ বন্ধ হয়েছে।

২

উক্ত মত সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যখন মতভেদ আছে, তখন তাঁদের কথায় ও লেখায় সে মতভেদের প্রকাশ অনিবার্য্য। কেন না, লেখাপড়া হচ্ছে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কায।

তার পর নিজের মত প্রকাশ করতে গেলে, লোকে সেই সঙ্গে তার স্বপক্ষে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতেও বাধ্য, আর বিপক্ষ মতখণ্ডন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তেও বাধ্য। এরূপ তর্কস্থলে লোক চিরকাল ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে এসেছে, আর চিরকাল তা কর্‌বে। তর্ক-যুদ্ধও যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য লোকে নানা প্রকার আলঙ্কারিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। আর যে তা কর্‌তে পারে না, সে চীৎকার করে। এ হচ্ছে মানুষের স্বভাব। মানুষের মন একমাত্র syllogism-এর পথ ধ'রে চলে না। মানুষের মস্তিষ্ক তার রক্তমাংসের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। এ যোগ থাকাটা মোটেই দুঃখের বিষয় নয়। দুঃখের বিষয় হয় তখন, যখন রক্তমাংসে মস্তিষ্ক একদম চাপা পড়ে।

মানুষে মানুষে মতভেদ ঘটলেও তাদের ভিতর সকল সময়ে মনোমালিন্য ঘটবার প্রয়োজন নেই। দেখতে পাওয়া

যায় যে, মনোমালিন্য বেশীর ভাগ সেই ক্ষেত্রেই ঘটে, যেখানে পরস্পর পরস্পরের কথা ভুল বোঝে। আমাদের পলিটিকসের কাম্যবস্তু কি? সে বিষয়ে বোধ হয় আমরা সকলেই একমত। আর যে ক'জন নন, তাঁদের কোন কথাই বল্‌বার নেই। তাঁরা হয় অতিমানুষ, নয় অমানুষ। এ ক্ষেত্রে পরস্পরের ভিতর যা প্রভেদ, সে হচ্ছে উক্ত উদ্দেশ্য-লাভের উপায় নিয়ে। সুতরাং প্রথম থেকেই ধ'রে নেওয়া উচিত নয় যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের জ্ঞাতিশত্রু। দ্বিতীয় কথা, আমাদের কারও মত এতাদৃশ চূড়ান্ত নয় যে, তার আর কোনও বদল হ'তে পারে না। আমরা তর্ক সুরু করি অবশ্য অপরের মত বদ্‌লে দেবার জন্য, কিন্তু তার ফলে শেষটা অনেক সময়ে নিজের মতই বদ্‌লে যায়। বুলি বদ্‌লায় না শুধু তোতাপাখীর।

৩

এই নন্‌-কো-অপারেশন বিষয়ে তর্ক অনেক সময়ে যে অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিণত হয়, তার কারণ পরস্পরের মত-ভেদ যে কোথায়, তার্কিকেরা সকল সময় সে দিকে নজর দেন না। সে যাই হোক্‌, কোন্‌ বিষয়ে যে আমরা সকলে একমত, সেটা যদি আমরা স্পষ্ট জানি, তা হ'লে আমাদের তর্কে এড়ো হয়ে পড়্‌বার সম্ভাবনা ক'মে আসে।

নন্‌-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের ভিতর মতের অমিল থাক্‌লেও মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজকের দিনে আমরা সবাই একমত। এ কথা যে অন্ততঃ আমার মুখে শুধু কথার কথা নয়, তাই প্রমাণ কর্‌বার জন্য আমার মতে তাঁর মাহাত্ম্য যে কোথায়, তা পরিষ্কার ক'রে বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল অসাধারণ। এই চরিত্র কথাটা নানা লোকে নানা অর্থে বোঝে। সুতরাং তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায়, সেইটিই হচ্ছে দ্রষ্টব্য।

ইংরাজীতে যাকে বলে asceticism, তার প্রতি আমার একটা সহজ শ্রদ্ধা আছে। কাষায় বসনকে আমি দেখবামাত্র উচ্চ আসন দিই। কিন্তু তাই ব'লে যিনি শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে উদাসীন, আর যিনি শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জ্জন করেছেন, তাঁকেই আমি মহাপুরুষ বল্‌তে প্রস্তুত নই। কেন যে নই, তার উত্তর গীতার এই শ্লোকে পাবেন।—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

মাহাত্ম্য আত্মার ধর্ম্ম, দেহের নয়; সুতরাং আমার কাছে মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যের সঙ্গে উপবাসাদির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে আমি এই কটি অসাধারণ গুণ দেখতে পাই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক; সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, কথায় এবং কাজে তিনি সম্পূর্ণ অকপট এবং সম্পূর্ণ সংযত; তাঁহার নির্ভীকতা আর পরার্থপরতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বল্‌বার প্রয়োজন নেই। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ভাষা যে কতদূর স্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন, সকলে তা লক্ষ্য করেছেন কি না জানিনে। এ ভাষায় কোন আড়ম্বর নেই, কোনও অলঙ্কার নেই, কোনও বাহুল্য নেই, কোনও অত্যুক্তি নেই; তাঁর এ ভাষা যেমন সংযত, তেমনি শক্তিশালী। এর কারণ, ভাষায় তিনি তাঁর মনের নগ্ন রূপ লোকের চোখের সুমুখে ধ'রে দেন। তাঁর ভাষার শক্তি ও রূপের পিছনে আছে তাঁর চরিত্র। সম্পূর্ণ অকপট হ'তে পার্‌লে মানুষের ভাষা যে কি অসাধারণ প্রসাদগুণ লাভ করে, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধীর ভাষা, যদিচ সে ভাষা তাঁর মাতৃ-ভাষা নয়, একটি বিদেশী ভাষা। আমি তাঁর ভাষার উল্লেখ কর্‌লুম তাঁর চরিত্রের একটা গুণ দেখাবার জন্য, তাঁর বক্তৃতায় সাহিত্যিক গুণের পরিচয় দেবার জন্য নয়। আমরা যাকে ষ্টাইল বলি, সেটা যে মনের গুণ, ভাষার গুণ নয়, মহাত্মা গান্ধীর ভাষা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নন্‌-কো-অপারেশন ব্যাপারের প্রধান বল হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল। ঐ প্রোগ্রাম যদি অপর কেউ, যথা ভি, জে, পাটেল সৃষ্টি কর্‌তেন, তা হ'লে তার জন্ম মৃত্যু যে একই তারিখে হ'ত, সে সম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ নেই।

বিপিন বাবু একবার বিদ্রূপ ক'রে বলেছিলেন যে, তিনি "লজিক" বোঝেন, "ম্যাজিক" বোঝেন না। লৌকিক মনের উপর মহাত্মা গান্ধীর যে অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে, তাকে ঐন্দ্রজালিক বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না, এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ ম্যাজিক হচ্ছে তাঁর চরিত্রবলের মন্ত্রশক্তি।

৪

মহাত্মা গান্ধীর নির্ভীকতা ও পরার্থপরতা সম্বন্ধে আমার মনে কখনো তিলমাত্র সন্দেহ স্থান পায় নি। তবে তাঁর মুখের কথা যে পুরোপুরি তাঁর মনের কথা, এ বিশ্বাস আমার বরাবর ছিল না। আমার মনে এ সন্দেহ পূর্ব্বে হয়েছে যে, হয় ত তিনি তাঁর মনের কথা সম্পূর্ণ খুলে বলেন নি। রাজনীতির সঙ্গে কূটনীতির যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ও নীতিতে উদ্দেশ্য যে তার উপায়কে পুত করে, আবহমান কালের ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। অতএব পলিটিশিয়ানদের কথা যে সম্পূর্ণ সরল, সে বিষয়ে সন্দেহ মানুষের মনে সহজেই জন্মে। তার পর অসংখ্য নন্-কো-অপারেশন-ভক্তদের মুখে অগণ্যবার শুনেছি যে, একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, মহাত্মা গান্ধীর কথা সাদা ভাবে বোঝা, না বোঝারই সামিল, এবং এই সব ভাষ্যকাররা তাঁর কথার নানা গূঢ় ও কূট অর্থ আমাদের শুনিয়েছেন।

আদালতে তাঁর বিচারের সময়, তাঁর কথা ও তাঁর ব্যবহার আমার মন থেকে চিরদিনের জন্য এ সন্দেহ দূর করেছে। তাঁর কথা যে সম্পূর্ণ অকপট, ঐ বিচারক্ষেত্রেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যেমন কোন কবির প্রতিভা, তাঁর রচিত নানা কাব্যের ভিতর কোনও একখানি বিশেষ কাব্যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তেমনি উক্ত বিচারস্থলেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও শক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়েছে। নির্ভীকতায়, সরলতায়, সংযমে ও সৌজন্যে ও ক্ষেত্রে তাঁর আত্মোক্তি—আমার কাছে একটি work of art স্বরূপে গণ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি মহাপুরুষের, সক্রেটিসের, বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আর সে বিবরণ আজ তিন হাজার বৎসর ধ'রে মানুষের মনকে মুগ্ধ ও পরিতুষ্ট ক'রে আসছে। মহাত্মা গান্ধীর বিচারের বিবরণ প'ড়ে আমার ঐ সক্রেটিসের বিচারের কথাই মনে পড়ে। যে সকল গুণের সদ্ভাবে, সক্রেটিসের আত্মোক্তি সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে, প্রায় সে সকল গুণেরই সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধীর আত্মোক্তিতে পাওয়া যায়। সক্রেটিসের apology বাঙ্গালায় অনুবাদ করবার আমার ইচ্ছা আছে। যদি কখনো সে অনুবাদ করতে সমর্থ হই, তা হ'লে বাঙালী পাঠকমাত্রেই দেখতে পাবেন যে, ঐ উভয়ের ভিতর একটা মস্ত আভ্যন্তরিক ঐক্য আছে।

বর্ত্তমানে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে মানুষের মহত্ব, কে কি করে, তাই দিয়ে আমরা যাচাই করি; কে কি, সে বিষয়ে ততটা মন দিই নে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় মনুষ্যত্বের মাপকাটি ছিল স্বতন্ত্র। আজকাল আমাদের আত্মচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে to do, আর সে কালে ছিল to be, এ দুই অবশ্য এক নয়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন :—

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥"

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন, তার দুটি চারটি কথা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

যে প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আদর্শ আমরা এতদিন শুধু সংস্কৃত পুস্তকেই প'ড়ে আস্‌ছি, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে সেই আদর্শের যতটা সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে, অপর কারও চরিত্রে তা পাওয়া যায় নি।

যাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, তাঁর যে কোনও কর্ম্ম নেই, তা নয়, কিন্তু তাঁর কর্ম্মের প্রেরণা ও পদ্ধতি আমাদের কর্ম্মের প্রেরণা ও পদ্ধতি নয়।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

এ সব কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, মহাত্মা গান্ধী যে এক জন আদর্শ পুরুষ,এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করেও নন্-কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম কেবলমাত্র পলিটিকাল প্রোগ্রাম হিসেবে বিচার করার প্রবৃত্তি ও অধিকার আমাদের আছে।

এমন অনেক লোক দেখেছি, যাঁরা মনে করেন যে, উক্ত প্রোগ্রাম রচনা করেছেন বলেই গান্ধী এক জন মহাত্মা।

অপর পক্ষে আমার মতে মহাত্মা গান্ধীর প্রোগ্রাম বলেই জন-সাধারণের কাছে তার এত মাহাত্ম্য।

মহাত্মা গান্ধী যদি এর ঠিক উল্টো প্রোগ্রাম বার করতেন, অর্থাৎ non-violenceএর বদলে তিনি যদি violence প্রচার করতেন, তা হ'লে জন-সাধারণ তা প্রত্যাখ্যান করত, এমন কথা যদি কেউ মনে করেন, তা হ'লে তিনি স্থিরধী ব্যক্তির বশীকরণী শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

এ কথা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য রয়েছে। এক চুল এদিক্ ওদিক্ হয় নি।

আমার শেষ কথা এই যে, নন্‌-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের যে মতভেদ রয়েছে, তার প্রকাশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমাদের চোখের সুমুখে রাখা উচিত, যদিচ আমরা জানি যে, তাঁর মত স্থিতধী হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত নই। আমরা নির্ম্মমও নই, নিরহঙ্কারও নই। উপরন্তু আমাদের মনে শান্তি নেই, আছে শুধু অশান্তি। তবু উক্ত আদর্শ চোখের সুমুখে রাখলে আমরা ভয়ে মিথ্যে কথা বলতে ঈষৎ সঙ্কুচিত হব, এবং কথায় অসংযম ও অসৌজন্য দেখাতে লজ্জিত হব।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

দোহন।

ফ্রান্স—আমি জার্ম্মাণীকে দোহন করিতে চলিয়াছি।
ইংলণ্ড—অত ব্যস্ত হইও না; ও যদি বা সিং না নাড়ে—আমরা সহিব কেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া রুথ কবাট বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু অর্গল বন্ধ করিল না; তাহার পর দীপ জ্বালিয়া শয্যার উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে মুক্তিসংবাদের অপেক্ষা; সে সাধকের পক্ষে দূরবর্ত্তিনী সিদ্ধির অপেক্ষা। সময় যে এত দীর্ঘ বোধ হয়, জীবনে সে আর কখন তাহা অনুভব করে নাই। ফরিদা কতক্ষণ গিয়াছে! তবে কি দায়ুদ আসিল না? হায়—দায়ুদ, তুমিও কি নির্দ্দয় হইলে? এক দিন তুমি যাহার সামান্য বেদনায় বক্ষে বিষম ব্যথা অনুভব করিতে, এক দিন যে তোমার নয়নের আলোক ও হৃদয়-মন্দিরের প্রতিমা ছিল, যাহার প্রেমে তুমি সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত তুচ্ছ মনে করিতে পারিতে, আজ সে দুঃখিনী—বন্দিনী। তাই কি তুমিও নির্দ্দয় হইলে? সে চিন্তায়—সে কল্পনায় কত ব্যথা! সে ব্যথায় রুথের বেদনাকাতর হৃদয় একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—যেন কে তাহার ক্ষতে ক্ষার নিক্ষেপ করিল। সে বেদনা বুঝি সে সহ্য করিতে পারিত না; সে বেদনার তুলনায় এত দিনের এত বেদনাও সহনীয় মনে হইতে লাগিল। তখনই তাহার মনে হইল—দায়ুদের কোন বিপদ হয় নাই ত? কে বলিতে পারে? সে অভাগিনী; তাহার জন্যই তাহার পিতার বিপদ—তাহার প্রিয়তমের বিপদ। আজ তাহার জন্য দায়ুদ ইচ্ছা করিয়া বিপদের পথ গ্রহণ করিয়াছে; যদি কেহ কোনরূপে জানিতে পারে, তবে তাহাকে পশুর মত বধ করিবে। তবে কি ফরিদা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে? সে ত এই পুরীতে আসিয়া এক দিনের জন্যও ফরিদার সঙ্গে কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করে নাই; বরং তাহাকে সদ্ব্যবহারে স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ করিতেই প্রয়াস পাইয়াছে। যদি সে তাহার শত্রুতাসাধনই করিবে, তবে সে তাহার কথায় সম্মতির ভাণ করিল কেন? সে ত ঔষধ আনিয়া দিয়াছে! আর যদি ফরিদা তাহার শত্রুতাসাধনই করে, দায়ুদ ত তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই—সে দায়ুদকে বিপন্ন করিবে না। তাহাই হউক। যদি কোন বিপদ হয়,তাহার আপনার হউক—দায়ুদকে যেন কোন বিপদ স্পর্শ করে না। কিন্তু—কিন্তু তবে কি আর দায়ুদের সঙ্গে দেখা হইবে না? তাহা হইলে সে আর এ জীবন রাখিবে কেন? আশা যদি না থাকে, তবে এ দুঃখের জীবন রাখিয়া ফল কি? কিন্তু তরুণ জীবন—অতৃপ্ত সুখসম্পদ—পিতা জীবিত—প্রিয়তম আজও দর্শন দিয়াছেন; তবুও অমৃতকুম্ভের পার্শ্বে সে বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করিবে? তাহাই কি তাহার নিয়তি?

রুথ এমনই কত কথা ভাবিতেছিল—এই সব ভাবনা বিদ্যুতের বেগে তাহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল—এমন সময় কক্ষদ্বার মুক্ত হইল—ফরিদার সঙ্গে বোরকায় অঙ্গ আবৃত করিয়া আর এক জন কক্ষে প্রবেশ করিল। রুথ চমকিয়া দাঁড়াইল। তবে কি দায়ুদ আসিল না? সে ফরিদাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল—নিশীথে উচ্চকণ্ঠে কথা কহিবার বিপদ বিস্মৃত হইয়া—স্থান, কাল সব ভুলিয়া জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ওষ্ঠাধর বিভিন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় আগন্তুক বোরকা ফেলিয়া দিল। রুথের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; সে দেখিল, সম্মুখে—দায়ুদ!

রুথ দায়ুদের কণ্ঠলগ্ন হইয়া—তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া বাতাহত অশ্বত্থপত্রের মত কম্পিত হইতে লাগিল—আর

তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। যে দুঃখ বেদনার আতিশয্যে জমিয়া কঠিন হইয়া আপনার বিস্তার-বেগে হৃদয়পাত্র বিদীর্ণ করে, তাহা যখন মিলনের আনন্দ-কিরণে দ্রব হইয়া প্রবাহিত হয়, তখন কে তাহার বেগ রোধ করিতে পারে? দায়ুদের স্পর্শ—দায়ুদের চুম্বন!

ফরিদা বলিল, "আমি বাহিরেই থাকিলাম। সাবধান, কেহ যদি কথা শুনিতে পায়, তবে এক খাতে সকলকেই জীবন্তে পুঁতিবে।" সে বাহির হইয়া গেল।

আজ বলিবার ও শুনিবার কত কথা—এই ছয় মাসের দুঃখ, ছয় মাসের সংবাদ বলিবার ও শুনিবার জন্য কত ব্যাকুলতা! কিন্তু কথা বলিতেও ভয় হয়। তবুও রুথ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—পিতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। দায়ুদ উত্তর দিল, তিনি বোম্বাইয়ে—সে তাঁহাকে তথায় রাখিয়া আসিয়াছে। তিনি কোনরূপে জীবন ধরিয়া কেবল রুথের আগমনপথ চাহিয়া আছেন। তিনি কিছুতেই কোন ব্যবসা করিবেন না; কিন্তু এমন অবস্থায় কোন কায না থাকিলে তিনি পাগল হইয়া যাইবেন বুঝিয়া দায়ুদ জিদ করিয়া কাযের পত্তন করিয়া দিয়া আসিয়াছে। দায়ুদ প্রথমেই আমীরের রাজধানীতে গিয়াছিল—তথায় তাঁহার বাগদাদে আগমন-সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বাগদাদে আসিয়াছে। কিন্তু বাগদাদে আসিয়া কিছুতেই রুথকে সংবাদ দিবার বা রুথের সংবাদ পাইবার উপায় করিতে পারিতেছিল না। আমীরের গৃহে অত্যাচারের মাত্রা অধিক—অত্যাচার অন্ধকারেই পুষ্ট হয়, তাই সে গৃহে তিনি ইচ্ছা করিয়া অন্ধকার রাখেন—কেহ তাহার কোন কথা জানিতে না পারে। তিন দিন সে এই পথে ঘুরিতেছে; কোন ভৃত্যের নিকট হইতে কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে নাই; শেষে ফলবিক্রেত্রী বৃদ্ধা আরব রমণীকে বহু অর্থে বশীভূত করিয়া ফলের উপর লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সে ফল রুথের হাতেই পড়িয়াছিল—রুথ গৃহবাতায়ন হইতে দায়ুদকে দেখিয়া নিশ্চিত হইয়া প্রত্যাখ্যাত ফলের সঙ্গে সঙ্কেত পাঠাইয়াছিল। সঙ্কেতানুসারে ফরিদার সাহায্যে সে আজ আসিয়াছে।

রুথের বিহ্বলকাতরতা যেন দায়ুদকেও অভিভূত করিতেছিল। পাছে সে-ও অভিভূত হইয়া পড়ে, তাই সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আর বিলম্বে কায নাই। চল, যাই।"

সত্যই আর বিলম্ব কেন? কারাগারদ্বার যদি সত্য সত্যই মুক্ত হইয়াছে, তবে বন্দী আর বিলম্ব করে কেন? বিশেষ এ কারাগৃহ—নরক। রুথ দীপালোক ম্লান করিয়া দিয়া বাহির হইতে ফরিদাকে ডাকিয়া আনিল; সে কক্ষে আসিলে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ফরিদা, তোমার এ ঋণ আমি জীবনে কখন শোধ করিতে পারিব না।"

ফরিদা বলিল, "ভগিনি, আজ নহে—যখন এ গৃহের প্রাচীর পার হইবে, তখন ও কথা বলিও।"

"তোমার কৃপায় আমরা এখনই পার হইব—চল, আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চল।"

ফরিদা বলিল, "আজ নহে।"

রুথ যেন বজ্রাহত হইল। দায়ুদ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আজ আমি যখন দ্বারের দিকে যাইতেছিলাম, তখন এক আরমানী বেগম আমাকে দেখিয়াছেন; তিনি আপনাকেও আসিতে দেখিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, বড় বেগমের দাসী আসিতেছিল। কিন্তু যদি আজ যেদিদা বেগম পলাইয়া যায়েন, তবে সে কথা আর চলিবে না। আমীরের সোহাগ পাইবার আশায় আরমানী বেগম সে কথা বলিয়া দিবেন।"

রুথ বলিল, "এখন উপায়?"

ফরিদা উত্তর করিল, "আমি উঁহাকে যেমন আনিয়াছিলাম, তেমনই বোরকায় ঢাকিয়া বাহিরে রাখিয়া আসিব। কাল এই সময় উঁহাকে আবার আনিব—তখন তোমরা দুই জনে যাইতে পারিবে।"

দায়ুদ বলিল, "হাজার লীরা দিব, দুই জনকে বাহির করিয়া দাও।"

ফরিদা বলিল, "লীরার জন্য আমি জান দিতে পারিব না—আমাকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবে। আমি লীরার জন্য এ কায করি নাই, স্নেহের জন্য করিয়াছি। আপনি যে লীরা পুরস্কার দিয়াছিলেন, সে কেবল ফিরাইয়া দিলে আপনার অপমান হইবে বলিয়া ফিরাইয়া দিই নাই।" সত্যই সে তখন লীরার অপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তুর কথা কল্পনা করিতেছিল।

ফরিদার কথায় দায়ুদের বিশ্বাস হইতেছিল না। কিন্তু বিশ্বাস না করিয়াই বা উপায় কি? এখন তাহাকে অসন্তুষ্ট করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে উভয়ের মুক্তির পথ রুদ্ধ হইবে। সুতরাং

তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য বুঝিয়া দায়ুদ বলিল, "এ গৃহে তোমার আপনার কে আছে ?"

ফরিদা বলিল, "কেহই নাই।"

"তবে চল, তোমাকেও লইয়া যাইব—তোমারও মুক্তি হইবে।"

"ক্ষমা করিবেন। আমীর অন্যের প্রতি যাহাই কেন হউন না, আমার প্রতি স্নেহশীল। সে স্নেহের সূত্র আমি সন্ধান করিয়াও পাই নাই—সন্দেহমাত্র করিতে পারি। কিন্তু আমি তাঁহার সেই স্নেহের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার বিনা অনুমতিতে এ গৃহ ত্যাগ করিব না। তিনি যে দিন স্বচ্ছন্দে মুক্তি দিবেন—সেই দিন যাইব।" ফরিদার মনে তখন কি ষড়যন্ত্রের আর কি আশার আন্দোলন চলিতেছিল, কে বলিবে ?

উপায়ান্তরবিহীন হইয়া দায়ুদ আবার ছদ্মবেশে যাইতে প্রস্তুত হইল—রুথকে চুম্বন করিয়া সে ফরিদার অনুসরণ করিল।

রুথ শয্যায় লুটাইয়া কান্দিতে লাগিল। আরও এক দিন! অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। কি হইবে, কে বলিতে পারে ? নীড়ের নিকটে আসিয়া পিঞ্জরদ্বার মুক্ত পাইলেও যদি বিহগীর বাহির হইতে বিলম্ব অনিবার্য্য হয়, তবে—সে কিরূপ যাতনা ভোগ করে ? আবার এক দিন—আবার এমনই করিয়া হৃদয়ের ঘৃণা গোপন করিয়া মুখে হাসিয়া আমীরকে ছলিয়া—এমনই করিয়া ঔষধ প্রয়োগে তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া—চাবি চুরি করিতে হইবে। আবার কত আশঙ্কা—কত বাধা। যে অদৃষ্ট আজ সুপ্রসন্ন হইয়াও এমন অপ্রসন্ন হইল, সেই অদৃষ্ট আবার সুপ্রসন্ন হইবে ত ? তখন তাহার মনে পড়িল, সে যে হাসির বিনিময়ে আজ মুক্তির জন্য চাবি সংগ্রহ করিয়াছে, সে কথা ত দায়ুদকে বলা হয় নাই ?

এই সময় ফরিদা আসিয়া চাবি দিল। তখন রুথ বুঝিল, এমন অধীর হইলে সে আপনারই সর্ব্বনাশ করিবে ; তাহাকে দৃঢ় সঙ্কল্পে কায করিতে হইবে—সব সহ্য করিয়া মুক্তি পাইতে হইবে। সে উঠিল—আমীরের কক্ষে যাইয়া তাঁহার উপাধান-তলে চাবি রাখিয়া দিল। তখনও আমীর ঔষধের ক্রিয়াজাত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। রুথের একবার মনে হইল, আর একবার এই সুযোগ সে পাইবে ত ?

রুথ সেই কক্ষের হর্ম্ম্যতলে বসিয়া কত ভাবনা ভাবিতে লাগিল! আজ যে তাহার ভাবনার নূতন উৎস মুক্ত হইয়াছে—সেই উৎসারিত উৎসমুখে সঞ্চিত ভাবনার প্রবাহ প্রবল বেগে বহিতেছে। আজ আর অনিশ্চিতের আশঙ্কা নাই—আজ আশার আশঙ্কা। সে সাফল্যের কূলে আসিয়াছে—এখন তরী হইতে অবতরণ করিতে পারিলেই হয়। কূল কর্দ্দমাক্ত—পিচ্ছিল—তাহাতে পদস্খলনের সম্ভাবনা, এ সবই সত্য ; কিন্তু দায়ুদ যাহার অবলম্বন, তাহার ভয় কি ? যে তাহার জীবন-তরী সাফল্যের কূলে আনিবে বলিয়া একান্ত বিশ্বাসে সে শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছে,সে কি এই সামান্য বিপদের আশঙ্কা দূর করিতে পারিবে না ? অবশ্যই পারিবে। এই চিন্তায় রুথ মনে যেমন প্রবোধ লাভ করিল, তেমনই আবার নানারূপ আশঙ্কাও তাহার হৃদয়ে নিদাঘের দিনান্ত-বাত্যায় বিতাড়িত মেঘের মত সমুদিত হইতে লাগিল। আশার ও আশঙ্কার আলোক ও মেঘ তাহার হৃদয়-গগনে গতায়াত করিতে লাগিল।

এমনই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে রাত্রি শেষ হইয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। ততক্ষণে আমীরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তিনি জাগিয়া বলিলেন, "তুমি কতক্ষণ জাগিয়াছ ?"

রুথ এমনই চিন্তামগ্না ছিল যে, সে কথায় চমকিয়া উঠিল ; সে যে জগতে বাস করিতেছিল, এ ত সে জগতের কথা নহে। সে চমকিয়া চাহিল ; আত্মস্থ হইতে তাহার একটু বিলম্ব হইল। ততক্ষণে আমীর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কাল কি এক ঘুমে রাত্রি শেষ করিয়াছি ?"

রুথ চেষ্টা করিয়া হাসিল ; হাসিয়া বলিল, "হাঁ।"

আমীর বলিলেন, "সে আমার অপরাধ।"

রুথ বলিল, "সে আমার ভাগ্য।"

আমীর বলিলেন, "আজও তুমি সরবৎ লইয়া আসিবে।"

রুথ ভাবিল, সে সাফল্যের আর এক সোপান অতিক্রম করিয়া মুক্তির সন্নিহিত হইল।

দিন দীর্ঘ বোধ হইলেও প্রহরের পর প্রহর কাটিতে লাগিল ; রুথের মনে হইতে লাগিল, সে তাহার সাফল্যপথে কোন বাধা লক্ষ্য করিতে পারিল না। সময় যত যাইতে লাগিল, তাহার চাঞ্চল্য তত বাড়িতে লাগিল বটে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশাও বাড়িতে লাগিল।

মধ্যাহ্নের পরই ফরিদা আসিয়া বলিল, "আমি বাজারে চলিলাম।"

রুথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

ফরিদা হাসিয়া বলিল, "এত ভুলিলে তুমি কি করিয়া কি করিবে ? আজ আর ঔষধ লাগিবে না ?"

রুথ লজ্জিতা হইল। তাহার মনে হইল, বিধাতা তাহার উদ্ধারের জন্যই ফরিদাকে এই প্রাসাদে রাখিয়াছিলেন।

রাত্রিকালে যথাসময়ে সে চাবি আনিয়া ফরিদাকে দিল এবং ফরিদা দায়ুদকে লইয়া আসিল। দায়ুদকে রুথের কক্ষে রাখিয়া বাহিরে যাইবার সময় ফরিদা তাহাকে চাবিও দিয়া গেল।

দায়ুদ বলিল, "চল।"

রুথ বলিল, "কিন্তু, দায়ুদ, আমি তোমাকে একটা কথা কাল বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এ ছয় মাস আমি আমীরের যে আদর ঘৃণায় পদদলিত করিয়াছি, কাল আর আজ তাহাকে ছলিয়া চাবি আনিবার জন্য সেই আদর হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছি। আমার কোন অপরাধ হয় নাই ত ? ভগবান্ জানেন—"

দায়ুদ বলিল, "আমি দাসীর কাছে সে সব শুনিয়াছি / দায়ুদের কাছে কি রুথের কোন অপরাধ থাকিতে পারে ?" সে সাদরে রুথের মুখচুম্বন করিল ; বলিল, "চল।"

রুথ ফরিদাকে ডাকিতে গেল ; ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ফরিদা কোথায় গিয়াছে !"

দায়ুদ অধীরভাবে বলিল, "চাবি কি তাহার কাছে ?"

"না। আমার কাছে।"

"তবে চল, আমি পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব।"

রুথ দায়ুদকে চাবিটি দিল। দায়ুদ কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া দালানে গেল—দায়ুদ অগ্রে, রুথ পশ্চাতে।

সহসা দুই দিক্ হইতে দুই জন বলিষ্ঠ প্রহরী আসিয়া দায়ুদকে ধরিয়া ফেলিল—চক্ষুর নিমিষে দায়ুদ নিরস্ত্র হইয়া তাহাদের হস্তে বন্দী হইল।

তখনই সমস্ত দালান আলোকে পূর্ণ হইল—সম্মুখে আমীর আজীজ পিশাচের হাসি হাসিতেছে। রুথ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

আমীর আদেশ দিলেন, "ইহাকে লইয়া আইস।"

দুই জন প্রহরী দায়ুদকে লইয়া ও এক জন মূর্চ্ছিতা রুথকে তুলিয়া লইয়া আমীরের অনুসরণ করিল।
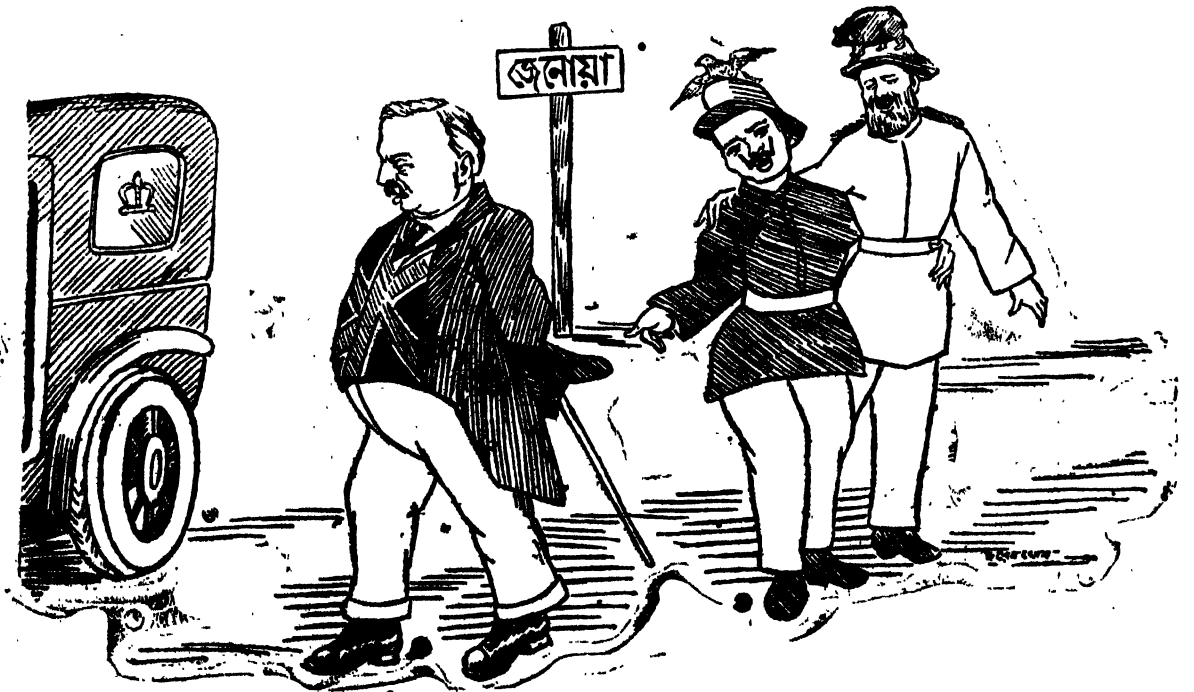
কাঁঠাল।

রসিয়া আপন রসে গায়ে দেছে কাঁটা।
কাঁচাতে সুরুচি ভোজ্য, নাম গাছপাঁটা।
ইঁচড়ে আচার হয় কোপ্তা দম ডাল্না ;
রাঁধুনী রাঁধিলে নারে পাঁটা দিতে পাল্লা।
বীচিতে অরুচি রুচি, শুচি তুলনায়,
পোড়া ভাজা ভাতে সিদ্ধ ডাল-ডালনায়॥
ক্ষীরেতে ডুবায়ে যদি খাই খাজা কোষ,
রসনায় পায় তায় পূরা পরিতোষ।
বোঝে না খাজার মজা কলিকাতাবাসী,
হজম হবে না ভেবে সারা বারমাসই।
যশোরে জানিবে খাজা কাঁটালের রাজা ;
এক গাড়ী পরিমাণ আজো পাবে তাজা॥
ললিতলবঙ্গলতা সহরের বাবু,
তিন কোয়া খেলে তাঁরা হ'য়ে যান কাবু।
রসে নোয়া নেয়ো কোয়া মধুর সৌরভ,
বাটিভরা খাঁটি দুধে বাড়ায় গৌরব ;
পেটরোগা চোগা-আঁটা বাক্য-দক্ষ বীর।
কাঁঠাল পাঠালে পেটে যাবে গঙ্গা-তীর।
আম কি কাঁঠাল মুড়ি ঝুনা নারিকেল
জোয়ানে হজম করে রোগে শক্তিশেল।
যখন এ বঙ্গ ছিল আনন্দের হাট,
হাসিত বাঙ্গালী খুলি মনের কবাট,
সবার উঠানে ছিল ধানের মরাই,
ঘরে ঘরে পূজা পেত দুগ্ধবতী গাই,
যখন প্রবেশি দেশে ম্যালেরিয়া জর
করেনি বঙ্গের অঙ্গ জর-জর জর,
যখন হয়নি কেহ ভাতের কাঙ্গালী,
মালসাট মারি লাঠি ধরিত বাঙ্গালী,
ধমকে চমকি চক্ষু জানিত রাঙাতে,
ডেঙ্গা কেড়ে নিতে এলে পারিত ঠেঙাতে,
তখন এ দেশে ছিল মুণ্‌কে রঘুনাথ
আশানন্দ ঢেঁকি আর সে বিশু ডাকাত।
এখন শান্তির রাজ্য ল' এণ্ড অর্ডার,
সভ্যতা ক'রেছে ভব্য পাইক সর্দ্দার।
ছেলেরা দৌড়িলে বলি, 'আস্তে চল, বাবা',
যৌবনে ব্যায়াম শুধু প্রেম-পদ্ম-ভাবা।

এক নোট ছোলা ভাজা বাছা দিলে মুখে,
কলেরা হইবে বলি ঢেঁকি পড়ে বুকে ;
ছেলেকে জোয়ান যদি বলে কোন জন
দশ দিক্ শূন্য দেখি, হই ক্ষুণ্ণ মন।
আহার্য্য অগ্রাহ্য আজি ভেষজ ভোজন,
ভোগে দেখি বিভীষিকা, রোগপ্রয়োজন।
আমি ত মেড়েতে আজও চিবাই মটর,
তালের ফুলুরি করে হজম জঠর,
সফেন আতপ অন্ন অড়রের দা'ল,
ভাজাভুজো তরকারি ইলিশের ঝাল,
পরিতোষে খেয়ে শেষে মিশাইয়ে দুধে,
কাঁঠাল আমের রস খাই চক্ষু মুদে।
পরিতোষে খাই, রাখি এক কোণ খালি ;
স্বাস্থ্য তাই আজো আস্ত রেখেছেন কালী।
বাবারা খাবার নাহি ক'রে আঁটা-আঁটি
ছেলেরে শেখাও খেলা হাঁটা খাটাখাটি ;
মা নাও কলসী কাঁকে ; বাল্‌তি ভ'রে ছেলে
দোতালাতে উঠে দাও বারান্দায় ঢেলে ;
পিসীমা ঘোরাও জাঁতা ; বাঁট্‌না বাট মাতা ;
ব্যাটা নিয়ে হাঁট বাবা খুলে তুলে ছাতা।
পরের তেতালা দেখে ফেল না নিশ্বাস,
চেষ্টা-ফল মিষ্ট বেশী রাখিও বিশ্বাস ;
সুখের কোটর নয় মোটরের মধ্যে ;
জীবনের পদ্ম মেশা খাটুনীর গন্ধে,
মুটে তাই ছুটে, ভাই, গান গেয়ে সুখে,
ট্রামেতে আরামে বাবু অন্ধকার মুখে।
সুখের শ্রাবণে ধরা ধারায় সরস,
মাটা নাই কাঁঠালেতে আগাগোড়া রস ;
বসে খাও পিঁড়ে পেতে চিঁড়ে দই মেখে,
মিশায়ে পনস-রস দেখ দেখি চেকে !
ঝম ঝম ঝম যবে পড়ে জোরে বিষ্টি,
দেখ দেখি বীচি পোড়া কত লাগে মিষ্টি।
বঙ্গদেশ তোরে আমি বড় ভালবাসি।
তুমি যে আমের মাতা কাঁঠালের মাসী।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

কাদা-খোঁচা

আমাদের বাঙ্গালা দেশের কাদা-খোঁচার আকৃতি ও প্রকৃতির সহিত যাঁহাদের কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারা উহার নামের সার্থকতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নাতিদীর্ঘ সুপুষ্ট দেহ, তুণ্ডাগ্রে সুদীর্ঘ চঞ্চু, কৃষ্ণ-পীত-ধূসর বর্ণের এমন বিমিশ্র সমাবেশ যে, সেই বর্ণচ্ছটার ম্লানিমা তাহার আত্মগোপনের সহায়তা করে। চষা মাঠে, সিক্ত তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডে, হ্রদ-তড়াগ-সমীপবর্ত্তী কোমল কর্দ্দম-মধ্যে সে বর্ষা ঋতুর শেষভাগ হইতে বসন্তের অবসান পর্য্যন্ত বিচরণ করে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহাকে বিচরণ করিতে বড় একটা দেখা যায় না, কারণ; সে দিবাভাগে জলাভূমির শরবনান্তরালে অথবা ঘনশষ্পমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, কচিৎ প্রত্যূষে অথবা সায়াহ্নে আমাদের নয়নগোচর হয়। দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে অথবা অনেকে মিলিয়া একত্র আহারের অন্বেষণ করিতে কাদা-খোঁচা অভ্যস্ত নহে; কেবল কখনও কখনও স্বতন্ত্রভাবে আহার্য্যান্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথাও একাধিক বিহঙ্গ একত্র আসিয়া হয় ত উপস্থিত হয়। বাস্তবিক স্বভাবতঃ ইহারা নিশাচর; রাত্রিকালে ইচ্ছামত উদর-পূর্ত্তির আয়োজন ইহারা অবাধে করিবার সুযোগ পায়। এই নাতি-হ্রস্বাঙ্ঘ্রি, দীর্ঘচঞ্চু বিহঙ্গের ঠোঁটের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সে মুখব্যাদান না করিয়াও চঞ্চুর অগ্রভাগ অনায়াসে এমন বিস্ফারিত করিতে পারে যে, কর্দ্দমের ভিতর হইতে সহজেই কীটাদি আহার্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ঠোঁট হইতে অনেক দূরে চক্ষুর্দ্বয়ের সংস্থান দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা তাহার আত্মরক্ষার পক্ষে সুন্দর নৈসর্গিক ব্যবস্থা। কাদার মধ্যে ঠোঁটের খোঁচা দিয়া যখন সে নতমুখে খাবার খুঁজিতে ব্যস্ত থাকে, তখন পাছে অতর্কিত-ভাবে কোনও আততায়ী তাহাকে আক্রমণ করে, সেই জন্যই যেন প্রকৃতি দেবী তাহার চক্ষু দুইটিকে এত দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন যে, তাহার চারিদিকে ঐ সময়ে সে দৃষ্টি রাখিতে পারে; অর্থাৎ কাদার মধ্যে ঠোঁট প্রবিষ্ট করাইলেও, ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে চোখ দুইটি থাকে বলিয়া তাহার বিপদের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত অল্প। এই অনুমানের মূলে কোনও সত্য থাকুক বা না থাকুক, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্য কোনও বিহঙ্গের চক্ষু চঞ্চু হইতে এত দূরে সংস্থাপিত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ষার শেষভাগে আমাদের দেশে কাদা-খোঁচা পাখীর আবির্ভাব হয়। সে যে যাযাবর, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে কয় শ্রেণীর কাদা-খোঁচা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সকলেরই স্বভাব প্রায় এক-রূপ;—কেবল একশ্রেণীর কাদা-খোঁচা যাযাবর নহে, অর্থাৎ কোনও ঋতুতে তাহারা অন্যান্য আগন্তুক কাদা-খোঁচার মত ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যায় না। যাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহারা উত্তর-পশ্চিমের গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া অথবা পূর্ব্বভারতের বিশাল নদ-নদীর তীরে তীরে, একে একে অথবা দলে দলে উপস্থিত হয়। বসন্তাগমে অথবা গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভে আবার তাহারা বাহির হইয়া যায়। সুদূর মধ্য-এসিয়ার তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে তাহারা নীড়রচনা ও ডিম্ব প্রসব করে। ইহা পক্ষিতত্ত্ববিদ্গণ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, এ দেশেও কাশ্মীর প্রভৃতি কোনও কোনও অঞ্চলে কাদা-খোঁচার বাসা ও প্রসূত অণ্ড দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা তাহাদের চির-ন্তন অভ্যাসের ব্যতিক্রম মাত্র।

ইহাদের স্বভাবগত অভ্যাস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী শীকারীর সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান্। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, কাদা-খোঁচা কিছুতেই দিনের আলো সহ্য করিতে পারে না। প্রত্যূষে অথবা গোধূলিক্ষণে তাহাদিগকে বিচরণ

করিতে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দীর্ঘ মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্য্যালোক হইতে আত্মগোপন করিয়া আমাদের বাঙ্গালা দেশের ধানের ক্ষেতের মধ্যে তাহারা লুক্কায়িত থাকে; এমন ভাবে লুক্কায়িত থাকে যে, তাহাদের দেহ মাটীর সঙ্গে মিলাইয়া যায়। আগন্তুক শীকারী অথবা তাহার অনুচরগণ তাহাদের গায়ের উপর আসিয়া পড়ে, তবুও তাহারা সহজে উড়িতে চাহে না। এক জন শীকারী লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার শোলার টুপী চাপা দিয়া একবার একটা পাখী ধরিয়াছিলেন। আর চলিয়া যাইতে হয়, তখনও নিশীথে চন্দ্রালোকে আকাশমার্গে তাহাদের প্রব্রজন হয়। এতদিন যাহারা একাকী থাকিতে ভালবাসিত, সহসা স্বজাতীয় কাহাকেও কাছে ঘেঁসিতে দিত না, আজ তাহারা দলে দলে মিলিত হইয়া কোন এক নিরুদ্দেশ রহস্যময় আকাশযাত্রায় বদ্ধপরিকর। দিবালোকের কথা বলিতেছিলাম; শীকারীরা দ্বিপ্রহরে কাদা-খোঁচা শীকারে প্রায়ই ব্যর্থপ্রয়াস হয়; কারণ, কোথায় যে ধানের ক্ষেতের মধ্যে, আ'লের পাশে, ঘাসের ঝোপে, ধানের অথবা মাটীর

কাদাখোঁচা। শিল্পী—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুশারী।

একবার তাঁহার অনুচর আর একটা পাখী হাতে করিয়া ধরিয়াছিল। তাহাদিগকে গোপনী স্থান হইতে উড়িতে বাধ্য করিলেও তাহারা পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করে না, আতপতাপ এতই তাহাদের অসহ। জ্যোৎস্নালোক ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। চন্দ্রালোকিত ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে অথবা জলাশয়সমীপে ইহারা আহার-বিহার করিয়া থাকে। আবার যখন চৈত্র বৈশাখে এ দেশ ছাড়িয়া তাহাদিগকে অথবা তৃণের সহিত সে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যাধ-চক্ষুর অগোচর। পাখীটার স্বভাব এই যে, সে আততায়ী দেখিলেই অন্য পাখীর ন্যায় প্রাণভয়ে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে না, বরঞ্চ আরও দৃঢ়ভাবে মাটীর উপর বসিয়া পড়ে। যদিই বা ভীত হইয়া ঝোপ পরিত্যাগ করতঃ আকাশে উড়ে, তাহার উৎপতন-ভঙ্গী অত্যন্ত এলোমেলো; কিন্তু কিছুতেই সে বেশীক্ষণ উড়িতে

চাহে না, যেখানে সেখানে যে কোনও ঝোপে পুনরায় আশ্রয় লয়।

সুন্দরবনের মধ্যে কোনও কোনও শীকারী আবদ্ধ জলের মধ্যে অবতরণ করিয়া প্রখর দিবাভাগে স্নিগ্ধ পদ্মপত্রান্তরালে সমাসীন বিহঙ্গের সন্ধান পাইয়াছেন। কাদা-খোঁচাকে এ দেশে কেহ দাঁড়ে বসার মত বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিতে দেখে নাই, কিংবা ভূমির উপরে কিয়দ্দূর দৌড়িয়া যাইতেও দেখিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে না কি ইহাদের স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। শাবক-জনন ঋতুতে য়ুরোপে এবং এসিয়ার উত্তরখণ্ডে ইহারা বৃক্ষ-শাখায় বসে। এই ঋতুতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পক্ষভরে আকাশ-পথে বিচিত্র-ভঙ্গীতে খেলা করিতে ভালবাসে; তখন কেমন একটা শব্দ তাহাদের পুচ্ছচালনে উত্থিত হয়, তাহা লইয়া অনেকে অনেক প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন। পক্ষি-দম্পতির নীড় শরবনে অথবা তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপরে রচিত হয়; প্রায় একত্র চারিটি ডিম্ব প্রসূত হইতে দেখা গিয়াছে। পাখীর দেহের পরিমাণ হিসাবে ঐ অণ্ডগুলি বেশ বড় বলিয়া মনে হয়।

পাখীর দেহের বর্ণ সম্বন্ধে পক্ষিপালকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রায়ই প্রাঙ্-মিথুন-লীলার অবসানকালে ও দাম্পত্য-জীবনের প্রারম্ভে পুংপক্ষীর পতত্রের বর্ণ গাঢ়তর ও উজ্জ্বলতর হইয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, শাবকের দেহের বর্ণ তাহার জনক-জননীর বর্ণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হইয়া থাকে; কিছু দিন পরে এই বর্ণপার্থক্য দূর হইয়া যায়। কাদা-খোঁচার সম্বন্ধে কিন্তু এই সাধারণ নিয়ম খাটে না। স্ত্রী-পুং অথবা প্রৌঢ়-অপ্রাপ্তবয়স্ক নির্ব্বিশেষে সকল পক্ষীর দেহের বর্ণ প্রায় একই রকম হইয়া থাকে। কেবল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তাহাদের শ্রেণীগত বৈলক্ষণ্যবশতঃ কৃষ্ণ ও পীত রেখার ঈষৎ তারতম্য দৃষ্ট হয়। আবার একই শ্রেণীভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন কাদা-খোঁচার বর্ণে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে;— অনেক স্থলে পূর্ব্বোক্ত রেখাগুলির গাঢ়তার ও ঔজ্জ্বল্যের ইতরবিশেষ হয়। কখনও কখনও বা সাদা রং এমন ভাবে আসিয়া পড়ে যে, তাহাকে সিতবর্ণে রূপান্তরিত albinistic বলিলেও চলে। কোথাও বা পীত-লোহিতবর্ণ বিলুপ্ত হওয়ায়, ঈষৎ মেটে রং দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; কদাচিৎ বা অন্য সমস্ত রং একেবারে লোপ পাইয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণবর্ণে মণ্ডিত হইতে দেখা যায়। এই প্রকার সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত (melanistic) বিহঙ্গকে কেহ কেহ আমাদের সাধারণ পরিচিত কাদা-খোঁচা হইতে ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এত দিন মনে করিতেন; কিন্তু আজকাল মিঃ ফ্রাঙ্ফিন্ প্রমুখ অনেকেই স্পষ্টভাবে ইহাকে সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কাদা-খোঁচার এই বর্ণ-বৈচিত্র্য পর্য্যালোচনা করিয়া নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলা কঠিন যে, ইহার পশ্চাতে প্রকৃতি দেবীর কোনও গূঢ় অভিসন্ধি প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়া করিতেছে না। যখন সে মস্তক অবনমিত করিয়া স্বীয় দেহ এমন ভাবে উত্তোলিত করে যে, তাহার সমস্ত শরীর ও পুচ্ছ ঋজুরেখার মত ভূমি হইতে ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত হয়, তখন তাহার পৃষ্ঠদেশস্থ পীত রেখাগুলি সরল শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া দর্শকের মনে ভ্রম উৎপাদন করে না কি? এই ভ্রমোৎপাদন পাখীর আত্মরক্ষার অনুকূল কি না অথবা সে তাহার দেহের রেখাগুলির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন কি না, বলা যায় না। সম্ভবতঃ সে আদৌ সচেতন নহে। ইহার দ্বারা তাহার জীবনরক্ষা কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্ভাবিত হয় কি না, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা বোধ করি তাহার নাই। তবে কার্য্যগতিকে প্রকৃতির বিপুল প্রাঙ্গণে যাহা দাঁড়ায়, তাহা উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া অনুমান করা হয় মাত্র; কারণ, তাহা না হইলে এই বর্ণ-সমাবেশের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয় না। উদ্দেশ্য থাকুক, আর না-ই থাকুক, ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, পক্ষি-জগতে কাদা-খোঁচা যে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে,— স্ত্রী-পুংনির্ব্বিশেষে, প্রৌঢ়-শিশু-নির্ব্বিশেষে বর্ণ-বিন্যাসে প্রায় কোনও প্রকার ভেদ লক্ষিত হয় না—তাহা বহু যুগযুগান্তরের দেহ-বিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল। সে তাহার জীবনের ইতিহাসে এমন যায়গায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে, কোনও প্রকার বর্ণভেদ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অসামঞ্জস্য জন্মাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই অবস্থাপ্রাপ্তি খুব উচ্চস্তরের specialisation বা বিশিষ্টীকরণ। তবে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে ভেদ দেখা যায়, তাহা তাহাদের আকারগত,—স্ত্রী-পক্ষীর দেহ অপেক্ষাকৃত বড় ও চঞ্চু অপেক্ষাকৃত লম্বা।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

জেনোয়ায় বিশেষ কিছু হইল না। ব্যাপারটা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ কিছু না হইবারই কথা। ফরাসীর মেজাজ প্রথম হইতেই গরম ছিল; কিন্তু লয়েড জর্জ্জের মোহিনী শক্তি বার্টুকে প্রায় অভিভূত করিয়া যখন সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল, প্যারি হইতে পোঁয়াকারে ফরাসী প্রতিভূর রাশ টানিয়া ধরিলেন,—জর্ম্মণী ৩১এ মে'র মধ্যে reparationএর এক কিস্তি টাকা দিতে বাধ্য, নচেৎ সামরিক চাপ দেওয়া হইবে; আর রুশকে কোনও নূতন প্রস্তাব করিতে দেওয়া হইবে না। ফরাসীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য লয়েড জর্জ্জ ইহাতে সম্মতি দিলেন। ইঙ্গ-ফরাসীর মতের সহিত মত মিলাইয়া রুশ হয় ত চলিতে পারিতেন; কিন্তু বেলজিয়মের প্রতিনিধি জ্যাস্পার যখন রুশিয়ার মধ্যে বিদেশীয়দিগের ভূসম্পত্তির কথা তুলিলেন, তখন মিলনের আর কোনও সম্ভাবনাই রহিল না। ইংরাজ চুপ করিয়া গেলেন; ফরাসী বেলজিয়মের সহিত যোগ দিলেন;—জেনোয়াও হইয়া গেল।

রুশ বলিলেন, তাঁহারা বেলজিয়মের এই আব্দার অন্যায় বিবেচনা করেন। রুশিয়ার মধ্যে যখন কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা কোনও সঙ্ঘবিশেষের নিজস্ব ভূসম্পত্তি বলশেভিক গভর্মেণ্ট স্বীকার করেন না, যেখানে ষ্টেটের বা রাষ্ট্রেরই একমাত্র সার্ব্বভৌম অধিকার, অন্য কাহারও কোনও প্রকার স্ব স্বামিত্ব ভূমিসম্বন্ধে যেখানে স্বীকৃত হয় না, সেখানে কেমন করিয়া বেলজিয়মের বা অন্য কাহারও ভূ-স্বামিত্ব স্বীকার করা হইতে পারে? তবে এই পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে যে, গভর্মেণ্ট নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য জমি পত্তনি দিতে পারেন। শেষতঃ যাঁহারা পূর্ব্বে কোনও কোনও জমি ভোগদখল করিতেন, তাঁহারা সেই সকল ভূমি কিছু দিনের জন্য ষ্টেটের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন। এই পর্য্যন্ত বস, ইহার অধিক চলিতে পারে না। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও বিদেশীয়দিগকে কিছু সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অপর সকলকে সব রকম সুবিধা করাইয়া দিয়া চিচারিণের দল কি রিক্তহস্তে দেশে ফিরিতে পারেন? যখন দেশের লোক বলিবে,—তোমরা কি আনিলে? তখন কি উত্তর দেওয়া যাইবে? জেনোয়ার আসরে রুশের পালা শেষ হইলে, টাকা-কড়ি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্তও না পাইয়া, সে কি তাহার বাদ্যযন্ত্র ও হুঁকাটি ফেলিয়া মানে মানে ফিরিয়া যাইবে? লোক জিজ্ঞাসা করিবে,—"কি হে, এবার জেনোয়ার আসরে তোমাদের পালা কেমন জম্‌ল?" উত্তর হইবে,—"চমৎকার! চারদিক থেকে সাধুবাদ (অর্থাৎ লোষ্ট্র-নিক্ষেপ)।" "কি পেলেথুলে?" "আঃ, খুব মিষ্ট ব্যবহার, আরো পাবার আশা আছে।" "তোমাদের সব বাদ্যযন্ত্রগুলো কোথায়?" "ফের গাইতে হবে কি না, তাই যদি আমরা না যাই, ওরা বাজনাগুলো নিয়ে রেখে দিয়েছে।" "তবে এখনও কিছু পয়সা-কড়ি পাও নি! ফের কোথায় গাওনা হবে?" "হেগ্‌-এ"।

রুশ চাহিয়াছিল যে, বলশেভিক গভর্মেণ্টকে সকলে সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্মেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লউক, আর তাহাকে কিছু বেশী টাকা ঋণ দেওয়া হউক্‌। এ দুইয়ের কোনওটাই হইল না। সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্মেণ্ট বলিয়া স্বীকৃত না হইলে কেহ তাহার সহিত দেনা-পাওনার কারবার করিতে চাহিবে না। তবে একটা কথা উঠিয়াছিল, য়ুরোপ ও মার্কিণের ধনকুবেরগণ মিলিত হইয়া একটা Consortium করিয়া রুশিয়ার যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক রাখিয়া কিছু ধার দিতে পারে। রুশিয়া অবশ্যই সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিল। কাযেই কিছু হইল না।

কিন্তু একটা কিছু ত হওয়া চাই! যাহা হইল, তাহার ইংরাজী নামকরণ—Non-aggression pact অর্থাৎ আক্রমণ-না-করা সর্ত্ত। কেহ কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিবে না। এই আক্রমণ-না-করা'র অর্থ কি, ইহা লইয়া ইহারই মধ্যে অনেক প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভার্শাইল্ সন্ধি অনুসারে রাষ্ট্রীয় সীমানাগুলি ঠিক আছে ত? সে সম্বন্ধে বোধ

লয়েড জর্জ্জ ও বার্ট্

করি আর কোনও কথা উত্থাপিত হইতে পারে না। অন্ততঃ বড় বড় মোড়লদের এই মত। তাহাই যদি হয়, তবে কিসের জোরে পোলাণ্ড রিগা দখল করিয়া বসিয়া আছে? ওটা ত

ভার্শাইল্ নিরূপিত সীমানার মধ্যে নাই। রুশিয়ার বেসারাবিয়া দেওয়া হইয়াছে রুমানীয়াকে; কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত রুশ গভর্মেণ্ট তাহাতে স্বীকৃত না হয়, তত দিন কি তাহা সম্পূর্ণরূপে

পাকা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? বল্‌টিক সাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র মধ্য-য়ুরোপে এই রকম অনেক গোলযোগ রহিয়াছে। তবে এই সমস্ত ভূখণ্ডগুলির স্বামিত্ব লইয়া বিরোধের সম্ভাবনা আছে। পোল্ রিগায় রহিল, ইহা aggression, না non-aggression? পুনশ্চ,—সশস্ত্র হইয়া অন্যের সীমানা অতিক্রম করিলেই কি এই সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইবে? না, সীমানার সম্মুখে সামরিক আয়োজন করিবামাত্র এই সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইবে? পররাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্রোহীদিগকে অস্ত্র যোগাইলে কি এই সর্ত্তের ব্যতিক্রম হয় না? আগামী ৩১এ অক্টোবর জাপান সাইবিরিয়া পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু যত দিন না করে, তত দিন কি বলিব—aggression না non-aggression?

রুশ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইটালী ও চেকো-শ্লভাকের সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ সন্ধি করিলেন। য়ুরোপ যে আশা করিয়া জেনোয়ায় মিলিয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হইল।

এখন হেগ্। ঐ নামটার সঙ্গে হতভাগ্য রুশ-সম্রাট নিকোলাসের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনিই ওখানে প্রথম Peace Tribunal স্থাপিত করেন। যাহাতে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়, জগতে শান্তি-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিলেন। বিরোধের কোনও সম্ভাবনা হইলেই এই শান্তি-ধর্ম্মাধিকরণ তাহা মিটাইয়া দিবে। কিছু দিন পরে রুশ-সম্রাট টেলিগ্রাফ করিলেন, জর্ম্মণ-সম্রাট উইল্‌হেল্‌ম্‌কে—"প্রশান্ত-মহাসাগরের অ্যাড্‌মিরাল্ আটলান্টিক মহাসাগরের অ্যাড্‌মিরাল্‌কে অভিবাদন করিতেছেন!" অল্পকাল পরেই উক্ত প্রশান্ত-মহাসাগরের অ্যাড্‌মিরাল্ জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। তাহার হেগ্ ধর্ম্মাধিকরণ তখন কোথায় ছিল?
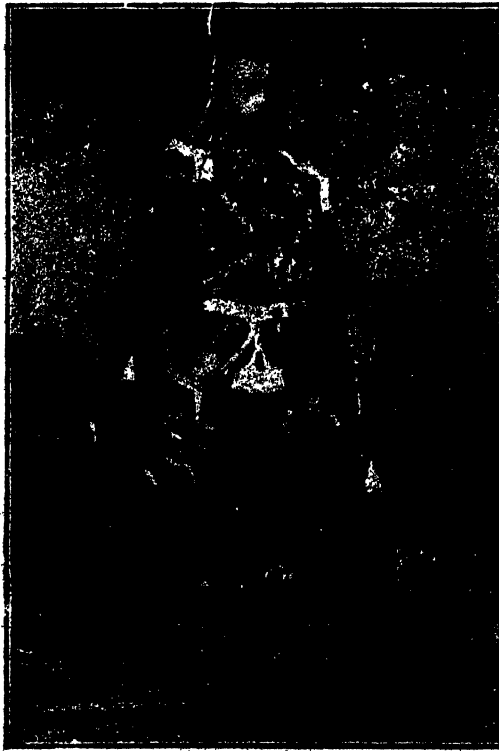
রুশ-সম্রাট নিকোলাস।

ইহারই মধ্যে যে সকল দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনেকেই মনে করিতেছেন যে, হেগ জেনোয়ার একটি নূতন সংস্করণ মাত্র হইবে। মিছামিছি সময়ের এই অপব্যবহার করিয়া য়ুরোপের ক্ষতিবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা।

বাজে কথায় এখন আর শিক্ষিত চিন্তাশীল য়ুরোপীয় আশ্বস্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা হতাশভাবে অনেক কথাই বলিতেছেন। কোথায় তাঁহাদের জীবনের মূলসূত্র ছিন্ন হইয়াছে, এক একবার তাহারই অনুসন্ধান করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাঁহারা ছট্‌ফট্ করিতেছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, একটা অত্যন্ত ভীষণ আকস্মিক উৎপাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রেম-মন্ত্র লুপ্ত হইয়াছে, অথবা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাই সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে মানব-জীবনের মূলমন্ত্র হারাইয়া গিয়াছে। এক জন লিখিতেছেন,—এ যুগে মানুষ কিছুতে বুঝিতেই পারিতেছে না, কেমন করিয়া বাঁচিতে হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সে মনে করিত যে, কায জুটিলেই তাহার মোক্ষলাভ হইল, ধনই একমাত্র কাম্য। এখন যা' হউক, আবশ্যক কায-কর্ম্ম চলিতেছে; কিন্তু স্ফূর্ত্তি নাই, আগ্রহ নাই; সমাজে অনাচার ও কদাচার দেখা দিয়াছে। যে য়ুরোপের পুরুষ নানা অবস্থায় নানা

বিচিত্র কার্য্যে নিজেকে অনায়াসে নিয়োজিত করিত, আজ সে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে (European man, with his variety and adaptability, seems to have given up, like a sick animal); কিন্তু তাই বলিয়া কি জেনিভা, ওয়াশিংটন, জেনোয়া, হেগ্ এ সভা করিলেই তাহার রুগ্ন দেহে বলসঞ্চার হইবে? বিজেতৃ শক্তিপুঞ্জ জর্ম্মণীর ঘাড়ে সমস্ত পাপের বোঝা চাপাইয়া আপনাদিগকে নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ স্থির করিয়া বসিয়া আছে। ইংরাজ পত্র 'নেশন্'

জার্ম্মাণ-সম্রাট।
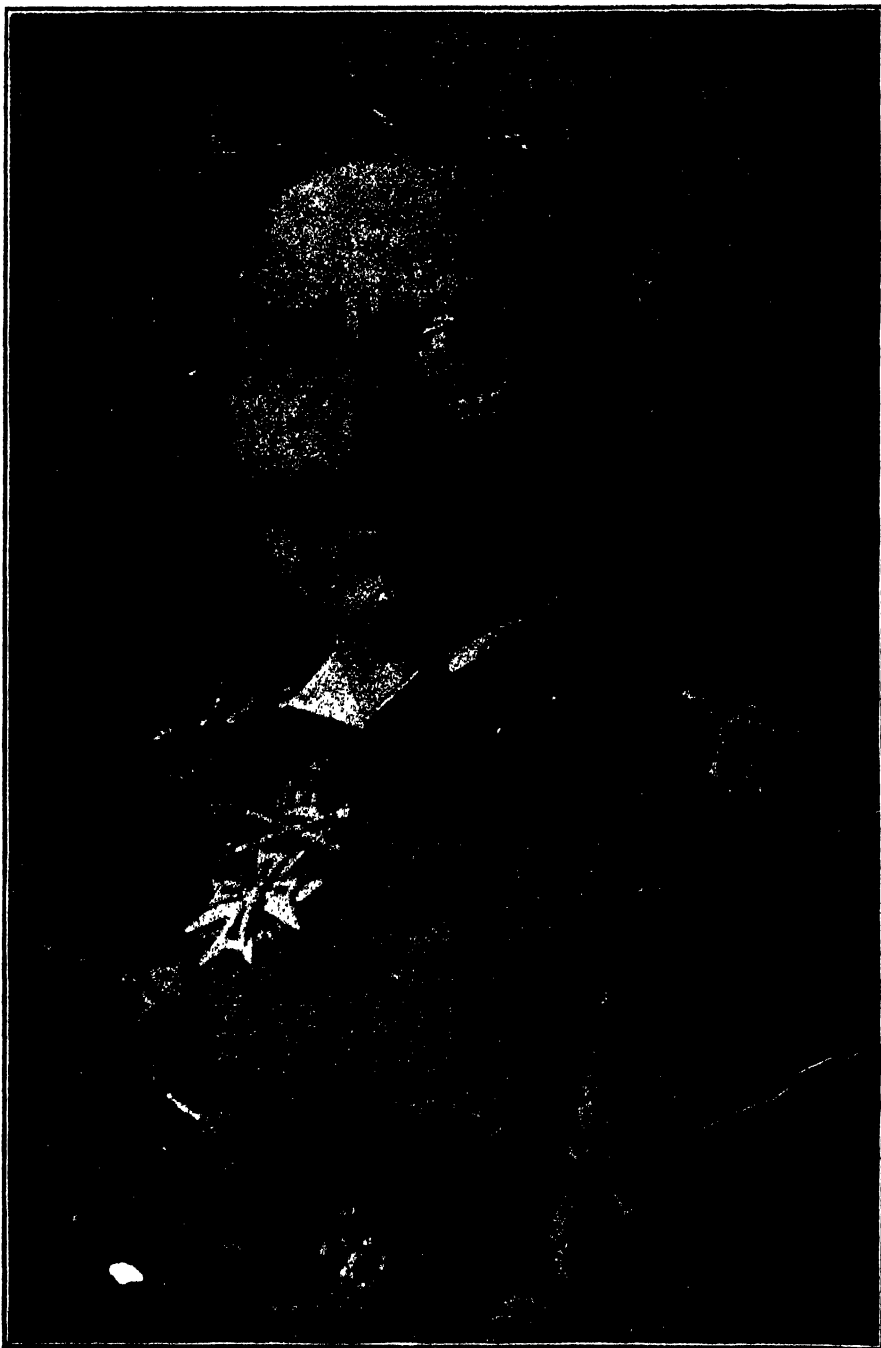
বলিতেছেন,—জর্ম্মণীকে বর্ব্বর, পরস্বগৃধ্নু ও সমরদর্পী বলা হয় ;—কিন্তু য়ুরোপের মধ্যে রুশিয়া ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর, আমরা ইংরাজ সর্ব্বাপেক্ষা পরস্বগৃধ্নু, আর ফরাসী সর্ব্বাপেক্ষা সমরদর্পী। খৃষ্টান য়ুরোপের হৃদয় আজ কঠিন। সে অন্যের পাপ-পুণ্যের বিচার করে, এক দিন তাহারও বিচার হইবে। It will go on judging others till in turn it is judged and destroyed; living for self till every creed and continent turn against the common nuisance of 'Christian' Europe,...professing righteousness and flouting every Christian test and canon of it; and crucifying any Son of Man or God who arises to tell it the truth about itself. অর্থাৎ এক দিন এই স্বার্থান্ধতা শ্বেতকায় "খৃষ্টান" য়ুরোপের বিরুদ্ধে সমস্ত জগৎকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবে; ধর্ম্মপ্রাণতার ভাণ করিয়া ধর্ম্মকে সে পদদলিত করিবে; এবং যদি ধর্ম্মের গ্লানি বা অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে সত্যবাণী শুনাইবার জন্য কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিবে।

কিন্তু "খৃষ্টান" য়ুরোপের হৃদয় কিরূপ কঠিন হইয়াছে, তাহা এই 'নেশন' পত্রে সম্পাদকমণ্ডলী যতটা বুঝিতে

পারিয়াছেন, আমরা বোধ হয় তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। উহার যে সংখ্যায় এই ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসটুকু পাওয়া যায়, সেই সংখ্যাতেই মহাত্মা গন্ধীকে বুজরুক বলা হইয়াছে,—India chose this engaging charlatan when she had better men for her service...চক্ষু রগড়াইয়া পুনশ্চ আমরা পাতা উল্টাইয়া পড়িয়া দেখি—যদি তাহাকে সত্যবাণী শুনাইবার জন্য কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিবে। এই শ্রেণীর লেখকের কাছে সত্য সহসা ধরা দেয় না। অথচ য়ুরোপীয় সামাজিক জীবন কেন হতশ্রী হইয়া পড়িল, কবে এই দুর্গতি আরম্ভ হইল, তাহা জানিবার চেষ্টা অনেকেই করিতেছেন।

খ্যাতনামা অধ্যাপক জিমারণ্ বলেন, যে দিন হইতে য়ুরোপ ইকনমিকস্এর অর্থ বুঝিতে ভুল করিল, সেই দিনই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। পলিটিক্স্ বা রাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য বুঝিতে লোকের কষ্ট হইল না; কিন্তু ইকনমিকস্ বা বার্ত্তা-শাস্ত্র মানবকে প্রভূত লাভবান্ হইবার উপায় দেখাইয়া দিবে, উনবিংশতি শতাব্দীতে এই ধারণা সমাজের সকল স্তরে বদ্ধমূল ছিল। সমাজের ব্যবহারোপযোগী আবশ্যক সামগ্রী প্রস্তুত করা, ও সেই সকল দ্রব্য সমাজের সর্ব্বত্র যথোচিত বণ্টন করা কি উপায়ে প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ করিতে পারা যায়, ইহাই ইকনমিক্স্এর মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল;—এই গ্রীক শব্দটির ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ,—গৃহস্থালীবিধি। সামাজিক মানবের দৈনন্দিন অভাব-মোচনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ষ্টেট্কে সেই অভাব-মোচনের চেষ্টা করিতে হইবে, এই জন্য এই শাস্ত্র পলিটিক্যাল। এখানে profiteering বা প্রচুর লাভ করার কোনও কথাই নাই। এই লাভের চেষ্টায় অর্থের চেয়ে অনর্থের বৃদ্ধি হইল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টার্বেরির পাদরি-লাট একটা কমিটী গঠিত করিয়াছিলেন, যাহাতে কারবারে ব্যবসায়ে খৃষ্টীয় নীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, এরূপ কোনও উপায় উদ্ভাবন করা যায় কি না। কমিটীর রিপোর্টে সমাজ-সেবা বা serviceএর উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পলিটিক্স্এর সঙ্গে সঙ্গে ইকনমিক্স্ অগ্রসর হইতে পারে নাই। পলিটিক্স্এ এই সমাজ-সেবা বা service ভাব অল্পে অল্পে প্রাধান্য লাভ করিতেছে; ইকনমিক্স্এ কিন্তু ইহার একান্ত অভাব। যত কিছু গোল বাধিয়াছে এইখানে। এ অভাব মোচন করিতে পাদরীরা পারেন নাই; জেনোয়া হেগ্ পারিবে কি?

আপাততঃ ফরাসীর এ সকল কূট-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা আদৌ নাই। সে মনে করে, তাহার অবস্থা ভীষণ সঙ্কটাপন্ন। ক্ষতি-পূরণের দাবি মিটাইয়া না পাইলে সে কিছুতেই সামলাইতে পারিবে না। জর্ম্মণী যখন বলেন যে, গত এপ্রিল মাসের মধ্যে সর্ব্বসমেত অন্যূন পঁয়তাল্লিশ সহস্র কোটি সুবর্ণ মার্ক মূল্যের সম্পত্তি বিজেতৃদিগের হস্তগত হইয়াছে, ফরাসী বিরক্তির সহিত তাহার উত্তরে বলেন যে, তন্মধ্যে মাত্র এক শত ত্রিশ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে,—আর সমস্তই রেল, জাহাজ, কয়লা, ভূসম্পত্তি, গাড়ী, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতি বাবদে একটা কাল্পনিক মূল্য হিসাব করিয়া দেনা-পাওনা মিটাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। টাকা পাওয়া গেল না; অথচ ফ্রান্সের নষ্ট প্রদেশগুলার পুনর্গঠন-কল্পে প্রচুর অর্থব্যয় প্রয়োজন। ফরাসীকে নয় সহস্র কোটি ফ্রাঙ্ক ঋণ করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতীব ভয়ানক। গত বৎসরে ফরাসী রাষ্ট্রের আয় ছিল প্রায় আড়াই হাজার কোটি ফ্রাঙ্ক; রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদের পরিমাণ হইল প্রায় তের শত কোটি! অথচ যে বৎসর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ আয়ের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ছিল।

কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—ফ্রান্সের পূর্ব্বাঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে পুনরায় গড়িয়া তুলিবার জন্য ফরাসী গবর্মেণ্ট ঋণ করিতে গেলেন কেন? অন্য কোনও উপায় ছিল না কি? ছিল বৈ কি; এবং অনেকে তাহা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিলেও পোঁয়াকারের দল তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। জর্ম্মণ সচিব র‍্যাথেনাউ ফরাসী প্রতিনিধি লুশিয়ারের সঙ্গে diplomatic আলাপ করিয়া গত বৎসর যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই:—ফ্রান্স ও বেলজিয়মের সমস্ত বিধ্বস্ত প্রদেশের পুনর্গঠনের ভার জর্ম্মণ গভর্মেণ্ট লইবেন; ফরাসী গভর্মেণ্ট যে রকম বাড়ী, ঘর, বাগান, পথ, ঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে চাহেন, জর্ম্মণ রাষ্ট্র নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাই করিয়া দিবে; কিন্তু সমস্ত মজুর, মিস্ত্রী, মাল-মসলা জর্ম্মণ হওয়া চাই; উৎকৃষ্ট শিল্পী কর্ত্তৃক উত্তম

উপকরণে ফরাসী গভর্মেণ্টের আদেশ অনুসারে গঠনকার্য্য সুসম্পন্ন করা হইবে। অথচ নগদ স্বর্ণমুদ্রা ফরাসীকে দিবার জন্য জর্ম্মণীর দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইবে। মার্ক বিনিময় যন্ত্র-বিকল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বাস্তবিক reparation হইবে, অথচ সব দিক্ বজায় থাকিবে।

এই প্রস্তাবে লুশিয়ার সম্মতি দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য য়ুরোপ এই র‍্যাথেনাউ-লুশিয়ার বন্দোবস্তের সংবাদে আশ্বস্ত হইল। কিন্তু ফ্রান্সের একটা প্রবল দল এই ব্যবস্থাকে উড়াইয়া দিল। তাঁহারা বলিলেন,—এ ব্যবস্থায় জর্ম্মণীর যত সুবিধা, ফরাসীর তত সুবিধা নাই। জর্ম্মণীর মাল-মসলার কাট্‌তি হইবে ফ্রান্সে! আর আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিবে, কিন্তু জর্ম্মণীর কুলী মজুর, এঞ্জিনীয়র প্রভৃতি সকলেই কায পাইবে আমাদের দেশে! এ raparation আমরা চাই না। তা'র চেয়ে আমরা ঋণ করিয়া আমাদের দেশের লোক খাটাইয়া আমাদের স্বদেশ-জাত দ্রব্যাদির সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করি; শেষে সুদ শুদ্ধ জর্ম্মণীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইব! কেন জর্ম্মণী দিবে না? সে দরিদ্র, না আমরা দরিদ্র? কে বলিল যে, তাহার ধনবৃদ্ধি দ্রুততর হইতেছে না? গত বৎসরে আমাদের খনি ও কারখানা হইতে যত লৌহ ও ইস্পাত বাহির হইয়াছিল, জর্ম্মণীর প্রায় তদপেক্ষা তিন গুণ অধিক হইয়াছিল। সে বহুসংখ্যক নূতন বাণিজ্যপোত নির্ম্মাণ করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু জর্ম্মণী নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া জেনোয়ায় বলিল যে, সুবর্ণ-মুদ্রা না পাইলে এখন ফরাসীর অবস্থা খুবই খারাপ হইবার সম্ভাবনা বটে; তবে জর্ম্মণীর পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাহা আর পাঁচ জনে মিলিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। অর্থাৎ জর্ম্মণীকে কয়েক বৎসর সময় দেওয়া হউক; সেই কয় বৎসরের মধ্যে কেহ তাহার কাছে ঋণ পরিশোধের কথা তুলিবে না; এবং ফরাসীকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা কর্জ্জ দিয়া আপাততঃ পাঁচ জনে তাহাকে দায় হইতে মুক্ত করুক; ফরাসীর এই নূতন ঋণ জর্ম্মণী কালক্রমে পরিশোধ করিবে। জেনোয়ায় অবশ্যই জর্ম্মণীর এ সকল কথা টিকিল না। র‍্যাথেনাউ তিনবার লয়েড জর্জ্জের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দেখা হইল না। ইহার পরেই বল্‌শেভিক চিচারিণের সঙ্গে র‍্যাথেনাউ ও ওয়ার্থ সন্ধি করিলেন। অতঃপর রুশিয়া ও জর্ম্মণী পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে কোনও হিসাবে কিছুমাত্র টাকা-কড়ির দেনা-পাওনা দাবী করিতে পারিবে না।

র‍্যাথেনাউ।

ফরাসীর ক্রোধের সীমা রহিল না। তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা এই ক্রোধের কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন,—

১। জর্ম্মণী সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করায় দাঁড়াইল এই যে, যে গভর্মেণ্টকে আমরা কেহই ন্যায়-সঙ্গত রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতেছি না, সেই গভর্মেণ্টকে মিত্র বলিয়া যদি জর্ম্মণী স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে আজ না হয় কাল আর সকলকেই স্বীকার করিতেই হইবে।

(কিন্তু যখন ব্রেষ্ট্‌ লিটভ্‌স্কে রুশ-জর্ম্মণ সন্ধি হইয়াছিল, তখন এ কথা উঠে নাই কেন?)

২। বল্‌শেভিক রুশিয়া যখন একটা বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে দেনা-পাওনা উড়াইয়া দিয়া সন্ধি করিতে পারিলেন, তখন ফরাসী কিংবা অন্য কাহারও সহিত মিত্রতা করিবার সময় ঐ রকম দেনা মুছিয়া ফেলিবার কথা থাকিবার সম্ভাবনা বেশী হইল। সে ক্ষেত্রে ফরাসী রূঢ়ভাবে কিছু বলিলে সুশোভন হইবে কি?

(জেনোয়ায় সুপণ্ডিত ডাক্তার বণ্‌ জর্ম্মণীর তরফ হইতে ঋণ-পরিশোধের যে ব্যবস্থাপত্র পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে

ঋণ উড়াইয়া দিবার কথা ছিল না। ফরাসীর আবশ্যকমত টাকা পাঁচ জনে আপাততঃ ফ্রান্সকে কর্জ্জ দিক্; পরে জর্ম্মণ রাষ্ট্র ঐ নূতন ঋণের বোঝা নিজের স্কন্ধে বহন করিবে।)

বস্তুগত্যা কিন্তু হেগ্-এ রুশ প্রতিনিধি সমস্ত দেনা শোধ করিবার জন্ম প্রস্তুত আছেন, যদি তাঁহাকে বাজারে প্রচুর কর্জ্জ করিবার সুবিধা দেওয়া হয়।

৩। ভার্শাইল সন্ধি-পত্রের ১১৬ ধারায় আছে যে, পরে যখন রুশিয়া জর্ম্মণীর সহিত সন্ধি করিবে, তখন সে জর্ম্মণীর নিকট হইতে যথোপযুক্ত ক্ষতি-পূরণের দাবী করিতে পারিবে; তাহাতে ইঙ্গ-ফরাসী-ইটালী মিত্রশক্তিগণ রুশিয়ার পক্ষসমর্থন করিবে। চিচারিণ র‍্যাথেনাউএর এই র‍্যাপালো সন্ধি ভার্শাইল-বিরোধী। অতএব ইহা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না।

(তাই না কি? অথবা ইহার মধ্যে আরও কিছু গুপ্ত রহস্য আছে? রুশিয়া যদি ফরাসীকে বলে যে, রোম্যানফ্-ঘটিত ঋণ-পরিশোধ করিবার সামর্থ্য তাহার একেবারে নাই.

বামে জর্ম্মাণ চ্যান্সেলার ওয়ার্থ, দপ্তর লইয়া চিচারিণ।

তখন ত রুশিয়াকে বলা হয়—"কেন? ১১৬ ধারা অনুসারে তুমি ত যত ইচ্ছা খেসারৎ জর্ম্মণীর কাছ হইতে আদায় করিতে পার! সেই টাকাটা আমাদের নামে লিখিয়া দাও না কেন? আমরা তাহা জর্ম্মণীর নিকট হইতে ঠিক আদায় করিয়া লইব; তোমাদেরও সাবেক দেনা অনায়াসে শোধ হইয়া যাইবে।" ফরাসীর কাছে ঋণ-পরিশোধের এমন সহজ

উপায় অবলম্বন না করিয়া র‍্যাপালোয় রুশিয়া জর্ম্মণীকে সম্পূর্ণরূপে ঋণ-মুক্ত করিয়া দিল!)

৪। এই সন্ধির নিশ্চয়ই একটা অপ্রকাশিত সর্ত্ত আছে যদ্দ্বারা উভয়ে উভয়কে যুদ্ধ-বিগ্রহে, অর্থে ও সামর্থ্যে সহায়তা করিবে।

(বার্লিন ও মস্কো পুনঃ পুনঃ ইহা অস্বীকার করিলেও ফরাসী তাহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন না। জর্ম্মণীর গুপ্ত-সভার ও সামরিক আয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ কাগজে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সম্প্রতি এক জন জর্ম্মণ জালিয়াৎ ধরা পড়িয়াছে; সে অর্থলোভে জর্ম্মণীর শত্রুপক্ষের কাছে কাল্পনিক গুপ্ত-সমিতির ও সামরিক আয়োজনের বিবরণ চালাইয়া দিত। লোকটার নাম ডাক্তার আন্‌স্প্যাশ্‌। ফরাসী ও ফরাসী-প্রেমিক বিদেশীয় কাগজগুলা আপাততঃ এ সম্বন্ধে চুপ করিয়া গিয়াছে।)

এ সকল তর্ক-বিতর্কে মানুষের পেট ভরে না। স্বার্থান্ধ ফরাসী ক্রোধবশতঃ গত বৎসর র‍্যাথেনাউর যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এত দিন পরে একটু রকম-ফের করিয়া তাহাই আদর করিয়া লইতেছেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতেই তাঁহার স্বার্থ-সিদ্ধি হইবে। অন্ত কিছুতে হইবে না। এই শুভ সংবাদ বার্লিনে পৌঁছিবার অল্পকাল পূর্ব্বেই র‍্যাথেনাউ গুপ্ত ঘাতুকের হস্তে নিহত হইলেন। অদৃষ্টের এই পরিহাসে অনেকেই ব্যথিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, হিণ্ডেনবর্গের দল জর্ম্মণীতে পুনরায় কৈশরী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত উদ্যোগ করিতেছে; র‍্যাথেনাউএর মত প্রতিভাশালী গণতন্ত্র-নেতাকে সরাইয়া দেওয়া আবশুক; সম্প্রতি নানাস্থানে ট্যানেন্‌বর্গ-বিজয়োৎসবে হিণ্ডেন্‌বর্গের সামরিক দল মত্ত হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট এবার্ট এই উৎসব বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার অন্তঃপাতী ট্যানেন্‌বর্গে একটা প্রকাণ্ড রুশ-সৈন্যকে সেনাপতি হিণ্ডেন্‌বর্গ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার পরে কোনও রুশ-সৈন্ত আর প্রুশিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেই বিজয়-স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য এই উৎসবের আয়োজন। জেনোয়ায় রুশ-জর্ম্মণ সন্ধির পরে এ উৎসব উভয় গভর্মেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর। গভর্মেণ্টের সঙ্গে প্রুশিয়ার সামরিক দলের এই বিরোধের ফলে র‍্যাথেনাউ প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি যদি reparation সমস্তা ভাল করিয়া সমাধান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জর্ম্মণীর মধ্যে সামরিক কিংবা অন্য কোনও দল গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারিত না। প্রেসিডেণ্ট এবার্ট বলেন যে, যদি য়ুরোপের বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জ দেনা-পাওনা সম্বন্ধে উদার না হইতে পারেন, তাহা হইলে পরিণাম আরও ভয়ঙ্কর হইবে।

কিন্তু উদারতার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। হেগ্‌ সভায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ফরাসী গভর্মেণ্ট যে প্রকার কড়া ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে কোনও সুফল আশা করা যায় বলিয়া মনে হয় না। বিরুদ্ধ মিত্রশক্তিদের উপর রুশিয়া যে ক্ষতি-পূরণের দাবী জেনোয়ায় উপস্থাপিত করিয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে; ঋণ পরিশোধ করা রুশিয়ার প্রথম কর্ত্তব্য; ভূসম্পত্তি রুশ গভর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে না;—এ সকল স্বীকার করিয়া রুশ যদি কায করিতে চাহেন, তবেই ফরাসী প্রাজ্ঞরা উপায় চিন্তা করিতে হেগ্‌-বৈঠকে উপস্থিত হইতে পারেন; নচেৎ উপস্থিত হইয়া কোনও লাভ নাই। ক্রমশঃ ফরাসী সুর একটু নরম করিলেন। হেগ্‌ বৈঠকে উপস্থিত হওয়াই সুযুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইল। রুশের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে হইবে; জেনোয়ার মত কোনও গোল-যোগ যাহাতে না হয়, আগে হইতেই তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই জন্ত দু-টা স্বতন্ত্র কমিশন বসিল;—প্রথম-টায় রুশ-প্রতিনিধির প্রবেশ নিষিদ্ধ। রুশকে বাদ দিয়া বাকি সকলে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। কয়েক দিবস পরে রুশ-কমিশনের কার্য্যারম্ভ হইবে। তখন দুই কমিশনে আলাপ হইবে। রুশের সহিত টাকা কড়ি জমি সম্বন্ধে কোনও কিছু সুমীমাংসা হয় কি না, তাহা চেষ্টা করা উভয় কমিশনের উদ্দেশু। কিন্তু উদ্দেশু সফল করিতে হইলে, অন্ত উপায় অবলম্বিত হইলে ভাল হইত। লড়াইয়ের পর সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী-ইটালী একটা মহাসংসদ্‌ সুপ্রীম কাউন্সিল গঠিত করিয়া য়ুরোপের ভাঙ্গা-গড়া করিলেন। উহার ফল,—ভার্সাইল্‌। ক্লেমেসোঁ বলিলেন—এই সন্ধি যুদ্ধের রূপান্তর মাত্র। জর্ম্মণ শক্তি লুপ্ত করিতে গিয়া য়ুরোপ জর্জ্জরিত হইল। মার্সাইল্‌ বণিক্‌-সমিতি ভল্গা প্রদেশের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে বহুকাল মেলা-মেশা করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। যুদ্ধের কয় বৎসর সেই সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়; যুদ্ধের পরেও

রুশকে বৈরিভাবে ফরাসী গভর্মেণ্ট দেখিতে লাগিল। মন্ত্রিবর ব্রিয়াঁর নিকটে মার্শাইল্ চেম্বর অফ্ কমার্শ আবেদন করিল, রুশের সহিত আদান প্রদান না হইলে তাহারা মারা যায়। ইহার ফলে,—ক্যাণে বৈঠক···গল্‌ফ খেলা···রুশকে জেনোয়ায় নিমন্ত্রণ করা···ফরাসীর বিস্ময় ও ব্রিয়াঁর পদত্যাগ। ক্যাণে সভায় সেই সুপ্রীম কাউন্সিলের ছাপমোহর অঙ্কিত রহিয়াছে। জেনোয়ায় লয়েড্ জর্জের ডিনার টেবলে সেই গোপন কথাবার্ত্তা, সেই সুপ্রীম কাউন্সিলের পুনরভিনয়। চিচারিণ র‍্যাথেনাউ সেখানে প্রবেশ করিতে পাইলেন না। সব ব্যর্থ হইল। হেগ্-এ রুশকে বাদ দিয়া যে কমিশন বসিয়াছে, তাহাও সেই ভূতপূর্ব্ব সুপ্রীম কাউন্সিলের ছায়া।··· ততঃ কিম্?

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

ইঞ্চকেপ কমিশন।

মাছের কথা।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছে যে, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টজীব মানুষের সহিত মৎস্যেরও পার্থক্য বড় অধিক নয়। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছেন, মানুষের মত মৎস্যেরও জীবন-সংগ্রাম আছে এবং মানুষের মত তাহারাও আত্মরক্ষাকল্পে রীতিমত বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দিয়া থাকে। কূটনীতিতে মৎস্যকুলও বিশেষ অভ্যস্ত।

পূর্ব্বকালে মৎস্যজাতি কিরূপ ছিল, তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হয় ত নাই ; কিন্তু এ কথা যথার্থ যে, বর্ত্তমান যুগের মৎস্যকুল প্রাচীনকালের মৎস্যজাতির অপেক্ষা স্বতন্ত্র। আধুনিক যুগে দেখা যাইতেছে, মৎস্যের শ্রবণশক্তি ও চিন্তা করিবার ক্ষমতা বিদ্যমান আছে। এমন একজাতীয় মৎস্য আছে, তাহারা জলাশয় ত্যাগ করিয়া বৃক্ষে পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কোনও পুং-মৎস্য, স্ত্রী-মৎস্যের সহিত প্রণয়ালাপ করিবার সময় যুবকের ন্যায়ই সাজ-সজ্জা করিয়া থাকে। মানুষের মত মৎস্যেরও সমুদ্র-পীড়া জন্মে। প্রকাণ্ড জলাধারের মধ্যে ধৃত মৎস্য রক্ষা করিয়া জাহাজে চালান করিবার সময় কোন কোন মৎস্য ঠিক মানুষের মতই সমুদ্র-পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকে।

পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভাগের জীবকুলের অধিকাংশের পরিচয় মানুষ এখনও জানিতে পারে নাই। তন্মধ্যে গভীরতম অরণ্যবাসী জীবসম্প্রদায় এক, ও অতলস্পর্শ সমুদ্রবিহারী প্রাণিগণ অন্যতম। সমুদ্রতলচারী জীবসম্প্রদায়ের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, তথায় মানব ইচ্ছানুসারে পর্য্যটন করিয়া বিচিত্র প্রাণিনিচয়ের পরিচয় জানিবার সুবিধা পায় না। অরণ্যচারী জীবের তুলনায় মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীবের সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্পস্থানেই, বৈজ্ঞানিক গবেষণাকল্পে বিভিন্ন জাতীয় মৎস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে আমেরিকা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। নিউইয়র্কে, কৃত্রিম পাহাড় ও জলজগুল্ম প্রভৃতি সমাকীর্ণ কাচ-নির্ম্মিত বৃহৎ জলাধার আছে। পরীক্ষার জন্য তথায় বিভিন্ন জাতীয় মৎস্য সংরক্ষিত হইয়া থাকে। এই বিচিত্র মৎস্যশালা দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে বৎসরে অন্যূন বিশ লক্ষ দর্শক সমবেত হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে এত বড় মৎস্যশালা আর কোথাও নাই।

সংপ্রতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, মৎস্যগণ অনেক সময় চক্ষু নিমীলিত না করিয়াও তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অতি অল্পকাল হইল, একদা নিশীথকালে, মৎস্যশালার আলোক মৃদু করিয়া দিবার পর দেখা গেল, মৎস্যগণ স্বাভাবিক অবস্থা হারাইয়াছে। আবার আলোক প্রজ্বলিত হইলে তাহারা পূর্ব্ববৎ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জলাধারস্থিত বহু মৎস্য অনেক সময় প্রাচীর অথবা কৃত্রিম শৈলের কোনও প্রস্তরে হেলান দিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহারা বিশ্রামার্থ ঐ প্রকার আশ্রয় অবলম্বন করে। নিদ্রাকালে তাহাদের বর্ণ অপেক্ষাকৃত কাল দেখায়।

মৎস্যের বুদ্ধি-শক্তি আছে। যাঁহারা মাছ ধরিয়া থাকেন, তাঁহারা ভালই জানেন যে, একবার যে মাছ বঁড়শী ছাড়াইয়া পলায়ন করে, তাহাকে ধরা কতই কঠিন! নিউইয়র্কের মৎস্যশালায় পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছেন যে, মাছ চমৎকার পোষ মানিয়া থাকে। আমাদের দেশেও পোষা মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। নোলক-পরা, মাকড়ী-পরা মাছ বাঙ্গালা দেশেও আমরা বহুবার দেখিয়াছি। নাম ধরিয়া ডাকিলে বড় বড় রুই, কাত্‌লা, জলের ধারে, বাঁধান সিঁড়ির উপর ভাসিয়া বেড়ায়। তবে হিংসার সংস্রব থাকিলে পোষা মাছ সহজে কাছে আসিতে চাহে না।

বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস যে, মাছের কল্পনা ও বুদ্ধি-শক্তি আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে কল্পনা করিবার সামর্থ্য সম্ভবতঃ তাহাদের নাই। মৎস্যেরা কথা কহিয়া থাকে। তবে তাহাদের ভাষা মানুষ এখনও বুঝিতে পারে নাই। কোন কোন জাতীয় মৎস্য মানুষের মতই বেশ কথা কহে। তাহাদের যে শব্দ করিবার শক্তি আছে, ইহাতে বিস্মিত হইবারই

কথা। কোন কোন মৎস্য বড় বেশী শব্দ করিয়া থাকে। আমেরিকায় "হেমুলন্" জাতীয় এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহারা শূকরের ন্যায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করিয়া থাকে। আর এক প্রকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ঢাকের ন্যায় শব্দ করে। "স্যালি গ্রোলার্স" নামক এক প্রকার মাছ আছে, তাহারা কুক্কুর-শাবকের ন্যায় শব্দ করিয়া থাকে। 'পফার' জাতীয় মৎস্যকে করতলে রক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন, দন্তে-দন্ত ঘর্ষণ করিলে যে প্রকার শব্দ হয়, ইহাদের মুখ হইতে তেমনই একটা শব্দ নির্গত হইয়া থাকে।

'পফার' মৎস্য আপনার শরীরকে তিন গুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে।

নিউইয়র্কে "পফার" মৎস্য অত্যন্ত অধিক। আমাদের দেশে "গুলে" মাছের সহিত ইহাদের কতকটা সাদৃশ্য আছে। ইহারা ইচ্ছানুসারে আপনাদের শরীরকে বাড়াইতে পারে। সমুদ্রমধ্যে হাঙ্গর অথবা অপর কোনও শত্রুর সম্মুখীন হইলে, ইহারা বায়ু অথবা জল টানিয়া লইয়া শরীরকে তিন গুণ বড় করিয়া ফেলে। এইরূপ আকস্মিক দৈহিক বৃদ্ধির ফলে "পফারে"র শত্রু অনেক সময় তাহাকে আক্রমণ করিতে বিরত হয়।

অশ্বমুখাকৃতি সামুদ্রিক মৎস্য।

নিউইয়র্ক মৎস্য-শালায় আর এক জাতীয় মাছ আছে, তাহারা গাছে চড়িতে পারে। স্থলপথেও ইহারা বেশ চলিতে পারে। আমাদের দেশে কই মাছ যেমন 'কান্‌কো' ও ডানায় ভর দিয়া স্থলপথে চলিতে পারে, ইহারাও অনেকটা সেই ভাবে পথ অতিবাহন করিয়া থাকে। এই একই পদ্ধতি অনুসারে ইহারা গাছে আরোহণ করিতে পারে। দক্ষিণ সমুদ্রে উড্ডীয়মান মৎস্য আছে, তাহারা প্রায় আধ পোয়া পথ অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে।

কোন কোন মৎস্য ইচ্ছানুসারে বর্ণ-পরিবর্ত্তনে সমর্থ। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মৎস্যদেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণ গহ্বর আছে। সেই গহ্বরকে সঙ্কুচিত অথবা প্রসারিত করিলেই মৎস্যের দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে।

নিউইয়র্কে এক প্রকার মাছ দেখিতে পাওয়া যাইত,

তাহাদের মুখাকৃতি অনেকটা ঘোড়ার মত। এই মাছ তথায় অসংখ্য পাওয়া যাইত ; কিন্তু সংপ্রতি সে জাতীয় মৎস্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তথায় ভয়ানক শীত পড়ায়, অশ্বমুখাকৃতি মাছগুলি মরিয়া গিয়াছে। নিউ-ইয়র্ক অথবা তাহার সন্নিহিত কোনও স্থানেই আর এই জাতীয় মৎস্য এখন বিদ্যমান নাই।

পাখী যেমন এক স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়, অনেক মৎস্যও সেই প্রকার স্থান-পরিবর্ত্তনের ভক্ত। তাহারা দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকে না। দলবদ্ধভাবে এক সমুদ্র হইতে অন্য সমুদ্রে চলিয়া যায়।

মাছ বাঁচাইয়া রাখা অতি কঠিন কার্য্য। যে মৎস্যের পক্ষে যে প্রকার জলের প্রয়োজন, তাহাকে তেমনই জলের মধ্যে রাখিতে হয়। কোন কোন মৎস্যের সমুদ্র-পীড়া জন্মে বলিয়া তাহাদিগকে জাহাজের চৌবাচ্চায় করিয়া লইয়া যাইবার সময়, অনাহারে রাখা হয়। প্রথম তিন চারি দিন জাহাজ চলিবার পর, তবে তাহাদিগকে আহার্য্য দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় মাছ ভালই থাকে।

নিউইয়র্ক মৎস্যশালায় প্রতি-বৎসর প্রায় আড়াই শত বিভিন্ন জাতীয় মৎস্য বা জলচর জীব সংগৃহীত হইয়া থাকে।

কোট প্যাণ্ট টুপী পরা মাছ, মুখে চুরুট, মুখাকৃতি অনেকটা মানুষের মত।

"তারা মাছের" ক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক। অনেক প্রকার মাছ আছে, তাহাদের ডানার কিয়দংশ ছাঁটিয়া দিলে, আবার পুরা ডানা গজাইয়া উঠে ; কিন্তু "তারা মাছের" শক্তি অদ্ভুত। তাহার দাড়াগুলি সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হইলেও আবার নূতন করিয়া উৎপন্ন হয়। এমনও দেখা গিয়াছে যে, "তারা মাছে"র অর্দ্ধাংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিলেও কিয়দ্দিবস পরে সে সম্পূর্ণ আকার লাভ করিয়াছে।

মাছ মরে কিসে ?

আমেরিকা মৎস্য-বিভাগের বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, নদীর জলে, বন্দরের জলে তৈল ও আল্‌কাতারার অবশেষ নিক্ষেপ করার ফলে মৎস্যের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। পেট্রলিয়ম ডিষ্টিলার, গ্যাসের কারখানা ও জাহাজসমূহ হইতে যে সকল বিষাক্ত পদার্থ ও তৈল সর্ব্বদাই বন্দর ও নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে মাছ মরিয়া যায়। বিন্দুমাত্র পরিমাণ বিষের ক্রিয়া এমনই ভীষণ যে, তাহাতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ধ্বংস হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমেরিকার "এবি মৎস্যে"র প্রাণ অত্যন্ত কঠিন। সহসা তাহাদের মৃত্যু হয় না। কিন্তু যদি দশ লক্ষ গুণ জলে চারি পাঁচ ভাগ নেপ্‌থালিন্, বা হাইড্রোজেন্ সল্, ফাইড্, অথবা অনুরূপ জলে সাত ভাগ এমোনিয়া মিশ্রিত করা যায়, তবে ঐ কঠিন-প্রাণ মাছও এক ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যাইবে। আর যদি প্রত্যহ অতি সামান্য পরিমাণ বিষ-মিশ্রিত অগাধ জলেও কয়েক দিন ধরিয়া মাছ রাখা যায়, তবে তাহাতেও তাহারা নিশ্চয় মরিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া দুর্গন্ধের পীড়ায় মাছ তীরের কাছে আসিতে চাহে না। কাযেই মৎস্য-শীকারের সময় তাহাদিকে ধরিবার সুবিধাও হয় না। শুধু মাছ নহে, ঐ প্রকারে দূষিত জলে, সমুদ্রতলচারী শুক্তি প্রভৃতিও রুদ্ধশ্বাসে মরিয়া যায়। মাছের ডিম, চারা মাছও উহাতে ধ্বংস হইয়া যায়। আল্‌কাতরা, কেরোসিন তৈল, পেট্রল্ প্রভৃতি পদার্থের সংস্রবে আসিয়া জলের গুণেরও এমন পরিবর্ত্তন ঘটে যে, জলজ প্রাণী তাহাতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পেট্রল জাতীয় পদার্থে বিষ নাই, তথাপি তাহার দুর্গন্ধে মাছ পাঁচ মিনিটের মধ্যে মরিয়া যায়। আল্‌কাতরা-লিপ্ত রাজপথ বৃষ্টি-জলে ধৌত হয়। সেই জল নদীতে পড়ে। তাহাতে মাছের প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে।

জলের ভিতর দীপ-শলাকা।

প্যারী নগরীর জনৈক বৈজ্ঞানিক সমুদ্রগর্ভে অগ্নি জ্বালিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত জাহাজের লৌহপাতগুলি অনায়াসে কাটিয়া ফেলিবার জন্য এক প্রকার মশাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার অত্যধিক উত্তাপের সাহায্যে লৌহপাতগুলি সহজে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। গ্যাসের চাপ (Pressure) এতই অধিক যে, তাহাতে মশালের আলোক নির্ব্বাপিত হয় না। কারণ, জল তাহার কাছেই পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু কোনও আকস্মিক কারণে মশালের আলোক নিবিয়া যাইতে পারে। তখন ডুবুরিকে বাধ্য হইয়া উহা জ্বালিবার জন্য পুনরায় উপরে উঠিয়া আসিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক নূতন দীপ-শলাকা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার সাহায্যে, মশাল নিবিলেও, উপরে না উঠিয়াও ডুবুরি আবার মশাল জ্বালিয়া লইতে পারে। পটাসিয়ম্ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু আছে, জলের নীচে তাহাদিগকে রাখিলেই ভীষণ উত্তাপ সৃষ্ট হয়, অথবা আলোক জ্বলিয়া উঠে। আবার অন্য এমন পদার্থ আছে, যাহার সাহায্যে আলোক উৎপাদিত হইবেই। এই প্রকার মিশ্রিত পদার্থ যদি চুরুটিকার আকারযুক্ত কোনও পিত্তল-নির্ম্মিত চোঙ্গের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ ছিপির দ্বারা রুদ্ধ করা যায়, তবে সহজেই অগ্নি উৎপাদিত হইতে পারে। সমুদ্রতলে কায করিবার সময় অগ্নি উৎপাদনের প্রয়োজন হইলে, এই পিত্তল-চুরুটিকার মুখের ছিপি খুলিয়া দিতে হয়। অমনই তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিবে। জল সংস্পর্শে উহার অভ্যন্তরস্থ মিশ্রিত পদার্থ অমনই জ্বলিয়া উঠিবে। কাযেই ঠিক দীপ-শলাকার ন্যায় উহা কায করিয়া থাকে।

সমুদ্রগর্ভে মশাল জ্বালিবার দীপশলাকা—পিত্তল নির্ম্মিত চুরুটিকার আকার বিশিষ্ট দীপশলাকা মশালের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে

সমুদ্রগর্ভে "ইজিপ্ট।"

কুজ্ঝটিকার গাঢ়, দিগন্তবিস্তৃত যবনিকা সমুদ্রবক্ষে দুলিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার, কুহেলিকার মসীকৃষ্ণ আবরণ ভেদ করিয়া পেনিন্‌সুলার ও ওরিয়েণ্টাল কোম্পানীর "ইজিপ্ট" জাহাজ লণ্ডন হইতে বোম্বাই অভিমুখে ছুটিতেছিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না; সবই মসীলিপ্ত; কিন্তু সমুদ্র তখন স্থির। অধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে জাহাজ হইতে সতর্কতা-জ্ঞাপক শৃঙ্গ-নিনাদ মধ্যে মধ্যে সমুদ্রবক্ষে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল।

সে দিন ২০শে মে, শনিবার। ইজিপ্ট জাহাজের যাত্রীর সংখ্যা মহিলা ও শিশু লইয়া ৪৪। এতদ্ব্যতীত জাহাজের কর্ম্মচারী ও লস্করের সংখ্যাও বহু শত। সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। নৈশ-ভোজের ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইতেই আরোহীরা ভোজনাগারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে বিপদ্ ঘটিবার আশঙ্কায় নাবিকগণ অতিরিক্ত সতর্কতাসহকারে জাহাজ চালাইতেছিল; কিন্তু ভবিতব্যতার বিধান কে লঙ্ঘন করিতে পারে? অপর দিক্ হইতে একখানি ফরাসী পোত আসিতেছিল। উভয় জাহাজের চালকগণের কেহ কাহারও অবস্থিতির কথা সেই ঘনান্ধকারে বুঝিতে পারিল না।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড সংঘর্ষে "ইজিপ্ট" দুলিয়া উঠিল। ফরাসী-পোত "সিনের" অগ্রভাগ প্রবল বেগে "ইজিপ্টের" পার্শ্বদেশ চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

চারিদিকেই মহাকালের অন্ধকার যবনিকা! মৃত্যুর বিষাণ কি ভীমনাদেই ধ্বনিত হইয়া উঠিল! জাহাজের অধ্যক্ষ বুঝিলেন, সমুদ্র-সমাধি হইতে "ইজিপ্টের" অব্যাহতি নাই। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরাও আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। জাহাজে "লাইফবোট" ছিল। সর্ব্বাগ্রে শিশু ও রমণীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। কর্ম্মচারিবৃন্দ সেই ঘোরতম সঙ্কট মুহূর্ত্তে, পুরুষের কর্ত্তব্য, মানবের কর্ত্তব্য পালনের জন্ম প্রস্তুত হইলেন।

বাইশ বৎসরের যুবক হার্ডউইক, জাহাজে তারহীন বার্ত্তা-প্রেরকের কায করিত। সে তখন ডেকের উপরই ছিল। তাহার তখন ছুটীর সময়; কিন্তু এই নিদারুণ দুর্ঘটনা হইবামাত্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবক দ্রুতপদে যন্ত্র-ঘরে নামিয়া গেল। অধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে, সহকারীকে উঠাইয়া দিয়া তাহাদের রক্ষায় অগ্রসর হয়—সে কর্ত্তব্য ফেলিয়া কি সে এখন আত্মরক্ষার প্রয়াসী হইবে?

যুবক দৃঢ় সংকল্পে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিল।

"ইজিপ্ট" জাহাজ জলমগ্ন হইবার দুই ঘণ্টা পরে, এই বীর যুবকের মৃতদেহ "সিন্" জাহাজের কোনও নৌকায় নাবিকরা সমুদ্রবক্ষ হইতে তুলিয়া লইয়াছিল।

ইজিপ্ট জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন অ্যানড্রু কলিয়ার দুর্ঘটনার পর অবিচলিতভাবে যাত্রীদিগকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার আদেশে অগ্রে বালক-বালিকা ও
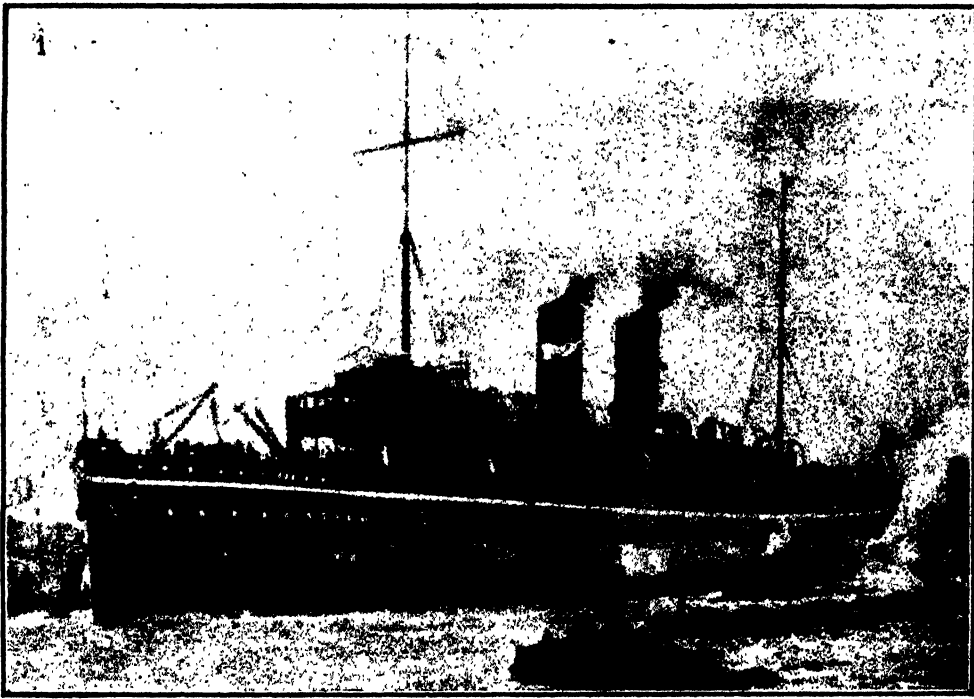
ইজিপ্ট জাহাজ।

বীর যুবক, অকুণ্ঠিত চিত্তে আসনে বসিয়া দিকে দিকে এই ঘোরতর বিপদের বার্ত্তা যন্ত্রসাহায্যে প্রেরণ করিতে লাগিল।

প্রতি মুহূর্ত্তেই "ইজিপ্ট" সলিলগর্ভে নামিয়া যাইতেছিল, চারিদিকেই মৃত্যুর ভীষণ বিভীষিকা। আত্মরক্ষার উপায় তখনও আছে; হয় ত সে ডেকের উপর উঠিয়া গেলে অন্যের ন্যায় আপনার জীবনরক্ষার উপায়ও করিয়া লইতে পারে; কিন্তু এতগুলি প্রাণীর জীবনরক্ষার যদি কোনও উপায় হয় —যদি এ বিপদবার্ত্তা শুনিয়া নিকটবর্ত্তী অন্য কোনও জাহাজ নারীদিগকে বোটে করিয়া নামাইয়া দেওয়া হইতেছিল। মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও যাত্রিগণ চীৎকার অথবা দৌড়াদৌড়ি করিয়া বিপদকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিল না। একটি নারীযাত্রী শুধু প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু সে শুধু কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। সকলে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, চীৎকার করিয়া কাঁদিলে বিপদকে অতিক্রম করা যাইবে না। অগত্যা শঙ্কিতা, বেপথুমতী নারী আত্মসংবরণ করিলেন।

জাহাজ হইতে বোট নামাইয়া দেওয়া হইতেছিল। মৃত্যু

আসন্ন, তথাপি দৃঢ়, দ্রুতহস্তে নাবিকগণ কায করিতেছিল। প্রথম নৌকায় এক জন স্পেনীয় ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী, পাঁচ বৎসরের একটি সন্তান ও দেড় বৎসরের একটি শিশুকে বসাইয়া নৌকায় স্বয়ং আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন, সহসা নৌকা কেমন করিয়া উল্‌টাইয়া গেল। আরোহীরা প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু মৃত্যু তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিল না। জলমগ্ন হইয়া তাঁহারা প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইতোমধ্যে চারি পাঁচখানি আরোহিপূর্ণ নৌকা নিরাপদে সমুদ্রবক্ষে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। "ইজিপ্টের" ডেকের উপর তখন জলের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নৌকা নামাইয়া দিবার সময় আর রহিল না, দেখিয়া অধ্যক্ষের নির্দেশক্রমে কর্ম্মচারী ও মাল্লাগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে নৌকার বন্ধনরজ্জুগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। জাহাজ ডুবিয়া গেলে, নৌকাগুলি ভাসিয়া থাকিতে পারিবে। জাহাজের কাঠের কড়ি, তক্তাসমূহকেও ঐ প্রকারে বন্ধনমুক্ত করা হইল।

জাহাজের অনেকেই "লাইফ-বেল্ট" সংগ্রহ করিয়াছিল। মিঃ জি, ডব্‌লু জেনার জাহাজের প্রিণ্টার ছিলেন। তিনিও আত্মরক্ষাকল্পে একটি "লাইফ-বেল্ট" সংগ্রহ করিয়া নিমজ্জমান জাহাজের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। ঘনান্ধকারে মৃত্যু ক্রমেই দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। আর বড় বিলম্ব নাই, জাহাজ জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বেই সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। "লাইফ-বেল্ট" দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। সহসা তিনি দেখিলেন, একটি নারীযাত্রী অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ভ্রমক্রমে তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লওয়া হয় নাই। মিঃ জেনার মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। রমণীর দেহে "লাইফ-বেল্ট"টি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া তিনি বলিলেন, "ম্যাদাম্, এ বেল্ট এখন আপনার। আমি অবশ্য সাঁতার জানি না। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই। অন্যের অদৃষ্টে যাহা আছে, আমার ভাগ্যেও তাই ঘটিবে। যদি আর সকলে রক্ষা পায়, আমিও পাইব।"

এই আত্মত্যাগী ইংরাজ বীর সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা পায়েন নাই। তিনি স্ত্রী-পুত্রকে অনাথ করিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার এই আত্মত্যাগের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

শ্রীমতী পার্কার অন্যতম যাত্রী। মিঃ জে, পি, মুন্ নামক জনৈক রুগ্ন আরোহীর সেবার ভার তিনি লইয়াছিলেন। মিঃ মুন্ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন সত্য; কিন্তু নিজের হাতে কোনও কিছু করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। শ্রীমতী পার্কার এই ভদ্রলোকের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মিঃ মুন্‌কে বোটে উঠাইয়া লইবার সুযোগ আসিল না দেখিয়া, এই কর্ত্তব্যপরায়ণা নারী তাঁহার পার্শ্বদেশ ত্যাগ করিয়া অগ্রে আত্মরক্ষায় সম্মত হইলেন না। প্রাণভয়ে পলায়নের জন্য তখন সকলেই ব্যস্ত। স্রোতোধারা-প্লাবিত ডেকের এক পার্শ্বে নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া, শ্রীমতী পার্কার চুরুটিকা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা যে দেখিয়াছিল, সেই বিস্মিত হইয়াছিল।

শ্রীমতী পার্কার রক্ষা পাইয়াছিলেন কি না, সে সংবাদ এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। তবে তাঁহার মৃতদেহ এখনও পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। মৃত্যুর সময়েও এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা মহীয়সী নারীর পক্ষেই সম্ভবপর। ইতিহাস কখনও কি এমন নীরব বীরত্বের স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারিবে?

যে সকল যাত্রী রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী টেলার অন্যতমা। তিনি আর একটি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। শেষ লাইফ বোটে চড়িয়া তিনি তাঁহার স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার স্বামী বোটে আরোহণ করিবার জন্য রজ্জু ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, শ্রীমতী লিউইস্ নাম্নী অপরা যাত্রী তখনও স্থান পায়েন নাই। মিঃ টেলার সহাস্যমুখে তখনই রমণীকে আহ্বান করিলেন। আর একটিমাত্র আরোহীর স্থান সেই বোটে ছিল। মিঃ টেলার উক্ত মহিলাকে এই আসন ছাড়িয়া দিয়া আপনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী টেলার তার পর তাঁহার স্বামীর আর কোনও সংবাদ জানিতে পারেন নাই। মিঃ টেলারের মৃতদেহও এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয় নাই।

"সিন্" পোতের সহিত সংঘর্ষের বিশ মিনিট পরে "ইজিপ্ট" সমুদ্র-সমাধি লাভ করে। এই অত্যল্পকালের মধ্যে যতগুলি প্রাণীকে রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল—"ইজিপ্টের" অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ তাহার ত্রুটী করেন নাই। জাহাজের দুই মুখ সর্ব্বাগ্রে জলমগ্ন হয়। নাবিকগণ জাহাজের কড়ি, বরগা, অথবা অন্যান্য প্লবমান পদার্থ অবলম্বন করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। "সিন" পোতের নৌকাগুলি আসিয়া পরে তাহাদিগের অধিকাংশকে রক্ষা করে

জাহাজের চিকিৎসক, ডাক্তার ব্রেম্নার শেষ পর্য্যন্ত একখানি ডেক্‌চেয়ার অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সমুদ্র-প্রবাহ অবশেষে তাঁহাকে মৃত্যুর রাজ্যে পৌঁছিয়া দিয়াছিল। অন্যান্য মৃতদেহের সঙ্গে তাঁহার প্রাণহীন-দেহ পরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন অ্যানড্রু কলিয়ারকে "সিন" পোতের প্রেরিত একখানি নৌকা উদ্ধার করে।

কুজ্ঝটিকার অন্ধকার এমনই নিবিড় যে, দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই "সিন" পোতের নৌকা-সমূহ "ইজিপ্টের" সাহায্য করিতে পারে নাই। উহার অবস্থান নির্ণয় করিতেই অনেকটা সময় বৃথা ব্যয়িত হইয়াছিল।

তিন ঘণ্টা ধরিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া "সিনের" কর্ম্মচারী ও নাবিকগণ নৌকযোগে বহু ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছিল। বহু ব্যক্তি সমুদ্র-বক্ষে পড়িয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সমুদ্র-বক্ষ তখন শান্ত ছিল, তাই অধিকাংশের জীবন-রক্ষা সম্ভবপর হইয়াছিল। "সিনের" অধ্যক্ষের বর্ণনানুসারে জানা গিয়াছে, ২৯ জন যাত্রী ও ২১০ জন নাবিক রক্ষা পাইয়াছে। চারিটি মৃতদেহও "সিন" পোতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। সমুদ্র-বক্ষে আর কোনও ব্যক্তিকে খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে "সিন্" ব্রেষ্ট অভিমুখে রওনা হয়। সংঘর্ষের ফলে "সিনের"ও যথেষ্ট অঙ্গহানি হইয়াছিল। অধ্যক্ষ পরিশেষে জাহাজের গুরুতর ক্ষতির কথা অবগত হইয়া নিরাপদে তাহাকে বন্দরে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন।

"ইজিপ্ট" জাহাজে সিষ্টার রোজ নাম্নী একটি মহিলা ছিলেন। তাঁহাকে নৌকায় উঠিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি বলেন যে, যদি সকলের স্থান হয়, তবেই তিনি যাইতে পারেন, নচেৎ তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে অগ্রে রক্ষা করা হউক। ইহার পরই এই রমনী ডেকের উপর জানু পাতিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে থাকেন। "ইজিপ্ট" যখন সলিল-সমাধি লাভ করে, তখনও তিনি সেই অবস্থায় প্রার্থনায় রত ছিলেন।

এই নিদারুণ দৈব-দুর্ঘটনায় সর্ব্বসমেত ১০২ জন প্রাণ হারাইয়াছে। তন্মধ্যে ৬ জন পুরুষ যাত্রী, ৭টি মহিলা ও দুইটি শিশু। জাহাজের ডাক্তার, প্রধান ইঞ্জিনীয়ার, ৩৫ জন শ্বেত-কর্ম্মচারী ও নাবিক, ৫০ জন লস্কর।

আমেরিকায় বাঙ্গালী মণিকার।

মার্কিণ রত্নবণিকগণের অর্থে, আমেরিকার প্রভিডেন্স নগরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় ছাত্রগণ হীরকাদি রত্ন-সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার ৺লক্ষীনারায়ণ সেনের

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন।

পৌত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ সেন জহরত সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন। চারি মাস পরেই একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রভিডেন্স নগরের জনৈক প্রসিদ্ধ ধনকুবের ছয়টি বিষয়ের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ প্রথমসংখ্যক "মডেল্"এ প্রথম ও দ্বিতীয়সংখ্যক "মডেল্"এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শিক্ষকগণ এই নবীন যুবকের অধ্যবসায় ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছেন। চারি বৎসরের শিক্ষা তিনি দুই বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত করিয়া শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন।

নারীর লাবণ্যবৃদ্ধির নূতন উপায়।

সকল দেশের নারীরাই দেহের লাবণ্যবৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত। পূর্ব্বকালে এ দেশের নারীরা চন্দন-কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগ লেপন দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেন। যাঁহাদিগের ভাগ্যে সেরূপ বিলাসসামগ্রী জুটিত না, তাঁহারা সর-ময়দা ব্যাসমাদি দ্বারা সে সাধ মিটাইতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের নারীদিগের অঙ্গরাগের জন্য নিত্যই নূতন ব্যবস্থা হইতেছে। কতই রকম বে-রকমের ব্লুম, (Bloom) বাম, (Balm) পেষ্ট (Paste) যে তাঁহাদিগের দেহের ও মুখের লাবণ্যবৃদ্ধির জন্য নিত্য নিত্য উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সকলের দুই চারিটা ইদানীং এ দেশের ভামিনীগণও ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু বুঝি বা ঐ সকল অঙ্গরাগের দিন অতীত হইল। সম্প্রতি ইংলণ্ডে নারীর লাবণ্যবৃদ্ধির এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। Mud Bath বা কর্দ্দম-স্নান অথবা ঠিক ইহাকে স্নান বলাও যায় না। ইহা অঙ্গে এক প্রকার কর্দ্দম-লেপন। য়ুরোপে কোন স্থান হইতে গঙ্গা-মৃত্তিকার ন্যায় এক প্রকার মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া লণ্ডনের স্যাভয় হোটেলে এই স্নানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের দেশে রোগবিশেষের প্রতীকারার্থ অথবা দেহ মন নির্ম্মল করিবার জন্য যেমন কেহ কেহ অঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপিয়া স্নান করেন, নূতন Mud Bath কতকটা সেইরূপ, তবে এ দেশে যেমন জলে অবগাহনপূর্ব্বক সেই মৃত্তিকা ধৌত করা হয়, বিলাতে সেরূপ করা হয় না। দেহের যে যে অংশের লাবণ্যবৃদ্ধির প্রয়োজন, সেই সেই স্থানে উল্লিখিত মৃত্তিকা লেপন করিয়া আধ ঘণ্টাকাল শুকাইতে দেওয়া হয়। কাদা যখন বেশ শুকাইয়া শক্ত হয়, তখন উহার মধ্যে মধ্যে ফাটিয়া ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে পরিণত হয়। সেই সময়ে ঐ শুষ্ক খণ্ডগুলি আস্তে আস্তে খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তখন দেহের বর্ণ তুষারশুভ্র হয় এবং কোথাও গাত্র-চর্ম্ম একটুও কুঞ্চিত দেখা যায় না ও মেছেতা প্রভৃতির ন্যায় দাগও পরিদৃষ্ট হয় না। স্যাভয় হোটেলে যেরূপে এই "মৃত্তিকা স্নান" সম্পন্ন হইতেছে, তাহার একটি প্রতিকৃতি এ স্থলে প্রদত্ত হইল। প্রকাশ যে,ঐ মৃত্তিকায় কোন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করা হয় নাই। তবে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত করিয়া দেহে প্রয়োগ করা হয়। এই নূতন প্রথায় লাবণ্যবৃদ্ধির জন্য শত শত নারী স্যাভয় হোটেলে নিত্য যাইতেছেন। কিন্তু এক দিন মাত্র এই "স্নানে" চিরলাবণ্যবতী হওয়া যায় না। সপ্তাহে তিন চারিবার এই প্রক্রিয়ার অধীন হইতে হয়। খৃষ্টীয় যুগের পূর্ব্বে গ্রীস ও রোমের বিলাসিনীগণ না কি রূপের জন্য দেহকে এইরূপ কর্দ্দমাক্ত করিতেন। ইদানীং বহু চিকিৎসক এইরূপ মৃত্তিকা-লেপনে দেহ চর্ম্মরোগমুক্ত হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ দেশের ভামিনীরা কি আবার গঙ্গা-মৃত্তিকানুলেপন দ্বারা অঙ্গরাগে অনুরাগিণী হইবেন?

কর্দ্দম-স্নান।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ।

আষাঢ়ের অপরাহ্নে মেঘনম্র আকাশতলে হর্ম্ম্যমালাময়ী কলিকাতা নগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌধমূলে দাঁড়াইবামাত্র মন বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। লর্ড কার্জ্জনের আমলে লোকপূজ্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য যে উদ্যোগের সূত্রপাত হইয়াছিল, দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর, লর্ড রেডিং মহোদয়ের শাসনকালে আজ সেই

কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল।

অপূর্ব্ব স্মৃতি-সৌধ দর্শকের মনে বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিয়া সকলের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে।

স্মৃতি-সৌধের চারিপার্শ্বে উদ্যান-রচনা প্রভৃতির কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। উত্তর তোরণই প্রধান প্রবেশ-দ্বার। দক্ষিণদিকেও একটি দীর্ঘ তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সে দিকের পথ এখনও সাধারণের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয় নাই।

উত্তরতোরণপথে প্রবেশ করিয়া, কঙ্করময় প্রশস্ত বর্ত্ম ধরিয়া খানিকটা অগ্রসর হইলেই মহারাণীর এক পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার অনতিদূরে স্মৃতি-সৌধে প্রবেশ করিবার মর্ম্মর-প্রস্তর-রচিত সোপান-শ্রেণী। প্রথম দৃষ্টিপাতেই আগ্রার তাজমহলের কথা দর্শকের চিত্তে সমুদিত হয়। অনেকটা সাদৃশ্য আছে বৈ কি। তবে তাজ শাহজাহানের অমূল্য অক্ষয় প্রেমের স্বপ্ন হইতে উদ্ভূত আর ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ অনুরক্ত, ভক্ত প্রজামণ্ডলীর নিবেদিত অর্ঘ্যের নিদর্শন। উভয় সৌধেই স্থাপত্যশিল্পীর বিস্ময়জনক নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু মনে হয় বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক শিল্পচাতুর্য্য সপ্তদশ শতাব্দীর স্থাপত্যশিল্পকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

স্মৃতি-সৌধের চারি পার্শ্বেই মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রশস্ত চত্বর। দর্শক অনায়াসেই তাহার সাহায্যে সৌধের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে পারে। উত্তরদিক্ দিয়া সৌধমধ্যে প্রবে-

করিতে হয়। প্রকাণ্ড হল ঘরে ছাতা, লাঠি প্রভৃতি জমা দিয়া নিদর্শনস্বরূপ চাকৃতি লইয়া অন্যান্য কক্ষে প্রবেশ করিতে হয়। এই হল ঘরের দুই পার্শ্বে দুইটি চিত্রাগার। তন্মধ্যে বৃহদাকার তৈলচিত্র সমূহ সুরক্ষিত। ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি সমূহ, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিক, মহারাণীর যৌবন, প্রৌঢ় প্রভৃতি নানা অবস্থার চিত্র, তাঁহার স্বামীর যৌবনের প্রতিকৃতি, বিবাহ উৎসবের সুন্দর চিত্রসমূহ এই দুইটি কক্ষে সংরক্ষিত। তন্মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরেরও প্রকাণ্ড তৈলচিত্র বিদ্যমান।

এই দুইটি ঘরের মত দক্ষিণাংশেও দুইটি প্রশস্ত কক্ষ বিদ্যমান। একটি ঘর সাধারণের জন্য নহে। সম্ভবতঃ সে কক্ষ এখনও দর্শকদিগের জন্য সুসজ্জিত করা হয় নাই বলিয়া বন্ধ আছে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কক্ষ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত, তবে দর্শনীস্বরূপ প্রতি কক্ষে চারি আনা না দিলে এই কক্ষে প্রবেশাধিকার নাই। চারি আনা দিয়া একখানি টিকিট কিনিতে পারিলে, নিম্নতলের এই কক্ষ এবং ঠিক ইহার উপরতলের কক্ষস্থ বিবিধ দ্রব্য দর্শনের সুযোগ ঘটে।

নিম্নতলস্থ এই চিত্রাগারে নানাবিধ সুদৃশ্য চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাণী আলেকজান্দ্রা ও মহারাণী মেরীর উপহৃত বহুবিধ চিত্র এই কক্ষে সংরক্ষিত। মহারাণী মেরী ভারতবর্ষের কতিপয় সুন্দর সুন্দর চিত্র উপহার দিয়াছেন। প্রত্যেকটিই দর্শনীয়। মহারাণী আলেকজান্দ্রা রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে যে রাণী-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, স্বর্ণ-খচিত সেই মহামূল্য পরিচ্ছদটি কাচাবরণের মধ্যে সংরক্ষিত রহিয়াছে। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মাণিকচাঁদ লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশানুসারে এই পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

এই কক্ষের শেষ প্রান্তে, একদিকে মহাযুদ্ধের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ কতিপয় অস্ত্র; অপর দিকে কোটা রাজ্যের মহারাওর পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করিতেন, সেগুলি সযত্নে সুবৃহৎ কাঠের আলমারীর মধ্যে শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর অনেকগুলি অস্ত্রও ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া গেল। শুধু কোটা নহে, রাজপুতানার বিভিন্ন সামন্তরাজ্য হইতেও প্রাচীনকালের নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। মুরশিদাবাদের নবাবও অনেকগুলি অস্ত্র ও বর্ম্ম প্রভৃতি উপহার দিয়াছেন।

দ্বিতলের চিত্রাগারেও নানাবিধ মূল্যবান্ চিত্র ও দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। ইংলণ্ডের নৃপতিগণের ব্যবহৃত কতিপয় দ্রব্যও এই গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ, সেনাপতি ভ্যান্ কোর্টল্যাণ্ডকে যে রত্ন-খচিত সুদৃশ্য তরবারি উপহার দিয়াছিলেন, তাহাও দেখিতে পাওয়া গেল। সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড অভিষেকের সময় যে রাজবেশ পরিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বেই লর্ড কার্জ্জনের সামরিক পরিচ্ছদ! দরবারের সময় তিনি সেই বেশ ধারণ করিয়া দিল্লীতে অভিষেকোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই বিশাল কক্ষে অন্যান্য তৈলচিত্রের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায় ও ও কেশবচন্দ্র সেনের আলেখ্য বিদ্যমান। কক্ষের উত্তর-দিকে ঐতিহাসিকের ইতিহাস রচনার বহু উপাদান সংরক্ষিত। মহারাজ নন্দকুমার যে দলিল জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত ও পরিশেষে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেই মূল দলিলখানি একদিকে রক্ষিত। তাঁহার প্রাণদণ্ডের রায়ের পুরাতন "কপি"ও তাহার পার্শ্বে সজ্জিত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের "দি সন্" নামক সংবাদপত্রখানি দেওয়ালের গাত্রে বিলম্বিত। উক্ত সংখ্যার কাগজে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনাধিরোহণের সংবাদ প্রতিমূর্ত্তিসহ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সহিত ইংরাজের যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, সেই মূল দলিলগুলিও দর্শকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। কতিপয় প্রাচীন গ্রন্থও রহিয়াছে; তন্মধ্যে টিপুস্বলতান যে কোরাণ পাঠ করিতেন, তাহাও আছে। শ্রীরঙ্গপত্তনদুর্গ ও পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি কাচাবরণের মধ্যে থাকিয়া দর্শকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে।

সৌধের ঠিক মধ্যস্থলে প্রশস্ত, গোলাকার স্মৃতি-গৃহ। ইহাকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে অন্যান্য কক্ষ অবস্থিত। এই স্মৃতি-কক্ষেরই উচ্চ চূড়া আকাশ-পথে সমুত্থিত হইয়াছে। কক্ষতল মর্ম্মর-প্রস্তরমণ্ডিত। ঠিক মধ্যস্থলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মর-প্রতিমা, বার্দ্ধক্যের নহে, যৌবনের। শিল্পীর নিপুণতা এই চমৎকার মূর্ত্তিতে পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতলে গোলাকার বারান্দা, চারিদিক্ হইতেই, সোপানাবলীর সাহায্যে তথায় আরোহণ করা যায়। বারান্দার উপরেই পাশাপাশি দ্বাদশটি চিত্র—প্রস্তরে খোদিত এবং বিচিত্রবর্ণরাগে রঞ্জিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিই তাহাতে পরিস্ফুট।

এই স্মৃতি-কক্ষে দাঁড়াইলেই আবার তাজের কথা মনে পড়ে! তাজের সেই সমাধি-কক্ষের নীরব গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে কালজয়ী প্রেমের যে বিচিত্র সঙ্গীতের ঝঙ্কার অনুক্ষণ ধ্বনিত হইতে শুনা যায়, তাহার প্রভাবে চিত্ত ভরিয়া উঠে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই স্মৃতি-কক্ষে দাঁড়াইয়া ঠিক সে ভাব মনে আইসে না বটে; তবে এই মহিমময়ী রাজ্ঞীর মহৎ-চরিত-কথা, তাঁহার প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও কীর্ত্তি-কাহিনীর স্মৃতি দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অজস্র অর্থ ব্যয়ে স্মৃতি সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহার উপকরণ—প্রস্তর ভারতে সংগ্রহেরই ব্যবস্থা হইয়াছিল। লর্ড কর্জ্জন সৌধ-কল্পনার বিবরণ বিবৃত করিবার সময় বলিয়াছিলেন, ইহাতেই সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি তাঁহার ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের মনে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান থাকিবে। অবশ্য তখন তিনি মনে করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার পর বড়লাট হার্ডিং ইংরাজের স্মৃতি-জড়িত—ইংরাজের সৃষ্ট রাজধানী ত্যাগ করিয়া দিল্লীর শ্মশানে রাজধানী রচনার আয়োজন করিবেন। আজ ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-সৌধ কি মৌন ভাষায় লর্ড হার্ডিংকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদই করিতেছে না?

স্থাপত্য সৌন্দর্য্যে তাজের সহিত তুলিত হইবার উপযুক্ত না হইলেও এই স্মৃতি-সৌধ কলিকাতায় অন্যতম অলঙ্কার।
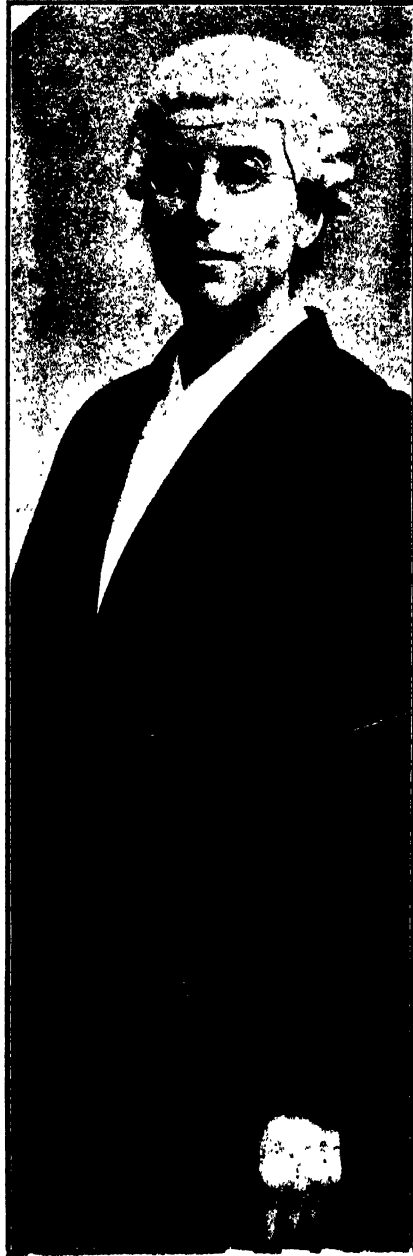
কুমারী আইভি উইলিয়ামস।

প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার।

কুমারী আইভি উইলিয়ামস ইংরাজ মহিলা। ইনি এম, এ, পাশ করিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ ইঁহাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ প্রদান করা হইয়াছে। আর একটি ব্যাপারের জন্ম ইঁহার নাম ইংরাজের জাতীয় ইতিহাসে লিখিত থাকিবে। গত ১০ই মে তারিখে তাঁহাকে ইংলিশ বারে প্র্যাক্‌টিশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। মহিলার প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই প্রথম। নারীর অধিকার ক্রমেই সকল সভ্যদেশে স্বীকৃত হইতেছে।

কিন্তু এ বিষয়ে একটি বিষম সামাজিক সমস্যা আছে। কর্ম্মক্ষেত্রে যদি নারীতে ও পুরুষে প্রভেদ বিলুপ্ত হয়, তবে কি নরনারীর মধ্যে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পার্থক্য অতিক্রম করিবার চেষ্টায় সমাজের শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে না? গৃহেই কি নারীর কর্ম্মক্ষেত্র থাকিতে পারে না এবং সেই ক্ষেত্রেই কি তাঁহার প্রতিভা প্রযুক্ত হইয়া মানব-সমাজের কল্যাণ-সাধন করিতে পারে না?

এ দেশে অদ্যাপি মহিলাদিগকে ব্যবহারাজীবের কাষ করিতে দেওয়া হয় নাই।

অদৃষ্ট-পরীক্ষা।

(গল্প)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘকাল অমিতাচারের ফলে, ইন্দ্রভূষণবাবু কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সহরের বড় বড় "সাহেব" ডাক্তার, বাঙ্গালী ডাক্তার, কবিরাজ আজ মাসাধিককাল চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই একটু সুরাহা হয় নাই, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন, অন্য সকলেই তাঁহার বাঁচিবার আশা এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিল;—গত কল্য ডাক্তাররাও জবাব দিয়াছেন। অনেক সময় ইন্দ্রবাবু সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই থাকেন, মাঝে মাঝে দুই এক ঘণ্টার জন্য জ্ঞান হয় মাত্র। গত কল্য অপরাহ্নকালে এইরূপ অবস্থায়, হেমন্তবাবুর সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ তিনি দেওয়ানজীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তদনুসারে বর্দ্ধমানে তাঁহাকে তার করা হইয়াছিল।

বেলা পাঁচটার সময় হেমন্তবাবুর গাড়ী আসিয়া ইন্দ্রবাবুর ফটকের কাছে দাঁড়াইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, নিম্নতলেই দেওয়ানজী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দেওয়ানজী সজলনয়নে তাঁহার প্রভুর অবস্থা সমস্তই হেমন্তবাবুকে জানাইলেন। হেমন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে দাদা এত ব্যাকুল হয়েছেন কেন, তা কিছু আপনি শুনেছেন? কোনও বিশেষ কারণ আছে কি?"

দেওয়ানজী বলিলেন, "আপনি তাঁর বাল্যকালের বন্ধু, সেই জন্যেই বোধ হয়। তা ছাড়া কোনও বিশেষ কারণ যদি থাকে, সেটা আমি জান্‌তে পারি নি।"

দেওয়ানজী হেমন্তবাবুর মুখাদি ধাবনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাঁহার আগমনসংবাদ দিবার জন্য উপরে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনার চা দেওয়া হয়েছে, উপরে চলুন।"

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কি জেগেছেন?"

"না"—বলিয়া দেওয়ানজী অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

একটি কক্ষে হেমন্তবাবুর জন্য জলযোগ সাজানো ছিল। তিনি জলযোগে বসিলেন। যুবা সুরেন্দ্রভূষণ, ইন্দ্রবাবুর একমাত্র পুত্র, "কাকাবাবু, ভাল আছেন ত?" বলিয়া কাছে আসিয়া বসিল; চিকিৎসা ও চিকিৎসকগণ সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিল।

জলযোগ শেষে হেমন্ত বলিলেন, "যাও দেখি, বাবা, আর একবার দেখে এস জেগেছেন কি না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে সুরেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "না, বাবা এখনও জাগেন নি। মা একবার আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন। আপনি ভিতরে আসুন।"

ইন্দ্রভূষণবাবু দুই তিন বৎসরের বড় বলিয়া হেমন্ত তাঁহাকে দাদা ও তাঁহার স্ত্রীকে বউদিদি বলিতেন। পূর্ব্বকালে, যখন ইন্দ্রবাবু নূতন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, হেমন্ত কখনও কখনও আসিয়া দেবরের ন্যায় বউদিদির উদ্দেশে হাস্য-পরিহাস, আমোদ-আব্দার করিতেন, বউদিদিও তাহার জবাব দিতেন,—কিন্তু অন্তরাল হইতে। সাক্ষাৎভাবে এ পর্য্যন্ত কখনও বাক্যালাপ হয় নাই। তাই হেমন্তবাবু অনুমান করিলেন যে, বিশেষ কারণ জন্য ইন্দ্রভূষণ অন্তিম-শয্যায় তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই প্রসঙ্গেই বউদিদি তাঁহাকে কিছু বলিবেন।

সুরেন্দ্র তাঁহাকে লইয়া গিয়া একটি ঘরে বসাইয়া, মা'কে আনিতে গেল। ক্ষণকাল পরে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা এক জন প্রৌঢ়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। "বউদিদি?"—বলিয়া হেমন্ত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার বিষাদখিন্ন স্ফীত অবনত চক্ষু দুইটির পানে চাহিলেন।

বউদিদি মাথার কাপড় একটু তুলিয়া, পুত্রকে বলিলেন, "যাও বাবা, তুমি ওঘরে গিয়ে ব'স।"

হেমন্ত সবিস্ময়ে বউদিদির মুখের পানে চাহিলেন। কি এমন কথা ইনি বলিবেন, যাহা উপযুক্ত পুত্রেরও অশ্রাব্য?—ইহাই তাঁহার বিস্ময়ের কারণ।

সুরেন্দ্র চলিয়া গেলে বউদিদি অশ্রুভরা কণ্ঠে কহিলেন, "ব'স ঠাকুরপো, ব'স।"

"আপনি বসুন"—বলিয়া হেমন্ত চেয়ারখানিতে বসিলেন।

বউদিদি বসিলেন না; তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হেমন্ত তাঁহার এই সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন, "আমাকে কি বল্‌বেন, বউদিদি?"

বউদিদি সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "ঠাকুরপো, কর্ত্তা তোমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, তা কিছু তুমি জান কি?"

"না, বউদিদি, আমি ত কিছু জানিনে। আপনি জানেন?"

বউদিদি বলিলেন, "না, আমি বিশেষ কিছু জানিনে। তবে এইটুকুমাত্র তিনি আমায় বলেছেন, তোমার নাম ক'রে, 'এক সময়ে তার একটা ভয়ানক অনিষ্ট আমি করেছি। সে আমাকে ক্ষমা না কর্‌লে, পরলোকে আমার সদ্‌গতি হবে না।'—এইটুকুমাত্র তিনি আমায় বলেছেন, আর কিছুই বলেন নি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দেন নি, চুপ ক'রে ছিলেন। হয় ত তাঁর মনে কষ্ট হচ্চে, এই ভেবে আমি আর পীড়াপীড়ি করি নি। খুব সম্ভব, সেই বিষয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যেই তিনি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। ঠাকুরপো, আমি ত আজ ত্রিশ বছর তোমাদের দেখছি, সব খবরই জানি; কিন্তু তিনি তোমার প্রতি কোনও দিন যে কোনও অন্যায় করেছেন, তা তো আমি জানিনে! কি অন্যায় তিনি করেছেন, যদি বল্‌তে কোনও বাধা না থাকে, তবে তুমি আমায় তা বল, ঠাকুরপো!"

হেমন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তিনি আমার প্রতি অন্যায় করেছেন? আমার অনিষ্ট করেছেন? কবে? কি অনিষ্ট করেছেন? কৈ, আমিও ত কিছু ভেবে পাচ্চিনে, বউদিদি!"

বউদিদি বলিলেন, "এ ত আশ্চর্য্য কথা। তিনি বলেন, তোমার তিনি ঘোর অনিষ্ট করেছেন, অথচ তুমি বল্‌ছ, তুমি কিছুই জান না?"

"জ্বরের ঘোরে তিনি ভুল বকেছেন বোধ হয়!"—বলিয়া হেমন্ত বাবু মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

বউদিদি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া, মুখখানি তুলিয়া অশ্রু-গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "আজকে দু' তিন বার যখনই ওঁর জ্ঞান হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করেছেন, 'হেমন্ত এসেছে?' আমরা বলেছি, তাঁকে 'তার' করা হয়েছে; আজ কোনও সময়ে তিনি এসে পৌছবেনই। এখন অঘোরে ঘুমুচ্চেন, আবার জ্ঞান হলেই তিনি তোমায় ডেকে পাঠাবেন। তোমায় তিনি কি বল্‌বেন, তা জানিনে,—তোমার কি ক্ষতি করার কথা বলে তোমার কাছে মাপ চাইবেন, কিছুই আমি অনুমান কর্‌তে পার্‌চিনে। তুমি নিজেই যখন এর বিন্দুবিসর্গ জান না, আমি কি ক'রে জান্‌ব? কিন্তু দোহাই তোমার ঠাকুরপো"—(বউদিদি গলবস্ত্র হইয়া যোড় হাত করিলেন)—"তিনি তোমার প্রতি যে অন্যায় করার কথাই বলুন, যে ক্ষতি, যে অনিষ্ট করার কথাই বলুন, তুমি প্রসন্ন মনে তাঁকে ক্ষমা কোরো। নইলে, এই অন্তিম সময়ে—"

বউদিদির কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া আসিল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

হেমন্ত বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি হাতযোড় করেন কেন, বউদিদি? করেন কি! আমায় অত ক'রে বল্‌তে হবে না। খুব সম্ভব জ্বরের ঘোরে একটা কোনও কাল্পনিক অনিষ্টের কথাই তাঁর মাথায় ঢুকেছে। যদি বাস্তবিকই কিছু হয়, আমি আপনার কাছে কথা দিচ্চি, আমি এমন ভাবে উত্তর কর্‌ব, যাতে তাঁর মনে কোনও ক্ষোভ, কোন অশান্তি আর না থাকে। আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন, বউদিদি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এক ঘণ্টা পরে ইন্দ্রভূষণ বাবুর পুনরায় জ্ঞানসঞ্চার হইল। গৃহিণী যেরূপ বলিয়াছিলেন, জাগিয়াই তিনি হেমন্ত বাবুর খোঁজ করিলেন। হেমন্ত বাবু অনতিবিলম্বে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে নীত হইলেন।

ইন্দ্রভূষণ ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "হেমন্ত, এসেছ ভাই? আমার মেয়াদ ত শেষ হয়ে এসেছে। তোমাকে আমার কিছু বল্‌বার আছে—সেইটি না বল্লে আমার প্রাণ বেরুচ্চে না। ওগো, তোমরা সবাই একবার ওঘরে যাও।"

উপস্থিত সকলে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; যাইবার সময় গৃহিণী মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে হেমন্ত বাবুর পানে চাহিয়া গেলেন।

নির্জ্জন হইলে, ইন্দ্রভূষণ বাবু বলিলেন, "বেশী কথা কবার সময় নেই, শক্তিও নেই। হেমন্ত, মনে আছে, তোমার ওকালতীর সেই প্রথম অবস্থা? বড় কষ্টে তোমার দিন যাচ্ছিল।"

হেমন্ত বলিলেন, "হাঁ দাদা, মনে পড়ে বৈকি! তোমার

কাছে সে সব দিনে অনেক সাহায্য আমি পেয়েছি। জীবনে তা কি ভুলবো ?”

ইন্দ্রভূষণ ধীরে ধীরে বলিলেন, “থাক্। তখন, তিন বছর না চার বছর তোমার প্র্যাক্‌টিস হয়েছে। জার্ম্মাণীতে যে লটারি খেলা হয়, আমি সেই লটারির দুখানি টিকিট কিনেছিলাম। একখানি তোমার জন্মে, একখানি আমার নিজের জন্মে। তোমার আসল ঠিকানাটি না দিয়ে, আমার কেয়ারেই লিখে দিয়াছিলাম।—উঃ, গলা শুকিয়ে যাচ্চে, একটু জল।”

হেমন্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই কাহিনী শুনিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা ত জ্বরের প্রলাপের মত শুনাইতেছে না।—পাশে টেবিলে জলের গেলাস ছিল। দুই তিন চামচ জল তিনি রোগীকে পান করাইয়া দিলেন।

জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া ইন্দ্রভূষণ বাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, “উভয়ের অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্মে, টিকিট দুখানি কিনেছিলাম। কত দিন হ'ল, সে আজ বোধ হয়, ত্রিশ বছরের কথা, নয় ?—আজ ত্রিশ বছর পরে তোমায় জানাচ্চি, তোমার টিকিটখানি এক লক্ষ টাকা প্রাইজ পেয়েছিল।”

হেমন্ত অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“অ্যাঁ !”

ইন্দ্র বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন—“যখন চিঠি এল, তখন আমি দেশের বাড়ীতে। তোমার নামে, আমার কেয়ারে, রেজেষ্ট্রী করা চিঠি, তার ভিতর তোমার নামে লক্ষ টাকার একখানি ক্রশ-করা চেক। কলকাতায় যে জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক আছে, সেই ব্যাঙ্কের উপর চেক। আমার টিকিটে শূন্য উঠ্‌লো, তোমার টিকিট লক্ষ টাকা প্রাইজ পেলে, দেখে আমার বুকের ভিতরটায় যেন আগুন জ্বল্‌তে লাগ্‌লো। আমি যে এত ক্ষুদ্রমনা, তা আগে আমি জান্‌তাম না। বুকের সেই আগুন বুকে চেপে রেখে, ভাবলাম, তোমায় গিয়ে খবরটা দিই, চেকখানা তোমায় দিয়ে আসি। উঃ—আর একটু জল।”

হেমন্ত আবার তাঁহাকে জলপান করাইলেন। পানান্তে ইন্দ্র বাবু বলিতে লাগিলেন, “তার পর শয়তান আমার স্কন্ধে এসে ভর করলে। ভাবলাম, আমিই আত্মসাৎ করবো। আমিই ত টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিলাম, সুতরাং তোমার ও টাকায় কিসের অধিকার ? এই কুবুদ্ধি শয়তানই আমার মাথায় এনে দিলে। কিছুতেই লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। ক্রশ-করা চেক, কোনও ব্যাঙ্কের মারফৎ ভিন্ন ভাঙ্গানো হবে না। চেকের পিঠে তোমার নামটি আমি জাল করলাম। কল্‌কাতায় গিয়ে, আমার ব্যাঙ্কে সেই চেক জমা দিয়ে, পরদিন লক্ষ টাকা বের ক'রে নিলাম। সেই সময় জয়রাম-পুরের বাবুদের একখানা খুব ভাল মহাল দেনার দায়ে বিক্রী হচ্ছিল, সে মহালটা কিনে নেবার জন্মেই টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে, বাড়ী আস্‌ছিলাম।

“আমি যে নিতান্ত ক্ষুদ্রমনা, তা নয়—আমি যে এত লোভী, এমন শঠ, প্রবঞ্চক,—পূর্ব্বে আমি তা জান্‌তাম না। যা হোক, টাকাটা নিয়ে বাড়ী আসছিলাম—কিন্তু মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন যে! আর, অদৃষ্ট ব'লে একটা জিনিষ আছে,—সেটা ভুল্লেই বা চলবে কেন ? ঐ লক্ষ টাকা যদি আমার অদৃষ্টে থাক্‌তো, তা হ'লে আমার টিকিটেই ত উঠতে পার্‌তো ! তা তো ওঠেনি। লক্ষ টাকার নোটের সেই বাণ্ডিল নিয়ে ট্রেণে বর্দ্ধমান যাচ্ছিলাম; সঙ্গে হুইস্কি ছিল; গাড়ীতে বসে ঢালছিলাম আর খাচ্ছিলাম। এক সময় বাথরুমে যাই। নোটের বাণ্ডিলটি র‍্যাকের উপর রেখে মুখ ধুচ্ছিলাম। এমন সময় গাড়ী শ্রীরামপুরে এসে দাঁড়ালো। সোডা ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি নেমে, আইসভেণ্ডারকে সোডা আন্‌তে বল্‌তে গিয়েছিলাম—হঠাৎ ট্রেণ ছেড়ে গেল। লক্ষ টাকার নোটের বাণ্ডিল, গাড়ীতে গোসল-খানার সেই র‍্যাকেই পড়ে রইল। চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে ওঠবার জন্মে আমি ছুটলাম। ষ্টেশনের লোকেরা হাঁ হাঁ ক'রে আমার পিছু পিছু ছুটে আমায় ধরতে এল। টানা-টানিতে আমি ধড়াস্ ক'রে প্ল্যাটফর্ম্মে পড়ে গেলাম। একখানা ইট না পাথর কি ছিল, মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরমায়ু ছিল, তাই গাড়ী আর প্ল্যাটফরমের ফাঁকের মধ্যে পড়িনি। ষ্টেশনের লোক, অজ্ঞান অবস্থায় আমায় হাঁসপাতালে পাঠিয়েছিল। সেখানে আট দশ ঘণ্টা পরে আমার চৈতন্ম হয়। পরদিন বাড়ী আসি।”

এই কাহিনী শুনিয়া হেমন্তের বুদ্ধি-শুদ্ধি সমস্তই যেন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। মাথার দুই রগ আঙ্গুলে টিপিয়া তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—“তাই কি ? তাই কি ?”

ইন্দ্র বাবু বলিলেন, “হাঁসপাতালে জ্ঞান হতেই টাকার

তন্ময়

শিল্পী—শ্রীগগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

রবিকরে হাসে সরসীর জল
মনে পড়ে তা'র হাসি;
বিকচ-কুমুদ- পরশ আনিছে
তাহার সোহাগরাশি।

গুঞ্জরে অলি কুসুম-কাননে
মনে পড়ে তা'র কথা।
বিহগ-বিরাবে আসিছে ভাসিয়া
ব্যাকুল বিরহ-ব্যথা।

অতীতের মাঝে ডুবেছে হৃদয়
আর কিছু নাহি মনে;
বিরহ-দিবসে মিলনের স্মৃতি—
দুখ-দিনে সুখ গণে।

খোঁজ নেওয়ার কথা আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাবলাম, তাতে ফল কি হবে? কেউ না কেউ সেটা পেয়েছে। সে কখনই দেবে না, বা স্বীকার করবে না। যদি এই নিয়ে এখন একটা গোলমাল বাধাই, তা হ'লে আমার জাল করাটি ধরা প'ড়ে যাবে, সকল ব্যাপার খবরের কাগজে উঠবে— কেলেঙ্কারির একশেষ—হয় ত আমায় জেলেও যেতে হবে। তাই চুপ ক'রে গেলাম।

"এবার এই ব্যারামে পড়ে, প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, তোমার আমি এই যে মহা ক্ষতিটি করেছি, এই যে প্রবঞ্চনাটি তোমায় করেছি, তার পাপ কি আমায় লাগবে না? তার প্রতিফল, পরলোকে গিয়ে কি আমায় নিতে হবে না? দিন যতই এগিয়ে আসছে, এই চিন্তা আমার মনে ততই প্রবল হয়েছে। তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি, ভাই। সে সময়, এই টাকা পেলে তোমার কষ্ট ঘুচে যেত। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এখন তোমার কোনও অভাব নেই—এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়ে তুমি সম্পত্তি কিনেছ। ত্রিশ বচ্ছর আগে, তোমার এই যে ক্ষতিটি আমি করেছি, আজ তুমি তার জন্য আমায় মাপ কর, ভাই—বল, আমায় ক্ষমা করলে!"—ইন্দ্র বাবুর দুই চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

হেমন্ত বাবু তাঁহার হাত দুইখানি নিজ হস্তে লইয়া বলিলেন, "দাদা, শান্ত হও, শান্ত হও। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই, তুমি যে বলেছ, সেই কথাই ঠিক। সেই টাকা আমারই অদৃষ্টে ছিল, আমিই তা পেয়েছি।"

ইন্দ্র বাবু প্রায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তুমিই সে টাকা পেয়েছ? বল কি? কোথা পেলে? অসম্ভব।"

হেমন্ত তাঁহাকে শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "দাদা, উত্তেজিত হোয়ো না। তোমার মনের সমস্ত ক্ষোভ, সব সন্তাপ দূর কর। তোমার দ্বারা আমার কোনও অনিষ্ট হয় নি। সেই লক্ষ টাকার বাণ্ডিল, সেই ট্রেণে আমিই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।"

ইন্দ্র বাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া হেমন্তের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; বলিলেন,"মৃত্যুকালে আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে মিছে কথা বোলো না, ভাই। তুমি আমায় অকপটচিত্তে ক্ষমা করেছ,এইটুকু জানতে পারলেই আমার যথেষ্ট সান্ত্বনা।"

হেমন্ত বলিল, "না, দাদা, তোমায় ভোলাবার জন্যে আমি মিছে কথা বলি নি। তোমার দুখানি গ্রাম আমি যে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনলাম, সে টাকার মধ্যে লক্ষ টাকা সেই টাকা।"

কোথায়, কবে হেমন্তবাবু বাণ্ডিল পাইয়াছিলেন, বাণ্ডিল কিরূপ ভাবে জড়ানো ছিল, কত কত টাকার নোট তাহাতে ছিল, সমস্ত ইন্দ্রবাবু খুঁটিয়া খুঁটিয়া হেমন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত কথার উত্তর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জয় গোপীবল্লভজি! তোমার অসীম দয়া। মহাপাপ থেকে তুমি আমায় রক্ষা করলে!"—বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে মুখখানি প্রসন্নভাব ধারণ করিল, দুই চোখের কোণ হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ইহার কিয়ৎ পরে, ইন্দ্র বাবুর স্ত্রীর সহিত হেমন্ত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া, সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিলেন। পরামর্শ হইল, ছেলেকে বা অন্য কাহাকেও এই পুরাতন কলঙ্ক-কাহিনী জানাইবার কোনও প্রয়োজন নাই।

পরদিন প্রাতের ট্রেণে হেমন্তবাবু বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন। দুই দিন পরে ইন্দ্র বাবুর মৃত্যু-সংবাদ তাঁহার কাছে পৌঁছিল।

শ্রাদ্ধের দিন,নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য হেমন্ত বাবু কলিকাতায় গেলেন। মুণ্ডিতমস্তক সুরেন্দ্রভূষণ, শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, জলযোগান্তে আসিয়া হেমন্তবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হেমন্ত বাবু সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহাকে নানা মিষ্ট বাক্য বলিয়া, অবশেষে পকেট হইতে একখানি বড় লেফাফা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "বাবা, এইটি আমার লৌকিকতা-স্বরূপ তুমি গ্রহণ কর।"

"কি এ?"—বলিয়া সুরেন্দ্র খামখানি খুলিয়া ফেলিল। দেখিল, ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রী আপিসের মোহরযুক্ত একখানি দলিল। জমীদারের ছেলে, অল্প দূর পড়িয়াই বুঝিতে পারিল, ইহা একখানি দান-পত্র,—চারি বৎসর পূর্ব্বে পিতার নিকট হইতে ক্রীত দুইখানি গ্রামের একখানি (বাঁশডাঙ্গা) পুত্রকে, পিতৃ-শ্রাদ্ধে লৌকিকতা-স্বরূপ হেমন্ত বাবু দান করিতেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে হেমন্ত বাবুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "এ কি, কাকাবাবু!—এ আপনি কি করেছেন? এর নাম কি লৌকিকতা দেওয়া? না না—এ আমি কোনমতেই নিতে পারিনে।"

হেমন্ত বাবু বলিলেন,"না, বাবা, তুমি মনে কোনও সঙ্কোচ কোরো না। যে টাকা দিয়ে তোমাদের ঐ গ্রাম দু'খানি আমি কিনে নিয়েছিলাম, সে টাকার অধিকাংশই তোমার বাপের অনুগ্রহেই আমার পাওয়া—তোমার বাপেরই টাকা বলা যেতে পারে। এক হিসাবে, বাঁশডাঙ্গা আমি তোমায় দান কর্‌ছিনে, ও ত তোমারই—তোমার বাবাই বরং খাস-বেড়ে আমায় দান ক'রে গেছেন।"

সুরেন্দ্র ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া হেমন্ত বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল ; শেষে বলিল, "আপনি কি বলছেন ?—এ যে প্রহেলিকার মত—আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে কাকাবাবু।"

হেমন্ত বলিলেন, "এর মধ্যে অনেক কথা আছে, বাবা, সে সব তোমায় শুনে কায নেই। তোমার মা সমস্তই জানেন। তুমি বিনা দ্বিধায় বাঁশডাঙ্গা গ্রামখানি ফিরিয়ে নাও। তাতে কোনও দোষ, কোনও অন্যায় হবে না।"

"আচ্ছা, মা'কে তা হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি। তিনি যদি অনুমতি করেন ত নেবো।"—বলিয়া সুরেন্দ্র চলিয়া গেল।

মাতা শুনিয়া, অনুমতি দিলেন। সুরেন্দ্র আসিয়া হেমন্তবাবুকে তাহা জানাইয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
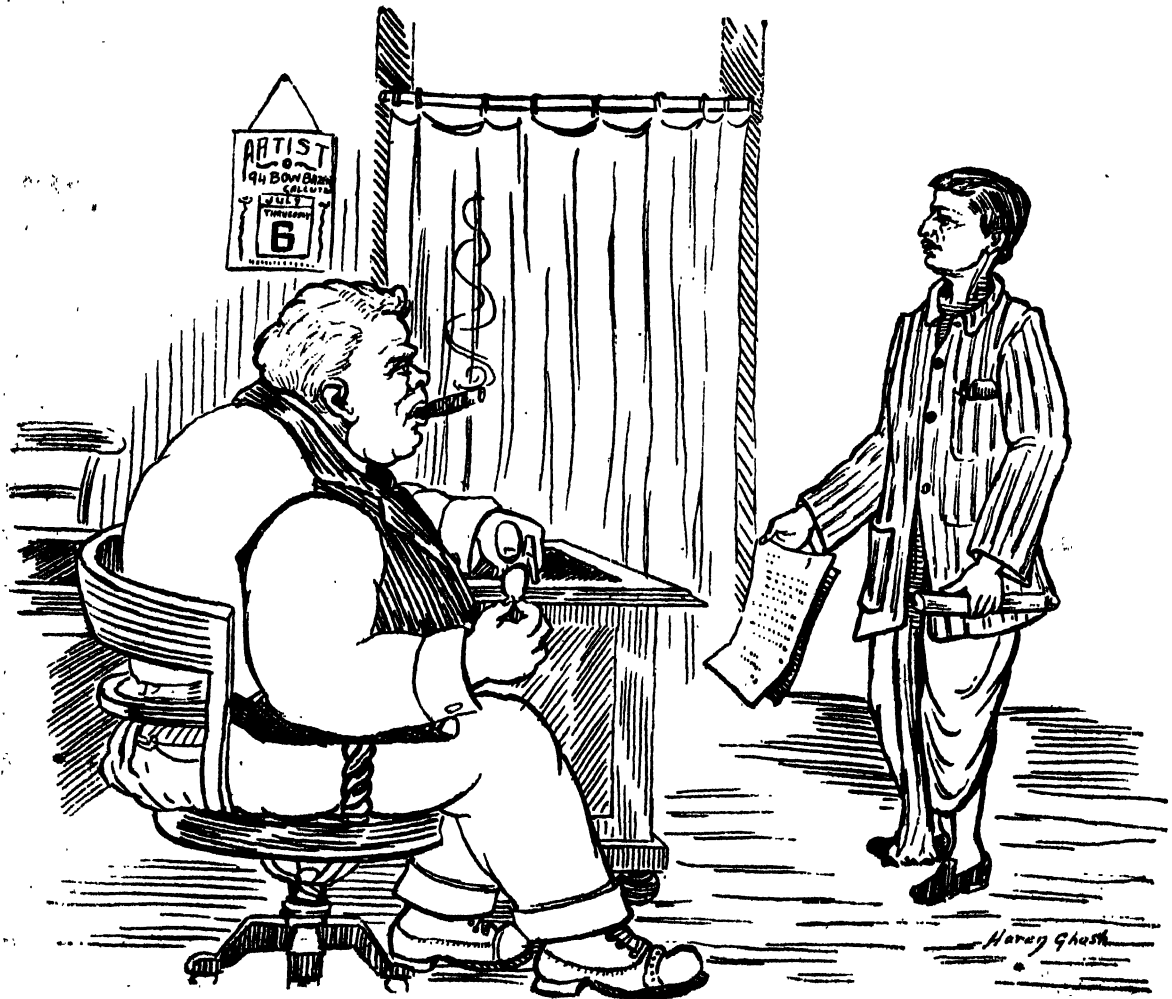
উমেদার—আমি বি, এ, পাশ—আপনার আফিসে ৩০৲ টাকা মাহিনার একটা চাকরী-
"বড় সাহেব"—বি, এ,র ৩০৲ টাকা—এম, এ, নইলে হবে না, বাবু—পথ দেখ।

পদব্রজে পৃথিবী-পর্য্যটন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা প্রদেশের অধিবাসী মিষ্টার হিপো-লাইট মার্টিনেট পদব্রজে পৃথিবী-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল যুক্তরাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত ওয়াশিংটন প্রদেশের সিয়াটল বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া সমগ্র যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, ইটালী, অ্যালবেনিয়া, গ্রীস, মিশর, প্যালেষ্টাইন, আরব, মেসোপোটেমিয়া হইয়া ইনি বোম্বাই বন্দরে আইসেন। বোম্বাই হইতে ২২শে মে যাত্রা করিয়া গত ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় আসিয়া পৌছেন। মার্টিনেট এইভাবে অন্যাধিক চৌদ্দ হাজার মাইল পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে উত্তর-বঙ্গ, আসাম, মণিপুর ও ব্রহ্ম হইয়া তিনি হংকং যাইবেন। চীন, জাপান প্রভৃতি প্রশান্ত-মহাসাগরের তীর-স্থিত দেশগুলি পর্য্যটন করিলেই তাঁহার পৃথিবী-পর্য্যটন-ব্রত উদ্‌যাপিত হয়।

মার্টিনেট স্বাধীনতার উপাসক। তিনি সকল বিষয়েই মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার পক্ষপাতী। তিনি জুতা-জামা প্রভৃতি বড় পসন্দ করেন না; নগ্নপদে নগ্নমস্তকে পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। পরিধানে মোটা খাকী প্যাণ্ট, গায়ে খাকী সার্ট। সার্টের উপর লেখা—"পদব্রজে ভূ-পর্য্যটন-কারী।" আসবাবপত্রের মধ্যে জলপানের জন্য একটি কাচের পাত্র এবং শয়নের জন্য রবারের বিছানা। শুইবার সময় উহা বায়ুপূর্ণ করিয়া বড় করিয়া লইতে হয়। প্রয়োজনে উহা ছত্ররূপে ব্যবহৃত হয়

সময়ের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তিনি একটি ছোট ঘড়িও নিজের কাছে রাখিয়াছেন। মার্টিনেট তাঁহার পর্য্যটন-বৃত্তান্ত সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছেন। এ জন্য তাঁহার সঙ্গে ডায়েরীও থাকে। বলা বাহুল্য, ডায়েরীলিপির সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে। তিনি কপর্দ্দকশূন্য ভাবে দেশ হইতে বাহির হয়েন। ফ্রান্সে আসিয়া তাঁহার কিছু অর্থসংগ্রহ হয়। বেশী টাকা-কড়ি তিনি সঙ্গে রাখেন না; কারণ, পথে দস্যুভয় আছে। আরবে তিনি অনেকবার বেদুইনদের হাতে পড়িয়াছিলেন। আরবের এক জন সর্দার পথ-পর্য্যটনের সঙ্গিস্বরূপ একটি ভাল কুকুর তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন। কুকুরটি তাঁহার

মিঃ মার্টিনেট।

সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মার্টিনেট খাঁটী মার্কিণ হইলেও অনাবৃত মস্তকে শীতাতপের মধ্যে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করায় তাঁহাকে এখন আর দেখিলে মার্কিণের লোক বলিয়া সহসা চিনা যায় না। এখন তাঁহার চেহারা অনেকটা গল্পের রবিন্সন ক্রুসোর মত; মস্তকে সুদীর্ঘ কেশপাশ, শ্মশ্রু-গুম্ফও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। ১৪ মাস পূর্ব্বে ফ্রান্সে তাঁহার জন্মতিথির পর হইতে তিনি চুল-দাড়ী রাখিয়াছেন। পর্য্যটন-ব্রত শেষ হইলে এই রবিন্সনী-বেশ পরিত্যাগ করিবেন। চুল-দাড়ী রাখার জন্য এবং খালি পায়ে ও খালি মাথায় থাকার জন্য তাঁহাকে দেখিতে অনেকটা সাধু-সন্ন্যাসীর মত হইয়াছে। তাঁহার আচার-ব্যবহারও কতকটা সেই রকম। তিনি মাছ-মাংস ভালবাসেন না, পথে সাধারণতঃ নিরামিষ এবং দুধ ও ফল-মূলই আহার করেন, সকাল-বিকাল স্নান করেন এবং অধিক পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন না। কলিকাতায় কোন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী তাঁহাকে দুই সুট পোষাক দিতে চাহিলে তিনি এক সুটের অধিক লয়েন নাই; বলিয়াছেন, আবশ্যকের অধিক লইলে পাপ হইবে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি কোনরূপ অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখেন না। কোনরূপ মাদক দ্রব্য ব্যবহার বা ধূমপানও করেন না। সামাজিক ব্যাপারে তিনি সোস্যালিষ্ট মতের পক্ষপাতী।

মিঃ মার্টিনেট দিনে গড়ে চল্লিশ মাইল হিসাবে চলেন। একবার ছাপ্পান্ন মাইল হিসাবেও চলিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিতে তাঁহার পা ফুলিয়া গিয়াছিল। সে জন্য এখানে কয়দিন বিশ্রাম ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি বাঙ্গালার অতিথি হইয়াছিলেন। এ জন্য বাঙ্গালী ক্লাব—বহুবাজারের "ওল্ড ক্লাব"—তাঁহাকে কয়দিন আদর-আপ্যায়ন করেন।

কয়জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর গৃহেও তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। মার্টিনেট ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ আদর-অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। পথে অ্যালবেনিয়া ও দামস্কসেও তিনি এইরূপ আদর-যত্ন পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ইলিশ মাছ, আনারস, ল্যাংড়া আমের তিনি বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। দেশীয় প্রথায় আহার, সন্দেশ-রসগোল্লা তাঁহার নিকট খুব প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। রোম্যান ক্যাথলিক শিক্ষিত বংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহারা তিন সহোদর, একান্নে থাকেন। ভাই দুই জন এঞ্জিনীয়ার। ইঁহার দুই ভগিনী আছেন। মার্টিনেট স্বাধীন জীবন-যাপন করিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ করেন নাই, কৌমার-ব্রত পালন করিতেছেন।

মার্টিনেট (পথ চলিতেছেন)

পৃথিবীপর্য্যটনকারীর অভাব নাই; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বোধ হয় কেহই এ বিষয়ে মার্টিনেটের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ভূয়োদর্শনের ফলে বলিয়াছেন, এ দেশের মহিলাদিগের সলজ্জ নম্রভাব বড়ই মুগ্ধকর। তিনি পর্য্যটক—এ দেশের রাজনীতিক আলোচনা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি যে কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালীরই অতিথি হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার সাম্যপ্রিয়তা বুঝিতে পারা যায়। তিনি, গত ২৫শে আষাঢ় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন।
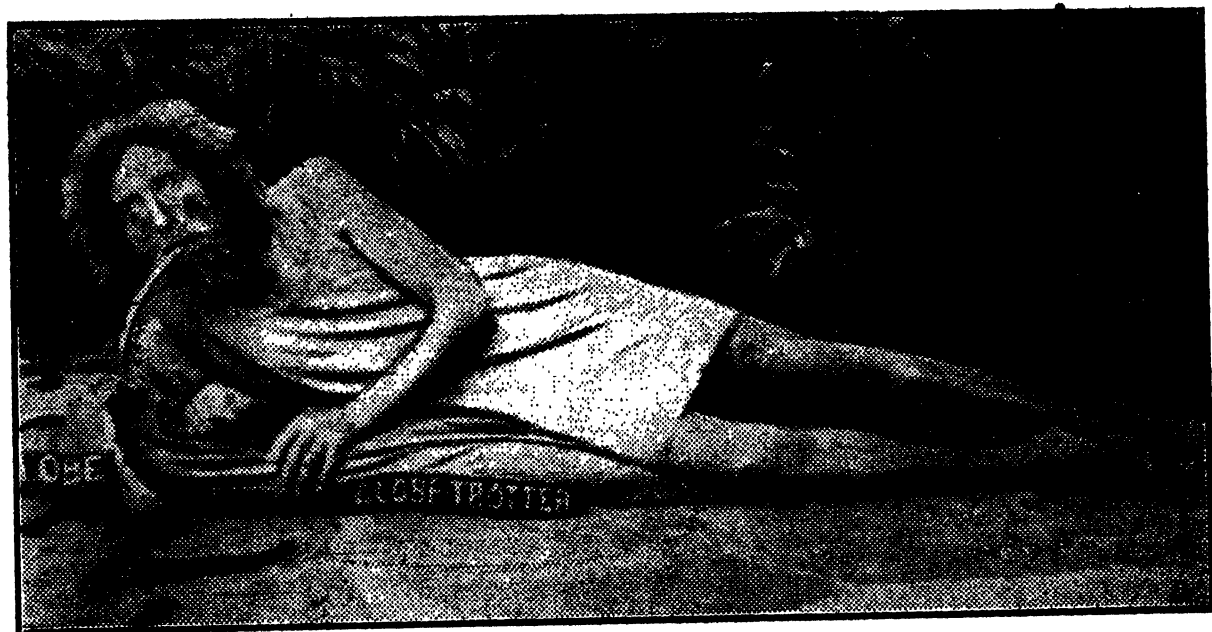
মার্টিনেট শয্যাটি বায়ুপূর্ণ করিতেছেন।

ওল্ড ক্লাবের সদস্যগণসহ মার্টিনেট।

শিক্ষার বাহন

ছাত্রের মাতৃভাষাই যে তাহার পক্ষে শিক্ষার বাহন হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক, সে বিষয়ে বিশ্বের কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকিলেও আমাদের বিদেশি-শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের তাহাতে বিশেষ সন্দেহই ছিল এবং তাঁহারা বাঙ্গালীর ছেলেকে বাল্যাবধি বিদেশী ভাষা শিক্ষায় নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২৮ বৎসর পূর্ব্বে এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালীর ছেলে বিদেশী ভাষা শিখিতেই কাল কাটায়, তাহার অবস্থা শোচনীয় হইবেই। "ইহাতে কি সে ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি এক প্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামী করিতে শেখে না?" কে আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের সামঞ্জস্য সাধন করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন - "বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং এক দিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।" কিন্তু তাঁহার "ক্ষীণ স্বর" কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। সিনেট হৌসের সভা "অসংখ্য বালকবলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে" কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন নাই; কারণ, "বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণ স্বর যদি বা কোন কর্ণ ভেদ করিতে না পারে, তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।"

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কএক জন সভ্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই।" (Calcutta University Minutes for 1891—92 pp. 56—58)

আরও এক জন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি—আনন্দমোহন বসু। তিনি বলেন, "এ বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি, তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।" হইবারই কথা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহারা যদি এ প্রস্তাবে আপত্তি না করিবেন—"তবে আমাদের দেশের এমন দুর্দশা হইবে কেন?"

এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের মাতৃভাষাকে তাহার শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাবে আমাদেরই দেশের লোক কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয়, এই ২৮ বৎসরে আমাদের দেশে দেশাত্মবোধ এতটুকু প্রবল হইয়াছে যে, সে আপত্তিই অধিকাংশ সদস্য কর্ত্তৃক সমর্থিত হয় নাই। তবে এই বিষয়ের বিচারকালে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, যাঁহারা ইংরাজীতেই এ দেশে শিক্ষাপ্রচলনের পক্ষপাতী, আজও দেশে তেমন লোক আছেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, কোন বাঙ্গালী অধ্যাপক বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে ইংরাজীতে কালিদাস-কথা শুনাইতেছিলেন। তাঁহার বিবৃতিদোষে ছাত্ররা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তিনি কেন বাঙ্গালায় তাঁহার বক্তব্য ব্যক্ত করিতেছিলেন না জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"তা হ'লে জাত যাবে। ছেলেরা মানবে না।" আমরা আর কত দিন এইরূপ কুসংস্কারের বশীভূত থাকিব? আমরা রাজনীতিক হিসাবে পরাভূত হইয়াছি; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কেন

আনন্দমোহন বসু।

ইচ্ছা করিয়া, শিক্ষাবিষয়েও intellectual slavery ভোগ করিব? সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাইস-চান্সেলাররূপে বলিয়াছেন—বাঙ্গালী ছাত্ররা বাঙ্গালার সন্তান-রূপে গড়িয়া উঠে, ইহাই সকলের অভিপ্রেত। অর্থাৎ নকল ফিরিঙ্গী গড়া বিশ্ববিদ্যালয়েরও অভিপ্রেত হওয়া সঙ্গত নহে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী ও গুণী, তাঁহারা যদি তাঁহাদের বক্তব্য বঙ্গভাষায় বিবৃত করেন, তবে বিদেশীকেও বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে হইবে। আর বাঙ্গালা ভাষাই শিক্ষার বাহন হইলে বাঙ্গালীর ছেলে অনেকটা অকারণ শক্তিক্ষয়ে বাধ্য হইবে না।

আজ বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্ববিধ-ভাব-প্রকাশক্ষম এবং বাঙ্গালা সাহিত্য ও বিশ্ব-সাহিত্য সভার আদর লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালায় আজ বিজ্ঞান-দর্শন-চর্চ্চাও হইতেছে এবং বাঙ্গালীরা যদি সে সব ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ না করিয়া বাঙ্গালায় ব্যক্ত করেন, তবে অচিরে এই ভাষা অন্যান্য দেশেও আলোচিত হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গত ১০ই আষাঢ় সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কয় দিন মাত্র রোগ ভোগ করিয়া ৪১ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। সাহিত্যসেবা সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে কৌলিক। তাঁহার পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের নাম বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা-কালে সসম্মানে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বঙ্গ-সাহিত্যের গঠনযুগে অক্ষয়কুমার তাঁহার 'চারুপাঠ' হইতে 'বঙ্গীয় উপাসক সম্প্রদায়' পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহের সাহিত্যানুরাগ উত্তরাধিকারিসূত্রে পাইয়াছিলেন এবং আজীবন সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য তাঁহার কাছে প্রকৃতই সাধনার ছিল। তিনি বিবিধ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কবিতায় কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সর্ব্বতোভাবে সপ্রকাশ ছিল। তাঁহার 'বেণু ও বীণা' যখন প্রকাশিত হয়, তখন পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় আমাদিগকে তাহা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উপহার দিয়া 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সেই তরুণ বয়সের রচনাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহাতেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা গিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য তাঁহার কাছে সাধনারই ছিল। একাগ্র সাধনায়—অনুশীলনে তিনি তাঁহার কবি-প্রতিভা সবিশেষ মার্জ্জিত করিয়াছিলেন এবং তাহা দক্ষ শিল্পী কর্ত্তৃক সংস্কৃত মণির মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। একান্ত দুঃখের বিষয়—যখন বাঙ্গালী তাঁহার নিকট আরও অনেক উপাদেয় রচনা পাইবার আশা করিতেছিল, সেই সময় তিনি অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। সাহিত্যসেবাই যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে সাহিত্য-সেবকদিগের মর্ম্ম-বেদনা একান্তই স্বাভাবিক।

সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার চেষ্টা হইতেছে জানিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

সুকবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য—তাঁহার স্বদেশ-প্রেম। এই প্রেম যে তাঁহার "মর্ম্মে বিজড়িত মূল" ছিল, তাহা তাঁহার কবিতার পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন। তিনি বাণীসেবার দ্বারা স্বদেশের সেবা করিতেন এবং তাহাতে পরম আনন্দ লাভ করিতেন। যাহাকে সাহিত্য-রসিক বলে, তিনি তাহাই ছিলেন। অকালে তাঁহার মত একনিষ্ঠ সাহিত্যেকের তিরোভাব বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধনা

গত ১৩ই আষাঢ় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করেন। লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বিশিষ্ট সভ্য করায় এই সংবর্দ্ধনার আয়োজন। এই সম্মান ভারতবাসীর পক্ষে দুর্ল্লভ হইলেও, ইহাতে সোসাইটীর গুণ-গ্রাহিতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্মানবৃদ্ধি হয় নাই। সোসাইটীর মূল সভা—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী—ইতঃপূর্ব্বেই শাস্ত্রী মহাশয়কে সভাপতি করিয়াছিলেন এবং প্রত্নতত্ত্ব-ক্ষেত্রে তাঁহার যশ আজ সভ্যজগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমরা—বঙ্গবাসীরা তাঁহার কৃত কার্য্যে গৌরবানুভব করিয়া থাকি।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সংবর্দ্ধনার দিন পরিষদের পক্ষ হইতে পণ্ডিত মহাশয়কে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একাংশ উদ্ধৃত হইল :—

"সেই সুদূর 'বঙ্গদর্শন'-যুগে যাঁহারা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের মহাপাত্ররূপে বঙ্গবাণীর সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদের অন্যতম। তদবধি সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে আপনি প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তথাপি প্রত্ন-তত্ত্বই আপনার স্বক্ষেত্র। যে যত্ন, ধীরতা, পরিশ্রম, অনুশীলন, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা ও গবেষণাগুণের অধিকারী হইলে প্রত্ন-তত্ত্বে পারদর্শী হওয়া যায়, আপনাতে সেই সকল গুণই বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান। সেই জন্য ঐ ক্ষেত্রে

আপনি বিপশ্চিৎ, ক্ষেত্রজ্ঞ—ঐ ভূমির আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিরাট্।"

বাঙ্গালার প্রত্ন-তত্ত্ব-ক্ষেত্রে আজ শাস্ত্রী মহাশয়ের আসনের নিকটবর্ত্তী হইবার লোকেরও অভাব। রাজা রাজেন্দ্রলাল যে দিন প্রত্ন-তত্ত্বক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে দিন সে ক্ষেত্রে তিনি একক ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার সৌভাগ্য, আজ শাস্ত্রী মহাশয়কে পুরোভাগে করিয়া বহু বাঙ্গালী এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষার সেবায় শাস্ত্রী মহাশয় যৌবনাবধি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যখন বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিতেছিল, তখনই তিনি 'বঙ্গদর্শনের' অন্যতম লেখক ছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় ইচ্ছা করিলে প্রাচীন ভারতের—হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের—একখানি বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। সে কার্য্যে তাঁহার মত যোগ্যতা আর কাহার আছে? তিনি সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন কি?

নরেন্দ্রনাথ লাহা।

নরেন্দ্র-সংবর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পি, এইচ ডি" উপাধি পাওয়ায় তাঁহার বহু গুণানুরাগী ব্যক্তি গত ৯ই আষাঢ় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত "আশীর্ব্বাদ" পাঠ করেন;—

"কল্যাণীয় নরেন্দ্র,

ধনে মানে, রূপে গুণে, কুলে শীলে তোমার বংশ অতি উজ্জ্বল। তুমি তাহার কুলপ্রদীপ। তুমি 'হৃষীকেশ'-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং 'ওরিয়েণ্টাল সিরিজ' প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছ। তুমি ইংরাজীতে পণ্ডিত ও বিখ্যাত গ্রন্থকার। বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি তোমায় 'ডাক্তার' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। তোমার এই অভ্যুদয়ের সময় তোমার মিত্রবর্গ পরিষদ-মন্দিরে মিলিত হইয়া জগদীশ্বরের নিকট তোমার দীর্ঘ আয়ু ও নিরন্তর মঙ্গল কামনা করিতেছেন। আমিও বলিতেছি তথাস্তু।"

নরেন্দ্রনাথ যে পুস্তক রচনা করিয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ও গভীর গবেষণার পরিচায়ক। সেরূপ পুস্তকরচনা সবিশেষ প্রশংসার্হ। কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার অনুসন্ধানফল রচনায় লিপিবদ্ধ করিয়া—জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের পূর্ণতাসাধনচেষ্টা করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি 'ওরিয়েণ্টাল সিরিজ', 'হৃষীকেশ সিরিজ' ও 'দুর্গাচরণ সিরিজ' প্রকাশ করিয়া সে কার্য্যের আরও সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার আপনার রচনা বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে বহু শ্রমের ফল এবং তাঁহার প্রকাশিত 'সিরিজ'গুলিতে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। এসিয়াটিক সোসাইটী ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধভাবে যে বিরাট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নরেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে সেই কার্য্য করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহার সাধু চেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

উৎসব
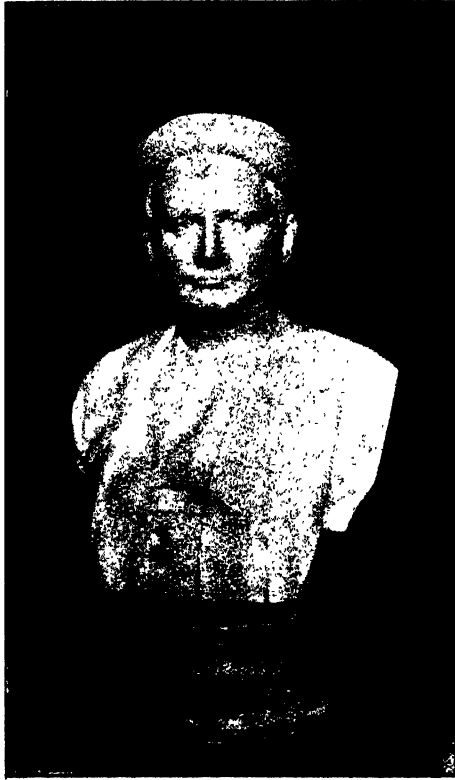
বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

নবীনচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্রাট-রূপে দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছেন এবং সাহিত্য-স্রষ্টা-রূপে আপনার ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে ভাষায় অপূর্ব্ব শ্রীসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, এতদিন পর্য্যন্ত যে তাঁহার কোন মূর্ত্তি বঙ্গীয় পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সুখের বিষয়, সার আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ বাঙ্গালীর চেষ্টায়, সাধারণের সাহায্যে বাঙ্গালীর সে কলঙ্ক এত দিনে মোচিত হইল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির বর্ত্তমানে আমাদের বাণীভবন এবং ইহারই সঙ্গে "রমেশভবন"—সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা কল্পিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে হেমচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি হেমচন্দ্রের আবক্ষ মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া পরিষদে রক্ষা করিয়াছেন।
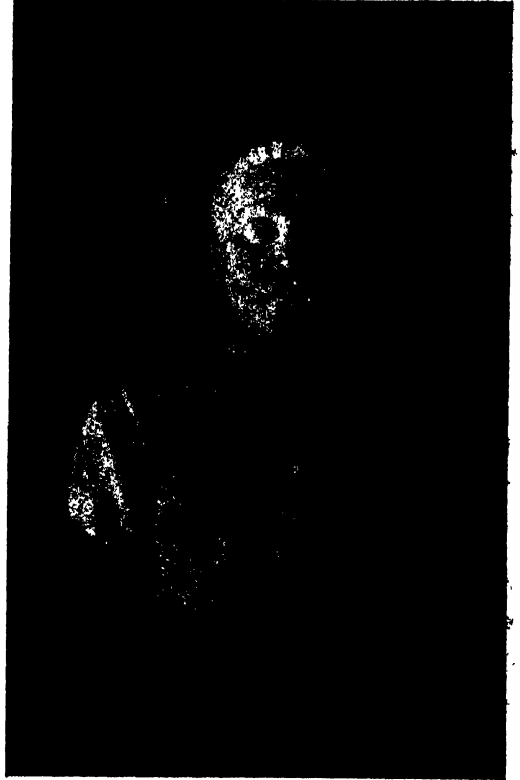
হেমচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

তাহার পর নবীনচন্দ্র স্মৃতি সমিতিও নবীনচন্দ্রের আবক্ষ মর্ম্মর-মূর্ত্তি পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই রূপে পরিষদের সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হইতেছে। যাঁহার গৃহে পরিষদ প্রথমে আশ্রয় পাইয়াছিল, সেই রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা টাউন হলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণের অন্যান্য কায ও তাঁহার সাহিত্য সেবা তুলনা করিলে মনে হয় তাঁহার মূর্ত্তিও পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলে শোভন হইত।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আবক্ষ মর্ম্মরপ্রস্তর-মূর্ত্তি এক জ

ভারতীয় ভাস্করের কীর্ত্তি। তিনি বোম্বাইবাসী—কলিকাতা-প্রবাসী। বোম্বাইয়ে ভাস্কর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ গণপতি মাত্রে, শ্রীযুক্ত কর্ম্মকার প্রভৃতি বহু শিল্পী ভাস্করকার্য্যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি কোন বাঙ্গালী এই কার্য্যে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর প্রতিভা অন্যান্য বিভাগের মত এ বিভাগেও প্রযুক্ত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অন্যতম অধ্যাপক। রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি অপরিচিত নহেন। এবার জাতিসঙ্ঘের (লীগ অব নেশনস্) কর্ত্তারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য জেনিভায় যে ১০ জন পণ্ডিতকে পরামর্শ-সভায় আহ্বান করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। বাঙ্গালী প্রমথনাথের এই সম্মানে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যয়-সঙ্কোচ

বিলাতী সরকারের অনুকরণে ভারত সরকার যেমন ব্যয়-সঙ্কোচ সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকারও তেমনই ভারত সরকারের অনুকরণে এক সমিতি গঠিত করিয়াছেন।

সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গত ১৩ই জুন তারিখে বাঙ্গালা সরকার এ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থায় বাঙ্গালা সরকার যে রাজস্ব পাইয়াছেন, তাহাতে আবশ্যক ব্যয়-নির্ব্বাহ হয় না। গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রস্তাব করিয়াছিলেন—সরকারের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কিরূপ ব্যয়-সঙ্কোচ করা সম্ভব, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার ২০ জন সদস্য লইয়া এক সমিতি গঠিত হউক।

বর্ত্তমান সমিতি সেই প্রস্তাবানুসারে গঠিত হয় নাই। ইহার সদস্য—

সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)
মিষ্টার সি, ডবলিউ, রোডস
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক
রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
মিষ্টার এস, ই, প্রাই

সমিতিকে যে সব কথা বিবেচনা করিতে বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি এই—লোক যে শিক্ষা-বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি, কৃষি প্রভৃতির জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে বলিতেছে, তাহা করিলে সে সব বাবদে
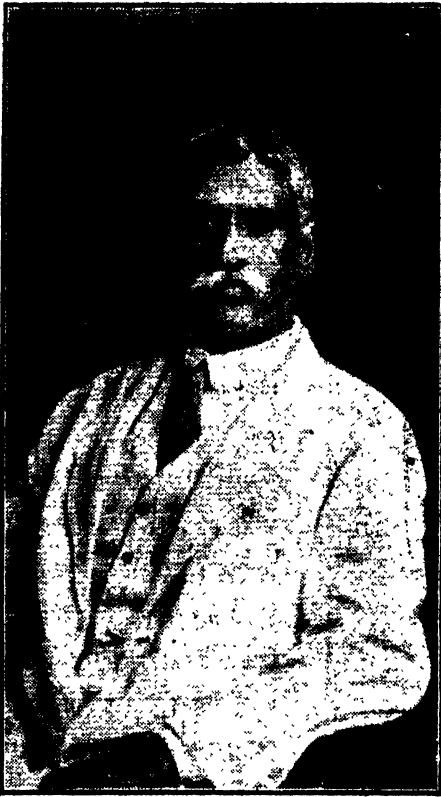
রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র।

ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ সংগ্রহের (অর্থাৎ নূতন কর সংস্থাপনের) ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হইবে কি না ?

এই কথায় আমাদের একটু ভয় পাইবার কারণ আছে। চৌকীদারী টেক্স, পথকর, পাবলিক কর—এ সকলের উপর এখন ইউনিয়ন বোর্ডের টেক্স প্রবল হইবে। তাহারই প্রতিবাদে স্থানে স্থানে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। কাযেই এ সব ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিচার প্রয়োজন।

সমিতির সদস্যদিগের মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী। সুরেন্দ্র বাবু এখন কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। সুতরাং তিনি এই সমিতিতে কায করিবার অবসর পাইবেন কি না, জানি না। স্যার রাজেন্দ্রনাথ যত বড় ব্যবসায়ীই কেন হউন না, শাসনের ব্যবস্থা-বিষয়ে তাঁহার যে কোন অভিজ্ঞতা আছে, এমন প্রমাণ আমরা পাই নাই। অথচ বাঙ্গালায় সেরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের অভাব না থাকিতেও তাঁহাকেই কেন সভাপতি মনোনীত করা হইল ? সুরেন্দ্র বাবু যদি সমিতিতে কায করিতে না পারেন, তবে তাঁহার স্থানে কে কায করিবেন ?

সমিতি কি বাঙ্গালীর সাধারণ গড় আয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ করিবেন ? এ দেশে সরকার প্রায়ই ভুলিয়া যায়েন যে, ব্যয় কত করা হইবে, তাহা স্থির করিয়া কর ধার্য্য করা সঙ্গত নহে—রাজস্ব কত, তাহাই বুঝিয়া ব্যয় স্থির করা কর্ত্তব্য। সমিতি সেই মূলকথাটি স্মরণ রাখিবেন কি ?

বিদেশে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভারতবর্ষের নিরন্ন প্রজার অর্থে সরকারের নির্দ্দেশে উপনিবেশসমূহে বক্তৃতা করিয়া ও ভোজ খাইয়া ফিরিতেছেন। বলা হইয়াছে—উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার বক্তৃতায় উপনিবেশসমূহ ভারতবাসীর প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে আর ঘৃণ্য পশুর মত ব্যবহার করিবেন না। আমরা যাচিয়া মান ও কাঁদিয়া সোহাগ লইবার বিরোধী এবং আমাদের বিশ্বাস, যাচিলে মান ও কাঁদিলে সোহাগ মিলেও না। যখন আমরা স্বাবলম্বী হইব এবং স্বায়ত্ত-শাসন পাইব, তখনই এই অবস্থার প্রতীকার হইবে। শাস্ত্রী যে ভাবে আমাদের অর্থে বিদেশে যাইয়া মানের কান্না কাঁদিতেছেন, তাহাতে আমরা লজ্জানুভবই করিতেছি। তিনি বলিতেছেন, উপনিবেশসমূহ যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন—স্বদেশে শ্বেতাঙ্গ ব্যতীত অন্যের

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী।

প্রবেশ নিষেধ করিতে পারেন ; কিন্তু যে সব ভারতবাসী সে সব দেশে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের উপর দয়া করুন—"প্রসীদ!" যদি এমন করিয়াই কাঁদিতে হয়, তবে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রজার সাধারণ অধিকারের কথা কি আর মুখে আনা শোভা পায়? শাস্ত্রী কানাডায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই সব কথা বলিতেছেন। সে সব দেশে ভারতবাসী নাই বলিলেই চলে। যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ও কেনিয়ায় ভারতবাসীর এত লাঞ্ছনা, সে সব দেশে তিনি কিছু করিতে পারিবেন কি? শাস্ত্রী এক স্থানে বলিয়াছেন, সরকারের উপর আর এ দেশের লোকের বিশ্বাস নাই। কিন্তু তিনি সেই সরকারেরই কায করিতে বাহির হইয়াছেন।

ডাক্তার তেজবাহাদুর সপরু

ডাক্তার তেজবাহাদুর সপরু বড়লাটের শাসন-পরিষদের আইন-সদস্য ছিলেন। সিমলার জলহাওয়া তাঁহার সহ্য হয় না বলিয়া তিনি পদত্যাগ করিতেছেন। কিন্তু শুনা যাইতেছে, তিনি আবার এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কায করিবেন। অবশ্য সুন্দরলাল ও সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর এবং পণ্ডিত মতিলাল ব্যবহারাজীবের কায ত্যাগ করায়, এলাহাবাদে ডাক্তার সপরুর পশার খুবই বাড়িবে। কিন্তু শরীর যদি সুস্থ না থাকে, তবে ব্যবসা চলিবে কিরূপে?

এখন কথা, ডাক্তার সপরুর স্থানে কে আইন-সদস্য হইবেন? শুনা যায়, সার জর্জ লাউণ্ডসের পর এই পদ সার চিমনলাল শীতলবাদকে দেওয়া হইবে কথা হইয়াছিল। এবার কি তিনিই এ পদ পাইবেন? না—সার বিনোদচন্দ্র মিত্র?

গোপবন্ধু দাস

কংগ্রেসের নির্দ্ধারণে কংগ্রেসকর্ম্মীরা যখন গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং দেশ আইন ভঙ্গ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে কি না, তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে, তখন উড়িষ্যার অক্লান্ত কর্ম্মী গোপবন্ধু দাস কারাবদ্ধ হইয়াছেন, পর পর ২টি অভিযোগে পণ্ডিত গোপবন্ধুকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে।—প্রথম, বালেশ্বরে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া সভা করায়, ৫০৲ টাকা জরিমানা বা ১ মাস বিনাশ্রমে কারাবাস। তিনি জরিমানা না দিয়া কারাবাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে জেল হইতে লইয়া যাইয়া কটকে নূতন সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (২) ধারা অনুসারে ২ বৎসর বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। পণ্ডিত গোপবন্ধু উড়িষ্যার খদ্দর-প্রচলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি এমন কথাও বলিয়া গিয়াছেন যে, কণিকায় চণ্ডনীতির স্বরূপ প্রকাশ করিবার শঙ্কার সহিত তাঁহার কারাদণ্ডের সম্পর্ক আছে।

গোপবন্ধু দাস।

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে দেশের লোক অবশ্যই মনে করিবে, রাজনীতিক উদ্দেশ্যে আইন ব্যবহৃত হইতেছে। তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাও সরকারের পক্ষে গৌরবজনক নহে। বালেশ্বর হইতে যখন তাঁহাকে কটকে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাঁহার হাতে হাতকড়া দেওয়া হয়—কোমরে দড়ী বাঁধা হয়! ট্রেণেও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয় নাই। লোককে ভয় দেখাইয়া সহযোগিতা-বর্জ্জনে বিরত করাই কি এই ব্যবহারের উদ্দেশ্য?

নমামি ত্বাং।

মিশ্র-বেহাগ—কাশ্মিরী-খেম্‌টা।

নমামি ত্বাং ভারতি, হৃদয় কমলদলবাসিনি।
নমামি ত্বাং বাণি, রাগ-রাগিণী বিকাশিনি।
নমামি ত্বাং নন্দননন্দিতাং, সুরনরবন্দিতাং বীণাপাণি।
তব প্রেম পরশ রস রাগে,
পুলকিত, মোহিত চিত নিত জাগে—গীত অনুরাগে;
নমামি বাগ্‌বাদিনী সরস্বতি! ভক্তচিত্তে দিব্যজ্যোতিবিভাসিনী।

গান ও সুর—শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

০ ১ | ০ ১ | ০ ১
II { গা গা -া I রা সা -া | সন্ধা -া না I সা -া -া | সা সা সা I সা সা সা
ন মা ০ মি ত্বাং ০ | ভা০ ০ ০ র তি ০ ০ | হৃ দ য় ক ম ল

০ ১ | ০ ১ | ০ ১
গা গা -া I গমা পা মা | মগা -া -া I -া -া -া } | সা সা -া I গা গা -মা
দ ল ০ বা০ ০ সি | নি০ ০ ০ ০ ০ ০ | ন মা ০ মি ত্বাং ০

০ ১ | ০ ১ | ০ ১
পা -া -না I না -া -া | পা -া -া I না—র্সা র্সা | র্সা -া -া I -া -া না
বা ০ ০ ণী ০ ০ | রা ০ গ রা ০ গি | ণী ০ ০ ০ ০ বি

০ ১ | ০ ১ | ০ ১
ধনর্সা -র্রা র্সা I না -া -ধপমগা II সা সা -া I না না -া | সা -া গা I গা -া -া
কা০ ০ ০ শি নি ০ ০০০০ | ন মা ০ মি ত্বাং ০ | ন ০ ন্দ ন ০ ০

০ ১ । ০ ১ । ০ ১
রগা -মপা ম্ম I আ -া -া | গা মা পা I পা -া -া | পা -া ম্মা I পা -া -া |
ন০ ০০ ন্দি ত্রা ০ ০ | সু র ন র ০ ০ | ব ০০ ন্দি তাং ০ ০ |

০ ১ । ০ ১
ঋপা -না পা I পা -মা -া | গা -া -া I -া -া -া II
বী০ ০০ ণা পা ০ ০ | ণি ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ । ০ ১ । ০
গা মা II { পা -না না I না না না | না র্সা ধনর্সা I -া র্সা -া | না না না I
ত ব { প্রে ০ ম প র শ | র স রা০০ ০ গে ০ | পু ল কি

১ । ০ ১ । ০ ১ । ০
না র্সা -া | র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা না | ধনা -র্সনা -ধা I পা -া -া } | পধণা -া ধা
ত মো ০ | হি ত চি ত নি ত | ঙা ০০ ০ গে ০ ০ } | গী০ ০ ০ ত

১ । ০ ১ । ০ ১ । ০
I -া পা মা | গা -া -া | সা -া -া | না সা -গা I মা পা -া | না -া না I
০ অ মু | রা ০ ০ | গে ০ ০ | ন মা ০ গি বা গ্ | বা ০ দি

১ । ০ ১ । ০ ১ । ০
না -া না | র্সর্রা -া না I র্সা -া -া | র্সা -া র্সা I না -া পা | পা -া ধপা
নী ০ স | র০ ০ স্ব তি ০ ০ | ভ ০ ক্ত চি ০ ত্তে | দি ০ ব্য০

১ । ০ ১ । ০ ১
I মা -া -া | গা -া গা I গমা -পা মা | মা -গা -া I -া -া -া II II
জ্যো ০ ০ | তি ০ বি ভা০ ০ সি | নী ০ ০ ০ ০ ০

আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্ত্তিত।

১। স র গ ম প ধ ন = সপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন, স্বরের নীচে হসন্ত, এবং উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ।

২। কোমল র = ঋ ; কোমল গ = জ্ঞ ; কড়িম = হ্ম ; কোমল ধ = দ ; কোমল ন = ণ।

৩। তাল বিভাগের চিহ্ন, পার্শ্বে এক একটা দাঁড়ি। ১, ২´, ৩, ০ ইত্যাদি তালি ও ফাঁকের অঙ্ক। যে অঙ্কের মাথায় রেফ তাহাই সম্।

৪। তালের একফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে "আই" এই ইংরাজী অক্ষরটী বসে ; আরম্ভ ও শেষে দুই "আই" বসে।

৫। একমাত্রা = া। অৰ্দ্ধমাত্রা = ঃ। দুটী অৰ্দ্ধমাত্রা, যথা "সরা"। চারিটী সিকিমাত্রা, যথা "সরগমা"। দুটী সিকি মাত্রা, যথা "সরঃ"। একটী অৰ্দ্ধমাত্রা ও দুইটী সিকিমাত্রা মিলিয়া এক মাত্রা, যথা "সঃ গরঃ"। একটী দেড়মাত্রা ও একটী অৰ্দ্ধমাত্রা মিলিয়া দুইমাত্রা, যথা "রাঃ গঃ"।

৬। কোন আসল স্বরের পূর্ব্বে যদি কোন নিমেষকালস্থায়ী আনুসঙ্গীক স্বর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই স্বরটী ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়। সরা—গরা ; গমকের স্থলে প্রায়ই এইরূপ স্পর্শমাত্রিক স্বর লাগিয়া থাকে। আসল স্বরের পরে কখন কখন অন্য স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে ; তখন ঐ স্বর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয়—যথা "রাস"।

৭। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই। হাইফেন-বর্জ্জিত হইলে, এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা বিরামের মাত্রা বলিয়া জানিবেন। স্বরের ক্ষণিক নিস্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

৮। অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি। হয় এইখানে একেবারে থামিবে ; নয় এইখানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

৯। পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ অস্থায়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটী করিয়া "আই" বসে। কোন কলির শেষে II এই যুগল "আই" দেখিলেই অস্থায়ীর যেখানে এইরূপ যুগল "আই" আছে, সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

১০। পৌনরুক্তির চিহ্ন, এই { } গুম্ফ বন্ধনী ; এবং পৌনরুক্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন, এই ( ) বক্র বন্ধনী, যথা, { [illegible] (মা পা) ধা না }

[সা রা গা]।

১১। পুনরাবৃত্তি বা পৌনরুক্তিকালে কোন স্বরের পরিবর্ত্তন হইলে, শিরোদেশে ব্র্যাকেটের মধ্যে পরিবর্ত্তিত স্বরগুলি স্থাপিত হয় যথা, রা গা মা

—আনন্দ-সঙ্গীত-পত্রিকা।

৭ই জ্যৈষ্ঠ—

রেলে ফিরিঙ্গীদের বিশিষ্ট দাবীতে আশ্বাস। মিঃ লয়েড জর্জ্জের জেনোয়া হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন। তিহারাণস্থিত রুস দূতকে মস্কোয় ফিরিয়া যাইবার জন্ত রুস কর্ত্তৃপক্ষের হঠাৎ আহ্বান। ঢাকায় সের শাহের আমলের কামান বাহির; কামানের গায়ে বাঙ্গালা অক্ষরে ওজন লেখা—তিন মণ এগারো সের; নিম্ন বঙ্গের মোগল বহরের প্রধান সেনাপতি মানবার খাঁ কর্ত্তৃক মগ-যুদ্ধে ব্যবহৃত নওয়ারা কামানগুলির অন্ততম বলিয়া বিশ্বাস।

৮ই জ্যৈষ্ঠ—

ত্রিবাঙ্কুরে অনুন্নত এজ্রাভাগণের কংগ্রেস আন্দোলন, হিন্দু মন্দির-প্রবেশের অধিকারের দাবী। বর্ম্মা, সগাইনের নিকটবর্ত্তী ম্যাগিজিন গ্রামে ছয় বৎসরের বালকের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি; পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত অর্থ উদ্ধারের ব্যবস্থা; পুলিসের বাধা। কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপাল এলাকায় গো-বধ বন্ধ; মুসলমান কমিশনারদের একযোগে সম্মতি। পেনাঙ্গে প্রিন্স অব ওয়েলস্।

৯ই জ্যৈষ্ঠ—

বঙ্গীয় কংগ্রেসের ময়মনসিং অধিবেশনে কমিটীর সকল সদস্যের ও কার্য্যকারকদের স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইবার প্রস্তাব। আলিপুরের উকীল শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম, এল, সি, কলিকাতা করপোরেশনে অস্থায়ী ভাবে চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত; প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান। মোপলা হাঙ্গামায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দু-সমাজে গ্রহণে কোচিনের নম্বুদ্রি সভার সম্মতি-প্রদান। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরুর বাকী ৬৮৬।৵০ জরিমানা আদায়ের জন্ত আবার আনন্দ-ভবনে ক্রোকী পরোয়াণা; পনেরো শত টাকার অধিক মূল্যের জিনিষপত্র গ্রহণ; প্রথমবারে বারো শত টাকার দ্রব্যাদি ক্রোক করা হইয়াছিল। গৌহাটীতে ভূতপূর্ব্ব জেলার শ্রীযুত নীলকান্ত বর্ম্মা, তাঁহার বাড়ীর কেহ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবে না, এই মর্ম্মের প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় আসাম সরকারের আদেশে তাঁহার পেন্সন আটক।

১০ই জ্যৈষ্ঠ—

ময়মনসিংহে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে ব্যক্তিগত ভাবে কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অমান্তের অনুমতি; হাবড়া ও কলিকাতায় পিকেটিং চালাইবার জন্ত কমিটী নিয়োগ; লবণ ও চৌকীদারী টেক্স, বন-বিভাগের নিয়ম প্রভৃতি ছোটখাট বিধি-নিষেধ অমান্তের জন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেসের অনুমতি-প্রার্থনা। কাপ্তেন রস স্মিথের নির্দ্দিষ্ট পথে বিমানযোগে ভূপ্রদক্ষিণ করিবার জন্ত মেজর ডবলিউ টি ব্লেক প্রমুখ তিনজন বৈমানিকের বিলাত হইতে যাত্রা। রুস-ইটালীয়ান বাণিজ্য-সন্ধি স্বাক্ষরিত।

১১ই জ্যৈষ্ঠ—

কলিকাতায় কলেরার আধিক্যে করপোরেশনের অনুরোধে আবশ্যক ব্যবস্থা। মৌলানা হসরৎ মোহানী কর্ত্তৃক জেলে মূল্য দিয়া আহার্য্য-গ্রহণ কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের নিকট কলেজ ষ্ট্রীটের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে গুণ্ডার লাঠীবাজী; শা ওয়ালেসের [দরোয়ানের নিকট হইতে] পাঁচ হাজার টাকা উধাউ; মোটরে করিয়া গুণ্ডাদের প্রস্থান।

১২ই জ্যৈষ্ঠ—

ভাগলপুর জেলে মুসলমান বন্দীদের আজান নিষিদ্ধ; আদেশ অমান্য করিয়া দণ্ড-গ্রহণ। সাঁওতাল পরগণায় সরকারী রুদ্রনীতিতে বিহারের নেতা শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবরণ;—অসহযোগে সহানুভূতিতে দণ্ড, অসহযোগীকে আশ্রয় দেওয়ায় দণ্ড বা গ্রাম হইতে বিতাড়ন, জমি-জমা হইতে উচ্ছেদ, ১৪৪ ধারায় সভা বন্ধ, মহকুমায় প্রবেশ করিতে নিষেধ, কংগ্রেস আন্দোলনে বাধা, অসহযোগীর আগমন সংবাদ না দেওয়ায় দণ্ড, মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করায়, ঢোল দেওয়ায়, স্বরাজ পতাকা তোলায়, জাতীয় সপ্তাহ পালনে অনুরোধ করায় দণ্ড, আসামীকে প্রহার, প্রহারে অজ্ঞান ব্যক্তিকে জঙ্গলে নিক্ষেপ, আসামীর সকল সম্পত্তি ক্রোকে পরিবারবর্গ পথের ভিখারী, আসামীর জননীর হাজত, কংগ্রেস আফিসে অগ্নিপ্রদান, আফিস ভাঙ্গিয়া মাল-মশলা ক্রোক, জুয়ায় বাধা দেওয়ায় দণ্ড, আবগারীর ডাকে ১৪৪, তীর্থস্থানের স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ কাড়িয়া লওয়া। গুজরাট রাজনীতিক সভায় শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গন্ধীর অভিভাষণ—কাউন্সিলে যাওয়ার প্রতিবাদ। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেট-জেনারেল, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরলোক। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি উপাধির ব্যবস্থা।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ—

মাদ্রাজে টাকার অনাটনে হাইকোর্টে ব্যয়-হ্রাস; দুই জন বিচারপতি ছুটী লওয়ায় তাঁহাদের স্থানে নূতন অস্থায়ী লোক লওয়া বন্ধ। ত্রিপুরায় জলাভাব, স্থানে স্থানে সাত আট মাইলের মধ্যেও পানীয় জল পাওয়া যায় নাই; নোয়াখালীতে চর অঞ্চলে জলাভাবে গরু-মহিষের মৃত্যু; এ বি রেলের বহু ষ্টেশনে জলাভাব; লাকসাম ষ্টেশনে দুই আনা সের দরে জল বিক্রয়; আরও নানা স্থানে সের দরে পানীয় জল বিক্রয়। দক্ষিণ আয়ারলণ্ডে সিন-ফিনে ও স্থানীয় সরকারের আপোষে ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধি নষ্ট হইবার আশঙ্কায় লণ্ডনে সন্ধির স্বাক্ষরকারীদের পরামর্শ-সভা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য ও পণ্ডিত রাজেন্দ্রপ্রসাদের আসাম পরিভ্রমণ; তাঁহাদের গৌহাটী গমনে রেল ষ্টেশনে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ; ষ্টেশন পুলিসের দখলে, বিনা পাশে শোভাযাত্রা ও জনতা বন্ধ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ—

মেসোপটেমিয়ায় ফয়জুল সরকারের চরমপন্থী সদস্যদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী। উত্তরপাড়া হইতে আহিরীটোলা (বাগবাজার ঘাট) পর্য্যন্ত সন্তরণের প্রতিযোগিতা; আহিরীটোলা সুইমিং ক্লাবের শ্রীমান্ আশুতোষ দত্ত প্রথম স্থান অধিকার করেন; তিনি এক ঘণ্টা তেরো মিনিটে এই পথ (সাত মাইল) অতিক্রম করেন; প্রতিযোগীদের সংখ্যা ছিল ছয় জন। সালেম মিউনিসিপ্যালিটীতে মহিলা সদস্য গ্রহণের প্রস্তাব। শ্রীশ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মস্থান বসিরহাট মহকুমার শিকড়া গ্রামে স্বামীজীর মহাপ্রস্থান উপলক্ষে উৎসব।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ—

সম্মিলিত পক্ষের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থায় জার্ম্মাণ মন্ত্রি-সভার সম্মতি; ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সন্তোষ। আলষ্টারের সাহায্যার্থ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের রণতরী প্রেরণ। বিহারে কংগ্রেস প্রচারে মহিলা; মজঃফরপুরের পরলোকগত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লতিফ আলমের সহধর্ম্মিণী—বেগম লতিফ ও বেগম সফীর নানা সভায় বক্তৃতা। মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুত পি এস রঙ্গনাথ রাওয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা পি সুশীলা বাঈ বেল্লারি তালুক বোর্ডে মনোনীত সদস্যরূপে গৃহীত।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ—

ব্রহ্মে কাউন্সিল বয়কট সভায় তেইশ জন প্রধান সদস্যের নামে ১৪৪; সভা পুলিস আদেশে ছত্রভঙ্গ। বৃটিশ গায়না ডেপুটেশনের সদস্য দেওয়ান বাহাদুর পি কেশব পিলে কর্ত্তৃক অসহযোগ আন্দোলনের প্রশংসা; মহাত্মার অহিংস মন্ত্রের প্রভাবে মার্কিণের ভারতীয় বিদ্রোহীদের ক্ষমতা-হ্রাস। ব্রহ্মের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ, লাট সভায় মোট ১০১ জন সদস্য; তন্মধ্যে ৭৮ জন সাধারণের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—

ময়মনসিং, কিশোরগঞ্জে কোন তালুকদার কর্ত্তৃক অনাবৃষ্টির প্রতীকারের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ-ব্যাঙীর বিবাহ; বহু অর্থ ব্যয়; পলাতক কনে ব্যাঙের সন্ধানে প্রদীপের আগুনে অগ্নিকাণ্ড, বহু গৃহ ভস্মীভূত। আহিরীটোলার বালিকা বধূ-নির্য্যাতন মামলায় দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিঙ্গের রায়; বালিকার স্বামী নগেন ভাদুড়ীর দুই বৎসর এবং শাশুড়ী জ্ঞানদা ও ননদ প্রতিভার এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড। কেনিয়ার শাসন-পরিষদে শ্রীযুক্ত বামনবিষ্ণু ফাড়কে বে-সরকারী সদস্যরূপে গৃহীত কটকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নূতন ১৭ ধারার পরোয়াণা-বলে পণ্ডিত শ্রীযুত গোপবন্ধু দাস পুরীতে গ্রেপ্তার; পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে আরও দুইটি মামলা; হুকুমকে ১৪৪ ধারা অমান্য করিবার জন্য ১৮৮ ধারার অভিযোগ; কণিকা-রাজ্যের এক প্রজা কর্ত্তৃক মানহানির অভিযোগ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ—

শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন দাশের জরিমানা আদায় করিবার জন্য বৌবাজার ষ্ট্রীটে এক্সেলসাস কোম্পানীর আফিসে ক্রোকী পরোয়াণা; ১০০৷৷০ আদায়। ঝড়ের ফলে সমুদ্রের মাঝে অষ্ট্রেলিয়ান জাহাজ উইণ্টসায়ার টুক্-টুকরা; দুই দিন দুই রাত্রি পরে জাহাজের ভাসমান অংশবিশেষ হইতে নাবিকদের উদ্ধার। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার পার্থ বন্দরে শ্রীযুত শাস্ত্রীর উপস্থিতি ও অভিনন্দন; প্রবাসী ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ নিবেদন। কলিকাতায় জাহাজের মাল তুলিবার নামাইবার কার্য্যের ১৮ হাজার শ্রমিকের ধর্ম্মঘট।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ—

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন দাশ ও হেমন্তকুমার সরকারের মুক্তি। ময়মনসিং করটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলি খাঁ পণি ওরফে চাঁদ মিঞা সাহেব অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় উক্ত কারাগার হইতে তাঁহারও অব্যাহতি। ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আইরিশ প্রতিনিধিদের সন্তোষজনক উত্তরে লণ্ডনে পরামর্শ-সভায় সু-বাতাস। বদরীনাথের পথে বরফস্তূপ চাপা পড়িয়া প্রায় এক শত যাত্রীর মৃত্যু; অধিকাংশই বাঙ্গালী তীর্থ-যাত্রী। চৈনিক প্রেসিডেন্টের পদ-ত্যাগ; সেনাপতি উপেইফুর নূতন বিক্রমে যুদ্ধ। মিঃ ষ্টোকসকে লাহোর সেণ্ট্রাল জেল হইতে শিমলায় লইয়া যাইয়া মুক্তি প্রদান। চলন্ত ট্রেণ হইতে পড়িয়া যাওয়ায় বিলাতে পার্লামেণ্টের সদস্য ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় সিবিলিয়ান সার জন রীজের মৃত্যু। আলিপুরের সেণ্ট্রাল জেল হইতে মহাত্মা গন্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত হীরালাল গন্ধীর কারামুক্তি। মেবারে ভীলদের উপর সৈন্যদের এবং সৈন্যদের উপর ভীলদের গুলীবর্ষণ। আপত্তি-জনক বক্তৃতা দেওয়ায় মিরাটের কোন মোক্তারের বিপদ; কেন মোক্তা-রীর সনন্দ কাড়িয়া লওয়া হইবে না, তাহার কারণ-প্রদর্শনের অভিযোগ।

২০শে জ্যৈষ্ঠ—

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে রাসায়নিক রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, পণ্ডিত শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহামহোপাধ্যায় এবং প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত জলধর সেন ও নদীয়া কাহিনী প্রণেতা শ্রীযুত কুমুদনাথ মল্লিক রায় বাহাদুর হইয়াছেন। জেনোয়া হইতে রুস প্রতিনিধি এম চিচেরিনের প্রস্থান। গ্রীকদের প্রতি তুর্কীর অত্যাচারের তদন্তে মার্কিণের প্রতিনিধি পাঠাইতে সম্মতি। সিনফিন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আলষ্টারে সৈন্য-সমাবেশ।

২১শে জ্যৈষ্ঠ—

সামরিক আইনের স্মৃতিরক্ষার্থ কলম্বোর ইয়াং লঙ্কা লীগ কর্ত্তৃক 'জাতীয় দিবস' পালন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ—

উত্তর আয়ারলণ্ডে সিনফিনদের সহিত যুদ্ধ। লক্ষ্ণৌয়ে খেলাফৎ, জমি-য়ৎ উলেমা ও কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার অধিবেশন। হরিদ্বারে নিখিল ভারত সাধু মহামণ্ডলের অধিবেশন। মার্কিণ জাহাজে খাদ্য-শস্য প্রভৃতির অন্তরালে অস্ত্র-শস্ত্র; আইরিশ উপকূলের নিকটে আটক।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ—

রিশড়া ওয়েলিংটন পাটের কলের তিন শত নারী শ্রমিকের ধর্ম্মঘট। পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের বাটী ও তাঁহার সত্যবাদী আশ্রমে পুলিস। কণি-কার হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে আউল-রাজ গ্রেপ্তার। পণ্ডিত মতিলাল মেহেরুর কারামুক্তি। ইয়াং ইণ্ডিয়ার প্রকাশক দেশাই, মুদ্রাকর ভানশালী ও প্রেস-পরিচালক আনন্দানন্দ রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার। ফ্রান্সের জেদে জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ সমস্যা আরও জটিল; কমিশনের অধিবেশন স্থগিত। লক্ষ্ণৌ গোয়াবাগিকের দর্জীর দোকানের কোন চৌকী-দার হত্যার সম্পর্কে দুই জন সৈনিক গ্রেপ্তার। বড় লাটের সহিত শ্রীযুত এইচ এস্ এল পোলকের সাক্ষাৎ।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ—

রুসিয়ার সুধীমণ্ডলী নানা কারণে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে দারুণ কষ্টে রহি-য়াছেন; তাঁহাদের সাহায্য উদ্দেশ্যে অক্সফোর্ডের রুস অধ্যাপকের নিকট হইতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট আবেদন-পত্র। কলিকাতা বেনিয়া-টোলায় শ্রীযুত নন্দলাল নন্দী নামক এক ধনী ব্যবসায়ীর বাটীতে ডাকাতিতে

৩৫ হাজার টাকা লুণ্ঠিত। লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিতে বাঙ্গালার কোন প্রতিনিধি কর্তৃক ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আইন অমান্য প্রস্তাব ; ভোটে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত। জোড়হাট জেলে ২৭ জন সাধুর প্রায়োপবেশন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ—

কারাগারে মৌলানা আজাদের উদরাময়। ধনাসার চা-বাগানের কোন শ্রমিকের মৃত্যু সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার অভিযুক্ত। দুঃসংপ্রকাশে রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে "জনশক্তি"র অব্যাহতি। লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেসে পণ্ডিত মতিলাল কর্তৃক আইন অমান্য প্রস্তাব। পারস্যের নানা স্থানে যুদ্ধবিগ্রহের সংবাদ। আইরিশ সমস্যায় আশার আলোক ; আইরিশ সরকার ইঙ্গ আইরিশ সন্ধি-সর্ত্ত বজায় রাখিবেন। দিনাজপুরে বালিকা বধূ নিগ্রহের মামলা।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ—

মালিগাঁও হাঙ্গামার বিবরণ সম্পর্কে "বোম্বাই ক্রনিকেল" অভিযুক্ত। প্রসিদ্ধ এটর্ণী সতীশচন্দ্রপাল চৌধুরীর পরলোক। লক্ষ্ণৌয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সংশোধনে নূতন আইন অমান্য প্রস্তাব ; ১৫ই আগষ্টের মধ্যে দেশবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আইন অমান্য সম্বন্ধে পুনরালোচনার সঙ্কল্প। লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত খেলাফৎ কমিটীতেও কংগ্রেসের অনুরূপ প্রস্তাব।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ—

"কংগ্রেস প্রসঙ্গ ২ নং" শীর্ষক বোম্বায়ের কোহিনুর বায়স্কোপ কোম্পানীর চলৎ-চিত্র বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক প্রদর্শনে আপত্তি। লক্ষ্ণৌ সেণ্ট্রাল জেলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র-সন্দর্শনে এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পুত্র-দর্শনে আপত্তি। মিশরে যুবরাজ প্রিন্স-অব-ওয়েলস্। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক আইন অমান্য তদন্ত কমিটী গঠিত।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—

সারণের বন্যার বিবরণ সম্পর্কে পাটনার সার্চ্চ লাইটের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা। জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ সমস্যায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য ; ইংলণ্ড জার্ম্মাণীকে সুবিধা দিবার পক্ষে। পারস্যের রেষ্ট সহরে বলশেভিক রক্ত পতাকা উত্তোলন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ—

ইঞ্চকেপ কমিটীর (ভারত সরকার সংক্রান্ত) সদস্য-ব্যবস্থা ; তিন জন য়ুরোপীয়, তিন জন ভারতীয়। স্মার্ণায় গ্রীক অত্যাচারের তদন্তে মিত্র-শক্তির পূর্ব্বতন কমিটীর বিবরণ ; গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ। রাজদ্রোহের অভিযোগে ইয়াং ইণ্ডিয়ার সম্পাদক সায়েব কোরেশী গ্রেপ্তার। ব্রহ্মের শাসন-সংস্কারে বিলাতে মহাসভার সম্মতি ; আমেদাবাদে গুজরাট বিদ্যাপীঠের উপাধি-বিতরণ, সভা খদ্দর-মণ্ডিত, সনন্দ খদ্দর-রচিত। জোড়াবাগান আদালতের অসহযোগী উকীল কেদারেশ্বর গাঙ্গুলীর কারামুক্তি। কলিকাতা করপোরেশনের কোন ষ্টোর-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে ঘুষ লওয়ার অভিযোগ ; বে-সরকারী চেয়ারম্যান ও জেনারেল কমিটীর দুই জন সদস্য কর্তৃক ষ্টোর-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ধৃত।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ—

মহীশূর রাজ্যে সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ। কলিকাতা বন্দরে ৩০ হাজার ভারতীয় নাবিকের ধর্ম্মঘট। বলশেভিকদের তৃতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশনে প্রকাশ, ভারতে অসহযোগীদের সাহায্যার্থ রুসিয়া ৭০ লক্ষ স্বর্ণ রুবল ব্যয় করিয়াছে। ভারতবাসীর পক্ষপাতী খৃষ্টান পাদরীর অষ্ট্রেলিয়া-প্রবেশে আপত্তি। জার্ম্মাণ সৈন্যদলে রাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ ; সরকারী আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গের নায়কতায় ট্যানেনবার্গের বিজয়-স্মৃতি উৎসবে যোগদান ; প্রতিপক্ষ দলের সহিত সংঘর্ষ। কলিকাতায় হসরৎ মহম্মদের বংশধরের লোকান্তর।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ—

পঞ্জাব মেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত রেল কর্ম্মচারী চার জনের পরিবারবর্গের নিমিত্ত বে-সরকারী সাহায্য ; ড্রাইভার কুপারের পরিবার ২৫ হাজার টাকা, এম রাজাকের ৪ হাজার, ঘুরা খাঁর ৪ হাজার ও রাজাকের ৫ হাজার—মোট ৩৭ হাজার টাকা। মুলসীপেটায় টাটা কারখানার জন্য ৫৪খানি গ্রামের ১২হাজার অধিবাসীর গৃহ-চ্যুতির সম্ভাবনা। বেলিয়াঘাটা ডাকাতি সম্পর্কে সম্ভ্রান্ত ঘরের তিনজন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার দক্ষিণ আইরিশ সরকার ও সিনফিনদের সম্মিলিত শাসনতন্ত্রের জন্য পারলামেন্টের নূতন নির্ব্বাচনে বিভ্রাট ; সিনফিনদের অত্যাচারের অভিযোগ ক্ষতিপূরণে জার্ম্মাণীর দাবী—অধিকৃত স্থানগুলি ফিরাইয়া দাও,রপ্তানী শস্যে শুল্কের পরিমাণ কমাও, তাহা হইলে দেনা পরিশোধ করিতে পারিব চট্টগ্রামের চকরিয়া, কক্সবাজার ও রামু থানায় অতিরিক্ত পুলিস ; পুনঃ আর দুই থানায় বসিয়াছিল। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীতে গো-বধ নিবারণ প্রস্তাব লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ; জন-সভায় মীমাংসা চেষ্টা ; প্রস্তাব কর্ত্তার প্রস্তাব প্রত্যাহারের আশ্বাস।

১লা আষাঢ়—

মালাবারে বিদ্রোহ-পূর্ণ অঞ্চলে ছয়টি বে-তার টেলিগ্রাফ স্থাপনে ব্যবস্থা। পণ্ডিত মতিলালের অর্থ-দণ্ড বাজেয়াপ্ত। রুশ-সমস্যার আলোচনায় হেগে রাজনৈতিক সম্মেলন। বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় ১৪ জন মহিলার কৃতিত্ব ; ভারতীয়া এক জন—মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজী। স্কেলার-শিপ পরীক্ষায় চার জন ভারতীয় ছাত্রের সাফল্য। ইয়াং ইণ্ডিয়া সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রকাশক ও প্রেস-পরিচালকের দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। কলিকাতায় আর এক বালিকা বধূ নিগ্রহের অভিযোগ। বিলাতে মহাসভায় সহকারী ভারত-সচিবের মুখে সংস্কার ব্যবস্থার সমর্থন ; সংস্কারে অসন্তুষ্ট অসহযোগী এবং উহার তিরোধানকামী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া—উভয়ে ভ্রান্ত। কৃষ্ণসাগরের উপকূলে অরক্ষিত তুর্ক বন্দর সামসানে গ্রীকদের গোলাবর্ষণ। তার-হীন টেলিফোঁর আবিষ্কার সংবাদ।

২রা আষাঢ়—

পুরীধামে পাণ্ডাদের অনুরোধ, দেবসেবায় বিদেশী বস্ত্র বা দ্রব্য দিবে না। মান্দ্রাজ সরকারের পুলিসের ব্যয় তিরানব্বই হাজার টাকা কমাইয়া দিবার আশ্বাস। এলাহাবাদে পণ্ডিত শ্যামলাল ও মোহনলাল নেহেরুর কারামুক্তি।

৩রা আষাঢ়—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তৈলচিত্র উন্মোচন। বিনা টিকিটে ভ্রমণ করার অভিযোগে কয় দিনে বোম্বায়ে ৪০ জন গ্রেপ্তার, ভাড়া দিয়া অনেকের অব্যাহতি। সিনেট সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা স্থির।

৪ঠা আষাঢ়—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে স্বর্গীয় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অর্দ্ধমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। কলিকাতায় সংবাদপত্র-সেবক সমিতির প্রথম অধিবেশন। কটন ষ্ট্রীটে জল খেলায় ২৩ জন মাড়োয়ারী গ্রেপ্তার। তুর্কীস্থানে দুই জন ইংরাজ রাজপুরুষ নিহত।

৫ই আষাঢ়—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ওয়াজিরীস্থান অঞ্চলে সামরিক ব্যয় ৪০ লক্ষ টাকা হ্রাসের সম্ভাবনা। সেন-চিয়াং-মিং ও সান্ ইয়াট-সেনের সৈন্যগণের ক্যাণ্টনে যুদ্ধ, যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থা। জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বৃটিশ ও ফ্রান্সের আপোষ, কমিশনে আর্থিক অবস্থার তদন্ত-ব্যবস্থা; আপাততঃ জার্ম্মাণীর সুবিধা।

৬ই আষাঢ়—

ইন্দোর-রাজ হোলকারের অভিযোগে কলিকাতার শেঠ দুলীচাঁদের বিরুদ্ধে চার লাক টাকা ডিক্রী। "অসমীয়ার" মানহানি মামলায় সম্পাদকের এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড; মুদ্রাকরের দেড় শত টাকা অর্থদণ্ড বা এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। প্রিন্স অব ওয়েলসকে লইয়া "রিনাউনের" প্লিমাউথে উপস্থিতি। আলষ্টারের নানা কারাগারের রাজনীতিক আসামীদের জল-বিহারের বন্দোবস্ত; জাহাজে পুস্তক পাঠ, তাস ও দাবা খেলার ব্যবস্থা।

৭ই আষাঢ়—

বিলাতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য-রক্ষার উদ্দেশ্যে বড় বড় পার্কে খোলা জায়গায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এঙ্গোরার সাহায্যে আরও পাঁচ হাজার পাউণ্ড প্রেরণ, ইতিপূর্ব্বে নব্বই হাজার প্রেরিত হইয়াছে। মেছুয়াবাজারের নিকটে পুলিস-কনেষ্টবলকে খুন করায় সেখ হিঙ্গুর ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

৮ই আষাঢ়—

রেঙ্গুন জেটীর বিরাট চাউল চুরীর মামলায় পোর্ট-কমিশনারদের কর্ম্মচারী ও পুলিসের কতিপয় কর্ত্তার বিরুদ্ধে 'কমিশন' পাওয়ার অভিযোগ। সরকারী তুর্কী সাহায্য ভাণ্ডারে বেলুচিস্থানের মুসলমানদের পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য। জার্ম্মাণীতে মোটরশূন্য এরোপ্লেন তৈয়ারী, ঐরূপ উৎকৃষ্ট এরোপ্লেনের জন্য লক্ষ মার্ক পুরস্কার ঘোষণা। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের বিখ্যাত বৃটিশ সেনাপতি ফীল্ড মার্শাল সার হেনরী উইলসন লণ্ডনে গুপ্ত-ঘাতকের গুলীতে নিহত। খুলনার দায়রায় পুত্রঘাতী জননীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের ব্যবস্থা। পঞ্জাবে সরকারী আদেশ;—সরকারী কর্ম্মচারীদের উপহার দেওয়া নিষিদ্ধ। অতিবৃষ্টিতে তারকেশ্বর (ই আই) ও বি পি রেল অচল। লর্ড সিংহ বিলাতে বিশেষ অসুস্থ। গন্ধেশ্বরীর বন্যায় বাঁকুড়ার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সম্পূর্ণ বাড়ীটি নদীর কুক্ষিগত; দ্বারকেশ্বরের বন্যায় বাঁকুড়ার ওন্দা থানা এবং আরামবাগে বালী দেওয়ানগঞ্জ থানা বিপন্ন; অনেক স্থানে গরু মহিষের প্রাণহানি; শস্য নষ্ট; বিস্তর ঘর-বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে।

৯ই আষাঢ়—

রাজনীতিক আসামীর অপমানকারী যশোহরের হাবিলদার জবা খাঁর হাইকোর্টে দণ্ড-হ্রাস; ৩ মাস হইতে ২৫ টাকা অর্থদণ্ড। ১৪৪ ধারা অমান্যে মাদ্রাজ তিরুমঙ্গলে নিত্যানন্দ স্বামী নামে এক সন্ন্যাসীর দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড। প্রবল বন্যায় বাঁকুড়া দামোদর রেলের লোহার পুল ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। বন্যায় আমতা রেলের চাঁপাডাঙ্গা শাখাতেও রেলপথ ভাঙ্গিয়াছে। মিশরের মহিলা সমাজের বিলাতী বয়কটে দৃঢ় পণ। গোরক্ষপুরে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী কর্ত্তৃক ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য। মারকনি কর্ত্তৃক তারহীন সার্চলাইট আবিষ্কারের সংবাদ। মার্কিণে নিউইয়র্ক সহরে শান্তি স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প; সৌধবাটিকায় কয়েকটি ক্লাব, জল, বল নাচের হল, আফিস ঘর, ষ্টুডিও, কনসার্ট হল, সঙ্গীতালয়, শিল্প ভাস্কর্য্য প্রদর্শনী কক্ষ ও সঙ্গীত-যন্ত্রাদির কক্ষ থাকিবে। রেলের পুল ধ্বংসে রঘুনাথপুরের নিকটে বি, এন, ডবলিউ রেলের একখানি যাত্রী গাড়ীর খানিক অংশ নদীগর্ভে পতিত।

১০ই আষাঢ়—

সুকবি ও সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোক। কলিকাতায় নাবিক ধর্ম্মঘটের অবসান। অস্পৃশ্যতা পরিহারে মুলতানের অসহযোগিগণের মেথর ঝাড়ুদার প্রভৃতির সহিত পংক্তিভোজন। পিলভিত সহরে পণ্ডিত হরকরণ নাথ মিশ্রের সভায় বাধা। জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব হার র‍্যাথেনো আততায়ীর গুলীতে নিহত। গোরক্ষপুরে পণ্ডিত মতিলালের বক্তৃতায় আপত্তি; সভাস্থল ঘেরাও। সাইবেরিয়া হইতে জাপানের সৈন্য সরাইয়া লইবার সঙ্কল্প।

১১ই আষাঢ়—

ইটালীর পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তশত সাংবাৎসরিক উৎসবে সমগ্র পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণের সমাগম; ইটালীরাজ কর্ত্তৃক উৎসবের উদ্বোধন; প্রথম অভিনন্দন পাঠের সম্মান—সংস্কৃত ভাষায়, ডাক্তার সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের।

১২ই আষাঢ়—

রঙ্গপুরে পিকেটিংয়ের অপরাধে বারো বৎসরের বালক নরেন্দ্রমাধব রায়ের ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড; ইতিপূর্ব্বে আর কয়বার বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। বরোদায় দ্বিতীয় দেবী চৌধুরাণীর দল; দিনের বেলা ডাকাতি, ডাকাতির বস্ত্রাদি পথে গরীবদের মধ্যে বিতরণ। লণ্ডনে ফীল্ড মার্শাল সার হেনরী উইলসনের সসমারোহে সমাধি; মহা-সভায় স্বরাষ্ট্র সচিবের উক্তি, হত্যা রাজনৈতিক কারণে নহে। সিন্ধু দেশের "হিন্দু"র পঞ্চম সম্পাদকেরও প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ। পটুয়াখালীর কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনের কারাগারে প্রায়োপবেশনে (৫এ দিন সপ্তদশ দিবস) তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য পটুয়াখালীর অধিবাসীদের প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প।

১৩ই আষাঢ়—

গৌরীশঙ্কর অভিযানের বৈমানিকরা ২৭ হাজার ৩ শত ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত উঠিয়া জলবায়ুর গোলযোগে অবতরণ করেন। জেনোয়ার শ্রমিক কন্‌ফারেন্সে নিখিল-ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে শ্রীযুত এন, এম যোশীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা। "দেশের ডাক" পুস্তকের জন্য সরস্বতী লাইব্রেরী ও একটি মেসে খানাতল্লাস; প্রকাশক ও মুদ্রাকর গ্রেপ্তার। বৃটিশ গবর্মেণ্টের তাগাদায় দক্ষিণ আয়ারলণ্ডের সরকার কর্ত্তৃক অত্যাচার অনাচার দমনের সঙ্কল্প।

১৪ই আষাঢ়—

বোম্বাই হাইকোর্টে মৌলনা হসরৎ মোহানীর ১২১ ক ধারায় মামলা; দুই ঘণ্টায় বিচার শেষ। ভারত সরকারের আইন সদস্য ডাক্তার তেজ বাহাদুর সপ্রুর স্বাস্থ্যের অজুহাতে পদত্যাগের সঙ্কল্প। "সার্ভেণ্টের" জামানতের দুই হাজার টাকা ফেরৎ। "দেশের ডাকের" গ্রন্থকার পাবনায় গ্রেপ্তার। ডাবলিনের বিচারালয় হইতে সিনফিনদের বিতাড়িত করিবার জন্য স্থানীয় সরকার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ। কাউলার হল নামক স্মৃতি-মন্দির হইতে সিনফিনদের বিতাড়িত করিবার জন্য ফ্রী-ষ্টেটের সৈন্যদের গোলাবর্ষণে হলটি অগ্নিমুখে। ভোলায় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষের প্রতি ১৪৪; মুখবন্ধের আদেশ; প্রতিবাদে শরৎকুমারের প্রায়োপবেশন আরম্ভ।

১৫ই আষাঢ়—

কলিকাতা বড়বাজারে পিকেটিং করিবার জন্য এক শত সাধুর সঙ্কল্প। ডাবলিনে সরকার পক্ষ কর্ত্তৃক আদালত অধিকার। কাউলার হল হইতে বিতাড়িত সিনফিনদের ডাবলিন সহরে গরিলা-যুদ্ধ। টাউনহলটি সিনফিনদের দখলে।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক মেসিন যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশবন্ধু শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ
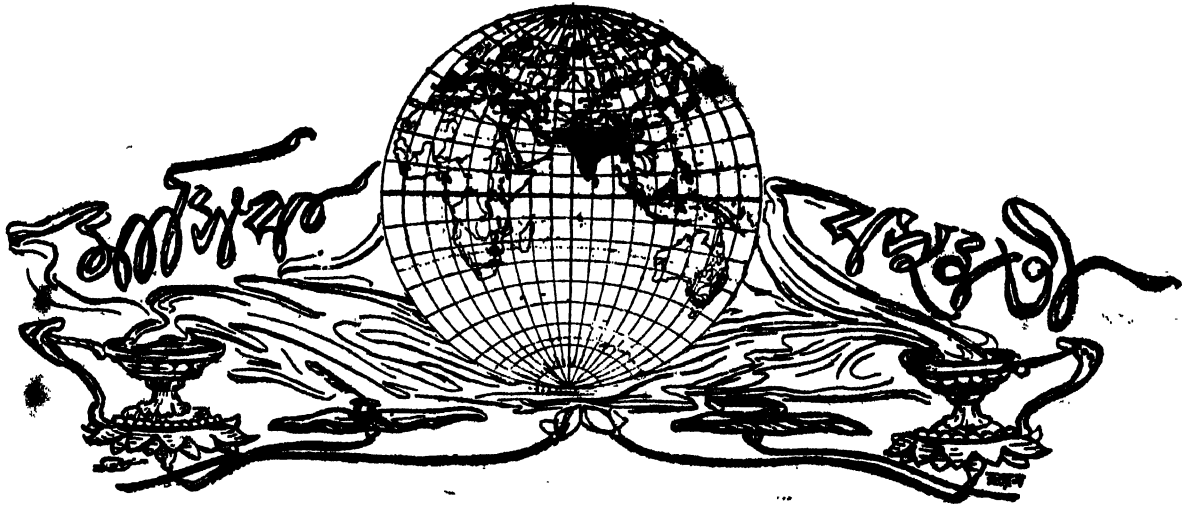
১ম বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩২৯ { ৪র্থ সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্র।

আজ আটাশ বৎসর দুই মাস নয় দিন হইল বঙ্কিমবাবু স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পঁচিশ বৎসরে এক পুরুষ ধরিলে আমরা দ্বিতীয় পুরুষে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছাব্বিশ বৎসর বৈধব্য-দুঃখ সহ্য করিয়া দুই বৎসর হইল স্বর্গে গিয়া স্বামীর সহিত মিলিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর ভাই শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহার দৌহিত্রেরা ও তাঁহার ভাইপোরা অনেকে জীবিত আছেন এবং যথাশক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত একযোগে 'বঙ্গদর্শন' চালাইয়াছিলেন ও বাঙ্গালা ভাষার সেবার জন্য একটা মজলিস্ তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র গিয়াছেন,

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অক্ষয়বাবু গিয়াছেন, রাজকৃষ্ণবাবু গিয়াছেন, [illegible]নাথবাবু গিয়াছেন, হেমবাবু গিয়াছেন, যোগেন্দ্রবাবু গিয়াছেন, ঈশানবাবু গিয়াছেন, রামদাস সেন গিয়াছেন, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় গিয়াছেন, লালমোহন বিদ্যানিধি গিয়াছেন, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়াছেন, জগদীশনাথ রায় গিয়াছেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়াছেন, আরও অনেকে গিয়াছেন। থাকিবার মধ্যে আছেন, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, আর আছি আমি। চন্দ্রশেখরবাবু অথর্ব্ব হইয়াছেন, আমি এখনও সাম্-ঋক্-যজুর মধ্যে আছি বোধ হয়। এখনও আর কতদিন এইরূপ থাকিব, তাহা বলিতে পারি না।

বঙ্কিমবাবুর কাঁটালপাড়ার বাড়ীর আর সে শ্রী নাই।

অধিকাংশ জমীই রেলওয়ে গ্রাস করিয়াছে; সবই গ্রাস করিত, কেবল রায় শ্রীযুক্ত বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের (Land Acquisition Deputy-Collector) চেষ্টায় বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা-সংলগ্ন শিবমন্দিরটি রক্ষা পাইয়াছে। আর লর্ড কার্জ্জন বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানাটি লইতে দেন নাই। লর্ড কার্জ্জন কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাড়ীতে মর্ম্মর-ফলক লাগাইয়া দিয়াছেন। তিনি যে বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানাটি নষ্ট করিতে দেন নাই, ইহাতে আর বিচিত্র কি? এখন শুনিতে পাইতেছি, রাস্তার উত্তরে বঙ্কিমবাবুর বাড়ী, পূজার দালান, এমন কি, ৺রাধাবল্লভের মন্দির পর্য্যন্ত রেলওয়েসাৎ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে বঙ্কিমবাবুর শিবমন্দির ও বৈঠকখানা মাত্র—অতীতের সাক্ষ্য দিবে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় মারবেল ফলক লাগাইয়া, উহা যে পুরাতন কীর্ত্তি, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং উহা যে চিরস্থায়ী হইবে, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এই মারবেল ফলক-প্রতিষ্ঠার সময় চারি বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার অনেক মান্যগণ্য লোক, অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী কাঁটালপাড়ায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই যাহাতে কলিকাতায় বঙ্কিমবাবুর মারবেল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার চেষ্টা করেন এবং সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়কে মুখপাত্র করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে এক সভা আহ্বান করেন। সে সভা ও তাহার কমিটীর রিপোর্ট আপনারা সম্পাদকের নিকট পাইয়াছেন। এখন আমাদিগকে এই মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাঁহার গুণগান করা চিরকালের রীতি। কিন্তু এই আটাশ বৎসরে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার কাব্যের সমালোচনা অনেকবার হইয়াছে;—একবার গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় করিয়াছেন, একবার পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় করিয়াছেন, আর একবার এখন প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয় করিয়াছেন। তাঁহার ভাইপো শচীশবাবু তাঁহার জীবন-চরিত লিখিয়াছেন; বঙ্কিমবাবুর জীবন সম্বন্ধে টুকিটাকি খবরও অনেক দিয়াছেন। এই সকল টুকিটাকি খবর জানিবার জন্য লোকের আগ্রহ অত্যন্ত অধিক, তাই অনেকে সেই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন ও প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং নূতন কথা যে অধিক বলিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এরূপ ক্ষেত্রে একটু

সমালোচনার লোভও ছাড়িতে পারিতেছি না, একটু তুলনার লোভও ছাড়িতে পারিতেছি না, টুকিটাকি দুই চারিটি খবর দিবার লোভও ছাড়িতে পারিতেছি না।

বঙ্কিমবাবু কলিকাতা ইউনিভারসিটীর প্রথম বি,এ। তাঁহার পড়াশুনা যথেষ্ট ছিল, ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস তাঁহার যথেষ্ট পড়া ছিল। ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণির নিকট তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য পড়িয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয় কাব্য পড়াইতে গিয়া কেবল ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের খুঁটি-নাটি লইয়া

অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

থাকিতেন না। কাব্য, রস, সৌন্দর্য্য বিষয়ে তাঁহার বেশ দৃষ্টি ছিল। বঙ্কিমবাবু তাঁহার কাছ হইতে এ সব বিষয়ে বেশ একটু উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং সে উপদেশের মত কিছু কিছু কাযও করিয়াছিলেন। সংস্কৃত প্রাচীন কাব্যের ভাবটা তাঁহার বইয়ে যতটা পাওয়া যায়, এখনকার বইয়ে ততটা পাওয়া যায় না। তিনি সংস্কৃত কাব্যের অনেকগুলি সমালোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার কাব্যের গণ্ডী কিন্তু বাঙ্গালায় আবদ্ধ নহে; হিন্দু জাতিতে আবদ্ধ নহে; তাঁহার কাব্যে বইয়ে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, ইংরাজ সব জাতিই আছে; তাঁহার কাব্যের ক্ষেত্রও ভারতময়। তিনি লিখিতেন বাঙ্গালায়, কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের কবি হইবেন, সব জাতির কবি হইবেন। বঙ্কিমবাবু যে সময় লিখিতে আরম্ভ করেন, সে সময় দেশ-ভক্তি বলিয়া জিনিষ জাগিয়া উঠে নাই। সেটার

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগরণ ক্রমে ক্রমে হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু যখন মরেন, তখনও "ভারত ঘুমাইয়া"; কেবলমাত্র জাগরণের উদ্যোগ হইতেছিল। তাঁহার প্রধান চেলা অক্ষয়বাবু কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে একেবারে যাইতে চাহিতেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙ্গালাকে ভাল করিয়া চেনা। তাই তিনি খুঁটি-নাটি করিয়া বাঙ্গালার সব জিনিষ দেখিতে চাহিতেন। বঙ্কিমবাবু খুঁটি-নাটি করিয়া দেখিতে চাহিতেন না। তিনি বড় বড় জিনিষগুলিই দেখিতেন; ভাল ও বড় জিনিষগুলিই দেখিতে চাহিতেন, বাছিয়া লইতেন। তাই তাঁহার বইয়ে দুঃখী গরীবের স্থান নাই; যাহারা খেটে খায়, তাহাদের স্থান নাই। তাঁহার সকল নায়ক-নায়িকাই বড়মানুষ। অভাবের তাড়নায় তাহারা ক্লেশ পায় না। তাহাদের যাহা ক্লেশ, তাহা কেবল প্রেমের তাড়নায়। এই তাড়নাটা বঙ্কিমবাবুর সকল বইয়েই খুব। দুই পুরুষ এক মেয়েকে ভালবাসে বা এক পুরুষকে দুই মেয়ে ভালবাসে, এই তাঁর গল্পের মূলমন্ত্র। কিন্তু ইহারই মধ্যে তিনি এত বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কখনও একঘেয়ে হয় নাই, দু'টি গল্পও কোনমতেই এক নহে। ভাবের, ভাষার ও ঘটনার বৈচিত্র্য সব কয়টিতেই আছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একখানা বইয়ে দুইটি গল্প মিলাইবার চেষ্টা তিনি মাত্র দুইবার করিয়াছেন। একবার বিষবৃক্ষে, আর একবার চন্দ্রশেখরে। বিষবৃক্ষে তিনি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। দুইটি গল্প এমন ভাবে মিলাইয়াছেন যে, তাহাদের তফাৎ করিবার উপায় নাই। কবি—বিশেষ উপন্যাস-লেখকের পক্ষে এটি বড় শক্ত 'কর্ত্তপ।' এই কর্ত্তপে সিদ্ধিলাভ করা অল্প প্রতিভার কর্ম্ম নহে। চন্দ্রশেখরে কিন্তু বঙ্কিমবাবুর এই সিদ্ধিলাভ হয় নাই, দুইটি গল্প বেশ তফাৎ হইয়াছে। একটু চেষ্টা করিলেই দুইখানি বই করিয়া ছাপান যায়। কিন্তু চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমবাবুর কল্পনার দৌড় সকলের চেয়ে বেশী। শৈবলিনীর স্বপ্নের মত প্রকাণ্ড জিনিষ বাঙ্গালায় আর নাই।

গোড়ায় গোড়ায় বঙ্কিমবাবু কেবল কাব্যাংশ দেখিতেন, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি দেখিতেন, কাব্যকলার বিকাশ দেখিতেন, রস-সৃষ্টি দেখিতেন, আর কিছুই দেখিতেন না। তাই কাব্যাংশে তাঁহার প্রথম বইগুলি ভাল হইয়াছিল। প্রথমখানির অপেক্ষা দ্বিতীয়খানি ভাল, দ্বিতীয়খানির চেয়ে তৃতীয়খানি ভাল, এইরূপে তিনি কৃষ্ণকান্তের উইলে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাহার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল, কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু ধর্ম্ম-প্রচার, একটু দেশ-ভক্তির প্রচার। এ বিষয়ে দুইটি মত আছে। এক দল বলেন, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হইলেই তাহারই নাম ধর্ম্ম-প্রচার, তাহারই নাম দেশ-ভক্তি-প্রচার। কারণ, উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য, উৎকৃষ্ট দেশ-ভক্তি, তিনই এক জিনিষ। আর এক দল বলেন, "না, উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট দেশ-ভক্তি, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য, এক জিনিষ নয়; সুতরাং উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যে ধর্ম্ম বা দেশ-ভক্তি না দিলে, শুধু সৌন্দর্য্যে ধর্ম্ম বা দেশ-ভক্তি প্রচার হয় না।" এখানেও দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুই বাদই আছে। বঙ্কিমবাবু দ্বৈতবাদী হইলেন। তাঁহার চেলাদের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাঁহারা তাহাতে মত দিলেন না। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, এই সময়কার দ্বৈতবাদের বই। এই বইগুলিতে বঙ্কিমবাবুর কল্পনার যথেষ্ট খেলা আছে। আর এইগুলিই দেশের মধ্যে অধিক[illegible] হইয়া উঠিয়াছে এবং এগুলির ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালার গণ্ডীর মধ্যে। এইগুলির জন্য লোক তাঁহাকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে করে। এইরূপে যখনই দেখিয়াছি, বঙ্কিমবাবু চেলাদের সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া "আমার খুনী আমি করিব, তোমাদের ইচ্ছা হয় পড়িও না" এই বলিয়া আপনার গোঁএ চলিয়াছেন, সেই সকল জায়গায় দেশের লোক তাঁহাকে অধিক প্রশংসা

করিয়াছেন। ইহাতে বেশ বোধ হয়, বঙ্কিমবাবু তাঁহার চেলাদের চেয়ে দেশের মতিগতি ঢের বেশী বুঝিতেন। তিনি 'বন্দে মাতরম্' গান লিখিয়া যে দিন সকলকে শুনাইলেন, সকলেই আপত্তি করিল; কেহ ভাষার আপত্তি করিল, কেহ ভাবের আপত্তি করিল, কেহ বলিল কটমট হইয়াছে, কেহ বলিল বাঙ্গালায় সংস্কৃতে মিশিয়া একটা অদ্ভুত জিনিষ হইয়াছে, কেহ বলিল বিটকেল হইয়াছে, কেহ বলিল মলয়জ-শীতলাং শী-এর ঈকারের জন্য শ্রুতিকটু হইয়াছে; কিন্তু বঙ্কিমবাবু কাহারও কথা শুনিলেন না, আপনার গোঁএ উহা ছাপাইয়া দিলেন। এখন ত সমস্ত ভারতবাসীর সেইটাই মূলমন্ত্র হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, বঙ্কিমবাবুর এমন একটা কিছু ছিল, যাহাতে তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন এবং যাহা তাঁহার চেলাদের ছিল না। এইটেই তাঁহার বিশেষত্ব, এইটেই তাঁহার প্রতিভা। তিনি দেশকাল-পাত্র বুঝিতেন, চেলারা বুঝিত না। যিনি যেমন দেবতা, তাঁহাকে তেমন বাহন ও ভূষণ দিতে হয়, এটা তাঁহারা জানিতেন না; বঙ্কিমবাবু জানিতেন। অনেক লিখিয়া তাঁহার সে আক্কেলটুকু হইয়াছিল।

এইরূপ মূলতত্ত্ব বিষয়ে আসল সমস্যায় ঘোর মতভেদ থাকিলেও, বঙ্কিমবাবুর এমন একটা আকর্ষণ ছিল যে, বঙ্কিমবাবুর অন্তরঙ্গমণ্ডলীর মধ্যে কেহ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া যাইত না। আমার সঙ্গে তাঁহার দুই তিনবার ঘোরতর মতভেদ হইয়াছিল, এমন কি, তাহার জন্য আমাকে কিছু দিন বাঙ্গালা লেখা ছাড়িতেও হইয়াছিল। আর একবার অন্য কারণে একটু বিবাদ হওয়ায় আমি চারি পাঁচ মাস বঙ্কিমবাবুর বাড়ী যাই নাই। এ কারণটা সাহিত্য-ঘটিত নহে, আমাদের দেশীয় কোন ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটি বঙ্কিমবাবু জানিতেন আর আমি জানিতাম। অন্য লোক ইহার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই টের পায় নাই। "তুমি যাও না কেন," কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিতাম, "এই শীঘ্রই যাইব," বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"বিশেষ কাযকর্ম্ম আছে। আসিতে পারিতেছে না।" কিন্তু এক আশ্চর্য্য উপায়ে অন্যে কিছু জানিবার পূর্ব্বেই আমাদের সেই বিবাদ মিটিয়া গেল। আমি সেই টুকিটাকি গল্পটি আজই বলিব, আপনারা বিরক্ত হইবেন না। কেহ জানে না, সুতরাং নূতন কথা, তাই বলিতেছি। আমি একদিন আপিসে বসিয়া কায করিতেছি, পিছনদিক্ হইতে একখানা লম্বা সাদা হাতে একটি চৌকো খামে চিঠি আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। পিছন ফিরিয়া দেখি "সাহেবটি" আমার চেয়ে একহাত উঁচু, বেশ লম্বা চোড়া মুখখানা, ইংরাজের মত নয়, ফ্রেঞ্চের মত নয়, জার্ম্মাণের মত নয়, আর ভয়ানক রাঙ্গা। চাহিয়া দেখিলাম, সম্পূর্ণ অপরিচিত। চিঠিখানা আমাদের মহামান্য অধ্যাপক টনি সাহেবের হাতের লেখা। সাহেবকে চিনিতে পারিয়া চিঠি খুলিলাম। পড়িয়াই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া গেল। টনি সাহেব সেণ্টপিটার্শবর্গের অধ্যাপক মিনায়েফ্‌কে আমার কাছে পাঠাইয়াছেন; অনুরোধ করিয়াছেন, ইনি যাহা চান, করিয়া দিবে। পড়িবার সময় প্রফেসর মিনায়েফ্‌কে একবার দেখিয়াছিলাম; সে এই ঘটনার প্রায় ষোল সতর বৎসর আগে। তখন তিনি রোগা ছিপছিপে ছিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সেই দিন হইতে তিনি সর্ব্বদা আমার বাসায় আসিতেন; আমিও সময় সময় তাঁহার হোটেলে যাইতাম। আফিসে কাযকর্ম্ম কিছু ছিল না; প্রায় সমস্ত দিনই তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আমি তখন একটু একটু পালী ও সিংহলী শিখিতেছিলাম। পালীতে তখন তিনি ইউরোপের প্রধান, তার উপর সংস্কৃত জানিতেন, বেশ বাঙ্গালাও জানিতেন, অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়'

তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তাঁহার সব কথা বলার দরকার নাই। একদিন তিনি হঠাৎ বলিলেন, আমায় জনকতক বড় বড় বাঙ্গালা লেখকের বাড়ী লইয়া যাইতে পার ? আমি বলিলাম, পারিব না কেন। বলিলাম বটে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে বঙ্কিমবাবুর কথা মনে হইল। তাঁহার কাছে আগে না লইয়া গিয়া অন্য যায়গায় গেলে সহচারবিরুদ্ধ হইবে; সুতরাং অগত্যা আগে তাঁহার বাড়ী দেখা করার স্থান ও কাল নির্ণয় করিতে গেলাম। আমি যাওয়ায় তিনি খুব খুসী হইলেন, কিন্তু কিছু প্রকাশ করিলেন না; কেবল বলিলেন, "তাঁহাকে লইয়া তুমি বাড়ী বাড়ী ঘুরিবে, তার চেয়ে আমি কেন তাঁহাদের আমার বাড়ী ডাকি না।" তিনি রবিবার সকালে নয়টায় সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। অধ্যাপক মিনায়েফ্ আসিলে তাঁহাকে বলিলাম, রবিবার নয়টার সময় আমরা বঙ্কিমবাবুর বাড়ী যাইব। তিনি বলিলেন, "আমি ত পথ চিনি না, আটটার সময় আমার হোটেলে আসিয়া আমায় লইয়া যাইও।" রবিবার গাড়ীতে আসিবার সময় বলিলাম, "বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতেই হয় ত আপনার সঙ্গে অনেকগুলি বাঙ্গালা লেখকের সহিত দেখা হইবে।" তিনি অত্যন্ত দুঃখিত,ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি যে তিন জন লোক একত্র থাকিলে কথা কহিতে পারি না,ভেবাচেকা খাইয়া যাই।" আমি বলিলাম, "আপনি ইউরোপীয়, কেন ভেবাচেকা খাইবেন?" তিনি বলিলেন, "আমি হই তা কি করিব। বাড়ী ব'সে পড়াশুনা করি, লোকজনের সঙ্গে বড় মিশি না ত।" যাহা হউক, বঙ্কিমবাবুর বাড়ী আসিয়া দেখি, সেখানে হেমবাবু আছেন, চন্দ্রবাবু আছেন, রমেশ দত্ত আছেন, রজনী গুপ্ত আছেন, আরও চার পাঁচ জন লোক আছেন। প্রফেসর মিনায়েফ্ আসিলে, তাঁহারা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেকহাণ্ড করিলেন। পরস্পর পরিচয় ও শিষ্টালাপের পর প্রফেসর মিনায়েফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে ব্রহ্মদেশটা ইংরাজরা সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইল, তাহাতে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সকল কি বলিল?" আমরা সকলেই বলিলাম, "খবরটা দিল মাত্র, মতামত কিছুই প্রকাশ করে নাই।" তাহার পর মিনায়েফ্ কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আজমীর যাইতে হইলে কোন্ পথে যাইতে হয়, চিতোর যাইতে হইলে কোন্ পথে যাইতে হয় ইত্যাদি। তখন আমরা কেহই দেশ-ভ্রমণ করি নাই; করিয়াছিলেন কেবল রমেশবাবু। তিনি তাঁহাকে রাস্তার কথা সব বলিয়া দিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা বইয়ের মধ্যে কি কি ভাল ভাল বই আছে, সে কথা হইল। যাঁহার যাহা মনে ছিল, তাহাই বলিয়া দিলেন; তিনি সেগুলি লিখিয়া লইলেন। ঘণ্টাখানেক থাকিয়া প্রফেসর মিনায়েফ্ উঠিয়া গেলেন। আমি যখন তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে যাই, বঙ্কিমবাবু তখন বলিলেন,"হরপ্রসাদ, তুমি ফিরিয়া আসিও।" আসিয়া দেখি, বঙ্কিমবাবু প্রচুর আহারের উদ্যোগ করিয়াছেন। সকলে আহার করিয়া দুইটার সময় বাড়ী ফিরিয়া গেলেন; আমার হাঙ্গামটা মিটিয়া গেল। কিন্তু মিনায়েফের ব্যাপার মিটিল না। শুনিলাম, কে এক জন 'মীরারে' লিখিয়া দিয়াছে যে, Professor Miniev was invited at the house of Babu Bankim Chandra Chatterji. The agitaitor class, musterd strong and inflammatory speeches were made ইত্যাদি। সার সুরেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিলাম, আমাদের সকলের নাম পুলিশের Black bookএ উঠিয়াছে। তখনকার Political পুলিসও অনেকবার আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিল এবং অধ্যাপক মিনায়েফ্ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দুই বৎসর পরে শুনিলাম, পুলিস আমাদের নামগুলি Black book হইতে কাটিয়া দিয়াছে। *

[ক্রমশঃ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের আবক্ষ প্রস্তর-মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা সভায়

পতিত ডাক্তার।

(নক্সা)

২

অনেক দিন ভুগিয়া, পতিতের পিতা ব্রজনাথ রোগশয্যা হইতে চিতাশয্যায় শয়ন করিলেন ; জীবনের সমস্ত ধুমধাম ধূমে পরিণত হইল। চিতায় দেহ-ভস্ম জাহ্নবীজলে ভাসাইয়া উনিশ বৎসরের পতিতও চক্ষে ধোঁয়া দেখিতে দেখিতে গৃহে ফিরিল। ডাক্তারী শেখে নাই বলিয়া তাহার আপশোষ দশ গুণ বৃদ্ধি পাইল। সে নিজে ডাক্তার হইয়া চিকিৎসা করিলে পিতাকে বাঁচাইতে পারিত, এই তাহার ধারণা। ব্রজনাথের প্রথম রোগের চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্ত্তনের খরচাদিতে, পরে তাঁহার অপব্যয়ে এবং অন্তিমরোগে বৈদ্য-ঋণ পরিশোধ করিতে সামান্য পুঁজি ফুরাইয়া গিয়া অবশেষে পতিতের মা'র খাড়ু পৈঁচেতে যে হাত পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে তখন পতিতের ভ্রূক্ষেপই নাই ; মা চিরকাল সংসার চালাইয়া আসিয়াছেন, মা-ই চালাইবেন, এই তাহার দৃঢ়বিশ্বাস। পতিতের মাহিনা ১৮ টাকা হইয়াছিল, ব্রজনাথের মৃত্যুর পর বদন বাবুর দয়ায় আর দুই টাকা বাড়িয়া তাহা ২০ টাকা দাঁড়াইল ; কিন্তু পিতার শ্রাদ্ধ তিল-কাঞ্চনে সারিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী প্রভৃতিকে ভোজনাদি করাইতে ব্যয় ৪০০৲ টাকার উপর পড়িয়াছিল এবং ইহার জন্য মায়ের কণ্ঠমালা ও গোপহার পাড়ার বেণে-গিন্নীর সিন্দুকে গিয়া পূর্ব্বপ্রস্থিত খাড়ু পৈঁচের বিচ্ছেদ-যাতনা দূর করিয়াছিল, সে সংবাদ পতিত জানিত না। সে আফিসে যায় ; কায করে ; আফিস হইতে আসে, প্রাণমনহীন কলের পুতুলের মত ; প্রাণ তাহার দেহে ফিরিয়া আসে, মন সাড়া দিয়া উঠে, লোকের বিপদ শুনিলে। পতিতের রোগি-পরিচর্য্যার খ্যাতি এখন পাড়া ছাড়িয়া আরও দূরে দূরে গিয়াছে ; কাহারও গঙ্গা-যাত্রায় রাত্রি জাগিতে, কাহারও সৎকারে কোমরে গামছা বাঁধিতে পতিত সর্ব্বাগ্রে আগুয়ান ; ইহাতে পতিতের ধনিনির্ধন ভেদজ্ঞান ছিল না, ব্রাহ্মণচণ্ডাল জাতিবিচার ছিল না। ইদানীং মাঝে মাঝে কাহারও সামান্য সর্দ্দি রোগের প্রথম অবস্থায় পতিত নিজেই প্রিস্কৃপশন্‌ লিখিয়া ঔষধ দিত, লোক তাহার আত্মীয়াধিক যত্ন দেখিয়া তাহাকে অবিশ্বাস করিত না ; কিন্তু রোগ একটু বৃদ্ধি পাইলেই, সে নিজে ডাক্তার ডাকিবার পরামর্শ দিত এবং আপনি গিয়া ভাল ডাক্তার আনিয়া দিত ; পাড়ার প্রবীণ ডাক্তার ক্ষেত্রবাবুকে ও বাগবাজারের সরকারী দাওয়াইখানার নেলার "সাহেবকেই" বেশী "কল" দিত। এখানে নেলার "সাহেবের" একটু পরিচয় দি। নেলার সাহেব ত' বলিলাম, কিন্তু তিনি বেলী সাহেব, ফেরার সাহেব, পার্টিজ্ সাহেব, ম্যাক্‌নামারা "সাহেব" প্রভৃতির ন্যায় আসল বিলিতি গোরা ডাক্তার ছিলেন না, আবার চক্রবর্ত্তী "সাহেব", চন্দ্রা "সাহেব", কর "সাহেব", এম, এন্, ব্যানার্জ্জি "সাহেব", ডি, এন, রায় "সাহেব" প্রভৃতির ন্যায় বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন না। চিকিৎসাবিদ্যার নিপুণতায় এবং অমায়িকতাদি গুণে তিনি যে কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সে কুলের নাম নির্ণয় করিয়া বলা একটু কঠিন এবং আজকাল একটু ভয়ও করে। পূর্ব্বে এ দেশের লোক তাঁহাদের ফিরিঙ্গী বলিত, পঞ্জাব অঞ্চলে ফিরিঙ্গীদের কেরাণী বলিত। এখন তাঁহারা ফিরিঙ্গী কথাটা মানহানিকর বলিয়া মনে করেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রথম যখন পর্ত্তুগীজ, ডচ, ডেন, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় পুরুষগণ এ দেশে আসেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই সস্ত্রীক সেখান হইতে আসিতেন ; কিন্তু আসিয়া তাঁহারা যে কবে কত দিনে স্বদেশে ফিরিবেন এবং কখনও ফিরিবেন কি না, তাহা এ দেশের জলবায়ুর বৈপরীত্যগুণে ও তখনকার পালবাহী ক্ষুদ্র জাহাজে অর্ণবপথে ঘোর সন্দেহপূর্ণ দুর্গম যাত্রার কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিতেন না। সেই জন্য অনেকেই এ দেশে বাসকালীন সাময়িক সুবিধার জন্য এক একটি Native wife গ্রহণ করিতেন, এই নেটিভ ওয়াইফদের অনেকেই হিন্দুর দৃষ্টিতে ইতরকুলোদ্ভবা এবং সাধারণতঃ দরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রীলোক হইত। কিন্তু "সাহেবরা" তাহাদিগকে নিজ বাটীর মধ্যে বা অন্যত্র বেশ সুখস্বচ্ছন্দে ও ভোগবিলাসে

রাখিতেন। বিলাতী "সাহেবরা" এ দেশে আসিলে তাঁহাদের নাম হইত Anglo-Indian এই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে শুভাদৃষ্ট বশতঃ বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যাঁহারা স্বদেশে ফিরিতে পারিতেন, সেখানকার "সাহেবরা" তাঁহাদিগকে "নবাব" আখ্যা প্রদান করিত। সেই নবাবরা এ দেশে থাকিবার সময় বাস্তবিকই নবাবী চালে চলিতেন, বড় বড় বাড়ী, বাংলা, বাগান, বড় বড় চিত্র-বিচিত্র করা পান্ধী তাঞ্জাম, এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে আসাশোটা হরকরা চোপ্‌দার হুক্কা-বরদার; ময়ূরপুচ্ছের পাখা লইয়া ভৃত্য বাতাস করিত, ময়ূরপুচ্ছের চামর দ্বারা মক্ষিকা তাড়াইত। তাঁহারা সকালে কায করিতেন, মধ্যাহ্নে নিদ্রা দিতেন, বৈকালে হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেন, সন্ধ্যার পর অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত দশবার জনে একত্র জমাট বাঁধিয়া ইয়ারকি দিতেন, মদ চলিত, নাচ চলিত, গান চলিত, জুয়া খেলা চলিত; দেশের অর্দ্ধদগ্ধ রোষ্ট ও তদ্রূপ সিদ্ধ চপ্‌ যদিও পরিত্যাগ করেন নাই, তথাপি মাদ্রাজ হইতে মুলুগ্‌তানি সুপ্‌ খাইয়া এবং বাঙ্গালায় আসিয়া কালিয়ার মোলায়েম্‌ আস্বাদনে তাহা 'কারী' নামে অভিষিক্ত করিয়া টেবিল-ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা বাড়ীর মধ্যে ঢিলে পাত্‌লা পাজামা পরিতেন, ঢিলে বেনিয়ান গায়ে দিতেন, সখ হইলে কেহ কেহ জঁাকাল নেটিভ পরিচ্ছদ পরিয়াই মজ্‌লিসাদিতে উপস্থিত হইতেন। দেশীয় লোকের সঙ্গে তাঁহারা খুব মেশামিশি করিতেন, বাগে পাইলে ঘুষোঘুষিও যে করিতেন না, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ডেন পর্ত্তুগীজাদির কথা ঠিক বলিতে পারি না, ইংরাজদিগকে শেষ বিষয়ে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইত। এ দেশে আসিবার সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট তাঁহাদের একখানি একরারনামা লিখিয়া দিয়া আসিতে হইত, তাহাতে অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে এইরূপ দুইটি কড়ার করিয়া আসিতে হইত যে, তাঁহারা অনুমতিপ্রাপ্ত একটি সীমার মধ্যেই নিজেদের কায বসবাসাদি করিবেন, সেই সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ বাঙ্গালার সীমা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে পারিবেন না; আর একটি এই যে, তাঁহারা দেশীয় লোকদিগের সহিত কোনরূপ দুর্ব্যবহার ও অসদাচারণ করিবেন না এবং তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিবেন না; করিলে কঠিন শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে, বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে কোম্পানীর এখানকার কর্তৃপক্ষ ঐ ইংরাজ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া জাহাজে তুলিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু প্রকৃতিগত দোষ সামলাইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ এরূপ শাস্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। প্রথমোক্ত কড়ার অর্থাৎ লাভের লোভে সীমানা অতিক্রম করার অপরাধেও কাহাকেও কাহাকেও বস্তাবন্দি হইয়া বিলাতমুখো ভাসিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন চতুর ইংরাজ আইন বাঁচাইয়া নির্দ্দিষ্ট সীমার বহির্ভাগে ব্যবসাদি চালাইবার এক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নেটিভ্‌ ওয়াইফের গর্ভজাত হাফ্‌কাষ্ট্‌গণ এবং তাঁহাদেরও সন্তান-সন্ততিরা তখন নেটিভ্‌ পর্য্যায়ই ভুক্ত ছিলেন; নেটিভ্‌ বা দেশীলোকের গতিবিধির উপর কোন নিষিদ্ধ আইন কানুন করিবার ক্ষমতা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছিল না, তাঁহারা যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারিতেন, সুতরাং কোন কোন ইংরাজ বণিক ঐ হাফ্‌কাষ্টের ভিতর হইতেই ভাল লোক বাছিয়া সীমান্তে কার্য্য চালাইবার জন্য তাঁহাকে গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন। সে নামে নেটিভ্‌, কাযেই কড়ারের সর্ত্ত বজায় থাকিত, আবার পিতৃরক্তের অনুরোধে প্রভুর কার্য্যে বেশী অনুরক্ত হইত। এখন দেখা গেল, গোড়ায় ফিরিঙ্গীরা ইংরাজদিগের দ্বারাই নেটিভ্‌ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন; পরে তাঁহাদের নাম হয় ইষ্টইণ্ডিয়ান্‌; বাঙ্গালীরা ইষ্টইণ্ডিয়ান্‌ বা ফিরিঙ্গী "সাহেব"দিগকে চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন যথা,—ট্যাশ্‌ টোঁশ্‌, মেটিয়া, ফোঁস্‌। যাঁহাদের বর্ণ খুব ফরসা, মেজাজ ঠাণ্ডা এবং খুব বড় "সাহেবদের" অধোবংশধর, তাঁহারা ছিলেন ট্যাশ্‌। তার চেয়ে একটু মাদা রং, মেজাজটা দশ আনা ছয় আনা মিঠে কড়া, দ্বিতীয় নামে মাঝারি বৃটিশ পিতার গন্ধ, তাঁহারা হইতেন টোঁশ্‌; মেটে রং, বেশ কাল কোমল চুল, মাঝারী ভদ্রলোকের মেজাজ, তাঁহারাই ছিলেন মেটিয়া; আর পর্ত্তুগীজ বোম্বেটে বা হতচ্ছাড়া হাভাতে য়ুরোপীয়ের ঔরসে ও ঘেসেড়ানী, হাড়িনী প্রভৃতির গর্ভে এই বঙ্গদেশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিতেন, তাঁহারা হইতেন ফোঁস্‌,—রংয়ে মিশি, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র, মাতাল, ঘাড়ে ঘা-ওয়ালা কুকুরের মত পেঁকী এবং ভদ্র ইংরাজদিগের কাছে হেয় ঘৃণ্য। ক্রমে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ানরা নিজ নামে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন এখানকার ইংরাজ সমাজ তাঁহাদের নাম দিলেন ইউরেশিয়ান্‌; কালক্রমে বাসি হইয়া ইউরেশিয়ান্‌ও তাঁহাদের

মনার রেওয়াজ বোধ হইতে লাগিল; তাই এখন সেই ফিরিঙ্গী-দের নাম হইয়াছে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্। এখনও—আজও এই কলিকাতা সহরে অনেক য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ পরিবারমধ্যে বর্ণভেদে আভিজাত্যের অভিমান বিলক্ষণ বজায় আছে; অনেক ফর্সামুখ বড় ভাই বা ভগিনী তাঁহাদের সহোদর সহোদরার রং ময়লা হইলে উঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করেন না বা করিতে লজ্জিত হন; বেচারীদের "Disgrace to the family" বলিয়া ফরসা নাসিকা ও কটা ভ্রূ কুঞ্চিত করেন। আজকাল আবার লাট্‌কৌন্সিলে ঘাটে বাটে হেঁসেলে গোল উঠিয়াছে যে, সব সার্ভিসকে ইণ্ডিয়ানাইজ করা চাই, রেলওয়ে সার্ভিস ত আগে; তাই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ মহলে কল-কোলাহল; এঁরা ইণ্ডিয়ান্ বটে, কথাটা স্বীকার করিলে কোন গোল-ই থাকে না, কিন্তু সেই ইণ্ডিয়ান্ কথাটা স্বীকার করিতে এঁরা রাজী নন। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ডাক্তার নেলার "সাহেবকে" কোন্ জাতি বলিয়া এখন পরিচয় দিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়ানরা, য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ বা ইউরেশিয়ান্ হইবার পূর্ব্বেই কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্‌ই হউন আর যাহাই হউন, লোক যে তাঁহাদিগকে "সাহেব"-ও বলেন, সম্মানও করেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন বলিয়া আমি প্রথ-মোক্ত উপাধিতেই তাঁহাকে পরিচিত করিলাম। "সাহেব" সেকেলে এ্যাপথিকারী ছিলেন, পরে কিন্তু তিনি নামের অন্তে এম, ডি, অক্ষরদ্বয় যুক্ত করিতেন এবং ঐ ডিগ্রি লইবার জন্য একবার বিলাতেও গিয়াছিলেন; পাড়ার ছোঁড়ারা ঠাট্টা করিয়া বলিত, "নেলার সাহেব জাহাজ চ'ড়ে গিয়ে রেঙ্গুন থেকে-ই এম, ডি, হ'য়ে এসেছেন।" শুনিয়াছি, প্রথমে নেলার সাহেব গরাণহাটা ডিসপেন্সারী বলিয়া নিমতলা ষ্ট্রীটের কাছে চাঁদনী হাঁসপাতালের যে একটা শাখা দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, সেইখানেই ডাক্তারী করিতেন এবং পদব্রজে ছাতা মাথায় দিয়া এক টাকা ভিজিটে রোগীদিগের বাড়ী গিয়া দেখিতেন। ছয় মাস বয়সের সময় অন্নপ্রাশনের সমস্ত উদ্যোগ; আনন্দ-নাড়ু তৈয়ারী হইতেছে, এমন সময় ওলাউঠা ঠাকুরাণী নেলার "সাহেবকে" ডাকাইয়া আমার সঙ্গে প্রথম ইন্‌ট্রোডিউস্ করিয়া দেন। তখন বাগবাজারের চিৎপুর-পুলের নেলার সাহে-বের ডাক্তারখানা একটা অদ্ভুত রকম দেখিবার জিনিস ছিল; আরে বাপ্ রে! এখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট-ই বা তাহার কাছে কোথায় লাগে! "সাহেব" বেশ বাঙ্গালা জানিতেন, উঁচু চৌকির উপর চেয়ার-টেবল-পাতা, সাহেব তাহার উপর বসিয়া, পাশে চাপরাশি দাঁড়াইয়া, কাঠগড়ার ভিতর এক এক জন রোগী সেলাম করিয়া ঢুকিতেছে, সাহেব ভারি গলায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কি নাম", রোগী তাহাদের দেশে কিরূপ ধান হইয়াছে থেকে বলিতে আরম্ভ করিলে "চোপ্‌রাও" রব শুনিতেছে, কুৎসিত-রোগ-ভোগিগণ মিঠেকড়া ভাষায় ভৎর্সিত হইতেছে, সাহেব উচ্চ স্বরে ব্যবস্থা করিতেছেন, "চিরেতা-মিক্‌শ্চার এক বোতল; চার চার ঘণ্টা বাদ" "ক্যাস্‌টার ওয়েল্ এক আউন্স পিলায় দেও" "পোল্‌টিস্" "টিন্‌চার আইডিন্ পেণ্ট করোও, ফোমেন্‌টেসান্ সামঝায় দেও" "অপারেসন্—ফাড়নে হোগা সব ঠিক করোও, আদমি বৈঠা রাখোও"। আর এক দিকে শিশি, বোতল, পট্‌, খল, পিল্, টাইল্ প্রভৃতি সাজান লম্বা টেবলের ওধার থেকে বড় কম্‌পাউণ্ডার অনবরত হাঁকিতেছে "এ-এ-এ-এস্" "এ-এ-এ-এ-এস্" "এ-এ-এ-এস্!" এক ধারে একখানা বড় কড়ায় মশিনার পুল্‌টিস্ চড়ান আছে, এক জায়গায় জল গরম হইতেছে, কানে পিচ্‌কিরি দেওয়া বা ধোয়াধুয়ি প্রভৃতি হইবে; আর একদিকে একটা ময়লা বালিসের কোলে একটা ময়লা কম্বল বিছান একটা কাঠের চৌকি পাতা, তাহাতে শুইয়া রোগীদের বাগী ফোঁড়া কাঁক্‌বেরালি প্রভৃতি অস্ত্র করা হয়, ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেওয়া হয়, নড়া দাঁত উপড়িয়া ফেলা হয়। * যখন "সাহেব" খয়রাতি দাওয়াই-খানার কায শেষ করিয়া প্রাইভেট প্র্যাকটিসে বাহির হই-তেন, তখন তাঁহার কম্পাস্ গাড়ী ও ভিজিট দুই টাকা; পরে খুব বড় জুড়ী করেন ও ভিজিট প্রথম দিনে চার টাকা, পরে দুই টাকা; শেষে প্রতি ভিজিটই চার টাকা হইয়াছিল, কিন্তু যে সকল বাড়ীর সহিত প্রাচীন সম্বন্ধ ছিল, সে সব স্থলে এবং গরীব গৃহস্থ লোক দুঃখ জানাইলে দুই টাকা লইতে আপত্তি করিতেন না, হয় ত এক একটা ভিজিট বাদ-ও দিতেন। শ'বাজার, শ্যামবাজার, বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের লোকের কাছে সাহেব এক জন পরিবারস্থ লোক বলিয়া গণ্য হ্

---

* মহত্তের আদর এই নেলার সাহেবের ডাক্তারখানার আদর্শে কিঞ্চিৎ রসসিক্ত করিয়া আমরা প্রথমে জিম্‌ন্যাষ্টিকের সঙ্গে ও পরে ন্যাশান্যাল ও গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী নামক ব্যঙ্গনাট্য অভিনয় করি।—লেখক।

হইতেন; রোগীর শিয়রে বসিয়া ডাক্তার সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিতেন, তাহাকে সান্ত্বনা দিতেন, গিন্নী-বান্নীরা তাঁহার সহিত কথা কহিলে সাহেব শান্তশিষ্ট সম্মানসূচক মিষ্ট বচনে তাঁহাদের উৎকণ্ঠিত চিত্তকে প্রবোধ দিতেন। নেলার "সাহেব" বেশ সুবিবেচক চিকিৎসক ছিলেন, খৈ-বাতাসা খাইতে বলিতেন, বেল খাইতে বলিতেন, লাল্‌তে খাইতে বলিতেন, আর অন্ততঃ Minor Surgeryতে তিনি যে সুদক্ষ ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমার নিজ অঙ্গেই অঙ্কিত আছে। জীবনে একটিমাত্র তিনি বড় রকম ভুল করিয়াছিলেন, ছয়মাস বয়সের একটি ক্ষুদ্র শিশুকে নূতন আমদানী ওলাউঠার গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া দিয়া। সেটি না করিলে এই সত্তর বৎসর পরে আজ আপনাদিগকে এই বিচিত্র চিত্র দেখিয়া বিরক্ত হইতে হইত না। এখনও এমন লোক অনেক আছেন—যাঁহারা চিৎপুরের ডাক্তারখানাকে "নেলার সাহেবের ডাক্তারখানা" বলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, লজ্জার কথা যে, কলিকাতার ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ "নগর-পিতারা" ঐ অঞ্চলের একটা রাস্তা বা গলিকে নেলার ষ্ট্রীট বা নেলার লেন বলিয়া অভিহিত করিলেন না। স্বায়ত্ত-শাসনই বল আর স্বরাজই বল "আই বাই ইট-সেল্‌ফ্‌ আই" যায় কোথায়?

হামেসা কল্‌ দিতে দিতে নেলার সাহেবের সহিত পতিতের বেশ একটু ঘনিষ্ঠ রকম চেনা-পরিচয় হইল, সাহেবও কতকটা তাহার দ্বারা লাভ হয় ভাবিয়া, আর কতকটা সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিনয়ী বলিয়া, তাহাকে একটু অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখিতেন; যাতায়াতে যাতয়াতে এবং বাটী হইতে পানের খিলি, ঝাল নাড়ু, কাসুন্দি, তালের বড়া, পিঠে প্রভৃতি লইয়া গিয়া খাওয়াইয়া পতিত কম্পাউণ্ডার ড্রেসারদের সঙ্গেও বেশ আলাপ জমাইয়া ফেলিল। ডেস্‌প্যাচ্‌ ক্লার্কদের কাযের ভিড় বৈকালের দিকেই একটু বেশী পড়ে, সুতরাং দশটার মধ্যে আফিসে যাইবার জন্য পতিতকে তত তাড়াতাড়ি করিতে হইত না। সে ভোরে উঠিয়া চট্ করিয়া বাজারটা বাড়ীতে ফেলিয়াই নেলার সাহেবের ডাক্তারখানায় ছুটিত; সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোগীদিগের চেহারা দেখিত, কথা শুনিত, সাহেবের ব্যবস্থা কানে শুনিয়া মুখস্থ করিত এবং ঔষধকরণ-প্রণালী মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিত। যে প্রায় প্রত্যহ দুই ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ছয়বার সেলাম করে, ভদ্রলোককে তাহার সহিত দুই একটা কথা কহিতেই হয়; সুতরাং সাহেব পতিতকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন, "Well Patit! ডাক্টারী কেমন লাগে?" পতিত অমনই করযোড়ে নিবেদন করিত "Good than সন্দেশ রসগোল্লা, Sir"! এক দিন সাহেব খুব খোসমেজাজে ছিলেন, পতিতের কাছে ঐ রকম একটা বিশুদ্ধ ইংরাজী শুনিয়া ড্রেসারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ আবুদুল, পটিট্ আচ্ছা চোগ্‌রা, কাম্‌ দেখাও, পুল্‌টিস্, ব্যাণ্ডিজ্‌, পিচ্‌কারী সম্‌জাও।" সেদিন আহ্লাদে পতিত আর সেলাম করিতে পারিল না, একেবারে করযোড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতৃতুল্য নেলারের পদে প্রণাম করিয়া ফেলিল।

যেখানে পুণ্য আছে, সেখানে পাপ আছে; যেখানে গুণ আছে, সেখানে দোষ আছে; যেখানে ভাল আছে, সেখানে মন্দ আছে; যেখানে আলো আছে, সেখানে অন্ধকার বা ছায়া আছে; সংসারে নগণ্য ক্ষুদ্র পতিতের স্বভাবের ক্ষীণ আলোকটুকু দেখাইলাম, এখন কোথায় কোথায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে—দেখাইবার চেষ্টা করিব। তাহার প্রথম দৌর্ব্বল্য, সে নিজের জাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করে; যদিও সে প্রাচীন পণ্ডিত বা যাজক ব্রাহ্মণ দেখিলে হাত দু'খানা জড় করিয়া কপালে ঠেকায়,তথাপি তাহার বিশ্বাস যে, বৈদ্যরা বিদ্যা-বুদ্ধি তেজ-প্রতিভা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বড়, মানবকে ভবলোক হইতে মুক্ত করিতে ব্রাহ্মণরা কত দূর সমর্থ, তাহা তর্ক ও বিচারের বিষয়; কিন্তু বৈদ্যরা যে জীবকে দেহ-রোগ হইতে মুক্ত করেন, ইহা নিত্য-প্রত্যক্ষ। স্বজাতি-প্রেম পতিতের হৃদয়ে সাতিশয় প্রবল, স্বজাতির প্রাধান্য বা স্বত্বে অন্য কেহ হস্তক্ষেপ করিলে সে বড়ই বিরক্ত হয়। ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির মধ্যে কেহ যদি বৈদ্য-ব্যবসায় গ্রহণ করেন, পতিত যে কেবল সেটা অনধিকার প্রবেশ বলিয়া মনে করে,তাহা নহে,কোন জাতি-বৈদ্য ঐরূপে কবিরাজের শিক্ষা বা ব্যবসার প্রসারণে সহায়তা করিলে সে কার্য্যটা অন্যায় বলিয়া মনে করে। যদি কেহ তাহাকে বলে যে, বৈদ্য-জাতীয় লোকও ত ব্রাহ্মণকায়স্থাদির ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া ওকালতী, শিক্ষকতা, হিসাব-নবিশ, লিপিকর প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহাতে পতিত উত্তর দেয় যে, অনন্যসাধারণ প্রতিভাপ্রভাবে দক্ষতায় ঐ সকল কার্য্য অধিকতর গৌরবান্বিত হইবে বলিয়া কোন কোন বৈদ্যসন্তান অনুগ্রহচ্ছলে ঐ সমস্ত বৃত্তি অবলম্বন করেন। পতিতের

দ্বিতীয় দৌর্ব্বল্য যে, সে মিথ্যা কথাকে পাপ বলিয়া জানিলেও মনে মনে বিচার করিয়া মিথ্যাকে থাক দিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়াছে; যে মিথ্যায় পরের অনিষ্ট হইবে, সেরূপ মিথ্যা সে পারতপক্ষে কহে না, কিন্তু যে মিথ্যায় পরের অনিষ্ট বা ক্ষতি নাই অথচ আপনার গৌরব-তৃপ্তি বা লাভ হয় অথবা যে মিথ্যা না কহিলে সে নিজে ফাঁকিতে পড়িবে, তাহা কহিতে পতিতের রসনা মোটেই অনশন করে না। বলিয়াছি, পতিত থার্ড ক্লাশে উঠিয়াই সেখানে বানচাল হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে লোককে বলে, সে এণ্ট্রান্স ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল এবং পরীক্ষাও দিয়াছিল, কিন্তু ফেল হইয়া গেল বাঙ্গালায়। এই বাঙ্গালায় ফেল হওয়া বলাটা তখনকার কালে বড় একটা পাকা চাল ছিল; পতিত ইহার পেটেণ্ট আবিষ্কারকর্ত্তা নহে; তখনকার ছাত্ররা এণ্ট্রান্স, এল, এ, বি, এ পরীক্ষায় ইংরাজী, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে ফেল হউক না কেন, বাজারে বলিত যে, তাহারা বাঙ্গালায় ফেল হইয়াছে; ইহাতে তাহাদের বিদ্যাবত্তায় নিন্দা ত হইতই না, বরং স্থলবিশেষে "ইংরাজী এত পড়েছে যে, বাঙ্গালা বই খুলে দেখবার কি আর সময় পেয়েছে" বলিয়া খানিকটা গৌরব লাভও হইত। ভাল ইংরাজী জানার গর্ব্বের জন্য পতিতের আর একটা বড় নজির ছিল; সে বলিত, আমি শম্ভু-গুপ্তর পৌত্তুর, ইংরাজী আমাদের ঘরোয়ানা বিদ্যা; কল্‌কেতার অনেক বড় বড় শীল-মল্লিক-টেগোরের পিতা-পিতামহ আমার ঠাকুরদা'র ছাত্র, বাবার ছাত্র। লেখা-পড়া-জানা লোকের সহিত ইংরাজী কহিতে পতিত একটু সাবধান হইত; কিন্তু বামুন পণ্ডিতের কাছে, মেয়েদের সামনে, কি পাড়া-বেপাড়ায় দোকানী-পশারী কাঁসারী-শাঁখারী প্রভৃতি ইংরাজী-না-জানা লোকের সঙ্গে কথা কহিবার সময় পতিতের মুখ হইতে দশটা বাঙ্গালা কথার সঙ্গে ছয়টা ইংরাজী জড়াজড়ি হইয়া বাহির হইয়া পড়িত; দুঃখের বিষয়, পতিত যে সকল নূতন ইংরাজী কথা নিজে আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যায় নাই, রাখিলে সে খাতা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই কেম্‌ব্রিজ্ ডিক্‌স্‌নারির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিতাম। আর তাও বলি, লিখিয়া রাখিবেই বা কি করিয়া? একটা বাঙ্গালা শব্দের এক ইংরাজী অর্থ সে প্রায় দু' বার ব্যবহার করিত না, সকালে যদি কাহাকে ঢেকুর উঠ্‌ছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া "pomping হচ্ছে কেমন" বলিত, বৈকালে তাহাকেই আবার জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত "fountain হয়েছে কতবার?" অনেক রোগেরও সে নূতন নামকরণ করিয়াছিল; নবজ্বরকে বলিত Nava-zemla, অম্বলের ব্যায়ারামের নাম রাখিয়াছিল Velitudina-rian, বাতকে বলিত Manumotapa বাগীকে সাদাসিধে Tigressই বলিত। Plaguenant ছিল গর্ভবতী স্ত্রীলোক। তখন Second Number Spelling নামক বানান শিক্ষার একখানি ভাল বই স্কুলে ব্যবহার হইত। তা' থেকে সে অনেক বড় বড় কথা শিখিয়াছিল, আর একখানি বই পড়িয়াছিল, তার নাম Oswald's Etymology, তা' থেকে অনেক ইংরাজী কথা Greek, Latin, French root মুখস্থ করিয়া কতকগুলা ঔষধেরও নাম বদলিয়া ফেলিয়াছিল। অনেকে কুইনাইন্ খাইতে রাজি হইত না বলিয়া সে কুইন্ আর আইন্ এই দুইটা কথা মিলাইয়া ঐ ঔষধের নাম করিয়াছিল Pulv. reginia ligalia; এইরূপ আরও অনেক ছিল, কিন্তু এগুলা পতিতের রীতিমত practiceএর কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলিয়াছি।

Amateur ডাক্তারীও করে, অফিসেও যায়, এইরূপে যখন তাহার বয়স তিরিশের ঘেঁষাঘেঁষি গিয়াছে, এমন সময় Macswallow "সাহেব" দেখিলেন যে, বছর পঁচিশ এ দেশে থাকিয়া তিনি এত অধিক swallow বা গ্রাস করিয়াছেন যে এখন তাঁহার জন্মভূমি জই-এর রাজ্যে গিয়া জাবর কাটা একান্ত প্রয়োজন, তাই হিসাব নিকাশ চুকাইয়া দিয়া আফিস wind up করিয়া ফেলিলেন; তিনি এ দেশে Pagoda Tree নাড়িতে আসিয়াছিলেন, এখন তাঁহার ভুঁড়ি নড়ে আর রূপিয়া পড়ে। আফিসের সব লোককে এক এক মাসের মাহিনা বক্‌সিস্ দিয়া তিনি জাহাজে চড়িলেন; সঙ্গে চলিল প্রভূত স্বর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ দুষ্ট লিভার, বেঙ্গল ফিভার, মেজাজ বেজায় রুক্ষ, আর 'ড্যাম্' 'শুয়ার' না বলিতে পারার দুঃখ।

পতিতের মুক্তি লাভ হইল, বদন বাবু বলিয়াছিলেন, "তোমায় আর এক যায়গায় জোগাড় ক'রে ঢুকিয়ে দেব, মাঝে মাঝে এসে দেখা কোরো", কিন্তু পতিত আর কলু-টোলার দিকে নিজের বদন দেখাইতে গেল না। অবশ্য পতিতের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ছেলেপুলেও হইয়াছে; সাতাশ আটাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হইলে, বাঙ্গালীর ছেলে পতিতের জাতি যাইত, ছেলেপুলে না হইলে পিতৃপুরুষ নরকস্থ

হইতেন। বর্ষীয়সী মা এখনও বিছানা। তিনি বুঝাইলেন, Prime minister অর্থাৎ পত্নী সুপরামর্শ দিলেন, পাড়ার লোক পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু পতিত আর চাকরীর চেষ্টা করিল না। দুর্গা আছেন বলিয়া পতিত "ঝুলে পড়্‌ল," অর্থাৎ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। কাল কি খাইব, গেঁড়ি-গেণ্ডিরা কি খাইবে, না ভাবিয়া সে বক্সিসের টাকা হইতে ষ্টেথেস্‌কোপ ও একখানা ল্যান্‌সেট্ কিনিয়া ফেলিল; আপাদমস্ত মোটা কাপড়,চাদর,পিরাণ পরিয়া, পায়ে গরাণহাটার জুতা, মাথায় পেনের বাড়ীর ছাতা, পতিত প্র্যাক্‌টিসে বাহির হইল। ডাকুক না ডাকুক, জানিত লোকের বাড়ী রোগ হইয়াছে শুনিলেই পতিত সেখানে গিয়াই হাজির। শ্যামবাজার, শ্যামবাজার, বাগ্‌বাজার, কুমারটুলি,হাটখোলা প্রভৃতি স্থানের বস্তিতে বস্তিতে পতিত সকাল হইতে বেলা ১২টা ১টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়, খোলার ঘরে কাহারও ব্যারাম হইয়াছে শুনিলেই পতিত সেখানে তেড়ে ঢুকিয়া পড়ে, পয়সা দিক না দিক, প্রিস্কৃপ্‌সন্ লিখিয়া ওষুধ কিনিয়া আনিয়া দেয়, কেহ ওষুধ কিনিবার পয়সা নাই বলিলে ডাক্তারখানাওয়ালায় খোসামোদ করিয়া বারো আনা দামের ওষুধ নিজের গাঁট হইতে ছ' আনা দিয়া আনিয়া তাহাকে দেয়। মাস তিন চার এইরূপ ঘোরাঘুরির পর পতিত প্রত্যহ এক টাকা দেড় টাকা দুই টাকা পর্য্যন্ত বাড়ীতে আনিতে সমর্থ হইল। ক্রমে পতিতের পসার বাড়িতে লাগিল। তিন দরজা তফাতের ইংরাজী-জানা কোঠা-বাড়ীর অধিবাসী বাবুয়ানার গর্ব্বে ঘটা করিয়া চিকিৎসা করায়, পরিবারস্থ কাহারও পীড়া হইলে পতিতকে ডাকে না বটে, কিন্তু সাদাসিদে গৃহস্থ লোক প্রায়ই পতিতকেই প্রথম ডাকে এবং সে রোগ একটু উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেই নেলার সাহেব, ক্ষেত্রবাবু বা অন্য কোনও বড় ডাক্তারকে ডাকিয়া আনে। তাঁহারা যে পতিতের পূর্ব্ব প্রিস্কৃপ্‌সন্ চাহিয়া দেখেন, তাহার সহিত পরামর্শাদি করেন, বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নীদের কাছে ডিপ্লোমার চেয়েও সেটা পতিতের বড় রকম সার্টিফিকেট হইয়া দাঁড়ায়। তাহার উপর দুপুরবেলা ডাক্তার আসিয়াছেন, বাড়ীতে তেমন চাকর-বাকর নাই, ছেলেরা স্কুলে গিয়াছে, কে ওষুধ আনিয়া দেয়, পথ্য কিনিয়া আনে? পতিত গৃহস্থের সে উপ-[illegible] সম্পাদন করে। সুতরাং এমন আত্মীয় ডাক্তারের [illegible] গাড়ী, ইংরাজী বক্তৃতা, নামের শেষে G. B.M. C. বা L. M. S. জোড়া না থাকিলেও পসার বাড়িবে না কেন? কম্পাউণ্ডারীটায় পতিত এক রকম হাত বশ করিয়া লইয়াছিল, নিজের রোগীর প্রিস্কৃপ্‌সন্ ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া কম্পাউণ্ডিং রুমে ঢুকিয়া নিজের প্রিস্কৃপ্‌সন্ সে নিজেই ডেস্‌প্যাচ করিত। সে জন্য অন্য অন্য নামজাদা ডাক্তার অপেক্ষাও পতিত ডাক্তারখানার প্রিস্কৃপ্‌সন্ কিছু বেশী রকম পাইত। এ সওয়ায় রোগীর বাড়ী হইতে যে ঔষধের মূল্য বলিয়া সে আঠার আনা পাইত, এবং অন্য লোক ঔষধ আনিতে গেলে তাহাকে আঠার আনাই দিতে হইত, সে ঔষধ ডাক্তারখানাওয়ালাকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া পতিত চৌদ্দ-আনায় রফা করে, চার আনা তাহার উপরিলাভ। পতিতের এই ব্যবহারকে নৈতিকরা নিন্দা করিবেন, নিঃসন্দেহ; কিন্তু দুঃস্থ রোগীরা "এই বই আর নাই বাছা, এইতেই যা ওষুধ হয়,পথ্যি হয়, কেমা বেমা ক'রে এনে দাও" বলিয়া যখন সতর আনা খরচের জায়গায় পতিতের হাতে দুটা সিকি মাত্র গুঁজিয়া দেয়,তখন সে উপরিলাভের পয়সা হইতেই ঔষধের পূরা দাম চুকাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পয়সা চারেকের সাবু-মিছরিও কিনিয়া দেয়। তিন চারিটি জানা ডাক্তারখানার সঙ্গে পতিতের বন্দোবস্ত ছিল (বড় বড় ষোল টাকা ভিজিটের অনেক ডাক্তারদেরও এরূপ থাকে) পতিতের প্রিস্কৃপ্‌সন্ সেই সব জায়গাতেই পাঠাইতে হইত; অন্য ডাক্তারখানায় না যাইতে পারে, তাহার জন্য পতিত কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। জানা ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারদের সঙ্গে পতিতের একটা সাঁট ছিল যথা,—যেমন বলিয়াছি তাহার কুইনাইনের নাম রেজিনা রিগালিয়া, Ipeicacuanhaর নাম Vomitonia, Oil Cajuputiর নাম Oil Nebu-chadhar, তাহা ছাড়া My Diarrhoea Mixture, My Pain Murderer, My Eye Lotion লেখা প্রিস্কৃপ্‌সন্ লইয়া গেলে Bathgate, Smith Stanistreet-কেও ফিরাইয়া দিতে হইত। বাগ্‌বাজার, শ্যামবাজার, কাশী-পুর, চিৎপুর অঞ্চলে পতিতের কতকগুলি তুলোওয়ালা ও লোহাওয়ালা প্রভৃতি খোট্টা পেশেণ্ট ছিল, তাহাদের ঔষধে সাদা জল না মিশাইয়া পতিত গরম জলের ব্যবস্থা করিত; সাধারণ প্রিস্কৃপ্‌সনে সে Aqua puraর বদলে Aqua Machinia (কলের জল) লিখিয়া দিত বটে, কিন্তু ঐ খোট্টাদের বাড়ীর প্রেস্কিপ্‌সনে সে লিখিত Aqua Hotwa Hitra, [illegible]

পতিতের ভারী খোসনাম বাহির হইয়াছিল। কম্বুলেটোলা অঞ্চলে একটা গলির মধ্যে ঘর ছুই পূজারী ব্রাহ্মণ, এক ঘর ঘটক, এক ঘর শুঁড়ি এবং কয়েক ঘর কংসবণিক জাতীয় গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাস ছিল। এই কংসবণিকদিগের প্রায় সকলেরই পিতল, কাঁসা, তৈজস-পত্রের দোকান ছিল এবং অর্থসঙ্গতিও মন্দ ছিল না; এই গলির মধ্যে শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয়ের বাহিরবাড়ীর একটি ঘর পাইয়া এক প্রাচীন কায়স্থ বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে কলিকাতার ধনী, মধ্যবিত্ত কোনও গৃহস্থলোকই ভদ্রাসন বাটীর কোনও অংশ ভাড়া দিতেন না, দিলে সমাজে নিন্দা-ভাজন হইতে হইত, একটু খাটো হইতে হইত; কাহারও বহির্ব্বাটীতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘর থাকিলে, কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতাপ্রবাসী একটু জানাশুনা বিদেশী লোককে অমনিই থাকিতে দিতেন। থাকিতে থাকিতে গৃহকর্ত্তা, গৃহকর্ত্রী, অতিথির দাদা, কাকা, মামা, মামী, খুড়ীমা, ঠান্‌দি প্রভৃতি পাতান সম্পর্কে আত্মীয় হইয়া যাইতেন; সত্য সত্যই আত্মীয় হইয়া যাইতেন, শুধু যে থাকিবার ঘর পাইতেন, তাহা নহে, অন্দর হইতে সময়ে সময়ে দু' একটা তরকারী দু' পাঁচখানা রুটী তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য আসিত। অসুখ হইলে, বাড়ীর ভিতর হইতেই সাবু প্রস্তুত হইয়া আসিত। আবার অপর পক্ষে অতিথিও বিনা ভাড়ায় থাকিয়া মাসে দু' টাকা করিয়া বাড়ীওয়ালাকে দিতে হয় বলিয়া, বড়াই করিতেন না; পীড়িতের সেবা করিতেন; বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গঙ্গা-যাত্রার রাত্রি জাগিতেন; ছুটীর দিনে পল্লীগ্রামের খশুরালয় হইতে গৃহ-কর্ত্রীর কন্যাকে তাঁহার বাপের বাড়ী আনিয়া পৌছিয়া দিতেন; প্রয়োজন হইলে বাজার করিয়া, এমন কি, রান্নার কাঠ পর্য্যন্তও চেলা করিয়া দিতেন। এখন সবাই স্বাধীন, কেউ কাহারও নয়,—জয় ভারতের জয়!

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

মানস-বধূ।

যেমন ছাঁচি পানের কচি পাতা প্রজাপতির ডানার ছোঁয়ায়,
ঠোঁট দুটি তার কাঁপন-আকুল একটি চুমায় অম্‌নি নোয়ায়॥

জল্ ছল্‌ছল্ উড়্ উড়্ চঞ্চল তার আঁখির তারা,
কখন্ বুঝি দেবে ফাঁকি সুদূর পথিক-পাখীর পারা,
নিবিড় নয়ন-পাতার কোলে,
গভীর ব্যথার ছায়া দোলে,
মলিন চাওয়া ছাওয়া যেন দূরের সে কোন্ সবুজ ধোঁয়ায়॥

সিঁথির বীথির খ'সে-পড়া কপোল-ছাওয়া চপল অলক;
পলক-হারা, সে মুখ চেয়ে নাচ ভুলেছে নাকের নোলক।
পাংশু তাহার চূর্ণ কেশে,
মুখ মুছে যায় সন্ধ্যে এসে,
বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙ্‌ড়ে কাঁচা আঙুর চোঁয়ায়॥

দীঘল শ্বাসের বাউল বাজে মাবার সে তার যোড়-বাঁশীতে,
পান্না-ক্ষরা কান্না যেন ঠোঁট-চাপা তার চোর হাসি সে॥
ম্লান তার লাল গালের লালিম,
রোদ-পাকা আধ-ডাঁশা ডালিম,
গাগুরী ব্যথায় ডুবায় কে তার নৌল-খাওয়া গাল চিবুক কুয়ায়॥

চায় যেন সে শরম-সাড়ীর ঘোম্‌টা চিরি, পাতা ফুঁড়ি,
আধ-ফোঁটা বৌ মউল-বউল, বোল্‌তা-ব্যাকুল বকুল কুঁড়ি।
বোল্-ভোলা তার কাঁকন চুড়ি,
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি,
দু'চোখ-ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠোঙায়॥

বুকের কাঁপন হুতাশ-ভরা, বাহুর বাঁধন কাঁদন-মাখা,
নিচোল বুকের কাঁচল আঁচল স্বপন-পারের পরীর পাখা।
খেয়া পারের ভেসে-আসা,
গীতির মতন পায়ের ভাষা,
চরণ চুমায় শিউরে পুলক হিম-ভেজা দুধ ঘাসের রোঁয়ায়॥

সে যেন কোন্ দূরের মেয়ে আমার কবি-মানস-বধূ,
বুক-পোরা আর মুখ-ভরা তার পিছুলে পড়ে ব্যথার মধু।
নিশীথ-রাতের স্বপন হেন,
পেয়েও তারে পাইনে যেন,
মিলন মোদের স্বপন-কূলে কাঁদন ভরা চুমায় চুমায়।
নাম-হারা সে-ই আমার প্রিয়া, তারেই চেয়ে জনম গোঁয়ায়॥

কাজী নজরুল ইসলাম।

১

শ্রীদাম ঘোষ যে সে লোক নহেন। কলিকাতা সহরে তাঁহার চৌরঙ্গীর বাটী দেখিয়া অনেক "সাহেব" মেম হাঁ করিয়া থাকে। সেই বাটীর মধ্যে কত বড় লোকই না জানি আছে! তিন তিনখানা মোটর কার! রেশমী পর্দ্দায় গবাক্ষ-শ্রেণী সুশোভিত, তাহার পার্শ্বে নারিকেল ও গুবাকু বৃক্ষ। ল'নে, ময়ুর, ময়ুরী বর্ষার ভরা বাদরের তলে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যায় পর ঘোষজা মহাশয়ের দুহিতা ললিতা পিয়ানো বাজায় এবং সেই সঙ্গে বন্ধুগণ বাহবা দিয়া দার্জ্জিলিং-টী খান। সেই অবসরে বাটীর মা-জননী ঘোষজা-গৃহিণী গোশালায় গাভীগুলিকে দেখিয়া আসেন। ঘোষজা মহাশয়ও সেই সুযোগে এক ছিলিম তামাকু সেবন করিয়া হরিনামের মালাটি লইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করেন।

ঘোষজা মহাশয় দুগ্ধ বেচিয়া বড়লোক। গাভী তাঁহার মূলধন। দুগ্ধ তাহার সুদ। টাকা তাহার মূল্য। কেবল কলিকাতায় নহে, নারিকেলডাঙ্গা, টালা, শিবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার বিরাট গোগৃহাবলী। দুগ্ধ খাঁটি। কলিকাতা সহরে যত গাভীই থাকুক না কেন, শ্রীদাম ঘোষের গাভীর দুগ্ধ বিখ্যাত। পরিমাণে বেশী অথচ সুমিষ্ট। সেই দুগ্ধের গুণেই নবীন ময়রার রসগোল্লা, ভীম নাগের সন্দেশ ও পঞ্চানন মুখুয্যের রাবড়ি।

সময়ের গুণে কি না হয়? শ্রীদাম ঘোষকে এখন কেহ দেখিলে সে কালের শ্রীদাম বলিয়া চিনিতে পারে না। তাহার প্রধান কারণ শ্রীদামের দেহভার। বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীদামের সহিত একটা পতঙ্গের তুলনা হইতে পারিত, এখন একটা হস্তীর সহিত তুলনা চলে। শ্রীদাম ঘোষ তাহাতে দুঃখিত কি না, তাহা প্রকাশ করিতেন না। মনের কথা প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব ছিল না। গৃহিণী অনেক চেষ্টা করিয়াও কর্ত্তার মনোগত ভাব জানিতে পারেন নাই।

অথচ তাঁহার পক্ষে ইদানীং চলা-ফেরা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রতিবাসী নবীন মাষ্টার মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বুঝাইতেন; —"আপনি একটু দেশের জন্য কাঁদুন, যদি তাহাতে শরীর কমিয়া যায়।" নবীন দেশহিতৈষী ও প্রেমিক। মধ্যে মধ্যে নবীনকে দেখিয়া ঘোষজা মহাশয়ের বোধ হইত যে, পৃথিবীর মধ্যে মানব বলিয়া এক জাতি আছে এবং ভারতবর্ষ বলিয়া একটা দেশ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ ঠিক কি রকম, তাহা বুঝিতে পারিতেন না। হরিনামের মালা হাতে লইলে সেই চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইত।

হরিনামের মালা? মালা কি সকলে পছন্দ করে?

মাষ্টার মহাশয়কে একদিন ঘোষজা মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনার কি বোধ হয়? আমার উন্নতি হচ্ছে, না অবনতি হচ্ছে?"

মাষ্টার। আপনার কি বোধ হয়?

ঘোষজা। ঠিক বুঝা যায় না। প্রথমে যখন মোটা হ'তে আরম্ভ করলুম, তখন বোধ হ'ল যে, উন্নতি হচ্ছে। এখন ঠিক তাহার উল্টা বোধ হয়। আচ্ছা, আমি যদি এখন শীর্ণ হ'তে সুরু করি, তবে লোকে কি বল্‌বে?

মাষ্টার। অবস্থা খারাপ হচ্ছে বল্‌বে। অথচ সেটা উন্নতি বই আর কিছুই নয়। অনেকে বলে, মোটা ভাত-কাপড় ধরিলে সেটা অবনতি বুঝিতে হবে, অথচ যাঁহারা অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপ্ত বাবুগিরিতে বিরক্ত হয়ে এখন তাহা অবলম্বন করেছেন, তাঁহারা বলেন যে, এর চেয়ে মনুষ্যত্বের আর অন্য কোনও সুগম পথ নাই। সেই রকম, প্রথমে ছেলে-পুলে হ'লে উন্নতি বোধ হয়, কিন্তু গৃহ ভরিয়া গেলে বোধ হয় অবনতি।

ঘোষজা। ফল কথা, লোকে ভালই বলুক, আর মন্দই বলুক, আমাদের ক্রমে উন্নতিই হচ্ছে। তবে আমার মনে একটা সন্দেহ হয়। হয় ত আমরা ঠিক এক অবস্থাতেই

এক যায়গায় ব'সে আছি। উন্নতি অবনতি কেবল মনের অবস্থার উপর। যেমন সমুদ্রের ঢেউ। তারা বাস্তবিক দৌড়িয়া কোন দিকে যায় না।

২

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। প্রায় দুই দণ্ড ধরিয়া বৃষ্টিপাত হইয়াছে। এখন আকাশ পরিষ্কার। দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ। চন্দ্রমণ্ডলের শোভা দেখিবার লোক নাই। দশ বিশ বৎসর পূর্ব্বে দুই একটা প্রেমিক, কিংবা দুই এক জন কবি, চাঁদনিচকের চৌমাথা পার হইয়া গড়ের মাঠে পূর্ণিমা-নিশির ঝিল্লীরব শ্রবণ-মানসে শ্রাবণ মাসেও সিক্ত চটি জুতার সাহায্যে চলিয়া যাইতেন, তাহা দেখা গিয়াছে; কিন্তু এখন সে দৃশ্য বিরল।

না জানি কেন, আজ ঘোষজা মহাশয়ের খানিকটা হাঁটিয়া বেড়াইবার অভিলাষ হইল। দ্বিতল হইতে নিম্নে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হইল না। এমন কি, তাঁহার বোধ হইল যে, লাফ দিয়া পড়িলেও কোন ভয় নাই; এমন কি, তিনি কেবলমাত্র বায়ু অবলম্বনে শূন্যে বিচরণ করিতে পারেন। যাহা হউক, তিনি কাহারও মতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া পদব্রজে অনায়াসে উদ্যানের দিকে চলিয়া গেলেন।

সেই উদ্যানের পথের নাম ঘোষজা মহাশয় "বনপথ" রাখিয়াছিলেন। কলিকাতা সহরে "বন" কোথায়? বন সভ্য হইয়া উঠিলে তাহার নাম উদ্যান হয়। অথচ বনের জন্য আমরা এত ব্যাকুল কেন? বন,পর্ব্বত প্রভৃতি দেখিলে তাহাদের জন্য এত মায়া হয় কেন? হয় ত কোনও নিহিত পূর্ব্বস্মৃতি আমাদের জড়াইয়া আছে, জাতিস্মরতার অভাবে সেটা জাগরূক হয় না।

একে পূর্ণিমার নিশি, তাহাতে বনপথ। না জানি কেন, শ্রীদাম ঘোষের বৃন্দাবনের কথা মনে পড়িল। তিনি একটা বকুল বৃক্ষের অন্ধকারে বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতে লাগিলেন।

সংসার নশ্বর হউক, অলীক হউক, কিংবা স্বপ্নই হউক, ইহার দারুণ মায়াই আমাদের প্রাণ। এ মায়া ত্যাগ করিয়া বাহাদুরী কি? ক্রমাগত ঝিল্লীরবের মধ্যে তিনি তাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় একটা বংশীস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এটা পিয়ানোর ধ্বনি নহে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। দূরাগতও নহে, অন্তরেও নহে, খুব নিকটে। বোধ হইল তাঁহার পৃষ্ঠদেশে। ঘোষজা মহাশয় একটু ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও?"

অমনি কে যেন বলিল, 'শ্রীদাম, চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমি তোমার ব্রজের সখা।'

কিন্তু রূপ কোথায়? মূর্ত্তি না দেখিলে বিশ্বাস করে কে? দেখিলেই বা কে বিশ্বাস করে? ত্রিভুবন ছাড়িয়া ব্রজের সখা চৌরঙ্গীতে শ্রীদামের আলয়ে আসিবেন, এটা কি সম্ভব? ভক্ত বলিয়াই কি আসিয়াছেন? কিন্তু ভক্তির মধ্যে শ্রীদামের কেবল হরিনামের মালাজপ। এই সামান্য ভক্তিতে তাঁহাকে আকর্ষণ করা কি সহজ কথা?

ঘোষজা মহাশয়ের সন্দেহ হইল, কিন্তু সন্দেহ সত্ত্বেও বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বৃন্দাবনের মায়া একেবারে তিরোহিত হয় নাই। হয় ত মনের মধ্যে যে বাঁশী কখন কখনও বাজিত, তাহাই এখন বনের মধ্যে বাজিতেছে। ইতস্ততঃ চাহিয়া তিনি বলিলেন—

"ঠাকুর, ছলনা কর্‌ছেন না ত'?"

বকুলতলের ছায়ার মধ্যে আর একটা ঘনতর ছায়া! ছায়া বলিল, "আমি ঠাকুর নই, তোমার সখা।"

শ্রীদাম। আমি যে সেই শ্রীদাম, তার প্রমাণ কি?

ছায়া। আমি যে 'ঠাকুর', তারই বা প্রমাণ কি? আমার বিশ্বাস, তুমিই সেই শ্রীদাম, তুমি বিশ্বাস কর না কেন?

শ্রীদাম। ঠাকুর! শ্রীদামের গৃহ ছিল বৃন্দাবনে, আমার নিবাস কলিকাতা সহরে। শ্রীদাম গরু চরাইত, আমি দুধ বেচিয়া খাই। শ্রীদাম খেলা করিয়া বেড়াইত, আমি এত মোটা যে, চলিতে ফিরিতে পারি না। শ্রীদাম গোশালায় তোমার নিকট সারারাত্রি গল্প করিয়া কাটাইত, আমি তেতালার ঘরে আকাশের দিকে তাকাইয়া রাত্রি কাটাই।

ছায়া। তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই আবার সব কর্‌তে পার।

শ্রীদাম। আমার কি বৃন্দাবন যাবার শক্তি আছে?

ছায়া। রেলে চড়িলেই কি বৃন্দাবনে যাওয়া হয়? ভারতবর্ষের প্রত্যেক যায়গাই বৃন্দাবনের ছাঁচে গড়া। বৃন্দাবন যেমন শ্রীহীন, গ্রামগুলিও তেমনিই। এই যে বিশাল দেশ, যেমন তোমার বিশাল শরীর, তার প্রত্যেক রক্তকণায় বৃন্দাবনের রাখাল-রাজ্য। যত ধর্ম্মই প্রবর্ত্তিত হোক্ না কেন, তাদের গতি বৃন্দাবনের ধর্ম্মে। যত রাজ্যই প্রতিষ্ঠিত হোক্

না কেন, তাদের গতি সেই আর্য্যরাজ্যে। তুমি একটু ভেবে দেখ, আবার আর এক দিন আসব। আমার সাথীর অভাব। গোচারণের মাঠের অভাব, প্রেমের অভাব। আমার অভাবের জন্যই মা আদ্যাশক্তি এই সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে শান্তির স্থান এই দেশ। এই দেশের ভাব নিয়ে সব দেশ একত্র হবে। যতদিন না হবে, ততদিন ক্রমাগত ভাঙতে থাকবে। ভেঙ্গে ভেঙ্গে একত্র হবে।

৬

যখন বকুল গাছের পাখীগুলি প্রত্যূষে ডাকিয়া উঠিল, ঘোষজা মহাশয় নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নবীন মাষ্টার সকলকে লইয়া তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া।

ঘোষজা। ব্যাপারখানা কি ?

মাষ্টার। আপনি এখানে উঠে এলেন কি ক'রে ?

কন্যা ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ভাল আছেন ত ? আমরা ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছি।"

গৃহিণী মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ওঁর গায় হাত দিয়ে দেখ। জ্বর হয় নাই ত ?"

সকলের বিবর্ণ মুখ এবং ব্যস্ততা দেখিয়া শ্রীদাম ঘোষের খুব হাসিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কি মনে করিয়া হাসিলেন না।

ঘোষজা মহাশয় বলিলেন, "দেখ, বোধ হয়, তোমরা মনে করেছিলে যে, আমার এত দূর হেঁটে আসা অসম্ভব, কিন্তু ঠিক তা নয়। আমার বোধ হয়, সরু চাউলের ভাত ও পাতলা কাপড় প'রে আমার শরীর অথর্ব্ব হয়ে গেছে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় অভ্যাস করলে সেটা সেরে যাবে।"

আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, "তবে চৌরঙ্গীর মধ্যে মোটা কাপড় ও ভাত নিয়ে আসা অসম্ভব। প্রভু যখন মথুরায় রাখাল-রাজ্য সংস্থাপন করতে গিয়েছিলেন, তখন অনেক চেষ্টা ক'রেও পারেন নাই। হস্তিনাতেও পারেন নাই। ফলে সব ভেঙ্গে গিয়েছিল।"

ঘোষজা মহাশয়ের মতলব কোন্ দিকে, তাহা নবীন মাষ্টার খানিকটা বুঝিতে পারিলেও সকলে মর্ম্মগ্রহণ করিতে [illegible]। কাজেই গৃহিণীর [illegible] হইল যে, বাবার একটু গোল- [illegible]। [illegible] তাঁহার যৌবনকাল [illegible]।

ডাক্তার আসিয়া চুপি চুপি সেই মতেরই পোষণ করিলেন। বাটীতে বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। পাড়ার লোকে প্রচার করিল, "ঘোর উন্মত্ত অবস্থা, এমন কি, এই সময় সাবধান না হইলে রাস্তার ফুটপাথে ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিবেন, আর দেরী নাই।" পুলিসের ইন্স্পেক্টর আসিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, "আপনারা ওঁকে বাটীর বাহিরে যেতে দেবেন না, হয় ত জামিন মুচ্‌লিকার দরকার হ'তে পারে।"

কাজেই পিয়ানোর আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল। অনেকে ভয়ে খাইতে আসিল না। ভীতির সঞ্চারে ইন্দ্রিয়বর্গ স্তব্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল।

ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া ঘোষজা মহাশয় নবীন মাষ্টারকে ডাকিলেন।

ঘোষজা। কথাটা তলিয়ে বুঝেছ ত ?

মাষ্টার। খানিকটা।

ঘোষজা। এ রকম কষ্টময় জীবন-যাপন করা আমার মত মানুষের সাধ্য নয়।

মাষ্টার। তবে উপায় ?

ঘোষজা। আমাদের পূর্ব্বনিবাসে সকলকে নিয়ে যাওয়া আমার অভিপ্রায়। সেখানে অবশ্য একটা কূল-কিনারা পাওয়া যাবে।

মাষ্টার। এ ত সহজ কথা। একবার আজ্ঞা করলেই হয়।

ঘোষজা। তবে জিনিষপত্র বাঁধ। কালই রওনা হওয়া যাক্।

যদিও সকলের মনে হইল যে, "পূর্ব্বনিবাসে" গেলে কষ্ট, এমন কি, বিপদের সম্ভাবনা, তথাপি সকলে সম্মত হইল। কারণ, ঘোষজা মহাশয়ের দেহের ন্যায়, তাঁহার সম্পত্তিও বিশাল। পয়সা থাকিলে কষ্টের লাঘব হয়, বিপদের আশঙ্কাও কম। সুতরাং তাঁহাদের মতে, ব্যাপারটা অনেকটা বায়ু-পরিবর্ত্তনের মত। গৃহিণী বলিলেন, "ওঁর মতলব কি, ঠিক বুঝা যায় না। আপাততঃ গরুগুলো নিয়ে যাওয়া শক্ত হবে। অতি কম তিনশ গরু।" নবীন মাষ্টার বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা গ্রামের মাঠে ঘাস খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইবে। দুধ বেচিলে টাকা হইতে পারে, কিন্তু দুগ্ধ বিতরণ করিলে প্রজা সন্তানের মত [illegible] হয়। টাকা খরচ করিলে জিনিষপত্র হয়, কিন্তু লোকেই মানুষ বশীভূত হয়, টাকা যখন থাকে না, তখন মানুষে [illegible] পড়ে। [illegible] ধরিয়া রাখা যায়।

৪

যে "পূর্ব্বনিবাসের" উল্লেখ করা গেল, তাহা একটা বিস্তীর্ণ গ্রাম।

মাথার সঙ্গে দেহের অপরাংশের যে সম্বন্ধ, সহরের সঙ্গে গ্রামের সেই সম্বন্ধ। মন মাথার মধ্যে। হৃদয় অপরাংশের অন্তর্গত। মাথা জ্ঞানের আধার এবং বাক্যই তাহার সর্ব্বস্ব। মাথাটা ঠিক রাখিবার জন্য দেহ ব্যস্ত। কিন্তু দেহ ঠিক রাখিবার জন্য মাথা ব্যস্ত নয়। দেহ মাতৃস্থানীয়। মাথা সন্তান। আবর্ত্তনে দেহের জঠর হইতে মাথা বাহির হয়। মাথার যত অভাব হয়, দেহ তত খাদ্য যোগাইতে থাকে। দেহের পতন আরম্ভ হইলে, মাথা তাহার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে রত হয়।

শ্রীদাম ঘোষের দৃষ্টি জন্মভূমির দিকে আরোপিত হওয়াতে গ্রামের লোক মনে করিল যে, তিনি শ্রাদ্ধ-প্রক্রিয়াদির অনুষ্ঠান দ্বারা দশ জনকে অন্নদান করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার শৈশবের সাথী সকল কোথায়?" এবং বলিলেন, "আমি আবার বৃন্দাবনের নূতন পত্তন করিব," তখন সকলের সন্দেহ হইল যে, তাঁহার মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীদামের কথাবার্ত্তায় সেই ধারণা সকলের আরও বদ্ধমূল হইয়া পড়িল।

শ্রীদাম। তোমাদের গ্রামে বাঁশী আছে?

এক জন। বাঁশী বাজাবার লোক নাই।

শ্রীদাম। বাঁশ আছে?

এক জন। বাঁশীর উপযুক্ত নাই, লাঠির উপযুক্ত গোটাকতক আছে।

শ্রীদাম (মাষ্টারকে লক্ষ্য করিয়া) ব্যাপার দেখ্‌ছ ত?

মাষ্টার। এতে ধর্ম্ম আর থাকে না।

শ্রীদাম। যে সকল রাখাল গরু চরায়, তাদের এক একটা বাঁশী তৈয়ারি করিয়া দেও। আমার সঙ্গে তিনশ গরু এসেছে। তাদের বাঁশীর রবে চরাতে হবে।

এক জন। এত রাখাল পাওয়া দুষ্কর।

মাষ্টার। তারা গেল কোথায়?

এক জন। চাকুরী করবার জন্য লেখা-পড়া শিখ্‌ছে। এক ক্রোশ দূরে একটা স্কুল আছে, সেখানে।

মাষ্টার। তারা পড়ে কি?

এক জন। ইংরাজী পড়ে, বাঙ্গালাও পড়ে।

শ্রীদাম। গান করতে পারে?

এক জন। গান করা দূরে থাকুক, চেঁচিয়ে কথা কহিতে পারে না। জ্বরে জ্বরে সারা।

শ্রীদাম। গান করে না, সেই জন্য জ্বর হয়। মশা গান করে, তাই ম্যালেরিয়া সত্ত্বেও জ্বর হয় না। আমি সংকীর্ত্তনের দল বাঁধ্‌ব। সকলকে ডেকে একত্র কর। আমি নাচ্‌ব, আর তারা আমাকে ঘিরে বাঁশী বাজাবে।

সকলের মুখে একটু সন্দেহের ভাব দেখিয়া ঘোষজা মহাশয় মাষ্টারকে বুঝাইয়া বলিলেন, "এদের ভাব দেখে বোধ হচ্ছে যে, এরা আমাকে হয় ত পাগল ভাবে, নয় ত অন্নচিন্তা করে। অন্নচিন্তার কোন কারণ নাই। মোটা ভাত সকলেরই নিজস্ব। যারা স্বত্বের গণ্ডী বিস্তার ক'রে, অন্যের স্থান জমী দখল ক'রে বসেছে, তারা অল্পদিনেই বুঝ্‌বে যে, জমী রাখার যে বখেড়া ও খরচ, তার চেয়ে সকলে একত্র হয়ে লাঙ্গল, গরু, জমী ব্যবহার করলে লাভ বই লোকসান নাই। জমীর উপজাত জিনিষ কখনো বেশী জমানো উচিত নয়। বিক্রী ক'রে টাকা জমানোও কিছু নয়। এতে দস্যুবৃত্তি বাড়ে, অন্য যায়গার লোকও আক্রমণ করে। খেয়ে ব'সে থাক্‌লে আর ভয় কি? লাঠালাঠির ও যুদ্ধবিগ্রহের কোন দরকার হয় না। অধীনতা-স্বাধীনতার কোন পার্থক্য থাকে না। এই জন্য বনের পশু স্বাধীন। মানুষের দরকার কেবল পরস্পরের জন্য পরিশ্রম।"

মাষ্টার। একেই বলে ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম রেখে জন্মভূমিতে ম্যালেরিয়া জ্বরে মরা ভাল, অন্য একটা ধর্ম্ম নিয়ে আমাশয় রোগে মরা কিছু নয়। কেন না, কোনো রকমে মরতেই হবে। নূতন গর্ত্তে সকলের পরিত্যক্ত হয়ে মরার চেয়ে, যারা বহুপুরুষের ও বহু জন্মের সাক্ষী, তাদের মধ্যে মরা ভাল। সহরের পোষা পশু-পাখী মরণের সময় হ'লে নিজের পূর্ব্বনিবাসে এসে মরতে চায়।

ঘোষজা। আমি কাল থেকে পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার আরম্ভ করব। জলের ভাবনা থাক্‌বে না। আমার বাগানের আম যারা চুরি ক'রে খায়, তাদের বল, 'তোমাদেরই সম্পত্তি, লুকিয়ে আত্মসাৎ করবার দরকার নেই। যদি তোমরা খেয়ে কিছু বাঁচে, তবে এনে দিও।' আমার গরীব

সুখে কলিকাতা সহর খাড়া ছিল, এখন তাদের দিনকতক কষ্ট হবে, কিন্তু আমার অনর্থক টাকা বাড়ছিল। তোমরা সকলে মিলে দুধ খাও, দধি কর, ছানা কর, সন্দেশ কর, রসগোল্লা কর। আমাদের বংশের ভাল লোক যাঁরা ছিলেন, তাদের কথা বল, মাষ্টার ইতিহাস লিখ্‌বে। মেয়েছেলেদের লেখাপড়া শেখাও, তাদের স্নেহ ও করুণা, কথায় ও কর্ম্মে ফুটে বেরুক। মনুষ্যত্ব বেড়ে গেলে অন্ন-জ্বালা দৈন্য সকলই পালিয়ে যাবে। কেবল অন্নের অভাবে ও তোমাদের নির্ম্মম ও স্বার্থপর ব্যবহারে দেশের এই অবস্থা।

৫

যেমন পিপীলিকার পাখা উঠিলে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া পড়ে, সেই রকম কলিকাতার জীবন একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে গ্রাম্যজীবন যাপন করা অসহ্য হয়। কিন্তু ঘোষ-পরিবারের পক্ষে তাহার লক্ষণ বিশেষ প্রকাশ পায় নাই।

আহারের মধ্যে নূতন পাঁচ রকম শাক মাষ্টার মহাশয় আবিষ্কার করিলেন। তাহার মধ্যে একরকম কচুর শাক নিতান্ত সুমিষ্ট। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় বড় বড় মৌরুল্লা ও বাটা অপর্য্যাপ্তভাবে প্রকাশ পাইল। একটা জলাভূমে এত কই ও মাগুর ছিল যে, তাহার তদন্ত পূর্ব্বে কেহই ভাল করিয়া করে নাই। বৎসর বৎসর জ্বরের প্রাদুর্ভাবে তিন্তিড়ী ও আমড়া প্রভৃতি অম্লের সুব্যবহার উঠিয়া গিয়াছিল। গ্রামের পুরাতন এক জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সচন্দন তুলসীপত্রের পুনরুদ্ধার মানসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মাষ্টার মহাশয়ের সহিত গোপনে পরামর্শ করিলেন।

মাষ্টার মহাশয় বুঝাইলেন যে, কারাগারে বন্দী হইলে যেমন মশকদংশনে কিছু আসে যায় না, সেই প্রকার আহার প্রভৃতির পরিবর্ত্তনে এবং সংযমে মশার কামড় হিতকারী হইয়া উঠে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই, [illegible] এবং লতাগুল্মের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার বিষই অনায়াসে পরিপাক করিতে পারে। কিন্তু তাহার 'তদ্‌বির' চাহি।

এ দিকে ললিতা রমণীসমাজ সংস্থাপনের জন্য পিয়ানোর [illegible] কনসার্ট ছাড়িয়া দিল। গ্রামের গোপালদমার পক্ষে [illegible] একটু কষ্টকর হইলেও বাঁশী অচিরাৎ তাহাদিগের [illegible] হইয়া গেল। [illegible]

অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি হওয়াতে গ্রামের গাইকলজি,—নূতন আকার ধারণ করিল। গাভীকুল, বাঁশীর স্বরে মুগ্ধ হইয়া বেশী দুগ্ধ দিত, তাহার সন্দেহ নাই; গ্রামের নবীন তৃণ খাইয়া এবং মনের আনন্দ পাইয়া, দুগ্ধের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "সৃষ্টিতত্ত্বে ইহা অতিশয় গূঢ় প্রণালী। কেবল ভক্তির আকর্ষণেই মাতার দুগ্ধক্ষরণ হয়। সে মাতা ধরিত্রী কিংবা জন্মভূমি কিংবা গাভী যাহাই বলুন। অন্য কোনো উপায়ে জোর করিয়া অন্নবর্দ্ধন অসম্ভব। কারণ, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি যত উপকরণ—অর্থাৎ দেবগণ—সেই ভক্তিরই অধীন। আপনি বোধ হয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ পড়িয়াছেন ?"

মাষ্টার। না পড়িলেও বুঝা যায়। সন্তানের ভক্তি না থাকিলে মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ শুকিয়ে যায়, তা স্বচক্ষে দেখেছি।

ঘোষজা-গৃহিণী কথোপকথনে যোগ দিলেন;—"ললিতা বল্‌ছে যে, যত স্ত্রীলোককে সে স্বাধীন করবে। তার অর্থ কিছু বুঝ্‌তে পারছ, মাষ্টার ?"

মাষ্টার। তাহার অর্থ ভাল বই মন্দ কিছুই না। দেশের সকলের যাতে ভাল হয়, সকলের স্বাস্থ্য ও চরিত্র যাতে গড়িয়া তোলা যায়, সেই সঙ্কল্পে যাহারই অনুষ্ঠান হোক না কেন, তাহাই স্বাধীনতার লক্ষণ। স্বয়ং ভগবানের সঙ্কল্প যে দিকে, সেই দিকে মানবের সঙ্কল্প বুঝিলে স্বাধীনতার অর্থ বুঝা যায়। সংসারের বাধা-বিপত্তি বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে যায়। সে পথে অধীনতা স্বীকার করাও স্বাধীনতা। ইহা ছাড়া অন্য রকম স্বাধীনতার চেষ্টা ক্ষণিক, সেই বালির বাঁধের মত।

ভট্টাচার্য্য। সন্তানদের লালনপালন করবেন ব'লে জগদ্ধাত্রী স্ত্রীরূপে অবতীর্ণা। সেই ব্রতেই তাঁরা স্বামিগৃহে অধীনতা স্বীকার করেন। স্বামী ও সমাজ উভয়ে তাঁহাদের উৎপীড়ন ও অবমাননা করায় দেশ পতনোন্মুখ। কেবল এই দেশ নয়, সকল দেশেরই এক অবস্থা। সংসারে পাপ-পুণ্যের অংশ সমান। পাপে নিবৃত্তির জন্য ব্রাহ্মণের উপর ধর্ম্মভার ন্যস্ত হয়েছিল।

মাষ্টার। একসময় আপনারা অনেক কায করিয়া গেছেন। ধর্ম্মপ্রচারকগণও সাহায্য করেছেন। কিন্তু পাপের নিবৃত্তি ও তাহার জন্য শাসন, দণ্ড ও সংযমে দু একজন [illegible] [illegible]

মানুষ ব'লে ধরা যায়, তবে তাহার চরিত্র, তাহার স্বাস্থ্য, তাহার উদ্ধার ও মুক্তি সকলের একত্রিত শক্তিসাপেক্ষ। সকলের পরিশ্রম, সম্মিলিত দায়িত্ব, সকলের সমবেদনা—এই সব সমস্যা এই যুগের। যিনি মানব সকলকে এই পথে একত্রিত করিতে পারিবেন, তিনিই পূজ্য। আপনারা এক সময় চেষ্টা করেছিলেন; এই জন্য এখনও পূজ্য।

ঘোষজা-গৃহিণী। তবে কি সকলে একাকার হয়ে যাবে, বাবা?

মাষ্টার। মোটেই না। যাহাদের যতদূর সম্মান, যাহারা যতদূর কৃতী, সমাজ আপনিই ঠিক ক'রে দেবে। ধন যাদের হাতে থাক্‌লে সুব্যবহার হবে, তাদের হাতেই ন্যস্ত হবে। যারা দেশ রক্ষা করতে পারবে, তারাই ক্ষত্রিয় হবে। অথচ সকলেই পরস্পরের সেবা ক'রে শূদ্রত্ব গ্রহণ করবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সদ্‌ব্রাহ্মণ, তাহাই থাক্‌বেন। তাঁর অন্ন কেহই কেড়ে নেবে না। আমাদের সনাতন 'আর্ট' অতি সুন্দর। কেবল স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে গিয়ে বিকৃত হয়েছে। এখন শাসন কেবল পরিশ্রমের মধ্য দিয়াই হবে। সেই সমস্যাই অতিশয় জটিল। কারণ, আমরা বিরাট অলসের দল।

৬

মাষ্টারের বোধ হয় আরও বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ললিতা সেই সময় আসিয়া পড়াতে বলিলেন, "আমি একবার ঘোষজা মহাশয়কে দেখে আসি।"

ললিতা মাষ্টার মহাশয়ের বক্তৃতা আড়াল হইতে শুনিয়াছিল এবং নিজের মতের মত কথাগুলি হওয়াতে নিতান্ত উৎফুল্ল মুখে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বসিল।

ভট্টাচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বংশের মুখোজ্জ্বল কর।"

ঘোষজা-গৃহিণী। ক'দিন মাটীতে শুয়ে গা হাত পা ব্যথা কচ্ছে। তোর অবস্থা কি রকম?

ললিতা। অনেক ভাল। শুনেছিলুম যে, কলের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে তফাৎ এই যে, মানুষ নানা দিক্ দিয়ে বাড়ে কমে। চৌরঙ্গী ছিলুম একটা ঘড়ির মত। সব বাঁধা। এখন দেখ, অনেক রকম কর্ম্মী করেছি। বুঝিয়ে বলি,—এ গ্রামের স্ত্রীলোকও কলের মত ছিল। কলসী কাঁখে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হ'ত, চারিটি খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেপুলেদের জন্য এসে অন্ধকার ঘরে তাদের ছেঁড়া মাদুরের পাশে শুয়ে কাঁদতো। হয় ত সন্ধ্যার সময় স্বামীর জুতো লাথি খেয়ে, পুকুরের পাড়ে গিয়ে আত্মহত্যার চিন্তা করত।

ঘোষজা-গৃহিণী। এখন কি যুদ্ধ করবে?

ললিতা। ঠিক্ তা নয়, সকলে মিলে মেহনত্ করবো। পতনের সময় সমস্ত শরীর যেমন পরস্পরকে সাহায্য ক'রে প্রাণরক্ষা করে, তেমনিই আমরা সকলে মিলে দেশ রক্ষা করব। এই দেখ, তার 'প্রোগ্রাম।'

১।—প্রাতঃকাল। দুগ্ধ-নিবাসে। গাভী-দোহন। মাখন তোলা। দুগ্ধ জ্বাল। ছানা প্রস্তুত। গ্রামের যাহা দরকার, তাহা রাখিয়া, বাকি কলিকাতায় চালান।

অন্নশালায়।—গ্রামের সকলের অন্নব্যঞ্জন রন্ধন। স্নান করিয়া সকলের ঠাকুরমন্দিরে নমস্কার। তাহার পর আহার।

রোগিনিবাসে।—একত্রিত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা।

ভট্টাচার্য্য। সকলই কি স্ত্রীলোকে করবে?

ললিতা। যারা চাষী, তারা চাষ করিতে যাবে। বাকি পুরুষ স্ত্রীলোকদের সাহায্য করবে। যাদের শরীর দুর্ব্বল, তারা হাল্কা পরিশ্রম করবে।

২।—দ্বিপ্রহর। চরকা-নিবাসে। সুতাকাটা, পরিধেয় বস্ত্র তৈয়ারি।

৩।—বৈকাল। অন্নবস্ত্র-ভাণ্ডারে—দুই বৎসরের আহার্য্য ও বীজের উপযুক্ত শস্য সংগ্রহ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ। ইহা একত্র হইলে কতকগুলি নির্ব্বিঘ্ন স্থানে ভাগ করিয়া রাখার বন্দোবস্ত, নচেৎ দস্যুভয়।

৪।—সন্ধ্যা। কনসার্ট পার্টি ও সংকীর্ত্তন। ঠাকুর-বন্দনা।

কোন্‌টা কি করিয়া হবে, ও কাহার হাতে কোন্ ভার দেওয়া যাবে, তা এখনও স্থির হয় নাই।

ঘোষজা-গৃহিণী। এ ত সকলই হোটেলের কাণ্ড-কারখানা।

ভট্টাচার্য্য। এত কার সকলে একত্র পেরে উঠবে?

ললিতা। আর কোনো সোজা উপায় নাই যে, কাজ ভাল লাগে না, সে কাজে কেউ হাত দিতে চাইবে' না। আমার [illegible] [illegible] যে, 'পরস্পরের হিতের জন্য যে কাজ

তা একবার মনে লাগ্‌লে চিরকালই ভাল লাগে। আবার তার মধ্যে আমোদ-প্রমোদ থাক্‌লে খুব উৎসাহ বাড়বে।

ভট্টাচার্য্য। এই সকল নিবাস ও ভাণ্ডার কবে নির্ম্মাণ হবে, মা?

ললিতা। ছ'মাসের মধ্যে সবই হয়ে যাবে। গ্রামেই স্কুল পাঠশালা হবে।

ভট্টাচার্য্য। তোমার কি বিশ্বাস যে, লোকের আবার ধর্ম্মে মতি হবে, ও পরস্পরের জন্য সকলে নিজের নিজের স্বার্থ ত্যাগ কর্‌বে?

ললিতা। আমার বিশ্বাস যে, সাধারণ লোকের ধর্ম্মে মতি কেবল এই যুগে আরম্ভ হবে। পূর্ব্বে যাহা ছিল, সেটা সমাজের ভয়। সে সমাজ ভেঙ্গে গিয়ে এখন পরস্পরের আত্মরক্ষার জন্য যে ভাবনা উপস্থিত হবে, তাহার সমস্যা কেবল ধর্ম্মই পূরণ কর্‌তে পারবে। সেই ধর্ম্মই মানব-ধর্ম্ম। লেখা-পড়া শিখে যদি সেটুকু না হয়, তবে সব ধ্বংস হয়ে যাক্, সেই ভাল।

৭

ঘোষজা-গৃহিণী সেকালের স্ত্রীলোক। সকল বিষয়েই আতঙ্ক, বিপদের ভয়। ভট্টাচার্য্যই তাঁহার ভরসা। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আপনি সতী, সাধ্বী, লক্ষ্মী। আপনার বিষয় অগাধ। কোন বিপদ্ ঘটিলে টাকা দিয়ে সাম্‌লে নিতে কতক্ষণ?"

গৃহিণী। যদি একটা তুমুল যুদ্ধ বাধে, তবে সামান্য টাকায় কি হবে? আমার ত দশ বিশ লাখ্ টাকার চেয়ে বেশী নাই। তাও ছাই, বেশী ভাগ ব্যাঙ্কে। স্ত্রীলোকরা যদি ক্ষেপে উঠে, তবে ব্যাঙ্ক কত দিন থাক্‌বে?

অনেকেই মনে করিয়াছিল যে, ঘোষজা মহাশয়ের পাগ্‌লামি তাঁহার কন্যা ললিতা ও মাষ্টার মহাশয়ের মাথায় সঞ্চারিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই পাগ্‌লামি স্ত্রীলোকদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া পড়াতে গ্রামের মণ্ডল, প্রধান, চৌকীদার প্রভৃতি সকলেই ত্রস্ত হইয়া পড়িল। শরীরে নবজীবন সঞ্চারিত হইলে এবং দেহ নববলে দৃপ্ত হইয়া উঠিলে, পুরাতন জীর্ণ ভাগগুলি প্রথমে বাধাবিপত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এমত স্থলে সৎপরামর্শ, বক্তৃতা প্রভৃতি বৃথা। সম্মার্জ্জনীর সুব্যবহারই স্ত্রীলোকদিগের ব্রহ্মাস্ত্র।

ঝাঁটা হস্তে, অশ্রুসিক্ত নয়নে, সারি সারি স্ত্রীলোক দেশের হিতের জন্য দাঁড়াইয়া পড়াতে অনেকের স্বামী, পিতা ও ভ্রাতা এবং অনেক পিসী ও মাসী, ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল, "এই কাযটাই ঠিক, নয় ত ভগবান্ স্বপ্নে দেখা দেবেন কেন?" যাহারা নিতান্ত অলস, তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া আসাম প্রভৃতি যায়গায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহাদের নিরস্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধ দল অন্যদিকে দাঁড়াইয়া গেল। "বিদেশে গিয়া দামু ঘোষের ও শ্রীপতি মণ্ডলের অবস্থা কি হয়েছিল, মনে নাই? সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, কুৎসিত রোগগ্রস্ত হয়ে যখন দেশে ফিরে এল, তখন তাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার হাড় ক'খান ভাগাড়ে। মানুষ ও পশুর মধ্যে তবে প্রভেদ কি? সখের জন্যই মানুষ বিদেশে যায়। পরিশ্রম কর্‌লে ও বুদ্ধি থাক্‌লে, সকল সখের জিনিষই দেশে আমদানী করা যায়। যদি ভগবান্‌কে পাওয়াই মনুষ্যত্বের উদ্দেশ্য হয়, তবে বিদেশে গিয়া লাভ কি?"

অনেকে বলিল, "আমরা মেহনত্ ক'রে যা উপার্জ্জন করেছি, তা পরের পেটে যাবে কেন?" স্ত্রীলোকরা তাহার উত্তরে 'আপন' ও 'পরের' তথ্য বুঝাইতে আরম্ভ করিল।

মাষ্টার মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন, "পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার সোজা কথা, আমাদের মনে যে পাঁক্ পড়েছে, তারই উদ্ধার কর্‌তে অনেক দিন লাগ্‌বে।"

যাদের সংসারে সম্পত্তি কম, তাদের ভাগই সমাজে বেশী। দীন-হীনের দল লইয়া গ্রামের ফৌজ। দীনহীন লোকই প্রেমের কাঙ্গালী। তাহারাই শ্রীদাম ঘোষের দলে প্রথমে জুটিয়া গিয়াছিল। পরে তুমুল স্বার্থ-সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ঘোষজা-গৃহিণী শান্তিস্থাপনের জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত ধন অপর পক্ষকে দিয়া বিবাদ মিটাইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বনিবাসে স্বাধীনতা প্রথমে পূর্ণভাবে প্রচারিত হওয়াতে সহর হইতে অনেক লোক দেখিতে আসিল। তাঁহারা বলিলেন, 'ঝাঁটার গুণে কায সুচারুরূপে সুরু হয়ে গেছে। শেষ রক্ষার বেশ সম্ভাবনা।'

তাহার কোন সন্দেহ রহিল না।

বৃহৎ 'নিবাস' ও 'ভাণ্ডার'গুলি নির্ম্মিত হইলে, পরিশ্রম করিবার লোকের অভাব রহিল না। স্ত্রীলোকই তাহার নেত্রী, ভক্তিই তাহার মূল।

প্রেমের অবলম্বন পাইলে প্রাণে যে উৎসাহ হয়, তাহাতে

রোগ, শোক, মৃত্যুভয় থাকে না। 'আমার কেহই নাই,' 'আমার কিছুই নাই,' এই নিদারুণ ভাবই রোগশোকের মূল। যখন সকলের বিশ্বাস হইল, 'এরা সকলই আমার, ও আমিও সকলেরই,' তখন ধর্ম্মে বিশ্বাস হইল, এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপিত হইল।

সকলের চেয়ে নূতন ধরণের 'ললিতার কন্‌সার্ট পার্টি।' সেই কনসার্ট পার্টি যে কেবল পিয়ানো ও বাঁশীর 'ঐক্যতান বাদন', তাহা নয়। সেটা দেশের স্ত্রীলোকের সমবেদনা ও সহানুভূতির সঙ্গীত। বহু যুগ বাহিয়া সেই সঙ্গীতের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতেছিল, এখন তাহার প্রথম পল্লব দেখা দিল। কনসার্ট পার্টি ক্রমে সামাজিক পার্টিতে পরিণত হইল। তাহার মূলে ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যা। র‍্যাশনলিষ্টিক্ আর্ট তাহার শাখা, এবং পলিটিক্‌স তাহার প্রশাখা মাত্র। দীপ্তধর্ম্মের বলে পাপ, লাম্পট্য, দস্যুবৃত্তি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল।

৮

শ্রীদাম ঘোষ কোথায়?

শ্রীদাম ঘোষ বনপথে। পূর্ব্বনিবাসের উত্তর ভাগে একটা বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। কৃষ্ণদর্শনলালসায় তিনি সেখানে একটা ঘর বাঁধিলেন।

শ্রীদামের এখন আর কলিকাতার শরীর নাই। অতিশয় শীর্ণ। কৃষ্ণমূর্ত্তি, গাত্রে নামাবলী, সর্ব্বদাই মুখে হাসি, মুখে হরিনাম। সঙ্গে গ্রামসংকীর্ত্তনের দল। ভট্টাচার্য্য সেই দলে মিশিয়াছেন।

শ্রীদাম ঘোষ বলিলেন, "ভারতবর্ষের ইহাই বিশেষত্ব। একটা দেশ ধরিত্রীর মাঝে চিরকাল থাকিবে, তাহা সকল দেশের হৃদয়-স্বরূপ। শোণিত দিয়া জগৎকে পালন করিবে সে। নচেৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই মিথ্যা। সে কখনও পাশবিক বলের অনুমোদন করিবে না, কারণ, তাহার পশ্চাতে জ্ঞানময় ঈশ্বর সংসারের নশ্বরতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মানবের দৃষ্টি-পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। তাহাই এ দেশের দর্শন শাস্ত্র।"

"তোমরা যোগে বসিয়া অন্তর্দৃষ্টির চেষ্টা কর কেন? এই দৃশ্য সংসারই তাঁহার অন্তরে। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। বিজ্ঞান দিয়া পরীক্ষা কর, জ্ঞানশাস্ত্র দিয়া কর, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্ম দিয়া পরীক্ষা কর, দেখিবে যে বাহিরে ও অন্তরে তফাৎ নাই। তোমার নিজের মনস্তত্ব ছোট। দেশের মনস্তত্ব তার চেয়ে বড়। সকল দেশের মনস্তত্ব আরও বিস্তৃত।"

"মনস্তত্ব অধ্যয়ন করিতে হইলে, প্রথম সোপান সংকীর্ত্তন। রাগ-রাগিণী তাহার বাহন। সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেই দেখ্‌বে যে, বনপথে গিয়া পড়েছ। যদি সাথী না থাকে, তবে ভয় হবে। এই বন হ'তেই হিংস্রক পশুর দল সঙ্কীর্ত্তনের চেষ্টায় মানুষের অবয়ব ধারণ করেছিল। সেই চেষ্টার ফলে ভাষা ও গান। পশুর অন্তরের প্রথম উত্তম রাগ-রাগিণীর মূলে। হঠাৎ সকলে একত্র হয়ে সামগান প্রচারিত করে-ছিল। মানুষ ও পশু একত্র হয়ে প্রথমে অরণ্যে গান আরম্ভ করে। ক্রমে মানুষের সমাজ স্বতন্ত্র অবস্থা ধারণ কর্‌বার পর, পশুর সঙ্গে তাদের বিবাদ-বিসংবাদ। কিন্তু কীট-পতঙ্গের সঙ্গেও আমাদের বাস্তবিক কোন ঝগড়া নাই। তবে তারা আমাদের হিংসা করে কেন?"

শ্রীদাম ঘোষের মাথা খারাপ সাব্যস্ত হইলেও অনেকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, শ্রীদামের মূর্ত্তি ও ভাব কৃষ্ণেরই মত। এমন কি, এই শ্রীদামই হয় ত এককালে তাঁর বৃন্দাবনের সখা ছিল।

ঘোষজা মহাশয় বলিলেন, "অমন কথা ব'ল না। আমি দুধ বেচিয়া টাকা সঞ্চয় করিতাম। আমি কি প্রভুর পায়ের যোগ্য?" ইহা বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

ললিতা দুগ্ধ ও ফলমূল লইয়া গোপললনাদের সঙ্গে পূর্ব্ব-নিবাস হইতে প্রত্যহ পিতাকে দেখিতে আসিত। শ্রীদাম ঘোষ একদিন হঠাৎ বলিলেন, "ললিতা! যদি তোমার কাহাকেও স্বামিরূপে বরণ কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, তবে মাষ্টার মহাশয়ই তোমার যোগ্য। আমি প্রভুর পাদপদ্মের সন্ধানে দেহ উৎসর্গ করেছি। বেশী দিন নাই।"

আবার দোল পূর্ণিমার নিশীথিনী! সংকীর্ত্তন শেষ হইয়া গেলে শ্রীদাম ঘোষ অন্ধকারে বকুলবৃক্ষের ছায়ার নীচে বসিয়া। বনকুসুমের সুগন্ধিতে অরণ্য প্লাবিত!

কোথা হইতে মলয় সঞ্চারিত হইল!

আবার সেই বংশীধ্বনি!

শ্রীদাম বিভোর হইয়া বলিল, "সখা! তোর কি সত্য সত্যই আমাকে মনে আছে? তবে ছলনা কেন?" শ্রীদামের আঁখি অশ্রুভরা।

কে যেন বনফুলের মাল্যভার গলদেশে বহন করিয়া ধীরে

ধীরে শ্রীদামের দেহ তাহার কোমল স্নিগ্ধ বাহুযুগে বেষ্টন করিল। এবার ছায়া নহে। যথার্থই কৃষ্ণমূর্ত্তি। যে মোহিনী মূর্ত্তিতে সমুদ্রমন্থনের গরল প্রশমিত হইয়াছিল, ইহা সেই মূর্ত্তি।

মূর্ত্তি প্রেমভরে বলিল, "তোর সঙ্গে আমার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই শ্রীদাম! আমি বলেছিলাম, আবার দেখা হবে, তাই এসেছি। তোর মত আর দশ জন পেলে আবার রাখালরাজ্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হবে। আমাকে মনে রাখিস্। আমি প্রেমের কাঙ্গালী। সৃষ্টি মিথ্যা হইলেও, তাহার সার্থকতা না থাকিলেও, আমি প্রেমের জন্য পাগল।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মারাঠা বীর।

শুনিয়া জননী পুত্র তাঁহার হারিয়া এসেছে রণে,
দুঃখে বিষাদে অশ্রু দু' ফোঁটা ফেলিলা সঙ্গোপনে।

অঞ্চলে মুছি' আঁখি
পুত্রে কহিলা ডাকি'—
ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠ তাঁহার—"হা রে হতভাগা, হা রে!
যুদ্ধক্ষেত্রে তুচ্ছ ও প্রাণ রাখিতে পারিলি না রে?

লাজে অবনত শিরে,
হারিয়া আসিলি ফিরে!
আপন জীবন দিতে পারিলি না?—আপদ যাইত চুকে।
মারাঠা বীরের তনয় হইয়া ফিরে এলি কোন্ মুখে?

রাজপুতগণ সনে,
যুঝিতে যুঝিতে রণে,
এক দিন তোর স্বর্গীয় পিতা প্রাণ দেন অবহেলে;
হায়, হতভাগা কুলকণ্টক, তুই না তাঁহারি ছেলে?"

পুত্র কিছু না কহে,
স্তব্ধ মৌন রহে,
জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ অগ্নির সম জ্বলে উঠে আঁখি দু'টি,
মুক্ত কৃপাণ টানি লয়ে করে বাহিরে আসিল ছুটি'।

রণ-ভেরী উঠে বাজি';
বাহির হইল সাজি,
শত শত বীর সামরিক সাজে—"বোম্, বোম্, হর" রবে।
হেরেছে হেরেছে সে বার, কিন্তু এ বার জিতিতে হ'বে।

পুণ্য-বিপাসা-তীরে,
সন্ধ্যা নামিছে ধীরে
মিলিল তখন মারাঠা সৈন্য পুনঃ যুঝিবার তরে;
চলিল যুদ্ধ মারাঠা মোগলে সপ্ত দিবস ধরে।

এ দিকে মারাঠা-পুরে,
শত শত ক্রোশ দূরে,
মারাঠা বীরের বিধবা মহিষী উদাসীনা উন্মনা—
পুত্রের লাগি ইষ্টদেবের করিছেন আরাধনা।

সপ্তাহকাল পরে,
ফিরিল আপন ঘরে,
যুদ্ধে বিজয়ী মারাঠা সৈন্য মত্ত বিজয়-নাদে,
উড়ায়ে নিশান বাজায়ে বিষাণ হুঙ্কারি আহ্লাদে।

পুত্র আসিছে ফিরে,
বিজয়-মাল্য শিরে,
জননী তাহার চন্দন, ফুল, কুঙ্কুম লয়ে করে,
শুভ্র বসনে মধুর হাস্যে দাঁড়ায়ে দুয়ারপরে।

পুত্রের লাগি তাঁ'র,
সবুর সহে না আর।
সহসা সেথায় বীর সেনাপতি কুর্ণিশ করে আসি',
নয়নে অশ্রু, ঘর্ম্ম ললাটে, অধরে শুষ্ক হাসি।

"পুত্র রহিল কোথা?"
মহিষীর ব্যাকুলতা,
হেরি', সেনাপতি ফুকারিয়া উঠে করপুটে মুখ ঢাকি'—
"জিতিয়া এসেছি আমরা, কিন্তু তাঁহারে এসেছি রাখি।"

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

স্মৃতি-সৌধ।

৪

দিল্লীর বহু স্মৃতি-সৌধের মধ্যে ফিরোজ শাহের স্মৃতি-সৌধও উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্য্যে ও বৈশিষ্ট্যে ইহা প্রসিদ্ধ না হইলেও ফিরোজের সমাধি-সৌধ ঐতিহাসিক হিসাবে দ্রষ্টব্য।

তোগলকাবাদের সংস্থাপক তোগলকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহম্মদ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন রাজ্যে শান্তি বিরাজিত। তিনি যদি বা তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়া থাকেন, তবুও লোক তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল না। তিনি স্বয়ং সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার দোষ প্রকাশ পাইতে ও প্রবল হইতে লাগিল। তিনি দানে যেমন মুক্তহস্ত ছিলেন, নিষ্ঠুরতায় তেমনই অপরাজিত ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদদ্বারে তাঁহার সাহায্যপুষ্ট ভিক্ষুকের দল ও তাঁহার ক্রোধে নিহত ব্যক্তিদিগের শব সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইত। তিনি অত্যাচারের নানারূপ প্রথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষিত হস্তীরা লোককে শুণ্ডে তুলিয়া দন্তসংবদ্ধ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে পাতিত করিত। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজদ্রোহী সন্দেহ করিয়া তাঁহার দেহ হইতে চর্ম্ম ছাড়াইয়া লয়েন এবং মৃত ব্যক্তির মাংস রন্ধন করিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট প্রেরণ করেন। নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি মহারাষ্ট্রে পুনার নিকটস্থ দেবগিরিকে দৌলতাবাদ নাম দিয়া দিল্লীর অধিবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক তথায় যাইতে বাধ্য করেন এবং সেই সর্ব্বস্বান্ত প্রজাবর্গ অনাহারে ও রোগে মরিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি প্রদান করেন। বিপুল অর্থব্যয় করিয়া শেষে তিনি পিত্তলের মুদ্রা প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন। তখন স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতীত অন্য ধাতুর মুদ্রা রাজার দৈন্যের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। বিশেষ সুবিধা পাইয়া লোক গোপনে পিত্তলের মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে এবং বিদেশী ব্যবসায়ীরা পিত্তলের মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। তিনি রাজস্ব বৃদ্ধি করায় গ্রাম জনহীন হয়। বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রদেশে শাসকরা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই অবস্থায় ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহম্মদ ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হয়েন।

ফিরোজ শাহের স্মৃতি-সৌধ।

মহম্মদের মৃত্যু হইলে তাঁহার সিন্ধুপ্রদেশস্থ সেনানায়করা তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ফিরোজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফিরোজের জননী দীপলপুরের হিন্দুরাজার দুহিতা—পিতা তুর্ককে কন্যাদান করিতে অস্বীকার করিলে তুর্কেরা তাঁহার রাজ্যে প্রজাপুঞ্জের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে এবং

রাজপুত্রী তাহাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া তুর্ককে আত্মদান করেন। তাঁহার পুত্র ফিরোজ পিতৃব্য কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সিংহাসন লাভ করেন, তখন তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর

তিনি দয়ালু ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন এবং সিংহা-সনে আরোহণ করিয়াই মহম্মদের শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। তিনি যুদ্ধ ও নরহত্যা ঘৃণা করিতেন এবং দাক্ষিণাত্যে ও বঙ্গদেশে শাসকদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার উজীর মকবুল খাঁ বিচ-ক্ষণ উপদেষ্টা ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে এতই শ্রদ্ধা করিতেন যে, কামিনীবিলাসী উজীরের শুদ্ধান্তে গ্রীক্ হইতে চীনা সর্ব্বজাতীয়া ২ হাজার রমণী থাকিলেও তাঁহার প্রত্যেক পুত্রের ও কন্যার জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন।

মহম্মদের পিত্তলমুদ্রা।

মহম্মদ কৃষকদিগকে যে ঋণ দান করিয়াছিলেন, তাহারা তাহা পরিশোধ করিতে পারিতেছে না, দেখিয়া ফিরোজ তাহাদিগকে ঋণদায়ে মুক্তি দিয়া খতপত্র নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং রাজস্বের হার কমাইয়া দেন। ফলে প্রজার ঘরে অর্থ ও অলঙ্কার সঞ্চিত হয়। প্রজার সন্তোষে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

তিনি উদ্যান রচনা করিতে ভালবাসিতেন এবং দিল্লীর চারিদিকে ও অন্যান্য স্থানে ১২ শত উদ্যান রচিত করেন। সকল উদ্যানে সপ্তবিধ আঙ্গুর থাকিত এবং বাগান হইতে ফলক্রয়ের আয় ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা হইয়াছিল। সমসাময়িক লেখক আফিফের মতে তাঁহার রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ—৬ কটি ৮৫ লক্ষ টাকা। দুই শতাব্দী পরে সম্রাট আক্‌বর বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্ব ইহার ৩ গুণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব-পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

উদ্যানরচনার মত নগররচনাতেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ ছিল। তিনি রাজ্য লাভ করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হই-বার সময় তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি সেই স্থানে এক নগর পত্তন করেন। বাঙ্গালা প্রদে-শে অভিযান-কালে তিনি একদালাকে "আজাদপুর" ও পাণ্ডুয়াকে "ফিরোজা-বাদ" নামে অভিহিত করেন। দিল্লী হইতে ৫ ক্রোশ দূরে তিনি আর এক "ফিরোজাবাদ" রচনা করেন। এ বিষয়ে তিনি তোগলকের

কলন মসজেদ।

ও মহম্মদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠস্থিত ফিরোজাবাদ ও যমুনার কূলে রচিত হয়। মালিক-গাজী শানা ও আবদুল হক নামক ২ জন প্রসিদ্ধ স্থপতি নগর-রচনার তত্ত্বাবধান করিতেন। অর্থের অভাব হইত না। কারণ, ফিরোজ বিপুল বিত্তশালী ছিলেন এবং রাজস্বের হিসাব ও তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাব স্বতন্ত্র রক্ষিত হইত।

কদম শরিফ।

কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ফিরোজাবাদের কথায় লিখিয়াছেন, সর্ব্বদাই এত লোক দিল্লী হইতে ফিরোজাবাদে এবং ফিরোজাবাদ হইতে দিল্লীতে যাতায়াত করিত যে, রাজপথ সর্ব্বদাই জনাকীর্ণ থাকিত। এই সকল যাত্রীর জন্য যান-বাহনের সুব্যবস্থাও ছিল—খচ্চর, ঘোড়া ও পাল্কী নির্দ্দিষ্ট ভাড়ায় পাওয়া যাইত—পাল্কীর ভাড়া ছিল—৮ আনা। তদ্ভিন্ন ভারবাহীর অভাব ছিল না। সহরে সাধারণের জন্য ৮টি মসজেদ নির্ম্মিত হয়—কোন কোনটিতে ১০ হাজার লোক উপাসনা করিতে পারিত। বর্ত্তমান কলন মসজেদ সেই সকলের অন্যতম বলিয়াই অনুমান হয়।

সহরের বাহিরে তোগলক শাহের সমাধির মত দুর্গপ্রাচীর-বেষ্টিত একটি স্মৃতি-সৌধ বিদ্যমান। তাহা "কদম শরিফ" নামে পরিচিত। যে পুত্রের জন্ম উপলক্ষে ফিরোজ ফতেবাদ নগর পত্তন করিয়াছিলেন—এই স্মৃতি-সৌধ সেই পুত্রের শবের জন্য শোকার্ত্ত পিতা কর্ত্তৃক রচিত। ইহারই বেষ্টনীমধ্যে বাগদাদের খলিফার উপহার "পদচিহ্ন" শিলামধ্যে সযত্নে সংস্থাপিত।

লৌরিয়া—নন্দনগড়-স্তম্ভ।
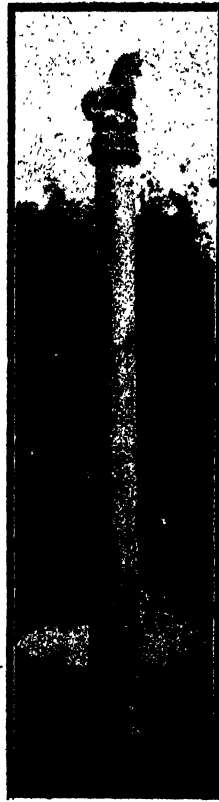
ফিরোজের আর ২টি কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করা সঙ্গত। তিনি বহু খাল কাটাইয়া দেশের জলাভাব দূর করিয়াছিলেন। যমুনা ও শতদ্রু হইতে খালে জল গৃহীত হইত। ইহার মধ্যে একটি খাল অদ্যাপি শত ক্রোশ পথ—দুই পার্শ্বে জমী উর্ব্বর করিতেছে। এ বিষয়ে ফিরোজ আদর্শ শাসক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ফিরোজের দ্বিতীয় কীর্ত্তি—অশোকের প্রস্তরস্তম্ভ দিল্লীতে আনয়ন। মৌর্য্য-সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের নানা স্থানে বহু স্তূপ ও স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যেন সুবৃহৎ স্তম্ভ স্থাপনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। কোন কোন স্তম্ভগাত্রে লিপি উৎকীর্ণ—কোন কোনটিতে লিপি নাই। রুম্মিনদেই (প্রাচীন লুম্বিনী) স্তম্ভে লিখিত আছে, সম্রাট অশোক গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী দর্শনার্থ যাইয়া তাহা নিষ্কর করেন এবং তথায় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। লৌরীয়া-নন্দনগড়ে এইরূপ একটি স্তম্ভ আজও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। এই স্তম্ভচূড়াস্থিত সিংহ সারনাথে প্রাপ্ত সিংহচূড়ার তুলনায়

সুন্দর না হইলেও সে কালের প্রস্তর-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নানা স্থানে এইরূপ স্তম্ভ ছিল। অশোকের মৃত্যুর পর ১৬ শতাব্দী অতিবাহিত হইলে ফিরোজ আম্বালায়—তোপরা হইতে একটি ও মীরাট হইতে একটি স্তম্ভ আনিয়া দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সমসাময়িক ইতিহাসে স্তম্ভ স্থানান্তরিত করিবার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।—এই সব স্তম্ভ দেখিয়া ফিরোজ বিস্মিত হয়েন এবং দুইটি স্তম্ভ সযত্নে দিল্লীতে আনিবার সঙ্কল্প করেন। খিজরাবাদ (আম্বালায় তোপরা) দিল্লী হইতে ৯০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি স্তম্ভ আনিবার উপায় চিন্তা করেন। শেষে নিকটবর্ত্তী স্থানের সকল অধিবাসী ও সৈনিকদিগকে হাজির হইতে আদেশ করা হয়। তাহাদিগকে এই কাযের উপযোগী অস্ত্রাদি আনিতে বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়, তাহারা যেন শিমুলের তূলা লইয়া আইসে। স্তম্ভের গাত্রে এই তূলা জড়াইয়া দেওয়া হয় এবং মূল খনিত হইলে স্তম্ভটি ধীরে ধীরে সেই কোমল গদির উপর পতিত হয়। তখন ক্রমে তূলা সরাইয়া লইলে স্তম্ভটি ভূমির উপর পড়িয়া থাকে। মূলদেশ খনন করিলে তথায় একখানি বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তর পাওয়া যায়। সেখানিও তুলিয়া লওয়া হয়। তাহার পর শর ও কাঁচা চামড়া দিয়া স্তম্ভ মুড়িয়া ফেলা হয়। এ দিকে স্তম্ভ বহনের জন্য ৪২ চাকার একখানি যান প্রস্তুত করা হইলে সহস্র সহস্র লোক বহু চেষ্টায় স্তম্ভটিকে ঐ যানে স্থাপিত করিয়া দিলে ৮হাজার ৪ শত লোক যানবদ্ধ ৪২টি রজ্জু আকর্ষণ করিয়া তাহা দিল্লী অভিমুখে লইয়া চলে। স্তম্ভটি যমুনার কূলে নীত হইলে সুলতান তথায় আইসেন। নদীতে ২ হাজার মণ হইতে ৭ হাজার মণ পর্য্যন্ত শস্যবাহী নৌকা রাখা হইয়াছিল। কৌশলে স্তম্ভটি যান হইতে নৌকায় তুলিয়া ফিরোজাবাদে আনয়ন করা হয়। তথায় নিপুণ শিল্পীরা ইহার জন্য একটি গৃহ রচনা করিতে আরম্ভ করে। এই গৃহ প্রস্তরে ও চুণে গঠিত এবং ইহার অনেকগুলি সোপান ছিল। একটি সোপান নির্ম্মিত হইলে স্তম্ভটি তাহার উপর তুলিয়া দ্বিতীয় সোপান রচনা আরম্ভ হয়। এইরূপে ক্রমে স্তম্ভটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উত্তোলিত হইলে বহু চেষ্টায় তাহা তুলিয়া বসান হয়। পূর্ব্বকথিত চতুষ্কোণ প্রস্তরখানিও যথাস্থানে স্থাপিত করা হয়।

সারনাথের সিংহচূড়া।

এই স্তম্ভটি আজও ফিরোজ শা'র কোটলার একটি গৃহের মধ্যস্থলে দৃষ্ট হয়। স্তম্ভটি আজও অক্ষত। ফিরোজ স্তম্ভের উপর স্বর্ণলেপসমুজ্জ্বল একটি কলসও স্থাপিত করিয়াছিলেন। স্তম্ভটি ৩২ গজ দীর্ঘ—৮ গজ প্রোথিত হইলে উপরে ২৪ গজ থাকে।

দ্বিতীয় স্তম্ভটি মীরাট হইতে আনিয়া দিল্লীর পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপর স্থাপিত করা হয়। এই স্থানে ফিরোজের পল্লী-প্রাসাদ রচিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বিস্ফোরক বিস্ফুরণে স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া যায় ও প্রায় দেড় শত বৎসর সেই অবস্থায় ছিল। কাযেই স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ফিরোজশার চরিত্রে পরস্পর-বিরোধী বৃত্তির মিশ্রণ ছিল। তিনি মুসলমান-ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন এবং কোরাণের উপদেশ অনুসারে কায করিতেন। তাঁহার দরবারে ঐশ্বর্য্যের অনুচর বিলাস ছিল। কিন্তু তিনি কোরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার ও পানভোজনে ধাতব পাত্র বর্জ্জন করিয়াছিলেন। পতাকায় চিত্রাদিও তিনি রাখিতে দিতেন না।

ফিরোজশার কোটলা।

অথচ তিনি স্বয়ং মদ্যপ ছিলেন। তিনি যখন বাঙ্গালার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, তখন এক দিন সেনানায়ক তাতার খাঁ প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, তিনি অর্দ্ধসমাপ্ত-বেশে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং শয্যার নিম্নে চাদর-ঢাকা পানপাত্রাদি রহিয়াছে। তাতার খাঁ এই দৃশ্যে স্তম্ভিত হইলেন, সুলতানেরও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শেষে খাঁ সাহেব [illegible] সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। সুলতান যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এমনই ভাবে তাঁহার সে কথা বলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। খাঁ সাহেব তাঁহাকে লুকান পানপাত্র দেখাইয়া দিলেন। তখন সুলতান স্বীকার করিলেন, তিনি সময় সময় গলা ভিজাইয়া লইবার জন্য সামান্য মদ্য ব্যবহার করেন। খাঁ সাহেব সে কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হওয়ায় সুলতান প্রতিশ্রুত হয়েন, তিনি আর মদ্যপান করিবেন না। কিন্তু তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই।

বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তাহার ৩ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মন্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি মন্ত্রীর পুত্রকে শাসনভার দিয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং পরে ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে কুমার মহম্মদই সে ভার প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু রাজপুত্র বিলাসী ছিলেন—সুশাসন করিতে পারেন নাই। তাই বিদ্রোহ হয়। কিন্তু ফিরোজ স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলেই বিদ্রোহ নিবৃত্ত হইয়া যায়। কারণ, প্রজারা তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত ছিল। তাঁহার কথায় লিখিত আছে—"ফিরোজের শাসনে উচ্চ, নীচ, স্বাধীন, দাস সকলেই নিশ্চিন্তচিত্তে সানন্দে বাস করিত। দরবার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ছিল—দ্রব্যাদিও সুলভ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে

কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই; কোন গ্রাম শূন্য ছিল না; কোন জমী 'পতিত' ছিল না।" তখন দ্রব্যাদির মূল্য—

দ্রব্য	মণ
গম	৩ আনা
যব	দেড় আনা

আর চিনির সের ১ আনা হইতে ৬ পয়সা।

১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ফিরোজের মৃত্যু হয়। তিনি বহু মসজেদ, স্তম্ভ ও স্মৃতি-সৌধের সংস্কার করাইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলিয়াছেন, তাঁহার রচিত খাল, সরাই, বাঁধ, গৃহ প্রভৃতির সংখ্যা ৮ শত ৭৫।

ফিরোজ স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, তিনি গৃহনির্ম্মাণে ও গৃহ-সংস্কারে বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। তিনি দিল্লীতে যে সকল গৃহের ও স্তম্ভের সংস্কার করিয়াছিলেন এবং যে সকল পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়াছিলেন, সে সকলের তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন। সেগুলির মধ্যে দিল্লীর পুরাতন মসজেদে জামে, কুতব মিনার, সুলতান আলতামাসের সমাধি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফিরোজ লিখিয়াছেন, কুতব মিনার বজ্রাহত হইয়াছিল—"আমি তাহার সংস্কার করিয়া তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ করি।" ইহার পরও বোধ হয়, কুতব মিনারে বজ্রপাত হইয়াছিল—কারণ, স্তম্ভের মস্তকে আবরণ নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার আর একবার জীর্ণ মিনারের সংস্কার করান। এই সময় এঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন স্মিথ কুতব মিনারের উপর বসাইবার জন্য যে ছত্রগম্বুজ গঠিত করান, তাহা এখনও উদ্যানে রক্ষিত। তাহা এতই তুচ্ছ যে, কর্ণেল শ্লীম্যান বলিয়াছিলেন—স্তম্ভশিরে যদি ঐরূপ আবরণই থাকিয়া থাকে, তবে বজ্র তাহা নষ্ট করিয়াই ভাল করিয়াছে। কারণ, তাহা বিরাট স্তম্ভের উপযুক্ত নহে। তবে জানা যায়, স্তম্ভশিরে রক্তপ্রস্তরের একটি মনোরম গম্বুজ ছিল।

ফিরোজ যে সব গৃহের জীর্ণসংস্কার করাইয়াছিলেন, সে সকলের তালিকা হইতে দিল্লীতে উল্লেখযোগ্য স্মৃতি-সৌধ কত ছিল, অনুমান করিতে পারা যায়।

উদ্ভট-সাগর।

এই ঘোর কলিকালে স্বামীর প্রতি রমণীর আধিপত্য কিরূপ প্রবল, তাহাই কবি এই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন—

প্রায়োঽস্মিন্নবলাকুলং প্রতি কুলং ভর্ত্তুঃ সমং ভাষতে
তাসাং যৎ পতিদেবতেতি কথনং ষষ্ঠীসমাসে কৃতম্।
লজ্জাধর্ম্মভয়ং ন তাসু কতিচিৎ স্বেচ্ছানুকার্য্যে রতা
নাসাবদ্ধগবানিব স্বকপতীন্ সঞ্চারয়ন্তি ধ্রুবম্॥

এই ঘোর কলিকালে নারী সমুদায়
পতির বিরুদ্ধ হ'য়ে কথা কয় প্রায়।
তাহাদের রহে 'পতি-দেবতা' যে নাম,
ষষ্ঠী-তৎপুরুষে তাহা জেনো অবিরাম,—
পতিগণ নারীদের দেবতা,—কে বলে?
নারীগণ পতিদের দেবতা ভূতলে!
কলিতে নারীর নাই লজ্জা-ধর্ম্ম-ভয়,
ইচ্ছামত কার্য্য করে সকল সময়।
নাকে দড়ি দিয়া ঠিক বলদের মত
পতিরে ঘুরায়ে মারে নারী অবিরত।

কোন গুড়ুক-খোর কবি নব-যুবতীর সহিত হুঁকার সাদৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন:—

তল্পানন্নবিভূষণা রসজুষাং যূনাং মনোমোহিনী
নেত্রান্তেঽপি দৃশ্যতে সুরসিকৈঃ স্তোকং গুরূণাং ভিয়া।
অন্তর্লোলরসা বহিঃ কঠিনতা স্পর্শাৎ প্রমোদপ্রদা
হুক্কেয়ং নবকামিনীব রমতে ক্রতে কলং চুম্বিতা॥

শয্যায় থাকিলে বসি' শোভা যায় বেড়ে,
রসিক যুবার মন প্রাণ লয় কেড়ে।
গুরুজন সম্মুখেও থাকেন যখন,
কটাক্ষে রসিক যুবা করে দরশন।
টল্ টল্ করে রস সদাই ভিতরে,
হায় রে কঠিন কিন্তু বড়ই বাহিরে।
স্পর্শ করিলেই মনে প্রীতি নিরন্তর,
চুম্বন করিলে করে কল কল স্বর।
তাই বলি, হুঁকা আর নবীনা রমণী,
দুইটিই একরূপ,—হেন মনে গণি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

কোরাণের ভাষায় কথোপকথন

ধৈর্য্য, সন্তোষ ও ভগবানে বিশ্বাসের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত, তাপসকুল-শ্রেষ্ঠদিগের অন্যতম, বিদুষী হজরৎ রাবেয়া বসরী তাঁহার খোদাপ্রাপ্তির পর প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহাকে কেহ কোন প্রশ্ন করিলে, তিনি কেবল পবিত্র কোরাণের ভাষাতেই তাহার উত্তর দিবেন, এবং কোরাণের উক্তি ব্যতীত অন্য কোন কথাই উচ্চারণ করিবেন না।

বিরাট হানফী সম্প্রদায়ের নায়ক ইমাম আজম আবু হানিফার শিষ্য খ্যাতনামা হদিসজ্ঞ মহা বিদ্বান্ আব্দুল্লা বিন মোবারক বলেন, "আমি উষ্ট্রারোহণ করিয়া মক্কা হইতে মদিনা গমন করিতেছিলাম; পথিমধ্যে দূরে কৃষ্ণবর্ণ কি এক বস্তু আমার নয়নগোচর হইল। নিকটে উপস্থিত হইলে দেখি, জনৈক বৃদ্ধা। আমি এই নীরব, জনমানবশূন্য কাননে তাঁহাকে একাকিনী দেখিয়া বড় বিস্মিত হইলাম; আরও নিকটে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম।" তিনি সালামের প্রত্যুত্তরে বলিলেন;—

সলামুন্ কওলাম মির রব্বির রহিম [সুরা ইয়াসিন, রুকু ৪]

দয়াবান্ পালনকারীর পক্ষ হইতে সালাম বলা হইবে। *

আব্দুল্লা বিন মোবারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কি করিতেছেন?" উত্তর হইল;—

"এবং আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, পরে তাহার জন্য কেহ পথি-প্রদর্শক নাই" [সুঃ মোমেন, রু ৪]

আব্দুল্লা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি পথ ভুলিয়াছেন এবং পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোথায় যাইতে ইচ্ছা করেন?" উত্তর হইল:—

"তিনি পবিত্র, যিনি এক রাত্রিতে আপন দাসকে (মোহাম্মদ) মসজে-দুল হারাম (মক্কা) হইতে মসজেদুল আকসা (বয়তুল মোকাদ্দেস) পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন" [সুঃ বনি ইসরাইল, রু ১]

আব্দুল্লা বুঝিলেন যে, তিনি মক্কার হজ সমাপন করিয়াছেন, এক্ষণে বয়তুল মোকাদ্দেস (জেরুজালেম) যাইতে চাহেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্থানে আপনি কত দিন হইতে অবস্থান করিতেছেন?" উত্তর হইল:—

"পূর্ণ তিন রাত্রি গত হইয়াছে," [সুঃ মরয়ম রুঃ ১]

আব্দুল্লা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গভীর বনে সম্ভবতঃ আপনার নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য নাই, তবে কেমন করিয়া চলিল?" তিনি বলিলেন:—

"সেই (আল্লাহ) যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।"
[সুঃ শোয়ারা, রুঃ ৫]

আব্দুল্লা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বনে জলের নামগন্ধ নাই, আপনি নমাজের জন্য ওজু কেমন করিয়া করেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন:—

"যদি তুমি জল না পাও, তবে পবিত্র মৃত্তিকার চেষ্টা কর" [সুঃ নেসায় ৭]

আব্দুল্লার নিকট কিছু খাদ্য-সামগ্রী ছিল। তিনি মনে করিলেন, ইনি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত্ত,ইঁহাকে কিছু খাইতে দিই। কিন্তু রাবেয়া বসরী বলিলেন:—

"তৎপর রোজাকে রাত্রি পর্য্যন্ত পূর্ণ কর" [সুঃ বকর রুঃ ২৩]

সে রোজার মাস নয়। সুতরাং আব্দুল্লা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন:—

"এবং রোজা রাখাও তোমাদের পক্ষে উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞাত থাকিতে" [সুঃ বকর রুঃ ২৩]

আব্দুল্লা যে প্রশ্ন করেন, তাহারই উত্তর কোরাণের উক্তিতে পাইতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত তিনি অতি বিব্রত হইয়া উঠিলেন এবং ব্যস্ততা-সহকারে বলিলেন, "আমি যেমন সরলভাবে কথোপকথন করিতেছি, আপনি তেমন ভাবে কেন করেন না, কোরাণ শরিফ বুঝিতে যে আমার বিশেষ কষ্ট হইতেছে।" তিনি উত্তরে বলিলেন:—

"মানুষ এমন কোন কথা বলে না, যাহা তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ না হয়," অর্থাৎ আমি আমার আ'মালনামা (কার্য্যলিপি) কোরাণের উক্তিতেই সম্পূর্ণ করিতে চাহি। [সুঃ কাফ, রুঃ ২]

আব্দুল্লা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত?" উত্তর হইল:—"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, তুমি তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইও না। (যেহেতু,শেষ বিচারের দিনে) নিশ্চয় কর্ণ ও চক্ষু এবং অন্তঃকরণ সকলের প্রত্যেকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে।" [সুঃ বনি ইসরাইল, রুঃ ৪]

আব্দুল্লা তাঁহার এই প্রশ্নের নিমিত্ত নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাবেয়া বসরী এই উক্তির উল্লেখ করিলেন:—

"আজ তোমার কোন জবাবদিহি নাই, খোদা তোমাকে মার্জ্জনা করুন।"

আব্দুল্লা মনে করিলেন, রমণী একা বনে বসিয়া আছেন, আমি তাঁহাকে আমার উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া সঙ্গে লইয়া যাই। তিনি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সাধ্বী রাবেয়া বলিলেন:—

"তোমরা যে সৎ কায কর, আল্লাহ তাহা জ্ঞাত আছেন" (এবং প্রতি-দান দিবেন) সুঃ বকর রুঃ ২৫

আব্দুল্লা তাঁহার উষ্ট্রকে বসাইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। বিদুষী রাবেয়া পরদা রক্ষার উদ্দেশ্যে বলিলেন:—

"এবং (হে মোহাম্মদ) তুমি বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে বল, যেন তাহারা আপন চক্ষু সকল বন্ধ করিয়া লয়।" [সুঃ নুর রুঃ ৪]

আব্দুল্লা তাঁহার মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাবেয়া বসরীকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরো-হণ করিতে বলিলেন। উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরোহণকালে হঠাৎ উষ্ট্র লম্ফ দিয়া উঠিল। ইহাতে তাঁহার উত্তরীয় ছিঁড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন:—

"যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তোমাদের হস্ত যাহা করিয়াছে, তাহা তজ্জন্য হয়।" [সুঃ শুরা, রুঃ ৪]

আব্দুল্লা বলিলেন, "উত্তম, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ইহার পদ বন্ধন করি, তদনন্তর আরোহণ করিবেন।"

"অনন্তর আমি সোলায়মানকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম।" অর্থাৎ তুমিও সেইরূপ বুঝিলে। [সুঃ আম্বিয়া, রুঃ ৫]

---

* কোরাণের উক্তি বর্ত্তমানে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় শুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয় না। সুতরাং কোরাণের আয়াতের অবমাননা ভয়ে কেবল তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইবে।

আব্দুল্লা উষ্ট্রের পদবন্ধন করিয়া তাঁহাকে আরোহণের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তিনি ইহার ধন্যবাদার্থ বলিলেন :—

"তিনিই পবিত্র, যিনি ইহা (পশু) আমাদের জন্য বশীভূত করিয়াছেন এবং আমরা তাহার উপর সমর্থ ছিলাম না। (এমন শক্তি ছিল না যে, তাহাকে বশীভূত করি) এবং নিশ্চয় আমরা আপন প্রভুর দিকে ফিরিয়া যাইব।" [সুঃ জথরফ রুঃ ১]

আব্দুল্লা অগ্রভাগে বসিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উষ্ট্র ছুটাইতে লাগিলেন। রাবেয়া বসরী বলিলেন :—

"আপন চলনে মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন কর এবং আপন স্বরকে নিম্ন কর," [সুঃ লোকমান রুঃ ২]

আব্দুল্লা উষ্ট্রের গতি হ্রাস করিয়া ধীরে ধীরে গানের সুরে পাঠ করিতে লাগিলেন। এ জন্য বিদুষী রাবেয়া বসরী উপদেশ দিলেন :—

"অনন্তর তাহা হইতে যাহা সহজ হয় পড়," অর্থাৎ যত সহজভাবে সম্ভব পড়। [সুঃ মোজাম্মিল রুঃ ২]

আব্দুল্লা অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আল্লাহ পাক আপনাকে কি মহৎ সামগ্রী না দান করিয়াছেন!"

"বুদ্ধিমান্ ব্যতীত উপদেশ গ্রহণ করে না," অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ই কেবল ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। [সুঃ আলইমরাণ রুঃ ১]

আব্দুল্লা রাবেয়া বসরীর অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ। তিনি ভাবে তন্ময় হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আপনার স্বামী আছেন?" ইহাতে রাবেয়া বসরী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন :—

"হে বিশ্বাসী মুসলমানগণ, সেই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না, যদি তাহা তোমাদের জন্য প্রকাশিত হয়, তবে তোমাদিগকে অসন্তুষ্ট করিবে।" অর্থাৎ এমন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, যাহা প্রকাশ পাইলে, তোমার অসন্তোষের কারণ হইতে পারে। [সুঃ মায়দা, রুঃ ১২]

আব্দুল্লা নীরব হইলেন এবং চলিতে চলিতে কাফেলায় (পথিকের দল) উপনীত হইলেন এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দলে আপনার কেহ আছেন?" তিনি বলিলেন :—

"সম্পত্তি ও সন্তান সকলই পার্থিব জীবনের শোভা।" [সুঃ কহফ রুঃ ২]

ইহাতে আব্দুল্লা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্রও এই কাফেলায় আছেন। সুতরাং তাহার নিদর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তাঁহার চিহ্ন, সে তারকা দেখিয়া কাফেলা পরিচালিত করে।" [সুঃ নমল রুঃ ২]

আব্দুল্লা বুঝিলেন যে, তাঁহার পুত্র ঐ দলের নায়ক। তিনি স্বীয় উষ্ট্রকে কাফেলার মধ্যে লইয়া গিয়া তাপসী রাবেয়াকে তাঁহাদের নিবাস চিনিয়া লইতে বলিলেন। তদুত্তরে বিদুষী তাঁহার পুত্রগণের নামে নিম্ন লিখিত আয়াত পাঠ করিলেন :—

"আল্লাহ ইব্রাহিমকে তাঁহার বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

"মুসার সহিত আল্লার কথোপকথন হইয়াছিল।"

"হে এহয়া দৃঢ়তার সহিত এই গ্রন্থ গ্রহণ কর।"

আব্দুল্লা বুঝিলেন যে, ইব্রাহিম, মুসা ও এহয়া ইঁহার তিন পুত্রের নাম; এবং তিনি ঐ নামে তাঁহাদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। পুত্রর ইহা শুনিয়া দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং মাতাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইয়া উপবেশন করাইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

রাবেয়া বসরী পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"আমাকে আমার সকালের আহার দাও, অবশ্য আমরা এই ভ্রমণে কষ্ট পাইয়াছি।" [সুঃ কাহাফ, রুঃ ৯]

পুত্রগণের নিকট উপস্থিত কোন খাদ্যসামগ্রী ছিল না। সুতরাং রাবেয়া বসরী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন :—

"তোমাদের মধ্যে এক জনকে আপনাদের টাকা দিয়া সহরের দিকে প্রেরণ কর, যেন সে দেখে, কোন্ খাদ্য বিশুদ্ধ এবং তাহা হইতে আবশ্যক-মত আমার নিকট লইয়া আইসে," [সুঃ কহফ, রুঃ ৩]

মাতার আদেশানুযায়ী তাঁহাদের মধ্যে এক জন বাজার হইতে খাদ্য-সামগ্রী আনয়ন করিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তৎপরে কৃতজ্ঞ রাবেয়ার অনুরোধ :—

"গত দিবসে তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, তাহার প্রতিদানে, তুমি আহার ও জল পান কর।" [সুঃ হাক্কা]

গুণমুগ্ধ আব্দুল্লা রাবেয়া বসরীকে প্রত্যেক কথায় মহাগ্রন্থ কোরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিতে দেখিয়া, বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পুত্রগণের নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে, ইনি বসরার দেবী রাবেয়া; ইঁহার বয়স চত্বারিংশৎ; ইঁহার দ্বারা এমন কোন বাক্য উচ্চারিত না হয়, যাহার নিমিত্ত কেয়ামতের দিন (শেষ বিচারের দিন) কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তজ্জন্য ইনি কোরাণমজিদের উক্তি ব্যতীত কোন বাক্যই কথোপকথনে ব্যবহার করেন না।

"এ খোদারই কৃপা, যাহাকে দান করেন, সেই পায়।"

এ এমনই এক অলৌকিক ও অসামান্য ঘটনা যে ইহা আজ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরও সেইরূপ দুঃসাধ্য ও অতুলনীয় হইয়া রহিয়া দেবী রাবেয়ার মহান্ কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে।

চৌধুরী হজুরুল হক।

সম্পদ।

সাগরের আছে বারি বিস্তার;
গগনের আছে নীলিমা,
কুসুমের আছে সৌরভভার,
অরুণের আছে শোণিমা।

সন্ধ্যার আছে তারকার হার;
রজনীর আছে জ্যোছনা;
শিখরের আছে অমল তুষার,
গিরির হৃদয়ে ঝরণা।

লতিকার আছে শ্যাম-পল্লব;
ফলরাশি আছে পাদপে;
তটিনীর জলে কলকল রব—
স্নিগ্ধ মাধুরী আতপে।

বিহগের আছে মধুর কাকলি;
প্রভাতের শোভা শিশিরে;
আমার ব্যাকুল হৃদয়ে কেবলি
গুঞ্জরে প্রেম অধীরে।

কলিকাতার নবস্থাপিত বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ।

আধি-ব্যাধি-মৃত্যুর অধীন এই মানবদেহ যে চিন্তাশীল মানবের আদি গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যেখানে আদি-সভ্যতার বিকাশ, সেই ভারত-ভূমিই যে ভৈষজ্য-বিদ্যার জননী, ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুই সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছিলেন, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" যে বেদ অপৌরুষেয় এবং যাহা অপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ কোন জাতির কোন ভাষায় আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, রোগপ্রবণ শরীরের স্বাস্থ্যবিধানকল্পে সেই বেদের অথর্ব্ব-শাখায় বহু প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট আছে। স্বাস্থ্যের বৈষম্যে স্বভাবের প্রেরণায় পশু-পক্ষিগণ যে ঔষধি গ্রহণ করে, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তাহা পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিয়া ভৈষজ্য-তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল। এই অধ্যবসায়ফলে প্রাচীন হিন্দুগণ পশু-চিকিৎসাতেও যে সুপরিপক্ক ছিলেন, বর্দ্ধমান-রচিত 'যোগমঞ্জরী', দীপঙ্করের 'অশ্ববৈদ্যক', গণ-প্রণীত 'অশ্বায়ুর্ব্বেদ' প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সর্প-বহুল দেশে বিষ চিকিৎসাও যে অন্যদেশপ্রচলিত বিষ-চিকিৎসার শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। চরক, সুশ্রুতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

স্বভাবতঃ সহানুভূতিসম্পন্ন কোমল-হৃদয় হিন্দু যে এই কল্যাণময়ী চিকিৎসা-বিদ্যাকে কি উচ্চাসন প্রদান করিতেন, পৌরাণিক ইতিহাসে বর্ণিত সমুদ্র-মন্থনে ধন্বন্তরির উদ্ভব তাহার কথঞ্চিত আভাস প্রদান করে। কেহ কেহ অনুমান করেন, আরবের মরুময় প্রদেশই চিকিৎসা-বিদ্যার জন্মভূমি। ওয়েবর এবং মূলার প্রভৃতি মনীষিগণ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আরব্য ও পারস্য ভাষায় অতি প্রাচীনতম ভৈষজ্য-গ্রন্থে ভারতীয় প্রভাব প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়।

ভারতীয় ভৈষজ্য-বিদ্যা প্রধানতঃ তিনটি যুগে বিভক্ত :—প্রথম, বৈদিক যুগ। এই যুগে ঋক্ ও অথর্ব্ববেদ এবং কৌশিক সূত্রের প্রভাব।

দ্বিতীয়, বৌদ্ধ যুগ। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক হইতে ইহার সূচনা। ইনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। এই যুগে খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীতে দর্শন ও চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নালন্দ নগরে দশ সহস্র ছাত্রের বাসোপযোগী এক বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধরাজগণ মানব ও পশু-পক্ষীর চিকিৎসার জন্য বহু চিকিৎ-সালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

তৃতীয় যুগে চরক সুশ্রুত প্রভৃতির অভ্যুদয়, কিন্তু এ যুগেও বৌদ্ধপ্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। চরক বৌদ্ধরাজ কনিষ্কের সভাসদ্ ছিলেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের গ্রন্থ নূতনাকারে গঠিত করেন।

কিন্তু হায়, তে হি নো দিবসা গতাঃ। জ্ঞানের ঐশ্বর্য্যে যে বেদ এক দিন হিন্দুর মাথার মণি ছিল, আজ তাহা প্রত্ন-তত্ত্বের প্রেতভূমে নির্ব্বাসিত হইয়াছে; বৌদ্ধরাজগণের সে মানব ও পশু-চিকিৎসালয় সকল ধরণীর ধূলিকণা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে; আর কতিপয় ভগ্নস্তূপ মাত্র, নালন্দ নগরের সেই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণাম! চরক সুশ্রুতের সে নর-শরীর ও অস্থি-বিদ্যা—উন্নত গ্রীস অবনত মস্তকে যাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিল—তাহার প্রমাণ এখন সাঁচি প্রভৃতি স্থলে পর্ব্বত-গুহা-নিহিত কয়েকটি প্রস্তর মূর্ত্তি! আজ কোথায় সে আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন-বিদ্যা, প্রাচীনতম আরব-রাসায়নিক যাহা সযত্নে শিক্ষা করিয়াছিলেন? যে বিদ্যার যশোগরিমা এক দিন ধরণীর দূর হইতে সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণ বিস্তার করিয়াছিল, কালের প্রভাবে আজ তাহা নিশার স্বপনে পরিণত হইয়াছে!

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারত-চিকিৎসা-বিজ্ঞান স্বাধীন গবেষণার পরিচয় দিয়াছিল। আচার্য্যবর্য্যের 'সারোত্তর নির্ঘণ্ট' (ভৈষজ্য-পরিভাষা) ১০৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল; শিহ্লনের 'চিকিৎসামৃত' ১২২৪ খৃষ্টাব্দে সাম্-সুদ্দিন আল্‌তামাসের রাজত্বকালে দিল্লীতে প্রণীত হয়। রাম-চন্দ্র সোমযাজী-বিরচিত নাড়ী-পরীক্ষার জন্ম ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে। যে বিদ্যা এক দিন ভারতের গৌরব ছিল, ভারতবাসীর শ্রদ্ধা হারাইয়া আজ তাহা সিঞ্চন-বঞ্চিতা লতার ন্যায় দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছে।

যে দেশে যাহার জন্ম, সেই দেশের মৃত্তিকা ও আব-হাওয়ায় যে তাহার জীবনীশক্তি নিহিত আছে, ইহা সহজেই বোধগম্য। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমি হইতে অমৃতরস সঞ্চয় করিয়া যে সকল বনৌষধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার সঞ্জীবনীশক্তি যে সর্ব্বজাত ভেষজ অপেক্ষা অধিকতর বলবতী, তাহা চিন্তাশীল

ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। রোগ এ ধারে—তাহার ঔষধি সাগর-পারে; ব্যবসায়ীর বুদ্ধি ভিন্ন কোন যুক্তি এ কথা অনুমোদন করিবে না। কিন্তু সেই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তই এখন আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ধনী এবং শিক্ষিত সমাজ বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ 'হাতুড়ে' বৈদ্যের উপর আস্থা-স্থাপন করিতে সঙ্কুচিত হয়েন। এ দেশে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির বিশ্বাস যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের যাহা মূল ভিত্তি, সেই অস্থি-বিদ্যা ও নর-শরীর-বিজ্ঞান হিন্দুদিগের অজ্ঞাত ছিল; কেন না শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত নরদেহের প্রকৃত তত্ত্ব-নির্ণয় সম্ভব নহে। কিন্তু সার উইলিয়ম জোন্‌স বলেন, নর-শরীরান্তর্গত স্নায়ু, শিরা, নাড়ীসমূহের বিশিষ্ট সংজ্ঞাসহ হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রনিচয়ের বর্ণনা এবং ভ্রূণের উৎপত্তি ও ক্রম-পরিণতি সম্বন্ধে যাবতীয় তত্ত্ব বেদে বিশদভাবে সন্নিবিষ্ট দেখিয়া আমি যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়াছি। এককালে যে শব-ব্যবচ্ছেদ-প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার অবিসংবাদী প্রমাণ সুশ্রুত। এই গ্রন্থে নর-শরীর-তত্ত্ব যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত হইয়াছে, কেবলমাত্র পাশব-দেহচ্ছেদ দ্বারা সেরূপ সূক্ষ্ম জ্ঞান কদাচ সম্ভাবিত হইতে পারে না। খৃষ্টীয় অষ্ট শতাব্দীর শেষ-ভাগে বাগদাদের খালিফদিগের আদেশে চরক সুশ্রুত আরব্য ভাষায় অনূদিত হয়। তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হকিম অল্‌রজি এই গ্রন্থদ্বয়কে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের যুগে মৃত-শরীর অস্পৃশ্য বলিয়া প্রচার হওয়ায়, শব-ব্যবচ্ছেদ অপ্রচলিত হইয়াছিল। সুশ্রুতে বর্ণিত কপোলের চর্ম্ম হইতে কৃত্রিম (Rhino-plasty) নাসিকা গঠন প্রণালীর জন্য বর্ত্তমান অস্ত্র-চিকিৎসা ভারতীয়গণের নিকট ঋণী। য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু যে দিন গিয়াছে, নিষ্ফল আক্ষেপে তাহা আর ফিরিবে না। দিন ফিরে না, কিন্তু নির্ব্বাপিত দীপ পুনঃ প্রজ্বলিত হয়, সাধনায় হৃত-গৌরব ফিরিয়া আসে। উন্নতিপ্রয়াসী দেশবাসী দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এ সময় একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত—স্বাস্থ্য সকলের মূল। স্বাস্থ্যের অভাবে উন্নতির প্রয়াস, বাতুলতার উচ্ছ্বাসমাত্র। অন্নে যাহার শরীর জীর্ণ,বক্ষ্মারকঙ্কালসার, তাহার পক্ষে কর্ম্মের সকল দ্বারই রুদ্ধ। দুর্ভিক্ষ-দুশ্চিন্তাপীড়িত দেশে ব্যাধির অভাব নাই। প্রকাশ্যে অথবা ছদ্মবেশে শীকার অন্বেষণে ফিরিতেছে। রোগ প্রচুর,কিন্তু চিকিৎসকের অত্যন্ত অভাব। একে ত অন্য সকল সুসভ্য দেশের তুলনায় এ দেশে লোকসংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা নিরতিশয় অল্প। তাহার উপর যে সকল চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের কষ্টার্জ্জিত অভিজ্ঞতা সামান্য পণে বিনিময় করিতে অনিচ্ছুক। দরিদ্রের পক্ষে আবার বিষম অন্তরায়, ঔষধের মূল্য। এ সকলের একমাত্র প্রতীকার—দেশী চিকিৎসার অধিকতর প্রচলন।

কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান উন্নতির দিনে মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসা পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে,তাহাতে অভিনব প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে। শারীর বিজ্ঞান, অস্ত্রচিকিৎসা, ব্যাধি-নিদান প্রভৃতি বিভাগে যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তৎসমুদয় অবাধে গ্রহণ করিয়া স্বাধীন গবেষণা দ্বারা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের পুনঃ-সংস্কার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যসাধনের অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহোদয়ের অধ্যক্ষতায় কলিকাতায় একটি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দিনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "সাধনা দ্বারা আমরা দেশের আয়ুর্ব্বেদের এরূপ উন্নতিসাধন করিব যে, তাহা দেখিয়া পৃথিবী চমৎকৃত হইয়া যাইবে।" যাঁহারা স্বদেশের জন্য প্রাণপণ আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, জন্ম-ভূমির কল্যাণকামনায় বিদেশী শিক্ষার দাসত্ব বর্জ্জন করিয়াও গন্তব্যস্থানে পৌছিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না, 'বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠ' তাঁহাদিগের পথি-প্রদর্শক। এখানে হিন্দুর আয়ু-র্ব্বেদকে মূলভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া অ্যানাটমি, সার্জ্জারি, ফিজিওলজি, ফিজিক্স প্রভৃতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানসঙ্গত প্রণালীতে আলোচনা করা হয়। ভারতীয় ভৈষজ্যবিদ্যায় তিনটি যুগ অবধারিত হইয়াছে। মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর মহাবাক্য অনুসারে চতুর্থ যুগের আবির্ভাব দেখিবার জন্য দেশমাতা সাগ্রহে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছেন।

৬৪নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে এই বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। স্বদেশের কল্যাণকাম যুবকগণের উৎসাহ উদ্যম ও যোগ-দান ব্যতীত এরূপ অনুষ্ঠান কখনই সফল হইতে পারে না। যাহাতে অর্থ ও ছাত্রের অভাবে এই লোকহিতকর প্রচেষ্টার অকালমৃত্যু না হয়, তাহা দেশবাসিগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

গুহামধ্যে।

১৩

প্রথমেই, যে স্থান হইতে গৌরীকে লাভ করিয়াছিলাম, সেই চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম।

বহু লোক স্নান করিতেছিল—স্ত্রী ও পুরুষ। আমার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিলেন, 'মা'। সুতরাং পুরুষদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল না। আমি তীরে দাঁড়াইয়া চোখের নিমিষে তাঁহার অনাগমন বুঝিয়া লইলাম। শত লোকের মধ্যে থাকিলেও মা সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য স্বরূপ লুকাইতে পারিত না। জাহ্নবীজলে ডুবিলেও মা বুঝি রূপ ডুবাইতে পারিতেন না।

অন্য ঘাটে যাইবার জন্য তীর-ভূমি হইতেই ফিরিতেছি, নদীগর্ভ হইতে কথা উঠিল—"অম্বিকাচরণ!"

স্বর-মাধুর্য্যেই বুঝিলাম, গুরুদেব। মুখ ফিরাইতেই দেখিলাম, তিনি জল হইতে উঠিতেছেন।

"স্নান না ক'রে চলে যাচ্ছ যে?"

উত্তর না দিয়া তাঁহার অভয়চরণে মস্তক স্পর্শ করিলাম।

"স্নান সেরে এস, আমি চাঁদনিতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে গুরুর আদেশ পালন করিতে চলিলাম।

ডুব দিতে গিয়া,—এখনও 'মা'কে দেখার অভিলাষ ত্যাগ করিতে পারি নাই—চুরি করিয়া মেয়েদের দিকে চাহিলাম। দৃষ্টি পড়িল, একটি মেয়ের উপর। মা'কে পূর্ব্বে না দেখিলে এই মা'কেই যে বলিতে হইত, "তোমার মত সুন্দর আর কখন দেখি নাই!"

সঙ্গে আর একটি রমণী, মধ্যবয়সী। তাঁহাকে সাধিকা বলিয়াই বোধ হইল, তাঁহার বসন গৈরিক-রঞ্জিত।

এই পর্য্যন্ত। চক্ষু মুদিয়া প্রায় একশ'বার ডুব দিলাম। আর কোনও দিকে না চাহিয়া, গুরুর কাছে উপস্থিত হইয়া দেখি, গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সেই দুইটি মহিলাই বিদায় লইতেছে।

"অনুমতি করুন, আসি, বাবা!" গৈরিক-ধারিণীই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

"এসো, মা।"

চলিবার মুখে সুন্দরী ঈষৎ অবগুণ্ঠনবতী, অনুচ্চস্বরে তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন—"মা, বাবা কবে আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দেবেন জিজ্ঞাসা কর।"

গুরুদেব নিজেই সে কথা শুনিয়া উত্তর দিলেন—"হবে রে বেটি হবে, যে দিন বিশ্বনাথের ইচ্ছা হবে।—একবার দাঁড়া —অম্বিকাচরণ, এগিয়ে এস এঁকে প্রণাম কর। তোর স্বামীর গুরু ভাই।"

উভয় মহিলাই আমাকে প্রণাম করিলেন—আমিও হাত তুলিয়া উভয়কেই প্রতি-প্রণাম করিলাম।

"মায়ের রূপ দেখ্‌লে, অম্বিকাচরণ?"

মহিলা দুই জন তখনও পর্য্যন্ত অধিক দূরে যান নাই।—কথা কহিলে পাছে শুনিতে পান, তাই আমি শুধু মৃদু হাসিলাম।

"হাস্‌লে শুধু হবে না হে, বল্‌তে হবে।"

"দেখেছি, প্রভু!"

"এ রূপ কদাচ দেখা যায়, সাক্ষাৎ যেন অন্নপূর্ণা।"

"না, প্রভু, অন্নপূর্ণার সখা—আমি অন্নপূর্ণাকে দেখেছি।"

"বল কি হে!"

"মিথ্যা বলিনি, প্রভু!"

"তা হ'তে পারে। মিথ্যা কইবে কেন? অনন্ত-রূপিণী মা। যাক্‌, তার পর? এসে বল্‌ব ব'লে যে চ'লে এলে,—"

"এখনো বলতে পারছি না, বাবা!"

"বলি, যাবার ইচ্ছা আছে ত?"

"আমার ইচ্ছা হ'লে কি হবে, আমার গুরুরই নিয়ে যাবার ইচ্ছা নেই।"

"বাঃ! আমিই ত তোমাকে যাবার অনুরোধ কর্‌লুম।"

"ও তোমার মুখের কথা, বাবা, বোধ হয় অন্তরের কথা নয়।"

"এ অদ্ভুত রহস্য তুমি কি ক'রে আবিষ্কার কর্‌লে?"

"নইলে পুঁটুলি-পাট্‌লা বেঁধেও আমি যেতে পারছি না কেন? বোধ হয়, এ জন্মেই যেতে পারব না।"

ক্ষণেক আমার মুখের দিকে চাহিয়া গুরুদেব বলিলেন—"ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি। কোনও কিছু কি বন্ধনে পড়েছ?"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন—"এক ভুবনের মা'কে যদি বন্ধন মনে কর, বুড়ীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পার।"

তথাপি আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ঈষৎ কোপের সহিত তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বল্‌বার কিছু থাকে বল; আমার কাছে গোপন কেন, মূর্খ!"

"বল্‌বার ঢের আছে, বাবা; আর বল্‌তেও অনেক সময় লাগ্‌বে। এখানে দাঁড়িয়ে ত হয় না।"

"বেশ, তোমার ঘরেই আজ আমার ভিক্ষা রইল।" বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন, একবারের জন্যও আর তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।

একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর্বেদনা বহির্বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেল।

১৪

আমার আজ আনন্দের সীমা নাই, ভুবনের মা'র বাঁচিবার উপায় হইয়াছে। গুরুদেবের প্রসাদ, সে আর গ্রহণ করিব না বলিতে পারিবে না। গুরুদেবের পূর্ব্বাশ্রম বঙ্গদেশে ছিল। বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থানের জন্য এখন এক রূপ পশ্চিমাই হইয়া গিয়াছেন। তণ্ডুলান্ন তিনি কদাচ গ্রহণ করেন। স্থির করিলাম, লুচি-পুরির সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট তণ্ডুলান্ন প্রস্তুত করিয়া দিব। ভুবনের মা কয় দিন পরে অন্নাহার করিবে, লুচি-পুরি খাইলে মরিয়া যাইবে। যদি প্রসাদের মত বৃদ্ধা অন্নের কথা মুখে দিতে চাহে, গুরুদেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভোজন করাইব।

গুরুর আহারের ব্যবস্থা করিতে আমি ঘরে ফিরিতেছিলাম, পথে সেই গৈরিক-ধারিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইহার পর হইতে তাঁহাকে 'যোগিনী মা' বলিব। পরিচয়ে জানিয়াছি, তিনি একনিষ্ঠা তপস্বিনী—চিরকুমারী; লোকের কল্যাণরূপিণী হইয়া বহুকাল এই কাশীতেই অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্ব্বাশ্রমের কথা তিনি কাহাকেও বলেন না। সর্ব্বদা হিন্দীতেই কথা কহেন, তবে বাঙ্গালাও মাতৃভাষার মত বলিতে পারেন। সাধারণের চক্ষুতে বিশেষ সুন্দরী না হইলেও তপসোজ্জ্বল দৃষ্টি তাঁহার মুখখানিতে এমন সৌন্দর্য্য-বৈভব ঢালিয়াছিল, যাহা শ্রেষ্ঠ রূপসীর মুখেও কদাচ দেখা যাইত। তাহার উপর তিনি সঙ্গীতজ্ঞা, অতি সুকণ্ঠা, ভজনকালে নিজের সুরেই তিনি মগ্ন হইয়া যাইতেন।

এ সমস্ত পরিচয় আমি পরে পাইয়াছি। গুরুদেবের কাছে আমি অনেকবার গিয়াছি, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। অথচ তাঁহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তাঁহাকে গুরুদেবের পরিচিতা বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল।

আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"আপনার বাসায় আমার যাবার যে একবার প্রয়োজন আছে, বাবা!"

"কবে যেতে পারবেন বলুন, মা।"

যোগিনী অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ আপনার সুবিধা হবে?"

"সুবিধা অসুবিধা আপনার।"

"তা হ'লে আজই চলুন না কেন, মা!"

যোগিনী হাসিয়া বলিলেন "আজই!"

"আজ কেন, এখনি—আমার বাসায় আজ আপনাকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।"

"আপত্তি নেই, তবে অন্য এক স্থানে আগেই যে প্রতিশ্রুত হয়েছি, বাবা!"

"গুরুদেব নিজে উপযাচক হয়ে আমার ওখানে পায়ের ধূলো দিতে চেয়েছেন। সেই সাহসেই আপনাকেও বল্‌লুম, মা।"

"তবে, আমার শুধু নয়, বাবা, যার ঘরে আমার নিমন্ত্রণ, তাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"এ আরও সুখের কথা, মা!"

"কিন্তু আপনার যে কষ্ট হবে!"

"এ কথা তোমার মুখ থেকে শুন্‌তে হ'ল, মা!"

"তবে আপনি আসুন, আমরা যথাসময়ে যাব।"

যোগিনী প্রস্থানোন্মুখী হইলেন, আমিও চলিলাম। কাহার ঘরে তাঁহার নিমন্ত্রণ, আমি অনুমানে বেশ বুঝিয়া লই-লাম। সে আর কেহ নহে, সেই যুবতী। আসে সে আসুক, তাহাতে আমার বিশেষ কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে না, যোগিনী মায়ী আসিলে আমার আর একটু বল হইবে। ভুবনের মা'কে অন্ন গ্রহণ করাইতে তাঁহারও আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইবার আশা করি।

বাসার দ্বারে—এ কি, এক পশ্চিমা দরোয়ান বসিয়া আছে কেন? হিন্দীতেই তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—কে সে, কোথা হইতে, কেন আসিয়াছে। উত্তর যাহা পাইলাম, তাহাতে তাহার অবস্থান-রহস্য—আমার সম্যক্ বোধগম্য হইল না। কে এক রাণীমা আসিয়াছে, তার গুরুজি দর্শন করিতে। সে বাঙ্গালা মুলুকের রাণী—রাজাসাহেব, রাণী—উভয়েই মুলুকে ফিরিয়া যাইবে, সেই জন্য রাণী গুরুজির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে।

কতকগুলা এই প্রকার কি সে দ্রুতবাক্য-বিন্যাসে বলিয়া গেল, আমি বুঝিতেই পারিলাম না। শেষে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এইটেই রাণীমা'র গুরুর বাড়ী?"

"হাঁ, ঠাকুরজি!"

"তোমাকে কে বল্‌লে?"

"সো হামি জানে।"

জাহুক্ গে বেটা, আমি বাড়ীতে প্রবেশ করি।

"ইধির কাঁহা যাবে, ঠাকুরজি?"

"এ আমারই বাসা, সেপাইজি।"

সন্দেহ-সঙ্কুচিত-নেত্রে সে কেবল আমার পানে চাহিল। আমার আকৃতি ও বেশে গুরুজির কোনও লক্ষণ ছিল না।

আমার রাঁধিবার ঘর প্রবেশ পথের অপর পার্শ্বে, যাইতে হইলে বারান্দা বেড়িয়া যাইতে হয়—হিন্দু গৃহস্থের রীতি, যে-সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে না পায়।

রান্নাঘর হইতে আমি ধূম নির্গত হইতে দেখিলাম, দেখিয়া বিস্ময় আসিল। পেটের জ্বালায় কাতর হইয়া ভুবনের মা-ই কি রাঁধিতে বসিয়াছে? যাক্, যদি সে-ই হয়, এখন দেখা দিয়া তাহার আহার-চেষ্টায় ব্যাঘাত দিব না। কিন্তু 'রাণীমায়ী'কে যে দেখিতে পাইতেছি না! বোধ হয় উপরে আছেন, কিন্তু তাঁহাকে একা বসাইয়া বুড়ী কি পেটের জ্বালা-নিবারণে এত ব্যস্ত হইল!

বরাবর উপরে চলিয়া গেলাম। বারান্দায়, কই, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ভুবনের মা'র ঘরেও যে কেহ আছে, সেটাও কোনও চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি রাণীও ভুবনের মা'র কাছে রান্নাঘরে বসিয়া আছে?

আমার ঘরের দ্বার হাট করিয়া খোলা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরের সমস্ত জিনিষ-পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—বুঝিলাম, আর কিছু নয়, এ সমস্তই গৌরীর কায। সে দিন দিন অধিকতর দুষ্ট হইতেছে। ভুবনের মা দুর্ব্বল, আমার ঘরে তাহার এই অত্যাচার নিবারণ করিতে পারে নাই। তবু একবার ডাকিলাম, "ভুবনের মা!"

"এসেছ, বাবা!"

"তুমি ঘরেই আছ?"

বৃদ্ধা বাহিরে আসিল। আসিয়া, বড়ই দুর্ব্বল, দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল।

রাণীর আসার নিদর্শন ত এখনও পাইলাম না। আমি আবার বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি উনুনে আগুন দিয়ে এসেছ?"

ভুবনের মা ঈষৎ প্রফুল্লভাবে উত্তর দিল—"আমাকে আর দিতে দিলে কই?"

"কে আগুন দিয়েছে?"

"আমার কি ছাই মরণ আছে? বিশ্বনাথ অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ লিখে রেখেছেন, তার ঠিক কি!"

"মা এসেছেন?"

"শুধু এসেছেন, এসেই গৌরীর জন্য দুধ গরম কর্‌তে গেছেন।"

"হুঁ!—গৌরী?"

"গৌরী তাঁরই কাছে।"

"আমি কি আমার ঘরের দোর বন্ধ কর্‌তে ভুলে গিছলুম?"

"কেন, কি হয়েছে ?"

"সমস্ত জিনিষ-পত্র গৌরী ওলট্-পালট্ ক'রে দিয়েছে। আসনে জল ঢেলেছে।"

"গৌরী নয়।"

"তবে কে ?" প্রশ্ন করিবার পরই মনে পড়িল, গৌরীর মায়ের যে আর একটি ছেলে আছে। মনে পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা কি তাঁর পুত্রটিকে আজ সঙ্গে ক'রে এনেছেন ?"

"বাপ্ রে বাপ্, এমন দুরন্ত !"

"ছেলেটি কোথায় ?"

"সঙ্গে একটি মেয়ে এসেছে; বোধ হয়, সে তাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে। আমার কাছে তার মা রেখে গিছ্লো, কিন্তু আমার কি ক্ষমতা তাকে আগ্‌লাতে পারি ?"

"ভুবনের মা, আমাদের বাড়ীতে এক রাণী এসেছেন।"

"রাণী ?"

"আমাদের বাঙ্গলাদেশের এক রাণী।"

"কোথায় তিনি ?"

"এসে বাড়ীর কোন্‌খানে তিনি লুকিয়ে আছেন।"

"সে কি! কেন ? কি জন্ত ?"

"সে সব আমি জানিনে। তুমি তাকে খুঁজে বার কর। আমার অবকাশ নেই, এখনি আমাকে বাজারে যেতে হবে।" বলিয়াই, ভুবনের মা'কে ধাঁধাঁয় ফেলিয়া আমি আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"তাই ত মা, আর দু'দিন যদি না আস্‌তুম, তোমাকেও আর দেখতে পেতুম না।"

আমি পেঁটরা হইতে টাকা বাহির করিতেছিলাম। হাত তুলিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভুবনের মা'র এইবারে উত্তর শুনিব। বৃদ্ধা যে উত্তর দিল, শত আগ্রহেও তাহা শুনিতে পাইলাম না। রাণী ? ঐ পথে নিক্ষিপ্তা বালিকা কি তবে এতদিন এক রাণীর করুণা-নির্ঝরে স্নাত হইয়া আসিতেছে ?

মায়ের উত্তরেই আমার শুনিবার আগ্রহের মীমাংসা হইয়া গেল।

"কথা পর্য্যন্ত কইবার ক্ষমতা নেই!—টলে পড়্‌ছ! নাও আমার হাত ধর।"

বুঝিলাম, সিঁড়ির মাথার উপরে দাঁড়াইয়া মা কথা কহিতেছেন। ভুবনের মা বোধ হয় নীচে যাইতেছিল। এইখানেই বোধ হয় অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সে তাঁহাকে আমার আগমনবার্ত্তা শুনাইয়া দিল। কেন না, পেঁটরায় হাত দিয়া, কান পাতিয়া কিছুক্ষণ আর কাহারও কথা শুনিতে পাইলাম না; গৌরীর মুখের একটা অস্ফুট বাক্যও আমার কর্ণগোচর হইল না। অগত্যা টাকা লইয়া পেঁটরা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলাম। গুরু আসিবেন; আর তাহাদের কথায় কান দিবার অবসর আমার নাই।

বাহিরে আসিয়া দেখি, উভয়েই নীচে নামিয়া গিয়াছেন। ঘরের যদি বার বার এইরূপ অবস্থা হয়। মনে করিলাম,—কবাটে কুলুপ দিয়া বন্ধ করিয়া যাই।

আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কোথায় কুলুপ ? কি আপদ, যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে ত নাই ই, ঘরের চারিধার খুঁজিয়া কোথাও সেটা দেখিতে পাইলাম না। দুরন্ত ছেলেরা সেটা বারান্দা হইতে ফেলিয়া দিল না কি ? ভুবনের মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়া যে জানিব, তাহারও সম্ভাবনা নাই, নীচে হইতে তাহার ক্ষীণকণ্ঠ আমার কর্ণেও প্রবেশ করিবে না। সেই এখনো-না-দেখা ছেলেটার উপর বিরক্ত হইয়াই আমি ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম। দ্বারের বাহিরে আসিতে না আসিতে দেখি, এক চন্দ্রকান্তি বালক!

ক্ষুদ্র দস্যু, আমার ঘরের যেখানে যা অবশিষ্ট আছে, লুটিবার জন্ত কাহারও দিকে যেন লক্ষ্য না করিয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। আমি পথের মাঝেই তাহাকে বুকে তুলিয়া দুই বাহুপাশে বন্দী করিলাম। ক্রোধে ক্ষুদ্র করপত্রে সে আমার শ্মশ্রু ধরিয়া টান দিল। কিছুতেই যখন আমি পরাভব স্বীকার করিলাম না, তখন ক্ষুদ্র হুঙ্কারে সে আমাকে ভয় দেখাইল।

"এর দিকে একবার ফিরে চান, বাবা!"

যশোদা, দেবকী—যেন উভয়েরই প্রতিরূপ সেই রহস্যময়ী নারী! কোলে গৌরী!

"এর মুখের অবস্থাটা একবার দেখুন!"

জীবনদায়িনীর কোলে রহিয়াছে, তবু আমার কোলে তাহার নবাগত দুরন্ত স্নেহাংশভাগীকে দেখিয়া ক্ষুদ্র বালিকার মুখ অভিমানে রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে

তাহার মাতৃক্রোড়ে বালিকা স্থায্য নিজস্বের ভাগ লইতে উঠিয়াছে, বালকের ভ্রুক্ষেপও নাই, সে অপরিস্ফুট আনন্দের

[শিল্পী—নারায়ণচন্দ্র কুশারী ।

স্নানান্তে ।

তাবায় ছুই হাত দিয়া আমার শ্মশ্রু, মুখ, নাসিকা বিপন্ন করিতে নিযুক্ত ছিল।

আসিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তথাপি আমার চোখে জল আসিল।

"এর মায়া কি আপনি ত্যাগ করতে পারবেন?"

"বালক-বালিকার এ কি অদ্ভুত সাদৃশ্য, মা! অন্তে দেখলে যমজ না ব'লে থাকতে পারবে না।"

"খোকা এক মাসের বড়।" বলিয়া মা গৌরীকে কোল হইতে নামাইলেন। আমিও বালককে ভূমিতে রক্ষা করিলাম। গৌরী আমার দিকে আসিতেছিল। বালক পথের মাঝে, চোখের পালট পড়িতে না পড়িতে, তাহাকে যেন লুটিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর চাৎকার।

অগত্যা আমি গৌরীকে কোলে লইলাম। বালক একবার আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর আপনার মনে কিছু দূর বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়া ছুটিল।

এইবারে কথা ফিরাইতে মা বলিলেন,—"মায়ের এত অসুখ হয়েছে, জানতুম না।"

"তুমি কি তার অসুখের খবর পেয়ে এসেছ?"

"না, বাবা, খবর নিতেই ত আসি।"

"ভুবনের মা তোমাকে কি অসুখের কথা বলেছে?"

"বলতে হবে কেন, দেখতেইত পাচ্ছি,—দাঁড়াবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই। মুখ দে কথা বার হচ্ছে না।"

"তুমি কি এখনি যাবে, না কিছুক্ষণ থাকতে পারবে?"

"আপনি কি আবার কোথাও যাচ্ছেন?"

"একবার বাজারে যেতে হবে।"

"কি আনতে হবে, ব'লে দিন, আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়াই তিনি ডাকিলেন, "পার্ব্বতি!"

"অন্তের দ্বারা হবে না, আমাকেই যেতে হবে। আমার গুরুদেব এখানে পদধূলি দেবার ইচ্ছা করেছেন।"

"তবে আমিও একবার ঘুরে আসি না কেন?"

"পার ত ঘুরে এস। না পার, ভুবনের মা'কে কিছু আহার করিয়ে যাও। তোমারই জন্ত সে আজ ক'দিন অন্ন ত্যাগ করেছে।"

"বলেন কি, বাবা! আমার জন্ত?"

"আমার শত অনুরোধে, কেবল আমাকে তুষ্ট করতে, এক আধটা ফলের কণা সে মুখে দেয়।"

ভীতি-বিহ্বল চোখে মা আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

"বুড়ী গেল কোথায়?"

"আমি তাকে নীচে বসিয়ে এসেছি।"

"বসতে সে নীচে যায়নি, কোথা থেকে এক রাণী গুরুর বাড়ী ভুল ক'রে এখানে এসেছে, বুড়ী তাকে খুঁজতে গেছে।"

পার্ব্বতী এই সময় উপরে আসিয়া মা'কে উত্তরের দায় হইতে নিষ্কৃতি দিল।

"পার্ব্বতীকে দিয়ে আনালে হবে না?"

"হবে না কেন, কিন্তু আমার তৃপ্তি হবে না, মা! আজও পর্য্যন্ত তিনি আমার এ গৃহে পদার্পণ করেন নি।"

"তবে ঘুরে আসুন।"

গৌরী এতক্ষণ চুপটি করিয়া আমার কাঁধে মাথা দিয়া ছিল।

"গৌরীকে আমার কোলে দিন।"

দিতে যাইতেছি, ঘরের ভিতরে শব্দ হইল। আমাদের কথার অবসরে কখন্ যে তাঁহার শিষ্ট ছেলেটি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা কেহই দেখিতে পাই নাই।

"দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? কি ভাঙ্গলে দেখ।" পার্ব্বতীকে আদেশ করিয়া মা গৌরীকে কোলে লইলেন।

"যাই ভাঙ্গুক, মা, ছেলেকে যেন কিছু ব'ল না।"

পার্ব্বতী দ্বারের কাছে উপস্থিত হইয়াই বলিল,—"কলসী ভেঙ্গে বাবার বিছানাপত্তর সব জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।"

বাহির হইতে কৌতূহল-পরবশ হইয়া, একবার দেখিলাম। ঘর জল-প্লাবিত, বালক তাহার উপরে পড়িয়া মহানন্দে যেন সাঁতার কাটিতেছে।

"উপর থেকে চাদর নিয়ে বেশ ক'রে মুছিয়ে দাও—যেন মারধর্ করো না, মা! আর যা বললুম, ফিরে আসা যদি অসম্ভব মনে কর, ভুবনের মা'র জীবনরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে যাও। নইলে তোমার গৌরীর জীবন রাখা ভার হবে।"

"আমি এখন যাব না, বাবা।"

১৫

গুরুর অহেতুকী কৃপা! কখন্, কি অবস্থায়, কেমন করিয়া কাহার ভাগ্যে তাহা লাভ হইয়া থাকে, ভাবিতে গেলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। নহিলে, যে জীবনে ভুলের উপর ভুল

করিয়া একান্ত হেয় হইয়াছিল, সে এক অপূর্ব্ব অবস্থার সংযোগে, এক মুহূর্ত্তেই এই অপূর্ব্ব বস্তুর অধিকারী হইল কেন ?

শুনিয়াছি, ভগবান্ বালক-স্বভাব। রত্নের পুঁটুলি লইয়া বালক পথের ধারে বসিয়া আছে। এক জন তাঁহার কাছে দুটি হাত পাতিয়া বারংবার রত্ন-ভিক্ষা করিল,—পাইল না। আর এক জন তাহার দিকে, দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না করিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, বালক ছুটিয়া পিছন হইতে ধরিয়া তাহাকে রত্ন দান করিল।

আমার ঘরে আজ তাই দেখিলাম।

বাজার করিয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম, পথে আসিতে দেখি, দশাশ্বমেধের বড় পথ ধরিয়া দুইদিক্ বন্ধ একটি পাল্কী চলিয়াছে। পাল্কী অমন ত অনেক যায়, সেটার প্রতি লক্ষ্য করিবার আমার কিছুই ছিল না, যদি না ঠিক সেই সেপাইজির মত এক জন লাঠি হাতে তার পিছন পিছন ছুটিত। আমি অনুমান করিলাম, পাল্কীর ভিতরে আর কেহ নয়, মা আছেন।

তথ্য লইবার আমার ইচ্ছা হইল ; কিন্তু অনেক লোকের গতায়াত, লওয়াটা উচিত বোধ করিলাম না। মুখ ফিরাইতেই দেখি, পার্ব্বতী। আর আমার সন্দেহ রহিল না। সে-ও নিশ্চয় পাল্কীর অনুসরণ করিতেছিল, ছুটিতে অশক্ত—পিছাইয়া পড়িয়াছে।

বুঝিলাম, মা আমার সাধারণ মহিলা নহেন—রাণীই বটেন। কিন্তু এরূপ ভাবে এত শীঘ্র তাঁহারা চলিয়া যাওয়ায় আমার মনে সংশয় জাগিল। মা যে বলিয়াছিলেন, থাকিব !

পার্ব্বতী অন্যদিকে মুখ করিয়া পথ চলিতেছিল। গোটা দুই প্রশ্ন করিয়াই বুঝিলাম, আমাকে দেখিয়াই সে ওরূপ করিয়াছে।

আমি ডাকিলাম,—"পার্ব্বতি !" সে উত্তর দিল না। আবার বলিলাম,—"ওগো মা ! তোরা চ'লে যাচ্ছিস্ যে।" উত্তর ত সে দিলই না, একবার মাত্র আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, যেন চির-অপরিচিত কে আমি, সে অধিকতর দ্রুতগতিতে আমা হইতে অনেক দূরে চলিয়া গেল। আমার সংশয় দ্বিগুণিত হইল। ভুবনের মা তবে কি মায়েরও অনুরোধ রক্ষা করিল না ? মরিতেই কি সে সঙ্কল্প করিল ? কিংবা এমন কোন কথা আবার সে মা'কে শুনাইয়াছে যে, অভিমানাহত কুলাঙ্গনা মুহূর্ত্ত মাত্রও আর আমার বাড়ী তিষ্ঠিতে পারেন নাই !

ব্যাকুলভাবেই আমি বাসায় ফিরিলাম। প্রবেশ করিতেই দেখি, ভুবনের মা উপরে উঠিবার সিঁড়ির মুখেই বসিয়া আছে। তাহার মুখ কিন্তু অপ্রফুল্ল দেখিলাম না।

"থাক্‌ব ব'লে মা চ'লে গেল কেন, ভুবনের মা ?"

উত্তর শুনিতে ভুবনের মা'র কাছে উপস্থিত হইলাম। আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে বলিল,—"বাবা এসেছেন।"

"তিনি আস্‌বেন আমি জান্‌তুম ; মা চ'লে গেলেন কেন ?"

"হঠাৎ তাঁর কি একটা প্রয়োজন পড়েছে।"

"রাগ ক'রে গেলেন না ত ?"

ভুবনের মা আমার মুখের পানে চাহিল।

"তাঁর ঝিকে ডাক্‌লুম, সে শুনতে পেয়েও উত্তর দিলে না, একবার ফিরে চেয়ে চ'লে গেল।"

"রাগের কারণ ত কিছুই হয়নি। তুমি বলেছ, আমি না কি অনাহারে মর্‌ব সঙ্কল্প করেছি, তাই শুনে কত দুঃখ কর্‌লেন তিনি। দু'হাতে ধরে আমাকে খেতে কত অনুরোধ কর্‌লেন।"

"যাক্, আজ আহার হবে ত ?"

"নিজেই রেঁধে দিতে প্রস্তুত।"

"খাবে ত ?"

"ও বাবা ! আর না খেয়ে পারি ! যাবার সময় মা, সেই ননীর পুতুলকে দেখিয়ে আমাকে অনুরোধ ক'রে গেছে।"

"বাঁচা গেছে।"

"ও বাবা, সে পাগল মেয়ে—ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আমাকে দিব্যি গাল্‌তে বলে। আমি যদি মর্‌ব ত দুঃখ ভোগ কর্‌বে কে ?"

"বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে ? তোমার মাথা নাড়ায় বুঝতে পার্‌লুম না,—হয়েছে, না হয়নি ?"

"আমি বলতে পার্‌লুম না, বাবা !"

"যাক্, এখানে ব'সে আছ কেন ?"

ভুবনের মা উত্তর দিল না।

তাহার এরূপ আচরণ আমার কাছে কেমন একটা রহস্যের মত বোধ হইল। আমি বলিলাম,—"তুমি যেন আমার কাছে কথা গোপন কর্‌ছ ?"

"এক সাধু মা এসে আমাকে বল্লে, 'মা এইখানে বস। কেউ যদি আসে, তাকে উপরে উঠ্‌তে নিষেধ ক'র ! বাবার সঙ্গে আমার কিছু দরকারি কথা আছে'।"

"আমাকেও উঠতে নিষেধ করেছে ?"

"তোমার কথা ত স্বতন্ত্র ক'রে বলেনি, বাবা !"

"বেশ। গৌরী ?"

"সাধু মা তাকে কোলে ক'রে নিয়ে গেছেন।"

অবশ্য আমি বিস্মিত হইলাম,—একটা যেন রহস্যের জাল চারিধার হইতে আমার বাসাটাকে বেরাও করিতেছে। তবে ভুবনের মা'কে আর প্রশ্নে উৎপীড়িত করা সঙ্গত মনে করিলাম না। এই ক'টা কথা কহিতেই বৃদ্ধা যেন ক্লান্ত হইয়াছে। সাধু মা'র সঙ্গে আর এক জন আসিয়াছে কি না, জানিবার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা দমিত করিয়া জিনিষগুলা রাখিতে আমি রন্ধন-শালায় চলিয়া গেলাম।

কি আপদ, নিজের ঘরে কি চোর হইলাম ! গুরুর সঙ্গে তার এমন কি কথা যে, আমার পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত হইবার অধিকার নাই ! অভিমান যাইবে কোথায় ? রন্ধন-শালায় বসিয়া, দুই হাতে হাঁটু বাঁধিয়া, আমি নিমীলিত-নেত্রে যোগিনীর মুণ্ডপাত করিতেছিলাম।

"তাই ত, বাবা, একটা যে বড় অন্যায় হয়ে গেছে !"

আমি চোখ মেলিলাম মাত্র।

"যে-সে পাছে উপরে যায়, মাকে নিষেধ ক'রে গিয়েছিলুম, মা আমার কথা বুঝতে পারেন নি। যে-সে'র মধ্যে কি আপনি !"

"আপনাদের কথা হয়ে গেছে ?"

"আপনাকে গোপন ক'রে কইতে হবে, এমন কোনও কথা তাঁর সঙ্গে আমার ছিল না—উঠে আসুন।"

"আমার উপরে যাবার প্রয়োজন আছে, মা ? এখনো দু'চারটে জিনিষ আমার কিন্‌তে বাকি আছে।"

"উঠে আসুন, উঠে আসুন। আমার সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন, তাঁরই সম্বন্ধে কথা বাবাকে যা বলেছি, সমস্তই তাঁর মুখে আপনি শুন্‌তে পাবেন। আপনারও শোন্‌বার প্রয়োজন।"

অভিমান করিয়া বসিয়া থাকার কোনও মূল্য নাই বুঝিয়া আমি আসন ত্যাগ করিলাম।

"ভুবনের মা কি সেইখানেই ব'সে আছে ?"

"না বাবা, তাকে উপরে তুলে দিয়ে এসেছি।"

"বালিকা ?"

তপস্বিনী হাসিয়া বলিলেন—, "উপরে যান, সকলকেই দেখ্‌তে পাবেন।"

"আপনি ?"

"আমি সেই মেয়েটিকে আন্‌তে চল্‌লুম।"

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

ব্যাকরণ।

(হায়েন)

যুগযুগান্তর ধরি' চাহে এ উহার পানে,
আকাশে তারকা দু'টি প্রেমব্যথা বহি' প্রাণে।

তাহাদের আছে ভাষা, কোমল মধুর যাহা,
মানুষের সাধ্য নাই, বুঝিতে পারিবে তাহা।

তাহাদের সেই ভাষা বুঝিতে পেরেছি আমি—
প্রিয়া-মুখ-ব্যাকরণ পড়িয়া দিবস-যামি।

ইলিশ।

চক্‌চকে চাকা চাকা সিকি-ঢাকা অঙ্গ।
কালাপেড়ে দাঁড়াখানি তনু ধনু-ভঙ্গ॥
মিঠে গঙ্গাজলে তোলা অন্নপূর্ণা-ঘাটে।
মেছোর পাটায় শোভে কিবা বাঁকা ঠাটে॥
ইলিশে খোলসে যথা জলুশের ছটা।
ভোজনে স্বজনসনে আরো ভারি ঘটা॥
পেট-জোড়া ডিম যোড়া পড়ে যেন ফেটে।
দিচ্চে তুলে হাতে মেছো ইচ্ছে খেতে চেটে॥
পাড়াতে কড়াতে কেহ মাছ ভাজে রাতে।
রন্ধনে আনন্দ বাড়ে গন্ধে মন মাতে॥
লাউপাতা সাথে ভাতে সর্ষেবাটা মাখা।
সেই বোঝে মজা তার যার আছে চাখা॥
ভাতে মেখে খাও যদি ইলিশের তেল।
কাজ দেবে যেন 'কড্‌লিভার অয়েল'॥
গরম গরম ভাজা খিচুড়ির সঙ্গে।
বর্ষাকালে হর্ষে গালে তোলে লোকে বঙ্গে॥
পদ্মার হুদোর মধ্যে ইলিশের রান্না।
উড়েতে হাঁড়িতে দিলে চোখে আসে কান্না॥
কাঁচা ইলিশের ঝোল কাঁচা লঙ্কা চিরে।
ভুলিবে না খেয়েছে যে বসে পদ্মাতীরে॥
ভাজিলে ঝালের ঝোলে ইলিশ অসার।
কাঁচাতে অরুচি রুচি মাখমের তার॥
সর্ষে বাটা দিয়ে তা'তে মিশাইয়া দধি।
আমিরী আহার হবে রেঁধে খাও যদি॥
পিয়িতে ইলিশ গাঁথা পুঁইপাতা সাথে।
তেল-কাঁটা দিয়ে ঘাঁটা চাটাচাটি পাতে॥
টকেতে চটক বাড়ে শেষে মুখশুদ্ধি।
ধন্যি ধন্যি রাঁধে গিন্নী মরি মরি বুদ্ধি॥
রাঁধুনী নিপুণা রাঁধে কত যে রকম।
ইলিশেতে অম্ল গড়ে বড়া পোড়া দম॥
পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক যতনে।
আদরে করেন পূজা ইলিশ রতনে॥
আষাঢ়ে প্রথম মৎস্য প্রবেশিলে ঘরে।
দূর্ব্বাধানে পূজে তারে শঙ্খরব ক'রে॥
রমণী-রসনা বোঝে ইলিশের স্বাদ।
চাঁদমুখে চিবাইতে সধবার সাধ॥
একটি একটি কাঁটা তারিয়ে তারিয়ে।
অবলা বিরলে খান বেরালে হারিয়ে॥
ছেলে-পুলে ধরে এনে খাওয়াইয়ে ঠুসে।
পুণ্যবতী গিন্নী খান কণ্ঠাখানি চুষে॥
বড় বউ মুড়ো চায় ভাজা খাবে মেজো।
ছোট বউ বলে, দাগা কড়া করে ভেজো॥
ন'খুড়ীমা'র রুচি বেশী চচ্চড়ি খেতে।
আছ্‌ড়া-আছ্‌ড়ি ছুঁড়ীদের ছেঁচ্‌ড়া পাতে পেতে॥
আম্ব-অম্ব পান্তা-ভাতে মেখে টক্ বাসি।
হতেন না'ক' ক্ষান্ত কভু খেতে শান্ত মাসী॥
হিষ্টিরিয়া দৃষ্টিহারা পরকোলা দে চোখে।
অম্বল সম্বল পেটে ওঠে ঢোঁকে ঢোঁকে॥
নিভাননা সুকুন্তলা আলোচনাগণ।
বঞ্চিতা ভোজ্যের ভোগে যত বাছাধন॥
ইলিশকে বিষ বোধে সারা হ'ন ভয়ে।
হজুব্যাণ্ড হাইজিন্‌তত্ত্ব প'ড়েছেন ব'য়ে॥
ছেলে পড়ে স্বাস্থ্যরক্ষা অম্ল-উদজান।
চাম্‌চে মাপে নাম্‌চে তাই অন্নপরিমাণ॥
আস্ত গোটা মৎস্য খাবে কোস্তা-কুস্তি কস্ত।
কাঙলা বাঙ্গালা হ'তে সে পুরুষ অস্ত॥
দেখেছি, এ দেশে নারী ঢুকে ঢেঁকিশালে।
শ্যামা যেন রণবেশে নাচে তালে তালে॥
পড়েছে কেশের রাশি পিছনে ঝাঁপায়ে।
দুম্ দুম্ পড়ে ঢেঁকি মেদিনী কাঁপায়ে॥
ঘর্ঘর ঘুরিছে জাঁতা কামিনীর করে।
শিলেতে পিষিছে নোড়া জোড়া ভুজে ধ'রে॥
জলের কলসী কাঁকে হেলাইয়া অঙ্গ।
আলো ক'রে চলে পথে রূপের তরঙ্গ॥
শুয়ে ব'সে মাথা ঘ'সে রসে ভেসে কবে।
ফর্কে গিয়ে পর্দাপার্কে সুস্থ দেহ হ'বে॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

শিবাজীর কলঙ্ক।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর দুইটি কলঙ্কের উল্লেখ করিয়াছেন। ১ম—বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক জাওলীর রাজা চন্দ্র রাওকে হত্যা। ২য়—বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক আফজল খাঁর প্রাণবিনাশ। শিবাজী স্বহস্তে আফজলের প্রাণ লইয়াছিলেন, চন্দ্র-রাওয়ের প্রাণ গিয়াছিল শিবাজীর অনুচর ব্রাহ্মণ রঘুনাথ বল্লালের হাতে। আফজল খাঁ'র হত্যাকাণ্ডে শিবাজীর চরিত্রে বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছিল কি না, তাহা লইয়া বহুদিন হইতেই তর্কবিতর্ক চলিতেছে। মারাঠা বখরকারগণ এ বিষয়ে একবারে একমত। তাঁহাদের মতে শিবাজী আফজলের সহিত শঠে শাঠ্য সমাচরণ করিয়াছিলেন মাত্র, মুসলমান সেনাপতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। আফজলই শিবাজীর অঙ্গে প্রথম অস্ত্রাঘাত করেন, শিবাজী বাঘনখের আঘাতে আফজলের উদর বিদারণ করিয়াছিলেন আত্মরক্ষা-ব্যপদেশে। সম্প্রতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার আফজলের [illegible] শিবাজীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন। যদুনাথের বহু পূর্ব্বে পারসী লেখক কারকরিয়া একটি ইংরাজী প্রবন্ধে উপরিউক্ত ঘটনা সম্পর্কে শিবাজীর কলঙ্কভঞ্জনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় তখন কেহ বিশেষভাবে কর্ণপাত করে নাই। আমাদের এ যুগ কলঙ্কভঞ্জনের যুগ, সুতরাং দ্বিতীয় কলঙ্কভঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক-মহলে শিবাজীর প্রথম কলঙ্ক মোচনের চেষ্টাও আরম্ভ হইয়াছে।

শিবাজী।

জাওলী এখন একটি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রাম বোম্বাই সরকারের নিদাঘ-নিবাস মহাবলেশ্বরের অতি দূরে কয়না নদীর উপত্যকায় অবস্থিত। এখন য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের সুবিধার জন্য মহাবলেশ্বরে বাইবার সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। শিবাজীর সময়ে এই সকল পথঘাটের চিহ্নমাত্রও ছিল না, এখনকার সমৃদ্ধ মহাবলেশ্বর তখন ছিল নিবিড় অরণ্যানী-পরিবেষ্টিত বিরলবসতি ক্ষুদ্র গ্রাম, আর এখনকার গণ্ডগ্রাম জাওলী ছিল এই দুর্গম অরণ্য-দ্বারা সুরক্ষিত একটি সমৃদ্ধ জনপদের জনবহুল রাজধানী। মহাবলেশ্বরে কৃষ্ণা, কয়না,

বেণা, গায়ত্রী ও সাবিত্রী এই পঞ্চনদীর উৎপত্তিস্থান। আর দ্বাদশ বৎসর অন্তর পূতসলিলা ভাগীরথীও নাকি এই পুণ্যতীর্থে পঞ্চনদীর সহিত মিলিতা হয়েন। এইজন্য বহু প্রাচীনকাল হইতেই মহাবলেশ্বরে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে যাদব-নৃপতি সিঙ্গন দেব তীর্থদর্শন মানসে এই স্থানে আসিয়াছিলেন ও তীর্থদেবতা মহাবলেশ্বর শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

যাদব নরপতিগণ মহাবলেশ্বরের মালভূমি ও তৎসন্নিহিত উপত্যকাপ্রদেশ শিরকেদিগকে দান করেন। বাহমনী বংশের রাজত্বকালেও শিরকেবংশীয় সামন্তরাজগণ মুসলমান সম্রাটের অধীনে এই প্রদেশ শাসন করিয়াছিল। কিন্তু বাহমনী বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শিরেকবংশেরও পতনের সূত্রপাত হয়। ইউসুফ আদিল শাহের সেনানায়ক পরসোজী মোরে শিরকেদিগের রাজ্য অধিকার করেন এবং প্রভুর নিকট হইতে "চন্দ্র রাও" উপাধি লাভ করেন। পরসোজীর পুত্র য়েশবন্ত রাও আহম্মদ নগরের যুদ্ধে বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। শিবাজীর সময়ে রাজা বালাজী মোরে চন্দ্র রাও জাওলীর অধিপতি ছিলেন।

বালাজী মোরে আনুমানিক ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে জাওলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৪৯ হইতে ১৬৫৫খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিবাজী বিজাপুরের সহিত বিরোধ করিতে সাহসী হয়েন নাই। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার পিতার জীবন বিপন্ন হইত। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে শাহাজী নিরাপদ হইবামাত্র শিবাজী জাওলী বিজয়ে উদ্যোগী হয়েন। কারণ,জাওলী জয় করিতে না পারিলে দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে তাঁহার রাজ্য-বিস্তার করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু জাওলী রাজ্য পর্ব্বত ও অরণ্যানীবেষ্টিত; সুতরাং বিপক্ষ সেনার দুরধিগম্য। চন্দ্র রাও মোরের সেনাবলও নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য ছিল না। সভাসদের মতে চন্দ্র রাও দশ কিংবা দ্বাদশ সহস্র জাওলী সেনার অধিনায়ক ছিলেন। চিটনীসের মতে জাওলীরাজের সেনাবল দশ সহস্র। শিব-দিগ্বিজয়ের অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বলেন যে, জাওলীর রাজা চন্দ্র রাও মোরে পঁচিশ হইতে ত্রিশ হাজার মাওলী সেনা একত্রিত করিয়াছিলেন। সুতরাং শিবাজী প্রথমে বিগ্রহনীতি অবলম্বন না করিয়া সন্ধির দ্বারা স্বীয় অভীষ্টসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা সফল হয় নাই। সভাসদ এ সম্বন্ধে নীরব; কিন্তু চিটনীস ও শিব-দিগ্বিজয়কার উভয়েই বলিয়াছেন যে, চন্দ্র রাও শিবাজীর সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইলে শিবাজী জাওলী রাজ্য যে কোন উপায়ে হস্তগত করিবার সঙ্কল্প করেন।

সভাসদ জাওলী বিজয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন,—শিবাজী রঘুনাথ বল্লাল সবনীসকে চন্দ্র রাওয়ের নিকট পাঠাইলেন। তিনি রঘুনাথকে বলিলেন—চন্দ্র রাওকে না মারিলে রাজ্যজয় করা যাইবে না। তুমি ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা এই কার্য্যটি হইবে না। তুমি তাহার নিকট দৌত্যে যাও। রঘুনাথের সঙ্গে বাছা বাছা তলোয়ারবাজ একশত কি সওয়া শত লোক দেওয়া হইল। তাহারা জাওলীর নিকট এক স্থানে যাইয়া চন্দ্র রাওকে খবর পাঠাইল —আমরা শিবাজীর নিকট হইতে আসিয়াছি, তোমার সহিত বিশেষ প্রয়োজনীয় সন্ধিসম্বন্ধীয় কথা আছে। চন্দ্র রাও তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কপট প্রস্তাব শেষ হইলে—রঘুনাথ তাঁহার বাসাবাড়ীতে আসিয়া থাকিলেন। পরদিন তিনি আবার চন্দ্র রাওয়ের দরবারে গেলেন এবং তাঁহার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন; তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া চন্দ্র রাও ও তাঁহার ভ্রাতা সূর্য্যাজী রাওকে ছোরার আঘাতে হত্যা করিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া তাঁহার অনুচরগণের সহিত মিলিত হইলেন। যাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রাণ গেল। এই কায শেষ করিয়া তিনি রাজার সহিত মিলিত হইলেন। রাজা স্বয়ং অবিলম্বে জাওলী জয় করিলেন; মাওলীদিগকে আশ্রয় দিয়া নিজ সেনাদলে গ্রহণ করিলেন। প্রতাপগড় নামে একটি নূতন কেল্লা নির্ম্মিত হইল। চন্দ্র রাওর ভ্রাতা হনমন্ত রাও জাওলীর অন্তর্গত চতুর্বেট নামক স্থানে সুরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। হনমন্ত রাওকে না মারিলে জাওলীর কণ্টক দূর হয় না। সুতরাং শিবাজী সাম্ভাজী কাওজী মহালদারকে হনমন্তের নিকট পাঠাইলেন। সাম্ভাজী বিবাহপ্রস্তাবের ছলে হনমন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছোরার আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। জাওলী বিজিত হইল।

চিটনীসের বিবরণ এইরূপ—"কোন কৌশলে চন্দ্র রাওকে বন্দী করিবার জন্য রাঘো বল্লাল সবনীসকে পাঠান হইল। তাহার সহিত বাছা বাছা দুই শত লোক গেল।

রাঘো বল্লাল বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পাকা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে,চন্দ্র রাও মাদকদ্রব্যে আসক্ত এবং তাঁহার সেনাগণের মধ্যে ঐক্য নাই। তিনি তখন একটা মতলব স্থির করিয়া রাজা শিবাজীর নিকট লিখিলেন—'আপনার পুণ্য-প্রতাপে চন্দ্র রাওয়ের কায শীঘ্রই শেষ করিব। আপনি কোন অজুহতে এদিকে আসিবেন, কাযটা হইয়া গেলেই আপনাকে জানাইব এবং আপনি ঘাটের পথে অবতরণ করিবেন।' শিবাজী উত্তর দিলেন—'তোমার চিঠি অনুসারে রাজগড় হইতে পুরন্দরে আসিয়াছি এবং শ্রীমহাবলেশ্বর দর্শন করিয়াছি।' ইতোমধ্যে রঘুনাথ পন্ত চন্দ্র রাও ও তাঁহার ভ্রাতা সূর্য্য রাওকে গোপন মন্ত্রণার ছলে এক নিভৃত কক্ষে অবস্থান করিয়া হত্যা করিলেন।...সাম্ভাজী কাওজী মোরেদিগের প্রধান অমাত্য সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা হনমন্ত রাওকে হত্যা করিলেন। শিবাজী তখন মহাবলেশ্বরে ছিলেন। তিনি সেখানকার দেবতাকে প্রণাম করিয়া, নিসনি ঘাটের পথে জাওলী আসিলেন। দুই প্রহর যুদ্ধ করিয়া তিনি জাওলীর দুর্গ অধিকার এবং চন্দ্র রাওর পুত্র বাজী ও কৃষ্ণ রাওকে বন্দী করিলেন। চন্দ্র রাওয়ের পুত্রদ্বয় এবং পরিবারবর্গ পুণায় নীত হইলেন। পুণার দক্ষিণে কোন স্থানে পুত্রদ্বয়কে হত্যা করা হয়। কিছুদিন পরে মহিলাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং জাওলী শিবাজীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।"

শিব-দিগ্বিজয়ের বিবরণ ইহা হইতে অন্যরূপ—"রঘুনাথ বিবাহের প্রস্তাব লইয়া চন্দ্র রাওয়ের ভ্রাতা ও প্রতিনিধি হনমন্ত রাওয়ের নিকট গেলেন। রঘুনাথ হনমন্তকে খবর দিলেন যে, তাঁহার বিবাহযোগ্যা কন্যার সহিত মহারাজা শিবাজীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া তিনি আসিয়াছেন এবং তিনি হনমন্তের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। রঘুনাথ বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন বলিয়া হনমন্ত কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। হনমন্তকে অসতর্ক ও অরক্ষিত দেখিয়া রঘুনাথ তাঁহাকে হত্যা করিলেন। শিবাজী পুরন্দর দুর্গে আসিয়াছিলেন, রঘুনাথ ওয়াইর পথে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন এবং সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। শিবাজী রঘুনাথের বুদ্ধি ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, হনমন্ত রাওর ন্যায় সুদক্ষ সেনানায়ক মোরের সৈন্যদলে আর নাই; অতএব ইহাই তাঁহার রাজ্য আক্রমণের প্রকৃত সুযোগ। * * * রঘুনাথ বল্লাল আত্রেকে পাঁচ সাত হাজার মাওলী ও চারি পাঁচ শত অশ্বারোহীর সহিত রড় তোণ্ডীর পথে পাঠাইলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই দল সেনা একই সময়ে জাওলীতে পৌঁছিল। জাওলীর সেনাদলও খুব বড়। চন্দ্র রাও সাহসের সহিত দুই প্রহরকাল যুদ্ধ করিলেন। * * * যুদ্ধে চন্দ্র রাওর মৃত্যু হইল। তাঁহার দুই পুত্র বাজী রাও ও কৃষ্ণ রাও স্ত্রীলোকদিগের সহিত বন্দী হইলেন। * * * ১৭৬৪ শকে চিত্রভানু সংবৎসরে বাজী ও কৃষ্ণের মস্তক ছেদন করা হয় এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।" *

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডফ সভাসদ বা চিটনীস কাহারও বিবরণ সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, হনমন্ত রাও শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন।

"Ragoo Bullal with his Companion proceeded to Jowlee, attended by twenty-five Mawulees. They were courteously received, and had several interviews with Chunder Row, the particulars of which are not mentioned, but Ragoo Bullal seeing the Raja totally off his guard formed the detestable plan of assassinating him and his brother, to which Sumbhajee Cowajee readily acceded. He wrote to Sivajee communicating his intention, which was approved, and in order to support it, troops were secretly sent up to the Ghauts, whilst Sivajee, pretending to be otherwise engaged, proceeded from Rajgarh to Poorundhar. From the latter place he made a night-march to Mahaylissur at the source of the Krishna, where he joined his troops assembled in the neighbouring jungles. Ragoo Bullall, on finding that the preparations were completed, took an opportunity of demanding a private conference with the Raja and his brother, when he stabbed the former to the heart, and the latter was despatched by Sumbajee Cowajee. Their attendants being previously ready, the assassins instantly fled, and darting into the thick jungles, which everywhere surrounded the place, they soon met Sivajee, who, according to appointment, was advancing to their support. Before the consternation caused by this atrocious deed had subsided, Jowlee was attacked on all sides; but the troops headed by the Raja's sons and Himmut Row, notwithstanding the surprise, made a brave resistance until Himmat Row fell, and the sons were made prisoners." †

---

* সভাসদ, চিটনীস ও শিব-দিগ্বিজয়ের ভাবানুবাদ দেওয়া হইল।

† Grant Duff, Oxford Edition Vol I pp. 117—118.

সভাসদ ও চিটনীসের বিবরণের সহিত শিব-দিগ্বিজয়ের ঐক্য নাই, আবার গ্রাণ্ট ডফের বিবরণ এই তিনটি বিবরণ হইতেই স্বতন্ত্র। কিন্তু ঐ চারিটি বিবরণেই এক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ইঁহাদের সকলের মতেই জাওলী-বিজয়ের জন্ত চন্দ্র রাও, সূর্য্যাজী রাও এবং হনমন্ত রাও, ইঁহাদের মধ্যে কাহাকেও না কাহাকেও বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক হত্যা করা হয়। শিবাজী এই হত্যাকাণ্ডের অনুমোদন ত করিয়াছিলেনই, বোধ হয়, এই হত্যার কল্পনাও প্রথম তাঁহারই মনে উদিত হইয়াছিল। জাওলী-বিজয়ের পরে নিষ্কণ্টকে ও নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিবার জন্ত তিনি বন্দী বাজী ও কৃষ্ণ রাওয়ের প্রাণ বিনাশ করেন। আফজল মুসলমান, কিন্তু মোরে শিবাজীর স্বজাতি হিন্দু মারাঠা। সুতরাং জাওলী বিজয়ের জন্ত বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক চন্দ্র রাওয়ের হত্যাকাণ্ডই শিবাজীর পক্ষে গুরুতর কলঙ্ক। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সম্পূর্ণরূপে সভাসদের অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ, শিবাজীর মারাঠা জীবন-চরিতের মধ্যে সভাসদের গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং সরকার মহাশয়ও এই কলঙ্কমোচনের চেষ্টা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত শিশু মারাঠা রাজ্যের বিস্তৃতিসাধনের নিমিত্তই শিবাজী অগত্যাপক্ষে চন্দ্র রাওকে হত্যা করাইয়াছিলেন। সুতরাং রাজনীতিক কারণ ব্যতীত অন্তভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করা যায় না।

শিবাজীর এই কলঙ্কমোচনের চেষ্টা প্রথম করিয়াছেন রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস, তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থ 'মহাবলেশ্বরে' এবং মারাঠী মাসিক পত্র 'ইতিহাসসংগ্রহে।' মিঃ সি, এ, কিনকেইড তাঁহার 'History of the Maratha People" নামক গ্রন্থে পারসনীসের এই উদ্যমের সহযোগিতা করিয়াছেন। কিনকেইডের গ্রন্থে জাওলীর কাণ্ডের এইরূপ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে :—শাহাজী যখন কারাগারে, তখন বাজী শামরাজ নামক এক ব্যক্তি শিবাজীকে ধরিবার জন্ত বিজাপুর দরবার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়। চন্দ্ররাও মোরে ইহার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্র রাওয়ের সহিত শিবাজীর বাল্যে পরিচয় হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে একবারে বিনষ্ট করিবার পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকরিয়া তাঁহাকে নিজের দলে আনিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি জাওলীতে যাইয়া স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের নামে চন্দ্র রাওয়ের মতি-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অধিকন্তু চন্দ্র রাও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিয়া বিজাপুর দরবারে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিবাজী এইরূপ ষড়যন্ত্রের জন্ত প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন;
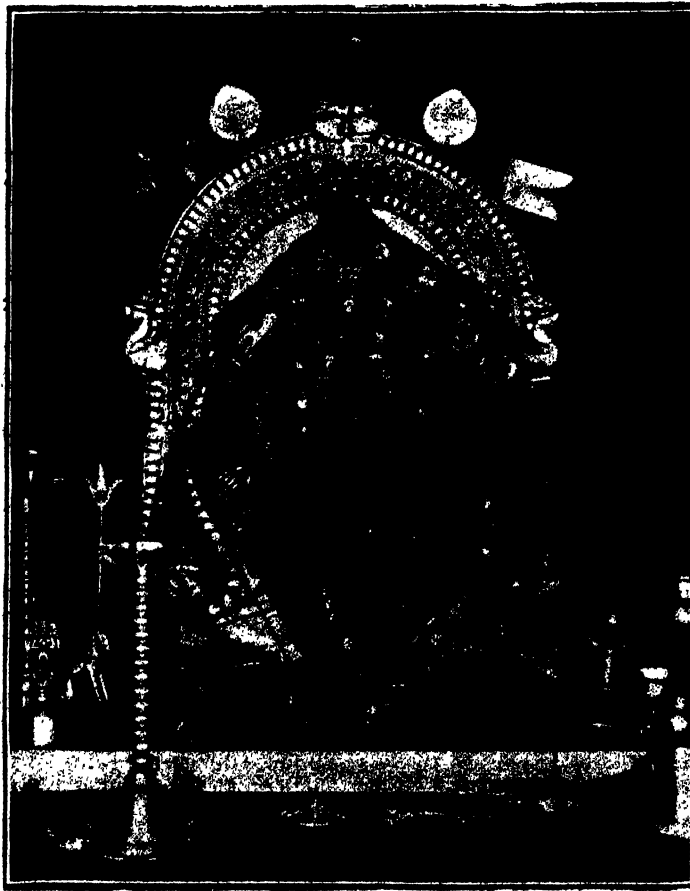
শিবাজীপূজিত ভবানী।

সুতরাং তিনি আততায়ীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হওয়াতে তিনি মোরের সহিত সখ্যস্থাপনের আশা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন; তথাপি যুদ্ধঘোষণা করিবার পূর্ব্বে আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত বিবেচনায় জাওলীতে দুই জন দূত প্রেরণ করিলেন। এই দুই জনের এক জন ব্রাহ্মণ, নাম রাঘো বল্লাল আত্রে; অপর জন জাতিতে মারাঠা, নাম সাম্ভাজী কাওজী। ইঁহারা যে প্রস্তাব লইয়া গেলেন, তাহাকে একবারে চরম প্রস্তাব বা ultimatum বলা যাইতে পারে। হয় মোরে অবিলম্বে শিবাজীকে কন্যা দান করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করুন, নতুবা প্রত্যাখানের ফলভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। মোরে প্রথম এই প্রস্তাবে সম্মতির ভাব দেখাইলেন, কিন্তু চূড়ান্ত জবাব দিলেন না। দূতেরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য কোনরকমে সময় নষ্ট করা। এই সংবাদ পাইয়া শিবাজীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। লোক জানিল, তিনি সসৈন্যে পুরন্দরের পথে যাত্রা করিতেছেন। কিন্তু রজনীযোগে তিনি পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ করিয়া একবারে মহাবলেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ইতোমধ্যে রাঘো বল্লাল একটা পাকাপাকি জবাব পাইবার জন্য মোরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা নিভৃতে মিলিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই নিভৃত সম্মেলনে কি ঘটিয়াছিল, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। হয় ত শিবাজীর দূতেরা প্রবঞ্চনার জন্য চন্দ্র রাওকে ভৎর্সনা করিয়া থাকিবেন। হয় ত প্রত্যুত্তরে চন্দ্র রাও শিবাজী কর্ত্তৃক অকারণে তাঁহার রাজ্য আক্রমণের উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। [illegible] বোধ হয় [illegible] করিয়াছিলেন, এবং সেই দ্বন্দ্বে রঘুনাথের হস্তে চন্দ্র রাও মোরে এবং সাম্ভাজীর হস্তে সূর্য্যাজী মোরে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। তৎপরে রঘুনাথ ও সাম্ভাজী আরণ্য-পথে পলায়ন করিয়া শিবাজীর সহিত মিলিত হয়েন। শিবাজী তাঁহার দূতদিগকে চন্দ্র রাওয়ের হত্যার জন্য নিয়োজিত করেন নাই, কিন্তু তাঁহার চরম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে তিনি বিনা দ্বিধায় জাওলী আক্রমণ করিলেন। চন্দ্র রাওয়ের ভ্রাতৃগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। তাঁহারাও শিবাজীর সহিত যোগদান করিলেন। চন্দ্র রাওয়ের মন্ত্রী হনমন্ত রাও এবং তাঁহার পুত্রগণ অকুতোভয়ে শিবাজীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে হনমন্ত হত হইলেন, রাজপুত্রদ্বয় বন্দী হইলেন। রাজসেনা শিবাজীর আনুগত্য স্বীকার করিল এবং জাওলী-রাজের বিপুল ধন-ভাণ্ডার শিবাজীর হস্তগত হইল। এই অর্থ দ্বারা তিনি মহাবলেশ্বরের মন্দির সংস্কার করিলেন এবং প্রতাপগড়ের দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

শিবাজীর রায়গড় দুর্গ।

যদি এই বিবরণ সত্য হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, চন্দ্ররাওয়ের হত্যাকাণ্ডের সহিত শিবাজীর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু প্রায় নয়খানি মারাঠী বখর এ বিষয়ে অভিন্ন মত, তাহাদের বিবরণ অনুসারে শিবাজী পূর্ব্বাহ্ণেই রাঘো বল্লালকে জাওলীর কণ্টক বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উদ্ধার করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাউক, কিনকেইড ও পারসনীসের বিবরণ কিরূপ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা বলেন যে, একখানি নবাবিষ্কৃত ছোট বখরে এইরূপ বিবরণ আছে। এই বখরখানি পারসনীস মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে ইতিহাস-সংগ্রহে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু

সকল বখরের বিবরণ সমান নির্ভরযোগ্য নহে। সভাসদ বখরের সঙ্কলয়িতা কৃষ্ণাজী অনন্ত শিবাজীর অনুচর ছিলেন। তিনি শিবাজীর পুত্র রাজারামের আদেশে তাঁহার বখর রচনা করেন। সেই বখরে তিনি স্পষ্ট ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, তিনি তাঁহার প্রভুর বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা অভিযোগ আনিতে নিশ্চয়ই সাহসী হয়েন নাই ; বিশেষতঃ যখন সে অভিযোগটি তাঁহার তদানীন্তন প্রভু রাজারামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই জন্যই অধ্যাপক সরকার প্রশ্ন বলিয়াছেন—এই বখর লিখিয়াছে কে ? এতদিন ছিল কোথায় ? পাওয়া গেল কেমন করিয়া ? পাইয়াছেন কে ? ইহা যতদিন না জানা যাইতেছে, ততদিন কিনকেইড ও পারসনীসের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতেছে না।

রাজগড়ে শিবাজীর শবদাহ স্থান।

"Some Maratha writers have recently 'discovered' what they vaguely call 'an old chronicle'—written nobody knows by whom or when, preserved nobody knows where, and transmitted nobody knows how,—which asserts that Chandra Row had tried to sieze Siva by treachery and hand him over to the vengeance of Bijapur * * Unfortunately for the credibility of such convenient 'discoveries,' none of the genuine old historians ofShiva could anticipate that this line of defence would be adopted by the twentieth century admirers of the national hero; they have called a murder a murder."

গ্রন্থখানি কোথায় ছিল, কেমন করিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস বোম্বাইয় 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' পত্রে এক জন অজ্ঞাতনামা সমালোচক প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও এই গ্রন্থকে সভাসদের গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন সন্তোষজনক কারণ দেখান হয় নাই।

শ্রীযুত কেলুসকর ও অধ্যাপক তাকখাও তাঁহাদের লিখিত Life of Shivaji Maharajএ এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং কিনকেইড ও পারসনীসের বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণীয়।

ইঁহাদের মতে বখরের বিবরণে কোথাও গলদ রহিয়া গিয়াছে। কেন না, বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যাইয়া রাঘো বল্লাল চন্দ্র রাওকে খুন করিয়া আসিবার পরই যে সাম্ভাজী কাওজীর সমপ্রকৃতির প্রতারণায় ভুলিয়া হনমন্ত রাও তাঁহার হাতে প্রাণ দিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। শিবাজী যে দীর্ঘকাল জাওলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ "জেধেদিগের শকাবলীতে" পাওয়া যায়। ঐ শকাবলীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে, শিবাজী প্রথম জাওলী আক্রমণ করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর জাওলীর পতন যখন অবশ্যম্ভাবী হইল, তখন চন্দ্ররাও মোরে জাওলী হইতে পলায়ন করিয়া রায়রী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশ্য, তাঁহাকে রায়রী দুর্গ শিবাজীর সেনাগণের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে হইয়াছিল। জাওলীর পতনের পরই শিবাজী রায়রী অবরোধ করেন। এইখানে তাঁহার সহিত কাহ্নোজী নাইক জেধে এবং বাদল ও সিলিবকর দেশমুখ ছিলেন। হৈবত রাও এবং বালাজী নাইক সিলিবকরের মধ্যস্থতায় চন্দ্র রাওর সহিত শিবাজীর আপোষ হইয়া যায়। চন্দ্র রাও বশ্যতা স্বীকার করিবার পরেও বোধ হয় হনমন্ত রাও শিবাজীর প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই, এবং সেই জন্যই সাম্ভাজীর

হস্তে তাঁহার প্রাণ যায়। ঘটনার বহু পরে লিখিত বখরগুলিতে স্বভাবতঃ এক পিতার সন্তান হনমন্ত রাও ও বালাজী রাও মোরের সহিত গোলমাল হইয়া থাকিবে। শ্রীযুত কেলুসকর ও তাকখাও এইরূপে বখরের ও জেধে শকাবলীর বিবরণের সামঞ্জস্যসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণও সন্তোষজনক নহে। কারণ, অন্যান্য বখর ঘটনার বহু পরে লিখিত হইলেও সভাসদ্ বখর জাওলীবিজয়ের অর্দ্ধশতাব্দীমধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে সভাসদ্ অপেক্ষা এ বিষয়ে জেধে শকাবলীই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কেন না, কৃষ্ণাজী অনন্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কি না, তাহা জানা নাই। কিন্তু কাহ্নোজী নাইক জেধে জাওলী অভিযানে শিবাজীর সহযাত্রী ছিলেন। কিন্তু এই যুক্তিও গ্রহণীয় নহে। কারণ,পরলোকগত বাল গঙ্গাধর তিলক বলিয়াছেন যে,অক্ষর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনে হয়, শকাবলীর যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে,তাহা একশত কিংবা দেড় শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। আবার সভাসদের বিবরণ সম্বন্ধে কেলুসকর ও তাকখাও যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাও একেবারে অবহেলার যোগ্য নহে। একই প্রকারের ছলনায় যে অল্প-কালের মধ্যেই চন্দ্র রাও ও হনমন্ত রাও উভয়েই প্রাণ হারাইয়াছিলেন, ইহা কতকটা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সকল বখরেই হনমন্তের বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার প্রশংসা আছে। বরং জেধে শকাবলীর সহিত শিব-দিগ্বিজয়ের বিবরণের অনেকটা সামঞ্জস্য থাকে। প্রথমে হনমন্তকে খুন করিয়া পরে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পরে জাওলী-বিজয় অসম্ভব নহে। কিন্তু শিব-দিগ্বিজয় অত্যন্ত আধুনিক গ্রন্থ; সুতরাং সভাসদ্ অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য নহে। মোটের উপর ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, যে পর্য্যন্ত অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত না হইতেছে, ততদিন শিবাজীর এই কলঙ্ক অপনয়নের চেষ্টা বৃথা।

কিনকেইড ব্যতীত আর যাঁহারই বিবরণ গ্রহণ করুন না কেন, শিবাজীর উপর চন্দ্র রাও অথবা হনমন্ত রাও মোরের হত্যার দায় আসিয়া পড়ে; এবং সকলের মতেই শান্তির প্রস্তাবের ছলনায় এই হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছিল। *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

---

* এই প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি—

(1) Grant Duff, History of the Mahrattas (Oxford Edition.)

[2] Kincaid and Parasnis, History of the Maratta People.

[3] Parasni's Mahabaleshwar

[4] Parasni's Itihas-Sangraha.

[5] Sarkar—Shivaji.

[6] মৎকৃত—Siva Chhatrapati.

[7] Keluskar and Takhakhare, Life of Shivajee Maharaj.

[8] B. I. S. Mandal. Chaturtha Sammilan

পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাঙ্গালার বাণীকুঞ্জ যাঁহার সঙ্গীতে এক নূতন সুরে ভরিয়া উঠিতেছিল, বাঙ্গালার জাতীয়তা যাঁহার বীণার তানে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইতেছিল, ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও ভঙ্গীতে বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য যিনি অশেষ শোভা ও সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া তুলিতেছিলেন, সেই সত্যেন্দ্রনাথ সহসা আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। আজ আমাদের দেশের ব্যথা ও দুর্দ্দশাকে অনবদ্য কাব্যের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে, সামাজিক অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের কশা ধারণ করিতে, এক কথায় কাব্য-সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে জাতির ও দেশের সেবায় নিয়োজিত করিতে, কবির অভাব হইল। রবীন্দ্রনাথ এখন বিশ্ব-সুন্দরীর রূপচ্ছটায় এতই মুগ্ধ যে, দেশের কথা ভাবিবার তাঁহার অবসর অল্প। নবীন কবি যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও কাব্যে পল্লীর কথা শুনিতে পাই বটে, কিন্তু আজ দেশময় যে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা কয়জনের কবিতায় ধ্বনিত হয়? স্বদেশ-প্রাণ নবীন কবি কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লামকে ভুলি নাই। কিন্তু একা সত্যেন্দ্রনাথই যে প্রকৃতপক্ষে অক্লান্তভাবে স্বদেশ-সেবার নূতন মন্ত্র সকলকে শুনাইতেছিলেন, সে কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের সুযোগ্য বংশধর সত্যেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার 'তীর্থ-সলিল' লইয়া জননী বঙ্গবাণীর রাতুল চরণে অঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি সকলকে পুলকিত ও আশান্বিত করিয়াছিল। তদবধি তিনি আপনার অসামান্য শক্তিরই পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন। তখন কি কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল যে, তাঁহার যৌবন অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই, চল্লিশ বৎসর মাত্র বয়সে, তিনি তাঁহার কর্ম্ম উদ্‌যাপন করিয়া চলিয়া যাইবেন? তখন সকলেরই মনে হইয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নোত্থিত নির্ঝরের ন্যায় তাঁহার "এত প্রাণ আছে, এত গান আছে" যে, সে প্রাণ ও সে গানের ধারা যতক্ষণ না সারা দেশকে প্লাবিত করিবে, ততক্ষণ তাহার উৎসমুখ বন্ধ হইবে না। কিন্তু আমরা তাঁহাকে অকালে হারাইলাম!

আধুনিক বাঙ্গালার অনেক কবিই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবান্বিত; অনেকে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কাব্যসাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথমে যাঁহারা এই বিশ্বজয়ী কবিকে অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই; তাঁহার ভাষা ও ছন্দ নকল করিয়া এবং কিছু কিছু ভাব আয়ত্ত করিয়া অনেকেই তাঁহার অনুকারী মাত্র হইয়া রহিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ক্রমশঃ একটা বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণভাবে বলিতে গেলে, এই সকল রবীন্দ্র-শিষ্যের কাব্যে অন্ধ অনুকরণের প্রায় সমস্ত দোষই লক্ষিত হইবে,—ইহা বিশেষত্ববর্জ্জিত এবং প্রাণহীন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্য, ক্রমশঃ আর একদল নবীন কবি আবির্ভূত হইলেন, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার অনুকারী নহেন। ইঁহারা এক নূতন সুরে গান গাহিতেছেন; সে সুর রবীন্দ্রনাথের ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি নহে, সে গান কাহারও নির্দ্ধারিত পন্থা অনুসরণ করিয়া চলে না। ইঁহাদের সাহিত্য-সাধনায়—বাঙ্গালার কাব্য-ভাণ্ডার নানা রত্নে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবিগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, টেনিসন ব্রাউনিঙের যুগে সুইন্‌বার্ণ রসেটি মরিস প্রমুখ এমন কয়েকজন কবির উদ্ভব হইয়াছিল, যাঁহারা ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবের কোমলতায় উক্ত মহাকবিদ্বয়কেও পরাস্ত করিয়াছিলেন, তেমনই আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের যুগে সত্যেন্দ্র—করুণা—কালিদাস প্রমুখ কবিগণ ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাষার নূতনত্বে এবং ভাবের লালিত্যে সাহিত্যে এক গৌরবময় বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথকে সুইন্‌বার্ণের সঙ্গে তুলনা করা বোধ হয়, অসঙ্গত নহে। এই ইংরাজ কবির ন্যায় সত্যেন্দ্রনাথ ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়মকানুন না মানিয়া অশ্রান্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া যাইতেন। সেই জন্য দুই জনকেই যথেচ্ছাচারিতার অপবাদ ভোগ করিতে হইয়াছে। স্বাধীনতামন্ত্র প্রচারেও এই দুই কবির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনায় আজ প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু তাঁহার ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা

দরকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি সংস্কৃত-পন্থীদিগের নিকট যথোচিত সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের নিগড় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া নানা যাবনিক শব্দের যথেচ্ছ সংমিশ্রণ দ্বারা ইহাকে এমনই একটা নূতন আকার দান করিতেছিলেন, যাহার ব্যঞ্জনাশক্তি ও লীলায়িত গতি বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইতেছিল। ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল, এবং এই অভিনব উপায়ে তিনি তাঁহার ভাষাকে যে সুর, যে ঝঙ্কার, যে ভঙ্গী ও যে ওজস্বিতা দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হইতে পারিত বলিয়া মনে হয় না। ভাষাকে স্বাধীনতা দান সম্বন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ছন্দ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যেমন নানা নূতন ছন্দের উদ্ভাবন করিয়া ভাষার অন্তর্নিহিত সঙ্গীতটিকে বিচিত্র আকার দান করিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথ তেমনই আবার রবীন্দ্রনাথকেও পশ্চাতে ফেলিয়া আরও বেশী অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। ভাবকে কিরূপে সঙ্গীতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হয়, সে কৌশল তিনি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শুধু সুললিত বাক্যবিন্যাসদ্বারা অর্থ-প্রকাশেই কাব্যের সার্থকতা নহে, কানের ভিতর দিয়া মরমে না পশিলে যে অনেক ভাল কাব্যও ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। তাই দেখি, তাঁহার কবিতায় কখনও 'পাগ্‌লা ঝোরা'র মর্ত্ত নর্ত্তনের সলীল ভঙ্গী, কখনও বা মাঝি-মাল্লার ক্ষেপনী-নিক্ষেপের তালে তালে তাহার উত্থান-পতন; কখনও পিয়ানোর গান, কখনও বা 'চরকার ঘরঘর', কখনও উন্মাদিনী বর্ষার অট্টহাস্য, কখনও বা 'বিদ্যুদ্‌বর্ণা' অপ্সরীর নৃত্যদোদুল চরণ-নিক্ষেপ। ধ্বনিত হইত।

অতঃপর আমরা তাঁহার স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার' গানটি সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার দুই তিন বৎসর পরেই যখন সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হইল, তখন সকলে দেখিল যে, বাঙ্গালীকে শুধু তাহার অতীত গৌরব লইয়াই তাহার বুদ্ধ, অশোক, চৈতন্য, প্রতাপাদিত্যের গৌরবময় কাহিনী স্মরণ করিয়া স্বীয় আত্ম-সম্মান ও স্বদেশ-ভক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে না, বর্ত্তমানেও সে মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারে; বাঙ্গালী অধঃপতিত অবস্থাতেও হেয়, ঘৃণ্য, অপদার্থ নহে, তাহারও গৌরব করিবার অনেক আছে, তাহার দেশের মাটীই তীর্থস্বরূপ পুণ্যভূমি—

"মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথা মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে।"

এই আশা ও উৎসাহের মৃতসঞ্জীবনী বাণী তিনি মৃতবৎ বাঙ্গালীর কর্ণে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর দেশের উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া গেল। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত, শত সহস্র পূজারী উৎপীড়নে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে, ভারতের এই মুক্তি-সংগ্রামে সত্যেন্দ্রনাথ উদ্দীপনাময়ী রণ-দুন্দুভি বাজাইয়া বাঙ্গালীর প্রাণে স্বদেশপ্রেমের তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছেন। পৌরাণিক উপাখ্যানের রূপকে দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা চিত্রিত করিয়া তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার জাতীয়-সাহিত্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পৎরূপে চিরসঞ্চিত হইয়া থাকিবে। এই সকল কবিতা কবির হৃদয়-রক্ত দিয়া লিখিত, কাব্য হিসাবে এগুলি খুব উচ্চ শ্রেণীর। সাহিত্যিকদের মধ্যে মহাত্মা গন্ধীর এমন ভক্ত বুঝি আর কেহ ছিলেন না। গন্ধীজীর উদ্দেশে তিনি গত বৎসর 'ভারতী'তে যে সুদীর্ঘ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহার ছত্রে ছত্রে দেশভক্ত কবির আকুল হৃদয়াবেগ ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ গিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে 'হোমশিখা' জ্বালাইয়া গিয়াছেন, তাহার পূতোজ্জ্বল দীপ্তি চিরকাল বঙ্গগৃহ আলোকিত করিবে; তাঁহার 'বেণু ও বীণার' মধুর ধ্বনি বাঙ্গালীকে চিরমুগ্ধ করিয়া রাখিবে; সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যে 'ফুলের ফসল' উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহা সৌন্দর্য্যক্ষুধাতুরের বুভুক্ষু প্রাণ তৃপ্ত করিয়া রাখিবে; তাঁহার 'তুলির লিখন' কালের করস্পর্শেও কখনও ম্লান হইবে না। তাঁহার 'মণিমঞ্জুষা' কাব্য-ভাণ্ডারের অক্ষয় মণিমঞ্জুষা। দশ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা রাণীর—

"প্রাণে আছে মধুর ঝরণা,
পিয়ে সেই মকরন্দ সারা বঙ্গ আনন্দে মগনা।"

নিরানন্দ দেশে যিনি এই অফুরন্ত আনন্দের উৎস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী তাঁহাকে ভুলিবে না।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

মিলন-রাত্রি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সভাভঙ্গের পর রাজা অতুলেশ্বর পার্শ্ববর্তী গৃহে প্রবেশ করিয়া বিচারালয়ের মোগলাই-সাজ ত্যাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে প্রসাদপুরের পুরাতন রাজকীয় প্রথাই তিনি মানিয়া চলিতেন। পরে তিনি বাঙ্গালী-বেশ ধারণ করিয়া শ্যামাচরণের সহিত বৈঠকখানার দক্ষিণ বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

সম্মুখে সবুজ ঘাসের প্রশস্ত ময়দান,—তাহার পশ্চিম প্রান্তে বিলুণ্ঠিত বৃহৎ দীর্ঘিকার আংশিক জলখণ্ড তটভূমিস্থিত বিশাল রবার-বটের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ময়দানের ধারে ধারে শীত ঋতুর বিচিত্রবর্ণ পুষ্পশোভা, স্থানে স্থানে কৃত্রিম জলপ্রপাত, মধ্যস্থিত ফোয়ারার দুই পার্শ্বে দুইটি মূল্যবান্ প্রস্তরমূর্ত্তি, হ্রদবাসী কিন্নর-কিন্নরী যেন কৌতূহলাক্রান্তভাবে উপরে উঠিয়া সহসা প্রস্তরমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ভিনাস-মূর্ত্তির মাথার উপর একটি খঞ্জন পাখী বসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল; রাজা দেখিয়া কহিলেন, "নৃত্যশীল এই চঞ্চল পাখীটি পাতরকেও যেন প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে!"

শ্যামাচরণ বাবু কবি নহেন, রাজার দৃষ্টিতে এ দৃশ্যের মাহাত্ম্য দেখিতে অক্ষম হইয়া তিনি কহিলেন,—"খঞ্জনটি না নেচে যদি স্থির থাকৃত, তা হ'লে ওকে প্রস্তরমূর্ত্তিরই অঙ্গভুক্ত ব'লে মনে করা যেতে পারৃত।"

রাজা এ কথায় মনোনিবেশ না করিয়া, আরাম-চৌকির হেলানে আরামে মাথা রাখিয়াই, পূর্ব্ববৎ ভাববিভোরভাবে কহিলেন,—"আচ্ছা, বলুন ত গাঙ্গুলি মশায়, আপনার কি মনে হয়? দেহগঠন সুন্দর ব'লেই কি আমরা এই মূর্ত্তিটিকে এত সুন্দর দেখি?"

শ্যামাচরণ সম্প্রতি গোঁপ জোড়া কামাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে চাড়া দিয়া বুদ্ধি শাণাইয়া লইবার আর উপায় নাই, মাথা চুলকাইয়া উত্তর করিলেন,—"তাই ত মনে হয়।"

ইতোমধ্যে খঞ্জন পাখীটি উড়িয়া গেল, রাজার দৃষ্টি তদনুসরণে একবার নীলাকাশে উত্থিত হইল। তাহার পর আবার ভিনাসমূর্ত্তির দিকে নয়নপাত করিয়া শ্যামাচরণের মন্তব্যের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি কহিলেন,—"আমার কিন্তু তা' মনে হয় না। আচ্ছা, দেখুন ত গাঙ্গুলি মশায়, কোমলতা, প্রীতি, করুণা প্রভৃতি রমণী-হৃদয়ের রমণীয় ভাবগুলি ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে বেয়ে পড়ছে কি না? কারিকর দেহসৌন্দর্য্য-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রগুপ্তি দ্বারা যদি ওর মধ্যে ভাবেরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করতেন, তা হ'লে কি মূর্ত্তিটি এত সুন্দর হ'ত? ওর দিকে একটুখানি চেয়ে থাকুন দেখি, একটি পরিপূর্ণ আনন্দতৃপ্তিতে আপনার মন ভ'রে উঠ্‌বে।"

শ্যামাচরণের মত অরসিক বৈষয়িক লোকও রাজার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভাবুক জনের মতই কহিলেন,—"তা ঠিক! এত দিন কিন্তু এ ভাবে মূর্ত্তিটি কখনো দেখিনি!"

রাজা একটু হাসিলেন, তাহাতে তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশিত হইল। তাহার পর চৌকির ঠেশ হইতে মাথা উঠাইয়া, দুই ইজি চেয়ারের মধ্যবর্ত্তী টেবিলে সংরক্ষিত স-দেশলাই-পান-চুরুটের সরঞ্জাম নীরব ধন্যবাদস্বরূপই যেন তাঁহার হাতের নিকট সরাইয়া দিলেন। আতিথ্যের ত্রুটি হইতেছে—সম্ভবতঃ এই কথাটা এতক্ষণে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল! শ্যামাচরণের মনে কিন্তু পান-তামাকুর অভাব এ পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠে নাই। গদি-মোড়া ইজি-চেয়ারের হেলানে বসিয়া মখমল-বালিসের পাদানীতে পদরক্ষা পূর্ব্বক আলোয়ান আবরণের উত্তাপ উপভোগ করিতে করিতে এমনই মোহমুগ্ধ ভাবেই তিনি রাজার গল্প শুনিয়া যাইতেছিলেন। হত্যাগন্ধদূষিত [illegible]পুরী পার হইয়া এ যেন তাঁহারা পরীরাজ্যের দিকেই [illegible] উড়িয়া চলিয়াছিলেন। কিছু পূর্ব্বে তিনি রাজার কঠোর বিচারক-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন; এখন তিনি ভাবুক কবি। সাধারণতঃ বৈষয়িক কাযকর্ম [illegible] তাঁহাদের দেখা-শুনা হয়, আজ যেন ছদ্মবেশী রাজার [illegible] রূপ সহসা তাঁহার নয়নে ধরা

দিয়াছে। এ সৌভাগ্য ক্ষণকাল তাঁহাকে এমন ইন্দ্রিয়াতীত ভাবে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো অভাববৃত্তিই তখন আর তাঁহার মনের দ্বারে পৌঁছিতে পারে নাই। রাজহস্ত তামাকু-পাত্র তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিবামাত্র তিনি যেন আবার বাস্তব-জগতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহার ধূমপানলালসাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে রাজাতিথ্য গ্রহণ করিবার পর রাজাও প্রসাদস্বরূপ একটি সিগারেট মাত্র হাতে তুলিয়া লইলেন। তিনি অসময়ে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেন না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে, অচিরাৎ সিগারেটের মুখ হইতে ধূমায়িত বাষ্প এবং তাঁহাদের মুখ হইতে কুণ্ডলাকৃতি ধূম নির্গত হইতে লাগিল। ধূমপান করিতে করিতে রাজা এইবার হার্কিউলিস মূর্ত্তিটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, এই যে বীর অবতার হার্কিউলিস, এ মূর্ত্তিটি দেখে আপনার কি মনে হয়, বলুন ত, গাঙ্গুলি মশায় ?"

শ্যামাচরণ এই প্রশ্নসঙ্কটে পড়িয়া কিয়ৎকাল সঙ্কটহারী সিগারেটের ধ্যাননিমগ্ন হইয়া রহিলেন, পরে রাজপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা মনে না রাখিয়াই আর একটি পান মুখে পুরিয়া দিলেন, তাহার পর চর্ব্বিত তাম্বূল ধূম-প্রেমে মজাইয়া উপভোগ করিতে করিতে বেশ নিশ্চিন্তভাবেই উত্তর করিলেন, "বীর অবতার বলেই মনে হয়।"

রাজা সহাস্যে কহিলেন,—"কিন্তু এই বীর অবতারকে দেখে কি আপনি খুব একটা আনন্দ-মোহে মুগ্ধ হন ? আপনার মাথা কি সম্মানভরে ওর পায়ের দিকে নুয়ে পড়তে চায় ?"

শ্যামাচরণ সিগারেটের ছাই-স্তূপ ছাইদানীতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এবার নতমুখেই বলিলেন,—"আমি ত রাজা বাহাদুর, কবি নই! কোনো মূর্ত্তি দেখলেই মোহমুগ্ধভাবে তা'কে পূজা করতে আমার ইচ্ছা হয় না।"

রাজা নিজের মুখোদ্গীর্ণ ধূমপুঞ্জের গতি লক্ষ্য করিতে করিতে বলিলেন,—"আমিও ত মূর্ত্তিপূজক নই, গাঙ্গুলি মশায়, আমি শুধু সুন্দর ভাবের ভক্ত। এই কাছাকাছি মূর্ত্তি দু'টি যখনি আমি দেখি, আমার মনে যুগপৎ প্রীতি এবং অপ্রীতির সঞ্চার হয়। এই যে বীরমূর্ত্তি, সাধারণতঃ লোকে যে মূর্ত্তির এত ভক্ত, আমি দেখি, এর মধ্যে শুধু পশুবল; অর্থাৎ [illegible] উদ্দাম একটা বিকাশ। আমাদের পশুস্বভাব তা'তে মুগ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু মানবস্বভাবে দেবভাব যা' কিছু আছে, সেটুকু এ দৃশ্যে একান্ত কুণ্ঠিত, অপ্রীত হয়ে ওঠে না কি ?"

শ্যামাচরণ একজন 'পজিটিভিষ্ট', রাজার মুখে কাণ্ট ঋষির পুরাতন উক্তিই নূতন ভাষায় শুনিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুখ-তৃপ্তি লাভ করিলেন। কিন্তু সুখের দিনে দুঃখের স্মৃতিই সর্ব্বাগ্রে মানুষের মনে আসিয়া জমে—তিনি দুঃখিত ও ম্রিয়মাণ ভাবে মুখের সিগারেট হাতে নামাইয়া ধরিয়া কহিলেন,—"কিন্তু দুঃখ এই,—রাজা বাহাদুর, সংসার যে বাহুবল নইলে চলেই না!"

"আপাততঃ চল্‌ছে না, এটা ঠিক!" উত্তরে এই বলিয়া রাজা বাহাদুর তাঁহার অর্দ্ধভুক্ত সিগারেট ছাইদানীতে রক্ষা করিয়া, আকাশের বর্ণবৈচিত্র্যে ভিনাসমূর্ত্তি কিরূপ লীলায়িত রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহাই দেখিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে অতুলেশ্বর নেশার জন্য তামাকু সেবন করিতেন না, আতিথ্য-রক্ষার জন্যই প্রধানতঃ তিনি অল্পস্বল্প সিগারেট খাইতেন।

শ্যামাচরণ তাঁহার অঙ্গুলি-ধৃত সিগারেট পুনরায় ওষ্ঠাগ্রে লইয়া সঞ্জীবনী দুই এক টানেই তাহাকে দিব্য জলস্বরূপ প্রদান করিয়া, রাজা বাহাদুরের উত্তরে কহিলেন, "আপাততঃ কেন ?—কোন কালেই চলেনি। সুরগণ চিরদিনই অসুরবলের নিকট হার মেনেছেন; আর দেবভাব ত্যাগ ক'রে—অসুরভাব অবলম্বন করেই ছলে বলে কৌশলে শেষে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছেন। ধর্ম্ম চিরদিনই, রাজা বাহাদুর, অধর্ম্মের সহায়তা ক'রে আস্‌ছে!"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন—"বুঝেছি, গাঙ্গুলি মশায়—আপনি যা বল্‌ছেন, তা ঠিক! তবুও সেই দুর্লভ দেবভাবের আকাঙ্ক্ষাতেই মন চঞ্চল, ব্যথিত হয়ে ওঠে। সত্যই কি সংসার চিরদিনই পশুবলের উপরই স্থাপিত থাক্‌বে ? এমন এক দিন কি আস্‌বে না—যে দিন ন্যায়, মঙ্গল, সত্যকে আমরা জগতের একচ্ছত্র অধিপতি দেখ্‌তে পাব ?"

"আপনার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জগতেরও আকাঙ্ক্ষা যদি কোন দিন এক হয়, তবে অবশ্যই সে দিন কোন সময়ে আস্‌বে। কিন্তু এখনও ত তার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না—না স্বদেশে, না বিদেশে, কোথাও ত ধর্ম্মের যথার্থ সম্মান দেখ্‌তে পাইনে। এই দেখুন না—আমাদের স্বদেশী ছেলেদেরই কাণ্ডকারখানা! সাধু উদ্দেশ্যকেও অসাধুতার মোচড়ে তারা কিরূপ বিকৃত ক'রে তুলেছে!"

রাজা ব্যথিতচিত্তে মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—শ্যামাচরণ আবার কহিলেন,—"আমার কি বিশ্বাস জানেন রাজা বাহাদুর? প্রসাদপুরের এই অস্ত্রচুরী—তথাকথিত স্বদেশী ছেলেদেরই কাণ্ড; এবং খুব সম্ভব, মাণিকতলাদলের সঙ্গে এদেরও একটা যোগাযোগ আছে।"

বেদনার একটা বিদ্যুৎশিখা রাজার বক্ষ হইতে উঠিয়া মস্তক ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি চৌকি হইতে উঠিয়া বারান্দায় পা-চালি করিতে আরম্ভ করিলেন; দু' একবার পরিক্রমণের পর রেলিংএর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। বারান্দার ছবির ঘড়িতে সুমধুর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়া জানাইল, এখন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা।

গেটের বড় ঘড়িতেও ঢং ঢং ঢং করিয়া সজোরে তিনটা বাজিয়া উঠিল। রাজা দুইটার সময় বিচারকার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া এক ঘণ্টাকাল মাত্র এখানে সুখগল্পে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। বাগানের মালী আসিয়া ঝরণাযন্ত্রে চাবি লাগাইয়া দিয়া গেল; শতধারে জলরাশি উৎক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া কাননে নব-মাধুরী ফুটাইয়া তুলিল; প্রস্তরমূর্ত্তি দুইটিও কি এক বিচিত্র আভায় রঞ্জিত হইয়া সহসা যেন হাসিয়া উঠিল। রাজা আনমনে সেই দিকে চাহিয়া, এতক্ষণ পরে শ্যামাচরণের কথার উত্তরে—স্বগত ভাবেই আস্তে আস্তে কহিলেন,—"তা নাও হ'তে পারে।"

শ্যামাচরণও একটু আগেই রাজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি এ কথায় কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ তাঁহার প্রায় নিঃশেষিত চুরুটটিকে চরম টানে মরণ দশায় আনিয়া ফেলিয়া সবল নিক্ষেপে বাগানের মাটীতে সমাধিদান করিলেন, তাহার পর টেবিলের কাছে আসিয়া পূর্ণাবয়ব আর একটিকে তৎস্থলাভিষিক্ত করিয়া লইয়া পুনরায় রাজার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া কহিলেন—"আপনি কি মনে ক'রে এ কথা বল্লেন—তা ত ঠিক বুঝতে পারছিনে, রাজা বাহাদুর!"

রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মূল্যবান্ জামিয়ারখানার স্খলিত লুণ্ঠিত অঞ্চল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া কহিলেন,—"বসবেন, চলুন—বলছি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রসাদপুরে কন্‌ফারেন্স হইয়া যাইবার অল্পদিন পরেই মাণিকতলার বিদ্রোহ-চক্রান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়ে, বিদ্রোহিদলভুক্ত অনেক ছেলেকেই রাজা চিনিতেন। দেশের কার্য্যে উৎসর্গীকৃত তাহাদের জীবন এক দিন যে সুসিদ্ধিতে ধন্য হইয়া উঠিবে, এই আশাবিশ্বাসেই তিনি ভরপুর ছিলেন। যখন শুনিলেন, দেশমাতার এই সুসন্তানগণ বিলাতী আদর্শে অধর্ম্মের পথে চলিয়া তাহাদের সাধু উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন বিকৃত, ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাঁহার কষ্টের সীমা রহিল না। তাঁহার মনে হইল—স্বয়ং বিধাতা-পুরুষ এ দেশের প্রতি যখন বিমুখ, তখন এই অভিশপ্ত দেশের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের আশা দুরাশা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে এই হতভাগ্য ভ্রান্ত দেশসেবকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা-করুণায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ইহাদের মুক্তির অভিপ্রায়ে যাঁহারা গোপনে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন, অতুলেশ্বর তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। শ্যামাচরণের সন্দেহবাক্য তাঁহার অসম্ভব বলিয়া মনে হইল না, কিন্তু প্রসাদপুরেও যে এই ঘোর ব্যাধি সংক্রমিত হইতে পারে, ইহা মনে করিতেও তিনি সাতিশয় কষ্ট বোধ করিলেন। ইহার ফলে উক্ত চৌর্য্য ঘটনার অপর যে একটা সম্ভাবিত দিক আছে, তাহাকেই প্রবলতর সম্ভাবনার ভিত্তিতে দাঁড় করাইবার দিকেই তাঁহার ইচ্ছার গতি চালিত হইল। সুদক্ষ ব্যারিষ্টারের ন্যায় তৎপক্ষীয় যুক্তি-তর্কের আলোচনা-প্রবৃত্ত হইয়া তিনি কহিলেন—

"ছেলেরা এর মধ্যে লিপ্ত থাকা অসম্ভব নয়, লিপ্ত আছে বলেই মনে হয়, কিন্তু মূল ষড়যন্ত্রী—আমার বিশ্বাস, সুজন রায় খুড়, ছেলেরা তাঁর চর মাত্র। হরিরামের কথাই এ সম্বন্ধে আমার প্রামাণ্য ব'লে মনে হয়।"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"কিন্তু প্রমাণ-প্রয়োগ ত তার কথায় বেশী কিছু পাওয়া যায়নি।"

"দরকার ছিল না। প্রসাদপুরের আদিরাজ সনাতন রায়ের ধনুক সম্বন্ধে আমাদের বংশগত যে একটা প্রবচন আছে, আপনি বোধ হচ্ছে তা জানেন না, জান্‌লে হরিরামের কথার মধ্যে প্রমাণ-যুক্তির অভাব দেখ্‌তেন না।"

শ্যামাচরণ কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে হস্তের চুরুট ছাইদানীতে রক্ষা করিয়া বলিলেন—"আপনাদের বংশে প্রবাদ-প্রবচনের

অভাব ত কিছু নেই; তার মধ্যে কোন্‌টি শুনেছি,—কোন্‌টি শুনিনি, তা ত এখন মনে পড়ছে না।"

বলিতে বলিতে দাঁড়াইয়া, শ্যামাচরণ তাঁহার চৌকিখানা রাজার মুখামুখিভাবে একটু ঘুরাইয়া লইয়া পুনরুপবিষ্ট হইলেন।

রাজা বলিলেন—"সেই প্রবচনের সার ও সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—সনাতন ধনুক বেদখল হ'লে রাজ-বিভ্রাট ঘটবে, এবং যিনি দখল কর্‌বেন, তিনিই রাজা হবেন! এখন জানেন ত রায় খুড়র মনটি কি ধাঁচে গড়া। ঐ বাক্যটিকে বেদবাক্যের মত আঁকড়ে ধ'রে, চিরদিনই এ ধনুকটি হাত কর্‌বার ফন্দীতে তিনি আছেন।"

এই প্রসঙ্গে সহসা শ্যামাচরণ মনশ্চক্ষুতে দেখিলেন, প্রসাদপুরের প্রাসাদদ্বারস্থ মৃত একটি নরবানরের প্রহরি-মূর্ত্তি। সুজন রায় কর্ত্তৃক উৎপীড়ননিযুক্ত উক্ত বনমানুষটি রাজ-হস্তে নিহত হয়। অতঃপর অতুলেশ্বরের প্রসাদভোগিরূপে এই বেশে সে দ্বারদেশের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

শ্যামাচরণ সহাস্যে কহিলেন,—"হ্যাঁ, ফন্দীতে শকুনি মামাকেও রায় মহাশয় হার মানিয়েছেন সন্দেহ নাই। তবে রাখে কৃষ্ণ মারে কে! কোন ফন্দীতেই ত আপনাকে বা আপনার ধনুককে তিনি ঘায়েল কর্‌তে পার্‌ছেন না।"

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা রাজার নয়নে উথলিয়া উঠিল। তিনি ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, মনে মনে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার মঙ্গলময় ভাগ্য-দেবতাকে স্মরণ করিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, রায় খুড়র এত উৎ-পীড়নের মধ্যেও আমি এবং আমাদের ধনুর্দ্দেবতা উভয়েই যে এখনো টেঁকে আছি, এটা—আশ্চর্য্যের কথা বই কি! জানেন ত, রাজ্যের লোকের বিশ্বাস, সনাতন ধনুক প্রাণবন্ত দেবতা—তাঁর অঙ্গে হাত লাগিয়ে কোন শত্রুরই নিস্তার নেই।"

"কিন্তু এ বিশ্বাস আপনার সংস্কার-অন্ধ খুড় মহাশয়কে ত বিচলিত কর্‌তে পারেনি?"

"বরঞ্চ চালিতই ক'রে আস্‌ছে। তিনি মনে করেন, তাঁর ঘরে অধিষ্ঠানলাভের জন্য ঠাকুর ম'রে আছেন; অতএব ঠাকুরকে জাগ্রত ক'রে তোলাই তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য। লোকে যদি নিজের নিশ্বাসফুৎকারে বিশ্বাসকে সজীব দৈনিক ক'রে না তুলত, তা হ'লে কি জগতে এত লাঠালাঠি মারামারি হ'তে পার—এইটে ভাবুন দেখি?"

"তা ত বটেই। তবুও সে কথাটা সহজে মনে পড়ে না।"

"সুজন খুড় হাঁটতে শিখে পর্য্যন্তই বোধ হয় আমাদের উপর আক্রমণ সুরু ক'রে দিয়েছেন, আর আমরাও বর্ম্ম এঁটে তাঁর দিব্যাস্ত্রকেও ব্যর্থ ক'রে আস্‌ছি। আমার বৈমাত্রেয় ভগিনী—অনাদির মা'র বিবাহের সময় কাকাবাহাদুরকে রায় খুড় কিরূপ বিপদে ফেলেছিলেন, শুনেছেন কি সে গল্প মহা-রাণীর নিকট?"

শ্যামাচরণ আগ্রহ সহকারে উত্তর করিলেন—"না।"

"রায় খুড়ই আমার দিদির সম্বন্ধ আনেন। পাত্র তাঁরই দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। বর সভাস্থ হয়ে বস্‌বামাত্র রায় খুড় বল্লেন, 'রায়-বংশের পদ্ধতি অনুসারে বরকে ধনুক উঠিয়ে বল-পরীক্ষা দিতে হবে—সভাস্থলে ধনুক আনীত হোক।' উদ্দেশ্য অবশ্য বুঝছেন। বরযাত্রীর সঙ্গে তাঁর যে সব গুপ্ত লাঠিয়াল আছে, পথ থেকে তারা ধনুক লুট ক'রে নিয়ে যাবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজা একটি চুরুট মুখে লইয়া তাহাতে দেশলাই সংযোগে রত হইলেন। এই উপন্যাস-কাহিনীর শেষভাগে পৌছিতে শ্যামাচরণ তখন এতই কৌতূহলাক্রান্ত যে, তাঁহার ন্যায় তামাকুখোর লোকও রাজদৃষ্টান্তে প্রলুব্ধতার লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া অধীরভাবেই উপকথাশ্রবণলোলুপ বালকের ন্যায় কহিলেন, "তার পর, রাজা বাহাদুর?"

রাজা বাহাদুরের চুরুট তখন বেশ ধরিয়া উঠিয়াছে—ধূম-খোর না হইয়াও মজগুলভাবে তাহাতে দু' চার টান দিয়া দু' চারবার শূন্যে ধূম উড়াইয়া দিলেন—তাহার পর সিগারেট মুখ হইতে নামাইয়া ছাইদানীতে পুনঃ সংস্থাপিত করিয়া রুমাল দিয়া ওষ্ঠাধর মুছিতে মুছিতে বলিলেন—

"রায় খুড়র জিবের ডগা থেকে কথাগুলা বার হ'তে না হ'তে তাঁর মনের মৎলবখানা যে কাকাবাহাদুর বুঝে ফেলে-ছিলেন—তা ত বুঝতেই পার্‌ছেন? এখন ভাবুন দেখি, কাকার কি বিপদ! হয় ধনুক যায়, নয় বিয়ে ভাঙ্গে! আপনি এ অবস্থায় পড়লে কি কর্‌তেন বলুন দেখি, গাঙ্গুলি মশায়?"

রাজা হাসিয়া এই প্রশ্ন করিলেন, গাঙ্গুলি মহাশয় গম্ভীর-ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বল্‌তে পারি না, রাজা বাহাদুর। মাথায় ত এখন কোন বুদ্ধিই যোগাচ্ছে না।"

রাজা বলিলেন,—"তবে শুনুন, কাকাবাহাদুরও বড় কম ফন্দীবাজ ছিলেন না—"

রাজার কথা সম্পূর্ণ না হইতেই শ্যামাচরণ কহিলেন,—

"তা ত বোঝাই যাচ্ছে, নইলে কি রায় মহাশয়ের এই চক্রান্তের মধ্যে তিনি টি'ক্‌তে পাত্তেন ?"

রাজা সহাস্তে অনুমোদনবাক্যে কহিলেন,—"তা ঠিক! কাকা মহাশয় রায় খুড়কে সবিনয়ে জানালেন যে, এ স্থলে তাঁর রায়দাদা কেবল বরকর্ত্তা নন, রায়-বংশেরও কর্ত্তা ব্যক্তি; অতএব গুরুজনের আদেশ দেবাদেশের ন্যায় তাঁর শিরোধার্য্য। কিন্তু গুপ্তভাণ্ডারে রক্ষিত লৌহ-ধনুক সভায় আন্‌তে একটু ত সময় লাগ্‌বে, ততক্ষণ জামাতা অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার পর্ব্ব শেষ ক'রে আসুন, নইলে লগ্ন ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

শ্যামাচরণের মুখে এতক্ষণ পরে হাসি বাহির হইল, তিনি প্রফুল্লভাবে কহিলেন, "হাঁ, একেই বলে চতুরে চতুরে। এ প্রস্তাবে রায় মশায় রাজী না হ'য়ে আর কি কর্‌বেন ?"

"তবে দেখ্‌ছি, খুড়কে আপনি এখনো চেনেননি। তিনি এ প্রস্তাবে একেবারেই বেঁকে বস্‌লেন। বরকে সভাস্থল হ'তে তখনি তিনি উঠিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত, চারিদিকে হুলস্থূল প'ড়ে গেল, বর যদি ভিতরে ভিতরে আমাদের পক্ষ না হতেন, তা হ'লে এ বিয়ে কিছুতেই ঘটতে পেত না। জামাই সভাস্থল হ'তে উঠে রায় খুড়র অনুসরণ না ক'রে কাকার সঙ্গে অন্তঃপুরে চ'লে আসেন, এবং সেখানেই বিবাহপর্ব্ব শেষ হয়।"

শ্যামাচরণ আনন্দের ও ঔৎসুক্যের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আঃ, বাঁচা গেল, বাঁচা গেল, বিয়েটা তা হ'লে হ'য়ে গেল! রায় খুড় শুনে কি কর্‌লেন ?"

"কর্‌বেন আর কি, পৈতে ছিঁড়ে শাপ দিলেন।"

"সুখের বিষয়, ব্রহ্মশাপে এখন আর বজ্রাগ্নি ছোটে না!"

"কিন্তু বাক্যাগ্নির জ্বালাটা এ যুগেও ত কিছু কমেছে ব'লে মনে হয় না। বরঞ্চ অনেক সময়ে সে জ্বালা এমনই সজীব হয়ে ওঠে যে, তখন বেল পড়লে উড়ন্ত কাককেও আমরা কারণ ব'লে মেনে নিই। হাজার হোক্, স্মার্ত্তচূড়ামণির সন্তান ত আমরা। অনাদি জন্মাবার কিছুদিন পরে আমার ভগিনীপতি যখন মারা গেলেন, মা তখন কাতরচিত্তে সেই শাপান্তের জন্ম স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ ক'রে দিলেন; আর রায় খুড় উল্লসিত হয়ে উঠে, তাঁর চামুণ্ডামন্দির ছাগ-মহিষ-রক্তে ভরিয়ে তুল্‌লেন। নরবলির উপায় থাক্‌লে বোধ হয় আনন্দের বলিকেই সে কাষ করতেন।"

"কি পাষণ্ড! এ যে ঠিক উপন্যাসের কথা! যা হোক্, তাঁর মতলবটা যে সিদ্ধ হয়নি, এতেই বড় আহ্লাদ হচ্ছে।"

"এর পর আর একবার তিনি ধনুক লুটের চেষ্টা করেন—কাকা বাহাদুরের শ্রাদ্ধের সময়। প্রসাদপুরের কোন রাজার দেহান্ত হ'লে, পিণ্ডদাতাকে শ্রাদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে সনাতন ধনুকের পূজা করতে হয়। খুড় ভাবলেন, ধনুক লুটের এ মহা অবসর তিনি ছাড়বেন না।"

"কি বিপদ্!" শ্যামাচরণের এই উৎকণ্ঠাপূর্ণ বাক্যে রাজা হাসিয়া বলিলেন, "বড় বেশী বিপদ্ হয়নি সেবার, আমরা খুবই সতর্ক ছিলুম, তাঁরই দু'চার জন লোক জখম হয়েছিল।"

"তা বেশ! আশা করি, এ ঘটনা থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন ?"

"হ্যাঁ, তার পর থেকে আর ধনুক লুটের চেষ্টা করেননি বটে, কিন্তু উপরোধ অনুরোধের জ্বালায় আমাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন, পাষাণ তাতে গল্‌বার নয়, তখন থেকে শাসনবাক্য ধরেছেন যে, তিনি আমার নামে মোকর্দ্দমা আন্‌বেন—কারণ, ধনুকের প্রকৃত মালিক তিনিই, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নয়, তাঁর দেহেই সনাতনশোণিত বহমান, আমি কোথাকার কে, দৌহিত্রবংশের সন্তান মাত্র।"

করুণরসাদিনাট্য এইরূপ কৌতুক-রহস্যে শেষ করিয়া রাজা থামিলেন, থামিয়া আর একটি সিগারেট গ্রহণ করিলেন। এবার শ্যামাচরণের নিকটে মহাজনপ্রদর্শিত পথ উপেক্ষিত হইল না। সিগারেট জ্বালাইয়া লইয়া রাজা বলিলেন, "আমি যে কেন রায়খুড়কেই এই অস্ত্র-চুরীর মামলাতে প্রধান অপরাধী মনে কর্‌ছি—তার কারণ ত সব শুন্‌লেন, এখন আপনি বলুন দেখি, আপনার কি মনে হয় ?"

শ্যামাচরণ এতক্ষণ রঙ্গমঞ্চের এক জন উৎসুক শ্রোতা ছিলেন, এখন প্রকৃত জীবন-নাট্যে মন্ত্রিরূপে আহূত হইয়া গম্ভীরভাবেই কহিলেন, "ধনুকটি দেখ্‌ছি রায়বংশের গৃহবিগ্রহ; এটি লাভের জন্য—এ হেন কায নেই, রায় মশায় যা করতে না পারেন—তাও বুঝ্‌ছি, তবুও আমার মনে খট্‌কা লাগছে এই যে, ধনুক-চুরীর চেষ্টা ত হয়েছে পরে, অস্ত্র-চুরী চলেছে যে তার পূর্ব্ব থেকেই।"

"হ'তে পারে, খুড়র চরেরা অস্ত্র-চুরীতেই প্রথমে হাত পাকাচ্ছিল;—আমাকে যে কোন রকমে লোক জব্দ করাই

ত তাঁর উদ্দেশ্য? তা ছাড়া অত বড় ভারী ধনুকটা লোকের চোখে ধূলো দিয়ে উড়িয়ে নেবার পূর্ব্বে কসরৎ ত করা চাই,—অস্ত্র-চুরী ক'রেই প্রথমটা দেখ্‌ছিল—ধরা পড়ে কি না।"

শ্যামাচরণের এ কথা মনে লাগিল না, তিনি মুখগৃহীত ধূম নাক দিয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন,—"কিন্তু সন্তোষ যদি রায় মশায়ের চরই হবে, তবে ওকে গুলী কর্‌লে কে?"

"এর সহজ সিদ্ধান্ত, সম্ভবতঃ ও রায় খুড়র চর নয়। সন্তোষ যাদের বিশ্বাস ক'রে অস্ত্রশালায় ঢুকতে দিচ্ছে, তারাই যে অবিশ্বাসী—হয় ত বা প্রথমটা সে তা বোঝেই নি—তার পর বুঝে সত্যই চোর ধর্‌তে গিয়ে সে গুলী খেয়েছে। নইলে মাঝে থেকে সন্তোষের উপর গুলী পড়বার অন্য কোনই কারণ ত খুঁজে পাওয়া যায় না।"

কথাটা অযৌক্তিক নহে, তবুও শ্যামাচরণের মনের সন্দেহ মিটিল না। ভুক্তাবশিষ্ট চুরুটটি ছাইদানীতে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "সন্তোষের জবানবন্দী না পেলে কিন্তু সত্যটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তবে ত তাকে বাঁচিয়ে তুলতেই হচ্ছে। আর আপনার ভাগিনেয়টি যমের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে যেরূপ পটু—তাঁর দৌত্যে এ কার্য্যে যে আমরা সিদ্ধিলাভ কর্‌ব—এ আশাও দুরাশা নয়।"

রাজা কথা কহিতেছিলেন শ্যামাচরণের সহিত—তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—ভিনাসমূর্ত্তির দিকে। উত্তরে শ্যামাচরণ যখন বলিলেন,—"কই, প্রসাদপুরে যাবার কথা ত শরৎকুমারকে এখনো বলা হয় নাই", তখন রাজা সচকিতে চৌকিতে সোজা হইয়া বসিয়া বিস্ময়প্রকাশক স্বরে কহিলেন—"বলা হয় নি এখনো! তাই ত! দেখুন দেখি অন্যায় কাণ্ড! ঐ মূর্ত্তি দু'টি আমাকে কাযের কথা সব ভুলিয়ে দেয়।"

বলিতে বলিতে তিনি টেবিলে সংস্থিত তাড়িৎ-ডাকযন্ত্রের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন, কল টিপিয়া দ্বারস্থ হরকরাকে ডাকিবেন, এই অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা তাঁহার উদ্যত হস্ত নিরুদ্যমে পুনরায় চৌকির হাতার উপর আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজা সাহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে! যমকে স্মরণ করিতে স্বয়ং যমদমন আসিয়া উপস্থিত! এস ডাক্তার, এস এস,—তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা ক'রে আছি!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

অমরা-প্রয়াণ।

১

গুরু গুরু গর্জ্জনে বারি-ধারা বহে,
কি জানি প্রমত্ত তানে কি কথা সে কহে।
এমন বর্ষণ-ক্ষণে, বিরহী যক্ষের মনে,
যে ছন্দ উঠিল জাগি তাহা ত এ নহে।

২

উন্মত্ত মাতন এ যে ভৈরব নর্ত্তন,
বিশ্ব-বীণা-যন্ত্র-তন্ত্রে ঝঙ্কৃত প্লাবন।
মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায়, বিদ্যুৎ চমকি যায়,
অশনি-মৃদঙ্গ-তালে চলে প্রভঞ্জন।

৩

গাছে গাছে উন্মাদন-শিহরণ দোলা,
তরঙ্গিনী রঙ্গ-ভঙ্গে নটী চঞ্চলা।
মেঘে মেঘে কোলাকুলি, শিখী নাচে পুচ্ছ তুলি,
নৃত্য-শ্রান্ত দিক্‌ভ্রান্ত আষাঢ়ান্ত বেলা।

৪

সহসা পশ্চিম নভে আরক্তিম রবি,
স্তব্ধ বরষাব নৃত্য! স্তব্ধ দিক্‌ছবি!
ধূ ধূ চিতা জলে তীরে, নর-নারী ভাসে নীরে,
মর্ত্ত্য ত্যজি স্বর্গধামে চলেছেন কবি!

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীরামকৃষ্ণ।

৩

কামারপুকুর-পল্লীর জীবন-স্বরূপ গদাধর পাঠশালে গিয়া যে সহপাঠিগণের হৃদয় অধিকার করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার সহজ ভাব-প্রবণ হৃদয় সেই শিশুবয়সে ক্রীড়াবশে যে বিচিত্র রঙ্গরসের অবতারণা করিত, তাহা দেখিয়া কয়জন বালক আত্মসমর্পণে উদাসীন থাকিতে পারে? সমবয়স্কদিগের ত কথাই নাই, আমাদের মনে হয়, গদাধরের হাব-ভাব-ভঙ্গী দর্শনে কঠোর-হৃদয় গুরুমহাশয়েরও উদ্যত বেত্র, ঘূর্ণিত নেত্র নিশ্চল হইয়া যাইত। কিন্তু গদাধরের এই অলৌকিক ভাব-তন্ময়তা সহসা এক দিন অভিনব ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। তখন তাহার বয়স প্রায় ছয় বৎসর।

পল্লী-বালকগণের রীতি অনুসারে গদাধর সে দিন কাপড়ের খুঁটে জলপান লইয়া খাইতে খাইতে মাঠের মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছিল। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস। দূর-দিগন্তচক্রে অকস্মাৎ একখানি মিশ কালো মেঘ দেখা দিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহা ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর আকাশে উঠিতে লাগিল। গদাধরের বিমুগ্ধ-দৃষ্টি তাহার অনুসরণ করিতে করিতে দেখিল, এক দল শ্বেত বক খণ্ডিত মালার আকারে সেই মেঘের কোল দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে গদাধরের বাহ্য চৈতন্যও সেই অসীম আকাশে বিলীন হইয়া গেল এবং তাহার নিষ্পন্দ দেহ সহসা যেন প্রাণশূন্য হইয়া ভূপতিত হইল। সে সময় যাঁহারা মাঠে উপস্থিত ছিলেন, সংজ্ঞাহীন বালককে কোলে তুলিয়া লইয়া বাটী পৌঁছাইয়া দিলেন। চন্দ্রাদেবীর আকুল ক্রন্দনে এই আকস্মিক বিপদ্-বার্ত্তা অবিলম্বে পল্লীময় প্রচারিত হইল এবং সারা গ্রাম জুড়িয়া সেই কালো মেঘের মত একটা আতঙ্কের ছায়া পড়িল। এই কুলতিলক সন্তান যখন গর্ভে, কত দেব দেবীদর্শন দৈব-বাণীশ্রবণ না জননীকে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও পুলকিত করিয়াছিল! তারপর আশা-আতঙ্কে সে কি হেলা-দোলা! গয়ার স্বপ্নবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া স্বামী সে সময় কতই না আশ্বাস দিয়াছিলেন! আর আজ? চন্দ্রা অশ্রু-প্লাবিত চক্ষে দেবোপম পতির পানে চাহিয়া দেখিলেন, সে চিরপ্রফুল্ল মুখও আজ মেঘাচ্ছন্ন। ক্ষুদিরাম গভীর কাতর স্বরে ক্ষণে ক্ষণে রঘুবীরের নাম উচ্চারণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে গদাধর ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। চন্দ্রা হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া অজস্র চুম্বনে পুত্রকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং 'জয় রঘুবীর' বলিয়া ক্ষুদিরাম আপাততঃ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর হইতে আশঙ্কার মেঘ নিঃশেষে অপনীত হইল না। ক্রমে যখন প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে চলিল, গদাধরের স্বাস্থ্যের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না, তখন দুশ্চিন্তার মেঘ কাটিয়া গিয়া ক্ষুদিরামের গৃহাকাশ আবার পরিষ্কার হইয়া গেল।

ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার এখন উপার্জ্জনক্ষম হইয়া পিতাকে সংসার-চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ় দেবভক্তি-সম্পন্ন, তপঃপরায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এখন নিশ্চিন্ত মনে রঘুবীরের পূজা করেন। জপ-ধ্যান সন্ধ্যাহ্নিক সমাধা করিয়া আহারান্তে যেটুকু অবসর পান, শ্রীরঘুবীরের জন্য মালা গাঁথেন ও সেই সময় গদাধরকে কাছে বসাইয়া দেবতার স্তব-বন্দনা, কখন বা পুরাণ-কাহিনী শিখান। জমীদারের চক্রান্তে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ধর্ম্মভীরু ক্ষুদিরাম ঊনচল্লিশ বর্ষ বয়সে যখন নূতন স্থানে আসিয়া দৈন্যের অঙ্কে নূতন সংসার পাতিয়াছিলেন, তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র রামকুমার ও একটিমাত্র কন্যা কাত্যায়নী ভিন্ন অন্য সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই। তার পর দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রামে একে একে ঊনত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে পর পর রামেশ্বর, গদাধর—দুই পুত্র ও সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সর্ব্বমঙ্গলার জন্ম হইয়াছে। বর্দ্ধিত পরিবার হইলেও শ্রীরঘুবীরের প্রসাদে ও শ্রীমান্ রামকুমারের কৃতিত্বে ক্ষুদিরামের ক্ষুদ্র সংসারে এখন আগেকার মত দারিদ্র্যের সে দুর্ব্বিষহ দহন আর নাই। কিন্তু স্বচ্ছলতার বিশেষ কোন লক্ষণও দেখা যায় না। কায়-ক্লেশে ব্যয় সঙ্কুলান হয়, টায়েটোয়ে ছুকুড়ি সাতের খেলা বজায় থাকে। কিন্তু প্রাচুর্য্যের আড়ম্বরবিহীন এই দরিদ্র সংসারে সন্তোষ, প্রীতি, দেব-ভক্তি ও অতিথি-সেবার কোন দিন অভাব ছিল না। অক্লান্তকর্ম্মিণী গৃহিণী চন্দ্রা পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। আতপক্লিষ্ট, শুষ্ক-মুখ পথিক দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া বলিতেন, "ও বাপ., রোদে

তোমার মুখখানি যে শুকিয়ে গেছে! এস বাছা, ছুটি পরিষ্টি ভাত, একটু শুষনীর ঝোল খেয়ে যাও!" মাতৃ-হৃদয়ের এই সমবেদনাপূর্ণ আহ্বান উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবে, এমন পাষণ্ড সে পথ দিয়া চলিত না।

এমনি করিয়া আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল। ক্ষুদিরাম সপ্তষষ্টি বর্ষ অতিক্রম করিলেন। ক্রমে ১২৪৯ সালের আশ্বিন মাস উপস্থিত। জগন্মাতা সারদার শুভাগমন-প্রতীক্ষায় শারদীয় প্রকৃতি কমলে-কাশফুলে রমণীয় শ্রী ধারণ করিল। কিন্তু হায়, ঐ স্বচ্ছ সুনীল আকাশের অন্তরালে যে কাল বজ্র লুকাইয়া ছিল, কে জানিত! বার্দ্ধক্যের আক্রমণে ক্ষুদিরামের শরীর এখন একান্ত অপটু হইয়া পড়িয়াছে। পাকা ফল—কবে বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িবে, ঠিক কি! তার উপর আবার সাধুজন-সুলভ গ্রহণী-রোগ দেখা দিয়াছে।

প্রতি বৎসর ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ বাটী সেলামপুরে দুর্গোৎসব করেন। খুব সমারোহেই উৎসব সম্পন্ন হয়। কিন্তু সে সময় ক্ষুদিরাম উপস্থিত না থাকিলে, রামচাঁদের উৎসবে আনন্দের একটি বিশিষ্ট উপকরণের অভাব পড়ে। প্রতি বারের ন্যায় এ বৎসরও মাতুলের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আসিল, কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। যাইতেও মন সরিতেছে না, অথচ আনন্দময়ীর আহ্বান উপেক্ষা করাও চলে না। জীবনে আবার এ সুযোগ উপস্থিত হইবে কি না, কে বলিতে পারে! অবশেষে ক্ষুদিরাম সকল দ্বিধা সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা হইল। নবমীর নিশায় গ্রহণী-পীড়া সাংঘাতিক বাড়িয়া উঠিল। বিজয়ার দিন প্রতিমা-নিরঞ্জন করিয়া রামচাঁদ গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, মাতুলের শেষ সময় উপস্থিত। তিনবার রঘুবীরের নাম উচ্চারণ করিয়া ভক্তের কণ্ঠ চির-নীরব হইল।

আমাদের ক্ষুদ্র নায়কের বয়স তখন সাত বৎসর। মৃত্যুর সহিত এত কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ পরিচয় পূর্ব্বে আর কখন তাহার হয় নাই। যে এমন কঠোর কঠিন, বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আঘাত করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠাবিহীন, শোকের বুক-ফাটা হাহাকারে যে পাথর-কালার মত উদাসীন, তার নিষ্ঠুর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য গদাধরের সমগ্র অন্তর যেন সশস্ত্র সজাগ হইয়া রহিল। শোকের অশ্রু মুছিয়া, হাহাকারের কণ্ঠরোধ করিয়া বালক এখন দিনের অধিকাংশ সময় জননীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, তাঁহাকে গৃহকর্ম্মে সহায়তা করে; হাসে খেলে—মা'কে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য। জননীও বুকের ব্যথা লুকাইয়া মুখে হাসিলেন। বালক আবার দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতে মন দিল; আবার পূর্ব্বের মত পুরাণ-প্রসঙ্গ ও যাত্রা গান শুনিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল, কিন্তু দিনে দিনে গদাধর অধিকতর নির্জ্জন-প্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ভূতির খালের শ্মশান, মাণিক রাজার আমবাগান, এমনি সব জনবিরল স্থান, অবসরসময়ে এখন তাহার নিঃসঙ্গ বিচরণভূমি। কিন্তু বয়সের অনুপাতে বালকের এই বিচিত্র আচরণ, কাহারও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। যাহারা দেখিল, তাহারা ভাবিল খেয়াল।

কিন্তু খেয়াল বলিতে হইলে এই সময়ের আর একটি খেয়াল আমাদিগকে গদাধরের মানসিক গতি ও পরিণতির কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করে। কামারপুকুর গ্রামের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে জমীদার লাহাবাবুদের একটি অতিথিশালা ছিল। পুরী-যাত্রী সন্ন্যাসিগণ সময় সময় তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ঐ কালে এই অতিথিশালায় বিভিন্নপন্থী নানা সাধুর সমাগম হইত। কেহ দীর্ঘ শ্মশ্রু-জটা-দণ্ড-কমণ্ডলুধারী, কেহ মুণ্ডিত-কেশ, কাহারও বা ত্যাগী বৈরাগীর বেশ। ইঁহাদের স্তব-বন্দনা ও ভজন-গানে আকৃষ্ট হইয়া গদাধর দূর হইতে ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিত। দিনে দিনে দূরের ব্যবধান নিকটতর হইয়া বালক ক্রমে সাধুগণের একান্ত প্রিয়তম হইয়া উঠিল। গদাধর তাঁহাদের জন্য ধূনী ও রন্ধনের কাঠ সংগ্রহ করে, জল আনিয়া দেয়। সংসার-বন্ধন-বিহীন সাধুগণ ক্রমে প্রিয়দর্শন বালকের অনিবার্য্য আকর্ষণে এমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে,তাহাকে এক দিন না দেখিলে তাঁহারা বিচলিত হইতেন। গদাধরকে ইঁহারা প্রায়ই প্রসাদ দিতেন এবং বালক মধ্যে মধ্যে বিভূতি মাখিয়া, তিলক-ধারণ করিয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইত। পিতৃ-বিয়োগ-বিধুর অষ্টমবর্ষীয় বালক সাধুগণের সহবাসে খেলা লইয়া নিদারুণ শোক ভুলিয়া আছে ভাবিয়া চন্দ্রাদেবী সানন্দে প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। কিন্তু গদাধরের দিনেকের আচরণ মাতৃহৃদয়ে আতঙ্ক-সঞ্চার করিয়া অকস্মাৎ তাঁহাকে চেতাইয়া তুলিল। সে দিন সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখিয়া, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস ধারণ করিয়া গদাধর জননীর

নিকট উপস্থিতা মাতাকে সাজ দেখাইয়া বলিল, "মা, সন্ন্যাসীরা আমাকে কেমন সাজিয়ে দিয়েছে, দেখ!"

জাগিলে দুরন্ত শিশুর মত শীঘ্র ঘুমাইতে চাহে না। জননী পুত্রের প্রতিজ্ঞায় সম্পূর্ণ আস্থা-স্থাপন করিতে পারিলেন না।
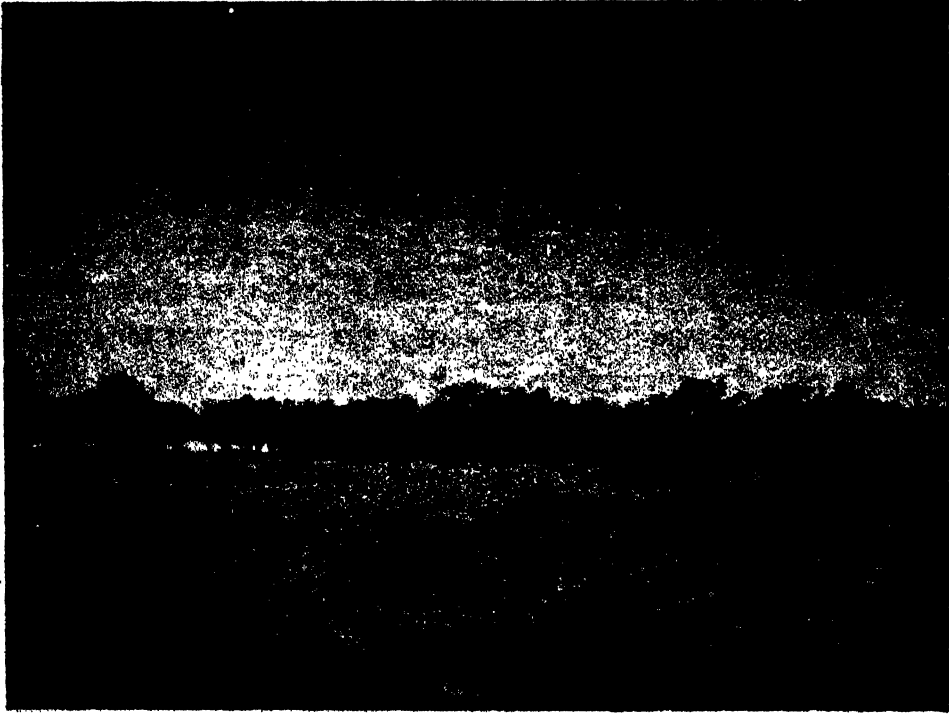
কামার পুকুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মাণিক রাজার প্রতিষ্ঠিত আম্র-কানন।

কৌপীন-বহির্ব্বাস-পরিহিত বিভূতি-ভূষিত বালকের মনোহর বালমহেশ্বরমূর্ত্তি দেখিয়া চন্দ্রাদেবী কিয়ৎকাল স্তিমিত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মাতৃমুখে আশঙ্কার ছায়া দেখিয়া বালক বুঝিল, পাছে সন্ন্যাসীরা তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে মা কাতর হইয়াছেন। সেকালে ভণ্ড সাধুগণের মধ্যে এরূপ অসদাচরণ বিরল ছিল না। কে জানে কে ভণ্ড? কে সাধু? কার মনে কি আছে? জননীকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত গদাধর প্রতিশ্রুত হইল, সন্ন্যাসীদিগের নিকট আর একবার যাইয়া বিদায় লইয়া আসিবে। পরে আর অতিথি-শালায় যাইবে না। কিন্তু মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কা একবার

এদিকে শেষ বিদায় লইতে গিয়া গদাধর সাধুদিগকে সকল কথা খুলিয়া বলিলে, তাহার সহিত আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় সন্ন্যাসিগণ নিরতিশয় কাতর হইলেন। যে আকর্ষণে কামারপুকুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বদ্ধ, তাহার অমোঘ প্রভাব সর্ব্বত্যাগী, সংসার-বিরাগী সাধু-সন্ন্যাসিগণও এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহারা সদলে চন্দ্রাদেবীর নিকট আসিয়া বলিলেন, গদাধরকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবেন, এরূপ বিসদৃশ কল্পনা তাঁহাদের মনে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত উদয় হয় নাই, কখন হইবেও না। দেবী আশ্বস্তা হইলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

উইণ্ডসর।

লণ্ডনের উপকণ্ঠে উইণ্ডসরে ইংলণ্ডের একটি রাজপ্রাসাদ আছে। সহরের মধ্যে অবস্থিত বাকিংহাম প্রাসাদ বিস্তৃত উদ্যানমধ্যে অবস্থিত নহে। উইণ্ডসরে শ্যাম-শোভা। বিলাতের লোক পল্লীগ্রাম বড় ভালবাসে। যে পারে, শনিবারে সহরের বাহিরে গ্রামে যাইয়া অন্ততঃ এক দিনের জন্যও মুক্তবাতাসে

উইণ্ডসর-প্রাসাদ।

বাস করিয়া আইসে। তাহারা বলে, মধ্যে মধ্যে সহরের ধূলি-ধূম ত্যাগ করিয়া না যাইলে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে না, মনও প্রফুল্ল হয় না। যে স্থলে সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস এইরূপ, সে স্থলে রাজার পল্লীভবন যে বিশেষ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমাদিগকে যেদিন উইণ্ডসর প্রাসাদ দেখান হয়, সেদিন অপরাহ্নে মিষ্টার চার্লস রবার্ট নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, পার্লামেণ্টে আমরা তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া আহারান্তে হাউস অব কমন্স-সভার অধিবেশন দেখিব।

আমরা প্রাতরাশ শেষ করিয়াই উইণ্ডসরে যাত্রা করিলাম। উইণ্ডসর লণ্ডন হইতে ২১ মাইল দূরে টেমস নদীর তীরে অবস্থিত—সহরটি পুরাতন এবং প্রাসাদের কাছে রক্ষিত বনও আয়তনে সামান্য নহে। এই বনে শীকারের জন্য পক্ষী প্রভৃতি থাকে।

পথে ইটন—বিলাতের অন্যতম প্রসিদ্ধ স্কুল। সেকালের মত একালেও ছাত্ররা দীর্ঘ হ্যাট পরিধান করে—সেই বেশে সহরের রাজপথে গতায়াত করিতেছে।

উইণ্ডসর প্রাচীন সহর এবং ইহার সহিত ইংলণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক যুগের পৌরাণিক রাজা কিং আর্থারের স্মৃতি বিজড়িত। কাযেই এই স্থানের প্রাসাদ পুনঃপুনঃ সংস্কৃত এবং পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহার কতকাংশ বহুদিনের এবং তাহার সঙ্গে কিংবদন্তী নানা কথা বিজড়িত করিয়াছে। যে স্থানে আজ "রাউণ্ড টাওয়ার" অবস্থিত, সেই স্থানেই নাকি আর্থার পারিষদ-পরিবৃত হইয়া বসিতেন। তদবধি বহু ইংরাজ রাজা এই প্রাসাদে বাস করিয়াছেন।

প্রাসাদের প্রবেশদ্বার সেকালের—দ্বারের উপর হইতে রক্ষীরা অগ্নিবর্ষণ করিয়া কেমন ভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রহত করিতে পারিত, তাহা সিংহদ্বার দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখন আর সেরূপ উপায়ে প্রাসাদ রক্ষা করা যায় না; কারণ, মানুষ এখন বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্র আবিষ্কারে প্রযুক্ত করিয়াছে।

উইলিয়ম দি কঙ্কারারের সময় গৃহের বেষ্টনের পুরাতন কাষ্ঠপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া প্রস্তরের প্রাচীর রচিত হয়। তদবধি ইংলণ্ডের বহু রাজা ও রাণী এই গৃহের সংস্কার করিয়াছেন।

উইণ্ডসর প্রাসাদে বহু ঐতিহাসিক-নিদর্শন সযত্নে সংরক্ষিত। কোন্ রাজার সময় কিরূপ বর্ম্ম ও অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল—কোন্ যোদ্ধার কি পতাকা ছিল—সে সব জাতীয়-সম্পত্তির মত শ্রদ্ধাসহকারে রক্ষা করা হইয়াছে। যে গুলীতে নেলসন আহত হইয়াছিল, সেটিও মখমলের বাক্সে স্থাপিত হইয়া দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে। বিলাতের লোক আপনাদের ইতিহাসের সব উপকরণ এমনই যত্নসহকারে রক্ষা করে। তাহাদের জাতিগত গর্ব্ব এ কার্য্যে তাহাদের সহায়। আমাদের বিনীত মানসিক ভাব বহু পরিমাণে আমাদের ইতিহাসের অভাবের কারণ। কিন্তু ইংরাজ গর্ব্বিত অহঙ্কারী জাতি; তাই তাহাদের ইতিহাসের বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"অহঙ্কার, অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী; এখানে তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি, বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম।"

উইণ্ডসর-প্রাসাদ-পুস্তকাগারে বহু পুরাতন পুস্তক ও চিত্রাদি রক্ষিত—সে আগারের ছাত খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্প-নিদর্শন।

প্রাসাদের সঙ্গে যে ভজনালয় আছে, তাহার স্থাপত্য বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং সৌন্দর্য্য চিত্তাকর্ষক। ইংলণ্ডের রাজাদিগের স্মৃতি-সৌধ হিসাবে—ওয়েষ্ট মিনিষ্টার অ্যাবির পরই ইহার স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। তবে রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের পূর্ব্বে কোন রাজা এই গৃহে সমাহিত হয়েন নাই। তিনি নির্দ্দেশ করেন—এই গৃহে তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট সমাধি নির্ম্মিত ও রৌপ্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। আজ সে সমাধির বা মূর্ত্তির চিহ্নমাত্র নাই—আছে কেবল সমাধির লৌহবৃতির কতকাংশ। অষ্টম হেনরীও এই গৃহে সমাহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মর্ম্মর ও ব্রোঞ্জরচিত সমাধি বোধ হয় সম্পূর্ণ হয় নাই। ধাতু যাহা ছিল, তাহা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে গলাইয়া ফেলা হয়।

ভজনালয়ের বৈশিষ্ট্য—নানা রাজপুরুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনের উপর তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক পতাকা। পতাকায় তাঁহাদের চিহ্ন অঙ্কিত। য়ুরোপের প্রায় সকল শাসকই ইংরাজসরকার কর্তৃক সম্মানিত হইয়া "নাইট অব দি অর্ডার অব দি গার্টার" উপাধিলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকলেরই নির্দ্দিষ্ট আসন এই ভজনালয়ে আছে। কেবল—জার্ম্মাণ যুদ্ধের ফলে কৈশরের আসনের উপর হইতে জার্ম্মাণ পতাকা সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। সে স্থান শূন্য। কৈশর সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্র—মাতামহীর বিশেষ স্নেহভাজনও ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যিনি বিশ্বজয়ী হইবার চেষ্টার পর স্বীয় রাজ্য হইতেও চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উইণ্ডসরের ভজনাগারে আসনভ্রষ্ট হওয়ায়, বোধ হয়, দুঃখের কোন কারণ নাই। কিন্তু এই কার্য্যে কি ইংরাজই বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে?

উইণ্ডসর প্রাসাদের সহিত রাজা অষ্টম হেনরীর নানা স্মৃতি বিজড়িত। রাজা সপ্তম হেনরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ আর্থার পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগত হইলে, দ্বিতীয় পুত্র রাজ্যলাভ করেন। তিনি ইতিহাসে অষ্টম হেনরী নামে পরিচিত। তিনি জ্যেষ্ঠের বিধবা ক্যাথারিনকে বিবাহ করেন। কিছু দিন তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন সুখময় ছিল। হেনরী স্বয়ং কর্ম্মঠ ও বলশালী ছিলেন—তীর ছুড়িতে ও লাফাইতে কোন প্রজাই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি প্রজাদিগের প্রিয় ছিলেন। তিনি তীক্ষবুদ্ধি হইলেও কার্য্যভার মন্ত্রী কার্ডিনাল

উলসীর উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তখন ফ্রান্সে ও স্পেনে যুদ্ধ চলিতেছিল। পাছে কেহ প্রবল হয়, এই ভয়ে হেনরী দুর্ব্বলের পক্ষ লইয়া উভয়কেই দুর্ব্বল করিয়া রাখিতেন। এ দিকে মুদ্রাযন্ত্রে পুস্তক মুদ্রিত হওয়ায় ইংলণ্ডের লোক জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া আপনাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে লাগিল। যুদ্ধান্তে অনেক লোক কার্য্য না পাইয়া দস্যু হইয়া উঠিলে, হেনরী সেকালের কঠোর আইন অনুসারে তাহাদের প্রাণদণ্ড দিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি অ্যান বোলীন নাম্নী সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রাণী ক্যাথারিণের সহিত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করিয়া অন্যায় কায করিয়াছেন বলিয়া ধর্ম্মগুরু পোপকে সে বিবাহ অসিদ্ধ বলিতে অনুরোধ করিলেন। তখন পোপ ধর্ম্মবিষয়ে যাহা বলিতেন, লোক তাহাই অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিত —স্বর্গের চাবি তাঁহার কাছে ছিল! হেনরীর প্রস্তাবে পোপ উভয়সঙ্কটে পড়িলেন। বিবাহ অসিদ্ধ বলিলে ক্যাথারিনের স্বজন স্পেনের রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন—বিশেষ ইটালীতে তাঁহার অনেক সৈন্য বিদ্যমান; আবার বিবাহ সিদ্ধ বলিলে হয় ত হেনরী নবপ্রবর্ত্তিত প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমত গ্রাহ্য করিবেন। তাই পোপ অনেক বিলম্ব করিয়া শেষে কার্ডিনাল উলসী ও আর এক জন ধর্ম্মযাজককে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে দুই পক্ষের কথা শুনিতে আদেশ দিলেন। বিচার আরম্ভ হইলে রাণী হেনরীর পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিলেন—তিনি হতভাগিনী, ২০ বৎসর সতী-সাধ্বীর মত রাজার সেবা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তিনি পোপ ব্যতীত কাহারও কাছে স্বীয়
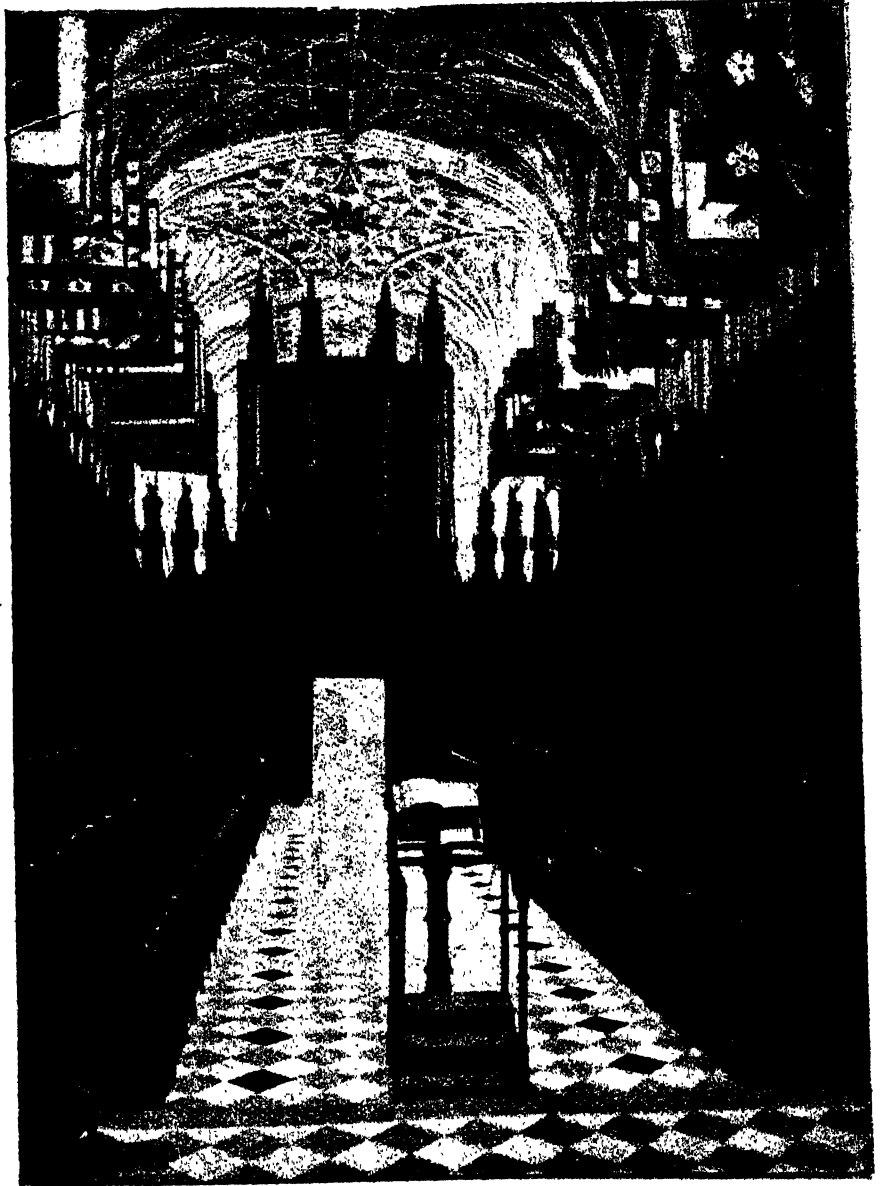
ভজনালয়।

বক্তব্য ব্যক্ত করিবেন না। শেষে পোপও তাহাতেই মত দিলেন। উলসী যে হেনরীর বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, অকৃতজ্ঞ রাজা তাহা ভুলিয়া তাঁহার উপরই রাগ করিলেন। উলসীর সর্ব্বনাশের উপায় নির্দ্ধারিত হইল।

উলসী রাজার আদেশে যে কায করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য তিনি অপরাধী নির্দ্দিষ্ট হইয়া কর্ম্মচ্যুত হইলেন। তাঁহার ধনসম্পত্তিও সরকারে জব্দ হইল। উলসী একান্ত দরিদ্র হইলেন। তাহার পর তাঁহাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া বিচারার্থ লণ্ডনে আনিবার ব্যবস্থা হয়। পথে তিনি মরণাহত হইয়া লিষ্টার গির্জ্জায় আশ্রয় লইয়া তথায় পাদরীকে বলেন,—"আমি আমার জীর্ণ দেহ রক্ষা করিতে আসিয়াছি।" মৃত্যুকালে তিনি বলেন, "আমি যেরূপ একনিষ্ঠভাবে রাজার সেবা করিয়াছি, যদি সেইরূপ ভাবে ভগবানের সেবা করিতাম, তবে তিনি এই বৃদ্ধবয়সে কখনই আমাকে ত্যাগ করিতেন না।" উলসীর এই উক্তি পাঠ করিলে ভারতচন্দ্রের সেই কথাই স্মৃতিপথে সমুদিত হয়—

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ;
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।"

কার্ডিনাল উলসী

হেনরীর মত অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির প্রসাদও ভয়ঙ্কর। তিনি বিনাদোষে ক্যাথারিনকে ত্যাগ করিয়া অ্যান বোলীনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে মিথ্যা অপরাধের অজুহতে প্রাণদণ্ড দিয়া জেন সেমোরকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে হেনরী চিত্র দেখিয়া অ্যানকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ক্যাথারিন হাউয়ার্ডকে অঙ্কশায়িনী করিয়া তাঁহাকে অসতীত্বের অপরাধে নিহত করিয়া ষষ্ঠ পত্নী গ্রহণ করেন। ইঁহাদের স্মৃতি আজও উইণ্ডসর প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া আছে। উলসী যখন রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে একটি কক্ষ প্রদান করেন। রাজা তৃতীয় হেনরী এই কক্ষ গঠন আরম্ভ করেন এবং ইহার উপরের অংশ সপ্তম হেনরী কর্ত্তৃক রচিত হয়। বহুদিন এই কক্ষ উলসীর সমাধিগৃহ নামে পরিচিত ছিল। উলসী ফ্লোরেন্স হইতে শিল্পী আনাইয়া মর্ম্মরে ও ব্রোঞ্জে রচিত এক বৃহৎ সমাধি গঠিত করান। সমাধির উপরে তাঁহার মূর্ত্তি। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই উপহাস যে, তিনি রাজার অনুগ্রহভ্রষ্ট ও নিগ্রহভাজন হইয়া নিঃস্ব অবস্থায় ভগ্নহৃদয়ে লিষ্টারে প্রাণত্যাগ করেন। ইংলণ্ডে যখন কিছুদিনের জন্য প্রজাতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের আদেশে সমাধির ধাতু লইয়া বিক্রয় করা হয়। ধাতুর মূল্যই প্রায় ৯ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে হৃতালঙ্কার মর্ম্মরাধার উইণ্ডসর হইতে লণ্ডনে লইয়া যাইয়া বীরবর নেলসনের সমাধির উপর ব্যবহৃত হয়।

তাহার পর সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আদেশে প্রসিদ্ধ শিল্পী সার গিলবার্ট স্কট এই শ্রীভ্রষ্ট কক্ষে নূতন সজ্জা দান করেন। বিধবা সাম্রাজ্ঞী ইহা তাঁহার পতির স্মৃতিমন্দিররূপে উৎসৃষ্ট করেন। এখন ইহা অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল চ্যাপেল নামে অভিহিত। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার বহু প্রিয়জনের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রস্তুত ও তাঁহার পারিবারিক জীবনের নানাঘটনার চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। উইণ্ডসরে বহুকালাবধি নানা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্ঞী আর কোন কক্ষই এমন করিয়া সুসজ্জিত করেন নাই। ইহা দেখিলে প্রাচীন ভারতের কথা মনে পড়ে—ভক্তের ভক্তি দেবমন্দির সুন্দর করিতেই আপনার সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াছে—মন্দিরের সর্ব্বত্র সেই
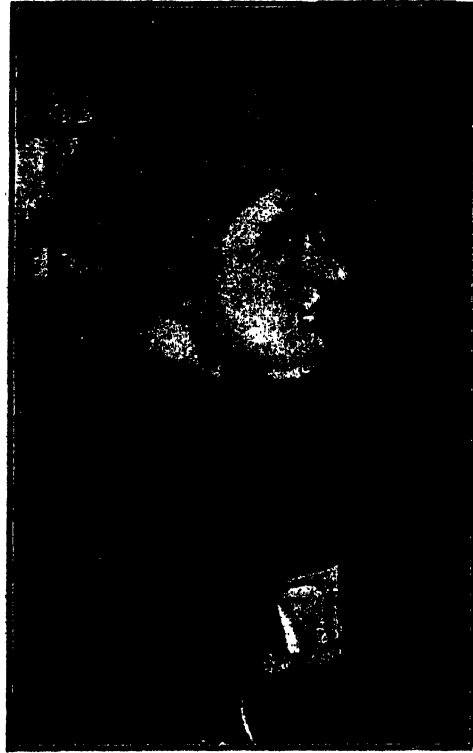
ভক্তি যেন আত্মপ্রকাশ করিয়া সৌন্দর্য্যে আত্মবিকাশ করিয়াছে।

কক্ষপ্রাচীর মর্ম্মরাবৃত—তাহাতে সাম্রাজ্ঞীর পুত্র-কন্যার মুখের মর্ম্মরমূর্ত্তি। তন্নিম্নে প্রাচীরে প্রস্তরফলকে—সুকৌশলে ধাতুর রেখা বসাইয়া নানা ঘটনার স্মৃতি চিত্রে অমর করিয়া রাখা হইয়াছে। এ সব এক জন ফরাসী শিল্পীর কীর্ত্তি। তিনি যে কৌশলে এইরূপ চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে কৌশল তাঁহার সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে—আর কেহ তাহা জানে না। যখন ফ্রাঙ্কো প্রাসিয়ান যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণরা প্যারিস অবরুদ্ধ করে—সেই সময় বিপজ্জালে বেষ্টিত হইয়াও শিল্পী তন্ময় হইয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কয়খানি ফলক সেই সময় রচিত হইয়াছিল।

সাম্রাজ্ঞী লণ্ডনে তাঁহার পতির যে স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার কথা প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি। এই মন্দিরের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর।

মন্দিরের গাম্ভীর্য্য তাহার সৌন্দর্য্য যেন নূতন শ্রীসমুজ্জ্বল করিয়াছে। আর এই মন্দিরে বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নারীহৃদয়ের প্রেম যেন ভক্তিতে পরিণতি লাভ করিয়া পরলোকগত পতির কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছে।

প্রিন্স অ্যালবার্ট।

উইণ্ডসর প্রাসাদেই তাঁহার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের মৃত্যু হইয়াছিল। বিস্ময়ের বিষয়, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ জর্জ্জ, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ উইলিয়াম ও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অ্যালবার্ট একই কক্ষে প্রাণত্যাগ করেন। সাম্রাজ্ঞীর কনিষ্ঠ পুত্র ডিউক অব আলবেনী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র-শোকাতুরা জননী পতির নামে উৎসৃষ্ট এই স্মৃতি কক্ষেই তাঁহার শব শেষ-শয্যায় শায়িত করেন। আবার যখন সাম্রাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র ডিউক অব ক্লারেন্স ভারত-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রিন্সেস (বর্ত্তমান রাণী) মেরীর সহিত পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন—যখন মৃত্যুর অন্ধকারে বিবাহোৎসবের আয়োজন আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন শোকার্ত্তা পিতামহী এই কক্ষেই প্রিয় পৌত্রের সমাধি রচনা করাইয়াছিলেন, সমাধির উপর কুমারের শ্বেতমর্ম্মররচিত মূর্ত্তি—তিনি যেন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।
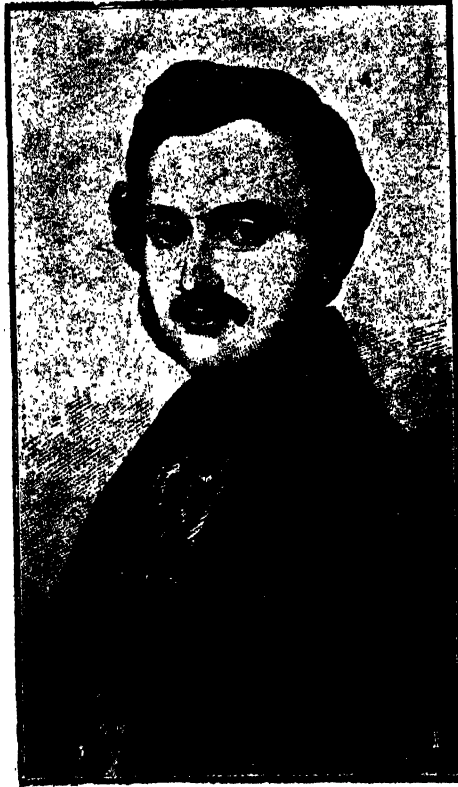
যে দিন আমরা উইণ্ডসর প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহার কয় দিন পূর্ব্বে কুমারের মৃত্যাহ। সেই দিন বুঝি তাঁহার মাতার (সাম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার) হৃদয়ে পুত্রশোক নূতন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সমাধির উপর কুসুমদাম দিয়া গিয়াছেন—তাহাতে লিখিত—প্রিয় পুত্রের জন্য শোকার্ত্তা জননীর উপহার। কি বুকভাঙ্গা বেদনা সেই কুসুমদামে জড়াইয়া আছে—কত অশ্রু সেই ফুলদল সিক্ত করিয়াছে, তাহা সন্তান-শোকাতুর ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারিবে না।

সেই কথা মনে করিতে করিতে আমরা উইণ্ডসর প্রাসাদ দর্শন করিয়া শ্যাম-শোভাময় পথে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি।

বর্ত্তমান প্রতীচ্যেরই অভ্যুদয়ের যুগ; পাশ্চাত্য জগৎই সমস্ত মানব-সমাজের জ্ঞানদাতা-শিক্ষক-স্থানীয়। প্রাচ্য মহাদেশ আজ মোহনিদ্রার ঘোরে মৃতবৎ। ভারতের অবস্থা আবার আরও শোচনীয়। ভারতবাসী সংখ্যায় ত্রিশ কোটির অধিক হইলেও জন-সমাজে তাঁহাদের কোন আদৃত স্থান নাই। স্বাধীনতা-লোপের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের পূর্ব্ব-গৌরবও হারাইয়াছি। এখন সব বিষয়েই প্রতীচ্যের অনুকরণই আমাদের শিক্ষার সার হইয়াছে। অনুকরণে পটু হইলেই য়ুরোপীয় সমাজে আদৃত হইলেই, শিক্ষার উৎকর্ষ, জ্ঞানের উৎকর্ষ ও জন-সমাজে আদর হয়।

অবশ্য অনুকরণে দোষ নাই। অপরের নিকট শিক্ষা করিলে তাহাতে কোন প্রত্যবায় ঘটে না। তবে মানুষ অত্যধিক অনুকরণের ফলে নিজের ধর্ম্ম—নিজের জাতীয়তা—নিজের সর্ব্বস্বই হারায়। বর্ত্তমানেও আমাদের এই দশা; এবং ইহার ফলে আমাদের আত্মসংস্কার লোপ পাইতেছে, তেজোবধও ঘটিতেছে। আমরা আমাদের নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়াছি। প্রতিনিয়তই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইতেছে যে, আমাদের নিজের কিছুই নাই বা ছিল না।

প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠ করিলে আমাদের এই সংস্কার ঘুচে; আমরা পিতৃপুরুষের উৎকর্ষও বুঝিতে পারি; ভ্রমও দূর হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির আদর্শেও ভারতীয় চিন্তাশক্তির বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ বুঝা যায়। অবশ্য, তাহার সমস্তই যে নব্য আদর্শের বা আধুনিক জগতের অনুমোদিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। ভারতীয় আদর্শের অনেক জিনিষই নব্য দার্শনিকের দৃষ্টিতে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতে পারে। তবে ইহা যে ভারতীয় মনীষীর চিন্তাশক্তির অভাব বা একদেশদর্শিতার ফল, তাহা বলা যায় না। সামাজিক আদর্শের সংগঠনের মূলে অনেকগুলি সংস্কার, অনেকগুলি বিশ্বাস অন্তর্নিহিত ছিল। তাহারই ফলে বর্ত্তমানের সহিত সে আদর্শের এত প্রভেদ। প্রতীচ্যের জড়বাদ ভারতীয় মানসে কখনও বদ্ধমূল হয় নাই। ভারতীয় মনীষীর দৃষ্টিতে সুখ-দুঃখের সমন্বয় মাত্র মানব-জীবনের অস্তিত্বের চরম সীমা বা অন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। তাহারই ফলে তাঁহারা মানব-জীবন জড় জগতের সুখের উপাদান দিয়া গঠিত করিতে চাহেন নাই; সংসারে সুখের ভাব লইয়া চিরদিন সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন নাই। মানব-জীবন তাঁহাদের দৃষ্টিতে নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কণামাত্রের অভিব্যক্তি বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। কর্ম্মফলভোগী জীবাত্মা এইরূপ কত জীবন ধারণ ও ত্যাগ করে, তাঁহাদের নিকট তাহার ইয়ত্তা ছিল না। এই নশ্বর জীবনের সুখ তাঁহাদের মূল লক্ষ্য ছিল না। মোক্ষের দিকে, এই পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতির দিকেই তাঁহাদের প্রধান মনোযোগ ছিল। জীবনের ক্ষণিক-বাদে বিশ্বাসের সহিত কর্ম্মফলবাদও তাহাদের মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। কর্ম্মের ফলেই মানবের সুখ দুঃখ ও সেইগুলির ভোগের জন্য পুনর্জন্ম, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা দুঃখ স্বকর্ম্মের ফলমাত্র জ্ঞান করিয়া কর্ম্মের উৎকর্ষ দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্মে যাহাতে আর কর্ম্মভোগ না করিতে হয়, তাহার জন্য প্রয়াসী হইতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অপরের প্রতি বিদ্বেষেরও কারণ অধিক হইত না। অপরের, ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের সুখ যে তাহার পূর্ব্বকর্ম্মের ফলস্বরূপ, এই বিশ্বাসের বশে ভারতীয় সমাজে, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি এত বিদ্বেষও কখনও বদ্ধমূল হয় নাই।

উপরের এই কয়টি সংস্কারের ফলে সমাজে সাম্য নীতির (Doctrine of Equality) বর্ত্তমানের ন্যায় প্রভাব ছিল না। এমন কি, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে উহার স্থানই ছিল না। গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ মূলক চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের প্রত্যেক বর্ণই নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম-পালনে যত্নবান্ ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের প্রতীচ্য সমাজের ন্যায় শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বিরোধের কারণও অল্প ছিল।

এই সকল আদর্শের ভিত্তির উপরেই প্রাচীন ভারতীয় সমাজ গঠিত হইয়াছিল। সমাজের গঠনেরও বৈচিত্র্য ছিল। সমাজভুক্ত জন-সমষ্টির সুখের দিকে ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমস্ত সমাজের সুখের ও উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই

উহার গঠন হইয়াছিল। সমাজের পুষ্টির জন্য—সমাজের শাসনের জন্য—সমাজের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য এক এক শ্রেণীর উপর এক একটি কার্য্য-বিভাগ ন্যস্ত হইয়াছিল। সুশৃঙ্খলভাবে সমাজ চলিতে হইলে, প্রত্যেক বর্ণই অপরের মুখাপেক্ষী হইতেন। সমাজের নৈতিক-শাসন ও পরিচালনের ভার ছিল ব্রাহ্মণের উপর—ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের উপর ছিল উহার রক্ষার ভার—সমাজের পুষ্টির ভার ছিল বৈশ্যের উপর—আর সেবার ভার ছিল শূদ্রের হাতে।

সমাজের আর একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, ভারতীয় সমাজ কখনও শাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হয় নাই। অবশ্য, সমাজ রাজ-শাসনে পরিচালিত হইত—রাজার ক্ষমতা প্রবলই ছিল; তবে প্রতীচ্যের ন্যায় ভারতের সমাজ কখনও রাজশক্তির ক্রীড়নক হয় নাই। ভারতীয় সমাজের স্বাতন্ত্র্য ছিল। আজিও ভারতীয় সমাজের স্বাতন্ত্র্যের ফল আমরা বেশ দেখিতে পাই। এখনও কোন নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে, উহা সমাজের মনঃপূত না হইলে চলে না; উহা আইনের গ্রন্থেই রহিয়া যায়। উহার মতে কোন কার্য্য হয় না।

সমাজের এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে সমাজ ও শাসন-তন্ত্র (Government) উভয়ের মধ্যে কার্য্য-বিভাগের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। দেশের শাসনের ও রক্ষণের ভার ছিল রাজার উপর। আর সমাজের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারের ভার ছিল সমাজের নেতৃবর্গের উপর। প্রজার ধর্ম্ম বা সামাজিক ব্যাপারে রাজার হস্তক্ষেপের অধিকার ছিল না। অবশ্য শাস্ত্রানুমোদিত বা মনুষ্য-সমাজের অযোগ্য রীতিনীতি রাজা নিষেধ করিতে পারিতেন। তবে ঐরূপ স্থল ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে হাত দেওয়া তাঁহার পক্ষে অযৌক্তিক হইত। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যায়। ভারতে কখনও রাজা প্রজার ধর্ম্ম নির্ব্বাচন বা ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয়েন নাই। আর ধর্ম্মমত লইয়া কখনও এ দেশে রাজায় রাজায় যুদ্ধও হয় নাই। তাহার ফলে ভারত কখনও অধর্ম্ম-মূলক ধর্ম্ম-যুদ্ধের (Religious war) শোণিতে রঞ্জিত হয় নাই।

সমাজের রক্ষার ভার ছিল রাজার হাতে। সমাজ-রক্ষণের জন্য রাজার বহু কর্ত্তব্যই ছিল। তাঁহাকে কেবল প্রহরীর কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইত না। তাঁহার হস্তে প্রজার জীবিকা ও বৃত্তিরক্ষার ভারও ছিল। অতি প্রাচীন যুগেই রাজশক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রাচীন মনস্বীদিগের এইরূপই অভিমত ছিল। বৈদিক যুগের রাজসূয়াদির অভিষেক-মন্ত্রে ইহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যজুর্ব্বেদের নবমাধ্যায়ে দেখা যায় যে, পুরোহিত রাজাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন :—

"ইয়ং তে রাট্। যন্তাসি যমনো। ধ্রুবোঽসি ধরুণঃ।
কৃষ্যৈ ত্বা ক্ষেমায় ত্বা রয্যৈ ত্বা পোষায় ত্বা।'

অর্থাৎ হে রাজন্, এই আপনার রাজ্য (আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত হউন) আপনি এই রাজ্যের যন্তাস্বরূপ হইয়া, সকলের নিয়ন্তা হইয়া অটল-অচলভাবে প্রজাপালন করুন; কৃষিকার্য্যের উন্নতির দিকে প্রজাদিগের উন্নতিকল্পে ও রক্ষণার্থে তাহাদের পুষ্টির দিকে যথাযোগ্য মনোযোগ করুন।

অতি প্রাচীন বৈদিকযুগের এই মহামন্ত্রটিই ভবিষ্যতের আদর্শের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণাদির সাহায্য, আতুর, দরিদ্র, বিধবা, অনাথার ভরণ-পোষণ ভারতীয় রাজামাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রজার প্রতিপালন, রাজ্যের সুশাসন এই সকলেরই গুণে রাজা ও প্রজায় সৌহার্দ্দ্যের অভাব ছিল না। প্রজাও কৃতজ্ঞতাসহকারে রাজাকে হিতৈষী বন্ধুজ্ঞানে ভালবাসিতেন—পূজা করিতেন। অত্যাচারী রাজার স্থান সমাজে ছিল না। প্রজাপীড়ক বা দুর্নীতিপরায়ণ হইলে, প্রজার হাতে তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইত; সময়ে সময়ে পদচ্যুতও হইতে হইত। প্রজাবর্গ ইচ্ছামত রাজকুল হইতে বা অন্য কোন ক্ষত্রিয়কুল হইতে রাজাকে মনোনীত করিয়া লইতেন।

অতি প্রাচীন যুগে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কালক্রমে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বলাবলের তারতম্যের ফলে সমাজে নূতন চিন্তা ও ভাব আসিয়া পড়িল। রাজাপ্রজার সম্বন্ধ অনেকটা চুক্তিবন্ধের ফলস্বরূপ (Contract) বলিয়া পরিগণিত হইল। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে এই চুক্তিমূলক সম্বন্ধের উৎপত্তির উপাখ্যান দেখা যায়। চুক্তির ফলে রাজা হইলেন—প্রজাদিগের বেতনভোগী রক্ষণকর্ত্তা। আর প্রজারাও রক্ষার বিনিময়ে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। রাজাকে পূর্ব্বের ন্যায় সকল প্রকার কর্ত্তব্যই প্রতিপালন করিতে হইল। মহাভারতের নানা স্থানেই এই চুক্তিমূলক সম্বন্ধের প্রভাব (Influence of the theory of Contract) দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজাপ্রজার এ সম্বন্ধ কিন্তু অধিককাল স্থায়ী রহিল না। নানা কারণে ও নানা ঘটনার প্রভাবে রাজশক্তির বল বাড়িতে লাগিল। প্রজাশক্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে উভয় শক্তির সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। মৌর্য্যপূর্ব্ব ও মৌর্য্যযুগে এই পরিবর্ত্তনটি ঘটে।

এ যুগে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইল। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে এইরূপ ধারণার প্রভাব দেখা যায়।

মহাভারতের নানা স্থানেও উহার উল্লেখ আছে। মহাভারতের এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুশাসক প্রজার পিতৃস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

মূল শ্লোক এই—

"পুত্র ইব পিতুর্গৃহে বিষয়ে যস্য মানবাঃ।
নির্ভয়া বিচরিষ্যন্তি স রাজা রাজসত্তমঃ॥
পিতা মাতা গুরুর্গোপ্তা ………"

অর্থশাস্ত্র ও কৌটিল্য বহু স্থলে বলিয়াছেন যে, রাজা প্রজাকে সন্তানের ন্যায় দেখিবেন ও যত্নে রক্ষা করিবেন, (পিতেব অনুগৃহ্ণীয়াৎ) দুঃস্থ কৃষককে অর্থ-সাহায্য করিবেন। কোষ হইতে অর্থ দিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজার প্রাণরক্ষা করিবেন। আপদে বিপদে প্রজাকে পুত্রের ন্যায় দেখিয়া তাহার রক্ষণে যত্নবান্ হইবেন। অর্থশাস্ত্রের পরবর্ত্তী যুগে রাজার পিতৃোচিত কর্ত্তব্যের আদর্শ আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সম্রাট অশোকের গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপিগুলির বহু স্থলেই এই মহান্ আদর্শের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট এক স্থলে (জৌগড়লিপি) যে কথাগুলি বলিয়াছেন—তাহা জগতের চিরস্মরণীয়, "সকল প্রজাই আমার পুত্রতুল্য এবং আমি যেমন নিজের সন্তানদিগের ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গল-কামনা করি, তদ্রূপ প্রজাদিগের মঙ্গল-কামনাও আমার মনে সদাসর্ব্বদাই জাগরূক রহিয়াছে।" নিজের মনের কথা জানাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। মহামাত্র, রাজকর্ম্মচারী, স্বদেশবাসী, বিদেশী—সকলেরই নিকট তিনি মহান্ নীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বহু অনুরোধ করিয়াছেন।

এই ত গেল রাষ্ট্রনীতির আদর্শের কথা। অতঃপর রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াই উপসংহার করিব। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থসমূহে যাহা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় তৎকালের গভর্ণমেণ্ট প্রজার উন্নতিকল্পে কোন প্রকার চেষ্টা বা যত্নের ত্রুটি করিতেন না। সর্ব্বপ্রকারে প্রজাকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়াই ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল এবং এ বিষয়ে তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য-দেশের গভর্ণমেণ্টগুলি হইতে কোন অংশে পশ্চাতে ছিলেন না। যাঁহারা মনে করেন যে, প্রাচীন যুগের ভারতে রাজারা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, চোর-দস্যু-দমন করিয়া—নামে মাত্র কর্ত্তব্যপালন করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত সমাজ-চিত্র পাঠ করিলে তাঁহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইবে। অর্থশাস্ত্রে যাহা দেখা যায়—তাহাতে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমানের প্রতীচ্য গভর্ণমেণ্টগুলিরও এখনও আমাদের কাছ হইতে লইবার অনেক জিনিষ আছে। অর্থশাস্ত্র হইতে কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা উদ্ধৃত করিলাম—

১। অর্থশাস্ত্রে সকল শ্রেণীর প্রজাকেই সাহায্য করিবার ব্যবস্থা আছে। কৃষকদিগকে জমী দিয়া নূতন আবাদী ভূমিতে বসান হইত এবং বীজ-ধান্য বা অর্থ দিয়া সাহায্য করা হইত। যাহাতে উত্তমর্ণের অত্যাচারে কৃষককুল একবারে নিঃস্ব না হইয়া পড়ে, তাহারই জন্য আরও ব্যবস্থা ছিল। কেহ কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে হইলে, তাঁহাকে প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে হইত। শস্য বপন ও কর্ত্তনকালে ঋণের দায়ে প্রজার কারাদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। কর্ষণের সাহায্যের জন্য খাল, জলাশয় প্রভৃতি খননের ব্যবস্থা ছিল। গ্রীকদিগের বর্ণনায় উহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

২। শ্রমিক (Labourers) দিগের উপর কেহ অত্যাচার করিলে উহাকে বিশেষভাবে দণ্ডিত করা হইত। বেতনের চুক্তি না থাকিলে শ্রমিকমাত্রেই তাহার পরিশ্রমের ফলের দশমাংশ ভোগ করিতে পাইত।

৩। দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদের জন্য অর্থশাস্ত্রে বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। আত্মীয় স্বজন ও সন্তান-সন্ততিকে দাসরূপে বিক্রয় করিলে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইত। য়ুরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, প্রাচীন ভারতে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে উহার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রের আইনে দেখা যায় যে, প্রভু দাসের উপর অত্যাচার করিলে দণ্ডিত হইতেন। বিশেষ অত্যাচারস্থলে দাস-সত্বঃ মুক্তিলাভ করিত। দাস নিজের ধনে অধিকারী হইত এবং নিজ-সম্পত্তি ইচ্ছামত দানাদি করিতে পারিত। আর নিষ্ক্রয়-মূল্য সংগ্রহ করিলে নিজে স্বাধীন

হইতে পারিত। নিষ্ক্রয়-মূল্য দিলেও প্রভু যদি স্বাধীনতা দান না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দণ্ডিত হইতে হইত।

৪। শ্রোত্রিয়—শাস্ত্রালোচনকারী ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বিশেষ পরিহার ও অধিকার ছিল। শিল্প, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষায় ব্যাপৃত অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবর্গ রাজসরকার হইতে পেন্সন্ লাভ করিতেন।

৫। বণিক্ ও ব্যবসায়ীর যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধি নিবারণার্থ রাজকর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা অত্যধিক মূল্য-বৃদ্ধিকারীর দণ্ডবিধান করিতেন; পণ্যের উপর ব্যবসায়ীর লাভের অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইলে, ওজনে কম দিলে, দূষিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্যবসায়ীর দণ্ড হইত। বিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে যে সকল ব্যবস্থার প্রচলন হইতেছে, ২৫ শত বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে সেইগুলি ছিল—ইহা বড় কম কথা নহে।

৬। প্রজাকে আপদ্-বিপদ্ হইতে রক্ষার জন্য রাজকর্ম্ম-চারিগণ সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজারক্ষার জন্য প্রতি বৎসরের করস্বরূপ গৃহীত উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ রাজকোষে সঞ্চিত (Reseve) থাকিত। শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে বা দুর্ভিক্ষ হইলে উহা প্রজাগণের মধ্যে বিতরিত হইত। বিদেশ হইতে শস্য আমদানী করা হইত এবং ধনীর শস্য-সম্ভার রাজকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া উহা দীনদুঃখীর মধ্যে দেওয়া হইত।

৭। প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষারও বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। কেহ বাটীতে দূষিত পয়ঃপ্রণালী বা আবর্জ্জনা রাখিলে, রাস্তায় ময়লা ফেলিলে বা অন্য কোন উপায়ে স্বাস্থ্যহানির চেষ্টা করিলে তাহাকে দণ্ডিত করা হইত। মড়কের সময় চিকিৎ-সক নিযুক্ত করা হইত। শান্তি-কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইত।

অধিক লিখার প্রয়োজন নাই। বহু শতাব্দীর নৈতিক অবনতির ফলে—কুসংস্কার বদ্ধমূল হওয়ায় ও নিজেদের বুদ্ধির দোষে আমরা সবই হারাইয়াছি। তবে প্রাচীন যুগের ব্যবস্থা-গুলির পর্য্যালোচনা করিলে মনে পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরূক হয়। আমাদের ন্যায় হতভাগ্য জাতির পক্ষে সে স্মৃতিও অমূল্য ধন। সেই স্মৃতির ফলে প্রাচীন আদর্শ যদি দেশে ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে আমরা আবার জন-সমাজে মাথা তুলিতে পারি।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

লয়েড জর্জ্জ—ভাই জার্ম্মাণ! আর কিছু দাও বা না দাও, আমার রুটী ডিমের দামটা দাও

ভোলার ভালবাসা।

১

ভোলার মা কুলা-ধুচুনী বেচিয়া ভোলাকে "মানুষ" করিল বটে, ভোলা কিন্তু মানুষ হইল না। সে মায়ের দুঃখ বুঝিল না, বা নিজের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে যত্নবান্ হইল না, টপ্পা গাহিয়া, গল্প করিয়া, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। ডোমের ছেলে,—বেতের কায জানিত, কুলা-ধুচুনীও বেশ বুনিতে পারিত, কিন্তু সে সকল কাযে ভোলার আদৌ মন বসিত না; এক দিন কায করিলে দশ দিন বিশ্রামের প্রয়োজন হইত। মা রাগিয়া তিরস্কার করিলে গম্ভীর-ভাবে উত্তর করিত, "ও সব আমার ভাল লাগে না।"

মা বলিত, "ভাল লাগে না তো খাবি কোথা থেকে?"

ভোলা উত্তর দিত, "যেখান থেকে এদ্দিন খেয়ে আসছি।"

মা রাগিয়া বলিত, "আমি এই বুড়ো বয়সে ধুচুনী চুপড়ী বুনে তোকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব, তোর তাতে একটুও লজ্জা হয় না?"

ভোলা মাথা নাড়িয়া বেশ সহজ ভাবেই উত্তর করিত, "উহুঁ।"

কুড়ি বছরের উপযুক্ত ছেলের এমন নির্লজ্জ উত্তরে মা রাগে অধীর হইয়া যাহা মুখে আসিত, তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকিত। ভোলা কিন্তু সে তিরস্কারে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া "আমার মন কেড়ে নিয়ে দেখ গো পালায়" গাহিতে গাহিতে প্রতিবেশী গোলোক সর্দ্দারের বাড়ীতে উপস্থিত হইত, এবং গোলোক সর্দ্দারের মেয়ে লখীর সম্মুখে বসিয়া, তাহার আরব্ধ ধুচুনীগুলার মুড়ি বাঁধিয়া দিতে দিতে গাহিতে থাকিত—

"ভালো বাসিবে ব'লে ভালো বাসিনে।
আমারো স্বভাবো এই তোমা বই আর জানিনে।"

গোলোক সর্দ্দার কিছু দিন পূর্ব্বে গ্রামের সর্দ্দারি ত্যাগ করিয়া পরলোক নামক নূতন দেশের সর্দ্দারি করিতে গমন করিলে তাহার পরিত্যক্ত ঘরখানা সংস্কারের অভাবে যখন পতনোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী কন্যা লক্ষ্মীমণি ওরফে লখী স্বামীর তাড়নায় অস্থির হইয়া স্বামী জগন্নাথের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীর্ণ পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং ধুচুনী চুপড়ী বুনিয়া নিজের ও শিশু পুত্রের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

লখী স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিলেও স্বামী তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সে মাঝে মাঝে লখীর পৈতৃক গৃহে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিত, এবং প্রণামীস্বরূপ গাঁজা বা তাড়ির পয়সা আদায় না হইলে লখীকে প্রহার দিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিত না। নিত্য প্রহারের পরিবর্ত্তে মাসান্তে বা পক্ষান্তে এরূপ প্রহার খাইতে লখী তেমন কষ্ট বোধ করিত না। তবে হাতে পয়সা থাকিলে সে প্রহার সহ্য করিতে চাহিত না, দুই চারি আনা যাহা হাতে থাকিত, তাহাই দিয়া স্বামীকে হাসি-মুখে বিদায় দিত। কখন বা ভোলা গোপনে পয়সার যোগাড় করিয়া দিয়া লখীকে প্রহারের দায় হইতে রক্ষা করিত।

লখী ভোলার নিকট শুধু এই সাহায্যটুকুই পাইত না। সে যদি দিনের অধিকাংশ সময় তাহার কাছে বসিয়া তাহার অসমাপ্ত কায সমাপ্ত করিয়া না দিত, তাহা হইলে লখীর দিন চলাও ভার হইয়া উঠিত। লখী একা দিনে পাঁচ সাত পয়সার বেশী কায করিতে পারিত কি না সন্দেহ, কিন্তু ভোলার সহায়তায় সে প্রত্যহ চার ছয় আনা উপার্জ্জন করিত।

এইরূপে নিজের কায হারাইয়া পরের ব্যাগার দেওয়ার জন্য ভোলাকে যে শুধু অপরের কাছেই তিরস্কার সহ্য করিতে হইত, তাহা নহে, লখী নিজেও এক এক সময়ে তাহাকে বেশ পাঁচ কথা শুনাইয়া দিত। ভোলা সে সকল কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিত। শেষে কথাগুলা যখন নিতান্ত কঠোর হইয়া আসিত, তখন ভোলা বাঁশের 'পাত্‌রী' তুলিতে তুলিতে উচ্চ-কণ্ঠে গান ধরিত—

"ভালো বাসিবে ব'লে ভালো বাসিনে।
আমারো স্বভাবো এই তোমা বই আর জানিনে।"

তা লখীর সঙ্গে ভোলার যে তেমন কিছু নিকট সম্বন্ধ ছিল, তাহা নহে। ভোলার বয়স যোল, আর লখীর বয়স চৌদ্দ, তখন গোলোক সর্দ্দার দীনু মাঝির ছেলে ভোলার সহিত কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছিল। একমাত্র

(শিল্পী—শ্রীপশুপতিনাথ ব্যানার্জী)
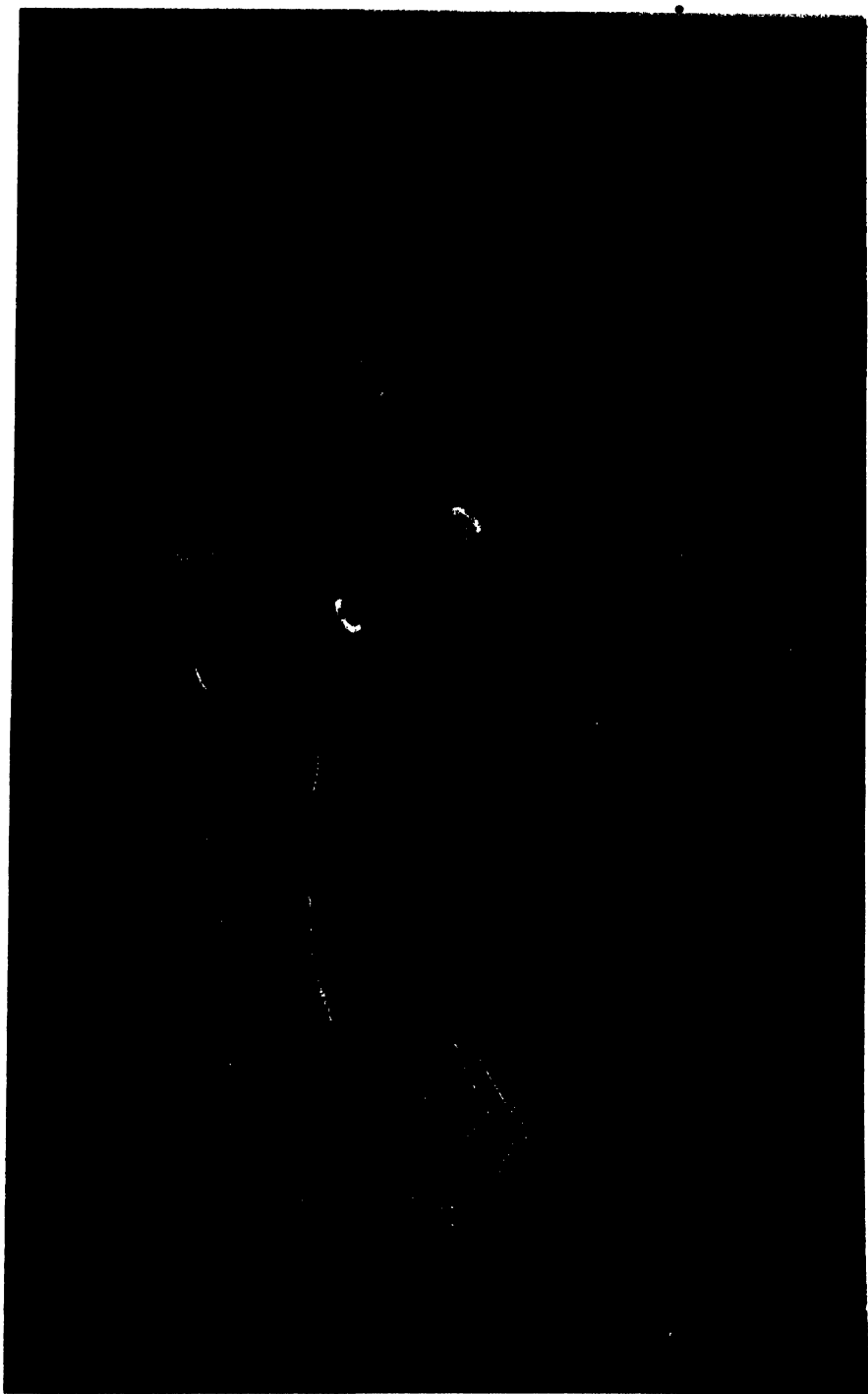
"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।"

মেয়ে—দেশে ঘরে পড়িলে সর্ব্বদা চোখে দেখিতে পাইবে, অসুখ-বিসুখে মেয়ে-জামাই আসিয়া মুখে একটু জল দিতে পারিবে, ইহাই গোলোকের উদ্দেশ্য ছিল। ডোমের মেয়ে হইলেও লখীর রূপের একটু খ্যাতি ছিল, সুতরাং গোলোকের প্রস্তাবে ভোলারও আহ্লাদের সীমা ছিল না। কিন্তু ভোলার মা গোল বাধাইল, ষোল বৎসরের ছেলের ঘাড়ে চৌদ্দ বছরের মেয়েটাকে চাপাইতে রাজি হইল না। কাযেই গোলোককে অন্যত্র কন্যা সম্প্রদান করিতে হইল।

কিন্তু সেই সময় হইতে ভোলা যেন মুসড়িয়া পড়িল। কাযে কর্ম্মে, গানে গল্পে তাহার কেমন যেন একটা বিরক্তি জন্মিল। মা ছেলের বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। এখানে সেখানে দেখিতে দেখিতে বছর দুই কাটিয়া গেল। শেষে এক স্থানে সম্বন্ধ স্থির হইল। ঠিক এই সময়ে লখী স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভোলার নির্জ্জীব প্রাণটা সহসা যেন সজীব হইয়া উঠিল। আবার তাহার গানে পাড়াটা চঞ্চল হইয়া উঠিল, লখীর ঘরে আড্ডা জমাইয়া ভোলা বেশ প্রফুল্লচিত্তেই দিন কাটাইতে লাগিল, সেই সঙ্গে মাতার স্থিরীকৃত বিবাহ-সম্বন্ধে সাফ্ জবাব দিয়া বসিল। মা রাগে দুঃখে তিরস্কার করিল, মাথা কুটিল, ভোলা কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লখীকে নূতন নূতন গল্প ও গান শুনাইতে থাকিল।

২

"লখী, ও লখী, মরেছিস্, না বেঁচে আছিস্?"

ঘরের ভিতর হইতে লখী উত্তর দিল, "বেঁচে আছি রে, বেঁচে আছি; আমি ম'লে তোর মুয়ে নুড়ো জ্বাল্‌বে কে?"

কৃত্রিম রোষগম্ভীর স্বরে ভোলা বলিল, "ইঃ, তুই আমার মুয়ে নুড়ো জ্বাল্‌বার কে বল্ তো? তুই যার মুয়ে নুড়ো জ্বাল্‌বি, সে তো এয়েছিল।"

লখী বলিল, "তুই দেখেছিস্?"

তালপাতার চাটাইখানা টানিয়া লইয়া তায়াতে বসিতে বসিতে ভোলা বলিল, "হুঁ, দেখেছি বৈ কি। আমি তখন কুমোরডাঙ্গায় বড় শিমুলগাছটায় উঠে দুখানা শুক্‌নো কাঠ ভাঙ্‌ছি, দেখি জগা শালা তালপুকুরের পাড় ধ'রে হন্ হন্ ক'রে আস্‌ছে।"

লখী চুপ করিয়া রহিল। ভোলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেনে এয়েছিল, লখী?"

"অনেক দিন এসেনি, তাই একবার দেখ্‌তে এয়েছিল।"

"খাওয়া-দাওয়া ক'রে বুঝি চ'লে গেল?"

"হুঁ।"

"তা তুই এমন সময় ঘরে প'ড়ে কেনে?"

"আমাকে বিরহ নেগেচে।"

ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ পরিহাসের স্বরে ভোলা বলিল, "বিরহ নেগেচে, না উত্তম-মধ্যম খেয়েছিস্?"

স্বরে একটু রুক্ষতা আনিয়া লখী উত্তর দিল, "ইঃ রে, উত্তম-মধ্যম খেলেই হ'লো আর কি! মাত্তে তো পয়সা লাগে না?"

"তোর কিন্তু মার খেতে পয়সা লাগে।"

বলিয়া ভোলা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। লখীর নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না দেখিয়া ভোলা হাস্য-বেগ সংবরণ পূর্ব্বক বলিল, "বাইরে আয় তো দেখি, মার খেয়েছিস্ কি না।"

তর্জ্জন সহকারে লখী বলিল, "আমি মার খেয়ে থাকি খেয়েছি, না খেয়ে থাকি না খেয়েছি, তোর তাতে কি বল্ তো?"

ভোলার পরিহাসহাস্যপ্রদীপ্ত মুখখানা যেন একটু মলিন হইয়া আসিল। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তা মার খাস্ আর নাই খাস্, বাইরে আয় না। সারা দিনটা কি ঘরেই প'ড়ে থাক্‌বি?"

ক্রুদ্ধস্বরে লখী বলিল, "হাঁ, থাক্‌বো, আমার খুসী।"

"তবে থাক্" বলিয়া ভোলা কতকগুলা বাঁশের 'পাত্‌রী' লইয়া চুপড়ী বুনিতে বুনিতে গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরিল—

"ভালো বাসিবে ব'লে ভালো বাসিনে।"

"তোকে কে ভালো বাস্‌তে বলে রে!"

ভোলা মুচ্‌কি হাসিয়া মুখ তুলিয়া গাহিল—

"আমারো স্বভাবো এই—"

"ও কি, লখী, তোর কপালটা যে কেটে গিয়েছে! বাঁ চোখটা ফুলে উঠেছে। এ কি হয়েছে, লখী?"

হাতের চুপড়ী ফেলিয়া ভোলা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লখী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ছেলেটার পিঠের কি দশা হয়েছে দেখেছিস্?"

সর্ব্বনাশ! তিন বছরের কচি ছেলে—তাহার পিঠ যে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে! ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে ভোলা বলিল, "এ্যাঁ, ছেলেটাকেও আধমরা ক'রে গিয়েছে যে, লখী!"

ভোলা জ্বলন্ত চোখ দুইটা তুলিয়া লখীর মুখের দিকে চাহিল। লখী শান্ত করুণস্বরে বলিল, "করেছে তার আর কি করবো, ভোলা; ছেলেরও কপাল, আমারও কপাল!"

দাঁতে দাঁত ঘসিয়া ভোলা বলিল, "ধ্যেৎ তোর কপাল! আমি যদি থাক্‌তাম—"

"তা হ'লে হয় তো একটা খুনোখুনি হয়ে যেতো।"

গর্জ্জন করিয়া ভোলা বলিল, "এবার কিন্তু এমনতর হ'লে শালাকে আমি খুন কর্‌বো।"

একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া লখী বলিল, "মাইরি নাকি, আমি থাক্‌তে নয়।"

"তুই ধ'রে রাখ্‌বি?"

"হাঁ তো।"

ভোলা হতাশভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা হ'লে মার খাওয়া তোর সাধ বল্?"

মাথা নীচু করিয়া অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে লখী বলিল, "মার খাওয়া কারো সাধ নয়, ভোলা, কিন্তু কি কর্‌বো, যার জিনিষ, সে মার্‌লে মাত্তে পারে, কাট্‌লে কাট্‌তে পারে।"

ভ্রূকুটী করিয়া ভোলা বলিল, "ইঃ, মাত্তে পারে! বলে—'ভাতকাপড়ের কেউ নয়, নাক কাট্‌বার গোঁসাই'।'

ম্লান হাসি হাসিয়া লখী বলিল, "ও কথা তোরা বল্‌তে পারিস্, কিন্তু মেয়েমানুষ আমরা—আমাদের বলা চলে না।"

মুখভঙ্গী করিয়া ভোলা বলিল, "তোদের শুধু পরের লাথি হজম করা চলে।"

লখী বলিল, "হজম না ক'রে কি করি বল্।"

ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে ভোলা বলিল, "করবি তোর মাথা-মুণ্ডু ছরাদ। আমি যদি আর কোন দিন তোকে এ কথা বল্‌তে আসি, তবে আমার নাম ভোলা নয়।"

দাঁতে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে ভোলা রোষ-কম্পিতপদে প্রস্থান করিল। লখী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কাযে মন দিল।

৩

সেই দিন রাত্রিতে খাইতে বসিয়া ভোলা মা'কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হ্যাঁদে মা, আমার কি বিয়ে দিবিনি?"

মা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর করিল, "সে কি রে, ভোলা, তোর বিয়ের ভাবনায় আমার যে রেতে ঘুম হয় না।"

ভোলা ভারী মুখে গোঁ গোঁ করিয়া বলিল, "তোর আবার ঘুম হয় না কি রকম? সারা রাত ষাঁড়ের মত তোর এমন নাক ডাকে যে, তার জ্বালায় আমারি ঘুম ধরে না।"

মা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিল, "তা বাছা, বুড়ো মানুষ, সারাদিন খেটে খুটে রেতে একটু হায় ক'রে ঘুমোব না?"

ভোলা বলিল, "তা তুই স্বচ্ছন্দে ঘুমো না। কিন্তু ঘুম হয়নি ব'লে মিছে কথা বলিস্ কেনে?"

ছেলের এই স্পষ্ট উত্তরে মা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই বিয়ে কর্‌বি, ভোলা?"

ঈষৎ রাগতভাবে ভোলা বলিল, "বিয়ে কর্‌বো না তো চেরকাল আইবুড়ো হয়ে থাক্‌বো নাকি? নফরা বলে—আইবুড়ো ছেলে মলে শ্যাওড়াগাছে ভূত হয়ে থাকে।"

মা ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিল, "ষাট্ ষাট্, অমনতর কথা কইতে আছে! আচ্ছা, আমি মেয়ের চেষ্টা দেখ্‌ছি, তুই টাকার যোগাড় কর্।"

"কত টাকা চাই?"

মা হিসাব করিয়া বলিল, "চাই বৈকি, যদি নলপুরের হরি মেটের মেয়েটাই হয়, তা হ'লে সাড়ে তিন গণ্ডা টাকা পণ দিতে হবে, আর মল চারগাছা, চুড়ী আটগাছা—তাতেও কোন্ না তিন গণ্ডা পড়্‌বে। মোটের ওপর ছ' গণ্ডা সাত গণ্ডা টাকা চাই।"

টাকার হিসাব শুনিয়া ভোলা একবার মুখ সিঁট্‌কাইয়া তার পর নীরবে কয়েক গ্রাস অন্ন উদরস্থ করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি বেতের কাযে মজুরীতে যাই, তা হ'লে আট আনা রোজ পাব। তা হ'লে একমাসে পনরো টাকা—দু' মাসেই তো সাড়ে সাত গণ্ডা টাকা হ'তে পারবে।"

মা আহ্লাদে এক্‌গাল হাসিয়া বলিল, "তা খুব হবে। তুই আমার রোজগারী ছেলে, তুই মনে কর্‌লে কি না হয়

বল্ তো? লোকে বলে, ভোলার মা, তোর ভোলা ছেলে একটি বটে। যেমন কষ্ট ক'রে মানুষ করেছিস্—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভোলা বলিল, "তা হ'লে খেয়ে উঠে আমি একবার কালু দাদার সাথে দেখা ক'রে আসি। কাল সকাল থেকেই তার সাথে কাযে যাব।"

পুত্রের এই মতিগতিপরিবর্ত্তনে মায়ের আহ্লাদের সীমা রহিল না; সে রাত্রিতে বিছানায় পড়িয়া ঠাকুরদেবতাকে এত মানত করিল, যাহা ভোলার তিন বৎসরের উপায়েও শোধ হওয়া সম্ভব নয়।

আর ভোলা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যে পয়সা দিয়া পরের মার খায়, তাহার পিণ্ডির যোগাড় করিতে গিয়া সে আর নিজের পিণ্ডির উপায় নষ্ট করিবে না।

পরদিন সকালে উঠিয়া ভোলা মজুরী খাটিতে চলিয়া গেল, এবং সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিয়া মায়ের হাতে আট আনা পয়সা গণিয়া দিল। মা হাসিতে হাসিতে ভোলার যাহাতে দিন দিন সুবুদ্ধি হয়, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

ভোলার চিত্তের দৃঢ়তা ছিল; দুই তিন দিন সে লখীর ঘরের দিকে একেবারেই গেল না। কিন্তু চতুর্থ দিনে ফিরিবার সময়—তাহার এই রাগে বা অনুপস্থিতিতে লখী কতটা দুঃখিত হইয়াছে, তাহা জানিয়া মনে মনে গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিবার জন্য লখীর ঘরে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আনন্দ একটুও হইল না, বরং নিজের এই অস্বাভাবিক রাগের জন্য মনে মনে সে আপনাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কাল হইতে লখীর খাওয়া হয় নাই বলিলেই চলে। পরশু যে কায হইয়াছিল, তাহাতে সে কাল পাঁচ পয়সা মাত্র পাইয়াছে এবং সেই পাঁচ পয়সার চাউলে কষ্টেসৃষ্টে এক বেলা চলিয়াছে। কাল বিকালে আবার একটু জ্বরভাব হওয়ায় কাল মোটেই কায হয় নাই, সুতরাং আজ একেবারে উপবাস। ছি ছি, ভোলা রাগের মাথায় করিয়াছে কি? ভাগ্যে সে আজ খোঁজ লইতে আসিল, নতুবা—ভোলা ছুটিয়া গিয়া চারি আনার চাউল কিনিয়া দিয়া ঘরে ফিরিল।

মা চারি আনা পয়সা পাইয়া বাকী চারি আনা কি হইল জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে ভোলা লখীর উপবাসের কথা বলিল। শুনিয়া মা ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল, "এমন ক'রে মজুরীর পয়সা বিলিয়ে দিলে বিয়ের টাকা কদ্দিনে হবে?"

ঈষৎ রাগতভাবে ভোলা বলিল, "যদ্দিনে হয় হবে, ছ' মাসে হ'তো, না হয়, ছ'মাসে হবে। বিয়ে দু মাস পরে হলেও চলবে, কিন্তু মেয়েমানুষটা দু'দিন না খেতে পেলে মারা যাবে যে!"

ইহার উত্তরে মা আর কিছু বলিতে পারিল না। ভোলাও সেই দিন হইতে কোন দিন মজুরীর অর্দ্ধেক, কোন দিন বা তাহারও বেশী দিয়া লখীর উপবাস নিবারণ করিতে লাগিল।

৪

"লখি!"

"কেনে, ভোলা?"

"জগা আজ আবার এসেছিল না?"

"কে তোকে বল্লে?"

"আমার সাম্‌নে দিয়ে যে এলো।"

"তবে আবার জিজ্ঞেস্ কচ্চিস্ কেনে?"

"জিজ্ঞেস্ কচ্ছি এই জন্যে যে, আজ আবার মার খেয়েছিস্?"

লখী একটু গম্ভীর স্বরে বলিল, "সে এলেই বুঝি আমাকে মার খেতে হয়?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া ভোলা বলিল, "তা নয় তো সে কি চিঁড়ে মুড়কী খাওয়াতে আসে?"

ভারী মুখে লখী বলিল, "যাই খাওয়াতে আসুক, তোর সে খোঁজে দরকার কি?"

ভোলা বলিল, "দরকার কিছু নেই, তবে জিজ্ঞেস্ করি, কদ্দিন এ রকম মার খাবি?"

"যদ্দিন পারি।"

"তবু মার খেতে হবে?"

"উপায় কি?"

"উপায় ঢের আছে।"

"কি উপায় আছে শুনি।"

ভোলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া, মাথাটা একবার চুল্‌কাইয়া বলিল, "আমাদের জাতে সাঙা আছে জানিস্ তো?"

লখী তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উত্তর দিল, "খুব জানি।"

"জগা শালাকে ছেড়ে দিয়ে আর এক জনকে সাঙা কর্‌লেই পারিস্।"

"যাকে সাঙা কর্‌বো, সেও যদি মারে?"

"সবাই জগা মাঝির মত মাতাল নয়।"

"সাধুও তো তেমন দেখ্‌তে পাই না।"

জোর গলায় ভোলা বলিল, "অনেক আছে।"

লখী মৃদু হাসিয়া বলিল,"অনেকের মধ্যে তো এক জনকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

আগ্রহে ভোলা জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে দেখ্‌ছিস্?"

"তোকে।"

যেন একটা তীব্র বিদ্যুতের আঘাতে ভোলার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। লখী স্থির দৃষ্টিতে তাহার আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে সাঙা কর্‌বার ইচ্ছে তোর খুব আছে, না ভোলা?"

আবেগকম্পিত কণ্ঠে ভোলা বলিল, "খুব আছে, লখী, খুব আছে।"

"তাই বুঝি তুই মজুরীর পয়সাগুলো আমাকে দিয়ে যাস্?"

লখীর সে বজ্র-কঠোর স্বরে ভোলা চমকিয়া উঠিল; মুখ তুলিয়া দেখিল, লখীর চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছে। ভয়ে ভোলার মুখ শুকাইয়া গেল; লখীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, শুধু হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভোলা চারি আনা পয়সা লখীকে দিয়াছিল; সে পয়সা লখীর সম্মুখেই পড়িয়া ছিল। লখী সেই পয়সাগুলা তুলিয়া লইল, এবং সেগুলা ভোলার গায়ের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমি না জেনে তোর পয়সা খেয়েছি—ঝকমারি করেছি। কিন্তু এবার যদি তুই আমাকে একটা পয়সা দিতে আসিস্, তা হ'লে—তা হ'লে ভাল হবে না তা ব'লে দিচ্ছি।"

ভোলা কম্পিত হস্তে পয়সাগুলা কুড়াইয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। লখী সশব্দে ঘরের আগড় বন্ধ করিয়া দিল।

৫

ঘরে ফিরিয়া ভোলা মায়ের হাতে পয়সা দিলে মা পয়সা গণিয়া একটু আশ্চর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যে ভর্ত্তি আট আনাই এনেছিস্ রে ভোলা।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভোলা বলিল, "ভর্ত্তি আন্‌বো না তো রাস্তায় কতক ফেলে দিয়ে আস্‌বো নাকি?"

মা বলিল, "পয়সা কি ফেলে দিয়ে আস্‌তে হয় রে বাছা, তবে রোজ যদি এম্‌নি ক'রে ভর্ত্তি মজুরী নিয়ে আসিস্, তা হ'লে ভাবনা কিসের?"

উচ্চস্বরে ভোলা বলিল, "হাঁ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজ এম্‌নি পয়সা এনে দিতে পার্‌লে তোমার খুব আমোদ হয়, তা জানি। কিন্তু সেটি হচ্ছে না, কাল থেকে আর আমি খাট্‌তে যেতে পার্‌বো না।"

মা বুঝিল, ভোলাকে আবার কুড়েমীতে পাইয়াছে। সুতরাং সে বিষণ্ণভাবে ছেলেকে বুঝাইয়া বলিল, "তা বাছা, খেটে আমার আর কি কর্‌বি বল্। আমি অনেক আশা ক'রে তোকে মানুষ করেছি, কিন্তু তুই তো মানুষ হলি না। সে আমার কপাল! তবে এখন পয়সা আন্‌তে পারিস্, তোরি বিয়ে থা হবে, সংসারী হয়ে তুই নিজেই সুখী হবি।"

মুখভঙ্গী করিয়া ভোলা বলিল, "সুখ ব'লে সুখ! খেটে পয়সা এনে আর এক জনের পায়ে ঢেলে দেব! সেটি ভোলার দ্বারায় হবে না, ভোলা এত বোকা নয়। বিয়ে আমি কচ্ছি না।"

রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে ভোলা তামাক সাজিয়া লইয়া ফাঁকে গিয়া বসিল।

নিদাঘের উষ্ণ সন্ধ্যাকে শীতল করিয়া দক্ষিণা বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল; সম্মুখের আমগাছের পাতার ভিতর হইতে একটা কোকিল প্রাণপণ চীৎকারে ডাকিতে-ছিল—কু-উ, কু-উ। ভোলা হুঁকায় মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"ভালো বাসিবে ব'লে ভালো বাসিনে।"

৬

পরদিন ভোলা সত্যই কাযে গেল না, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দুপুর পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিল। মধ্যাহ্নে সে স্নানাহারের জন্য যখন ঘরে ফিরিতেছিল, তখন দেখিল, লখী ছেলে কোলে করিয়া দুইটা চুপড়ী ও একটা ধুচুনী লইয়া শাপুরের হাটের দিকে চলিয়াছে। ভোলা বুঝিতে পারিল, এই ধুচুনী চুপড়ী কয়টা বেচিতে পারিলে আজ লখীর অন্নসংস্থান হইবে। কিন্তু এই তিনটা জিনিষ বেচিয়া সে কতই বা পাইবে? বড়

ক্ষোর ছয়টা কি সাতটা পয়সা। তাহাতে তো এক বেলাও চলিবে না। তার পর এই ছুপুরের রোদে এক ক্রোশ মাঠ ভাঙ্গিয়া লখী কোন্ সাহসে হাটে চলিয়াছে? ভোলার ইচ্ছা হইল, লখীকে ডাকিয়া হাটে যাইতে বারণ করে। কিন্তু হাটে না গেলে—এই জিনিষ কয়টা বিক্রী না হইলে সে খাইবে কি? খাইবার ভাবনা ছিল না, যদি লখী,—দূর হোক্, ভোলা তাড়াতাড়ি সে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং দাঁতে জিভ চাপিয়া ধরিয়া নিজের ঘরের দিকে ছুটিল।

ভোলা সেদিন সারা ছুপুরটা বড়ই অস্থিরচিত্তে কাটাইল; খাইতে বসিয়া ভাল খাইতে পারিল না। মা জিজ্ঞাসা করিল, "এত ভাত প'ড়ে রইলো যে ভোলা?"

বিরক্তি সহকারে ভোলা উত্তর করিল, "কি দিয়ে ভাত-গুলো গিল্‌বো? তোর মাথা দিয়ে? শুধু সজ্‌নেশাক দিয়ে বুঝি ভাত গেলা যায়?"

মা বলিল, "তা আমি কি কর্‌বো বাছা, বুড়ো মানুষ—আমি কোথায় কি পাব? ভাল মাছ তরকারী এনে দাও, আমি তৈরী ক'রে দিতে পারি।"

ভাতের থালাটা আগের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ভোলা বলিল, "আচ্ছা, ভাল মাছ আন্‌তে পারি তো ভাত খাব; নৈলে এই রইলো তোর ভাত।"

ভোলা হাত-মুখ ধুইয়া, ছিপ হাতে লইয়া মাঠপুকুরের ধারে গিয়া বসিল। প্রচণ্ড রৌদ্রে ছায়াবিহীন শস্যশূন্য মাঠটা যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। ভোলা দৃষ্টিটাকে যতদূর পারিল বিস্ফারিত করিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। মাঠে কেহ কোথাও নাই, শুধু আগুনের হল্কার মত প্রখর সূর্য্যকিরণে মাঠটা যেন চক্‌চক্ করিতেছে। চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টি যখন ক্লান্ত হইয়া আসিল, তখন ভোলা চোখ দুইটাকে ফিরাইয়া লইয়া ফাৎনার উপর স্থাপন করিল।

দৃষ্টি কিন্তু ঠিক ফাৎনার উপর নিবদ্ধ রহিল না, থাকিয়া থাকিয়া তাহা রৌদ্রদগ্ধ মাঠের দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উঃ, কি রোদ! এই রোদে মাঠ পার হওয়া,—যেমন আমার উপর রাগ করিয়া—আমার পয়সা খাইবে না বলিয়া নিজে পয়সার চেষ্টায় গিয়াছে, এই রোদে তেমনই শাস্তি পাইবে, এই রোদে আধপোড়া হইয়া যাইবে, অহঙ্কারের উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে। কৈ, এখনও ফিরিল না! ফিরিবার সময় এখনও হয় নাই। যাঃ, ফাৎনাটা যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে!

ভোলা তাড়াতাড়ি ছিপ ধরিয়া টান মারিল, কিন্তু মাছ উঠিল না, মাছ তখন বঁড়শী ছাড়িয়া সরিয়া গিয়াছে। এঃ, মস্ত মাছটাই বঁড়শী ধরিয়াছিল, আর একটু আগে টানিতে পারিলে মাছটা কি যায়! ভোলা পুনরায় বঁড়শীতে 'চার' গাথিয়া ফেলিল, এবং অনন্যদৃষ্টি হইয়া ফাৎনার দিকে চাহিয়া রহিল। নাঃ, মাছটা সরিয়া গিয়াছে। রোদটাও বড় খর, মাথা যেন জ্বলিয়া যাইতেছে। ভোলা ছিপটাকে জলে পোঁতা কঞ্চির উপর স্থাপন করিয়া পাড়ের উপর উঠিল, এবং বড় অশ্বত্থ গাছটার ছায়ায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। দৃষ্টিটা কিন্তু মাঠের উপর নিবদ্ধ রহিল।

বেলা অনেকটা পড়িয়া আসিয়াছে। এইবার বোধ হয় ফিরিবে। ঐ না মাঠের ওপারে কালো মত কি একটা দেখা যাইতেছে? লখীই বোধ হয় ফিরিয়া আসিতেছে। আমি এখানেই থাকিব, না চলিয়া যাইব? বসিয়া থাকিলে যদি মনে করে, তাহার অপেক্ষাতেই আমি এখানে বসিয়া রহিয়াছি? ওঃ, ভারী তো লখী, তাহার অপেক্ষায় আমি বসিয়া থাকিব! না, চলিয়া যাইব না; লখীর ভয়ে পলাইয়া যাইব, ধিক্ আমাকে! না, এইখানেই বসিয়া থাকিয়া, তাহাকে দেখাইব, তাহার রাগে আমার কিছুমাত্র দুঃখ-কষ্ট নাই; নাই বলিয়াই আমোদ করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছি। কৈ, যে আসিতেছিল, সে কোথায় গেল? দূর হউক, ও যে একটা কালো গরু। ছিপের ফাৎনাটা নড়িতেছে না? ভোলা ব্যস্তভাবে উঠিয়া ছিপের কাছে গিয়া বসিল।

এমনই করিয়া একবার ছিপের দিকে, আরবার মাঠের দিকে চাহিতে চাহিতে বেলা শেষ হইয়া আসিল, তপ্ত সূর্য্য মাঠের উপর স্নিগ্ধ রক্তরশ্মি ছড়াইতে ছড়াইতে পাটে বসিল। ভোলা পায়ের কাছে ছিপ ফেলিয়া রাখিয়া উদ্বেগচঞ্চল দৃষ্টিতে মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। এ কি, সন্ধ্যা হয়, এখনও ফিরিল না কেন? কোথায় রহিল? হাটে থাকিবার যায়গা বা কোথায়? তবে কি কোন বিপদে পড়িল? এই রোদে সর্দ্দি-গর্ম্মি হইল না তো? ঐ যে কে আসে। লখীই বটে, ঐ যে কোলে ছেলে! আমার এ ভাবে চাহিয়া থাকা ঠিক নয়।

ভোলা ছিপটাকে তুলিয়া পুনরায় ভাল করিয়া ফেলিল। না, মাছগুলা আজ বড় ফাঁকি দিয়াই গেল। আজ আর কিছু হইবে না। কৈ, লখী কত দূরে? দূর ছাই, ও যে একটা পুরুষ মানুষ, কাঁধে ছেলে নয়—মোট। ভোলার

আশা-প্রফুল্ল মুখখানা নৈরাশ্যে, বিষাদে অন্ধকার হইয়া আসিল।

সূর্য্য ডুবিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে মাঠ ঢাকিয়া গেল, আকাশে সারি সারি তারা ফুটিল, অশ্বত্থ গাছের ডালে পেঁচা ডাকিয়া উঠিল। ভোলা ছিপ গুটাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিল।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভোলা ঘুরিয়া একবার লখীর ঘরে গেল। উদ্দেশ্য, লখী অন্য কোন পথে ফিরিয়াছে কি না। কিন্তু তাহার ঘরে আগড় বন্ধ দেখিয়া, ভোলার বুকটা যেন দমিয়া গেল। খানিক এদিকে ওদিকে চাহিয়া সাহসে ভর করিয়া সে ডাকিল, "লখি!"

কেহই উত্তর দিল না। ভোলা পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "লখি! লখি!"

এবার উত্তরে একটা পেঁচা বিকট শব্দে ডাকিল। ভোলা শঙ্কাকম্পিত পদে সে স্থান ত্যাগ করিল। সে রাত্রিটা কোনরূপে কাটাইয়া পরদিন সকালে উঠিয়াই শাপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভোলা ফিরিয়া আসিয়া মা'কে জানাইল, পোড়ারমুখী লখীর কিছুমাত্র লজ্জা বা ঘৃণা নাই; এত মার খাইয়াও সে হাটে যাইবার অছিলা করিয়া আবার জগার ঘর করিতে গিয়াছে।

মা তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিল, "চুলোয় যাক্ সে! 'পরের বেরাল খায়, বন পানে চায়'—তুই আপনার বিয়ে থা ক'রে ঘরসংসার কর্।"

ভোলা এবার সাগ্রহে মায়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিল। মা তখন মেয়ের চেষ্টা দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিল। ভোলা মহাজন হৃদয় পালের হাতচিঠাতে সহি দিয়া পাঁচগণ্ডা টাকা সংগ্রহ করিল।

৭

বিবাহের পূর্ব্বদিনে ভোলা কুটুম্ব-নিমন্ত্রণের জন্য শাপুরে গিয়াছিল। সেখানে গিয়া শুনিল, জগা মাঝি কাল রাত্রিতে তাহার স্ত্রীকে এমন মারিয়াছে যে, মারের চোটে মেয়েটা মর-মর হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়া ভোলা ছুটিতে ছুটিতে জগা মাঝির গৃহে উপস্থিত হইল, এবং লখীর অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তাহার সঙ্গে পাড়ার আরও পাঁচ জন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা পরামর্শ দিল, মেয়েটাকে সরকারী হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া উচিত, নতুবা উহার বাঁচিবার আশা নাই। ভোলা ডুলী ভাড়া করিয়া লখীকে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী সরকারী হাঁসপাতালে লইয়া গেল।

লখীকে শুধু হাঁসপাতালে দিয়াই ভোলা নিরস্ত হইল না, জগাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য তাহার নামে স্ত্রীকে অবৈধ প্রহার করার অপরাধে মামলা রুজু করিয়া দিল। লখী শুনিয়া বলিল, "মামলা রুজু কর্‌লি, কিন্তু মামলা কত্তে টাকা কোথায় পাব, ভোলা?"

ভোলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত বলিল, "যত টাকা লাগে, আমি দেব।"

বিবাহ মুলতুবী রহিল, ভোলা মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইল।

মোকর্দ্দমার দিনে ভোলা সাক্ষীসাবুদ লইয়া আদালতে উপস্থিত হইল। লখী সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, সে-ও হাজির হইল। হাকিম সাক্ষ্যপ্রমাণ লইয়া জগা মাঝির দশ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিলেন; অনাদায়ে এক মাস সশ্রম কারাবাস। জগার টাকা দিবার ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং আদালতের পেয়াদা আসিয়া জগার হাত ধরিল। জগা কাঁদিতে কাঁদিতে লখীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমাকে বাচা, লখি!"

লখী ভোলার সঙ্গে আদালত হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, স্বামীর কাতর আহ্বানে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। ভোলা জিজ্ঞাসা করিল, "দাঁড়ালি যে, লখি?"

লখী বলিল, "ওকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই, ভোলা?"

ভোলা বলিল, "জরিমানার টাকা দিলেই বাঁচ্‌তে পারে।"

লখী বলিল, "তবে দশটা টাকা আমাকে দে।"

ভ্রূকুটী করিয়া ভোলা বলিল, "টাকা আমি কোথায় পাব?"

লখী তাহার পা দুইটা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যেখানে পাস্, দশটা টাকা আমায় দে। আমি তোর কেনা বাঁদী হয়ে থাক্‌বো, তুই যা বল্‌বি, তাই শুন্‌বো।"

ভোলা তাহার মুখের উপর অলস্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "শুন্‌বি আমার কথা?"

"শুন্‌বো।"

"যদি বলি, আমাকে সাঙা কত্তে হবে?"

"তাই কর্‌বো।"

"কর্‌বি ?"

"হাঁ।"

মামলার খরচের জন্ম ভোলা টাকা সঙ্গে আনিয়াছিল, কোঁচার খুঁট হইতে দশটা টাকা খুলিয়া লখীর হাতে দিল।

জগা খালাস পাইয়া ভোলাকে গাল দিতে দিতে প্রস্থান করিল। লখী ভোলার সঙ্গে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া ভোলা লখীকে বলিল, "তুই এবার তোর নিজের ঘরে যা, লখী। কিন্তু এবার যদি জগা শালার ঘরে যাবি—"

লখী বলিল, "তার ঘরে যাব আর কিসের লেগে? তোকে সাঙা কর্‌লে—"

বাধা দিয়া জোর গলায় ভোলা বলিল, "সাঙা কত্তে আমি চাই না। কিন্তু খবরদার, আর যদি কখন জগার কাছে যাবি, তা হ'লে তোরি এক দিন, কি আমারি এক দিন। নিজের কথা ঠিক রাখিস্।"

লখী অতিমাত্র বিস্ময়ে হাঁ করিয়া ভোলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মা বলিল, "হাঁ রে ভোলা, বিয়েও কর্‌লি না, আর মিছে পাঁচ গণ্ডা টাকার দেনদার হ'লি ?"

উচ্চ হাসি হাসিয়া ভোলা বলিল, "কুচ্ পরোয়া নেই মা, দুটো মাস মন দিয়ে খাটলে অমন তিন পাঁচ গণ্ডা টাকা শোধ ক'রে দেব।"

ভোলা হুঁকা হাতে হাসিতে হাসিতে বাহিরে গিয়া আম-গাছের তলায় বসিয়া হুঁকায় টান দিতে দিতে গান ধরিল,—

"ভালো বাসিবে ব'লে ভালো বাসিনে।
আমারো স্বভাবো এই তোমা বই আর জানিনে।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভাঙ্গানো বাগান।

১

আমবাগান আজ ভাঙ্গিয়ে দেবে,
আগ্‌লানো আজ শেষ।
কাঁদ্‌ছি কেন? সাঙ্গ হ'বে
রাত-জাগা ও ক্লেশ।
এই যে সজাগ নেত্র দু'টি,
বেশ ত পা'বে আজকে ছুটী,
বাগান থেকে ঘর যাবো আজ
বিদেশ থেকে দেশ।

২

প্রথম যখন এই বাগানে
রচি কুটীরখান,
তখন ছিল বাগানভরা
আম-মুকুলের ঘ্রাণ;
কচি আমের দোলনা দোলে
শ্যামল পাতার ঝালর ঝোলে
কণ্ঠে কণ্ঠে পিক পাপিয়ার
আনন্দ-তুফান।

৩

কাল বুলাল রঙের তুলি
ধর্‌লো যখন পাক
গাছে গাছে শোভার থাকে
নিমন্ত্রণের ডাক।
শাখায় শাখায় রঙের মেলা,
ছায়ায় ছায়ায় ছেলের খেলা,
ভুল্‌ত না পথ ভ্রমর এবং
প্রজাপতির ঝাঁক।

৪

গাছগুলি আজ দাঁড়িয়ে আছে
রিক্ত করতল,
বিশ্বপিতার দানের শেষে
শূন্য—নিঃসম্বল।
তাদের দানে পূর্ণ থলি,
ভিখারী আজ যায় যে চলি,
কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ ব্যথায়
অন্তর বিকল।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আয়র্লণ্ডের প্রকৃত অবস্থা।

১

মুক্তিমুমুক্ষু আয়র্লণ্ডের প্রকৃত অবস্থা এখন কিরূপ, সে সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা বিবিধ সংবাদপত্রের মারফতে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। পরস্পর-বিরোধী সংবাদ পাঠে প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্যও নহে। বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমানে আয়র্লণ্ডের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেকের ধারণাই ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'ম্যাক্লুরস্' মাসিক পত্রের সম্পাদক এস্, এস্, ম্যাক্লুর আয়র্লণ্ডের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি কিছুই লিখেন নাই। তাঁহার জন্মভূমি আয়র্লণ্ড। এখন তিনি আমেরিকা-প্রবাসী। বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং আয়র্লণ্ডে গিয়া 'সরেজমিন' তদন্ত করিয়া আলোচ্য প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। দীর্ঘ ছয় মাসকাল তিনি আয়র্লণ্ডে ছিলেন। সেই সময় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়র্লণ্ডের যাবতীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। গত দুই তিন বৎসর ধরিয়া আয়র্লণ্ডে যে প্রবল গৃহবিবাদ চলিয়াছে এবং তাহার ফলে বর্ত্তমানে তাহার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে,সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই আলোচনা করেন নাই; কারণ,তাঁহার মতে এই অবস্থা অচিরস্থায়ী সুতরাং সে বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে, আয়র্লণ্ডের স্থায়ী ও প্রকৃত অবস্থার কথা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না। তিনি স্থায়ী অবস্থা সম্বন্ধেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়র্লণ্ডের যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন :—

(১) আইরিশগণ স্বাধীন জাতি। আয়র্লণ্ড যুক্তসাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট রাজ্য। কংগ্রেসে যেমন নিউইয়র্ক রাজ্যের প্রতিনিধি আছেন, সেইরূপ আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধিও বৃটিশ পার্লামেণ্টে স্থান পাইয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে আয়র্লণ্ডের বিশেষ সৌভাগ্যের কথা এই যে, ইংরাজের ন্যায় আইরিশগণও শতকরা ৬০ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার সম্ভোগ করিতেছিলেন।

(২) আইরিশগণ উন্নতিশীল জাতি।

সম্পাদক মহাশয় জনৈক মার্কিণ ভদ্রলোকের সমভিব্যাহারে সমগ্র আয়র্লণ্ড পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই মার্কিণ ভদ্রলোকটিও কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ। তিনি আইওয়াতে যৌবনের অধিকাংশকাল কৃষিকার্য্য লইয়া পড়িয়া ছিলেন, ম্যাক্লুরও ইণ্ডিয়ানা ও ইলিনয়ে কৃষিবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কাযেই এই যুগল পর্য্যটক, মার্কিণ কৃষিজীবীর দৃষ্টিতেই আয়র্লণ্ডের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। আয়র্লণ্ডের অতুল কৃষি-সম্পদ দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ানা ও আইওয়ার মতই শস্য-সম্ভারপূর্ণ সুবৃহৎ গোলাবাড়ীসমূহ আয়র্লণ্ডের অঙ্গ সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে। উৎকৃষ্ট জাতীয়, সুস্থ, সবল গৃহপালিত গো-মেষাদি পশু দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হয়েন। কৃষককুলের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য, দেহের স্বাস্থ্যপূর্ণ অবস্থা,মুখে পরিতৃপ্তির আনন্দ দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার মতে য়ুরোপের সর্ব্ববিধ্বংসী মহাসমরের সময় এক আয়র্লণ্ড ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও খাদ্যদ্রব্যের এত প্রাচুর্য্য তিনি দেখেন নাই। পৃথিবীর আর কোনও দেশের অধিবাসী, এক পুরুষের চেষ্টায় এমন উন্নতিসাধন করিতে পারিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

লেখক সমগ্র আয়র্লণ্ডের বিবরণ সংগ্রহের পর আলোচনা করিয়া দেখাইতেছেন যে, দরিদ্র আইরিশগণের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। আয়র্লণ্ডের অবস্থা এ সম্বন্ধে নিউইয়র্ক অপেক্ষাও উন্নত। পরের সাহায্যে আইরিশগণ এখন আর জীবনধারণ করিতে বড় একটা চাহিতেছে না। সকলেই পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জনে রত। "দরিদ্র নিবাসে" ক্রমেই সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে।

অনেকে বলেন যে, আয়র্লণ্ড স্বায়ত্ত-শাসনলাভের পর করভারে প্রপীড়িত, অর্থনীতিক চাপে তাহার কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত; ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নানাবিধ উন্নতিকর ব্যাপারে আইরিশদিগের অবস্থা বর্ত্তমানে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েলসের অধিবাসীদিগের অবস্থা অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ সকল বিষয়েই আয়র্লণ্ড অবনতির পথে চলিয়াছে, এই ভ্রান্তধারণা দূরীভূত করিবার জন্য লেখক বহু যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন।

তিনি বলেন, "এ বিষয়ে আমার প্রথম সাক্ষী জন্ রেডমণ্ড। তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমি তাঁহার এক জন ভক্ত। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 'ম্যাক্লুরস্' পত্রে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। আয়র্লণ্ডের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁহার নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি এক জন সাধক রাজনীতিক ছিলেন। রেডমণ্ডের উক্তি আমি এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—'পার্ণেলকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, সম্মিলিত জাতীয়দলের প্রতিনিধির স্বরূপ তিনি মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত-শাসন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া, মীমাংসায় অগ্রসর হইবেন কি না? তখন উত্তরে পার্ণেল বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের নিকট হইতে যাহা কিছু আদায় করিতে পারা যায়, তাহাতেই আয়র্লণ্ডের শক্তিবৃদ্ধি হইবে, এ নীতিতে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস আছে। কিন্তু সেখানেই তিনি নিরস্ত হইতে চাহেন না। কিছু আদায়ের পর আবার বেশী করিয়া আদায় করিবার চেষ্টা করিতে থাকিবেন। গ্লাডষ্টোনের প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লইয়া আপাততঃ তিনি মীমাংসা করিবেন। কিন্তু তাহাতেই জাতীয়দলের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইবে না। স্বায়ত্ত-শাসন লাভই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য নহে। কোনও জাতির অগ্রগতিকে সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার কাহারও নাই। রেডমণ্ড, পার্ণেলের এই উক্তিই তাঁহার জীবনের ধ্রুবমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন'।"

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর তারিখে মেসাচুসেটস্এর উরষ্টার নগরে বক্তৃতাপ্রদানকালে মিঃ রেডমণ্ড বলিয়াছিলেন, "আমাদের উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিব, আমাদের দেশকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করাই আমাদের চরম লক্ষ্য।"

বিগত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে অবস্থানকালে 'হেরাল্ড' পত্রের কোনও প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি সেই প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন, "আয়র্লণ্ড স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করিতে চাহে। নিজের দেশকে তাহারা নিজেই শাসন করিবে। আয়র্লণ্ড অবশ্যই তাহা পাইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য যে প্রণালীতে শাসন-কার্য্য চালাইতেছেন, আয়র্লণ্ডেও সেই নীতি অনুসৃত হইবে।"

মিঃ রেডমণ্ড, 'ম্যাক্লুরস্' পত্রে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায়, গ্রেটবৃটেন ও বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সহিত আয়র্লণ্ডের সংস্রব-সংক্রান্ত একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের কোন কোন স্থান হইতে লেখক মহাশয় তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ইম্পিরিয়াল পার্লামেণ্টের" প্রাধান্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, এই উদ্ধৃতাংশ পাঠে তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে।—

"আমি ইম্পিরিয়াল পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বলিতে এই বুঝিয়াছি যে, আলোচ্য বিলের দ্বারা আইরিশগণের উপর যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, যদি কোনও কারণে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার তাঁহারা করেন, তখন ইম্পিরিয়াল পার্লামেণ্ট তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন। কিন্তু জাতীয় দল যখন এই বিল শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন না। আইরিশদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ আমরাও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আইরিশগণ কখনই তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে না। আমরা যথাশক্তি এ বিষয়ে অবহিত থাকিব। যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়, সে দিকে আমাদের সমগ্র শক্তিও প্রয়োগ করিব।"

পরিশেষে তিনি স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছিলেন যে, আয়র্লণ্ডের দিক দিয়াই তিনি প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন।

"এ প্রশ্নের মীমাংসার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আলোচ্য বিলে যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, তাহাতেই এ প্রশ্নের চরম মীমাংসা সম্ভবপর। আমারও বিশ্বাস, আইরিশগণ ইহাতে প্রতিবাদ করিবে না।

"অর্থাৎ আমরা স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট চাহি। ইম্পিরিয়াল পার্লামেণ্টের নূতন বিধানবলে কার্য্যকরী সমিতির দায়িত্বেই আইরিশ পার্লামেণ্টের কার্য্য চলিবে। ভূমি, শিক্ষা, দেশশাসন, শ্রমজীবী, কৃষি-বাণিজ্য, স্থানীয় কর, আইন, বিচার, পুলিস প্রভৃতি আয়র্লণ্ডের যাবতীয় ব্যাপারে আইরিশ পার্লামেণ্টের এই কার্য্যকরী সমিতিই দায়ী থাকিবেন। ইম্পিরিয়াল পার্লামেণ্ট শুধু সৈন্য, রণতরী, পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত বিষয় ও শুল্ক প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিবেন। অবশ্য সে পার্লামেণ্টেও আইরিশ প্রতিনিধি থাকিবেন, তবে সংখ্যায় অল্প। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানের প্রাদেশিক ব্যাপারে ইম্পিরিয়াল পার্লামেণ্টের যে প্রকার স্বামিত্ব-ক্ষমতা আছে, আয়র্লণ্ডের উল্লিখিত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের তদনুরূপ ক্ষমতা অবশ্য থাকিবে।"

এক শত বা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সম্বন্ধে যে সকল অন্যায় আচরিত হইয়াছিল, লেখক সে সকলের উল্লেখ করিয়া প্রমাণস্বরূপ মিঃ রেডমণ্ডের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ওয়েক্সফোর্ড স্বেচ্ছাসেবক সেনাদলকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—

"আমাদিগকে এখন বিচারবুদ্ধি ও সত্যবাদিতার পরিচয় দিতে হইবে। আমাদিগকে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের সময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি, আমরা এখন স্বাধীন জাতি। কৃষিব্যবসায়ীদিগকে আমরা অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তি দিয়াছি; কৃষক শ্রমজীবীদিগের বসবাসের সুব্যবস্থা করিয়াছি; আমরা দেশশাসনের অধিকার অর্জ্জন করিয়াছি; ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমরা এখন স্বাধীন। বিনাব্যয়ে শিক্ষা-বিস্তার করিবার ব্যবস্থাও আমাদের দেশে হইয়াছে। আইরিশ ভাষা—আমাদের মাতৃভাষা—এখন বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইয়াছে। যাহারা জমী চাষ করে, তাহাদিগকে আমরা জমীর স্বামিত্ব প্রদান করিয়াছি। জাতীয় উন্নতি-বিধানের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে আমাদের দেশে পার্লামেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ কার্য্যকরী সমিতি উহার কর্ণধার।"

'সিন্‌ফিন্' পত্রের সম্পাদক আর্থার গ্রিফিথ।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমানেই আয়র্লণ্ডের অবস্থা উন্নত হইয়াছে, অথবা যুদ্ধের সময় উহার অবস্থা ভাল হইয়াছিল; কিন্তু মিঃ রেডমণ্ডের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, যুদ্ধের পূর্ব্বেই আয়র্লণ্ড সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। পরে বা সেই সময়ে নহে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখের 'কর্ক-একজামিনার' পত্র হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে—

"আয়র্লণ্ডের উন্নতি সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানাভাবে এমন কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন যে, তাহাতে অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, আয়র্লণ্ডেরও বহু ব্যক্তির মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতেই আয়র্লণ্ড প্রথম উন্নতিলাভ করিতেছে। এই সময় হইতেই না কি আয়র্লণ্ডের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারে এত অধিক সঞ্চয় হইয়াছে যে, পাঁচ বৎসরেরও ন্যূনাধিক সময়ের মধ্যে আয়র্লণ্ড য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী দেশের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে।

"কিন্তু আমরা বলিতেছি যে, এ ধারণা প্রকৃত নহে। যুদ্ধের ফলে আয়র্লণ্ডের অবস্থান্তর ঘটে নাই। যে দিন হইতে ভূমিসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হইয়াছে, ভূস্বামীর বর্দ্ধিত হারে খাজানার দায় হইতে যে দিন কৃষককুল অব্যাহতি লাভ করিয়া জমীর মালিক হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হইতেই আয়র্লণ্ডের উন্নতির বাহ্যবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষককুল যে দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, জমীর উন্নতি হইলে তাহার ফলভাগী তাহারাই থাকিবে, তাহাদের অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, জমী ভূস্বামীর অধিকারে ফিরিয়া যাইবে না, তখন হইতেই তাহারা জমীর উৎকর্ষ-সাধনের জন্য আত্মবিনিয়োগ করিয়াছিল, তখন হইতেই জমীর উৎপাদিকা শক্তিও বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। উহা যুদ্ধের পূর্ব্বের ঘটনা, তখন হইতেই আয়র্লণ্ডের উন্নতির সূত্রপাত হয়।"

বিগত ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে 'সিন্‌ফিন্' পত্রে মিঃ আর্থার গ্রিফিথ্, ফাদার কলিন্সের একটি বক্তৃতা মুদ্রিত করেন। তাহার সারাংশ এইরূপ :—

"আইরিশরা অতি দরিদ্র জাতি, এ কথার উত্তরে বলা যায় যে, জগতের মধ্যে আইরিশ কৃষককুলই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। তাহাদের ৭৫ কোটি টাকা ডাকঘরের খাতায় জমা পড়িয়া রহিয়াছে—ব্যবসায়ে খাটিতেছে না। এই টাকাটা আয়র্লণ্ডের শ্রমশিল্পে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে।"

জোসেফ্ ডেল্‌ভিন্ মিঃ রেডমণ্ডের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে লিডস্ নগরে বক্তৃতাদানকালে তিনি বলিয়াছিলেন—"দশ বৎসরের মধ্যে আয়র্লণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ভূমি জমীদারের হস্ত হইতে চাষীর অধিকারভুক্ত হইয়াছে। বৃদ্ধবয়সে পেন্সন দিবার আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতেও আয়র্লণ্ডের অবস্থার সমধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই গ্রেস্‌হাম্ হোটেলে মিঃ রেডমণ্ড একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল :—

"আজ আয়র্লণ্ডের অধিবাসীরা দেশের অধিকার সম্ভোগ করিতেছে। আইরিশ শ্রমজীবীরা এখন পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস করিতেছে। দেশশাসন বিষয়ে আইরিশগণ এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন, করনির্দ্ধারণ সম্বন্ধেও আইরিশগণ অধুনা কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। পার্লামেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্যনির্ব্বাচনেও আমরা এখন স্বাধীন। নগরে নগরে শ্রমজীবীদিগের বাসগৃহ স্থাপনের জন্ম আইন এখন প্রচলিত হইয়াছে। এখন আর নাগরিক শ্রমজীবীদিগকে কেহ ইচ্ছা করিলেই গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ নহে ; ইহাই আমাদের পরম সান্ত্বনার বিষয়। কোনও শ্রমজীবী বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে গৃহচ্যুত করিতে হইলে, গৃহস্বামীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, এইরূপ আইন আমরা বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। এ বিষয়ে ইংলণ্ড এখনও এতটা উন্নতি করিতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইরিশ যুবকগণ স্বাধীনভাবে যাহাতে বিদ্যার্জ্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাও বিগত ৩৪ বৎসরের চেষ্টায় যথেষ্ট উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আয়র্লণ্ডে বৃদ্ধ বয়সের বৃত্তিনির্দ্ধারণে মহৎ উপকার সংঘটিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় আয়র্লণ্ডের প্রত্যেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জীবনোপায়ের জন্ম দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইয়াছে। সত্তর বৎসরের বুড়া-বুড়ীর জন্ম আর চিন্তা নাই, তাহারা অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। আর তাহাদিগকে খাটিয়া খাইতে হইবে না। জীবনের অবশিষ্ট অংশ তাহারা এই বৃত্তির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তভাবে, নিরুদ্বেগে ও সুখে যেখানে ইচ্ছা যাপন করিতে পারিবে। আমাদের দেশে একটা নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার ফলে এখন আর কোনও দরিদ্র কঠোরপরিশ্রমী নরনারীকে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য দীন-দুঃখীর উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। গুরুশ্রমে কোনও দরিদ্র নর-নারী পীড়িত হইলে, যাহাতে তাহারা খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষা পাইতে পারে, তাহার বিশেষ সুব্যবস্থা হইয়াছে।"

"ইউনাইটেড আইরিশ লিগ্" সভার বাৎসরিক অধিবেশনে, উহার সম্পাদক মিঃ জোসেফ্ ডেভ্‌লিন্ বিগত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে যে "বিবরণ" পাঠ করেন, তাহাতে আইরিশ শ্রমজীবীদিগের সম্বন্ধে অনেক কথাই ছিল। নিম্নে সেই বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"আইরিশ জনসাধারণের অবস্থা এখন যেরূপ, তেমন অবস্থা আয়র্লণ্ডের ইতিহাসে পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। আইরিশ কৃষক-সম্প্রদায়ের মত আর কোনও দেশের কৃষককুল পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস করিতে পায় না। এমন সুখী ও স্বাধীন কৃষক এ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ইহার ফলে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যেও পরিবর্ত্তনের প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে। আগে বর্ষে বর্ষে আয়র্লণ্ডে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই ছিল, এখন তাহা কবি কল্পনা বলিয়া অনুমিত হয়।

"বৃদ্ধ বয়সের বৃত্তির বিধান আয়র্লণ্ডে প্রচলিত হওয়ায় দেশের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ও মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। বৃদ্ধ নরনারীরা এই বৃত্তির সাহায্যে গৃহে বসিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ আরামে যাপন করিতে পারিবে। এই বৃত্তি-বিধান অনুসৃত হইবার পর আয়র্লণ্ডের ২ লক্ষ ৩ হাজার নর-নারী বৃত্তি-সম্ভোগ করিতেছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯ শত ৩০ টাকা এ জন্ম ব্যয়িত হইয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরে এই বাবদে মোট ১৭ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছে।"

বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ম্যাক্‌লুর যখন আয়র্লণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ডব্‌লিন্ হইতে প্রকাশিত

৭ই অক্টোবরের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রে 'ডেলি মেলের' জনৈক সংবাদদাতার প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। মিঃ টমাস্ ঐ পত্রের লেখক। তাঁহার প্রবন্ধের একাংশে এইরূপ লিখা ছিল :—

"যুদ্ধের পর সকল দেশেই প্রচণ্ড ধর্ম্মঘট হইতেছে, কিন্তু আমি একটিমাত্র দেশের কথা বলিতে পারি, যেখানে এই গৃহ-বিবাদ বা ধর্ম্মঘটের ফলে বিন্দুমাত্র অশান্তির উৎপাত নাই। সে দেশ আয়র্লণ্ড। ধর্ম্মঘটের সময় আমি আয়র্লণ্ড বেড়াইয়া আসিয়াছি। কিন্তু আয়র্লণ্ডে খাদ্যদ্রব্যাদির এমন প্রাচুর্য্য যে, তাহার গুণ-গান করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। সে কথা স্মরণ করিতেও আমার লেখনী হইতে যেন কাব্য-স্রোতঃ নিঃসৃত হয়। এখানে খানার টেবলে অপর্য্যাপ্ত নবনী। ইংলণ্ডে খানা খাইবার সময় টেব্‌লে নবনীর চিহ্ন প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু আয়র্লণ্ডের ঘরে ঘরে ইহার প্রচুর সমাবেশ। জীবন-যাত্রা এখানে চমৎকার। উৎকৃষ্ট মাখন যত চাহিবে, ততই পাওয়া যায়। এমন কি, ইংলণ্ডে লইয়া যাইতে চাহিলে, আপত্তি দূরে থাকুক, বন্ধুবর্গ ইচ্ছা করিয়াই যথেষ্ট মাখন সঙ্গে দিতে চাহেন।

"এখানে চারিদিকেই উন্নতির চিহ্ন। অভাব এখানে নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা যেমন অভাবের কথা চিন্তা করিতেও পারিতাম না, আয়র্লণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক তেমনই।"

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা নবেম্বর তারিখের 'লণ্ডন টাইমস' পত্রে 'উইস্ কন্‌সিন্' বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ, এল্, পি, ডেনিস্ মহোদয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। আইরিশদিগের আত্ম-নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে অধ্যাপক মহোদয় সহৃদয়তা সহকারে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

ডি ভেলেরা।

"কেহ যদি খুব দ্রুতগতিতেও আয়লণ্ড পর্য্যটন করিয়া আইসেন, তথাপি তাঁহার দৃষ্টিতে তত্রত্য অধিবাসীদিগের সামাজিক ও সাধারণ জীবন-যাত্রার বিচিত্র প্রণালী প্রতিভাত হইবে। বাস্তবিক আয়র্লণ্ডের অর্থ-নৈতিক উন্নতি দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়। সমগ্র য়ুরোপের সহিত এ বিষয়ে আয়র্লণ্ডের পার্থক্য অসাধারণ।

"এখানে যুদ্ধের সময় খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল না। আয়র্লণ্ডে অপর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে। সমগ্র জগতে এখন খাদ্যাভাব, ভবিষ্যতেও বহুদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এ অভাব থাকিবে; কিন্তু আয়র্লণ্ডে তাহার চিহ্নমাত্র নাই।"

আয়র্লণ্ডে শুধু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরই যে প্রাচুর্য্য, তাহা নহে। লেখক বলেন,—তত্রত্য বিধানগুলিও লোকহিতকর। তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থনের জন্য ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'ফ্রিম্যান্‌স্ জর্ণাল'এ প্রকাশিত কোন প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই :—

"ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের [illegible]

(আয়র্লণ্ডের) শ্রমজীবী ও শিল্পীদিগের কুটীর অথবা আবাস-গৃহ যথেষ্ট উন্নত এবং তাহারা প্রকৃতই উন্নততর জীবন-যাপন করে।"

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট সংখ্যার 'কর্ক-এগ্‌জামিনার' পত্রে এইরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছিল, "কৃষক, শ্রমজীবী ও সহরের ভাড়াটিয়াদিগের যেরূপ সুবিধা ও সুযোগ আছে, ইংলণ্ডের ঐ শ্রেণীর জনগণের সেরূপ সুবিধা নাই; বোধ হয়, পৃথিবীর কুত্রাপি এমন সুবিধাজনক ব্যবস্থা প্রচলিত নাই। এ বিষয়ে আয়র্লণ্ড অতুলনীয়।"

লেখক বলিয়াছেন,—"এমন যে আয়র্লণ্ড, ইহারই সম্বন্ধে সেনেটর লা ফলেট্ তাঁহার সম্পাদিত মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন দিবার সময় ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখের 'আইরিশ ওয়ার্লড'এ কি লিখিয়াছিলেন, দেখুন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"মানবের যে অধিকার রক্ষার জন্য আজ আয়র্লণ্ড অসহ দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যজনিত স্বার্থ তাহা অতিক্রম করিয়াছে।"

আয়র্লণ্ড এত উন্নত কেন? লেখক বলিতেছেন যে, তথায় কৃষিসম্পদের অসাধারণ প্রাচুর্য্য বশতঃই আয়র্লণ্ড এমন উন্নত হইয়াছে। জমীর উর্ব্বরাশক্তি বহুলাংশে এবম্প্রকার উন্নতির হেতু। নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'ঈভনিং জার্ণাল' পত্রে মিঃ ডি ভেলেরা এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—

"আয়র্লণ্ডের উর্ব্বরাশক্তি অতুলনীয়। শস্যের শ্যামল শ্রী এমনই মনোমুগ্ধকর, এমনই বিচিত্র যে, দর্শনমাত্রেই পর্য্যটকের চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। এই জন্যই ইহার নাম 'মরকত দ্বীপ'।"

কিন্তু নিম্নলিখিত উক্তিগুলিতে কাব্যসমাবেশ নাই:—

(ক) লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত কোন কোন স্থলের মাটী এতই সারবান্ যে, কুত্রাপি আমি তেমন উর্ব্বরা ভূমি দেখি নাই।

(খ) ইংলণ্ডের অপেক্ষা আয়র্লণ্ডের জমী সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

(গ) এমন সারবান্ জমী আমি কোথাও দেখি নাই।

(ঘ) অত্যন্ত অযত্নেও এখানে এমন অপর্য্যাপ্ত তৃণ ও যব যত্রতত্র উৎপন্ন হয় যে, তাহাতেই জমীর উর্ব্বরাশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঙ) এখানকার স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি এমনই যে, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশের উর্ব্বরা জমীর সহিত তাহা উপমিত হইতে পারে।

উল্লিখিত উক্তিগুলি কবির লেখনী-নিঃসৃত নহে। ওয়েক্‌ফিল্ড, ডি, ল্যাভারজ্‌নি, আর্থার ইয়ং, ম্যাক্‌কুলচ্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ আয়র্লণ্ডের জন ও জমী প্রভৃতির বিবরণ-বহিতে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে বিবরণ আবার বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অনুরূপ গ্রন্থসমূহে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বেকনের লিখিত গ্রন্থে কি দেখা যায়?—তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"এই দ্বীপ (আয়র্লণ্ড) প্রকৃতির নিকট হইতে ভারে ভারে যৌতুক পাইয়াছে। জমীর উৎপাদিকাশক্তি, বন্দর, নদী, অরণ্য এবং অন্যান্য বিষয়ে এই দ্বীপ বিশেষ সৌভাগ্যশালী। বিশেষতঃ আইরিশ জাতিটা—এমন সাহসী, পরিশ্রমী ও কষ্ট-সহিষ্ণু না হইত, প্রকৃতির এমন অফুরন্ত দানকে মাথায় তুলিয়া লইয়া যদি না ইহারা তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিত, তাহা হইলে এমন সুখময় জীবন-যাত্রা এখানে এমনভাবে সম্ভবপর হইত না।"

জমীর উর্ব্বরাশক্তি ও জল-বায়ুর গুণে আয়র্লণ্ড আজ জগতের শ্রেষ্ঠতম কৃষি-সম্পদ্‌পূর্ণ দেশের অন্যতম। বিগত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য হইতে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য গ্রেটবৃটেনে বিক্রীত হইয়াছিল, আয়র্লণ্ডও সেই পরিমাণ আহার্য্য বিক্রয় করিয়াছিল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এক যুক্তরাজ্য ব্যতীত আর কোনও স্থান হইতে আয়র্লণ্ডের মত খাদ্যদ্রব্য ইংলণ্ডে বিক্রীত হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষে যখন আমেরিকা হইতে জাহাজে করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রেরণের ভীষণ ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, তখন যুক্তরাজ্যের তুলনায় আয়র্লণ্ড প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ আহার্য্যদ্রব্য গ্রেটবৃটেনে সরবরাহ করিয়াছিল। যে তিনটি স্থান হইতে প্রধানতঃ খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানী হইত, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

	১৯১২খৃঃ পাউণ্ড	১৯১৩খৃঃ পাউণ্ড	১৯১৪খৃঃ পাউণ্ড	১৯১৫খৃঃ পাউণ্ড	১৯১৬খৃঃ পাউণ্ড
আয়র্লণ্ড—	৩ কোটি	৩ কোটি ৬০ লক্ষ	৩ কোটি ৭০ লক্ষ	৪ কোটি ৬০ লক্ষ	৫ কোটি ৯০ লক্ষ
যুক্তরাজ্য—	ঐ	৩ কোটি ৯০ লক্ষ	৪ কোটি ২০ লক্ষ	৮ কোটি ২০ লক্ষ	১১কোটি ৬০ লক্ষ
আর্জ্জেণ্টাইন	৩ কোটি ২০ লক্ষ	৩ কোটি ১০ লক্ষ	২ কোটি ৭০ লক্ষ	৪ কোটি ৬০ লক্ষ	৩ কোটি ৬০ লক্ষ

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গ্রেটবৃটেনে সর্ব্বসমেত ২১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছিল। অন্যান্য দেশ হইতে যত পাউণ্ড মূল্যের খাদ্যদ্রব্য আসিয়াছিল, প্রতি বার আয়র্লণ্ড তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ সরবরাহ করিয়াছে।

লেখক বলেন যে, বৃটেনের ন্যায় পৃথিবীর আর কোনও দেশ এত অধিক খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে না। বৃটিশের বাজারেই উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া, আর্জ্জেন্‌টাইন্, কেনাডা ও যুক্তরাজ্যের বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জাহাজ-বোঝাই খাদ্যদ্রব্য বৃটিশের বাজারে আসিয়া থাকে। আয়র্লণ্ডের এমনই অবস্থা যে, এক রাত্রির মধ্যেই আয়র্লণ্ডের যে কোন স্থান হইতে ইংলণ্ডের বাজারে দ্রব্যাদি পৌঁছিয়া থাকে।" অন্য কোনও কৃষিপ্রধান দেশের আয়র্লণ্ডের মত সুবিধা ও সুযোগ নাই।

গ্রেটবৃটেনের সহিত যে সকল দেশের বাণিজ্য চলে, তন্মধ্যে এক যুক্তরাজ্য ছাড়া আর কোনও দেশ আয়র্লণ্ডের সমকক্ষ নহে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্যের হিসাব ধরিয়া সম্পাদক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আলোচ্য বর্ষে যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের সহিত যত মূল্যের দ্রব্য সরবরাহ করিয়াছিলেন, আয়র্লণ্ড তাহার তুলনায় শতকরা আশী ভাগ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মণী যত টাকার বাণিজ্য করিয়াছিলেন, আয়র্লণ্ডের বাণিজ্য তাহার দ্বিগুণ। যথা :—

ফ্রান্স … … … …	৬ কোটি ৩০ লক্ষ।
জর্ম্মণী … … … …	৭ কোটি।
আয়র্লণ্ড … … … …	১৩ কোটি ৫০ লক্ষ।
যুক্তরাজ্য … … … …	১৭ কোটি ৩০ লক্ষ।

উল্লিখিত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, এক যুক্তরাজ্য ছাড়া, আয়র্লণ্ডের মত আর কেহই গ্রেটবৃটেনের বড় মক্কেল নাই। ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর বাণিজ্যক্ষেত্র এক করিলেও গ্রেট-বৃটেনের নিকট আয়র্লণ্ডের বাণিজ্যক্ষেত্রের মূল্য অনেক অধিক।

আয়র্লণ্ডে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ পরিপুষ্ট হওয়ায় আজ তাহার এমন অপূর্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছে।

প্রবন্ধের এক স্থানে লেখক লিখিয়াছেন যে, যদি আয়র্লণ্ডকে স্বাধীন দেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার বহির্বাণিজ্যের অবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির সহিত তুলনীয়। বিগত দ্বাদশ বৎসরে আইরিশগণ বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	আমদানী পাউণ্ড	রপ্তানী পাউণ্ড	মোট পাউণ্ড
১৯০৪ খৃঃ	৫কোটি ৪০লক্ষ	৪কোটি ৯০লক্ষ	১০কোটি ৩০লক্ষ
১৯১৩ "	৭ " ৪৫ "	৭ " ৩৮ "	১৪ " ৮৩ "
১৯১৬ "	১০ " ৫০ "	১০ " ৭০ "	২১ " ২০ "

"সমগ্র পৃথিবীতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল। তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশসমূহের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটা হিসাব দেওয়া যাইতেছে। জনসংখ্যার অনুপাতে মাথা পিছু এই হিসাব ধরা হইল—

			পাউণ্ড শিলিং পেন্স
আয়র্লণ্ড	…	…	৩১— ৬—৭
যুক্তসাম্রাজ্য (ইংলণ্ড)		…	২৫ —১৪ — ৬
নরওয়ে	…	…	২০—১৫—১১
সুইডেন	…	…	১৬— ৭—১১
জর্ম্মণী	…	…	১৫— ৫—১১
যুক্তরাজ্য (আমেরিকা)		…	৯— ০—৮
ইটালী	…	…	৬—১৯—১

লেখক মহাশয় উল্লিখিত তালিকার আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, "আয়র্লণ্ড দারিদ্র্যপিষ্ট, চিরদিন দারিদ্র্য-যন্ত্রণা-ভোগ করিতেছে, এ কথা কোন আয়র্লণ্ডবাসীই সহ্য করিতে সম্মত নহে। আমিও নহি।"

লেখক তাহার পর "কো-অপারেটিভ" কৃষি-সমিতিসমূহের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে আয়র্লণ্ড সমগ্র ইংরাজীভাষী দেশের অগ্রণী। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের কৃষি-ব্যবসায়ীরাও আয়র্লণ্ডের নিকট হইতে এ বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

আয়র্লণ্ডের কৃষি সম্মিলনের উদ্যোক্তা সার হোরেশ প্লাঙ্কেট্ বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯২২) তারিখে নিউইয়র্ক নগরে, ব্যবহারাজীব ক্লবে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, নবীন আয়র্লণ্ড বরং নিউইয়র্কের সহিত অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকিতে চাহে, কিন্তু লণ্ডনের সহিত নহে। বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডের ব্যাঙ্কসমূহে এত টাকা সঞ্চিত

হইয়াছিল যে, ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ উহা লইয়া বিব্রতই হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে সকল আইরিশের টাকা আছে, কোন বিষয়ে টাকা খাটাইবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রায় সকলেই স্বাগ্রে জানিতে চাহে, কত টাকা তাহাদের নামে জমা আছে। জমীই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পত্তি। বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে জমীর মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল।

জমীর মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ম্যাক্লুর কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জমীর মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়াছিল।

আয়র্লণ্ডের ব্যাঙ্কসমূহে কি পরিমাণ টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকাও তিনি প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

পোষ্ট আপিসের সেভিংস্ব্যাঙ্ক সমূহে

৩০শে জুন, ১৯০৪ ... ... ৪১ লক্ষ ৫৫ হাজার পাউণ্ড।
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯১৮ ... ... ১ কোটি, ২০ লক্ষ পাউণ্ড।

ট্রাষ্ট সেভিংস্ব্যাঙ্ক সমূহে

৩০শে জুন, ১৯০৪ ... ... ১৮ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউণ্ড।
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯১৮ ... ... ২৮ " ৭৮ " "

জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্ক সমূহে

৩০শে জুন, ১৯০৪ ... ... ৪ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ হাজার "
৩০শে ডিসেম্বর, ৯০১৮ ... ... ১২ " ১১ " ৯১ " "

মোট

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ... ... ৫ কোটি ২১ লক্ষ ২৬ হাজার পাউণ্ড।
১৯১৮ " ... ... ১৩ " ৬০ " ৬৯ " "

আয়র্লণ্ড সকল বিষয়েই উন্নতি করিয়াছে, শুধু একটি বিষয়ে সে পিছু হটিতেছে। সে বিষয়টি—দরিদ্রশালায় সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মোট সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল, ১ লক্ষ ১ হাজার ২ শত ৯৮; কিন্তু ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে, ৬১ হাজার ৬ শত ১৩ জন মাত্র।

সার হোরেশ প্লাংকেট।

আয়র্লণ্ড ক্রমেই উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু তাহার জনসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে কেন? ৮০ বৎসর পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের অধিবাসীর যে সংখ্যা ছিল, এখন তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া গেল কি জন্য? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জনসংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু উন্নতিশীল আয়র্লণ্ডে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে কেন? ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে সংখ্যার 'ন্যাশনালিটী' পত্রে মিঃ গ্রিফিথ লিখিয়াছিলেনঃ—

"১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-শাসনে আয়র্লণ্ডের জনসংখ্যা ছিল, ৫৬ লক্ষ ৪০ হাজার। রুসিয়া শাসিত পোলাণ্ডে তখন ৫০ লক্ষের অধিক অধিবাসী ছিল না। বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে —য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সময়ে—আয়র্লণ্ডের জনসংখ্যা কমিয়া কমিয়া ৪৩ লক্ষ ৭০ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে পোলাণ্ডের অধিবাসীর সংখ্যা হইয়াছিল, ১ কোটি ২০ লক্ষ।

"এই যে পার্থক্য, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাতে শিখিবার বিষয় আছে। এক সময়ে আয়র্লণ্ডকে 'পশ্চিমের পোলাণ্ড' বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্তু পোলাণ্ড যে ব্যবহার পাইয়াছিল, যদি তদনুরূপ ব্যবহার আয়র্লণ্ডের অদৃষ্টে ঘটিত, তবে এখন আয়র্লণ্ডের জনসংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ

দাঁড়াইত। পোলাণ্ড তাহার স্বাধীনতা হারাইয়াছিল; কিন্তু আয়র্লণ্ড শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই, তাহার অধিবাসীর সংখ্যা এবং অর্থও কমিয়াছিল। পোল্যাণ্ডের প্রতি রুসিয়ার অত্যাচার অতি ভীষণ সন্দেহ নাই; কিন্তু জাতীয়তা, রাজনীতি এবং অর্থনীতির উপর অত্যাচার সীমা অতিক্রম করে নাই।"

[ক্রমশঃ।

গৃহশ্রী।

যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
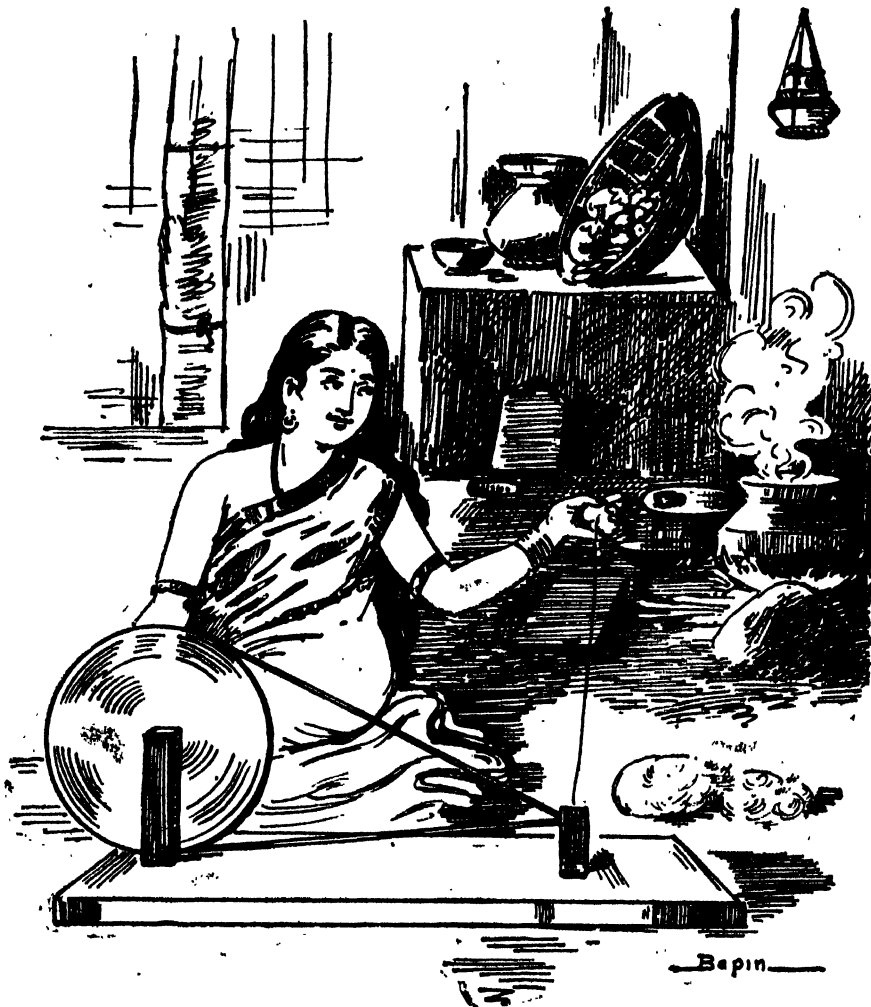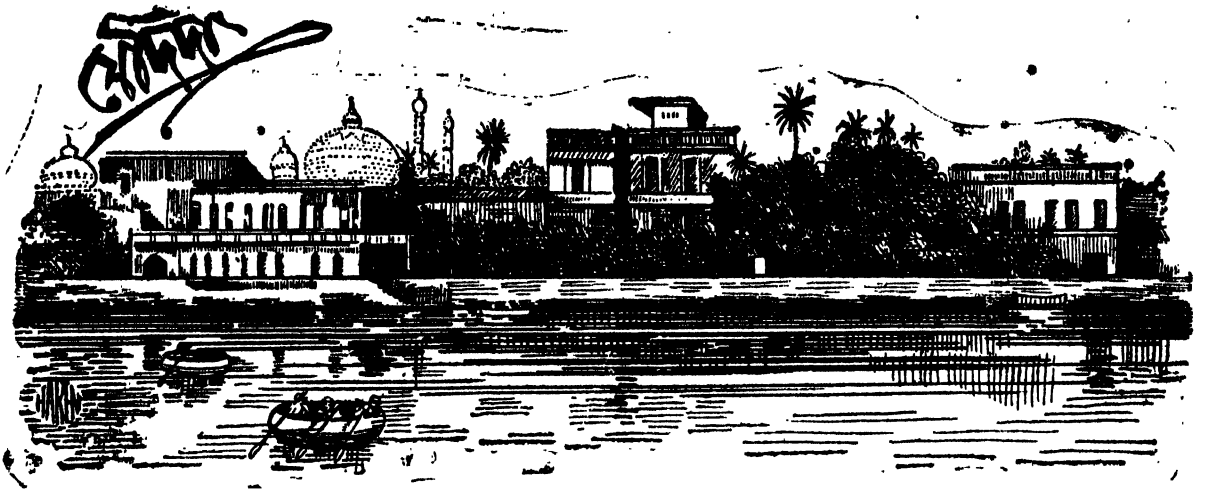
আমীর আজীজের নির্দ্দেশে রক্ষীরা মূর্চ্ছিতা রুথকে ও দায়ুদকে সারদাবে লইয়া গেল। "আজ থাকুক—কাল উপযুক্ত শাস্তি দিব"—বলিয়া আমীর রক্ষীদিগকে বাহিরে আসিতে বলিলেন ; তাহারা বাহির হইয়া আসিলে স্বয়ং সারদাবের দ্বার চাবিবদ্ধ করিয়া শয়নকক্ষে ফিরিয়া গেলেন। ফরিদা সেই কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল ; আমীর তাহাকে বলিলেন, "তোর কথা আমার মনে থাকিবে।"

এত বড় একটা ব্যাপার যত নিঃশব্দেই কেন সম্পন্ন হউক না—নিশীথে একেবারে অজ্ঞাত থাকে না। অনেক বেগম প্রভাতালোকে পারাবত যেমন করিয়া কক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখে, তেমনই করিয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে বহুবাহুসঙ্কেত ফরিদাকে আহ্বান করিল। সে সব বাহুর অলঙ্কার-শিঞ্জিত ফরিদা শুনিয়াও শুনিল না—চলিয়া গেল। তাহাকে ডাকিতে কোন বেগমের সাহসে কুলাইল না।

এ দিকে সারদাবের দ্বার রুদ্ধ হইলেই দায়ুদ মূর্চ্ছিতা রুথের মস্তক আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইল—তাহার ওষ্ঠাধর চুম্বন করিল। তাহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ভাবনা রুথকে লইয়া। সে ভাবিল, জল কোথায় পাই ? সারদাব দীপশূন্য হইলেও একেবারে অন্ধকার ছিল না। টাইগ্রীসের দিকে কক্ষপ্রাচীরে যে তিনটি গবাক্ষ ছিল, সেই তিনটি দিয়া চন্দ্রকর কক্ষে প্রবেশ করিয়া অন্ধকার কতকটা দূর করিয়াছিল। দায়ুদ দেখিতে পাইল, কক্ষে নানা দিকে কতকগুলি দ্রব্য রহিয়াছে। তাহার কাছে দেশলাই ছিল—জালিয়া সে একটি পাত্রে জল দেখিতে পাইল। আমীরের সরবৎ শীতল করিবার জন্য বৃহৎ রৌপ্যপাত্রে বরফ রক্ষিত ছিল—তাহাই গলিয়া জল হইয়াছিল। সেই জল দেখিয়া দায়ুদের যে আনন্দ হইল, বোধ হয়, মরুমধ্যে মৃগতৃষ্ণিকায় বহুপথপর্য্যটনশ্রান্ত পথিক স্বচ্ছ জলস্রোত পাইলেও তত আনন্দিত হয় না। সে অনায়াসে রুথের মৃণালচ্যুত কমলের মত এলায়িত দেহ তুলিয়া গদীর উপর লইয়া গেল এবং পাত্র হইতে জল লইয়া তাহার মুখ সিঞ্চিত করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই রুথের জ্ঞান হইল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে চক্ষু মেলিয়া ডাকিল, "দায়ুদ !"

দায়ুদ উত্তর দিল, "রুথ !"

কেহ আর কোন কথা বলিল না ; উভয়েরই হৃদয়ের ভাব কথায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। দায়ুদ রুথকে বক্ষে টানিয়া লইল—সেই উষ্ণ—কোমল দেহ বক্ষে ধরিয়া যেন তাহার ব্যথিত বক্ষের বেদনার উপশম হইল। আর সেই বক্ষে রুথ যেন সুখের স্বপ্নে বেদনার যাতনাও ভুলিয়া গেল। উভয়ে বন্দী—হয় ত রাত্রি শেষ হইলেই উভয়ের ভাগ্যে কল্পনাতীত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর ব্যবস্থা নিষ্ঠুর আমীরের কল্পনায় রচিত হইতেছে। তাহা হউক—তবুও আজ, কত দিন—যেন কত যুগ পরে তাহারা পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ। এই সুখের স্মৃতিও যে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভুলাইয়া দেয়।

রুথ কাঁদিতে লাগিল। দায়ুদ ভাবিতে লাগিল।

রুথ বলিল, "দায়ুদ, আমার ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহা ত হইয়াই ছিল। তাহার পরেও, কেন আমি তোমাকে এই বিপদসঙ্কুল কার্য্যে আহ্বান করিলাম ? আমার জন্য তোমার এ কি বিপদ।" সে কাঁদিতে লাগিল।

দায়ুদ তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "এ বিপদ ত আমি ইচ্ছা করিয়াই আহ্বান করিয়াছি। তোমার দোষ কি? মৃত্যু! এ জগতে কে অমর? কিন্তু পশু-পক্ষীর মত না মরিয়া যদি আমি তোমার স্বামী তোমার উদ্ধারচেষ্টায় প্রাণপাত করি—সে ত আনন্দের—সুখের—গৌরবের।"

দায়ুদ লক্ষ্য করিতে লাগিল, কক্ষের তিনটি গবাক্ষপথে যে আলোক তিনখানি চতুষ্কোণ কিরণাস্তরণের মত গালিচার উপর পড়িয়াছিল—সে আলোক ক্রমে হর্ম্ম্যতল হইতে, প্রাচীরগাত্রে উঠিয়াছে। যত সময় যাইতেছে, তত সে আলোক সরিয়া যাইতেছে। সে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিল—কি ভাবিল—তাহার পর রুথকে জিজ্ঞাসা করিল, "গবাক্ষের পরপারে কি আছে?"

রুথ বলিল, "জানি না।"

তখন রুথকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া দায়ুদ উঠিল। ততক্ষণে সেই সামান্য আলোকে সে অভ্যস্ত হইয়াছে। সে একখানি আসন আনিয়া মধ্যস্থ গবাক্ষের নিম্নে হর্ম্ম্যতলে রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল, সে জলকল্লোল শুনিতে পাইল। সে কান পাতিয়া ভাল করিয়া শুনিল—জলের শব্দই বটে, নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রাচীরগাত্রে তরঙ্গের আঘাতজনিত শব্দ শুনা যাইতেছে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলচ্ছন্দে প্রাচীরগাত্রে আহত হইয়া উঠিয়া পড়িতেছে। তাহার মনে পড়িল—আমীরের বাড়ী নদীর কূলেই বটে। তবে কি এই প্রাচীরের পরেই নদী! তবে কি টাইগ্রীসের অবাধ, মুক্ত, নিদাঘবারিপ্রবাহপুষ্ট জলস্রোত আর এই অন্ধকারাগার—ইহার মধ্যে এই প্রাচীরের ব্যবধান ব্যতীত অন্য ব্যবধান নাই? দায়ুদের মনে হইতে লাগিল, রুথকে উদ্ধার করিবার বাসনার উত্তেজনায় সে শত মত্ত-মাতঙ্গের বিক্রমে সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে। কিন্তু তাহার হৃদয় যেমন আবেগপ্রবণ, তেমনই স্থির-চিন্তার আধার। সে আবার রুথকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর এই অংশই কি পশ্চাতের অংশ?"

রুথ বলিল, "হাঁ।"

"এই দিকে বাগান আছে?"

"হাঁ। তাহার পরেই নদী।"

"তবে এই প্রাচীরের পরেই নদী।"

"তাহা বলিতে পারি না।"

"এই গবাক্ষ কি দিয়া রক্ষিত?"

"আমি ত জানি না, দায়ুদ।"

"তাই ত; তুমি কেমন করিয়া জানিবে?" দায়ুদ ভাবিতে লাগিল।

দায়ুদ একখানি আসনের উপর আর একখানি আসন স্থাপিত করিয়া সাবধানে তাহার উপর দাঁড়াইল—তথা হইতে চন্দ্রকরোজ্জ্বল আকাশের একাংশ লক্ষিত হইল। ঐ আকাশ—উদার—অনন্ত, উহা মুক্তির স্বরূপ; আর ঐ যে নদীর জলকল্লোল শুনা যাইতেছে—সে-ও মুক্তির আর এক রূপ। মুক্তি! মুক্তি! দায়ুদ ভাবিল, মুক্তিলাভের জন্য সে প্রাণান্ত চেষ্টা করিবে। আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বোধ হইল, গবাক্ষে জাল দেওয়া আছে। লৌহের জাল? সে হাত বাড়াইল—হাত ততদূর পৌঁছিল না। তখন সে নামিয়া আসিয়া আবার দেশলাই জ্বালিল, যে চৌকীর উপর আমীরের নারগিলা থাকে, সেখানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। দায়ুদ সেখানিকে আনিয়া তাহার উপর পর পর দুইখানি আসন স্থাপিত করিল; তাহার পর সাবধানে তাহার উপর উঠিল—পাছে পড়িয়া যায়। এবার সে জাল স্পর্শ করিতে পারিল—জাল লৌহেরই বটে। কিরূপে সে জাল বদ্ধ, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু জালের মধ্যে দুই হাতের অঙ্গুলী চালাইয়া সেই জাল ধরিয়া—বুকে ভর দিয়া অতি কষ্টে গবাক্ষের গহ্বরে উঠিতে পারিল।

বিবর ক্ষুদ্রায়তন—সরলভাবে বসিবার উপায় নাই—বেগে হস্ত বা পদ সঞ্চালিত করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু সেই বিবর হইতে দায়ুদ দেখিতে পাইল, প্রাচীরের পরপারেই টাইগ্রীসের প্রবাহ—পূর্ণ ও পুষ্ট—মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়া সাগরসন্ধানে যাইতেছে। নদীবক্ষে তরঙ্গ—তরঙ্গে চন্দ্রকর। উপরে আকাশ—সেই আকাশ হইতে চন্দ্র পরপারে বাগদাদ সহরের মিনার, গম্বুজ, হর্ম্ম্য, উদ্যান সকলের উপর স্নিগ্ধ রজতধারা ঢালিয়া দিতেছে—দিবসের প্রখর রৌদ্রের পর—উত্তাপের পর এ কি শান্তি—সুপ্তি—সৌন্দর্য্য! আকাশ, বাতাস, নদী—সকলেই স্বাধীন। মানুষই কোন্ পরাধীন? মানুষের সাধ্য কি, মানুষকে পরাধীন করিয়া রাখে; স্বাধীনতার—মুক্তির কামনা যত দিন সুপ্ত থাকে, তত দিনই তাহা সম্ভব—নহিলে নহে। মুক্তি সম্মুখে—অদূরে, সে কি আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে? দায়ুদ প্রাণপণ শক্তিতে সেই জাল ধরিয়া

টানিল—জাল বাঁকিয়া আসিল, কিন্তু ছিঁড়িল না; সে জাল ছিন্ন করিবার মত শক্তি তাহার নাই।

কিন্তু দায়ুদের তখন আপনার শক্তি বিচার করিবার ধৈর্য্য নাই—উত্তেজনার উন্মাদনা তখন তাহাকে মুক্তির জন্য চেষ্টায় প্ররোচিত করিতেছিল। সে আবার জাল ধরিয়া টানিল—তাহার দুই হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, সে জানিতেও পারিল না।

তাহার পর সে সেই জালে পদাঘাত করিল। সে স্বল্পস্থানে পদসঞ্চালন কষ্ট-সাধ্য—নহিলে বোধ হয়, জাল খুলিয়া যাইত। কারণ, সেই পথে যে কখন কেহ আসিবার বা পলাইবার চেষ্টা করিবে, এমন কল্পনা অতি-সাবধান আমীর আজীজও কোন দিন করিতে পারেন নাই; বিশেষ টাইগ্রীসের জল অত্যন্ত বাড়িলে সে গবাক্ষ-বিবর গাঁথিয়াও দিতে হয়। তাই তিনি সে বাতায়ন অতি সাধারণভাবে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পদাঘাতে অসুবিধা দেখিয়া দায়ুদ আবার হাত দিয়া জাল ধরিয়া টানিল। কিন্তু তাহার পদাঘাতে গবাক্ষ বিবরের এক পার্শ্বে জাল প্রাচীরের গাঁথনি হইতে খুলিয়া গিয়াছিল। টানিবাই সে বুঝিল, জাল খুলিয়া আসিতেছে। তখন সে বুঝিল, ভিতরের দিকে টানিলে যদি জাল খুলিয়া আইসে, তবে সেই সঙ্গে সে সারদাবে পড়িয়া যাইবে—শব্দে সকলে জানিতে পারিবে; সুতরাং বাহিরের দিকে ঠেলিতে হইবে—যদি সেই বেগে সে বাহিরে পড়ে, তবে নদীর জলে পড়িবে। সে সন্তরণপটু।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রুথের উদ্ধারের পথ মুক্ত করিতে হইবে। দায়ুদ জিজ্ঞাসা করিল, "রুথ তুমি আসিতে পারিবে?"

রুথ বলিল, "জানালা ভাঙ্গিয়াছে?"

"হাঁ—ভাঙ্গিবে। আমি যাইয়া তোমাকে তুলিয়া দিব?"

বিপদের সময় নারী প্রিয়তমকে নিরাপদ দেখিলেই নিশ্চিন্ত হয়—সে আপনার ভাবনা ভাবে না। রুথ বলিল, "আমি উঠিতে পারিব।"

দায়ুদ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "পারিবে ত?"

রুথ বলিল, "পারিব। তুমি বাহির হও।" সে ভাবিল, সে যাইতে পারিবে; আর যদি না-ই পারে—দায়ুদ ত মুক্ত হইবে।

দায়ুদ প্রবল বেগে জালে ঠেলা দিল। জাল খুলিয়া গেল—একসঙ্গে জাল ও দায়ুদ নদীর জলে পড়িল। নদীর জলে তাহাদের পতন-শব্দ শুনিয়া রুথ যেন নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর রুথ গবাক্ষ-বিবরে উঠিবার চেষ্টা করিল। দায়ুদের হিসাবে ভুল হইয়াছিল—সে জাল ধরিয়া উঠিয়াছিল; রুথ সে জাল ধরিয়াও উঠিতে পারিত কি না সন্দেহ, এখন জাল না থাকাতে ধরিবার কিছুই পাইল না। তাহার পদের চাপে মর্ম্মরের চৌকীর উপর হইতে একখানি আসন সরিয়া গেল। সে সশব্দে পড়িয়া গেল।

সেই শব্দে আমীর উঠিয়া আসিলেন। তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই; শব্দ শুনিয়া আসিয়া সারদাবের দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন—দায়ুদ নাই! তাঁহার নয়নে পিশাচের প্রতিহিংসানল ফুটিয়া উঠিল। তিনি রুথকে বলিলেন, "শয়তানী, সে পলাইয়াছে। কিন্তু এখন তোর রক্ষার উপায় কি করিবি?"

রুথের ইচ্ছা হইল বলে, সে জন্য তাহার আর ভয় কি? কিন্তু আমীরের দৃষ্টি দেখিয়া সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

[ক্রমশঃ।

কল্প-লক্ষ্মী।

চিত্রিত ভ্রূবল্লী, নেত্র, বদনখানিতে,
　অধরে তোমার মধু কবিতার রস,
সঙ্গীত মূর্চ্ছনা উঠে তোমার বাণীতে,
　ঘোষিছে বিনোদ-বেণী বয়নের যশ।

উরুযুগে প্রকটিত স্থাপত্যের কলা,
　তনু তব অপরূপ ভাস্কর্য্যের সার,
সর্ব্বাঙ্গে তোমার, দেবি, কারুর শৃঙ্খলা,
　সর্ব্ব শিল্পময়ী কল্প-লক্ষ্মীটি আমার।

শ্রীকালিদাস রায়।

ডাহুক বা 'ডাক' পাখী একটি জীবন্ত রহস্য। এই আছে, এই নাই,—চকিতে দেখা দিয়া কোথায় সে অদৃশ্য হইয়া যায়, অদূরবর্ত্তী কোন ঝোপের অন্তরাল হইতে নিঃসৃত, তাহার কর্কশ কণ্ঠস্বর গ্রামের ক্ষেত ও বাগানের উপর দিয়া ধ্বনিত হয়; তাহাকে দেখি দেখি মনে করি, অথচ কখনও তাহাকে ভাল করিয়া দেখা হয় না; সরোবরের সোপানাবলী অবতরণ করিতেছি, সহসা জলের ধারে ঘাস অথবা শরবনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, দ্রুতপদক্ষেপে তাহাকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই; মুহূর্ত্তমধ্যে সে ভূমি ছাড়িয়া খানিকটা উড়িল, আবার ভূতলে নামিল ও দৌড়াইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পরক্ষণেই সে যেন আমার ব্যর্থতাকে পরিহাস করিয়া তাহার কণ্ঠনাদে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া তুলিল। কুটীরদ্বারে অথবা গবাক্ষসমীপে দাঁড়াইলে কখনও কখনও অদূরে বেড়ার ধারে তাহাকে দেখিতে পাই,—হয় ত সে তাহার নামমাত্র পুচ্ছটুকু সঞ্চালিত করিতেছে, অথবা ভূমির উপরে কি যেন অন্বেষণ করিতেছে; নিমেষের মধ্যেই সে যেন মনুষ্য-সমাগম জানিতে পারিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, আর একটা ডাক পাখী কোথা হইতে বাহির হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইল। ব্যাপারটা বর্ণনা করিতে আমার যত সময় লাগিল, তাহার এক-চতুর্থাংশকালের মধ্যে সমস্তটা সংঘটিত হইয়া গেল। আমি দেখিলাম, শুধু তাহাদের সাদা বুক, অত্যল্পপরিসর পুচ্ছ, কৃষ্ণ-ধূসরবর্ণ ও দীর্ঘ পদাঙ্গুলি।

ডাহুকের জাতি-নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণতঃ ইহাকে প্লবজাতীয় বলা হয়; পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্ববিৎ বলিবেন যে, ইহারা Rallidae পরিবারভুক্ত। সাধারণ ইংরাজ বলিবেন, ইহারা wader বিহঙ্গগণের অন্যতম। আমাদের 'প্লব' ও ইংরাজের "wader" এই দুইটি শব্দ জলচরত্বদ্যোতক। এই Rallidae বিহঙ্গ-পরিবার সম্বন্ধে এইখানে পাঠকদের অবগতির জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহাদের সকলেরই পা অপেক্ষাকৃত লম্বা, পায়ের আঙ্গুল সাধারণতঃ দীর্ঘ,—এবং যদিও হংসজাতীয় পাখীর মত আঙ্গুলগুলা পরস্পর জোড়া নহে, তথাপি ইহারা অনায়াসে জলে সাঁতার দিতে পারে। সকলেরই ভূমিতে চলা-ফেরা, অথবা আকাশে উড়িবার বা বৃক্ষশাখায় বসিবার রীতি প্রায় একই রকম। সাঁতার দিতে অথবা জলে ডুব দিতে সকলেই পটু। সকলেই দ্রুতপদে গাছে উঠিতে পারে। ঝোপের মধ্যে অথবা বৃক্ষপত্রান্তরালে আত্মগোপন করিতে সকলেই অভ্যস্ত বটে, কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক মুখরতা তাহাদের লুকোচুরীর অন্তরায় হয়। সকলেই উদ্ভিজ্জ ও পোকা-মাকড়, ভেক, শম্বুকাদি খাইয়া জীবনধারণ করে।

এই Rail পরিবারের অনেকগুলি বিহঙ্গ যাযাবর, কিন্তু ডাহুক নহে। সে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায় বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই তাহার প্রব্রজনশীলতা সীমাবদ্ধ। বর্ষাকালে ডাহুক-দম্পতি জলাশয় সমীপে ঘন শরগুচ্ছের শিরোভাগে অথবা ঝোপের মধ্যে বা বৃক্ষাগ্রে নীড় রচনা করিয়া গৃহস্থালী পাতিয়া বসে। ইহাদের বাসাগুলা চ্যাপ্টা; পুনঃপুনঃ পদাঘাতে ইহারা কাঠি-কুটা প্রভৃতি উপকরণ এমন ঋজুভাবে বিন্যস্ত করে যে, ডিম্বগুলার গড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। ডাহুক পাখীর একাধিক বাসা কাছাকাছি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন যে, এক জোড়া পাখীই ঐ সকল নীড় রচনা করিয়া পছন্দমত একটির মধ্যে ডিম্ব রক্ষা করে। এই সমস্ত রচিত নীড়ের পরিধিমধ্যে ডাহুকদম্পতি অপর ডাহুককে সহজে আসিতে দেয় না। আগন্তুক দেখিলেই ইহারা সম্মুখে গ্রীবা প্রসারিত করিয়া ও পুচ্ছদেশ ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়। ইহাদের প্রধান

অল্প লম্বা পা। এই সময়ে ইহাদের কণ্ঠনাদে জলস্থল অহরহঃ ধ্বনিত হইতে থাকে।

ডাহুকী একসঙ্গে ৭।৮টা ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি ঈষৎ পীতাভ, মাঝে মাঝে অল্প লালের ছিটাফোঁটা থাকে। কিন্তু সবগুলি ডিম দেখিতে ঠিক এক রকম নহে। কোনটা অধিকতর লম্বা এবং তাহার অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত সরু; কোনটা বা একটু বেশী স্থূল ও গোলাকার। ডিম ফুটিয়া শাবক বাহির হইতে প্রায় ২০।২১ দিন লাগে। শাবকগুলি দেখিতে ছোট ছোট ধূসর পশমের বর্ত্তুলের (ball) মত। তাহারা প্রথমে উড়িতে পারে না, কিন্তু অসঙ্কোচে জলে নামে। দিনকতক জনক-জননীই উহাদের খাওয়ায়।

ডাহুক-ডাহুকীর বর্ণের তারতম্য নাই; উভয়েরই বুক ও পেট সাদা; দেহের অন্যান্য অংশ প্রায়ই কাল। ডাহুক-শিশুর বর্ণে কিছু বৈচিত্র্য আছে;—পৃষ্ঠদেশ কাল নয়, ধূসর; বক্ষোদেশের লোম সাদা বটে, কিন্তু তাহার অগ্রভাগের ধূসরতা সাদাকে ম্লান করিয়া ফেলে।

এই ডাহুককে ইংরাজ সাধারণতঃ white-breasted water-hen অর্থাৎ শ্বেতবক্ষ জল-মুরগী বলেন। ইহার জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় অন্যান্য পাখীর বিভিন্ন লক্ষণানুসারে কাহাকেও water-cock বা জল-মোরগ; কাহাকেও বা Common Water-hen বা সাধারণ জল-মুরগী, কাহাকেও বা Purple Moor-hen, কাহাকেও বা Coot আখ্যা দিয়া থাকেন। শুধু অনুবাদের হিসাবে নয়, বস্তুতঃ ইংরাজ যাহাকে water-hen বলেন, আমাদের দেশে তাহাকেই "জল-মুরগী" বলা হয়। আরও কৌতুকের বিষয় এই যে, সংস্কৃত সাহিত্যে "অম্বুকুক্কুটিকা"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে এখন অপরূপ নাম-সাদৃশ্য পক্ষিতত্ত্বজ্ঞের কৌতূহল জাগাইয়া তুলে। দেখিতে হইবে, এই নামগুলির সার্থকতা কি, অর্থাৎ ইহাদিগকে জলের কুক্কুট বলা হইল কেন? মোরগ-মুরগীর সঙ্গে ইহাদের সম্পূর্ণ আকারগত সুসাদৃশ্য না থাকিলেও, এই উভয় জাতীয় পাখীর স্বভাবে এতটা সাদৃশ্য দেখা যায় যে, Rallidae পরিবারভুক্ত বিহঙ্গগুলিকে "কুক্কুট" আখ্যায় পরিচিত করিতে দ্বিধা হয় না। মোরগ যেমন স্বভাবতঃ লেজ উচু করিয়া থাকে, দ্রুতপদে ইতস্ততঃ ধাবমান হয় এবং সহজে উড়িতে তত অভ্যস্ত নহে, আত্মরক্ষার আবশ্যকে পদ-নখর দ্বারা মৃত্তিকা বিদীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত করে, ক্রুদ্ধ হইলে পদাঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করে,—এই সমস্ত Water-hen, Moor-hen, Water cock প্রভৃতি নামধেয় পাখীগুলিও ঠিক সেইরূপ করে। মোরগের ছানা যেমন প্রথমাবস্থায় একটি সাদা অথবা ধূসরবর্ণের ক্ষুদ্রকায় পশমের 'বলের' মত দেখায় এবং অনায়াসে দৌড়াইতে পারে, জলকুক্কুটশাবকও যে ঠিক তাহার অনুরূপ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মোরগের মত ইহারা শস্যের বীজ, উদ্ভিজ্জ ও কীটাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। মোরগের মত ইহারা ছোট ছোট কাঁকর দিয়া উদরপূর্ত্তির সাহায্য করে। মোরগের মত ইহারা মানুষের পোষ মানে। পূর্ব্ববঙ্গে কোথাও কোথাও ইহাদিগের লড়াই দেখিবার জন্য Water-cock বা কোড়া পাখীকে বিশেষ যত্নের সহিত পালন করা হয়। লড়াইএর সময়ে ইহাদিগের ডানা মোরগের ডানার মত ঝটপট্ করে। অতএব দেখা গেল যে, ডাহুক ও তাহার জ্ঞাতিবর্গকে জলের মোরগ বা মুরগী বলিলে নামকরণে বিশেষ কোনও ভুল হয় না।

এখন এই অম্বুকুক্কুটিকা বা জল-কুক্কুট সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। শুধু কুক্কুট অথবা কুক্কুটিকা শব্দ পাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। ইহারা যে জলচর পাখী—যাদবের বৈজয়ন্তী যাহাদিগকে "প্লবপরিপ্লবৌ" বলিয়াছেন, তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং অনেক স্থলে ইহাদিগকে "দাত্যূহ" পাখীর সঙ্গে একত্রে দেখা যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে * নানা বিহঙ্গের উল্লেখ লোমশ মুনি করিতেছেন—

"ভৃঙ্গরাজৈস্তথা হংসৈর্দাত্যূহৈর্জ্জলকুক্কুটৈঃ"

পুনশ্চ, বৈশম্পায়ন জলচারী কয়েকটি বিহঙ্গের নাম করিতেছেন,—

"কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ কুররৈর্জ্জলকুক্কুটৈঃ।
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈর্বকৈর্ম্মদ্গুভিরেব চ॥
এতৈশ্চান্যৈশ্চ কীর্ণানি সমন্তাজ্জলচারিভিঃ।"

এখন দেখা যাউক, অভিধানকারেরা কি বলেন। যাদব এইরূপ পরিচয় দিতেছেন,—

"জলরঙ্কুস্তু বঞ্জুলঃ
দাত্যূহশ্চাথ শকটাবিলে প্লবপরিপ্লবৌ
অন্বর্থনামধেয়ৌ যৌ জালপাদাম্বুকুক্কুটৌ।"

* ১০৮ অঃ, ৭ শ্লোক।

শকটাবিল অর্থে প্লবজাতীয় জালপাদ ও পরিপ্লবজাতীয় অম্বু-কুক্কুট এই দ্বিবিধ সার্থকনামধারী পক্ষীকে বুঝায়।

বাচস্পত্য অভিধানে দেখিতে পাই, জলকুক্কুট অর্থে "জলে কুক্কুট ইব" এইরূপ বুঝান হইয়াছে। সুশ্রুতে প্লবজাতীয় পক্ষিগণের মধ্যে "অম্বুকুক্কুটিকা"র নাম পাওয়া যায়। টীকাকার আচার্য্য ডল্লনমিশ্র বলিতেছেন—"অম্বুকুক্কুটিকা জলকুক্কুটী কৃষ্ণবর্ণা।"

ইহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল যে, এই বিহঙ্গটি জলে কুক্কুটের মত এবং দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। যে দাত্যূহ পাখীর সহিত ইহার জলচর হিসাবে নামোল্লেখ দেখা গেল, তাহার সম্বন্ধে এই কয়টি কথা জানা যায়:—

অমর বলিতেছেন, "দাত্যূহঃ কালকণ্ঠকঃ।" যাদবে পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি—"জলরঙ্কুস্তু বঞ্জুলঃ দাত্যূহশ্চ।" শব্দরত্নাবলীতে ইহার কয়েকটি নামান্তর পাওয়া যায়, যথা,—অত্যূহঃ, দাত্যৌহঃ, কালকণ্ঠঃ, মাসঙ্গঃ, শিতিকণ্ঠঃ, কচাটুরঃ।

অত্যূহ শব্দের আভিধানিক অর্থ "অতিশয়বিতর্কঃ অর্থাৎ Noisy। কালকণ্ঠ বা কালকণ্ঠক,—অমরের টীকাকার ব্যাখ্যা করিতেছেন—কালে বর্ষাকালে কণ্ঠোহস্য, Noisy during the rains। শিতিকণ্ঠ—অর্থাৎ White-breasted। উদ্ভট শ্লোকে ইহার বর্ণনা এইরূপ—

"প্রাবৃট্‌কালে সুখীভূত্বা কোবা কুত্র ন গচ্ছতি।
ইতি বদতি দাত্যূহঃ কোবা কোবা কবা কবা॥"

বৈষ্ণব-চূড়ামণি কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থেও দেখা যায়—

ডাহুক পক্ষীর জল-ক্রীড়া।

কৃষ্ণং বিনা সুশীলঃ কো বা ব্রজভূতে ক্ব বা লীলা।
ভণ্যত ইতি দাত্যূহৈঃ কোবা কোবা কবা কবা বিরুতৈঃ॥

এইখানে আমরা দাত্যূহের কণ্ঠস্বরের যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতেই তাহাকে চিনিবার সুবিধা হইবে—কোবা-কোবা-কবা-কবা। এখন ডাহুক অথবা White-breasted Water-henএর গলার স্বরের বর্ণনা ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিৎ কিরূপ দিয়াছেন, দেখা যাউক।—

"It would be difficult to give to my

European readers an adequate idea of the sounds by attempting to syllabise them; but they commence somewhat with the syllables 'quaor,' 'quaor,' 'quaor' slowly pronounced at first, and then accelerated and breaking into 'Korowak wok', 'Korowak wok-wok' 'Korowak wok'; this is changed into a very deep 'quoor', 'quoor,' 'qu-ooor' ending slowly and with apparent effort, as if the bird's throat had suddenly become very sore with its exertions।

লেগ্‌এর এই বর্ণনার ব্যাখ্যা বোধ করি নিষ্প্রয়োজন। শব্দঘটিত সাদৃশ্য উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত ধ্বনি-গুলির সহিত কতটা আছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। এখন কালকণ্ঠ শব্দের আর একটা ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ আছে;—"কল এব কাল স্বার্থে অন্। কালোঽব্যক্ত-ধ্বনিঃ কণ্ঠে অস্য ইতি।" দুইটা অর্থ পাওয়া গেল; এক-টায় বর্ষাকালের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, অপরটায় কেবল-মাত্র কলকণ্ঠ সূচিত হইতেছে। এখন দেখা যাউক লেগ্‌ কি বলেন—

"After a very heavy monsoon shower...... I had ample opportunity of listening to the extraordinary cries for which this species is celebrated. Wonderful as they are, and most unnatural as proceeding from the throat of a bird, I cannot but admit that they are to my ears very interesting from the bare fact of their being so remarkable."

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বর্ষাকালে ইহার কণ্ঠধ্বনি বিদেশী পক্ষিতত্ত্বজ্ঞের কর্ণ-গোচর হইয়াছে এবং সেই interesting ও remarkable কণ্ঠস্বর—কলকণ্ঠ সূচিত করে।

এইখানে দাত্যূহকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। শ্লোকটি এই—

হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রাহ্বৈঃ সারসৈরপি,
জলকুক্কুট-কোয়ষ্টি-দাত্যূহ-কুল-কূজিতম্।

এস্থলে সারস, হংস, কারণ্ডব ইত্যাদি জলচর-বিহঙ্গের সহিত জলকুক্কুট, কোয়ষ্টি ও দাত্যূহকে একত্র পাওয়া গেল। যাদব বলিতেছেন—"কোয়ষ্টিশিখরী সমৌ"; ত্রিকাণ্ডশেষ ইহার প্রতিশব্দ দিতেছেন,—"জলকুক্কুভ।" এই জলকুক্কুভের প্রতিশব্দ দিতে গিয়া হেমচন্দ্র "কোয়ষ্টি" ও "শিখরী"র নাম করিয়াছেন। বৈদ্যকশব্দসিন্ধু বলিতেছেন—"জলকুক্কুভ জলকুক্কুটে পুং। তৎপর্য্যায়ঃ—কোয়ষ্টিঃ শিখরী।" পুনশ্চ, জলকুক্কুট বুঝাইতে গিয়া বৈদ্যক অভিধানকার লিখিয়াছেন—'ডহুকে' ইতি ভাষা। এই ডহুক বা ডাহুকের সম্পর্কে অনেকগুলি নাম পাওয়া গেল,—কোয়ষ্টি, শিখরী, জলকুক্কুভ ইত্যাদি। জলকুক্কুভ যে জলকুক্কুটের অন্তর্গত, তাহারও কিছু আভাস পাওয়া গেল। সমস্ত অভিধানের টীকাকারগণ বলেন যে, এই কোয়ষ্টি বা শিখরী বা জলকুক্কুভ পাখী আমাদের সাধারণ পরিচিত "কোড়া" পাখী বই আর কিছু নহে। এই কোড়ার ইংরাজী নামান্তর হইতেছে "Water Cock" বৈজ্ঞানিক নাম Gallicrex Cinerea.

এই আলোচনার ফলে বুঝা গেল যে, দাত্যূহ পাখীই ডাহুক। উপরে উদ্ধৃত অনেকগুলি শ্লোকে এই দাত্যূহকে জলকুক্কুটের পার্শ্বে দেখা গিয়াছে। জলকুক্কুট একটি বৃহত্তর পরিবার;—বৈজয়ন্তী "পরিপ্লব" পরিবার সংজ্ঞায় ইহাকে বিশেষিত করিয়াছেন। "জালপাদ" (web-footed) প্লব বিহঙ্গরা যেমন aquatic বা জলচর, পরিপ্লব অম্বুকুক্কুটও প্রায় তদ্রূপ। প্লব পরিপ্লবের মধ্যে এত সূক্ষ্ম বিচার করিয়া তারতম্য নির্দ্দেশ করা সংস্কৃত সাহিত্যে প্রায় দেখা যায় না। তাই চরক সুশ্রুত অম্বুকুক্কুটিকাকে প্লব বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই বৃহত্তর জলকুক্কুট পরিবারের মধ্যে ডাহুক ও কোড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ব্ব-বঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে কোড়া পাখীকে পোষা হয়,—প্রধানতঃ তাহার লড়াই দেখি-বার জন্য। পুং-স্ত্রী-ভেদে ইহাদের চঞ্চুচরণের বর্ণের তারতম্য দৃষ্ট হয়; চঞ্চুর যে অগ্রভাগ মাথার উপরে প্রলম্বিত হয়, তাহা পুং-পক্ষীর শিরোদেশে শৃঙ্গের মত প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

কিন্তু ডাহুক বা অন্য কোনও জলকুক্কুটের অত লম্বা শিরোভূষণ আদৌ দেখা যায় না। ডাহুক বা দাত্যূহকে এ দেশে সাধারণতঃ কেহ পোষে না। য়ুরোপে অনেক স্থলে ইহাকে মানবের আনুগত্য স্বীকার করিতে দেখা যায়।

ইহাদের সঙ্গে আর একটি পাখীর নাম করিতে হয়, কারণ, সেটিও আমাদের গ্রামে বিশেষভাবে পরিচিত। এই

'কায়েম' পাখীও জলকুক্কুটের অন্তর্গত। ইহার দেহের বর্ণ-সামঞ্জস্য অতীব সুন্দর; নীল ও বেগুণি রং সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিতে থাকে; চঞ্চু, পদদ্বয় ও শিরোদেশে কঠিন অস্থিখণ্ড রক্তবর্ণ। এইজন্যই ইহার ইংরাজী নামকরণ হইয়াছে Purple Moorhen.

বাঙ্গালার জলাশয়ের শর ও হোগ্‌লাবনে ইহারা দল বাঁধিয়া বাস করে। সারা বৎসরই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। জলের উপরে ইহারা অনেকগুলি একত্র হইয়া মালার মত প্রায়ই ভাসিয়া বেড়ায়; ইহাদের কণ্ঠস্বর জলান্তর্বর্ত্তী ঝোপের ভিতর হইতে সর্ব্বদাই শ্রুত হয়। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কায়েম পাখীকে পালন করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কোনও পিঞ্জর বা পক্ষি-গৃহে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই; পুষ্করিণী ও তাহার সমীপবর্ত্তী অনল্প-পরিসর স্থানের মধ্যে তাহাকে বিচরণ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। পাছে তাহারা একেবারে স্থান ত্যাগ করিয়া উড়িয়া যায়, সেইজন্য প্রথম প্রথম কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের পক্ষচ্ছেদন করিয়া প্রাচীর অথবা লৌহজালবেষ্টিত জলা-ভূমিতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পুনরায় যখন সম্পূর্ণ পক্ষোদ্‌গম হয়, তখন আর তাহারা চিড়িয়াখানা, পরিত্যাগ করিতে চাহে না; এই সময়ের মধ্যেই তাহাদের মন বসিয়া যায় এবং ইহারা স্বচ্ছন্দে গৃহস্থালী করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকার পাখী-পোষাকে য়ুরোপ আমেরিকায় Semi-domestication বলে। বর্ষাকালেই কায়েম পাখী গৃহ-স্থালী পাতিয়া বসে। এই সময় আলিপুরের বাগানে বেড়াইতে গেলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, গণ্ডারের বাস-বেষ্টনীর মধ্যস্থিত জলার ধারে শষ্পগুচ্ছে কায়েম তাহার বাসা রচনা করিতেছে অথবা শাবকসহ আহারের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

"সত্য"-প্রয়াণ-গীতি।

(বাউলের সুর)

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে';
ওগো এই গঙ্গারি কূলে।

দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তা'র নিয়ে গেছে কোলে তুলে',
ওগো এই গঙ্গারি কূলে॥

চপল চারণ বেণু-বীণে তা'র
সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,
শেষ গান গাওয়া হ'ল নাক আর
উঠিল চিত্ত দুলে',
তারি ডাকনাম ধ'রে ডাকিল কে যেন অস্ত-তোরণ-মূলে,
ওগো এই গঙ্গারি কূলে॥

ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন্ সর্ব্বনাশী?
বিষাণ কবির গুমরি উঠিল, বেজেছো বাজিল বাঁশী।

আঁখির সলিলে ঝলসানো আঁখি
কূলে কূলে ভ'রে ওঠে থাকি' থাকি',
মনে পড়ে কবে আহত এ পাখী
মৃত্যু আফিম ফুলে
কোন্ ঝড়-বাদলের এমনি নিশীতে পড়েছিল ঘুমে ঢুলে'
ওগো এই গঙ্গারি কূলে॥

তার ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির-বন্ধন হারা,
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্ত-ধারা।
ও সে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি',
অমৃত বিলালো বিষ জ্বালা সহি',
শেষে শান্তি মাগিল ব্যথা বিদ্রোহী
চিতায় অগ্নি-শূলে,
পুনঃ নব-বীণা করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে,
ওগো এই গঙ্গারি কূলে॥

কাজী নজরুল ইসলাম।

হিমারণ্যে।

আষাঢ় সংখ্যার 'মাসিক বসুমতীতে' হিমালয়-অভিযানের প্রথম পর্ব্বের কথা বিবৃত হইয়াছে। দুর্লঙ্ঘ্য হিমগিরির শীর্ষ-দেশে এ যাত্রায় আরোহণ করা সম্ভবপর হয় নাই। অবশিষ্ট ১ হাজার ৮ শত ফুট অনাবিষ্কৃত রাখিয়াই জেনারল ব্রুসের বাহিনী নামিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অকুতোভয় ইংরাজ আবিষ্কারকগণ, পরিশ্রমী ও সাহসী, নেপালী, সের্পা ও ভুটিয়া অনুযাত্রিগণসহ দুর্গম হিমারণ্যে বিচরণ-কালে বিবিধ প্রকার অসু-বিধা ভোগ করিয়াছিলেন। হিমালয় যেমন বিরাট্ ও মহান্, তেমনই দুর্জ্জয়; সহজে তাহার উন্নত শীর্ষে জয়ের পতাকা উড্ডীন করা সম্ভবপর নহে। এতটুকু ভ্রম, বিন্দুমাত্র বিবেচনার ত্রুটি ঘটিলেই সর্ব্বনাশ—আর রক্ষার উপায় নাই।

জেনারল ব্রুস্ এই অভিযান সম্বন্ধে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায় যে, আবিষ্কারক-গণ যখন শেষ শৃঙ্গে উঠি-বার জন্ত আয়োজন করিতেছিলেন, তখন বর্ষা আসন্ন। বর্ষার বারিধারা একবার পর্ব্বত-দেহে পড়িতে আরম্ভ করিলে, অগ্রগতি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে, এই আশ-ঙ্কায় বাহিনীর নেতৃগণ পর্ব্বতারোহণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সময় কর্ণেল ষ্ট্রট্, ডাক্তার লংষ্টাফ্ এবং মেজর মর্সেড্ পীড়িত হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। মেজর মর্সেড তুষার-পীড়ায় এমনই কষ্ট পাইতে-ছিলেন যে, হিমারণ্যমধ্যে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে আদৌ যুক্তিসঙ্গত ছিল না। চিকিৎসার্থ কাযেই তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙ্গে ফিরিতে হইয়াছিল। উক্ত বাহিনীর অপর দুই জন সদস্য—মেজর নর্টন ও কাপ্তেন ব্রুস্ও স্বাস্থ্যের অনুরোধে থারুটা উপত্যকাভূমিস্থিত শিবিরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কাযেই তাঁহাদের সাহায্য পাইবার আশা আর ছিল না।

অভিযানকারীদিগের দলে তখনও ছয় জন য়ুরো-পীয় বিদ্যমান ছিলেন। আলোচনার পর তাঁহারা স্থির করিলেন, পর্ব্বতশীর্ষে আরোহণ করিতেই হইবে। সেই সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে, বর্ষা যখন আসন্ন, তখন ধারাপাত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই, পূর্ব্ব-রংবক তুষার-নদীর তীরবর্ত্তী শিবিরগুলি উঠাইয়া লওয়ার প্রয়োজন। এভারেষ্ট গিরিগাত্রের ঢালু প্রদেশে পর্ব্বতারোহণকালে যে শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়া-ছিল, তাহাও আর সে স্থলে রাখা নিরাপদ নহে। দলের সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শুষ্ক, রৌদ্রদীপ্ত দিন ছাড়া শিবির উঠাইয়া লওয়া এবং পর্ব্বতে আরোহণ করা হইতে পারে না। সুতরাং সহসা এতদুভয়ের কোন কাযই অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। মিঃ মেলরি, ডাক্তার সমারভেল্ এবং কাপ্তেন ফিঞ্চ, এই তিন জন পর্ব্বতারোহণ করিবেন স্থির হইয়াছিল। আর ডাক্তার ওয়েকফিল্ড, মিঃ ক্রফোর্ড ও কাপ্তেন মরিসের উপর শিবির উঠাইয়া লইবার

এভারেষ্ট শৃঙ্গ—অভিযানকারীরা যে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন।

ভার পড়িয়াছিল। উঁহারা সকলেই অনুচরবর্গসহ কেন্দ্র-শিবির হইতে ৩রা জুন তারিখেই যাত্রা করেন। সে দিন আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না। রাত্রিকালে অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। প্রবলবেগে তুষার-ঝটিকা প্রবাহিত হইল। ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বিরাম ঘটিল না। সেই হিমারণ্য মধ্যে কাপ্তেন ফিঞ্চের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া উঠিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে, প্রথম শিবিরে পঁহুছিয়া তিনি এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার আর পর্ব্বতারোহণ করিবার সামর্থ্য রহিল না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কেন্দ্র-শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। যে দিন তিনি কেন্দ্র-শিবিরে পঁহুছিলেন, তাহার পরদিবস প্রথম দল দার্জ্জিলিঙ্গে ফিরিয়া যাইবার কথা। সেই দলের সমভিব্যাহারে তিনি দার্জ্জিলিঙ্গ যাত্রা করিলেন।

পর্ব্বত-আরোহণকারী দলের অবশিষ্ট সদস্যগণ ৫ই জুন তারিখে তৃতীয় শিবিরে উপনীত হয়েন। পরদিবস আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। তুষার-ঝটিকার অবসানে হিমারণ্য উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে ঝলমল করিয়া উঠিল। যাত্রিগণ সেই মধুর রৌদ্র উপভোগ করিতে করিতে সে দিন বিশ্রাম করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য অঞ্চলে বর্ষাঋতুর যাবতীয় লক্ষণই রীতিমত বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ তুষারপাতের পরই অপেক্ষাকৃত গরম অনুভূত হইতেছিল এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ পবন বহিতেছিল। কিন্তু ৬ই জুন তারিখে পর্য্যটকের চির-শত্রু, হিমজর্জ্জরিত উত্তর পবন পুনরায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। দিবাভাগে সূর্য্যের উত্তাপে বরফ গলিতে থাকে, রাত্রির অতিরিক্ত শৈত্যে আবার জমিয়া কঠিন হয়। এই অবস্থার অপেক্ষা, উল্লিখিত তুষার-ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বাতাস বহিতে থাকায়, হিমারণ্য-যাত্রীদিগের মনে আশার সঞ্চার হইল। যদিও এই উত্তর-পবন অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং অসহ্য, তথাপি ইহার আবির্ভাববশতঃ বরফ গলিবার সম্ভাবনা নাই, তাই তাঁহারা মনে করিলেন যে, এইবার পর্ব্বতারোহণ করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সে রাত্রিতে 'ফারেনহিট্' তাপ-মান যন্ত্রের পারদ ০ ডিগ্রিরও ১০ ডিগ্রি নিম্নে রহিয়াছে দেখা গেল। হিম-শিখরযাত্রিগণ বুঝিলেন, উত্তর দিক্ অর্থাৎ চ্যাং-লার ক্রমনিম্ন প্রদেশের অবস্থা আশাপ্রদ। তত্রত্য জমাট তুষাররাশি সহসা স্থানচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। উহার উপর দিয়া পর্ব্বতশীর্ষে, আরোহণ অথবা নিম্নে অবতরণ করা সম্ভবপর হইবে। অভিযানকারিগণ তদনুসারে স্থির করিলেন, এক দল শিবির উঠাইয়া নিম্নে অবতরণ করিবেন, অপর দল বিরাট শিখরশীর্ষে আরোহণ করিবেন। আর কালবিলম্ব সঙ্গত নহে।

অতি প্রত্যূষে হিমালয় প্রদেশের উচ্চতর স্থানে পরিভ্রমণ করা আদৌ নিরাপদ নহে। কারণ, প্রচণ্ড শীতে তুষার-পীড়ায় চরণের সবিশেষ দুর্দ্দশা ঘটিবার সম্যক্ সম্ভাবনা। কাযেই অভিজ্ঞগণ একটু বেলা না হইলে, এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হয়েন না। যাত্রিগণ বেলা ৮টার সময় তৃতীয় শিবির ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। এই দলে মিঃ মেলরি, ডাক্তার সমারভেল্ ও মিঃ ক্রফোর্ড ছিলেন। মিঃ ক্রফোর্ড সিঁড়ি কাটিয়া যাত্রীদিগের আরোহণের সুবিধা করিয়া দিবার জন্যই তাঁহাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। ১৪ জন কুলি খাদ্যদ্রব্য এবং অক্সিজেন উৎপাদক যন্ত্রাদিসহ রজ্জু অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। অক্সিজেনের সাহায্য সর্ব্বশেষে প্রয়োজন হইবে মনে করিয়া, তাঁহারা উহা সঙ্গে লইয়াছিলেন।

উত্তর দিকের অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রদেশের বরফের অবস্থা আশাপ্রদ দেখিয়া, যাত্রিগণ উৎফুল্ল-হৃদয়ে আরোহণ করিতে লাগিলেন। বরফের চাপ পর্ব্বতগাত্রে দৃঢ়ভাবেই আবদ্ধ ছিল। যাত্রিগণ মনে করিলেন, উত্তরদিকের উচ্চশীর্ষ পর্য্যন্ত বরফ-স্তূপের অবস্থা সর্ব্বত্রই এইরূপ আছে। তাঁহারা অধিকতর উৎসাহের সহিত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। বেলা দেড় ঘটিকার সময়, উত্তর দিকের অর্দ্ধপথ আরোহণ করিবার পর, অকস্মাৎ একটা শব্দ তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইল। তুষার-শিলা বিদীর্ণ হইয়াছে! বিরাট তুষার-স্তূপ স্থানচ্যুত হইয়া নামিয়া আসিতেছে! সর্ব্বাগ্রে দড়ি বাহিয়া মিঃ মেলরি, ডাক্তার সমারভেল্ ও মিঃ ক্রফোর্ড এক জন মাত্র অনুচরসহ আরোহণ করিতেছিলেন। তাঁহারা সেই বরফস্তূপের সহিত ক্রমেই নিম্নে গড়াইয়া আসিতে লাগিলেন। এই নিম্নগামী বরফস্তূপ তাঁহাদিগকে কোথায়—কোন্ তুষার-শীতল [illegible] হিত করিবে, কে বলিতে পারে! দড়ি ধরিয়া তাঁহারা নিশ্চেষ্ট-ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় দেড় শত ফুট এমনই ভাবে গড়াইয়া আসিবার পর, সহসা বরফ-শিলার গতিরোধ হইল। চারি জনই তখন অনেক কষ্টে আপনা-দিগকে সে অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া লইলেন। তাঁহারা

অক্ষত দেহেই ছিলেন। যে তুষার-শিলা স্থানচ্যুত হইয়া গড়াইয়া আসিয়াছিল, তাঁহারা তাহার এক পার্শ্বেই ছিলেন। মুক্তিলাভের পরই তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের অন্যান্য সঙ্গীর অবস্থা কি হইয়াছে। নিরীক্ষণ করিবার পর তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদের অনেক নিম্নে, তুষার-শিলার উপর কয়েকটি লোক রহিয়াছে। যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহারা অবতরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহারা দেখিলেন যে, দ্বিতীয় রজ্জু ধরিয়া যাহারা উঠিতেছিল, তাহারাও রজ্জু ধরিয়া আছে। উহা স্খলিত হইয়া যায় নাই। বরফের চাপ একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তুষার-শৃঙ্গের পার্শ্বদেশে বাধা পাইয়া আর গড়াইয়া যাইতে পারে নাই। এই তুষার শৃঙ্গটি প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ হইবে। উহার পাদদেশের তুষারস্তূপে বৃহৎ 'ফাটল' বিদ্যমান।

তাঁহারা দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে, অপর যে দুইটি রজ্জু ধরিয়া দ্রব্যাদিসহ অনুচরবর্গ পর্ব্বতারোহণ করিতেছিল, তাহারা বরফের ভগ্নচাপের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ক্ষুদ্র তুষার-শৃঙ্গের উপর দিয়া গড়াইয়া, উহার পাদদেশস্থিত ফাটলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা তখন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সেই স্থলে উপনীত হইলেন এবং প্রাণপণ পরিশ্রম সহকারে বরফ সরাইয়া প্রথমেই ৩ জনের উদ্ধার-সাধন করিলেন। দলের অপর ২ জন তুষাররাশির মধ্যে এমনই ভাবে সমাহিত হইয়াছিল যে, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে তাহাদের প্রাণরক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। এক ব্যক্তির পদযুগল উপরের দিকে ও মস্তক নিম্নদিকে প্রোথিত হইয়াছিল; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহার অঙ্গের কুত্রাপি কোনও আঘাত লাগে নাই। শুধু সে ব্যক্তি জড়ের মত অবস্থায় অনেকক্ষণ অবস্থিত ছিল। ৬০ ফুট উচ্চ স্থান হইতে এমন ভাবে পড়িয়া গিয়াও সে যে রক্ষা পাইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অবশিষ্ট ৭ জন এমনই ভাবে তুষার মধ্যে সমাহিত হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার কোনই উপায় ছিল না। তাহারা ফাটলের গভীরতম প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং স্খলিত বরফশিলার প্রধান ভাগ তাহাদের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল।

জেনারল ব্রুস বিবরণে লিখিয়াছেন যে, তথাপি সকলেই উৎসাহ সহকারে সমাহিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া গুরু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রাণপণ পরিশ্রমের পর তাঁহারা ১ জন ব্যতীত আর সকলেরই প্রাণশূন্য দেহ তুষার-সমাধি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জেনারল ব্রুস লিখিয়াছেন, "বাস্তবিক এই ভাবে আমাদের দলের ৭ জন অকুতোভয়, বীরহৃদয় অনুচরকে হারাইয়াছি এ কথা চিন্তা করিতেও মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। তাহারা সকলেই অতিশয় কর্ম্মপটু ও চমৎকার অনুচর। তাহাদের জীবনের পরিণাম যে এমনই বিয়োগান্ত দৃশ্যে পরিণত হইবে, ইহা কেহই ভাবিতে পারে নাই। হিমালয় অভিযানে এ পর্য্যন্ত এমন বিশ্বস্ত, কর্ম্মপটু অনুচর আর কেহই সংগ্রহ করিতে পারে নাই। আমার ধারণা, হিমালয় কেন, পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে কোনও আবিষ্কারক ইতঃপূর্ব্বে এমন আজ্ঞাবহ ও কর্ম্মনিপুণ অনুচর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাহারা এই অভিযানে আমাদিগকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। সকল অবস্থাতেই তাহারা সদাপ্রফুল্ল। অবর্ণনীয় অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াও, নানাপ্রকার কষ্ট পাইয়াও মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে নাই। তাহাদের শ্রমসহিষ্ণুতাও অতুলনীয়। বিপদের সম্মুখীন হইয়াও তাহারা হাসিমুখে খেলাচ্ছলে বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছে। এই অভিযান সমাপ্ত হইবার সময় এমন ভীষণ ভাবে তাহাদের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে যবনিকা পতিত হইবে, ইহার অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে?"

পৃথিবীর বৃহত্তম—শ্রেষ্ঠতম গিরিশিখরে আরোহণ করিবার এই অভিযান এ বৎসরের মত এইরূপেই সমাপ্ত হইয়া গেল। অভিযানের পূর্ণ সাফল্য-লাভের সৌভাগ্য মানবের অদৃষ্টে এবারও ঘটিল না। কখনও ঘটিবে কি না, তাহা ভবিতব্যতার গর্ভেই নিহিত। কিন্তু অভিযানকারিগণের এখনও বিশ্বাস যে, তাঁহারা এবার যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে মানবশক্তি দুর্জ্জয় গিরিশিখরে বিজয়-কেতন উড্ডীন করিতে পারিবে। তবে একটা কথা, হিমগিরির দুইটি প্রধান মিত্রশক্তি আছে। তাহাদের সহায়তায় এভারেষ্ট মহাশক্তিশালী। প্রথম—পর্ব্বতে আরোহণ করিবার অনুকূল ঋতু অত্যন্ত স্বল্পকালস্থায়ী। দ্বিতীয়—ঋতু যখন অনুকূল, তখন ভীষণ পশ্চিম-বায়ু বহিতে থাকে। এই দুইটি শক্তিকে আয়ত্ত করাই অতিশয় কঠিন কার্য্য।

পর্ব্বত হইতে শিবির তুলিয়া লইয়া অবতরণ কালে অভিযানকারিগণ হিমারণ্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা

প্রণিধানযোগ্য। জেনারল ব্রুস লিখিয়াছেন, "আমরা দেখিলাম, ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন দক্ষিণ-পবন বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এভারেষ্টের উত্তরভাগ এবং তাহার পাদদেশস্থিত তুষারনদীর অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। ইহার উপর দিয়া আমরা ইতঃপূর্ব্বে যখন পদব্রজে তৃতীয় শিবিরে আরোহণ করিয়াছিলাম, তখন তুষারনদী জমাট পাতরের ন্যায় দৃঢ়, অবতরণকালে দেখিলাম, তথায় স্রোতোধারা বহিতেছে, পর্ব্বত-গাত্র বহিয়া ধারা নামিতেছে, চারিদিকেই আর্দ্রভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, কোথাও যেন কোন দৃঢ়তা নাই, সবই যেন গলিয়া ভাসিয়া যাইবে। আমরা যে ঠিক সময়েই শিবির তুলিয়া লইতে পারিয়াছিলাম, ইহাই পরম ভাগ্য বলিতে হইবে।"

অভিযানের প্রধান অংশ এখন খাম্‌টা উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এখন অভিযানকারিগণ অত্যন্ত শ্রান্ত। তাঁহারা তাই তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিতেছেন।

দার্জ্জিলিঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় হইলেও জেনারল ব্রুস ও তাঁহার সহচরগণ আপাততঃ সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। কুলিগণ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, তাহাদের বিশ্রাম প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত ৭ জন সাহসী অনুচর তুষার-সমাধিলাভ করিয়াছে, এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ না করিতে পারিলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শিবির গুটাইয়া আসাও সহজ ব্যাপার নহে। এই অভিযান ব্যাপার ঠিক সামরিক প্রণালী অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে শিবির, প্রত্যেক শিবির হইতে সংবাদ আদান-প্রদানের রীতিমত ব্যবস্থা, প্রচুর রসদ সঞ্চয়—সবই শৃঙ্খলা ও

শিলিংএর সন্নিহিত রঙ্গপথ— ৪৮ মাইল দূর হইতে প্রথম এভারেষ্টের দৃশ্য।

সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া করা হইয়াছিল। কাযেই এত বড় বিরাট ব্যাপারকে অল্পদিনের মধ্যে গুটাইয়া লওয়াও সম্ভবপর নহে। দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে প্রথম শিবিরের দূরত্ব ৩ শত মাইল। পথও নিরাপদ নহে। ইয়াটুং পর্য্যন্ত পঁহুছিলেও যে বাকি পথটুকু অনায়াসে অতিক্রম করা সম্ভবপর, তাহাও নহে। বর্ষাকালে সিকিমের পর্ব্বতমালা প্রকৃতই অতি ভীষণ। সুতরাং অভিযানকারিগণ দার্জ্জিলিঙ্গে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

৭ জন ভারতীয় কুলি এই অভিযানে তুষার-[illegible]

করিয়াছে, এ সংবাদে দার্জ্জিলিঙ্গে একটা উত্তেজনার সঞ্চারও হইয়াছে। নেপালী, ভুটিয়া ও সের্পাগণ তাহাদের হতভাগ্য আত্মীয় স্বজনের এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুতে অভিভূত বা উত্তেজিত হইবে, ইহা ত স্বাভাবিক। এতদুপলক্ষে কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছেন যে, দেবগিরি হিমালয়ের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য উল্লিখিত নেপালী, ভুটিয়া ও সের্পা কুলিরা অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়াই হিমগিরির দেবতা শুল্কস্বরূপ তাহাদিগকে

শিলিং শিবির।

গ্রাস করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যদি আবার অভিযান আরব্ধ হয়, তবে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে না! কারণ দেবতা উপহার পাইয়া তুষ্ট হইয়াছেন। কথাটা হাস্যোদ্দীপক বটে। ভারতীয়ের জীবন না হইলে ভারতীয় গিরি-দেবতার তুষ্টি হয় না।

বিগত ৮ই জুলাই তারিখে শেখরজঙ্গ হইতে জেনারল ব্রুস আর একখানি পত্র লিখিয়াছেন। উহা পাঠে জানিতে পারা গিয়াছে যে, অভিযানকারীদিগের অধিকাংশই দয়া-লা অতিক্রম করিয়া খারুটা জিলায় আসিয়া পঁহছিয়াছেন। গুরু পরিশ্রমের পর তাঁহারা যে শুধু বিশ্রামার্থই আপাততঃ দার্জ্জিলিঙ্গে ফিরিতে পারিতেছেন না, তাহা নহে। খারুটা জিলা এবং বিচিত্রদর্শন কর্ম্ম উপত্যকা পর্য্যবেক্ষণের লোভ তাঁহারা সংবরণ করিতে পারেন নাই। অরুণ নদী যে সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া নিপতিত হইতেছে, তাহার উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করাও তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জেনারল ব্রুস তাঁহার সহযাত্রিবর্গের পর্য্যটনের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অতি মনোজ্ঞ। তিনি লিখিয়াছেন যে, গত বর্ষে কর্ণেল হাউয়ার্ড বারি এই পথে যে সময়ে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহার ২ মাস পূর্ব্বেই তাঁহারা এই জিলার মধ্য দিয়া চলিতেছেন। কর্ণেল বারি সে সময় এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে যে ঋতুর আবির্ভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন, জেনারল ব্রুস ও তাঁহার সহচরবর্গ এখন সে ঋতুর বহু পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন।

অভিযানকারীরা গিরিমালা অতিক্রমের সময় নানা স্থানের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতি-

ক্রম করিলেই তুষারধবল এভারেষ্টের বিরাট অভ্রভেদী মূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম দর্শকের চিত্তকে একটা মহান ভাবে অভিভূত করিয়া ফেলে, এখানে তাহার একখানি ছবি প্রদত্ত হইল। এই স্থান হইতে এভারেষ্টের দূরত্ব মাত্র ৪৮ মাইল হইবে। উল্লিখিত রন্ধ্রপথের বহির্মুখে পর্য্যটনকারীদিগের শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

জেনারলব্রুস লিখিয়াছেন,—"তিব্বতের শুষ্ক বাতাস ও উর্ব্বরাশক্তিবর্জ্জিত স্থানের কঠোর দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া আমাদের চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। খারুটা ও কর্ম্ম উপত্যকার মধ্য দিয়া যখন আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন অপেক্ষাকৃত কোমল দৃশ্যসমূহ আমাদের নয়ন ও মনের তৃপ্তিবিধান করিল।"

শাম্‌চুন্ লা ও চগ্‌লার উপর দিয়া কর্ম্ম উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় পুষ্প-খচিত তরুলতাদির দৃশ্য তাঁহাদের ক্ষুধিত দৃষ্টির কিরূপ তৃপ্তিবিধান করিয়াছিল, তাহা শুধু অনুভবযোগ্য। এখানে তাঁহারা বহুসংখ্যক "রোডোডেনড্রন্" ফুল দেখিতে পাইয়াছিলেন।

শাকিথাং শিবিরে আসিবার পর এমন প্রবল বর্ষা নামিয়াছিল যে, পর্য্যটনকারীরা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বর্ষণ একটু ক্ষান্ত হইলেই তাঁহারা আবিষ্কারের জন্য বাহির হইয়া পড়িতেন। এই উপত্যকাভূমির উচ্চতর স্থানের বৃক্ষ-লতাদির অবস্থা আশাপ্রদ নহে। বর্ষাধারার প্রাবল্যে ৪ মাসকাল এ স্থানের বাতাস জলকণায় এমন আর্দ্র থাকে যে, বৃক্ষ-লতাদির বৃদ্ধি ও পুষ্টি সম্ভবপর নহে। কিন্তু উপত্যকাভূমির তলদেশের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে আসিয়া পর্য্যটকগণের খাদ্যদ্রব্যাদির অভাব হইয়াছিল। অরুণ উপত্যকার উচ্চতর স্থানে বসতি আছে জানিতে পারিয়া, তাঁহারা লাম্‌টাঙ্গে এক দল লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহারা আবার শিবির তুলিয়া হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়েন। খারুটা শিবিরে ফিরিয়া না গেলে খাদ্যাভাবে সকলকে মরিতে হইত।

শাকিথাং শিবিরে অবস্থানকালে পর্য্যটনকারীরা কর্ম্ম ও অরুণ উপত্যকার যতটুকু আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ দিয়াছেন। অরুণ নদী কুশীর একটি প্রধান শাখা। পর্ব্বতমালার পশ্চাদ্ভাগে ইহার উৎপত্তিস্থল। তিব্বতের গিরি ও মালভূমি ধৌত করিয়া এই নদী প্রবাহিত। তৎপরে অরুণ, সঞ্চিত জলরাশির প্রভাবে হিমালয়ের প্রধান গিরিমালার মধ্য দিয়া বিসর্পিত গতিতে চলিয়াছে। ইহার এক দিকে এভারেষ্ট, অন্য দিকে কাঞ্চন-জঙ্ঘা। খারুটা শিবির ও কিয়ামাটাং গ্রাম এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রায় ২০ মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থলে অরুণ ৪ হাজার ফুট উচ্চ স্থান হইতে সহসা নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। অভিযানকারীরা অরুণ নদীর এই অংশ আবিষ্কার করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই জলপ্রপাতটি সকল সময়েই বিদ্যমান আছে, কি, শুধু আকস্মিক জল বৃদ্ধিতেই উহার আবির্ভাব হয়, তাহা নিঃসংশয়ে জানিবার জন্যই তাঁহাদের সবিশেষ আগ্রহ।

অরুণ-গিরিরন্ধ্র ও নদীর উৎপত্তি-স্থল নির্ণয়ের জন্য তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। ফটোগ্রাফার কাপ্তেন নোয়েল এবং কাপ্তেন মরিস কতিপয় অনুচরসহ এতদুদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন। অধিক লোক সঙ্গে থাকিলে এই সকল আবিষ্ক্রিয়ার সুবিধা হয় না।

শাকিথাং শিবিরে অবস্থানকালে, গিরি-চূড়া হইতে দুই হাজার ফুট নিম্নে তাঁহারা কর্ম্মনদীর রৌপ্য-সূত্রবৎ রেখা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই নদী এভারেষ্ট ও মাকালু শৃঙ্গের তুষার-নদী হইতেই উৎপন্ন। এখানকার সরল দুরারোহ গিরিপার্শ্ব ঘন, শ্যামল অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। বর্ষাকালে, বারিপূর্ণ মেঘমালা উপত্যকাভূমির উপর দিয়া ভীমবেগে প্রবাহিত হয়। এই সময়ে অরণ্যমধ্য হইতে বাষ্প অবিশ্রান্ত নির্গত হইতে থাকে। কর্ম্ম নদীর বাম-তীরে একটি পথ আছে। উহা ছোট্রোম্ পর্য্যন্ত প্রসৃত। তথা হইতে নদী পার হইয়া পথটি ক্রমশঃ উপরের দিকে পাহাড়ের গাত্র বহিয়া উঠিয়াছে। পপ্তি-গিরিবর্ত্মে আসিয়া এই পথ মিশিয়াছে। এই পথে নেপাল ও তিব্বতের বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া স্বার্থবাহগণ যাতায়াত করিয়া থাকে।

অরুণ নদী কোনও উল্লেখযোগ্য প্রপাতের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু এই নদী ৩টি সুগভীর গিরিরন্ধ্রপথের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই রন্ধ্রপথগুলির একটি কিমাটাঙ্গএ, অপরটি খারুটায়। তৃতীয়টি উল্লিখিত দুইটি শৈলের মধ্যবর্ত্তী একটি স্থানে অবস্থিত। অরুণ নদী অত্যন্ত বেগবতী। উহার স্রোতোধারা সগর্জ্জনে সঙ্কীর্ণ গিরিপথে প্রবাহিত। এই রন্ধ্র-পথগুলি অতিক্রম করিতে গেলে, উচ্চাবচ বহু সহস্র ফুট পথ চলিতে হয়। এক এক স্থলে নদীতট হইতে ১০ হাজার ফুট

পর্য্যন্ত উচ্চে না উঠিলে চলে না। এখানকার দৃশ্যও অতি মনোরম।

জেনারল ব্রুস্ প্রত্যাবর্ত্তন-পথে নানা তিব্বতীয় গ্রাম দেখিয়া আসিয়াছেন। অরুণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা কারিজঙ্গে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। সদলবলে তাঁহারা এখন কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন।

হিমালয় অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, হিমালয়শীর্ষে আরোহণ করা অসম্ভব নহে। তবে এ কার্য্যে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে। গিরি আরোহণকারীদিগের বয়সও ৩০ এর অধিক না হইলে ভাল হয়। ভারবাহী পার্ব্বত্য-কুলীদিগের তিনি খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাদের মত অক্লান্তকর্ম্মা সদানন্দ, কর্ম্মঠ ব্যক্তি তিনি কুত্রাপি দেখেন নাই। ইহাদিগকে আরও একটু শিক্ষা দিলে অভিযানের কার্য্যে আশাতিরিক্ত সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি অবশেষে বলিয়াছেন, "একটা কথা অভিযানকারীদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হিমালয়ে আরোহণকালে যখনই মনে কোনও বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইবে, তখনই সে কার্য্য স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। নহিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।"

মদনের মনোভঙ্গ।

উপনিবেশের পুলিস—শোন মদন, ওদিকে যেতে পাবে না—দেখ্‌ছ না, বিবির পাশে ভারতবাসী বসেছে; তুমি গেলেই যে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হবে।

মদন— ওঃ বাবা, আমাকেও আটকাবে?

পুলিস— পারি, না পারি, চেষ্টা কর্‌তেই হ'বে। নইলে [illegible] থাক্‌বে না।

প্যালেষ্টাইন্।

প্যালেষ্টাইন্ লইয়া ইংরাজকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছে। অনেক টাকা-কড়ি খরচ হইতেছে, অথচ চারিদিকে অশান্তি। ঘরে অশান্তি; কারণ, করভার-নিপীড়িত ইংরাজ বলিতেছেন, ওখানে সৈন্য-সামন্ত লইয়া পাহারা না দিলে, যদি ইহুদীর একটা "হোম" করিয়া দিবার সুবিধা না হয়, তবে না হয় না-ই হইল। স্বদেশের বড় বড় সমস্যার কোনও সমাধান হইল না; আয়র্লণ্ড, মিশর, ভারতবর্ষ লইয়া যথেষ্ট ব্যস্ত থাকা গিয়াছে; জনকতক পোলিটিশ্যান্ ইরাক্—প্যালেষ্টাইন্—আরবের ভূতের বোঝা ব্রিটিশ করদাতৃগণের ঘাড়ে চাপাইয়া সকলকে আরও অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক কষ্টে ইরাণকে ঘাড় হইতে নামাইতে পারা গিয়াছে;—বল্শেভিকদের সঙ্গে তাহার সখ্য নিবিড়তর হউক্, সাধারণ শ্রমজীবী ইংরাজের তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞরা গত শতবর্ষের ইতিহাস কি সহজে ভুলিতে পারেন? পারস্য উপসাগরে এতদিন ধরিয়া পাহারা দেওয়া গেল, তাহার কি এই পরিণাম? বাহিরেও অশান্তি; কারণ, প্যালেষ্টাইন্—ইরাক্—আরব ইংরাজের প্রতি একেবারে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উইনষ্টন্, চর্চ্চিল্বংশের এক এবং অদ্বিতীয় উইনষ্টন্, ইংরাজের one and only Winston কিন্তু বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। ইরাণকে বল্শেভিকের হাত হইতে রক্ষা করা গেল না, সে দোষ তাঁহার নহে। তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নাই;—যুদ্ধ-সমাপ্তির পরেও তিনি না কি ভল্গাপ্রদেশে, ডন্প্রদেশে, বল্টিকোপকূলে, ইরাকে, ইরাণে অনেকগুলি শ্বেতহস্তী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; বিলাতের শ্রম-সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে অধিকাংশ white elephant সরাইয়া আনা হইল। সে দেশের গৌরীসেন টাকা দিতে রাজি হইল না। ইরাণে তেল আছে, ইংরাজ কোম্পানীও আছে; ইরাক্ পারস্যোপসাগরের মুখরক্ষা করিতেছে, ভারতবর্ষের উপকারের জন্য; আরবকে স্বাধীনতাদান করিতেছেন ইংরাজ নিঃস্বার্থভাবে,—অথচ রাজা হুসেন অথবা আমীর ফয়শুল তাহা বুঝিতেছেন না কেন? প্যালেষ্টাইনে ইংরাজের স্বার্থ কি, বলুন দেখি? যে ইহুদী এতকাল ভবঘুরে ছিল, সেই wandering Jewকে যদি ওখানে একটা ন্যাশনাল হোম করিয়া দেওয়া যায়,তাহা হইলে কত বড় কায করা হয়! না করিয়া দিলে সত্যভ্রষ্ট হইতে হয়, উইনষ্টন্ কি সত্যভঙ্গ করিয়া জগতের সমক্ষে ইংরাজ জাতিকে কলঙ্কিত করিতে পারেন?

উইনষ্টন চর্চ্চিল।

আসল কথাটা যাহাই হউক্, সে দিন হাউস অফ্ কমন্সএ যখন প্যালেষ্টাইনের কথা উঠিল, মিঃ চর্চ্চিল্ উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন যে, এ বিষয়ের আলোচনা করা নিরর্থক; কারণ, ব্যাল্ফোর-প্রস্তাবে সম্মতি দিবার সময় তাঁহারা কি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, এক দিন সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে? আজ যখন সেই শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত, তখন তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। লর্ড র্যাণ্ডলফ্ চর্চ্চিলের উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত কথা বটে। বাগদত্ত ইংরাজ গভর্মেণ্ট তিলমাত্র সত্যবিচ্যুত হইতে পারেন কি? আর লোক যা বলে বলুক, যিনি নিজের বিধবা জননীকে গির্জ্জাঘরের বেদীসম্মুখে স্বহস্তে দ্বিতীয় ভর্ত্তার করে সমর্পণ

করিয়া কন্তাদান অপেক্ষা অধিক পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই উইন্‌ষ্টন্‌ ইহুদীর হাতে প্যালেষ্টাইন্‌ দিয়া অধিকতর পুণ্য-সঞ্চয় করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন কেন? সত্যরক্ষা করিবার মত চরিত্রবল কয়জনের থাকে? এই যে সম্প্রতি আফ্রিকায় কেনিয়া উপনিবেশে তিনি এক দল শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান ভবঘুরেকে উচ্চ স্বাস্থ্যকর মালভূমির উপর "হোম" করিয়া দিবার জন্ত বাগ্দান করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে ভারত গভর্মেণ্ট অবাক্‌ হইয়া দেখুক, কেমন করিয়া মার্লবরো-কুলপ্রদীপ পশ্চিম এসিয়া হইতে পশ্চিম আফ্রিকা পর্য্যন্ত অর্দ্ধজগৎ তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণে উজ্জল করিয়া দিতেছেন। কমন্স সভায় "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"। উইন্‌ষ্টনের এখন "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন"। সত্যের মর্য্যাদা না বুঝিয়া সেদিন প্যালেষ্টাইনের মুসলমান ও খৃষ্টান অধিবাসিগণ দোকান-পাট বন্ধ করিয়া একটা দেশব্যাপী হরতাল করিল! এ স্থলে মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৮০ জন মুসলমান ও ১০ জন খৃষ্টান; বাকি ১০ জন ইহুদী। সেই ১০ জন ইহুদীর ন্যাশনাল হোম হইবে প্যালেষ্টাইন্‌;—ব্যাল্‌ফোর-প্রতিজ্ঞার ইহাই না কি পরিষ্কার অর্থ। বড় বড় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ইহুদী ধনকুবেরগণ মিঃ (ইদানীন্তন আর্ল) ব্যাল্‌ফোরের কাছে আবেদন করিয়াছিল যে, ইংরাজ এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত আছেন কি না যে,যুদ্ধে জয়ী হইলে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীর ন্যাশনাল হোম তিনি প্রতিষ্ঠিত করিবেন? মিঃ ব্যাল্‌ফোর স্বীকৃত হইয়া তদুত্তরে যে পত্র লিখেন, তাহাই Balfour Declaration বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত হইল।

লর্ড র‍্যাণ্ডলফ্‌ চর্চ্চিল।

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা,—১৯১৭ খৃষ্টাব্দ। যুদ্ধ তখন ভীষণভাবে চলিতেছে। ইহুদী ইংরাজকে ভাল করিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু কাহার সাহায্যে প্যালেষ্টাইনের উপর ইংরাজ mandate পাইলেন? ইহুদীর, না ভারতবর্ষীয় হিন্দু-মুসলমানের? লর্ড অ্যালেন্‌বি কি বলেন? কে অকাতরে অর্থদান করিয়াছিল? ইহুদী, না ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান? অথচ এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্মুখে কোনও প্রলোভনের সামগ্রী ছিল না। আজ প্যালেষ্টাইন্‌ ইহুদীর "হোম" হইবে।

আচ্ছা, এই ব্যাল্‌ফোর-ইহুদী পত্র-ব্যবহারের কয়েক মাস পরে আর কোনও ইংরাজ সচিব আর কাহারও সম্বন্ধে কোনও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কি? যদি করিয়া থাকেন ত সে প্রতিজ্ঞাকেও ইংরাজের বাগ্দান বলিয়া মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। তুর্কী সম্বন্ধে অমাত্যশ্রেষ্ঠ মিঃ লয়েড্‌ জর্জ্জ এমন কিছু বলিয়াছিলেন কি, যাহাতে জগতের মুসলমান-সমাজ আশ্বস্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজ তুর্কীসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেন? এখন শুনিতেছি নাকি, মিঃ জর্জ্জের উক্তির প্রকৃত অর্থ আমরা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের প্রভূত অর্থ পশ্চিম এসিয়ার মুসলমানাধ্যুষিত "তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম" যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন হইতে এই অনর্থের সৃষ্টি হইল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে, সমগ্র সীরিয়া যখন তুর্কীসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তখন কিন্তু প্যালেষ্টাইনে যে সকল জাতির আবাস ছিল, তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোনও তারতম্য ছিল বলিয়া মনে হইত না। তুর্কী-শাসনকর্ত্তা বেইরুৎ-এ অবস্থান করিতেন। শুধু ইহুদীর নয়, জেরুসালেম খৃষ্টান ও মুসলমানের নিকটে পুণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হয়। খৃষ্টানের পূততম সমাধির (Holy Sepulchre) দ্বাররক্ষক এক জন মুসলমান;—এই মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষরা বহুকাল ধরিয়া এই দৌবারিকের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, খৃষ্টান তাহাতে আপত্তি করিবার কোনও বিশেষ কারণ দেখেন নাই। তথায় সাধারণতঃ আরব ভাষা কথিত হয়। কিন্তু প্রাচীন ইহুদী অধিবাসী স্পেনীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। তাহার সঙ্গে বিশেষ কোনও বিরোধ

খৃষ্টান অথবা মুসলমানের ছিল না। কিন্তু ইদানীং রুশিয়া, রুমানিয়া, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশ হইতে দলে দলে ইহুদী প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তথায় প্রাচীন সায়নের (Zion) পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত বদ্ধপরিকর হইল। অনেক দিন হইতে তাহারা এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল। ইস্রায়েল জ্যাঙ্গুইল্ প্রমুখ অনেক প্রতিভাবান্ লেখক য়ুরোপে মার্কিণে গল্পে ও প্রবন্ধে এই কথা ঘোষিত করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এক জন জর্ম্মণ ইহুদী, থিয়োডোর হার্জল্, একখানি বই লিখিলেন। বইখানির নাম—'Der Juden Staat' অর্থাৎ ইহুদী-রাষ্ট্র। ইংরাজ তখন সবেমাত্র আফ্রিকায় উগাণ্ডা দখল করিয়াছেন। য়ুরোপের Zionist ইহুদীদিগকে তিনি বলিলেন,—"তোমরা এইখানে একটা উপনিবেশ কর; তোমাদের ইহুদী ষ্টেট্ এইখানে গঠিত করিয়া তুলিতে দিতে আমাদের আপত্তি নাই।" ইহুদী এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহার সন্দেহ হইল যে, ইংরাজ ইহুদীর টাকায় নবাধিকৃত উগাণ্ডা প্রদেশ উন্নত (develope) করাইয়া লইতে চায়। জেরুসালেমের আশা ইহুদী Zionist কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিল না। একদল ইহুদী কিন্তু এই নেশন-রাষ্ট্রগঠনের বিরুদ্ধে বরাবর মতপ্রচার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহুদীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-স্থাপন-চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হইতে পারে না; অন্ততঃ কিছুতেই ফলবতী হওয়া উচিত নহে; কারণ, লাভ-লোকসানের খতিয়ান করিলে, বোধ হয়, ক্ষতির মাত্রা বেশী হইবে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে 'পগ্রম্' হইলেও ইহুদীর ক্ষমতা কোনও স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ না থাকায় সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তবে এ চেষ্টা করিয়া লাভ কি? কিন্তু Zionist ইহুদীগণ এ কথায় বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারা নানা উপায়ে স্বজাতিকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন। উগাণ্ডা-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর কিছুদিন অতিবাহিত হইল। বুয়র-যুদ্ধের মধ্যে ইংরাজ ইহুদীর কথা ভুলিয়া গেলেন। ভারতবর্ষের কুলী, মজুর, কেরাণী, এঞ্জিনীয়র লইয়া ইংরাজ উগাণ্ডা develope করিতে লাগিলেন। বুয়র-যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই চীন লইয়া সমস্ত য়ুরোপ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহুদীরাষ্ট্রের কথা তখন কে ভাবিতে পারে?

আর্ল ব্যালফোর।

কৈশর উইল্হেল্ম একটু ভাবিতেছিলেন। তখন আর বিস্মার্ক জীবিত নাই যে, কোনও প্রকার চক্ষুলজ্জা হইবার সম্ভাবনাও কল্পনা করা যাইতে পারে। কোনও কালে যে তাঁহার চক্ষুলজ্জা ছিল, এমন কথা বলা যায় কি না, সন্দেহ। অনেক কথাই মনে পড়ে। যখন তাঁহার পিতামহ সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, বালক উইল্হেল্ম বিস্মার্ককে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, বিভিন্ন জর্ম্মণ-রাষ্ট্রের রাজন্তবর্গকে রাষ্ট্রীয়-সভায় সম্মিলিত হইবার জন্ত শীঘ্রই আহ্বান করা হউক; প্রিন্স উইল্হেল্ম তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য সভায় জানাইবেন, তিনি প্রুশিয়ার রাজা হইলে কি ভাবে রাজ্যচালনা করিবেন! বিস্মার্ক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"প্রিন্স, এ পত্র আপনি আমায় লিখিয়াছেন, যদি কেহ ঘুণাক্ষরে ইহার মর্ম্ম জানিতে পারে, তাহা হইলে কি লজ্জার কথা! যদি ইহার কোনও প্রতিলিপি

আপনার নিকটে থাকে, তাহা নষ্ট করিয়া ফেলুন। আপনার পিতামহ রাজা; পিতা এখনও ক্রাউন্ প্রিন্স; আপনি রাজা হইয়া কি কি করিবেন, তাহা এখনই প্রকাশ্য-ভাবে ঘোষিত করিবেন?" পিতামহের তিরোভাব হইল। পিতা ফ্রেড্রিক্ ৯৯ দিন সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া ইহধাম হইতে অপসৃত হইলেন। যথাকালে তিনি কৈশর হইলেন। কিছুদিন গেল। এক দিন বিস্মার্কের নিকটে তিনি একটি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বৃদ্ধ চান্সেলর কঠোরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন—"এ কি! ইহুদীর ও রোমান ক্যাথলিকের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য সহসা আপনি আইন পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করেন কেন?" উইল্‌হেল্‌ম্ নিরস্ত হইলেন। কাউন্ট ফন্ ওয়াল্‌ডার্শী রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! পুণ্যশ্লোক ফ্রেড্রিক্ কথনও Der Gross (The Great) হইতে পারিতেন না, যদি তাঁহার রাজা হইবার সময় এক জন পরাক্রান্ত চান্সেলর জীবিত থাকিতেন, কিংবা থাকিলেও, যদি সেই চান্সেলরকে কার্য্য হইতে মুক্তি দেওয়া না হইত।"...
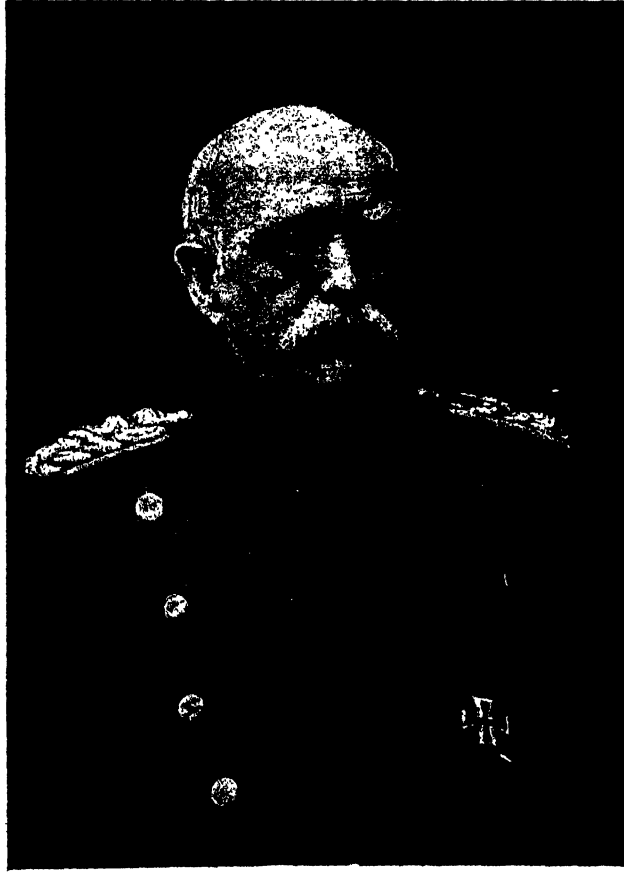
বিস্মার্ক।

আরও অল্প কয়েক দিন গেল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কারখানার শ্রমিক আইনের তর্ক-বিতর্কের অজুহতে বৃদ্ধ চান্সেলরকে কার্য্য হইতে মুক্তি দেওয়া হইল।...আরও ১০ বৎসর গেল। জর্ম্মণ জীবন-নাট্য নব নব রঙ্গে অঙ্কে অঙ্কে লীলায়িত হইয়া চলিল। বিস্মার্ক আর নাই। ওয়াল্‌ডার্শী চীনে বক্সার-বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। উইল্‌হেল্‌ম্-ভ্রমর "সহলে সহলে" তুর্কী-"কমলে"র মধ্যে "পশিল"। আনাতোলিয়ার রেল-লাইন শুধু আঙ্গোরা পর্য্যন্ত যাইয়া থামিবে কেন? দক্ষিণে সাগরোপকূল পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া চলে না কি? গ্রীক্, আর্ম্মিনীয়, ইহুদী সকলেই যুগপৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু সে ভ্রমরগুঞ্জনে ইহুদী মজিল না। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কৈশর বলিলেন—"সীরিয়ার দক্ষিণপ্রান্তে, মিশরের সন্নিধানে এল্-আরিশ্-এ তোমরা তোমাদের ন্যাশনাল ষ্টেট্ গঠিত করিতে পার।" Zionist ইহুদীগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। কৈশর আর ও কথা উত্থাপিত করিলেন না। তিনি কি উদ্দেশ্যে ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও বুঝিতে দিলেন না। ইংরাজ যখন ইহুদীকে লইয়া আফ্রিকায় উপনিবেশের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তখন জর্ম্মণীর সহিত রাষ্ট্রীয় অথবা বাণিজ্যসম্পর্কীয় কোনও প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকটিত হয় নাই। জর্ম্মণী যখন এশিয়ার প্রান্তভাগে ইহুদীরাষ্ট্র স্থাপনের আয়োজন করিলেন, তখন ইংরাজের সঙ্গে নৌ-প্রতিযোগিতা আরব্ধ হইয়াছে। ক্রমে নানা কূট রাষ্ট্র-সমস্যার আলোড়নে এই Zionistসমস্যা কিছুকালের জন্য লোক-চক্ষুর অন্তরালে গিয়া পড়িল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইহুদী-যুবকরা ইংরাজের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিল। যে রুশিয়ার 'পগ্রম' বিভীষিকা ইহুদীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, সেখানে অন্যূন ৩০ হাজার ইহুদী-যুবক রুশের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লড়াই করিতে অগ্রসর হইল। জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়াতে এইরূপ হইল। কার্য্যগতিকে ইহুদী জাতি দুই বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল বটে, কিন্তু Zionistগণ আসল কথা কিছুতেই

তুলিল না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন সাইক্‌স্-পিকো সর্ত্তে সীরিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইল, তখন তাহাদের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল; তাহারা ভাবিল, অন্ততঃ ইংরাজ এইবার তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করাইবেন। কিন্তু তখনও সেই সীরিয়া-বিভাগ-ব্যাপার অনেকটা কালনেমির লঙ্কাভাগের মত অনিশ্চিত ছিল। কাগজে-কলমে ইংরাজ ও ফরাসী স্থির করিলেন যে, সীরিয়ার মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র spheres of influence হইবে। প্যালেষ্টাইন্ ইংরাজের হাতে থাকিবে; দামস্কস্ আরবের অধীন হইবে; বাকি সমস্ত সীরিয়া ফরাসীর অধিনায়কত্বে শাসিত হইবে। পরবৎসর, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, ব্যাল্‌ফোরোক্তি ইহুদী-রাষ্ট্র প্রসঙ্গটাকে অনেক দূর অগ্রসর করাইয়া দিল। কোনও এক শুভলগ্নে ইহুদী গৃহ-প্রবেশের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইল।

প্যালেষ্টাইনে একটি Zionist কমিশনের আবির্ভাব দেখিয়া আরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নানা কথা বলিল। কমিশনের সঙ্গে বৃটিশ পার্লামেন্টের সভ্য মেজর গোর (Major The Hon. W. Ormsby Gore) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া যাইবার পর দলে দলে ইহুদী সৈনিক-গার্ড গঠিত হইল। আরবভাষার মত হিব্রুভাষাও সরকারী অফিস্যাল্ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনের আরব-কংগ্রেস এই নবীন ইহুদী-রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল। কোনও ফল হইল না। তার পর? ··

১৯২০ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে দু'-এক দিন অন্তর এই দুইটি সংবাদ পাওয়া গেল,—

(প্রথমে)—The San Remo Conference has re-affirmed the Balfour Declaration, অর্থাৎ স্যান্ রেমো সন্ধি ব্যাল্‌ফোর-প্রতিজ্ঞার সমর্থন করিয়াছে। (অ্যাঙ্গোরা তুর্কী-প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে এই স্যান্ রেমোর কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল, আজ প্রাসঙ্গিক হইলেও নূতন কথা পাড়িয়া ধৈর্য্যচ্যুত পাঠককে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিব না।)

(পরে)—There is a serious outbreak in Jerusalem জেরুসালেমে ভয়ানক গোলমাল।

গোলযোগ অবশ্যই থামিয়া গেল। সর হার্‌বার্ট স্যামুয়েল হাই-কমিশনর নিযুক্ত হইয়া জেরুসালেমে পদার্পণ করিলেন। সর হার্‌বার্ট খুব ভাল লোক। কিন্তু সম্মিলিত মুসলমান-খৃষ্টান-সঙ্ঘ একবাক্যে বলিল, ছিঃ, এই গোলযোগের সময় এক জন ইহুদী ভদ্রলোককে প্যালেষ্টাইনের হাই-কমিশনর নিযুক্ত করিয়া এখানে পাঠাইতে ইংরাজের একটুও সঙ্কোচ হইল না?

আবার ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনের আরবগণ কংগ্রেসে সম্মিলিত হইয়া নানা অত্যাচার অভিযোগের আলোচনা করিলেন। সীরিয়ায় যখন তুর্কী গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন ইস্তাম্বুলের রাজসভায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সীরিয়ার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ আসন গ্রহণ করিতেন। দেশের ভিতরকার শাসন-ব্যবস্থা অনেকটা সেখানকার অধিবাসিবর্গের স্বায়ত্ত ছিল; অত্যল্পসংখ্যক তুর্কী রাজকর্ম্মচারী, নামমাত্র শাসনভার বহন করিত। রাজকার্য্য-পরিচালনায় অপরিমিত অর্থ-ব্যয় হইত না। যখন যুদ্ধ বাধিল, ইংরাজ অথবা ফরাসীর প্রতি তাহাদের কোনও প্রকার অপ্রীতির ভাব প্রকটিত হয় নাই। জাহাজের জন্য নূতন নূতন বন্দর প্রস্তুত করিবার উদ্দেশে বৃটিশ পূর্ত্ত-বিভাগ উদ্যোগী হইয়া শ্রেষ্ঠিগণকে আহ্বান করিল। ধনী Capitalistরা প্যালেষ্টাইন্ দেখিয়া আসিল। তখনও আরবগণের বিশেষ কোনও চিন্তার কারণ উপস্থিত হয় নাই। যুদ্ধ বাধিল, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই, অর্থাৎ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মক্কার শরিফ হুসেন ইংরাজকে জানাইলেন যে, এডেন বাদ দিয়া সমগ্র আরবদেশের স্বাধীনতা ইংরাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। অক্টোবর মাসের মধ্যেই বৃটিশ গভর্মেণ্ট প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইলেন। প্যালেষ্টাইনের আরবগণ হুসেনের এই সন্ধিতে উল্লসিত হইল কি না, সে সম্বন্ধে হয় ত মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। কিন্তু ৫ বৎসর পরে, যখন সার স্যামুয়েল হার্‌বার্ট হাই-কমিশনর হইলেন, তখন প্যালেষ্টাইনে আরবগণকে নানা প্রকারে চাপিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইল,—ইহাই আরবগণের প্রধান অভিযোগ। আরবদেশের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর তাহাদের বেশী ছিল না।

নানা গোলযোগের ভিতর দিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দ শেষ হইল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পরে পরে এই কয়েকটি সংবাদ পাওয়া গেল,—

(প্রথমে)—The Colonial Office takes over the mandatory areas from the Foreign Office অর্থাৎ সীরিয়া ইরাক্ প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণভার বৃটিশ

পর-রাষ্ট্র-বিভাগের হাত হইতে সরাইয়া লইয়া উপনিবেশ-বিভাগের হাতে ন্যস্ত করা হইল। মিঃ উইন্‌ষ্টন্ চর্চ্চিল কর্ত্তা হইলেন।

(পরে)—মিঃ চর্চ্চিল মিশর পরিদর্শন করিতে গেলেন। প্যালেষ্টাইনের আরবগণ জনকতক ভদ্রলোককে ইহুদী ন্যাশনাল হোম সম্বন্ধে আবেদন করিবার জন্য তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিল। তিনি তাঁহাদের সহিত দেখা করিলেন না।

(আরও পরে)—উইন্‌ষ্টন্ প্যালেষ্টাইনে আসিলেন। Zionist deputation cordially received...Popular demonstration at Haifa...অর্থাৎ Zionist ইহুদীদের কথা তিনি যত্নসহকারে শুনিলেন; হায়ফার অধিবাসিগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিল।

কয়েক দিবসের মধ্যে, ১লা মে তারিখে, যাফ্‌ফায় যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইল, তাঁহাতে বহুসংখ্যক আরব ও ইহুদী প্রাণ হারাইল। তদন্ত করিবার জন্য ইংরাজ এক কমিশন বসাইলেন। তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ যে, সমগ্র অ-যুডীয় অধিবাসী (non-Jewish population) ইহুদী-বিরোধী।

আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। বিগত ২২এ জুলাই তারিখে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, প্যালেষ্টাইনে ইংরাজের রক্ষকতায় নেশন-সঙ্ঘ (League of Nations) সম্পূর্ণ সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

বিলাতে বাঙ্গালী ছাত্র
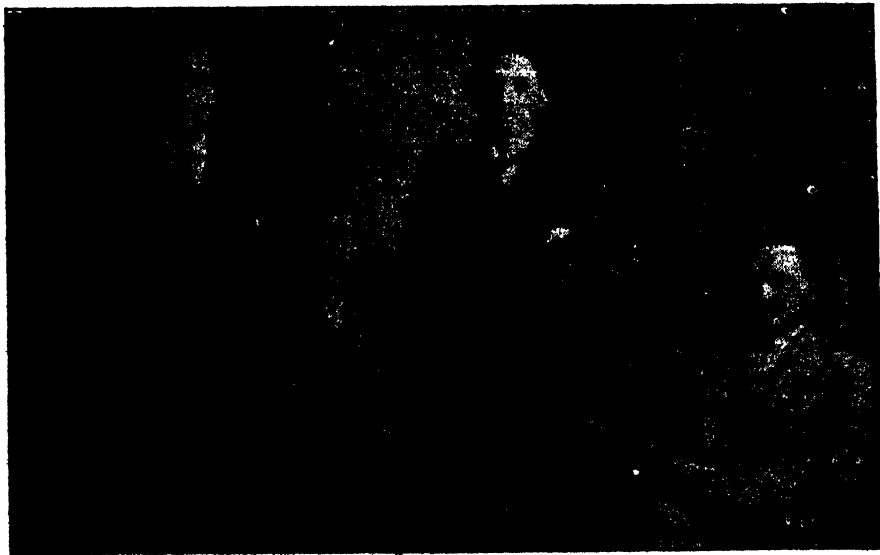
বাম দিক হইতে—

(১) শ্রীজ্ঞানচন্দ্র সিংহ—রসায়ণ ও কাগজ প্রস্তুত শিখিতেছেন।
(২) শ্রীসুধাকর মুখোপাধ্যায়—ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ারিং শিখিতেছেন।
(৩) শ্রীরাখালদাস সোম—ইনকর্পোরেটেড একাউনট্যান্ট হইতেছেন।
(৪) শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ—এসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

ঘরে বাহিরে।

স্তূপ-মানব—
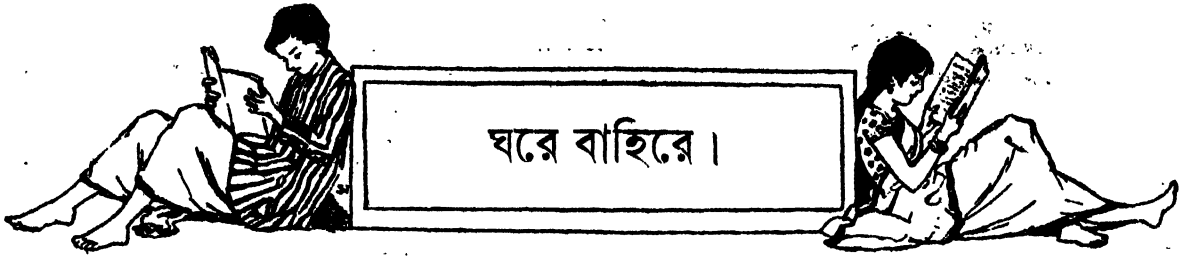
পাহাড়টা দূর হইতে গম্ভীর ও উদার দেখায়, নিকটে আসিলে দেখায় না। আত্মীয়তা অনেক সময় অবজ্ঞার কারণ হইয়া থাকে—Familiarity breeds contempt. খৃষ্ট ইহুদীর সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই, বুদ্ধের আদর ভারতের বাহিরে হইয়াছিল। মহাত্মা গন্ধীকে যাহারা চিরদিন নাড়িয়া চাড়িয়া আসিল, তাহারা তাঁহাকে চিনিল না, গৌরবের মুকুট না দিয়া শীর্ষে কণ্টক-মুকুট পরাইয়া দিল। আর যাহারা দূরে—বহু দূরে অনন্ত-বিস্তার আটলাণ্টিকের অপর পারে থাকিয়া তাঁহার অমৃত-বাণীর আস্বাদ গ্রহণ করিল, তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর-জানিত বলিয়া বুঝিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিল। যুগ-প্রবর্ত্তক পুরুষ-প্রধানের ইহাই কি লক্ষণ?

ভাষাই কি মুক্তি—

বাঙ্গালা কি উর্দ্দু হইবে, ইহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া ফল কি—মনান্তরের সৃষ্টিরই বা প্রয়োজন কি? ভাষা মুক্তির বাহন হইতে পারে, কিন্তু মুক্তি নহে। এখন ভারতের লক্ষ্য—মুক্তি; নৈতিক, রাজনীতিক, সমাজনীতিক,—সকল বন্ধন হইতে মুক্তি। সে মুক্তির সাধন-পথে যে ভাষা কার্য্যকরী হইবে, সেই ভাষাই গ্রহণ কর। ইহাতে বিবাদ নাই। আর একটা কথা। বাঙ্গালা কি বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা নহে? মুসলমান বাঙ্গালী কবি, মুসলমান বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক, মুসলমান বাঙ্গালী সংবাদপত্র-সম্পাদকের অভাব আছে কি? বাঙ্গালী মুসলমান কি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়া, বাঙ্গালার সন্তান বলিয়া গৌরব অনুভব করেন না? সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ামক যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতেও কি মনে হয় না, বাঙ্গালায় বাঙ্গালী মুসলমানের শতকরা ৯০ জনের বাঙ্গালা ভাষাই মাতৃভাষা?

প্যান-ইসলাম—

প্যান-ইস্লাম বলিতে শিহরিয়া উঠি কেন? কারণ, স্বার্থবাদী আর্য্যদ্বেষী আমায় বুঝাইয়াছে—যেমন ন্যায়ের ও সত্যের অবতার ইংরাজ ঐতিহাসিক বুঝাইয়াছে, ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে এ দেশ বর্ব্বরতায় মণ্ডিত ছিল—তেমনই প্যান-ইস্লাম বলিতে সমগ্র জগতে মুসলমানের উত্থান, পরন্তু ইস্লামের বিজয় পতাকার সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা। প্যান-ইস্লাম কি তাহাই? প্যান-ইস্লাম মিশরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, পবিত্র কোর-আন সরিফের উপদেশ অনুসারে মুসলমান দেশ হইতে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের উচ্ছেদসাধন করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র প্রচার করিয়াছিল। প্যান-ইস্লাম জগতে সকল জাতিকে, সকল মানুষকেই স্বাধীন দেখিতে চাহে, কেন না সকল মানুষই এক পরম পিতার সন্তান, তাহাদের সকলেরই সমান অধিকার। প্যান-ইস্লাম মিশর ও তুর্কীর স্বেচ্ছাচার শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, পারস্যের শাহ নসীরুদ্দীন এক দিন প্যান-ইস্লামের ভয়ে কম্পান্বিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভারতের প্যান-ইস্লামবাদীদিগকে যাঁহারা extra-territorial (অর্থাৎ ভারতের বাহিরে স্বাধীন মুসলমান দেশের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি) বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা লোককে ভ্রান্তপথে পরিচালনা করিতেছেন, বুঝিতে হইবে।

ফুরাইল লীলাখেলা—

মানুষ পৃথিবী চালায়, না পৃথিবী মানুষকে চালায়? মার্কিণ পণ্ডিত এমার্সন যাঁহাদিগকে representative men বলিয়াছেন, তাঁহার মতে তাঁহারাই পৃথিবী চালাইয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ পৃথিবীকে যেমন সাজে তাঁহারা তাঁহাদের ভাবে সাজাইয়াছেন, পৃথিবীর লোক অনেকটা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিয়াছে। এমার্সন এমন লোকের মধ্যে নেপোলিয়ান, সোয়েডেনবর্গ প্রভৃতির নাম করিয়াছেন। সেকালের সে দানা-দৈত্যদের (giants) তুলনায় বর্ত্তমানের লয়েড জর্জ্জ কতটুকু? অথচ বর্ত্তমানের ইংরাজ লয়েড জর্জ্জকে লইয়া হুলোমালা করিতে ক্লান্ত হইতেছে না। জাতির অবনতির পরিমাপ ইহা হইতে করা যায় না কি? ইংরাজের মধ্যে এ কথাটা যে কেহ একবারে বুঝেন না, তাহা নহে। এক জন লিখিয়াছেন:—"বর্ত্তমান খিচুড়ী মন্ত্রি-সভা (coalition)

দেশের লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইয়া এখনও টিকিয়া রহিয়াছে, ইহাতে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন; কেহ কেহ ইহাতে লয়েড জর্জ্জকে বাহবা দিতেছেন, কেন না, লয়েড জর্জ্জের মত মানুষ মাথায় আছে বলিয়া, মন্ত্রিসভা টলিয়াও টলে না। কিন্তু লয়েড জর্জ্জ যে যাদুকরের মত ভেল্কীর তাক লাগাইয়া দেশের লোকের নিকট মস্ত বড় রাজনীতিক সাজিয়া বসিয়া আছেন, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ইংলণ্ডে এখন representative man বা যুগ-মানবের অভাব হইয়াছে।" এই অভাবের প্রভাব ইংলণ্ডের সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য,—সর্ব্বত্রই mediocre মানবের ছড়াছড়ি, যুগ-মানব নাই, তাই এত ভাব দৈন্য। রোমক-সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব্বে এমন ভাব-দৈন্য দেখা গিয়াছিল। ইহা জাতির পক্ষে শুভ নহে।

প্রাচ্যের উত্থান—

প্রাচ্যে যুগ-মানবের অভ্যুত্থান হইয়াছে, এ কথা প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ জড়বাদী মার্কিণের বুধমণ্ডলীও স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচ্যই চিরদিন জগৎকে নূতন ভাবের ধারা দিয়া আসিয়াছে, ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছে। বুদ্ধ, কনফিউসাস, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, শঙ্কর,—সবই প্রাচ্যের লোক। অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট, প্রতীচ্যকে তৃপ্ত, শান্ত ও সন্তুষ্ট করিবার মৃত-সঞ্জীবনী সুধা লইয়া কে আজ অবতীর্ণ? গন্ধী ও লেনিন। গন্ধী প্রাচ্যের লোক, লেনিনও তাতাই, কেন না, লেনিন রুষিয়ান হইলেও আবাল্য সাইবিরিয়ায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত। এই দুই যুগ-মানব নূতন বাণী আনিয়াছেন—নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন সমাচার ঘোষণা করিতেছেন,— ক্ষুদ্র মানুষের তাই এত চমক লাগিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্য বংশধরগণের এ চমক থাকিবে না, তাহারা তাঁহাদের মুক্তি-মন্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। যে দিন তাহা হইবে, সেই দিন জগৎ ধ্বংসের অগ্রদূত Capitalism, Imperialism ও Militarismএর পাষাণচাপ হইতে মুক্তি পাইবে।

এ দেশের শিশুমৃত্যু—

এ দেশে শিশুমৃত্যুর হার অন্য দেশের সহিত তুলনায় কিরূপ? বোম্বাই সহরের সহিত লণ্ডনের তুলনা করিয়া দেখাইতেছি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রতি হাজার শিশুজন্মের হারের অনুপাতে প্রতি হাজারে ৮০টি শিশুমৃত্যু হইয়াছে। আর বোম্বাই সহরে প্রতি হাজার শিশু-জন্মের অনুপাতে ৬ শত ৬৬টি শিশুমৃত্যু হইয়াছে। জীবন্ত জাতির কি ইহাই লক্ষণ?

বাঙ্গালার জন্ম ও মৃত্যু—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি—

জিলা	মোট লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
বর্দ্ধমান বিভাগ—			
বর্দ্ধমান	১৪৩৮৯২৬	০	৬·৫
বীরভূম	৮৪৭৫৭০	০	৯·৪
বাঁকুড়া	১০১৯৯৪১	০	১০·৪
মেদিনীপুর	২৬৬৬৬৬০	০	৫·৫
হুগলী	১০৮০১৪২	০	০·৯
হাওড়া	৯৯৭৪০৩	৫·৭	০
মোট	৮০,৫০,৬৪২	৫·৭	৩২·৭
প্রেসিডেন্সি বিভাগ—			
কলিকাতা	৯০৭৮৫১	১·৩	০
২৪ পরগণা	২৬২৮২০৫	৮	০
নদীয়া	১৪৮৭৫৭২	০	৮
মুর্শিদাবাদ	১২৬২৫১৪	০	৮
যশোহর	১৭২২২১৯	০	১
খুলনা	১৪৫৩০৩৪	৬·৭	০
মোট	৯৪,৬১,৩৯৫	৮·৮	১৭
রাজশাহী বিভাগ—			
রাজশাহী	১৪৮৯৬৭৫	০·৬	০
দিনাজপুর	১৭০৫৩৫৩	·১	০
জলপাইগুড়ী	৯৩৬২৬৯	৩·৭	০
দার্জ্জিলিং	২৮২৭৪৮	৬·৫	০
রঙ্গপুর	২৫০৭৮৫৪	৫·১	০
বগুড়া	১০৪৮৬০৬	৬·৬	০
পাবনা	১৩৮৯৪৯৪	০	২·৭
মালদহ	৯৮৫৬৬৫	০	১·৮
মোট	১০৩,৪৫,৬৬৪	২২·৬	৪·৫

জিলা	মোট লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
ঢাকা বিভাগ—			
ঢাকা	৩১২৫৯৬৭	৮৩	০
ময়মনসিংহ	৪৮৩৭৭৩০	৬৯	০
ফরিদপুর	২২৪৯৮১৮	৪·৮	০
বাখরগঞ্জ	২২৬৩৭৫৬	৮·২	০
মোট	১২৮,৩৭,৩১১	ঃ৮২	০
চট্টগ্রাম বিভাগ—			
চট্টগ্রাম	১৬১১৪২২	৬·৮	০
ত্রিপুরা	২৭৪৩০৭৩	৯·৭	০
নোয়াখালি	১৪৭২৭৮৬	১·৩	০
পার্ব্বত্যদেশ	১৭৩২৪৩	১২·৬	০
মোট	৬০,০০,৫২৪	৪২·১	০
মিত্ররাজ্য—			
কোচবিহার	৫৯২৪৮৯	০	০·১
ত্রিপুরা	৩০৪৪৩৭	৩২·৬	০
মোট	৮,৯৬,৯২৬	৩২·৬	০·১

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, পাবনা, মালদহ ও কোচবিহারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া হ্রাস হইতেছে। সুতরাং এ সকল জিলার যে ধ্বংসের বিলম্ব নাই, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

কেন এই ধ্বংস—

ধ্বংসের কারণ যে রোগ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগে বাঙ্গালার পল্লী নিত্য ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে। এ রোগের মুখ্য কারণ যাহাই থাকুক, অভাবই যে ইহার গৌণ কারণ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অর্থাভাব, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, সুপানীয়ের অভাব, সুপথ্যের অভাব, সুচিকিৎসার অভাব, ঔষধের অভাব, সেবার অভাব, অভাব কিসের নাই? সব চেয়ে বড় অভাব অর্থাভাব। অর্থাভাবে সুপেয়, সুখাদ্য, সুপরিধেয়, সুচিকিৎসা,—সকল সু-রই অভাব অবশ্যম্ভাবী। একবার রোগের বিষ শরীরে প্রবেশলাভ করিলে, অভাবহেতু রোগীর রোগের বিপক্ষে যুঝিবার সামর্থ্য থাকে না, ফলে জীবনীশক্তির হ্রাস। এই নিত্য অভাবের বিষ-দংশন হইতে জাতিকে অব্যাহতি দিবার জন্য মহাত্মা পল্লী উটজ শিল্পের প্রচলনে মুক্তি-মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন। অবসরকালে লোক ঘরে ঘরে কার্পাস চাষ করিতে, তুলা জন্মাইতে, সূতা কাটিতে পারে, এই জন্য চরকার প্রচলন। তাই মহাত্মা চরকার দ্বারা স্বরাজের আবির্ভাবের কথা বলিয়াছিলেন। আগে জাতিকে বাঁচিতে হইবে, তাই মহাত্মা বাঁচিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, বিলাসের মোহ কাটাইয়া পরিশ্রমের দ্বারা স্বরাজ সাধনা করিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

ফল কি হইয়াছে?—

মরণোন্মুখ বাঙ্গালী কি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে চরকা বসাইয়াছে, নিজের ঘরের অভাব নিজে ঘুচাইবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে? প্রথম উৎসাহের দিনে বাঙ্গালী চরকাকে বুকে লইয়াছিল। সে সময়ে হাতে কাটা সূতা মণকরা ৮০৲।৯০৲ টাকায় বিক্রয় হইত। লোক এই অতিরিক্ত লাভের আশায় এবং একটা ভাবের প্রেরণায় সে সময়ে ঘরে ঘরে চরকা কাটিত। যত সূতা প্রস্তুত হইত, তত ক্রেতা পাওয়া যাইত না। তথাপি সূতা কাটার বিরাম ছিল না। দর মণকরা ৮০৲।৯০৲ হইতে ৪০৲।৫০৲ টাকায় নামিয়া গেল। তথাপি উৎসাহ হ্রাস হয় নাই। ঠিক সেই সময়ে বর্দ্দলইয়ের রায় বাহির হইল। অমনই ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর উৎসাহ কমিল, চরকার আদর কমিল। বিশেষতঃ মহাত্মার বিচার ও দণ্ডের পর লোকের মুখে শুনা যাইতে লাগিল,—"স্বরাজ ত এক বৎসরে পাওয়াই গেল না, অধিকন্তু মহাত্মাই জেলে গেলেন; তবে আর ও ছাই চরকায় কায কি? দাও উহা উনানে জ্বালাইয়া।" অর্থাৎ লোক আসল মূলের কথা ভুলিয়া গেল, নিজের অভাব-সংস্থার সমাধানের কথা একেবারে বিস্মৃত হইল। বলিল, "১৲ টাকা অথবা ৸০ আনা তুলার সের কিনিয়া এক মণ সূতা ৪০৲ টাকায় বেচিয়া লাভ?" কিন্তু মহাত্মা যে তুলা কিনিয়া সূতা বেচিয়া লাভ করিবার উপদেশ দেন নাই, বরং নিজের আঙ্গিনায় তুলা উৎপন্ন করিয়া নিজে সূতা কাটিয়া কাপড় বুনাইয়া লইয়া নিজের পরিবারের

অভাব-মোচন করিতে বলিয়াছিলেন, সে কথাটা তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখিল না। আবার জাতিটা মৃত্যুমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্ত স্রোতে গা ভাসান দিতে অগ্রসর হইয়াছে।

উপায় কি ?—

এখন এ রোগ প্রতীকারের একমাত্র উপায়—আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া। প্রতীচ্যের বণিকরা যেমন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া আপনাদের ব্যবসায়কে বাঁচাইয়া রাখে, মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া বণিক যেমন করিয়া আপনাদের মধ্যে একতাবদ্ধ হইয়া নিজেদের মালের কাটতির উপায়বিধান করে, আমাদিগকেও তেমনই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তুলার চাষ ও চরকায় সূতা কাটা চালাইবার উপায়বিধান করিতে হইবে। মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া বণিক বিদেশী বস্ত্র বেচে বটে, কিন্তু কিনে কে ? আমরাই ত ? তবে সন্ন্যাসীর প্রায়োবেশনে বা ছেলেদের পিকেটিংয়ে কি হইবে ? তাহা হইলে বাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে তুলার চাষ করুক, সে তুলা যাহাতে বাঙ্গলার বাহিরে রপ্তানী না হয়, তাহাই করুক এবং তুলার দাম যাহাতে অকারণ না বর্দ্ধিত হয়, তাহার উপায়বিধান করুক। তুলার দাম ন্যায়সঙ্গত হইলে সূতার দাম কমিবে, সূতার দাম কমিলে কাপড়ের দামও কমিবে। কাযেই তখন ক্রেতাকে ভাবিতে হইবে না যে, ৫৲ টাকা যোড়ার বিদেশী বস্ত্র কিনি, কি ৭৲ টাকা জোড়ার খদ্দর কিনি। সস্তায় পাইলে লোক আপনিই খদ্দর কিনিবে, মাড়োয়ারীর দ্বারে কাহাকেও ধর্ণা দিতে যাইতে হইবে না।

তবে কালোপযোগী হওয়াও চাই—

তবে উটজ শিল্প উদ্ধার করা চাই বলিয়া যে কালোপযোগী শিল্পের প্রসার বন্ধ রাখিতে হইবে, এমন কথা আমরা বলি না। সে শিল্পেরও সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি হউক, কিন্তু সেই সঙ্গে যেন প্রতীচ্যের Capitalism পাপ এ দেশে না আইসে, ইহাই কামনা। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমাদেরই দেশের নারিকেল-ছোবড়া বা নারিকেল-শস্ত (কোপরা) বিদেশে রপ্তানী হইয়া উহাই আবার কলজাত পণ্য হইয়া এ দেশে ফিরিয়া আসিয়া বহুগুণ অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। আমরা এই শিল্প হস্তগত করি না কেন ? তেমনই পাট, কার্পাস, তুলা, তামাক ইত্যাদির সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। পাটের কথাই ধরা যাউক। কাঁচা পাট এ দেশে ৬৲।৭৲ মণ হইতে ১২৲।১৪৲ মণ পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। এই পাট বিদেশী (স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি প্রভৃতি সহরে) রপ্তানী হইয়া কারখানায় কলজাত পণ্যে (যথা চট, বোরা, বস্তা, সতরঞ্চি ইত্যাদি) পরিণত হইয়া আবার এ দেশেই বহুগুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। এ দেশেও অনেক পাটের কল, চটের কল আছে ; এক বৎসর ঐ সব কলে প্রায় ৪০ লক্ষ মণ পাটের পণ্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ঐ পণ্য ৫২ কোটি টাকা মূল্যে রপ্তানী হইয়াছিল। কাঁচা পাটের মূল্য মণ করা ১২৲ টাকা হইলে ১ কোটি মণে ১২ কোটি টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু উহার পণ্যের দাম কাঁচা মাল অপেক্ষা অনেক বেশী (১২৲ টাকার কাঁচা মাল পণ্যে পরিণত হইয়া বিক্রীত হইলে ১০০৲ অধিক পাওয়া যায়)। এই ভাবে কাঁচামাল হইতে পণ্য প্রস্তুত করিবার প্রবৃত্তি আমাদের জাগে না কেন ? কেহ কেহ বলিবেন, টাকার অভাব, মূলধনের অভাব। কিন্তু সরকারী লোনে বা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে ত টাকার অভাব হয় না !

কৃষকের কি হইবে—

তাহার পর কৃষির কথা। প্রথমেই বলিয়া রাখি, এ দেশ কৃষি-প্রধান দেশ, সুতরাং শিল্প অপেক্ষা কৃষির কথাই এ দেশে অধিক প্রয়োজনীয়। কৃষকের দুরবস্থা দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে মহাত্মাজীর উপদেশমত অবসরকালে চরকা ধরিতে হইবে। চরকা ভিন্ন তাহাদের অভাবের হাত হইতে আশু মুক্তির অন্য উপায় নাই ; তাহারা বৎসরে সব কয়মাস চাষ করে না। যে কয়মাস বসিয়া থাকে, সে কয়মাস তুলা উৎপন্ন করিতে ও চরকা কাটিতে অনায়াসে পারে। তাহার পর তাহাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ঋণ-মুক্ত হওয়া। সকল দেশেই কৃষক ঋণ লইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের মত কোথাও এমন ভয়ঙ্কর সুদখোর মহাজন নাই, অপরিণামদর্শী কৃষকও নাই। এ দেশের কৃষক দুই পয়সা অধিক রোজগার করিলে কারিগরেরই মত দুই দিন ঘরে বসিয়া থাকে, কাযে বাহির হয় না, অথবা ভাল মাছ বা ভাল বিলাসের দ্রব্য ক্রয় করে। এমন দেখা গিয়াছে, কৃষক দিনে ১৲ টাকা রোজগার করিয়া ৳০ আনার মাছ কিনিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, অথচ ঘরে মাছ ভাজিবার তেল নাই। এই অপরিণামদর্শিতা দূর করিতে

হইবে। ইহা এক দিনে যাইবার নহে, অভ্যাস করিতে হইবে। অপরিণামদর্শিতার ফলে কৃষক সঞ্চয়ী হয় না বলিয়া বাজারে তাহার Credit থাকে না, তাই দুর্দ্দিনে কর্জ্জ সংগ্রহ করিতে হইলে তাহাকে অত্যধিক হারে সুদ দিয়া মহাজনের নিকট ঋণ সংগ্রহ করিতে হয়। মহাজন এক জন 'অবস্থাপন্ন' ব্যক্তিকে যে হারে যত বেশী টাকা ধার দিবে, কৃষককে তাহাতে কখনও দিবে না। এজন্য মহাজনের ঋণে কৃষকের হাল হেলে—এমন কি, ঘরের ঘটীবাটিও বেচিতে হয়। এই অবস্থা দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে পরিণামদর্শী হইতে হইবে, চরকা চালাইতে হইবে এবং সমবায় প্রথায় সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে Co-operative credit society কৃষকের উপকার সাধন করিতেছে। কৃষকরা একটু বুঝিতে শিখিলে আপনারাই এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের শিক্ষিত লোকের সাহায্যে ও পরামর্শে যৌথব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারে। মহাজনদের সুদের হার শতকরা ২৫৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ। আবার বিশেষ স্থলে শতকরা ১২৫৲, ১৫০৲, ২০০৲ টাকা সুদও দেখিতে পাওয়া যায়। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট প্রথায় এই অত্যাচার নিবারিত হইতেছে। কৃষকরা যদি নিজে সমবায় প্রথা প্রবর্ত্তন করে, তাহা হইলে কালে নিশ্চিতই উহা শুভফলপ্রদ হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

বিষবাষ্পে বিপন্নের উদ্ধারসাধন

বিলাতে দূষিত বাষ্পপূর্ণ স্থানে যাইয়া বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়। বিপদপূর্ণ স্থানের যাত্রীরা আত্মরক্ষার উপায় করিয়া গমন করেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রি-জাহাজ।

সংপ্রতি আমেরিকায় একখানি নূতন জাহাজ অভিনব প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নাম "ম্যাজেষ্টিক্।" এ পর্য্যন্ত যাত্রিবহনের জন্ম ইহার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও দীর্ঘ অর্ণবপোত একখানিও নির্ম্মিত হয় নাই। নৌ-বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পী ডাক্তার আর্ণেষ্ট ফোরস্টার্ "ম্যাজেষ্টিকের" নক্সা প্রস্তত

ম্যাজেষ্টিক জাহাজ।

করেন। বহু যত্ন, পরিশ্রম ও আলোচনার পর তিনি অভিনব প্রণালীতে এই জাহাজ নির্ম্মাণের নক্সা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত করেন। জাহাজখানি অনেকটা ক্রুজারের আকারে গঠিত হইয়াছে।

জাহাজখানির গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় সাড়ে চব্বিশ মাইল হইবে। উহা চালাইতে ৬৩ হাজার ঘোড়ার বেগ লাগে। কয়লার পরিবর্ত্তে তৈলের সাহায্যেই এই জাহাজ চলে। ইহাতে সুবিধাও যথেষ্ট হইয়াছে। প্রায় ১৮ লক্ষ মণ ওজন লইয়া ম্যাজেষ্টিক অনায়াসে সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারে। একবারের যাত্রার প্রায় দেড় লক্ষ মণ তৈলের প্রয়োজন।

যাত্রীদিগের শয়নকক্ষ, উপবেশনাগার প্রভৃতি উষ্ণ-বাষ্পের সাহায্যে গরম রাখিবার বিশেষ বন্দোবস্ত এই জাহাজে আছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর দরবারগৃহগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে উত্তপ্ত রাখা হয়। প্রত্যেক যাত্রী প্রয়োজনানুরূপভাবে নিজের ঘরকে ইচ্ছামত উত্তপ্ত রাখিতে পারেন, এমন বন্দোবস্তও জাহাজে বিদ্যমান। কোন কোন ছোট সহরে তাড়িতালোকের যেমন বন্দোবস্ত থাকে, এই জাহাজে তদপেক্ষা অনেক সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সমগ্র জাহাজ বিদ্যুতালোকে আলোকিত করিবার সবিশেষ বন্দোবস্ত আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছাড়াও আর এক স্থলে স্বতন্ত্র ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি কোনও কারণে অকস্মাৎ প্রধান কেন্দ্রের কায কিছুক্ষণের জন্ম বন্ধ হইয়া যায়, সেই সময় জাহাজকে আলোকিত করিবার জন্মই এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে। ৮০ ঘোড়ার শক্তিতে এই বিদ্যুতাধার হইতে আলোক নির্গত হয়। ৮শত স্বতন্ত্র ল্যাম্পের সহিত এই ক্ষুদ্র বিদ্যুৎকেন্দ্রের তার সন্নিবিষ্ট।

জাহাজ চালাইবার "বয়লার" কক্ষে সর্ব্বসমেত ৪৮ জন লোকের দ্বারাই কায চলে। ইহারাই পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত দিন ও রাত্রি "বয়লার" পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। "অবিবক"

(fire rooms) সমূহ পরিষ্কার রাখিবার জন্য ৩৬ জন কায করে। এই বিভাগে সর্ব্বসমেত ৪৮ জন কর্ম্মচারী আছে। যদি তৈলের পরিবর্ত্তে কয়লার সাহায্যে জাহাজ চালাইবার ব্যবস্থা হইত, তবে শুধু এই বিভাগেই ৩ শত ৭৭ জন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইত। কয়লাও অনেক লাগিত। দৈনিক ২৮ হাজার মণ কয়লা না হইলে, এই জাহাজ চালান সম্ভবপর নহে। আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র একবার উত্তীর্ণ হইতে গেলে এই জাহাজের জন্য ১ লক্ষ ৬৮ হাজার মণ কয়লার প্রয়োজন হইত।

"ম্যাজেষ্টিক" জাহাজে যাত্রীদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। সমগ্র জাহাজে ৯টি 'ডেক্' আছে। জাহাজটি ১ শত ফুট চওড়া, ১ শত ফুট গভীর ও প্রায় সহস্র ফুট দীর্ঘ। ডেকগুলির মধ্যে ৫ নিম্নতলে অবস্থিত। বিস্তৃত ডেকের উভয় পার্শ্বে কক্ষসমূহ বিদ্যমান। তাহাদের দ্বারগুলি এমনভাবে নির্ম্মিত যে, কক্ষমধ্যে এক বিন্দু জলও প্রবেশ করিতে পারে না। সেতুর উপর হইতে দরজাগুলি ইচ্ছামত রুদ্ধ ও মুক্ত করা যায়। পঞ্চম ডেকের উপর আর ৪ অতিরিক্ত ডেক বিদ্যমান। এই ৪ ডেকেও "কেবিন্" ও সাধারণের ব্যবহারোপযোগী কক্ষসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মিত। ৯টির মধ্যে যাত্রীদিগের জন্য ৭টি ডেক নির্দ্দিষ্ট আছে। যাত্রীদিগের ব্যবহারার্থ ডেকের নিম্নভাগ দিয়া ধূমনির্গমন নলগুলি অবস্থিত। এই ব্যবস্থায় যাত্রীদিগের কোনই অসুবিধা হয় না। প্রধান "সেলুনের" সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিলে, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সবই নেত্রপথে পতিত হয়। এক প্রান্তের অবস্থিত কক্ষের সম্মুখবর্ত্তী বারান্দা দিয়া সমগ্র জাহাজের যাবতীয় কক্ষের সম্মুখে অবস্থিত বারান্দায় যাতায়াত করা যায়। যদি কেহ এই ভাবে পরিক্রম করেন, তবে তিনি ৯ মাইল পর্য্যটনের ফল পাইবেন। সমুদয় "ডেকের" বিস্তৃতি মাপিয়া দেখিলে, প্রায় সাড়ে ৭ 'একর' হইবে। কোনও যাত্রী যদি শরীররক্ষার জন্য জাহাজের উপর ভ্রমণ করিতে চাহেন, তবে ডেকের চতুঃপার্শ্ব চারিবার ঘুরিয়া আসিলেই ১ মাইল ভ্রমণের ফল পাইতে পারেন। জাহাজের প্রধান ভোজনাগারে ৬ শত ৫২ জনের বসিবার আসন আছে। উহার দৈর্ঘ্য ১ শত ১৭ ফুট, বিস্তৃতি ৯৮ ফুট, আর উচ্চতা ৩৭ ফুট হইবে। যদি জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা অধিক হয়, তবে "এ লা কার্টে" নামক "রেস্তোরাঁ"তে দুই শত ব্যক্তির ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

জাহাজের প্রধান ভোজনাগার।

প্রধান সেলুন বা বিশ্রামাগার দৈর্ঘ্যে ৭৬ ফুট, প্রস্থে ৫৪ ফুট এবং উচ্চতায় ২৬ ফুট হইবে। এই বিশাল, বিস্তৃত কক্ষমধ্যে একটি স্তম্ভ পর্য্যন্ত নাই। উপরের ছাত প্রাচীরের উপরেই ন্যস্ত; কিন্তু এমনই সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, মাঝে মাঝে থাম দিবার প্রয়োজনই হয় নাই। বাস্তবিক কক্ষটি যেমন সুদৃশ্য, তেমনই সুন্দরভাবে সজ্জিত। কক্ষমধ্যে প্রবেশমাত্রই মন মুগ্ধ হয়।

এই জাহাজের মধ্যে আর একটি চমৎকার স্থান আছে। একটি সুন্দর প্রশস্ত কক্ষমধ্যে "পাম্" কুঞ্জ আছে। তাহা চেয়ার, টেবল প্রভৃতিতে সযত্নে সজ্জিত। নিভৃতে বসিয়া আলাপ করিবার পক্ষে এই স্থানটি অতিশয় উপযোগী। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকে স্থানটি উদ্ভাসিত থাকে। দিবা-সন্ধ্যায়,

অথবা প্রভাতে বা মধ্যাহ্নে যাত্রিগণ ইচ্ছামত কুঞ্জমধ্যে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতে পারেন।

আধুনিক যুগে প্রত্যেক উচ্চ-শ্রেণীর যাত্রি-জাহাজে অবগাহন-স্থান ও সন্তরণের ব্যবস্থা থাকে। "মাজেষ্টিক" জাহাজের "পম্পীয়" স্নানাগারটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।
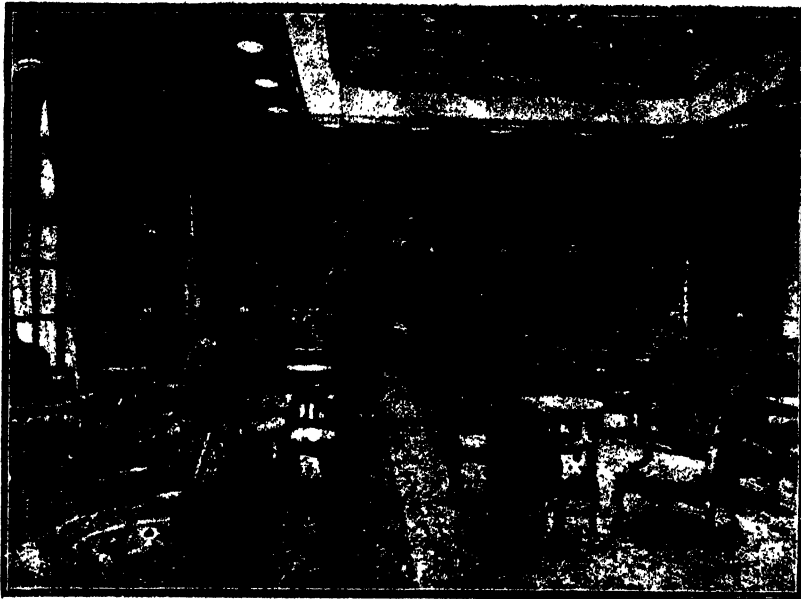
ভূগর্ভনিহিত রোমক হামামের আদর্শে এই স্নানাগার নির্ম্মিত। প্রাচীরে, স্তম্ভে কারুকার্য্য, মর্ম্মর প্রস্তর এবং নানাবর্ণের ও মূল্যবান্ কাচখণ্ড সিমেণ্টের সাহায্যে জোড়া দিয়া সমগ্র স্নানাগারটি সুসজ্জিত করা হইয়াছে। স্থপতি-শিল্প-নৈপুণ্য দর্শনমাত্রেই মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এমন চমৎকার স্নানাগার অন্য কোনও যাত্রি-জাহাজে নাই। এই বৃহৎ সলিলাধারের চারি পার্শ্বে তুরস্ক-দেশীয় হামামের অনুকরণে বৈদ্যুতিক আলোকদীপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নানাগারসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত। এই বৃহৎ জলাশয়ে যাত্রিগণ ইচ্ছামত সন্তরণ করিতে পারেন।

বিশ্রামাগার।

'পাম-কুঞ্জ' কক্ষের এক প্রান্তের দৃশ্য।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্য এই জাহাজে বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগার, পাঠাগার ও ধূমপান-কক্ষ প্রভৃতি গতযুগের প্রথম শ্রেণীর যাত্রি-জাহাজের অনুরূপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোজনাগারে একত্র ৫শত ব্যক্তির বসিবার স্থান আছে। বিশ্রামাগার, পাঠাগার প্রভৃতি সুসজ্জিত এবং আরামপ্রদ। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্যও এই জাহাজে সুসজ্জিত বিশ্রামাগার, ভোজন-কক্ষ, ধূমপানাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। কোন কক্ষে ২ জন, কোন কক্ষে ৩ জন, আবার কোনও প্রশস্ত কামরায় ৪ জনের শয়নেরও ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু সে কামরাগুলি সুসজ্জিত এবং পর্য্যাপ্ত আলোকমালায় সুশোভিত। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা যাহাতে পরম আরামে থাকিতে পারে, সর্ব্ববিধ সুখ ও সুবিধার অধিকারী হইতে পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা এই জাহাজে আছে।

বিংশ শতাব্দীতে এমন দীর্ঘ, সুসজ্জিত, আরামপ্রদ

পম্পীয় স্নানগার ও সন্তরণ-ক্ষেত্র।

করা আদৌ সম্ভবপর নহে, কারণ, লিখিত অংশ উত্তাপের সাহায্যে কাগজের উপর এমন ভাবে বসিয়া যায় যে, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা লোপ-সাধন মানুষের সাধ্যাতীত। চামড়া অথবা কাষ্ঠের উপর অতি সুন্দর নক্সাও অঙ্কিত করা যায়। এমন কি, কাচের উপরও এই পেন্‌সিলের সাহায্যে অক্ষর লিখিবার সুবিধা হইয়াছে। কঠিন রবার প্রভৃতি দ্রব্যের উপরও অতি চমৎকার লিখা চলে।

এই বৈদ্যুতিক পেন্‌সিল আবিষ্কৃত হওয়ায় কাযের অনেক
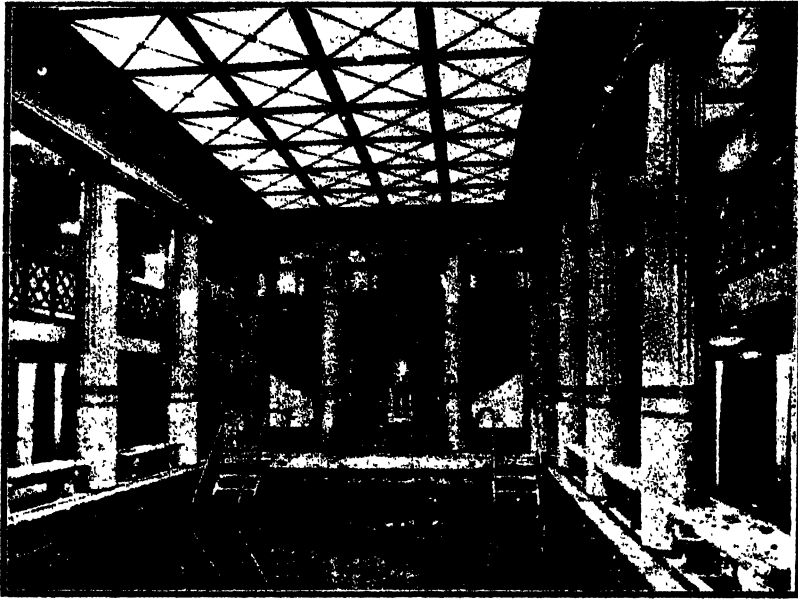
ও দ্রুতগামী জাহাজ আর নাই। ইহাই বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাত্রি-জাহাজ।

বৈদ্যুতিক পেন্‌সিল।

পেন্‌সিলের আকারবিশিষ্ট এই যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ লিখন-কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। যে সাধারণ প্রণালীতে গৃহমধ্যে বৈদ্যুতিক আলোক প্রজ্বলিত হয়, এই লিখন-যন্ত্রও সেই প্রণালীতে কার্য্যোপযোগী করা হইয়াছে। তাড়িতালোক জ্বালিবার "সকেট্" বা ছিদ্র-পথে পেন্‌সিলের সহিত সংযুক্ত তারটি বসাইয়া দিলেই, তড়িত-প্রবাহ উহার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তখন উহার দ্বারা যে কোনও ধাতব পদার্থ, ইস্পাত অথবা কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর ইচ্ছামত নক্সা কিংবা অক্ষর লিখিতে পারা যায়। বৈদ্যুতিক উত্তাপবশতঃ এই লিখন অথবা নক্সা এমনই দৃঢ়ভাবে ধাতব পদার্থাদির উপর মুদ্রিত হইয়া যায় যে, কোনমতেই তাহা লুপ্ত হয় না। পেন্‌সিলের উপরি-ভাগে এমন একটা আচ্ছাদন আছে যে, অঙ্গুলি অকস্মাৎ উত্তপ্ত সূচি-মুখ স্থানে পিছলাইয়া যাইতে পারে না। সাধারণ পেন্‌সিলের মত এই বৈদ্যুতিক পেন্‌সিলও অতি সহজভাবে ব্যবহার করা যায়, কোনও প্রকার অসুবিধা হয় না। ইহার সাহায্যে "চেক্" লিখাও বেশ চলে। আর সে "চেক্" জাল

বৈদ্যুতিক পেন্‌সিল

সুবিধা হইয়াছে। কঠিন ধাতব পাত্রে নক্সা বা অক্ষর লিখিবার প্রয়োজন হইলে, পূর্ব্বে শিল্পীর যে সময় লাগিত, তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প সময়ের মধ্যে সে কার্য্য সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়।

মোটর গাড়ীর সংখ্যা।

মোটর গাড়ীর সংখ্যা সকল দেশেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি য়ুরোপে ও আমেরিকায় ইহার একটা শুমারি হইয়াছিল তাহাতে জানা গিয়াছে। য়ুরোপে সর্ব্বসমেত ১১,১০,৯৯৬ খানি মোটর গাড়ী আছে। মোটর সাইকল ও ট্রাক্টর (tractor) এই গণনায় ধরা হয় নাই। কোন্ দেশে কতগুলি মোটর গাড়ী আছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গ্রেট বৃটেন	...	...	৪৯৭৫৮২	খানি
ফ্রান্স	...	...	২৩৬১৪৬	”
জার্ম্মাণী	...	...	৯১,৩৮৪	”
ইটালী	...	...	৫৩০০০	”
স্পেন	...	...	৩৭৫৬০	”
রুশিয়া	...	...	৩৫০০০	”
বেলজিয়াম ডেনমার্ক		...	২২২৬০	”
সুইটজ্যার্ল্যাণ্ড	...	...	১৮০০১	”
অষ্ট্রীয়া	...	...	১৬৩৫০	”
নরওয়ে	...	...	১৪৩৪০	”
সুইডেন	...	...	১৪২৫০	”
হলাণ্ড	...	...	১৩৫০০	”
পোলাণ্ড	...	...	১০৭০০	”
রুমানিয়া	...	...	৮৫০০	”
পর্টুগাল	...	...	৫০০০	”
জেকো-শ্লোভাকিয়া		...	৪১৩৮	”
এস্তোন	...	...	৮০০	”
মোট	...	...	১,১১০৯৯৬	”

কিন্তু আমেরিকা এ বিষয়ে য়ুরোপকে পরাস্ত করিয়াছে। সমগ্র য়ুরোপে যত মোটর গাড়ী আছে একমাত্র আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে প্রায় তত গাড়ী আছে। নিম্নের তালিকা দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে :—

যুক্তরাজ্য	...	...	১০,৫০৫,৬৬০	খানি
কানাডা	...	...	৪৪৩,৪৪৮	”
আর্জেন্টিনা	...	...	৭৫,০০০	”
ব্রেজিল	...	...	২৫,০০০	”
মেক্সিকো	...	...	২৫,০০০	খানি
কিউবা	...	...	২০,০০০	”
চাইল	...	...	১০,০০০	”
উরুগুয়া	...	...	১০,০০০	”
পোর্টোরিকো		...	৬,৫০০০	”
পেরু	...	...	৩,৩৪৩	”
ভেনেজুয়েলা	...	...	২৫০০	”
ট্রিনিডাড্	...	...	২২২১	”
কলম্বিয়া	...	...	২০০০	”
পানামা	...	...	১৯৫০	”
ডমিনিকাল সাধারণতন্ত্র		...	১৮০০	”
জামেকা	...	...	১৩৫০	”
বৃটিশ গায়না	...	...	১০৫০	”
বার্বাডোজ	...	...	১০০০	”

আর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, গোয়াটিমালা, বলিভিয়া প্রভৃতি ১১টি দেশে ১৫০ খানি হইতে ৬০০ মোটর গাড়ী আছে। কেবল বৃটিশ হণ্ডুরাশে ৬৮ খানি। সমগ্র আমেরিকায় মোটর গাড়ীর সংখ্যা ১১,১৬২১১০ খানি।

পৃথিবীর বয়ঃক্রম।

গত এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে মার্কিন দার্শনিক সভার এক মহাধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনের শেষ ভাগে পৃথিবীর বয়ঃক্রম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে গণনার তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, এবং তাহাতে প্রতিপাদিত হয় যে, সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বয়স ৮০ লক্ষ বৎসর ও ১৭০ কোটি বৎসরের মধ্যবর্ত্তী। সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি, সি, চেম্বার্লেন্সের মতে পৃথিবীর বয়স ৭ কোটি বৎসর ও ১৫ কোটি বৎসরের মাঝামাঝি। তিনি বলেন, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রথানুসারে সমুদ্রের বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণতির কাল গণনার দ্বারা তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক ডুয়ান বলেন, ঘড়ীর গতি যেমন একই দিকে, প্রকৃতিরও কোন কোন অঙ্গের সেইরূপ একই দিকে গতি আছে। তিনি সেই গতির হিসাব করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

পৃথিবীর বয়স ৮০ লক্ষ বৎসর হইতে ১৭০ কোটি বৎসর। তিনি বলেন, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের ভূ-স্তর গঠনের প্রণালী অনুসারে পৃথিবীর বয়স গণনা করা নিরাপদ নহে। সূর্য্য বা পৃথিবীর শীতোষ্ণ অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া গণনা করা ভ্রমসঙ্কুল। ভিন্ন ভিন্ন ভূ-স্তর সর্ব্বদা একই পদ্ধতিতে গঠিত হয় নাই। কোন স্তরটি দীর্ঘকাল ধরিয়া গঠিত হইয়াছে; কোনটি বা অপেক্ষাকৃত অল্পকালে হইয়াছে। সেইরূপ পৃথিবীর শীতোষ্ণ অবস্থা দেহের তাপের ন্যায় সময়ে সময়ে ভিন্নরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু আলোকের গতি চিরদিন সমভাবেই পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক ডুগান সেই গতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

নীল স্ফটিকের প্রভাব।

য়ুরোপের পূর্ব্বাঞ্চলে, বিশেষতঃ গ্রীস ও তুরস্কে প্রায় সকল লোকই নীল স্ফটিকের অনুরাগী। তাহাদের বিশ্বাস, উহা সৌভাগ্য আনয়ন করে ও অশুভ দূর করে। গ্রীসের নরপতি কনষ্টাণ্টাইনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মসিয়ঁ গুণারিশ তাঁহার জামার পকেটে সর্ব্বদাই নীল স্ফটিকের মালা রাখেন, এবং কোন বিদেশী সংবাদপত্রের সংবাদদাতা বা রাজনীতিক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি সেই স্ফটিক-মালা বাহির করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা এক একটি স্ফটিক গণিতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে কাথাবার্ত্তাও বলিতে থাকেন। মন্ত্রি-সমিতির অধিবেশনে অথবা যুদ্ধের পরামর্শ কালে প্রায় সকল সভ্যই নীল স্ফটিক-মালা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এঙ্গোরা পার্লামেণ্টে যখন তীব্র বাদানুবাদ উপস্থিত হয়, সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে স্ফটিক-মালা প্রদর্শন করেন এবং সময়ে সময়ে একজন অন্যের উপর ঐ মালা নিক্ষেপ করেন। তুরস্ক ও গ্রীসের কৃষকগণ তাহাদিগের আসন স্ফটিক-মালায় মণ্ডিত করে,দ্বারদেশে যেমন ঘোড়ার নাল মারে,তেমনই নীল স্ফটিক মালা ঝুলাইয়া রাখে; তাহাদের অশ্ব-সজ্জাও ঐরূপ স্ফটিকে সুশোভিত করে এবং গো মহিষাদির শৃঙ্গ উহাতে সুশোভিত করে। তথায় বিদেশ-যাত্রা করিতে হইলে অশ্বে বা গাড়ীতে স্ফটিক-মালা কোন না কোনরূপে লাগাইতে হইবে। কৃষক-নারীরা অন্ততঃ একটিও নীল স্ফটিক বাঁধিবে এবং ধনিপত্নীরা নীল স্ফটিকের মালা কণ্ঠে ধারণ না করিলে অন্ত কোন অলঙ্কার তাঁহাদিগকে তৃপ্তিদান করিবে না। এসিয়া মাইনর, তুরস্ক, গ্রীস দেশের বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে স্ফটিকের মালা বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে নীল স্ফটিকেরই ক্রেতা অধিক। আমাদের দেশে নীলার প্রভাবে বিশ্বাস সর্ব্বজন-বিদিত।

নাসিকা-বিজ্ঞান।

কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে নাসিকার গঠন দেখিলেই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা বলেন, দীর্ঘনাসা ব্যক্তিমাত্রেই বুদ্ধিমান ও শক্তিমান। যে জাতি যত উন্নত ও সভ্য, সে জাতির অধিকাংশ লোকেরই নাসিকা সেইরূপ দীর্ঘ ও সুগঠিত। সকল যুগেই কৃষি-জাতিরা তাহাদিগের সরল দীর্ঘ নাসিকার গৌরব করিয়া আসিতেছেন। গ্রীক ও রোমান জাতি দীর্ঘ নাসিকার জন্য যেমন প্রসিদ্ধ, তেমনই তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। য়ুরোপে একটা প্রবাদবাক্য আছে, "ক্লিওপেট্রার নাসিকা যদি এক ইঞ্চি ছোট হত তাহা হইলে পৃথিবীর ব্যাপার অন্যরূপ হইত।" যাঁহারা ক্লিওপেট্রার প্রতিকৃতি দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সুদীর্ঘ খগচঞ্চুর ন্যায় নাসিকার বিষয় ভুলিতে পারেন না। পুরাকালের প্রখ্যাতনাম্নী নারীগণের যে দীর্ঘ বাঁশীর মত নাসিকা ছিল, ইহা তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে। য়ুরোপীয় রাজগণ এতাবৎ রাজবংশে বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের আকৃতিতে একটু বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের কাহারও খর্ব্বাকৃতি নাসিকা দেখা যায় না। চক্ষু, নাসিকা ও মুখশ্রী যেমন ব্যক্তিবিশেষের সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক, তেমনই তাঁহাদিগের বুদ্ধিরও পরিচায়ক। জুলিয়াস সিজারের নাসিকা সরল ও সুদীর্ঘ ছিল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বর্ণনাকালে জ্ঞানী সেনেকা বলিতেন Homo nasutissimus সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নাসিকাবিশিষ্ট মানুষ। কবি দান্তের নাকের কথা কাহারও ভুলিবার নহে। নেপোলিয়ান বোনোপার্ট বলিতেন, "আমার সেনানিগণ যদি সুগঠিতনাসাবিশিষ্ট হইত তাহা হইলে আমি জগজ্জয়ী হইতে পারিতাম।" এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত-দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, নাসিকার গঠনের সহিত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

পাখীর প্রেমালাপ।

[১ম চিত্র]

পক্ষি-তত্ত্বে অভিজ্ঞগণ ভূয়োদর্শনের ফলে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পুং-পক্ষী প্রেমালাপকালে পক্ষ-বিস্তার করিয়া থাকে। স্ত্রী-পক্ষী দর্শনে পুং-পক্ষীর এই প্রকার পক্ষ-বিস্তারের উদ্দেশ্য কি, এ সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন; পক্ষি-তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার যে উত্তর দিয়া থাকেন, তাহাতে সকল সময় এ প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা হয় না। ডারউইন বলিয়াছেন যে, যে সকল পুং-পক্ষীর পালক সর্ব্বাংশে উন্নত এবং যে পক্ষী উত্তমরূপে পক্ষ-বিস্তার করিতে সমর্থ, স্ত্রী-পক্ষী তাহাকেই সঙ্গিরূপে নির্ব্বাচিত করে। কিন্তু ডারউইনের এই মত সকলে গ্রাহ্য করেন না। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ পক্ষি তত্ত্ববিদ্ মিঃ ডি, সেথ্-স্মিথ্ বলেন যে, পুং-পক্ষী যতই উৎসাহ সহকারে পক্ষবিস্তার করুক না কেন স্ত্রী-পক্ষী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ

[২য় চিত্র]

[৩য় চিত্র]

করে বলিয়া তিনি কখনও দেখেন নাই। পুং পক্ষীর পালক সুসম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ, তাহাও যে স্ত্রী পক্ষী লক্ষ্য করে এমন প্রমাণ তিনি পায়েন নাই। কিন্তু কোন কোন স্থলে তিনি দেখিয়াছেন যে, পুং-পক্ষী যখন পুনঃপুনঃ পক্ষবিস্তার করিতে থাকে, তখন স্ত্রী-পক্ষীর ভিতর যেন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই সময় প্রায়ই দেখা যায় যে, স্ত্রী-পক্ষী নীড়-নির্ম্মাণ ও শাবক-প্রজননের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে চেষ্টা করে। পারাবত-পালকরা বিশেষ রূপেই অবগত আছে যে, পুং-পারাবত যখন পুনঃপুনঃ পক্ষ-বিস্তার করে, তখন স্ত্রী-পারাবত নীড়াভিমুখে ধাবিত হয়। কোনও স্ত্রী-পক্ষী উপস্থিত না থাকিলেও পুং-পক্ষী পুনঃপুনঃ উৎসাহভরে পক্ষ-বিস্তার করিয়া থাকে। "বার্ড অব্ প্যারাডাইজ" সম্বন্ধে ইহা অধিকতররূপে প্রযোজ্য। পুং-পক্ষীর পক্ষ যখন সম্পূর্ণতালাভ করে, তখন সে পুনঃপুনঃ পক্ষ-বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না।

১ম চিত্র। পক্ষী-শালার কক্ষান্তরে অবস্থিত, ভিন্নজাতীয় স্ত্রী-পক্ষীকে দেখিয়া গৃধ্রজাতীয় এক পুং-পক্ষী মাথা নত করিয়া, শরীর আন্দোলিত করিতে করিতে পক্ষ-বিস্তার করিতেছে।

২য় চিত্র। ইহা প্রেমালাপের চিত্র নহে। "সন্

বিটারেন্" জাতীয় পক্ষী (স্ত্রী ও পুরুষ) কোনও নবাগতকে দেখিলেই, এইভাবে পক্ষ-বিস্তার করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য, তাহাকে ভয়প্রদর্শন।

[৪র্থ চিত্র]

[৫ম চিত্র]

৩য় চিত্র। পুং মনাউল্, কুক্কুট, পক্ষ-বিস্তার করিয়া তাহার প্রণয়িনীর পার্শ্ব দিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে।

৪র্থ চিত্র। ইহাও দাম্পত্যালাপের চিত্র নহে। এক জোড়া "কেগস্" পরস্পরকে অভিনন্দন করিতেছে। এই পক্ষী দুইটিই পুরুষজাতীয়।

৫ম চিত্র। ময়ূরজাতীয়-কুক্কুটের প্রেমালাপ। পুং-কুক্কুট সঙ্গিনীকে দেখিয়া, টুকিটাকি খাবার দিয়া, ভূমিতলে বক্ষ চাপিয়া, পক্ষ ও পুচ্ছ বিস্তৃত করিয়াছে।

[৬ষ্ঠ চিত্র]

৬ষ্ঠ চিত্র। মনাউল্, কুক্কুট, এই চিত্রে দ্বিতীয় প্রকারে প্রেমালাপ করিতে সমুদ্যত। সঙ্গিনীর নিকটে দ্রুত ধাবিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা।

৭ম চিত্র। 'বষ্টার্ড' (জলাভূমির সারসজাতীয় পক্ষি-বিশেষ) স্ত্রী পক্ষীকে দেখিয়া সগর্ব্বে এইরূপে পক্ষ-বিস্তার করিয়া এদিক্ হইতে ওদিকে, হাঁটিয়া বেড়াইতেছে।

৮ম চিত্র। পুং মনাউল্, কুক্কুট, প্রেমালাপের সময় দুই
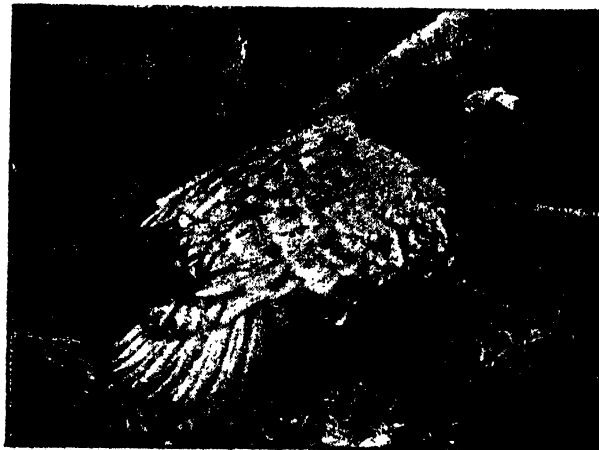
[৭ম চিত্র]

প্রকারে পক্ষ-বিস্তার করিয়া থাকে। এই চিত্রে সে সম্মুখভাগে এমনভাবে দেহ নত করিয়াছে যে, তাহার বক্ষোদেশ প্রায় ভূমিস্পর্শ করিতেছে।

বিদেশীয় আমদানী চিনি।

গত ৩ বৎসর ভারতে বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে যে পরিমাণ চিনি আমদানী হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল এবং সেই সঙ্গে তাহার মূল্যও প্রদর্শিত হইল।—

খৃষ্টাব্দ	টন	মূল্য
১৯১৯-২০	৩৪০৫১১	১৮,২৮,৭২,০০৬ টাকা
১৯২০-২১	১৬৪৩৩১	১০,৮১,৮৬,৩৩০ "
১৯২১-২২	৬৩৪৯৯১	২৫,০৭,৪৪,০৩২ "

জাভা হইতেই সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিনি এ দেশে আমদানী হয়। গত বৎসর তথা হইতে ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৯ শত ৬৫ টন আমদানী হইয়াছিল। তাহার পরেই মরীচ দ্বীপ; সে স্থান হইতে ৬১ হাজার ৬ শত ১১ টন আমদানী হয়। আর যে বেলজিয়ম সবেমাত্র যুদ্ধ-জনিত দুরবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়াছে, সে দেশ হইতেও ১২ হাজার ৭ শত ৯৮ টন চিনি ভারতে আসিয়াছে। অথচ অধিক দিন অতীত হয় নাই, এ দেশে যে চিনি উৎপন্ন হইত, তাহা দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশে ভূরি পরিমাণে প্রেরিত হইত। এক চিনির জন্য ভারতের কত কোটি টাকা বিদেশে যায়, তাহা ভাবিবার বিষয়। যুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য বীটের চাষ হইতেছে। যাহাতে বিদেশীয় চিনির আমদানীতে ইংলণ্ডের এই নবজাত ব্যবসা নষ্ট না হয়, সেজন্য উহার উপর একসাইজ মাশুল ত লওয়াই হইবে না, বিদেশীয় চিনির মাশুলেরও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপস্থ একখানি সংবাদ-পত্রে প্রকাশ যে, এই মাশুল ব্যবস্থায় ইংলণ্ডজাত চিনির তুলনায় বিদেশীয় চিনির মূল্য টনপ্রতি ২৫ পাউণ্ডের অধিক মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বৃটিশ উপনিবেশের উৎপন্ন চিনির উপর ২১ পাউণ্ডের উপর দাম চড়িয়াছে অর্থাৎ বিদেশী

[৮ম চিত্র]

চিনি কিনিতে ইংলণ্ডবাসীকে প্রতি পাউণ্ডে ২০ পেন্স অধিক দিতে হয়। ইহাতে ইংরাজের অবাধ-বাণিজ্যনীতি রক্ষা হয় না।

সিনেমা চিত্র।

সিনেমা বা চলচ্চিত্রাভিনয় দর্শনের প্রতি অধুনা সকল দেশের লোকেরই অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই হেতু জগতের সর্ব্বত্র সিনেমা-রঙ্গালয়ের সংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এক ভারতবর্ষেই বর্ত্তমানে ৪ শতাধিক সিনেমা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লোকের চিত্রাভিনয় দর্শনে অনুরাগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিক্ষাদানের অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়। এতদ্দ্বারা দেশের নিরক্ষর লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব ও শ্রমশিল্প সম্বন্ধে নূতন নূতন জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

প্রকাশ যে, বঙ্গীয় সরকার এইরূপ বিষয়ে চিত্র প্রস্তুত করাইবার আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ চিত্র প্রস্তুত করিবার শিল্পীর অত্যন্ত অভাব। তথাপি কয়েকজন সিনেমা-রঙ্গালয়ের অধিকারীর চেষ্টায় এই অভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে এবং সেজন্য কোন কোন

মিঃ এস, এন, গুহ।

মিসেস্ গুহ।

নূতন চিত্রপট প্রস্তুতের চেষ্টাও হইতেছে। এই কারণে চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা একটা লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক গ্রেট বৃটেনে এই ব্যবসায়ে গত বৎসর ৩ কোটি পাউণ্ড আয় হইয়াছে, মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ১২ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সিনেমা-চিত্রের কারবার হইয়াছে, এবং সমগ্র পৃথিবীতে ৩০ কোটি পাউণ্ড একমাত্র এই চিত্র প্রস্তুতের ব্যবসায়ে আদান-প্রদান হইয়াছে। এই চিত্রাভিনয় দর্শনে যেমন আনন্দ উপভোগ হয়, সেইরূপ ইহা শিক্ষালাভ ও ভারতবাসী য়ুরোপে ও আমেরিকায় গিয়া এই সিনেমা চিত্র প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিতেছেন। সম্প্রতি মিষ্টার এস, এন, গুহ বি, এস সি আমেরিকা হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমেরিকায় তাঁহার প্রস্তুত সিনেমা চিত্র সমাদৃত হইয়াছে। তিনি যদি এ দেশে এই ব্যবসাটি লাভজনক করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অর্থার্জ্জনের একটা নূতন পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। তাঁহার পত্নী এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন।

মহাচীনের ভাগ্যচক্র।

প্রাচ্যে মুক্তির বাণী প্রচারিত হইয়াছে। পারস্যে, তাতারে, ইরাকে, ভারতে,—সর্ব্বত্রই মুক্তির বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মহাচীনও এ দেশব্যাপী ধ্বনির সংস্পর্শ হইতে কি বঞ্চিত থাকিতে পারে? নামে মহাচীন স্বাধীন; কিন্তু আলস্য, জাড্য, হিংসা, দ্বেষ, স্বভাব-দোষ (Corruption) মহাচীনকে যেন নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সেই বন্ধন হইতে মহাচীন মুক্তির চেষ্টা করিতেছে, মহাকায় সিংহের মত হস্ত-পাদ-বিক্ষেপে মোহের নাগপাশ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। এই মহাযজ্ঞে প্রধান হোতা চীনের সেনাপতি জেনারল উ-পেইফু। আজ উ-পেইফুর দেশনায়কত্বে মহাচীন যে উন্নতির বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়াছে, চীনে মহা-বিপ্লবের পর এ যাবৎ সে নিশান কেহ উড়াইতে সমর্থ হয়েন নাই। এই অনুকূল বাতাস সমান বহিলে মহাচীনও অচির-ভবিষ্যতে জগতে মান্য-গণ্য শক্তিশালী দেশে পরিণত হইবে। মাঞ্চু সাম্রাজ্য স্বেচ্ছাচারের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; উহার ফলে বিপ্লব উপস্থিত হইল; বিপ্লবের ফলে সামরিক নেতা-নিয়ামকের উদ্ভব হইল; সেই নেতা-নিয়ামক শেষে নিজেকেই সম্রাটরূপে ঘোষণা করিয়া সাধারণ-তন্ত্রের অবমাননা করিলেন। ইউয়ান-সি-কাই নেতা-নিয়ামক হইতে সম্রাটের আসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার দেহাবসানের পর অনেকগুলি নেতা-নিয়ামকের সৃষ্টি হইল। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে চীনের নবীন সাধারণ-তন্ত্র জীবন্মৃত হইয়া রহিল। উ-পেইফু ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

এই সময়ে দুইটি পার্লামেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইল, একটি উত্তরে পেকিংএ, অপরটি দক্ষিণে ক্যাণ্টনে। উভয় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা নিজ নিজ প্রধান কেন্দ্রের বাহিরে অধিক দূর অনুভূত হয় নাই। বিভাগীয় শাসন-কর্ত্তারাই (টুচুনরাই) যাহা কিছু লুঠপাট করিয়া খাইতেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ পার্লামেণ্টে মনোমালিন্য ঘটিল। উ-পেইফু সেই সময়ে মহাচীনের মধ্যভাগে হুনান প্রদেশে সেই সকল কলহ-বিবাদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া রহিলেন, মহাচীনের 'মহা-রাজনীতির' ছায়া মাড়াইলেন না। কিন্তু বহুদিন তাঁহাকে এই শান্তি উপভোগ করিতে হইল না। পেকিং সরকারে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইল; পরন্তু আনফু সম্প্রদায় জাপ-ভক্ত হইয়া পড়িল। দেশের বিপদ সমুপস্থিত দেখিয়া উ-পেইফু নীরব থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হুনানের শান্ত বিবর হইতে বাহির হইয়া দেশ-বৈরীদিগকে রণে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু প্রকৃত দেশ-প্রেমিকের ন্যায় তিনি বিজয়ীর প্রাপ্য ফল উপভোগ করিলেন। রোমের বিপদের দিনে সিনসিনেটাস যেমন হলচালনা ত্যাগ করিয়া দেশ-বৈরীদিগকে দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া পুনরায় হলচালনায় মন দিয়াছিলেন, উ-পেইফুও তেমনই মাঞ্চুরিয়ার আধা দস্যু টুচুন (শাসন-কর্ত্তা) চাঙ্গ-পোলিনের হস্তে শাসন-ভার অর্পণ করিয়া হুনানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চাঙ্গ, উ-পেইফুর মত স্বদেশভক্ত ছিলেন না। তাঁহার যোগ্যতা কিছুই ছিল না, তবে অর্থলালসা ছিল অতি প্রবল। এমন দুই বিপরীত স্বভাবের শক্তিমান্ লোক অধিক দিন মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে পারে না। চ্যাঙ্গের সঙ্কীর্ণ নীচ কার্য্য-কলাপের কথা যতই কর্ণগোচর হইতে লাগিল, উ-পেইফু ততই ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। ইহার ফল আমরা ইহার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উ-পেইফু ঘোর যুদ্ধে চ্যাঙ্গকে পরাস্ত করিয়া মহাপ্রাচীরের বাহিরে মাঞ্চুরিয়ায় তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু স্বয়ং দেশের কর্ত্তৃভার গ্রহণ করিলেন না; তিনি ভূতপূর্ব্ব সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট লি-ইউয়ান-হাঙ্গকে পেকিংয়ে কর্ত্তৃপদে এবং ডাক্তার ইয়েনকে প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং সমর-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে সম্মত হইলেন।

এ দিকে দক্ষিণ অর্থাৎ ক্যাণ্টন পার্লামেণ্টের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার সান-ইয়াট সেন চ্যাঙ্গ-পোলিনের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সেনাপতি বা সেনা ছিলেন না, রাজনীতিই বুঝিতেন। তাই তাঁহাকে রাজ্য-শাসনের জন্য জেনারল চেন-চিউঙ্গ-মিঙ্গের উপর নির্ভর করিতে হইত। সান ইয়াৎ-সেন, চ্যাঙ্গের দিকে ঝুঁকিলেন বটে, কিন্তু যাঁহার ভরষায় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব, সেই জেনারল চেন বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি স্পষ্টই বলিলেন, দেশ-প্রেমিক উ-পেইফুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তিনি হস্ত কলঙ্কিত করিবেন না। ফলে সানকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। চেন তখন উ-পেইফুর নামে ক্যাণ্টন কেন্দ্র হইতে দক্ষিণ চীন শাসন করিতে লাগিলেন।

ইহাকেই মহাচীনের সৌভাগ্যোদয় বলিয়া মনে করা

যায়। ইহাতেই যেন মহাচীনের মুক্তি-সূর্য্যের প্রথম উষোদয় হইতেছে বলিয়া মনে হয়। বহুযুগের ঘোর ঘনান্ধকারের পর—দ্বেষহিংসা-স্বার্থপরতা-কুটিলতা-কুহেলিকা ছিন্ন করিয়া মহাচীনের মুক্তি-সূর্য্যের মত উ-পেইফু ধীরে ধীরে চীনের গগনে উদিত হইতেছেন, আর তাঁহারই সুবর্ণ-রথের রশ্মি হস্তে অরুণের মত জেনারল চেন বালার্কপ্রভায় চীনের মুক্তি-অরুণাচল আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

যদি এই দুইটি প্রধান পুরুষ স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে চীনের সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব হইবে না। ইতোমধ্যে গঠনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। উ-পেইফুর নির্ব্বাচিত নবীন প্রেসিডেণ্ট লি-যুয়ান হাঙ্গ (যিনি ১৯১১ সালে প্রথম মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া সাধারণতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন) এবার প্রথমে প্রেসিডেণ্টের পদে বসিতে চাহেন নাই। কেন বসিতে চাহেন নাই, তাহার কারণও তিনি দেখাইয়াছিলেন। তিনি উ-পেইফুকে বলেন, "প্রথমে দেশের আবর্জ্জনা দূর করুন, তাহার পর আমি প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিব।" আবর্জ্জনা এই কয়টি:—(১) মদগর্ব্বিত চতুরঙ্গ চীনা-বাহিনী, (২) স্বেচ্ছাচারী, লোভী, অত্যাচারী টুচুন, (৩) উৎকোচগ্রাহী রাজকর্ম্মচারী।

লি-যুয়ান-হাঙ্গ প্রস্তাব করেন, (১) মদগর্ব্বিত সেনাদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক, (২) টুচুনের পদ লুপ্ত করা হউক, (৩) রাজকার্য্যে সাধু কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হউক।

উ-পেইফু তাহাই করিয়াছেন। তিনি জেনারল চেনের সাহায্যে দুর্দ্ধর্ষ প্রিটোরিয়ান গার্ডের সদৃশ চীনা সেনাদল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, টুচুনের পদ লুপ্ত করিয়াছেন এবং যাহাতে উৎকোচদানের প্রথা একেবারে উঠিয়া যায়, তাহার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগের সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উ-পেইফুর মনস্কামনা পূর্ণ হউক, মহাচীন আবার পূর্ব্ব-গৌরবে সমুজ্জ্বল হউক। তবে উ-পেইফুর কায এখনও অনেক বাকি। এই যে সেনাদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহারা বেকার বসিয়া থাকিলে চোর ডাকাতের সংখ্যাই বৃদ্ধি করিবে; তাহাদিগকে কায দিতে হইবে। সে কাযের সৃষ্টি করিতে হইলে দেশে ধনাগমের উপায়বিধান করিতে হইবে। এ বিষয়ে উ-পেইফু নিশ্চেষ্ট আছেন, এমন কথা বলিতেছি না। তাঁহারই অনুরোধমত প্রেসিডেণ্ট লি-যুয়ান-হাঙ্গ মহাচীনের অর্থনীতিক উন্নতিবিধানের জন্য লণ্ডনস্থ চীনা দূত মিঃ ওয়েলিংটন কু-কে উপায় নির্দ্ধারণ করিবার ভার প্রদান করিয়াছেন।

উ-পেইফু, জেনারল চেন এবং প্রেসিডেণ্ট লি-যুয়ান-হাঙ্গকে লইয়া মহাচীনের ভাগ্যতরী আশা-সমুদ্রে ভাসাইয়াছেন। পরিণাম ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, তবে এশিয়াবাসীমাত্রেরই আন্তরিক সহানুভূতি তাঁহাকে উৎসাহান্বিত করিবে সন্দেহ নাই।

কর্দ্দম-নিবারক অশ্বক্ষুর।

য়ুরোপে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিবার জন্য অনেক স্থলেই অশ্ব ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত নরম মাটীতে লাঙ্গল দিবার সময় ঘোড়ার পা যাহাতে মাটীর মধ্যে বসিয়া যাইতে না পারে, এ জন্য অশ্বক্ষুরে

কর্দ্দম-নিবারক অশ্বক্ষুর।

এক প্রকার দীর্ঘ "নাল" ব্যবহৃত হয়। ইহা অস্থায়িভাবে ক্ষুর সংলগ্ন লৌহ "নালের" উপরেই সন্নিবিষ্ট হয়। তাহাতে ঘোড়ার পা আর কর্দ্দমমধ্যে প্রোথিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে জিলা ও লোকাল বোর্ডের অনেক রাস্তায় কাদায় মানুষ ডুবিয়া যায়। সে সব স্থলে ব্যবহারোপযোগী কোন "ক্ষুর" বা জুতা আবিষ্কৃত হয় না? আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করিয়া দেখুন না?

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

বিদেশী বিজেতার শাসন জাতির যে নানা অনিষ্ট করে, তাহার মধ্যে একটি এই যে, তাহা দেশাত্মবোধের পরিপন্থী। "আমার দেশ" বলিয়া যে বিশ্বাসে মানুষ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, বিদেশীর শাসনে তাহার বিকাশ হয় না। সেই জন্যই এ দেশে সরকারের কায আর দেশের বা জনসাধারণের কায -- Government servic আর Publice service এক নহে। আর সেই জন্যই এ দেশে লোক সরকারী চাকরী কেবল বেতনের মাপকাটিতে মাপিয়া বিচার করে। তাই এ দেশে মন্ত্রীর বেতন শাসন-পরিষদের সদস্যদের বেতনের সমান না হইলে, তাঁহাদের "মান" থাকে না। আর, বোধ হয়, সেই জন্যই ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরাও বিধিনির্দ্দিষ্ট টাকাটা যেমন করিয়াই হউক, আদায় করিয়া লইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। সংপ্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের গৃহীত টাকার যে হিসাব প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে—অন্য দেশ হইলে—তাঁহারা অবশ্যই লজ্জিত হইতেন।

হিসাবে দেখা গিয়াছে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে গত জুন মাস পর্য্যন্ত সদস্যরা গতায়াতের ও কলিকাতায় থাকিবার ব্যয় বাবদে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৯ শত ২৩ টাকা ২ আনা ২ পাই লইয়াছেন। কেহ কেহ ৪ হাজার টাকারও অধিক উদরস্থ করিয়াছেন। সরকারপক্ষ হইতে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, কোন কোন সদস্য কেবল এই টাকা আদায় করিবার জন্য কলিকাতা হইতে গৃহে যাইয়া কয় ঘণ্টা মাত্র থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন! কেহ বা ২২ ঘণ্টা, কেহ বা মাত্র ৩ ঘণ্টা বাড়ীতে ছিলেন!

হিসাবটা একটু খতাইয়া দেখাইতেছি। যিনি ঢাকা হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তিনি কেমন ভাবে টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন দেখুন। শনিবারে ও রবিবারে ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশন হয় না। কাযেই সদস্য মহাশয় শুক্রবারে ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যশেষে রাত্রি ১০টায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া, শনিবার অপরাহ্ণে ঢাকায় পৌছিতে পারেন এবং তথায় প্রায় ২২ ঘণ্টা অবস্থান করিয়া, রবিবার মধ্যাহ্নে যাত্রা করিয়া, সোমবার প্রাতে কলিকাতায় পৌছিয়া সেই দিনই বেলা ৩টার সময় ব্যবস্থাপক সভায় যাইয়া হাজিরা দিতে পারেন। শনি ও রবি ২ দিন কলিকাতায় থাকিলে, তিনি দৈনিক ১০ টাকা হিসাবে ২০ টাকা মাত্র পাইতেন। কিন্তু এই গতায়াতের ফলে তিনি প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার চতুর্গুণ অর্জ্জন করায় প্রায় ১ শত ২০ টাকা পাইবেন; অর্থাৎ তিনি কলিকাতায় থাকিলে যাহা পাইতেন, তদপেক্ষা ১ শত টাকা অধিক পাইবেন। শীতকালে প্রায় ৩ মাস ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। ইহার মধ্যে ১২ বার গতায়াত করিয়া সদস্য মহাশয় ৪ শত ৮০ টাকার স্থানে ১ হাজার ৪ শত ৪০ টাকা অর্জ্জন করিতে পারেন। আর তিনি যদি প্রথম শ্রেণীতে গতায়াত না করেন বা না যাইয়াই গতায়াতের বিল করেন, তবে ত কথাই নাই।

যিনি খুলনা হইতে নির্ব্বাচিত, তাঁহার অর্থার্জ্জনের উপায় আরও কম কষ্টসাধ্য। তিনি রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যায় খুলনায় পৌছিতে পারেন এবং ৩ ঘণ্টা পরে রওনা হইয়া, সোমবার প্রাতে কলিকাতায় উপনীত হইতে পারেন। কলিকাতায় থাকিলে তিনি যে স্থলে কেবল ১০ টাকা পাইতেন, সে স্থলে—এই গতায়াতে—প্রায় ৫২ টাকা লাভ করিতে পারেন। ২০ বার এইরূপে গতায়াত করিলে, তিনি মোট ১ হাজার ৪০ টাকা আদায় করিতে পারেন।

কিন্তু যাঁহারা গতায়াত করিয়াছেন বলিয়া প্রতিবারই প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার দ্বিগুণ আদায় করিয়াছেন, তাঁহারা

সকলেই যে সত্য সত্যই প্রথম শ্রেণীতে গতায়াত করিয়াছেন, এমনও নহে; কারণ, আমরা অনেক সদস্যকে প্রথমেতর শ্রেণীতে গতায়াত করিতে দেখিয়াছি। আর কেহ কেহ যে কলিকাতাতেই থাকিয়া মিথ্যা বিল করেন নাই, এমনও না হইতে পারে। কারণ, যাঁহারা কলিকাতাতেই বাস করেন বা যাঁহাদের কলিকাতায় স্থায়ী বাসা আছে, এমন সব সদস্যকেও বিল করিয়া টাকা আদায় করিতে দেখিতেছি। কেবল যে দরিদ্র সদস্যরা এমন কায করিয়াছেন, তাহাও নহে। এই সব সদস্যের মধ্যে ধনীর সংখ্যাও অল্প নহে।

এ অবস্থায় কোন কোন সদস্য যে এই কাযের জন্য মাসিক বেতনপ্রাপ্তির প্রস্তাব করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

ইঁহাদের এই ব্যবহারে—বিশেষ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মিথ্যার আশ্রয় লইয়া থাকিলে তাহাতে—বাঙ্গালীর লজ্জিত হইবার কারণ অবশ্যই আছে।

যে ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ সদস্য সদর্পে বিরাজিত, সে ব্যবস্থাপক সভা হইতে দেশের লোক কতটুকু উপকার লাভের আশা করিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আর এই সব সদস্য যে লাটের কথায় মত পরিবর্ত্তন করিবেন, তাহাও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অথচ, শাসন-সংস্কারের ফলে ইঁহাদিগের সদস্যপদপ্রাপ্তির হেতু বাঙ্গালার গভর্ণর বলিয়াছেন, কংগ্রেসের স্বকৃত সমর্থকদিগের অপেক্ষা ইঁহাদিগকেই লোকপ্রতিনিধি বলা যায়! কংগ্রেসের কর্ম্মী কাহারা?—মহাত্মা গন্ধী, হাকিম আজমল খাঁ, মতিলাল নেহরু, লালা লজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি। ইঁহাদিগের ত্যাগপুণ্যে ভারতবর্ষ ধন্য এবং জাতীয় আন্দোলন পূত হইয়াছে। কেবল ভারতবর্ষে নহে, যে কোন দেশে এই সব ত্যাগী কর্ম্মীর নেতৃত্ব যে কোন আন্দোলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে পারে। বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় ইঁহাদিগকে দেশের শত্রু বলিলেও—দেশ ইঁহাদিগকে ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছে এবং সেই শাসক-সম্প্রদায়ের কৃত লাঞ্ছনার অগ্নি-পরীক্ষায় ইঁহাদের দেশ-প্রেমের বিশুদ্ধি প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শাসন-সংস্কারের ফলে দেশের এই এক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে যে, রাজনীতিচর্চ্চা স্বার্থ-কলুষিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে—রাজনীতিচর্চ্চা ধনীর অবসর-বিনোদনের ও করতালি লাভের উপায় মাত্র থাকিবার পর—রাজনীতিচর্চ্চা বিপদের কারণ ছিল; তখন দেশের লোকের প্রশংসা ব্যতীত রাজনীতিক আর কোন পুরস্কারলাভের আশাও করিতেন না—অন্য কোন পুরস্কার কল্পনা করিতেও পারিতেন না। এখন ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরাও অর্থলোভে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন—ভোটের বিনিময়ে পুত্র-জামাতার চাকরী কিনিতে পারা যায়—তাহার পর বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা বেতনের চাকরীর আশাও থাকে। তাই বলিয়াছি, শাসন-সংস্কারের ফলে আমাদের—এই পরাধীন জাতির রাজনীতিচর্চ্চা স্বার্থ কলুষিত হইয়াছে এবং তাহাতে আমাদের স্বরাজ-সাধনার পথ বিঘ্ন-কঙ্কর-কণ্টকিত হইয়াছে। মহাত্মা গন্ধী প্রমুখ যে সব ত্যাগী স্বদেশ-সেবক বর্ত্তমান অবস্থায় অসহযোগ অবলম্বন করিবার জন্য দেশের লোককে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয়, দিগন্তে এ বিপদবারিদও লক্ষ্য করিয়া অভিজ্ঞ নাবিকের মত পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছেন।

শাসনের ব্যয়-বৃদ্ধি

ভারত সচিব মিষ্টার মণ্টেগু বৃটিশ পার্লামেণ্টের সম্মতি লইয়া ভারতবর্ষে যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসীর স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার-লাভ কতটুকু হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও তাহাতে যে ভারতবাসীর ব্যয়-বৃদ্ধি হইয়া, শাসনপ্রণালী দরিদ্র দেশের পক্ষে অনাবশ্যক বিলাসে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবে শুনিয়াই, এ দেশে শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে বিদ্রোহ দলনের জন্য হাউইটজার কামানে গোলা ব্যবহৃত হয় নাই—বর্দ্ধিত বেতনের রৌপ্যের গুলীতেই সে কায হইয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে প্রশ্ন হয়। মিষ্টার লানের প্রশ্নের উত্তরে মিষ্টার মণ্টেগু এই বিবর্দ্ধিত বেতনের পরিমাণ জানাইয়াছিলেন :—

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস	...	৫৪ লক্ষ টাকা
ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস	...	১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
ইণ্ডিয়ান শিক্ষা সার্ভিস	...	১৫ লক্ষ টাকা
ভারতে ভারতীয় ও দেশীয় সেনাদলের বৃটিশ কর্ম্মচারীরা	...	২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা
ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস	...	৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

কাযেই দেখা যাইতেছে, এই হিসাবেই মোট ৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা খরচ বাড়িয়াছে।

তাহার পর আবার এই বাঙ্গালাতেই যে কায এক জন ছোটলাটে হইত, সেই কায লাট, ৩ জন মন্ত্রী ও শাসন-পরিষদের ৪ জন সদস্য করিতেছেন এবং তাঁহাদের আবার সেক্রেটারী হইতে চাপরাশী পর্য্যন্ত সবই দিতে হয়।

এবার বিলাতে পার্লামেণ্টে শাসন-সংস্কারের ফলে এ দেশে ব্যয়-বৃদ্ধির একটা হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সরকারের ব্যয় কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

ভারত সরকারে	... ...	৯ লক্ষ টাকা
মাদ্রাজ সরকারে	... ...	৫ লক্ষ ২৫ হাজার "
বোম্বাই সরকারে	... ...	৫ লক্ষ ২৫ হাজার "
বাঙ্গালা সরকারে	... ...	৫ লক্ষ ৭৫ হাজার "
যুক্তপ্রদেশ সরকারে	... ...	৭ লক্ষ ৭৫ হাজার "
পঞ্জাব সরকারে	... ...	৫ লক্ষ "
বিহার সরকারে	... ...	২ লক্ষ ৫০ হাজার "
মধ্যপ্রদেশের সরকারে	...	২ লক্ষ ২৫ হাজার "
আসাম সরকারে	... ...	২ লক্ষ ৭৫ হাজার "

খাস ভারত সরকারের বিবর্দ্ধিত ব্যয়ের হিসাব এইরূপ:—

কৌন্সিল অব ষ্টেটের সভাপতি	...	৫০ হাজার টাকা
লেজিসলেটিভ এসম্ব্লীর সভাপতি	...	৫০ হাজার "
ঐ সহযোগী সেক্রেটারী	...	৩৬ হাজার
অতিরিক্ত ডেপুটী সেক্রেটারী	...	২৪ হাজার "
২ জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট	...	১৮ হাজার "
৭ জন কৌন্সিল রিপোর্টার	...	৫৩ হাজার ৭ শত ৫০ "
১ জন সেক্রেটারিয়েট সহকারী	...	৫ হাজার ৬ শত ২৫ "
১০ জন সহকারী	...	৪২ হাজার "
৭ জন কেরাণী	...	৩৮ হাজার ৬ শত ৭৫ "
৩ জন ষ্টেনোগ্রাফার	...	৯ হাজার ৭ শত ৭৫ "
৬ জন দপ্তরী	...	১ হাজার ৮০ "
২ জন জমাদার	...	৪ শত ৮০ "
১৬ জন চাপরাশী	...	১ হাজার ৯ শত ২০ "
১৮ জন অস্থায়ী চাপরাশী	...	২ হাজার ১ শত ৬০ "
গিরি-বিহারের খরচা	...	২২ হাজার "
কৌন্সিল অব ষ্টেটের ও লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীর রাহা খরচ	...	৫লক্ষ ৫ হাজার ৫ শত "
১ জন পোশাকী কর্ম্মচারী	...	৩ হাজার টাকা
সদস্যদের পুস্তকাগারের বাবদে খরচ	...	১৫ হাজার "
কেরাণী ও দপ্তরী	...	৬ হাজার ৮ শত "
এসেম্ব্লীর ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট	...	৭ হাজার "

প্রত্যেক প্রদেশেই ব্যয় বাড়িয়াছে। যে আসামে কেবল চীফ কমিশনারেই কায চলিত, সেই ক্ষুদ্র আসামেও এখন গভর্ণর দেওয়া হইয়াছে। আর গভর্ণরের বাণ্ড বা বাদ্যকর হইতে সবই চাহি—নহিলে লাটের লাটগিরীর ষোলকলা পূর্ণ হয় না। আসামে যখন এমন ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন মধ্য-প্রদেশও বাদ যাইতে পারে না। সর্ব্বত্রই ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। বাঙ্গালায় ব্যয়ের পরিমাণ এত বাড়িয়াছে যে, ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য বাঙ্গালা সরকারকে শেষে আমোদ-প্রমোদের উপরও কর বসাইতে হইয়াছে। নহিলে উপায় নাই।

শাসন-পরিষদের এক জন (অতিরিক্ত) সদস্য		৬৪ হাজার টাকা
৩ জন মন্ত্রী	... ...	১ লক্ষ ৯২ হাজার "
ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি	...	৩৬ হাজার "
ঐ সহকারী সভাপতি	...	৫ হাজার "
শিল্প ও কৃষি-বিভাগের সেক্রেটারী	...	৩৩ হাজার "
চীফসেক্রেটারীর আফিসে ১ জন ডেপুটী সেক্রেটারী	...	২৩ হাজার ৪ শত "
২ জন সহকারী সেক্রেটারী	...	১০ হাজার ৩ শত ২০ "
লেজিসলেটিভ বিভাগে ১ জন ডেপুটী সেক্রেটারী	...	১৮ হাজার "
শাসন-পরিষদের ১ জন সদস্য, ৩ জন মন্ত্রী এবং ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদিগের পাথেয় প্রভৃতি	...	১লক্ষ ১৫হাজার ৫শত "
নূতন ব্যবস্থাপক-সভার কাগজপত্র ছাপা প্রভৃতি	...	৫০ হাজার "
ঐ বাবদে অতিরিক্ত কেরাণী	...	৩৭ হাজার ২ শত ৪০ "

যে দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে—যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিবার জন্য আবশ্যক অর্থের অভাব—যে দেশে প্রতীকারসাধ্য ব্যাধির নিবারণ জন্য আবশ্যক অর্থ-ব্যয় অসম্ভব—যে দেশে পানীয় জলের অভাব দূর করিবার অর্থ সরকার দিতে পারেন না—সে দেশ এই শাসন-সংস্কার লইয়া কি করিবে?

বাঙ্গালার জনসংখ্যা

লোকগণনা বা আদমশুমারীর ফল প্রকাশিত হইয়াছে। সে ফলে আমাদের চিন্তিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। গত ১০ বৎসরে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি বাড়িয়াছে। কোন সুস্থ—সবল—জাতির মধ্যে বৃদ্ধি এত কম হয় না। অথচ ফ্রান্সে যে কারণে—যে বিলাসের জন্য জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল এবং তাহার নিবারণকল্পে ফরাসী সরকার নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সে কারণ নাই। ভারতবর্ষে ব্যাধি ও দারিদ্র্যই এই অবস্থার জন্য দায়ী—বলা যাইতে পারে।

সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বাঙ্গালার কথা ধরা যায়, তবে দেখা যায়, গত ১০ বৎসরে জনসংখ্যা মোট ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫ হাজার ১ শত ৭০ হইতে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৪ শত ৬২ দাঁড়াইয়াছে—মোট বৃদ্ধি ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার ২ শত ৯২ বা শতকরা প্রায় ২। আর ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ বৎসরে বৃদ্ধি শতকরা ৮ অর্থাৎ এবারের বৃদ্ধির প্রায় ৪ গুণ ছিল! এবার বাঙ্গালার ১২টি জিলায় লোকসংখ্যা কমিয়াছে। সেগুলি পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে অবস্থিত।

আবার হিন্দুর সংখ্যা মোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২ শত ৩১ কমিয়াছে! বৃদ্ধি যাহা কিছু মুসলমানের মধ্যে।

হিন্দু-মুসলমানে বসবাসের আহারাদির প্রভেদ অতি সামান্য। কেবল মুসলমানের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বহুলভাবে প্রচলিত। তেমনই হিন্দু সমাজেও "নিম্ন" বর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ চলিত আছে। কাযেই কেবল যে মুসলমান-সমাজে বিধবা-বিবাহেই এই বৈষম্য হইয়াছে, এমনও বলা যায় না।

মূল কথা পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অধিক এবং পূর্ব্ববঙ্গেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই জন্যই মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, বর্দ্ধমান বিভাগ লইয়া তাহা দেখান যাইতেছে—

বর্দ্ধমান বিভাগ মোট	... ...	শতকরা প্রায় ৪ হ্রাস
বর্দ্ধমান জিলায়	... ...	শতকরা প্রায় ৬ হ্রাস
বীরভূম জিলায়	... ...	শতকরা প্রায় ৯ হ্রাস
বাঁকুড়া জিলায়	... ...	শতকরা প্রায় ১০ হ্রাস
মেদিনীপুর জিলায়	... ...	শতকরা প্রায় ৫ হ্রাস
হুগলী জিলায়	... ...	শতকরা প্রায় ১ হ্রাস
হাওড়ায়	... ...	শতকরা প্রায় ৫ বৃদ্ধি

হাওড়ায় কল-কারখানায় নানা স্থান হইতে কুলী-মজুর আমদানী হয়; প্রধানতঃ সেই জন্যই তথায় লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বর্দ্ধমান বিভাগের আর সব জিলাতেই অল্লাধিক পরিমাণে লোকসংখ্যা কমিয়াছে। অথচ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় এই সব জিলাতেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১০ বৎসরে দেশের অবস্থা ম্যালেরিয়ায় এমনই শোচনীয় হইয়াছে যে, বর্দ্ধমানে আবাদযোগ্য জমীর শতকরা ৪৭ ভাগ চাষ হয়, আর ৫৩ ভাগ পড়িয়া আছে।

তাহার পর প্রেসিডেন্সী বিভাগে ২৪ পরগণা ও কলিকাতা বাদ দিলে, কেবল খুলনায় জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে কারণে হাওড়ায় জনসংখ্যা বাড়িতেছে, সেই কারণেই ২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ৩ জিলাতেই লোকসংখ্যা কমিয়াছে। মুর্শিদাবাদে ও যশোহরে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে। সে ২ জিলাতেও লোকসংখ্যা কমায় বুঝা যায়, ম্যালেরিয়াই লোকক্ষয়ের কারণ। খুলনায় যে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, যে স্থানে প্রবহমান নদী আছে, সে স্থানের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। রঙ্গপুরে কুড়ীগ্রামের এবং টাঙ্গাইলে অবস্থা বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

অথচ বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান শত্রু ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য—বাঙ্গালাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক চেষ্টা যে হইতেছে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত ২০ বৎসর ধরিয়া কাগজে-কলমে বাঙ্গালার হাজা-মজা নদীর সংস্কারের কতকগুলা খসড়া "স্কিম" হইয়াছে; কিন্তু উল্লেখযোগ্য কায কিছুই হয় নাই। যে দেশে ম্যালেরিয়ায় লোকক্ষয় হেতু আবাদযোগ্য জমীর শতকরা অর্দ্ধেকেরও অধিক পড়িয়া থাকে, সে দেশে মিনিষ্টার ত পরের কথা—গভর্ণর অপেক্ষাও ম্যালেরিয়া নিবারণ অধিক প্রয়োজন। শাসন-সংস্কারে বাঙ্গালায় বার্ষিক ব্যয় ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪ শত ৬০ টাকা বাড়িয়াছে—ইহা সরকারই স্বীকার করিয়াছেন। এক দিকে এই—আর এক দিকে সরকারী ডাক্তারখানায় রোগীদের চিকিৎসার উপযুক্ত কুইনাইন সরবরাহ করা যায় না! এমন দুরবস্থা—এ দেশেই সম্ভব।

কারীগরী শিক্ষা

এ দেশে কারীগরী শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া দেশের লোক বহুদিন হইতেই সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে বলিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রোদন প্রায় অরণ্যে রোদনই হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে হাণ্টার বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিকে কেবল কেরাণী সৃষ্টির উপায় বলিয়াছিলেন। এত দিন পরে শিক্ষা-সচিবও স্বীকার করিয়াছেন, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের দারিদ্র্যহেতু কারীগরী শিক্ষার দিকে মনোযোগদান প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ, এত দিন যে শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে, তাহাতে যুবকদিগের স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জনের সুবিধা হয় না- কাযেই যাহাতে তাহাদের জীবিকার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হয়, তাহার উপায়-বিধান করিতে হইবে।

২০ বৎসর পূর্ব্বে লোক-গণনার বিবরণে রিসলী এই মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের লোকের দুরবস্থার কথা বলিয়াছিলেন—কৃষির বর্দ্ধিত আয়ে তাহাদের কোন উপকার হয় না, তাহারা ব্যবসা করে না, আবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়াছে, সে বৃদ্ধির অনুপাতে বেতনের পরিমাণ বাড়ে নাই, পরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাহেতু কমিয়াছে, সব দিকেই খরচ বাড়িয়া গিয়াছে, কাযেই পৈতৃক গৃহে বাস করিয়া ঠাট বজায় রাখা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে—

Life is in many ways harder for respectable families who live on salaries or pensions and struggle to keep up appearances in an ancestral house built in more prosperous times.

শিক্ষা-সচিব শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র।

কিন্তু এই যে মধ্যবিত্তসম্প্রদায়, এই সম্প্রদায়ই এ দেশে সমাজের মেরুদণ্ড। এই সম্প্রদায়ের আর্থিক অবনতিতে সমগ্র সমাজের অনিষ্ট অনিবার্য্য।

এবার শিক্ষা-সচিব এই সম্প্রদায়ের বালকদিগের অর্থার্জ্জন-পথ প্রশস্ত করিবার কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার প্রস্তাব—

যাহাতে ছাত্ররা বড় হইয়া কোন ব্যবসা বা হাতের কায অবলম্বন করিতে পারে, সেই জন্য বর্ত্তমানে ঢাকায় এক বা একাধিক কারখানা স্থাপিত হইবে। তাহাতে সহরের যত মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সূত্রধরের, কর্ম্মকারের, কার্ড, বোর্ড প্রস্তুত করিবার ও এইরূপ অন্যান্য কাযের শিক্ষা পাইতে পারিবে।

এই আরম্ভ যে অতি সামান্য এবং প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। আরও কথা, ঢাকায় এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সার্থকতা কি? কলিকাতায় সরকারী ও আধা-সরকারী অনেক বড় বড় কারখানা, ডক প্রভৃতি আছে। এ অবস্থায় পরীক্ষাকেন্দ্র কলিকাতায় করিলেই ভাল হইত।

শিক্ষা-সচিব বিলাতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্যই দেখিয়া আসিয়াছেন। বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি সহরে যে সব টেকনলজিক্যাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, সে সকলের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান এ দেশে নাই। সে সকল প্রতিষ্ঠান বিলাতের ব্যবসার উন্নতি-সাধনে কত সহায়তা করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এ দেশের বয়ন-শিল্পের সর্ব্বনাশ-সাধন করিবার জন্য ম্যাঞ্চেষ্টার যখন প্রথম এ দেশে ধুতী ও শাটী পাঠায়, তখন সে সব কাপড়ের পাড়ের রং পাকা হইত না, বিশেষ এ দেশের তাঁতের কাপড়ের পাড়ে যে সব বৈচিত্র্য

থাকিত, সে সব ম্যাঞ্চেষ্টারের কল্পনাতীত ছিল। কত চেষ্টায়—কত পরীক্ষার ফলে—কত দিনে ম্যাঞ্চেষ্টার এ বিষয়ে সফল-প্রযত্ন হইয়াছে, তাহার পরিচয় ঐ টেকনলজিক্যাল প্রতিষ্ঠানের গৃহ-প্রাচীরে আছে।

কারীগরী বিদ্যালয়ের পর বাণিজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে বাঙ্গালা, বোম্বাইয়েরও পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বঙ্গদেশে সিডেনহাম কলেজের মত কোন প্রতিষ্ঠান নাই।

কিন্তু এ সব বিষয়ে আমরা কি কেবল সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব? সার রাসবিহারী ঘোষের ও সার তারকনাথ পালিতের দানের মত দানে কি আমাদের দেশের লোকের নেতৃত্বে এইরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইবে না? জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। এ সময় আমরা কি এমন আশা করিতে পারি না যে, দেশের লোকের সাহায্যে ও চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানই অদূর-ভবিষ্যতে বাঙ্গালার কর্ম্মজীবনে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য প্রভাব বিস্তার করিবে?

স্বামী সচ্চিদানন্দ।

বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন

আমরা যে সকল বিদেশী পণ্য ব্যবহার করি, সে সকলের মধ্যে বস্ত্রেই অধিক অর্থ বিদেশে যায়। সেই অর্থ দেশে রাখিবার অভিপ্রায়ে এবং বস্ত্র-বিষয়ে আমাদিগের পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিবার জন্য মহাত্মা গন্ধী দেশের লোককে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যে দিক্ হইতেই কেন দেখা যাউক না, এই উপদেশের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না।

দুঃখের বিষয়, কলিকাতা বড়বাজারের মাড়োয়ারী বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা আবার বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিতেছে। তাহার প্রতিবাদ-কল্পে স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। শেষে পিকেটিং করা হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে অনশন-ব্রত ত্যাগে সম্মত করা হয় এবং শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি মহিলাদিগের নেতৃত্বে বড়বাজারে আবার পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। পুলিস সেইজন্য কতিপয় মহিলা ও যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়; কিন্তু মহিলাদিগকে মুক্তি দিয়া যুবকদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করে। ফলে যুবকদিগের মধ্যে অনেকের দণ্ড হইয়া গিয়াছে। আইনের কোন্ বিধান অনুসারে মহিলারা "অপরাধী" হইলেও তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া পুরুষদিগকেই দণ্ডদান করা হইয়াছে, বলিতে পারি না। বোধ হয়, এখনও মহিলা জেল প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া কুলললনা সিন্ধুবালাদ্বয়ের অকারণে লাঞ্ছনাকারী সরকার মহিলাদিগকে জেলে পাঠাইতে লজ্জানুভব করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, দেশের লোক কি মহাত্মার উপদেশের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া এবং দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান-কল্পে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী বস্ত্রই ব্যবহার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইবে না? প্রয়োজন হইলে ত্যাগ স্বীকার করিয়াও আমাদিগকে সে কায করিতে হইবে; তাহা না হইলে আমরা কখনই স্বাবলম্বী হইতে পারিব না। অন্যান্য দেশ যে আমদানী শুল্ক বসাইয়া স্বদেশী শিল্পের উন্নতিসাধন করে, আমরা কি স্বেচ্ছায় পরোক্ষভাবে সে শুল্ক দিতে পারি না?

বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

একান্ত দুঃখের বিষয়, বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আগমন-কালে—অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়রূপে ট্রেণ হইতে পড়িয়া আঘাতের ফলে বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ প্রাণ হারাইয়াছেন।

বরেন্দ্রকৃষ্ণ উদ্যমশীল কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। তিনি বিদেশী ব্যবসায়ীর কারবারে ব্যবসা শিক্ষা করিয়া সেই লব্ধ অভিজ্ঞতা আপনার কাযে স্বাধীন-ভাবে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন বোম্বাইয়ে ছিলেন এবং তথায় বহু বাঙ্গালী তাঁহার সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এক-কালে এলাহাবাদে যেমন নীলকমল মিত্র মহাশয় ও দিল্লীতে হেমচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবাসে বাঙ্গালীকে আদর-আপ্যায়নে তুষ্ট করিতেন, এ কালে বোম্বাইয়ে বরেন্দ্রবাবু তেমনই বাঙ্গালীকে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করাইতেন।

বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।

রামকৃষ্ণ মিল—কাপড়ের কল—বরেন্দ্র-বাবুর উদ্যমের ও কর্ম্মকুশলতার নিদর্শন। তিনি রামকৃষ্ণ দেবের নাম গ্রহণ করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং বহু বাধা অতিক্রম করিয়া কলস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের মত ব্যবসায়িপ্রধান স্থানে ব্যবসাবিমুখ বাঙ্গালার সন্তান বরেন্দ্রবাবুর এই সাফল্যে বাঙ্গালী অবশ্যই গৌরবানুভব করিতে পারে।

অকালে তাঁহার অতর্কিত মৃত্যু অতি শোচনীয় ব্যাপার।

মুসলমানের মাতৃ-ভাষা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দিবার প্রস্তাব আলোচনাপ্রসঙ্গে মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া বাঙ্গালার মুসলমান ছাত্রদিগের বিশেষ অসুবিধা করিয়াছেন। প্রথমে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়, তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালার মুসলমানরা বঙ্গদেশে বাস করে বলিয়াই বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা চালায়। মিষ্টার হক সে কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালাই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃ-ভাষা বটে, কিন্তু বাঙ্গালার মুসলমানরা সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা পড়ে না এবং উর্দ্দু না শিখিলে তাহারা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারিবে না। ছাত্রের মাতৃ-ভাষা যদি শিক্ষার বাহন হয়, তবে বাঙ্গালার মুসলমান ছাত্রদিগকে ইংরাজী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা শিখিতে হইবে—চাপ বড় গুরু হইবে।

শিক্ষাবিষয়ে যাঁহারা আবশ্যক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলেন, মাতৃ-ভাষা শিক্ষার বাহন হইলেই শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা সহজসাধ্য হয়। বাঙ্গালার মুসলমান ছাত্ররা যে সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালার আলোচনা করেন না, এমন ত মনে হয় না। যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্গালার পরীক্ষক, তাঁহারা জানেন, মুসলমান পরীক্ষার্থীরা হিন্দু পরীক্ষার্থীদিগের মত বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকেন। বহু মুসলমান কবি ও গদ্য-লেখকের রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য

সমৃদ্ধও হইয়াছে। এ দিকে দেখা গিয়াছে, গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১৯ হাজার ১ শত ৩৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৩ হাজার ৮ শত ১১ জন। এই ৩ হাজার ৮ শত ১১ জনের মধ্যে ৩ হাজার ৭১ জন বাঙ্গালাই মাতৃ-ভাষা বলিয়া বাঙ্গালায় পরীক্ষা দিয়াছে।

বাঙ্গালার মুসলমানরা মাতৃ-ভাষা অবহেলা করিয়া উর্দ্দুর চর্চ্চা করিবেন কেন? ধর্ম্ম-বৈষম্যে ভাষা-বৈষম্য হয় না। মিষ্টার হক বলিয়াছেন, উর্দ্দু না শিখিলে বাঙ্গালার মুসলমানরা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারিবেন না। কিন্তু হিন্দুরা কি করেন? বাঙ্গালার বাহিরে হিন্দুদিগের মধ্যে তেলেগু, তামিল, কানারী, গুজরাতী, হিন্দী, মার্হাট্টী নানা ভাষার প্রচলন আছে। তবে কি হিন্দুকে এই সব ভাষাই শিখিতে হইবে? চীনে, রুসিয়ায়, তুর্কীতে, আরবে, পারস্যে, মিশরে—যে সব মুসলমান বাস করেন, তাঁহারা কি উর্দ্দুতে কথোপকথন করেন; না—মুসলমানের ধর্ম্ম-গ্রন্থ উর্দ্দুতে লিখিত? বাঙ্গালী মুসলমান যদি উর্দ্দু শিক্ষা করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তির কোন কারণ নাই। কিন্তু মুসলমান ছাত্ররা যদি মাতৃ-ভাষার আলোচনা ত্যাগ করিয়া উর্দ্দু জবান দোরস্ত করিতে সময় ও উদ্যম ব্যয় করে, তবে তাহা সুবুদ্ধির পরিচায়ক বলা যায় না।

কৃষ্ণদাস পাল।

খৃষ্টান য়ুরোপে ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরাজী, ইটালীয় প্রভৃতি বিবিধ ভাষা প্রচলিত আছে। ফরাসী ভাষা জানিলে য়ুরোপের সর্ব্বত্র কথাবার্ত্তার সুবিধা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কোন ইংরাজ ছাত্র ইংরাজী অবহেলা করিয়া ফরাসী ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করে না।

স্বয়ং এ বিষয়ে আমরা সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মতই সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি স্বয়ং ইংরাজী ব্যতীত অন্য কোন ভাষা ব্যবহারে পটু নহেন। সেজন্য লজ্জানুভব না করিয়া তিনি সগর্ব্বে বলেন, ইংরাজের পক্ষে ইংরাজী জানাই যথেষ্ট।

সেইরূপ আমরাও মনে করি, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালা জানা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করাই প্রথম কর্ত্তব্য। তাহার পর এখন ভারতে সর্ব্বত্রই উচ্চ-শিক্ষার জন্য ইংরাজী শিখিতে হয়। আর সেইজন্যই ইংরাজী সমগ্র ভারতের জনগণের ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হইয়াছে। হিন্দুর মত মুসলমান ছাত্রকেও ইংরাজী শিখিতে হয়। তাহার পর অবসর, অধ্যবসায় ও আগ্রহ থাকিলে বাঙ্গালী মুসলমান অবশ্যই মূল ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য আরবী শিখিতে পারেন—অন্য কারণে উর্দ্দু শিখিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালাই যখন বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃ-ভাষা, তখন বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার মুসলমান ছাত্রের পক্ষে উর্দ্দু শিখিবার চেষ্টা করার কারণ দেখা যায় না।

কৃষ্ণদাস স্মৃতি-সভা

কৃষ্ণদাস পালের বার্ষিক স্মৃতি-সভায় এবার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি হইয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রবাবু সভাপতির অভিভাষণে বর্ত্তমান রাজনীতিক কথায় আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক নহেন। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, রাজনীতিক হিসাবে সহযোগিতা-বর্জ্জন ঘৃণার নামান্তর মাত্র, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। মহাত্মা গন্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ ঘৃণা-লেশ-শূন্য। যিনি এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, সেই মহাত্মার প্রতি ভূপেন্দ্রবাবুর শ্রদ্ধা অবিচলিত। তিনি বলিয়াছেন —যে সকল গুণে গন্ধী 'মহাত্মা' বলিয়া বিশেষিত হয়েন, সে

সকল গুণ বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ত্তমানের আন্দোলনের অবসানে লোক বুঝিতে পারিবে, গন্ধী ঈশ্বর-জানিত লোক—জগতে সেরূপ লোকের আবির্ভাব সুলভ নহে।

ভূপেন্দ্রবাবু বলেন, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুবরাজের পিতামহ এডওয়ার্ড যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছিলেন—"আপনি যে স্থানেই যাইতেছেন সেই স্থানেই নূতন প্রলেপ দিয়া প্রকৃত অবস্থা আপনার দৃষ্টি হইতে দূরে রাখা হইতেছে। আপনার দৃষ্টিসুখের জন্য সমগ্র (ভারত) সাম্রাজ্যে নূতন সুধালেপ দেওয়া হইয়াছে। আপনি যাহা দেখিতেছেন, তাহা প্রকৃত নহে—বিরাট অসত্য। সর্ব্বত্র আপনার আগমনে যে আনন্দ দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আপনার এমন বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, লোক সন্তুষ্ট। কিন্তু সে বিশ্বাসের অপেক্ষা বড় ভুল আর কিছুই হইতে পারে না।"

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু।

প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে— অসহযোগ আন্দোলনের কথা নারও পূর্ব্বে—যখ কংগ্রেসেরও সৃষ্টি হয় নাই তখন রাজভক্ত কৃষ্ণদাস পাল ব্যুরোক্রেশীর সত্যগোপন চেষ্টা ও দেশে অসন্তোষ সম্বন্ধে এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু ৫০ বৎসরে ভারতের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাযেই এ দেশে সহযোগিতা-বর্জ্জন আন্দোলনের উদ্ভবে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

পুলিসের নালিশ

ভবানীপুরে একটি সভায় কলিকাতার পুলিস কর্ম্মচারী কিড সভা ভঙ্গ জন্য উপস্থিত হয় এবং লোককে প্রহারও করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেয়। সেই সভায় শ্রীমতী হেমনলিনী আহতা হয়েন এবং সে সংবাদ পাইয়াও কিড তাঁহার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না করিয়া চলিয়া যায়। তাহার পর 'সার্ভাণ্ট' পত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয়—কিডের প্রহারেই শ্রীমতী হেমনলিনী আহতা হইয়াছিলেন। কিড্ যখন লোককে প্রহার করিয়াছিল, তখন তাহারই আঘাতে শ্রীমতী হেমনলিনীর আহতা হওয়া অসম্ভব না হইলেও এবং কিড মোকর্দ্দমার আদালতে সব সত্য প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ না করিলেও মানহানির মামলায় বিচারক 'সার্ভাণ্টের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়কে ও মুদ্রাকরকে অপরাধী স্থির করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মামলায় আপীল
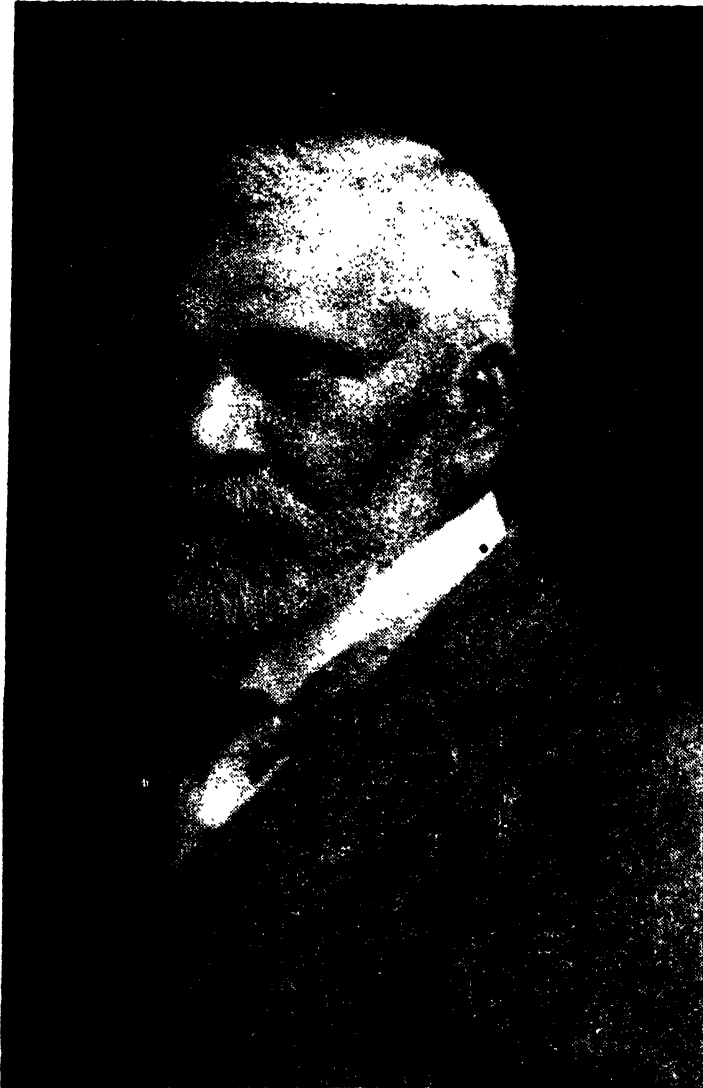
হইয়াছে। সুতরাং মামলা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা সমীচীন নহে।

কিন্তু এই সব মামলায় সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন—তাহার সম্বন্ধে বলিবার কিছু আছে। কোন সংবাদ প্রকাশিত হইলে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া "মারি অরি, পারি যে কৌশলে" হিসাবে প্রজার অর্থ নষ্ট করিয়া, বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার দিয়া পুলিস কর্ম্মচারীর পক্ষে মামলা চালাইয়া লোকমতের প্রকাশোপায় সংবাদপত্রকে জব্দ করিবার চেষ্টা কেবল এই দেশেই সম্ভব! কারণ, এ দেশে বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় কোনরূপে দেশের লোকের নিকট কৈফিয়তের জন্য দায়ী নহেন—তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। এক দিকে বিদেশী সরকারের হাতে প্রজার অর্থ ও সরকারের জিদ—আর এক দিকে সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্রের পক্ষে সাক্ষ্য সংগ্রহের অসুবিধা। এ অবস্থায় আদালত বিদেশী সরকারের না হইলেও ফল কিরূপ হইবার সম্ভাবনা?

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীগোপালদাস দেশাই।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্য্যাদা

শ্রীযুক্ত গোপালদাস অম্বাইদাস দেশাই বোম্বাই প্রদেশে সিন্ধু কাথিবাড়ে এক জন তালুকদার। সংপ্রতি বোম্বাই লাট কাথিবাড় পরিদর্শনে যাইলে, দেশাই মহাশয় অন্যান্য দরবারীর মত—লাটের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে (to pay respect) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়েন নাই এবং তাহার পর সেই "ক্রটির" জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও সম্মত হয়েন নাই। তিনি অসহযোগ-আন্দোলনের সম্পর্ক ত্যাগ করিতেও অসম্মত। এই "অপরাধে" বোম্বাই-সরকার তাঁহার তালুক দুইটি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ করিয়াছেন।

তালুকদার হইলে সরকারকে প্রাপ্য রাজস্ব দিতে হয়; নহিলে তালুক থাকে না। কিন্তু সেই সঙ্গে কি এমন কোন সর্ত্ত থাকে যে, তালুকদারকে বড়, ছোট, ক্ষুদে সব লাটের কাছে সেলাম বাজাইতে যাইতে হইবে? সে বিষয়ে এবং রাজনীতিক বিষয়ে মতের স্বাধীনতা কি তালুকদারদিগের নাই? কিছুদিন পূর্ব্বে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দেওয়ার "অপরাধে" এক জনের ক্ষেত্রে জল দেওয়া হয় নাই এবং সে জন্য বরিশালে বিনোদবাবুর লাঞ্ছনার কথাও আমরা অবগত আছি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আইনে—এমন কি বন্দুকে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। সে চেষ্টা সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে বিফল হইয়াছে। বিশেষ এ দেশে সরকার এখনও অসহযোগ-আন্দোলন আইন-বিরুদ্ধ ও আইনে দণ্ডনীয় বলিয়া প্রচার করেন নাই। আর লাটের পক্ষে এমন ভাবে বলপূর্ব্বক শ্রদ্ধার কৃত্রিম বহির্বিকাশ লাভ করিবার চেষ্টাই কি শোভন?

আইন-ভঙ্গ

বর্ত্তমান সরকারের সহিত সহযোগিতা-বর্জ্জনের শেষ সোপান আইন-ভঙ্গ। যে আইন সমাজের জন্য প্রয়োজন, তাহা ভঙ্গ না করিয়া যে সব আইন অনাবশ্যক বা প্রজার অধিকার-

(বাম হইতে দক্ষিণে)— [কংগ্রেস]

দণ্ডায়মান—এম, এ, বসিত; সি, রাজাগোপালাচারী; এম, এ, আনসারি; এচ, এম, হায়াৎ; লালজি মোরথ্‌।

উপবিষ্ট—ভি, জে, পাটেল; হাকিম আজমল খাঁ; পণ্ডিত মতিলাল নেহরু; এস, কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার।

বিরোধী, সেই সকল ভঙ্গ করিয়া সরকারের কার্য্যের বা শাসন-পদ্ধতির প্রতিবাদ করাই এ ক্ষেত্রে অভিপ্রেত। আইন-ভঙ্গ করিতে হইলে, সে জন্য বিশেষ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়। কারণ, তাহাতে সরকার পক্ষ হইতে ধর্ষণ-নীতি আরম্ভ হইলে, তাহার অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে হয়। তাহা বুঝিয়া মহাত্মা গন্ধীপ্রমুখ নেতারা লোককে প্রথমে অহিংসায় অবিচলিত থাকিয়া, ত্যাগের অনলে আত্মশুদ্ধিলাভ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার প্রভৃতি আরও কতিপয় কার্য্যে লোকের যোগ্যতার পরিমাপ করিবেন, বলিয়াছিলেন।

দেশ বর্ত্তমানে আইন-ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে কি না অর্থাৎ দেশের লোক সেই দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে কি না, তাহা বুঝিবার জন্য কংগ্রেসের ও খিলাফৎ-সমিতির মনোনীত সদস্যরা সমগ্র দেশের অবস্থা বিচার করিতেছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া লোকের প্রকৃত অবস্থা লক্ষ্য করিতেছেন। বাঙ্গালায় ভাবস্রোতঃ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল

এবং বহু রাজনীতিক অনুষ্ঠানে বাঙ্গালাই অগ্রণী হইয়াছে। তাই বাঙ্গালার মতের উপর সমিতিদ্বয়ের সিদ্ধান্ত বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে। বাঙ্গালা তাঁহাদিগের নিকট মত নিবেদন করিয়াছে।

এই সমিতিদ্বয়ের নির্দ্ধারণের উপর সমগ্র ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ভর করিতেছে।

(বাম হইতে দক্ষিণে)— [খেলাফৎ]

দণ্ডায়মান—আশফক্ আলি; বসিত আলি; মহম্মদ গোয়াজেম।
উপবিষ্ট—মোয়াজেম আলি; টি, এ, কে, সেরওয়ানী; জহুর আহম্মদ।

সমিতিদ্বয়ের সদস্যদিগের মধ্যে হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত পাটেল, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, শ্রীযুক্ত কস্তরীরঙ্গ আয়াঙ্গার প্রভৃতি লোক আছেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ জানিবার জন্য সমগ্র দেশ উদ্গ্রীব হইয়া আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গত জুন মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা অকুলান ছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা তাহার মধ্যে আড়াই লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অবশিষ্ট টাকার কি হইবে, ব্যবস্থাপক সভা সে বিষয়ে কোন মতপ্রকাশ করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় সদস্য টাকা দিবার বিরোধী ছিলেন। কারণ ইতঃপূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান জন্য এক সমিতি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই এবং শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থার নিন্দা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

মন্ত্রী মহাশয়ের পক্ষের কথা, তাঁহার হাতে সাড়ে ৮ লক্ষ টাকার অধিক নাই; কাযেই তিনি একটিমাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আড়াই লক্ষের অধিক দিতে পারেন না। বিশেষ ঢাকায় ও রেঙ্গুনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এবং সহযোগিতা-বর্জ্জন অনুষ্ঠানের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতির পরিমাণ--আড়াই লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপক সভার অনুসন্ধান সমিতি গঠনে সম্মত না হইলেও আপনারা সমিতি-গঠন করিয়াছেন এবং সে সমিতির তদন্তফল ব্যবস্থাপক সভাকে দিতে সম্মত আছেন।

ব্যবস্থাপক সভা আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিবার পর গত ২৯শে জুলাই তারিখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক সভাধিবেশন হয়। সে অধিবেশনে তদন্ত-সমিতির বিবরণ পেশ করা হয়। তাহাতে মন্ত্রী মহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-পদ্ধতির আলোচনা করিয়া বলা হয়—বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্ত-শাসনশীল; সুতরাং তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপের অধিকার আর কাহারও নাই। তবে সরকার বা ব্যবস্থাপক সভা কোন বিষয়ে সংবাদ চাহিলে বিশ্ববিদ্যালয় আইনতঃ তাহা দিতে বাধ্য না হইলেও দিতে অস্বীকার না-ও করিতে পারেন। অর্থাৎ আর কেহ কোন বিষয়ে সংবাদ চাহিলে—"Such information cannot be demanded as a matter of right" বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয়ের ব্যক্ত মতের কোন কারণ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত-সমিতির বিবরণ গৃহীত হউক—এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে যাইয়া, ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার সার নীলরতন সরকার বলেন, ব্যবস্থাপক-সভায় এমন কথা বলা হইয়াছে যে, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের অতি-বিস্তারই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থার কারণ এবং বিজ্ঞান কলেজের প্রতি যথেষ্ট ও যথোচিত সদ্ব্যবহার করা হয় নাই। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে মোট ছাত্রসংখ্যা—১৫ শত; আর বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রসংখ্যা—২ শত মাত্র। কাযেই বিজ্ঞান কলেজে ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। এই বিভাগ সরকারের সম্মতি লইয়া স্থাপিত এবং তাহার প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না। এই বিভাগের ছাত্ররা গত ১০ বৎসরে বেতন বাবদেই ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার উপর দিয়াছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অনেক টাকা মজুদ থাকাই স্বাভাবিক নহে—থাকিলে বুঝিতে হয়, সে সব প্রতিষ্ঠান আপনাদের দায়িত্ব বুঝেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থার অন্যতম কারণ এই যে, সরকারের কাছে যে টাকা পাইবার আশা করা হইয়াছে, সে টাকা পাওয়া দুরাশামাত্র হইয়াছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

এইরূপে সার নীলরতন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কন্ধ হইতে লইয়া সরকারের স্কন্ধেই ঝুলাইয়া দিয়াছেন। এখন এ বিষয়ে সরকার কি বলেন?

ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে ডাক্তার হীরালাল হালদার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত-শাসন আছে। অদৃষ্টের কি উপহাস যে, দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে ব্যবস্থাপক-সভার উৎপত্তি, সেই ব্যবস্থাপক সভাই আর একটি স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিতে প্রয়াস করিতেছেন!

আমরা কিন্তু বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ কি, তাহা সরকার কতিপয় অধ্যাপকের নিয়োগ নাকচ করাতেই বুঝিতে পারিয়াছিল। আর ব্যবস্থাপক সভা দেশে যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, তাহার কথা আর না বলাই ভাল।

রাজনীতিক বন্দী

বাঙ্গালায় বহু নেতা ও কর্ম্মী কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও কারাবাসকাল শেষ হইয়াছে—

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

তাঁহারা দেশ-সেবার জন্য যে লাঞ্ছনা পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সহ্য করিয়া আবার কর্ম্মক্ষেত্রে
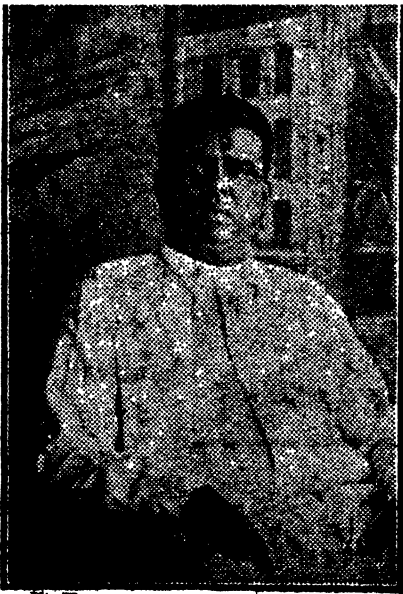
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

আসিতেছেন। সর্ব্বপ্রথমে আসিয়াছেন—শ্রীমান সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের পরিচয় আজ আর বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া দিতে হইবে। তীক্ষবুদ্ধি সুভাষচন্দ্র বিলাতে যাইয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিয়া—চাকরী না লইয়া দেশে আসিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা, উদ্যম ত্যাগ দেশসেবায় প্রযুক্ত হইয়া যে সুফল প্রসব করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

সুভাষচন্দ্রের পর শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস। বীরেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার। কিন্তু তিনি দেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান মেদিনী-পুরে। জনসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাবহেতুই তথায় ইউনিয়ন সেস বন্ধ করা লোকের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জন আজ আর কেবল বাঙ্গালার নহেন—পরন্তু

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সমগ্র ভারতের অন্যতম নেতা। আজ বাঙ্গালায় কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যে কর্ম্মীর তত অভাব নাই, যত নেতার অভাব অনুভূত হইতেছে। এই সময় ইঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্রে পুনরাবির্ভাব বাঙ্গালার সৌভাগ্য!

সংপ্রতি বাঙ্গালার যুবকরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সম্মিলনে মিলিয়া কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিবার আয়োজন করিতেছেন, আমাদের আশা আছে, তাহার ফলে দেশে গঠনকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে। এই সম্মিলনের প্রাথমিক অনুষ্ঠানে সভাপতি হইয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙ্গালার যুবকদিগকে যে সদুপদেশ দিয়াছেন, আমরা বাঙ্গালার সকল যুবককে তাহা গ্রহণ করিতে বলিতেছি।

হরি মহারাজের মহাসমাধি

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আর একটি ধ্রুব-তারা খসিল। গত ৫ই শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় কাশীধামে পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্য, অশেষ-শাস্ত্রদর্শী, আজন্ম ব্রহ্মচারী, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়স্থল, স্বামী তুরীয়ানন্দ, মঠের হরি মহারাজ, মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে শোক করিতে নাই, কিন্তু তাঁহার অভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের, তথা দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি একাধারে তপস্বী ও কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার তপঃ-প্রভাবে মঠের সাধক-মণ্ডলী যেমন উপকৃত ও পরিচালিত হইতেন, তেমনই তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত জ্ঞান-সুধা পান করিয়া ত্রিতাপতপ্ত সংসারী শিষ্য ও ভক্ত-মণ্ডলীও পরম পুলকিত হইতেন। হরি মহারাজ বিবেকানন্দ স্বামীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ
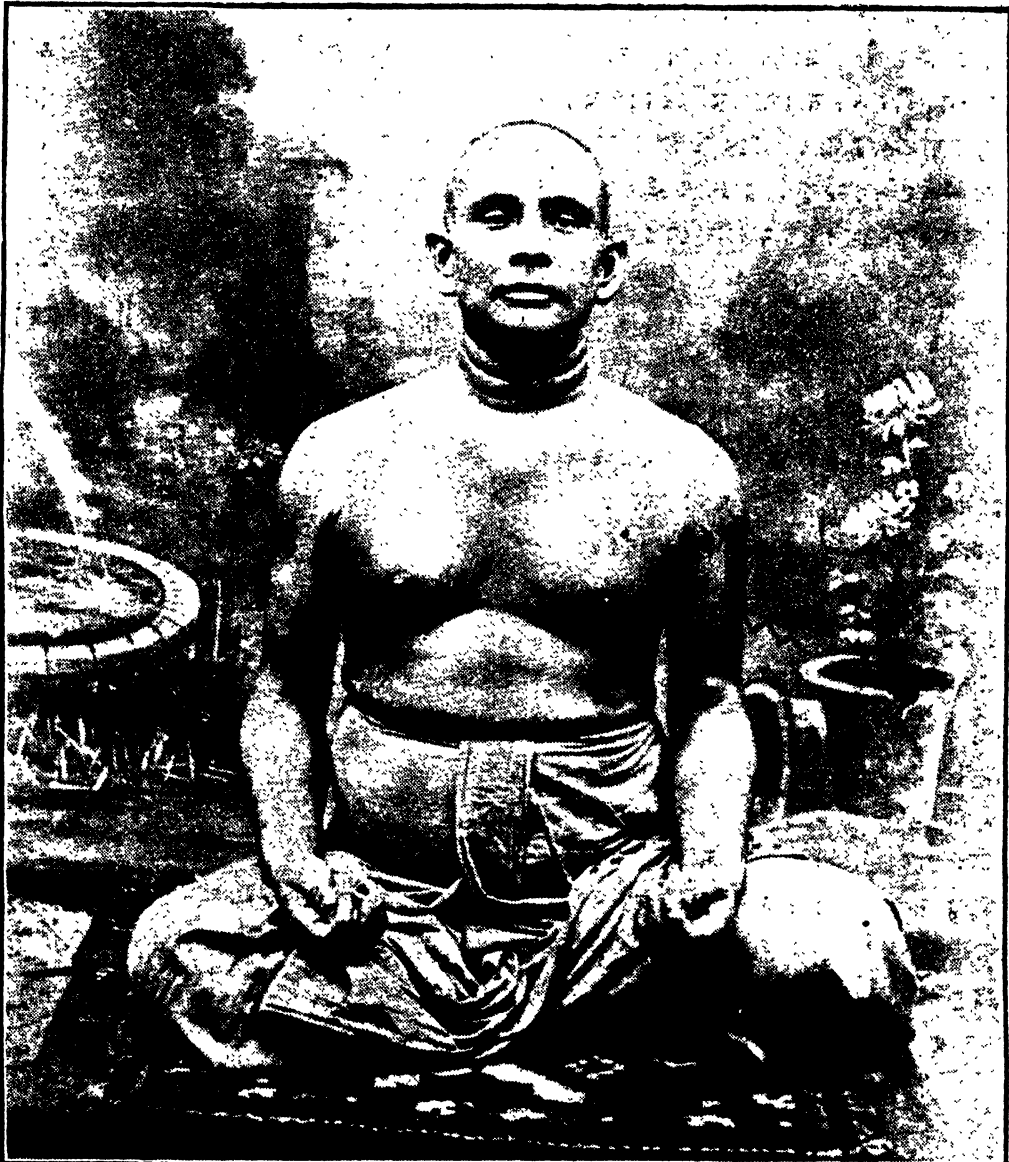
তুরীয়ানন্দ স্বামী।

ছিলেন। স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে লয়েন। ফলে তুরীয়ানন্দের চেষ্টায় কালিফোর্ণিয়ায় শান্তি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। মার্কিণ সমাজের সাধক-মণ্ডলী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। দীর্ঘ তিন বৎসর কাল তিনি তথায় অবস্থান করিয়া স্বামীজীর অভীপ্সিত কার্য্যে রত থাকেন। তাহার পর স্বামীজীর গ্রন্থ-সম্পাদনেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে আজ চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিতেছে।

হরি মহারাজ প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বাগবাজার, বসু-পাড়া অঞ্চলে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতেন। স্বপাক হবিষ্য ভোজন, বেদান্ত অধ্যয়ন, বেদান্তের উপদেশ অনুসারে জীবন-গঠন করা—এগুলি যেন পূর্ব্বসংস্কারবশে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ হইয়াছিল। হরি মহারাজ ঘোর পুরুষকার-বাদী ছিলেন, কিন্তু পরমহংস দেবের সংসর্গে তিনি অচিরেই পরম ভক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার মুখে জ্ঞান ভক্তি-মাখা স্তোত্রলহরী যে শুনিয়াছে, সেই মোহিত হইয়াছে।

পরমহংস দেবের তিরোভাবের পর হরি মহারাজ শ্রীরাম-কৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। তাহার পর কিছুদিন হিমালয়াদিতে ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে আলমবাজার মঠে আসিয়া ব্রহ্মচারিগণের শিক্ষা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বলরাম-ভবনে ও অন্যান্য স্থানে সমাগত ভক্ত ও শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট তিনি কিছুদিন যাবৎ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করেন। তাহার পর বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামীজী দ্বিতীয়বার মার্কিণ যাত্রা করিলে হরি মহারাজ স্বামীজীর বিশেষ অনুরোধে তাঁহার সঙ্গী হয়েন। নিষ্ঠাবান্ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের উপর পাশ্চাত্য সমাজ একটুও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিনি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ই স্বামীজী মহাসমাধি গ্রহণ করেন। স্বামীজীর বিয়োগে ব্যথিত হইয়া হরি মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া আবার কঠোর তপস্যায় রত হয়েন। এই সময় অসুস্থ হইয়া পড়িলে কনখল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ কল্যাণানন্দ স্বামী তাঁহাকে কনখলে লইয়া যায়েন। কনখলে যাইয়াও তিনি কেবল বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন নাই, সেখানেও শিষ্যদের অধ্যাপনা করিতে থাকেন। কনখল হইতে পুরী যাইলে তাঁহার অসুখ আরও বাড়িয়া যায়। তাহার পর কলিকাতায় চিকিৎসাদি করাইয়া তিনি কাশী যায়েন। কাশীতেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হয়।

যাঁহারা পরমহংস দেবের কাছে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, পরমহংস দেব যাঁহাদিগকে উপযুক্ত আধার বুঝিয়া দিব্য-জ্ঞান দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে লীলা শেষ করিয়া মহাপ্রস্থান করিতেছেন। তাঁহারা এক এক জন এক এক কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—যিনি যাঁহার কার্য্যাবসানে চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা রাখিয়া যাইতেছেন, —সেই পুণ্য আদর্শ দেশের লোককে পূত করিবে—উদ্‌ভ্রান্তকে কেন্দ্রস্থ ও দ্বিধাবিচলিতকে সঙ্কল্প-দৃঢ় করিবে। যুগে যুগে যে সব মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তাঁহারা আদর্শই রাখিয়া যায়েন। "দেহিনোঽস্মিন্ যথাদেহে কৌমারং যৌবনং জরা" দেহান্তর-প্রাপ্তিও সেইরূপ। ধীর তাহাতে কাতর হয়েন না। যাঁহারা তাঁহাদের আদর্শ অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারা মনে করিতে পারেন—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়;
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধরে
আমরাও হই বরণীয়।"

নিজে সুখ দুঃখের বাহিরে থাকিলেও সমাজের সুখ-দুঃখে মহারাজ উদাসীন ছিলেন না। বিগত স্বদেশীর যুগে ও বর্ত্তমান অসহযোগ-আন্দোলনে তিনি দেশবাসীকে আত্মত্যাগ করিতে দেখিয়া প্রীত হইতেন এবং ভক্ত-মণ্ডলীকে স্বার্থত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন। নিষ্কাম কর্ম্মীর নিঃস্বার্থ দেশ-প্রীতি শত ভাবে শত পথে দেশের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। বঙ্গ-জননীর সুসন্তান দেশে বিদেশে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার অমর আত্মার আশীর্ব্বাদে দেশবাসীর সাধনা সিদ্ধ হউক। দেশবাসী তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হউন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ আজ পরলোকে—তিনি জীর্ণ দেহ রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু যত দিন রামকৃষ্ণ মিশন ভারতে নরনারীর কল্যাণ-সাধন করিবে, তত দিন তাঁহার কীর্ত্তি ম্লান হইবে না।

———

সদ্যকারামুক্ত দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ।

কংগ্রেসের গঠন-কার্য্য

কংগ্রেসের প্রথম কায—দেশে ভাবপ্রচার সম্পন্ন হইয়াছে, যে ভাব এতদিন মুষ্টিমেয় ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা আজ সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে—পর্ব্বতের বক্ষে রুদ্ধ জলরাশি আজ প্রান্তরে আসিয়া চারিদিক শস্য-শ্যামল করিতেছে। বিশেষ যে স্তর হইতে সমাজের শক্তি উদ্ভূত হয়, সেই স্তর বর্ত্তমান আন্দোলনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। দেশের যে জনগণকে এত দিন দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা আজ আপনাদের অধিকার উপলব্ধি করিয়াছে—শক্তি অনুভব করিয়াছে। তাহারা সে অধিকার চাহিতেছে—সে শক্তি দেশের কাযে প্রযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। অসহযোগ-আন্দোলনের ফলে যদি কেবল এই কাযই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলা যাইতে পারে, সে আন্দোলন বিফল হয় নাই। আর যতদিন যাইবে তত তাহার সেই ফললাভ করিয়া দেশবাসী ধন্য হইবে।

আজ সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট গঠন-কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে হইবে। দেশ যাহাতে স্বাবলম্বী হয়—দেশের জনগণ যাহাতে স্বরাজে তাহাদের জন্মগত অধিকার বুঝিয়া সেই অধিকার পাইবার জন্য অহিংসার পথে কর্ত্তব্য সম্পাদন করে—ত্যাগের পথে অধিকার লাভ করে—সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার করে—তাহাই করিতে হইবে।

সে জন্য কর্ম্মীর প্রয়োজন। চিত্তরঞ্জন কারামুক্ত হইয়াই সে প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যেই কর্ম্মীরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। বাঙ্গালার সৌভাগ্য, এই সময় কংগ্রেসের ও খিলাফৎ সমিতির নির্ব্বাচিত সদস্যরা আইন-ভঙ্গ সম্বন্ধে দেশের যোগ্যতাবিচারব্যপদেশে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া চিত্তরঞ্জন দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন—কারণ, দীর্ঘ ৬ মাস তিনি কারাগারে বদ্ধ থাকায়, অনেক বিষয় তাঁহার গোচর হয় নাই।

এ দেশে চরকা ও তাঁতের প্রচলন কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট গঠন-কার্য্যের অন্যতম। সে বিষয়ে বাঙ্গালার প্রকৃত অবস্থা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অবগত আছেন। তাহার পর অস্পৃশ্যতা পরিহার ও হিন্দু-মুসলমানে ভ্রাতৃভাব প্রবর্দ্ধন। শেষোক্ত দুই বিষয়ে বঙ্গদেশ যে অনেক অগ্রসর হইয়াছে, সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নাই এবং তাহাতে বাঙ্গালার সৌভাগ্যই সূচিত হইতেছে।

কংগ্রেসের নেতৃগণের সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত। তাঁহারা দেশের লোকের নেতার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সে কাযের দায়িত্ব তাঁহারা বিশেষরূপ অবগত আছেন এবং আমাদের বিশ্বাস, সে কার্য্য করিবার যোগ্যতাও তাঁহাদের আছে। তাঁহারা সাধনা করিয়া সে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। দেশ আজ তাঁহাদের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাঁহারা দেশের অবস্থা বিচার করিয়া—দেশের কল্যাণকামনায় লোককে পথনির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

এই সময় বিলাতে প্রধান মন্ত্রী স্পষ্ট কথা বলিয়া অনেকের মোহান্ধকার দূর করিয়াছেন। যে শাসন-সংস্কারকে তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের প্রথম দান বলিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাহা পাকা নহে, পরন্তু Experiment বা পরীক্ষামাত্র। আর এ দেশে শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদিগের অধিকার ও ক্ষমতাদি অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। কেন না, তাঁহারাই বৃটিশ-শাসনসৌধের স্তম্ভ। এই কথা হইতেই এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান সম্বন্ধে বিলাতের রাজনীতিকদিগের প্রকৃত মনোভাব বুঝা যাইবে।

চিত্তরঞ্জন কারামুক্ত হইয়া দেশসেবাতেই আত্মনিয়োগ করিলেন।

তাঁহার সাধনা সফল হউক, ইহাই তাঁহার দেশবাসীর কামনা।

গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে আইনভঙ্গ ও ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন সম্বন্ধে মত প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল গঠন-কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। দেশীয় সূতার ও বস্ত্রের বহুল প্রচলন—শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান—এ সব আমাদিগকে করিতে হইবে। আজ যে বাঙ্গালার নানা স্থানে বন্যায় গ্রামবাসীরা বিপন্ন, তাহার জন্য দেশের লোককেই বিপন্নের উদ্ধার-সাধনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই সব কায আজ দেশের লোককে কর্ত্তব্যজ্ঞানে সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৬ই আষাঢ় —

মিউনিশান বোর্ডের সম্পর্কে সরকারের নামে শ্রীযুক্ত কেশোরাম পোদ্দারের ৩৫ লক্ষ টাকার দাবীতে নালিশ। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং ফিজীতে ভারতীয়দের দুরবস্থায় ভারতের জনসাধারণের উদ্দেশে শ্রীযুক্ত এইচ, এস, এল, পোলক ও মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজের নিবেদন ; সাম্রাজ্য-সভার প্রদত্ত সমান অধিকারের প্রতিশ্রুতি পালন করান চাই। বিলাতী ডাক জাহাজ "ইজিপ্টের" লস্কর গোবিন্দ পদ্ম কোন সৈনিকের প্রাণ-রক্ষাকল্পে অদ্ভুত সাহস প্রদর্শন করায় তাহার পুরস্কার-প্রাপ্তি। সিন-ফিনদের মাইন ফাটিয়া যাওয়ায় ডাবলিনের আদালত-গৃহ ধ্বংস ; বহু দলিল-পত্র নষ্ট ; আদালতের বাহিরে ডিভ্যালেরার নেতৃত্বে সিনফিনদের আত্মরক্ষার চেষ্টা ; ডাবলিনের যুদ্ধে মোট ৩০০ বিদ্রোহী বন্দী ; সিনফিন ও নাগরিকে মিলিয়া ৪০ জন নিহত, ১৮০ জন আহত ; যুদ্ধের জন্য ডাক বন্ধ, আইরিশ পারলামেন্টের অধিবেশন স্থগিত।

১৭ই আষাঢ়—

দিল্লীতে কংগ্রেসের আইন-অমান্য-তদন্ত কমিটির সাক্ষ্যগ্রহণ আরম্ভ।

১৮ই আষাঢ় —

প্রশান্ত অঞ্চলের প্রিন্স অব ওয়েলস্ দ্বীপের অধিবাসী মিঃ ডবলিউ জে স্কাউলি নামক এক জন পদব্রজে ভূ-পর্য্যটনকারীর বোম্বায়ে উপস্থিতি ; ভারত ঘুরিয়া তিনি আফ্রিকা ও য়ুরোপ যাইতেছেন। ১৯১৯ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পেনাঙ্গ হইতে যাত্রা করেন।

১৯শে আষাঢ় —

অষ্ট্রেলিয়ায় শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর পরিদর্শনের ফলে কুইন্সল্যাণ্ডে কঠোরতা-হ্রাস। ১৯২১ অব্দের ১৮ই নবেম্বর হইতে গত ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে একমাত্র নূতন ফৌজদারী সংস্কার আইনে গ্রেপ্তার ও দণ্ডের সংখ্যা যথাক্রমে—কলিকাতায় ৬৫৫১,৩১৩২, ফরিদপুর ৬৪৬,৪৩৫, বাখরগঞ্জ ১০৪, ৪১, মৈমনসিং ৩০৯,১৯২, ঢাকা ৪৪৮, ৩০০, হাবড়া ২৮২, ২৬০, বীরভূম ১০, ৪, রঙ্গপুর ৩৩৬, ২৯৬, ২৪ পরগণা ২০২, ৫২, চট্টগ্রাম ৬১০, ৪৮৮, ত্রিপুরা ৫২, ৭, মেদিনীপুর ৫, ৪। পাটনার "সার্চ্চলাইটে"র নামে স্থানীয় পুলিসের মিঃ লুইস ও পারকিন্সের সত্তর হাজার টাকার দাবীতে নালিশ।

২০শে আষাঢ় —

যারবেদা জেলে মহাত্মা গন্ধীর চিঠিপত্র লেখায়, পুস্তক রচনায়, সংবাদ-পত্র-পাঠে কড়াকড়ি ; শ্রীযুক্ত ব্যাঙ্কার নির্জ্জন কক্ষে। নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটীর সদস্য মৌলবী আমেদ আলির প্রতি খুলনায় ১৪৪ ধারা। সার্ভেণ্ট' মানহানি মামলায় সম্পাদকের ৫০০৲ অর্থদণ্ড বা তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড, মুদ্রাকরের ৫০৲ টাকা বিকল্পে এক মাস বিনাশ্রম কারাবাস ; সম্পাদক ও মুদ্রাকরের জরিমানা না দিয়া কারাবরণ। খিদিরপুর ডকে জাহাজে মাল তুলিবার নামাইবার কাযের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের অবসান। "দৈনিক-বসুমতী"র আবেদনে নির্য্যাতিতা বালিকা-বধূ শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবীর সাহায্য-ভাণ্ডারে আড়াই শত টাকা প্রাপ্তি। মার্কিণ ভূপর্য্যটক মিঃ হিপোলাইট মার্টিনেটের কলিকাতায় আগমন ; তিনি পদব্রজে দৈনিক গড়ে চল্লিশ মাইল পথ হাঁটিতেছেন ; ১৯২০ অব্দের অক্টোবর মাসে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত, প্রশান্ত-মহাসাগর তীর-বর্ত্তী ওয়াশিংটন প্রদেশের সিয়াটল বন্দর অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের এক দিকের শেষ প্রান্ত হইতে তিনি যাত্রা করেন ; মিঃ মার্টিনেট ইতিমধ্যে চৌদ্দ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন। চট্টগ্রাম, ফটিকছড়িতে বাঁধ কাটা ব্যাপারে পুলিসের গুলী, কয়জন হতাহত। বার্লিনে সাধারণ-তন্ত্রীদের মিছিলে রাজ-তন্ত্রীদের সহিত সংঘর্ষ ; বহুলোক হতাহত।

২১শে আষাঢ় —

রেঙ্গুন আদালতে নারী দো-ভাষী। সিডনিপ্রবাসী ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর অভিনন্দন।

২২শে আষাঢ়—

ডাবলিনের যুদ্ধে কতিপয় আইরিশ নারী কর্ত্তৃক সরকারী সৈন্যদলের উপর অন্তরাল হইতে গুলীবর্ষণ ; বিদ্রোহীদলের শুশ্রূষাকারিণী মিসেস্ ম্যাক্সুইনী ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কেভিনবারীর ভগ্নী ক্যাথলিন সরকারী সৈন্যের হস্তে ধৃত ; মুক্তি দিতে চাহিলেও ইহাঁরা মুক্তি লয়েন নাই ; যুদ্ধে সরকারী সৈন্যের জয়লাভ। পারস্যের এঞ্জেলী বন্দরে সোভিয়েটের নৌ-বহর ; পারসীক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অভিনন্দন। আলিপুর জেলে নেতৃবর্গের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রশ্নে ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সপ্ত-রথীর মধ্যে ডাঃ সারওয়ার্দ্দীর বীরত্ব। ব্রহ্মের জননায়ক ভিক্ষু উত্তম কারাগার হইতে মুক্তি পাওয়ায় মবিনে তাঁহার অভিনন্দন ; সমাগত মহিলা-বৃন্দ কর্ত্তৃক সন্ন্যাসীর গমন-পথে আলুলায়িত কেশ-পাশ স্থাপন। বড়বাজারের কবিরাজ শ্রীযুত অনাথনাথ রায় জরিমানার টাকা জমা দেওয়ায় জেল হইতে সার্ভেণ্টের সম্পাদক ও মুদ্রাকরের মুক্তি। সক্কর মিউনিসিপ্যালিটীতে কর্ম্মচারীদিগের খদ্দর পোষাক ব্যবহারের প্রস্তাব। মজঃফরপুর ও দ্বারবঙ্গে অসহযোগ-দমন-বিদ্বেষী জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্রিজ ও মিঃ কিং ; বিহার-বাসীর প্রশংসা। টাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত শাহাবাদ সিমেণ্ট কোম্পানীতে নিজাম সরকারের পাঁচ লাক টাকার অংশ ক্রয়। নূতন নিয়মে এলাহাবাদে গৃহীত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৪৬ জনের সাফল্য। সরকার কর্ত্তৃক ঢাকায় কারীগরি ও ব্যবসায় শিক্ষার ব্যবস্থার প্রস্তাব ; ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমিতি-গঠন।

২৩শে আষাঢ়—

সরকারী দয়ায় ময়মনসিংহের অসহযোগী উকীল শ্রীযুত অজিতকুমার বসুর কারাদণ্ড হ্রাস। আসাম সরকারের খদ্দর প্রীতি, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দের খদ্দরে মোড়া পুলিন্দা ডাক-বিভাগের প্রেরণে অসম্মতি। শ্রীযুক্ত ছোটানী কর্ত্তৃক গ্রীক যুদ্ধে বৃটিশের নিরপেক্ষতা-ভঙ্গের অভিযোগ।

২৪শে আষাঢ়—

খড়দহ হইতে আহিরীটোলা, গঙ্গাবক্ষে তেরো মাইল সন্তরণের প্রতিযোগিতা; আহিরীটোলার ১৬ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান্ আশুতোষ দত্তের প্রথম স্থান অধিকার; মোট নয় জনের সাফল্য। বাঙ্গালায় সরকারী ব্যয়-সংক্ষেপ কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ। বোষ্টনে আন্তর্জ্জাতিক ধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে যোগদান করিবার জন্য স্বামী ধীরানন্দ গিরির কলিকাতা হইতে মার্কিণ যাত্রা। সক্কর মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক আলি জননীকে অভিনন্দন। জেলে আলি-ভ্রাতাদের উপর কড়াকড়ি, সাক্ষাৎ করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে ইংরেজীতে কথা কহিতে হইবে। ব্রহ্মে হেঙ্গাদা নামক স্থানে ডাকাতিতে মগ-রমণীর রিভলভার-হস্তে নেতৃত্ব; দুই জন ডাকাতের সহিত তাহার গ্রেপ্তার। মালাবারে বন্যায় বহুলোক গৃহশূন্য। পারলামেণ্টে ঔপনিবেশিক সচিবের সাফ জবাব, কেনিয়ায় য়ুরোপীয়দের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

২ শে আষাঢ়—

দিল্লীর জন নায়ক "কংগ্রেস" সম্পাদক মৌলানা কুতবুদ্দীন সিদ্দিকি রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার। সিরাজগঞ্জেও মৌলবী আহমদ আলির প্রতি ১৪৪ ধারা। জব্বলপুর মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক কংগ্রেসের আইন অমান্য তদন্ত-কমিটীর অভিনন্দন, কমিটীর গমনে মিউনিসিপালিটীর বাটীগুলিতে জাতীয় পতাকা, অফিসের ছুটী।

২৬শে আষাঢ়—

বেলিয়াঘাটায় বেলা দশটার সময় মোটর ডাকাতি, ৬১৫১ টাকা লুণ্ঠিত। য়ুরোপ ও মার্কিণ হইতে প্রকাশিত ভারতে বাজেয়াপ্ত-করা পুস্তক-পুস্তিকার জন্য সার্ভেণ্ট, বিজলী, বেঙ্গলী, অল-হকিম ও আনন্দবাজার অফিসে এবং কয়খানি পুস্তকের ও অন্যান্য দোকানে খানাতল্লাস। সিরাজগঞ্জে স্থানীয় আট জন নেতার প্রতি ১৪৭ ধারা; মৌলবী আহমদ আলির প্রতি আর এক দফা; সভায় বক্তৃতা, যোগদান ও সভার আয়োজন নিষিদ্ধ। অমৃতসরে লালা দুনীচাদ, শ্রীযুত সন্তানম ও এক জন মুসলমান নেতার শোভাযাত্রা বন্ধ। মেদিনীপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুত কুমারনারায়ণ জানার প্রায়োপবেশনের ফলে সঙ্গীন অবস্থা।

২৭শে আষাঢ়—

বৈদ্যবাটীতে গৃহ-কলহে বালিকা বধুর কেরোসিনে আত্মহত্যা। বারাসত হাই স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক কূপ হইতে নিমজ্জমান একটি নারীর উদ্ধারে পুরস্কারলাভ। ভুবনেশ্বরের পাণ্ডা-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক দেব সেবায় স্বদেশী ভিন্ন অন্য দ্রব্য প্রদান বন্ধ করার অনুরোধ। বোষ্টনের মহিলা-সমাজ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গন্ধীর নিকট মহাত্মার গ্রেপ্তারে সহানুভূতি-জ্ঞাপন। মাদারল্যাণ্ডের সম্পাদক মৌলবী মজহরল হকের নামে মানহানির নালিশ। বারাণসীতে অধ্যাপক ধর্ম্মবীর সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার; হাতে হাতকড়ি দিয়া ও কোমার দড়ি বাঁধিয়া আদালতে লইয়া যাওয়া। বৃটিশ গায়না প্রতিনিধি-মণ্ডলীর পণ্ডিত বেঙ্কটেশ নারায়ণ তেওয়ারীর নিবেদন—গায়নার ভারতীয়দের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য কতিপয় শিক্ষিত ভারতবাসীর তথায় যাওয়া উচিত। কতিপয় ভারতীয় কর্ত্তৃক লণ্ডনে ভারতীয় নাট্যাভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের সঙ্কল্প। জার্ম্মাণীতে মুদ্রাসঙ্কট; সম্মিলিত শক্তির অবিশ্বাস।

২৮শে আষাঢ়—

কলিকাতায় ড্যালহাউসি ইনষ্টিটিউটে বাঙ্গালা সরকারের কৃষি, শিল্প ও সমবায় বিভাগের সভার অধিবেশন আরম্ভ। সুরাটে মোসলেম অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য বোম্বায়ের শেঠ হাজী মহম্মদের চল্লিশ লক্ষ টাকা দান। যারবেদা জেল হইতে মহাত্মা কর্ত্তৃক তাঁহার স্বহস্তে কাটা প্রায় পাঁচ সের সূতা সত্যাগ্রহ আশ্রমে প্রেরিত। মহাসভায় ইরাক পরিত্যাগ প্রস্তাবে ঔপনিবেশিক সচিবের উত্তর—ইরাক গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে চাহেন। হেগ বৈঠকেও রুস সমস্যার সমাধান না হওয়ার আশঙ্কা। আয়ারলণ্ডের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে বিদ্রোহী সেনার গরিলা যুদ্ধ। ফ্রান্স কর্ত্তৃক পশ্চিম এসিয়ায় শান্তি-স্থাপনের প্রস্তাব; ইংরেজ, ফরাসী, তুর্কী ও গ্রীকদের লইয়া মীমাংসা সভা গঠনের সঙ্কল্প।

২৯শে আষাঢ়—

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একশত ছাত্র প্রেরণ; তন্মধ্যে একটি বালিকা। দক্ষিণ আইরিশ সরকার কর্ত্তৃক বিদ্রোহীদের দমনার্থ সমর-সমিতি গঠন। ময়মনসিংহের শ্রীযুত মনোমোহন নিয়োগী ও আর দুই জন উকীল এবং এক জন মোক্তার অসহযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় সনন্দ কাড়িয়া লওয়ার মামলা; হাইকোর্টের বিপরীত রায়। বাঙ্গালার সরকারী কারা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সার আবদার রহিমের পদত্যাগের জনরব। খুলনায় গবর্ণর-গমনে হরতাল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাড়তী বাজেটে কৃষি বিভাগের আট হাজার ও পুলিস বিভাগের ৬০১১ টাকা ছাড়া আর সব প্রস্তাব গৃহীত। বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীর হারবৃদ্ধির প্রস্তাবে মাণিকতলা মিউনিসিপালিটীর প্রতিবাদ।

৩০শে আষাঢ়—

বিলাতের বৃটিশ বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগিগণের তিব্বত-যাত্রা; যাত্রিগণ বিলাত হইতে ভারতে আসিয়া দার্জ্জিলিং হইয়া যাইবেন। প্যালেষ্টাইনে ইহুদী স্থাপন সঙ্কল্পের প্রতিবাদকল্পে হাইফা বন্দরের মুসলমান ও খৃষ্টানগণের হরতাল। লাহোরের "আকালী" সম্পাদক জ্ঞানী হীরা সিং রাজদ্রোহের অভিযোগে গেপ্তার। কলিকাতায় বিলাতী বস্ত্রের আমদানী ও বিক্রয় আধিক্যে স্বামী সচ্চিদানন্দ ও আর চার জন সন্ন্যাসীর প্রায়োপবেশন; স্বামীজীর সঙ্গে মোট এক শত সন্ন্যাসী আছেন, ব্যবসায়ীরা লোভ সংবরণ না করিলে তাঁহারা পাঁচ পাঁচ জন করিয়া প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবেন; স্বামীজীর বয়স ৬৮ বৎসর। মান্দ্রাজ, এরোদ মিউনিসিপ্যালিটীতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প।

৩১শে আষাঢ়—

ঢাকার প্রসিদ্ধ জন-নায়ক শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ও শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী কারাগারে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলে সঙ্গী দুইটি শিশু পুত্রকে বাহিরে রাখিয়া যাইতে আদিষ্ট হয়েন; তাঁহারা সরকারী কৃপার বহর দেখিয়া চলিয়া আসিয়াছেন; শ্রীশ বাবুর মাতুল-পুত্রের পরিবারবর্গেরও অদৃষ্টে ঠিক এইরূপ ব্যবহারই জুটিয়াছিল; ঐ জেলে কোন কয়েদী অসাবধানতাবশতঃ আমের আঁটি কোন কর্ত্তৃপক্ষের গায়ে ফেলায় সকল বন্দীর আত্মীয়-স্বজনদের জেলে ফল-মূলাদি পাঠান বন্ধ। পুরুলিয়ায় নয় জনের নামে মিছিল, সভা প্রভৃতি নিষেধের নোটীশ। সক্করের আদর্শে করাচী, লারকানা ও হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপালিটীরও কর্ম্মচারীদিগকে খদ্দর পরাইবার সঙ্কল্প। গবর্ণরের বরিশাল গমনে হরতাল। চট্টগ্রাম ষ্টেশন হাঙ্গামা মামলার অন্যতম আসামী শ্রীযুত সিরাজুল হকের দণ্ডহ্রাস; ৭ মাস হইতে ৪ মাস, অর্থদণ্ড বাতিল। ফিরোজপুরে এক ফৌজদারী মামলায় ১৩ জনের ফাঁসী, ২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; আসামীরা দুই ত্যাজ্য পুত্রের পক্ষীয়, উহারা অন্য ছয় ভ্রাতার পরিবারবর্গকে হত্যা করে ও তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করে। ড্যালহাউসী ইনষ্টিটিউটে সরকারী কৃষি-শিল্প সভায় চরকার প্রশংসা; শিল্প-সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব। নূতন বাঙ্গালী টেরিটোরিয়াল সৈন্যদলে জমীদারদের লোকজনকে অফিসার রূপে গ্রহণের প্রস্তাব। পাটনা রেল ষ্টেশনে স্থানীয় এক ভদ্রলোক শ্রীযুত মনজুর হোসেনের গণ্ডে চপেটাঘাতে হেনরী লিমনের মাত্র ৩০ টাকা অর্থদণ্ড; বাদী অসাবধানে আসামীর গায়ের উপর পড়িবার মত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ইচ্ছা অনুসারে ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তদীয় জননী ও সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক কবিবরের লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক দশটি আলমারী ও দুইটি বুককেস সহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান ; স্কটিশচার্চ্চ-কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্য উদ্দেশে পরিষদে হাজার টাকার ওয়ার-বণ্ড দান। ডি-ভ্যালেরার নেতৃত্বে কর্কে যুদ্ধ। ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক ইন্‌জেকশনের পরিবর্ত্তে ভ্যাকসিন পানে রোগ আরোগ্যের নূতন উপায় আবিষ্কার। বিলাতে খেতাব দেওয়ার ব্যাপারে গলদ ; তদন্ত-প্রস্তাবে মন্ত্রিসভার পদত্যাগের ভয়-প্রদর্শন।

৩২শে আষাঢ়—

মেসোপটেমিয়ায় বৃটিশের পক্ষপাতী ও বিরুদ্ধবাদীতে দলাদলির সংবাদ। জাতিসংঘের পরামর্শের জন্য য়ুরোপে আহূত সিরিয়ো-প্যালেষ্টাইন কংগ্রেসের সভাপতি কর্ত্তৃক কথা-প্রসঙ্গে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও লেবাননের স্বাধীনতার দাবী। পিকিনে মফঃস্বলের বেকার শ্রমিকদল কর্ত্তৃক সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর অত্যাচার। গোলদিঘীতে একটি সন্তরণ-শিক্ষার্থী যুবকের মৃত্যু।

১লা শ্রাবণ—

বিলাতে ফীল্ড মার্শাল সার হেনরী উইলসনের হত্যাকারী দুইজনের প্রাণদণ্ডের আদেশ। আয়ারলণ্ডের ঘরোয়া যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত ২০০০ সিনফিন বন্দী। রুসিয়ায় বিষম দুর্ভিক্ষ, অনাহারে প্রত্যহ শত শত লোকের মৃত্যু ; পেটের জ্বালায় চালের খড় ও মৃত দেহ ভক্ষণ ; ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া লোকজনের পলায়ন। গৌরীশঙ্কর অভিযানের ৭ জন শ্রমিকের বরফস্তূপে চাপা পড়িয়া মৃত্যু। ঢাকায় লাটের মুখে অসহযোগের স্তুতি-নিন্দা।

২রা শ্রাবণ—

য়ুরোপীয় মহা-যুদ্ধে জার্ম্মাণ মাইনের আঘাতে আইরিশ উপকূলে জলমগ্ন লরেণ্টিক জাহাজ হইতে দুই মাসের চেষ্টায় দশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সোনার বাট উদ্ধার ; রত্নোদ্ধারের কায এখনও চলিতেছে। জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব সার রাথেনাউয়ের হত্যাকারী দুই জনের আত্মহত্যা। বিলাতে উপাধি-প্রদানের ব্যাপারে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগে মহাসভা ও লর্ড-সভায় প্রতিবাদ। পার্লামেণ্টের স্থায়ী জয়েণ্ট কমিটী কর্ত্তৃক ভারতে সামরিক ব্যয়-হ্রাসের অনুরোধ ; কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯১৩-১৪ অব্দে ভারতে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের জন্য ব্যয় হইয়াছিল ৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকা, ১৯২১-২২ অব্দে ব্যয় দাঁড়াইয়াছে ১৬ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা অথচ, পূর্ব্বের তুলনায় সৈনিকদের সংখ্যা এখন ৬ হাজার কম। উপনিবেশিক অফিসের উক্তিতে কাম্পালের ভারতীয়গণের প্রতিবাদ : তাহারা য়ুরোপীয়দের নিকট হইতে পৃথক্ স্থানে বাসের ব্যবস্থা চাহে না, পক্ষান্তরে, প্রতিবাদস্বরূপ নূতন সহরে সে ব্যবস্থায় জায়গা-জমী লইবে না। সিন্ধু, হায়দ্রাবাদের হিন্দু-পত্রের অন্যতম প্রধান সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী মহারাজ লোকরামের যারবেদা জেলে প্রায়োপবেশন। চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের চাঁদা সংগ্রহে শোভাযাত্রা করিবার অপরাধে কলিকাতা বড়বাজারে ছয় জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার। পঞ্জাবে লাহোরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দ গ্রামের পিটুনী পুলিস সম্বন্ধে স্থানীয় কংগ্রেসের তদন্ত-বিবরণ—পুলিসের খরচ আদায় যে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের নিকট ৫ টাকা, সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস, পঞ্চায়েৎ ও আকালীদের নিকট ৪০ টাকা হারে ও ভূতপূর্ব্ব কয়েদীদের নিকট ৩০ টাকা হারে। চতুর্থ গন্ধী পুণ্যাহে আমেদাবাদে বক্তৃতার পরিবর্ত্তে জাতীয় সঙ্গীত ; বরিশালে স্বরাজ-ভাণ্ডারে দারিদ্র্য-ব্রতধারী শরৎকুমারের শেষ সম্বল—পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীর অলঙ্কারগুলি দান। শিমলায় অস্ত্র-আইন কমিটীতে সাক্ষ্য-গ্রহণ। সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক সমস্যা।

৩রা শ্রাবণ—

যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস কর্ত্তৃক বর্ত্তমান সরকারী চণ্ড-নীতি ও অর্থ-নীতির প্রতিবাদ-কল্পে পদত্যাগ। যুক্ত-প্রদেশ, মজঃফরনগরের শেঠ বিহারীলাল কর্ত্তৃক তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি জাতীয় ও শিল্পশিক্ষার জন্য দান ; সম্পত্তির আয় বার্ষিক লক্ষ টাকা। ছোটনাগপুরের চণ্ড-নীতির বিবরণ ;—কারামুক্ত নেতার অভ্যর্থনায় পুরুলিয়ায় শোভাযাত্রা ও সভা বন্ধ ; মফঃস্বলে মৌখিক সভা বন্ধের আদেশ অগ্রাহ্য করায় যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে দুই জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার ; পাহাড় ও বনের ভিতর দিয়া দশ মাইল দূরে থানায় লইয়া যাইয়া অব্যাহতি, তাঁহাদের ফিরিবার পথে দোকানদারদিগকে জিনিষ-পত্র বিক্রয় করিতে ও গৃহস্থকে অতিথি-সৎকারে নিষেধ। চম্পারণ জেলায় রকসৌলে রেলের পুল ধ্বংসে ট্রেণ জলমগ্ন হওয়ার পরবর্ত্তী বিবরণ ; ট্রেণের শিকল কাটিয়া যাওয়ায় এঞ্জিন-শূন্য ট্রেণ প্রায় আধ ঘণ্টা সেতুর উপর দাঁড়াইয়া থাকিবার পর উহা সেতু-সহ-জলমগ্ন হয় ; দুর্ঘটনার ১৭ ঘণ্টা পরে একজন রেলকর্ত্তৃপক্ষ ট্রেণের ডাকের তল্লাস করিতে যান, যাত্রীদের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা তাহারও পরে হইয়াছিল। এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ১৯১১৩, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৩৮১১, তাহাদের ৩১৭৯ জনের মাতৃভাষা ছিল বাঙ্গালা, ৩৭০ জনের উর্দ্দু, ৪৮ জনের আসামী এবং এক জনের গুজরাঠী। দ্বারকেশ্বরের বন্যায় ক্ষতি-নির্দ্ধারণ ; হাজার বিঘা জমী বালি-চাপা, তিন শত বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে ; মোট ক্ষতি সওয়া লাখ টাকা। মেজর ব্লেকের নেতৃত্বাধীন বিমানযোগে পৃথিবী ভ্রমণকারী বৈমানিক দলের করাচীতে উপস্থিতি। হেগ সভায় সুবাতাস ; ঋণ শোধ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের আবশ্যক সময় বিলেঃ রুস প্রতিনিধিরা মস্কো কর্ত্তৃপক্ষকে আর একবার বুঝাইয়া দেখিবেন। ইটালী সরকার দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে না পারায় প্রজাসভায় নিন্দা প্রকাশে মন্ত্রি-বর্গের পদত্যাগ। জার্ম্মাণীর নূতন প্রার্থনা—ক্ষতিপূরণের মাসিক হার কমাইয়া দাও, জার্ম্মাণীর বাসিন্দা সম্মিলিত পক্ষের প্রজাদের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা স্থগিত থাকুক। অষ্ট্রীয়ায় টাকার বাজারে গোলমালে জন-সাধারণমধ্যে চাঞ্চল্য। আয়ারলণ্ডে কনট ও মানষ্টার প্রদেশে তুমুল যুদ্ধ ; অপর দুই প্রদেশে সুরক্ষা।

৪ঠা শ্রাবণ—

মস্কোতে আঙ্গোরার প্রতিনিধি-মণ্ডলী ; মস্কো-আঙ্গোরা সন্ধিতে নূতনত্বের সম্ভাবনা। মিশরে কোন মসজিদে স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার মঙ্গল কামনায় শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হস্তে খতিবের অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ। রুসিয়ায় ভারতীয় ছাত্র আবদুল রহিমের মৃত্যুর সংবাদ ; যুবক আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ হইয়া গিয়াছিল এবং রুসিয়ায় এরোপ্লেন পরিচালন বিদ্যা শিখিতেছিল। ভারতের বহির্বাণিজ্যের জুন মাসের হিসাব ; আমদানী ২০৯০ টাকার রপ্তানী ১৯৬ লক্ষ টাকার কারাবাসী পণ্ডিত গোপবন্ধুর নামে মানহানির নালিশ লাহোরের বন্দে মাতরম ও আকালী পত্রের সম্পাদক দ্বয়ের রাজদ্রোহ অভিযোগে দেড় বৎসর করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড। আকালী সর্দ্দার মোতা সিংএর কৃপাণ কাড়িয়া লওয়ায় জেলে তাঁহার প্রায়োপবেশন। নৈনিতালে এলাহাবাদের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার জর্জ্জ নক্সের পরলোক।

৫ই শ্রাবণ—

কলিকাতায় চার্টার্ড ব্যাঙ্কের ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে ব্যাঙ্কের প্রধান কেশিয়ার, তাঁহার সহকারী ও একজন ব্যবসায়ী দায়রা সোপর্দ্দ। খরচের অনাটনে যুক্ত প্রদেশে পাঁচ হাজার অ-রাজনৈতিক কয়েদীর মুক্তি ; একরূপ বন্দী মুক্তির ইহা চতুর্থ দফা। নিজাম সরকার কর্ত্তৃক চারিটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার অনুমতি ; অর্দ্ধেক শেয়ার কিন্তু নিজামের প্রজাদের থাকা চাই। বিখ্যাত পঞ্জাবী হাঙ্গামায় হতাহত ভারতবাসিগণের ক্ষতিপূরণের জন্য পঞ্জাব সরকার কর্ত্তৃক বাইশ লক্ষ ছয়ষট্টি হাজার টাকা মঞ্জুর। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে মহিলাদের ভোটাধিকার পাইবার প্রস্তাব গৃহীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজীর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম স্বামী তুরীয়ানন্দজীর কাশীধামে মহাসমাধি। পুণা মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর অভিনন্দন। শ্রীহট্ট "ক্রনিকেলের" অভিযোগ, সরকার-নির্দ্দিষ্ট গ্রামগুলি ছাড়া অন্যান্য স্থানেও পিটুনী পুলিস বসিয়াছে। বরিশালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা উষাঙ্গিনী দেবী ও আর ১১ জন মহিলার বিদেশী বস্ত্রের দোকানে

পিকেটিং। সম্মিলিত পক্ষের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দাবী বুলগেরিয়া কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। মস্কোর প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিয়াবাসী ছাত্রের সংখ্যা এখন ৬০০; ছাত্ররা বলশেভিকবাদের মূলতত্ত্ব ও তাহার প্রচার-কার্য্য শিখিতেছে।

৬ই শ্রাবণ—

স্যাণ্ডহার্ষ্টের রয়্যাল মিলিটারী কলেজে চারজন ভারতীয় ছাত্র গ্রহণ। কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ধর্ম্মবীরের ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। যারবেদা জেলে কড়াকড়ি, মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাতের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে আর কাহাকেও মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না; শ্রীযুক্ত মাগনলাল গন্ধী কর্তৃক এই কড়াকড়ি অগ্রাহ্য করিবার জন্য তাঁহার সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত প্রকাশ। করাচী মিউনিসিপ্যালিটিতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। আবগারীর আয় কমিয়া যাওয়ায় ও অন্যান্য কারণে ত্রিবাঙ্কুরে ৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব কম হইবার সম্ভাবনা। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিতে শিশু-মৃত্যুর আধিক্য; যে ক্ষেত্রে জন্ম এক হাজারের, সেখানে (এক বৎসরের অনধিক বয়সের) ৬৬৬টি শিশুর মৃত্যু। ভূ-পর্য্যটক মিঃ মার্টিনেটের চট্টগ্রাম হইতে আকিয়াব যাত্রা। হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল ও ডাঃ আনসারীর কারাগারে মহাত্মার সহিত বন্ধুভাবে (রাজনীতির সম্পর্কে নহে) সাক্ষাতেও আপত্তি।

৭ই শ্রাবণ—

কালিয়াবাড় অঞ্চলের তালুকদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস অম্বাইদাস দেশাই স্থানীয় লাটের মফঃস্বল পরিদর্শনের সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান নাই এবং পরে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ও অসহযোগ আন্দোলন ছাড়িতে অস্বীকৃত হন বলিয়া তাঁহার তালুক কাড়িয়া লওয়ার আদেশ।

৮ই শ্রাবণ—

আমেদাবাদ কংগ্রেসের বহ্ন্যুৎসব (সিন্ধু) হায়দ্রাবাদে আলোকচিত্রে প্রদর্শিত হইত, তাহার প্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। বন্নার জেলের জেলার কর্তৃক মাদারল্যাণ্ড সম্পাদক দেশ-ভূষণ মৌলবী মজহরল হকের নামে আর এক মানহানির নালিশ। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের সর্ব্বপ্রথম কারারুদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুত সি এস রঙ্গ আয়ারের ফৈজাবাদ জেল হইতে মুক্তি। বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিতে গো-হত্যা বন্ধে নূতন সমস্যার উদয়ে কংগ্রেস নেতাদের নিবেদন; সামাজিক সমস্যা হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টায় সমাধান করিতে হইবে, মুসলমানরা স্বেচ্ছায় গো-হত্যা বন্ধ না করিলে হিন্দুদের নীরব থাকাই বর্ত্তমান জাতীয়তার পক্ষে প্রয়োজনীয়। ইজিপ্ট দুর্ঘটনায় ট্রেড-বোর্ডের তদন্তে ভারতীয় লস্কর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের প্রশংসা। বিলাতে "ভ্যানগার্ড অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" নামক সংবাদপত্রের তত্ত্ব; উহা বলশেভিক পত্র, বার্লিন-প্রবাসী শ্রীযুত এম এন রায় রুসিয়া হইতে অর্থসাহায্য আনিয়া উহার পরিচালন করেন; বি আই সিং কর্তৃক উহা সম্পাদিত এবং হাম্বার্গে মুদ্রিত হয়। ফ্রান্স জার্ম্মাণীর নিকট তাহার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের দাবী হ্রাস না করায়, বৃটেন ফ্রান্সের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য সমরঋণের দায় হইতে রেহাই দিতে অসম্মত। প্যালেষ্টাইনের তীর্থস্থান-সমূহ ও তথাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার সম্বন্ধে অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে জাতি-সঙ্ঘের ব্যবস্থায় কমিশন নিয়োগ।

৯ই শ্রাবণ—

উত্তর কানাডায় কাউ-লো নামক গরু ও মহিষের সঙ্করে এক প্রকার জীব-সৃষ্টির চেষ্টা। আয়ারল্যাণ্ডের ঘরোয়া যুদ্ধে নানাস্থানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, টিপারারির যুদ্ধস্থলে নিরুদ্দেশ ডি-ভ্যালেরার আত্মপ্রকাশ। বিলাতের ইম্পিরীয়াল ইনষ্টিটিউটের রিপোর্ট,সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে বৎসরে আশী লক্ষ আউন্স কুইনাইন ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ আউন্স বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। গত আদম-সুমারীতে প্রকাশ, বাঙ্গালী হিন্দু-জাতি ধ্বংসোন্মুখ; দশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ কমিয়াছে বাড়ে নাই! কলিকাতায় আবার পিকেটিং আরম্ভ; এবার নেত্রী স্বনামধন্যা শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার; পিকেটিং আরম্ভ হইবার সংবাদে স্বামী সচ্চিদানন্দের উপবাস ত্যাগ; হেমপ্রভা দেবী, তাঁহার দুই পুত্র, তিনটি গুজরাটী ও তিনটি হিন্দুস্থানী মহিলা এবং বহু কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সহ বড়বাজারে গমন করেন; হেমপ্রভা দেবী ও গুজরাটী মহিলা তিন জন গ্রেপ্তার হইয়া লালবাজার থানায় যান; সেখানে নাম-ধামাদি লিখিয়া লইবার পর তাঁহাদের অব্যাহতি; হিন্দুস্থানী মহিলা তিনটাকেও পুলিশ আটকাইয়াছিল, কিন্তু কিছু পরেই ছাড়িয়া দেয়; ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে হেমপ্রভা দেবীর দুই পুত্র। মাদ্রাজে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটর বিচারে "স্বরাজ গীতি-মালার" গ্রন্থকার শ্রীযুত সত্যনারায়ণের রাজদ্রোহের অভিযোগে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। হুগলী, হরিপাল থানার এলেকায় গজা গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক দল কর্তৃক কয়জন ডাকাত ধৃত; ডাকাতরা দশ বারো হাজার টাকা লুঠ করিয়া লইয়া পলাইতেছিল। অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সার সুরেন্দ্রনাথের মানহানির মোকদ্দমা আরম্ভ। বহুবাজারে মুচিপাড়া থানার এলেকায় আর এক বালিকা বধূ নির্য্যাতনের অভিযোগে শাশুড়ী গ্রেপ্তার; বধূ কুসুমকুমারী হাসপাতালে।

১০ই শ্রাবণ—

বরিশাল জেলে পটুয়াখালীর সেবক রোহিণীকে বেত্রদণ্ড দেওয়ায় রাজনীতিক কয়েদীদের প্রায়োপবেশন। কলিকাতায় পুনরায় পিকেটিং প্রবর্ত্তনে প্রথম দলের আঠোরো জন স্বেচ্ছাসেবকের এক মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড; ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুশীলকুমার আছে; মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স নিতান্ত অল্প থাকায় তাহার অব্যাহতি; সেবকদের হুগলী জেলে প্রেরণ। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পুনরায় ব্যবহারাজীবের কার্য্যে যোগদান, চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যের পদ পরিত্যাগ। বিহার উড়িষ্যার কারা বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেল সার হরমাসজী বানাতওয়ালা কর্তৃক উপস্থাপিত মানহানির অভিযোগে পাটনার অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জনষ্টনের বিচারে দেশভূষণ মৌলানা মজহরল হকের হাজার টাকা জরিমানা, বিকল্পে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড; মৌলানাজীর কারাবরণ; রাঁচী জেলার সিসাই গ্রামে সালিশী বিচারের জরিমানা-দাতার অভিযোগে বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ; লোকগুলি আত্ম-সমর্পণে অসম্মত হইলে জোর করিয়া গ্রেপ্তার চেষ্টায় সশস্ত্র গ্রামবাসীদের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ; পুলিসের লাঠী ও স্থানীয় জমীদারের সাহায্যে শান্তি-স্থাপন। পাবনায় কংগ্রেস আফিস ও চার জন ভদ্রলোকের বাড়ীতে খানাতল্লাস; সলঙ্গা হাটে আহতদের ফটোগ্রাফের নেগেটিভ প্লেট পর্য্যন্ত গৃহীত। চট্টগ্রামে দরবার কক্ষে লর্ড লিটনের বক্তৃতা; পল্লী অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থায় প্রধানতঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকেই উদ্যোগী হইতে হইবে; অসহযোগীরা দেশের শত্রু, গবর্ণর তাহাদের প্রীতি ক্রয় করিতে চাহেন না; ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরাই দেশের প্রতিনিধি; ব্যবস্থাপক সভা, গবর্মেণ্ট ও জেলার শাসকমণ্ডলীর যোগাযোগে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। লক্ষ্ণৌয়ের রয়্যাল ফীল্ড আর্টিলারীর গোলন্দাজ ইটনের প্রতি চৌকীদার হত্যার অপরাধে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। শিমলায় অস্ত্র-আইন কমিটীর সাক্ষ্য-গ্রহণের অবসান; সাধারণতঃ সরকারী সাক্ষীরা বর্ত্তমান ব্যবস্থার এবং বে-সরকারী সাক্ষীরা আরও উদারতার পক্ষপাতী। কোমাগাটা মারুর বিখ্যাত গুরুদিৎ সিং রাজদ্রোহের অভিযোগে পাঁচ বৎসরের নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত। বেহালার রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠাতা অক্লান্তকর্ম্মী বরেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় বোম্বাই মেলে কলিকাতা ফিরিবার পথে সাতনা ষ্টেশনের নিকট ট্রেণ হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত। আসানসোল রেল ষ্টেশনের গুর্খা চৌকীদারদের আক্রমণে লাঠী ও কুকরি আঘাতে তিন জন রেল কর্ম্মচারী আহত।
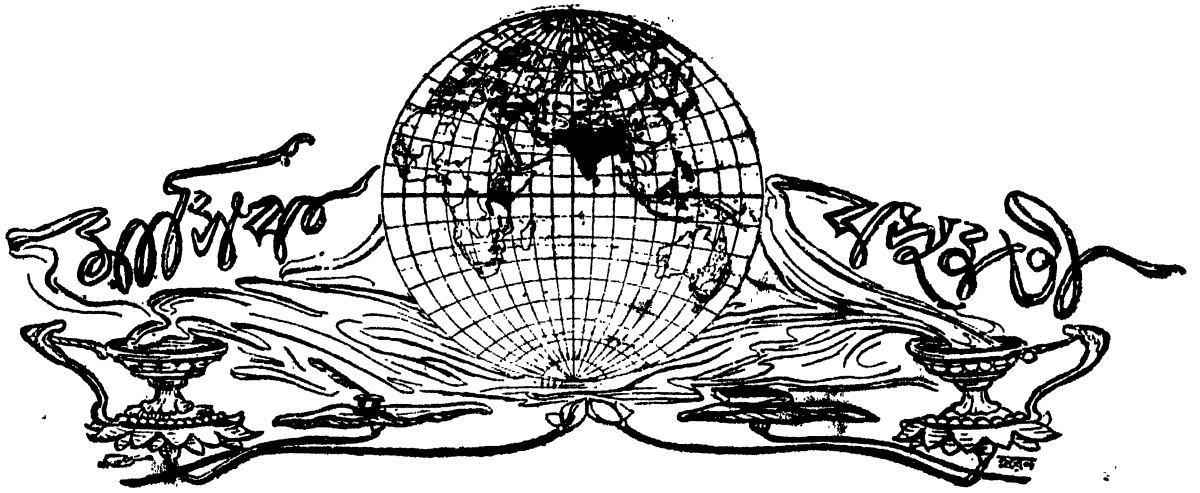
১ম বর্ষ } ভাদ্র, ১৩২৯ { ৫ম সংখ্যা

বাঙ্গালার জনসংখ্যা।

বাঙ্গালার জনসংখ্যা যে অন্যান্য দেশের অনুপাতে আশানুরূপ বৰ্দ্ধিত হইতেছে না, সে কথা বাঙ্গালীরা ইতঃপূর্ব্বে বহুবারই বলিয়াছেন। কিন্তু এই অবস্থার প্রতীকারে এ দেশের সরকারের কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় নাই। ম্যালেরিয়াই যে এ প্রদেশে লোকক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। এমন কি, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার লোকগণনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল—

"বৎসরের পর বৎসর ম্যালেরিয়া নীরবে (লোকক্ষয়) কায করিতেছে। প্লেগে সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু হয়, জ্বরে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জ্বরে যে কেবল অনেক লোক প্রাণত্যাগ করে, তাহাই নহে ; পরন্তু যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের বল ও প্রজননশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। ইহার ফলে লোকের জীবনযাত্রা বিশৃঙ্খল হয় এবং দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন হয় না। ম্যালেরিয়াই বাঙ্গালার দারিদ্র্য প্রভৃতির অন্যতম প্রধান কারণ। ম্যালেরিয়ার জন্যই বাঙ্গালী উদ্যমহীন।"

বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিয়া লর্ড রোণাল্ডসে বঙ্গে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং অনুসন্ধান-ফলে স্তম্ভিত হয়েন। তিনি দেখেন, বাঙ্গালায় বৎসরে সাড়ে ৩ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু মৃত্যুসংখ্যাতেই ইহার কুফল সম্যক্রূপে উপলব্ধ হয় না। হয় ত ১ শত বার জ্বরে ভুগিয়া ১ জনের মৃত্যু হয়। ফলে ২০ কোটি দিন লোক কার্য্যে যোগ দিতে অক্ষম হয়। আর্থিক হিসাবে ইহার ফল শোচনীয়—সন্দেহ নাই। ম্যালেরিয়ার ফলে জন্মের হার কমে ও মৃত্যুর হার বাড়ে—অনেক ম্যালেরিয়াপীড়িত জিলায় লোকসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।

কিন্তু ইহা বুঝিয়াও বাঙ্গালার গভর্ণর এই শোচনীয় অবস্থার প্রতীকারের কোন উপায় করেন নাই। অথচ ম্যালেরিয়া প্রতীকারসাপেক্ষ এবং কোন কোন স্থানে মানুষের চেষ্টায় দেশ ম্যালেরিয়াশূন্য হইয়াছে।

সংপ্রতি যে লোকগণনা হইয়াছে, তাহার ফলে লর্ড রোণাল্ডসের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। ১০ বৎসরে বাঙ্গালার জনসংখ্যা মোট শতকরা ২ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বৰ্দ্ধিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালার ১২টি জিলায় জনসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে।

১০ বৎসরে বাঙ্গালায় হিন্দুর সংখ্যা না বাড়িয়া ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২ শত ৩১ জন কমিয়াছে। মুসলমানের সংখ্যা মোট ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮ শত ৯৭ জন বাড়িয়াছে।

হিন্দুর মধ্যে জনসংখ্যা হ্রাসের ও মুসলমানের মধ্যে বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যে ১২টি জিলায় লোকসংখ্যা কমিয়াছে, সে কয়টি পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে অবস্থিত এবং

বাঙ্গালার এই ভাগেই নদীর অবস্থা শোচনীয় ও ম্যালেরিয়ার আধিক্য।

সহরগুলিতে নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া বাস করে এবং ২৪ পরগণায় ও হাওড়ায় কল-কারখানা ডক প্রভৃতির বাহুল্যে অন্য স্থান হইতে শ্রমজীবীরা আসিয়া থাকে। এই ২টি জিলা বাদ দিলে ত্রিপুরা রাজ্যেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—প্রায় শতকরা ৩২ জন। ত্রিপুরা রাজ্যে বহু পতিত জমীতে নূতন বসতি হইতেছে।

তাহার পর নোয়াখালিতে বৃদ্ধি শতকরা প্রায় ১৩ জন, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য-প্রদেশে শতকরা প্রায় ১২ জন এবং ঢাকা ও বাখরগঞ্জে প্রায় ৮ জন। দার্জ্জিলিং, বগুড়া, খুলনা ও চট্টগ্রাম জিলায় বৃদ্ধির হার প্রায় ৭ জন।

নদীয়ায় ও মুর্শিদাবাদে লোকসংখ্যার হ্রাস, শতকরা প্রায় ৮ জন।

বর্দ্ধমান বিভাগের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। এই বিভাগে ৬টি জিলার মধ্যে হাওড়া বাদ দিলে—বর্দ্ধমানে হ্রাস শতকরা প্রায় ৬ জন, বীরভূমে প্রায় ৯ জন, বাঁকুড়ায় প্রায় ১০ জন, মেদিনীপুরে প্রায় ৫ জন ও হুগলীতে প্রায় ১ জন। অথচ ১০ বৎসর পূর্ব্বে এই ৫টি জিলায় শতকরা প্রায় ২, ১, ৩, ২ ও ৩ জন হিসাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেশ কত দ্রুত অস্বাস্থ্যকর ও জনহীন হইতেছে, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

১৯২১।
বাঙ্গালায় জন্ম-মৃত্যু।
জন্মের আধিক্য।
মৃত্যুর আধিক্য।

মানচিত্র।

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য পার্শ্বে একখানি মানচিত্র প্রদত্ত হইল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অবস্থা এইরূপ। শ্বেতবর্ণ স্থানসমূহে জন্মের আধিক্য ও কৃষ্ণবর্ণ স্থানসমূহে মৃত্যুর আধিক্য।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের সহিত তুলনায় এবার প্রায় ২৬ হাজার বর্গ-মাইল স্থানে জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। বর্দ্ধমানে ১৪ হাজার বর্গ-মাইল স্থানের মধ্যে ১১ হাজার বর্গ-মাইলে জনসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগের অর্দ্ধাংশে ও রাজশাহী বিভাগের এক-তৃতীয়াংশে এইরূপ দুরবস্থা। আর পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩ হাজার বর্গ-মাইল স্থানের মধ্যে কেবল ৩ হাজার বর্গ-মাইলে জনসংখ্যার সামান্য হ্রাস হইয়াছে। কাযেই ঢাকা জিলায় আবাদযোগ্য জমীর শতকরা ৯২ ভাগ চাষ হইয়াছে আর লোকাভাবে বর্দ্ধমানে শতকরা ৫৩ ভাগ জমী "পতিত" রাখিতে হইয়াছে। যে

দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে খাদ্য-শস্যের পরিমাণ অল্প, সে দেশে লোকাভাবে আবাদযোগ্য জমী "পতিত" রাখার ফল যে লোকের অন্নাভাব, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

বর্দ্ধমান জিলায় বীরভূমের উত্তরে ২টি মাত্র থানায় স্বাস্থ্য ভাল। আর কাটোয়া ও পূর্ব্বস্থলী থানাদ্বয়ের অবস্থা ভাল।

মোট কথা, এই মানচিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে সব স্থানে জলের অভাব, সেই সব স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রাদুর্ভাব। পূর্ব্ব-বঙ্গে নদী-নালা এখনও তত হাজিয়া মজিয়া যায় নাই, সেইজন্য পূর্ব্ব-বঙ্গ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর এবং তথায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্যহেতু বাঙ্গালায় মোটের উপর মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। যশোহরে ও মুর্শিদাবাদে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অল্প না হইলেও ম্যালেরিয়ার প্রাবল্যহেতু সেই ২ জিলায় মোটের উপর লোক-সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, যে সব স্থানে নদী-নালা ভাল আছে—জলের অভাব নাই, সে সব স্থানে স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। পূর্ব্ব-বঙ্গের অবস্থা এখনও সেইজন্য মন্দের ভাল। কিন্তু তথায় এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে—সে কচুড়ীপানা।

গত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ড্রেণেজ কমিটীর বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহাতে দেখা যায়, বাঙ্গালায় কোন কোন স্থানে অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৮০ জনেরও অধিক বিবর্দ্ধিত প্লীহায় কাতর। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় কি মানুষের শরীরে শক্তি বা মনে আনন্দ থাকিতে পারে? এই রিপোর্টে ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট ও ডাক্তার প্রক্টার লিখিয়াছিলেন,—"ম্যালেরিয়ায় যে জন্মের সংখ্যা হ্রাস হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ম্যালেরিয়ায় পীড়িত নারীর গর্ভস্রাব হয় ও মৃতবৎসা দোষ জন্মে। আবার যাহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে থাকে, তাহাদের প্রজনন-শক্তির হ্রাস হয়।" এই রিপোর্টে লিখিত হইয়াছিল—জল-নিকাশের ব্যবস্থা যে সহসা হইবে, এমন আশা করা যায় না; কিন্তু কুইনাইনের ব্যবহারে ও রোগীর চিকিৎসায় আশু সুফল লাভ হইতে পারে।

কিন্তু দেশের সরকার এ বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য কায করেন নাই। এমন কি, স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে কুইনাইন সরবরাহ করা হয়, তাহাতে সকল রোগীর চিকিৎসা সম্ভব নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা থানায় থানায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কোন ব্যবস্থা অদ্যাপি হয় নাই। বোধ হয়, সে জন্য আবশ্যক অর্থ নাই। কিন্তু আমরা অবশ্যই বলিব, দেশের লোকরক্ষা সরকারের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। রাজকর্ম্মচারীদিগের শৈল-বিহার, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের প্রথম শ্রেণীতে গতায়াত, মন্ত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি—এ সব বিলাস শ্মশানে একান্তই অশোভন। যতদিন বাঙ্গালীকে ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধারের উপায় না হয়, ততদিন অর্থ ও মনোযোগ সেই কার্য্যে প্রযুক্ত করাই কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে দেশের লোকেরও বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। বিদেশী সরকার এই লোকক্ষয়ের প্রতীকারে আবশ্যক মনোযোগ না দিলেও বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষায় অবহিত হইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘস্থাপন করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় করিতে হইবে—যাহাতে গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য না হয়—যাহাতে গ্রামে পীড়িতের চিকিৎসার উপায় হয়—যাহাতে গ্রামে পানাপুকুরের সংস্কার হয় ও পচা ডোবা ভরাট করিয়া দেওয়া হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এ সব কার্য্যে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়কে অগ্রণী হইয়া দেশের জনসাধারণকে চালিত করিতে হইবে। এই স্বাবলম্বনের ভিত্তির উপর যে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা স্বাস্থ্যে সুন্দর, শক্তিতে অপরাজেয় এবং উন্নতির আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে।

পতিত ডাক্তার।

(নক্সা)

৩

যে কায়স্থ বাসাড়ে লোকটির কথা বলিলাম, তাঁহাকে সকলে বক্সীমশাই বলিয়াই ডাকিত, পুরা নাম বড় কেহ জানিত না; বহুদিন আত্মনাম কানে না শুনিয়া এবং কাহারও প্রশ্নের উত্তরে মুখে না উচ্চারণ করায় বক্সী মহাশয় নিজেই সেটা হঠাৎ স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সকলে জানিত, বক্সী মশাই দালালি করেন। হাতে পাইলে তাহা করিতেন বটে, তবে তিনি চুরি-জুয়াচুরির দিকে না গিয়া যে কোন সদুপায় বা ভদ্রসমাজগ্রাহ্য অসদুপায়েও দু' পয়সা আনিয়া নিজের খরচ চালাইয়া দিতেন। গলির মধ্যে তিনিই ইংরাজীনবিশ, অর্থাৎ ট্যাক্সর বিল, মিউনিসিপ্যাল নোটিশ প্রভৃতি পাঁচ সাতবার নিজে পড়িয়া লইয়া প্রতিবেশী বিধবাগণকে ও তাঁহাদের কারবারী ভাসুরপো দেওরদের বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। ঐ পাড়াটুকুর মধ্যে তিনি এক-জন মুরুব্বি গোছের ছিলেন, সুতরাং কাহারও বাড়ীর দরজায় রাস্তাবন্দি সাহেব আসিয়া দাঁড়াইলে বা কাহারও বাড়ী ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিলে মুরুব্বিরূপে তথায় উপস্থিত হইতেন। পতিত এই বক্সী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া রোগী ও তাহার আত্মীয়গণকে শুনাইয়া নিঃশঙ্কে তাহার অ-পূর্ব্ব-শ্রুত মৌলিক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত, আর বক্সী মহাশয়ও গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া বা "ঠিক ঠিক" বলিয়া নিজের বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন।

নন্দন মহাশয়দিগের বহির্ব্বাটীর উত্তরাংশে যে একটি লম্বা দালান ছিল, তাহার পশ্চিমপার্শ্বস্থ কুঠুরিটি বক্সী মহাশয় নিজের ব্যবহারের জন্য পাইয়াছিলেন। সেই দালানে রকের উপর একখানা পরচালা ছিল, সেই চালার আড়ায় একটা পাটের গোছা ঝুলাইয়া বক্সী মহাশয় রকে বসিয়া ঢেরায় পাক দিয়া দড়ি প্রস্তুত করিতেছিলেন। এটা তাঁহার প্রায় নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে ছিল। তিনি কখন দড়ি বিক্রয় করিতেন না, কিন্তু গাঁটের পয়সা দিয়া পাট কিনিয়া প্রায় প্রত্যহই বৈকালে খানিকটা দড়ি পাকাইয়া মৌতাত বজায় রাখিতেন। কেবল বক্সী মহাশয়ই নহে, তখনকার অনেক সচ্ছল অবস্থার গৃহস্থের ঘরে কর্ত্তাদের দড়ি পাকান, জাল বোনা প্রভৃতি হাতে একটা কায করা অভ্যাস ছিল, ইহাতে তাঁহারা কেহই আপনা-দিগকে হীন বিবেচনা করিতেন না। হাতের কাযকে ক্রমে হীনতর স্তরে নামাইয়া দিয়াছে ফার্ষ্ট বুকের এ বি সি, চাঁদনীর কামিজ আর সেমিজ, অনর্গল ধূমোদ্গারী কল এবং মোড়ে মোড়ে এঁকেবাঁকে দোকানঘর। প্রায় সকল বাড়ীতেই এক আধখানা কণিক থাকিত, ইমারতের ছোটখাট মেরামত দাগ-রাজিটাগরাজি বাড়ীর পুরুষদের মধ্যে কেহ না কেহ নিজেই সারিয়া লইতেন; খুরসি পিঁড়েখানা ছোট চৌকি বাক্সর কব্জা আঁটার কাযটা প্রায় অনেকেই আপন হস্তে করিতে পারিতেন, ঘটী ঘড়া গাড়ু ফুটো হইলে রাংঝালটাও কেহ কেহ দিতে পারিতেন; এখন সেই সব বাড়ীতেই মশারি টাঙ্গাইবার পেরেক পুঁতিবার জন্য ছুতোর ডাকিতে হয়। আরও মজার কথা, সেই বাড়ীর ছেলেই ১৯।২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভিতরে শিল্কের প্যাডিং দেওয়া জুতা পরিয়া ও জন্মে একটা উডপেন্সিল পর্য্যন্ত ছুরি দিয়া নিজ হাতে না কাটিয়া জাপানে গিয়া মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার জন্য বাবাকে বা সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। মেয়েরা শুধু রাঁধিতেন না; ঢেঁকিতে পা দিতেন, কুলোয় চাল ঝাড়িতেন, জাঁতায় ডাল ভাঙ্গিতেন, বড় বঁটি পাতিয়া ১৫ সের ওজনের রুই মাছ দুই হাতে তুলিয়া অনায়াসে তাহার আঁশ ছাড়াইয়া কুটিতেন, বড়ী দিতেন, আবার কাসুন্দী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন, মুড়ি ভাজিতেন, খই ভাজিতেন, নারিকেল কুরিয়া নাড়ু করিতেন, চন্দ্রপুলি করিতেন, চুলের দড়ি বিনাইতেন, শিকা বুনিতেন, বিচিত্র ফুলদার ছবিওয়ালা কাঁথা শেলাই করিতেন, কড়ির আল্না প্রস্তুত করিতেন, বড় বড় পিতলের কলসী কাঁকালে করিয়া নদী বা পুষ্করিণী হইতে জল আনিতেন, আবার ছেলেও কোলে করিতেন, তাহাকে খেলাও দিতেন, গল্প করিতেন, তাস বা দশপঁচিশ খেলিতেন, কেহ বা রামায়ণ

মহাভারত পড়িতেন, কেহ বা শুনিতেন, আবার প্রয়োজন হইলে কোন্দলও করিতেন এবং অম্বল অজীর্ণ বাত হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিকে যেন ঝাঁটার চোটে গাঁ-ছাড়া করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ছিল না—পুরুষদের উপর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল; তাঁহারা বলিতেন দাসী, হইতেন মহিষী। যাক্ সে সব বর্ব্বরতা অসভ্যতার দিন। অসভ্য বর্ব্বর বক্সী মশাই দড়ি পাকাইতেছেন, এমন সময় পণ্ডিত ডাক্তার অন্দর হইতে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থিত একখানি ছোট চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। বক্সী মশাই পণ্ডিত ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন দেখলেন?"

পণ্ডিত। একটু বাঁকা।

বক্সী। সরকার গিন্নীও নাড়ী দেখে তাই বলে গেছেন। সরকার গিন্নীর নাড়ীজ্ঞান অনেক কবরেজের চেয়েও বেশী, আমি দেখেছি, উনি নাড়ী দেখে তিন দিন আগে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করে দেছেন; সন্ধ্যার ঝোঁকে কি আড়াই প'হরের সময় যাবে, তাও বল্‌তে পারেন।

পণ্ডিত। আমার বট্‌ঠাকুর্দ্দা শম্ভু কবরেজ মশাই—নাম শুনেছেন বোধ হয়—রুগীর নাড়ী দেখে রুগী কি কুপথ্যি করেছে, তাও বলে দিতে পার্‌তেন।

বক্সী। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সে সবই চলে গেল, ডাক্তার মশাইরা রুগীর কব্জীটা হাত দে চেপে ধরেন মাত্তর, ও বিদ্যে মোটেই নেই।

পণ্ডিত। তা বল্‌তে পারেন। তবে আমি জাতবদ্দি, নাড়ীজ্ঞানটা আমাদের বংশগত বিদ্যে।

বক্সী। এ জ্বরটাকে আপনারা কি বলেন?

পণ্ডিত। লিভারিশ ফিবারিশ রেমিট্যান্স।

বক্সী। তাই ত—তবেই ত—বড় শক্ত কথা! ঐ মোড়ের বাড়ী সুরেন মেডিকেল কলেজে পড়ছে, সে বল্‌ছিল যে কমা না কি হয়েছে।

পণ্ডিত। হাঁ, পরশু অবধি কমাই ছিল বটে, কাল থেকে একটু একটু সেমিকোলনও দেখা যাচ্ছে।

বক্সী। (সচকিতে) বটে! তবে ত ফুলিষ্টপ পর্য্যন্ত—

পণ্ডিত। তা কি এত দিন বাকি থাক্‌ত—তবে আমার জাঞ্জিবার মিক্‌শ্চারটা সময়ে পড়েছিল আর হাইগ্রেট কলেরা অয়েলটাও বিশেষ উপকার করেছে। আর ভয় নেই; এখন এই লিবারটা—

বক্সী। কর্ত্তার লিবার হবে কেন? লিবার ত মদ খেলেই হয় শুনেছি; উনি সাত্ত্বিক মানুষ, নিত্য গঙ্গাস্নান সন্ধ্যাহ্নিক করেন, কোন রকম নেশার সম্পর্ক রাখেন না, ওঁর লিবার! কলিতে সবই উল্টো। চেষ্টটা কেমন দেখ্‌লেন?

পণ্ডিত। এস্‌টেলেস্‌কোপ বসালে খালি একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যায়, আর কিছুই নয়, তাতেই বোধ হয় হার্টটা—

বক্সী। হাট—হার্ট মানে ত অন্তস্করণ; সেটা কি বুকে থাকে নাকি?

পণ্ডিত। ধাত বুঝে, কর্ত্তার সেটা বুকেই আছে, ক্রমেই বড্ড বড় হয়ে পড়েছে। বক্সী মশাই, যদি মড়া কেটে ডিসেস্‌টেসন ক'ত্তেন, তা'হলে দেখতে পেতেন, মানুষের ভেতর কি সব আশ্চর্য্য ব্যাপার! স্ত্রী পুরুষে কত তফাৎ, আবার এক একটা জাতের এক একটা অর্গান দুটো তিনটে করেই আছে, আবার এক একটা জাতের সে অর্গান মোটেই নেই। অর্গান বোঝেন ত?

বক্সী। বুঝি বই কি, ডাক্তার মশাই, সব জ্ঞানই একটু আধটু বুঝি; পার্‌লুম না কেবল বুঝ্‌তে ব্রহ্মজ্ঞান।

পণ্ডিত। ইংরেজদের অর্গান কখন কখন বাজে, তা জানেন?

বক্সী। না, তা জান্‌তুম না।

পণ্ডিত। বাজে, আমি এনাটমি খুলে দেখাতে পারি। এই হার্ট সবারই কি বুকে থাকে? তা নয়, কারো কারো বা দুটো হার্ট থাকে—যেমন মেয়েদের মধ্যে। হার্ট বড় আশ্চর্য্য জিনিষ, এ আর কত বোঝাব আপনাকে; এই এস্‌টেলেস্‌কোপ দিয়ে দেখেছি, যারা মুক্ষু সুক্ষু মানুষ লেখা পড়া জানে না, তাদের হার্টগুলা একেবারে বুক জোড়া শব্দ হচ্ছে, যেন ঢেঁকি পড়ছে—ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর কি; কিন্তু লেখাপড়া শিখতে শিখতে ব্রেণের ঘি যত গরম হয়ে ওঠে, হার্টও তত ছোট হয়ে আসে। ম্যালেরিয়া হ'লে যেমন স্পীলিং বা পিলে বড় হয়, মুখ্যু হলেও তেমনি হার্ট বড় হয়, ডাক্তার কলসিন্থ বলেন যে, অনেক সাহেবের হার্ট এ দেশের গরম সহ্য কর্‌তে না পেরে বুক থেকে নেমে পেটে পড়ে যায়।

বক্সী। সর্ব্বনাশ, নাড়ীতে চাপ পড়ে না?

পণ্ডিত। বলেন কি, মশাই, কার কথা হচ্ছে, ওরা রাজার জাত, আমাদের মত কি শুকনো চামড়ার পেট, ওদের রবারের পেট, যত টান তত বাড়ে।

বক্সী। ঠিক্ ঠিক্ "তেজীয়সাং ন দোষায়" তেজস্বী পুরুষ ওঁরা, ওঁদের উদোর অন্তস্বরূপ, বক্ষেই যকৃৎ থাক্‌তে পারে, তার আর বিচিত্রতা কি!

পতিত নিজে ডাক্তারী বিদ্যায় বিস্তার-বাহুল্য ব্যাখ্যা করিবার অবসর পাইলে আর সকল কথা ভুলিয়া যায়; বক্সী মহাশয়ের মত শ্রোতাও তাহার সহজে মিলে না; গল্প বেশ জমিয়া গিয়াছে। হুঁকা এ হাত ও হাত ফিরিতেছে, এমন সময় একটি ছেলে ভয়ব্যাকুল মুখে বাড়ীর ভিতর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তারবাবু, শীগ্‌গির আসুন, শীগ্‌গির আসুন; পিসীমা ব'ল্লে, দাদা যেন কেমন কেমন ক'চ্ছে।" পতিত ও বক্সী মশাই তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর যাইলেন, বালকটিও পেছনে পেছনে গেল।

এই বহু প্রাচীন বাটীর দ্বিতলের একটি কক্ষ শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয়ের শয়ন-গৃহ। আটষট্টি বৎসর পূর্ব্বে এই বাটীর নিম্নতলে একটি অর্দ্ধান্ধকার গৃহে শ্রীকান্ত পৃথিবীর আলোক প্রথম দেখিয়াছিলেন। বাসনের কারবারে তাঁহারা বংশানুক্রমে ধনোপার্জ্জন করিতেন, অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল; শিশুর জন্মে বাড়ীতে আনন্দোৎসব পড়িয়াছিল। দলে দলে ঢোল আসিয়া বাজাইয়া গাহিয়া টাকা কাপড় পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইয়াছিল; ধাত্রী তসরের কাপড় ও নগদ আট টাকা পাইয়াছিল, হিজড়া বিদায় পাইয়াছিল। যেঠেরা পূজার দিন পঁচিশটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ তৈজস নগদ মুদ্রা ও বস্ত্র পাইয়াছিলেন। ষষ্ঠীপূজার পর শুভাশৌচের জন্য এক মাস ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ থাকায় বহু ভিখারীকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হইয়াছিল। কত ঘটায় কত আনন্দ-নাড়ু ভাজিয়া কত কুটুম্ব স্বজাতিকে ভোজন করাইয়া খোকার শুভান্নপ্রাশন ও শ্রীকান্ত নামকরণ হইয়াছিল। এই বাটীতে সে বাল্যলীলায় কত খেলা খেলিয়াছে, কত উৎপাত করিয়াছে, কত কোলে উঠিয়াছে, কাঁধে উঠিয়াছে, কত ধমক কত প্রহার খাইয়াছে, কত হাসিয়াছে, কত কাঁদিয়াছে। এই বাটী হইতে সে তাড়ি বগলে করিয়া ঘোষেদের পাঠশালায় যাইত, চৌদ্দ বৎসর বয়সে পাঠশালা ছাড়িয়া সে এই বাটী হইতেই নিজের শ'বাজারের পৈতৃক দোকানে কায শিখিতে যাইতে আরম্ভ করে। পনর বৎসর বয়সে সে একটি সাত বৎসর বয়সের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এই বাটীতেই আনয়ন করে। যৌবনে আজ যে কক্ষে তিনি রোগশয্যায় শায়িত, সেই কক্ষেই অবগুণ্ঠনবতী ষোড়শী সহধর্ম্মিণীর সহিত তিনি সেকেলে ধরণের প্রথম প্রেমালাপ করেন। সে প্রণয়-সম্ভাষণে লজ্জাশঙ্কাজড়িত মধুর ফিস্ ফিস্ পার্শ্বের ঘরে শায়িত বৃদ্ধা ঠানদিদিও শুনিতে পান নাই, সুতরাং সে কথা-বার্ত্তার সংবাদ আমিই বা কি করিয়া জানিব? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নিজের দোকানের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয় এই ঘরে বসিয়াই অর্থার্জ্জনের কত নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন, ঐ ঘরে বসিয়াই দ্বারে খিল দিয়া ঐ দেওয়ালপার্শ্বস্থিত লোহার সিন্দুক খুলিয়া মোহর, টাকা, আধুলি, সিকি গণনা করিয়াছেন। আবার ঐ ঘরে বসিয়া তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক ইষ্টমন্ত্র জপাদি করিয়াছেন। ঐ ঘরে বসিয়াই তিনি বৎসর বৎসর বাড়ীর দুর্গোৎসবের খরচের ফর্দ্দ করিয়াছেন, আবার ঐ ঘরে বসিয়াই কত লোককে জব্দ করিবেন স্থির করিয়াছেন—ঐ লোহার সিন্দুকের উপরিস্থিত কাঠের বাক্স হইতে ছোট আদালতে নালিশ করিবার খরচার টাকা বাহির করিয়াছেন। যে নিম্নতলস্থ গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গৃহেই ক্রমে তাঁহার পুত্র পুত্রী পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। আজ এই সুখ দুঃখ আনন্দ বিষাদ কলহ মিলন ক্রোধ শান্তি লাভ ক্ষতি তর্জ্জন-গর্জ্জন মধুর ভীষণ প্রভৃতির স্মৃতি-বিজড়িত পুরাতন প্রিয়কক্ষে শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয় তাঁহার শেষ শয্যায় শায়িত। এ সুখ না দুঃখ? ভাগ্য না অভাগ্য? বোধ হয়, যখন এ সংসার ছাড়িয়া যাইতেই হইবে, মরণ যখন জীবনের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত, তখন যে দেশে জন্মিয়াছি, সেই দেশে মরাই ভাল; যে গ্রামে বা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে গ্রাম বা পল্লীতে মরাও ভাল; আর যে স্থানে জন্মিয়াছি, তাহা পর্ণকুটীরই হউক আর অট্টালিকাই হউক, জীবন-গ্রন্থের সমস্ত অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া সেই স্থলে মরাই ভাল—মরাও সুখ, মরাও সৌভাগ্য!

কক্ষটির পশ্চিমের দিকে দুইটি বড় বড় কাঠের সিন্দুক। একটা সিন্দুকের উপর একটা টিনের তোরঙ্গ, একটা চামড়া-মোড়া বেতের পেঁটরা, আর একটা সিন্দুকের উপর একটা স্নাতর ও দুটা ছোট কাঠের হাত-বাক্স, একটি তামার ঘটিতে এক ঘটি গঙ্গাজল; সিন্দুক দুটির তলায় যে কতকগুলি পাতরের খোরা থালা ও খান দুই বড় বটি আছে, তাহা বাহির হইতেই বেশ বঝা যায়। উত্তর দিকে দেওয়ালের ধারে একটি

বড় লোহার সিন্দুক, তাহাতে দুইটি বড় বড় জগন্নাথের তালা লাগান ; সিন্দুকের উপর খেরোর ঘেরাটোপ দেওয়া কাঠের বাক্স, সিন্দুকের সম্মুখভাগ সিন্দুর-চন্দন-লিপ্ত। ঘরের কড়ি হইতে একটি কড়িবসান আল্‌না ঝুলান ; তাহাতে ময়লা, আধ-ময়লা, ফর্সা, পাঁচ ছয়খানা কাপড় ঝুলিতেছে। ঘরের দেওয়ালে কাঠের ফ্রেমে কাচ বসাইয়া বাঁধান কালীঘাটের কালীর ছবি, জগদ্ধাত্রীর ছবি, দুর্গার ছবি, নবনারী-কুঞ্জরের ছবি, কালীয়-দমনের ছবি, আর রোগীর যেখানে দৃষ্টি পড়ে, সেখানে একখানি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির ছবি টাঙ্গান আছে। একখানি খুব উচ্চ খট্টায় তাঁহার বিছানা পাতা, তাহার উপর অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয় উত্তানভাবে শায়িত। দক্ষিণ হস্তখানি বক্ষের উপর স্থাপিত ; অঙ্গুলির ভাব দেখিয়া বুঝা যায়, তিনি যেন কর জপিতেছেন। শিয়রে একখানি উঁচু চৌকা চৌকির উপর তিনটা ঔষধের শিশি, একটা ছোট কাচের গেলাস, একখানি কাল পাত্তরের রেকাবিতে কতকটা মিছরি, একটা ভাঙ্গা বেদানা, গোটাকতক পানিফল ছড়ানও রহিয়াছে। সেই সাত বৎসরের কনে আজ ঠাকুরমা—গৃহিণী, চক্‌চকে লালপেড়ে শাড়ী পরিয়া, শুভ্রকেশমধ্যস্থ সিঁথি রগ্‌রগে সিন্দুররাগে ভূষিত করিয়া ধপ্‌ধপে শাঁখা আর টক্‌টকে সোনার খাড়ু পরা দক্ষিণ হস্তখানি পতির পদের উপর স্থাপন করিয়া আর্দ্র নয়ন নত করিয়া আছেন। রোগীর গৃহতল ও সম্মুখস্থ বারান্দা ভরিয়া নন্দন মহাশয়ের ভাই, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, পৌত্রী, দৌহিত্রী, ভ্রাতৃজায়া, পুত্রবধূ, পৌত্রবধূ, দৌহিত্রবধূ এবং অন্যান্য পরিজনগণ উৎসুকমুখে চক্ষু মুছিতেছেন। রোগীর গৃহে এরূপ ভিড়, স্বাস্থ্যতত্ত্বমতে অসভ্যতা, কিন্তু শেষ যাত্রাকালে এই সোনারহাট—ধূমাবৃত দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বিদায় লওয়া বুঝি মর্ত্ত্যেই স্বর্গের প্রথম আভাস!

পতিত ডাক্তারের পিছু পিছু বক্সী মহাশয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন—মেয়েরা ঘোম্‌টা একটু বেশী করিয়া টানিয়া নামাইয়া দিলেন ; খাটের ওধারে পাড়ার সরকার-গিন্নী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শুভ্রবসনপরিহিতা বর্ষীয়সী বিধবা, বামবক্ষের উপর আঁচলের খুঁটে বাঁধা একথোলো চাবী ঝুলিতেছে, মালার কুঁড়োজালিটি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া—দক্ষিণ বক্ষের উপরে স্থাপিত—চাবীর পাশে কুঁড়োজালি—ইহকাল ও পরকাল এক সঙ্গে—সংসারে এই সাধনা। পতিতকে দেখিয়াই সরকারগিন্নী বলিয়া উঠিলেন, "ও পতি, এ কি হ'ল?" ডাক্তার তাড়াতাড়ি নন্দন মহাশয়ের হাতখানি তুলিয়া টিপিয়া ধরিল, হাত নামাইয়া দিয়াই লোহার সিন্দুকের উপর হইতে কাগজ পেন্সিল লইয়া প্রেস্‌ক্রপ্‌সন লিখিতে বসিয়া গেল। সরকার-গিন্নী বলিলেন, "ও পতি, লিখছিস্ কি রে—চোখ পানে চেয়ে দেখ্।" কাগজ রাখিয়া পতিত তাড়াতাড়ি এক হাত নাড়ীর উপর রাখিল, আর এক হাত বালিসের উপর রাখিয়া ঝুঁকিয়া রোগীর চক্ষু দেখিল ; দেখিয়াই "তাই ত, তাই ত" করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সরকার-গিন্নী বলিলেন, "কি দেখ্‌লি রে?" পতিত বলিল, "আবার দেখ্‌বো কি? মা'কে সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও" বলিয়াই জামার বোতাম খুলিতে লাগিল। সরকার-গিন্নী বলিলেন, "কি মনে হয়?"

পতিত।—আর মনে হবে কি? আমার অন্নদাতা—অন্নদাতা—ছেলের মত ভালবাস্‌তেন।

পতিত ততক্ষণ চাদর ফেলিয়া দিয়াছে—জামা খুলিয়া ফেলিয়াছে। "ধর ধর" বলিয়াই সে ঘুরিয়া গিয়া পায়ের দিকের তোষকের এক খোঁট্ ধরিল—অনুজপুত্ররা আসিয়া ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে নামাইল। রোগীকে নীচের দালানে আনিয়া শোয়াইয়াই পতিত বলিল, "মাথার কাছে একটা তুলসীগাছ রাখ, মুখে একটু গঙ্গাজল দাও, আর আমাকে একটা টাকা শীগ্‌গির দাও।" পিসীমা বাক্স হইতে টাকাটা বাহির করিয়া পতিতের হাতে দিবামাত্র পতিত খালি পায় খাট আনিতে ছুটিল ; যত শীঘ্র পতিত খাট আনিয়া ফিরিল—বাড়ীর আর কেহ যাইলে তত শীঘ্র পারিত না। পতিত এখন আর ডাক্তার নয়, সে জাঞ্জিবার মিক্‌শ্চার ভুলিয়াছে—মনুমেটাকা ভুলিয়াছে, তার ষ্টেথস্‌কোপ্ কোথায় গড়াগড়ি যাইতেছে। সে এখন বাড়ীর ছেলে—বুড়োর ছেলে! (ছি ছি এ কি ডাক্তার, একটু ডিগ্‌নিটি নেই!) "হরেকৃষ্ণ! হরেকৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরে! হরে! হরেরাম! হরেরাম! রাম! রাম! হরে! হরে!" বিষাদপূর্ণ গম্ভীরকণ্ঠে পুরুষরা এই রব করিতে করিতে খাট তুলিয়া ধরিলেন—বামাকণ্ঠে করুণ রোল উঠিয়া পল্লী পরিপূরিত করিল। গলির দুধারের বাড়ীর লোকরাই স্ত্রী-পুরুষে চক্ষু মুছিতেছে—শিশুরা হাঁ করিয়া—মা ঠাকুরমা'র মুখপানে চাহিতেছে।

* * * * *

* * * * *

পরদিন প্রাতে বেলা সাতটার সময় সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া নগ্নপদে বাড়ী ফিরিলেন, পতিতও সঙ্গে—দ্বারের বহির্ভাগে স্থাপিত পূর্ণ কলসীকে সকলে প্রণাম করিল—অগ্নি ও লৌহস্পর্শ করিল, একটা খাঁসারির ডাল দাঁতে ঠেকাইয়া ফেলিয়া দিল। বাড়ীর লোক যাহা করিল, বাড়ীর ডাক্তারও তাহা করিল। সেই সময়ে অন্দরে আর একবার ক্রন্দনরোল উঠিল; বহির্বাটীতে বসিয়া সকলে সরবৎ পান করিলেন ও মুখে মিষ্ট দিলেন। তাহার পরে পতিত নিজের জুতা, জামা, ছাতা ও ষ্টেথস্কোপ্ লইয়া নিজ বাটী ও অন্যান্য রোগীর বাটীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

* * * * *

এক মাস পরে অবস্থোচিত সমারোহে শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। বৃষ, ষোড়শ, অধ্যাপক বিদায়, কাঙ্গালী বিদায়, ব্রাহ্মণ-ভোজন, প্রতিবেশী-পরিচিত-স্বজন-ভোজন, জ্ঞাতি-ভোজন সবই হইয়া গেল। শ্রাদ্ধে সকালে পতিত দরজায় দরোয়ানী করিয়াছে, কাঙ্গালী-ভোজনে কোমর বাঁধিয়াছে—শূদ্র-ভোজনের দিন চাঙারী ঘাড়ে করিয়া পরিবেশন করিয়াছে; কয়দিন নিজে পেট ভরিয়া খাইয়াছে, ছেলেদের জন্য মোট বাঁধিয়া খাবার লইয়া গিয়াছে—নিয়মভঙ্গের দিনও একটা মৃগেলমাছ, একখানা দই ও এক চাঙারী সন্দেশ তাহার বাড়ী পঁহুছিয়াছে।

* * * * *

আর সে পতিত ডাক্তার নাই! সে ডাক্তারের জাতিই লোপ পাইয়াছে! এই সত্তর বৎসর বয়সের সময় ভাবিতেছি যে, শেষ দিনের ত' আর বিলম্ব নাই। যখন সে দিন আসিবে, তখন কোথায় মূর্খ ডাক্তার পাইব যে, আমার ঔষধের ব্যবস্থা দিবে? ঔষধ কিনিয়া আনিয়া সাবু, বেদানা কিনিয়া আনিয়া দিবে? গিন্নীকে জোর করিয়া খাইতে পাঠাইয়া দিয়া, নিজে শিয়রে বসিয়া বাতাস করিবে? আর খাটের এক কোণ ধরিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া আসিবে?

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি।

১

বিলাপ কাকলি-হীন, অশ্রু-হীন হোক,—
তবু এ যে বুক-ফাটা জ্বালাময় শোক!
সত্য আর সত্য নাই!
কি কথা শোনালে, ভাই?
আপনার হতে সে যে আপনার লোক!

২

ছিল না সে একা মোর, ছিল বিশ্বজন;—
যখনি ডেকেছি তবু পেয়েছি দর্শন!
আজ এ ব্যাকুল ডাকে
আকুল না করে তাকে!
এ দুঃখ হায় রে প্রাণে বড় অসহন!

৩

কি সুন্দর নম্র-মূর্ত্তি প্রশান্ত আনন!
সত্যে ধ্রুবচিত্ত, প্রীতি-প্রফুল্ল নয়ন!
হাসিমাখা ওষ্ঠাধরে
ধীর স্নিগ্ধবাক্য ঝরে;
লভিলে প্রশংসা তা'র—সার্থক রচন!

৪

আজ ধরিয়াছি গান দুঃখ-মন্দ্র সুরে;
কোথা তুমি? শুনিছ কি দাঁড়াইয়া দূরে?
আমার হৃদয় হায়!
তৃপ্তি নাহি মানে তায়?
দরশ-হরষ লাগি পরাণ যে ঝুরে!

৫

ছেড়ে গেছ সত্য; আজি অমর্ত্ত্যের তুমি!
হাহাকারে ভরে গেছে সারা বঙ্গ-ভূমি!
স্তন্য-সুধা চাপি বুকে
বাণী-মাতা মৌন মুখে—
কাতরে নাড়েন তব ছন্দ-ঝুম্‌ঝুমি!

৬

তব স্মৃতি তব প্রীতি হে কাব্য-প্রেমিক!
অমূর্ত্ত মূর্ত্তিতে আজি ছেয়েছে চৌদিক!
তোমার কবিত্ব-রসে—
ত্রিকালে বেঁধেছে যশে—
মৃত্যুঞ্জয় তুমি ওহে কবি পৌরাণিক!

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

কৈলাস-যাত্রা ।

প্রথম অধ্যায় ।

সঙ্কল্প ।

ভ্রমণস্পৃহা আমার স্বভাবগত। এই স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে কোন কোন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। ভ্রমণ-কাহিনী, বিশেষতঃ বিপদপূর্ণ ভ্রমণ কাহিনী আমার বড় হৃদয়গ্রাহিণী, আর এরূপ ভাবে যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাল্যকাল হইতে আছে। দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে যে সকল সাধু সন্ন্যাসী আগমন করিতেন, তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য অতি বাল্যকাল হইতে তাঁহাদের কাছে যাইতাম। ফলে আমার স্বভাবগত স্পৃহাটা বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত নানা দেশের ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতাম। ন্যানসেনের মেরু-ভ্রমণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। আমি সুইডিস্ পরিব্রাজক স্বেন হিডেনের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলাম। ইনি তিব্বত-ভ্রমণ করিয়া একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পরলোকগত অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাকফারলেন ডাঃ স্বেন হিডেনকে সমাদরের সহিত আহ্বান করিয়া চা-পানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক ডাক্তার কথায় কথায় মানস-সরোবরের অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য, অতুলনীয় তীর্থ-(জল) মহিমা কীর্ত্তন করেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী য়ুরোপীয়ের মুখে তীর্থ-মহিমার কথা শুনিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন। স্বেন হিডেন মানসের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে কহেন, "আমি নানা দেশে নানা প্রকারের পেয় পান করিয়াছি; বৃটিশ সম্রাট্, জার, কৈশর প্রভৃতির সহিত 'শ্যামপেন' প্রভৃতি মদ্য পান করিয়াছি। সে সকল পেয় শারীরিক অবসাদ আনয়ন করিয়া থাকে, সে সকল পেয় আত্মিক মলিনতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু মানসের জল শারীরিক অবসাদ দূর করিয়া চিত্তে প্রসন্নতার সঞ্চার করিয়া থাকে। মানস-সরোবর হিন্দু বৌদ্ধের তীর্থ। যিনি ইহার জল পান বা ইহার দৃশ্য দর্শন না করিয়াছেন তাঁহাকে আমি হিন্দু বা বৌদ্ধ বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকি।" কথাগুলি আমার হৃদয়ের ভিতর গিয়া আঘাত করে।

কৈলাসযাত্রী শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

উদ্যোগ।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে হিমালয় সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশ পাঠ করিলাম। সে সকল প্রদেশে ভ্রমণজন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা ধীরে ধীরে সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। কিন্তু নানাপ্রকার প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে গমনে বিলম্ব হইতে লাগিল।

তিব্বতের যে প্রদেশে আমি যাইব, তাহার অনেক স্থল

চির-তুষারাবৃত প্রদেশ ; সুতরাং সে প্রদেশে অবস্থান জন্য কলিকাতায় গরম কাপড় প্রস্তুত করাইতে লাগিলাম। মোটা ফ্ল্যানেলের পা-জামা, জঙ্ঘাস্পর্শী মোটা গরম ষ্টকিং, পট্টি, পাদুকা, জানু পর্য্যন্ত পৌঁছান কম্বলের জুতা সংগ্রহ করিলাম। দেহের উপর সূতা ও পশম-মিশ্রিত গেঞ্জী, তাহার উপর হাতকাটা তুলা-ভরা গরম কাপড়ের আস্তরণযুক্ত রামজামা, তাহার উপর সোয়েটার, তাহার উপর তুলার ওভারকোট, পট্টুর ওভারকোট। মস্তকের জন্য গরম কাপড়ের চক্ষু-খোলা টুপি (ব্যালাক্লাভা), তাহার উপর

পাগড়ী (অবশ্য সূতার নহে), এইরূপ আবরণ সমূহ সংগ্রহ করিয়া তিব্বতভ্রমণে বহির্গত হই।

তিব্বতে দিবাভাগে অত্যন্ত প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হয় ; অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরকণিকাও ইহার সহিত বাহিত হইয়া থাকে, ইহা হইতে চক্ষু রক্ষা করিবার জন্য চোখ-ঢাকা চশমা সংগ্রহ করিতে হয়। ভবিষ্যতে এই চশমা হইতে আমার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল, আর ইহার কোষ আমার জীবনরক্ষার পক্ষে সাহায্য করিয়াছিল।

উপরিউক্ত দ্রব্য ছাড়া সাধারণ কতকগুলি ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই সকল ঔষধে আমার নিজের ও অন্য লোকের উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যাঁহারা হিমালয়ে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন পেটের অসুখের কিছু ঔষধ সঙ্গে রাখেন।

আমার উদ্যোগপর্ব্ব প্রায় শেষ হইল। আমার গমনের দিনও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

তিব্বতে আমাদের দেশের রৌপ্যমুদ্রা ব্যতীত আর কিছু চলে না। নোট বা গিনীর তাহারা কদর জানে না ; সুতরাং ইহার আদান-প্রদান নাই। সমস্ত টাকা নোটের আকারে ছিল, আলমোড়ায় তাহা বদলাইয়া লইব মনে করিয়া এখানে আর বেশী রৌপ্যমুদ্রা লইলাম না। লইবার মধ্যে ৮টি গিনা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। যদি রাস্তায় সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয় বা চুরী যায়, এই ভয়ে গিনী কয়টি আমার তুলা-ভরা হাতকাটা ছেঁড়া রামজামার ভিতর শিলাই করাইয়া লইলাম। যদি সর্ব্বস্ব হারায়, অন্ততঃ এই ছেঁড়া জামাটা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। ইহার উপর কাহারও লোভদৃষ্টি পড়িবে না, বিবেচনা করিয়া বুকের উপর সোনা গাঁথিয়া রাখিয়াছিলাম।

খাদ্যসামগ্রী বড় কিছু লইলাম না, লইবার মধ্যে কিছু পেস্তা, কিস্‌মিস্ লইয়াছিলাম মাত্র। আর যাহা কিছু, আলমোড়া হইতে সংগ্রহ করিব মনে করিলাম। এ সকল দ্রব্য

ছাড়া ছুরী, কাঁচি, সুচ সুতা, তিব্বতী ভাষার গ্রন্থ, কিছু কাগজ প্রভৃতি লইলাম।

বিছানা সংগ্রহে—বিছানা যত হাল্কা আর শীত দূর করিবার উপযোগী হয়, তাহা করিয়াছিলাম—ফেল্টের দোভাঁজ একখানি কম্বল, একখানি ছোট সতরঞ্চি, পাতিবার একখানি কম্বল—বিছানার চাদর, ক্ষুদ্র বালিস। ঘনলোমপূর্ণ মৃগচর্ম্ম রাস্তায় এক ভক্ত প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা খুব লঘু অথচ বরফের উপর পাতিলেও উষ্ণতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইত। তিব্বতে যতদিন ছিলাম, সমস্ত তৈজসপত্র জামা জোড়া পরিয়া শয়ন করিতাম, তাহাতেও সকল সময় শীত

আলমোড়া।

নিবারণ হইত না। সময় সময় ভুটিয়াদের মোটা কম্বলও ব্যবহার করিতে হইত। যেন জগদ্দল পাথর বুকে রাখিয়া শয়ন করিতাম। এইরূপে বুকের উপর প্রস্তর রক্ষার অভিনয় অনেক সময় করিতে হইত। এইরূপ ভাবে থাকিয়াও গরলা মান্ধাতায় যে শীত ভোগ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিলে এখনও যেন কম্পানুভব হয়। যে প্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে, সে প্রদেশের উত্তম ভূচিত্র, বিশেষ হাঁটাপথের চিত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমার ভ্রমণ হাঁটাপথে হইবে। ম্যাপ পথিপ্রদর্শকরূপে সমস্ত রাস্তা, নগর, গ্রাম, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি এবং দূরত্বের কথাও জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তিব্বতের এবং হিমালয় প্রদেশের ম্যাপের সংগ্রহের জন্য আমি Surveyor Generalএর আফিসে গমন করি।

যাত্রা।

২৭শে মে (১৯২০) আমার জীবনের একটি প্রধান দিন। এই দিনে আমি আমার বহুদিনের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হই। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে যে উদ্বেগ, যে বিপদ, যে ক্লেশভোগ করিতে না হয়, আমার এ তিব্বত ভ্রমণে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বিপদ, কষ্ট ও উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই দিন হইতে তাহার সূত্রপাত হয় বলিয়া ইহাকে আমি জীবনের প্রধান দিন বলিয়া পরিগণিত করিয়াছি।

গৃহ হইতে বিদায় লইয়া আমি প্রায় ১১টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এবং এক্সপ্রেসে যাত্রা করিলাম।

এই যাত্রাতে আমার এক জন সঙ্গী জুটিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ যুবকটি আমার এক গোত্রের, ধর্ম্মপরায়ণ, চিত্রাঙ্কনপটু। ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব ধূমকেতুর মতন বিস্ময়াবহ। কৈলাস মানস-সরোবরে আমার গমন-কথা শুনিয়া, যুবক যাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। মনে করিলাম, যদি সঙ্গী পাওয়া যায় মন্দ কি? এই যাত্রাটুকুমাত্র আমরা একত্র

ছিলাম, তাহার পর তাহার আর কোন খোঁজ-খবর পাই নাই। প্লাটফরমে আসিয়া যুবকের দেখা পাইলাম না! মনে করিলাম, আবেগে বলিয়াছে, আবেগের অভাবের সহিত আসিবার কথাও বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে। আমিও তাহার কথা ভুলিয়া গেলাম। গাড়ীতে বসিয়া আছি, এরূপ সময় দেখি, যুবক আমাকে খুঁজিতেছে, আমিও সমাদরের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে গাড়ী মোগলসরাই উপস্থিত হইল। যুবক-বন্ধু এলাহাবাদে কিছুকাল থাকিয়া আমার সহিত সাজাহানপুরে মিলিত হইবে, এইরূপ স্থির হইল। আমি স্নানা-হার করিয়া ১০টার মেলে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। অপরাহ্ণে গাড়ী সাজাহানপুরে উপস্থিত হইল। এখানে শ্রীমান্ ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় আমার এক জেঠতুতো ভাই কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করেন, তাঁহার বাসায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া রাত্রিযাপন করি।

যে গাড়ীতে আমি আসিয়াছিলাম, সেই গাড়ীতে কাঁঠগুদাম যাইবার জন্য আবার প্রস্তুত হইলাম। যুবক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া পরদিবস সকালে কাঠগুদাম ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

ডাক বাঙ্গলা।

কাঠগুদাম আলমোড়া, নাইনিতাল প্রভৃতি স্থানে যাইবার শেষ রেল-ষ্টেশন। গ্রীষ্মের জন্য ষ্টেশন শ্বেতাঙ্গ রেল-যাত্রীতে পরিপূর্ণ, টাঙ্গা, মোটর প্রভৃতির সংখ্যাও কম নহে।

ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হওয়া গেল। স্থানটি আমাদের ন্যায় যাত্রীর পক্ষে মন্দ নহে। দেখিলাম, কয়েক জন পাহাড়ী পান্থ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরাও একটি ঘর দখল করিলাম। স্থানটি মন্দ নহে বটে, কিন্তু এক দোষে ইহার সকল গুণ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখানে উনকি পোকার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এত অধিক পোকা যে, নিশ্বাস গ্রহণ করিতে গেলে নাসিকায়, কথা কহিতে গেলে মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। এ উৎপাতে কোনরূপে নাসিকায় ও মুখে কাপড় বাঁধিয়া নিষ্কৃতি-লাভ করা গেল।

ভোজনাদি সাঙ্গ করিয়া পাহাড়ীদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া গন্তব্যপথের বিষয় অবগত হইতে লাগিলাম। এ আলাপে সুফল ফলিল, আলমোড়াতে থাকিবার স্থানের সন্ধান পাইলাম। আলমোড়া এ অঞ্চলের সহর। সহর যায়গায় থাকিবার স্থানের অসুবিধা হইয়া থাকে। সে ভাবনা হইতে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলাম।

আলমোড়ায় যাইবার জন্য ভাড়াটে ঘোড়ার অনুসন্ধান করিয়া তাহারও বন্দোবস্ত করা গেল। প্রাতঃকালে অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিব, এইরূপ কহিয়া, অশ্বস্বামীকে কিছু অগ্রিম প্রদান করিয়া বিদায় দেওয়া গেল।

মধ্যাহ্নকালে দেখিলাম, আমার দক্ষিণ-পদের অঙ্গুষ্ঠ বেদনা-যুক্ত হইয়া বেশ একটু ফুলিয়াছে, চলিতে কষ্ট-বোধ হইতেছে। ফুলা ও বেদনা দেখিয়া ভাবিলাম, জানি না, ভগবান্ এই ঘটনার দ্বারা কি সঙ্কেত করিতেছেন। সম্মুখে দুর্গম পর্ব্বত-মালা—যাঁহার বলে এই দুরারোহ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে হইবে, তিনিই রুগ্ন হইয়াছেন! নিকটে নিসিন্দা-গাছ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে দেখিলাম। ইহার পাতা লইয়া অঙ্গুষ্ঠের চতুর্দ্দিকে বন্ধন করিলাম। রাত্রিতেও এইরূপ বন্ধন করিয়া নিদ্রিত হইলাম। প্রাতঃকালে দেখি, ফুলা ও বেদনা অনেকটা কম। ঘোটকে আরোহণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে আলমোড়া অভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এখন রাস্তা লোক-পরিপূর্ণ। কেহ নাইনিতাল, কেহ ভাওয়াল গমন করিতেছে। রাস্তা প্রশস্ত ও গাড়ীর গমনের উপযোগী হওয়াতে বহু-সংখ্যক টাঙ্গা, গো-যান দিক্ সকল মুখরিত করিয়া গমন করিতেছে। চড়াই বেশী ক্লেশকর না হওয়ায়

নর্তকী।
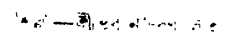
অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে আনন্দের সহিত সকলে গমন করিতেছে। প্রায় ১০টার সময় আমরা ভীমতালের তটে উপনীত হই। স্থানটি বেশ রমণীয়। অনেক য়ুরোপীয় এ স্থানে হ্রদের ধারে বাস করিয়া থাকেন। আমরা একখানি দোকানের দ্বিতল গৃহ থাকিবার জন্য নির্ব্বাচন করিলাম। ভোজনের অসুবিধা হইল না। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। পথে এক জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হয়। ভীমতালের দোকানে একত্র অবস্থান ও ভোজন করা হয়, এজন্য পরিচয়টা একটু ঘনীভূত হইয়াছিল। তিনি বিদায়কালে মঙ্গলকামনা করিয়া, যে দেশে গমন করিতেছি, সে দেশের বাণিজ্য ও রাস্তাঘাটের বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিয়া জানাইলে বড়ই উপকৃত হইবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ ভীমতালের তীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই নির্জ্জন প্রদেশেও পৃথিবীব্যাপী ঘোর-যুদ্ধের সাড়া বেশ অনুভব করা গেল। ভীমতালের কাছে বহুসংখ্যক তাম্বু—সৈন্যদের কৃত্রিম যুদ্ধ-স্থল—স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ পরিখা (Trench) প্রভৃতি পথিকের নয়নগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে নাইনিতালের রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন রাস্তা দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। কুলী সংগ্রহ করিবার জন্য যেরূপ আড়কাটি প্রেরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সিপাহী-সংগ্রহের জন্য হিমালয়ের অভ্যন্তর-প্রদেশে লোক সকল প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা যুদ্ধ-যজ্ঞে বলি আহরণ করিয়া আগমন করিতেছিল। কোন কোন দলে ৪।৫, ৭।৮, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনেকে মনে করিল, আমরাও বুঝি সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য গমন করিতেছি। উভয় পক্ষের মিলন ও সম্ভাষণ পথের নির্জ্জনতা ও নিঃশব্দতা দূর করিয়াছিল। স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্য থাকায় মধ্যাহ্নেও সূর্য্য-কিরণ তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ এক বনভূমির মধ্যে পাহাড়ের বাঁক ঘুরিয়া অকস্মাৎ এক জন য়ুরোপীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পরিচয়ে অবগত হইলাম, তিনি যুক্তপ্রদেশের সুপরিচিত মিষ্টার নেস্‌ফিল্ডের পুত্র ডাঃ নেস্‌ফিল্ড। ইনি মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে ছুটীতে আসিয়াছেন। ঘরে অলসভাবে ছুটী কাটাইতে পারেন না, তাই তিনি সস্ত্রীক হিমালয়-পরিভ্রমণ করিতেছেন। তিনি বদরীনারায়ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি নিরামিষভোজী। তিনি কুকুরের গলায় কাষ্ঠের মালা পরাইয়া নিজের বৈষ্ণবতা প্রকটিত করিয়াছেন! ডাক্তারের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী দীর্ঘ যষ্টি-হস্তে আগমন করেন। প্রাথমিক আলাপে ডাক্তার আমার যাত্রার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। কৈলাস তীর্থ-যাত্রার কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন। সেখানে এত কষ্ট করিয়া যাইবার দরকার কি?" উত্তরে আমি বলিলাম, "আপনার কথা যে খুব সত্য, এ কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনি বলুন, আপনার শরীরের সর্ব্বত্র কি চৈতন্য নাই? সর্ব্বত্র আছে;—পায়ে আছে, হাতে আছে, শরীরের সর্ব্বত্র আছে। পায়ের উপর যদি লাঠির আঘাত পড়ে, পা তাহা সহ্য করিয়া থাকে; কিন্তু চক্ষুতে যদি পদ্মের রেণু পতিত হয়, সেই রেণুও চক্ষু সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। ইহার কারণ কি? পায়ে কি চৈতন্য নাই? আছে। কিন্তু চক্ষুতে চৈতন্য বিশিষ্টরূপে অভিব্যক্ত। ভগবান্ আমার সর্ব্বত্র আছেন, লীলাময় কৈলাসে ব্যক্ত হইয়া লীলা করিয়া থাকেন। সে স্থানের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আপনারা পুলকিত হইয়া বিমোহিত হন; আমরা শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া কোটি কোটি প্রণাম করিতে থাকি।"

ডাক্তার আমার কথা কিরূপভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার পত্নী আমার করমর্দ্দন করিয়া, আমার শুভ-কামনা করিয়া বিদায় প্রদান করেন।

নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অপরাহ্নকালে আমরা রামগড়ে উপস্থিত হইলাম। এ সকল প্রদেশ কুলীদের সুপরিচিত; তাহারা একটি দ্বিতল গৃহে বোঝা লইয়া উপস্থিত হইল।

রামগড় এক সময় বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে হীন অবস্থায় পতিত হইলেও তাহার প্রাচীন সৌভাগ্যের চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এ প্রদেশে পুরাকালে প্রচুর পরিমাণে লৌহ উৎপন্ন হইত। তাহার নিদর্শন বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহের সহিত জাতির উন্নতির ও অবনতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যে জাতি যে পরিমাণে উন্নত, তাহার লৌহ-বাণিজ্যও সেই পরিমাণে বিস্তৃত। ভারতে যখন লৌহের জোর

ছিল, তখন ভারত উন্নত স্থানে সমাসীন ছিল। সে সময় ভারত জগতে অতুলনীয় বলিয়া ঘোষিত হইত। সেকালে দক্ষিণ ও উত্তর উভয় ভারতে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হইত। ইহার সহিত লৌহকারের সম্মানও সমাজে প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে সকল হিন্দু যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও লৌহকারকে সম্মান দিতে ভুলিয়া যায়েন নাই। রাজ-দরবারে তাঁহারা বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। ভারতের দুর্দ্দশার সহিত কর্ম্মকারদের অধঃপতনও শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে যে সকল স্থানে লৌহ প্রস্তুত হইত, তাহার কতিপয় স্থান পরিদর্শন করিলাম। এক সময় এ প্রদেশ নানাপ্রকার সুস্বাদু ফলের বাগানে পরিপূর্ণ ছিল। উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাবে ইহাও দুরবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এ সকল প্রদেশের জল-বায়ু ভাল; দুর্ব্বল বাঙ্গালী যদি কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া এই প্রদেশে জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার করে, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ও অর্থ উভয়ই লাভে সমর্থ হইবে।

প্রাতঃকালে আবার গমনে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। ছোট ছোট অনেক পার্ব্বত্য নদী অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। নানা বনস্পতি-পরিপূর্ণ হওয়াতে এ প্রদেশ অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে। চীড়ের বায়ুতে এ প্রদেশ বড়ই স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়াছে, ইহা ফুস্‌ফুসের পক্ষে বলকর। পর্ব্বতে উঠিতে ফুস্‌ফুসের বলের অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রদেশ নানা প্রকার বন্য পশু-পক্ষীতে পরিপূর্ণ, শীকারীর পক্ষে এ প্রদেশ বড়ই অনুকূল। পর্ব্বতের পাদদেশে তরাইএর জঙ্গলে হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

আলমোড়ার গমনপথে সর্ব্বোচ্চ স্থান গাগরের শিখর-দেশ প্রায় ৮ হাজার ফুট উচ্চ হইবে। আকাশমণ্ডল পরিষ্কার থাকিলে এই স্থান হইতে হিমালয়ের তুষারদৃশ্য বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আরোহণ যেরূপ কষ্টকর, অবরোহণ সেইরূপ সহজসাধ্য। বৃক্ষলতার ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া গন্তব্য পথ অতিক্রম করিয়াছে, পথের ধারে ঝরণা কুল কুল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নানা প্রকার পক্ষী মধুর শব্দ করিয়া দিক্‌ সকল ধ্বনিত করিতেছে। এই সকল নয়নরঞ্জন দৃশ্য ও শ্রুতিসুখকর শব্দ উপভোগ করিতে করিতে আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী হইলাম। আলমোড়ার ১০ মাইল দূরে পিউড়িতে মধ্যাহ্নক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলাম, সুতরাং ভোজনের অভাবে ক্লেশভোগ করিতে হয় নাই। আলমোড়ার এক মাইল দূরে খৃষ্টান মিশনারীদের আশ্রম দেখিলাম। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের সহিত শারীরিক রোগ দূর করিবার জন্য এ স্থানে আরোগ্য-নিকেতন স্থাপন করিয়াছেন। কুষ্ঠাদি ঘৃণিত রোগের চিকিৎসা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই সকল দেখিতে দেখিতে আলমোড়ায় উপস্থিত হওয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

নির্দ্দয়।

নিঠুর হইয়া কি গো, ফেলে গেলে ভাল হয়?
সে যে নিশিদিন তব আশাপথ চেয়ে রয়!
হেরিলে তোমার মুখ, উথলিয়া উঠে বুক,
তোমারি চরণে লুটে তৃষাকুল সে হৃদয়!

যা'বে যদি যাও ভুলে, একা ফেলে এ অকূলে,
সে ডুবিবে দুখনীরে জেনো মনে নিরদয়!
যা'বে যদি, যাও তুমি, দলিয়া হৃদয়-ভূমি,
মরণে বলিও, যেন যতনে তুলিয়া লয়।

শ্রীস্নেহশীলা চৌধুরী।

মত-পরিবর্ত্তন।

১
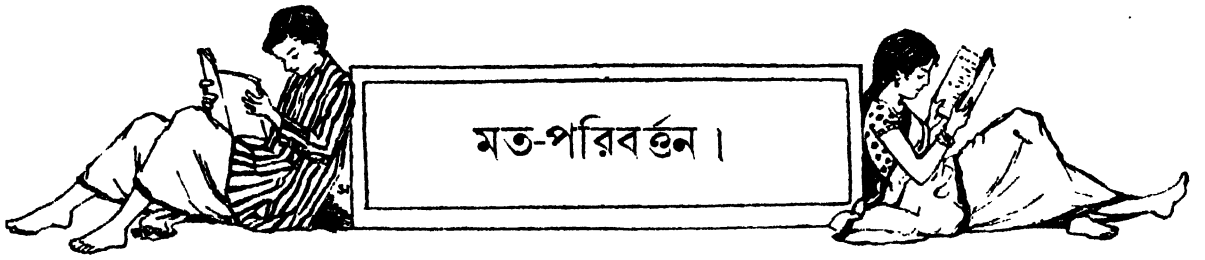
বর্ষার আকাশ যেমন মেঘ সঞ্চিত করিতে করিতে শেষে আর বর্ষণ নিবারণ করিতে পারে না, নিস্তারিণী ও তরুলতা দুই যা'র মনোমালিন্য তেমনই বর্দ্ধিত হইতে হইতে শেষে আর আত্মগোপন করিতে পারে নাই। আর এই মনোমালিন্য বর্ষার মেঘেরই মত বাড়িয়া বাড়িয়া সমস্ত সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা যোগীন ও পুলিন দুই ভাইকে স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—দুই ভাইয়ের ছেলেদের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নিস্তারিণীর ছোট ছেলে মেয়ে ছোটবৌ তরুলতার ঘরের চৌকাট পার হইলে কঠোর দণ্ড ভোগ করিত, তরুলতার ছেলেরা জ্যেঠাইমা'র ঘরে যাইত না। তরুলতার যে ইহাতে বড় দুঃখ ছিল, তাহা নহে; কেবল ভাশুরের বড় ছেলে যতীনও যে তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিত না, তাহাতেই সে একটু কষ্ট অনুভব করিত। কেন না, সে শ্বশুরবাড়ী আসিবার পরই ভাশুরের এই ছেলেটি হয় এবং বাপের বাড়ী ভাই-ভগিনীদের ছাড়িয়া আসিয়া, সে ইহাকেই কোলে তুলিয়া লইয়াছিল এবং ইহাকে সে-ই "আট আনা রকম"—"মানুষ" করিয়াছিল।

দুই ভাইয়ে বয়সের প্রভেদ দশ বৎসর। পিতা ধনেশ্বর ভগিনীপতির কৃপায় কোন য়ুরোপীয় সওদাগরের হৌসে চাকরী করিতেন। তিনি বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক ছিলেন এবং যোগীন বার বার দুইবার এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না দেখিয়া, তাহার প্রতিভার দৌড় বুঝিয়া তাহাকে সে বিড়ম্বনা হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন—সরস্বতীর মন্দির হইতে আনিয়া তাহাকে লক্ষ্মীর পান্থশালায় একটা ছোট কাযে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সে কাযটা যে কত বিচক্ষণতার পরিচায়ক,তাহা অল্পদিন পরেই বুঝিতে পারা যায়—তিনি অকালে দেহ রক্ষা করিলে যোগীনই "ধনেশ্বরস সন" বলিয়া "বড় সাহেবের" কৃপায় বড় পদ পাইয়া সংসার প্রতিপালন করিতে পারে। পুলিনকে সে-ই লিখা-পড়া শিখাইয়াছে এবং দুই ভাইয়ে বয়সের যে ব্যবধান পুলিনের বাক্যে বা ব্যবহারে কোন দিন সে ব্যবধান অতিক্রম করিবার কোন চেষ্টা বা দুরভিসন্ধি প্রকাশ পায় নাই। কাযেই ভাইয়ের উপর যোগীনের রাগ করিবার কোন কারণ ছিল না।

পুলিন ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এখন সেই ব্যবসা করিতেছে এবং কয় বৎসরের মধ্যে দু'পয়সা আনিতেছে। উপার্জ্জনের অর্থ সে দাদাকেই দিতে গিয়াছিল—যোগীন তাহাকেই রাখিতে বলিয়াছেন। সংসারের ভার পূর্ব্ববৎ যোগীনের।

দুই যা'র প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নিস্তারিণী ক্ষমতাপ্রিয়—অতিরঞ্জন ভালবাসে—আপনার প্রকৃত গুণ বা কল্পিত গুণ বড় করিয়া জাহির করে—তোষামোদ চাহে। তাহার "গৃহিণী" হইবার সখটা খুবই প্রবল; মা সংসারের প্রায় সব ভার তাহার হাতে ছাড়িয়া দিলেও সে মনে করে, শাশুড়ীই তাহার ন্যায্য অধিকার জুড়িয়া বসিয়া আছেন। সে আশা করে, তরুলতা যখন তাহার দশ বৎসরের ছোট—প্রায় "পেটের মেয়ের বয়সী", আর তাহার স্বামীই যখন খাটিয়া সংসার চালান, তখন তরুলতার পক্ষে তাহাকে একটু ভয় করিয়া—একটু তোষামোদ করিয়া চলাই স্বাভাবিক।

তাহার এই আশাতেই তরুলতা তাহাকে অত্যন্ত হতাশ করিয়াছে। দশ বছরের বড় যা'কে যতটুকু সম্মান দেখান কর্ত্তব্য, সে তাহাকে তদপেক্ষা এতটুকু অধিক কিছু দিতে প্রস্তুত ছিল না। বিশেষ সে নিস্তারিণীর অতিরঞ্জনপ্রিয়তার জন্য তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিত না। নিস্তারিণী যে মনে করিত—তাহার স্বামী যে সংসারের সব ভার লইয়াছেন, সে দয়া করিয়া, তরুলতা সে বিষয়ে তাহার মতের সমর্থন করিতে পারিত না। সে মনে করিত, মা'র ও ভাইয়ের ভার লইয়া যোগীন কর্ত্তব্যের "অতিরিক্ত কিছুই করে নাই; সুতরাং ভাশুরের প্রাপ্য সম্মানের অতিরিক্ত—উপরি পাওনা হিসাবে তাহার আর কোন পাওনা থাকিতে পারে না।

তরুলতা স্বল্পভাষিণী এবং আপনার আত্ম-সম্মানে ও আপনার স্বামীর সম্মানে সে বড় সতর্ক। কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে সে কোনরূপ ত্রুটি করিত না।

উভয়ের প্রকৃতিতে এই প্রভেদই উভয়ের মনোমালিন্যের মূল কারণ। নিস্তারিণী যাহা তরুলতার ত্রুটি বলিয়া মনে করিত বা কল্পনা করিত, তাহা যতই অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করিত, তরুলতা ততই আপনার কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্যে দৃঢ় হইয়া বসিত—যে আমাকে চাহে না, আমিই বা কেন তাহাকে চাহিব?—বলিয়া সে ঠিক কর্ত্তব্যটুকু পালন করিয়া যাইত এবং তাহার ব্যবহার নিস্তারিণীর কাছে ও তাহার ছেলে যতীনের কাছেও "আলুণী ভাতের" মত স্বাদহীন বোধ হইত। প্রতিদিন শুনিয়া শুনিয়া—একতরফা শুনিয়া—যোগীনও স্ত্রীর কথাই বিশ্বাস করিতেন। এ সব ব্যাপারে স্বামীকে বাধ্য হইয়া স্ত্রীর চক্ষুতেই দেখিতে হয়। তবে চক্ষু না থাকিলেও যত দিন লজ্জা থাকে, তত দিন একরূপ চলে; কিন্তু চক্ষু ও লজ্জা দুই-ই যখন যায়, তখনই সংসার ভাঙ্গে। বিশেষ যে সংসারে মনের মিল নাই, সে সংসার বড় অসুখের। তাই সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল মনে করিয়া যোগীন শেষে এক দিন স্ত্রীর কথায় উত্তর দিলেন, "সে-ই ভাল; আমার কায আমি করেছি; পুলিন ত রোজগারও করছে এইবার যে যা'র পথ দেখুক।"

নিস্তারিণী একগাল হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, বাড়ীর দক্ষিণের ভাগটা কিন্তু আমরা নেব। হাওয়া নইলে আমি থাকতে পারি নে।"

যোগীন বলিলেন, "সে সালিশ যেমন বলবে, তেমনই হ'বে; তোমার দেহ দেখেই ত আর সালিশ বিচার করবে না!"

"মরণ আর কি! আমি যেন আমার জন্যেই মরছি। তুমি ত আমাকে মোটাই দেখ; কিন্তু পদীপিশী সে দিনও ত ব'লে গেল, 'বড় বৌ, তোর শরীরে পদাত্ত নেই—খানিকটে জল বই ত আর কিছু নয়'। আমিও তাই দেখ্‌চি—সিঁড়ি উঠতে হাঁপ ধরে।"

"তাই না কি? কাল কি একবার ডাক্তারবাবুকে—তোমার জ্যাঠাবাবুকে খবর দেব?"

"আর কায নেই। বলে, মরলে কাটী দিয়ে উল্টে দেখ না; তা আবার ডাক্তার ডাকা।"

২

যোগীন স্থির করিলেন, পৃথক হইবেন এবং স্ত্রীকেও তাহাই বলিলেন বটে, কিন্তু তবুও পুলিনকে সে কথাটা বলিতে একটু বাধবাধ ঠেকিতে লাগিল। যে ভাইয়ের ব্যবহারে কোন দিন কোন ত্রুটি পাওয়া যায় নাই, তাহাকে কিসের ছল ধরিয়া সে কথা বলা যায়? সত্য বটে, ছলের অভাব হয় না—কিন্তু ছল সব সময় যে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাহাও নহে। ওদিকে নিস্তারিণী কেবলই "শুভস্য শীঘ্রং" হিসাবে বলিতে লাগিলেন—আর বিলম্ব করা কেন?

এমন অবস্থায় শেষে যাঁহাকে সবই সহ্য করিতে হয়, সেই মা'কেই শুনিতে হইল—যোগীন ভাইকে পৃথক করিতে চাহেন এবং তাঁহাকেই সে কথা পুলিনকে জানাইতে হইবে। যাহাকে ফেলিয়া দিব, পাছে তাহার অধিক ব্যথা লাগে, সেই ভয়ে পতনের স্থানে গদীপাতার মত যোগীন সেই অপ্রিয় কথাটা মা'কে দিয়াই বলাইতে চাহিলেন।

মা কিছু দিন হইতেই সংসারে অশান্তি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু কোনরূপ প্রতীকার করিতে পারেন নাই। যিনি সব অনিষ্টের মূল, তাঁহাকে দোষী বলিতে গেলেই তিনি কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ বাধাইবেন, কাযেই মা চুপ করিয়া ছিলেন। শেষাশেষি তাঁহারও মনে হইত, এত অশান্তির অপেক্ষা "যা'র যা'র তা'র তা'র" হওয়াই ভাল। কিন্তু সে কথাটা মনে করিতেও তাঁহার কষ্ট হইত।

এখন যোগীনের কথায় তিনি বলিলেন, "তা' আমি পুলিনকে বলব। কিন্তু এইবার আমার একটা উপায় কর।"

যোগীন বলিলেন, "কেন? তুমি আমার কাছে থাকবে—যখন ইচ্ছা পুলিনের কাছে যাবে।"

"না, বাবা, সে আর হ'বে না; আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দে।"

যোগীন এক কথায় তাহাতে সম্মত হয়েন নাই শুনিয়া নিস্তারিণী তাঁহার বুদ্ধিতে অনেক দোষারোপ করিলেন—"এ কি বুদ্ধি! ওঁর টান ছোট ছেলের দিকে; উনি দিন-রাত খচখচি করবেন। আর এই বয়েস—এখন তীর্থে থাকেন, সেই ত ভাল।"

কাযেই পরদিন যোগীন মা'কে বলিলেন, "মা, ভেবে

দেখলাম, তুমি যদি বৃন্দাবনে গিয়ে ভাল থাক, তবে আমাদের মায়ায় তোমাকে জড়িয়ে রাখা আমার কর্ত্তব্য নয়।"

কে যে "ভাবিয়া দেখিয়াছে"—তাহা বুঝিতে মা'র এতটুকুও বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন, "সেই ভাল, বাবা। আগে আমাকে পাঠিয়ে দে; তা'র পর বাড়ী ভাগ করিস্।"

কথাটা বলিতে কিন্তু মা'র বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই বাড়ীখানা করিতে কর্ত্তাকে কত ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে, তাঁহাকে কত চেষ্টা করিয়া সংসারের খরচ কুলাইতে হইয়াছে—সে সব কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। আপনার গত জীবনের কত কথা—নব-বধূর আশা ও আকাঙ্ক্ষা—কিশোরীর প্রেম—যুবতীর অপত্য-স্নেহ—তাহার পর কয়দিনের পীড়ায় কর্ত্তার তিরোভাব—সব স্মৃতি আজ এক সঙ্গে তাঁহার মনে আসিয়া, যেন বর্ষার বারিপ্রবাহের মত চঞ্চলবেগে বহিতেছিল।

মা'কে কবে বৃন্দাবনে পাঠান হইবে, তাহাও স্থির হইয়া গেল—মা'র মাসহারার ব্যবস্থাও স্থির হইয়া গেল। কেবল সে কথা পুলিনকে বলা হইলে সে বলিল, "মা, তোমার মাসহারা! সে আমি দিতে পারব না। তোমার যা' দরকার হ'বে, আমাকে বল্লেই আমি পৌঁছে দেব; আর আমাকে কথা দিয়ে যেতে হ'বে—আমার যখন ইচ্ছে তোমার কাছে যা'ব, তুমি তা'তে রাগ কর্তে পারবে না—আমাকে নিজের হাতে মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেবে।"

ছেলের কথা শুনিয়া মা'র চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বলিলেন, "বোকা ছেলে, শ্রীবৃন্দাবনে কি মাছ খেতে আছে?"

পুলিন বলিল, "সে ত আরও ভাল—তবে আমি তোমার পাতে খা'ব।"

৩

মা'র যাইবার দিন নিকট হইয়া আসিল। মেয়েরা দেখা করিতে আসিয়া চক্ষুর জল ফেলিলেন—মা গেলে বাপের বাড়ী আসা-যাওয়ার পাট প্রায় উঠিবে—

"বাপ রাজা—রাজার ঝি;
ভাই রাজা—আমার কি?"

এ দিকে যোগীন বাড়ী দেখিতে লাগিলেন—সে বাড়ীতে যাইয়া এ বাড়ী ভাগ হইলে—প্রাচীর তুলিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন।

কিন্তু মা রওনা হইবার দুই দিন পূর্ব্বে যতীন ফুটবল খেলা দেখিতে যাইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া আসিল এবং আসিয়া সারারাত্রি মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল—মা তাহার গায় হাত দিয়া দেখিলেন—গা আগুন।

পরদিনই ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার নিস্তারিণীর জ্যেঠা—তিনি ছেলেকে তিরস্কার করিলেন—"কি যে আজকাল হয়েছে—ফুটবল খেলা! পড়া-শুনা গেল—কেবল ঐ খেলা আর খেলা—এই ত dissipation of game" তিনি যথারীতি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

মা'র যাওয়া বন্ধ হইল।

ডাক্তার বাবুর সব প্রেস্‌ক্রিপশন ব্যর্থ করিয়া জ্বর যখন উত্তরোত্তর বাঁকা হইতে লাগিল, তখন ষষ্ঠ দিনে তিনি বলিলেন, "তাই ত, এ যেন টাইফয়েড। একবার রক্তটা পরীক্ষা করা দরকার।"

পরীক্ষার ফলে সব সন্দেহ দূর হইল—জ্বর পূরা টাইফয়েড। ডাক্তার বলিলেন, "এখন শুশ্রূষাই প্রধান চিকিৎসা।"

কাহারও অনুরোধ বা অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া পুলিন জ্বরের হিসাব রাখিতে—("চার্ট" করিতে) ও ঔষধপথ্য প্রয়োগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া গেল।

রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে নিস্তারিণী কোন দিনই পটু ছিল না। কিন্তু এবার সে জিদ করিয়া ছেলের সেবাশুশ্রূষা করিতে বসিল—আপনার ছেলের সেবার জন্য সে পরের সাহায্য লইবে না। বিশেষ রোগিপরিচর্য্যায় তরুলতার যে প্রশংসা ছিল, তাহা পূর্ব্বে অনেকবার তাহাকে পীড়িত করিয়াছে। তরুলতা দিনের মধ্যে দশবার যতীনের সংবাদ লইতে আসিত বটে, কিন্তু সে সঙ্কল্প করিয়াছিল, সে অনধিকারচর্চ্চা করিবে না। তাই এক দিন শাশুড়ী যখন বলিলেন, "ছোটবৌমা, তুমি খানিকটা ভার নিলে হয় না?"—তখন সে উত্তর দিল, "কেন মা, দিদি নিজে সব কর্‌ছেন—মা'র চেয়ে কি আর কারও ব্যথা বেশী হয়?"

কিন্তু পাঁচ ছয় দিন না যাইতেই নিস্তারিণীর অপটুত্ব সকলের—এমন কি, নিস্তারিণীরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। তাহার স্বাভাবিক অপটুত্ব—মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কায় আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে ঔষধ ঢালিতে কখন নির্দ্দিষ্টমাত্রার অধিক, কখন বা অল্প ঢালে—পথ্য দিতে রোগীর গায় ফেলে

ইত্যাদি। রোগভোগে রুক্ষস্বভাব পুত্র তাহার ব্যবহারে বিরক্ত ও উত্তেজিত হইতে লাগিল। শেষে নিস্তারিণী জ্যেঠ'র কাছেও তিরস্কৃতা হইয়া তরুলতাকে বলিল, "ছোট-বৌ, আমার যেন হাত-পা আর উঠে না—মা'র প্রাণ কি না! তুমি রোগীর সেবা কর।"

এই অনুরোধের পর তরুলতা আর বিলম্ব বা দ্বিধা না করিয়া যতীনের রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিল এবং সব কায নির্দ্দিষ্টভাবে করিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু রোগের বেগ প্রশমিত হইল না; রোগী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। একুশ দিন জ্বর বিচ্ছেদ হইবার আশা ব্যর্থ করিয়া রোগ তাহার ইচ্ছামত গতিতে চলিল। এরূপ রোগে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ, শেষে রোগীর আবশ্যক শুশ্রূষা হওয়া দুষ্কর হয়; কারণ, শ্রমে ও উৎকণ্ঠায় বাড়ীর লোক একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, তত তরুলতার সেবানৈপুণ্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল—শেষে তাহার যেন আর স্নান আহারের অবসরও রহিল না—যেন আর কাহারও কাছে রোগীকে পাঁচ মিনিটের জন্য রাখিয়াও সে বিশ্বাস করিতে পারে না!

এইভাবে দীর্ঘ দিন কাটিতে কাটিতে চল্লিশ দিনে পৌঁছিল। সে দিন মধ্যাহ্নে একবার বড় "টাল" গেল—"গেল গেল" হইয়া যতীনের স্তম্ভিত নাড়ীতে আবার জীবন প্রবাহিত হইল। ডাক্তাররা সব আশা ত্যাগ করিলেন।

মা নিস্তারিণীর জ্যেঠাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেহাই, কি দেখছেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আমাদের আর কিছু করবার নেই; এখন ভগবান্‌কে ডাকুন। তবে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ চিকিৎসা।"

৪

একচল্লিশ দিন। আজিকার দিনরাত্রি কাটিবে কি? দিনের বেলা একটা "টাল" সামলাইল। কিন্তু রাত্রিতে কি হইবে? ডাক্তাররা বসিয়া রহিলেন।

শেষরাত্রিতে রোগীর নাড়ী নিশ্চল হইয়া গেল। ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া "ইনজেকশন" দিলেন।

তরুলতা উঠিয়া গেল।

যতীনের বড় পিসী ব্যস্ত হইয়া নিস্তারিণীকে বলিলেন, "আর কি দেখছ?—মা'র ঘরে চরণামৃত আছে, শীগ্‌গির এনে বাছার মুখে দেও।"

নিস্তারিণী ব্যস্ত হইয়া শাশুড়ীর ঘরে চলিল; যাইবার সময় দেখিল, তরুলতা ঘরে নাই! তবে কি সব শেষ হইয়া গিয়াছে? তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। চরণামৃতের বাটি লইয়া ফিরিতে ফেলিতে আসিবার সময় সে দেখিল, তরুলতা আপনার ঘরে প্রাচীরে বিলম্বিত কালীর ছবির নিয়ে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে একমনে দেবতাকে ডাকিতেছে—"মা, রক্ষা কর।"

সে কোন আশ্বাসবাক্য শুনিতে পাইল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সে যখন ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন নিস্তারিণী দেখিল, তাহার মুখে আশঙ্কার অন্ধকার নাই। সম্মুখে নিস্তারিণীকে দেখিয়া সে তাহার হাত হইতে চরণামৃতের বাটি লইয়া রোগীর ঘরে গেল এবং আপনার স্থানটিতে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মুখে বিন্দু বিন্দু সেই জল দিতে লাগিল। ডাক্তার রোগীর নাড়ী দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে রোগীর নাড়ীতে গতি ফিরিয়া আসিল এবং তাহার পর হইতে জীবন-মরণের রণে জীবন জয়ী হইল—মৃত্যু ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল।

আরও পাঁচ দিন পরে নিস্তারিণীর জ্যেঠা মা'কে বলিলেন, "আর ভয় কি? নাতী সেরে উঠল। কিন্তু ও যে বাঁচল, সে কেবল আপনার ছোটবৌটির শুশ্রূষায়। ধন্য মেয়ে—ইচ্ছে করে, হাসপাতালের নার্স বেটীদের এনে দেখাই, বাঙ্গালীর মেয়ে—স্কুলে না শিখেও কেমন রোগীর সেবা করতে পারে।"

পূর্ব্বে এমন কথা শুনিলে নিস্তারিণী রাগ করিত। কিন্তু আজ আর তাহার মনে রাগ দেখা দিল না।

তাহার পরে ধীরে ধীরে যতীন সারিয়া উঠিতে লাগিল—প্রায় তিন সপ্তাহ শুশ্রূষা করিতে হইল। সে তিন সপ্তাহের মধ্যেও নিস্তারিণী আর ছেলের শুশ্রূষা করিতে অগ্রসর হইল না; তরুলতা কাছে না থাকিলে তাহাকেই ডাকিয়া দিতে লাগিল, "ছোটবৌ, তোমার ছেলের কি দরকার দেখ গে।" কিন্তু সে কথার মধ্যে ঈর্ষ্যা বা অভিমানের ঝঙ্কার থাকিত না।

৫

যতীন সারিয়া উঠিবার পর এক দিন যোগীন নিস্তারিণীকে বলিলেন, "দেখ, অনেক খুঁজে একটা ভাল বাড়ী পেয়েছি।"

নিস্তারিণী বলিল, "বাড়ী কি হ'বে?"

"বাড়ী যখন সারা হবে, তখন কি আর বাড়ীতে থাকা যাবে? বিশেষ যতীন এই অত বড় ব্যায়ারাম থেকে উঠেছে! একেবারে 'পার্টিশন' ক'রে আসব। মা'কে বলেছি; মা জন্মাষ্টমীর দিন বৃন্দাবনে যাবেন। তিনি আজ পুলিনকেও বলেছেন।"

নিস্তারিণী বলিল, "যে বাড়ী পেয়েছ, সেখানা ভাল?"

"একেবারে নতুন বাড়ী—দক্ষিণ খোলা; উপর নীচে দশটা ঘর।"

"তা' বেশ; আমার মাসতুতো ভাই লাহোর থেকে আস্‌বে—মেয়ের বিয়ে দেবে। বাড়ী পাচ্ছে না। তা'কেই ঐ বাড়ীটা দেব।"

"সে কত দিন থাক্‌বে?"

"অঘ্রাণ মাসের আগে ত আর বিয়ে হ'বে না—যেতে মাস মাস।"

"সে ত ছ'মাসের ফের। তত দিন—"

সেই সময় বারান্দায় পুলিনের পায়ের শব্দ পাইয়া নিস্তারিণী ডাকিল, "ঠাকুরপো?"

নিস্তারিণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া পুলিন মনে করিল, লজ্জার বাঁধ যখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন হয় ত তাহাকে একটা কড়া কথাই শুনিতে হইবে। সে প্রস্তুত হইয়া আসিল, নিস্তারিণীর কথা যত কড়াই কেন হউক না, উত্তরে সে মিঠেকড়া কথাও বলিবে-না—সংযত থাকিবে।

পুলিন ঘরে ঢুকিলেই নিস্তারিণী বলিল, "হ্যাঁ ঠাকুরপো, তোমার দাদারই না হয় বাহাত্তুর কাছিয়ে এল; তুমি ছেলেমানুষ—তোমার এ কি বুদ্ধি? মানুষের আপদ বিপদ সবই আছে—এই যে যতীনের এত বড় ব্যায়ারামটা গেল, ছোটবৌ না হ'লে কি ওকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারতাম? তুমি তোমার দাদার কথা শুন না—মা যা বলেছেন, তা' যেন ছোটবৌকে শুনিও না।"

শুনিয়া পুলিন বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

কিন্তু আরও বিস্ময় অনুভব করিলেন—যোগীন। সব দোষ তাঁহার?

*　　*　　*　　*

ইহার পরেই যোগীন যাইয়া মা'কে বলিলেন, "মা, বড় বৌ বলছে, পৃথক হওয়া হ'বে না। মানুষের আপদ বিপদ সবই আছে; এই যে যতীনের এত বড় অসুখটা গেল—ছোটবৌমাই ত ওকে বাঁচিয়ে তুল্লেন।"

আনন্দে মা'র চক্ষু দিয়া জল পড়িল। তিনি বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইয়ের মত থাক। চিরজীবী হও—রাজরাজেশ্বর হও।"

"তোমারও যাওয়া হবে না।"

"না, বাবা, আমাকে আর ফিরিও না। ঐ যে তোমার মত কেমন হয়েছিল, এরই মধ্যে দিয়ে গোপীনাথ আমাকে ডেকেছেন। আমি পরম সুখে তাঁর কাছে যাচ্ছি। সেখানে তোমাদের কল্যাণ কামনা করতে করতে শ্রীবৃন্দাবনের রজে দেহ রক্ষা করতে পারলেই পূর্ণকাম হ'ব।"

ধান্যদূর্ব্বা।

চাহিনাক' ভোগ-সুখ,
　　চাহিনাক' হিরণ্যের খনি;
চাহি না মর্য্যাদা খ্যাতি
　　রাজৈশ্বর্য্য, হে বঙ্গ-জননি!
দি'ও মোরে জন্মে জন্মে
　　আশীর্ব্বাদ তব চিরন্তন
মুঠা ভরি 'ধান্য-দূর্ব্বা'
　　অন্য কোন নাহি আকিঞ্চন।

অধিক চাহি না, মাগো,
　　চাহিবার নাহি অধিকার,
কাঙ্গাল সংসার মাঝে
　　দীনতম প্রার্থনা আমার।
শাক অন্নে শিশুগণে
　　দূর্ব্বাদলে গোধনে বাঁচায়ে
অপ্রবাসী ঋণমুক্ত
　　রহি যেন পল্লীবটছায়ে।

শ্রীকালিদাস রায়

আয়র্লণ্ডের প্রকৃত অবস্থা।

২

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে সংখ্যায় উক্ত 'ন্যাশনালিটী' পত্রে মিঃ গ্রিফিথ্ লিখিয়াছিলেন :—

"যদি স্বাভাবিকভাবে আয়র্লণ্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইত, তবে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার অধিবাসীর সংখ্যা দাঁড়াইত ১ কোটি ৬০ লক্ষ। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমাদের দেশে এখন কিঞ্চিদধিক ৪০ লক্ষের বেশী লোক নাই। সুসভ্য দেশে যে উন্নততর হারে প্রজাবৃদ্ধি হয়, আয়র্লণ্ডে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শুধু আমাদের দেশে যে বিধান চালান হইয়াছিল, তাহারই ফলে আমাদের দেশের চারি ভাগের তিন ভাগ অধিবাসীকে আমরা হারাইয়াছি।"

"অলষ্টার ইউনিয়নিষ্ট" দলের একটা প্রধান যুক্তি এই যে, অলষ্টারের উন্নতি হইয়াছে। আয়র্লণ্ডের অন্যান্য অংশের তুলনায় অলষ্টারের ভূমি তেমন উর্ব্বর নহে, প্রকৃতি ও শাসকের অনুগ্রহ হইতে উক্ত প্রদেশ বহুলাংশে বঞ্চিত, তথাপি অলষ্টারবাসিগণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহাদের আর একটা যুক্তি এই যে, একটি নাতিদীর্ঘ, বক্র, অপ্রশস্ত জলভাগকে তাহারা বৃহৎ বন্দরে পরিণত করিয়াছে; কর্দ্দমময় স্থানে তাহারা সুবৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণের ডক্ প্রস্তুত করিয়াছে, জলাভূমি ভরাট করিয়া বেলফাষ্ট নগরের বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। অলষ্টারের মত স্থানে যদি এ সকল ব্যাপার সম্ভব হইতে পারে, তবে আয়র্লণ্ডের অন্যান্য অংশে তাহা হইবে না কেন? মিঃ গ্রিফিথ্ এ সকল যুক্তির প্রতিবাদ না করিয়া, দৃষ্টান্ত সহকারে দেখাইয়াছেন যে, অলষ্টারের তথাকথিত উন্নতি অবনতির নামান্তরমাত্র। প্রকৃতপক্ষে অলষ্টার অবনতির পথেই চলিয়াছে। বিগত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'ন্যাশনালিটী' পত্রে গ্রিফিথ্ একটি প্রবন্ধ লিখেন; সেই প্রবন্ধের নাম "ইউনিয়নিষ্ট অলষ্টারের অবনতি।" উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন;—

"অলষ্টারের যে অংশের জনসাধারণ স্বায়ত্ত-শাসনের চেষ্টা না করিয়া ইংলণ্ডের দ্বারা শাসিত হইতে চাহে, আমাদের বিরুদ্ধ-পক্ষীয় রাজনীতিকগণ তাহাদের কথা তুলিয়া পুনঃ পুনঃ বলেন যে, অলষ্টারের সুখ-সৌভাগ্য ও উন্নতির সীমা নাই। এই মিথ্যার এমনই প্রভাব যে, ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াও অলষ্টারবাসিগণ, উহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। যদি কোনও দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিকে এক খণ্ড নীলবর্ণের কাগজ দেখাইয়া বলা যায় যে, কাগজখানি নীল নহে, উহা বাদামী—উপর্য্যুপরি চারি জন লোক যদি ঐ একই কথার উল্লেখ করিতে থাকে, তবে দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির মনে হয়, তাহারই ভ্রম, সত্যই কাগজখানি নীলবর্ণের নহে। অলষ্টারের দশাও ঠিক সেই প্রকার। আয়র্লণ্ডের অন্যান্য অংশের তুলনায় অলষ্টারের অবনতি অত্যন্ত অধিক; কারণ, তথায় জমীর খাজনা নির্দ্দিষ্ট এবং 'লিনেন্' কাপড়ের বিস্তৃত ও স্থায়ী ব্যবসায় সত্ত্বেও তথায় অবনতি ঘটিয়াছে। আয়র্লণ্ডের অন্যত্র তাহা নাই, কাযেই ইংরাজের, জন-সংখ্যা হ্রাসনীতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি সে সব স্থলে আরও অল্প।"

"বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, বেলফাষ্টে অসম্ভব দ্রুতগতিতে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি সে কথা সত্য হয়, তবে কোথা হইতে তাহারা আসিতেছে? আন্ট্রিম্ ও ডাউন খালি করিয়া বেলফাষ্ট জনাকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে মাত্র। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বেলফাষ্টের জন-সংখ্যা ছিল ৬৪ হাজার, এখন তথায় অধিবাসীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার। কিন্তু ১৮৪১ খৃঃ অব্দে আন্ট্রিম্ নগরে ৩ লক্ষ ৬১ হাজার অধিবাসী ছিল। এখন তথায় মাত্র ১ লক্ষ ৯৪ হাজারের বেশী লোক নাই। ডাউন নগরের ৩ লক্ষ ৬১ হাজার অধিবাসীর স্থলে এখন ২ লক্ষ ৪ হাজার মাত্র লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ডেরি নগরের প্রশংসায় বিরুদ্ধবাদীরা মুক্তকণ্ঠ। কারণ, তথায় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৫ হাজার লোক ছিল, এখন সে স্থলে অধিবাসীর সংখ্যা ৪০ হাজার। কিন্তু ডেরি জিলার অর্দ্ধেক লোক যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সেই প্রদেশে ২ লক্ষ ২০ হাজার লোক ছিল; আর এখন তথায় ১ লক্ষ ৪ হাজারের বেশী লোক নাই।"

"নিম্নে অলষ্টার প্রদেশের সমগ্র নগরের জনসংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইল। একটি বালকও ইহা হইতে সার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিবে ;—

	১৮৪১ খৃঃ অঃ	১৯১১ খৃঃ অঃ
আন্ট্রিম্	৩ লক্ষ ৬১ হাজার	১ লক্ষ ৯৪ হাজার
আরমাগন্	২ " ৩২ "	১ " ২০ "
বেলফাষ্ট	৬৪ "	৩ " ৮৭ "
ডেরি নগর	১৫ "	৪০ "
ডেরি জিলা	২ " ২২ "	১ লক্ষ
ডাউন	৩ " ৬১ "	২ " ৪ "
মোট	১২ লক্ষ ৫৫ হাজার	১০ লক্ষ ৪৫ হাজার

"দেখা যাইতেছে, অলষ্টারে ২ লক্ষ ১০ হাজার লোক কম পড়িয়াছে। বিগত ৭০ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ইউনিয়নিষ্ট অলষ্টার হইতে তাহার জন-সংখ্যার ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগ অন্তর্হিত হইয়াছে। আয়র্লণ্ডের বাহিরে য়ুরোপের কোন সভ্য দেশে কি এমন ঘটনা সম্ভবপর? অলষ্টার যতই উন্নত হইতেছে, ততই তাহার লোকসংখ্যা কমিতেছে।

"আমাদের বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। অলষ্টারবাসীদিগের জন-সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের আরও বক্তব্য আছে। শুধু ২ লক্ষ লোক উক্ত প্রদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আমাদের হিসাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক ইউনিয়নিষ্ট অলষ্টার-হইতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বাভাবিক হারে বর্দ্ধিত হইলে জনসংখ্যার পরিমাণ ২৫ লক্ষ হইত।

"জন-সংখ্যার হ্রাস, বিদেশগামী লোকসংখ্যার পরিমাণবৃদ্ধি যদি উন্নতির লক্ষণ হয়, তবে আরমাগন্, আন্‌ট্রিম্, ডাউন ও ডেরি নিশ্চিতই সমুন্নত হইয়াছে। কিন্তু যদি ঐ সকল ব্যাপার অবনতির লক্ষণ বলিয়া ধরা যায় (আয়র্লণ্ডের বাহিরে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মত তাহাই), তবে উক্ত স্থানসমূহ যে অবনত ও কুশাসিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। তত্রত্য অধিবাসীরা অবশ্যই মানুষ হিসাবে অবনত নহেন, তবে তাঁহারা কুশাসনের অধীন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, তাঁহারা স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের সত্য কথায় কর্ণপাত করেন না—তাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা কুশাসনের অধীন নহেন।"

মিঃ ম্যাক্‌লুর বলেন যে, মিঃ গ্রিফিথের প্রদত্ত সংখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভুল। যুক্ত-রাজ্যের লোক-গণনার বিবরণ-বহি হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন, "আয়র্লণ্ডের লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইলেও উহার ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডের লোক-সংখ্যা যখন ৫৬ লক্ষ, তখন আমি বালক মাত্র। আন্‌ট্রিম্ জিলায় আমার পিতার তখন ৯ একর জমীর আবাদ হইত। ইহার উপস্বত্ব হইতে আমাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হইত না। সেজন্য আমার পিতা সূত্রধরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীর পার্শ্বেই আমার এক খুল্লতাত ছিলেন, তাঁহার ২০ একর পরিমাণ জমী ছিল। অপর পার্শ্বে আমার পিতামহের ২৪ একর জমী। ১ মাইল হইতে ২ মাইল স্থানের মধ্যে আমার পিতার বহু আত্মীয় এই সকল কৃষি-বাড়ীতে কায করিতেন। আর একটা পল্লীতে আমার মাতার সম্পর্কিত বহু আত্মীয় চাষবাস লইয়াই ছিলেন। মিঃ গ্রিফিথের মতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আয়র্লণ্ডের জনসংখ্যা ৪৩ লক্ষে গিয়া দাঁড়ায়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, মহা-যুদ্ধের অব্যাবহিত পূর্ব্বে আমি আয়র্লণ্ডে ১ মাস যাপন করিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমি অলষ্টারের প্রত্যেক জিলায় ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, মিঃ গ্রিফিথের কথাই ঠিক; প্রত্যেক স্থলেই জন-সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে।

"আমি, ম্যাক্‌লুর ও গ্যাষ্টন—আমার পিতৃ ও ভ্রাতৃকুলের দৃষ্টান্তের দ্বারাই বুঝাইতে পারি, আয়র্লণ্ডের জন-সংখ্যার হ্রাস কেমন করিয়া ঘটিয়াছে। আমার পিতার ক্ষুদ্র গোলা-বাড়ীটি এখন আমার খুল্লতাত-পুত্রের অধিকারে আছে। তিনি এখন ২৯ একর জমীর মালিক এবং বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। আমার ছোটখুড়া, পিতামহের জমী পাইয়াছেন। তাঁহার জমীর পরিমাণ এক্ষণে ৪১ একর। তাঁহার অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, ম্যাক্‌লুর ও গ্যাষ্টন বংশের কোনও জমী হস্তান্তরিত হয় নাই। আমার বাল্যদশায় যখন আয়র্লণ্ডে ছিলাম, তখনকার তুলনায় এখন সকলেরই জমীর পরিমাণ বাড়িয়াছে। কিন্তু পরিবারের জন-সংখ্যা কমিয়াছে। সমগ্র আয়র্লণ্ডের অবস্থা ঠিক এইরূপ।"

ম্যাক্‌লুর এই প্রসঙ্গের আলোচনায় বলিয়াছেন যে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতার সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ইণ্ডিয়ানায় চাষ-বাসের জন্য গমন করেন। তখন ইণ্ডিয়ানার জন-সংখ্যা ১৫

লক্ষ মাত্র ছিল। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ ক্রমে ক্রমে আয়র্লণ্ড ত্যাগ করিয়া ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয়, আইওয়া, নেব্রাস্কা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। অন্যত্র জমী সুলভ ও অপর্য্যাপ্ত বলিয়া সকলে দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। যাঁহারা আয়র্লণ্ডে অবশিষ্ট ছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের জমীর পরিমাণ ও সঙ্গে সঙ্গে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

কিন্তু মিঃ গ্রিফিথের মতে এইটুকু বুঝা যায় যে, য়ুরোপের জাতিনিচয়ের মধ্যে গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে আয়র্লণ্ডের জন-সংখ্যা যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে, এমন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জর্ম্মণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীতে প্রতি বর্গ-মাইলে জন-সংখ্যা ৩ শত ১০ ছিল। ঐ সময়ে আয়র্লণ্ডে প্রতি বর্গ-মাইলে মাত্র ১ শত ৩৫ জন লোক ছিল। পোলাণ্ডের ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় যে, তথায় লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে। প্রতি বর্গ-মাইলে তথায় জন-সংখ্যা ২ শত ৮০—আয়র্লণ্ডের প্রায় দ্বিগুণ বলিতে হইবে।

লেখক বলিতেছেন,—"অর্থ-নীতির দিক্ দিয়া যদি আইরিশগণ যুক্ত-সাম্রাজ্যের একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যায় (প্রকৃত পক্ষে তাহাই বটে), তাহা হইলে আয়র্লণ্ডে জন-সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার উন্নতির এই অসামঞ্জস্য, অন্যান্য ভ্রান্ত ধারণার ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। যদি কোনওরূপে স্থলপথে আয়র্লণ্ডকে গ্রেট বৃটেনের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়—দৃষ্টান্তস্বরূপ বেলফাষ্টকেই ধরা যাউক, কারণ দুইটি দেশ এই স্থানেই পরস্পরের অতি সন্নিহিত—তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, অর্থ-নীতিক কোনও পরিবর্ত্তনই ইহাতে হইবে না। আয়র্লণ্ডের কৃষি-প্রধান অংশের জনসংখ্যা যে কারণে হ্রাস পাইয়াছে, গ্রেট বৃটেনের কৃষি-প্রধান স্থান-সমূহেও সেই একই কারণ বশতঃ লোক-সংখ্যা কমিয়াছে। ইহাতে কোনও বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না।"

লেখক মহোদয় এ সম্বন্ধে জর্ম্মণীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জর্ম্মণীর মত আর কোনও দেশে কৃষি-জীবন সুশৃঙ্খলে পরিচালিত নহে। ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি-ব্যাঙ্ক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে কৃষির উন্নতিসাধন প্রভৃতি ব্যাপারে জর্ম্মণী, পৃথিবীর সকল জাতির পুরোভাগে অবস্থান করিতেছে। বিগত ৩০ বৎসরে জর্ম্মণগণ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জর্ম্মণীর জন-সংখ্যা ৪ কোটি হইতে ৭ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি 'ফর্ট্নাইট্লি রিভিউ' নামক পত্রে এ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, লেখক তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল;—

"১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কয় বৎসরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শুধু প্রধান প্রধান খাদ্য শস্য জর্ম্মণীতে অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয় নাই, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পশু পক্ষীর চাষও দ্বিগুণ ফল দান করিয়াছে; ইহাতে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, তবে বোধ হয়, জর্ম্মণীর কৃষি-জীবী ও পল্লীবাসীর সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্য নহে। জর্ম্মণীর পল্লীবাসী ও পল্লীশ্রমজীবীর সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। খাদ্যশস্য ও গৃহপালিত পশুপক্ষী অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইলেও গ্রামের লোক-সংখ্যা বরং কমিয়াছে। শুধু নগরের জন-সংখ্যাই অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বড় বড় নগরের জন-সংখ্যা আরও অধিক। বিশেষতঃ যে সকল নগরে শ্রম-শিল্পের, কল-কারখানার সংখ্যা অধিক, সে সকল স্থানেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

লেখক বলেন যে, পূর্ব্বকালে যে স্থানে জ্বালানি কাষ্ঠই সভ্য-জাতির অবলম্বন ছিল, যে স্থানে কাষ্ঠের প্রাচুর্য্য ছিল, লোক সেই স্থানেই বসবাস করিত। কিন্তু এখন যেখানে কয়লা বেশী পাওয়া যায়, মানুষ সেই স্থানেই দলে দলে বাস করিয়া থাকে। জর্ম্মণীর রুহর জিলা লম্বে ৪০ মাইল ও প্রস্থে ১০ মাইল হইবে। এই জিলার অন্তর্গত ১১টি নগরের প্রত্যেক স্থলেই লক্ষাধিক লোকের বাস। আর ৫৫টি ক্ষুদ্র সহরের প্রত্যেকটিতে অধিবাসীর সংখ্যা ১০ হাজার হইতে ১ লক্ষ। এই জিলায় সর্ব্ব-সমেত ৬০ লক্ষ লোক বাস করে।

পোলাণ্ডের কয়লা-প্রধান স্থানেই লজ্ প্রভৃতি বড় বড় শিল্প-বাণিজ্য-প্রধান নগরগুলি অবস্থিত। পোলাণ্ডের জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির উহাই মূল কারণ।

লেখকের মতে, গ্রেটবৃটেনের নগরগুলিই জনবহুল, গ্রামের জনসংখ্যা কম। ১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২৩টি বৃটিশ জিলার লোকসংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯০০ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের ১০টি কৃষিপ্রধান জিলার লোকসংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল, অথচ সমগ্র দেশে তখন দেড় কোটি লোক বাড়িয়াছিল।

যুক্তরাজ্যের মধ্যে আইওয়ার মত উন্নতিশীল কৃষিপ্রধান স্থান আর নাই; কিন্তু ইহার জনসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। আমেরিকার ১০টি প্রদেশের লোকসংখ্যা ১৯০০ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনেক কমিয়াছে। সেগুলি এই:—কনেক্টিকট্, ইলিনয়, ইণ্ডিয়ানা, আইওয়া, মিশৌরী, নিউহ্যাম্পশায়ার, নিউইয়র্ক, ওহিও, রোড্ আইল্যাণ্ড ও ভারমণ্ট।

কৃষিপ্রধান স্থানে কেন লোকসংখ্যার হ্রাস হয়, তৎসম্বন্ধে তিনি ৩টি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

১ম। অন্যত্র জমী সুলভ, সে জন্য লোক দেশত্যাগ করিয়া থাকে, (এই কারণবশতঃ বহুবর্ষ ধরিয়া প্রতি বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ মার্কিণ কৃষিজীবী কানাডার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিতেছেন।)

২য়। কৃষিবিষয়ক নূতন নূতন যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হওয়ায়, মজুরের দ্বারা পূর্ব্বে যে কাম পাওয়া যাইত, তদপেক্ষা অনেক অধিক ফল যন্ত্রের সাহায্যে ঘটে।

৩য়। চতুর্দ্দিকে কল-কারখানা ও বিরাট শ্রমশিল্পের আবির্ভাব।

মিঃ ম্যাক্লুর বলেন, "৩০ একরের কম জমীতে কোনও আইরিশ কৃষিজীবী সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে পারে না। আয়র্লণ্ড যে দিন দিন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রধান কারণও ইহাই। কৃষিক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই আমার পিতৃব্য ও মাতুলপুত্রগণ আজ এত উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছেন।"

সার হোরেশ প্লাংকেট্ তাঁহার 'নূতন শতাব্দীর আয়র্লণ্ড' নামক গ্রন্থে এই কথাটাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই দ্বীপের অধিবাসিবৃন্দের কিয়দংশ স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ার ফলে পরিত্যক্ত ভূমি বক্রী কৃষকগণের অংশে পড়িয়াছে। সেই জন্যই যাঁহারা দেশে রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের এবম্প্রকার উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে—কোন অরণ্যের ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি কাটিয়া ফেলিলে, অবশিষ্ট বৃক্ষসমূহ যেমন সতেজ ও বলবান্ হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। ইহা ছাড়া এ দ্বীপের এমন উন্নতির অন্য কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভবপর নহে।"

কর

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন সংখ্যার 'নেশন্' পত্রে আইরিশ গণ-তন্ত্রের নেতা ডি ভেলেরা, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আয়র্লণ্ডের অভিযোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াছেন,—

"ইহার প্রধান ফল জন-সংখ্যার হ্রাস, শ্রম-শিল্পের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ধ্বংস, অতিরিক্ত করভারের আরোপ; খাজানা-বৃদ্ধি, সঞ্চিত এবং অতিরিক্ত অর্থ আয়র্লণ্ড হইতে ইংলণ্ডে প্রেরণ; অর্থনীতিক ক্রমোন্নতি ও সামাজিক সংস্কার ও উন্নতির বিঘ্ন-সম্পাদন; ইংরাজ ধনীদিগের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা।"

লেখক বলেন, "সিন্‌ফিন্ সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেরই ধারণা ঠিক ঐ প্রকারের। মিঃ ডি ভেলেরা যে বার সভাপতি হয়েন, তখন জাতীয় দলের নেতা ছিলেন জন্ রেডমণ্ড। সেই সময় শতকরা ৯০ জন লোক ডি ভেলেরার উল্লিখিত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। ডি ভেলেরাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার পর আইরিশগণের অধিকাংশই পূর্ব্বদল ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লিঙ্কলনের নির্ব্বাচনেও উদারনীতিক দলের অধিকাংশ লোকই এই প্রকারে উক্ত দল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"

এখন আয়র্লণ্ডে ৩টি দল বিদ্যমান। (১) সাধারণ-তন্ত্র—অধিকাংশ আইরিশ ইহার সভ্য। (২) জাতীয় দল—ইঁহারা ৯০ জনের মধ্যে মাত্র ৭ জনকে পার্লামেণ্টের সদস্য-রূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। (৩) ইউনিয়নিষ্ট—এই দলে সমগ্র আয়র্লণ্ডের মাত্র এক-চতুর্থাংশ লোক আছে।

রেডমণ্ডের মৃত্যুর পর, জোসেফ্ ডেভ্‌লিন্ জাতীয় দলের নেতা হয়েন। মিঃ ডেভ্‌লিন্ বলিয়াছেন, "স্বাধীনতা ছাড়া আয়র্লণ্ডের আর সবই আছে।"

ইউনিয়নিষ্ট দলের অধিকাংশই অলষ্টারে বাস করেন। তাঁহাদের মতেও আয়র্লণ্ড উন্নতিশীল এবং তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা বেশ সুশাসিত।

মিঃ ম্যাক্লুর এ সম্বন্ধে আলোচনার পর লিখিয়াছেন,—"আয়র্লণ্ডের উন্নতির মূল-সূত্রটি কোথায়, তাহাই আমি বলিব। ইউনিয়নিষ্ট যে সুশাসনের কথা বলিয়া থাকেন অথবা সিন্‌ফিন্‌গণ যে চণ্ড-নীতির উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহার প্রকৃত কারণেরও আমি বিশ্লেষণ করিতেছি।"

তিনি প্রথমেই করের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন, "মার্কিণ সংবাদপত্র-সমূহে নিম্নলিখিত বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে,—

"গত বৎসর ইংলণ্ড আয়র্লণ্ড হইতে ২০ কোটি ডলার আদায় করিয়াছেন। যুদ্ধের সূচনাকালে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট উহার একপঞ্চমাংশ টাকার জন্য ঋণী ছিলেন। উহা জাতীয় ঋণ। ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার যুদ্ধ-শেষে ফ্রান্সকে অর্থনীতির দিক্ দিয়া ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে বিস্মার্ক ফ্রান্সের নিকট যে টাকা দাবী করেন, এ টাকাটা তাহাই।"

মিঃ আর্থার গ্রিফিথ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখের 'ন্যাশনালিটী' পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"বৃটিশ পার্লামেণ্ট আগামী বর্ষের জন্য আয়র্লণ্ডের উপর যে করভার চাপাইয়াছেন, তাহার মোট সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড হইবে। এক স্পেন ব্যতীত আর কোনও দেশ এমন গুরু করভারে নিপীড়িত হয় নাই!"

আইরিশ স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমেরিকা যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার সুপ্রসিদ্ধ বিবরণে আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে –

"কর আদায় ও একাধিপত্য—এই যুগ্ম-প্রণালীর ফলে স্বতঃই কৃষকের ন্যায়-সঙ্গত লাভের অংশ চলিয়া যাইতেছে। জমী যতই উর্ব্বরা হউক না কেন, ঋতু যতই অনুকূল হউক না কেন, জনসাধারণ যতই উৎসাহী হউক না কেন, এমন প্রণালীতে শ্রম-শিল্প ধ্বংস হইবেই!"

মিঃ ম্যাক্লুর বলেন যে, উল্লিখিত বিবরণে ফ্রাঙ্ক বি, ওয়াল্স্, ইলিনয়ের ভূতপূর্ব্ব শাসন-কর্ত্তা এডোয়ার্ড এফ্ ডন্ এবং ফিলাডেল্‌ফিয়ার মাইকেল জে রায়ান স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

করসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা-কল্পে প্রবন্ধলেখক লিখিতেছেন, "১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দের আয়র্লণ্ডের কর সংক্রান্ত যে বিবরণ আমার কাছে আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আয়র্লণ্ড ৩ কোটি, ৭২ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড কর দিয়াছে। সেই বৎসর স্কট্‌লণ্ড ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত পাউণ্ড এবং ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ ৬৯ কোটি, ১০ লক্ষ ৬২ হাজার পাউণ্ড চাঁদা দিয়াছিল। ইহার অর্থ, স্থানীয় ও জাতীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই করের আরোপ; যুদ্ধের ফলে করবৃদ্ধি হইয়াছিল।"

অলষ্টারের অধিবাসীরা এই কর প্রদানে অসন্তুষ্ট নহে। আয়র্লণ্ডের প্রধান শ্রম-শিল্প-সমূহ অলষ্টারেই প্রতিষ্ঠিত, বিশেষতঃ বেল্‌ফাষ্ট নগরে। এ জন্য 'আয়র্লণ্ডের অন্যত্র অপেক্ষা এই অঞ্চলেই করের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক প্রশ্ন করিতেছেন, "অবস্থা যখন এইরূপ, তখন বেলফাষ্ট নগরের প্রধান শ্রম-শিল্প-সমূহের স্বত্বাধিকারিগণ গ্রেট বৃটেনের অনুরূপ প্রতিযোগীদিগের তুলনায় অসুবিধা ভোগ করিতেছেন কেন?"

লেখক নিজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "না, তাঁহারা সে অসুবিধা ভোগ করেন না। আয়র্লণ্ডে যে যে বিষয়ের উপর কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যুক্তসাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশেও ঠিক অনুরূপ কর ধার্য্য হইয়াছে, বাণিজ্য-শুল্ক ও আয়কর সর্ব্বত্রই সমান।

"নিউইয়র্কের কোন মার্কিণের আয়ের উপর যে হারে কর নির্দ্ধারিত হয়, যুক্ত-রাজ্যের অন্যান্য স্থলের অধিবাসীকেও ঠিক সেই হারে কর দিতে হইয়া থাকে। ইহার কোনও ব্যতিক্রম কোথাও লক্ষিত হয় না। আয়র্লণ্ড এবং যুক্তসাম্রাজ্যের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। গ্রেটবৃটেনের অধিবাসীরা যে বিষয়ে কর প্রদান করে না, আয়র্লণ্ডের জনগণকেও সে বিষয়ে কর দিতে হয় না। কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয়ে গ্রেট বৃটেনের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কর দিতে হয়, যাহা আয়র্লণ্ডে নাই। সেগুলি—ভূমিকর, বাসগৃহকর প্রভৃতি। অবশ্য এই কর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত, কিন্তু আয়র্লণ্ডকে এ সম্বন্ধে অনুগ্রহ দেখান হইয়াছে। ইংলণ্ডে যে ক্ষেত্রে ৭ শিলিং ৬ পেন্স দিতে হয়, আয়র্লণ্ডের অধিবাসীকে সে স্থলে মাত্র ২ শিলিং ৬ পেন্সের বেশী দিতে হয় না। অর্থাৎ ইংলণ্ডের ৪৫ লক্ষ লোক (যাঁহাদের আয় আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদিগের অনুরূপ) যদি আয়র্লণ্ডে গিয়া বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রদত্ত কর যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে। সুতরাং এরূপ প্রমাণ সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের অপেক্ষা আয়র্লণ্ডকে বেশী কর দিতে হইতেছে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে বিশেষ বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োজন।"

মিঃ ম্যাক্লুর অতঃপর ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দের আয়কয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেখাইতেছেন, উক্ত বৎসরে কোথা হইতে কত অর্থ আয়কর বাবদে আদায় হইয়াছিল।

আয়র্লণ্ডের জাতীয় কর—১ ক্রো, ৫১ল, ১৩হা, ৫শত পাউণ্ড
স্কটলাণ্ডের ঐ —৭ " ৭৭ " ১৪ " "
ইংলণ্ডের ঐ —৫৪ " ৭২ " ১৪ " ৫ শত "

১৯১১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় দেখা যায়—

স্কটলণ্ডের জন-সংখ্যা— ৪৭ লক্ষ ৬০ হাজার ৯ শত ৪
আয়র্লণ্ডের ঐ — ৪৩ " ৯০ " ২ " ১৯

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আইরিশগণকে মাথা পিছু যে কর দিতে হয়, স্কটলাণ্ডকে তাহার পাঁচগুণ অধিক দিতে হয় এবং ইংলণ্ডও আয়র্লণ্ডের প্রায় পাঁচগুণ অধিক কর প্রদান করে।

আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের কৃষি-প্রধান স্থানসমূহকে যদি বাণিজ্য-প্রধান দেশসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তবে সেখানেও এই একই ফল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আইরিশগণকে ইংলণ্ড যুক্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইলে, তাহারা গ্রেটবৃটেনের কৃষি-প্রধান স্থানের অধিবাসীদিগের ন্যায়ই একই হারে কর দিয়া আসিতেছে।

লেখক বলিতেছেন, "এখন একটা কথায় গোল বাধিতেছে। আয়র্লণ্ড যুক্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ধরিতে হইবে? আমেরিকার কোনও রাজ্য যদি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া বিবেচনা করে, তবে সে স্থানীয় কর এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্টের আরোপিত যুদ্ধকর ও জাতীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করের বিষয় তুলনা করিতে পারে।"

বন্দর।

ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ডের বন্দরসমূহের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, ইংলণ্ড ব্যতীত অপর কোনও দেশের সহিত আইরিশগণকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে দিতেছেন না, এমনই ভাবের অসংখ্য বিবরণ প্রায়ই প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। লেখক বলিতেছেন, "অলষ্টারের সাহিত্যে কুত্রাপি এই অভিযোগের প্রতিবাদ নাই।"

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ সংখ্যায় সাপ্তাহিক 'ন্যাশনালিটী' পত্রে মিঃ গ্রিফিথ্ আয়র্লণ্ডের ঘটনা নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"'নেভি লিগ্' আয়র্লণ্ডের ২২টি পোতাশ্রয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সমগ্র বিশ্বের নৌ-শক্তিধরদিগের স্থান সঙ্কুলান এখানে হইতে পারে। লক্ সুইনি, ডনিগাল্, স্লিজ, কিলালা, ব্লাকসড্, ক্লু, বল্ওয়ে, ট্রালি, ডিংগল্ উপসাগর, কেন্মেয়ার নদী, স্যানন্ মোহানা, ব্যান্ট্রি, ডুনাম্যান্স, কুইন্স্টাউন ও কর্কবন্দর, ডঙ্গারভেন্, ওয়াটারফোর্ড বন্দর, ওয়েক্সফোর্ড বন্দর, ডব্লিন উপসাগর, ডন্ডল্ক্, কার্লিংফোর্ড, বেলফাষ্ট এবং লফ্ফয়েল এই দ্বাবিংশ বন্দর আয়র্লণ্ডে আছে। তন্মধ্যে ৫টি প্রথম শ্রেণীর। আবার যেটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার মুখ আট্লাণ্টিক মহাসাগরের দিকে। বিশ্বের বাণিজ্যতরণীসমূহ ইহার উপর দিয়াই যাতায়াত করিয়া থাকে। পৃথিবীর ৫টি শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রত্যেকের জন্য আমাদের এক একটি বন্দর আছে। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির জন্য ১৭টি ক্ষুদ্র বন্দরও বিদ্যমান।

"যত দিন ইংলণ্ডের পতাকা এই সকল বন্দরে উড্ডীন থাকিবে, তত দিন উহা আমাদের অথবা অপর কাহারও কাযে লাগিবে না। সমুদ্রপথে বাণিজ্যটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার। যদি আয়র্লণ্ডের এই সমুদয় চমৎকার বন্দর আইরিশদিগের বাণিজ্য-ব্যাপারে কোনও সহায়তা না করে, তাহা হইলে সমুদ্রপারবর্ত্তী অন্য কোনও জাতির পক্ষেও উহা কাযে লাগিবে না। আইরিশ বন্দরগুলিকে বাণিজ্য অথবা নৌ-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হইলে প্রথমতঃই ইংলণ্ডের গ্রাস হইতেই তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

প্যারীর শান্তি-বৈঠকের সময় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে সংখ্যার সাপ্তাহিক 'ন্যাশনালিটী' পত্রে মিঃ গ্রিফিথ্ এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ নূতন একটা জাতির বাণিজ্য-পথ মুক্ত রাখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিতেছি। কিন্তু আমাদের এই আয়র্লণ্ডে ফিউমের ন্যায় উৎকৃষ্ট ২১টি বন্দর জগতের সহিত সকল সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া রহিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি? আড্রিয়াটিক্ বন্দরসমূহে জুগোশ্লাভ্ অথবা ইটালীয়গণের অধিকারের দাবী যাহাই থাকুক না কেন, নিজের দেশের বন্দরসমূহের উপর অধিকার এবং আমাদের তটভূমির নিকট দিয়া বিশ্বের যে বাণিজ্য-ব্যাপার চলিতেছে, তাহার সহিত আয়র্লণ্ডের সংস্রব রাখিবার ন্যায়সঙ্গত দাবীকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।"

ইলিনয়ের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মিষ্টার ডন্ও ১৯১৯

খৃঃ অব্দের ২৮শে জুন সংখ্যার 'ন্যাশনালিটী' পত্রে লিখিয়াছিলেন—"স্বাভাবিক ভাবে গ্যালওয়ে বন্দরের অবনতি দর্শনে আমি বিস্মিত হইয়াছি। জাহাজের অবিদ্যমানতাই এই অবনতির হেতু। উত্তর-ফ্রান্সের কামানের গোলায় বিধ্বস্ত নগরের দুর্দ্দশার অপেক্ষা গ্যালওয়ের অবস্থা শোচনীয়।"

মিষ্টার ম্যাক্লুর বলিতেছেন, "প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আয়র্লণ্ডের রপ্তানীর বাণিজ্য অসীম। দ্বিতীয়তঃ আয়র্লণ্ডের অন্যান্য স্থানে বন্দর ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত অলষ্টারের কোনও পার্থক্য নাই; সমগ্র যুক্তসাম্রাজ্যমধ্যেও ঐ একই নিয়ম বিদ্যমান। সমগ্র যুক্তসাম্রাজ্যের প্রধান ৭টি বন্দরের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাণিজ্যের অবস্থা এইরূপ :—

মাইকেল কলিন্স—সিনফিন্ নেতা।

লণ্ডন	...	৮৩ লক্ষ	৯৯ হাজার	৭৮ টন।			
লিভারপুল	...	৪২ "	৮৪ "	৮ শত	৫৩ টন্।		
নিউকাশল্	...	৩৪ "	১৭ "	৪ শত	৪৮ "		
বেলফাষ্ট	...	২৭ "	৬৩ "	৯ "	৯২ "		
ডব্লিন্	...	২৫ "	১৯ "	৮ "	২৪ "		
গ্লাসগো	...	১৯ "	৬৫ "	৫ "	৬৯ "		

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে, লণ্ডনের তুলনায় ডব্লিন শতকরা ৩০ ভাগ বাণিজ্য করিয়াছে এবং বেলফাষ্টের তুলনায় তাহার বাণিজ্যের হার শতকরা ৯০। স্কটলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর গ্লাসগোকেও ডবলিন এ বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছে।

যদি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের হিসাব ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, যুক্তসাম্রাজ্যের সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী বাণিজ্য-ব্যাপারে সমগ্র আয়র্লণ্ড ৭ ভাগের এক ভাগ বেশী বাণিজ্য করিয়াছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্সের বন্দরের অবস্থা আয়র্লণ্ডের বন্দরসমূহের মতই; কোনও পার্থক্য নাই। যুক্তসাম্রাজ্যের বন্দরগুলি সম্বন্ধে যেরূপ সুব্যবস্থা আছে, পৃথিবীর কুত্রাপি তাহা দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ, শুধু বাণিজ্যেই ইংলণ্ড বাঁচিয়া আছে।"

লেখক মহোদয় তাহার পর বিদেশের সহিত আয়র্লণ্ডের বাণিজ্য ব্যাপারের আলোচনা করিয়াছেন। সমগ্র আয়র্লণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্দ্ধাংশ বেলফাষ্টেই নিবদ্ধ। তাহার কারণ, এই স্থানেই নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র যুক্তসাম্রাজ্যে আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ ছিল, ৬ কোটি, ৬৬ লক্ষ ৬০ হাজার টন। এই বিরাট্ পণ্য-সম্ভারের মধ্যে বেলফাষ্ট মাত্র ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৯ শত টন লইয়াছিল। ঐ সময়ে যুক্তসাম্রাজ্যের রপ্তানী মালের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টন। ইহাতে বেলফাষ্টের দ্রব্যজাত মালের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ২১ হাজার ৮ শত ৫৭ টন মাত্র।

লেখক বলিতেছেন, "এখানে যদি কোনও ব্যক্তি এমন কল্পনা করেন যে, জাহাজে করিয়া পণ্যদ্রব্য যথেচ্ছ স্থানে স্বাধীনভাবে পাঠাইবার সময় কোনও প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে, অলষ্টারবাসিগণ তাহা নির্ব্বিবাদে সহ্য করে, তবে তিনি আয়র্লণ্ডের সম্বন্ধে নিতান্তই ভ্রান্ত বলিতে হইবে।

"বেলফাষ্টে ৫টি শ্রেষ্ঠ শ্রম-শিল্পের ব্যবসায় বিদ্যমান। সূক্ষ্ম বস্ত্রের এত বড় কল, এমন বৃহৎ পোতনির্ম্মাণক্ষেত্র, এত বড় রজ্জুর কারখানা, সুবৃহৎ তামাকের কারখানা ও প্রকাণ্ড মদের ভাঁটি জগতের আর কোথাও নাই। তবে প্রশ্ন এই,—বেলফাষ্ট বহির্জগতের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ নহে কেন? উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, যে কারণে নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনকারী কনেক্‌টিকট্‌ ও রোড দ্বীপে বৈদেশিক বাণিজ্য অল্প, বেলফাষ্টেও সেই হেতু বিদ্যমান।"

মিষ্টার ম্যাক্‌লুর বেলফাষ্টের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীদিগকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা লিভারপুলের মধ্যবর্ত্তিতায় কাঁচা মাল না লইয়া প্রভূত পরিমাণে সরাসরি মাল আমদানী করেন না কেন? উৎপন্ন দ্রব্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে সরাসরি রপ্তানী করিলেই ত ভাল হয়। তাঁহারা উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা খুবই সহজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ রজ্জু প্রস্তুতের ব্যাপারটাই ধরা যাইতে পারে। রজ্জুর কাঁচা উপকরণ জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া থাকে। যথা:—ম্যানিলা, মেক্সিকো, ভারতবর্ষ, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি। এই উপকরণগুলি জাহাজের অন্যান্য মালের অংশীভূত বলিয়া গণনা করা হয়। লিভারপুলে তাহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম বস্ত্র, তামাক প্রভৃতি রপ্তানী দ্রব্যও ঠিক ঐ প্রকারে লিভারপুল হইয়া যায়। কারণ, একখানি পূরা জাহাজ বোঝাই হইয়া এ সকল জিনিষ যায় না। অন্যান্য মালের সঙ্গে যায়।

যে স্থানে সমগ্র আয়র্লণ্ডের অর্দ্ধেক, বৈদেশিক রপ্তানী মালের কারবার, সেই বেলফাষ্টেরই যদি এই অবস্থা, তবে আয়র্লণ্ডের অন্যান্য স্থানের মাল কিরূপে জাহাজ বোঝাই হইয়া সরাসরি অন্য দেশে যাইবে? তাহাতে খরচ পোষাইবে কি?

যে কোনও দেশের জাহাজওয়ালা ইচ্ছা করিলে সরাসরি-ভাবে আয়র্লণ্ডে পোত প্রেরণ করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাজ্য হইতে আয়র্লণ্ড পর্য্যন্ত সরাসরি জাহাজ যাইবার বন্দোবস্ত এখন হইয়াছে। য়ুরোপ মহাদেশের সর্ব্বত্রই আয়র্লণ্ড হইতে সরাসরি জাহাজ যাইবার ব্যবস্থা আছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখের 'আইরিশ ওয়ার্লড' পত্রে এইরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছিল—

"নিউইয়র্ক হইতে জাহাজ এখন সরাসরি আইরিশ বন্দরে যাইতেছে। পনের দিন অন্তর জাহাজ ছাড়িবে। পর্য্যাপ্ত মাল বোঝাই করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। মুর ও ম্যাক্‌ কর্ম্যাক্‌ কোম্পানীর ৩০খানা জাহাজ মার্কিণ বন্দরে আছে। "নিউইয়র্ক হইতে কর্ক, ডব্‌লিন্‌ ও বেলফাষ্টে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করিতেছে, তাহাদের কায বেশ আশাপ্রদ। এজন্য কোম্পানী তিনখানা জাহাজ আয়র্লণ্ডে যাতায়াতের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছেন। ইংরাজ-বন্দর হইয়া আসিতে যে খরচ পড়ে, ইহাতে তদপেক্ষা শতকরা ৪০টাকা কম পড়িবে, সময়েরও অনেক সুবিধা হইবে। সরাসরি আমেরিকা হইতে আয়র্লণ্ডে আসিতে গেলে অর্থ ও সময় অনেক কমিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া নামান ও উঠানতে যে বিলম্ব ঘটে ও ক্ষতি হয়, ইহাতে তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই।

"আমেরিকা, বিশেষতঃ নিউইয়র্কের সহিত এখন আমাদের সরাসরি ব্যবসায়ের সুবিধা হইয়াছে। আমাদের দেশের কৃষিব্যবসায়ী, বণিক, শ্রমশিল্প প্রভৃতির ব্যবসায়িগণ প্রাণপণ চেষ্টায় সমুদ্র-পারের বাণিজ্যে সফলতালাভের চেষ্টা করিতে থাকুন। আমাদের দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ উৎকৃষ্ট; বণিকগণেরও সুনাম বাহিরে সর্ব্বত্রই আছে; সুতরাং সরাসরি বাণিজ্যব্যাপারে আমরা আমেরিকার সহিত স্থায়ী সংস্রব নিশ্চয় রক্ষা করিতে পারিব।"

উল্লিখিত সংবাদপত্রে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী আর একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল,—

"আইরিশ বণিকদিগের জন্য আজ মুর ও ম্যাক্‌ কর্ম্যাক্‌ কোম্পানীর জাহাজ 'মিলওয়াকী' মার্কিণ পণ্য সহ যাত্রা করিল। উহা কর্ক, ডব্‌লিন্‌ ও বেলফাষ্ট বন্দরে যথাক্রমে যাইবে। এতদিন আয়র্লণ্ডের পণ্যসম্ভার লিভারপুল বন্দর হইয়া আসিত। ইংলণ্ডের বন্দোবস্ত সেইরূপ ছিল। তথা হইতে ইংরাজ-জাহাজে উক্ত পণ্যসমূহ বোঝাই হইয়া আয়র্লণ্ডে আসিত। ইহাতে আয়র্লণ্ডের স্কন্ধে শতকরা ২০ টাকা খরচ অধিক চাপিত। বৃটিশশাসনের বিরুদ্ধে আয়র্লণ্ডের ইহাও অন্যতম অভিযোগ।"

লেখক এতদুপলক্ষে বলিতেছেন যে, এই সরাসরি বাণিজ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য কোনও নূতন বিধান প্রণয়নের প্রয়োজন নাই। যে কোনও মার্কিণ জাহাজওয়ালা যে কোনও সময়ে এ কার্য্য করিতে পারিতেন। সুতরাং ইংলণ্ড যে এত দিন আয়র্লণ্ডের পণ্যসম্ভার লিভারপুল বন্দর হইয়া লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এরূপ

উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও নিরর্থক। কারণ, তাহা হইলে কনেক্‌টিকট সম্বন্ধেও লোক এমন বলিতে পারে যে, আই-নেগ্ন বাঁধনে পড়িয়া কনেক্‌টিকটের ব্যবসায়ীরা বোষ্টন বা নিউইয়র্ক বন্দরের পথে আমদানী রপ্তানী করিতে বাধ্য।

গ্যালওয়ে বন্দরের অবনতি প্রসঙ্গে সম্পাদকমহাশয় বলিয়াছেন, "লোক কেন এই বন্দর ব্যবহার করে না? ইচ্ছা করিলেই ত বন্দরটিকে উন্নত করা যায়; কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে কেন? এখানে কে আসিবে? যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যাত্রিগণ গ্যালওয়ে বন্দরেই অবতরণ করিবে। তাহার পর? তাহাদিগকে নৌকাযোগে কূলে উঠিতে হইবে। তাহার পর ট্রেণে চাপিয়া ৩ বা ৪ ঘণ্টা কর্ম্মভোগের পর ডব্‌লিনে আসিতে হইবে। আবার ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার জন্য ৩ ঘণ্টা জলযাত্রা করিতে হইবে। তাহার পর নৌকা হইতে অবতরণ ও ট্রেণে আরোহণ, ৫ ঘণ্টা পরে লণ্ডনে আগমন। এত হাঙ্গামা করিয়া কে এ পথে চলিবে? তাহা ছাড়া দ্রব্যাদির মাশুল ও পর্য্যটনের ব্যয়টা খতাইয়া দেখিলে কোনও পরিব্রাজক এ পথে আসিতে চাহিবে না।"

একটা কথা ঠিক, আয়র্লণ্ডের আমদানী ও রপ্তানীর পণ্যসম্ভার বৃটিশ-জাহাজই বহন করিয়া থাকে। আবার এ কথাও সত্য যে, আইরিশ জাহাজওয়ালার পোতও আছে। আইরিশ্ জাহাজের সাহায্যে বিদেশে বাণিজ্য করিবার প্রতি-বন্ধকতাও কিছু নাই। এমন কোন বিধান নাই—যাহাতে তাহা করা নিষিদ্ধ। মহাযুদ্ধের ফলে অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তবে এ কথাও সত্য যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার পণ্য বৃটিশজাহাজ বহন করিত।

মিঃ ম্যাক্‌গায়ার জনৈক প্রসিদ্ধ আইরিশ। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বইখানির নাম, "King Kaiser and Irish freedom" (রাজা, কৈসর, ও আইরিশ স্বাধীনতা) এই গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"যে সময়ে মার্কিণ পতাকা সহস্র সহস্র দ্রুতগামী জলযানের উপর উড্ডীন হইত, বর্ষীয়ান্ মার্কিণগণ এখনও সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া থাকেন। সে সময়ে আমাদের দেশের বাণিজ্যসম্ভারের চারি ভাগের তিন ভাগ মার্কিণ-পোত বহন করিত। ইতিহাসে দেখা যায়, গৃহবিবাদ উপলক্ষে ইংলণ্ড কেমন সুযোগ বুঝিয়া মার্কিণের এই ব্যবসা হস্তগত করেন এবং আমাদের বাণিজ্যকে ধ্বংস করিয়া ফেলেন। তখন আমাদের দেশ ধরাশায়ী অবস্থায় ছিল।

"ইউনিয়ন জ্যাক্ (ইংরাজের) পতাকা-শোভিত পোতে আমাদের পণ্যদ্রব্য য়ুরোপের সর্ব্বত্র যাইতেছে। সমুদ্রবক্ষে আমরা এমনই অসহায়, নগণ্য। স্থিতপ্রজ্ঞ মার্কিণগণ বুঝিয়াছেন, জর্ম্মণী নহে, ইংলণ্ডই মার্কিণের জাহাজের ব্যবসায়কে ধ্বংস করিয়াছেন। রপ্তানীর তালিকায় সংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া আমরা ভুলিব না।"

লেখক বলিতেছেন, "চণ্ডনীতির প্রবর্ত্তনে যদি ইংলণ্ড মার্কিণের জাহাজের ব্যবসায় ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা সত্য হয়, তবে আয়র্লণ্ডের বৈদেশিক ব্যবসায়ও ইংলণ্ড চণ্ড-নীতির সাহায্যে ধ্বংস করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। যদি প্রথমটি কাহারও নিকট বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে দ্বিতীয়টিতেও তিনি বিশ্বাস করিবেন।"

[ক্রমশঃ।

ত্রিধারা।

শফরী-নয়না অয়ি 'ভোগবতী' তুহিন-শীতলা।
এস চন্দ্র-করোজ্জ্বলা রঙ্গময়ী তরঙ্গচঞ্চলা॥
যৌবনের কলোচ্ছ্বাসে এলাইয়া পুলিন-কঞ্চুক।
ঝাঁপ দিয়ে তব বুকে লভি অবগাহনের সুখ॥
এস 'মন্দাকিনী' ধারা হে কল্যাণি, পুণ্যদেহা অয়ি।
শিব জটা বিনির্গতা তপোব্রতা চির শিবময়ি॥

আন' শুদ্ধি, আন' ঋদ্ধি, স্বর্ণ শস্য, পণ্যের সম্ভার।
তোমার ও মেখ্যতটে, অয়ি হৃষ্টে, পাতিব সংসার॥
এস গো অলকানন্দা ছায়াপথ-চারিণী সুন্দরী।
পারিজাত মন্দারের গন্ধে তব মোদিত লহরী॥
প্রেমের তরণী বেয়ে তব বক্ষে যাব ভেসে ভেসে।
তোমার জনমক্ষেত্র বিষ্ণুপদে উপজিব শেষে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

প্রতিভার বরপুত্র, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁহার কোনও বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, বাঙ্গালীর ছেলের intellect দেখে; ভারতবর্ষে অনেক যায়গায় বেড়িয়েছি, কিন্তু অন্য কোথাও এত সহজে সাহিত্যের ভাষা ও ভাব আয়ত্ত কর্‌তে ছেলেদের দেখা যায় না। আমরা অতি সহজে গ্রহণ কর্‌তে পারি, এইটি আমাদের বিশেষত্ব।"

এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা-বিস্তারের যথাযথ ইতিহাস যদি কখনও লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর নাম তাহাতে সর্ব্বাগ্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের ভাষা ও ভাব আয়ত্ত করিয়া এই দুরূহ বিদেশীয় ভাষায় কয়েকজন শিক্ষিত বঙ্গবাসী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও সন্দর্ভাদি রচনা করিয়া তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও শক্তির যে অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন কি স্বদেশবাসীর কি বিদেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকৃষ্ট করিবে।

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র।

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই উহার অন্যতম ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজী ভাষায় কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করিয়া তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখকগণকে কিরূপ বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিলেন, তাহা কে না জানেন? প্রসিদ্ধ কবি, সন্দর্ভ-লেখক, সমালোচক ও শিক্ষক মেজর ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন ইঁহার রচিত একটি ইংরাজী কবিতা পাঠ করিয়া উচ্চকণ্ঠে উহার প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"Let some of those narrow-minded persons who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language but even in their own." ইংলণ্ডেও এই প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর নাম এক সময়ে সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইত এবং তাঁহার কার্ত্তিক-বিনিন্দিত সুন্দর মূর্ত্তির প্রতিকৃতি Fisher's Drawing Room Scrap Book প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রপুস্তকে মুদ্রিত হইয়া ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের বৈঠকখানায় বিরাজ করিত। সুকবি রাজনারায়ণ দত্তের নামও এককালে এতদ্দেশীয় ইংরাজী লেখকগণের মধ্যে অপরিচিত ছিল না। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপরিণত বয়সের ইংরাজী কবিতাগুলিও মান্দ্রাজে ইংরাজ পত্র-সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক কিরূপ সমাদৃত হইত, তাহা মাইকেলের জীবন-চরিত-পাঠকগণের অবিদিত নাই। রামবাগানের সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশোদ্ভূত হরচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, শশীচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজী কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ গোবিন্দচন্দ্রের সরস্বতীপ্রতিম দুহিতৃদ্বয়—অরু ও তরু, ইংরাজী ভাষায় কাব্যাদি রচনা করিয়া এডমণ্ড গস্‌ প্রভৃতি ইংরাজ কবি ও সমালোচকের যে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দ ও গৌরবে স্ফীত হইয়া না উঠে? এই বংশের রমেশচন্দ্র সেদিনও সুললিত ইংরাজী পদ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের

চিরমধুর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বিদেশীয় নরনারীকে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ও সভ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। "রাম শর্ম্মার" (নবকৃষ্ণ ঘোষ) বিদ্রূপ ও শ্লেষবর্ষী ইংরাজী কবিতা কে উপভোগ করেন নাই? অরবিন্দ, মনোমোহন ও সরোজিনীর ইংরাজী কাব্যগ্রন্থাদি কোন্ ইংরাজ কবির কাব্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট?

কিন্তু কোনও জ্ঞানী একদা বলিয়াছিলেন, পদ্যরচনা বরঞ্চ সহজ, গদ্যরচনা অতিশয় কঠিন। বাস্তবিক পদ্যের সুর ও ছন্দে সহজেই মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; কিন্তু গদ্য-লেখককে জ্ঞান ও তথ্য, যুক্তি ও তর্ক, এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হয় যে, রচনা নীরস না হইয়া রসপূর্ণ ও বিষয়ানুযায়ী প্রাঞ্জল বা গম্ভীর, করুণ বা ওজস্বিনী হয়। এই রসসৃষ্টিশক্তি ও লিপিকুশলতার অভাব বশতঃ অধিকাংশ গদ্য-লেখকই পাঠকের চিত্ত বিনোদনে ব্যর্থকাম হয়েন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিদেশীয় সাহিত্যের এই বিভাগেও বাঙ্গালী অভূতপূর্ব্ব সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুযুক্তিপূর্ণ রাজনীতিক প্রবন্ধাবলীর বিশুদ্ধ ভাষা, অপূর্ব্ব রচনা-নৈপুণ্য এক দিন শুধু ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডেও রাজনীতিকগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্রের ওজস্বিনী ভাষায় রচিত প্রবন্ধাবলী এক দিন য়ুরোপীয় মনীষিগণেরও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাঁহার সাগরগর্জ্জন সদৃশ ইংরাজী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কর্ণেল জর্জ্জ ব্রুস্ ম্যালিসনের ন্যায় প্রসিদ্ধ লেখক ও বাগ্মীও তাঁহার শক্তি ইংরাজ বক্তাদের আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ডিমস্থিনীস রামগোপালের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এক জন প্রসিদ্ধ ইংরাজ বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে সেই বক্তৃতা প্রদত্ত হইলে রামগোপাল 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রের সম্পাদক এবং বহু ইংরাজী গ্রন্থ ও সন্দর্ভের লেখক মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের রচনাও ইংরাজ বুধগণের প্রশংসালাভ করিয়াছিল এবং সার্ এশলি ইডেন প্রমুখ বহু ইংরাজ তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়া নীলকরগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিশুদ্ধ ইংরাজীতে রচিত গবেষণাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলী এক দিন য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের বিস্ময় ও ঈর্ষা উদ্রিক্ত করিয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ ইংরাজী সাহিত্য-জ্ঞান ও সমালোচনশক্তি মার্কুইস অব ডাফরিণের ন্যায় শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজের শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। লালবিহারী দের "গোবিন্দ সামন্ত" ও "বাঙ্গালার উপকথা" আজিও ইংলণ্ডে সমাদৃত। শশীচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্তের ইংরাজী গ্রন্থাবলী কোন্ ইংরাজ গ্রন্থকারের গ্রন্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট? কৃষ্ণদাস পাল ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষের ইংরাজী রচনাও কোনও ইংরাজ লেখকের রচনাপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে বাঙ্গালী মনীষীর জীবন ও রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,

সেই ভোলানাথ চন্দ্রও ইংরাজী গদ্য-রচনায় অপূর্ব্ব নৈপুণ্য, শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পল, গ্রাণ্ট ডফ্‌, উইলিয়াম হণ্টার, ট্যালবয়েস্ হুইলার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখকগণ তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'Travels of a Hindoo'র ন্যায় ভ্রমণবৃত্তান্ত-বিষয়ক পুস্তক অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তদ্বিরচিত 'রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিতে'র ন্যায় এতদ্দেশীয়

রমেশচন্দ্র দত্ত।

কর্ম্মবীরের জীবনীগ্রন্থ এখনও অধিক লিখিত হয় নাই। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে স্বদেশহিতৈষী ভোলানাথ চন্দ্র সাময়িক পত্রে যে সকল সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন, সেই সকল প্রতিভা-প্রোজ্জ্বল প্রবন্ধ আজিও আলোচনা করিলে উপকারের সম্ভাবনা আছে। যে যুগে ভোলানাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুগ আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ এবং ভোলানাথের জীবনী ও রচনাবলীর আলোচনা করিলে সেই যুগের ইতিহাসের অনেক অস্পষ্ট চিত্র আলোকিত হইয়া উঠে।

আমরা দীর্ঘ ভূমিকা না করিয়া মনীষী ভোলানাথের জীবনী ও রচনাবলীর আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও বংশবিবরণ।

সন ১২২৯ সালে (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) ১০ই আশ্বিন তারিখে—এক "শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত-রজনী"তে—১০ ঘটিকার সময় কলিকাতায় নিমতলা ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে ভোলানাথ জন্মগ্রহণ করেন।

নিম্নে প্রদত্ত বংশলতা হইতে ভোলানাথের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম অবগত হওয়া যায়:—

ভোলানাথের পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ কোনও বিবরণ জানিতে পারা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কে কবে প্রথম কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাহারও সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। কলিকাতা নগরী যখন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তখন অনেকেই বর্গীর হাঙ্গামা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কিংবা নূতন বাণিজ্য-কেন্দ্রে অর্থোপার্জ্জনের আশায় নানাস্থান হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিশ্বনাথ চন্দ্র বার্দ্ধক্যাবস্থায় এবং রাধাচরণ চন্দ্র প্রৌঢ়দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাধাচরণই সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় আগমন করেন। যদি রাধাচরণ অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফেরোক্‌শার নিকট হইতে নূতন ক্ষমতা

প্রাপ্ত হইয়া যখন ইংরাজগণ বাণিজ্যবিস্তার করিয়া কলিকাতাকে সমৃদ্ধিশালী করিতেছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার আগমন করা সম্ভব। যদি তিনি বর্গীর হাঙ্গামা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বর্গীদের আক্রমণকালে চন্দ্রমহাশয়গণের কলিকাতায় আসা সম্ভব। যাহা হউক, জব চার্ণক যে স্থানে ইংরাজপতাকা প্রথম উড্ডীন করেন, সেই পুরাতন সুতানটীতে তাঁহাদের বাসভবন নির্ম্মাণ করায় প্রতীয়মান হয় যে, কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই চন্দ্র মহাশয়গণ এই স্থানে আগমন করেন।

সঞ্চিত অর্থ দান করেন। পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন এবং কামারপাড়ায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণমোহনের ভবনে বাস করেন। কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইনি ইঁহার বিধবা স্ত্রীকে ১৫০০০৲ টাকা দিয়া যায়েন। এই সাধ্বী রমণী উহা হইতে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১০ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনযাত্রা করেন; কিন্তু পাটনা ও কাশীর মধ্যস্থলে পুণ্যসলিলা গঙ্গার বক্ষেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

রাধাচরণের পুত্র মাণিক চান্দ্রের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। মাণিক চন্দ্রের দুই পুত্র:—রামতনু এবং রামদুলাল।

রামতনু মথুরামোহন সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই ইনি কোনও প্রকারে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ইংরাজী প্রণালীতে হিসাব রক্ষা করিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সওদাগরের আফিস তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ হিসাবরক্ষকের সাহায্যপ্রার্থী হইত। এই কার্য্য দ্বারা তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিবেশী ও সমসাময়িক গৌর লাহাও এই উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। রামতনু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি দুর্গোৎসবে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল দরিদ্রসেবা। তিন দিন তিনি সকল প্রতিবেশী এবং দরিদ্রগণকে আহার করাইতেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আহিরীটোলায় নির্ম্মিত আবাসভবন বিক্রয় করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং সেই স্থানে অনেক বৎসর অতিবাহিত করেন ও মুক্তহস্তে পূর্ব্ব-

রাম শর্ম্মা (৺নবকৃষ্ণ ঘোষ)

ভোলানাথের পিতামহ রামদুলাল তাঁহার অগ্রজের ন্যায় চতুর ও কর্ম্মকুশল ছিলেন না। তিনি কাষ্টম হৌসে মূল্যনির্দ্ধারকের কার্য্য করিতেন। তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তদ্দারা ২ বিঘা জমী ক্রয় করিয়া ১০ কাঠার উপর একটি একতল আবাসভবন নির্ম্মিত করেন। তিনি বড়বাজারে এবং নিমু গোস্বামীর লেনেও এক খণ্ড ক্ষুদ্র জমী ক্রয় করেন। ইনি পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন এবং প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা করিতেন, তবে প্রতিমার পরিবর্ত্তে ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা হইত।

রামদুলালের সৌভাগ্যরবি শীঘ্রই অস্তমিত হয়। আহিরীটোলা ষ্ট্রীট এবং শঙ্কর হালদারের লেনের সন্ধিস্থলে অবস্থিত যে ভূমির উপর তিনি তাঁহার বাসভবন নির্ম্মাণ করেন, তাহা পূর্ব্বে হালদারবংশীয় এক ধনী ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল। ইঁহাদের দৈন্যদশায় ভূমিখণ্ড বিক্রীত হয়। লোক বলিত, এই ভূমিখণ্ড বড় 'অপয়া' এবং রামদুলালের বাটীটির 'ভূতের বাড়ী' অপবাদ রটিয়াছিল। গৃহসংলগ্ন ভূমিতে অনেকগুলি নারিকেল বৃক্ষ ছিল বলিয়া প্রতিবেশীরা উহার নাম দিয়াছিল "নারিকেলগাছওয়ালা বাড়ী।" প্রবাদ ছিল

যে, এই নারিকেল গাছের একটিতে এক অপদেবতা আছেন, তিনিই যত অনিষ্ট করেন। অনিষ্টের প্রথম সূত্রপাত হয়, ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে রামদুলাল অকালে কালকবলে পতিত হয়েন।

রামদুলাল চারি পুত্র রাখিয়া যায়েন। জ্যেষ্ঠ রামধন মথুরামোহন সেনের ভ্রাতা জগৎ সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। জগৎ সেন সেকালে ইংরাজীতে এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকাগারে অনেক বহুমূল্য ইংরাজী গ্রন্থ ছিল। রামধন অতি কোমল-প্রকৃতি ও অমায়িক লোক ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে অপদেবতার দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁতিপাড়ায় তাঁহার শ্যালক গঙ্গানারায়ণ সেনের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন।

রামদুলালের দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনই ভোলানাথের জনক। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কিংবা ১৮০২ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শান্ত, বিনয়ী এবং সাহিত্যানুরাগী বলিয়া অনেকের প্রশংসা লাভ করেন। সেকালে অনেক য়ুরোপীয় শিক্ষক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। এইরূপ কোনও বিদ্যালয়ে, বোধ হয়, ইঁহার শিক্ষালাভ হয়। অতি অল্পবয়সে, মাত্র ২১ বৎসর বয়সে, ১২২৯ সালে ভাদ্রমাসে নন্দোৎসবের দিন ইনি পরলোকে গমন করেন। ভোলানাথ তখন ৯ মাস মাতৃগর্ভে। রামমোহনের এই অকালমৃত্যু অপদেবতার জন্যই ঘটিয়াছে, পরিবারস্থ সকলেই এইরূপ মনে করিতেন; কিন্তু ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার স্থিরবিশ্বাস যে, বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার যে কারণ, তাহাই অর্থাৎ জমীর আর্দ্রতাই তাঁহাদের বাটীর অস্বাস্থ্যকর হইবার প্রধান কারণ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

জন্মিবার পূর্ব্বেই পিতৃহীন হওয়া যে কি দারুণ অভিশাপ, তাহা বলা যায় না। ভোলানাথ পিতৃ-স্নেহ কি, তাহা কখনও জানিতে পারেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী ভোলানাথ এই ঘটনার জন্য জীবনে কোন দিন অশান্তি ভোগ করেন নাই। তিনি এক স্থানে ইংরাজীতে লিখিয়াছেন :--

কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত এক রাক্ষসীর সাক্ষাৎ হয়। সে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার রাজশক্তির পরীক্ষা করে। তাহার একটি প্রশ্ন—"কে আকাশ হইতে উচ্চ?" রাজা উত্তর করেন,—"পিতা আকাশ হইতেও উচ্চ।" পৃথিবীতে এই পিতাকে জানিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। যখন আমি ৯ মাস মাতৃগর্ভে, তখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়—
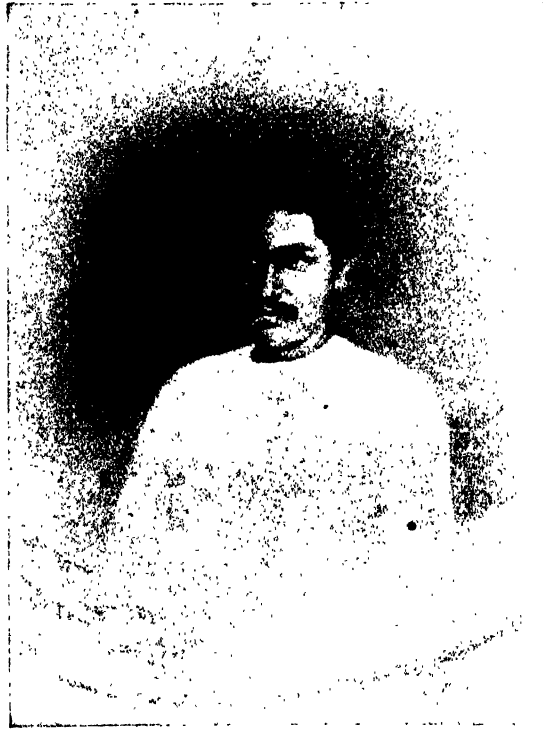
No one is born so wretched as he who loses his father before his days of self-help and moves in life's chartless main without the light of his father's morning star. But while he regrets buffeting in a sea of troubles, he gets hardened into a little hero. The hero of mind excels the hero of might. The man who in a lifelong struggle always overrides his privations, is a greater hero than the man who 'seeks the bubble reputation in the cannon's mouth.' The greatest of all herosim consists in scaling Himalayan difficulties of life and getting to the height of serene philosophic delight.

ভোলানাথের পিতৃকুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এইবার আমরা তাঁহার মাতুলকুলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ভোলানাথের জননী ব্রহ্মময়ী বৈষ্ণবচরণ সেন মহাশয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে প্রদত্ত বংশলতা হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নামের পরিচয় পাওয়া যায়।—

বৈষ্ণবচরণ সেন
|
জয়মণি সেন = গোপীমণি
|
মথুরামোহন সেন | জগৎ সেন | নিতাই সেন = রাইমণি | মদনমোহন
|
ব্রহ্মময়ী = রামমোহন চন্দ্র
|
ভোলানাথ চন্দ্র
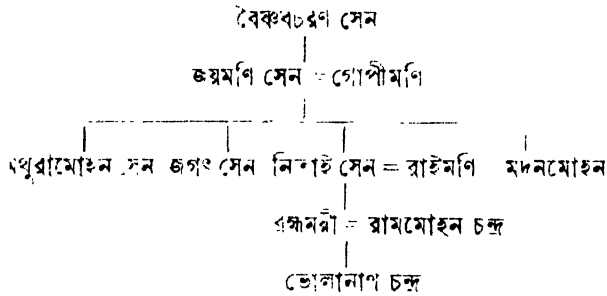
জয়মণি সেন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি নিমু গোস্বামীর লেনে একটি প্রাসাদোপম বাটী নির্ম্মাণ করেন, একটি 'ঠাকুরবাটী' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মৃত্যুকালে বিস্তৃত

[illegible]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

জমীদারী, প্রতিষ্ঠাপন্ন কারবার এবং নগদ চারি পাঁচ লক্ষ টাকা রাখিয়া যায়েন। তিনি চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা রাখিয়া যায়েন। ভোলানাথের মাতামহ নিতাইচরণ জয়মণির তৃতীয় পুত্র। নিতাইচরণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ স্বনামধন্য মথুরামোহন পরস্পরের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন এবং জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া উভয়েই যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মথুরামোহনের মহাজনী কারবার ছিল এবং অন্যান্য বাণিজ্য-ব্যবসায়েও তিনি টাকা খাটাইতেন। মথুরামোহন ও তদীয় ভ্রাতা নিতাইচরণ কিরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহার অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এক দিন বৈকালে কর্ম্মস্থল হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মথুরামোহন তাঁহার জননীকে বলেন, "মা, আজ আমি কোম্পানীর নীলামে ক্রীত ভায় হইতে ৮০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছি।" যশোহর জিলায় ইঁহাদের ৭টি নীলকুঠী ছিল। মথুরামোহনের ব্যাঙ্কের সেকালে অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল—কারণ, তখন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্কই ছিল না। কলিকাতায় ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল, বহু পরে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন মহাশয়রা নিমতলা রোডে গবর্ণমেণ্ট হাউসের আদর্শে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। অত্যুৎকৃষ্ট স্থাপত্যশিল্পের এরূপ সুন্দর নিদর্শন কলিকাতায় তৎকালে আর ছিল না।

প্রায় ছয় বিঘা জমীর উপর গৃহখানি নিম্মিত হয়। ১৮০৫-৬ খৃষ্টাব্দে উহার নিম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং তিন চারি বৎসর পরে উহা সমাপ্ত হয়। কথিত আছে, সেকালেও (যখন গৃহ-নিম্মাণের উপকরণাদি এত মহার্ঘ্য ছিল না) উক্ত গৃহ নিম্মিত করিতে সেন মহাশয়গণের ৩ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, উক্ত গৃহের চারিটি সিংহদ্বার গবর্ণমেণ্ট-হাউসের সিংহদ্বারের অনুরূপ ছিল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দেন! কিন্তু ইহার কোনও ভিত্তি নাই। কলিকাতায় সেনবংশ এই সময়ে মহাপ্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। উৎসবাদি উপলক্ষে ইঁহাদের গৃহে বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতি রাসেল প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজ কম্মচারিগণ উপস্থিত হইতেন। কোম্পানীর বাণিজ্য-কুঠীতে ইঁহারা অনেকে দেওয়ানের পদে বৃত হইয়াছিলেন। ভোলানাথের মাতামহ নিতাইচরণ ঢাকায় অবস্থিত কোম্পানীর রেসিডেন্সীর দেওয়ান হইয়াছিলেন।

মথুরামোহন সেকালে নিমাইচরণ মল্লিক ও রাজা সুখময় রায়ের ন্যায় প্রতিপত্তিশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তখন ইঁহারাই কলিকাতার শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ তখনও ইঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব মথুরামোহনের এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

মথুরামোহন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। মহা-সমারোহে ইঁহাদের পূজার দালানে দুর্গাপূজা হইত। ভোলানাথ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, যখন তাঁহার চারি বৎসর বয়স, তখন একবার পূজা দেখিতে গিয়াছিলেন, সে দিনের স্মৃতি ৭০ বৎসরেও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, দালানের সুন্দর খিলানগুলির স্মৃতি দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদ্ দেখিয়া পুনরায় তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। পূজার দালানে যে প্রকাণ্ড দীপাধার ছিল, সেরূপ দীপাধার গবর্ণমেণ্ট হাউস ব্যতীত আর কোথাও ছিল না।

ভোলানাথের মাতামহ নিতাইচরণ অতি অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। প্রথমে তাঁহার জ্বর হয়,—বিখ্যাত ডাক্তার নিকল্‌সন্ তাঁহার চিকিৎসা করেন। ভোলানাথ লিখিয়াছেন যে, সেকালে ইংরাজ চিকিৎসকগণ মনোযোগপূর্ব্বক দেশীয়গণের চিকিৎসা করিতেন না। এক দিন "ডাক্তার সাহেব" তাঁহাকে অন্ন পথ্য করিতে বলিলেন—সেই দিনই সন্ধ্যাকালে ৩৬ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্তর ঘটে!

ভোলানাথের মাতামহী রাইমণি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথোপকথন-প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে তিনি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন এবং উহার সরল ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি অবলীলাক্রমে পড়িতে পারিতেন। এক জন বৃদ্ধ পণ্ডিত বৈকালে আসিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। তিনি চিরদিন ন্যায়ের পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ সঙ্কল্পদার্ঢ্য কেবল ন্যায় ও যুক্তির নিকটে পরাভব স্বীকার করিত। ভোলানাথ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি মাতা বা মাতামহী কাহার নিকট চরিত্রগঠন সম্বন্ধে অধিকতর ঋণী, তাহা বলা কঠিন।

ভোলানাথের জননী ব্রহ্মময়ী পঞ্চদশবর্ষ বয়সে বিধবা হয়েন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভোলানাথ তখনও মাতৃগর্ভে। সেন মহাশয়গণের বাটীতে ব্রহ্মময়ী সর্ব্বপ্রথমে বিধবা হইলেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর ভোলানাথের জন্ম হইল, এই অশুভশংসী ঘটনাদ্বয়ের জন্য প্রাতঃকালে সেন-পরিবারস্থ মহিলাগণ ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখিতেন না। কিছুকাল ব্রহ্মময়ীকে এইজন্য তাঁহাদের ভবন-সংলগ্ন একটি পৃথক্ বাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই স্থানে ব্রহ্মময়ী কিছুদিন তাঁহার শিশু সন্তানকে লইয়া কালাতিপাত করেন। একাকিনী সময়াতিবাহিত করিবার পক্ষে পুস্তকপাঠই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। ব্রহ্মময়ী জননীর ন্যায় সংস্কৃত জানিতেন না, কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ অনুরাগিণী ছিলেন। ভোলানাথ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, বাল্যকালে যখন অসুস্থ হইয়া তিনি শয্যাগ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার স্নেহময়ী জননী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিতেন এবং সেই সকল পুণ্য-কাহিনী শ্রবণ করিয়া জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মময়ী রমণীয় গুণগ্রামের অধিকারিণী ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ের ও মনের সদ্‌গুণনিচয় তাঁহার পুত্র ভোলানাথে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তিয়াছিল। পুত্রের শিক্ষায় ও চরিত্রগঠনে তিনি

যে কতদূর মনোযোগ দিয়াছিলেন, জননীর মৃত্যুর পর তদীয় সতীর্থ ও প্রিয়বয়স্য গৌরদাস বসাক মহাশয়কে লিখিত মাতৃভক্ত ভোলানাথের একখানি পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

My mother, who was both my father and mother, is no more. * * * * I owe my little all to her. If death were not nature's inevitable grand ultimatum for all, I would not have known consolation. I never felt so lonely in my life

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

উদ্ভট-সাগর।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে 'মধ্যস্থ' মানা কর্ত্তব্য। মানুষ যতই শুচি ও গুণবান্ হউক না কেন, যদি তাহার স্বভাব অত্যন্ত লঘু হয়, তাহা হইলে তাহাকে কদাপি 'মধ্যস্থ' মানিতে নাই। তাহাকে 'মধ্যস্থ' মানিলেই পরিণামে বিপদ্ ঘটিবে। মাছ ধরিবার ফাৎনার উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন :—

প্রকৃতিলঘৌ মধ্যস্থে গুণিনি শুচাবপি ন বিশ্বাসঃ।
বোধয়তি বেধকালং ভাসিতরণ্ডো হি মীনস্য॥

মধ্যস্থ মানিতে যদি হয় প্রয়োজন,
বিশেষ বিচার তুমি করিও তখন।
যতই হউক্ লোক শুচি গুণী আর,
কিন্তু যদি দেখ লঘু স্বভাব তাহার,
কিছুতেই তারে নাহি করিও বিশ্বাস,
বিশ্বাস করিলে শেষে হবে সর্ব্বনাশ!
ফাৎনার মত আর কে আছে কোথায়
বিশ্বাস-ঘাতক হেন মধ্যস্থ ধরায়?
ফাৎনা পরম শুচি—জলে তার বাস,
বহুগুণে বিভূষিত রহে বারমাস;
কিন্তু অতি লঘু বলি' জলের ভিতর
কিছুতেই না ডুবিয়া ভাসে নিরন্তর।
মানুষ ধরিতে মাছ ব'সে আছে স্থলে,
খেলা করিতেছে মাছ জলে কুতূহলে।
টোপ ধরে গিয়া মাছ হায় রে যখন,
ত্যজিয়া তাহার পক্ষ ফাৎনা তখন,
সেই মানুষের পক্ষ করি' বলবান্,
ঘাড় নেড়ে ইষারায় বলে, "মার টান্!"

'বিদ্যুৎ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। তাই তাহাকে সম্বোধন করিয়া বর্ষাকালে কোন বিরহ-বিধুরা রমণী আক্ষেপ-পূর্ব্বক কহিতেছেন :—

বাতা বান্তু কদম্বরেণুশবলা নৃত্যন্তু সর্পদ্বিষঃ
সোৎসাহা নববারিগর্ভগুরবো মুঞ্চন্তু নাদং ঘনাঃ।
মগ্নাং কান্তবিয়োগশোকজলধৌ মাং বীক্ষ্য দীনাননাং
বিদ্যুৎ কিং স্ফুরসি ত্বমপ্যকরুণে স্ত্রীত্বে সমানে সতি॥

(বিদ্যাপতেঃ)

কদম্বের রেণু-যোগে নানা বর্ণযুত
পবন প্রবল-বেগে হোক্ প্রবাহিত।
সর্পোপরি যাহাদের বিদ্বেষ প্রবল,
নাচুক্ আহ্লাদে সেই ময়ূর সকল।
নব বারি গর্ভে ধরি' যত মেঘগণ
করুক্ উল্লাস-ভরে গভীর গর্জ্জন।
কিন্তু এই নিবেদন, ওলো সৌদামিনি!
তুমিও রমণী, আর আমিও রমণী।
নাথের বিরহে আমি হইয়া কাতর
শোক-সাগরেই মগ্ন আছি নিরন্তর;
দেখিয়াও তুমি মোর মলিন বদন
এত হাসি হাসিতেছ, বল কি কারণ!
এতই নিষ্ঠুর ওলো তোমার অন্তর,
নারী হ'য়ে দয়া নাই নারীর উপর!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর।

ঋগ্বেদ-বর্ণিত আর্য্যনারীর অবস্থা

১

বিশ্বামিত্র ঋষি ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলিয়াছেন :—"জায়েদস্তম্" অর্থাৎ "জায়াই গৃহ।" (৩৷৫৩৷৪) সায়ণাচার্য্য টীকায় বলিতেছেন—"জায়া ইৎ অস্তং গৃহং জায়ৈব গৃহম্।" তৎপরেই ঋষি বলিতেছেন :—"জায়াই সন্তানোৎপাদয়িত্রী।" অপর একটি মন্ত্রে তিনি ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন:—

"অপাঃ সোমমস্তমিন্দ্র প্র যাহি কল্যাণীর্জায়া
সুরণং গৃহে তে।" (৩৷৫৩৷৬)

অর্থাৎ, "হে ইন্দ্র, সোমপান কর, তৎপরে গৃহে গমন কর। তোমার গৃহে কল্যাণকারিণী জায়া ও সুন্দর ধ্বনি (সুরণং) আছে।" * সুন্দর ধ্বনির অর্থ, স্ত্রীর সুমধুর বাক্য ও শিশুগণের আনন্দময় কোলাহল।

উদ্ধৃত মন্ত্রে প্রাচীন আর্য্যগণের সুখময় গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। একমাত্র জায়াই সুখময় গার্হস্থ্য-জীবনের কেন্দ্রস্থানীয়। গার্হস্থ্য-জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা, পূর্ণতা ও পবিত্রতা একমাত্র জায়ার উপরেই নির্ভর করে। পরবর্ত্তী কালে স্মৃতিকার এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

গৃহকে গৃহ বলে না; গৃহিনীই গৃহ। অরণ্যের বৃক্ষতলই হউক, আর রাজপ্রাসাদই হউক, কিংবা সামান্য পর্ণকুটীরই হউক, যে স্থানে গৃহিণী বিদ্যমান, তাহাই গৃহ।

নীতিলেখক বলিয়াছেন :—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চ প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥

অর্থাৎ যাঁহার গৃহে মাতা ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা নাই, তাঁহার অরণ্যেই গমন করা উচিত। কেন না, তাঁহার পক্ষে গৃহও যেরূপ, অরণ্যও তদ্রূপ।

ঋগ্বেদ-রচনার সেই প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আর্য্য-সমাজে গৃহ ও জায়া সম্বন্ধে এই একই ভাব ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে।

বাস্তবিক, পবিত্র দাম্পত্য-প্রেমই গার্হস্থ্য-জীবনের একমাত্র উপাদান। স্ত্রী স্বামীর প্রতি এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত না থাকিলে, গার্হস্থ্য-জীবন, তথা সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনেরও কোনও প্রকার উন্নতি-সাধন হয় না। প্রাচীন আর্য্যগণ এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া নারীকে সমাজে উচ্চ স্থান ও উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে আর্য্য-নারীর কিরূপ চিত্র আছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করিব।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে শ্বশুর-গৃহে নবপরিণীতা বধূর স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল। ঋগ্বেদে নবোঢ়া বধূর প্রতি নিম্নলিখিত উক্তি আছে :—

পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি॥
ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সংসৃজস্বাধিজিব্রী বিদথমা বদাথঃ॥

(ঋগ্বেদ ১০.৮৫।২৬,২৭)

উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ এইরূপ :—"পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়া এই স্থান হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর।

"এই স্থানে সন্তান-সন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতি বর্দ্ধন করুক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর। বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজগৃহে প্রভুত্ব কর।"

স্বামী বধূকে বলিতেছেন :—

গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥

(ঐ, ১০।৮৫।৩৬)

* রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ। এই প্রবন্ধে যে সমস্ত মন্ত্রের অনুবাদ দেওয়া হইল, তাহার অধিকাংশ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কৃত।

ইহার অর্থ এইরূপ :—"তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি। আমাকে পতি পাইয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি। ভগ ও অর্যমা ও অতি বদান্য সবিতা, এই সকল দেবতা আমার সহিত গৃহকার্য্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।"

আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি রাজরসায় সমনক্তর্য্যমা।
অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥
(ঐ, ১০।৮৫।৪৩)

"প্রজাপতি আমাদিগের সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন; অর্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধূ, তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের দাস-দাসী এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল-বিধান কর।"

অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।
বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।

"তোমার চক্ষু যেন দোষ-শূন্য হয়। তুমি পতির কল্যাণকরী হও, পশুদিগের মঙ্গলকারিণী হও। তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্র-প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি ভক্ত হও। আমাদিগের দাস-দাসী এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল-বিধান কর।"

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননন্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।
(ঐ ১০।৮৫।৪৬)

"তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় হও।"

ইহার অর্থ এই যে, বধূ এরূপ কল্যাণী হউন, তাঁহার জীবন ও চরিত্র এরূপ পবিত্র হউক, তাঁহার মন এরূপ উদার ও মার্জ্জিত হউক, গুরুজনের প্রতি তিনি এরূপ ভক্তিমতী ও বয়ঃকনিষ্ঠগণের প্রতি এরূপ স্নেহশীলা হউন, যেন শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননদ, দেবর ও দাস-দাসী সকলেই তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে যথাক্রমে স্নেহ, সম্মান ও ভক্তি করেন। যাঁহাকে সকলেই স্নেহ করে, সম্মান করে ও ভক্তি করে, প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনিই তাঁহাদের হৃদয়-রাজ্যে আধিপত্যস্থাপন করিয়া সম্রাট্ বা সম্রাজ্ঞীর ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন।

এই সমস্ত উক্তির পর বর-বধূর যুক্ত প্রার্থনা এইরূপ :—

সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥
(ঐ ১০।৮৫।৪৭)

"তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন। বায়ু ও ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন।"

উদ্ধৃত মন্ত্র সমূহে পবিত্র গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম ও গৃহে বধূর পদমর্য্যাদার কি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে! প্রাচীনকালে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের আদর্শ এরূপ উচ্চ, দাম্পত্য-প্রেম এরূপ পবিত্র এবং নারী এরূপ সম্মানিত না হইলে, আর্য্য সমাজ কদাপি উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিত না। সেই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়াই আমরা আজ এইরূপ অধঃপতিত ও হীন হইয়াছি।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে কন্যাদের যে অল্পবয়সে বিবাহ হইত না এবং বালিকা-বধূদের সংখ্যা যে অতীব বিরল ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাপ্ত-যৌবনা না হইলে, কন্যাদের বিবাহের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপিত হইত না। বিবাহের পর তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশ্বাবসুর উদ্দেশে যে মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হইত, তাহাদের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"হে বিশ্বাবসু, এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু, এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নমস্কার ও স্তব দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃ-গৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা (পিতৃপদং ব্যক্তাং) হইয়া আছে, তাহার নিকট গমন কর। সেই তোমার ভাগ-স্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হও।

"হে বিশ্বাবসু, এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কার দ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও। তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামিসংসর্গিনী করিয়া দাও।" (১০।৮৫।২১,২২)

উদ্ধৃত অনুবাদের উপর টীকা অনাবশ্যক। * মূলে

* বিবাহের পর চতুর্থ দিবসে গর্ভাধানের ব্যবস্থা ছিল এবং তজ্জন্য "বাস্তু-সমস্ত হোমে"র অনুষ্ঠান করিতে হইত।

"পিতৃপদং ব্যক্তাং" এই স্বল্পাক্ষর বাক্যেই কন্যার দৈহিক বিকাশের অবস্থা সুন্দররূপে সূচিত হইয়াছে।

কন্যাদের পিতামাতা বা অভিভাবকগণ সম্ভবতঃ অনেক সময়ে তাহাদের উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। কিন্তু কন্যারাও যে সময়ে সময়ে তাঁহাদের মনোমত পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইতেন, ঋগ্বেদে তাহারও প্রমাণ আছে। কোনও কোনও যুবতী অর্থলোভে ধনবান্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হইতেন; কিন্তু ঋগ্বেদে তাঁহাদের নিন্দা আছে। একটি মন্ত্র এইরূপ:—

কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্য্যেণ।
ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনেচিৎ॥
(১০।২৭।১২)

"কত স্ত্রীলোক আছে যে, কেবল অর্থেই প্রীত হইয়া নারী সংবাসে অভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়? যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর সুগঠন, সেই অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয়পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে।" *

প্রেমের জন্যই বিবাহ—বিবাহ নামের যোগ্য, এবং অর্থের লোভে বিবাহ নিন্দনীয়, ঋষি উদ্ধৃত ঋকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

মনোনয়ন-প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া, সম্ভবতঃ অনেক স্ত্রীলোকের বিবাহ হইত না। হয় ত কোনও স্ত্রীলোক মনোমত বরলাভে অসমর্থা হইতেন; কিংবা কোনও বিবাহার্থী ব্যক্তি হয় ত তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইতেন না। এরূপ স্থলে, সেই উপেক্ষিতা অথবা বিবাহ করিতে অনভিলাষিণী নারী আজীবন অনূঢ়া থাকিতে বাধ্য হইতেন। অন্ধ কন্যাদেরও সহজে বিবাহ হইত না। একটি মন্ত্র এইরূপ:—

যস্যানক্ষা দুহিতা জাত্বাস কস্তাং বিদ্বাঁ অভিমন্যতে অন্ধাম্।
কতরো মেনিং প্রতি তং মুচাতে য ঈং বহাতে
য ঈং বা বরেয়াৎ॥
(১০।২৭।১১)

"যাহার চক্ষুর্বিহীন কন্যা কখন ছিল, কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই অন্ধ কন্যাকে আশ্রয় দান করে? যে ইহাকে বহন করে (লইয়া যায়), যে ইহাকে বরণ করে, কে-ই বা তাহার প্রতি বর্ষাক্ষেপ করে?"

ইহার ভাবার্থ এই যে, অন্ধ কন্যাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহে না। কিন্তু কোনও অযোগ্য ব্যক্তিও যদি তাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে, কাহারও ক্ষোভের কারণ থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে যে সকল নারী অনূঢ়া থাকিতে বাধ্য হইতেন, বর্ত্তমান কালের কুলীনকন্যাগণের ন্যায় তাঁহারা পিতৃগৃহেই জীবন যাপন করিতেন। এরূপ স্থলে, পিতৃকুল হইতেই তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হইত। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়:—

অমাজূরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানাদা সদসস্ত্বামিয়ে ভগম্।
ইত্যাদি।

(২।১৭।৭)

"হে ইন্দ্র, যাবজ্জীবন পিতামাতার সহিত অবস্থিতা দুহিতা যেমন আপনার পিতৃকুল হইতে ভাগ প্রার্থনা করে, সেইরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করি।"

সায়ণাচার্য্য উক্ত ঋকের টীকায় বলিয়াছেন:—"পতিমলভমানা সতী দুহিতা সমানাৎ আত্মনঃ পিত্রোশ্চ সাধারণাৎ সদসঃ গৃহাৎ * * * যথা ভাগং যাচতে।" অর্থাৎ পতিলাভে অসমর্থা দুহিতা নিজ ভরণপোষণের নিমিত্ত পিতৃ-সম্পত্তির অংশ প্রার্থনা করিতেন।

পিতৃগৃহে অবস্থিতা অনূঢ়া ভগিনীদিগকে পৈতৃক ধনের অংশ প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকায়, ভ্রাতৃগণ সহোদরাগণের যথাসময়ে বিবাহ দিবার জন্য স্বভাবতঃই ব্যাকুল ও উৎসুক হইতেন। কেন না, ভগিনীদের বিবাহ হইয়া গেলে, পৈতৃক-সম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না এবং কাহারও ভরণ-পোষণেরও কষ্ট হইত না। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ:—

"ঔরসপুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন দেন না। তিনি উহাকে ভর্ত্তার প্রণয়ের আধার করেন। যদি পিতামাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে এক জন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া-কর্ম্ম করেন এবং অন্য জন সম্মানিত হয়েন।" (৩।৩১।২)

কন্যার স্বয়ংবরা হওয়ার প্রথা বিদ্যমান থাকায়, কি জানি সে মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ না হয়, কিংবা

* ঋগ্বেদে অযোগ্য বা গুণহীন জামাতা কন্যালাভের জন্য কন্যা-কর্ত্তাকে অনেক ধন দান করিতেন, তাহার উল্লেখ দেখা যায়। (১।১০৯।২) সায়ণের টীকা দেখুন।

বিবাহেচ্ছু কোনও ব্যক্তি তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত না হয় এবং এইরূপ অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার উপস্থিত হইলে, কি জানি অনূঢ়া ভগিনীকে আজীবন প্রতিপালন করিতে হয় ও পৈতৃক ধনের অংশ দিতে হয়—এইরূপ একটি আশঙ্কা-বশতঃই কি প্রাচীন আর্য্য-সমাজ হইতে কন্যাদের যৌবন-বিবাহ-প্রথা ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়াছিল? উদ্ধৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া এইরূপ অনুমান নিতান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না। যে বয়সে কন্যা স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারে, সেই বয়স প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহাকে "পাত্রস্থা" করিয়া উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিলেই যেন তাহার পিতামাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপেই আর্য্য-সমাজে কন্যাদের বাল্য-বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য, ইহার সহিত অন্যান্য কারণেরও সংযোগ ছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কাও যে একটি প্রধান কারণ, তাহা উদ্ধৃত মন্ত্রের অনুবাদ পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে।

পুত্রহীনা বিধবা নারী স্বামীর ধন নিজ অধিকারবলে গ্রহণ করিতেন, তাহার উল্লেখ ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। (১০।১০২।১১)

পিতামাতা সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করিতেন। (ঋগ্বেদ ৯।৪৬।২ ; ১০।৩৯।১৪) বিবাহের সময় কন্যাকে ও জামাতাকে অবস্থানুসারে বিবিধ যৌতুক ও উপঢৌকন প্রদান করা হইত। ভ্রাতাও ভগিনীকে বহু ধন দান করিতেন। (১।১০৯।২) উপঢৌকনের দ্রব্যগুলি কন্যার রথের অগ্রে অগ্রে বাহিত হইয়া যাইত। গাভীও উপঢৌকনের অঙ্গ ছিল। (১০।৮৫।১৩) এই প্রথা বর্ত্তমান সময়ের প্রথারই প্রায় অনুরূপ ছিল। বর নানা প্রকার অলঙ্কার ধারণ ও সাজসজ্জা করিয়া বিবাহ করিতে যাইতেন। (৫।৬০।৪ ; ১০।৭৮।৭)

অপুত্রক পিতা কন্যার প্রথম পুত্রটিকে নিজ পুত্র বা পৌত্র-রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই পুত্রই পরবর্ত্তী সময়ে "পুত্রিকা-পুত্র" নামে অভিহিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে এইরূপ দৌহিত্র পৌত্ররূপে গণ্য হইত বলিয়া উল্লেখ আছে। একটি মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ :—

"পুত্রহীন পিতা সমর্থ জামাতাকে সম্মানিত করতঃ শাস্ত্রানুশাসনক্রমে দুহিতা-জাত পৌত্র প্রাপ্ত হয়েন। অপুত্র পিতা দুহিতার গর্ভ হইতে বিশ্বাস করতঃ প্রসন্ন মনে শরীর ধারণ করেন।" (৩।৩১।১)

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার টীকায় বলিয়াছেন :—

"পূর্ব্বকালে পুত্র না হইলে, কন্যার বিবাহ দিবার সময় জামাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইত যে, ঐ কন্যার পুত্র কন্যার পিতার হইবে এবং দৌহিত্র হইয়াও পৌত্রের কার্য্য করিবে।"

বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও আর্য্যগণের পুত্র-লাভের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল ছিল। পিতৃগণের সুখ-সাধনই এই আকাঙ্ক্ষার প্রধান কারণ ছিল। একটি মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ :—

"হে দেবগণ, স্বর্গস্থ আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যেন স্বর্গচ্যুত না হয়েন; আমরা যেন কদাচন সোমপায়ী পিতৃগণের সুখহেতু পুত্র হইতে নৈরাশ্য প্রাপ্ত না হই।" (১।১০৫।৩)

ঔরস-জাত পুত্রের অভাবে কখন কখন অপরের পুত্রকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করা হইত। দুইটি মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ :—

"হে অগ্নি, যেন অপত্য অন্যজাত না হয়। অবেত্তার পথ জানিও না।

"অন্যজাত পুত্র সুখকর হইলেও, তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে অথবা মনে করিতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানে গমন করে। অতএব অন্নবান্, শত্রুনাশক, নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আগমন করুক।" (৭।৪।৭,৮)

ঋষিগণেরও পুত্রবাসনা কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা নিম্নো-দ্ধৃত মন্ত্রের অনুবাদে জানা যায় :—

"হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে এরূপ একটি পুত্রস্বরূপ ধন দান কর, যে স্তোত্ররত ও দেবভক্ত হয়, যে প্রকাণ্ডমূর্ত্তি, বিশালকায়, গম্ভীরবুদ্ধি, সুপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী, শত্রুদমনক্ষম ও প্রিয়দর্শন হয়।" (১০।৪৭।৩) *

অত্রির অপত্য দ্যুম্ন ঋষিও দুইটি মন্ত্রে বীরপুত্রলাভের জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

"হে অগ্নি, যে পুত্র পরাক্রম দ্বারা যুদ্ধে সকল লোককে পরাজিত করিয়া গৌরবলাভ করিবে, তুমি দ্যুম্নকে এরূপ একটি চক্রবিজয়ী পুত্র প্রদান কর।

"হে পরাক্রান্ত অগ্নি, তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্ভুত, গোদাতা ও

* মূল মন্ত্র এইরূপ :—সুব্রহ্মাণং দেববন্তং বৃহন্তমরুং গভীরং পৃথুবুধ্নমিন্দ্র। শ্রুত ঋষিমুগ্রমভিমাতিষাহমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িন্দা। (১০।৪৭।৩)

অন্নদাতা ; তুমি এরূপ একটি পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র সৈন্য-পরাজয়ে সমর্থ।” (৫।২৩।১,২)

প্রয়োজন হইলে, ঋষিগণও আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেন। ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার কালে, সপ্তসিন্ধু প্রদেশে দস্যুগণের ভয়ানক উপদ্রব ছিল। সুতরাং ঋষিগণেরও পক্ষে বীরপুত্রলাভের জন্য প্রার্থনা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক ছিল না।

ঋগ্বেদে গার্হস্থ্য-জীবনের সুখময় চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পিতামাতা সন্তানগণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। (১০।১০৬।৪) পুত্ররাও জনক-জননীর প্রতি ভক্তিমান্ ছিল। শিশুগণ দেবশিশুর ন্যায় শুভ্র ছিল (৭।৫৬।১৬) এবং ক্রীড়াসক্ত হইয়া আনন্দ-কোলাহলে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিত। একটি মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—“ক্রীড়াসক্ত শিশুরা ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত করিয়া ঠেলিয়া দিয়া শব্দ করিতেছে।” (১০।৯৪।১৪) শিশুরা আগার ভুলিয়া ক্রীড়াস্থলে ক্রীড়া করিতে মত্ত হইয়াছে। জননী তাহাদিগকে ডাকিতে গিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ক্রীড়ায় এরূপ উন্মত্ত যে, জননীর আহ্বান কর্ণে শুনিতেছে না। জননী তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করাতে, তাহারা তাঁহাকে আঘাত করিয়া ঠেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার শব্দ করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। চিত্রটি কেমন সুন্দর! আর একটি শিশু বহুক্ষণ জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া কোথায় ক্রীড়া করিতেছিল। জননীর স্তন পীযূষপূর্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি শিশুর জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এমন সময়ে শিশু ক্ষুধা অনুভব করিয়া জননীর নিকট উপস্থিত। জননীর আনন্দের পরিসীমা নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ স্নেহের পুত্তলকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্যপান করাইতে বসিয়া গেলেন। মাতৃস্নেহের কি চমৎকার চিত্র! (৯।৬১।১৪) ধনসম্পত্তি, সুবর্ণ, ঘোটক, গাভী, যব ও সন্তান-সন্ততিই সংসার-সুখের প্রধান উপকরণ ছিল, এবং ঋষিগণ দেবতাগণের নিকট সর্ব্বদাই এই সকলের জন্য প্রার্থনা করিতেন। (৯।৬৯।৮)

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে লোক সাধারণতঃ একাধিক দার-পরিগ্রহ করিত না। কিন্তু ধনবান্ ব্যক্তিগণ ও রাজগণ ইচ্ছা করিলে বহুজায়াও গ্রহণ করিতে পারিতেন। (৭।১৮।২; ১০।৯৫।৬) যেখানে বহুজায়া, সেখানে সপত্নীকলহ অনিবার্য্য। (১।১০৫।৮) স্বামীর প্রিয়তমা হওয়ার জন্য, সপত্নী-পীড়ন-মন্ত্রও ছিল। এইরূপ কতিপয় মন্ত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

“এই যে তীব্র-শক্তিযুক্ত লতা, ইহা ওষধি, ইহা আমি খনন পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিতেছি; ইহার দ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়; ইহার দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।

“হে ওষধি, তোমার পত্র উন্নতমুখ; তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায়স্বরূপ; দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমার তেজঃ অতীব তীব্র; তুমি আমার সপত্নীকে দূর করিয়া দাও; যাহাতে আমার স্বামী আমারই বশীভূত থাকেন, তাহা তুমি করিয়া দাও।

“হে ওষধি, তুমি প্রধান; আমি যেন প্রধান হই, প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হইয়া থাকে।

“সেই সপত্নীর নাম পর্য্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপ্রিয়; দূর অপেক্ষা আরও দূরে আমি সপত্নীকে পাঠাইয়া দিই।

“হে ওষধি, তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা; আমারও ক্ষমতা আছে; এস, আমরা উভয়ে ক্ষমতাপন্ন হইয়া সপত্নীকে হীনবল করি।

“হে পতি, এই ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখিলাম। সেই শক্তিযুক্ত উপাধান তোমার মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয়।” (১০।১৪৫ সূক্ত)

উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহের অনুবাদে রমণী-হৃদয়ের কি গভীর ব্যথা ও দুরবস্থাই না পরিব্যক্ত হইতেছে! রমণী স্বামীর প্রেমের ষোল আনাই দাবী করিয়া থাকেন; কাহাকেও সেই প্রেমের অংশভাগিনী করিতে তিনি কখনও প্রস্তুত নহেন। কিন্তু নিষ্ঠুর দেশাচার তাঁহাকে অংশ দিতে বাধ্য করিলে, তাঁহার মন এরূপ ক্ষুব্ধ, সঙ্কীর্ণ, নীচ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার রমণী-সুলভ সরলতা, পবিত্রতা ও উদারতা বিনষ্ট হইয়া যায়। যে মানব বহু-বিবাহপাপে লিপ্ত, সে আপনার আত্মার অধোগতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে পত্নীগণেরও আত্মার অধোগতিসাধন করিয়া থাকে। এই ঘৃণিত প্রথা সমাজের পক্ষে যে একান্ত অমঙ্গলকর, নারীগণের দুর্গতি-সাধক ও গার্হস্থ্য-সুখের একান্ত পরিপন্থী, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন আর্য্য-সমাজে এই প্রথা কেবল রাজাদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; জনসাধারণের মধ্যে ইহা

তেমন প্রচলিত ছিল না। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসমূহের ঋষি স্বয়ং ইন্দ্রাণী। এই ইন্দ্রাণী কি ইন্দ্র-পত্নী শচী? বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রের গার্হস্থ্য-সুখের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে এই ইন্দ্রাণীকে ইন্দ্রপত্নী শচী বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ ইনি ইন্দ্রাণী-নাম্নী কোনও স্ত্রী-ঋষি ছিলেন। কোনও সাপত্ন্য-দুঃখ-পীড়িতা পরিচিতা মহিলার দুঃখ-নিবারণের জন্যই তিনি উক্ত মন্ত্রগুলি রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যদ্দ্বারা একের সুখ-সাধন, তদ্দ্বারা অপরের দুঃখ-বিধানও হইত।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে বর্ত্তমানকালের ন্যায় স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথা বিদ্যমান ছিল না। মহিলারা বস্ত্রে সংবৃত হইয়া, অর্থাৎ আধুনিক ওড়নার ন্যায় বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া, বাহিরে গমন করিতেন। (৮।১৭।৭) বধূও বস্ত্রে আবৃতা থাকিতেন (৮।২৬।১৩)। নারীগণ পুষ্পচয়নার্থ পর্ব্বতে আরোহণ করিতেন, তাহার উল্লেখ দেখা যায়। (১।৫৬।২) সোমযাগের সময় সাতটি স্ত্রীলোক সোমরস নিষ্পীড়ন করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাহা চালনা করিতে করিতে সোম-বিষয়ক গান গাহিতেন। (৯।৬৬।৮) ভদ্র মহিলারা নৃত্য করিতেন কি না, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আধুনিক কালের ন্যায় সেই প্রাচীনকালেও নৃত্য-গীত-ব্যবসায়িনী "নর্ত্তকী" (নৃত্ত) ছিল। একটি মন্ত্র এইরূপ :—

"অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে
বক্ষ উস্রেব বর্জহম্‌। ইত্যাদি (১।৯২।৪)

ইহার অর্থ এইরূপ :- "উষা নর্ত্তকীর ন্যায় (নৃত্যন্তী যোষিদিব) রূপপ্রকাশ করিতেছেন, এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় উধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন।"

দুহিতারা সাধারণতঃ গাভীসমূহের দুগ্ধ-দোহন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই কারণেই তাঁহাদের নাম "দুহিতা" হইয়াছিল। রমণীগণ গৃহে বস্ত্র বয়ন করিতেন (২।৩।৬; ২।৩৮।৪১) এবং বস্ত্র বয়নের উপকরণ সূত্রাদিও প্রস্তুত করিতেন। সাধারণতঃ মেষলোম হইতে সূত্র প্রস্তুত হইত, এবং সেই সূত্রে বস্ত্রবয়ন হইত। (১০।২৬।৬) প্রাচীন সপ্তসিন্ধু বা পঞ্চনদ প্রদেশে, ঋগ্বেদের মন্ত্ররচণার কালে, শীতের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল। ঋগ্বেদে বৎসরের নাম "হিম" ছিল। (১।৬৪।১০; ২।১।১১; ২।৩২।২; ৫।৫৩।১৫ ইত্যাদি) এই কারণে, সেই সময়ে সকলের পক্ষে পশমী বস্ত্রের ব্যবহারই একান্ত উপযোগী ছিল। ঋগ্বেদে বহু মূল্যবান্ বস্ত্রেরও উল্লেখ দেখা যায়। (৬।৪৭।২৩)

সূত্রকর্ত্তন ও বস্ত্রবয়ন ব্যতীত, রমণীগণ আরও যাবতীয় গৃহস্থালী কার্য্য সম্পাদন করিতেন। শস্যের মধ্যে যবই প্রধান ছিল। (১০।১৩১।২) ঋগ্বেদে ধান্যেরও উল্লেখ দেখা যায় (১।১৬।২; ১০।৯৪।১৩) তাঁহারা যবভর্জ্জন করিয়া তাহা হইতে শক্তু বা ছাতু ও করম্ভ প্রস্তুত করিতেন। সম্ভবতঃ ধান্য হইতে তাঁহাদিগকে চাউলও প্রস্তুত করিতে হইত। যবভর্জ্জন করা কোনও কোনও রমণীর বৃত্তি ছিল। একটি মন্ত্র এইরূপ :—"দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র-চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যবভর্জ্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি।" (৯।১১২।৩) গৃহে গৃহে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উদূখল-মুসল ছিল। (১।২৮।৫) তদ্দ্বারা সোমরস নিষ্পীড়িত হইত। ধান্য, যব প্রভৃতি শস্যও সম্ভবতঃ তাহাদের সাহায্যেই ছাঁটা হইত। রমণীগণ কুম্ভপূর্ণ করিয়া জল লইয়া যাইতেন। (১।১৯১।১৪)

স্ত্রীলোকরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান, নানাবিধ মূল্যবান্ অলঙ্কার ধারণ ও উত্তম বেশভূষা করিতে ভালবাসিতেন। "সুবাসা" অর্থাৎ উত্তম-পরিচ্ছদধারিণী রমণীর উল্লেখ দেখা যায়। (১০।১০৭।৯) যুবতীগণ প্রসাধনসময়ে মস্তকে চারিটি বেণী ধারণ করিতেন; (১০।১১৪।৩) এবং বনিতারা বেশভূষা করিয়া পতিগণের নিকট নিজ নিজ দেহ প্রকাশ করিতেন। (৪।৫৮।৯; ১০।১১০।৫) তাঁহাদের অলঙ্কারের মধ্যে সুবর্ণময় হার, রুক্ম (বক্ষঃস্থলের স্বর্ণালঙ্কার), খাদি (বলয়), কর্ণাভরণ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। (৭।৪৬।১৯; ৭।৫৭।৩; ৮।৭৮।৩; ৮।২০।২১ প্রভৃতি)। পুরুষরাও খাদি, কর্ণাভরণ, কনকময় কবচ (অৎক, ৫।৫৫।৬), কিরীট (৫।৫৯।৩) প্রভৃতি ধারণ করিতেন। তবে স্ত্রী ও পুরুষগণের অলঙ্কারসমূহের গঠনের তারতম্য অবশ্যই ছিল। ঋগ্বেদে স্বর্ণকারের উল্লেখ দেখা যায়। (নিষ্কং কৃণবতে ৮।৪৭।১৫)। নিষ্ক-আভরণ-নির্ম্মাতা যে স্বর্ণকার ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ যেরূপ বর্ত্তমানকালে দেখা যায়, প্রাচীনকালেও তদ্রূপ ছিল। একটি মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ :—

"প্রণয়বতী রমণী যেরূপ রূপাভিলাষী পুরুষকে বশীভূত করে, সেইরূপ ইন্দ্র মনুষ্যগণকে বশীভূত করেন;" (৮।৬২।৯)

ঋষিগণও সৌন্দর্য্যের মোহ অতিক্রম করিতে পারিতেন না। নিম্নলিখিত অদ্ভুত মন্ত্রগুলির অনুবাদ পাঠ করুন :—

"পূষানামক যে দেবতা, যিনি ছাগবাহনে গমন করেন, যখন যখন আমরা যাত্রা করি, তিনি যেন তখনই আমাদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহার প্রসাদে আমরা যেন সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই।

"কপর্দ্দীনামক যে দেবতা, তাঁহার উদ্দেশে এই সোমরস ঘৃতের ন্যায়, মধুর ন্যায় ক্ষরিত হইতেছে। আমরা যেন অনেকসংখ্যক সুশ্রী নারী লাভ করি।

"হে তেজঃপুঞ্জ, তোমার নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হইয়া, ঘৃতের ন্যায় নির্ম্মলভাবে এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছে। আমরা যেন বহুসংখ্যক সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই।" (৯।৬৭।১০-১২)

উদ্ধৃত অনুবাদের শেষোক্ত পদের মূলটি এইরূপ :—

আ ভক্ষৎকন্যাসু নঃ।

সায়ণাচার্য্য ইহার টীকায় লিখিয়াছেন :—"কিঞ্চ কনীসু কমনীয়াসু অভিমতাসু স্ত্রীষু নোঽস্মানাভক্ষৎ আভজতাম্। অস্মাকং কন্যাঃ প্রযচ্ছত্বিতার্থঃ।" উইল্‌সন্ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন :—May he bestow maidens on us.

উপরি-উক্ত ৬৭ সূক্তের ঋষি ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ ও পবিত্র। এই সূক্তের দেবতা পবমান সোম। সোমরসপানে একটু উন্মত্ততা জন্মিত। (৯।৬৮।৩ ; ৯।৬৯।৩,৬)।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

যুদ্ধ ও শান্তি

বঙ্কিমচন্দ্র।

২

এখন দেখিতেছি, লোকে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে এই সব টুকী-টাকী গল্প অনেক চায়। অনেকেই সংগ্রহ করিতেছেন এবং সংগ্রহ করিবেন। এগুলি সংগ্রহ করা খুব ভাল। ইহাতে বঙ্কিমবাবুর চরিত্রের অনেক কথা বুঝিতে পারা যায়। অন্যান্য লেখকের মত বঙ্কিমবাবু নিজের জীবনী লিখিয়া যান নাই, সুতরাং সে ভার বাঙ্গালীর উপর দেওয়া আছে। এই বেলা সে সমস্ত সংগ্রহ না হইলে, সংগ্রহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। পূর্ণবাবু এখনও বাঁচিয়া আছেন, তিনি অনেক কথা বলিতে পারিবেন, শ্রীমান্ জ্যোতিশ্চন্দ্র অনেক কথা বলিতে পারিবেন, শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র অনেক কথা বলিতে পারিবেন। কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় উচ্চ সমাজে খুব মিশিয়াছিলেন, অনেক বড়লোক তাঁহার বাড়ী যাইতেন, তিনিও অনেকের বাড়ী যাইতেন। যতদিন বাহিরে ছিলেন, সভা-সমিতিতে বড় যাইতেন না; কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া অনেক সভায় যাইতেন। তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর ফেলো হইয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট হাউসের গার্ডেনপার্টি ও ইভনীংপার্টিতে যাইতেন; কিন্তু তাঁহার লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল, University Institute তখন Society for the Higher Training of Young men। * তিনি প্রথম যে দিন সেখানে গিয়াছিলেন, সে দিন এত ভিড় হইয়াছিল যে, উহার প্রকাণ্ড হ'লেও লোক ধরে নাই। অনেকে দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, তাঁহার চেহারাও দেখিতে পায় নাই। তিনি শেষ Higher Trainingএ বেদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। Higher Training তখন খুব জমকাইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজী ১৮৯১ সালে তাঁহারই প্রবর্তনায় ইউনিভারসিটীর পরীক্ষায় বাঙ্গালা বেশী পরিমাণে চালাইবার চেষ্টা হয়। আমি ও সার আশুতোষ তাঁহার সহায় হই, আশুতোষের নামে Motion দেওয়া হয়। এমন কি, চেষ্টা হইয়াছিল, বাঙ্গালায় যাহাতে M. A. পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু তখনও দেশ প্রস্তুত হয় নাই। স্থির হইয়াছিল, বাঙ্গালায় একটা স্বতন্ত্র পরীক্ষা হইবে; তাহার নম্বর পাশের সময় ধরা হইবে না। এই উপলক্ষে Faculty of Artsএ বঙ্কিমবাবু একটি বেশ ছোটখাট অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ সালের মার্চ্চ মাসে একদিন শুনিলাম, বঙ্কিমবাবু অত্যন্ত পীড়িত; গিয়া দেখিলাম, তিনি অজ্ঞান ও অভিভূত। ইহারই কয়েকদিন পরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তিনি পেন্-সন্ লইয়া এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে Special Pension ও C. I. E, উপাধি দিয়াছিলেন। সার চার্লস ইলিয়ট তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

শুনিয়াছি, বঙ্কিমবাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি ভাল কায করিয়া গিয়াছেন, তিনি না কি বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর বারো বৎসরের মধ্যে তাঁহার জীবন-চরিত না লেখা হয়। তিনি যদি এটি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়া গিয়াছেন। সকল মানুষেরই দোষও থাকে, গুণও থাকে। তাড়াতাড়ি জীবন-চরিত লিখিলে দোষ ও গুণ দুই-ই প্রকাশ হইয়া পড়ে, দোষগুলা বরং একটু অতিরঞ্জিত হইয়া পড়ে। অতিরঞ্জিত না হইলেও পরনিন্দা ও পরকুৎসা করা মানুষের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে দোষগুলা লইয়াই বেশী আলোচনা আন্দোলন করে। তাই তিনি বারো বৎসর বলিয়া একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। *

* প্রধানতঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় লাট লর্ড ল্যান্সডাউন ও ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট এ বিষয়ে তাঁহার সহায় ছিলেন। প্রথমে সভার ৩টি বিভাগ ছিল—(১) নীতি বিষয়ক, (২) সাহিত্য বিষয়ক, (৪) ব্যায়াম বিষয়ক। প্রতাপ বাবু প্রথম, বঙ্কিম বাবু দ্বিতীয় ও কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিষ্টার হ্যারি লী তৃতীয় বিভাগের সভাপতি ছিলেন। আমরা প্রতি রবিবারে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাইয়া সাহিত্য বিভাগের সভাপতির উপদেশ লইতাম। সোসাইটীতে তিনি বেদ সম্বন্ধে ২টি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়।—'মাসিক বসুমতী'—সম্পাদক।

* বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে পত্র প্রচার করেন, তাহাতেই লিখিত ছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের ইচ্ছা, তাঁহার মৃত্যুর পর ১২ বৎসর গত না হইলে যেন তাঁহার জীবন চরিত লিখিত না হয়।—'মাসিক বসুমতী'—সম্পাদক।

হয় ত তিনি ভাবিয়াছিলেন; বারো বৎসরের মধ্যে লোকের রুচি এমন বদ্‌লাইয়া যাইবে যে, লোকে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ, কাব্য-নাটক ভুলিয়া যাইবে; তখন আর জীবন-চরিত লেখার দরকারই হইবে না। কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয়, তিনি যেরূপ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন, তাঁহার যেরূপ দূর-দৃষ্টি ছিল, তাহাতে তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হইবে, তাহাতে তাঁহার কার্য্যের, কবিত্বের, তাঁহার কাযের, সকল কথার একটা নূতন মানে লোকে দেখিতে পাইবে।

আমি দেখিতে পাইতেছি,—তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, তিনি ঠিকই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বারো বৎসরের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড জাগরণ আসিয়াছিল। দুর্গা-পূজার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যেমন ঘরে ঘরে আগমনী গায়, তিনি সেইরূপ আগমনী গাহিয়া গিয়াছিলেন, তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, দেবী নিশ্চয়ই আসিবেন; কিন্তু সে আগমন
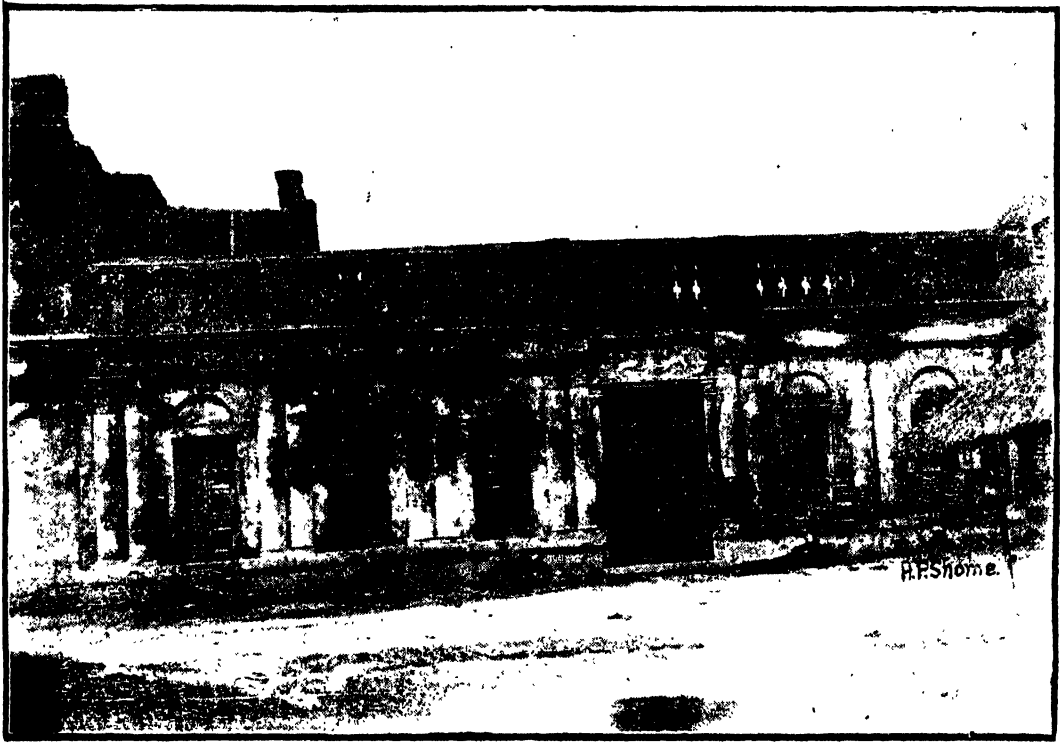
বঙ্কিমবাবুর বাটী

পুস্তকসমূহের আদর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি ও তাঁহার দলবল ভারতবর্ষে, বিশেষ বাঙ্গালায় যে জাগরণ-সঙ্গীত গাহিয়া গেলেন, যে প্রাণপ্রতিষ্ঠামাত্র করিয়া গেলেন, সেই সঙ্গীত জমিয়া উঠিবে, সে প্রাণে বল আসিবে, এবং তাহাতে দেশের অশেষ উন্নতি সাধিত হইবে; তখন হয় ত তাঁহার প্রত্যেক কথার দাম বাড়িয়া উঠিবে; তিনি যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাব বাড়িবে; তাঁহার জীবনের ঘটনা লোকে আগ্রহ করিয়া শুনিবে; টুকি-টাকি খবর লইবার জন্য লোকে ব্যস্ত হইবে, তাঁহার দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না, তাই তিনি বাঙ্গালীকে বারো বৎসর অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল, দেবী আসিয়াছিলেন। জাগরণ হইল তাঁহারই "বন্দে মাতরং" লইয়া। তখন লোকে বুঝিল, তিনি কি ছিলেন—তাঁহার দূরদৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ ছিল। এতদিন তিনি কবি ছিলেন, লেখক ছিলেন, উপন্যাসলেখক ছিলেন, ইতিহাস লেখক ছিলেন। এখন লোকে দেখিল, তিনি ঋষি ছিলেন, Saint ছিলেন, তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এতদিন লোকে তাঁহাকে লৌকিকভাবে দেখিত, এখন তাঁহাকে

অলৌকিক বা লোকোত্তরভাবে দেখিল। এতদিন তাঁহাকে মানুষ বলিয়া জানিত, এখন তাঁহাকে অতিমানুষভাবে জানিল। এতদিন তাঁহাকে হস্তপদাদিবিশিষ্ট জীব বলিয়া জানিত, এখন তাঁহাকে উপদেশরাশি বলিয়া মনে করিল। মানুষের যে সব দোষ থাকে, সে সব তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এতদিন তাঁহার সম্ভোগকায় দেখিয়াছিল, নির্ম্মাণ-কায় দেখিয়াছিল, এখন কেবলমাত্র তাঁহার ধর্ম্মকায় দেখিতেছে। এখন তাঁহার নবেলগুলির প্রত্যেক অক্ষরে নূতন নূতন মানে দেখিতেছে; তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে, গীতা-রহস্যে

বৈঠকখানা।

নূতন নূতন মানে দেখিতেছে, এমন কি, তাঁহার লোক-রহস্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ দেখিতেছে।

পঁচিশ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের শিষ্যগণও তাঁহাকে এই-রূপে দুই ভাবে দেখিয়াছিলেন। যাঁহারা বুদ্ধের সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে লৌকিকভাবেই দেখিতেন, অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিতেন, তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, একান্ত ধর্ম্মভাবে তাহার সবই মানিয়া চলিতেন; কিন্তু দু' এক পুরুষের মধ্যেই লোকোত্তরভাব আরম্ভ হইল। যাঁহারা স্থবিরদিগের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন না, তাঁহারা লোকোত্তরভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। বুদ্ধ শুদ্ধোদনের পুত্র হইলেও, মনুষ্যভাবে পৃথিবীতে বহুদিন বিচরণ করিলেও, তিনি একটা চিরন্তন অনাদি অনন্ত ধর্ম্মের ক্ষণিক বিকাশমাত্র। লোকোত্তরবাদীরা বলিতেন, তিনি যদি মানুষ হইতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সবই ফুরাইয়া যাইত; কিন্তু বুদ্ধ মরিলেও ত তাঁহার সব ফুরায় নাই, তাঁহার সঙ্ঘ বর্ত্তমান আছে, তাঁহার শাসন বর্ত্তমান আছে, তাঁহার বিনয় বর্ত্তমান আছে, তাঁহার ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে, তবে আর তিনি মরিলেন কি? তাঁহার ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার আসল দেহ, তাঁহার ধর্ম্মে উপদেশে বিনয়ে সঙ্ঘে বর্ত্তমান আছে। তিনি ছিলেন ক্ষণিক, এখন তিনি হইয়া-ছেন অনন্তকালব্যাপী। তিনি ছিলেন মূর্ত্ত, এখন হইয়াছেন বিভু অর্থাৎ সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী। যাহা ছিল অল্প স্থান ও অল্প কালে আবদ্ধ, এখন তাহা হইয়াছে কালে ও স্থানে অনন্ত। এই লইয়া এক শত বৎসর ধরিয়া তুমুল আন্দোলন হয়, শেষ লোকোত্তরবাদীরাই প্রবল হইয়া উঠেন। সেই লোকোত্তরবাদী পরিণামে মহাসাঙ্ঘিক ও মহাযান হইয়া উঠেন।

আমাদেরও বঙ্কিমবাবু সেইরূপ। তিনি মরিয়াছেন, তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার আবদ্ধ সীমাবদ্ধ অল্পক্ষণস্থায়ী অল্পদেশব্যাপী সত্তা লোপ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার ভারতব্যাপী যুগযুগান্তব্যাপী দেহ এখনও বর্ত্তমান আছে। শুধু বর্ত্তমান আছে নহে, ক্রিয়া করিতেছে, কায করিতেছে, দেশের লোককে অনুপ্রাণিত করিতেছে, তাহাদের আচার ব্যবহারে হেতুভূত হইয়াছে, তাহাদের সর্ব্ববিষয়ে শাসন করিতেছে, তাহাদের সমস্ত জীবনটা বদলাইয়া দিতেছে। তাঁহার ধর্ম্মকায় বজায় আছে, তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী বজায় আছে, তাঁহার উপদেশ বজায় আছে, তাঁহার দেহটা গিয়াছে, প্রাণটা বজায় আছে। সেই প্রাণ আজ আমরা এই মর্ম্মর-মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতেছি। ইহার অর্থ কি? আমরা কি আবার তাঁহাকে, তাঁহার ভারত-ব্যাপী প্রাণকে, যুগযুগান্তব্যাপী প্রাণকে এই মার্ব্বেলের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতেছি? তাহা নহে। এ মর্ম্মর-মূর্ত্তি বঙ্কিমবাবুর প্রতিভাসমাত্র, ছায়ামাত্র, প্রতিবিম্ব-মাত্র, এটা কিছুই না, শূন্য ফাঁকা। আমরা আরসীতে মুখ দেখি, আরসীতে আমাদের প্রতিবিম্ব পড়ে, ইহাকেই আমরা প্রতিভাস বলি। সে প্রতিবিম্ব প্রতিভাস কিছুই নহে, ফাঁকা, অথচ আমরা মনে করি, এ আমারই মুখ, আমি ঐ আরসীর মধ্যে বসিয়া আছি।—এ মার্ব্বেল-মূর্ত্তিও তাই। আরসীতে যে ছায়া দেখিয়াছিলাম, তাহা হইতেই এই মূর্ত্তি হইয়াছে, সুতরাং আরসীর প্রতিবিম্ব হইতেও এ মূর্ত্তি ফাঁকা। তবু এই মূর্ত্তিকেই আমরা বঙ্কিমবাবু বলিব। তিনি অদৃশ্যভাবে আমাদের জীবন পরিবর্ত্তন করিবেন, এ আমাদের সহিবে না। তাই আমরা সামনে একটা কিছু বসাইতে চাই, তাই এ মূর্ত্তি-কল্পনা।

[illegible] মন্দির।

লোকোত্তরবাদী মহাযানীরা বুদ্ধকে—বুদ্ধ-প্রতিবিম্বকে, বুদ্ধ-মূর্ত্তিকে উপায় বলিতেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, বোধি প্রজ্ঞা নির্ব্বাণ। বুদ্ধ আর কিছুই নহেন, সেই বোধি, সেই প্রজ্ঞা ও সেই নির্ব্বাণ পাইবার উপায়। তিনি যেরূপে পাইয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপে পাইব। তাই তাঁহাকে সম্মুখে রাখিতে চাই। তাঁহার ভাবে আমরা বিভোর হইতে চাই, তাঁহার পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করিতে চাই; তাই তিনিই উপায়। আমাদের এখানেও তাই, আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাই, তাঁহার ভাবে বিভোর হইতে চাই, তাই তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছি।

মূর্ত্তি দেখিলেই আমাদের বঙ্কিমকে মনে পড়িবে, তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি মনে পড়িবে, তাঁহার মন-মাতান গান মনে পড়িবে, আর আমরা সেইরূপ হইতে চাহিব। এখন উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহার এই শিষ্যটি এখনও তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত।

বঙ্কিম, তুমি এখন স্বর্গে আছ। রক্ত-মাংসের শরীরে

বঙ্কিমবাবুর বাটী ও দেবমন্দির।
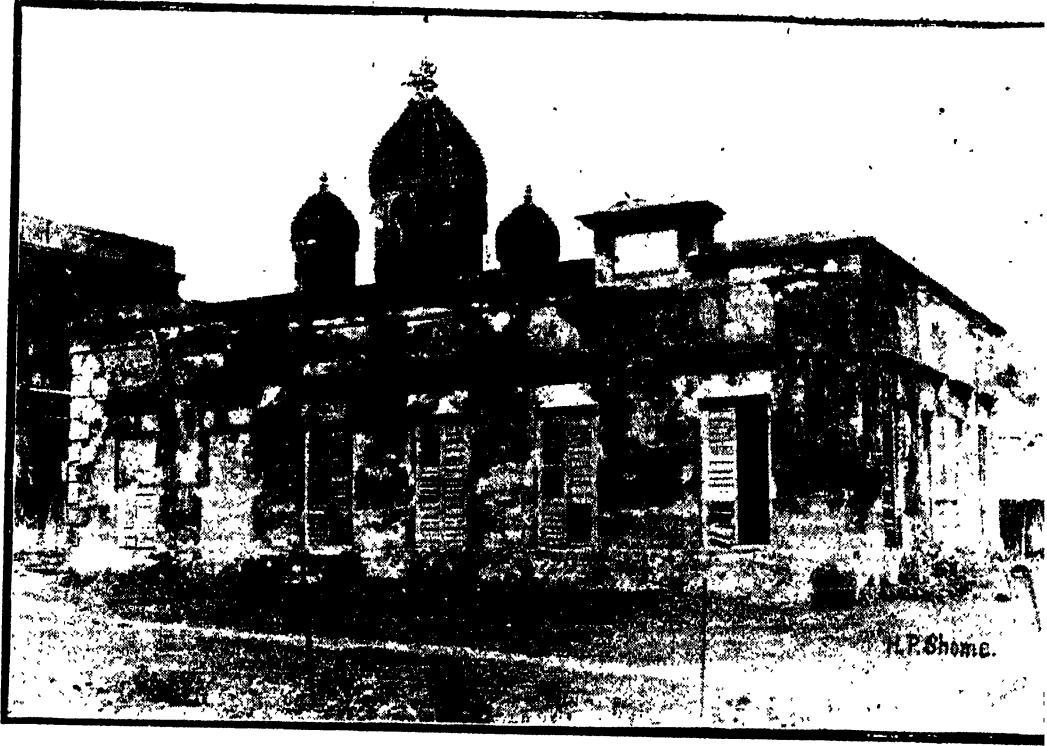
বঙ্কিমবাবুর মার্ব্বেল-মূর্ত্তি নীচেয় রহিয়াছে। সদর দরজার ঠিক সামনেই তাঁহার মূর্ত্তি থাকিবে, আসুন, আমরা সকলে গিয়া তাঁহার মূর্ত্তি উন্মোচন করি। তিনি জীবনে আমার Friend Philosopher and Guide ছিলেন। তিনি নাই, তুমি উপর হইতে দেখ, সমস্ত বাঙ্গালী জাতি তোমায় কত ভালবাসে, কত ভক্তি করে—তুমি তাহাদের আশীর্ব্বাদ কর, তাহারা যেন তোমার উপদেশমত কার্য্য করিতে পারে ও তোমার মনের মত মানুষ হইতে পারে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কৃষি-কথা।

২
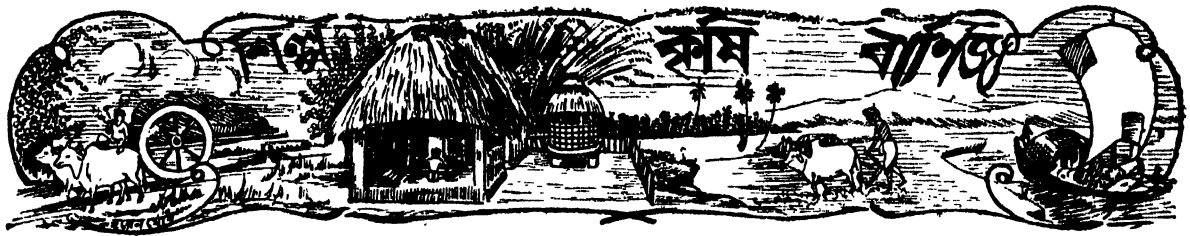
নানা কারণে বাঙ্গালায় কৃষির অবনতি ঘটিতেছে। দেশের জল-বায়ু দূষিত হইয়া একদিকে যেমন মানুষ ও পশু বলহীন ও উদ্যমশূন্য হইয়া পড়িতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দেশে দারিদ্র্য আসিয়া পড়ায় উত্তম চাষ, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার প্রভৃতির অভাব ঘটিতেছে। নানা কারণে দেশের নদী-নালাগুলি বুজিয়া আসায় দেশে দিন দিন জলাভাব দাঁড়াইতেছে। দরিদ্রের হাতে পড়িয়া অর্দ্ধাহারী, দুর্ব্বল ও কৃশ গোমহিষ আর তেমন সবলে মৃত্তিকা-কর্ষণে সমর্থ নহে; উপযুক্ত পরিচর্য্যাভাবে গাভী দিন দিন দুগ্ধহারা হইতেছে ও ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিতেছে; যেখানে পূর্ব্বে বিঘায় ১০ মণ ফলিত, এখন উপযুক্ত কারকিতের অভাবে সেখানে তাহার অর্দ্ধেক—এমন কি, কোন কোন স্থলে তাহার সিকি—ফসল দাঁড়াইয়াছে। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা ভূমির খাজনা বৃদ্ধি পাইয়াছে, মজুরীর হারও দিন দিন অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতেছে, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি ঘটিলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে, লোক পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে ও সমাজের শান্তি নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছে।—এরূপ ক্ষেত্রে আর চিরন্তন প্রথানুযায়ী গতানুগতিকভাবে কৃষির কার্য্য করিলে কিছুতেই চলিবে না। এখন অভিনব পদ্ধতিতে মাটীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া লইয়া, তাহাতে সুনির্ব্বাচিত সুপুষ্ট বীজ ব্যবহারে নূতন নূতন লাভজনক ফসল জন্মাইয়া বৈজ্ঞানিক সহজসাধ্য উপায়ে শস্যক্ষেত্রের ও সঞ্চিত শস্যের কীটাদি ও অন্যান্য রোগ নিবারণ করিতে পারিলে, তবেই কৃষি হইতে প্রচুর ধনাগম হইয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করিবে। কৃষির উন্নতি ঘটিলে ও তদ্দ্বারা ধনাগম হইলে, আবার দেশের নষ্ট-স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে, জলাভাব দূর হইবে, গো-মহিষাদি পশু সুস্থ শরীরে, সবলে, সোৎসাহে কৃষির কার্য্য করিবে। উপযুক্ত পরিচর্য্যায় গাভী সকল আবার সবল, সুস্থাবয়ব, বলিষ্ঠ বৎস প্রদান করিবে ও প্রচুর দুগ্ধ দান করিবে।

যতদিন দেশের ধনীরা ও বিদ্বজ্জন এ বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন, ততদিন কৃষির উন্নতি সুদূরপরাহত। একটি তৃণের স্থলে দুইটি তৃণ উৎপন্ন করিতে, একটি দানার স্থলে দুইটি দানা ফলাইতে না পারিলে, আর দেশের ভরসা নাই। দেশে জমীর পরিমাণ কম নাই এবং সে জমীতে যেমন তেমন করিয়া কিছু না কিছু ফসল প্রতি বৎসরই উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু তাহার ফলনের হার এতই কম যে, তাহার সমস্ত চেষ্টাটাই ব্যর্থ মনে হয়, কেবল কৃষক কোনও রকমে খাইয়া ও লজ্জানিবারণ করিয়া, তাহার অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট দুর্ব্বহ জীবন বহন করে।

গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ডে যতখানি যায়গা, ভারতে এতখানি যায়গায় ধান-চাষ হয়। চীন দেশেও ধান প্রচুর জন্মায়; কিন্তু একর প্রতি ফলনের হার স্পেন ও ইটালীতে অধিক। গোটা ইংলণ্ডের পরিমাণ যতটা, সমগ্র ভারতে তদপেক্ষা অধিক ভূমিতে গমের চাষ হয়। ইক্ষুর আবাদেও ভারতের কম ভূমি বদ্ধ নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে একর প্রতি ১ টন মাত্র নিকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয়, আর জাভা ও মরিসসে প্রতি একরে ৪ টন উৎকৃষ্ট চিনি পাওয়া যায়। যদি ভারতে ধানের ফলনের হার স্পেন ও ইটালীর মত, গমের ফলনের হার আমেরিকার মত ও ইক্ষুর ফলন জাভা ও মরিসসের মতন দাঁড় করান যায়, তাহা হইলে ভারতের কৃষকের অবস্থা স্বচ্ছল হইতে বিলম্ব হয় না। অন্য দেশে উদ্যম, যত্ন ও চিন্তাশীলতার ফলে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, এখানেও চেষ্টা করিলে, আত্মনিয়োগ করিলে, একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিলে, কেন সেইরূপ সফলতালাভ না ঘটিবে?

বর্ত্তমানকালে যে সকল দেশ বিজ্ঞান-সাহায্যে ও আন্তরিক অধ্যবসায়-প্রভাবে পৃথিবীর মধ্যে কৃষি-কার্য্যে উন্নতিলাভ করিয়াছে, আমেরিকা তাহাদের শীর্ষস্থানীয়। সেখানকার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেদিনও যখন সেখানে পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও ভাব-ভাষা মাত্র প্রবেশলাভ করিয়াছে, তখনও কৃষির উন্নতির দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই; ক্রমে যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে মানব যাইয়া তাহার অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, তখন সকলেরই তথাকার সুবিস্তীর্ণ বনভূমির উপর দৃষ্টি পড়িল ও সকলের সমবেত চেষ্টায়, উদ্যম ও অধ্যবসায়ে সেই বহুকালের বনভূমি লোপ পাইয়া সুন্দর নয়নারাম শস্য-শ্যামল ভূখণ্ড তাহার স্থান অধিকার করিতে লাগিল। বেশী দিনের কথা নহে, মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকায় কৃষি-বিষয়ক যত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব্বে যেখানে সামান্য ফসল জন্মিত, এখন সেখানে উন্নত প্রণালীর চাষ প্রবর্ত্তন হওয়ায় প্রচুর ফসল জন্মিতেছে; ঘোটক গো-মহিষাদি কৃষি-সহায়ক পশু ও শূকর, মেষ, ছাগল, পক্ষী প্রভৃতি মাংসপ্রদ জীব-জন্তুর দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে। পূর্ব্বে যেখানে মহাজনের ঋণের দায়ে কৃষিজীবীর জীবন দুঃখময় ছিল, আজ সেখানে কৃষক-মণ্ডলীর মধ্যে অসংখ্য কৃষি-ব্যাঙ্ক সৃষ্ট হইয়া বহু কোটি টাকা তাহাদের মজুত তহবিলে দাঁড়াইয়াছে—এখন সেই পূর্ব্বকার দরিদ্র চাষী বহু অর্থের মালিক হইয়া সপরিবারে পূর্ণানন্দে প্রফুল্ল জীবন অতিবাহিত করিতেছে। চতুর্দ্দিকে কুটীরের স্থলে স্বাস্থ্য-পূর্ণ ও সৌন্দর্য্যময় অট্টালিকা সকল শোভা পাইতেছে, অবসরকালে সকলে সাময়িক পুস্তকাদি পাঠ, কৃষিবিষয়ক কূট-প্রশ্ন সমাধান ও গীত-বাদ্য প্রভৃতির চর্চ্চায় মানসিক উৎকর্ষতা সাধন করিতেছে।

এক দিকে দেশের ধনী ও বিদ্বজ্জনগণ যেমন কৃষির উন্নতিতে বদ্ধপরিকর, অপর দিকে তেমনই তথাকার গবর্মেণ্টও সে বিষয়ের উন্নতির জন্য সদা সচেষ্ট ও মুক্তহস্ত। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে একটি সরকারী সর্ব্বপ্রধান কৃষি-বিভাগ আছে, উহার নাম Federal Agricultural Department, তদ্ব্যতীত প্রত্যেক ষ্টেটে একটি করিয়া পৃথক্ State Agricultural Department আছে ও ঐ সকলের অধীনে অন্যূন একটি করিয়া কৃষি-কলেজ ও একটি করিয়া Experimental Station বা পরীক্ষা-ক্ষেত্র আছে। ঐ সকল কলেজ অবৈতনিক। আইওয়া কলেজ (Iowa Agricultural College) এইগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত কলেজেই অল্প ও দীর্ঘকালব্যাপী দুই শ্রেণীর পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণ কৃষক-শ্রেণী বৎসরের মধ্যে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে কয়েক সপ্তাহের জন্য এই সকল কলেজে থাকিয়া কৃষিকর্ম্মের আবশ্যক বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহ হাতে-কলমে শিক্ষা করিয়া লয়, ও রীতিমত পাঠার্থী যুবকগণ ৩ বা ৪ বৎসরের "কোর্স" গ্রহণ করে, ও তথায় সুশিক্ষিত হইয়া দেশে বড় বড় ক্ষেত্র খুলে বা অপরের ক্ষেত্রে কার্য্য করে। এই সকল কলেজে স্ত্রীলোকগণের জন্য গার্হস্থ্য কর্ম্মের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও আছে। এতদ্ব্যতীত আইওয়া কলেজ হইতে প্রতি বৎসর কৃষি-বিদ্যাপারদর্শী অধ্যাপক-মণ্ডলীকে স্পেশাল ট্রেণে প্রত্যেক কৃষি-কেন্দ্রে কৃষিবিষয়ক নব নব তথ্য প্রচারের জন্য দেশমধ্যে প্রেরণ করা হয়। যে দিন যে সময়ে যেখানে স্পেশাল ট্রেণ দাঁড়াইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই তত্রস্থ কৃষকমণ্ডলীকে জানান হয় ও নির্দ্দিষ্ট দিনে শত শত কৃষক আসিয়া নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে সমবেত হয়। ট্রেণের সঙ্গেই সুসজ্জিত বক্তৃতা-গৃহ ও পরীক্ষাগার থাকে। কৃষকগণ বক্তৃতা শুনে ও অধ্যাপকগণের নিকট প্রশ্ন করিয়া নিজ নিজ জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লয়। যাহারা এই সকল বক্তৃতা শুনিবার সময় পাইয়া না উঠে, তাহারা ইচ্ছা করিলে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সরকারী বিশ্লেষণাগারের বিজ্ঞ অধ্যাপক-মণ্ডলীকে পত্র লিখিতে পারে; অধ্যাপকগণও বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত তাহাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সরকারী বিশ্লেষণাগার ব্যতীত প্রত্যেক ষ্টেটে একটি করিয়া United States Agricultural Station আছে। ইহাদের প্রত্যেকটি এক একটি তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত। কোথাও তামাকের, কোথাও ধান্যের, কোথাও গমের, কোথাও সবজীর নানা তথ্য অনুসন্ধান করা হয়; ইহা ব্যতীত প্রায় প্রতি গ্রামে গবর্মেণ্টের ব্যয়ে ও গবর্মেণ্টের বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে সেই সেই স্থানোপযোগী নূতন নূতন লাভজনক ফসল জন্মাইয়া বা চলিত ফসলে নূতন নূতন সার প্রয়োগ করিয়া উন্নতিকর নব নব পন্থা সকল পরিদর্শিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বহু অর্থ ব্যয়ে ও বহু গবেষণায় বহুকাল ধরিয়া

নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা যে সকল বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাহাই কৃষকের গৃহদ্বারে আনিয়া তাঁহারা প্রদর্শন করেন। নূতন নূতন কৃষিযন্ত্রাদি উদ্ভাবন, জলসেচনের নূতন নূতন প্রথাবিস্কার, অল্প ব্যয়ে অধিক ফসল উৎপাদন, মনুষ্য ও পশুর শ্রমলাঘবকর নব নব বৈজ্ঞানিক উপায় নির্দ্দেশ এই সকল তাঁহাদের লক্ষ্য। কৃষিবিষয়ক সকল কার্য্যই যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সেই জন্য যুক্তরাজ্যের সম্মিলিত কৃষি-বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন শাখার সাহায্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি পরিদর্শন করিয়া থাকেন,—(ক) নভোতত্ত্ব পর্য্যালোচনা, (খ) পশুতত্ত্বাবধান, (গ) ফসল বিভাগ, (ঘ) মৃত্তিকাপরীক্ষা বিভাগ, (ঙ) রসায়ন বিভাগ, (চ) কীটতত্ত্ব বিভাগ, (ছ) প্রাণী ও উদ্ভিদ বিভাগ, (জ) বনবিভাগ, (ঝ) গ্রামোন্নতি বিভাগ, (ঞ) বিনা মূল্যে বীজ সরবরাহ বিভাগ।

এই বিরাট কার্য্য এমনই সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয় যে, কোথাও একটু গোলযোগ ঘটে না। প্রতিদিন যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক ষ্টেট নভোতত্ত্ব পর্য্যালোচনা বিভাগ হইতে বিশেষজ্ঞগণ আবহাওয়া পরীক্ষা করিয়া টেলিগ্রাম ও টেলিফোন যোগে প্রতি গ্রামে কৃষকদিগকে সংবাদ জ্ঞাপন করেন, তাহারাও বৃষ্টি-বায়ুর তথ্য বুঝিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। পশুতত্ত্বাবধান বিভাগ হইতে প্রতি মাসে ছোট ছোট পুস্তিকার সাহায্যে পশুপালন, পশুচিকিৎসা, নূতন নূতন রোগের সংবাদ ও তাহার প্রতিবিধানের উপায় সকলকে জানাইয়া সময়ে সতর্ক করা হয়। ফসল বিভাগ—শস্য বপনের নূতন প্রথা, লাভকর নূতন নূতন ফসলের কথা ও চাষের নিয়মাদি সকলকে বিস্তারিতরূপে জ্ঞাপন করিয়া ও কৃষকগণের প্রশ্নের উত্তর দিয়া কৃষির উন্নতিতে সাহায্য করেন। মৃত্তিকা-পরীক্ষা বিভাগ কৃষকের প্রেরিত মৃত্তিকার নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া উহার শস্যোৎপাদনোপযোগী উপাদানের অভাব বা প্রাচুর্য্যের কথা ও উহার উপযোগী ফসলের কথা, ঐ মৃত্তিকায় বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন প্রণালীতে সার সংযোগের কথা ইত্যাদি কৃষককে জানাইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। রসায়ন বিভাগ—প্রধানতঃ মৃত্তিকা, জল ও ফসলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রত্যেকের অভাব ও অল্পব্যয়ে তন্নিবারণের উপায় সিদ্ধান্ত করিতে রত। এই বিভাগ অন্যান্য বহু আয়াস-সাধ্য বিষয় নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকিলেও নিত্য নূতন যে সকল ফসল পৃথিবীর বহু দূরদেশ হইতে আমেরিকার সুসন্তানগণ বহু ক্লেশ ভোগ করিয়া ও জীবন বিপন্ন করিয়াও মাতৃভূমির হিতের জন্য দেশে প্রচলন প্রয়োজন মনে করিয়া দেশ-বিদেশের লোকালয় ও বন জঙ্গল হইতে আহরণ করিয়া দেশে প্রেরণ করিতেছেন, সে সকল প্রকৃতই মনুষ্যের বা গৃহপালিত পশ্বাদির জীবনধারণের সহায়ক কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত। ঐ সমুদায় মনুষ্য শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকারক কি না, তাহা এই বিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। দেশের হিতকামেচ্ছু গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারিগণ স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হইলে তাঁহাদের উপর এই ফসলের গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাকালীন এই বিভাগ হইতে যে খাদ্য প্রদত্ত হয়, তদ্ব্যতীত তাঁহারা অন্য খাদ্য ব্যবহার করিতে পারেন না। এই খাদ্যের জন্য তাঁহাদের কোনও মূল্য লাগে না। খাদ্য ব্যবহারে প্রতিদিন তাঁহাদের শরীরের অবস্থা যেমন যেমন বোধ হয়, তাহা অভিজ্ঞের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়; পরিশেষে উহা ভাল বোধ হইলে এই বিভাগ ঐ খাদ্য শস্যের উপকারিতা সম্বন্ধে Certificate প্রদান করেন। তখন সেই ফসলের উন্নতি ও দেশমধ্যে বহুল প্রচলনের জন্য কৃষি-বিভাগ হইতে বিশেষ চেষ্টা করা হয়। কীট-বিভাগ—শস্যের প্রধান শত্রু কীট বিনাশে নানা প্রকারে সাহায্য করেন ও প্রতি বৎসর কোটি কোটি মণ শস্য তাহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া দেশের ধন-ভাণ্ডার পুষ্ট করেন। এমনই করিয়া প্রতি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল সুসমাহিত করিয়া দেশের কৃষিকার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। সম্মিলিত কৃষি-বিভাগের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী একখানি সুবৃহৎ অভিধানের ন্যায়। বহুল প্রচারের জন্য ইহার মূল্যও নামমাত্র লইয়া দেশমধ্যে ইহার প্রচার করা হয়। আমেরিকার লোক বুঝিয়াছেন যে, কৃষি-কার্য্য ব্যতীত দেশের উন্নতি অসম্ভব, তাই সর্ব্বত্র এই বিরাট আয়োজন।

কেমন করিয়া কৃষির উন্নতি করা যায়, তাহাই বুঝাইবার জন্য উপরে একটু বিস্তৃতভাবে আমেরিকার কৃষি-সংবাদ দেওয়া হইল। আমেরিকায় যে যে প্রণালীতে কৃষির উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এ দেশেও যে ঠিক সেই সেই প্রণালীতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এমন কোনও কথা নাই; তবে সেখানকার মত এ দেশের ক্ষুদ্র-ভদ্র, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ ও বিদ্বান সকলে মিলিয়া একমনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে এখানেও যে অল্পদিনের মধ্যে কৃষির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, এ কথা নিশ্চয়

বলা যায়। তবে কোনও একটা বিষয়ে উন্নতি করিবার জন্য একটা নূতন কিছু প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিশেষভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, আমরা যাহা উন্নত প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহি, তাহা আমাদের দেশকালপাত্রোচিত হইবে কি না। তাহা যথার্থ উন্নতিকর কি না দেখিতে হইবে। কেবল হুজুগে মাতিয়া চক্ষু মুদ্রিত রাখিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ঢালিয়া চলিলে উন্নতি ত দূরের কথা, অবনতির পথেই যাইতে হইবে।

কোনও একটা বিষয়ে উন্নতিসাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গদেশের কৃষির উন্নতি-সাধন করিতে হইলে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা কি, প্রথমেই তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের প্রচারিত ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দের Agricultural Statistics of Bengal হইতে আমরা জানিতে পারি,—সমগ্র বাঙ্গালার পরিমাণ-ফল ৫ কোটি ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫ শত ২০ একর। ইহার মধ্যে ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮ শত একর ভূমিতে আবাদ হইয়াছিল। ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৬ শত ৩৮ একর আবাদের উপযোগী ভূমি পতিত ছিল। আরও জানা যায় যে, ৫৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯ শত ৫ একর ভূমি যত্ন ও চেষ্টা করিলে আবাদ হইতে পারে, কিন্তু বরাবরই পতিত পড়িয়া আছে। ১ কোটি ১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭ শত ৬৬ একর ভূমি আবাদের অযোগ্য এবং ৪২ লক্ষ ৭২ হাজার ৪ শত ১১ একর ভূমি বন ও জঙ্গলাকীর্ণ।

১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দের আবাদী পূর্ব্বোক্ত ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮ শত একর জমীর মধ্যে ৪৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৫ শত একর জমীতে একই বৎসরে দুইবার ফসল হইয়াছিল। সুতরাং মোট ফসল হইয়াছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩ শত একর জমীতে। তাহার মধ্য হইতে দোফসলী পূর্ব্বোক্ত ৪৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৫ শত একর বাদ দিলে "নেট" আবাদী জমীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮ শত একর। ইহার মধ্যে একমাত্র ধান্যের আবাদ হইয়াছিল ২ কোটি ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর ভূমিতে। তন্নিম্নেই হইয়াছিল পাট, উহার পরিমাণ ২৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯ শত একর। তুলা জন্মিয়াছিল মাত্র ৫০ হাজার ১ শত একর জমীতে। গম হইয়াছিল ১ লক্ষ ১৬ হাজার ১ শত একর জমীতে। সবজী ও ফলমূলের চাষে বদ্ধ ছিল ৬ লক্ষ ৬ হাজার ৪ শত একরে। চিনি গুড় প্রভৃতির জন্ম ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ২ শত একর জমী ছিল।

তিল, সরিষা, তিসি প্রভৃতি তৈলপ্রদায়ী ফসল জন্মিয়াছিল মোট ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭ শত একরে। পশুখাদ্য হইয়াছিল ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৪ শত একরে ও অবশিষ্ট জমীতে নীল, চা, ও তামাক আফিম প্রভৃতি মাদক শস্য, বিভিন্ন প্রকারের দ্বিদল ও রবিশস্য, ঔষধের গাছগাছড়া ও অন্যান্য বিবিধ শস্য জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, বাঙ্গালায় আবাদী জমীর পরিমাণ নিতান্ত কম নহে এবং চেষ্টা করিলে এখনও বহু পরিমাণ পতিত জমী আবাদের উপযোগী করিয়া লইয়া আবাদ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; চাই কেবল দেশের লোকের আন্তরিক ইচ্ছা এবং সমবেত চেষ্টা ও যত্ন। চেষ্টা ও যত্ন করিলে অদূরভবিষ্যতে একর প্রতি ফসলের হার বৃদ্ধি করিয়া, নূতন নূতন লাভজনক ফসল উৎপন্ন করিয়া ফসলের পোকা ও রোগ নিবারণ করিয়া সঞ্চিত ফসল কুসীদজীবী মহাজন ও "দাও" অনুসন্ধানকারী ব্যাপারীর হাত হইতে রক্ষা করিয়া উৎপন্নকারী দরিদ্র কৃষকের অবস্থা উন্নত করা যাইতে পারে।

চাষ আবাদের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে। কেন না, গ্রামে গ্রামে জঙ্গল ও জঙ্গল পতিত অনাবাদী জমী উঠিত হইয়া গ্রাম পরিষ্কার হইয়া যাইবে, বিল খাল পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় মনোযোগ পাইয়া রোগের বীজাণু-শূন্য হইয়া সুপেয় জল প্রদান করিবে। জলহীন শুষ্ক প্রদেশে জলাশয় খাত হইবে বা নল-কূপ প্রভৃতির সাহায্যে প্রচুর জল পাওয়া যাইবে, কিংবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই সব উচ্চ জমীতে শুষ্ক চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়া দেশের ধন-ভাণ্ডার পুষ্ট করিবে। তখন দেশে লক্ষ্মী-শ্রী দেখা দিলে অনর্থক অপচয়ের দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে ও আজ যাহা সকলে গ্রামের আবর্জ্জনা বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, তখন সেই সবই মূল্যবান্ "সার" বলিয়া আদৃত হইবে। দেশের কঙ্কাল দেশেই মাটী হইয়া দেশেরই মাটী উর্ব্বর করিবে। গ্রামে গ্রামে তৈলদায়ী শস্য সকল হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইবে এবং দেশের খৈল দেশের সার

বৃদ্ধি করিবে ও দেশের গো-মহিষ পুষ্ট করিবে। তখন সুস্থ দেহে সবল পশুসকল দ্বিগুণ বলে ভূমি কর্ষণ করিবে ও পুষ্টদেহ গাভী প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করিবে। সেই দুগ্ধপুষ্ট সবল শিশু আর কথায় কথায় মরিবে না। মৃত্যু ও রোগের প্রতাপ কমিয়া যাইবে। তাহারা তখন কালে বলিষ্ঠ যুবক হইয়া কেহ Farmer, কেহ চাষী, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বা ব্যবসায়ী হইবে। বাঙ্গালী বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত সুস্থ দেহে জীবন উপভোগ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। দেশে ধনবৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অযথা কলহ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, রোগপ্রবণতা, অকালমৃত্যু, পরমুখাপেক্ষিতা, চাকরী-প্রিয়তা প্রভৃতি অন্তর্হিত হইয়া দেশে তখন এক সুস্থদেহধারী, উচ্চমনা আত্মনির্ভরশীল বলিষ্ঠ জাতির উদ্ভব হইবে। বহুদিনের নিশ্চেষ্টতার ফলে বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালীজাতি কেবল স্বাস্থ্য, বল ও ধন হারাইয়া হীন হইয়া আছে, মনুষ্যোচিত সকল বৃত্তিই তাহার শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহার সকল ক্ষমতাই ফিরিয়া আসিবে ও সে পৃথিবীতে যে কোনও জাতির সহিত সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মল্লিক।

অভয়।

লয়েড জর্জ্জ—(সিভিল সার্ভিসকে)—

তোরা যে রাজার বেটা, তোদের বধিবে কেটা,
চিরস্থায়ী রহিবি ভারতে।

কান্তকবি রজনীকান্ত।

কাব্যের চেয়ে কবি বড়। কবির কাব্য বুঝিতে হইলে, কবিকে বুঝিতে হয়; কবিকে না বুঝিলে তাঁহার কাব্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, তাঁহার কাব্যের সহিত সম্যক্ পরিচয় হয় না। কান্তকবি রজনীকান্তের কবিতা ও সঙ্গীত বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারের স্থায়ী সম্পদ। বাঙ্গালীর ভবিষ্যতে যতই চুর্দ্দৈব ঘটুক না কেন, বাঙ্গালী কোন দিন তাহার কয়েকটি গান ভুলিবে না—ভুলিতে পারিবে না। রজনীকান্ত নিজের প্রতিভায় সন্দিহান হইয়া এক দিন লিখিয়াছিলেন বটে,—"দেশের এই শত শত প্রতিভা-মার্ত্তণ্ডের মধ্যে আমি জোনাকী।" কিন্তু কাব্যামোদী বাঙ্গালী মাত্রেই জানে যে, তিনি বঙ্গের সাহিত্যাকাশের শুকতারা—শুকতারার মতই স্থির, স্নিগ্ধ, কান্ত, কোমল জ্যোতিতে কাব্য-গগন আলো করিয়া তিনি চিরদিন বিরাজ করিবেন।

রোগ-শয্যাশায়ী রজনীকান্ত গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতকে তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। গ্রন্থকার এই অনুরোধকে আদেশ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া দীর্ঘ বার বৎসরকাল প্রভূত শ্রম, অধ্যবসায়, অর্থব্যয় ও অনুসন্ধান করিয়া এই ৪০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী কবি-চরিত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু অনুষ্ঠান সফলতা-মণ্ডিত হইয়াছে; কারণ, এই গ্রন্থপাঠে আমরা কান্তকবিকে জানিতে ও চিনিতে পারিয়াছি এবং তাহার ফলে তাঁহার কাব্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিতেছি।

গ্রন্থকার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আমি বাস্তবিকই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়ি। এ যে অকূল-পাথার, অগাধ-সমুদ্র!" এ কথার আমরা প্রতিবাদ করি না; বাস্তবিকই কবির প্রতিভা অকূল-পাথার, অগাধ-সমুদ্র। এক জন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে, —"বিশ্বের মধ্যে তুইটি বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর—এক নক্ষত্র-মণ্ডিত অনন্ত নভোমণ্ডল আর এক বৈচিত্র্যপূর্ণ অজ্ঞেয়, অমেয়, মানব-মন!" আমার মনে হয় যে, দার্শনিকপ্রবর তাহার ঐ উক্তিতে কবি-প্রতিভাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; স্বতঃই কবি-প্রতিভা অকূল-পাথার, অগাধ-সমুদ্র। কিন্তু তথাপি নলিনীবাবু সাহস করিয়া সেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালীর সৌভাগ্যে জলমগ্ন না হইয়া, তলদেশ হইতে অনেক মণি-মুক্তা উত্তোলন করিয়া আনিয়াছেন—তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন।

নলিনীবাবুর এই চরিত-গ্রন্থে জানিবার ও শিখিবার অনেক কথাই আছে; তিনি ইহার মধ্যে বেশ গবেষণা, চিন্তাশীলতা, সহৃদয়তা, আখ্যান-পটুতা, রসামোদিতা ও শম-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু তথাপি যে গুণে এই গ্রন্থ আমার প্রিয়তর হইয়াছে, তাহা এই যে, ইহার সাহায্যে আমরা কান্তকবিকে জানিতে ও চিনিতে পারি এবং তাঁহার কাব্যের মর্ম্ম-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি।

কান্তকবি স্বয়ং তাঁহার জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে সুরু করিয়াছিলেন; কিন্তু রোগের বিড়ম্বনায় তাহা শেষ হয় নাই। তাঁহার আত্ম-জীবনের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার জীবন ক্ষুদ্র, বৈচিত্র্যহীন, নীরস; সুতরাং আমার কৈফিয়ত সংক্ষিপ্ত ও সরল।" কবি ঐ ভূমিকায় আরও লিখিয়াছেন, "এই জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সম্পূর্ণরূপ অশরণ ও অনন্যগতি হইয়া মঙ্গলময়ের চরণে একান্ত আশ্রয় লইয়া * * এই বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম।" এই অবস্থায় আত্ম-জীবনী রচনা করিতে বসিয়া কবি মামুলি বিনয় বা প্রথাগত নির্ব্বেদ অবলম্বন করেন নাই। বাস্তবিকই তাঁহার জীবন বৈচিত্র্যহীন। ঘটনার হিসাবে—তরঙ্গায়িত জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের দিক্ দিয়া দেখিলে কান্তকবির জীবন "ক্ষুদ্র, বৈচিত্র্যহীন ও নীরস" বটে; কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকের ভাবে দেখিলে, ঘটনার সঙ্ঘাতে মানবাত্মার বিস্ফূর্জ্জনের দিক্ দিয়া দেখিলে ঐ জীবন 'ক্ষুদ্র, বৈচিত্র্যহীন, নীরস' নহে। এইভাবেই গ্রন্থকার কান্তকবির জীবন-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের যে সঙ্কীর্ণ জীবন, বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে কান্তকবিরও সেই জীবন। সেই গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ ও জেলা স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ, সেই বি, এ, পড়া, গ্রাজুয়েট হওয়া, উকীল হওয়া, মাঝারি রকমের পসার হওয়া, রোগ হওয়া, দারিদ্র্যে কষ্ট পাওয়া এবং অবশেষে দুঃস্থ পরিবারবর্গকে

রাখিয়া ইহলীলা সংবরণ করা—ইহাই রজনীকান্তের বাহ্ জীবন—বাহিরের খোসা। কিন্তু তাঁহার অন্তর্জ্জীবন? মানুষ যে অবস্থার দাস নহে, মানবাত্মা যে পরিবেষ্টনীর উপর বিজয়ী হয়, সেই সনাতন, চিরন্তন, চিৎ-কণা যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় জীবের হৃদয়ে সংধুক্ষিত থাকে—কান্তকবির জীবন পাঠে আমরা সেই পুরাতন সত্যের পুনরাবৃত্তি করি। গ্রন্থকার সেই অবিচিত্র, অঘটনাবহুল রজনীকান্তের বাহ্য-জীবন যতটা মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত করা যায়, তাহার ত্রুটি করেন নাই। তিনি তাঁহার বংশপরিচয়ে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক কথার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার জনক-জননীর চিত্র অঙ্কিত ও মুদ্রিত করিয়া কান্ত প্রস্রবণের উৎপত্তি-ক্ষেত্রে আমাদিগকে উপনীত করিয়াছেন। রজনীকান্তের প্রখর বুদ্ধি, আবৃত্তি-পটুতা, সঙ্গীতকুশলতা, জনপ্রিয়তা এবং বাল্যরচনার অনেক পরিচয় আমরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি। ক্রমে অদৃষ্টের অভিশাপে কবি ওকালতীতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কোনদিনই তাঁহার ঐ বেসাতে অনুরাগবৃদ্ধি জন্মিল না। তিনি নিজে এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন —"আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল।" বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত রজনীকান্ত। গান কবিতা,সঙ্গীত-সাহিত্য, কল্পনা-সাধনা এই সকল লইয়াই প্রকৃত রজনীকান্ত। এই রজনীকান্তের সম্যক্ পরিচয় আমরা নলিনীবাবুর গ্রন্থ হইতে পাই।

রজনীকান্ত যখন অনিচ্ছায় আইন-সেবা ও ইচ্ছায় সঙ্গীত ও সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত আছেন এবং অতি সন্তর্পণে 'বাণী' ও 'কল্যাণী' প্রকাশ করিয়াছেন, এমন সময়ে বঙ্গ-ভঙ্গ লইয়া বঙ্গদেশে তুমুল স্বদেশী অন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হইল। রজনীকান্ত আন্তরিকতার সহিত এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন এবং "স্বদেশীর উন্নতি-বিষয়ক সভা, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই অগ্রসর হইলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা-সম্পাদনের জন্য সহচরগণকে সঙ্গে লইয়া সুদূর পল্লীতে—হাটে, মাঠে, ঘাটে অভিযান করিতে লাগিলেন।" সেই সময়ে রজনীকান্ত আর একটি কায করিলেন। তিনি "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই!" এই প্রাণপূর্ণ গানটি রচনা করিলেন। "এই গানের সঙ্গে সঙ্গে কান্তকবির নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।" রজনীকান্ত হঠাৎ দেশ-বিশ্রুত হইলেন। নলিনীবাবু এই ঘটনার সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গগত বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি সঙ্গীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। * * * যে গান দেববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান।" হয় ত এই মতের মধ্যে একটু অত্যুক্তি আছে; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এই একটি গান রচনা করিয়া কান্তকবি দেশ-বিশ্রুত হইলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সুফল ও কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নয়; কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন যদি আর কিছুই না করিয়া থাকে, তথাপি সে যে, কান্তকবিকে বাঙ্গালীর পরিচিত করিয়া দিল, উহাতেই ইহার সম্পূর্ণ সার্থকতা। যে কবি দেশবাসীকে—"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে", "কেন বঞ্চিত হব চরণে", "তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে", "আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ"—এই সকল অমূল্য, অতুল্য, অমোঘ গান উপহার দিয়াছিলেন, বাঙ্গালী তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই! আজ উত্তেজনার আবেগে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" দেখিয়া তাঁহাকে চিনিল। ইহাকেই বলে লোক-মতের খামখেয়াল। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে যেমন 'মারশেল' গান জাতীয় জীবন-তন্ত্রীতে তুমুল প্রতিধ্বনি তুলিয়া একদিনে দেশাত্ম হইয়াছিল, রজনীকান্তের এই "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" সেইরূপই হইল। অথচ গানের হিসাবে, কবিতার হিসাবে দেখিলে, এমন কি, জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে দেখিলেও এ গান কান্তকবির পূর্ণ পরিচায়ক নহে। "বন্দে মাতরম্," "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" "বঙ্গ আমার, জননী আমার," প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতের যে অমোঘতা আছে, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে" তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। রজনীকান্ত স্বয়ং ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—

ঐ অভ্রভেদী ধবল-শৃঙ্গে ফুটায়ে পদ্মরাগ,—
তাহে চরণ যুগল রাখ।
শুভ্র সুষমা চাহি না,—ভীম ভৈরবীরূপে জাগ্,
* * * * * *
আর, কিসের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা, প্রেমেরি গঙ্গা বো'ক্;
মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্য্যে, ফুটেছে আজ যে চোখ।
* * * * *

কিন্তু এ সকল সঙ্গীত "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে"র মত দেশায়ত হয় নাই। জাতীয় সন্ধিক্ষণে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" রচিত হইয়াছিল; এইজন্য বোধ হয় ইহার এত প্রসার।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আজ যে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব ও চরকা প্রবর্ত্তনের প্রসঙ্গ দেশময় ব্যাপকভাবে উঠিয়াছে, কান্তকবি তাহার পত্তন করিয়া গিয়াছেন।—

'আজ এক ক'রে দে সন্ধ্যা-নমাজ,
মিশিয়ে দে, আজ বেদ-কোরাণ!
* * * * * *
এবার যে ভাই তোদের পালা,
ঘরে ব'সে, ক'সে মাকু চালা।"

ইহার কিছুদিন পরেই কান্তকবির স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে আরম্ভ হয় এবং স্বদেশীর মন্দীভূত উচ্ছ্বাসের সময় আমরা তাঁহাকে রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনে দেখিতে পাই। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কান্তকবিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"সে ক্ষেত্রে রজনীবাবুই অভ্যর্থনা ব্যাপারের প্রাণ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া স্বরচিত হাসির গান এক একটা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; সভাস্থল হাস্যরসে মুখরিত হইয়া উঠিল, নির্ম্মল হাস্যরসের উৎস হইতে নিঃসৃত সুধাপান করিয়া সকলেই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইলেন। জানিতাম, আমাদের এই দিনে প্রাণে প্রফুল্লতা সমাগম করিয়া সজীব রাখিবার জন্য পশ্চিম-বঙ্গের এক দ্বিজেন্দ্রলালই আছেন; জানিলাম, উভয়ে সোদর—রজনীকান্ত তাঁহার যোগ্যতম সহকারী।"

এই হাসির গান সম্বন্ধে নলিনীবাবুর গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, ১৩০১ কি ১৩০২ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রাজসাহী গমন করেন এবং তথায় এক সভায় দ্বিজেন্দ্রবাবুর হাসির গান শুনিয়া রজনীকান্ত মুগ্ধ হন। তাহার পর হইতেই তিনি হাসির গান লিখিতে আরম্ভ করেন। "এই হাসির গান লেখা আরম্ভ করা অবধি তিনি ক্রমাগতই উহা লিখিতে থাকেন, ক্রমে গভীর ভাবাত্মক গান লিখিবার শক্তি তাঁহার নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। উত্তরকালে তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং দুই দিক্ বজায় রাখিয়া মাতৃ-বাণীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন।" ইহা বিচিত্র নয়—কারণ, হাসি ও অশ্রু যমজ ভাই। সেই জন্য সেক্সপীয়রের মত মহাকবির গভীরতম বিয়োগান্ত নাটকসমূহে শ্মশানের অদূরে প্রহসনের প্রস্রবণ দেখিতে পাই।

রজনীকান্তের অন্তস্তলে কিরূপ হাস্যরসের উৎস উচ্ছ্বসিত ছিল, নলিনীবাবু তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে ক্যানসার রোগ উৎকট হইলে এলোপ্যাথ ডাক্তাররা তাঁহার শ্বাসনালীর ট্রাকিয়া অংশে ছ্যাঁদা করিয়া দেয়—এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন "এলোপ্যাথরা ছ্যাঁদা করবার পর আমার গলার দড়ি খুলে দিয়ে বলেছে—এখন দুনিয়ার মাঠে চ'রে খাও গে।" শুনিয়াছি, পরিহাস-রসিক দীনবন্ধু নিজের পায়ে কার্‌বঙ্কল হইলে জনৈক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—"ফোড়া আমার পায়ে ধরেছে।"

আর একটা ডাক্তারদের সম্পর্কে রসিকতা শুনুন—"ওরা যখন গা ফুঁড়ে কি অস্ত্র করে, তখন মনে করে, আমরা বুঝি জড় পদার্থ; কিন্তু যখন ভিজিট নেয়, তখন আমরা প্রাণী!" এইরূপ অনাবিল শুভ্র হাস্য যাঁহার প্রাণে, তাঁহার রচিত হাসির গানে কঠোর কশাঘাত, নির্ম্মম বিদ্রূপ, ক্রূর কটাক্ষ থাকিতে পারে না। হাস্যরস সম্বন্ধে কান্তকবি এক স্থলে স্বয়ং লিখিয়াছেন:—"প্রকৃত Humour (ব্যঙ্গ) তাই, যাতে সমাজের বা ব্যক্তিবিশেষের weakness (গলদ) দেখিয়ে, তার rediculus side expose ক'রে (হাস্যরসাত্মক বিকৃত দিক্‌টা লোকের সামনে ধরে) সাধারণ ভাবে শিক্ষা দেয়। আমি যে সব humourএর (ব্যঙ্গের) অবতারণা করেছিলাম, তার একটাও নিষ্ফল কাজে লিখিনি।"

নলিনীবাবু তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে "হাস্যরসে কবি রজনীকান্ত" প্রসঙ্গে এ বিষয়ের নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যঙ্গ-কবিতার একটা সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি রজনীকান্তের হাসির গানের নমুনাস্বরূপ যে সকল গান ও কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠককে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি ;
এ সব করিয়া বাহির, বিদ্যা করেছি জাহির।

* * * * *

আমরা ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়ায় না মাথা
কে আছে এমন হিন্দু ?
আমাদেরই কোন পূর্ব্ব-পুরুষ
গিলে ফেলেছিল সিন্ধু।
গিরি-গোবর্দ্ধন ধ'রেছিল যেই,
মেরে ছিল রাজা কংসে ;—
তার বক্ষে যে লাথি মারে
সে যে জন্মেছিল এ বংশে।

আর একটা গানের নমুনা দেখুন :—

দেখ আমরা জজের Pleader,
যত Public movementএ leader.
আর Conscience to us is a marketable thing
[which] we sell to the highest bidder

কান্ত কবির হাসির গান সম্বন্ধে নলিনী বাবুর শেষ মন্তব্য এই :—

"তাঁহার ব্যঙ্গ, তাঁহার রঙ্গ, তাঁহার রহস্য, স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, শরতের আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, শিশুর হাসির মত সুন্দর, মাতার স্নেহের মত পবিত্র ;—ঔজ্জ্বল্যে মনের আঁধার ঘুচিয়া যায়,—সুনীল, নির্ম্মল স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়াইয়া আসে, আর সুন্দর, সরল ও পবিত্র-স্নেহে ও হাসিতে প্রাণ ভরিয়া উঠে। তাঁহার ব্যঙ্গে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই, সঙ্কীর্ণতার সঙ্কোচন নাই, অশ্লীলতার স্থান নাই, অনর্থক খোঁচা মারিয়া রক্তপাতের চেষ্টা নাই ; তাঁহার ব্যঙ্গে যাহা আছে, তাহা খাঁটি সোনা, তাহার সবটুকু সুন্দর, মনোহর ও পবিত্র।"

এ মন্তব্যের বোধ হয়, অনেকেই অনুমোদন করিবেন। বাঙ্গালার হাস্যরসের যদি দ্বিজেন্দ্রলাল রাজা হন, তবে রজনীকান্ত তাঁহার মহাপাত্র।

রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনে আমরা কান্ত কবিকে অফুরন্ত হাসিরাশি বিতরণ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এইবার বুঝি বিধাতা তাঁহার হাস্যরসের উৎস বন্ধ করিবেন। ১৩১৫ সালের মাঘ মাসে সাহিত্য-সম্মিলন আর ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার কাল-রোগ ক্যানসারের সূত্রপাত।

শরীর যখন অসুস্থ, তখন কান্তকবিকে কার্য্যোপলক্ষে রংপুর যাইতে হইল। সেখানে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১টা ১॥টা পর্য্যন্ত তিনি একা অক্লান্তভাবে হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধচিত্তে নির্ম্মমভাবে এই গীত-সুধা উপভোগ করিল। ফল—রোগবৃদ্ধি। রজনীকান্ত লিখিয়াছেন :—

"হঠাৎ হাস্‌তে হাস্‌তে গলায় ঘা হ'ল—তাই নিয়ে রংপুর গিয়ে তিন দিন গান কর্‌তে হ'ল। তার পর থেকেই এই দশা।"

ক্রমশঃই রোগের বৃদ্ধি। ১৩১৬ সালের ভাদ্র মাসে তিনি বাধ্য হইয়া কলিকাতা আসিলেন। ডাক্তার ওকিনেলিকে দেখান হইল,—তিনি বৈদ্যুতিক আলো ও বহুবিধ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—রোগ ক্যানসারই বটে, এবং Overstraining of the voice (অতিরিক্ত স্বর চালনাই) রোগের নিদান। এ কাল-রোগের প্রতীকার কে করিবে? অনেক চেষ্টা, অনেক চিকিৎসা, অনেক অর্থব্যয় হইল,—কিছুই ফল হইল না। ক্রমে রজনীকান্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া 'বাণী' ও 'কল্যাণীর' গ্রন্থস্বত্ব মাত্র ৪০০৲ টাকায় বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। 'বাণী' ও 'কল্যাণীর' মূল্য ৪০০৲ টাকা! নলিনী বাবু কবির কাতরোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"আমার এমন অবস্থা হ'ল যে, আর চিকিৎসা চলে না, তাইতে বড় আদরের জিনিষ বিক্রয় করেছি—হরিশ্চন্দ্র যেমন শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে বিক্রয় করেছিলেন। হাতে টাকা নিয়ে আমার চক্ষু দিয়ে জল পড়িতেছিল। আর ত তেমন মাথা নাই। আর ত লিখ্‌তে পার্‌ব না। যদি বাঁচি, জড় পদার্থ হ'য়ে রইল'ম।"

রোগ আরও বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে নিঃশ্বাস ফেলিতে ও শ্বাসগ্রহণে তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। তখন কাতরভাবে তিনি লিখিয়া জানাইতে লাগিলেন,—"হয় মৃত্যু, নয় শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার ক্ষমতা দাও, ঠাকুর!" এইবার এমন অবস্থা হইল যে, কণ্ঠের নালীতে অস্ত্রোপচার করা ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। আত্মীয়-স্বজন তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। মেডিকেল কলেজে Tracheotomy Operation জন্য তিনি ষ্ট্রেচরে করিয়া নীত হইলেন।

এই কণ্ঠনালীতে অস্ত্রোপচারের আশু সম্ভাবনায় নলিনীবাবু বড় খেদ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"জানি—কবির কলকণ্ঠ চিরতরে নীরব হইবে—জানি, তাঁহার প্রাণোন্মাদক সঙ্গীত সুধা আর পান করিতে পারিব না—জানি, তাঁহার সুধাসিক্ত চিত্তাকর্ষক আবৃত্তি আর শুনিতে পাইব না—জানি, তাঁহার হাস্যমুখর প্রাণভরা প্রাণখোলা কথা আর উপভোগ করিতে পারিব না—জানি সব, বুঝি সব,—কিন্তু তবু তিনি যদি রক্ষা পান * * * আর ভাবিবার সময় নাই,—অচিরে কবিকণ্ঠ নীরব করিতেই হইবে।" তাহাই হইল—ট্রাকিওটমি অস্ত্রোপচারে তাঁহার

কণ্ঠদেশে ছিদ্র করিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহার প্রাণরক্ষা করা হইল—কিন্তু, জন্মের মত তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল। এই মর্ম্মঘাতী ঘটনায় আক্ষেপ করিয়া গ্রন্থকার লিখিতেছেন,—"যে অমৃতনিঃস্যন্দী অক্লান্ত কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত-সুধা-ধারা নির্গত হইয়া সারা বাঙ্গালাদেশ প্লাবিত করিয়াছিল,—যে কণ্ঠোচ্চারিত প্রাণোন্মাদকর ভগবৎ-সঙ্গীতে শ্রোতার চক্ষে দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িত,—যে কণ্ঠ সাধন-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ভাবে গদ্গদ গম্ভীর হইত,—আর তার সঙ্গে সঙ্গে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া পুলক ও রোমাঞ্চে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিত—সেই কণ্ঠ—মধুময় সঙ্গীত-সুধার সেই অফুরন্ত প্রস্রবণ চিরতরে শুষ্ক ও নীরব হইয়া গেল!" আমার বিশ্বাস যে, এমন বাঙ্গালী নাই যে, নলিনী বাবুর এই আক্ষেপোক্তির সহিত সুর না মিলাইবে। বাস্তবিক রজনীকান্ত অতিশয় সুকণ্ঠ ছিলেন। যাহার কখনও তাঁহার সুর-সুধায় অভিষিক্ত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে, সে-ই গ্রন্থকারের কথায় সায় দিবে। অনেকে গন্ধর্ব্ব-কিন্নরের অস্তিত্ব মানেন না, আমি মানি এবং যাঁহারা কখন রজনীকান্তের স্বরলহরীতে প্লাবিত হইয়া পরব্যোমের অভিমুখে উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহারাও মানেন। সেই কিন্নর-কণ্ঠ চিরদিনের জন্য স্থগিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল।—বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য! কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? তাঁহার দেশবাসী, তাঁহার বন্ধুবান্ধব, তাঁহার প্রতিবেশী—যাঁহারা নিজের সুখের জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত স্বরচালনায় প্রণোদিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কমকণ্ঠকে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গীত-শক্তির অপচয় করিয়াছিলেন—তাঁহারা। আমার স্মরণ হয়, প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এক জন প্রসিদ্ধ ফরাসী গায়িকা (বোধ হয়, তাঁহার নাম মাদাম প্যাটী) অস্বাস্থ্য সত্ত্বে সঙ্গীত-মঞ্চে আবির্ভূতা হইয়া বহু কষ্টে নির্দ্দিষ্ট সঙ্গীত সমাপন করেন; কিন্তু তাঁহার গান শেষ হইবার পর শ্রোতৃমণ্ডলীর চতুর্দ্দিক্ হইতে এরূপ encore ধ্বনি উত্থিত হয় যে, সেই গায়িকা বাধ্য হইয়া সেই গানের দুইটি কলি পুনরাবৃত্তি করেন এবং তাহার সঙ্গে তিনি মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া সঙ্কটাবস্থায় পতিত হন। এই সংবাদে সমস্ত য়ুরোপে সে সময়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বার্থপরতার জন্য ধিক্কার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। যাহাদের স্বার্থপরতা আমাদের এই কবিকিন্নরকে অকালে ছিন্নকণ্ঠ করিল, তাহাদিগকে আমরা কি বলিয়া ধিক্কার দিব? বোধ হয়, তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ভগবান্ কান্তকবিকে এমন লোকে প্রেরণ করিলেন, যেখানে বিনা কণ্ঠে গীত উত্থিত হয় এবং যেখানকার শ্রোতারা মানুষের মত স্বার্থপর নয়।

অস্ত্রোপচারের পর রজনীকান্ত প্রায় সাত মাস জীবিত ছিলেন। জীবিত কি জীবন্মৃত, তাহা বলা কঠিন। এই সাতমাস কাল তিনি মেডিকেল কলেজের রোগী কেটেজে রুগ্ন শয্যায় শায়িত থাকিয়া অভাব, অনটন এবং আসন্ন মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এই সাতমাসের মধ্যে এক দিন তাঁহার একটি সুখের ঘটনা ঘটিয়াছিল।—তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়া একটি লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্র-বধূকে গৃহে আনিয়াছিলেন। ঐ পুত্রের বিবাহে তিনি ১০০০৲ টাকা পণ লইয়াছিলেন। তাহার সংবাদ পাইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সমাজরক্ষার অভিভাবকরা তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন—"এই রজনীকান্তই না 'বরের দর,' 'বেহায়া বেহাই' প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন? ইনিই এখন পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ করিলেন!" এই ঘটনা লইয়া নলিনীবাবু অনেক কষ্ট-কল্পনা করিয়াছেন এবং কবির হইয়া কৈফিয়ত দিবার প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আমার মতে এ প্রয়াস না করিলেও চলিত; তবে নলিনীবাবুর স্বপক্ষে উত্তম নজীর আছে। স্বয়ং কবি-গুরু বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বালীবধের কৈফিয়ত দিতে গিয়া এবং সিদ্ধ-কবি ব্যাস দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিরূপ অঘটন-ঘটনের ক্ষালন করিতে গিয়া কষ্ট-কল্পনার ত্রুটি করেন নাই। মানব-প্রকৃতিতে এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি, এইরূপ অঘটন-সংঘটন অশ্রুতপূর্ব্ব নয়। আদর্শ দেশ-প্রেমিক প্রতাপসিংহও এক দিন শিশু পুত্রের মুখ হইতে ঘাসের রুটী শ্বাপদকর্ত্তৃক অপহৃত দেখিয়া আকবরের নিকট সন্ধি-প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন।

হাঁসপাতালে কান্তকবি—এক দর্শনীয় দৃশ্য! ঐ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিবার যাঁহাদের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তাঁহারাই বিস্মিত, মোহিত, পুলকিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"আপনাকে দেখিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে! কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরও তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে, আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে।" নলিনী বাবু মর্ম্মস্পর্শী তুলিকায় রজনীকান্তের অন্তিম-জীবনের এই

দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবি-জননী মনোমোহিনী দেবীর একদিনকার একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। হাঁসপাতালে অবস্থানকালে একদিন রজনীকান্তের নাক দিয়া অনর্গল রক্তস্রাব হইতে লাগিল। এই রক্তপাতে তিনি অতিশয় কাতর হইয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন। আশী বৎসরের বর্ষীয়সী বিধবা এক পুত্রের মাতা মনোমোহিনী দেবীকে আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি লোক পাঠান হইল; সেই লোক কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের আসন্ন অবস্থা জানাইল; তখন কান্ত-জননী জপে নিযুক্তা ছিলেন, তিনি পুত্রের আসন্ন-মৃত্যু-সম্ভাবনাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিতা হইলেন না। তাঁহার ঐ সময়কার অবস্থা বর্ণন করিয়া রজনীকান্তের ভগিনী যাহা লিখিয়াছিলেন, নলিনীবাবু সেই বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। "গাড়ীতে উঠিয়া আমরা অনেকক্ষণ খুড়ী মাতাঠাকুরাণীর (মনোমোহিনী দেবীর) অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম, কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত বিলম্ব দেখিয়া, সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার নিকট গেলাম। যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আর এ জীবনে ভুলিব না। তিনি কুশাসনের উপর কালী-দুর্গানাম-শোভিত নামাবলী দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, মুদ্রিত নেত্রে জপে মগ্না রহিয়াছেন, যেন তাঁহার উপরে কোন ঘটনা ঘটে নাই, যেন তাঁহার একমাত্র পুত্র আজ মুমূর্ষু হন নাই, যেন তিনি চির-সুখিনী, যেন তিনি চির-ভাবনা-বিরহিতা। খুড়ী মাতাঠাকুরাণীর ভগ্নী ও আমার মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, —"এ কি? এ কি? আপনার কি কোন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নাই? আপনার কি চিরকালই এক ভাব? * * * মহামূল্য বসনাদি পরিধান করিয়া একমাত্র প্রিয়পুত্র অফিসে যাওয়ার সময়ে তিনি যেমন মনোযোগের সহিত জপ করিতেন, সেই পুত্র মুমূর্ষু শুনিয়া, তেমনই মনোযোগের সহিত জপ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি অশ্রুশূন্য অবস্থায় মুমূর্ষু পুত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের চক্ষে জলের সীমা-পরিসীমা ছিল না।" রামায়ণের কবি আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আহূতস্যাভিষেকায় বিসৃষ্টস্য বনায় চ।
ন ময়া লক্ষিতঃ কশ্চিদ্ রামস্যাকারবিভ্রমঃ॥"

দশরথ বলিতেছেন, "যখন রামকে অভিষেকের জন্য আহ্বান করিয়াছিলাম এবং যখন তাহাকে বনবাসে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম—এই দুই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের কোন আকার-বৈলক্ষণ্য দেখি নাই।" মনোমোহিনী দেবীর আমরা যাহা পরিচয় পাইলাম, এও সেই ধরণের কথা।

পরলোকবিশ্বাসী জনৈক খৃষ্টানের হাসিমুখে মৃত্যু দেখিয়া এক জন বলিয়াছেন—"দেখ দেখ, খৃষ্টান কেমন করিয়া মরে দেখ"—মনোমোহিনী দেবীকে দেখাইয়া আমরাও কি বলিতে পারি না—"দেখ দেখ, হিন্দু কেমন করিয়া মৃত্যুর করাল বিভীষিকা দর্শন করে, দেখ!"

কবির হাসপাতাল-বাসোপলক্ষে গ্রন্থকার তাঁহার তদানীন্তন সাহিত্য সাধনার পরিচয় দিয়াছেন।

নলিনীবাবু লিখিতেছেন—"হাঁসপাতালে দারুণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যে রজনীকান্ত যে ভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। প্রবল জ্বর, শ্বাস-কষ্ট, কাসির প্রাণান্তকর যন্ত্রণা, সর্ব্বোপরি ভোজন-কষ্ট—* * * সেই পীড়নের মধ্যেও তিনি যে সাহিত্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধুর ধারা পান করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসী পরিতৃপ্ত হইয়াছে।"

হাঁসপাতালে অবস্থানকালে কান্তকবি শিশুদিগের জন্য শিশু-পাঠ্য কবিতাগ্রন্থ 'অমৃত' প্রণয়ন করেন। ঐ 'অমৃত' সঞ্জীবনী সুধায় পরিপূর্ণ। রজনীকান্ত সেই দারুণ নিরানন্দের মধ্যেও জগজ্জননীর আনন্দময়ীরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া কতকগুলি আগমনী ও বিজয়ার গান রচনা করিয়া 'আনন্দময়ী' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। এই আনন্দময়ী সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—"ভগবান্‌কে কন্যারূপে আর কোন জাতি ভজন করে নি, যশোদার গোপাল আর মেনকার উমা ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাওয়ার দৃষ্টান্ত; এই বাৎসল্যভাবটা পরিস্ফুট করিয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য।" নলিনী বাবু 'আনন্দময়ী' হইতে কয়েকটি আগমনী ও বিজয়ার গান উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"কে দেখবি ছুটে আয়,
আজ, গিরি-ভবন আনন্দতরঙ্গে ভেসে যায়!"

* * * *

"নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মেলা
শ্রীপদনখে ক'চ্ছে খেলা,
(একবার) ঐ চরণে নয়ন দিয়ে সাধ্য কা'র ফিরায়?"

* * * *

"কান্ত কয়, ভাই নগরবাসি !
তোদের, সপ্তমীতে পৌর্ণমাসী,
দশমীতে অমাবস্যা, তোদের পঞ্জিকায়।"

ইহা আগমনী—একটি বিজয়া-সঙ্গীত শুনুন,—

"আজি নিশা, হয়ো না প্রভাত ;
পীড়িত মরমে আর দিও না আঘাত।
* * *
চির নিঠুরের ছবি, দশমী প্রভাত রবি।
তুইও কি উদিত হবি ? বধির জল্লাদ !
কান্ত বলে, রাজমহিষি ! পায় না যাকে যোগিঋষি
তিন দিন সে তোমার বুকে,—তবু অশ্রুপাত ?"

পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন যে, এই সময়ে কান্ত-কবির গীত-শক্তি স্তম্ভিত হইলেও কবি-শক্তি স্তিমিত হয় নাই। ইহার সবিশেষ পরিচয় পাই আমরা ঐ সময়কার কয়েকটি গানে। সেই গানগুলি দেশ-বিশ্রুত হইয়াছে ; অতএব তাহাদিগের প্রথম দুইটি ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করি,—

"আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ
গর্ব্ব করিতে চুর।"
* * *
"তুমি কেমন দয়াল জানা যাবে
আর কি তুমি আস্‌বে না।"
* * *
"বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙ্গে না হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী।"

নলিনীবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই দারুণ দেহপীড়ার মধ্যে যাতনার শলাকায় অহরহ বিদ্ধ হইয়াও কান্তকবি সাহিত্য-সাধনা করিতে পারিয়াছিলেন ! এমন কি, অনেক সময়ে উৎকট যাতনায় সাহিত্য-সেবাই তাঁহার বিনোদন ছিল। কিন্তু সাহিত্য-সাধকের পক্ষে ইহা বিচিত্র নয়। জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যথা, বেদনা দেহের—আত্মার নয় ; আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, শান্ত, দান্ত, চিরানন্দময়। আমরা দেহে আত্মবুদ্ধি করি বলিয়াই দৈহিক ভাব আত্মায় উপচরিত হয়—বৃত্তি-সারূপ্যম্ ইতরত্র। যিনি সাধক, তিনি নিজের সংবিৎকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় কোষ হইতে উত্তোলিত করিয়া বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে স্থাপিত করেন। তখন সেই আনন্দময়ের জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়।

"এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।"

ইহাই সাধকের বিশেষত্ব। কান্তকবি সাহিত্য-সাধক ছিলেন ; অতএব সাধারণ মানবের পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাঁর পক্ষে তাহা সহজ ও স্বাভাবিক।

"মুমূর্ষু রজনীকান্ত"-রূপ ঘনান্ধকারের মধ্যে স্নিগ্ধ আলোকের দুইটি রেখাপাত দেখিতে পাই। নলিনীবাবু উভয়েরই সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমটি কান্তকবির দেশবাসী কর্ত্তৃক তাঁহার সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি। দ্বিতীয় তাঁহার রোজনামচা। প্রথম প্রসঙ্গে মহারাজা মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী ও কুমার শরৎকুমারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহাদের সৌজন্য ও আর্থিক সাহায্য না পাইলে কবির সু-চিকিৎসা অসম্ভব হইত। তাঁহারা এ সম্বন্ধে দেশের মুখপাত্র হইয়াছিলেন। কারণ সেই সময় সমগ্র বঙ্গদেশে রজনীকান্তের প্রতি একটা সমবেদনার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। 'মেঘনাদবধের' অমর কবি মধুসূদন যখন দাতব্য চিকিৎসালয়ে দ্রুতপদে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছিলেন অথবা কবিবর হেমচন্দ্র যখন প্রবাসে অর্থ-কৃচ্ছ্র ভোগ করিতে-ছিলেন, বাঙ্গালী তখন উদাসীন ছিল। আজ রজনীকান্তের হাঁসপাতাল-বাসের সুযোগে সে ঐকান্তিক সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি করিয়া সেই কলঙ্ক ভঞ্জন করিল। বাঙ্গালী যেন এত দিন পরে বুঝিল যে, কবি মাত্র এক দিনের কর্ণ-বিনোদন গায়ন নহেন, তিনি কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক। সেই জন্য সে কান্তকবিকে তাহার মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিল এবং ভক্তিপুষ্পে তাঁহার অর্চ্চনা করিল। কবি তাঁহার রোজনাম্‌চায় এ জন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

"আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটুকুর জন্য কি চেষ্টা যে বাঙ্গালাদেশ করছে, তা আর ব'লে শেষ করা যায় না।" বিলাত থেকে রেডিয়াম্ নিয়ে এসে চিকিৎসার চেষ্টা হচ্ছে। তাতে ঢের টাকা লাগবে। তবু চাঁদা ক'রে তুলে রেডিয়াম্ এনে বাঁচাবে। সে তিন চারি হাজার টাকার কাজ।"

* * * *

বঙ্গে একটা নূতন প্রাণ এসেছে ; বিশ্বাস যদি না হয়, তবে একটু পীড়িতের ভাণ ক'রে সাত দিন পরে বিজ্ঞাপন দেন ত' * * * আমাকে দেশশুদ্ধ লোকে কেমন ক'রে যে ভালবাস্‌লে, তা বল্‌তে পারি না। আমার মলিন প্রতিভাটুকুর কত যে আদর কর্‌লে !"

* * * *

"বঙ্গদেশ আমাকে ছেলের মত কোলে ক'রে আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করছে, সেই জন্য আমি ধন্য মনে ক'রে ম'লাম।"

* * * *

"আমার একটুখানি প্রতিভা-কণিকার আদর যা বঙ্গদেশ কর্‌লে, তা unprecedented (অভূতপূর্ব্ব)। আমি দীর্ঘকাল পীড়িত হয়ে যখন অর্থহীন হ'লাম, তখন আমাকে ধনী সাহিত্যানুরাগীরা বুকে তুলে নিয়ে আমাকে প্রতিপালন করছে।"

* * * *

"আমার এত সৌভাগ্য,—আমার ব্যারাম না হ'লে বুঝতে পারতাম না। কোন্ পুণ্যে এই অসুখ হয়েছিল !"

কান্তকবির রোজনাম্‌চায় আমরা একাধিকবার উল্লেখ

করিয়াছি। ঐ রোজনাম্‌চা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। রোগ-শয্যায় হাঁসপাতালে কবি এই রোজনাম্‌চা রাখিতেন। ইংরাজরা যাহাকে 'ডায়েরি' বলে, ইহা সেরূপ ঘটনাত্মক দিনলিপি নহে। বরং ফরাসীরা যাহাকে Journal বলে—যাহাতে দৈনন্দিন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখক বিচিত্র জীবন-নাটকের সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেন—এ রোজনাম্‌চা সেই ধরণের! Amiel's Journalকে ইহার উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারা যায়। রজনীকান্তের রোজনাম্‌চা বাঙ্গালায় Amiel's Journal?

এই রোজনাম্‌চা সংগ্রহের জন্য নলিনীবাবুকে অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তিনি ঐ রোজনাম্‌চা হইতে অনেকগুলি পংক্তি উদ্ধার করিয়া সঙ্গত শিরোনামায় সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন—আমরা এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তবে আমার ইচ্ছা যে, তিনি সমস্ত রোজনাম্‌চাটি সযত্নে ও সাবধানে সম্পাদন করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তাহা হইলে কবির স্মৃতিসৌধের আর একটি চূড়া নির্ম্মিত হইবে।

যে অবস্থায় এ রোজনাম্‌চা লিখিত হয়, তাহাতে স্বভাবতঃ ইহা কবির মর্ম্মভেদী কাতরোক্তিতে মুখরিত। কান্ত বার-বার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন :—

"আমার গতি হোক দয়ার সাগর! আমি আর সইতে পারি না। করুণাময়! আর কষ্ট সহিবার ক্ষমতাও আমার লুপ্ত হয়েছে।"

*　*　*　*

"আনন্দময়ী আমার আরাধনার মা! আমার ভালবাসার মা! আমার বড় স্নেহের মা! আমার ক্ষমার ছবি মা! আয় কোলে নে। আমি পরিশ্রান্ত, বড় ক্লান্ত।"

*　*　*　*

"বড় কষ্ট রে, হীরা, বড় কষ্ট। হরি হে দয়াল সোজা হয়েছি। আর মের না এখনও নাও। * * কাছে টেনে নাও। আমার যে দোষটুকু আছে, তা তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিলেই সব চ'লে যাবে। * * দয়াল আর কষ্ট দিও না খুব মেরেছ, আর মের না।"

কিন্তু তথাপি তিনি ধর্ম্মে বিশ্বাস ও ভগবানে নির্ভর হারাইতেছেন না—তিনি বুঝিতেছেন ও বলিতেছেন—এ তাড়না নয়, শোধনা—মার নয়, প্রেম। রোজনাম্‌চার এ অংশগুলি অতীব সান্ত্বনাপ্রদ।

"আমাকে কাঁদাও। আমার পাষাণ হৃদয় ফাটাও। প্রাণ পরিষ্কার ক'রে দাও, খাদ উড়াও।"

"যাঁর দয়ায় এ পর্য্যন্ত বেঁচে আছি, তাঁরই দয়ায় কষ্ট পাচ্ছি। নিচ্ছেন আগুনে দগ্ধ ক'রে পাপের খাদ উড়িয়ে দিয়ে নিচ্ছেন; তা তো মানুষ বোঝে না,—মানুষ ভাবে, কষ্ট দিচ্ছেন।"

*　*　*　*

"আমাকে এই আগুনের মধ্যে ফেলে না দিলে খাঁটি হব কেমন ক'রে? যত angularities (খোঁচ খাঁচ) আছে, সব ভেঙ্গে সোজা ক'রে নিচ্ছে; নইলে পাপ নিয়ে, অসরলতা নিয়ে তো সেখানে যাওয়া যায় না।"

*　*　*　*

"এটা ঠিক জেনেছি যে, যত শাস্তি, তত প্রেম। এ তো কষ্ট নয়। সে যে তার কাছে নিতে চায়। তা আগুনের মধ্য দিয়ে খাদ পুড়িয়ে নির্ম্মল, উজ্জ্বল না করলে কেমন ক'রে সেখানে যাব?"

*　*　*　*

"আমি মার খাই প'ড়ে, দেখবার চোখ আমার নাই। মতি ভগবদ-ভিমুখী ক'রবার জন্য এই দারুণ রোগ, আর দারুণ ব্যথা, আর কষ্ট।"

*　*　*　*

"দেখুন, শাস্তি না হ'লে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কত জন্মজন্মান্তরের পাপ পুঞ্জ হ'য়ে আছে; ভগবান্ তো উচিত বিচার করবেনই; তার শাস্তি দেবেন না? এই শাস্তি ভোগ করছি; এতে দেহমনের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।"

*　*　*　*

"দয়াল আমার! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। মার্জ্জনা কর দয়াল, সকলেই একলা যায়, আমিও একলা যাব। চরণে স্থান দিও। তুমি ছাড়া আর কেউ নাই।"

*　*　*　*

"এই ঘটনা মঙ্গলময় ক'রছেন, তাঁর বিধান মান, তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে চিত্ত স্থির কর। আমি যে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।"

*　*　*　*

"মার নয়, প্রহার নয়, কষ্ট নয়, ব্যথা নয়,—সুধু প্রেম, সুধু দয়া।"

জগতে দুঃখ কেন—মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? কান্তকবির মত নির্দ্দোষ মানুষ কষ্ট পায় কেন?—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে Problem of Evil বলেন, সেই সমস্যা বিশ্বের চিরন্তন সমস্যা—দর্শন ধর্ম্মতত্ত্বের চূড়ান্ত সমস্যা। কান্তকবির রোজনাম্‌চায় ইহার অনেকটা সমাধান হয়; সেই হিসাবে এই রোজনাম্‌চার মূল্য খুব বেশী। এ সম্বন্ধে সার কথা তিনি নিম্নলিখিত গানে বলিয়া দিয়াছেন—

"তখন বুঝি নে আমি,
দয়াল হৃদয় স্বামি,
পাঠায়েছ শুভাশিস্,
　　দারুণ বেদনা-ছলে।

*　*　*

তার পর ভেবে দেখি,
এ যে তাঁরি প্রেম! একি?
শাস্তি কোথা? সুধু দয়া,
　　সুধু প্রেম—প্রতি পলে।"

এই ভাবেই প্রাচীনেরা বলিতেন,—

"যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।"

কান্তকবির জীবন ও সাধন-সঙ্গীত এই সূত্রের সার্থক ভাষ্য।

লেখনীমুখে পুঁথি বাড়িয়া এই সমালোচনা ক্রমেই সুদীর্ঘ হইল, অতএব এইবার ইহার উপসংহার করি; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একবার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতকে বঙ্গবাণীর সেবক ও সাধকবর্গের পক্ষ হইতে তাঁহার এই সুরচিত, সুগ্রথিত, সুচিন্তিত, সুখপাঠ্য 'কান্তকবি রজনী-কান্তের" জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।' *

* হৃষীকেশ সিরিজভুক্ত। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত রচিত। কলিকাতা ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, বেঙ্গল বুক কোম্পানী হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি টাকা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অবস্থা আকারে প্রকাশ

পাওনাদার—কি হে, যখন ৫০৲ টাকা মাইনে পেতে, তখন ত তবু সুদটা দিতে। এ যে ১শ' হ'য়ে তাও বন্ধ করলে! ব্যাপার কি?

কেরাণী— অবস্থা আকারেই প্রকাশ। বাগদা চিংড়ির বাবালোককের দাম ২ আনা, অথচ ধোপ কাপড় পরতে শয়। যেমন তেমন চাকরীতে আর ঘী ভাত নেই।

সংবাদপত্রের সম্বর্দ্ধনা।

বিলাতে পৌঁছিয়া সংবাদপত্রের সহিত পরিচয় হইতে আমাদের অধিক বিলম্ব হইল না। ১০ই অক্টোবর (১৯১৮) রাত্রিকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়া হাইড পার্ক কর্ণারের কাছে হাইড পার্ক হোটেলে বাসা লইলাম। পরদিন মন্ত্রি-সভা সে সংবাদ প্রকাশ করিলেন এবং ১২ই তারিখের সংবাদপত্রে আমাদের আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইল। সেদিন সকালেই অনেকগুলি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং আমাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। 'ডেলী মিরার' পত্রের লোক আমাদের ফটো তুলিয়া লইলেন এবং 'ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউস', 'টাইমস' ও 'অবজারভার' পত্র ৩ খানির প্রতিনিধিরা—আর এসোসিয়েটেড প্রেসের লোক সাক্ষাৎ করিয়া যাইলেন। 'টাইমস' আমাদের যে পরিচয় দিলেন, তাহাতে প্রবাসে ভারতীয় ছাত্রদিগের কাছে শ্রীযুক্ত কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গারের ও আমার আদর বাড়িয়া গেল। কারণ, তাহারা সকলেই জাতীয় ভাবের ভাবুক। 'টাইমস' পরিচয় দিলেন—মিষ্টার স্যাণ্ডব্রুক 'ইংলিশম্যান' পত্রের সম্পাদক, সে পত্র বে-সরকারী য়ুরোপীয়দিগের মুখপত্র; মিষ্টার মাবুব আলম লাহোরে 'পয়সা আখবর' নামক মুসলমানপত্র সম্পাদন করেন; পুনার 'জ্ঞান-প্রকাশ'-সম্পাদক মিষ্টার গোপালকৃষ্ণ দেবধর পরলোকগত গোখলের মডারেট মতাবলম্বী; আর মিষ্টার আয়াঙ্গারের সম্পাদিত মাদ্রাজের 'হিন্দু' ও মিষ্টার হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত কলিকাতার 'বসুমতী' চরমপন্থীদিগের পত্র।

হাইড পার্ক কর্ণার।

বিলাতে প্রথম যে নিমন্ত্রণ পাইলাম, সেও সংবাদপত্র-সেবকদিগের। নিমন্ত্রণপত্রের স্বাক্ষরকারী ৩ জন—'ইনষ্টিটিউট অব জার্ণালিষ্টসের' নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি মিষ্টার

গার্ভিন, পূর্ব্ব-সভাপতি মিষ্টার হিন্ড্রে ও সাগরপারের সমিতির সভাপতি লর্ড বার্ণহাম। তখন জলপথ বিপদসঙ্কুল; কাযেই আমাদের আগমন-দিন স্থির ছিল না—সেই জন্ত সময়ের অল্পতাহেতু অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি হইলে, তাহা ক্ষমা করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ ভ্রাতৃভাবে (fraternal) গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া—১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৮টার সময় সান্ধ্যভোজনে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইহাকে Fleet Street Supper of Greeting বলা হইয়াছিল। পত্রে স্বাক্ষরের পূর্ব্বে লিখিত—"Looking forward to the opportunity of improving acquaintance."

বিলাতে নানা সময়ের নানা বেশ—ভোজের বেশ স্বতন্ত্র। আমি সে সকলের জন্য চোগা ও চাপকান লইয়াছিলাম। কিন্তু পত্রে লিখিত ছিল—এ নিমন্ত্রণে যে কোন বেশ চলিবে। ফ্লীট ষ্ট্রীটে লণ্ডনের বহু সংবাদপত্রের কার্য্যালয় অবস্থিত—তাই এ ভোজের এমন নামকরণ হইয়াছিল।

এরূপ অনুষ্ঠানে সভাপতি অতিথিদিগের অভ্যর্থনা করিলে অতিথিদিগের পক্ষ হইতে উত্তরে বক্তৃতা করাই নিয়ম। নিমন্ত্রণ পাইয়া আমরা পরামর্শ করিলাম, কে বা কাহারা উত্তর দিবেন। এ বিষয়ে আমরা মিষ্টার ক্রেটনের ও মিষ্টার স্যাণ্ড-ক্রকের সঙ্গে আলোচনা করিলাম। মিষ্টার ক্রেটন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকুরীয়া—বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর "কমিশনার" অর্থাৎ "চেয়ারম্যান" ছিলেন। যুদ্ধের সময় ছুটীতে বিলাতে থাকায় তথায় গোয়েন্দা বিভাগের কায করিতে-ছিলেন। তিনি আমাদিগকে "দেখা-শুনার" ভার পাইয়া-ছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে হোটেলেই থাকিতেন। তাঁহার প্রধান কায ছিল—আমাদের উপর লক্ষ্য রাখা। কারণ, আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার পর বিলাতের সরকার সংবাদ পাইয়াছিলেন—আমাদিগকে, বিশেষ আয়াঙ্গার মহাশয়কে ও আমাকে "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং"—আমরা চরমপন্থী। মিষ্টার ক্রেটন ও মিষ্টার স্যাণ্ডক্রক উভয়েই বলিলেন, সে দেশের লোক কাযে ব্যস্ত—সকলে বক্তৃতা না করিয়া এক জনই সকলের

ফ্লীট ষ্ট্রীট।

হইয়া বক্তৃতা করিবেন। আমরা স্থির করিলাম, ভারতীয় সম্পাদকচতুষ্টয়ের পক্ষে এক জন ও মিষ্টার স্থাওক্রক স্বতন্ত্র বক্তৃতা করিবেন।

কিন্তু আমাদের মধ্যে কে বক্তৃতা করিবেন? আমি আয়াঙ্গার মহাশয়কে বলিলাম, "আপনিই ভার গ্রহণ করুন।" তিনি বলিলেন, তিনি রচনায় যত অভ্যস্ত, বক্তৃতায় তত অভ্যস্ত নহেন। আমি বলিলাম, "কিন্তু দেবধর বিষম মডারেট—মৌলবীর ত কথাই নাই। তাঁহারা কেহ বক্তৃতা করিলে, আমাদের অভাব অভিযোগের কোন কথাই বলা হইবে না। আমি যদি বলি, আপনি বয়সে বড়, আপনিই আমাদের হইয়া উত্তর দিবেন, তবে আর কোন আপত্তি হইবে না।" তিনি সম্মত হইলে আমি সেইরূপ ব্যবস্থা করিলাম। স্থির হইল, আমি বক্তৃতার খসড়া করিব। আমি খসড়া করিলে মিষ্টার স্থাওক্রক আসিয়া বলিলেন, "বক্তৃতা করার অভ্যাস আমারও নাই; ঐ এক বক্তৃতাতেই সব সারা হউক।" যৌথে বক্তৃতা হইবে বলিয়া সুর অনেকটা নামাইতে হইল। তাঁহার অনুরোধে আরও কতকগুলা বিষয় বাদ দিতে হইল—বক্তৃতাটা কতকটা মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িল।

মিষ্টার ক্রেটন।

১৫ই প্রাতে আমরা হেণ্ডনে বিমানের কারখানা দেখিয়া হেণ্ডলী-পেজ এরোপ্লেনে প্রায় ৩ হাজার ২ শত ফুট উচ্চে উঠিয়া আকাশ-ভ্রমণের পর তথায় আহার সারিয়া অপরাহ্ণে পার্লামেণ্টে হাউস অব লর্ডসে অধিবেশন দেখিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম এবং তাহার পর যথাকালে ইনষ্টিটিউটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম।

নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে গার্ডিনার, স্পেণ্ডার প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-সেবক এবং লর্ড ইসলিংটন, সার মাঞ্চারজী ভবনগরী প্রভৃতি ছিলেন। বহু পত্রের সম্পাদক বা প্রতিনিধিও আসিয়াছিলেন।

কার্য্যতালিকায় দেখিলাম, উত্তরে আমরা সকলেই বক্তৃতা করিব স্থির আছে! আয়াঙ্গার মহাশয়ের নাম সর্ব্বশেষে। মিষ্টার ক্রেটন বলিয়া দিলেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বক্তৃতা করিবেন।

অভ্যর্থনাব্যপদেশে 'অবজারভার' পত্রের সম্পাদক—সমিতির সভাপতি মিষ্টার গার্ভিন যুদ্ধে ভারতবর্ষের কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, কবি কিপলিং যে বলিয়াছেন, প্রাচী ও প্রতীচী কখন মিলিত হইতে পারে না—তাহা যথার্থ নহে, সভ্যতার আরম্ভ হইতে প্রাচী ও প্রতীচী মিলিত হইয়াছে। যুদ্ধে ভারতবর্ষের কৃত কার্য্য কখন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইবে না—যুদ্ধের পর পুনর্গঠনের সময় তাহা বিবেচিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি প্রথমে বক্তৃতার খসড়া করিয়াছিলাম, কাযেই আমার বক্তৃতা করিতে কোন অসুবিধা হইল না। আমি বলিলাম—ভারতের সংবাদপত্র বিলাতের সংবাদপত্রের আদর্শে উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার আশানুরূপ হয় নাই; অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান

পত্রসমূহ মুষ্টিমেয় বিদেশীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই করেন; আর সরকার দেশীয় সংবাদপত্রকে সন্দেহ করেন বলিয়া সংবাদপত্র সম্বন্ধে কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও আজ ভারতবর্ষে সংবাদপত্রই ভাববিস্তারের প্রধান উপায়—সংবাদপত্রই দেশের লোককে সরকারের কথা বুঝাইয়া দেয় ও বিদেশী শাসকসম্প্রদায়কে দেশের লোকের অভাব অভিযোগের কথা জানায়। আশা করি, যুদ্ধের পর এই সব অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টায় আমরা বিলাতের সংবাদপত্রের সাহায্য লাভ করিব। আমরা যুদ্ধে আমাদের কর্ত্তব্য যেমন ভাবে পালন করিয়াছি—আমাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য তেমনই ভাবে পালন করা ইংরাজের কর্ত্তব্য। আমরা স্বায়ত্তশাসন চাহি—তাহা প্রদান করাই ইংরাজের কর্ত্তব্য।

আয়াঙ্গার মহাশয়।

ভোজ শেষ হইলে আমাদিগকে সঙ্ঘের সদস্য করিয়া নিয়োগপত্র প্রদান করা হইল। এই পত্র আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম।

১৭ই অক্টোবর বিলাতের প্রসিদ্ধ সুচিত্রপত্র 'ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউসের' কর্ত্তারা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। আমরা প্রাতরাশ শেষ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যালয়ে গমন করি এবং তথায় পত্রখানি ছাপার ব্যবস্থা দেখি। বৃহৎ বৃহৎ প্রেসে পত্রখানি ছাপা হইতেছে এবং কাগজ ভাঁজা হইতে বই বাঁধা পর্য্যন্ত নানা কায মেয়েরা করিতেছে। এই সচিত্রপত্র ছাপিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়—পাছে ছাপা খারাপ হয়।

ছাপার সব ব্যবস্থা দেখাইয়া তাঁহারা আমাদিগকে আহারের জন্য এক ভোজনাগারে লইয়া গেলেন। ভোজনের এমন বিপুল আয়োজন—ভোজ্যদ্রব্যের এত সমাবেশ বিলাতে আর কোথাও দেখি নাই। যুদ্ধের সময় বিলাতে খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল; কিন্তু আমরা জাতির অতিথি বলিয়া কেহ আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে যথেচ্ছা আহার্য্য সংগ্রহের অধিকার লাভ করিতেন। 'নিউসের' কর্ত্তারাও সেই অধিকার পাইয়া তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভোজনের মত পানের ব্যবস্থাও ছিল এবং মিষ্টার স্থাওক্রক এবং আমাদের সহগামী মিষ্টার ক্লেটন ও লেফটেনান্ট লং পানীয়ের যথেষ্ট "সুবিচার" করিয়াছিলেন। এই লেফটেনান্ট লং পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ছিলেন এবং মামুদাবাদের রাজার কর্ম্মচারিরূপে লক্ষ্ণৌয়ে একখানি সংবাদপত্র পরিচালন করেন। ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই রাজা সাহেব একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের কর্ম্মচারীরা সেনাদলে উচ্চপদ পায় আর আমাদের পুত্ররা সে অধিকারে বঞ্চিত!" যুদ্ধের সময় বিলাত হইতে 'সত্যবাণী' নামক যে পত্র প্রচারিত হইত, লং তাহার ভার পাইয়াছিলেন।

আহার্য্যের মধ্যে ভারতীয় পোলাউ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হোটেলের কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন—তথায় এক জন ভারতীয় পাচক আছে। তাহাকে ডাকা হইল। সে নেপালী, কিন্তু বোম্বাইবাসী। 'নিউসের' সেক্রেটারী খুসী হইয়া তাহাকে ১ পাউণ্ড (১৫ টাকা) পুরস্কার দিলেন। আহার্য্যের আয়োজন যেমন বিপুল, বকশিসের বহরও তেমনই বড়; পরিবেশনকারী দুই জন ও পানীয়-প্রদাতা প্রত্যেকে ১৫ টাকা করিয়া বকশিস্ পাইল।

সেইদিনই আমরা ভারত-সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।

বিলাতে সংবাদপত্রসেবকদিগের সঙ্ঘ—"ইনষ্টিটিউট অব জার্ণালিষ্টস" আর সংবাদপত্রের অধিকারী প্রভৃতির সঙ্ঘ "এম্পায়ার প্রেস ইউনিয়ন।" ইউনিয়নও আমাদের সংবর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। ১লা নভেম্বর অপরাহ্ণ ৪টার সময় "ষ্টেসনার্স হলে" সে সংবর্দ্ধনা হইয়াছিল। ষ্টেসনার্স কোম্পানী অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর

প্রারম্ভে সংস্থাপিত। পুস্তকের উৎপাদক ও বিক্রেতাদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পুস্তক প্রকাশ করিতে হইলে অনুমতি লইতে হইত এবং বিনানুমতিতে প্রকাশিত পুস্তক নষ্ট করিবার অধিকার ছিল। সেই অধিকার অনুসারে ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে "ষ্টেসনার্স কোম্পানীকে" নিম্নলিখিত আদেশ দেওয়া হয়—

These are to Require you to Damask or obliterate whatsoever Sheets you have seized of a Book intitled Leviathan and for your so doing this shall be your Warrant.

কোম্পানীর খাতায় বহু প্রাচীন পুস্তকের নাম লিখিত আছে—সেক্সপীয়রের নাটকসমূহ সে সকলের অন্যতম। এই গৃহে নানা পুরাতন দ্রব্য সযত্নে রক্ষিত। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীন যখন লণ্ডনে কোন ছাপাখানায় কায করিতেন; তখন তিনি যে "কম্পোজিং ষ্টিক" ব্যবহার করিয়াছিলেন - তাহাও রক্ষিত হইয়াছে।

বিলাতে এইরূপ বহু পুরাতন প্রতিষ্ঠান আছে এবং সে সকল সযত্নে রক্ষিত হয়। চার্লস রবার্ট রিভিংটন লিখিত "ষ্টেসনার্স কোম্পানীর" ইতিহাস পাঠ করিলে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ বুঝিতে পারা যায়। "এম্পায়ার প্রেস ইউনিয়ন" আমাদিগের প্রত্যেককে একখানি করিয়া এই পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন।

সদস্যনিয়োগ পত্র

এই সংবর্দ্ধনায় প্রভূত লোকসমাগম হইয়াছিল। সভাপতি লর্ড বার্ণহাম আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া সংবাদপত্রের শক্তি, ভারতের সামরিক কার্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে মামুলী কথা বলেন। তখন ইংরাজের মুখে ভারতের প্রশংসার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাহার পরই রৌলট আইন, তাহার পরই জালিয়ানওয়ালাবাগ। তিনি বলেন—ভারতের কোন কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র "ইউনিয়নের" সদস্য থাকিলেও দেশীয় ভাষায় পরিচালিত কোন পত্রই সদস্য নাই এবং তিনি শুনিয়াছেন, সংবাদ সম্বন্ধেই ভারতীয় পত্রের কিছু ত্রুটি আছে। তিনি আমাদিগকে এ বিষয়ে উপায় স্থির করিবার জন্য বিবৃতিপত্রে সব কথা ব্যক্ত করিয়া "ইউনিয়নে" প্রদান করিতে বলেন। শেষে তিনি বলেন, তুরস্কের পরাভবে মুসলমানের দুর্দ্দশার অবসান হইবে! বোধ হয়, মিষ্টার মাবুব আলম যে বলিয়াছিলেন—তুরস্ক পরাভূত হইয়াছে জানিয়া ভারতবাসীরা আনন্দিত হইবে—তাহাতেই লর্ড বার্ণহাম এমন কথা বলিতে সাহস করিয়াছিলেন।

এই সংবর্দ্ধনায় লর্ড মেয়র লণ্ডনের পক্ষে আমাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের রত্ন-স্বরূপ ভারতে লণ্ডনের লোকের মনোযোগের অভাব নাই। মনোযোগ! এ মনোযোগে ভারতের উপকার হইয়াছে, না দারিদ্র্য ও অসহায়তা বিবর্দ্ধিত হইয়াছে?
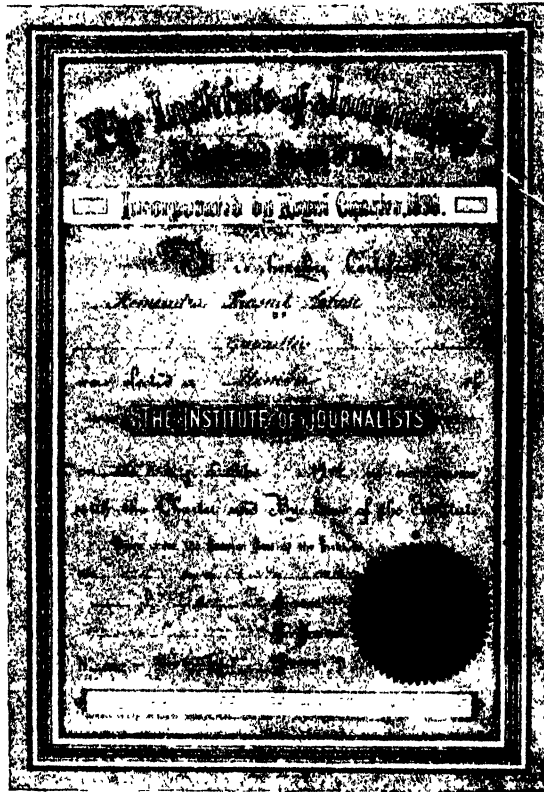
মিষ্টার স্তাওব্রুক যুদ্ধে ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের ত্যাগের বিশেষ উল্লেখ করিয়া বলেন, যুদ্ধে তাঁহাদের মধ্যে এত লোক প্রাণ দিয়াছেন যে, যুদ্ধান্তে তাঁহাদের সংখ্যা আরও কম হইবে। অথচ যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাবে ইঁহাদের আপত্তির অন্ত ছিল না!

আয়াঙ্গার মহাশয় ভারতে সংবাদপত্রের অসুবিধার কথার

কিছু আলোচনা করেন এবং বলেন, বিলাতের লোকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতায় তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। যুদ্ধের সময় কোন কোন ভারতীয় পত্র বিলাতে আসিতে দেওয়া হয় না।

লর্ড বার্ণহামের ছেঁদো কথায় ও মিষ্টার স্যাণ্ডক্রফের কথায় আমি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম, ভারতে সংবাদপত্রের প্রতি সরকারের অযথা ব্যবহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। সেজন্য আমি আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়া আফিসের পুস্তকাগারে গিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত তাহার আলোচনাও করিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে বলিয়াছিলেন, "উহারা যখন আদর অভ্যর্থনা করিতেছে, তখন এ সব অপ্রিয় কথা বলা কি ভাল হইবে? একে ত—তোমার সম্বন্ধে ভারত সরকারের মত এই যে, তুমি—অর্থাৎ তুমি খুব safe নহ।" কিন্তু শেষে তিনি বলিলেন, "তুমি যখন মনে করিতেছ, দেশের কাযের জন্য কাহারও প্রীতি বা অপ্রীতি অর্জ্জন করিতে দ্বিধাবোধ কর না, তখন এ সব কথা বলিতে পার। কিন্তু দেখিও, যেন অসংযত হইও না।" আমি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বক্তৃতা লর্ড বার্ণহাম প্রভৃতির প্রীতিপ্রদ হয় নাই।

সংবাদপত্র সম্বন্ধে ভারতীয় সরকারের ব্যবস্থা ও ব্যবহার বুঝাইবার জন্য আমি বলিয়াছিলাম—সরকার যুদ্ধের অবস্থা দেখিবার জন্য বিশ্বাস করিয়া আমাকে মেসোপোটেমিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন এবং এবার বিলাতে আনিয়াছেন—অথচ তাঁহাদের মতে আমার সম্পাদিত পত্র এমনই ভয়ঙ্কর যে, ব্রহ্মে তাহার প্রবেশাধিকার নাই; যেন ব্রহ্মপ্রবাসী মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী 'বসুমতী' পাঠ করিলেই তথায় ইংরাজ-শাসন বিপন্ন হইবে! আমার বন্ধু আয়াঙ্গার মহাশয়ের পত্র 'হিন্দু' ত বিলাতেও আসিতে পায় না! যে সরকারকে বিলাতের লোকের কাছেও এত ঢাকাঢাকি করিতে হয়, সে সরকার কেমন? যদি আমাদের দোষ থাকে, আইন অনুসারে আমাদিগকে অভিযুক্ত করাই সরল পথ। তাহা না করিয়া সরকার ডাকঘরের আইনের ছল ধরিয়া কোন কোন প্রদেশে পত্রপ্রচার বন্ধ করেন।

সংবর্দ্ধনা হইতে ফিরিবার পথে মিষ্টার ক্রেটন বলিলেন, "মিষ্টার ঘোষ, আজ ও সব কথা বলিবার, সরকারের ব্যবহারের অত তীব্র সমালোচনা করিবার উপযোগিতা কি?" আমি উত্তর দিলাম, "বিলাতের পত্রপরিচালকরা জানুন, তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা ভারতে সংবাদপত্রকে কেমন স্বাধীনতা দেন।" মিষ্টার ক্রেটন তর্ক করিতে যাইতেছিলেন—আয়াঙ্গার মহাশয় বলিলেন, "ও বিষয়ে আমাদিগকে পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিবেন না।"

লর্ড নর্থক্লিফ আমাদিগকে এক দিন সংবর্দ্ধিত করিবেন, কথা ছিল। ইহার পর সে কথা আর শুনা গেল না। বোধ হয়, স্থির হইয়াছিল—যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে, তাহাদের মুখে ভারতে ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থার এমন পরিচয় প্রদানের অধিক সুযোগ দেওয়া আর সঙ্গত নহে।

যশ।

(জীবনে ও মরণে)

এ পারে মরুভূ ধূ ধূ
দহে পদ ঈর্ষ্যাসিতকায়
লুব্ধ করে' ক্ষুব্ধ করে
যশ হেথা মরীচিকা প্রায়।

মরণের পরপারে
ধরেছে সে স্নিগ্ধ-শ্যামকায়া
কূজন-গুঞ্জন স্তবে
পুষ্প অর্ঘ্যে, ঋদ্ধ বনচ্ছায়া।

শ্রীকালিদাস রায়
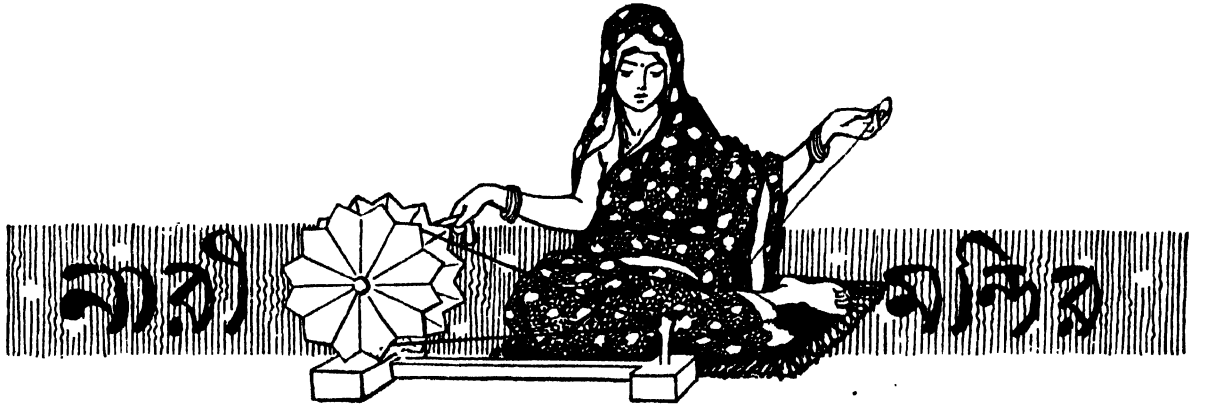
বিবাহ-বন্ধন।

মাতৃত্বের মূল বিবাহ। সমাজ-বদ্ধ নর-নারীর মধ্যে বিবাহ চিরন্তন প্রথা। সৃষ্টির আদিকালে সকল জাতির ইতিহাস এ সম্বন্ধে অস্পষ্ট হইলেও পরে বিবাহ সকল দেশেই অবশ্য-পালনীয় প্রথা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অসভ্য বর্ব্বরদের মধ্যেও কোনও না কোনও রূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে আর্য্যদিগের পুরাণেতিহাসে শ্বেতকেতু হইতেই বিবাহপ্রথার উৎপত্তি। শ্বেতকেতু আপনার জননীকে অপর পুরুষ কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইতে দেখিয়া এই বন্ধনের সৃষ্টি করেন বলিয়া কথিত। এখন বিবাহ হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হিন্দুর বিবাহ পবিত্র পুণ্যকর্ম্ম—ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া মানিত। ইহকালে এই বিবাহের বন্ধন ছিন্ন হয় না; অন্ততঃ হিন্দু স্ত্রী বিধবা হইলে তাহার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা প্রচলিত নাই। সুতরাং এ দেশে হিন্দু-সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ নাই, divorce courtsও নাই। অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া বিবাহের নড়চড় হইতে পারে না, এ কথার হাতে-কলমে প্রমাণ এখনকার কালে পাওয়া না গেলেও পুঁথিতে আছে,—শাস্ত্রের অনু-শাসনে হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য।

প্রতীচ্যের সহিত তুলনা।

প্রতীচ্যের খৃষ্টানদের মধ্যেও এমন অনেক গোঁড়া খৃষ্টান আছেন, যাঁহারা গির্জ্জায় গিয়া পাদরীর হাতে বাইবেল স্পর্শ করিয়া, পাদরীর মুখে উচ্চারিত বাইবেলের মন্ত্র আওড়াইয়া বিবাহ করাকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, সেই ধর্ম্ম সাক্ষ্য রাখিয়া বিবাহ-বন্ধন পতি-পত্নীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত অচ্ছেদ্য। সুতরাং তাঁহারা বিবাহবিচ্ছেদ বা divorceকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতীব অল্প। প্রতীচ্যে সাধারণতঃ বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য বলিয়া মানিত নহে।

ফাজিল রমণী।

আবার বর্ত্তমানে প্রতীচ্যের এক শ্রেণীর নর-নারী মূলতঃ বিবাহেরই বিরোধী। তাঁহারা ফাজিল রমণী বা surplus womenএর পক্ষপাতী। সমাজতত্ত্বজ্ঞ লেখকরা surplus womenএর বিরোধী। কিন্তু অপর পক্ষ বলেন, যাহারা স্বার্থপর, যাহারা আত্মম্ভরী, তাহারা ফাজিল রমণী সমাজে রাখায় আপত্তি করে, অন্যথা সমাজে অবিবাহিতা রমণী থাকিলে—সে রমণী আপনার ও আপনার দরিদ্র পিতামাতার সংসারের ভরণপোষণে আত্মনিয়োগ করিলে সমাজের কোনও ক্ষতি হয় না, বরং প্রকারান্তরে তদ্দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করে।

ডোরোথি রোজের কথা।

আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। কুমারী ডোরোথি রোজ প্রতিভাশালিনী লেখিকা। তিনি প্রতীচ্যের সমাজের একটা দিক আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, সমাজে অবি-বাহিতা নারী থাকিলে সমাজের কোনও ক্ষতি নাই। তাঁহার মূল যুক্তি এইরূপ :—

"পুরুষরাই চীৎকার করে যে, নারী বিবাহিতা হইলে—নারী সমাজে ফাজিল (surplus) রূপে বিদ্যমান না থাকিলে—বর্ত্তমান সমাজের এতটা অপকার হইত না, সমাজে এত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত না। বস্তুতঃ পুরুষ অতিরিক্ত স্বার্থপর বলিয়াই এইরূপ মনে করে। তাহাদের সেকেলে ভ্রমসঙ্কুল ধারণার এখনও অবসান হয় নাই। সেকেলে

পুরুষের মত তাহারাও এখনও মনে করে, পুরুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করাই নারীর জীবনের একমাত্র ব্রত। নারী যদি তাহা না করে, তাহা হইলে সে পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি করে মাত্র।

"নারীর প্রতি এই সব পুরুষের মনের ভাবটা অনেকটা আবদেরে বালিকার মত। বালিকা যেমন অনেকগুলা টুপী বাছিয়া শেষে একটা টুপী পছন্দ করে এবং বক্রী টুপীগুলা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, পুরুষও তেমনই অনেকগুলা নারীর মধ্য হইতে একটা নারীকে স্ত্রীরূপে বাছিয়া লইয়া অপরগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলে, মনে করে, তাহার স্ত্রীটিই জগতের পক্ষে আবশ্যক, বক্রী নারীগুলা ফাজিল (surplus)।

"পুরুষ নিজের সুখ ও কামনার দিক হইতে নারীর প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তার বিচার করে, সমগ্র সমাজের দিক হইতে করে না। স্বার্থপর পুরুষ বলে,—গৃহসংসারই নারীর রাজত্ব; নারীর বিবাহিত জীবন এবং মাতৃত্বই নারীর সন্তোষের মূল; উহা নারীর সুখ ও শান্তির আকর হওয়া উচিত। অবিবাহিতা নারী সমাজে অপ্রয়োজনীয়।

"কিন্তু নারী অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে না; সে বিবাহ না করিলেই surplus বা ফাজিল হয় না; সেও পুরুষের মত honest work বা শ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া সমাজের উপকারসাধন করিতে পারে। বহু বিবাহিতা নারী স্বামীর অর্থে পুষ্ট হইয়া, প্রজাপতিটির মত ফুরফুরে হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইয়া, সন্তানকামনা বর্জ্জন করিয়া, বন্ধুগণকে পোষাক-পরিচ্ছদের ও অলঙ্কারের জাঁকজমকে হারাইয়া দিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় হৃদয়টা পুরিয়া ফেলিয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। এই শ্রেণীর বিবাহিতা নারী অপেক্ষা 'ফাজিল' নারী সহস্রগুণে ভাল। 'ফাজিল' রমণী বিবাহিতা রমণীর ন্যায় বিবাহ করিয়া ও সন্তানজননী হইয়া কোনও পুরুষকে সুখী করিতে না পারে, কিন্তু সে যে তাহার দরিদ্র বুভুক্ষু সংসারকে অন্ন যোগাইয়া সুখী করে এবং তাহার দ্বারা সমাজের একটা প্রয়োজন সরবরাহ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"সুতরাং যাঁহারা বলেন, নারী অবিবাহিতা থাকিলে সমাজের ক্ষতি হয়, তাঁহাদের যুক্তির ভিত্তি নাই। যদি নারীর পক্ষে এ কথা খাটে, তাহা হইলে পুরুষের পক্ষেও খাটে। এমন অনেক পুরুষ আছেন, যাঁহারা পরিবার পোষণ করিতে পারেন, অথচ বিবাহ করেন না। যদি বলা যায়, নারীর বিবাহ বিধাতার লিখা, তাহা হইলে পুরুষের বিবাহও বিধাতার লিখা (destiny)। পুরুষ ক্ষমতা সত্ত্বেও আলস্য ও স্বার্থপরতাহেতু বিবাহ না করিলে তাহার দোষ ধরা হয় না, আর নারী পিতামাতার দরিদ্র সংসারের কথা চিন্তা করিয়া অবিবাহিতা থাকিয়া সংসারের জন্য রোজগার করিলেই যত দোষ হয়; ইহাই ন্যায়বিচার বটে।"

আমরা আধুনিক চিন্তাশীলা সমাজতত্ত্বজ্ঞা অসংখ্য লেখিকার রচনা হইতে মাত্র একটি উদ্ধার করিয়া দেখাইলাম। পাঠক ইহা হইতে বুঝিবেন, বর্ত্তমান প্রতীচ্যের চিন্তাস্রোতঃ কোন খাতে প্রবাহিত হইতেছে।

জননী

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু।

বিবাহটা কুসংস্কার।

বস্তুতঃ প্রতীচ্যে এখন কোনও কোনও শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিবাহটা ধর্ম্ম-কার্য্যের মধ্যে—অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়া দূরে থাকুক, সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়াই মানিত হইতেছে না। সেই সেকেলে শাস্ত্রোক্ত—

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনং'

এখনকার কানে আওড়াইলে ইঁহাদের সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয় সন্দেহ নাই। বিবাহ সম্বন্ধে আধুনিক প্রতীচ্যের মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের কেমন ধারণা, তাহা গ্রাণ্ট অ্যালেনের লেখার মধ্য দিয়া বেশ সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রাণ্ট অ্যালেন বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক। তাঁহার ন্যায় মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত লেখক এক টমাস হার্ডি ও এইচ. জি. ওয়েলস ব্যতীত বর্ত্তমান ইংলণ্ডে আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ, বিলাতের বড় বড় সমালোচক এই কথা বলিয়া থাকেন।

গ্রাণ্ট অ্যালেনের একখানি জগদ্বিখ্যাত উপন্যাসের নাম The British Barbarians. বার্ট্রাম এই উপন্যাসের নায়ক এবং ফ্রাইডা নায়িকা। ফ্রাইডার স্বামীর নাম মন্‌টিথ, সে একটা নগণ্য ভূমিকার চরিত্র মাত্র। আমি এই উপন্যাসের কোন কোন স্থান হইতে রচনা তর্জ্জমা করিয়া দিতেছি, পাঠক ইহা হইতে বুঝিবেন, প্রতীচ্যে বিবাহ-বন্ধনের দিকে আধুনিক সমাজের নর-নারীর টান কিরূপ ও কতটুকু।

নায়ক ও নায়িকার কথোপকথন হইতেছে :—

(১) বার্ট্রাম।—তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কখনই বলিতে পার না, তুমি তাহাকে (স্বামী মন্‌টিথকে) ভালবাস।

ফ্রাইডা।—না, বিবাহের পর প্রথম কয়মাস ছাড়া তাহাকে ভালবাসি নাই। কিন্তু বার্ট্রাম, তাহা হইলেও সে আমার স্বামী, আমায় অবশ্যই তাহার বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে।

বা।—না, তোমায় এরূপ কোনও কাযই করিতে হইবে না। তুমি তাহাকে আদৌ ভালবাস না, অতএব তোমার ভালবাসার ভাণ করাও উচিত নহে। ইহা অন্যায়, ইহা পাপ।

* * *

(২) বা।—তোমার উপর তোমার স্বামীর কোনও দাবী নাই, তোমার সমাজে হেয় করিবারও তাহার কোনও অধিকার নাই। তুমি আজ রাত্রিতে ঘরে ফিরিয়া যাও, ক্ষতি নাই; কিন্তু প্রিয়তমে, আমার সহিত সর্ব্বদা দেখা করিও। যদি তুমি আমার এই ঘরে অনুক্ষণ আসিতে সঙ্কোচ বোধ কর —যদি বাড়ীওয়ালী বিবি ব্লেকের অন্ধ বিশ্বাস (তাহার গৃহের 'পবিত্রতা') নষ্ট করিতে ভয় হয়, তাহা হইলে অন্যত্র আমার সহিত মিলিত হইও।

ফ্রা।—কিন্তু বার্ট্রাম, কাযটা কি ন্যায্য হইবে?

বা। কেন, ফ্রাইডা, কায যদি অন্যায় হইত, তাহা হইলে আমি কি তোমাকে উহা করিতে পরামর্শ দিতাম? আমি আছি তোমায় সাহায্য করিতে, তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতে, ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর—সত্য হইতে সত্যতর জীবনযাপনে শিক্ষা দিতে। যদি আমি নিশ্চিত না বুঝিতাম এবং বিশ্বাস না করিতাম যে, ইহাই ন্যায্য এবং উচিত জীবন-যাত্রা, তাহা হইলে কি আমি তোমায় উহা করিতে বলিতাম?

* * *

বার্ট্রাম।—ইংলণ্ডে অনেকে বিনা যুক্তিতর্কে মনে করে যে, যদি নর-নারী নিজেদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নিজেরা বাছিয়া ঠিক করিয়া লইত—সমাজের বা সম্প্রদায়ের তোয়াক্কা না রাখিত, তাহা হইলে সামাজিক জীবন ও শৃঙ্খলা একেবারে রসাতলে যাইত; পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড নরকে পরিণত হইত এবং সমাজটা একবারে ধ্বংস হইয়া যাইত। এই মন-গড়া অসম্ভব অশুভ ফল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নানা কঠোর বন্ধন দিয়া নর-নারীর পরস্পরের জীবনকে শৃঙ্খলিত করা হইয়াছে এবং নর-নারী এই বন্ধন অতিক্রম করিলেই অতি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে।

* * *

বা।—বন্ধনের মধ্যে **সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ও অপকৃষ্ট হইতেছে বিবাহ-বন্ধন** এবং তৎসংক্রান্ত নর-নারী-ঘটিত অন্যান্য বন্ধন। অতি আদিম অসভ্য যুগে মানুষের কৃত এই সকল অযুক্তিসঙ্গত অন্যায় বন্ধন ছিল। প্রস্তরযুগে মানুষ ভিন্ন জাতীয় মানুষের নারীকে লগুড়াঘাতে ভূতলশায়িনী করিয়া, পরে তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া নিজের গুহামধ্যে দাসী করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া যাইত. **সেই প্রথা হইতেই বিবাহের উৎপত্তি হইয়াছে।**

* * *

বা।—জগতে যত প্রকার ঘৃণাকর বন্ধন আছে, তন্মধ্যে বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণাকর। বিবাহ, পবিত্র ও নৈতিক বলে উন্নত সমাজের উপযোগী নহে।

* * *

বা।—প্রকৃতি আমাদিগের অন্তরে প্রেমের এমন ঐশী প্রেরণা দিয়াছেন, যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি, কাহার সহিত আমরা স্বেচ্ছায় মিলিত হইতে পারি।

* * * *

বা।—আমার মতে প্রত্যেক নরনারী নিজ দেহ সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন; কারণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ইহাই মূল ভিত্তি।

* * * *

ইহার উপর পাঠক প্রতীচ্যের বিবাহ-বন্ধনের প্রতি মনোভাবের আরও পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করেন কি? গ্র্যাণ্ট অ্যালেন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ভবিষ্যতের নর-নারীর কল্পনা করিয়া এই অদ্ভুত চরিত্রচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও প্রতীচ্যের বন্ধন-বিরোধী মুক্তপ্রাণ advanced সমাজ-সংস্কারক যে সমাজে বিবাহকে অতি নিকৃষ্ট আসন দিয়া থাকেন, ইহা তাহারই কতকটা পরিচায়ক। ইঁহাদের নিকট "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা," "বন্ধন," "প্রেম", "ন্যায় ও সত্য,"—প্রভৃতি শব্দ কি ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। বিবাহের বন্ধনই যেখানে সহিষ্ণুতার বাঁধ মানে না, সেখানে গৃহিণীত্বের বা মাতৃত্বের উপকারিতা যে স্বীকৃতই হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ভাবের 'মনস্তত্ত্ববিদের' সংখ্যা অল্প। এই যে artএর দিক হইতে চরিত্র চিত্রিত করিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা, এই যে art for art's sake কথার দাবী, এই যে artist is no moralistএর কল্পনা,—এই ঘোর সঙ্কট হইতে আমাদের দরিদ্র ধর্ম্মভীরু দেশ রক্ষা পাউক, ইহাই আন্তরিক কামনা!

এই যে সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া Nature paint করিবার প্রবল বন্যা, ইহার তরঙ্গের আঘাত প্রাচ্যেও আসিয়া পৌছিয়াছে। আমাদের দেশেও যাট্রাম-চরিত্র অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—ভয় হয়, পাছে এ সব অনুকরণের ফলে এ দেশেও বিবাহ ও মাতৃত্ব, ভার বা বোঝা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, এ দেশেও surplus womenএর প্রয়োজন হয়!

THE LONELY WOMAN.

একলা ঘরের একলা নারী।

প্রতীচ্যে কেবল যে surplus womenএর ভয় তাহা নহে, আবার lonely women বা নিঃসঙ্গ-জীবনের নারীর ভয় হইয়াছে। নারী কেন বিবাহ করিয়া পুরুষের অধীন হইবে—গলগ্রহ হইবে—বোঝা হইবে, সে বিবাহ না করিয়া নিজ জীবিকার্জ্জন করিতে পারে,—এই ভাবটা যেমন আধুনিক প্রতীচ্যে বদ্ধমূল হইতেছে, তেমনই বিবাহিতা নারীও স্বামীর অনুপস্থিতিতে "একলা ঘরে একলা কামিনী" থাকিয়া বিরহ-যন্ত্রণার দায় এড়াইবেন কিরূপে, ইহাও এক সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে করুন, কোনও নারীর সন্তানাদি হয় নাই, তাঁহারা থাকেন স্ত্রী-পুরুষে। পুরুষ ক্লাবে, ঘোড়দৌড়ে, ফুটবলে, আফিসে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার "একলা ঘরের একলা পত্নী" সে সময়ে কি করিবেন? সময় যে কাটে না! এ সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর ছোট গল্প আছে। গল্পটির নাম Anne wants looking after; পাঠককে তাহা উপহার দিতেছি:—

ডিক সেভারন ও তাহার প্রণয়িনী এ্যান পরস্পরের প্রণয়ে একবারে তন্ময়, কেহ একদণ্ড কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, যেন জল বিনা সফরী! উভয়ে কল্পনা করিল, শ্যামল পল্লীভূমির ঘন বৃক্ষচ্ছায়ার অন্তরালে লুক্কায়িত, গোলাপগন্ধামোদিত একখানি আদর্শ কুঞ্জকুটীরে তাহারা দুই জনে একান্তে থাকিবে,—"কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে", কাহারও সংস্রবে আসিবে না, এই ভাবেই জীবন অতিপাত করিবে।

বিবাহ হইল, মাস দুই তাহারা স্বপ্নরাজ্যে বাস করিল। কিন্তু পেট romance বুঝে না, নিভৃত কুঞ্জকুটীরের গোলাপের গন্ধে বা চাঁদের জ্যোছনায় পেট ভরে না! সঞ্চিত অর্থ যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন ডিককে লণ্ডনে চাকরীর অন্বেষণে যাইতে হইল। চাকরী জুটিল, ডিক আপনার ও প্রণয়িনীর জন্য এক ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিল।

এই সময় ডিকের আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ ডিককে অধিক বেতনে আফ্রিকার নিগারিয়া প্রদেশের শাখা আফিসে যোগদান করিতে হুকুম দিলেন, সেখানে ডিককে ২ বৎসর থাকিতে হইবে। প্রণয়িযুগলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া

পড়িল, প্রেমের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। উপায় নাই, ডিককে যাইতেই হইবে, না হইলে চাকরী যাইবে, উমেদারের অভাব নাই। অনেক কাঁদা-কাটার পর এ্যান সম্মত হইল। স্থির হইল, এ্যান ফ্ল্যাটেই বাস করিবে এবং প্রতি মেলে তাহার জীবনের রোজনামচা ডিককে লিখিয়া পাঠাইবে। এ্যান চোখের জল মুছিতে মুছিতে যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ সম্পন্ন করিয়া দিল, নির্দ্দিষ্ট দিনে উভয়ের অশ্রুর নিদর্শন লইয়া ডিক আফ্রিকা যাত্রা করিল।

প্রথম প্রথম নিয়মিতরূপে ডিক পত্নীর পত্র পাইত। কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতে পত্রের মাত্রা হ্রাস হইতে লাগিল। এ্যান লিখিল, সেও এক কায জুটাইয়াছে, কাযের মানুষ হইয়াছে, তাই আর প্রেমের চিঠি লিখিবার অবকাশ হয় না।

ডিক ম্রিয়মাণ হইল, কত সাধ্যসাধনা করিয়া এ্যানকে কায করিতে নিষেধ করিল; লিখিল, পুরুষ খাটিয়া স্ত্রীর ভরণপোষণ করিবে, স্ত্রীকে সংসারের ঝড়-ঝাপ্টা হইতে রক্ষা করাই পুরুষের ধর্ম্ম। ইহার উত্তরে এ্যান যাহা লিখিল,তাহাতে ডিকের চক্ষু স্থির হইল এ্যান তাহাকে নারীর কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে এক দেড়গজি 'সার্ম্মন' বা বক্তৃতা দিল।

এই ভাবে মনঃকষ্টে ও দুশ্চিন্তায় ১ বৎসর কাটিয়া গেল। আফিস ডিককে মোটা বেতনেই লণ্ডনে ডাকিয়া পাঠাইল। ডিক মহানন্দে গোছগাছ করিতে লাগিল, মেলে এ্যানকে যাত্রার খবর ত দিলই, পরন্তু যাত্রার পূর্ব্বে তার করিয়া কোন্ জাহাজে কখন্ সাদামটন বন্দরে পৌছিবে, তাহাও জানাইল।

সাদামটনে পৌছিয়া ডিক দেখিল, কা কস্য পরিবেদনা - কেহ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আইসে নাই। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে এ্যান নিশ্চয়ই আসিবে, এই আশায় সে সাদামটনের নৈরাশ্যের কথাও ভুলিয়া গেল। কিন্তু ও হরি! ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনেও কেহ নাই!

তখন ডিক একেবারে মন-মরা হইয়া পড়িল। কি হইল? এ্যানের কি কোন পীড়া হইল? এ্যান কি কোথাও কোনও আত্মীয়ের গৃহে নিমন্ত্রণে গেল? এ্যান—তাহার বড় আদরের এ্যান ত এমন করিয়া চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নহে। তাহার আগমন প্রতীক্ষায় বৎসরাধিককাল কষ্ট সহ্য করিয়া এখন সে কোথায় লুকাইল!

বাসার দ্বারে ট্যাক্সি লাগিল। দারুণ উৎকণ্ঠাভরে ডিক হৃদয়ে পাষাণচাপ বহিয়া একটি একটি করিয়া সোপান বহিয়া উঠিতে লাগিল।

উপরতলায় উঠিয়া কক্ষদ্বার ঠেলিবামাত্র একটি রমণী ব্যস্তসমস্তভাবে একবারে তাহার উপর আসিয়া পড়িল—তাহার মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, সে তাড়াতাড়ি কোন কাযে যাইতেছে। এই কি এ্যান? হাঁ, এ্যানই বটে, কিন্তু এই এ্যান ত তাহার ১ বৎসর পূর্ব্বের এ্যান নহে!

এ্যান তাহাকে দেখিয়া বলিল, "তুমি এই এলে, আমি এইমাত্র কায সেরে আস্‌ছি, এখনও চিঠির বাক্সে তোমার তার এসেছে দেখিনি।"

ডিকের মনের মধ্যে কে যেন বরফজল ঢালিয়া দিল, সে ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কায? কি কায? কোথায় কায?"

তাহার পর স্বামি-স্ত্রীতে অনেক কথা হইল। এ্যান বুঝাইল, ডিক চলিয়া গেলে দিনকতক বড় কষ্টে কাটিল, তাহার পর দিন আর কাটে না। সে বড় Lonely নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিল। গৃহের গৃহিণী-পনায়, রাঁধা-বাড়া বা ঘর সাজানয় তাহার মন টিকিল না।—গৃহিণীপনা (House-wife) তাহার ধাতে সহিল না। তাহার পর এক দিন নেভিল এলিয়টের সঙ্গে দেখা।

ডিক অস্থির হইয়া উঠিল। এ্যান আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, এলিয়টের জামার দোকানে একটা কায খালি ছিল, ব্লাউস পরিবার মডেল। এ্যান সেই কায লইল।

ডিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এ্যাঁ, তুমি সেই পশুটার ধাপ্পায় ভুলে শেষে মোডিষ্টে হ'লে?"

এ্যান বলিল, "কেন, তাতে দোষ কি? আমি সেই কাযে মুঠো মুঠো টাকা -"

ডিক বলিল, "রেখে দাও টাকা। কে তোমায় রোজগার করতে বলেছিল, তুমি আমার ঘরের ক্ষুদ্র লক্ষ্মীটি—তুমি আমার রাণী—"

এ্যান বাধা দিয়া বলিল, "না, না, তুমি বোঝ না। নারী কি পুতুল? তারও ত একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, অধিকার আছে—"

ডিক চীৎকার করিয়া বলিল, "না, নেই। কখ্‌খোনো নেই। স্বামি-স্ত্রী কি স্বতন্ত্র? নিশ্চয়ই সেই রাস্কেল এলিয়টটা --"

এ্যান একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ছিঃ ছিঃ ডিক, তুমি

নেহাৎ সেকেলে। কালের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা তুমি জান না। আমরা নারীরা এখন আর খেলার ঘরের পুতুল নই। তোমরা বাহিরের কায সেরে ঘরে ফিরবে, আর আমরা তোমাদের খানা রেঁধে ঠিক ক'রে রাখবো, তোমরা কাযে যাবে, আর আমরা ঘরে ব'সে ছেঁড়া মোজা সেলাই কোরবো, সেদিন আর নেই। এখন সবার কাযের দিন এসেছে। গত যুদ্ধ হ'তে আমরা এ কথা শিখেছি, এলিয়ট শেখায়নি। রাঁধা-বাড়া ঘরকন্নার কায মাইনে দিয়ে লোক রেখে করতে হবে, স্ত্রী সে কাযের জন্ম সৃষ্ট হয়নি।"

ডিক হতভম্ব হইয়া কি বলিবে, খুঁজিয়া পাইল না। ক্ষণেক নীরব থাকিবার পর সে সখেদে বলিল, "কিন্তু এ্যান, স্ত্রী হাজার রোজগার করলেও অন্যের দ্বারা গৃহিণীর (Home-maker) অভাব পূর্ণ হয় না। তোমরা নারীরা যত্নপালিতা হবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছ।"

এ্যান বলিল, "না, না, তুমি ভুল বুঝছো। প্রত্যেক জীবেরই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। নারীরও স্বাধীন জীবিকা অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।"

ইহার উত্তরে ডিক কিছু বলিল না, গম্ভীর হইয়া চুরুট টানিতে লাগিল। দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু গৃহে সুখ নাই, পতি-পত্নীতে কেমন একটা ছাড় ছাড় ভাব দেখা দিল, ডিক বাহিরে বাহিরে, আড্ডায় আড্ডায়, থিয়েটারে বায়স্কোপে সময় কাটাইতে লাগিল। এক দিন এক হোটেলে পুরাতন বন্ধু রেমণ্ডের সহিত হঠাৎ দেখা। কথায় কথায় রেমণ্ড ডিকের দুঃখের কথা বাহির করিয়া লইল। শেষে রেমণ্ডের পরামর্শে ডিক দেহের অসুস্থতার অজুহতে ২ মাসের ছুটি লইয়া সস্ত্রীক লণ্ডনের কম্মকোলাহল হইতে দূরে এক ঘন তরুচ্ছায়া-শীতল গোলাপগন্ধামোদিত পল্লীভূমিতে বাস করিতে গেল। এ্যান প্রথমে কিছুতেই রাজী হইবে না—ভয়, পাছে কাযটা হাতছাড়া হয়। কিন্তু শেষে স্বামীর অসুখের কথা ডাক্তারের মুখে শুনিয়া না গিয়া পারিল না।

সেখানে নিভৃত বনাশ্রমে নিত্য সাহচর্য্যে আবার তাহাদের গোলাপী আভার ভালবাসার জীবন ফিরিয়া আসিল। প্রথম প্রথম এ্যান বিদ্রোহী হইয়াছিল—এক সপ্তাহ পরেই লণ্ডনে কাযে ফিরিয়া যাইবার জন্ম জিদ করিয়াছিল; কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বিবাহিত জীবনের প্রথম যুগটা যেন আবার এ্যান ফিরিয়া পাইল।

তাহার পর ক্রমে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তনের দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। এক দিন ডিক হঠাৎ বলিল, "এ্যান, আর একটি সপ্তাহ মাত্র বাকি আছে। যাবার সব যোগাড় কর।"

এ্যান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া কাতরস্বরে বলিল, "না গেলে হয় না? প্রাণাধিক, আমি আর লণ্ডনে যাইতে চাহি না, স্বাধীন হইয়া নিজের হেপাজৎ লইতে চাহি না। আমার এই ঘর সংসারই ভাল।"

চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী।

সুতরাং modern woman যতই surplus থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করুন না, নারী-হৃদয়ের এই যে গৃহিণীপনা ও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, ইহা কোনও অস্বাভাবিক উপায়ে দমিত করিয়া রাখিলেও উপযুক্ত সুযোগ ও অবসর পাইলেই স্বতঃই স্বপ্রকাশ হইয়া থাকে। লিটনের উপন্যাসের অগাধ শাস্ত্রমগ্ন পণ্ডিতের সুন্দরী যুবতী পত্নীর ন্যায় চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীও ঘরসংসারে মন রাখিতে পারে নাই। কেন? কতকটা চন্দ্রশেখরেরই দোষে—অমনোযোগে। যুবতী পত্নী গভীর রাত্রিতে আহারের ও বিশ্রামের জন্য স্বামীকে ডাকিতেছে, স্বামী তখন

"কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ"

লইয়া ব্যস্ত। এমন অবস্থায় শৈবলিনীর সংসার যে বিষবৎ বোধ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই শৈবলিনীই যখন স্বামী কি বুঝিতে পারিয়াছিল, তখন বলিয়াছিল,—"এই যে চন্দন-চর্চ্চিত ললাট বিশাল বক্ষ সাগরের ন্যায় স্থির গম্ভীর স্বামী, এর কাছে প্রতাপ! ছিঃ!" এই জন্য হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষা এই ভাবে হয়—স্বামী সুরূপই হউন আর কুরূপই হউন, পণ্ডিতই হউন আর মূর্খই হউন,—সকল অবস্থাতেই তিনি স্বামী, আর তাঁহার ঘরই পত্নীর ঘর, সে ঘরের গৃহিণীপনা, সে ঘরে থাকিয়া মাতৃত্বলাভ হিন্দু-নারীর কাম্য। হিন্দুনারী surplus womanএর কল্পনা করিতে পারে না—অন্ততঃ এখনও শিখে নাই। আমাদের দেশে দুই এক জন উচ্চ-শিক্ষিতা বিদুষী নারী স্কুল-কলেজের শিক্ষয়িত্রীরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন, অবিবাহিতা থাকিয়া আপনার ঘরে আপনি স্বাধীন আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য।

তেমন কত শত বিদুষী শিক্ষিতা নারী স্বামীর ঘর আলো করিয়া আছেন; তাঁহারা গৃহিণীপণায় ও মাতৃত্ব-গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে রোজগার করিতে তাঁহারা সুখানুভব করেন না। আমাদের হিন্দু-মুসলমান নারী শিক্ষিতা হউন, কুসংস্কার-বর্জ্জিতা হউন, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত হউন, বীরপ্রসূ হউন, সুসন্তানের জননী হউন, নারীর ন্যায্য অধিকার দাবী করুন, আমরা সানন্দচিত্তে তাঁহাদের সমর্থন করিব। কিন্তু কেবল এই কামনা, যেন প্রতীচ্যের এই surplus woman, স্বাতন্ত্র্যপ্রার্থিনী woman এবং ঘরসংসার ফেলিয়া 'কাষ'-প্রার্থিনী woman হইতে ভারতবর্ষ বহু যুগ রক্ষা পায়। এদেশ Home makerএর দেশ, গৃহিণীর দেশ, মাতৃজাতির দেশ, এ দেশ গণেশজননী সন্তানপালিনী শক্তির পূজা করে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

"যার ছেলে যত খায়, তার ছেলে তত চায়।"

টেলিফোন কোম্পানী—তোমরা কালাই হও আর ধলাই হও—আমি সরকারের অনুগ্রহে পুষ্ট, আমি যত চাই—তত পাই।
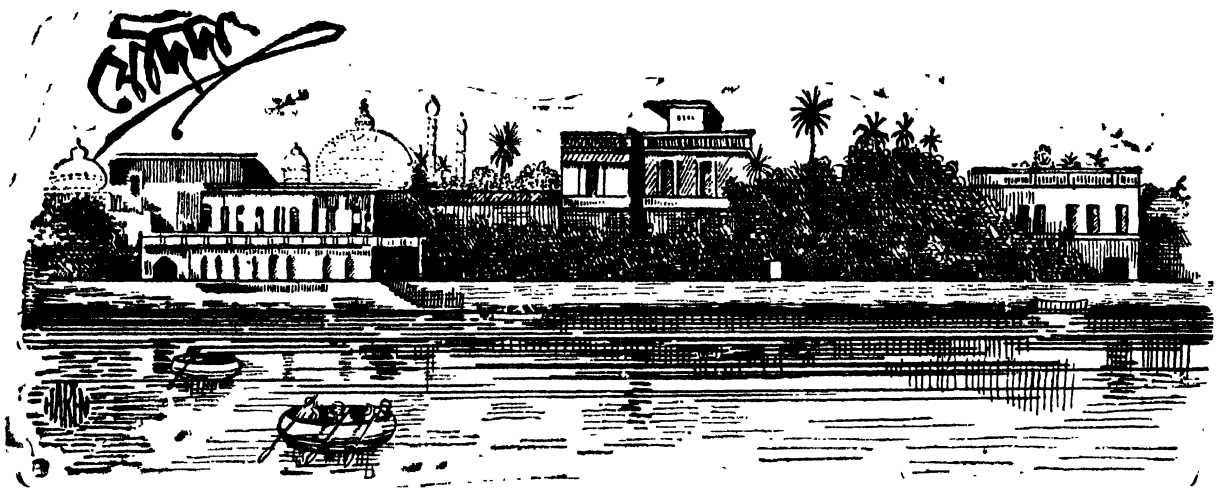
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে আমীর আসিয়া সারদাবের দ্বার মুক্ত করিলেন। রুথ তেমনই ভাবে বসিয়া ছিল। তাহার মনে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা—দুঃখ ও ভয় সকলের উপর একটা সুখের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রলিপ্ত হইয়াছিল। বন্যার জল যেমন মরা নদীর পঙ্ক ও শৈবাল সব ছাপাইয়া ফেলে, এও তেমনই। তাহার ভাগ্যে যাহা হয় হইবে—দায়ুদ মুক্ত। ঐ আকাশ—বাতাস—নদী—দায়ুদ উহাদেরই মত মুক্ত; আমীরের ক্রোধ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না—সে মুক্ত। সে যে আপনার জন্য দায়ুদের মুক্তিপথ বিপদ্সঙ্কুল করে নাই—এই ত্যাগের অনুভূতি তাহাকে স্নিগ্ধ শান্তি দান করিতেছিল। তাহার পক্ষে মৃত্যুর আর কোন কঠোরতা ছিল না।

সমস্ত রাত্রি নিষ্ফল আক্রোশের উত্তাপে পাপকল্পনার যন্ত্র-পরিচালিত করিয়া, আমীর রুথের জন্য নিষ্ঠুর দণ্ডের রচনা করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, গবাক্ষবিবর গাঁথিয়া বন্ধ করা হইবে—সারদাবের রুদ্ধ দ্বার পক্ষকালমধ্যে মুক্ত হইবে না। সেই সময়ের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় না পাইয়া রুথ ধীরে ধীরে—দিনে দিনে—পলে পলে কষ্ট পাইয়া মরিবে। এই আদেশ প্রচার করিয়া তিনি একবার রুথের দিকে চাহিলেন; ভাবিলেন, এই দণ্ডের নিষ্ঠুরতায় তাহার মুখে ভীতিভাব ফুটিয়া উঠিবে—হয় ত সে দীনভাবে ক্ষমা চাহিবে; তাহার সেই কাতরতায় তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিহিংসানল অনেকটা নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু রুথের মুখে তিনি ভাবনার ভাবান্তরচিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, ইহাকে শাসিত করিতে একটু বিলম্ব হইবে—কিন্তু জঠরজ্বালায় এ গর্ব্ব নষ্ট হইবে।

দুই জন মিস্ত্রী আসিয়া গবাক্ষবিবর গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। তাহাদের কায শেষ হইলে আমীর স্বয়ং তাহা দেখিয়া বলিলেন, "এইবার ক্ষুধা-তৃষ্ণার শাসন আরব্ধ হইল। দেখি, কতদিন সহ্য করিতে পারে।" তিনি সারদাবের দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমীরের এত কথা রুথ যেন শুনিয়াও শুনে নাই। মিস্ত্রীদিগের কায সে যেন দেখিয়াও দেখে নাই। সে আজ অন্য জগতে বাস করিতেছিল—সে জগতে এ জগতের সংবাদ পৌঁছে না। সে জগৎ ভাবের ও ভাবনার। মৃত্যুকে ভয় কি? দায়ুদের আলিঙ্গনতাপ সে তখনও বক্ষে অনুভব করিতেছিল—সে যে তাহার সর্ব্বশরীর পুলকে পূর্ণ করিয়া তাহার হৃদয়ভৃঙ্গারে সঞ্চিত হইয়াছিল; দায়ুদের চুম্বনের সুধা তখনও তাহার ওষ্ঠাধরে লাগিয়া ছিল—সে ত মুছিবার নহে। সে সব সম্বল লইয়া, আর তাহার জন্য নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, তাহার উদ্ধারের জন্য দায়ুদের চেষ্টা স্মরণ করিয়া মৃত্যুপথে যাত্রায় ভয় কি? আজ মৃত্যু ত সুখের—শান্তির বলিয়া মনে হইতেছে। বিশেষ মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া সে আমীরের অনুনয়ের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইয়াছে। আজ সে একা—আজ সে ভাবিবার সময় পাইয়াছে। সে দায়ুদের ধ্যান করিতে করিতে মরিতে পারিবে। তাহাতে দুঃখ নাই। দুঃখ যাহা কিছু, সে কেবল পিতার জন্য। কিন্তু তিনি অবশ্যই মনকে প্রবোধ দিতে পারিবেন। তিনিও দায়ুদের মত পুরুষ—রোদনমাত্র তাঁহার সম্বল নহে।

গবাক্ষবিবর রুদ্ধ হইলে কক্ষমধ্যে আলোক আরও

কমিয়াছিল ; কিন্তু একেবারে অন্ধকার হয় নাই। হাওয়াঘরের সেই শত মুকুরে প্রতিফলিত রবিকর অন্য দিনেরই মত কক্ষ-মধ্যে কিরণখণ্ড ছড়াইয়া দিতেছিল। শূন্য দৃষ্টিতে রুথ গালিচার ফুলের ও নক্সার উপর সেই সব কিরণখণ্ডের নিঃশব্দ গতি লক্ষ্য করিতেছিল। একবার তাহার কর্ণে সামান্য একটু "বজ-বজ" শব্দ প্রবেশ করিল। সে চাহিয়া দেখিল, রাত্রির মধ্যে কক্ষের কোণে মাকড়শা যে জাল পাতিয়া রাখিয়াছিল, একটি মক্ষিকা তাহাতে জড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ এই বন্দী মক্ষিকার জন্য রুথের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উভয়ে সমাবস্থ। সে উঠিয়া যাইয়া আঙ্গুলে জাল জড়াইয়া মক্ষিকাটিকে মুক্ত করিয়া দিল। সে ভাবিল, মানুষের মত ইতর প্রাণীরাও জাল পাতিয়া শীকার ধরে—তাহাদের জাল জড়পদার্থের, মানুষের জাল কৌশলের ; আর তাহারা জাল পাতিয়া শীকার ধরে আহারের—আত্মরক্ষার জন্য, মানুষ জাল পাতিয়া শীকার ধরে আপনার বিলাস-বাসনার ও বিশ্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য। মানুষ ইতর প্রাণী হইতে কত হীন! অথচ মানুষ আপনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গর্ব্ব করে—ভগবান্ তাহাকে আপনার আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন! তাহারই ভুল। এক জন বা দশ জন সে আদর্শের অপব্যবহার করে বলিয়া কি সকল মানুষকে হীন বলা যায়? এ জগতে আমীর আজীজও যেমন আছে, দায়ুদও ত তেমনই আছে। আমীরের সঙ্গে তুলনায়—অন্ধকারের পার্শ্বে আলোকের মত দায়ুদকে আজ কত সুন্দর দেখাইতেছিল! দায়ুদ এতদিন তাহার প্রেম-মন্দিরের দেবতামাত্র ছিল—আজ তাহাকে তাহার জীবন-মন্দিরের আরাধ্য-দেবতা বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল।

হর্ম্ম্যতলে গালিচার উপর হইতে সরিয়া প্রতিফলিত কিরণখণ্ডগুলি কক্ষপ্রাচীরের গালিচার উপর উঠিল - তাহার পর সারদাবের চিত্রাঙ্কিত গম্বুজ স্পর্শ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইবার সারদাব অন্ধকার হইল। রুথ বুঝিল, দিবাবসান হইল। দায়ুদের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদের পর দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু সে যে মিলনকে হৃদয়ে লইয়া মৃত্যু-পথে যাত্রা করিতেছে, সে মিলনের ত বিচ্ছেদ নাই। তবে দুঃখ কিসের?

তাহার পর আবার অন্ধকার কক্ষে সামান্য আলোকপাত লক্ষিত হইল। হাওয়াঘরের ছিদ্রপথে চন্দ্রকর কক্ষে উঁকি দিতেছিল। বাতাস, আলোক, বারি—এ তিন প্রকৃতির দান—ইহারা ধনি-দীন, সুখী-দুঃখী ভেদ করে না—সকলের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহার করিয়া সকলকে সমানভাবে আনন্দের দান বিলাইয়া যায়। তাই আজ সারদাবের অন্ধকারে--গাঢ়তর অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তামগ্না রুথের জন্যও হাওয়াঘরের সামান্য ছিদ্রপথে চন্দ্রকর সারদাবে নামিয়া আসিল। সে আলোক অনুজ্জ্বল, কিন্তু স্নিগ্ধ—তাহা সমবেদনা-কাতরের সান্ত্বনার মত—বাহুল্যবর্জ্জিত, কিন্তু গভীর ; —ঔজ্জ্বল্যহীন, কিন্তু হৃদয়স্পর্শী। বাহিরে যে আলোকে আকাশ ভরিয়া গিয়াছিল—কক্ষমধ্যে তাহাতে অন্ধকার দূর হইল না। পুষ্পপাত্রে বাসি ফুল - তাহার মধ্যে রাত্রির বাতাস পাইয়া মুদিতদল রজনীগন্ধা আর একবার দল খুলিয়া অবশিষ্ট সৌরভটুকু বাতাসে বিলাইয়া দিল—সৌরভ বিলাইবার জন্য, সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য নহে। তাই শুকাইবার পূর্ব্বে ফুল তাহার সব সৌরভ বিলাইয়া দিয়া—সব সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দিয়া যায়—তিলে তিলে ভূমি, বায়ু, রৌদ্র হইতে সে যে সম্পদ সঞ্চিত করিয়াছিল, তাহার কিছুই অদেয় রাখে না। সমস্ত দিন রুদ্ধ কক্ষে যে বাসি ফুলের গন্ধ ছিল, এখন তাহা ঢাকিয়া গেল—বাতাসে রজনীগন্ধার সৌরভ ভাসিতে লাগিল —আর বাহিরের বাতাসও বুঝি বাগান হইতে করবীর মৃদু-গন্ধ বহিয়া আনিতে লাগিল। রুথ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনার মধ্যে শৃঙ্খলা নাই—শরতের মেঘ যেমন বিচ্ছিন্ন-ভাবে গগনে গতায়াত করে, নানা চিন্তা তেমনই তাহার মনে বিচ্ছিন্নভাবে গতায়াত করিতে লাগিল। সে সব ভাবনার অন্ত নাই।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল—সেই কক্ষে বসিয়া রুথ বাহিরে শৃগালের প্রহরঘোষণা শুনিতে পাইল। বাহিরে বিশাল বিশ্ব —আলোকে উজ্জ্বল, কলরবে মুখরিত, কর্ম্মে চঞ্চল। আর ভিতরে—এই অন্ধ-কারাগৃহে সে বন্দিনী—একা—মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। অথচ তাহার পক্ষে জীবনের তৃষ্ণা মিটে নাই—সুখের সাধ পূর্ণ হয় নাই—পিতা জীবিত—প্রিয়তম তাহার সঙ্গসুখ-কামনায় আপনাকে বিপন্ন করিতেও কাতর নহেন। অদৃষ্টের এ কি উপহাস! অসামঞ্জস্যের কি বিরাট বিকাশ! ভাবিয়া রুথ বিস্মিতা হইল—বড় দুঃখের মধ্যেও তাহার হাসি আসিল। এ হাসি মরণাহত রোগীর মৃত্যুকে উপহাসের হাসি—জগৎ হইতে বিদায় লইবার সময়

যাত্রীর জগতের ব্যবস্থা-বিড়ম্বনার প্রতি বিদ্রূপের হাসি—আর কিছুই নহে। দুঃখ কেবল পিতার জন্য—যিনি মাতৃহীন কন্যাকে সংসারের অবলম্বন করিয়াছিলেন—তিনি এখন কি করিবেন। তাঁহার পক্ষে কন্যার বিরহে জগৎ অন্ধকার হইয়াছে। এতদিন সে অন্ধকারে যদি কোন আশার আলো—দূরে আলেয়ার আলোর মতও লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে দায়ুদ প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহাও নির্ব্বাপিত হইবে। আর দায়ুদ ?—দায়ুদ এখন কি করিবে। সে যে নদীর জলে তাহার অপেক্ষা করিয়াছিল- যখন তাহার সে প্রতীক্ষা নিষ্ফল হইয়াছে, তখন সে কি মনে করিয়াছে। সে ত রুথকে অপরাধিনী মনে করে নাই ? সে কল্পনাও যেন রুথের বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিল। সে মনে করিল—না; তাহার প্রতি দায়ুদের অবিচলিত বিশ্বাসের প্রমাণ সে পাইয়াছে। দায়ুদ বলিয়াছে, দায়ুদের কাছে রুথের কোন অপরাধ হইতে পারে না। সেই বিশ্বাসের গর্ব্বে রুথ সব দুঃখ ভুলিয়াছিল—সেই গর্ব্বের সুখ লাভ করিবার জন্য সে যে আরও ছয় মাস এইরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে পারে। এমনই কত ভাবনায় রুথের হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল। এক দিন যে গিয়াছে—এক রাত্রি যে যায়, ইহার মধ্যে তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণানুভবও হয় নাই। কারণ, কালের অনুমান তাহার ছিল না—সে চিন্তার রাজ্যে বাস করিতেছিল, সে রাজ্যে কালের অধিকার নাই।

রুথ চিন্তার রাজ্যে শারীরিক অবসাদ অনুভব করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহার শরীর সে অবসাদ অনুভব করিতেছিল। প্রিয়জনের শয্যাপার্শ্বে আমরা যখন জীবন-মরণের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি, তখন মানসিক উদ্বেগে আমরা শারীরিক অবসাদ অনুভব করি না,—ক্ষুধা-তৃষ্ণা জ্ঞান থাকে না, নয়নে নিদ্রা থাকে না। কিন্তু যে দিন আরোগ্য বা মৃত্যু একের জয় ঘোষিত হয়, সে দিন সেই অবসাদ আমাদিগকে আচ্ছন্ন করে—তাই দারুণ শোকের সময়েও মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে। রুথের শারীরিক অবসাদ তাহাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিতেছিল। তিন রাত্রির অনিদ্রার পর আজ নিদ্রায় তাহার নয়ন মুদিত হইয়া আসিতেছিল।

এই সময় বাহিরে টাইগ্রীসের বক্ষে একখানি গুফা রুদ্ধ গবাক্ষনিম্নে আসিল—আরোহিদ্বয়ের এক জন প্রাচীরের কার্ণিশে একটা লৌহের আঁকড়া বাধাইয়া গুফা নিশ্চল করিল। গুফা বাগদাদের সাধারণ নৌকা। বাগদাদে কাষ্ঠ দুষ্প্রাপ্য—তাই বাড়ীতে খিলান—আর শর দিয়া নৌকা-রচনা। শর দিয়া বড় বড় গোলাকার গামলার আকারে নৌকা নির্ম্মিত হয়—তাহার বাহিরে পিচ মাখাইয়া দেওয়া হয়। লোক সেই নৌকায় গতায়াত করে—বড় বড় গুফায় দশ বার জন আরোহীর স্থান হয়।

তন্দ্রাতুরা রুথ বাহিরে প্রাচীরে ঠুক ঠুক শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। ও কি ? তবে কি অসাধ্য-সাধনক্ষম দায়ুদ আবার মুক্তির কোন উপায় করিয়াছে ? ঐ শব্দ কি তাহারই ইঙ্গিত—তাহারই আহ্বান ? রুথের নয়ন হইতে তন্দ্রাবেশ দূর হইয়া গেল—সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল—ঠুক ঠুক! যেন কে সাবধানে—সশঙ্কভাবে প্রাচীরে আঘাত করিতেছে।—কে কোথায় আঘাত করিতেছে ?

ক্রমে কক্ষপ্রাচীরে যে স্থানে গবাক্ষ ছিল, সেই স্থানে সামান্য আলোক দেখা দিল—নবগ্রথিত ইষ্টক সরান হইয়াছে—ছিদ্র ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, আর সেই ছিদ্রপথে কক্ষে চন্দ্রালোক প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহার পর সেই ছিদ্রপথে অদৃশ্য-হস্তপ্রেরিত রজ্জু কক্ষে প্রেরিত হইল। আরবরা মস্তকের আবরণ রুমালের উপর উষ্ট্রলোমের যে রজ্জু জড়াইয়া রাখে, সেই রজ্জুর এক প্রান্ত প্রাচীর বাহিয়া নিম্নে আসিল। ঐ রজ্জু যদি সর্প হইত, তাহা হইলেও রুথ তাহা অবলম্বন করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিত; উহা যে দায়ুদেরই প্রেরিত, সে বিষয়ে তাহার আর কোন সন্দেহ ছিল না।

রুথ দুই হস্তে সবলে সেই রজ্জু ধরিল। প্রাচীরপরপার হইতে কে সেই রজ্জু টানিল—ভার দেখিয়া সে সবলে টানিতে লাগিল। প্রবলবলে আকৃষ্ট হইয়া রজ্জু গবাক্ষসমীপে নীত হইল। তখন দুইখানি প্রস্তরকঠিন হস্ত তাহার দুই হস্ত ধরিয়া অনায়াসে তাহাকে বাহির করিয়া গুফায় আনিল। অবসন্ন—অর্দ্ধমূর্চ্ছিত রুথকে গুফায় ফেলিয়া আগন্তুকদ্বয় গুফা ভাসাইয়া দিল।

আমীরের বড় বেগমের প্রেতাত্মার ভয়ের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি যখন শুনিলেন, যেদিদাকে অনাহারে সারদাবে হত্যা করাই আমীরের আদেশ, তখন তিনি ভয় পাইলেন। যদি তাঁহাকে কখন আবার ঐ সারদাবে যাইতে হয়। বহুদিন পূর্ব্বে আমীর তাঁহাকে সারদাবের একটি চাবি দিয়াছিলেন। আজ তিনি বহু অনুসন্ধানে সেটি বাহির করিয়া তাঁহার দাসীকে বলিলেন, "আজ শেষ রাত্রিতে তুই

সারদাব খুলিয়া লুকাইয়া যেদিদাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিস্। দেখিস্, বাড়ীতে অপমৃত্যু না মরে।" দাসী দ্বার খুলিয়া যখন দেখিল, কক্ষ শূন্য, তখন সে বিস্ময়ের আতিশয্যে দ্বার রুদ্ধ করিতেও ভুলিয়া দ্রুতবেগে বেগমের কক্ষে আসিয়া সেই সংবাদ দিল। বেগম, আল্লার নাম স্মরণ করিলেন। মানুষ হইলে কি এমন করিয়া দুই জনই পলাইতে পারে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে প্রহরীরা দেখিল, সারদাবের দ্বার মুক্ত এবং গত দিন যে তিনটি গবাক্ষ গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার একটির গাঁথনী ভগ্ন! তাহারা আমীরকে এ সংবাদ দিতে সাহস করিল না—তিনি শুনিলে কাহার কি হইবে, বলা যায় না। কারণ, ক্রোধ, স্বার্থ ও বিচার ইহারা পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করে না! তাহারা আপনারা পরামর্শ করিল। সারদাবের চাবি আমীর সর্ব্বদা আপনার কাছে রাখেন—সে চাবিও এমন নহে যে, কেহ সহসা একটা নকল চাবি করাইতে পারে। সে জন্য প্রহরীরা দোষী হইতে পারে না। কিন্তু গবাক্ষপ্রাচীর ভেদ ও বন্দীর পলায়ন—ইহার জন্য কে দায়ী? ভয়ে তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল, প্রহরীরা আমীরকে এ সংবাদ দিতে ভয় পাইল বটে; কিন্তু এত বড় একটা সংবাদ গোপন থাকে না। সংবাদ শুনিয়া আমীর দ্রুত সারদাবে আসিলেন।

আমীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সারদাবের অবস্থা পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার মনে হইল, গবাক্ষপ্রাচীরের নবগ্রথিত অংশ হইতে ইষ্টকগুলি বাহির করা অপেক্ষাকৃত সহজ! কেহ তাহাই করিয়া রুথের উদ্ধার-সাধন করিয়াছে। কিন্তু সারদাবের দ্বার মুক্ত হইল কেমন করিয়া? কে এ কায করিল? আরবিস্থানের কৃষক যেমন টাইগ্রীসের জলসেচন করিয়া ভূমিতে শস্য উৎপাদিত করে, তিনি তেমনই বুদ্ধিসেচন করিয়া মস্তিষ্কে এই ব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যদি গবাক্ষপথেই রুথের উদ্ধার-সাধন হইয়া থাকে, তবে সারদাবের দ্বার মুক্ত হয় কেন? এ কি পলাইবার সময় রুথ আমীরের ক্ষমতাকে উপহাস করিয়া দ্বারটিও মুক্ত করিয়া গিয়াছে? নহিলে যখন গৃহমধ্যে কেহ শব্দ শুনিতে পাইলে পলায়নপথ বিঘ্ন-কণ্টকাকীর্ণ হইবে, তখন কে ইচ্ছা করিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া গৃহে শব্দপ্রবেশের সুবিধা করিয়া দেয়? অপমানে ও দুশ্চিন্তায়, আক্রোশে ও আক্ষেপে আমীর ঘৃতাহুতিপুষ্ট অগ্নির মত উত্তেজিত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি প্রহরীদিগকে বলিলেন, যাহারা বাড়ীর প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ডাকাইতীর কথাও জানিতে পারে না—পাহারা না দিয়া নিশ্চিন্তমনে ঘুমায়, তাহারা যে শত্রুর সহায়তা করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না; মৃত্যুদণ্ডই তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড। শুনিয়া ভয়ে সকলেই বিহ্বল হইল—কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই আমীর আপনার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত গৃহে বৈশাখী অপরাহ্ণের গুমটের মত একটা ভাব অনুভূত হইতে লাগিল।

আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমীর গদীমোড়া চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া নারগিলা টানিতে লাগিলেন—ভাবিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি উঠিলেন। মানসিক চাঞ্চল্য তাঁহাকে স্থির থাকিতে দিতেছিল না। তিনি কিছুক্ষণ কক্ষে পাদচারণ করিয়া বাহিরে আসিলেন—যে দুই জন মিস্ত্রী সারদাবের প্রাচীর গাঁথিয়াছিল, তাহাদিগের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন এবং তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিলেন। তাহাদের এক জনকে পাওয়া গেল।—আর এক জন রাত্রিতে মারামারি করায় জেলে। আমীর তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিলেন—ভয় দেখাইলেন—অভয় দিলেন; কিন্তু কিছুতেই সেই রূঢ় আরব শ্রমজীবীর নিকট হইতে গত রাত্রির দুর্ঘটনার কোন কিনারার সন্ধান পাইলেন না। সে কেবলই বলিতে লাগিল, "আমি কিছুই জানি না। যদি আমি মিথ্যা কথা বলি, তবে যেন আমার মুখে বাগদাদের সব আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হয়—আমি যেন আমীরের নোকরের গাধার পদাঘাত সহ্য করি"—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার চীৎকারে আমীরের সহিষ্ণুতা ও বাজে কথায় তাঁহার ধৈর্য্য আর থাকিতেছিল না। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "এই বুদ্ধিহীন বাগিলার (খচ্চরের) বাচ্ছাটাকে দূর করিয়া দাও।"

তাহার পর আমীর বড় বেগমের কক্ষে উপনীত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, সারদাবের দ্বারের একটা চাবি তিনি বহুকাল পূর্ব্বে বড় বেগমকে দিয়াছিলেন।

বড় বেগম পালঙ্কে বিছানার উপর বসিয়াছিলেন। কোনরূপ শারীরিক শ্রমের একান্ত অভাবে এবং গব্য, গোস্ত প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের অতিমাত্রায় ব্যবহারে তাঁহার দেহ মেদের

ভাবে বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল। তিনি অধিকাংশ সময়ই শয্যায় বসিয়া বা শুইয়া—দাসীদিগের অসম্ভব সংবাদে বিশ্বাস করিয়া কাটাইয়া দিতেন। হারেমে তিনিই কেবল আমীরকে ভয় করিতেন না। তিনি ওয়ালীর (প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার) কন্যা—এবং তাঁহার জন্যই আমীর ক্রমে প্রায় স্বাধীন হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বহুদিন পরে আমীরকে এ সময় তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, রুথের পলায়নের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ আছে। তিনি যেন সে কথা শুনেন নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "এ কি, দীনের কুটীরে আমীরের আগমন! আজ কি ইরাকে সূর্য্য পশ্চিমদিকে উঠিয়াছে?"

আমীর একেবারেই বলিলেন, "তোমার কাছে কি সারদাবের সেই চাবিটা আছে?"

বেগম বুঝিলেন, দাসী দ্বার বন্ধ করিতে ভুলিয়াছে। বিপদে পুরুষ যত শীঘ্র প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারায়, রমণী তত শীঘ্র হারায় না। বেগম প্রথম হইতেই সাবধান হইয়া বলিলেন, "কিসের চাবি?"

"সারদাবের।"

বেগম বিস্ফারিত নেত্রে আমীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সারদাবের চাবি!"

আমীর একটু অধীরভাবে বলিলেন, "হাঁ গো—হাঁ।"

বেগম হাসিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন—তাঁহার অতিপিনদ্ধ অঙ্গরাখার দুই তিনটা বন্ধ তাঁহার সেই লুণ্ঠনে ছিঁড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তোমার মনের চাবি যত দিন আমার কাছে ছিল, তত দিন ঘরের চাবিও ছিল। তাহার পর তুমি দুই-ই লইয়া গিয়াছ। সে ত আজ অনেক দিনের কথা! এতদিন পরে আজ এ কি স্বপ্ন দেখিলে? এখন চাবীর সন্ধান আমার কাছে না করিয়া, যে যেদিদা তোমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, সারদাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর!"

"সে সারদাবে থাকিলে আর জিজ্ঞাসা করিতে আসিতাম না" বলিয়া আমীর প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

বেগম বলিলেন, "ওগো, একটু দাঁড়াও—এই পঞ্চত্রিশ বৎসর কি তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছি না রাখিতে পারিয়াছি, যে আজ অত তাড়াতাড়ি পলাইতেছ? ব্যাপারটা কি? আমি শুনিলে তোমার ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট হইবে না। কে শত্রু আর কে মিত্র, তাহা মনে বুঝিয়া দেখ।"

অগত্যা আমীর ফিরিলেন।

বেগম স্বয়ং যাইয়া একখানি কুর্শী দিলেন। তাহাতে বসিয়া আমীর যথাসম্ভব সংক্ষেপে রুথের পলায়নকথা বলিলেন।

শুনিয়া বেগম বলিলেন, "সহর বাগদাদ—আরব্যোপন্যাসের আজব সহর। এখানে চীনের রাজকন্যার উপকথার মত ব্যাপার না ঘটাই বিস্ময়ের বিষয়।" তাহার পর তিনি বলিলেন, "কিন্তু ইহাতেও কি তোমার চৈতন্য হইবে? মাথার চুলে কাকের পাখায় বরফ পড়িয়াছে—পাকা দাড়ী হেনার রঙ্গে রাঙ্গা করিতে হয়—তবুও ভাব, যৌবন অক্ষুণ্ণ আছে!" তিনি গত ত্রিশ বৎসরে হারেমে যতগুলা লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, সেগুলার উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিরক্ত হইয়া আমীর কক্ষ ত্যাগ করিলেন। ফরিদা সম্মুখে পড়িল।

বাড়ীর এত বড় ব্যাপার কেবল ফরিদাই শুনে নাই। সে আপনার ভবিষ্যতের নক্সা আঁকিয়া রাত্রি কাটাইয়া সকালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—অনেক বেলায় উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া সংবাদ সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়াছিল। তাহাকে ত আর এ হারেমের সংবাদ অধিক দিন রাখিতে হইবে না! সম্মুখে আমীরকে দেখিয়া সে ভাবিল—সুপ্রভাত; শুভকার্য্যে বিলম্ব করিতে নাই—বড়মানুষের খেয়াল বহাল থাকিতে থাকিতে কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে হয়। সে সেলাম করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার কথা একবার মনে করিবেন কি?"

বড় বেগমের কথার জ্বালা আমীর তখনও অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহাকে কিছু বলিতে আমীরের সাহস হয় নাই। সে জ্বালার ফল ভোগ করিল—ফরিদা। "তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া—আমার মুখে চুণ-কালী দিয়া পুরস্কার লইতে আসিয়াছিস্? এই তোর পুরস্কার"—বলিয়া আমীর সবলে ফরিদাকে পদাঘাত করিলেন। ফরিদা পড়িয়া গেল। আমীর চলিয়া গেলেন।

আমীরের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে এবং ফরিদার পতনশব্দে চারিদিক হইতে বেগমগণ ও দাসীরা তথায় সমবেত হইলেন। ফরিদার প্রতি আমীরের স্নেহই অনেকের ঈর্ষ্যার ও সন্দেহের কারণ ছিল; আজ সহসা তাহার প্রতি তাঁহার এই ব্যবহারে সকলেই বিস্মিতা হইলেন। তবে কি তাহারই সাহায্যে যেদিদা পলায়ন করিয়াছে? বড় বেগম স্বয়ং তাহাকে তুলিয়া বসাইলেন। সে কোন কথা বলিল না। চারিদিক হইতে

তাহার প্রতি নানা প্রশ্ন বর্ষিত হইতে লাগিল। মানুষ দ্রুতগামী বাষ্পীয় যান নিশ্চল করিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত করিয়াছে, কিন্তু আজও রমণী-রসনার চাঞ্চল্য নিশ্চল করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারে নাই। ফরিদা কোন প্রশ্নের উত্তর দিল না। তাহার ওষ্ঠ কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণার প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না—সে যাতনা সে অনুভূত করিতেই পারিতেছিল না। মানসিক বেদনায়—হতাশার আঘাতে সে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কল্পনারচিত নন্দনকানন মুহূর্ত্তে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

বড় বেগমের আদেশে এক জন দাসী জল আনিয়া ফরিদার ক্ষত ধৌত করিয়া দিল। বেগম তাহাকে তাঁহার কক্ষে লইয়া যাইতে বলিলেন। সস্নেহে বলিলেন, "আহা! বড় লাগিয়াছে। কি যে মানুষ, রাগিলে আর জ্ঞান থাকে না। আর বাছা, তুই ত সবই জানিস্, এ সময় কি কাছে আসিতে আছে?" ফরিদা কোন কথা না বলিয়া মহলের পশ্চাতে তাহার ক্ষুদ্র কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমীরের সেই নিষ্ঠুর কথা তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল—"এই তোর পুরস্কার।" অথচ সে আপনার সুখের আশায় আমীরের হিতচিন্তাই করিয়াছে।

সত্য বটে, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তাবশে সে প্রথমে রুথের সহিত দায়ুদের মিলন-ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর যখন সে দেখিল, দায়ুদ সত্য সত্যই রুথের জন্য আপনার জীবন বিপন্ন করিতে দ্বিধা করিল না; যখন সে, দায়ুদের আগমনে রুথের মুখে আনন্দের দীপ্তি লক্ষ্য করিল; যখন সে রুথকে দায়ুদের আলিঙ্গনবদ্ধা হইয়া কান্দিতে দেখিল, আর দায়ুদকে তাহার ওষ্ঠাধর চুম্বন করিতে দেখিল—তখনই তাহার ভাবান্তর হইল। সে ভাবিল, ইহাই পৃথিবীতে স্বর্গসুখ। এ সুখ হইতে সে বঞ্চিতা; কিন্তু মুক্তি পাইলে তাহার ভাগ্যেও এই সুখভোগ থাকিতে পারে। যে রূপের জন্য তাহার জননী প্রথমে স্বামীর ও পরে তাহার অজ্ঞাত জনকের বিলাসলালসার উপাদান হইয়াছিল, সে যে সেই রূপের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল, তাহা সে জানিত। সে কথা সে তাহার ক্ষমতায় ঈর্ষ্যাকাতর দাসীদিগকেও স্বীকার করিতে শুনিয়াছে; সে কথা সে ভৃত্যদিগের মুখে শুনিয়াছে; সে কথা সে বাজারে তাহার অবগুণ্ঠনমুক্ত মুখের দিকে লোকের প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে বুঝিয়াছে। সুতরাং নারীর সুখলাভের প্রথম সম্বল তাহার আছে। জগতে কত অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী কেবল রূপের জন্যই দারিদ্র্যের পয়ঃপ্রণালী হইতে—আবর্জ্জনার স্তূপ হইতে গৃহীত হইয়া সৌভাগ্যের দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে যাইয়া সুলতানের ও খালিফার অঙ্কশায়িনী হইয়াছে। জোবেদার বংশপরিচয় কে জানে? বিশেষ হীনবংশজাত পুরুষ সম্রাট হইলেও তাহার স্বাভাবিক হীনতা দূর হয় না, কিন্তু হীনবংশজা কামিনী সৌভাগ্য লাভ করিলেই সাম্রাজ্ঞীর ভাব স্বাভাবিকভাবে লাভ করে—এ কথা সে আমীরের মুখেই বহুবার শুনিয়াছে। সুতরাং মুক্তি পাইলেই সে ধরায় স্বর্গসুখলাভের উপায় করিতে পারে। কিন্তু আমীরের স্নেহ লাভ করিয়া—তাঁহার অন্নে পুষ্ট হইয়া সে পলায়ন করিবে না—দায়ুদের সে প্রস্তাবের প্রলোভনও সে সংবরণ করিয়াছিল—সে তাঁহার হিতকর কার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মুক্তি-পুরস্কার লাভ করিবে। সেই জন্যই সে রুথকে সেদিন পলাইতে দেয় নাই—সেই জন্যই সে পরদিন রুথকে পূর্ব্বদিনের ঔষধ আনিয়া দেয় নাই, নিবিধ চূর্ণ দিয়াছিল—সেই জন্যই পরদিন দায়ুদ আসিবার পর সে-ই আমীরকে সে কথা বলিয়া দিয়াছে। সে আপনার মুক্তির জন্য এই ষড়যন্ত্র করিয়া আশার ভিত্তির উপর সুখের প্রাসাদরচনায় সময় কাটাইয়াছে। আজ আমীরের পদাঘাতে এই হারেমে তাহার জন্মাধিকার প্রাধান্যই শেষ হইল না—সেই প্রাসাদ চূর্ণ হইয়া গেল—আর সেই ভগ্নাবশেষের পতনে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। এই তাহার পুরস্কার! এই পুরস্কারের আশায় প্রলুব্ধ হইয়াই সে ফেরিদার কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইয়া আমীরের বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে! তাহার কৃতকার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কারই সে লাভ করিয়াছে।

সে যত ভাবিতে লাগিল, তাহার মনে ততই প্রতিহিংসাগ্রহণের বাসনা বলবতী হইতে লাগিল—তাহার নয়নে যে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল, তাহা মুখের শীকার কাড়িয়া লইলে ব্যাঘ্রের নয়নে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। এত দিন তাহার জীবন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত ছিল—আজ তাহাতে ঝটিকাঘাতে তরঙ্গ উঠিয়াছে। আজ তাহার সেই তরঙ্গতাড়নে কি কেবল তাহার হৃদয়ই আহত হইবে? এ তরঙ্গতাড়নে কি আমীরের সৌধও বিধৌত হইবে না? আজ সে ত তাহার অতীত জীবনেও ফিরিয়া যাইতে পারে না। আজ দাসীরা তাহার

অপমানে হাসিবে—আর কেহ তাহার প্রাধান্য মানিবে না; এতক্ষণে তাহার অপমানের কথা আর কাহারও জানিতে বাকি নাই। সে আজ আমীরের হারেমে শত দাসীর এক জন—তাহারই মত রমণীর দাসীবৃত্তি করিয়া সুখহীন—প্রেমহীন—সম্মানহীন জীবনের শেষে কবরের মৃত্তিকাতলে কীটের আহার হইয়া মাটীতে মিশান—ইহাই তাহার নিয়তি। অথচ এই নিয়তির বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল—এই নিয়তির সঙ্গে সংগ্রামেই সে জয়লাভ করিতেছিল। আমীর তাহার বিরোধী। আর যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বহ্নি সে হৃদয়ে প্রজ্বালিত করিয়াছে, তাহার কি হইবে? সে ত নিবিবার নহে। সেই বহ্নিদাহ-যন্ত্রণা বক্ষে লইয়া সে কি স্থির থাকিতে পারে? না।

তবে সে কি করিবে? সে যে চেষ্টায় নিয়তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিতেছিল, সেই চেষ্টায় আমীরের সর্ব্বনাশসাধন করিবে। তাহার বুদ্ধিতে তাহার বড় বিশ্বাস ছিল—সেই বুদ্ধি সে আমীরের সর্ব্বনাশসাধনে প্রযুক্ত করিবে। তাহার রূপ আছে—এই রূপের বহ্নিতে সে তাহার বাঞ্ছিত পুরুষ-পতঙ্গের পক্ষ দগ্ধ করিয়া তাহাকে আপনার করিয়া রাখিবার আশা করিয়াছিল—এই রূপের শক্তিতে রমণী জয়ী হয়। এই রূপও তাহার উদ্দেশ্যসাধনে প্রযুক্ত হইবে। সে ত সকল আশায় হতাশ হইয়াছে—এখন সে তাহার জীবনের এই একই উদ্দেশ্যসাধনে তাহার সর্ব্বস্ব ব্যয়িত করিবে। নারীর রূপ—নারীর বুদ্ধি—নারীর কৌশল—ইহার একেই কত সম্রাটের, কত বীরের, কত রাজনীতিকের, কত সাধুর সর্ব্বনাশ হইয়াছে; এই তিনের সমন্বয়ে কি তুচ্ছ আমীর আজীজের সর্ব্বনাশ হইতে পারিবে না? ফরিদার মত রমণীর পক্ষে ইচ্ছা করিলে কোন কায করিতে বিলম্ব হয় না। উদ্দেশ্য স্থির করিলে তাহারা উদ্দেশ্যসাধনোপায়ের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করে না। তাহাদের সাধুতার কোন মূল্য নাই—তাহা অসাধুতার উপায়ের অভাবহেতুই অক্ষুণ্ণ থাকে—প্রলোভন সহ্য করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না। তাই তাহারা চক্ষুর নিমেষে সাধুতার গিরিশীর্ষ হইতে অসাধুতার পঙ্কে পতিত হইতে পারে। তাহারা বিবেকবুদ্ধির বিচারচালিতা হয় না—কেবল স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল উপায়ের সন্ধান করে। এইরূপ প্রকৃতিতে যখন প্রতিহিংসার বীজ রোপিত হয়—তখন অচিরে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া বিষফল প্রদান করে।

ফরিদার তাহাই হইল। বিচূর্ণিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার উত্তাপে তাহার মস্তিষ্কে ষড়যন্ত্রের সর্পডিম্ব ফুটিয়া বিষধর বাহির হইল। সে আমীরকে তাহার দংশনবিষে জর্জ্জরিত করিবার জন্য সযত্নে তাহাকে পুষ্ট করিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

প্রার্থনা।

১

উষর মাঝারে, আছি সদা পড়ে,
উষরেই যেন থাকি।
লোকালয় তবু, চাহি না, হে প্রভু;
সেথায় সকলি ফাঁকি॥

২

দু'দিনের হাসি, ভালবাসাবাসি,
দু'দিনে ফুরায়ে যায়।
হাহাকার ব্যথা, হৃদে থাকে গাঁথা,
সুখ-স্বাদ নাহি পায়॥

আলিমদ্দিন আহমদ

স্বামী তুরীয়ানন্দ

প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে বাগবাজার বসুপাড়া পল্লী. এক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন ; দেবভক্তি, সত্যানুরক্তি এবং দৃঢ় ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ভিন্ন উল্লেখ করিবার মত সম্পদ তাঁহাদের কিছুই ছিল না। কর্ত্তা চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় – নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, সর্ব্বজনসম্মানিত—ডব্লিউ ওয়াটসন কোম্পানীর গুদাম-সরকার ছিলেন। ইঁহার অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান ছিল—বিশেষ মৃত্যু-নাড়ী। তখনকার দিনে আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণের গঙ্গাযাত্রা করিবার একটা প্রথা ছিল। ত্রিরাত্রি ত্রিতাপ-হারিণীর তীরে বাস করিয়া অন্তকালে অর্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত, আত্মজ এবং আত্মীয়-স্বজনগণের মুখে অন্তে গঙ্গা-নারায়ণ ব্রহ্ম নাম শুনিতে শুনিতে অন্তিম শ্বাসত্যাগ মহা সৌভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু সঙ্গতিহীন লোকবলবিরল ব্যক্তিগণের পক্ষে সে সৌভাগ্য অতিদুর্ল্লভ ছিল। তাহা হইলেও প্রবীণ ও প্রাচীনগণের গৃহ মৃত্যু ঘটিলে, আত্মীয় স্বজনগণ সমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেন না। ত্রিরাত্রি যাপন না হোক, মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে অথবা সমসময়ে মুমূর্ষুকে পতিত-পাবনী জাহ্নবী-কূলে লইয়া যাইবার জন্য গৃহস্থগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু দৈবাৎ কোন গঙ্গাযাত্রীর মৃত্যুর সময় অতীত হইয়া গেলে যে কি বিভ্রাট উপস্থিত হইত, তাহা একটি ঘটনায় পাঠক বুঝিবেন। নাড়ীর অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া, কোন কবিরাজ এক বৃদ্ধাকে তীরস্থ করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মুমূর্ষু আর মরিতে চায় না। শ্মশানবন্ধুর দল নিত্য আশা করিয়া তাঁহার মুখপানে চায়, নিত্যই তাহাদের মনোভঙ্গ হয়। ক্রমে একে একে সকলে সরিয়া পড়িতে সুরু করিল। অবশেষে আর উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া, বাটীর সরকার বৃদ্ধার পুত্রকে স্পষ্টই বলিলেন, "বাবু, আপনার মা এর চেয়ে আর বেশী মরবেন না।" এ রকম বিভ্রাটে লোকে ঠাট্টা করিয়া বলিত, পাট অর্থাৎ ত্বরায় যাহাতে ল্যাঠা চুকিয়া যায়, সেরূপ তদ্বির কর। কেন না, গঙ্গাযাত্রীকে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে আর গৃহে ফিরিতে নাই, ফিরিলে গৃহস্থের মহা অকল্যাণ। এরূপ অবস্থায় কবিরাজের অপেক্ষা মৃত্যুনাড়ী-জ্ঞানাভিজ্ঞ চন্দ্রনাথের অভ্রান্ত বিধান যে গৃহস্থগণ কত মূল্যবান্ জ্ঞান করিতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। পাড়ার প্রাচীনাগণ চন্দ্রনাথকে কেহ পুত্র, কেহ ভাই, কেহ দেবর সম্বোধনে সনির্ব্বন্ধ মিনতি করিয়া বলিয়া রাখিতেন, শেষ সময় ভুল' না, হাড় ক'খানা যাতে গঙ্গায় যায়, তার ব্যবস্থা কোর। কথিত আছে, ব্রাহ্মণ নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সুহৃদ, তখনকার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ, গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে বলিয়াছিলেন, "আমি আর এক বৎসর পরে মরব।" ইঁহারই কনিষ্ঠ-পুত্র হরিনাথ, উত্তরকালে হরি মহারাজ—স্বামী তুরীয়ানন্দ।

চন্দ্রনাথের তিন পুত্র, তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ, মধ্যম উপেন্দ্রনাথ এখনও জীবিত এবং জ্যেষ্ঠা ব্যতীত অপর দুইটি কন্যা গতায়ু। এই জ্যেষ্ঠা সহোদরা হরিনাথের জন্ম-সময় যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শক ১৭৮৪।৮।১৯।৫।৩৪।৩০

সন ১২৬৯ সাল, ২০শে পৌষ, শনিবার, শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি, মৃগশিরা নক্ষত্র। ইং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ, ৩রা জানুয়ারী, বেলা ৯টা।

"বিদ্যা-বিত্ত-তপঃ-স্বধর্ম্মনিরতো লগ্নস্থিতে বোধনে।"
"শনিধর্ম্মগঃ শর্ম্মকৃৎ সন্ন্যাসং বা"

হরির আত্মীয়-স্বজনগণ বলেন, নবকুমার জন্মিবার পর চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ এসেছেন। হরি-লুঠের সন্তান বলিয়া চন্দ্রনাথ পুত্রের নামকরণ করিলেন, হরি-নাথ। পাড়ায় তাঁহার প্রচলিত নাম ছিল, লালা হরি। সম্ভবতঃ বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষা উচ্চারণের জন্য হরি উক্ত নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সুস্থ, সবল শিশু মাতার নিঃশঙ্ক অঙ্কে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহার বয়স প্রায় তিন বৎসর, সেই সময় এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কলিকাতার উত্তর বিভাগ তখন পল্লী-গ্রামের ন্যায় অপেক্ষাকৃত জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। রাত্রির ত কথাই নাই, দিবসেও শৃগালের কোলাহল শুনা যাইত। এক দিন হঠাৎ একটা ক্ষেপা শিয়াল আসিয়া শিশুকে আক্রমণ করে। জননী প্রসন্নময়ী দেবী ছুটিয়া আসিয়া ভীত বালককে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন। ক্ষিপ্ত শৃগাল মাতাকে দংশন দিয়া গেল। তখনকার প্রচলিত চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না। কিন্তু প্রাণাধিক পুত্রের কল্যাণে জননী প্রাণ বলি দিলেন।

মাতৃহারা বালকের লালন-পালনভার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার উপর পড়িল। বড় বধূ সযত্নে মাতৃহীন দেবরকে পালিতে লাগিলেন। কিন্তু মাতা ও মাতৃস্থানীয়ার পার্থক্য শিশুর মন সহজেই উপলব্ধি করে। কি এক অলক্ষ্য প্রভাব যে শিশুর স্বভাব সংযত করিয়া ফেলে, বালকের ব্যবহারে মাত্র তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা মাতার অভাবে দুরন্ত বালক শান্ত হয়। একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয় তাহার দুষ্ট-বুদ্ধির মুখে লাগাম কষিয়া রাখে, প্রত্যাখ্যাত হইবার লজ্জায় তাহার সহস্র আবদার মূক হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তাহার নিরুদ্ধ তেজ সময় সময় অভাবনীয়রূপে বিদ্রোহাচরণ করে। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের ভ্রাতৃদ্বয় ও আত্মীয়গণ বলেন, হরি বাল্যকালে খুব শান্ত, খুব বাধ্য ছিল, আহারে তাহার কোনরূপ রুচি বিচার ছিল না—যা পেত, খেত—কিন্তু রাগ্‌লে বেজায় মারধোর্ কর্‌ত।

এমনি করিয়া কম্বুলিয়াটোলা বাঙ্গালা স্কুলে পড়িতে পড়িতে আরও সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। হরি ক্রমে দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই সময় তাঁহার জীবনে আবার এক দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল—পিতৃবিয়োগ। এ মৃত্যু আকস্মিক নহে। পাঠকের স্মরণ আছে, এক বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ নিজ-মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিয়াছিলেন। দিনে দিনে তাহা সন্নিকট হইয়া, ক্রমে শেষসময় উপস্থিত হইল। চন্দ্রনাথ নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া পাল্‌কী আনাইবার আদেশ দিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, পুত্র ও আত্মীয়বন্ধুগণ তাহা বহিবে। তাহাই হইল। গৃহ হইতে গঙ্গাভিমুখে যাত্রাকালে হরি অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোরুদ্যমান পুত্রের প্রতি চন্দ্রনাথের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিলেন, "হরি কাঁদ্‌ছে, ওকে একটু সান্ত্বনা দিন।" পরলোকযাত্রী বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "হরিকে আর কি বলব! হরি জগতের—জগৎ হরির।" মুমূর্ষুর নিস্তেজ নয়নে তখন মহানিদ্রার ঘোর আসিতেছে, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য যেন বৃদ্ধের অন্তশ্চক্ষুতে পুত্রের ভাবী জীবন-চিত্র প্রকটিত হইল। চন্দ্রনাথের বয়স তখন অনুমান ৭০ বৎসর।

সাধক-জীবনে ধর্ম্মের বীজ বাল্যেই অঙ্কুরিত হয়। ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা, স্বার্থশূন্যতা, ভগবদ্‌ভক্তি ও লোকহিতৈষণা শ্বাসবায়ুর ন্যায় ইঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ এবং ঈশ্বরাভিমুখে ইঁহাদের জন্মগত আকর্ষণ। সাধনায় ইঁহাদের সহজাত ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হয় মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "লাউ-কুমড়োর আগে ফল, ফুল দেখা দেয় পরে।" মানস-নেত্রে আমরা দেখিতে পাই, বালক বিবেকানন্দ বাজার হইতে রামসীতার মূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, "মা, সীতা যে রামের বউ, আমি তা হলে রামসীতা-মূর্ত্তি কি করে পূজো করি।" অতঃপর তিনি যোগীশ্বর মহেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন—সম্মুখে আগতফণা সর্প, বালযোগীর চৈতন্য নাই। ত্যাগিপ্রবর বালক প্রেমানন্দ পরিণীত হইবার আশঙ্কায় কাঁদিয়া বলিতেছেন, "আমি ম'রে যাব—ম'রে যাব।" বালক যোগানন্দ বাল্য-ক্রীড়া ছাড়িয়া জপ-ধ্যান-পূজায় নিরত। স্বামী তুরীয়ানন্দও আবাল্য ধর্ম্মভাবাপন্ন। উপনয়নান্তে বালব্রহ্মচারী হরি দৃঢ়নিষ্ঠা সহকারে গায়ত্রী ও সান্ধ্যারাধনে মগ্ন। নিত্য গঙ্গাস্নান জপ-ধ্যানরত। এ সময় তিনি খৃষ্টীয় শিক্ষালয় জেনারেল এসেম্ব্লীতে অধ্যয়ন করেন। বাইবেল পাঠ এ বিদ্যালয়ের অপরিহার্য্য নিয়ম হইলেও সকল ছাত্র সে পারমার্থিক ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ। বাইবেল ক্লাস প্রায়ই ছাত্রশূন্য থাকে। এমন কত দিন হইয়াছে, স্বকরে নিত্য-অনুষ্ঠিত নারায়ণ-সেবা সমাপনান্তে বিদ্যালয়ে গিয়া ছাত্রশূন্য ক্লাসে হরি একাকী অধ্যাপকের কাছে পরম শ্রদ্ধাসহকারে বাইবেল অধ্যয়ন করিতেছেন। এই একনিষ্ঠ ছাত্রের উপর অধ্যাপকগণ বিশেষভাবে সন্তুষ্ট। কিন্তু হরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার অবধি অগ্রসর হইয়া হঠাৎ পিছাইয়া আসিলেন। লোকে প্রশ্ন করে, "এণ্ট্রান্সটা দিলে না কেন হে?" হরি

মৃদু হাসিয়া উত্তর দেন, "কি হবে পাসের সম্মান নিয়ে?" হরি সম্মান চাহেন না, সুখ চাহেন না। প্রতিবাসী নটকবি গিরিশচন্দ্রকে বলেন, "সুখ নিয়ে কি হবে, গিরিশ দাদা?" অর্থকরী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে অনুরোধ করিলে উত্তর দেন, "কি'হবে ইংরাজী পড়ে?"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে সংস্কৃত শিক্ষার অনুরাগ যেমন বাড়িতে লাগিল, তাঁহার আচারও তেমনি কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিল। জপ-তপ-শাস্ত্রচর্চ্চায় দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। আহার স্বপাক হবিষ্যান্ন, তাও আবার পঞ্চগ্রাস মাত্র। কৌতূহল প্রশ্ন করে, গণা পাঁচটি গ্রাস খাও কেন? নিষ্ঠা উত্তর দেয়, পাঁচটি গ্রাস পঞ্চভূতের জন্য

এই সময় হরির প্রিয়তম সুহৃদ্ এবং অনুক্ষণ সঙ্গী ছিলেন, গঙ্গাধর—স্বামী অখণ্ডানন্দ। দুই জনে শাস্ত্রচর্চ্চা এবং সদসদ্বিচারে সারাদিন অতিবাহিত করিতেন। গৃহাগত প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণ সতারত, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, দীর্ঘকেশ, তরুণ যুবক হরির দৃঢ়নিষ্ঠা, শাস্ত্রানুরাগ ও আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবি দর্শনে শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত।

স্বামী তুরীয়ানন্দ। (আমেরিকায়)

শরচ্চন্দ্র ঘোষ নামে অপর এক প্রতিবাসী যুবক এই সময় হরির একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার রমেশচন্দ্র মিত্রের জন্মভূমি রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রাম শরতের স্বদেশ এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ইঁহার নিকট-জ্ঞাতি। শরৎ বলেন, কবিবর সুরেন্দ্রনাথের মহিলা কাব্য ও ভক্তপ্রবর শ্রীতুলসীদাসের গাথা হরির কণ্ঠস্থ ছিল। সন্ধ্যা-সমাগমে কাঞ্চনগলিত গঙ্গাজল কল্ কল্ করিয়া ছুটিয়াছে। হরি কখনও তুলসীদাসের গাথা, কখনও বা মহিলা-কাব্য হইতে বিশেষ করিয়া মাতার অংশ স্তবকের পর স্তবক সাশ্রুনয়নে অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন। দূর পরপারে তরুশ্রেণীশিরে রাঙ্গা মেঘের কোলে রক্তরবি, আর এ পারে, পার্শ্বে—হরির অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-শ্রীমণ্ডিত, ভাবোদ্ভাসিত মুখচ্ছবি! সংসারের কঠোর সংঘর্ষে সে তরুণ বয়সের কত মধুময়ী স্মৃতি চিরদিনের জন্য মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু গঙ্গাতীরের এ প্রাণস্পর্শী চিত্র শরচ্চন্দ্রের মানসপটে আজিও তেমনি উজ্জ্বল প্রভায় ঝলমল করিতেছে!

গঙ্গাতীরের আর একটি বিপরীত চিত্র এইখানে পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন কারণে ক্রোধের উদয় হইলে, হরির স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতি অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। তাঁহার এক খুড়তুতো ভাই ছিলেন—প্রিয়নাথ। হরি তাঁহাকে সেজদা বলিয়া ডাকিতেন। এক দিন গঙ্গাতীর হইতে প্রিয় বিষণ্ণবদনে বাটী ফিরিতেছিলেন; হরি তাঁর মুখভাব দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে সেজদা?" উত্তরে শুনিলেন, "পোর্ট কমিশনারদিগের গঙ্গাতীরবর্ত্তী রেলপথ-সংক্রান্ত এক জন লোক প্রিয়র প্রতি নানা অপভাষা প্রয়োগ করিয়াছে।" হরি সবিস্ময়ে ভাইয়ের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "অপমান নিয়ে তুমি বাড়ী ঢুকছ, কি বল? চল, এখনই তাকে শিক্ষা দিতে হবে।" ভ্রাতাকে লইয়া হরি গঙ্গাতীরে উপস্থিত। সেজদা অবমাননাকারীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলে হরি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমার সাম্‌নে তুমি একে বেশ ক'রে জুতিয়ে দাও। দেখি কি করে!" সেজদাকে আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে হইল না। এঞ্জিনের লাল আলোর মত রক্তচক্ষু হরির পানে চাহিয়া লোকটি অতি শান্ত-শিষ্টভাবেই পাদুকার দান গ্রহণ করিল।

ভাগীরথী সংক্রান্ত অপর একটি ঘটনা আমরা এইখানেই

বিবৃত করিব। গঙ্গায় মাঝে মাঝে হাঙ্গর ও কুমীরের ভয় হয়। হরি এক দিন স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় অদূরে একটা কুমীর দেখা গেল। ভয়ে স্নানার্থীরা সকলে কূলে উঠিল এবং উঠিবার জন্য হরিকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। হরি কিছুক্ষণ স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া "আমি দেহ নই, প্রাণ নই, মন নই," বিচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তবু কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল, ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া তীরে উঠিলেন।

আহার সম্বন্ধে পঞ্চগ্রাস বিধান, কিন্তু অধিক দিন চলিল না। হরি রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন এবং আত্মীয়-বন্ধুদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আহারের ব্যবস্থা সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেন।

চন্দ্রনাথ যখন লোকান্তরে গমন করেন, হরি তখন দ্বাদশ-বর্ষের। মৃত্যুর কঠোর শিক্ষা হৃদয়ে অঙ্কিত হইবার মত বয়স নয়। শাস্ত্রপাঠেও তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শন যদি বা কচিৎ কখন কাহারও মনে জীবনের অনিত্যতা জ্ঞানের উদয় করে, চপলা-খেলার মত ক্ষণিকে তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। বকরূপী ধর্ম্মের পৃষ্ট প্রহেলিকার উত্তরে এই জন্যই পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

কিন্তু সারবান্ সাধু-হৃদয়ে শিক্ষার বীজ অচিরাৎ অঙ্কুরিত হয়। প্রিয়নাথের আর একটি ভাই ছিল—কেদারনাথ, হরির প্রায় সমবয়সী, বিসূচিকা রোগে হঠাৎ ইঁহার মৃত্যু হয়। হরি স্থিরদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল মৃতের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে উদ্বেলিত সিন্ধুর সুগভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসের ন্যায় একটিমাত্র বাক্য উচ্চারিত হইল—"এই জীবন!"

এই জীবন! ঘোর অন্ধকারে জোনাকীর আলো—এই জ্বলিতেছে, এই নিবিতেছে! একটি পলক, একটি ঝলক! বায়ু-পুষ্ট বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর! জন্মিলেই মৃত্যুভয়, কেবল—'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।'

সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির।

উক্ত ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে চিৎপুরে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে এক সাধু মহাত্মার আগমন হয়। হরি এবং গঙ্গাধর প্রায় নিতাই তাঁহার সন্দর্শনে যাইতেন। কথিত আছে, এই ত্যাগী বাক্‌সিদ্ধ সাধু যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাই ফলিত। লোকের অসম্ভব ভীড়। কেহ দুরারোগ্য রোগ হইতে নিরাময়, কেহ পুত্র, কেহ অর্থ কামনা করিতেছে। এই দুই তরুণ যুবক বসিয়া বসিয়া শুনেন, আর মনে মনে হাসেন! এক দিন সন্ন্যাসী হরিনাথকে প্রশ্ন করিলেন, "বেটা, তুমি আস-যাও, কিছুই ত বল না, কি চাও?"

"সাধন-ভজন ভগবান্‌লাভ।"
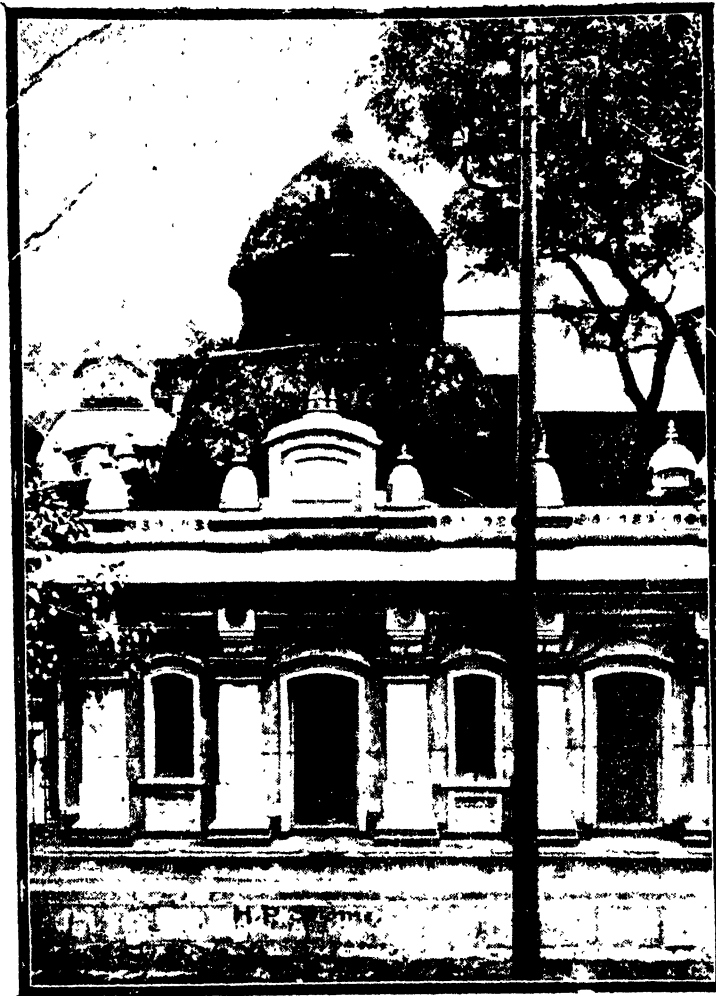
উত্তর শুনিয়া সাধু উল্লাসে অধীর হইয়া বলিলেন, "বেশ বেশ, কিন্তু এখন ঘরে থেকে সাধনা কর। সময় হয় নাই, একটু দেরী আছে।"

হরিনাথ সাধুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। ইতি-মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহারা পাত্র দেখিতে আসিতেন, হরির মুখে সজীব বৈরাগ্যের ভাষা শুনিয়া তাঁরা আর দ্বিতীয় দর্শন দিতেন না।

অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়া হরি তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। গঙ্গার পূতধারা সাগর-সঙ্গমে মিলিত হইল। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ লইয়া তখন তাঁহার মন নিরতিশয় জটিল তর্ক-বিচারে আচ্ছন্ন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভাবে-ভোলা দিগম্বর মূর্ত্তি, হরি-প্রেমে গর-গর মাতোয়ারা ভাব, শ্রীশ্রীজগন্মাতার নাম করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার ভাব-সমাধি, হরিনাথের মানস-নেত্রে এক অভিনব ভাব-জগতের দ্বার উন্মুক্ত করিল। পূর্ব্বোল্লিখিত শরৎ বলেন, এই সময় গঙ্গাতীরে সান্ধ্যবাসরে হরি প্রায়ই গাহিতেন—

"আমায় দে মা পাগল ক'রে।
আর কাজ নাই গো মা জ্ঞান-বিচারে।"

তাঁহার সে আকুল কণ্ঠস্বর আজিও যেন কর্ণে বাজিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত মহাকবি গিরিশচন্দ্র বলিতেন, ঠাকুর এক দিন বলরাম বাবুদের বাড়ী এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "সে ছেলেটি (হরি) কোথা গা ?" কে এক জন বল্‌লে, "সে মশাই, এখন খুব বেদান্ত পড়্‌ছে।"

"বটে, বেশ বেশ ! একবার ডাক না।"

তার পর হরি এলে তাকে কাছে বসিয়ে বল্‌লেন, "হ্যাঁগা, তুমি না কি খুব বেদান্ত বিচার কর্‌ছ ? বেশ ! কিন্তু শুধু বিচারে কি হবে ? বেদান্ত ত এই, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ঐটে ধারণা করা চাই। তবে কি জান, যতক্ষণ 'আমি' বোধ থাকে, ততক্ষণ জীব-জগৎ সব সত্য। নিত্য আর লীলা দুই-ই নিতে হয়। কিন্তু যতই কর, তাঁর কৃপা না হ'লে, তাঁকে লাভ করা যায় না। ব'লে ঠাকুর গাইলেন—

"ওরে কুশীলব করিস্ কি গৌরব—
বাঁধা না দিলে কি পার বাঁধ্‌তে।"

সেদিন গান কর্‌তে কর্‌তে ঠাকুরের চোখের জলে জামা ভিজে গেল। হরির চোখ দিয়েও অজস্র জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

মহাতরুর আশ্রয়ে তরুণ বৃক্ষ যেমন বর্দ্ধিত হয়, শ্রীগুরু-দেবের অপরিসীম কৃপালাভে হরিনাথ তেমনি দিন দিন উন্নত হইতে লাগিলেন। তার পর আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যখন লোক-লীলা সংবরণ করিলেন এবং শ্রীবিবেকানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল, হরি অচিরে তাহাতে যোগ দিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা উপেন্দ্র-নাথ বলেন, "এক দিন দেখি, এক অল্পবয়সী সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। মাথা নেড়া, গেরুয়া পরা—চিন্‌লুম হরি। বরাবরই সে ভাবপ্রবণ, দেখ্‌লুম, তার চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, 'কাঁদ্‌ছ কেন ? এই ত তুমি চাও ?' হরি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, 'আপনাদের কাছে আমি অনেক রকমে ঋণী—"তা হোক্ ! বড় ভায়ের যা কর্ত্তব্য, আমি করেছি। কিন্তু তুমি যখন সংসারী হলে না, তখন এই পথই ভাল। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমার সিদ্ধিলাভ হোক্।' আমার কথায় তার এত আহ্লাদ হ'ল যে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই হেসে উঠ্‌ল। তখন তার বয়স অনুমান চব্বিশ হবে।"

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ একাগ্র সাধনা এবং কঠোর তপস্যায় ডুবিয়া গেলেন। কখনও একাকী, কখনও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে—কখনও হিমালয়, কখনও শ্রীবৃন্দাবনে। এমনি উৎকট সাধনায় কয়েক বৎসর অতীত হইল। ইতিমধ্যে সুদূর আট্‌লাণ্টিক পারে আর্য্য-ধর্ম্মের বিজয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। দেশে দেশে দিকে দিকে শ্রীরাম-কৃষ্ণ নামের সৌরভ ছুটিল। যুগাচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ যক্ষো-পাসক, বিলাস-বিষধর-দষ্ট, পথভ্রষ্ট পাশ্চাত্য-জাতিকে বেদা-ন্তের প্রশস্ত রাজপথ দেখাইয়া দিয়া চারি বৎসর পরে দেশে ফিরিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় স্বামী তুরীয়ানন্দ মঠে আসিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে নবদীক্ষিত ব্রহ্মচারীদিগের শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী করিলেন। তার পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা হইল। স্বদেশে কিছুদিন থাকিয়া শ্রীনরেন্দ্রনাথ পুনরায় আমে-রিকা যাত্রা করিলেন—সহচর শ্রীহরি মহারাজ। পাশ্চাত্যের মহা কর্ম্মকেন্দ্রে শান্তির আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাই

হরিভাই তাঁহার সঙ্গী। আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দকে তথায় আচার্য্য-কার্য্যে ব্রতী করিয়া শ্রীনরেন্দ্রনাথ পুনরায় দেশে ফিরিলেন। এ দিকে একে একে আমেরিকার বহু নর-নারী হরি মহারাজের নিকট বেদান্তধর্ম্মের নূতন আলোক পাইয়া নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া প্রায় তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। তখন বিনিদ্র শ্রমে শ্রীনরেন্দ্রনাথের শরীর ভগ্ন হইয়াছে। হরি মহারাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত স্বদেশ-যাত্রা করিলেন; কিন্তু ইহলোকে আর উভয়ের মিলন হইল না। ভারত-প্রবেশের পথেই সংবাদ পৌঁছিল, স্বামীজী মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। হরি মহারাজের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। মহা সংযমী মহাপুরুষ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া আবার উগ্র সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। অনতিকাল পরেই তাঁহার দেহে বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত হইল।

দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল স্বামী তুরীয়ানন্দ এই কাল ব্যাধির সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়াছেন। কিন্তু এক দিনের জন্যও তাঁহার মুখে শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ ভিন্ন কেহ কখনও কাতরতার অস্ফুট স্বরও শুনিতে পায় নাই। একক্ষণের জন্য কেহ সেই চিরপ্রফুল্ল, প্রসন্ন মুখে যন্ত্রণার অণুমাত্র আভাস দেখিতে পায় নাই।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে কনখল সেবাশ্রমে শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের দুর্গোৎসবে তাঁহাকে বিধি-বিহিতরূপে চণ্ডীপাঠ করিতে দেখিয়া সকলে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁহার রোগ-ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কনখল সেবাশ্রম।

অতঃপর হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে হরি মহারাজ স্বামী শিবানন্দের সহিত আল্মোরায় গিয়া তত্রস্থ ছিল্কাপেটায় রামকৃষ্ণকুটীর নামে এক আশ্রম স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহার দেহে দুষ্ট ব্রণ এবং বিস্ফোটকের উদয় হইতে লাগিল। হরি মহারাজ যখন পুরীতে ছিলেন, সেই সময় এমনি এক পৃষ্ঠব্রণে অস্ত্র-প্রয়োগ প্রয়োজন হয়। ডাক্তার ক্লোরফরম্ করিবার প্রস্তাব করেন, হরি মহারাজ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "আমি ওখান থেকে মনকে সরিয়ে নিচ্ছি,

তুমি অস্ত্র কর। আমাকে একটু প্রস্তুত হ'তে দাও।" অনতিকাল পরে তিনি অস্ত্র চালাইবার ইঙ্গিত করিলেন। জড়ের উপর মনের এই শান্ত প্রভুত্ব দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এক সময় স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রিয়ভক্ত গুরুদাস (মিঃ হেগ্রুম্) তাঁহাকে সতের হাজার টাকা দেন। শিষ্যের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় হরি মহারাজ তাহা গ্রহণ করিয়া ব্যাঙ্কে জমা দিলেন। কিছুকাল অতীত হইবার পর গুরুদাস যখন ভারতে আসেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ সুদসমেত সমস্ত টাকা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। আবশ্যক না থাকিলে অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেহ কোন দ্রব্য দিলে স্বামী তুরীয়ানন্দ কুণ্ঠিত হইয়া, হয়, ফিরাইয়া দিতেন, নয়, অন্য কাহাকে দান করিতেন।

গত বৎসর ৺বারাণসীধামে হরি মহারাজের দেহে আর একবার অস্ত্রপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইলেও অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। স্বামী তুরীয়ানন্দ ইঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কাঞ্জিলাল ৺কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। অস্ত্র করিবার সময় রোগী মনের বলপ্রয়োগ করিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে, সে অস্বাভাবিক চেষ্টার ফল সময় সময় যে তাহার পক্ষে অনিষ্টকর হয়, অস্ত্র চিকিৎসকমাত্রেই তাহা অবগত। ছুরী প্রয়োগের সময় ডাক্তার বলিলেন, "আপনি চেঁচাবেন, কষ্ট চেপে সহ্যগুণ দেখাবেন না।" তার পর ডাক্তার কার্য্য সম্পন্ন করিলে রোগী দারুণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এ কি মহারাজ! এখন চেঁচাচ্ছেন কেন?"

"তুমি যে চেঁচাতে বললে গো!" বলিয়া মহারাজ হাসিতে লাগিলেন। অতঃপর আমরা এই নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার, একান্ত নির্ভরপরায়ণ, সত্যব্রত, সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত, উৎকট-তপাচারী, সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বসহিষ্ণু, সদানন্দময়, সাধু-জীবনের শেষাঙ্ক যথাসাধ্য অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইব। সাধু ও সাধারণ মানুষে প্রভেদ এই যে, সংসারী মানব আপনাকে ধরা দিবার ভয়ে নিরন্তর একটা মুখোস পরিয়া থাকে, মনের পাপচিত্র অন্তরে লুকাইয়া রাখে। কিন্তু সাধুর 'মন-মুখ' এক। হীরা বলিয়া মানুষ আপনাকে চালাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু কয়লা কি হীরা—জীবনের চরম সময় সে পরম সত্য অসংবৃত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মুমূর্ষুর চক্ষে সংসার-রঙ্গমঞ্চের উপর যখন ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িতে থাকে, তখন তাহার মানস-নেত্রের সম্মুখে এক অদ্ভুত দৃশ্যকাব্যের অভিনয় হয় এবং তাহারই অন্তরের চিত্রসকল জীবন্ত হইয়া তাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে। তখন সে দেখিতে পায়, তাহারই অজেয় লোভ অবয়ব ধারণ করিয়া তাহাকেই গ্রাস করিতে আসিতেছে! ঐ যে রক্তচক্ষু দানব দাঁতে দাঁত পিষিতেছে, উহা তাহারই ক্রোধের প্রকট মূর্ত্তি! নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিবার জন্য ঐ যে দুর্জ্জয় বহ্নি তাহার অভিমুখে গর্জ্জিয়া আসিতেছে, উহা তাহারই পাপ বাসনার প্রতিচ্ছবি! আর ঐ যে অতলস্পর্শ সিন্ধু তাহাকে কবলিত করিবার নিমিত্ত তরঙ্গ তুলিয়া উল্লাসে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, উহা তাহারই দুষ্কৃতিরাশি! তখন মানুষ আপনার অন্তরের সজীব ছবি দেখিয়া আপনা আপনি শিহরিয়া উঠে এবং পরিত্রাণের জন্য জড়িত রসনায় পরিত্রাহি চীৎকার করিতে থাকে। তখন তাহার মনে হয়, অর্থ মান অর্জ্জনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম, স্বার্থের সুপ্তিহীন ষড়যন্ত্র, পরের অনিষ্টচেষ্টার দুরন্ত চক্রান্ত, শঠতা, কপটতা, মিথ্যাচার—বৃথা—বৃথা—সবই বৃথা! মৃত্যু মহা শিক্ষাদাতা। কিন্তু জীবিতে যিনি তাহার কঠোর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করেন, দুস্তর বৈতরণী-নীর অপার সংসার-সাগর তাঁহার পক্ষে গোষ্পদ। সাধু-জীবনের অন্তিম দৃশ্যে এ নীতি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ।

এ বৎসর বর্ষার প্রায় প্রারম্ভ হইতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ রোগশয্যা গ্রহণ করেন। তখন চিকিৎসক অথবা সেবক কাহারও মনে উদয় হয় নাই যে, সে শয্যা হইতে আর তিনি উঠিবেন না; দেখিতে দেখিতে রোগ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। পৃষ্ঠদেশে আবার সেই বিস্ফোটক, আবার অস্ত্র-প্রয়োগের প্রয়োজন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল আবার ছুরী চালাইলেন, কিন্তু হতাশ চিত্তে।

এই সময় শ্রীবিবেকানন্দের শিষ্যা মিস্ ম্যাকলাউড তুরীয়ানন্দ মহারাজকে দেখিতে যান। মহারাজের দেহে তখন যম-যন্ত্রণা। পৃষ্ঠদেশে পিঠজোড়া ঘা, দুই পার্শ্বে শয্যাজনিত ক্ষত। চিৎ হইয়া, পাশ ফিরিয়া, কোন অবস্থায় সুস্থ থাকিবার উপায় নাই। শ্রীমতী ম্যাকলাউড সম্প্রতি রথযাত্রা দর্শন
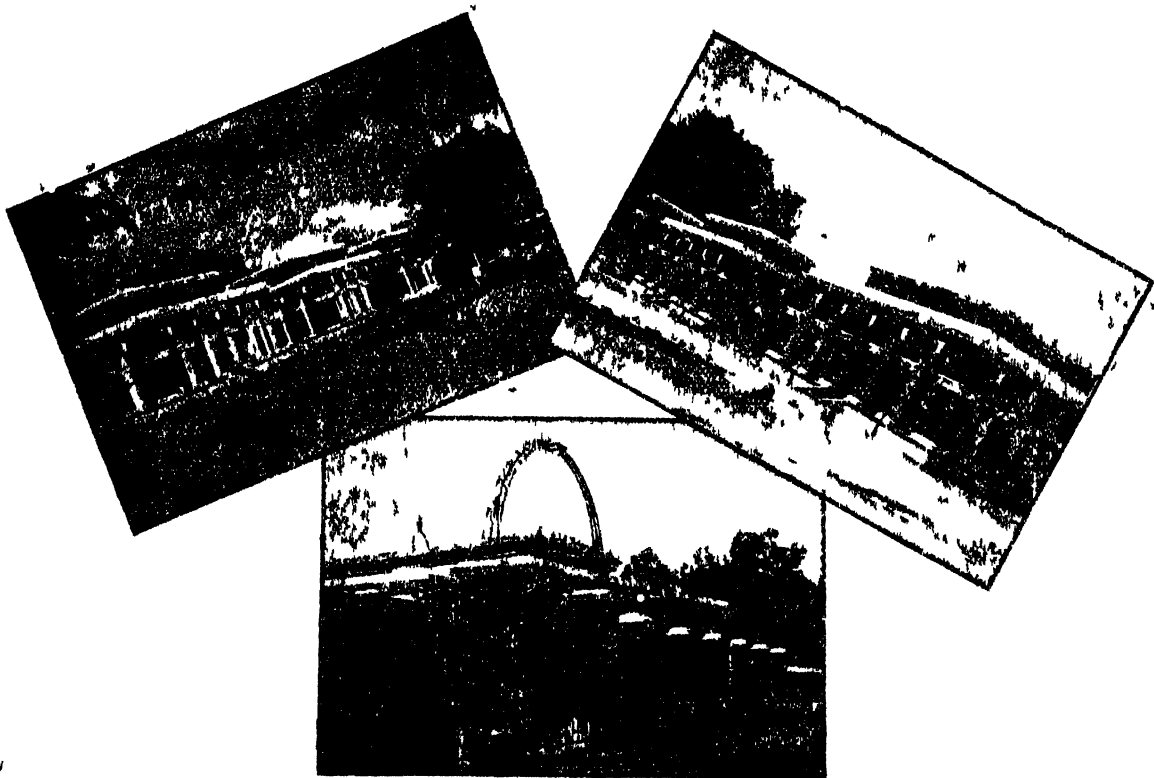
কাশী সেবাশ্রম।—উপরে সেবাশ্রমের পুরুষ বিভাগ, নিম্নে কার্যালয়।

সেবাশ্রমের নারীবিভাগ।

করিয়া পুরী হইতে ফিরিয়াছেন।" কথায় কথায় দেব দেবী এবং ক্রমে ব্রহ্মসম্বন্ধে আলোচনা উঠিল। মিস্ ম্যাকলাউড শ্রীবিবেকানন্দ মহারাজের উক্তি সকল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কোথায় গেল রোগ, আর কোথাই বা তাহার যন্ত্রণা! স্বামী তুরীয়ানন্দের কণ্ঠ হইতে সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় 'yes—yes—হুঁ—হুঁ' শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে মিস্ মহোদয়া যখন বলিলেন, "দেব-দেবী আর যা কিছু সবই সেই ব্রহ্মের প্রকাশ—স্বামী বিবেকানন্দ কি এ কথা বলেন নাই, মহারাজ?" মহারাজ সিংহনাদে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"We should be liars if we did not say so—সে কথা যদি না বলি ত আমরা মিথ্যাবাদী।" শ্রীমতী ম্যাকলাউড বিদায়কালে ডাক্তার কাঞ্জিলালকে বলিয়া গেলেন, "আপনারা মিথ্যা ভয় পাইতেছেন! স্বামীজীর কি হইয়াছে?"

কিন্তু মৃত্যুর দুঃসহ যন্ত্রণা দেহধারণ করিলেই অবশ্যম্ভাবী। গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে স্বামী তুরীয়ানন্দের কৈশোর-সহচর স্বামী অখণ্ডানন্দই একমাত্র তাঁহার শেষ-শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। অখণ্ডানন্দ বলেন, "সময় সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ দৈহিক যন্ত্রণায় নিরতিশয় কাতর হইয়া সকরুণ স্বরে কখন 'মা, মা,' কখন 'দীনবন্ধু-কৃপাসিন্ধু-দুঃখনিবারণ' বলিয়া ডাকিতেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট কয়েকদিন অবস্থিতির পর স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহুলা রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমে ত্বরায় ফিরিবার নিমিত্ত পত্র পাইলেন। কিন্তু কাশীর আশ্রমদ্বয়ের সেবক ও সন্ন্যাসিগণ বাধা তুলিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় স্বামী গঙ্গাধর হরি মহারাজের কক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন, "এস ভাই এস! দাদা এস! তুমি কাছে না থাক্‌লে সব ভুল হয়ে যায়, তুমি যেও না।"

অখণ্ডানন্দ আর মহুলায় ফিরিতে পারিলেন না। দিন বহিতে লাগিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ একাধিকবার এরূপ কঠিন পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। সেবকগণ এবারও ভাবিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের প্রিয় স্বামীর মহাপ্রস্থানের দিন সন্নিকট। স্বামী অখণ্ডানন্দকে তাঁহারা পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন, "মহারাজ, এক দিন ভাণ্ডারা দিন।" গঙ্গাধর নিঃসম্বল অবস্থায় বারাণসী আসিয়াছেন। ভাণ্ডারা দেওয়াও দুঃসাধ্য এবং ব্রহ্মচারীদিগকে 'না' বলাও সুকঠিন। কিন্তু সেদিনও গঙ্গাধর মহারাজ মুমূর্ষুর কক্ষে প্রবেশ করিতেই তাঁহার সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। স্বামী তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, আমার জন্যে কিছু টাকা জমা আছে। তুমি তা থেকে দরকার মত খরচ ক'রে, এক দিন তোমার নামে ভাণ্ডারা দাও।" ভাণ্ডারা দেওয়া হইল। সেবকগণের তখনও আশা। কিন্তু এই মায়াবী বিহঙ্গকে প্রাণপণে আবদ্ধ রাখিলেও, এক দিন সে হৃৎপিঞ্জর শূন্য করিয়া পলায়! রোগ কোনমতেই বাগ মানিতেছে না। ক্রমে হতাশ আসিয়া সেবকগণের হৃদয় অধিকার করিল। সকলে বিষণ্ণ হৃদয়ে আসন্ন সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেহ-রক্ষার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "আর কেন?

H. P. Ghose.

স্বামী অখণ্ডানন্দ।

শরীরটাকে টেনে ফেলে দাও!" অতঃপর বৃহস্পতিবার রাত্রি-শেষে উপস্থিত সেবককে বলিলেন, "কাল শেষ দিন—last day."

বিগত ২১শে জুলাই (১৯২২ খৃষ্টাব্দ), শুক্রবার সত্যই সে কাল-দিনের উদয় হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের মহাপ্রস্থান-কাহিনী স্বামী অখণ্ডানন্দ যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, এস্থলে তাহাই সন্নিবেশিত হইল। প্রাতরুত্থান করিয়া গঙ্গাধর মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দকে নিত্যই সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিতেন। একবার কি দুইবার ঐ কথায় প্রত্যভিনন্দন করিয়া স্বামী ক্ষান্ত হইতেন। কিন্তু এই কাল-দিনে তাঁহার মুখে ঐ শব্দ পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইতে লাগিল—"সুপ্রভাত—সুপ্রভাত—সুপ্রভাত—সুপ্রভাত।" গঙ্গাধর মহারাজ নিত্য তাঁহাকে স্তব শুনাইতেন। আজ স্তবাবৃত্তি শেষ হইলে, হরি মহারাজ কয়েকবার কারুণ্য-বিগলিতকণ্ঠে "মা—মা—মহামায়া" বলিয়া গঙ্গাধর মহারাজকে বলিলেন, "বল, আমরা মায়ের, মা আমাদের—মা আমাদের, আমরা মায়ের।" মহামায়াকে প্রণাম করিয়া অনন্তর স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন,—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোঽস্তু তে॥

দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া স্বামী শেষে বলিতে লাগিলেন, "বড় যন্ত্রণা! তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে, লোকে জান্‌তে পার্‌ছে না।"

কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দের আজ সারাদিন অতি উগ্র উত্তেজনাপূর্ণ ভাব। সেবকদিগের কোন কথাই শুনিতেছেন না। সমস্ত দিন কেহ থার্ম্মমিটার লইতে বা ঔষধ খাওয়াইতে পারিতেছেন না। মুখে পথ্য দিলে থু থু করিয়া ফেলিয়া দিতেছেন, কিন্তু গঙ্গাধর মহারাজের উপর স্বামী আজ নিরতিশয় প্রসন্ন। দিবসে দুই একবার যে ঔষধ-পথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই হাতে।

সমস্ত দিন এই ভাবে কাটিল। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমায় তুলে বসিয়ে দাও।" কিন্তু বসাইবার পর তাঁহার ঘাড় ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—"Can you not give me strength (আমাকে একটু বল দিতে পার না)?" দুই তিনবার এই কথা বলিয়া অবশেষে বলিলেন, "আমার পা ঠিক ক'রে দাও—" আসনপিঁড়ি হইয়া বসিবার ইচ্ছা। কিন্তু ঐ ভাবে বসিবার চেষ্টায় হঠাৎ তাঁহার শিবনেত্র হইয়া ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। সকলে ভীত হইয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিলেন। অল্পক্ষণেই কিন্তু সে ভাব সামলাইয়া তিনি চারিদিক দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! প্রভু!" গঙ্গাধর "দাদা" "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। উত্তরে স্বামী বলিলেন, "কিছু ঠাওর হচ্ছে না।"

অতঃপর স্বামী বলিলেন, "তুলে দাও।" তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, বসিয়া দেহ ত্যাগ করেন। কিন্তু তুলিয়া দিতে সাহস না করায় তিনি বলিলেন, "পা সোজা ক'রে দাও। হাত তুলে ধর।"

পদদ্বয় সরলভাবে স্থাপিত হইলে এবং হাত তুলিয়া ধরিলে স্বামী বলিতে লাগিলেন, "হরের্নামৈব, হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলম্।"

স্বামী অখণ্ডানন্দ অপরার্দ্ধ পূর্ণ করিয়া দিলেন, "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" পরে সকলের সঙ্গে সমস্বরে স্বামী নাম করিতে লাগিলেন, "ওঁ রামকৃষ্ণ, ওঁ রামকৃষ্ণ।"

মহারাজ অখণ্ডানন্দ পুনরায় তাঁহার করদ্বয় তুলিয়া ধরিতে স্বামী যোড়করে আবার প্রণাম করিলেন। এই সময় ডাক্তার আসিয়া ঔষধ পান করাইবার জন্য জোর করিয়া বলেন, "খান, আমি দিচ্ছি।" স্বামী সিংহনাদে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কে তুমি?" অনতিপরেই মৃদুস্বরে বলিলেন, "বোকারাম!"

ঔষধের পরিবর্ত্তে চরণামৃত দেওয়া হইল। স্বামী পান করিলেন। তখন আশ্রম রামকৃষ্ণ নামে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীও মধ্যে মধ্যে নাম করিতেছেন। গঙ্গাধর মহারাজ আর একবার চরণামৃত পান করাইলেন। ইহাই ইহ-জগতে স্বামীর শেষ খাওয়া। দুই তিন দিন যাবৎ তিনি প্রায় সর্ব্বদাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন; কিন্তু এই চরম সময় মহামায়ার রঙ্গস্থল যেন শেষ দেখা দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিকচ ফুলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। মুখে কি এক অলৌকিক ভাব! চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে

স্বামী বলিলেন, "সংসার মিথ্যা নয়—জগৎ সত্য—সব সত্য—সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত—সত্য-স্বরূপ—জ্ঞান-স্বরূপ—"

মহারাজ অখণ্ডানন্দ এই মহাবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "ওঁ সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ ক্ষণমাত্র স্থিরচিত্তে যেন আত্মপ্রত্যক্ষ

কাশী—মণিকর্ণিকা ঘাট।

করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "এই প্রাণ বেরিয়ে গেল।"

মুখে ভয়, বিষাদ বা ক্ষোভের চিহ্নমাত্র নাই, আছে কেবল এক নিবিড় আনন্দময় প্রশান্তি। গঙ্গাধর মহারাজকে বলিলেন, "হুঁ! বল।"

"ওঁ সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" মুমূর্ষুর কণ্ঠ হইতে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইল, "ওঁ সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম!"

অনন্তর গঙ্গাধর কহিলেন, "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" কিন্তু এই মহাবাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র স্বামী বলিলেন—"ব্যস্!" তার পর সব স্থির! সার্দ্ধ-উনষষ্টিবর্ষ বয়সে সন্ধ্যা ছয়টা পঞ্চান্ন মিনিটের সময় মহাপ্রাণ মহাপুরুষ মহাপ্রস্থান করিলেন! সংসার ছায়াসমাচ্ছন্ন হইল। সান্ধ্যগগন প্রকম্পিত করিয়া উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন রোল উঠিল, "রামকৃষ্ণ হরিবোল।"

পরদিন প্রাতে অর্চনা ও আরতি-অন্তে স্বামী তুরীয়ানন্দের কুসুম-চন্দনচর্চ্চিত-দেহ মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে নীত হইল। তথায় পুনরায় পূজা আরতি সমাধা করিয়া সন্ন্যাসী ও সেবকগণ মহাপুরুষের তপঃপূত শরীর ভাগীরথীর পবিত্র-নীরে সমাহিত করিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

জন্মাষ্টমী।

এস তুমি, এস—ভব-ভয়-বিমোচন!
আজি নিশি অন্ধকার, গগনে জলদভার,
চারি ধারে অবিশ্রাম বৃষ্টি-বরিষণ;
আঁধার অম্বরতলে, দামিনী চমকি' জ্বলে,
ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু মেঘ-গরজন;
বেদনার প্রবাহিণী, আজি কূলবিপ্লাবিনী—
কলকলে কোলাহলে কালিন্দী-জীবন।

ব্যাকুল বেদনা বহি' শ্বসিছে পবন;
আনন্দ আলোক-ভাতি, নিবায়েছে দুখরাতি,
বিলাপ—রোদন ছায় ধরণী গগন;
স্তম্ভিত—কম্পিত ধরা, শঙ্কা-শিহরণ-ভরা,
লুক্কায়িত চন্দ্র-তারা মেলে না নয়ন;
অনাচার-কংস ভয়ে, ধর্ম্ম রহে মৌন হয়ে—
অধর্ম্ম সগর্ব্বে করে গর্জ্জন ভীষণ।

অবিশ্বাসে অনাচার হয়েছে প্রবল।
আজি কংস-কারাগারে, সূচিভেদ্য অন্ধকারে—
শৃঙ্খলিতা জননীর ঝরে আঁখিজল;
বার বার সাত বার, বুকের মাণিক তাঁ'র,
লুণ্ঠিত; অষ্টমবার ফলিবে কি ফল!
শক্তিতে প্রত্যয়হারা, পিতৃনেত্রে ঝরে ধারা,
শক্তি যেন শক্তিহীন লুটে ধরাতল।

এস তুমি, এস—ভব-ভয়-বিমোচন!
নিরাশার অন্ধকারে, পরিপূর্ণ অনাচারে,
ওই শুন, দুর্ব্বলের আকুল ক্রন্দন;
ন্যায়ধর্ম্মে পদে দলি' পশুবল যায় চলি';—
অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে শঙ্কিত ভুবন।
এস, মুক্তিরূপ ধরি'; কংসপুরী ধ্বংস করি'
নিবার ধর্ম্মের গ্লানি—অধর্ম্ম-বারণ।

এস কারাগৃহমাঝে বন্ধন-মোচন;
মুক্ত হ'বে কারাদ্বার; খসিবে শৃঙ্খলভার;
পলাইবে অনাচার কম্পিত-চরণ।
দুর্ব্বলের বল তুমি, ধন্য কর পুণ্যভূমি,
জাগাও নিদ্রিত শক্তি জাগাও জীবন;
পূত কর ধরাতল, দূর কর অমঙ্গল,
উদ্ধত কালীয়ে কর চরণে দলন।

তরঙ্গিত অসন্তোষে ধরণী মগন।
প্রেম-বৃন্দাবনমাঝে, বিহরি' মোহন সাজে,
কোমলে কঠোর সত্তা—বিকাশ আপন—
বাঁশরী ত্যজিয়া হরি, অসি করে নাশ অরি,
লভ তুমি মথুরার রাজসিংহাসন;
ধরার ঘুচুক শ্রান্তি, মানব লভুক শান্তি,
উড়ুক প্রাসাদচূড়ে ন্যায়ের কেতন।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এস তা'র পর;
শক্তি-অশ্ব-বল্গা করে, অর্জ্জুনের রথপরে,
দাঁড়াও সারথি তুমি—চক্রী—চক্রধর।
যুগে যুগে এই পথে, লয়েছ মুক্তির রথে—
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে স্তব্ধি চরাচর।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বলী, ধর্ম্ম-রথচক্রে দলি',
তোমার মুক্তির রথ—হোক অগ্রসর।

এস তুমি, এস—ভব-ভয়-বিমোচন!
হের, হীন স্বার্থে ভরা, হিংসায় বিচ্ছিন্ন ধরা—
এস তুমি, কর—মহা-ভারত রচন;
প্রেমে সুখে আলো করা, সৃজিয়া নূতন ধরা,
মুক্ত কর উন্নতির রুদ্ধ প্রস্রবণ।
তার পরে পুনরায়, এস প্রেম-কান্ত-কায়,
এস ঋদ্ধি, এস সিদ্ধি—সার্থক-সাধন।

১৬

"এস অম্বিকাচরণ!"

সিঁড়ি ছাড়িয়া, উপরের বারান্দায় পা দিতেই দেখি, গৌরীকে বুকে ধরিয়া গুরুদেব পাদচারণ করিতেছেন। ভুবনের মা নিজের ঘরের দ্বারে বসিয়া, নির্নিমেষ-নেত্রে বুঝি তাঁহার লীলা দেখিতেছে।

"এই দেখ, তোমার মায়া আমাকেও দু'হাত দিয়ে কেমন জড়িয়ে ধরেছে।"

দেখিবার মত বটে! গুরুদেব হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর মাথায় প্রকাণ্ড জটাভার—গৌরী দুই হাতে সেই জটা আঁকড়িয়া যেন নিশ্চিন্তভাবেই তাঁরি বক্ষের উপর পড়িয়া রহিল।

"এই দেখ, আমি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমার মায়া আমাকে ছাড়ে না। কম্লি নেহি ছোড়্তা হায়। জটা মুড়ুবো নাকি, অম্বিকাচরণ?"

হাসিতে হাসিতে তিনি কথাগুলি বলিলেন, কিন্তু তীব্র-শলার মত সেগুলি আমার বুকে বিঁধিয়া গেল।

"ঘরের ভিতরে বসুন!"

গৌরীকে আবার বাহুপাশে বাঁধিয়া ঈষৎ শ্লেষের সহিতই তিনি বলিলেন,—"ঘরে কি বস্বার স্থান রেখেছ! নিজের সাধনাসন পর্য্যন্ত এই মোহ-স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছ।"

"এ কাজ ও করেনি প্রভু!"

"তবে কে—তোমার সেই অন্নপূর্ণার সেই ছেলেটি?"

বুঝিলাম, গুরুর সঙ্গে মায়ের দেখা হইয়াছে। আমি কোনও উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলাম। বাস্তবিক, দুষ্ট বালক আমার ঘরের মেঝের কোনও সামগ্রী শুদ্ধ রাখে নাই। উপরের ঝোলা আলনায় বসিবার মত যে যে বিছানা ছিল, তাহা লইয়া গুরুদেবের আসন করিলাম

উপবিষ্ট হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যেই করুক, অম্বিকাচরণ, কারণ এই। এই জীবটি এখানে না থাকিলে তোমার অন্নপূর্ণাও এখানে আস্ত না, তার পুত্রও আস্ত না। কল্মীর দল, একটাকে টেনেছ, সব এসেছে।" বলিয়া তিনি গৌরীকে বুক হইতে নামাইয়া কোলে শয়ন করাইলেন।

আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। বসিতে না বলিলে কখন তাঁহার সম্মুখে আমি উপবেশন করিতাম না।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বৎস!"

"আমাকে এখনি আবার বাইরে যেতে হবে।"

"সে হবে, এখন বস, বৎস।"

বসিতে বসিতে গৌরীর এক অদ্ভুত শান্ত-ভাব দেখিয়া বলিলাম,—"কি আশ্চর্য্য, প্রভু, এক দৃষ্টিতে মেয়েটা আপনার মুখের পানে চেয়ে আছে, চোখের পাতা পড়ছে না!"

আমার কথার উত্তর না দিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে বালিকার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। নিম্নমুখেই তারপর বলিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া গেল, কিছুক্ষণ কাঠের পুতুলের মত আমাকে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

"এতদিন ধরে একটা পরমা সুন্দরী কুলবধূ লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার বাড়ীতে আস্ছে, তা'কে একদিনও নিষেধ করতে তোমার সাহস হ'ল না, অথচ তুমি সন্ন্যাসী হ'তে চলেছ! ছি ব্রহ্মচারী, ছি!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি নির্ব্বাক্।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন,—ষাটের উপর বয়স, এখনো তোমার বুদ্ধি এলো না, তিন তিনটে সংসার ভেঙ্গে গেল,

তবু তোমার চৈতন্য হ'ল না! আবার এটাকে নিয়ে আর একটা সংসার প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি হে?"

"না প্রভু!"

"না কেন হে! জামাই হবে, নাতি হবে। সেই মোহেই না মা অন্নপূর্ণাকে নিষেধ করতে পারনি। বেশ, সকালে একবার ক'রে এসে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে—না এলে পাছে গৌরী আবার কৈলাসে ফিরে যায়—কেমন, এই ত মনের কথা হে।"

"ছ'মাস আমি তাঁর আসার খবর জানতুম না।"

"তা হ'তে পারে।"

"তিনি যে আসতেন, ভুবনের মা আমাকে একদিনও জানায়নি।"

"জিজ্ঞাসা কর না বুড়ীকে তার ফল। এমন তিরস্কার আমার কাছে খেয়েছে বুড়ী, বাপের জন্মে সে সেরূপ কঠোর-বাক্য শোনেনি। সে বেটীকেও যা ইচ্ছা তাই শুনিয়ে দিয়েছি।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

"সে বেটীও এখানে আর আসছে না, অম্বিকাচরণ, এক তাড়াতেই তার গৌরীর মোহ কেটে গেছে।"

"আমারই অপরাধে তাঁকে শুনতে হ'ল, প্রভু!"

"তাতে আর সন্দেহই নেই, এত বড় নির্ব্বোধের কায করেছিলে তুমি। এতে তোমার জীবনসংশয় হবার উপক্রম হয়েছিল। তা না হ'লেও সাধু ব্রহ্মচারী ব'লে তোমার যে নামের একটা মর্য্যাদা হয়েছিল, সেটি একেবারে নষ্ট হয়ে যেত। কাশীতে তোমার আর বাস করা চল্‌তো না।"

"তিনি যে ওরূপভাবে আসছেন, ছ'মাস আমি জানতে পারিনি। ভুবনের মা জান্‌তো, আমাকে বলেনি।"

"বুড়ীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না, সেজন্য তার আজ কি লাঞ্ছনা হয়েছে। বেটী হতভম্ব হয়ে কেমন ব'সে আছে, একবার দেখে এস না। যাক্, বিশ্বনাথ তোমাদের সহায়, সব ঝঞ্ঝাট মিটে গেছে।"

এই বলিয়া, গৌরীকে একটা পরমাত্মীয়তার গালিতে যেন আপ্যায়িত করিয়া, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,— "এইটাই হয়েছে যত অনর্থের মূল। এইটার মায়াতেই আবদ্ধ হয়ে তোমরা ছ'জনেই গোলমাল ক'রে ফেলেছ। রোজ রোজ এসে বেশ একে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে—আর কি? কে সে, কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে—আর জানবার দরকার কি?"

"আমরা ছ'জনেই তাঁকে এর গর্ভধারিণী মনে করেছিলুম।"

"তাইতেই ত বিশেষ অনর্থ ঘটিয়েছিলে, অম্বিকাচরণ! যে শ্রদ্ধার চক্ষে তাঁকে তোমাদের দেখা উচিত ছিল, তা তোমরা কেউ দেখনি।"

"না, বাবা, দেখিনি। শুধু দেখিনি নয়"

"থাক্, আর বলতে হবে না। তবে আর অনর্থের কথা বলছিলুম কেন বাবা, তুমি বৈরাগ্য নিয়ে গৃহ থেকে বেরিয়েছ—অত বড় বিঘ্ন ইচ্ছা ক'রে সম্মুখে রেখেছিলে! মা তাঁর পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে তোমার সম্মুখ দিয়ে চ'লে যেতেন, কিন্তু তোমার সমস্ত সাধন পণ্ড হয়ে যেত। যাক্, তাঁর কথা ছেড়ে দিয়ে, এইবারে যা বলব, শোন।"

"একটা কথা, বাবা?"

"কে তিনি, জানতে চাচ্ছ?"

করযোড়ে বলিলাম,—"গৌরীর মায়া, বোধ হয়, আপনার তিরস্কারেও ছাড়তে পারতুম না—"

হাসিয়া গুরুদেব আমার বক্তব্য বলিয়া দিলেন,—"মা ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন?"

"নইলে, এ জন্মে বুঝি আর আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে পারতুম না।"

মৃদুহাসি মুখে মাখিয়া তিনি বলিলেন,—"তা ও বেটীরা সবই করতে পারে। যিনি অঘটন সংঘটন করেন, সে বেটী ত তাঁরই একটি প্রতিমূর্ত্তি। যে বাবুটি সেদিন তোমার কাছে বসেছিল, ওটি তারই স্ত্রী। হতভাগা পাষণ্ড স্বামীকে মহাপাপের কবল থেকে মুক্ত করতে তিনি এই অসমসাহসিকের কায করেছেন। এই কাশী সহর,—এর পথে ঘাটে দুর্ব্বৃত্তরা সর্ব্বদা যাতায়াত করছে—ওই রূপ—সে সমস্ত ভ্রূক্ষেপ না ক'রে কি ক'রে যে মা এক বছর ধ'রে তোমার ঘরে যাতায়াত করেছেন, ভেবে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। হতভাগা স্বামী, চরিত্রহীন। ওই অমন পত্নীর উপর অসদ্ব্যবহার করে! নরাধমটা আবার আমার কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েছিল। কত প্রলোভন! আমাকে আশ্রম করতে তালুক দেবে, টাকা দেবে! যেমন দেখে আসছে, পয়সা দিয়ে গুরু

কেনা। মনে করেছিল, এখানেও বুঝি তাই! আমি তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলুম।”

“তিনি এসেছিলেন” বলিয়া ব্রজমাধব বাবুর সঙ্গে আমার যে যে কথা হইয়াছিল, গুরুদেবকে শুনাইয়া দিলাম।

“পাঠিয়েছিলুম কেন জান?—এই কাঞ্চন-কুসুমটিকে দেখাতে।”

“এইটিই তার?”

“এ আর বুঝতে পারছ না? হতভাগা আর এসেছিল?”

“না, প্রভু। সেই এক দিনই দেখেছিলুম, আর দেখিনি।”

“আর সে আসছে না। দেশে সে একটা মস্ত লোক হে! কোম্পানীর কাছে রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছে—ভারি প্রতিষ্ঠা! হাঁসপাতাল করেছে, ইস্কুল করেছে, দুর্ভিক্ষে চাঁদা দিয়েছে, বাপের শ্রাদ্ধে বছর বছর অগাধ টাকা খরচ করে, এই কাশীতেই সেদিন বামুন-পণ্ডিত, গরীব-দুঃখীদের কতই না দান করলে। রাজা হে রাজা। কিন্তু অম্বিকাচরণ, সে রাজ্যের রাজা, এ রাজ্যের কে? একবার পা দিয়ে দেখ্‌লে, দু'দণ্ড দাঁড়াতে পারলে না—চোরের মত পালিয়ে গেল।” বলিয়া কিছুক্ষণ গুরুদেব চিন্তিতের মত চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলেন। গৌরী এই সময়ে সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে হইল, সে যেন এইবার আমার কোলে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু গুরুর কোল হইতে তাহাকে লইতে, এমন কি, তাহার চাঞ্চল্যের কথা পর্য্যন্ত বলিতে আমার সাহসে কুলাইল না।

গুরুদেব উঠিলেন, গৌরীকে কোলে লইয়া ঘরের বাহিরে যাইয়াই তিনি ভুবনের মা'কে বলিলেন—“কি রে বুড়ী, কিছুক্ষণের জন্য এটাকে রাখতে পারবি?”

ভুবনের মা বোধ হয় উঠিতেছিল। নিষেধ করিয়া গুরুদেব তাহার কাছে চলিয়া গেলেন।

আমার মনে হইল, তিনি বুঝি আমাকে গৌরীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দিবেন না। আপনা-আপনি চোখে জল আসিতেছিল, গুরুদেবের ভয়ে পলকের মধ্যেই সে নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

ঘরে ফিরিয়া পূর্ব্ববৎ আসন গ্রহণান্তে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—“সন্ন্যাসী আমরা, সংসারীদের কথায় থাকা আমাদের একেবারেই উচিত নয়, থাকা ভালও লাগে না, কেবল তোমার জন্যই আমাকে এই জঞ্জালে পড়্‌তে হয়েছে।”

“দাসকে জঞ্জাল থেকে মুক্ত করুন।”

“ঠিক কথা?”

সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, তথাপি প্রবল চেষ্টায় বুকে বল বাঁধিয়া উত্তর করিলাম—“অন্তর্য্যামিন্, আর দাসকে পরীক্ষায় ফেল্‌বেন না।”

প্রথম যেদিন তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করি, মস্তকে আমার করস্পর্শ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—কি মধুর গম্ভীর আশ্বাস বাণী!—“অম্বিকাচরণ, আজ হ'তে আমি তোমার ভার গ্রহণ করলুম।” সেই বাণী মায়া-মনুষ্য মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

“আর মায়া কেন অম্বিকাচরণ? এই মেয়েটাকে চিন্তা করবার পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্ব-সংসারটাকে একবার চিন্তা ক'রে নাও। চিন্তা ক'রে নাও, তোমার সেই সাধ্বী পত্নী দয়াময়ীকে, তার বুকে-ধরা সেই কন্যাটিকে।”

“আমি নিজে অশক্ত, করুণা ক'রে আমাকে মুক্তি দান করুন।”

“মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না, বাবা, নিজের পুরুষকারে উপার্জ্জন করতে হয়।”

এর উত্তর দিতে একান্ত অশক্ত, শুধু গুরুদেবের মুখপানে চাহিয়া, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

“যিনি তোমাকে মুক্তি দিতে পারেন, তিনি তোমারই ভিতরে।”

মনে মনে বলিলাম—“তুমিই গুরুরূপে বাহিরে, অন্তর্য্যামিরূপে ভিতরে। তোমার এ ভয়-দেখানো কথায় আমি ভুলিব না।”

“কোথায় যেতে চাচ্ছ, যাও।”

প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম, তিনি আবার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিলেন। আবার যেন কি চিন্তা করিয়া বলিলেন—“বেশ, যাও। ফিরতে কত বিলম্ব হবে?”

“যত শীগ্‌গির পারব, প্রভু, বাজার করবার এখনও কিছু বাকী আছে।”

“যজ্ঞের আয়োজন করছ নাকি হে?”

আমাকে উত্তরের অবকাশ না দিয়া, তিনি আবার বলিলেন—“তাই ত, অম্বিকাচরণ, মনটা কেমন কেমন করছে।”

কি জন্য তাঁহার মন কেমন করিতেছে, অনুমানে বুঝিয়া আমি বলিলাম—"মাকে কড়া কথা ব'লে ?"

"বিশেষ কড়া কথাই বলেছি। বলেছি, রোজ রোজ এখানে মরতে এস কেন? আমার ছেলেটির সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না ?"

উত্তর দিব কি; ছেলে বলাতেই আমি অন্তরের হাসি চাপিতে পারিলাম না। ভুবনের মা'কে বয়স বলিয়াছিলাম ষাট, এখন মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলাম, পঁচাত্তর পার হইতে চলিয়াছে, আমি হইলাম তাঁর ছেলে! সত্যই কি তিনি আমাকে বালকবৎ দেখিয়া আসিতেছেন ?

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন—"কথাটা শোনামাত্র তাহার মুখখানা রাগে রাঙ্গা হয়ে গেল। আমি তা দেখে ভয় পাব কেন? আবার বল্লুম; 'মা না বিউলো, বিউলো মাসী; ঝাল খেয়ে মরে পাড়াপড়সী।' গর্ব্ভে ধর্লে যে, তার মমতা হ'ল না, ফেলে দিলে—দুর্য্যোগ রাত্তির—ফেলে দিলে মরতে, ওর মমতা উথলে উঠলো! এক বৎসর ধ'রে,—কুলবধূ—ফের যদি এ বাড়ীতে তোমাকে দেখ্তে পাই, ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেব। সঙ্গে যেটা ছিল, সেটা বুঝি ঝি, সে ব'লে উঠলো, 'কাকে কি বল্ছেন, ঠাকুর!' কে তার কথায় কান দেয়, আমি বলতে লাগলুম, তোর নরাধম স্বামীর চেয়ে আমার সে বালকটির মর্য্যাদা অনেক বেশী, তা জানিস্? ঝি বেটী ব'লে উঠলো, 'সাম্লে কথা কও ঠাকুর, কাকে কি বল্ছ, তুমি বুঝতে পারছ না।' আমি বল্লুম, 'কেন, তোর মনিব রাজা ব'লে নাকি? আর একবার সে পাষণ্ড বেটাকে আমার কাছে যেতে বলিস্, চিমটে পিটে আমি তাকে কাশী ছাড়া ক'রে দেবো। বেটী বুঝি রাগে দরোয়ানটাকে ডাকতে যাচ্ছিল, তোমার অন্নপূর্ণা নিষেধ কর্লেন।"

"মা কিছু বল্লেন না ?"

"অন্নপূর্ণা আবার কি বলবে! সে একটু হেসে বল্লে, 'না বাবা, আর আমি আস্ব না।' বালিকার মোহ? যেই এ প্রশ্ন করা, অম্বিকাচরণ, অমনি দুটো ডাগর চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল! সেই অবস্থায় মেয়েটা, তখনও তার কোলে ছিল, আমাকে দিয়ে মা চ'লে গেল। আমার কোলে তার স্নেহের পুতুলটির কি অবস্থা হ'ল, দেখতে একবার ফিরেও চাইলে না।"

"গৌরীর মোহ কেটে গেছে বল্লেন যে ?"

"কাটেনি ?"

"আমার যেন মনে হচ্ছে—"

"তোমার মনের মূল্য কি। তোমার মত পুরুষবেশী মেয়ে নয় সে, তাতে জগদম্বার সত্তা আছে।"

কঠোরতর তিরস্কারের ভয়ে আমি নীরব রহিলাম।

"বেশ, তোমার যদি তাই মনে হয়ে থাকে, একবার পরীক্ষা ক'রে আস্তে পার।"

"কেমন ক'রে কর্ব ?"

"তাঁর বাড়ীতে গিয়ে, আমার নাম ক'রে তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এস।"

গুরু রহস্য করিলেন, কি সত্যই বলিলেন, বুঝিতে না পারিয়া, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিয়া তিনি বলিলেন—"প্রয়োজন নেই, মা আমার এখানে আসবেন না।"

গুরুদেবের সম্মুখে শত চেষ্টাতেও আমি দীর্ঘশ্বাস রোধ করিতে পারিলাম না। সৌভাগ্য, তিনিও কতকটা আজ অন্যমনস্কের মত হইয়াছেন। আমার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি এক নূতন কথা আমাকে শুনাইয়া দিলেন—"তাই ত অম্বিকাচরণ, এতকালের সাধন-ভজন, এতকালের সন্ন্যাস, কত মহাপুরুষের সঙ্গ, কত দেশ-বিদেশ ভ্রমণ—আত্মজ্ঞান-লাভের জীবন-পণ চেষ্টা—সমস্ত ক'রেও যে বোকা সেই বোকা রয়ে গেলুম। একটা ছোট মেয়ে আমাকে ঠকিয়ে দিয়ে গেল!"

"আর কি কোন কথা হয়েছিল, প্রভু?"

"আমার হয়নি, হয়েছিল তার। গৌরীকে আমাকে কোলে দেবার সময়—চোখের জলে ভাস্তে ভাসতে—মুখে কিন্তু মৃদু মধুর হাসির কথা; ঝি শুনতে পেলে না, আমি মাত্র শুনতে পেলুম—আকাশবাণীর মত আমার কানে ঠেক্লো, 'আপনাকে কে গর্ভে ধরেছিল আপনি জানেন?' আমাকে বলতে হ'ল, 'না মা, আমি জানি না।' শুনে আরও একটু হেসে তিনি বল্লেন, 'দেবকী বল্তেন, আমি কৃষ্ণকে গর্ভে ধরেছি, যশোদা বল্তেন আমি। একমাত্র কৃষ্ণ জান্তেন, কে তাঁকে গর্ভে ধরেছে। ঠাকুর এ তত্ত্ব জান্লে আপনি আমাকে তিরস্কার কর্তেন না?" বলিয়াই একটি গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অম্বিকাচরণ, মাতৃ-চরিত্র-মাহাত্ম্য দেবতারও দুর্ব্বোধ্য।"

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, মা'কে আর একবার দেখিব।

১৭

গুরুদেবের মুখে যে বিস্ময়কর কথা শুনিলাম, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আমি পথ চলিয়াছি। উদ্দেশ্য গুরুর সেবার জন্য কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিব। চলিতে চলিতে উদ্দেশ্য ভুলিয়াছি। যে দোকান হইতে আমি মিষ্টান্ন লইতাম, তাহা ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি! মনে মনে মায়ের কথার কত অর্থ করিলাম। টীকার উপর টীকা অর্থও আমার সঙ্গে সঙ্গে কতদূরে চলিয়া আসিয়াছে। "আপনাকে কে গর্ভে ধরিয়াছে জানেন?" মা প্রশ্ন করিলেন। গুরু উত্তর দিলেন, "জানি না।"

গুরু জানেন না কে তাঁহার মা। তবে কি তিনি গৌরীরই মত পরিত্যক্ত সন্তান? এক জন তাহাকে গর্ভে ধরিয়াছে, আর এক জন পালন করিয়াছে? ক্ষুদ্র শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণেই সেই দ্বিতীয় মায়ের কোল আশ্রয় করিয়াছে। যখন তার বোধশক্তি আসিয়াছে, তখনও দেখে, সে সেই স্নেহময়ীর কোলে। সেই মায়ের সমস্ত ভালবাসা সেই ত একায়ত্ত করিয়া আসিয়াছে! তার ক্ষণেকের অদর্শনে শিশু যে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে!

সেই ত বালকের মা। কেহ যদি তার জন্মতত্ত্ব জানে, আর জানিয়া বালকের মনে সংশয় উৎপাদনের চেষ্টা করে, সে ত কখন তার অন্য মা স্বীকার করিবে না! তবে জননী যদি তার মানুষ-করা মায়ের কোল হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে যায়, বালক ত কখনই আকুল-আগ্রহে মা ছাড়িয়া তার কোলে উঠিতে যাইবে না!

কে আমার মা? আমিও কি নিঃসংশয়ে এ কথার উত্তর দিতে পারি? গুরুদেবের কথা ছাড়িয়া মায়ের প্রশ্নটা একবার নিজেকে করিয়া লইলাম। মনে মনে নানা বিচার-বিতর্ক করিয়া আমিও ত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না! কে পারে?

কে পারে? পৃথিবীর লোকের মধ্যে কয়জনেরই বা মাতৃ-স্তন্যপানেরই স্মৃতি আছে? মা—মা। এইটুকু বুঝিয়াই জগতের লোক নিশ্চিন্ত।

তখন মায়ের সেই প্রশ্ন আর ত আমার কাছে সহজ বোধ হইল না। গুরু উত্তর দিতে পারিলেন না। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এমন অবস্থায় আজিও বুঝি তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

গুরু বালক-শিষ্য সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "তোমার পিতা কে?" বালক তার মা'কে জিজ্ঞাসা করিল। জিজ্ঞাসায় যাহা জানিল, গুরুকে তাহা নিবেদন করিল। বালক জানে না, কে তার পিতা। কেন না, তার মা সেটা বলিতে পারিল না।

কিন্তু সত্যকাম সেই সঙ্গে ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিত, আমার মা কে? সত্যকামের মনেও সে প্রশ্ন উঠে নাই। উঠিলে বালক জিজ্ঞাসা করিত। বালক জানিত, মা মা। স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, উহা জানিবার আর প্রয়োজন নাই। জানিতে হইলে ওই মায়েরই কথার সত্যতার উপর নির্ভর করিতে হয়। "সূতিকা-গৃহে যখন আমার চৈতন্য ফিরিয়াছে, বৎস, ধাত্রীর কোলে তখন আমি তোমাকেই দেখিয়াছি এবং আমারই বস্তু জানিয়া সেই অবধি তোমাকে বুকে ধরিয়া মানুষ করিতেছি।"

"আপনি জানেন না, কিন্তু কৃষ্ণ জানিতেন, কে তাঁর মা।" তাই ত! সেই ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রি, আকাশের সেই আঁধার-কঠিন-করা মেঘের স্রাব, ঝড়ের সেই বনে বনে পাগলের অট্টহাসি-ভরা গান-ছুটানো উল্লাস!—আর যমুনার চিরোল্লাসময়ী তটিনীর সেই মত্ত চঞ্চল তরঙ্গরাশি মাথায় ধরিয়া তৃণচ্ছেদী রহস্যপ্রবাহে কৃষ্ণকোলে বসুদেবকে আবাহন!

সমস্ত ব্রজপুরী ঘন ঘুমে ডুবিয়া গিয়াছে! পশু-পাখী ত আর না জাগিবার মত যে যার আশ্রয় অবলম্বনে অন্ধকারের কঠিনাবরণে চোখ ঢাকিয়াছে। এক বসুদেব ভিন্ন আর কে জানিত ব্রজগোপালের জন্ম-রহস্য! ক্ষুদ্র শিশুকে সে রহস্যের কথা কে শুনাইল? যশোদা বলিলেন, আমি তার মা, দেবকী বলিলেন, আমি।

এ মাতৃত্বের অধিকার লইয়া যশোদা-দেবকীর দ্বন্দ্ব পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল হইতেই যে চলিয়া না আসিতেছে, তাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

গোপালের মা বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়ায় যশোদার বরং অধিকার ছিল। কিন্তু দেবকীর? চির-পরিচিতকেও যদি দশটা বছর দেখিতে না পাই, চিনিতে পারি না। আর

সেই সদ্যোজাত শিশু দীর্ঘ যোড়শ বৎসরের পরিবর্ত্তন দেহ ধরিয়া দেবকীর সম্মুখে দাঁড়াইল! দেখামাত্র সেই কিশোর কৃষ্ণকে সন্তান জ্ঞানে গ্রহণ দেবকী রাণী কেমন করিয়া করিলেন, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু কৃষ্ণ জানিতেন, কে তাঁর মা। না জানিলে দেবকীর আগ্রহেও বাৎসল্যের আদর্শ-রূপিণী যশোদার কোল ছাড়িয়া দেবকীর কোল তিনি আশ্রয় করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ নিশ্চয় জানিতেন, তাঁর গর্ভধারিণী দেবকী।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

"আমার তোমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, আমি তা জানি অর্জ্জুন, তুমি জান না।"

আমি যখন আমার জন্ম জানি, তখন মা'কেও জানি। কেন জানি শুনিবে?

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

যশোদাও নয়, দেবকীও নয়, মায়া আমার মা। নন্দও নয়, বসুদেবও নয়, মায়াধীশ আমিই আমার পিতা।

কৃষ্ণ জানিতেন, কে তাঁর মা। চির-আত্মজ্ঞ পুরুষ, জননী তাঁহার কাছে আত্ম-গোপন করিতে পারেন নাই। গৌরীরও কি সেই অবস্থা? ওই অন্ধকারে পরিত্যক্ত সদ্যোজাত শিশু—গৌরীকে পাইবার সমস্ত ঘটনাটা নব-প্রস্ফুটিত মূর্ত্তিতে আমার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল; প্রথমে বুক, পরে সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া উঠিল—সে কি জানে, কে তার মা? যদি জানে? আমার হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

"এ দিকে কোথায় যাচ্ছেন, বাবা?"

মুখ ফিরাইয়া দেখি, নদীজলে তপস্বিনীর সঙ্গে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই মেয়েটি। একখানি লালপাড় কাপড় পরিয়া একটি বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

কোথায় যাইতেছি বলা অসম্ভব—আমি প্রতিপ্রশ্ন করিলাম—"এই কি, মা, তোমার বাড়ী?"

"আমার বাবা এখানে থাকেন।"

"তুমি?"

কি যেন কেমন একটি কোমল সঙ্কোচ কোমলতর হাসির আবরণে ঢাকিয়া মেয়েটি বলিল—"আগে থাক্‌তুম না, এখন থাকি।" বলিয়াই কথাটা যেন ফিরাইবার জন্য সে বলিতে লাগিল—"ওপর থেকে দেখতে পেলুম, আপনি যাচ্ছেন, তাই তাড়াতাড়ি নেমে এসেছি। কোথাও যাবার যদি বিশেষ প্রয়োজন না থাকে—"

"বিশেষ এমন প্রয়োজন—"

আমি যেমন ভাবে কথা শেষ করিতে দিলাম না, সেও সেইরূপ করিয়া বলিল—"তা হ'লে একবার বাড়ীটাতে পায়ের ধূলো দিন না।"

"বেশ চল।"

বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। মেয়েটি পথ দেখাইয়া আমাকে উপরে লইয়া চলিল। কিন্তু সিঁড়ির পথটা এমন অন্ধকার, উপরে উঠিতে আমার কেমন উৎসাহ হইল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার বাবা কি উপরেই আছেন?"

"আছেন—তিনি পূজা কর্‌ছেন।"

"তবে—এক জনের বাড়ী যাবার ইচ্ছা করেছিলুম।"

"কার বাড়ী?"

"কিন্তু তার ঠিকানাটা আমার ভাল জানা নেই।"

"কার বাড়ী?

"ব্রজমাধব বাবুর।"

দেখিলাম, মেয়েটির মুখ সহসা মলিন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সে কোনও কথা কহিল না।

আমি বলিলাম—"জান্‌তে পার্‌লে প্রয়োজনটা সেরে যেতুম।"

"এখনি সেখানে যাবেন?"

"তুমি তাঁর ঠিকানা জানো?"

আমার কথার উত্তর না দিয়া, দোতলার দিকে মুখ করিয়া সে ডাকিল—"লছ্‌মী!" উপর হইতে একটি মধ্যবয়সী পশ্চিমা ঝি নামিয়া আসিল। মেয়েটি তাহাকে বলিল—"বাবাজিকে রাজা বাবুর বাসাটা দেখিয়ে দে।"

ঠিকানাটা এত সহজে পাইয়া আমার আহ্লাদ হইল বটে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ও হইল। একটু সন্দেহও আসিল। সে সন্দেহটা আনিল মেয়েটির বাপ।

থাক্, বিস্ময়, সন্দেহকে তাহাদের ক্রিয়া করিবার অবসর

না দিয়া আমি একেবারেই বলিয়া উঠিলাম—"আগে প্রয়োজনটা সেরে তোমার পিতার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ক'রে যাব।"

মেয়েটি কি যেন আমাকে বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে বলিতে আবার সঙ্কোচে বলা হইল না। আমি চলিলাম। লছ্‌মী পথ দেখাইয়া চলিল। আমি পূর্ব্বেই জঙ্গমবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সামান্য দূর যাইতেই অন্ধকারময় পথ ছাড়িয়া জঙ্গমবাড়ীর প্রশস্ত পথে উপস্থিত হইলাম। আর একটু চলিতেই লছ্‌মী দূর হইতে রাজাবাবুর বাড়ী দেখাইল। সেখানে পথ আরও প্রশস্ত এবং তাহারই পার্শ্বে নূতন রকমে প্রস্তুত একরূপ "সাহেবি" ধরণেরই অট্টালিকা।

বাড়ী দেখাইয়াই লছ্‌মী দাঁড়াইল। বাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত চলিবার অনুরোধ করিতে আধা বাংলা আধা হিন্দীতে বলিল—"হামি হুঁয়া নেহি যাব বাবা।" বলিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার রাজাবাবুকা পাশ কি দরকার আছে?"

"রাজাবাবুকা পাশ নয়, রাণীমায়ীকা পাশ।"

সে অবাক্ হইয়া আমার মুখের পানে একবার চাহিল, তার পর ফিরিয়া চলিল,—আমার কাছে বিদায় লইবারও অপেক্ষা রাখিল না।

১৮

ব্রজমাধব বাবুর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। অনেক লোক পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছে, সুতরাং সেখানে দাঁড়াইতে আমার সঙ্কোচ নাই। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে কেমন আমার সাহস হইতেছে না।

এই ধনী, তার এত বড় বাড়ী, তার স্ত্রীকে কেমন করিয়া আমার সেই নগণ্য, এ বাড়ীর তুলনায় কুটীরের মত গৃহে নিমন্ত্রণ করিব? দেউড়ীতে বন্দুক-ঘাড়ে সিপাহী পায়চারি করিতেছে। দেউড়ির ওপাশে লোককোলাহল—বুঝি রাজার ভৃত্য, কর্ম্মচারী অসংখ্য—বাড়ীতে প্রবেশই বা কেমন করিয়া করিব?

রাণীমা'কে নিমন্ত্রণ করায় গুরুর তেমন ইচ্ছা দেখি নাই। ইচ্ছা, আগ্রহ যা কিছু সব আমার। ব্রজমাধবের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমারও ইচ্ছা দমিত হইয়া গেল।

কিন্তু রাজাবাবুর সঙ্গে আমার ত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইয়াছে। আলাপে তাহাকে শিষ্ট, শান্ত এবং ধার্ম্মিক বলিয়াই বুঝিয়াছি। রাণীকে যখন নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, তখন নিষ্ফল প্রয়াসে ফিরিয়া যাইব? আমি ব্রহ্মচারী—কোন অর্থ-ভিক্ষায় এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছি না—আমার ভয় কি? ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া আমি ব্রজমাধবের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চলিলাম।

দ্বারমুখেই বাধা পাইলাম, দরোয়ান আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না। আমার মত পরিচ্ছদধারী অনেকেই, বোধ হয়, পয়সার জন্য বাবুর উপর উৎপাত করে। দরোয়ানের বাধায় আমার ক্রোধ হইল না। আমার আসার উদ্দেশ্য দরোয়ানকে বুঝাইব, পার্ব্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়াই কি রকম এক তীব্র দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—"কি ঠাকুর, এখানে কি মনে ক'রে?"

"রাণীমা'র সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছি।"

"রাণীমা'র সঙ্গে! বল কি বামুন, তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়!"

বেটীর দাম্ভিকতায় বাস্তবিকই আমার ক্রোধ হইল। তবু আমি শান্তভাবে তাহাকে বলিলাম—"কেন গো বাছা, এটা এমন দোষের কথা কি হ'ল! আমি ব্রহ্মচারী মানুষ—"

দরোয়ান আর আমাকে কথা কহিতে দিল না। সে একরূপ ধাক্কা দিয়াই আমাকে দেউড়ীর বাহিরে ঠেলিয়া দিল।

বাহিরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতই দাঁড়াইলাম। কি উৎপাত! এ কোথায় আমি কাকে খুঁজিতে আসিয়াছি। আমার সে কুটীরের দিক্ দিয়া রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমি যে সহজ মনে করিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম, সেটা আমার মস্ত ভুল। এটা মনে করিতে যাওয়াই আমার পাগলামী হইয়াছে।

পথে পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এক জুড়ি আসিয়া অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ীর মধ্যে ব্রজমাধব বাবুকেই দেখিতে পাইলাম। সঙ্গে আরও তিনটি। দুইটির বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ, একটি "সাহেব"বেশধারী।

ব্রজমাধব আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমিও তাহার সঙ্গে দেখা না করিয়া অবনতমস্তকে পাশ কাটিয়া যাইব মনে

করিলাম। দুষ্ট দরোয়ান আমাকে তাও করিতে দিল না, রূঢ় হস্তে আমাকে টানিয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড় করাইল। তা'র হুজুরের আসিবার পথে আমি বুঝি বাধা হইয়াছি।

প্রথমে ব্রজমাধব, তার পর একে একে তিন জন গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চলিল। পথের পার্শ্বে বন্দুক খাড়া করিয়া সিপাহী, তার পশ্চাতে আমি।

আমি ত মনে করিলাম, ব্রজমাধব আমার দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিল না, কিন্তু যেই ফটক ছাড়িয়া আবার আমি রাস্তায় পড়িয়াছি, অমনি একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বলিল—"ও ঠাকুর, হুজুর তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

কি করিব? ইহাদের কথাবার্ত্তাগুলা আমার ভাল লাগিতেছে না, ব্যবহার বিরক্তিকর হইয়াছে; যাইব কি না? আর যাইবারই বা প্রয়োজন কি? পার্ব্বতীর কথার ভাবে বুঝিয়াছি, রাণীকে নিমন্ত্রণ করা বৃথা। সে কথা দ্বিতীয়বার তুলিতেও আমার সাহস নাই। ব্রজমাধবের সঙ্গে কথা কহিবার কি আছে? ওদিকে অতিথি হইয়া গুরু ঘরে বসিয়া আছেন।

"তোমার হুজুরকে বল, আর আমি যেতে পার্‌ব না।"

ভৃত্য বলিল—"পার্‌ব না কি, যেতেই হবে।"

লোকটা ব্রজবাবুরই দেশের। কথা এমন কর্কশ যে, সহস্র চেষ্টায় ক্রোধ সংবরণ করিতে গিয়াও আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল। বিশেষ চেষ্টায় প্রকৃতিকে স্থির করিয়া আমি বলিলাম—"বেশ, আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তুমি রাজা-বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো, কি জন্য তিনি আমাকে ডাক্‌ছেন।"

হতভাগাটা এর উত্তরে বলিল—"যাবি কি না যাবি বল্।"

"যদি না যাই?"

অম্‌নি সে ডাকিয়া উঠিল—"সিপাহী!"

দেখি, পথের মাঝেই লাঞ্ছিত হই, সিপাহী আসিতেছে, দুই চারি জন পথিকও সিপাহীর নাম শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বলিলাম—"বেশ, চল।"

হতভাগাটা আমাকে যেন আগুলিয়া উপরে লইয়া গেল। পথে কোনও দিকে না চাহিতেও বুঝিলাম, অনেকগুলা লোক আমার পানে চাহিয়া আছে। কিন্তু সেই হতভাগী পার্ব্বতীটা আছে কি না, বুঝিতে পারিলাম না।

যে এক দিন দীনভাবে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তার বাড়ীতে এরূপ ব্যবহার পাইব, আমি যে স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই! আর তার এরূপ আচরণের অর্থই বা কি? রাণী কি সেদিন আমার দোষ গ্রহণ করিয়া নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়াছেন? তবে কি তিনি আমাকে ক্ষমা করেন নাই? অথবা আজিকার তৎপ্রতি গুরুর আচরণের সমস্ত ক্রোধটা আমার উপর পড়িয়াছে? বুঝিতে পারিলাম না, রাজাবাবুর বাড়ী আমার এ লাঞ্ছনার অর্থ কি।

উপরে উঠিতেই দেখিলাম, এক অতি সুন্দর, সজ্জিত, প্রশস্ত ঘর। ঘর রাজারই যোগ্য বটে! ঘরের তিন চারিটা দ্বার, তাতে রং-বার্ণিস করা অতি সুন্দর কবাট। তার একটা দিয়া বুঝি ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, কেন না, সেই দোরটার পাশেই একটা টুলের উপর দেখিলাম, সাজগোজ পরিয়া, যে দরোয়ানটা আমারই বাড়ীর দোরে বসিয়াছিল, বসিয়া আছে।

চাকরটা আমাকে দরোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া ভিতরে গেল। ঘর লোকে পূর্ণ—বাঙ্গালী, পশ্চিমা, পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, হিন্দু, মুসলমান—দুইই দেখিলাম। কাশীর পণ্ডিতদের ভিতরও দুই এক জন দৃষ্টিগোচর হইল। ইহারা আসিয়াছে —কেহ জিনিষ বেচিতে, কেহ বেচা জিনিষের দাম লইতে; কেহ বা শুধুই সাক্ষাৎ করিতে। আর এই পণ্ডিতগুলা আসিয়াছে, এই বিপুল বিলাসী ধনীর নিকট হইতে যা যৎকিঞ্চিৎ কৃপাপ্রাপ্তির লোভে, নানাবিধ স্তুতির শ্লোকে সেই অতুলনীয় দেবভাষার শ্রাদ্ধ করিতে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিজের অবস্থা ভুলিয়া গেলাম।

কিন্তু যাহাকে লইয়া স্তুতি, তাহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না। বুঝিলাম, বাবু ঘরের এক প্রান্তে বসিয়া আছেন। তাঁর সহচরগুলিকেও দেখা গেল না। উঁকি দিয়া যে দেখিব, তারও উপায় নাই। কতক্ষণ দরোয়ানের পার্শ্বে চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকিব? যে হতভাগা চাকর আমাকে দাঁড় করাইয়া ভিতরে গিয়াছে, সে বেটাও ত ফিরে না! কি আপদ্! এক এক মুহূর্ত্ত যে এখন আমার কাছে বৎসর বোধ হইতেছে!

"দরোয়ানজি !"

সে আমার মুখের দিকে চাহিল। দেখিলাম, তার তক্‌মা, পাগড়ী, পোষাক, টুল সমস্ত একসঙ্গে জড়াইয়া এক অপূর্ব্ব অহঙ্কারের মূর্ত্তি ধরিয়া তার চোখ দু'টার ভিতর হইতে আমাকে ধমক্ দিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, দরোয়ানজিকে সম্বোধন করাই আমার ধৃষ্টতা হইয়াছে।

হঠাৎ ঘরের ভিতরে একটা বিষম হাসির রোল উঠিল। ইহার একটু পরেই সেই "সাহেব"বেশী যুবক—সে আসিয়াই আমাকে বলিল—"তুমিই কি রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছ ?"

"ভুল ক'রেছিলুম বাবা! আমার বলা উচিত ছিল, রাজাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।"

যুবক মুখটা বিশেষ রকমই বিকৃত করিয়া বলিল—"ভুল হয়েছিল! ভিমরতি হয়েছে না কি! সিধুবিবির বাড়ীতে কি করতে গিয়েছিলে? সেটাও কি এই রকমেরই ভুল ?"

"সিধুবিবি কে, আমি ত জানি না বাবা !"

"জান না" বলিয়াই সে একটা কঠোর গালি দিয়া আমার গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিল।

একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন। দুই চারি জন লোক চপেটাঘাতের শব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সকলেই দাঁড়াইয়া নীরবে আমার লাঞ্ছনা দেখিল। দরোয়ান টুল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আগে হইতেই প্রাণহীনের মত আমার দুর্দ্দশা দেখিতেছে।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"শাস্তির যদি শেষ হয়ে থাকে, আমাকে যেতে অনুমতি দাও, বাবা!"

আর এক চপেটাঘাত। "বেটা, চিম্‌টেপেটা ক'রে রাজাবাবুকে কাশী-ছাড়া কর্‌বি না ?"

"সে ও বলেনি, পিসে বাবু!"

দেখিলাম, বারান্দায় একটু দূরে দাঁড়াইয়া পার্ব্বতীও আমার লাঞ্ছনা দেখিতেছে।

আমি বলিলাম—"সে আমারই বলা, পার্ব্বতি !"

ভিতর বাহির নিস্তব্ধ। সিঁড়ির মুখেও লোক দাঁড়াইয়াছে। কাহারও মুখে কোনও সহানুভূতির কথা ফুটিল না।

শেষে এক জনের মুখ হইতে উপদেশের কথা বাহির হইল। তার সর্ব্বদেহেই বৈষ্ণবোচিত চিহ্ন, হাতে মালার ঝুলি। ঝুলি নাড়িতে নাড়িতে সে আমাকে বলিল—"ভগবানের নামে ভণ্ডামীর ঠিক শাস্তি পেয়েছে। তোমার ভাগ্য ভাল। হরি করুন, এখন থেকে যেন তোমার সুমতি হয়। আর যেন ধর্ম্মের গ্লানি ক'র না।"

কেবলমাত্র এক জন আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কথা কহিল। সে মুসলমান। আমার বার বার লাঞ্ছনা দেখা সহ্য করিতে না পারিয়া বুঝি সে বলিয়া উঠিল—"বুঢ্‌ঢা আদমি ভুল কিয়া, মাফ কিজিয়ে হুজুর!"

যুবক প্রহার করিতে নিরস্ত হইল। কিন্তু সে সেই মুসলমান ভদ্রলোকটির কথায় হইল কি না বলিতে পারি না। নিরস্ত হইয়াছে সে পার্ব্বতীর কথায়। হতভাগা ভুল করিয়াছে। তার মুখে আমি অপ্রতিভের চিহ্ন দেখিলাম।

"এইবারে যেতে পারি, বাবু ?"

কোনও উত্তর না দিয়া যুবক চলিয়া গেল।

"কি গো, মা, যেতে পারি ?"

"যাও বাবা, কিছু মনে ক'র না। পিসেবাবু লোক ভুল করেছে।"

বাড়ীর বাহিরে যাইতে আর বাধা পাইব না বুঝিয়া, পার্ব্বতীর সান্ত্বনাবাক্যে শুধু হাসির উত্তর দিয়া আমি ব্রজমাধবের গৃহ ত্যাগ করিতে চলিলাম।

সত্য বলিতেছি, এই অহেতুক অপমানে হতভাগ্য যুবকটার উপর আমার কিছুমাত্র ক্রোধ হইল না। কেন হইল না, ইহার উত্তর কি দিব? উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, শ্রীগুরুর কৃপা। ক্রোধের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি আমার কেমন দয়া হইল। ভদ্রঘরের এরূপ অনেক আকাটমূর্খ আমি দেখিয়াছি। তাহারা কি করে, কি বলে, কেন করে, কেন বলে, নিজেরাই বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তি যখন মদান্ধ, অসৎপ্রকৃতি ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আশ্রয়দাতার মনস্তুষ্টির জন্য এমন ঘৃণিত কায নাই, যাহা সে করিতে পারে না। তাহার প্রভু যা নিজে করিতে অথবা বলিতে পারে না, সে তা অনায়াসে করিতেও পারে, বলিতেও পারে। প্রভুর কৃপা হারাইয়া এই প্রকার লোকদিগের অনেকের প্রকৃতি আবার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছি। হতভাগ্যের উপর ক্রোধ না হইয়া সত্যই তাহার উপর আমার কেমন দয়া হইল। তার মুখখানা দেখিয়া মনে হইল, এখনও

সে মনুষ্যত্বের সমস্তটা হারায় নাই। সদাশ্রয় পাইলে বুঝি হতভাগাটা আবার ভাল হইতে পারে। আর তাহাকে পশু করিয়াছে, তার এই বিজাতীয় পরিচ্ছদটা। ব্রহ্মাণ-সন্তান "সাহেবের" অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। অনুকরণে লইতে সমর্থ হইয়াছে কেবল তার দোষটুকু। তার এই বিলাতী পোষাকের আবরণে কত তম যে আশ্রয় করিয়াছে, প্রকৃতি পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া ওই আবরণের ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

যুবকটার উপর আমার দয়া হইল। দয়াই বা বলিতেছি কেন, কেমন একটা মমতা আসিল। এ মমতার কারণ আমি আমার মনের সমস্ত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়াও নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

কিন্তু ক্রোধ আসিতে লাগিল সেই পাষণ্ড, সেই বকধার্ম্মিক "রাজাবাবু"টার উপরে। যাহার ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে ওই বুদ্ধিমান্ যুবক যন্ত্রের মত কার্য্য করিয়াছে। এমন কাপুরুষ, যে কার্য্যটা নিজে করিতে সাহস করিল না, তাই তার এক জন অন্নদাস নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়া করাইল!

আমাকে দিয়া গুরুদেবকে দীক্ষা দিবার অনুরোধ করাইতে এই ব্যক্তিই কি আমার কাছে গিয়াছিল—সেই শান্ত মিষ্টভাষী বিনয়ী? গৌরীকে দেখিয়া সে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য না ব্যাকুল হইয়াছিল!

সেই হতভাগা জমীদারের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইতে আমার অধিকার ছিল। সহসা মায়ের মুখস্মৃতি! সে যেন হাসিয়া বলিল—"কর কি ঠাকুর! তুমি না সন্ন্যাসী হইতে চলিয়াছ, তোমার প্রাণের গৌরীকে ছাড়িবার সঙ্কল্প করিয়াছ?, অথচ একটা তুচ্ছ অপমান সহ্য করিবার তোমার ক্ষমতা নাই!"

যাও ব্রজমাধব, বিশ্বনাথ তোমার কল্যাণ করুন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

ইস্পাতের কাটাম।

লর্ড কর্জ্জন—সিভিল সার্ভিসের ইস্পাতের ফ্রেমে ভারত-সাম্রাজ্য খাড়া আছে।

মিঃ লয়েড জর্জ্জ।

মিঃ লয়েড জর্জ্জকে কেহই আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া চিনিতে পারিল না। তিনি নাকি একটি জীবন্ত প্রহেলিকা। তাঁহার মতিগতি কখন্ কিরূপ হইবে, তাহা নাকি স্থির করা বড় শক্ত। তিনি কোন্ দলভুক্ত, তাহা বলা কঠিন। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি লিবারল্ অগ্রণী-গণের অন্যতম ছিলেন। ইংলণ্ডের অবাধ-বাণিজ্যনীতি কোনও প্রকারেই ক্ষুণ্ণ করিতে তখন তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। স্বদেশের ও বিদেশের পণ্য-প্রবাহের গতিরোধ করা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। আরও অনেক বৎসর পূর্ব্বে যখন মিঃ জোসেফ চেম্বারলেন্ ক্যাবি-নেটের আসন পরিত্যাগ করিয়া সার্ব্বভৌম অবাধ-বাণিজ্যের অপকারিতা বুঝাইয়া দিবার জন্য কয়েক মাস অনবরত বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলেন, তখন লিবারল্দিগের মধ্যে যাঁহারা অত বড় প্রচণ্ড কন্সার্ভেটিভের পণ্যনীতির প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, মিঃ জর্জ্জ তাঁহাদের অন্যতম। মিঃ (অধুনাতন আর্ল্) আর্থর ব্যাল্ফোর রাষ্ট্র-পরিষদের কর্ণধার হইয়া গম্ভীর দার্শনিকের মত স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। মিঃ চেম্বারলেন্কে তিনি কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন নাই। কিন্তু জোসেফ বলিলেন—"আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হইবেন না। আমার বিচ্ছেদে আপনার চঞ্চল হইবার কোনও কারণ নাই। আপনার ক্যাবিনেটের পণ্য policyকে বলবত্তর করিবার জন্য আমি সদস্যপদ পরি-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। রাষ্ট্র-সচিব থাকিয়া ত খোলসা করিয়া বক্তৃতা করা চলে না। সচিব হিসাবে যতটুকু বৃটিশ সাম্রাজ্যের কায করি-বার সামর্থ্য আমার ছিল, ততটুকু আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে করি-য়াছি। সমুদ্রপারের বৃটিশ উপনিবেশ-গুলিকে এতকাল Colony বলা হইত; আপনি জানেন, আমি আমাদের রাষ্ট্রীয় আলাপে পরিচয়ে ঐ শব্দ প্রয়োগ একে-বারে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। তাহাদিগকে Dominions beyond the Seas আখ্যা দিয়াছি; ভাবিয়া দেখুন, তাহাতে তাহাদের ও আমাদের গৌরববৃদ্ধি হয় নাই কি? এত দিন তাহাদিগকে ইংলণ্ডের দুহিতৃ-প[illegible]চয়ে Daughter Countries বলা হইত; আমিই ত ঐ[illegible]দেশবাসীদিগকে সোদর সম্ভাষণে Sister Nations আখ্যা দিয়া প্রথমে আহ্বান করিলাম। এখন সেই Sister Nationদিগকে আরও কাছে টানিয়া আনিতে হইবে;—তাই আমি Imperial Preferenceএর দিকে ঝুঁকিয়াছি। কিন্তু কব্ডেন্-পন্থীরা আমার বৃথা অপবাদ দিতেছে। আমি ফ্রী ট্রেড-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছি না। অন্য সব নেশ-নের চেয়ে আমাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নেশনগুলির দিকে আমরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিব। বাণিজ্যের সুবিধা

পত্নী কন্যাসহ মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ—সঙ্গে সার এডওয়ার্ড গ্রেগ

তাহাদিগকে এমন ভাবে দিতে হইবে যে, তাহারা রাষ্ট্রীয় প্রীতিবন্ধনে তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল ব্যবস্থা দেখিয়া পুলকিত হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দৃঢ়তরভাবে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।" তাহার পর জোসেফ অমিতবিক্রমে ঝড়ের মত একটা hurricane compaign চালাইলেন। রোজবেরি অ্যাস্কিথ-প্রমুখ মহারথগণ কম্পিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে থাকিয়া মিঃ জর্জ্জ আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। খুব বেশী লোক শ্রদ্ধার সহিত তাহা শুনে নাই; কিন্তু তাঁহার মুষ্টিমেয় র‍্যাডিক্যাল্ বন্ধুবর্গ তাঁহাকে বাহবা দিল।

আজিকার অমাত্যবর কি সেই লয়েড জর্জ্জ? আজ যিনি ইংলণ্ডের কয়েকটি শিল্পরক্ষা করিবার প্রয়াসে এক হস্তে Antidumping Bill ও অপর হস্তে Safeguarding of Industries Act লইয়া ইংরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, ইনি কে? আর ইহাঁর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উনি কে? জোসেফ চেম্বারলেনের পুত্র! জর্ম্মণীর রংএর আমদানী ইংলণ্ডে যদি অবাধে চলিতে থাকে, তাহা হইলে কয়েকটি নবজাত বৃটিশ শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে। আরও অনেক জিনিষ আসিতেছিল, তাহাতে বৃটিশ ধনী capitalist ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা করিলেন। আইনের দ্বারা ইহার নিরাকরণ প্রয়োজন। অবাধ-বাণিজ্যনীতি একটা ভুল ধারণা মাত্র! বিশ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ জর্জ্জ এত বড় একটা ভুল ধরিতে পারেন নাই; তাই আজ জোসেফের পুত্র মিঃ অষ্টেন্ চেম্বারলেনের সম্মুখে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। দুষ্ট লোক বলে

জোসেফ চেম্বারলেন।

যে, তিনি চাকরী রাখিবার জন্য অষ্টেনের মন জোগাইতেছেন। অষ্টেন্ এখন সর্ব্ববাদিসম্মত টোরীদিগের নেতা। হাউস্ অব্ কমন্সেও অষ্টেন নেতা ও গভর্মেণ্টের মুখপাত্র। Co-alition দলের মধ্যে টোরীগণকে সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে মিঃ জর্জ্জকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। অতএব তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, কখনও তিনি ফ্রী-ট্রেডের পক্ষপাতী এক জন অগ্নিশর্ম্মা র‍্যাডিক্যাল ছিলেন। জাহাজ বোঝাই করিয়া জর্ম্মণ বণিক এক রকম দস্তানা abric gloves ইংলণ্ডে ইদানীং পাঠাইতেছিলেন; জনকতক ধনী ইংরাজ কল-কারখানাওয়ালা বিপদে পড়িয়া গভর্মেণ্টের শরণাপন্ন হইলেন। ক্যাবিনেটের মধ্যে একটু মতদ্বৈধ বোধ হয় হইয়াছিল। কিন্তু হুকুম জারি হইল,—আমদানী বন্ধ করা হউক। সমগ্র ল্যাঙ্কাশায়ার কিন্তু কাঁপিয়া উঠিল। তবে ত তাহাদের সূতা আর জর্ম্মণী লইবে না! গভর্মেণ্ট তাহাদের এত বড় অনিষ্ট করিল? একে ত তাহারা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছে; তাহার উপরে এ কি নূতন বিপদ্! এখনও পার্লামেণ্টের কাছে এ প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হয় নাই; একটা পরামর্শ-কমিটীর ভিতর দিয়া বোর্ড অফ্ ট্রেডের নিকটে ঐ শুল্ক বসান'র কথা আসিয়া পৌঁছিল। শেষোক্ত পণ্য-কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা গভর্মেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। ল্যাঙ্কাশায়ার মিঃ জর্জ্জকে চাপিয়া ধরিল। বেগতিক দেখিয়া তিনি পুনরায় ঐ প্রস্তাবটি ক্যাবিনেটের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এবার যদি ক্যাবিনেট্ আগেকার হুকুম রদ করিয়া দেয়, তাহা হইলে

টোরীদিগের মুখপাত্র মিঃ ব্যাল্ডুইন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আর তাঁহার সাধের Antidumping Bill ও Safeguarding of Industries Actএর কি দশা হইবে?

দো-টানার মধ্যে মিঃ জর্জ্জের ক্যাবিনেট্-তরী বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিক খাতের ভিতর দিয়া জয়পতাকা উড়াইয়া চলিয়া আসিতেছে। সে দিন তিনি দর্পভরে কমন্স সভায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমার মত এত দিন কেহ কখনও সম্মিলিত Co alition গভর্মেণ্ট চালাইতে পারিয়াছে কি?" কে এক জন বলিয়া উঠিল—"কেন, লেনিন?" তিনি বিদ্রূপ করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিলেন। এক দিন পার্লামেণ্টে তাঁহার 'একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং' দেখিয়া 'নেশন'-পত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— Under which George, Bezonian? আমরা কোন্ জর্জ্জ-এর রাজ্যে বাস করিতেছি? লয়েড জর্জ্জ, না রাজা পঞ্চম জর্জ্জ? টোরীরা ইঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে; জন কতক লিবারল্ও ইঁহার দলপুষ্টি করিতেছে। টোরীঋণ ইনি কেমন করিয়া শুধিবেন? আইরিশ ফ্রী ষ্টেট ব্যাপারে টোরীগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এখন কি করিলে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা যায়, ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। আল্ষ্টারের কার্সন্ তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। আজ তিনি বিষম বিরক্ত। এক দিন লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ্ চর্চ্চিল্ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়াছিলেন,—Ulster will fight, and Ulster will be right, আলষ্টার লড়াই করিবে, বেশ করিবে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সার এড্ওয়ার্ড কার্সন্ আদালতে ওকালতী বন্ধ করিয়া আলষ্টারে লক্ষাধিক নাগরিক সৈন্য সশস্ত্র ও সুসজ্জিত করিলেন। উইনষ্টনের আবাল্য সুহৃদ্ সোদরোপম মিঃ স্মিথ (অধুনাতন লর্ড চান্সেলর বার্কেন্‌হেড) কার্সনের সন্দেশবহ হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন; লোক তাঁহার নাম রাখিল Galloping Smith। মিঃ অ্যাস্কিথের ক্যাবিনেট্ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। ক্রমে যখন আয়র্লণ্ডের অন্তর্দ্রোহ অত্যন্ত ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল, দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের সাহায্যার্থ এক জাহাজভরা গুলী-গোলা-বন্দুক-বারুদ লইয়া স্বদেশ-প্রেমিক সার রজার কেস্‌মেণ্ট জর্ম্মণী হইতে আসিবার সময় ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। আলষ্টার সন্তুষ্ট হইল। কিছুদিন পরে মিঃ অ্যাস্কিথ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে মিঃ জর্জ্জ তাঁহার আসন অধিকার করিলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যে ব্ল্যাক্-অ্যাণ্ড-ট্যান্ নামধেয় সহস্র সহস্র সশস্ত্র গুণ্ডা দক্ষিণ আর্য়র্লণ্ডের ক্যাথলিক গৃহস্থের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। আলষ্টার আরও সন্তুষ্ট হইল। অত্যাচার অবাধে চলিতে লাগিল। * মহাসমুদ্র-পারে মার্কিণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ওয়াশিংটন বৈঠকে

লর্ড রোজবেরী।

* In a statement published on June 24 Mr. De. Valera had the hardihood to say : "I know that women have been outraged, men and women have been murdered, whole families have been wiped out, and I share the common belief that a cynical Imperialism

উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এমন একটা কিছু করা চাই—যাহাতে মার্কিণের চাঞ্চল্য প্রশমিত হইতে পারে। ব্ল্যাক্-অ্যাণ্ড-ট্যান্ আয়র্লণ্ড হইতে সরাইয়া আনা হইল। আর কার্সনের সম্মতি না লইয়াই আইরিশ ফ্রী ষ্টেট্ গঠিত করা হইল। আলষ্টারের ক্রোধের সীমা রহিল না। কার্সনের দলকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাঁহাদের লর্ড চ্যান্সেলর বন্ধু অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। কোনও বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। তখন পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া উইনষ্টন্ বলিলেন—যদি নবগঠিত আইরিশ ফ্রী ষ্টেট নিজের রাষ্ট্রকে সুশাসনে রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে উক্ত রাষ্ট্র-সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেণ্টকে পুনরায় বিবেচনা করিতে হইবে, কি করা উচিত। ইংরাজী ভাষা হইতে বাছিয়া বাছিয়া অনেক শব্দ উইনষ্টন্ ব্যবহার করিলেন; কিন্তু ফ্রী ষ্টেট সম্বন্ধে experiment শব্দটি প্রয়োগ করেন নাই। তাহা তাঁহার মাতব্বর মোড়ল মিঃ জর্জ্জ অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন বলিয়া

মিঃ অ্যাস্কিথ।

বোধ হয় তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, আলষ্টার কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। পরে যখন ফ্রী ষ্টেটের মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিল, আলষ্টার পুলকিত হইল। ডি ভ্যালেরা বলিলেন,—আয়র্লণ্ডের রঙ্গমঞ্চে মিঃ কলিন্সের দল ইংরাজের সঙ্কেতানুসারে স্বাধীনতার পুতুল-নাচ নাচিতেছেন। মিঃ জর্জ্জ কাহাকেও তুষ্ট করিতে পারিলেন না;—আলষ্টারকে নয়, দক্ষিণ আয়র্লণ্ডকেও নয়। কিন্তু তবুও তাঁহার ক্যাবিনেট্-তরী অনুকূল ও প্রতিকূল পবনে পাল তুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে। তাঁহাকে সরাইবার শক্তি লিবারল্‌দিগের নাই; তাঁহার সাহায্যে হাউস্ অভ লর্ডস্‌এর সংস্কারসাধন না করাইয়া টোরীরা তাঁহাকে সরিয়া যাইতে দিবেন না। কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন পার্লামেণ্টের নূতন করিয়া প্রতিনিধি বাছাই করিবার জন্য আর একটা General Electionএর কথা হয়, সার জর্জ্জ

---

has instigated these outrages, and provided the means for carrying them through."

—The Quarterly Review, July 1922. P 204.

In an open letter to the people of Great Britain by Mrs. Mac Swiney occurs the following paragraph :

"Look at the state of Belfast to-day. It is the doing of your Government, encouraged by your Government, for the express purpose of giving England an excuse to send extra battalions to reconquer the 'Mere Irish'. Your money is paying the brutal 'Specials' whose savagery is a blot on civilization. Your sons and your brothers stand by, whilst these savages murder women and little children ; but when the maddened victims of their savagery retaliate, they join in at the command of those same brutes, and use the 'resources of your civilization' to help in the extermination of the victims."

—The Nation & the Athenæum.—July 15, 1922. P. 535

ইয়ঙ্গার স্পষ্টই বলিলেন যে, 'টোরীরা এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইবে না, যতদিন মিঃ লয়েড জর্জ্জ বর্ত্তমান Co-alition majority'র সাহায্যে হাউস্ অভ লর্ডস্এর এমন ভাবে সংস্কার না করেন—যাহাতে উক্ত হাউস্ পুনরায় তাহার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরাইয়া পায়। ১১।১২ বৎসর পূর্ব্বে যখন মিঃ জর্জ্জ রাজস্ব-সচিব ছিলেন, তখন তাঁহারই চেষ্টায় লর্ডস্এর আপত্তি করিবার, বাধা দিবার, Veto করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়। তদবধি দ্বিতীয় চেম্বার আপত্তি করিতে পারে, কিন্তু হাউস্ অভ্ কমন্সের আগ্রহাতিশয্যে বাধা দিবার শক্তি তাহার রহিল না। অথচ সকলেই জানেন যে, সব সময়েই যে কমন্স খুব সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়া দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করেন, তাহা নহে। এখন যে মিশ্র Co-alition দলের উপর মিঃ জর্জ্জ নির্ভর করিতেছেন, তাহারা গত কয় বৎসরে অনেক অবিবেচনার কায করিয়া স্বল্প-সংখ্যক বিরুদ্ধবাদীকে পার্লামেণ্টে চাপিয়া রাখিতেছে। মধ্যে মধ্যে দু' একটা ভাল কথা কিন্তু হাউস্ অভ্ লর্ডস্ হইতে শুনা গিয়াছে। এখন টোরীরা মনে করিতেছেন যে, যদি আর একটা পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচনের ফলে তাঁহাদের Co alition পরাজিত হইয়া নূতন কোনও উদার শ্রমিক Liberal Lobour Majority'র মত লইয়া চলিতে বাধ্য হন! তাহার পূর্ব্বে লর্ডস্ সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করা চাই।

গ্ল্যাডষ্টোন।

শ্রমিক-উদারনীতিক দল জিজ্ঞাসা করেন—কি ব্যবস্থা করিতে চাও? অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ভ্রম-প্রমাদ হইতে আমাদের Constitutionকে মুক্ত করিতে চাহ না? আগে স্থির কর দেখি, দ্বিতীয় চেম্বারের উপকারিতা ও উপযোগিতা কি? ষাট বৎসর পূর্ব্বে ব্যাজহট্ এই প্রসঙ্গে যে তর্কজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে আসল কথা ঢাকা পড়িয়া গেল; কেবল আভিজাত্যগৌরব কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠিল মাত্র। আরও পূর্ব্বে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড জন্ রাসেল্ ধনী জমিদারের কুক্ষি-গত কমন্সকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পান, তখন ধনী অভিজাত-সমাজ চীৎকার করিয়া উঠিল,—বাস্তসম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, Propertyর সর্ব্বনাশ হইবে। প্রায় শতবর্ষ পরে, আজও অনেক টোরী ঐ ভাবে কথা কহিতেছেন। তাঁহারা বলেন, মিঃ জর্জ্জ Property'র সর্ব্বনাশসাধন করিতে অনেক দিন হইতেই বদ্ধপরিকর। যাহা ভাঙ্গিয়াছেন, আবার তাহা গড়িয়া তুলুন। Chancellor of the Exchequer মিঃ জর্জ্জ কি উদ্দেশ্যে লর্ডস্এর বীর্য্য অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু Prime Minister মিঃ জর্জ্জ কি তাহার জন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই? এই যে এখন দ্বিতীয় চেম্বারে সাত শত সাঁইত্রিশ জন Peers আছেন, ইঁহাদের মধ্যে শতাধিক কি মিঃ জর্জ্জের সৃষ্ট নহে? সম্প্রতি মিঃ ল্যাস্কি এ সম্বন্ধে যে কয়টি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে
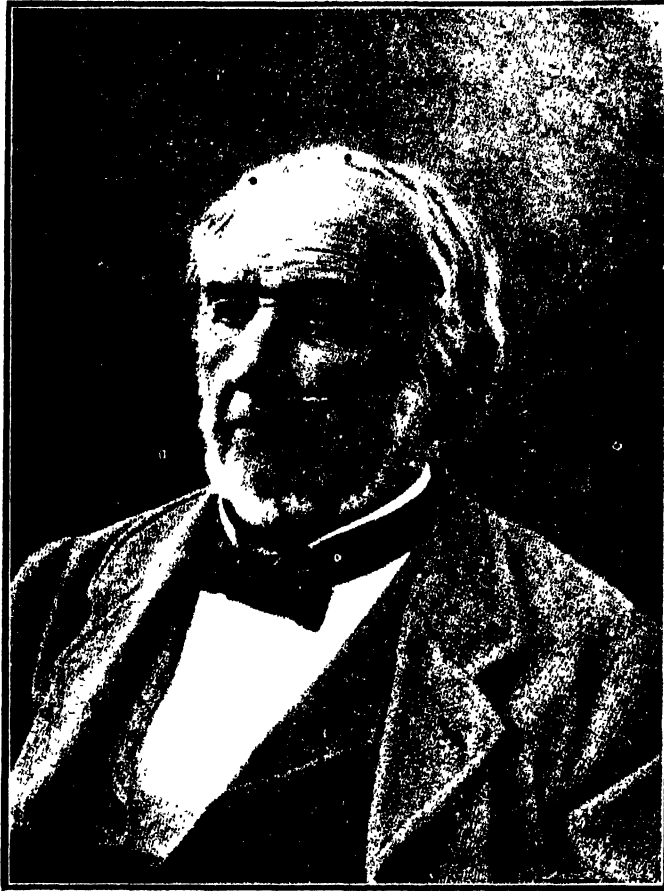
মন্ত্রিবরের কৃতিত্ব সহজেই অনুমিত হইবে। প্রথম দফা দেখুন :—

গভর্ণমেণ্ট		নূতন লর্ড	পদবীর উন্নতি-বশতঃ যাঁহারা লর্ড হইলেন	মোট সংখ্যা
বীকন্সফীল্ড	১৮৮০ —	১১	৩	১৪
গ্লাড্ষ্টোন	১৮৮০—৮৫	৩০	৪	৩৪
সল্‌স্‌বেরী	১৮৮৫—৮৬	১৩	১	১৪
গ্লাড্‌ষ্টোন	১৮৮৬—	৮	১	৯
সল্‌স্‌বেরী	১৮৮৬—'৯২	৪২	৭	৪৯
গ্লাড্‌ষ্টোন	১৮৯২—'১৪	৯	০	৯
রোজবেরী	১৮৯৪—'৯৫	৯	২	১১
সল্‌স্‌বেরী	১৮৯৫-১৯০২	৫০	১০	৬০
ব্যাল্‌ফোর	১৯০২—০৫	১৮	৫	২৩
ক্যাম্বেল-ব্যানার্ম্যান	১৯০৫-০৮	২১	—	২১
অ্যাস্কিথ	১৯০৮—'১৬	৮৯	১৭	১০৬
লয়েড জর্জ্জ	১৯১৬—২২	৮৭	২১	১০৮
		৩৮৭	৭১	৪৫৮

ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে। মিঃ অ্যাস্কিথ আট বৎসরের মধ্যে এক জন সংবাদপত্র পরিচালককে "পীয়র" করিয়াছেন; কিন্তু মিঃ জর্জ্জ ছয় বৎসরের মধ্যে পাঁচ জনকে উক্ত গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন। আরও একটু মজার কথা আছে। এক দিন যিনি হাউস্ অভ্ লর্ডস্‌এর ' Beerage and Peerageএর উদ্দেশে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, আজ কয় বৎসরে তিনি মদ্যব্যবসায়ী-দিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া তিন জনকে Peer করিয়াছেন; মিঃ অ্যাস্কিথ কিন্তু এক জনকেও করেন নাই। আজ এই যে গভর্মেণ্টের উপাধিবিতরণ (অথবা বিক্রয়?) উপলক্ষে 'এত কথা শুনা যাইতেছে, ইহার ভিতরকার আসল কথা এই যে, লয়েড জর্জ্জের স্বপক্ষে একটা প্রবল দল বরাবর রক্ষা করা প্রয়োজন,—নহিলে Co-alition গভর্মেণ্ট টিকিতে পারে না। লোকে বলিতেছে যে, সার রবার্ট ওয়াল্‌পোলের পর আর এমন ব্যবস্থা ইংরাজের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। আপাততঃ অন্য সকল অবান্তর কথা না তুলিয়া শুধু হাউস্ অভ্ লর্ড্‌স্‌এর কি করা উচিত, তাহাই মিঃ জর্জ্জের একটা বড় সমস্যা। কমন্স্‌দিগের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া দেড় শত কিংবা দুই শত যোগ্য ব্যক্তিকে অপর চেম্বারে পাঠাইয়া দিলে লর্ড্‌স্‌এর সংস্কার হয় কি না, মিঃ জর্জ্জ তাহাই বিচার করিতেছেন। কিন্তু টোরীরা সে রকম সংস্কার চাহে না। হাউস্ অভ্ লর্ডস্‌এর ক্ষমতা ছিল, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের লয়েড জর্জ্জ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কি করিবেন?

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের লয়েড্ জর্জ্জ ভারতবর্ষ-প্রসঙ্গে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে যাহা করিয়াছেন, লর্ডস্ সম্বন্ধে হয় ত তাহাই করিবেন! তবে সে বড় শক্ত ঠাঁই। লর্ড্‌স্‌দিগের Veto উঠাইয়া দেওয়া একটা experiment মাত্র, আর কিছু নয়,—এ কথা বলা চলে না কি? চাকরী রাখিতে হইলে সময়ে সময়ে কত রকম কথাই বলিতে হয়! যাঁহারা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, তাঁহা-দিগকে চাকরীর মায়া পরি-ত্যাগ করিতে হয়। মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেন, ডক্টর অ্যাডিসন, মিঃ মণ্টেগু,—ইঁহারা সকলেই পদত্যাগ করিলেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে মিঃ জর্জ্জ কত রকম কথাই বলিলেন। গণতন্ত্রশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে—The world made safe for democracy; হাতে হাতে ইংরাজ ফল পাইয়াছে… ইংলণ্ডে democracy আছে কি না, সে সম্বন্ধে অনেকের
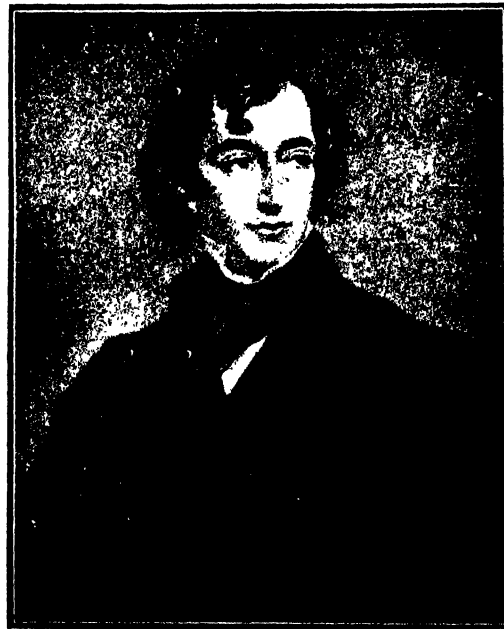
বীকন্সফীল্ড।

সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কৈসর উইল্‌হেল্‌মের মাথাটা লইতে হইবে··· "ধরণীর রাজবংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শির" অ্যামারঞ্জেণ-প্রবাসে উইল্‌হেল্‌মের কবন্ধদেহ কোনও জর্জ্জীয় পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার নয়ন-গোচর হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। Reparation স্বর্ণমুদ্রায় সিন্দুক বোঝাই হইয়া ইংলণ্ড অঋণী হইবে ··· কাণে, ওয়াশিংটন,জেনোয়া,হেগ্, লণ্ডন তাহার সাক্ষী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, ভাদ্র মাসে, তাঁহার ক্যাবিনেট্ ভারত-বর্ষ-শাসন-সম্বন্ধে কি একটা নূতন প্রতিজ্ঞায় না কি আবদ্ধ হইয়াছিল। সম্রাটের বাণী না কি ভারতবর্ষকে স্বরাজ-বার্ত্তা শুনাইয়াছিল। দরিদ্র ভারতের সমস্ত দৈন্যের বুঝি এইবার অবসান! যেখানে রিক্ততা ছিল, সেখানে পরিপূর্ণ গৌরবশ্রী বিরাজ করিবে। কিন্তু হায়! মিঃ লয়েড্ জর্জ্জের নূতন ভাষ্য পাঠ করিয়া লিবারল্‌-ন্যাশনালিষ্ট আজ আক্ষেপ করিতেছেন—

"এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!"

আমাদের এই রিক্ততা, এই শূন্যতা দেখিয়া কেহ কেহ পরিহাস করিয়াছেন, কেহ বা করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কখনও ইহাকে অশিব মনে করি নাই; মনে মনে বলিতাম, "শ্মশান ভালবাসিস্ বোলে শ্মশান করেছি হৃদি।" ভোগে আমার মন্দির পূর্ণ হইবে না; ত্যাগ চাই। কত আগষ্ট মাস, কত শ্রাবণ-ভাদ্র এল গেল; বর্ষে বর্ষে "বর্ষা এলায়েছে তা'র মেঘময় বেণী;" আমার চারিদিকে "শস্যশীর্ষে
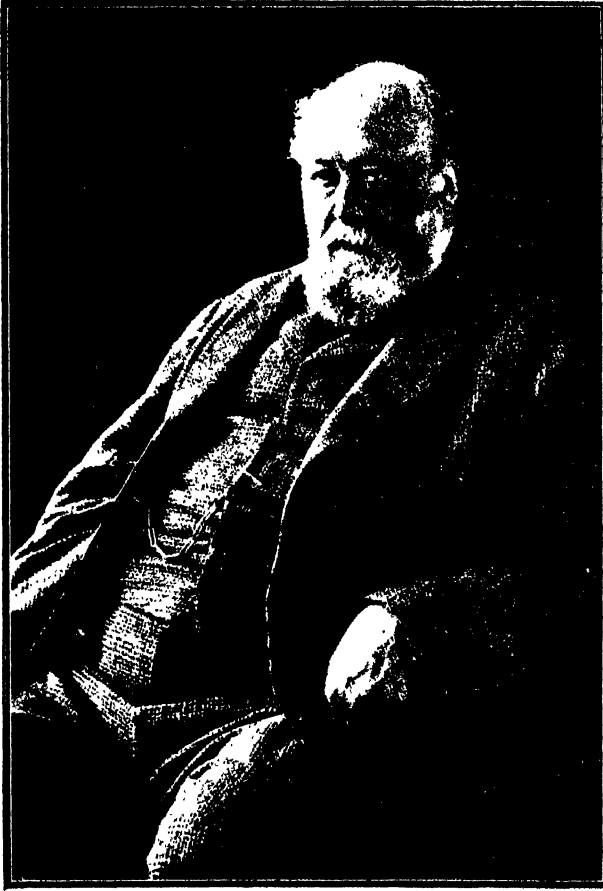
লর্ড সলস্‌বেরী।

তরঙ্গিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল;" যখন আমার "রাশি রাশি ভারা ভারা, ধান কাটা হ'ল সারা," তখন আমি কাহার প্রতীক্ষায় নদীকূলে বসিয়া থাকি? "গান গেয়ে, তরী বেয়ে, কে আসে পারে!" আমি তাহাকে ডাকিলাম,—"ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে,বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।" আমার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাকে নিবেদন করিলাম;—

যত চাও, তত লও
তরণী-পরে।
আর আছে? আর নাই,
দিয়াছি ভরে!
এত কাল নদীকূলে,
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে,
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে,
এমন আমারে লহ করুণা ক'রে।
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি!

এমনি করিয়া তিনি বর্ষে বর্ষে আসেন, আর চলিয়া যান। গান গেয়ে আসেন, গান গেয়ে যান। আর আমি

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি!
যাহা ছিল, নিয়ে গেল সোনার তরী।

এই বিরাট শূন্যতার জন্য অন্য কাহাকেও দোষী করিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি বৎসর আমি নিজের হাতে আমার সোনার ধান সেই অপরিচিতের সোনার তরীতে তুলিয়া দিতেছি;—কেন বলিব যে, তিনি আমার স্বদেশকে develope করিবার

জন্য আমাকে exploit করিতেছেন? অষ্ট্রেলিয়ার, কানাডার, আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ নাবিকগণ ঐ তরণীটি বাহিতে পারেন, ওখানে আমার স্থান হইবে কেন? শূন্য নদীর তীরে আমার শূন্য মন্দির লইয়া আমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে। নিশ্চয়ই আমাদের সাধনার ত্রুটি হইয়াছে। বর্ষায়, বসন্তে, শরতে, শীতে, পূর্ণিমায়, অমাবস্যায় সমস্ত দৈন্যের মাঝে একাগ্রচিত্তে নিশিপালন করিতে করিতে এক দিন হয় ত শুনিতে পাইব—কো জাগর্ত্তি, কে জাগে রে! সেই কোজাগর আহ্বানে আমাদের স্বদেশ-লক্ষ্মীকে তখন হয় ত আমরা ফিরিয়া পাইব। আজ আক্ষেপ করিয়া কোনও লাভ নাই। যিনি চিরকাল আমার অপরিচিত রহিয়া গেলেন, যাঁহার কাছে আমি চিরদিন রহস্যময় রহিয়া গেলাম; যিনি নিজের পণ্য লইয়া এত ব্যস্ত যে, আজ পর্য্যন্ত আমার দৈন্য তাঁহার চোখে পড়িল না; আমার কিছু বলিবার আছে কি না, তাহা শুনিবার জন্য যাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ আছে কি না, কে জানে? তাঁহার এবং আমার মাঝখানে কুহেলিকা-চ্ছন্ন আকাশের কি বিপুল মর্ম্মান্তিক ব্যবধান! তিনি সুদূর, তিনি মহান্। আজ তরী হইতে তিনি আমার শূন্য মন্দিরের বাহিরে সহস্রাধিক লৌহকঙ্কালের অট্টহাস্যমুখরিত প্রান্তরের দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া যদি বলিয়া থাকেন,—উহারাই নিত্য, সত্য, ঐখানে তোমাদের শিব, ঐখানেই তোমাদের শক্তি; তাহা হইলে আমরা বিচলিত হইব কেন? বোধ হয়, আমরা এত দিন আমাদের মন্দিরের বাহিরে শিবের ও শক্তির আরাধনা করিয়াছিলাম, তাই ঐ অভ্রচূড় Steel frame আমাদের দৃষ্টিরোধ করিয়া একমাত্র সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। মিঃ জর্জ্জ বলিলেন—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসংস্কার একটা experiment মাত্র, আর কিছু নহে। টোরী সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের অগ্রণী মিঃ গার্ভিন্ বলিতেছেন—মিঃ জর্জ্জ ঠিকই বলিয়াছেন, ওটা একটা experiment মাত্র। কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে সার ভ্যালেণ্টাইন্ চিরল্ বিলাতের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় লিখিলেন,—"The question which we have got to face—and it presents itself under a variety of forms is whether we are determined to go through with the constitutional experiment upon which we have entered and to accept the implications of Parliamentary institutions in India even if they carry us further and faster than we had originally contemplated. Indians who sincerely desire to maintain the British connection do not regard their new constitution as an experiment, but as an irrevocable charter... The gravest note of warning which Mr. Srinivasa Sastri sounded, was, however, addressed to British Ministers whom he knows, and who all know him. He had never known, he said, such profound distrust of Government as existed to-day, such absolute lack of sincerity, such a rooted tendency to put aside all pledges, promises and declarations as of no value whatever." আপাততঃ এইখানে মিঃ লয়েড্ জর্জ্জের নিকট হইতে বিদায় লওয়া যাইতে পারে।
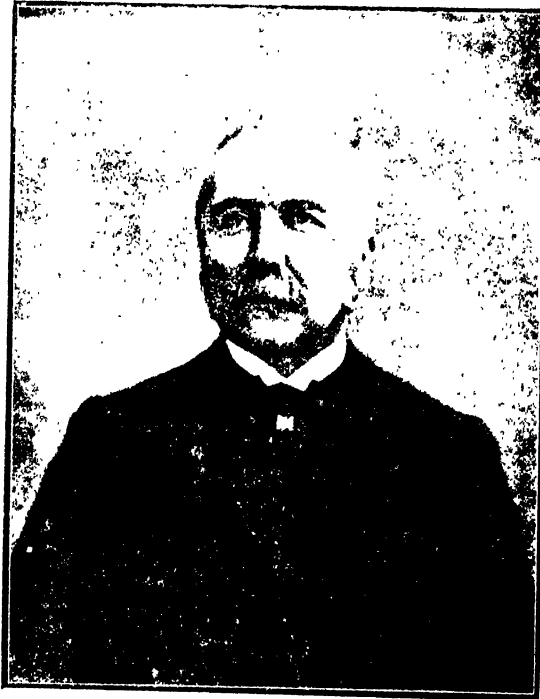
সার্ হেনরী ক্যাম্বেল ব্যানরম্যান

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

গুরুদাস বাবুর কথা।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সনাতনধর্ম্মী বাঙ্গালীর বড়ই গৌরবের পাত্র। তিনিও আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের ন্যায় তাঁহার সকল শুভ পিতামাতার পুণ্যফলে প্রাপ্ত বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন। এক সময়ে এ দেশের সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল। "পিতৃপুণ্যে বাঁচিয়া গিয়াছে"—প্রভৃতি এ দেশের সাধারণ কথা ছিল। এখনই ইংরাজী শিক্ষিতেরা কেহ কেহ আত্মনির্ভরতা এবং বিচার-নিষ্ঠতার দোহাই দিয়া পিতৃপিতামহের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া আসিতেছেন। লাভ হাতে হাতে না দেখাইলে দীক্ষা গ্রহণও করেন না!!

গুরুদাস বাবুর পিতা সওদাগরী আফিসে বুক-কিপার ছিলেন। মাহিনা ৫০৲ টাকা মাত্র ছিল। কিন্তু তখনকার ৫০৲ টাকা এখনকার ২০০৲র সমান। চাউলের দর ৪ গুণ বাড়িয়াছে। গুরুদাস বাবু তাঁহার পিতার মুখের ছাঁদ পাইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার পূর্ণ গৌরবর্ণ বা দীর্ঘাকার প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার পিতা চরিত্রগুণে পরিচিত সকলেরই প্রিয় এবং সম্মানের পাত্র ছিলেন। গুরুদাস বাবুও তাহা পাইয়াছেন—তবে তিনি সকল বাঙ্গালীরই পরিচিত। তাঁহার পিতৃ বন্ধুরা সকলেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে পিতার চরিত্রের গৌরব তাঁহার বংশে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গুরুদাস বাবু পিতাকে অধিক দিন পান নাই; মাতাই তাঁহার পক্ষে মাতাপিতার কায করিয়াছিলেন।

গুরুদাস বাবু স্কুলে কালেজে উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি ডি, এল এবং স্যার উপাধিযুক্ত ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্ট জজ। সে সকল জানে না কে? এ স্থলে তাঁহার মাতার সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তির এবং তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্রের প্রথম অবস্থার দুই একটি কথা মাত্র বলিব।

কালেজ হইতে বাহির হইয়া গুরুদাস বাবু জেনারেল অ্যাসেমব্লি কালেজে ১০০৲ টাকা মাহিনার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার মাতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি বরাবরই কলিকাতায় থাকেন, বাহিরে না যান। এজন্য কয়েকস্থলে উচ্চ বেতনের চাকরী পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সে চেষ্টা করেন নাই।

বহরমপুর কালেজে যখন আইনাধ্যাপকের কার্য্য মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে পাইবেন স্থির হইল এবং বেলা ১১টার পূর্ব্বে এক ঘণ্টা তথায় অঙ্ক পড়ানর জন্য আরও ১০০৲ টাকা পাইবার ব্যবস্থা হইল, তখন ঐ পদ লইবার জন্য সট্‌ক্লিফ সাহেব বিশেষ জিদ করিয়া বলেন। মাতার অমত খণ্ডন জন্য গুরুদাস বাবু তাঁহার মাতুলকে অনুরোধ করেন। তাঁহার মাতুল তাঁহার মাতাকে বুঝান যে, গুরুদাস বাবুর পরমা সুন্দরী শিশু কন্যাটির (উহার নাম পিতামহী রাখিয়াছিলেন মোহিনী) বিবাহসময়ে টাকা-কড়ির প্রয়োজন হইবে, ১০০৲ টাকা বেতনে কিরূপে টাকা জমিবে? গুরুদাস বাবুর মাতা বলেন, 'বিদেশের টাকা প্রায়ই বিদেশে থাকে, জমে না। বাড়ী হইতে গিয়া কায নাই।' তিনি আরও বলেন,—'ভূতপূর্ব্ব আইন অধ্যাপকের মৃত্যুতে ঐ পদ খালি হইয়াছে; যেখান হইতে তাঁহার স্ত্রীপুত্র কাঁদিয়া আসিয়াছে, সেখানে ভাল হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে।'—'তাঁহার মৃত্যুর সহিত গুরুদাস বাবুর ত কোন সম্বন্ধ নাই, মেয়ের বিবাহ জন্য টাকা জমান চাই' ইত্যাদি কথার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে শেষে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দিলেন। গুরুদাস বাবু বহরমপুরে গেলেন। তথায় ৺গঙ্গা থাকায় উঁহার মাতাও পরিবারবর্গকে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরবিগ্রহ সহিত তথায় গেলেন। গুরুদাস বাবুর পুণ্যবতী মাতার শুদ্ধচিত্তে পুত্রের বিদেশগমনে ক্ষতি হওয়ার যে একটা ছায়া পড়িতেছিল,—যাহা অপরে কেহই বুঝে নাই—তাহাই ঘটিল। যে কন্যাটির বিবাহসময়ে টাকা প্রয়োজনের চিন্তায় মাতার মন-পরিবর্ত্তন, তাঁহার মাতুল (মাতার বড় ভাই) করাইয়াছিলেন, সে কন্যাটি বহরমপুর পৌঁছিয়াই সেই রাত্রিতেই কলেরায় আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিল! ভক্তিমতী ও পুণ্যবতী বঙ্গনারীদিগের অনেকেই এইরূপ যোগিজনসুলভ সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী ছিলেন। সকলের শুভ চিন্তায় যাঁহারা অভ্যস্ত—অপরের ক্ষতিতে নিজেদের কোনরূপ উপকার আশায় যাঁহারা "শঙ্কিত", সেই সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন বঙ্গনারীকে ইংরাজী শিক্ষিতেরা অশিক্ষিতা মনে করিতেন!

গুরুদাস বাবুর বহরমপুরে সহজেই পসার হয়।

বঙ্গাধিকারী বংশ—মুর্শিদাবাদের দেওয়ান বংশ—খুব সম্ভ্রান্ত। সেই বংশের কেহ পত্নীর নামে বিষয় বেনামী করিয়া এক অবিবাহিতা কন্যা এবং এক পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। ঐ পত্নীও কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিয়াই মরেন। ঐ বংশে কন্যারা পিতৃগৃহেই থাকিতেন। জামাতারা ঘরজামাই হইতেন। ঐ কন্যার বিবাহের পর জামাতাকে লোক পরামর্শ দিল, বিষয়ের অর্দ্ধেক তোমার। ঘরজামাই থাক কেন? স্ত্রীকে অন্যত্র লইয়া গিয়া মোকর্দ্দমা কর। জামাতা তাহা করিতে গেলে—বাধা পাইলেন। পত্নীকে সরাইতে পারিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিলে এক জন ফিরিঙ্গি ইন্‌সপেক্টর প্রেরিত হয়েন। তিনিও মার খাইলেন, মোকদ্দমা হইল; আসামীর পক্ষে সকল বড় বড় উকীলকে অবিলম্বে নিযুক্ত করিয়া লওয়া হইল। সরকারী উকীল ইংরাজী জানিতেন না। গুরুদাস বাবু সরকারী পক্ষে নিযুক্ত হইলেন। আসামীর সাত দিন কয়েদ হইল। এত বড় মোকর্দ্দমা তাঁহার অত শীঘ্র পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ঘটনাচক্রে পিতৃমাতৃপুণ্যেই পাইলেন। সক্ষম উকীল বলিয়া নাম হইয়া গেল।

তাঁহার মাতা উঁহার টাকা জমাইয়া যখন ২৪ হাজার টাকার কাগজে মাসিক ১০০৲ টাকা সুদ হইল, তখন কলিকাতায় ফিরিতে বলিলেন। তখন কোম্পানির কাগজের শতকরা ৫৲ সুদ ছিল। সেই জেনারেল অ্যাসেম্বির চাকরীটি যেন পুরা পেন্‌সন পাইলেন, এই মনে করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ঢুকিতে মাতা দ্বারা আদিষ্ট হইলে—এবারে আর গুরুদাস বাবু দ্বিরুক্তি করিলেন না। তদ্ভিন্ন তাঁহার মাতা নগদ ১২০০৲ টাকা রাখিয়াছিলেন; যেন এক বৎসর মাসে ২০০৲ টাকা খরচ করিয়াও পুত্র হাইকোর্টে পসারের প্রতীক্ষা করিতে পারেন।

মাতার এই সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সর্ব্ববিষয়ে এরূপ দূরদৃষ্টি সহ তাঁহাকে পরিচালনাই শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর হাইকোর্টে আসিয়া পসার হওয়ার এবং জজিয়তী প্রাপ্তির মূল। মফঃস্বলে যতই পসার হউক না, তাহা হইতে ত হাইকোর্টের জজিয়তী প্রাপ্তি ঘটিত না!

অপর এক সময়ে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর নিজের অনুভূতির বিরুদ্ধে কার্য্য হইয়া যাওয়ায় বড়ই ক্ষতি হয়। তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক পুত্রকে ৺তারকেশ্বরে লইয়া যাওয়ায় তিনি অমত করেন। 'ঠাকুরের নিকট যাওয়ার কথা উত্থাপন করিয়া তাহার পর আর না যাওয়া ভাল নয়,' ঐরূপ কথাতেও অমত করেন। পরে তিনি অপর কাহার সহিত কথায় মগ্ন থাকার সময় বহির্ব্বাটীতে পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা হইলে তিনি অন্যমনস্কভাবে যাওয়ার মত দিয়া ফেলেন। ঐ পুত্রটি ৺তারকেশ্বর হইতে আসিয়াই কলেরায় মারা যায়। উহার স্মৃতির জন্য হেয়ার স্কুলে একটি বার্ষিক প্রাইজ দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর মাতা অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যা ছিলেন। কলিকাতায় গ্রে ষ্ট্রীট যেখানে খোলা হইয়াছে—সেইখানে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর মাতামহাশ্রয় ছিল। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর এক মামাতো ভগিনীর সহিত ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের বিবাহ হয়।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর মাতার শিক্ষা প্রণালী উচ্চ অঙ্গের ছিল। তিনি বলিতেন যে, শৈশবকাল হইতে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ওগুলি মাটীর পুতুল নহে যে খানিকক্ষণ নাচাইয়া রাখিয়া দিবে। উহাদিগের মন আছে এবং সেই মনে ভালবাসার সহিত দূরদর্শিতার ছায়া প্রথম হইতেই ফেলিতে হইবে; উহারা সেই প্রীতির ও জ্ঞানের আভাস অজ্ঞাতসারেই লাভ করিতে থাকিবে। তিনি কোন পৌত্রবধূকে বলিয়াছিলেন, 'ছেলে দুরন্তপনা করিতেছে বলিয়া তুমি বলিলে যে, মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব; কিন্তু ও যখন দেখিবে যে, প্রকৃতপক্ষে হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে না, তখন উহার আর তোমার কথায় বিশ্বাস বা তোমার উপর সম্ভ্রম থাকিবে কি? মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বল বা যেমনটি উচিত, ঠিক সেইটুক শাসন কর।' আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসর তাঁহার 'এডুকেশন' বা শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকে ঠিক এই উদাহরণটই দিয়াছেন!—সত্যপ্রিয় মানবমাত্রেই এই সূত্র ধরিতে পারেন। সকল উচ্চ ভাবই যে সেই "একেরই" নিকটবর্ত্তী করে।

শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবু শৈশব হইতে আম্র খাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহার স্মরণ আছে যে, তাঁহার চারি বৎসর মাত্র বয়সের সময় তাঁহার মাতা ১লা আষাঢ়ে তাঁহাকে আম্র দিলেন এবং বলিলেন,—'আষাঢ় মাসে আর আম খাইতে হইবে না; যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাই খাওয়ার

জিদ করিতে নাই; তুমি বল, আষাঢ় মাসে আম চাহিব না।' অনেক কান্নাকাটি করিলেও তিনি ঘরে আম থাকিতেও তাহা দিলেন না। "আম চাহিব না" এই কথা—মারপিট প্রভৃতি কিছুই না করিয়া—শুধু পাখীপড়ানর চেষ্টার ন্যায় নিজেই বলিতে থাকিয়া শেষে শিশুকে দিয়া বলাইলেন। শাশুড়ী তাহাকে বলিলেন, "মা! দিলেই বা—অত জিদ করিতেছে।" তিনি একটু ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দেন, "মা! আপনি বলিলে এখনই দিব; কিন্তু আজিকার চেষ্টাতেই ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে উহার জিদ ছাড়িতে শিখিবে। দেশ-কাল ভাল নয়; ব্রাহ্মণের ঘর।" সংযত অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যার—একান্ত বশীভূতা বধূর—অতিশয় নম্রতাসহ অনুরোধ কখনই উপেক্ষিত হয় নাই; এ ক্ষেত্রেও হইল না। পিতামহীর সহিত মাতার মতের মিল দেখিয়া শিশু মাতার সহিত পাখীপড়ার মত বলিল, "আম চাহিব না; আষাঢ় মাস।" সেই দিন রাত্রিতে শাশুড়ীরও কথা রক্ষা সম্পূর্ণভাবে করা উচিত বোধে তিনি শিশুকে একটি আম দিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন, "তুমি চাহিবে না—এ মাসে আমিও আর দিব না।" বাটী শুদ্ধ একমত না হইলে শৈশবের সুশিক্ষা হয় না। মাতার বিরুদ্ধে পিতামহীর নিকট আপীলে সর্ব্বদা জয় হইলে শিশুর কর্ত্তব্য-জ্ঞান দৃঢ় হয় না। আদি গুরু পিতা-মাতার প্রতি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানের মূলে একটু না একটু আঘাত পড়ে।

আর একবার একটি পৌত্র জিদ ধরে যে, একটি পিত্তলের কুলুপ লইবে। গুরুদাসবাবুর মাতা বলেন, "আর একটি আনাইয়া দিব; ভালটি খেলায় নষ্ট করিও না।" তাহার পর ঐ কথা ভুলিয়া যান। মাতার কথা সত্য রাখার জন্য গুরুদাসবাবু সন্ধ্যার পর লোক পাঠাইয়া ঐ কুলুপ আনাইয়া দিয়াছিলেন। মাতার গুণে শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবুর গৃহ প্রকৃত নিখুঁত হিন্দুর গৃহ।

তিনি চাকর প্রতিপালন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের এবং কর্ত্তা ও গৃহস্থ সাধারণের যেন একই চাউলের অন্ন প্রস্তুত হয়। ভাতের সম্বন্ধে কোন তারতম্য না হয়; তরকারি সম্বন্ধে না হয় দুই একটা তাহারা কম পাইবে। কতকটা সাংসারিক সুবিধা এই উদার হিন্দুধর্ম্ম-প্রণোদিত গৃহস্থালীর ব্যবস্থায় নিহিত! (১) ঝি-চাকরেরা দেখে যে, উহারা পরিবারের অঙ্গভুক্ত ভাবেই ব্যবহৃত; এ উদারতা উহাদিগকে প্রীত করিবেই করিবে এবং উহাদের কার্য্যও ভাল হইবে। (২) আহারাদির বৃথা আড়ম্বর সমস্ত পরিবারমধ্যেই কম থাকায় অনাবশ্যক ব্যয়ে অর্থনাশ হইবে না। (৩) স্বচ্ছল বাঙ্গালীর মধ্যে বর্ত্তমানকালে বর্দ্ধমান মারাত্মক রোগ প্রাত্যহিক ভোজনবিলাসিতা—সঙ্কুচিত থাকিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় থাকিবে। তিনি বলিতেন যে, বাটীতে পাচক বা অপরাপর যে কোন ব্রাহ্মণ থাকে, তাহাকে একটু একটু দুধ দিতে হয়। ব্রাহ্মণ ত—সুতরাং ঐ সম্মান পাইতে অধিকারী।

ভোজ্য পানীয় দ্রব্য তিনি কিছুই অনাবৃত রাখিতে দিতেন না। ধূলি-কীটাদি পড়িলে ভোজ্য অশুচি হয়; তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদনের অযোগ্য; দেহাভ্যন্তরস্থিত নারায়ণের সেবারও অযোগ্য। এক সময়ে ঐরূপ অনাবৃত অন্ন তিনি বাটীর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই। নিজেরা যাহা খাইব না—ঝি-চাকরকেও তাহা দিব না—তাঁহার এই ব্যবস্থা হয়। ঐ ক্ষতিতে লজ্জিত হইয়া পরিবারবর্গের শিক্ষা সুদৃঢ় হয়। তিনি যাহা ভক্তির চক্ষে প্রকৃত হিন্দুভাবে প্রত্যক্ষই ধরিতে পারিতেন- শুধু দেহের স্বাস্থ্য জন্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক তাহা বিস্তর গবেষণার পর বলিতেছেন—ভোজ্য-দ্রব্য অনাবৃত রাখিতে নাই।

গুরুদাসবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইলেই তিনি সম্প্রতি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সহিত হ্যাণ্ড সাহেবের কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গাদি আছে।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।
২রা ফাল্গুন, ১৩২২ সাল।

কল্যাণবরেষু—

আপনার সযত্নপ্রদত্ত আপনার পিতৃদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী ও স্বপ্রণীত "সদালাপ" নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

আপনার 'সদালাপ' অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহা কেবল বালক ও যুবকের নহে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরও শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দজনক।

আপনার পিতৃদেবের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমার পঠদ্দশা হইতেই তাঁহাকে এক জন অসামান্য পণ্ডিত ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি বলিয়া ভক্তি করিতে আরম্ভ করি, এবং ক্রমে তাঁহাকে যতই ঘনিষ্ঠভাবে জানিতে লাগিলাম এবং তাঁহার লেখা পড়িতে

লাগিলাম, ততই সেই ভক্তি প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। বহরমপুর কালেজের আইনের অধ্যাপক হইয়া যেদিন বহরমপুর যাত্রা করি, সেইদিন ভূদেববাবুর সঙ্গে হাবড়া ষ্টেশনে প্রথম দেখা হয়। দেখিলাম, তিনি এক জন সুদীর্ঘকায় বিশাল-ললাট শুভ্রবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ। তাঁহার অন্তরের উদারতা ও প্রখর বুদ্ধি যেন তাঁহার মুখকান্তিতে বিকাশ পাইতেছিল। আমরা যে গাড়ীতে উঠিলাম, সেই গাড়ীতে বহরমপুর কালেজের অধ্যক্ষ হাণ্ড সাহেবও উঠিলেন এবং তিনিই আমাকে ভূদেববাবুর নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহাতে ভূদেববাবু এতই অমায়িকতা ও স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন যে, বোধ হইল যেন, আমার সঙ্গে তাঁহার কতকালের পরিচয় ছিল। হাণ্ড সাহেব নিজের একখানি ফটোগ্রাফ তাঁহাকে দেওয়াতে তিনি বলিলেন,—"ছবিটি ঠিক উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার আসলটিকে আমি অধিক পছন্দ করি। (ইট্ ইজ্ এ গুড লাইকনেস্ বট আই লাইক দি ওরিজিনেল বেটার ড্যান দি কপি)।" তাঁহার সঙ্গে হাণ্ড সাহেবের ও আমার নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সে কথাগুলি সকল মনে নাই, কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে, তাঁহার কথাতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ছিল। এইরূপে হুগলী পর্য্যন্ত যাওয়ার পর তিনি হুগলী ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তাহাতে যে সকল কথার আলোচনা আছে, তন্মধ্যে দুই একটি কথা লইয়া মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু যতই সময় যাইবে, ততই তাঁহার অধিকাংশ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে এবং সমাজ-সংস্কারকেরা তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিবেন। ইতি— শুভানুধ্যায়ী

শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। *

* পূজ্যপাদ লেখক মহাশয়ের অপ্রকাশিত গ্রন্থ "আমার দেখা লোক" হইতে।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ভুল-ভাঙ্গা।

লয়েড জর্জ্জ—শাসন-সংস্কার—ও পাকা নয়—পরীক্ষা মাত্র। অতএব সাবধান

ড়াকাতধরা বন্দুক।

অনেক সময় চোর-ডাকাতরা মোটরের সাহায্যে পুলিসের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়া থাকে। সংপ্রতি আমেরিকায় একপ্রকার বন্দুক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে দ্রুতগামী মোটরে চড়িয়া পলায়নপর দস্যু-তস্করকে ধরিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এরূপ হাল্‌কা বন্দুক এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার ওজন মাত্র সওয়া চারি সের। প্রতি মিনিটে এই বন্দুক হইতে ১ হাজার ছোট গুলী নির্গত হয়। আবার ইচ্ছা করিলে এই বন্দুকের সাহায্যে বড় গুলীও নিক্ষেপ করা যায়।

অনেক সময় পুলিস চেষ্টা করিয়াও যে পলায়নপর দস্যু-তস্করকে ধরিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, পুলিসের নিকট শুধু রেগুলেশন পিস্তল থাকে। দ্রুতগামী মোটরে চড়িয়া যখন দুর্ব্বৃত্তগণ পলায়ন করিতে থাকে, তখন পুলিস তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পিস্তলের গুলীর দ্বারা তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে না। কারণ, সে অবস্থায় সোজা গুলী ছোড়া কঠিন। কিন্তু এই বন্দুক আবিষ্কৃত হওয়ায় সে অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। উল্লিখিত অভিনব আগ্নেয়াস্ত্র মোটর সাইকেলের উপর সন্নিবিষ্ট। পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়া পুলিস-প্রহরী অনায়াসে সেই বন্দুক ব্যবহার করিতে পারে।

পলায়ন-পর মোটরগাড়ী, উল্লিখিত নবাবিষ্কৃত বন্দুকের গুলীতে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। একখানি মোটরগাড়ীতে কতিপয় মানুষের প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রায় ত্রিশ ফুট দূরবর্ত্তী আর একখানি মোটরের সহিত উল্লিখিত মোটরকে রজ্জুবদ্ধ করা হয়। তার পর গাড়ী দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে থাকে। মোটর সাইকেলের সহিত সন্নিবিষ্ট বন্দুক হইতে তখন উক্ত পলায়নপর মোটরের উপর গুলী বর্ষিত হইতে আরম্ভ হয়। অবিলম্বে ডাকাতের মোটরের চাকাগুলি অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট হইয়া অবশেষে থামিয়া পড়ে—তাহার গতিবেগ আর থাকে না। সেই দ্রুতগুলীবর্ষণের ফলে মোটরে উপবিষ্ট যে কোনও ব্যক্তির প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা।

এই তস্কর-দমন বন্দুকের সাহায্যে যে কোনও মোটরগাড়ীর কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহার বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।
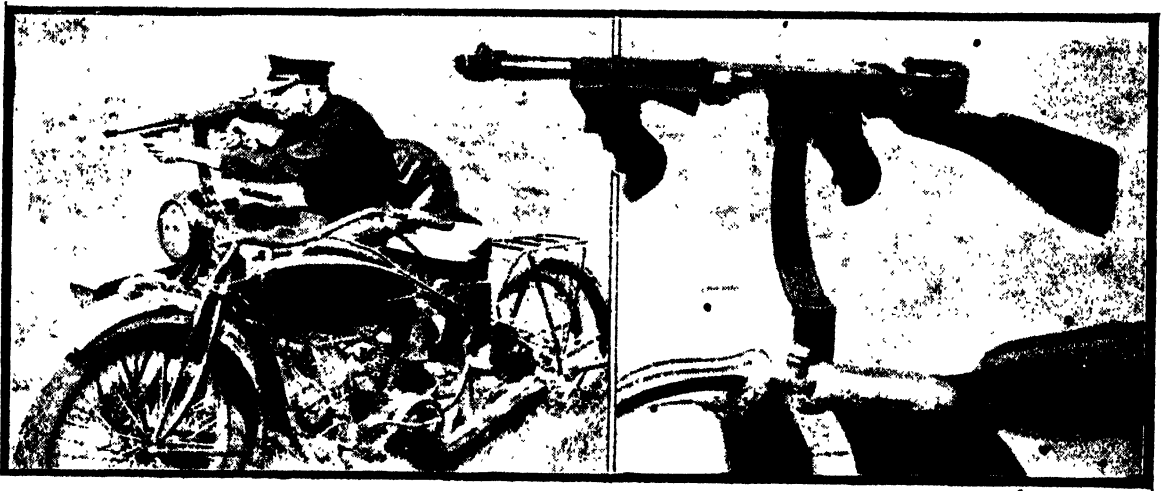
[দ্বিচক্র মোটরের পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়া পুলিস এই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতেছে।]

[পার্শ্বস্থ আসনযুক্ত মোটর সাইকেলের উপর সন্নিবিষ্ট বন্দুক]

একখানা মোটরগাড়ীর উপর—উহাতে ৭ জনের বসিবার স্থান ছিল—৩টি বন্দুকের গুলী নিক্ষিপ্ত হওয়ায় এক মিনিটের মধ্যে গাড়ীখানা একটা স্তূপে ভগ্ন পরিণত হইয়াছিল।

যে সকল স্থলে জনসংখ্যা অধিক, সে স্থানে পাখীমারা ছট্‌রা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে দস্যু-তস্করের প্রাণহানি হয় না, তবে তাহারা গুরু শাস্তি পায়। একটা চারি পাঁচ ফুট দীর্ঘ লক্ষীভূত পদার্থের উপর বন্দুক হইতে ছট্‌রা নিক্ষিপ্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চারি পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে উহার সর্ব্বাঙ্গ ছিদ্রময় হইয়া গিয়াছে—ঠিক যেন নিদারুণ বসন্তক্ষত। ৩০ ফুট দূর হইতে গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রায় দেড় সেকেণ্ডের মধ্যে এই বন্দুক হইতে ২০টা পাখীমারা 'কার্টিজ্' নির্গত হয়। প্রত্যেক কার্টিজে ১২০টা ৮ নম্বরের পাখীমারা ছট্‌রা থাকে। অর্থাৎ উল্লিখিত ২০টা টোটা হইতে দেড় সেকেণ্ডে ২ হাজার ৪ শত ছর্‌রা নির্গত হইয়া থাকে। ৪ মিনিটের মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার ছট্‌রা যে আগ্নেয়াস্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কি ভীষণ! পৃথিবীতে আর এমন কোনও আগ্নেয়াস্ত্র এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই, যাহার সাহায্যে গুলী ও পাখীমারা ছট্‌রা ব্যবহার করা যাইতে পারে। দস্যু-তস্করগণ, আক্রান্ত হইয়া পুলিসের হস্ত হইতে উদ্ধারলাভের জন্য গুলী নিক্ষেপ করিতে পারে। যদি এই আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া এক জন পুলিস ছয় জন বন্দুকধারী দস্যুর পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তবে দস্যুগণের নিক্ষিপ্ত গুলী একবার শেষ হইবার পর অর্থাৎ প্রত্যেক দস্যুর বন্দুকে যদি ৭টা করিয়া গুলী থাকে এবং ৬টা বন্দুক হইতে ৪২টা গুলী নির্গত হইয়া গেলে, পুনরায় গুলী ভরিবার পূর্ব্বেই পুলিসের এই অপূর্ব্ব আগ্নেয়াস্ত্র হইতে ৪২টা গুলী ছাড়াও ৫৮টা অতিরিক্ত গুলী নির্গত হইতে পারে। সুতরাং দস্যুদিগের বন্দুক যখন শূন্যগর্ভ, সে সময় পুলিস আরও ৫৮টা গুলী ছাড়িবার সুবিধা পায়। এই ৫৮টা গুলী পলায়নপর দস্যুদিগের উপর নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই বন্দুক যুদ্ধকালে ব্যবহৃত হইলে ২ হাজার ফুট পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী পদার্থকে ধ্বংস করিতে পারে; কিন্তু পুলিস যে গুলী ব্যবহার করে, তাহার পাল্লা ১ হাজার ৫ শত ফুট পর্য্যন্ত।

দীর্ঘজীবী নর-নারী।

এই বিংশ শতাব্দীতে কেহ এক শত বৎসর বাঁচিয়া আছে শুনিলেই আমাদের মনে হয়, ইহা কি সম্ভবপর? কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ কল্পনাপ্রসূত নয়। কনষ্টাণ্টিনোপলে জোরা নামক এক জন লোক আছেন, তাঁহার বয়সের 'গাছ-পাথর' নাই। সে দিন কোনও ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে জোরা বলিয়াছিলেন, "অলসভাবে থাকিলেই আমার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবে।"

১৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ষোড়শ লুই যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি শিশুমাত্র—দোলায় দোল খাইতেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের সময় ওয়েলিংটন ৫ বৎসরের শিশুমাত্র, নেলসন তখন সবে প্রাচ্য-সমুদ্রে নাবিকের কার্য্য শিক্ষা করিতেছিলেন।

জোরা যখন মধ্যবয়স্ক, তখন সেফিল্ডের শ্রীমতী অ্যান্ হেকিন্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়স ১০২ হইবে। শ্রীমতী হেকিন্ জোরার পৌত্রীর তুল্য। এই বর্ষীয়সী মহিলা এখনও অবলীলাক্রমে ৬ মাইল পথ প্রত্যহ পর্য্যটন করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহার কোনও কষ্টই হয় না। ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যেরূপ স্ফূর্ত্তি-সহকারে ধূমপান করিতেন, এখনও তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

কাউণ্টেস্ ডেস্‌মণ্ড নাম্নী একটি মহিলা ১ শত ৪০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। এই বয়সেও তাঁহার বাস-ভবন হইতে ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী নগরে তিনি পদব্রজে গতায়াত করিতেন। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত দাঁত বাঁধান ছিল। বাদামগাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু না ঘটিলে হয় ত আরও কিছুকাল তিনি জীবিতা থাকিতেন।

কুমারী এলিজাবেথ গ্রে নাম্নী একটি মহিলা ১ শত ৮ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। এক শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়াছিলেন। এডিন্‌বরায় এই মহিলার মৃত্যু হয়। বিনা চশমায় তিনি মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বেও সূক্ষ্ম সীবনকার্য্য করিতে পারিতেন।

কুমারী ষ্টিভেন্স কর্ণওয়ালের অধিবাসিনী ছিলেন। ১ শত বৎসর বয়সেও তিনি অশ্বপৃষ্ঠে বিশ মাইল পথ অতিবাহন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী হে ম্যাকেঞ্জি নাম্নী একটি মহিলা

১ শত ৩ বৎসর বয়সে পদব্রজে ১০ মাইল পথ পর্য্যটন করিয়া জন্মদিন উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত নৈশভোজে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী জেন্ ক্রিম্‌স্ নাম্নী আর একটি মহিলা ১ শত ৩০ বৎসর বয়সে লণ্ডন হইতে গ্রেভ্‌স্‌য়েণ্ডএ গতায়াত করিতেন।

চার্লস্ ম্যাক্‌লিন্ নামক কোনও অভিনেতা ১ শত বৎসর বয়সে সাইলকের ভূমিকা লইয়া রঙ্গালয়ে অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে তিনি যুবকের ন্যায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে আপনার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, টমাস্ পার্ নামক জনৈক শ্রমজীবী ৮০ বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ করেন। সেই পত্নীর মৃত্যু হইলে ১ শত ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ১ শত ৫২ বৎসর বয়সে তিনি স্বীয় জন্মভূমি হইতে বহুদূরবর্ত্তী লণ্ডন নগরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

"ইউনিভার্সাল্ ডেলি রেজিষ্টারে" এক দম্পতির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বরের নাম জন জেনিংস্, ইঁহার বাসভূমি ষ্টেপ্‌নিতে। কন্যার নাম মেরী স্নো। বিবাহকালে বর ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক যুবকের ন্যায় স্ফূর্ত্তি সহকারে পুরোহিতের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিবাহ-সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। বিবাহকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ১ শত ৩ বৎসর ছিল; কন্যা তাঁহার অপেক্ষা কয়েক মাসের ছোট। মিঃ জেনিংসের তিনবার বিবাহ হইয়াছিল।

অঙ্গুলির ছাপ জাল।

দুষ্কৃতকারীদিগকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অভ্রান্ত প্রমাণ তাহাদিগের অঙ্গুলির ছাপ। এতদিন পুলিস এই প্রমাণের সাহায্যে অসম্ভবও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু যাহারা আইনের কবল হইতে সতত আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে নিরত, তাহারা পুলিসের এই অমোঘ অস্ত্রকেও ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছে। অঙ্গুলির ছাপও তাহারা অভিনব কৌশল-সহকারে জাল করিতেছে। রবারষ্ট্যাম্প, মোম ও রুটির সাহায্যে এই জালক্রিয়া চলিতেছে। ছায়ালোকচিত্রও এ বিষয়ে পর্য্যাপ্ত সাহায্য করিয়া থাকে। যে ভাবে দুর্ব্বৃত্তগণ এই বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছে, তাহাতে লণ্ডনের সুবিখ্যাত স্কটলণ্ড ইয়ার্ডকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। অঙ্গুলিরেখা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কোনও পাক্ষিক পত্রে এ বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চলিতেছে। উহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দুষ্কৃতকারিগণ পূর্ব্ব হইতেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া লয়। যাহার দ্বারা কার্য্যসাধন করিবে, সে কিছুই জানিতে পারে না, তাহার অগোচরে এমন ব্যবস্থা করে যে, সেই ব্যক্তি কাচ অথবা যে কোনও সুমার্জ্জিত, আসবাবের উপর অঙ্গুলির ছাপ রাখিয়া গেলে তাহারা ফটোগ্রাফের সাহায্যে উহার ছবি তুলিয়া লয়।

কোন এক ক্ষেত্রে তাহারা এই জাল অঙ্গুলির ছাপ তুলিবার জন্য রবারষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়াছে। 'ট্রান্সফার' কাগজের সাহায্যে এই রবারষ্ট্যাম্পে আসল অঙ্গুলির ছাপ তোলা হইয়াছিল। ষ্ট্যাম্পের আশ-পাশের রবার এমন সুকৌশলে তীক্ষ্ণধার ছুরির সাহায্যে বাদ দিয়াছিল যে, উহা যে রবারষ্ট্যাম্পের ছাপ, তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

আর এক ক্ষেত্রে অঙ্গুলির ছাপের ছাঁচ মোম, প্লাষ্টার অব প্যারিস্, কর্দ্দম ও রুটির উপর তোলা হইয়াছে। এই ছাঁচ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, রবার, বাতির মোম প্রভৃতি পদার্থ গলাইয়া উহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। তার পর উহা শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আসল অঙ্গুলির রেখা সমূহ অভ্রান্তভাবে ও সুস্পষ্টরূপে তাহাতে অঙ্কিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মৃত অথবা অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, সেই ক্ষেত্রেই এই প্রণালী অবলম্বিত হয়।

তৃতীয় আর একটি প্রণালীর কথা জানা গিয়াছে। যে অঙ্গুলির ছাপ জাল করিতে হইবে, ফটোগ্রাফের সাহায্যে তাহার ছাপের ফটো তুলিয়া অন্য প্লেটের উপর আবার সেই ছাপ জাল করিয়া থাকে।

আর একটা মজার চুরীর কথা প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যাপারটা এই—আমেরিকায় প্রসিদ্ধ জালিয়াৎ এন্‌থনি ট্রেন্ট কোনও জর্ম্মন ব্যারনেসের রত্নালঙ্কার অপহরণ মানসে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। হীরকালঙ্কারগুলি একটি স্বর্ণনির্ম্মিত মসৃণ আধারে রক্ষিত ছিল। উহা উন্মুক্ত করিতে গেলেই অপহরণকারীর অঙ্গুলির ছাপ তাহাতে পড়িবে। লোকটার হাতে দস্তানা ছিল না। সঙ্গে স্পিরিট, কলোডিয়ন প্রভৃতি এমন কোনও পদার্থ ছিল না, যাহার সাহায্যে সে

তাহার করাঙ্গুলির ছাপ পরিশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারে। লোকটা তখন সত্যই বড় বিপদ বুঝিল।

সহসা সে দেখিতে পাইল যে, ব্যারনেসের স্বামী শয্যার উপর গড়াগড়ি দিতেছেন, যা'তা' বকিতেছেন। সে বুঝিল, ব্যারণ সুরাপানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অন্যের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার শক্তি তাঁহার নাই। ইহা দেখিয়া সে উল্লাসে অধীর হইল এবং ব্যারণের হাতখানা ধরিয়া সন্নিহিত অলঙ্কারাধারের উপর চাপিয়া ধরিল; তদুপরি নিজের হাত রাখিয়া ব্যারণের হাতের দ্বারাই সে অলঙ্কারের আধারটি মুক্ত করিল। সুরাপানে বিবশ, বিহ্বল স্বামীর করাঙ্গুলির ছাপ পত্নীর রত্নাধারের উপর তাঁহারই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছিল।
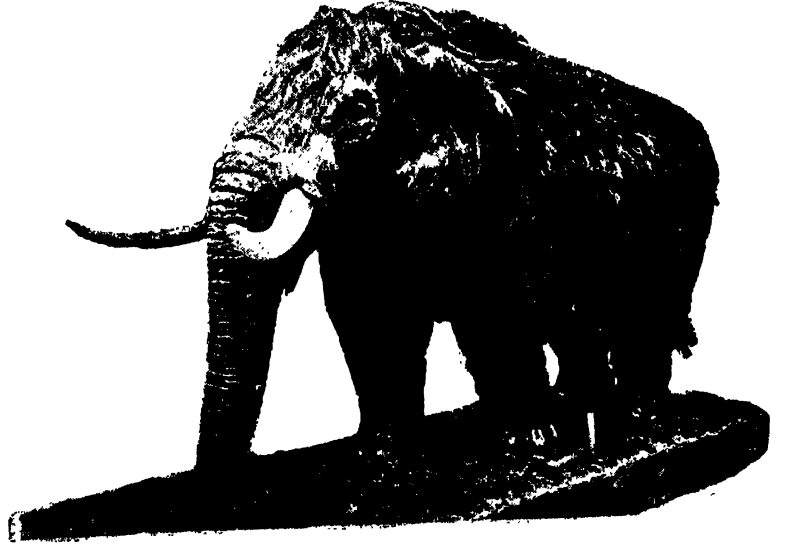
প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় হস্তীর পুনর্জ্জন্ম।

বিগত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কোহোস্ অঞ্চলে ভূগর্ভ হইতে একটি অতিকায় হস্তীর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। এই প্রাগৈতিহাসিক হস্তীটি পুরুষ ছিল। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, দক্ষিণ চোয়ালে দন্তপীড়া বশতঃ উহার আকার পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। এ জন্য এই হস্তিকঙ্কালের নাম হইয়াছে—'পীড়িত-দন্ত-অতিকায় বারণ।' আল্‌বানি নগরের সরকারী 'যাদুঘরে' অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল এই কঙ্কাল সংরক্ষিত রহিয়াছে। সম্প্রতি উক্ত অতিকায়ের পুনর্জ্জন্ম-সংস্কার-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

[অতিকায় হস্তীর পুনর্জ্জন্ম]
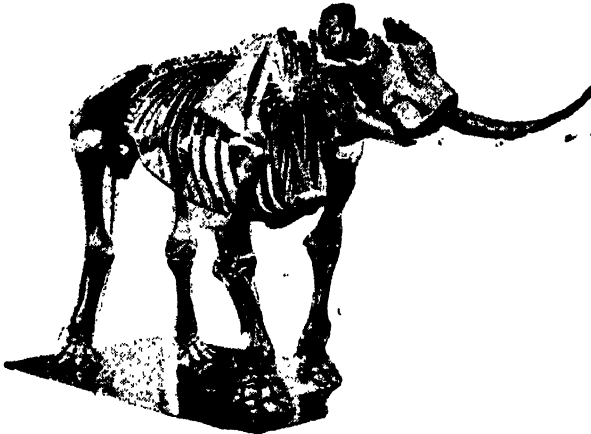
[প্রাগৈতিহাসিক হস্তীর কঙ্কাল]

অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ জীবদেহের কঙ্কাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিমাপ করিয়া উহার অনুরূপ অতিকায় মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। জীবিতাবস্থায় প্রাগৈতিহাসিক বারণশ্রেষ্ঠের মূর্ত্তি যেরূপ হইতে পারিত, শিল্পী বিজ্ঞানের সাহায্যে, কল্পনা-বলে অতি নিপুণভাবে এই নব-নির্ম্মিত মূর্ত্তিটিকে তেলনই ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। দেখিবামাত্র মনে হইবে যেন মূর্ত্তিটি সজীব। বৎসরাধিককাল পরিশ্রম করিয়া আল্‌বানির যাদুঘরের অধ্যক্ষপুত্র মিঃ নোয়া, টি, ক্লার্ক এই অভিনব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রধান হল ঘরের মধ্যে কঙ্কাল-দেহের পার্শ্বে এই নব-নির্ম্মিত মূর্ত্তিটি সংস্থাপিত। এতদুপলক্ষে যাদুঘরের কর্ত্তৃপক্ষ বহু ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দর্শকগণ এই মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া শিল্পীর সাধুবাদ করিয়াছিলেন। তুষারযুগে এইরূপ অতিকায় হস্তী পৃথিবীতে বিচরণ করিত বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এমনভাবে পূর্ব্বে আর কোনও জীবের পুনর্জ্জন্মক্রিয়া কোথাও সম্পাদিত হয় নাই।

টেলিফোনযোগে চিত্র প্রেরণ।

তাড়িতবার্ত্তাযোগে ছবি প্রেরণের সংবাদে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম, অধুনা টেলিফোন্-যোগে চিত্রপ্রেরণও সম্ভবপর হইয়াছে। প্যারীর জনৈক ইঞ্জিনিয়ার, মসিঁয়ে বেলিঁ, সম্প্রতি টেলিফোনযোগে চিত্র প্রেরণ করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।

যে ফটোগ্রাফ টেলিফোন-যোগে পাঠাইতে হইবে, তাহা একটি ধাতুনির্ম্মিত গোলাকার নলের উপর সন্নিবিষ্ট হয়। উক্ত গোলাকার নলটি ঘুরিতে থাকে। তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র সূচ সন্নিবিষ্ট। গ্রামোফোনের রেকর্ড ক্ষুদ্র আল্‌পিনের সাহায্যে যেমন শব্দ ও সঙ্গীত উৎপাদন করে, উক্ত ছবির উপর সূচটিও অনুরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করে। ছবির যেখানে শৈলশৃঙ্গ, সূচ সেখানে উপরের দিকে উঠে, আবার যেখানে উপত্যকাভূমি, সেখানে নামিয়া যায়, এইরূপ প্রণালীতে কায হয়। এই উচ্চ ও অধোগামী গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি 'লিভার' আছে; তাহাতে টেলিফোন যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট তারের মধ্য দিয়া তড়িৎস্রোতও নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত হয়। যে স্থানে এই চিত্র প্রেরিত হইবে, তথায়ও অনুরূপ যন্ত্র থাকে। সেখানে গোলাকার ভ্রাম্যমান্ নলের উপর একখানি 'ফিলম' বা উপযোগী কাগজ আবদ্ধ থাকে। উক্ত নলের সম্মুখে যেখানে টেলিফোনের তার শেষ হইয়াছে, তাহার সহিত দুইটি সূক্ষ্ম রৌপ্যতার বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট চুম্বকের মধ্য দিয়া প্রসৃত। তারের মাঝখানে একখানি দর্পণ। একই সময়ে উভয় প্রান্তের টেলিফোনের কার্য্য চলিতে থাকে। যেখানে ছবি প্রেরিত হইতেছে, তত্রত্য টেলিফোনের সংশ্লিষ্ট রৌপ্যতার তড়িতগতির বেগে আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতে থাকে, দর্পণে নিয়ন্ত্রিত আলোকদীপ্তিও প্রতিবিম্বিত হয়, আর নলসংযুক্ত কাগজে তদনুসারে ছাপ উঠিতে থাকে। তাহার পর উক্ত ছবির কাগজখানিকে সাধারণ প্রণালী অনুসারে "পরিণত" (develop) করিয়া তুলিলেই আসল ছবির প্রতিকৃতি পাওয়া যাইবে। অবশ্য উহা সকল বিষয়ে আসল ছবির মত সন্তোষজনক হয় না বটে; কিন্তু সংবাদপত্রে ছাপিবার মত কার্য্যোপযোগী হয়।

তারহীন বার্ত্তাবহের সাহায্যে পরিণয়।

পাশ্চাত্যদেশে সবই সম্ভবপর। ইদানীং সহস্র সহস্র মাইল ব্যবধানে অবস্থিত নরনারীর বিবাহব্যাপার তারহীন বার্ত্তার সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি এইরূপ একটি পরিণয়ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ডেট্রয়-বাসিনী এক যুবতীর সহিত আটলান্টিক মহাসমুদ্রের উপর ভাসমান জাহাজে অবস্থিত এক নাবিক যুবকের পরিণয়-ক্রিয়া তারহীন বার্ত্তাবহের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। জাহাজের উপর হইতে বর ও পুরোহিত তারহীন বার্ত্তাবহযোগে বিবাহের যাবতীয় ব্যাপার তিন হাজার মাইল দূরবর্ত্তী ডেট্রয়নগরে প্রেরণ করেন। কন্যা তখন আত্মীয়স্বজন সহ পুরোহিতের সহিত ধর্ম্মমন্দিরে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ পক্ষ হইতেও যাহা কিছু বক্তব্য, তাহাও উক্ত বার্ত্তাবহযোগে প্রেরিত হয়। সাধারণ বিবাহব্যাপারে যে পরিমাণ সময় লাগে, এ অনুষ্ঠানে তাহার অধিক সময় লাগে নাই। আমেরিকায় এখন এই ভাবে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদনের হুজুগ পড়িয়া গিয়াছে! সম্প্রতি জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী তাঁহার মনোনীতা পাত্রীসহ বিমানপোতে আরোহণ করিয়া আকাশপথে আরোহণ করেন। আবার আর একখানি বিমানপোতে চড়িয়া পুরোহিতও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হয়েন। তিনি আকাশ-পথেই এই নব প্রণয়িযুগলকে দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দেন। নিম্নে অতিরিক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট টেলিফোন যন্ত্রসমূহ রক্ষিত হইয়াছিল। তাহাদের সাহায্যে সমবেত জনসঙ্ঘ বিবাহের যাবতীয় কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিল। সেই সময়ে পুরোহিত ধর্ম্মগ্রন্থের সাহায্যে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, নব-দম্পতির ভাবী সুখময় জীবনের উদ্দেশে যে সকল আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়াছিলেন, বর ও কন্যা সে সময়ে পরস্পরের প্রতি সময়োপযোগী যে সকল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রোতৃবৃন্দ তাহার প্রত্যেক শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইয়াছিল। ভোগ-বিলাসের লীলাভূমি পাশ্চাত্যদেশের বিলাস-লালসাপূর্ণ এই অনুষ্ঠানগুলি সেই দেশের চরিত্রেরই উপযোগী। প্রবৃত্তির দীর্ঘশ্বাস অতৃপ্তির বহ্নিজ্বালাকে প্রখর করিয়াই তুলে। ইহার সমাপ্তি কোথায়?

অন্ধের বর্ণ-জ্ঞান।

আমেরিকায় সপ্তদশবর্ষীয়া একজন অন্ধ ও বধির যুবতী আছে, তাহার নাম উইলেটা হগিন্‌স্। সে গন্ধের সাহায্যে বর্ণ নির্ণয় করিতে পারে এবং স্পর্শের দ্বারা কথা শুনিতে পায়। তাহার এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া আমেরিকার চিকিৎসকগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। উইস্‌কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক, ডাক্তার জোসেফ্ জাস্‌ট্রো এই যুবতীকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে,তাঁহার বিশ্বাস, এই অন্ধ ও বধির যুবতীর সামান্য পরিমাণ দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বিদ্যমান না থাকিলে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে না।

অন্ধ ও বধির যুবতী টেলিফোন্ যন্ত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কথা শুনিতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ এই যুবতী প্রকৃতই অন্ধ। সত্যই ইহার কেন্দ্রীভূত দৃষ্টিশক্তি নাই। কিন্তু তথাপি মনে হয় যে, ইহার অতি সামান্যপরিমাণ বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিশক্তি থাকিতে পারে। নাসিকার সন্নিকটে কোনও বর্ণকে ধারণ করিয়া সে যখন ঘ্রাণ লইতে থাকে, সেই সময় তাহার বিচ্ছিন্ন সামান্য দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সে হয় ত বর্ণ-নির্ণয় করিয়া থাকে। অন্ধকার পরীক্ষাগারে সামান্য আলোক জ্বলিতেছিল। সেই সময় মিস্ হগিন্‌স্ অভ্রান্তরূপে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণগুলিকে সনাক্ত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আলোকোদ্ভাসিত স্থানে সে যেরূপ তৎপরতার সহিত এই কার্য্য করিতে পারে, স্বল্পালোকে তত দ্রুত পারে নাই। সম্পূর্ণ অন্ধকারে সে কিছুই পারে নাই। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, বক্তার কণ্ঠনালী অথবা মস্তকের সহিত এই যুবতীর অঙ্গুলি সাক্ষাৎভাবে অথবা কোনও কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া দিলে বক্তার কথা এই বধির যুবতী শুনিতে পাইবে। ইহাও আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না। আরও বিশেষ যত্ন সহকারে এ বিষয়ের পরীক্ষা না করিয়া বলা যায় না যে, প্রকৃতই সে শ্রবণশক্তিহীন অথবা ইহা তাহার মনের ভ্রমাত্মক সংস্কার মাত্র। মনোবৃত্তি-বিশ্লেষণাগারে এমন বন্দোবস্ত আছে যে,তাহা অবলম্বন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, অঙ্গুলির ভিতর দিয়া শব্দের স্পন্দন সঞ্চারিত হয় বলিয়াই সে শুনিতে পায় কিংবা শ্রবণবিবরে শব্দ প্রবেশ করে বলিয়াই তাহার শ্রবণানুভূতি ঘটে। মিস্ হগিন্‌সের অজ্ঞাতসারে কাষ্ঠদণ্ড বক্তার মস্তকে সংশ্লিষ্ট না করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। তাহাতে সে বক্তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে,যাঁহারা বলেন, উল্লিখিত যুবতীর শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি নাই, তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি।"

জলের মধ্যে ফটোগ্রাফ।

সাধারণ আলোকরেখা ২ শত ৫২ ফুটের অধিক গভীর জলে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং সমুদ্রের জল ২ শত ৫২ ফুটের নীচে গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু ফটোগ্রাফ তুলিবার 'প্লেট'এ যে রশ্মি ব্যবহৃত হয়, তাহার আলোকরেখা জলের বহু নিম্নস্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া থাকে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, পরিষ্কার জলে ১ হাজার ৫ শত ফুট পর্য্যন্ত জলের নিম্নতলস্থ দৃশ্য ফটোগ্রাফে তোলা যায়।

তারহীন তাড়িতবার্ত্তার কীর্ত্তি।

যাহা কিছু নূতন, যাহা কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহারই প্রতি মার্কিণের প্রগাঢ় অনুরাগ, প্রচণ্ড নেশা! কিছুকাল ধরিয়া আমেরিকায় তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বিগত চারি বৎসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের সর্ব্বত্রই তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে উল্লিখিত প্রণালীতে টেলিফোন্ যন্ত্রাদির প্রচলন হইয়াছে সত্য; কিন্তু আমেরিকার তুলনায় তাহা যৎসামান্য। ইংলণ্ডে তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্র পূর্ব্বে জনসাধারণ ইচ্ছামত ব্যবহারের অনুমতি পাইত না। বিনা "লাইসেন্সে" কেহ এই যন্ত্র রাখিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডে সংপ্রতি এই বিধানের কঠোরতা কিছু শিথিল করা হইয়াছে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৫ হাজার স্থানে লাইসেন্স প্রাপ্ত তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই যন্ত্রের সাহায্যে লোক সর্ব্ববিধ আমোদ-প্রমোদ ও প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারহীন তাড়িতযন্ত্রের সাহায্যে ঐক্যতান বাদন শ্রবণ, সংবাদপত্রে সংবাদ প্রেরণ, গৃহে বসিয়া রমণীকুলের পরস্পরের বিশ্রম্ভালাভ, আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, বক্তৃতা শ্রবণ প্রভৃতি যাবতীয় কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল। এই তারহীন টেলিফোনের 'দৌলতে' নগর হইতে শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী জনহীন অরণ্যের মধ্যে সমাজ বান্ধবহীন ঔপনিবেশিক সভ্যজগতের যাবতীয় ব্যাপারের সহিত সংস্রব রাখিতে পারিতেছিলেন, কৃষিব্যবসায়ীরা দূর-দূরান্তের মাঠের মধ্যে বসিয়া গমের বাজার দর নামিতেছে কি উঠিতেছে, তাহার সঠিক সংবাদ পাইতেছিলেন, আচার্য্য-মুখনিঃসৃত রবিবাসরিক ধর্ম্মকথা ইথর-তাড়িত হইয়া শয্যাশায়ী পীড়িতের কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছিল, ব্যবসায়ীরা বিশ্রামলাভাশায় নগর হইতে দূরে অবস্থান করিয়াও কার্য্যালয়ের সকল সংবাদ ইচ্ছানুসারে জানিতে পারিতেছিলেন।

উল্লিখিত সকল প্রকার সুবিধা তারহীন টেলিফোনের সাহায্যে ইতঃপূর্ব্বেই আমেরিকার অধিবাসীরা পুরা মাত্রায় উপভোগ করিয়াছে এবং ক্রমেই তাহার উন্নতি দ্রুততর বেগে হইতেছে। ইংলণ্ডে আর কয়েক মাসের মধ্যে তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে। ইতোমধ্যেই এই যন্ত্রের মূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ইচ্ছা করিলেই এখন যে কেহ তারহীন টেলিফোন্ ব্যবহার করিতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের উপযোগী তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্র এখনই কয়েক পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয় করিলেই ভাড়া পাওয়া যায়, অথবা উহার দ্বিগুণ অর্থে ক্রয় করাও সম্ভবপর হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সকল চিত্র সন্নিবিষ্ট করা গেল, অদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ডেও তাহা সম্ভবপর হইবে। চিত্রগুলি কল্পিত নহে। আমেরিকায়—যুক্তরাজ্যে চিত্রে বর্ণিত ব্যাপারগুলি শুধু সম্ভবপর হয় নাই, প্রতিদিনই এই সকল ব্যাপার তথায় তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

তারহীন যন্ত্রধারী পুলিস-প্রহরী।

উত্তরকালে, তারহীন যন্ত্রের প্রভাবে লণ্ডনের পুলিস-প্রহরী কিরূপ কার্য্যক্ষম ও দুর্দ্ধর্ষ হইতে পারিবে, তাহারই চিত্র প্রদর্শিত হইল। পুলিস-প্রহরীর নিকট যে তারহীন তাড়িতযন্ত্রটি থাকিবে, তাহার তারগুলি প্রহরীর কোটের অন্তরালে গুপ্ত থাকিবে, সেই তারের প্রান্ত প্রহরীর পদদেশ বাহিয়া বুটজুতার গোড়ালির সহিত সংশ্লিষ্ট। পুলিস-প্রহরী মাটীর উপর দাঁড়াইয়া থাকে, সুতরাং ভূমির সহিত তারের সংযোগ ঘটিবার প্রচুর অবসর।

প্রহরীর কোটের আস্তীনের উপর একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র সন্নিবিষ্ট। তারহীন তাড়িতবার্ত্তার প্রভাবে এই যন্ত্রে টুং' টাং শব্দ হইলেই প্রহরীর দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হইবে, তখনই সে বুঝিবে, কর্ত্তারা তাহাকে কিছু আদেশ দিতে চাহেন। কি আদেশ, তাহা সে সেই যন্ত্রের সাহায্যেই জানিতে পারিবে। সমগ্র যন্ত্রটি এতই ক্ষুদ্র যে, প্রহরীর পকেট অথবা কোমরবন্ধের ক্ষুদ্র থালির মধ্যে অনায়াসে তাহা রাখিতে পারা যায়। এইরূপে সুসজ্জিত পুলিস-প্রহরী উত্তরকালে কত কাযে লাগিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়; কোথাও তাহার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক হইলে এই যন্ত্রের সাহায্যে সে মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ জানিতে পারিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—নগরের কোনও প্রান্তে হয় ত গুণ্ডার উপদ্রব হইয়াছে, অমনই শত শত পুলিস-প্রহরীর নিকট তারহীন তাড়িতবার্ত্তার সাহায্যে সংবাদ প্রেরিত হইল, কোথায় তাহাদিগকে যাইতে হইবে। অমনই নানা দিক্ হইতে তাহারা ঘটনাস্থলে গিয়া পৌছিবে। দুর্বৃত্তেরা কোনও অনিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই পুলিস তাহার প্রতীকারে সমর্থ হইবে।

ভবিষ্য যুগে তারহীন তাড়িতবার্ত্তাবহ-যন্ত্রধারী ডাক্তারের উপযোগিতা বিস্ময়করই হইবার সম্ভাবনা। ডাক্তারের মোটরগাড়ীর উপরিভাগের চারিদিকে এই যন্ত্রের তার সন্নিবিষ্ট থাকিবে। ডাক্তার মোটরে চড়িয়া এ বাড়ী ও বাড়ী রোগী দেখিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার কাণের কাছে 'শ্রবণযন্ত্র'টি সন্নিবিষ্ট। সহসা যন্ত্র কথা কহিয়া উঠিল! "ডাক্তার! ডাক্তার! ডাক্তার!" ডাক্তার উৎকর্ণ হইলেন, পরেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, অমুকস্থলে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ডাক্তার অমনই মোটর হাঁকাইয়া ঘটনাস্থলে যাইতে পারিবেন। আবার নিজের ডাক্তারখানায়ও তিনি ঔষধের জন্য অনায়াসে সংবাদ পাঠাইতে পারিবেন। অনতিবিলম্বে ঔষধাদিও প্রয়োজনানুসারে তিনি আনাইয়া লইতে পারিবেন। ডাক্তারের তারহীন টেলিফোনের সাহায্যে উত্তরকালে বহু লোকের জীবন রক্ষা হইবাব সম্ভাবনা ঘটিবে।

মোটর গাড়ীতে বসিয়া ডাক্তার তারহীন বার্ত্তাবহের সাহায্যে সংবাদ পাইতেছেন।

ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেও তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্র অশেষ উপকারসাধন করিবে। হয় ত কোনও বিশেষ প্রয়োজনে কোনও ব্যবসায়ীকে বহু দূরে যাইতে হইবে; কিন্তু তাঁহার অবিদ্যমানে কার্য্যালয়ে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা; এ জন্য অনেকেই এখন কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে গিয়াও দুশ্চিন্তায় কালযাপন করেন। কিন্তু তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রের বহুল প্রচলনে তাঁহার সে দুর্ভাবনা থাকিবে না। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে, হয় ত তাঁহার আদেশ বা পরামর্শ ব্যতীত কোনও গুরু বিষয়ের মীমাংসা সম্ভবপর নহে। এমতাবস্থায় তিনি দূরে থাকিয়াও এই যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্র সন্নিবিষ্ট মোটর-গাড়ীতে বসিয়া বহুদূর হইতে তাঁহার কার্য্যালয়ের সহিত তিনি সংস্রব রাখিতে পারিবেন। সুতরাং ভবিষ্যতে তাঁহার অনুপস্থিতি অবস্থায় তাঁহাকে দুশ্চিন্তাভারে অবসন্ন হইতে হইবে না।

কোথাও হয় ত আগুন লাগিয়াছে। অগ্নি-নির্ব্বাণকারীরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, আরও অতিরিক্ত ইঞ্জিন ও লোকের প্রয়োজন। তারহীন যন্ত্র-সন্নিবিষ্ট গাড়ীতে চড়িয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা সে সংবাদ ষ্টেশনে পাঠাইতে পারিবে এবং অত্যল্পকালের মধ্যে পর্য্যাপ্ত সাহায্য আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবে।

দূরে থাকিয়া, বিমানপোতে আরোহণ করিয়া আত্মীয়-স্বজনের সংবাদের আদান-প্রদান, ধর্ম্মমন্দিরে না গিয়াও পুরোহিতের ধর্ম্মবক্তৃতাশ্রবণ—এ সকল ব্যাপারও অনায়াসে এই তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হইবে। আমেরিকায় এ সকল ব্যাপার নিয়তই হইতেছে। কোনও ধর্ম্মমন্দিরে লোক-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক বক্তৃতা দিলে অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই তাহা শুনিবার সুবিধা পাইয়া থাকেন। কারণ, বহু লোকের স্থান কোনও ধর্ম্মমন্দিরে হইতে পারে না। কিন্তু এই তারহীন তাড়িতবার্ত্তার যুগে সে আশঙ্কা আর রহিল না। সহস্র সহস্র ব্যক্তি অনায়াসে এই টেলিফোন্ যন্ত্রের সাহায্যে তেমন বক্তৃতা শ্রবণে ধন্য হইতে পারিবেন। বক্তাকে সে জন্য গলা-ফাটা চীৎকার করিতে হইবে না। সাধারণ ভাবে কথা কহিলেই সকলে অনায়াসে তাহা শুনিতে পাইবে।

নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বালিকারা সুদূরপ্রবাসী দাদামহাশয়ের গল্প শুনিতেছে।

এ সকলই সম্ভবপর হইল। শত শত ক্রোশ দূরে যাঁহাদের প্রিয়জন প্রবাসজীবন যাপন করিতেছেন, তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন তাঁহার কথা শুনিয়া পুলকিত ও সুখী হইবেন। আদরের নাতিনীরা দাদামহাশয়ের গল্প না শুনিয়া ঘুমাইতে পারে না। শত ক্রোশ দূর হইতে দাদামহাশয় পরীর গল্প আরম্ভ করিলেন। তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রের সাহায্যে নাতিনীরা সে গল্প শুনিয়া আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া হাসিমুখে শয়ন করিতে যাইবে। দাদামহাশয়ের কথিত মজার কাহিনী শুনিবার অসুবিধা আর তাহাদের হইবে না!

কোথাও কোনও শ্রেষ্ঠ গায়ক গান করিবেন। ঘটনা-স্থলে গিয়া সে গান শুনিবার সুবিধা অনেকের হয় ত ঘটে না। এই যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে বসিয়া সে মধুর সঙ্গীত শ্রবণের সুযোগ সকলেরই হইবে। নিভৃত উদ্যানে বসিয়া যদি এমন ভাবে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বা ঐক্যতানবাদন শুনা যায়, তাহাতে শ্রোতার কি বিমল আনন্দই না হইবে!

কোথাও কোনও বিলাসিনী মহিলার গৃহে নৃত্যোৎসব হইবে। ঐক্যতান বাদ্য অথবা অন্য কোনও বাদ্যযন্ত্রের কোনও ব্যবস্থা হয় ত সেখানে নাই। গৃহকর্ত্রী তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী কোনও নগরের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ সম্প্রদায়ের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অতিথিবর্গ সমবেত হইয়া দেখিলেন যে, প্রশস্ত গৃহের এক কোণে তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্র সংশ্লিষ্ট আধার হইতে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছে। গৃহকর্ত্রী ২।১ মিনিটের মধ্যে যন্ত্রটিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া দিলেন, অমনই

ইথর-তরঙ্গ সাহায্যে নৃত্য-সঙ্গীতের আবির্ভাব।

সুবৃহৎ শৃঙ্গাভ্যন্তর হইতে নৃত্যোপযোগী তান-লয়সমন্বিত বাদ্যধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নরনারীরা অমনই যুগলে যুগলে নাচিতে আরম্ভ করিলেন।

আমেরিকায় তারহীন যন্ত্রের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। সংবাদপত্র সমূহ এই যন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বদাই সংবাদের আদান-প্রদান করিয়া থাকেন। আমেরিকায় অনেক সংবাদপত্রে মহিলা সংবাদদাত্রী আছেন। মহিলাদিগের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব সংবাদপত্রে সংবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। কোনও লোকপ্রসিদ্ধ মহিলা সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিতে পারিলেই সংবাদদাত্রী এইরূপে তারহীন টেলিফোন্ যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ প্রদান করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পুলিস ও ডাক্তার কি প্রকারে এই যন্ত্র কত অনায়াসে সঙ্গে রাখিতে পারিবে; কিন্তু এই খানেই উহার সমাপ্তি নহে। অঙ্গুরীয়ের মধ্যেও তারহীন তাড়িতবার্ত্তা যন্ত্রের সম্পূর্ণ সরঞ্জাম সন্নিবিষ্ট করিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। অবশ্য, বহু দূরের কথা শুনিবার সুবিধা ইহাতে হয় না বটে; কিন্তু তথাপি স্বল্পদূরের কথা ত শুনা যায়। ক্ষুর রাখিবার বাক্স, ফাউণ্টেন পেনের আধার এবং দীপশলাকা-বাক্সেও এই যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। চুরুট রাখিবার বাক্সেও অতি সুকৌশলে তারহীন তাড়িতবার্ত্তা যন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রদত্ত চিত্র হইতে দেখা যাইতেছে, এক ব্যক্তি অঙ্গুরীয়-সন্নিবিষ্ট করপল্লবের দ্বারা একটি আলোকস্তম্ভ স্পর্শ করিয়া

উদ্যানে বসিয়া তারহীন বার্ত্তাবহের সাহায্যে সঙ্গীত শ্রবণ।

দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। উহাতেই ভূমির সহিত তাঁহার সংযোগ হইয়াছে। করাঙ্গুলিতে যে অঙ্গুরীয় আছে, তাহার সহিত অতি সূক্ষ্ম একটি তার সংশ্লিষ্ট; সেই তার একটি ক্ষুদ্র বাক্সের আকারবিশিষ্ট আধারের সহিত সংযুক্ত। এই আধারের মধ্যে তারহীন তাড়িতবার্ত্তার যন্ত্র রহিয়াছে। আর একটি সূক্ষ্ম তার লোকটির কটিদেশ বেষ্টন করিয়া উক্ত আধারের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহাতেই ইথরতরঙ্গের কার্য্য সম্পাদিত হয়।

বৃষ্টি পড়িতেছে না, অথচ লোকটা ছাতা খুলিয়া মাথায় দিয়াছে। দেখিলেই সাধারণের মনে হইবে, লোকটা পাগল নাকি! কিন্তু আসলে তাহা নহে। এই ছাতার সহিত তাহার পকেটের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ছাতার সহিত ক্ষুদ্র তার সন্নিবিষ্ট থাকায় ইথরতরঙ্গের কার্য্য তদ্দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। অঙ্গুরীয়ের সহিত সূক্ষ্ম তার পূর্ব্ববৎ সংশ্লিষ্ট। কোটের হাতার অন্তরালে কুণ্ডলীকৃত সূক্ষ্ম তারের সহিত অঙ্গুরীয়-সংলগ্ন তার মিলিত হইয়াছে। উহার দ্বারা মৃদু মধুরধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। লোকটির দৃষ্টিশক্তি প্রখর নহে। দূরের জিনিষ দেখিতে পায় না, জুয়াড়ীদিগের ইঙ্গিতে কথোপকথন সকল সময় বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই তারহীন তাড়িত-বার্ত্তার সাহায্যে সে সকলের অস্ফুট মৃদু গুঞ্জনও পরিষ্কার শুনিতে পাইতেছে। কানের কাছে ক্ষুদ্র টেবিলে যন্ত্র রহিয়াছে। তাহার দ্বারা লোকটির উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায়

ট্রাফালগর স্কোয়ারে দাঁড়াইয়া অঙ্গুরীয়-সন্নিবিষ্ট তারহীন তাড়িত যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ শ্রবণ

মহিলা সংবাদদাত্রী সংবাদপত্র-কার্য্যালয়ের সহিত এই যন্ত্র সাহায্যে সংবাদের আদান-প্রদান করিতেছেন।

সুসিদ্ধ হইতেছে। কোন্ ঘোড়ার দর কিরূপে উঠিতেছে বা নামিতেছে, তাহা জুয়াড়ীদিগের আলোচনায় শ্রুতিগোচর হইবামাত্র সে নিজের তহবিল ঠিক রাখিবার সুযোগ পাইতেছে। এইরূপ বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে দিন দিন নূতন নূতন যন্ত্রাদির আবিষ্কার হইতেছে। ইহাতে মানুষের সুবিধা হইতেছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে আবার মানুষের জীবনযাত্রা জটিল হইয়া পড়িতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দিন দিন যন্ত্রাদির উপর সমধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। অনেক স্থলে যন্ত্রই মানুষের মত কায করে; মানুষ যেন যন্ত্র হইয়া কায করিতেছে। এই অবস্থা শেষে কোথায় শেষ হইবে, তাহা ভাবিয়া অনেকে ইহার মধ্যেই চিন্তিত হইতেছেন। কিন্তু সে চিন্তার ফলে মানুষ যে আবার সরল জীবনে প্রত্যাবর্ত্তনপর হইবে, এমনও মনে হয় না।

ছাতা খুলিয়া ঘোড়দৌড়ের দিন 'খেলোয়াড়' দাঁড়াইয়া তারহীন তাড়িতযন্ত্রের সাহায্যে সে বাজির ঘোড়ার দরের হ্রাসবৃদ্ধি শুনিতেছে।

মার্কিণ দম্পতীর বানপ্রস্থাবলম্বন।

বর্ত্তমান সভ্যজগতের কোনরূপ সহায়তা গ্রহণ না করিয়া নরনারী স্বাভাবিকভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে কি না, ইহার পরীক্ষার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মেন প্রদেশবাসী মিঃ কার্ল, এ, সাট্টার ও তদীয় পত্নী উক্ত প্রদেশের একটি অরণ্যমধ্যে ছয় সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিবার জন্য গমন করিয়াছেন। বষ্টনের 'সেণ্ট্রাল নিউজ'পত্রে প্রকাশ, মিঃ সাট্টারের বয়স ২৭ বৎসর মাত্র এবং তাঁহার পত্নীর বয়স ২৩ বৎসর। সাট্টার-পত্নী খর্ব্বাকৃতি এবং তাঁহাকে ক্ষীণকায়া বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার স্বামীর ন্যায় তিনি শক্তিমতী ও ক্লেশসহিষ্ণু। তাঁহারা বনগমনকালে দ্বিতীয় বস্ত্র বা কোন প্রকার খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে লয়েন নাই, এমন কি, আত্মরক্ষার জন্য কোন প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রাদি সঙ্গে রাখা প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। তাঁহারা যে বনে গিয়াছেন, সেখানে অনেক হিংস্র জন্তু আছে, কিন্তু সাট্টার দম্পতী সে কারণ অণুমাত্র ভীত নহেন। তাঁহারা বনতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ। যে সময়ে তাঁহারা যাত্রা করিয়াছেন, সে সময়ে উত্তর-মেন প্রদেশ বড়ই ঠাণ্ডা, কিন্তু সে জন্য তাঁহারা কোন গাত্রবস্ত্র লয়েন নাই। উক্ত অরণ্যমধ্যে বহু হ্রদ আছে, তাঁহারা সেই হ্রদের মৎস্য আহার করিবেন, গাছের বন্ধলে অঙ্গ আচ্ছাদন করিবেন এবং আপনারা বনমধ্যে মাছ ধরিবার ও মৃগয়া করিবার মোটামুটি অস্ত্র প্রস্তুত করিবেন। এই দম্পতী গৃহের বাহিরে অনেককাল বাস করিয়াছেন, এ জন্য তাঁহারা কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যস্ত। তাঁহারা যদি এই ছয় সপ্তাহকাল নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিতে পারেন, তাঁহারা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য অরণ্যচারী হইয়া কাল কাটাইবেন।

চিত্তরঞ্জন-সংবর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ জয়যুক্ত হইয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসিবার পর গত ৩রা ভাদ্র তাঁহার "গুণমুগ্ধ স্বদেশ-বাসিগণ"—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে কলিকাতা মির্জ্জাপুর পার্কে তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করেন। দেশীয় সংবাদপত্রের পক্ষে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও মুসলমান সমাজের পক্ষে মৌলবী আহমদ আলী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলে, সভাপতি মহাশয় খদ্দরে মুদ্রিত নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন!

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তি-পথযাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে, সবিনয়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মা আমাদের আজ অবমানিতা, শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খল-ভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

"একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু, যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজও সে তেমনি গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক্। কিন্তু, আর একদিন এই বাঙ্গালা দেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাঙ্গালার নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর-বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয় ত, তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয় ত, কাহারও রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে তাহার মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।"

"তার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। যেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে সর্ব্বস্ব পণে তোমাকে পথের বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।"

"বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্ব্বলোক-চক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকে সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইয়া দিতে হইলে,—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

"এই ত তোমার ব্যথা! এই ত তোমার দান!"

"ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না,—তাই, বাঙ্গালা তোমাকে যখন 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় কোথাও লেশ-মাত্র দাগ লাগিল না।"

"আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ, তাই ত, আজ তোমার করতলে। তাই ত, তোমার

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ।

ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙ্গালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পঞ্জাবী, মারহাট্টি, গুজরাটী, যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।"

"তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানব-জাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এম্নি করিয়াই মানব-জীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এম্নি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তি অতিক্রম করিয়া চলে।"

"একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে, কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন, অবমানিত, উপদ্রুত, মানব-জাতি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে। এবং, কোনমতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।"

"জীবন-তত্ত্বের এই অমোঘ বাণী স্বদেশে-বিদেশে, দিকে-দিকে, উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেক দিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্ব্বের বড় গর্ব্ব বাঙ্গালী তুমি; তাই ত, সমস্ত বাঙ্গালার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছি,—আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ,—তুমি চিরজীবী হও! তুমি জয়যুক্ত হও!"

সভাপতি আচার্য্য রায় মহাশয় বলেন, যখন রাজশক্তির অনাচারে পঞ্জাব জর্জ্জরিত হয়, তখন সেই অনাচারের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য দেশের লোকের যে সমিতি গঠিত হয়, অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাহাতে কায করিয়া চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর বাঙ্গালায় যখন আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইল, তখন তিনিই অগ্রণী হইলেন।

চিত্তরঞ্জন বলেন, তিনি যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, সে অর্থ তিনি কোন দিনই আদরের বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। সুতরাং সে ত্যাগ যে বড় ত্যাগ, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তিনি প্রতীচ্যের অনুকরণে এ দেশে রাজনীতিচর্চ্চার বিরোধী। ভারতবর্ষ রাজনীতির বা সমাজনীতির জন্য ব্যস্ত হয় নাই—সে চাহিয়াছে—সত্য। তিনি দেশের লোককে সেই সত্যের সন্ধান করিতে বলেন। মহাভারতে পশুবলের দুর্দ্দশার যে দৃষ্টান্ত আছে, তাহা অসাধারণ। ধৃতরাষ্ট্র পশুবল—রাজনীতি—কূটনীতি। গান্ধারী অর্থে যিনি বেদ ধারণ করেন অর্থাৎ সত্যকে ধারণ করেন, কারণ—বেদের মূল সত্য। প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র আপনার গর্ব্বে—রাজনীতিক বলে—নিজের বুদ্ধিতে কুরু-শক্তি চালিত করিতেছিলেন। যাহারা পশুবলের উপর নির্ভর করে, তাহারা অন্ধ—ধৃতরাষ্ট্রও অন্ধ। কুরুক্ষেত্রে মহাপ্রলয়ের পর আমরা কি দেখিতে পাই? তখন পরাভূত ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ কূট-রাজনীতি গান্ধারীর অর্থাৎ সত্যের উপর নির্ভর করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তেমনই অদূর ভবিষ্যতে সত্যের উপর নির্ভর করিয়া পশুবল পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে।

চিত্তরঞ্জন ভারতবাসীকে অন্য কোন দেশের আদর্শের অনুকরণ করিতে নিষেধ করেন। তিনি ভারতবাসীকে সত্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত স্বরাজলাভ করিতে উপদেশ দেন।

সুভাষ-সংবর্দ্ধনা

অসহযোগ আন্দোলনে অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র বসু কারামুক্ত হইলে গত ২৫শে শ্রাবণ তাঁহার "গুণমুগ্ধ সহকর্ম্মিগণ" তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিয়া নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন—

বন্ধুবর!

যে বিধি অবিধি, তাহা প্রশংসনীয় ধৈর্য্যের সহিত অমান্য করিয়া তুমি কারাবরণ করিয়াছিলে। সম্প্রতি কারামুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তার সহিত পুনরায় দেশমাতৃকার সেবায় অগ্রসর হইয়াছ—ইহাতে আমরা আশান্বিত হৃদয়ে তোমাকে আমাদের সপ্রেম অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, উচ্চ রাজপদের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া তুমি দেশের এবং দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছ। সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিলাস-বৈভবের মোহ এড়াইয়া দেশসেবার বন্ধুর ও দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছ। দেশের পরম কল্যাণের জন্য যাঁহারা চরম দুঃখভোগ করিয়াও সঙ্কল্পে অটল রহিয়াছেন, তুমি সেই সব বরেণ্য

দেশসেবকগণের অন্যতম। তোমার পবিত্র চরিত্রাদর্শ দেশের অনেক যুবককে ধ্বংস ও অধঃপতনের মসৃণ পথ হইতে ফিরাইয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার প্রেরণা দিয়াছে, দেশের এই দুর্দ্দিনে তোমার মত স্থির, ধীর, উদার কর্ম্মীকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিতেছি।

শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র বসু।

তুমি আমাদের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দেশের যুবকগণকে পুনরায় শ্রেয়ঃ ও সত্যের পথে আহ্বান কর। তুমি সত্যাগ্রহী—সত্যের অমোঘ গতি কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না—এ জলন্ত বিশ্বাস তোমার আছে, সেই বিশ্বাসের আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে অন্ধকারে পথহারা বিপথগামীদিগকে প্রকৃত পথের সন্ধান দাও—তোমার গুণমুগ্ধ ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর ইহাই প্রার্থনা। ইতি

উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের নিরুৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই। এখন আমাদিগের সম্মুখে বিশাল কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে। আমাদিগকে অনেক কায করিতে হইবে:—

(১) বাঙ্গালার সর্ব্বত্র কংগ্রেস কমিটী স্থাপিত করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) সর্ব্বত্র খদ্দর প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) সমাজ-সেবা করিতে হইবে। শ্রমিকদিগকে শিক্ষাদান, পীড়িতের চিকিৎসা, এ সব কাযের ভার দেশের লোককে গ্রহণ করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছেন, আমাদিগকে অবিচারিত-চিত্তে কংগ্রেস-কমিটীর নির্দ্ধারণ মানিয়া লইতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটী আমাদিগকে আমাদের মনের মত আদেশ না করিলে আমরা তাহা মানিব না। উহা ঠিক নহে। সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অন্ধভাবে অধ্যক্ষের আদেশ পালন করে, এখন সেই ভাবে কংগ্রেসের আদেশ পালন করাই দেশের লোকের কর্ত্তব্য।

—

খদ্দর-মেলা

গত ১লা ভাদ্র কলিকাতায় স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের ভবনে একটি খদ্দর-মেলা বসিয়াছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সে মেলার উদ্বোধন করেন।

আচার্য্য রায় মহাশয় দেশের লোককে খদ্দর ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন। খদ্দর মোটা ও তাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া খদ্দর পরিধানে বিমুখ হইলে চলিবে না। আমাদের এই দরিদ্র দেশেও লোক রঙ্গালয়ে, বায়স্কোপ দেখিয়া, মূল্যবান্ জুতা পরিধান করিয়া অর্থব্যয় করেন; যাঁহারা খদ্দর পরিধান করেন, তাঁহারা এই সব বিলাস অনেকটা বর্জ্জন করেন। একজোড়া খদ্দর কিনিতে যদি এক বা দেড় টাকা অধিক পড়ে, তবে তাহার ফলে বিলাসিতা ত্যাগ করিলে বৎসরে ২০।২৫ টাকা লাভ হয়।

স্বগ্রামে চরকাচালনরতা মহিলাদিগের মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।

কেবল তাহাই নহে, মহিলারা যদি খদ্দর ব্যবহার করেন, তবে সায়া, সেমিজ, জ্যাকেট প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমিতে পারে। দরিদ্র দেশে যে কোনরূপে ব্যয়-সঙ্কোচ করায় আমাদের বিশেষ লাভ।

তাহার পর দেশের লোক যদি যে যাহার ঘরে চরকায় সূতা কাটিয়া সেই সূতায় কাপড় বুনাইয়া লইতে পারেন, তবে অতি সামান্য ব্যয়েই বস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে এবং বস্ত্রবিষয়ে ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে স্বাবলম্বী হইতে পারে। দুর্গোৎসবের আর বিলম্ব নাই—এই সময় বাঙ্গালীকে তাহার পরমুখাপেক্ষিতার অভিশাপমুক্ত করিবার জন্য এই যে আয়োজন, ইহা যেমন সময়োপযোগী, তেমনই প্রয়োজনীয়। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী এবার পূজার সময় বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিয়া দেশের নিকট অপরাধী হইবে না—আপনার আত্ম-সম্মান পদদলিত করিবে না।

মৌলবী মীরাজুদ্দীন

মৌলবী মীরাজুদ্দীনের মত উৎসাহশীল বাঙ্গালী অধিক নাই। গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বি, এস সি, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এম, এ পড়িতে পড়িতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাভায় গমন করেন। তথায় তিনি চিনি প্রস্তুত করিবার কারখানায় কায শিখিয়া পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

স্বদেশে তাঁহার লব্ধ অভিজ্ঞতা চিনির কারখানায় প্রযুক্ত হইয়া সুফল উৎপন্ন করিবে, এমন আশা করিতে পারি কি?

মৌলবী মীরাজুদ্দীন।

লর্ড নর্থক্লিফ

গত ১৪ই আগষ্ট লর্ড নর্থক্লিফের মৃত্যুতে বিলাতের সংবাদপত্র-সেবকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির তিরোভাব হইয়াছে। তাঁহাকে কেহ কেহ "সংবাদপত্রের নেপোলিয়ন" বলিতেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ব্যারিষ্টার ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি দুই ভ্রাতার সহযোগে 'আন্সার্স' পত্র প্রকাশ করেন। তাহার পর ১৮৯৬খৃষ্টাব্দে তিনি যখন'ডেলী-মেল' প্রকাশ করেন, তখন

লর্ড নর্থক্লিফ।

হইতে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত হয়। বিলাতে ইহাই প্রথম দুই পয়সার কাগজ। এই কাগজের সাফল্যলাভের জন্য তিনি বিমানবিহারে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি বহু পত্রের কর্তৃত্ব লাভ করেন—সে সকলের মধ্যে 'টাইমস' সর্ব্বপ্রধান।

যুদ্ধের সময় তিনি বৃটেনের পক্ষে শত্রুদেশে প্রচার কার্য্যের নেতৃত্ব লাভ করেন এবং সেই সময় তাঁহার 'At the War' পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক পাঠ করিলেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বুঝিতে পারা যায়। তিনি সাম্রাজ্য-মদগর্ব্বে, শ্বেতাঙ্গাতিরিক্ত জাতিসমূহকে ঘৃণা করিতেন—বিজিত জাতিরা তাঁহার মতে সম্মানলাভ করিবার উপযুক্ত নহে। পুস্তকে তিনি নানা দেশের কথা—যুদ্ধে সে সব দেশ ইংলণ্ডকে যে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু ভারতবাসীর ত্যাগের কোন কথা বলেন নাই। সমগ্র পুস্তকে তিনি ৩ স্থানে ভারতবর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। এক স্থানে বলা হইয়াছে—"ভারতের ধূলা খাকি-বর্ণের ময়দার মত।" আর এক স্থানে জার্ম্মাণীতে বন্দীদিগের মধ্যে ভারতবাসীর উল্লেখ আছে। তৃতীয় স্থানে তিনি হাঁসপাতালে দাতৃগণের মধ্যে ভারতবাসীর নাম করিয়াছেন। শেষে তিনি মৃত্যুর

অল্পদিন পূর্ব্বে ভূপর্য্যটন ব্যপদেশে যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন—তখন—তাঁহারই প্ররোচনায়—মহাত্মা গন্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জাপানের সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা ভাল ছিল না।

যুদ্ধের সময় তাঁহারই চেষ্টায় লয়েড জর্জ্জের সাফল্যলাভ। তিনি নানা পত্রে মিষ্টার অ্যাস্‌কুইথকে নিন্দা করিয়া তাঁহার প্রতি বৃটিশ জনসাধারণকে বিমুখ করেন। সে সব নিন্দাই যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, হয় ত তাহাও নহে। কিন্তু সংবাদপত্রের ব্যবসাদারীতে লর্ড নর্থক্লিফ অদ্বিতীয় ছিলেন। কাযেই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। যুদ্ধের পর তিনি লয়েড জর্জ্জের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাঁহাকে তিনিই প্রাধান্য দান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রাধান্যচ্যুত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আয়র্লণ্ডের অন্তর্বিপ্লব

আয়ার্লণ্ডের অন্তর্বিপ্লবের প্রকৃত অবস্থা আমরা অবগত হইতে পারিতেছি না। আইরিশ নেতা ডি ভেলেরা আয়ার্লণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব সহযোগীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই মত অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে ইংলণ্ড যাহা দিতেছে, তাহাই লইয়া—সেই ভিত্তির উপর ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করা ভাল। গ্রিফিথ ও কলিন্স শেষোক্ত দলের লোক ছিলেন। যখন আয়ার্লণ্ডের অন্তর্বিপ্লব সমগ্র দেশকে রক্তরঞ্জিত করিতেছে, সেই সময় উভয়ের অতর্কিত তিরোভাবে ভবিষ্যতে আয়ার্লণ্ডের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। গ্রিফিথ হৃদ্‌রোগে ও কলিন্স আততায়ীর হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। গ্রিফিথ যে দলের মস্তিষ্ক ও কলিন্স যে দলের শক্তি ছিলেন, সে দল যে উভয়ের তিরোভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহাও বলা বাহুল্য।

সত্য বটে, কনোলী লিখিয়াছেন, আইরিশ ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, যাঁহারা বহুদিন দেশ-প্রেমিক বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজসরকারের গুপ্তপ্রভাবে বশীভূত হইয়া মুক্তির গতি সংযত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু যতদিন গ্রিফিথ বা কলিন্সের সম্বন্ধে তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া না যাইবে, ততদিন বলিতেই হইবে, তাঁহাদের সহিত যাঁহাদের মতভেদ আছে, তাঁহাদের পক্ষেও এই দুই জনের আন্তরিক স্বদেশ-প্রেমে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

আইরিশ নেতা পার্ণেলের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিরা যেমন মডারেট মনে করিতেন—তাঁহাদিগকে তেমনই গ্রিফিথ কলিন্সের দল মডারেট মনে করিতেন। আবার ডি ভেলেরা প্রভৃতি—যাঁহারা মনে করেন, স্বাধীনতায় যখন জাতিমাত্রেরই জন্মগত অধিকার, তখন আয়ার্লণ্ড আংশিক স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট থাকিবে না—গ্রিফিথ কলিন্স প্রভৃতিকে মডারেট মনে করিয়াছেন।

গ্রিফিথ ইংলণ্ডের সহিত আয়ার্লণ্ডের সন্ধির সর্ত্ত পালনে সম্মত ছিলেন এবং মনে করিতেন, আইরিশদিগের পক্ষে সে সর্ত্তে স্বীকৃত হওয়াই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছিলেন—আমি এ সর্ত্ত পালন করিব—আর সকলেরও তাহাই করা কর্ত্তব্য—By that Treaty I am going to stand, and every man who has a scrap of honour in going to stand by it.

মৃত্যুকালে কলিন্সের বয়স প্রায় ৩১ বৎসর ছিল।

এ দিকে মার্কিণে আইরিশ মুক্তিকামীদিগের যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে, যাহাতে তাহা ডি ভেলেরার দল পাইতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহা হইলে, অর্থাভাবে তাঁহারা পরাভূত হইবেন।

তবে ডি ভেলেরার দল পরাভূত হইলেই আয়ার্লণ্ডে শান্তি স্থাপিত হইবে কি না, সন্দেহ। কারণ, আইরিশ চেষ্টা তখন অন্য পথে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা।

আয়ার্লণ্ডের এই অবস্থার সহিত ভারতের অবস্থার তুলনা করিলে আমরা মহাত্মা গন্ধী-প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিব। মহাত্মা গন্ধী ভারতবর্ষের মুক্তিলাভ প্রচেষ্টাকে কোনরূপ অনাচারে কলুষিত হইতে দিতে অসম্মত; তিনি রক্তরঞ্জিত পথে মুক্তিলাভ চেষ্টার বিরোধী। যে প্রথা ভারতবাসীর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এবং বিদেশের আদর্শে এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—তিনি সে প্রথা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের পরিচিত পুরাতন পথে অগ্রসর হইতে চাহেন। সে পথে মুক্তিলাভ চেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ নাই।

আয়ার্লণ্ডের অবস্থার সহিত ভারতবর্ষের অবস্থার যে নানা

বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া রক্তপাতে দেশ কলঙ্কিত করিয়া আয়ার্লণ্ডও অদ্যাপি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। কাযেই সে পথ সুগম নহে। মিশরের জন-নায়ক জগলুল পাশাও সেই জন্য বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে মহাত্মা গন্ধী যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, মুক্তিকামী মিশরবাসীদিগের পক্ষেও সেই পথ অবলম্বন করা সঙ্গত।

কলিকাতায় তদন্ত সমিতি

কংগ্রেসের আইন-ভঙ্গ তদন্ত সমিতির সদস্যরা কলিকাতায় আসিলে অধিবাসীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধিত করা হয়। মির্জাপুর পার্কে বিরাট জনসঙ্ঘ তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার প্রমুখ মহিলারা লাজবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবার পরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি খদ্দরে মুদ্রিত নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন—

শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ!

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণের অধিকাংশ কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এক অনিশ্চিত আশঙ্কার কৃষ্ণ-ছায়াতলে দাঁড়াইয়া ৩৩ কোটি হিন্দু-মুসলমান গভীর দুঃখ নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে। জাতীয়-জীবনের এই দুর্য্যোগময় অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন নিশীথে আপনারা ভারতবর্ষের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন। এই পরাধীন জাতিকে স্বরাজের পথে পরিচালিত করিবার সুমহান্ সঙ্কল্প লইয়া, উদ্ধত আমলাতন্ত্রের রোষ-রক্তিম-বক্র-কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া আপনারা নগরে নগরে গিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতেছেন এবং তদুপলক্ষে কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিয়াছেন। এতগুলি দেশ-নেতার পুণ্যদর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়া, কলিকাতা সহরের অসহযোগী এবং অসহযোগ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিসম্পন্ন অধিবাসিবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা সসম্ভ্রমে কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছি।

অপমান ও অত্যাচারের অবসানকল্পে ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজ লাভের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক বিঘ্ন-বহুল দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য শ্রদ্ধেয় নেতৃগণের অদর্শন-কালে আপনাদেরই স্কন্ধে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব অর্পিত। আমরা ভরসা করি, আপনারা সংযত শৌর্য্যে ও নির্ভীক ধৈর্য্যে জাতীয়-জীবনকে প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালনা করিবেন। আপনারা তথা-কথিত পদগৌরবের প্রলোভন পদদলিত করিয়া, প্রভূত স্বার্থত্যাগ করিয়া, নিশ্চিত ও অনিশ্চিত প্রচুর দুঃখ বরণ করিয়া প্রশান্ত দৃঢ়তায় এই হতভাগ্য জাতির নেতৃরূপে এক দুরূহ উদ্যমের মধ্য দিয়া মহিমান্বিত ভবিষ্যৎ ভারত-বর্ষ গঠন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। যেখানে চেষ্টা সাধু ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ভগবান্ সাফল্য বর্ষণ করিবেনই; বর্ত্তমানের ক্ষণস্থায়ী ব্যর্থতা,

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার ও শ্রীমতী হেমপ্রভা।

পরাজয়, গ্লানির বেদনা, অদূর ভবিষ্যতের সিদ্ধিকে অধিকতর জয়গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আপনাদের ত্যাগ ও দুঃখভোগ সার্থক হউক, আপনাদের সাধনা সিদ্ধ হউক—আমরা আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধন্য হই।

কলিকাতা
২৮শে শ্রাবণ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

ভবদীয় গুণমুগ্ধ—
কলিকাতাবাসিগণ।

অভিনন্দিত নেতৃবৃন্দের পক্ষে প্রথমে হাকিম আজমল খাঁ সাহেব বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, বিলাতে প্রধান মন্ত্রী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার পর মডারেটরা কি কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিবেন না? তাঁহারা পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিলেই লয়েড জর্জ্জের কথার উপযুক্ত উত্তর দেওয়া হয়। স্বরাজ কাহারও দয়ায় লাভ করা যায় না—স্বরাজলাভ মানুষের নিজের চেষ্টার ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

হাকিম আজমল খাঁ।

তাহার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু বলেন, কোন ব্যক্তি বা কোন প্রদেশ যদি কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত কার্য্য-পদ্ধতি পরিহার করিতে চাহেন, তাহাতেও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তরণী যখন বন্দরের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে যদি জলমধ্যস্থ শৈল বা আবর্ত্তাদি অতিক্রম করিবার জন্য নোঙ্গর করিতে হয় বা একটু ঘুরিয়া যাইতে হয়, তাহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। উদ্দেশ্য সকলেরই এক। এই যে মহারাষ্ট্রে কেলকার মহাশয় আজ কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতির সমর্থন করিতেছেন না, তিনি ত এমন কথা বলেন না যে, তিনি অসহযোগনীতির বিরোধী। পথ যদি ভিন্ন হয়, তাহাতে আপত্তি কি? বর্ত্তমানে কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে গঠন-কার্য্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। সকল যুদ্ধেই জয়পরাজয় আছে। যে জার্ম্মাণী যুদ্ধের আরম্ভেই প্যারীর দ্বারে আসিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছিল, শেষে সেই জার্ম্মাণীকেই পরাভূত হইতে হইয়াছিল। যদি কোন কোন পথে আমরা পরাভূত হই, তাহাতে নিরাশ হইব কেন? আমাদিগকে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে; হয় ত আরব্ধ কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তনও করিতে হইবে। তবে আমরা যেন উদ্দেশ্য ত্যাগ না করি।
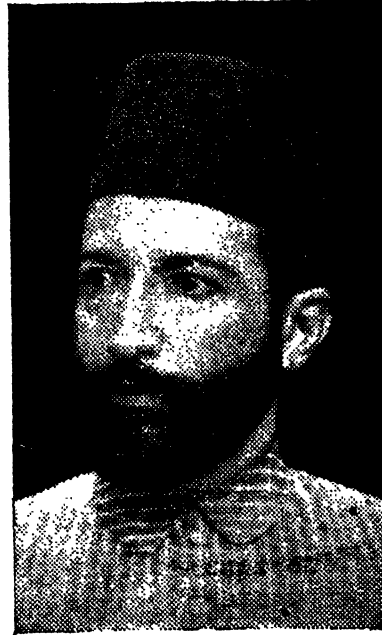
ইহার পর মিষ্টার পেটেল বলেন, মডারেটরা জাগিয়া ঘুমান, তাঁহারা যে লয়েড জর্জ্জের বক্তৃতায় বিচলিত হইবেন, এমন আশা করা যায় না। বর্ত্তমানে জাতীয় দলকে যেমন ব্যুরোক্রেশীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তেমনই মডারেটদিগের বিরোধ সহ্য করিতে হইবে।

কংগ্রেসের কার্য্য-পদ্ধতিতে কোন পরিবর্ত্তন হইবে কি না, তাহা তদন্ত-সমিতির নির্দ্ধারণের উপর নির্ভর করিবে। যত দিন কোন পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত না হয়, তত দিন জাতীয় দলের পক্ষে কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্য-পদ্ধতিরই অনুসরণ করিতে হইবে।

যত দিন দেশ সর্ব্বতোভাবে আইন ভাঙ্গিবার যোগ্যতা অর্জ্জন না করে, তত দিন আইন ভাঙ্গিলে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য হইবে—তত দিন আইন ভাঙ্গা সঙ্গত হইবে না। কংগ্রেসে বর্ত্তমানে যে কার্য্য-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেও নানা কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় যদি ভবিষ্যতে তাহার পরিবর্ত্তনই প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহাই করিতে হইবে।

মিলন-রাত্রি।

দশম পরিচ্ছেদ

শরৎকুমার একখানা ছোট চৌকি টানিয়া লইয়া তাঁহাদের কাছাকাছি আসিয়া বসিলেন। রাজা সাদর আগ্রহে বলিলেন—"আর, একটু এগিয়ে বোসো ডাক্তার, আরো কাছে,—আর একটু—"

শরৎকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতের টানা হ্যাঁচড়ে চৌকিখানা অনতিবিলম্বে রাজার মনোমত স্থানে আনিয়া ফেলিয়া তদুপরি শিকড় গাড়িয়া যখন বসিলেন—তখন রাজা হাস্য-অনুমোদনবাক্যে কহিলেন—"এখন ঠিক হয়েছে, এইবার কথা কবার বেশ সুবিধা হবে।"

অতুলেশ্বরের এই সহজ আদর-আপ্যায়ন ও সন্তুষ্টিভাবের মধ্যে শ্যামাচরণ, ভাগিনেয়ের প্রতি তাঁহার অসামান্য স্নেহ-গভীরতা উপলব্ধি করিয়া বেশ একটু আনন্দলাভ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল মনে মনে সঙ্গোপনে এ আনন্দ উপভোগ করিবার পর খোসমেজাজে কহিলেন—"শরৎকে যে আদেশ দিতে হবে দিন, রাজাবাহাদুর, আমি একবার দেওয়ানের সঙ্গে কথা ক'য়ে আসি।"

শ্যামাচরণ চলিয়া গেলে রাজা শরৎকুমারকে কহিলেন—"প্রসাদপুরের চৌর্য্যকাণ্ডের কথা অবশ্য শুনেছ ডাক্তার?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"সন্তোষকে কি তুমি চেন?"

"চিনি একরকম, আপনার ওখানেই দুচারবার দেখাশুনা হয়েছে।"

"লোকটা কি রকম ব'লে মনে হয়?"

"এক জন ভক্ত দেশসেবক। তাঁদের কার্য্যশক্তিই এ ভারতে সত্য, বাদবাকী সর্ব্বৈব মিথ্যা—এই তার মনোগত ভাব ও বিশ্বাস।"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন—"এ চুরিতে লিপ্ত থাকা তার পক্ষে সম্ভব ব'লে কি মনে কর তুমি? অনেকেই তাকে সন্দেহ করছে।"

"অসম্ভব নয়।"

"উদ্দেশ্য?"

"আমাদের সকলেরি যা—দেশোদ্ধার।"

রাজা তাঁহার মনের ব্যথা আর প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না,—ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আবেগ স্বরে প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেশোদ্ধার—অর্থাৎ দু' চারটে ইংরাজ খুন! তা'তে কি কখনো দেশোদ্ধার হ'তে পারে? এ সঙ্কল্প যে পাগলের আগুন-খেলা।"

"ক্ষুদ্র আগুনও ত জ্বলে উঠে দাবানল সৃষ্টি করতে পারে?"

কিন্তু বাঘ-ভালুক ধরা পড়্‌বার আগেই কোটালে বানে সে আগুন নিবিয়ে দেবে। মর্‌তে মর্‌বে যত ক্ষুদ্রপ্রাণ কীট-পতঙ্গ, পাখীপাখালি। ক্ষতি তাতে আমাদেরই ভারতবনের সুন্দর জীবগুলিরই তাতে উচ্ছেদসাধন হবে।"

"লাভ-লোকসানের তৌলদণ্ড হাতে নিয়ে ব'সে এ পর্য্যন্ত কেহ কখনো কোন মহৎ কায কর্‌তে পারেনি।"

"তা ঠিক! কিন্তু বিনা সাধনাতেও এ পর্য্যন্ত কোন মহৎ কায সিদ্ধ হয়নি।"

"আপনি আরামবাসে ব'সে বাইরের অত্যাচার অপমান তেমন ক'রে দেখতে পান না, তেমন ক'রে অনুভব করেন না, আপনার দেশানুরাগ কবির আরাম কল্পনামাত্র, কিন্তু যাদের মনুষ্যত্ব অহরহঃ নখাঘাতে পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত—তাদের জ্বালা যে অসহ্য। শুভ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করতে হ'লে তারা ত আর মানুষ থাকবে না।"

রাজা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "ডাক্তার, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ! রাজপুরুষের অত্যাচারে তোমাদের চেয়ে আমি কম মর্ম্মপীড়িত নই! আমিও এক সময় ঐ রকম মোরিয়া হ'তে হ'তে র'য়ে গেছি। তার পর ভগবৎপ্রসাদে বুঝেছি—ওরূপ অত্যাচারে আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারব না।"

"আমিও তাই মনে করি। তবুও অল্পপক্ষের মত উপেক্ষায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাদের সঙ্গে তর্কে-বিতর্কে আমার বাঁধা বিশ্বাসও সংশয়-দোলায় দুল্‌তে থাকে। আপনারা 'মোরিয়া' হয়ে যেখানে থেমে গেছেন, সেই পদাঙ্ক অনুসরণে নবসৈনিকদল যারা চলেছে, তারা থামতে চায় না; কালের এ মাহাত্ম্য! কর্জ্জন আইনকৃত সমগ্রদেশের প্রতি অপমান কি সহজে ভোলা যায়? প্রসাদপুরের কন্‌ফারেন্স দিনের অযথা পীড়ন কথাটাই একবার ভাবুন দেখি? তাতে কি মানুষ ঠাণ্ডা থাক্‌তে পারে? রাজপুরুষরা আমাদের আশা অধিকার যদি একটুও মেনে চল্‌তেন,—অন্ততঃ মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্ত্তব্য,—সেই শিষ্টাচারটুকুও যদি আমাদের দিতেন—তা'হলে কি এ বিদ্রোহের ভাব কারো মনে জাগে? আমাদের জিনিষ তাঁরা আমাদের যতটুকু দেন—তাও এমন অবজ্ঞাভরে যে, উচ্ছিষ্ট গ্রহণের মত তাতে প্রাণমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।"

এ কথার সত্যতা বুঝিয়া রাজা নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শরৎকুমার উত্তেজিতভাবে আবার বলিলেন—"আপনাদের মত গুরু না পেলে আমিও যে ঐ দলে ঢুকে পড়্‌তুম—তাতে সন্দেহমাত্র নেই। constitutional agitation! হায় রে! অর্থাৎ হাত পেতে ধাত বুঝে চেঁচান। কিন্তু যে জাতের কুলগৌরব রক্ষা হয় দুর্ব্বলের পিলে ফাটিয়ে, আঁতে ঘা না দিয়ে তাদের নীরব করা যায় কিরূপে বলুন ত? এ কথার সদুত্তর কি?"

"তেজস্বী মনের তর্জ্জনী ইঙ্গিতেও দুর্ব্বল শাসিত হয়। আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মনের অধীনতা যদি কখনো ঘোচাতে পারা যায়, তবেই আমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবের সহজ এবং স্থায়ী তেজ সঞ্চারিত হবে।"

"কিন্তু তেজঃসঞ্চার কি যুগান্তর-প্রদর্শিত উপায়ে হচ্ছে না? এখন কি ট্রাম গাড়ীতে বা ট্রেণে শাদামানুষ কোনো 'কালা আদমীকে' স্বচ্ছন্দচিত্তে অপমান করতে সাহসী হয়? বাঙ্গালীর কাপুরুষ নাম যে ঘুচেছে, এটা মানেন ত?"

"মানি, ডাক্তার, মানি। কিন্তু যুগান্তরের উত্তেজনাই যে তার মূলীভূত বা একমাত্র কারণ—তাও বল্‌তে পারিনে। যুগান্তর প্রকাশের বহুপূর্ব্বে থেকেই—অন্ততঃ বাঙ্গালীর অসাড়প্রাণে অপমান আঘাতে বেদনার সাড়া জেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারচেষ্টাও সুরু হয়েছে; তার পর—"

"তার পর যুগান্তরের প্রলয়ভেরী বাজিয়ে যুগান্তর এসে দেখা দিয়েছেন। আপনি কি বলেন,—এ কুম্ভকর্ণ জাতের ঘুমের ঘোর ভাঙ্গাতে এরূপ ভেরী-নিনাদের প্রয়োজন ছিল না?"

"যুগান্তরের কার্য্যকলাপের সঙ্গে আমার মতবিরোধ যতই থাক—যুগান্তরের উদ্দীপনা যে নিষ্ফল হয়েছে, এ কথা ত বল্‌তে পারিনে। যুগান্তর যে দেশের প্রাণের ভিতর প্রবল একটা আশা উৎসাহের স্রোত বইয়ে দিয়েছে এও অস্বীকার করিনে। যুগান্তরের ডাকে শত শত ছেলে প্রাণের মায়া ছেড়ে—মায়ের আঙিনাতলে এসে দাঁড়িয়েছে। এই মহা শিক্ষায় গুরু-শিষ্য উভয়েই ধন্য। কিন্তু যখন দেখি, এই মাতৃপূজাযজ্ঞে নরবলি অনুষ্ঠানের জয়োল্লাস প'ড়ে গেছে, তখনই সব আনন্দ নিরানন্দে ঢেকে যায়। যুগান্তর-কল্পিত উপায় যে দেশকে ব্যাপক এবং স্থায়িভাবে স্বাধীন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবে, এ কথা আমার মন স্বীকার করে না।"

"কিন্তু আপনার মত সাত্ত্বিক গুরুর উপদেশ লাঞ্ছিত তান্ত্রিকশিষ্যগণ গ্রহণ করবে না ত! কাপালিক গুরুর প্রতি তারা নিষ্ঠাবান্। দীর্ঘ সাধনায় বিশ্বাসহীন—অপমান অসহিষ্ণু তারা চায়—আশুফল;—রাতারাতি দেশের শৃঙ্খলমোচনে তারা বদ্ধপরিকর;—তাদের আপ্তবাক্য হচ্ছে Now or never, এই উৎসাহভরা মনে ব্যর্থতার সন্দেহ বা মৃত্যুর বিভীষিকা নেই। নিজেদের ভগবৎপ্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানেই জয়োল্লাসে তারা উন্মত্ত।"

রাজা অতি দুঃখে একটু হাসিলেন—তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি এরূপ খুন জখমই ভগবানের অভিপ্রেত হোত, তা'হলে কি ট্রেণ-বম্ নিষ্ফল হয়, না মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড নিরীহ স্ত্রীহত্যাতেই শেষ হয়? আচ্ছা, একটু ভেবে দেখ দেখি—এই যে তোমাদের ইংরাজ-বিদ্বেষ—যার দরুণ তোমরা পরশুরাম-ব্রত গ্রহণ করেছ, তারই বা মূলে কতটা উগ্র হেতু আছে? ইংরাজ রামরাজা না হোক্—রাক্ষস রাজাও নয়, স্বাধীন ইয়োরোপেরও অনেক রাজার চেয়ে তাঁরা ভাল, স্বার্থদ্বন্দ্বে তারা সুবিচারী না হলেও, নিজের সুবিধায় বে-আইনী আইন চালালেও তবু তাদের আইনকানুনের একটা ব্যবস্থা আছে, প্রজামঙ্গলে তারা প্রকৃত প্রস্তাবে উদাসীন নয়। তা ছাড়া ইংরাজের শিক্ষা-দীক্ষার গুণেই যে আমাদের অন্ধনয়ন ফুটে উঠেছে,—হৃদয়ে নব-আশা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগেছে—তারও ত কোন ভুল নেই। সুতরাং এজন্য তারা আমাদের কাছে যৎকিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতারও দাবী রাখতে পারে না কি? তার পরিবর্ত্তে তোমরা যদি

তাদের উচ্ছেদসাধনে ব্রতী হও—তা'হলে তোমরা পতিত-উদ্ধার করতে যে পারবে না, এটা ধ্রুব নিশ্চয়—মাঝে থেকে তোমরাই সর্ব্বপ্রকারে পতিত হবে।"

বলিয়া রাজা থামিলেন; তাঁহার মূর্ত্তিতে একটি সুগভীর বিষাদ-বেদনা প্রকটিত হইয়া উঠিল। শরৎকুমারও সহানুভূতি-পীড়িত হইয়া সান্ত্বনা-প্রদানের ইচ্ছাতেই যেন উত্তরে কহিলেন —"ইংরাজ-উচ্ছেদসাধন ত বাস্তবিক কারো অভিপ্রায় নয়—আসল অভিপ্রায় ছলে-বলে কৌশলে তাদের শক্তি খর্ব্ব করা। রাজশক্তিকে দমন করতে না পারলে আমাদের দেশকে ত পাব না। আপনারা শাসনে সমাধিকারলাভের জন্য চীৎকার করছেন, রাশি রাশি রেজলিউসন পাশ করছেন, পোকামাকড়ের খাদ্য হওয়া ছাড়া সে সব রেজলিউসনের কি সার্থকতা আছে, বলুন দেখি? এতদিনের পর এখন যে রিফর্ম্মস্কিমের একটা কথা শোনা যাচ্ছে—এ কি শুধু বিদ্রোহিতার ফল নয়?"

রাজা হাসিয়া বলিলেন—"আমরাও যেমন, তোমরাও তেমনি—সবাই সমান বাঁদর কি না—তাই ওদের হাতের কলা দেখে আনন্দে নৃত্য করতে লেগে গেছি। আসল কায রইল প'ড়ে—আর আমরা চীৎকার ক'রে মরছি—আর তোমরা কাটাকাটি ক'রে মরছ—এতে যে কায একেবারে কিছুই হচ্ছে না, তা যদিও বলতে পারিনে, তবে ঠিক পথটা ধরলে কায খুব এগিয়ে যেত। মাণিকতলার সেই মহামতি ছেলেরা—যারা অসি দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়েছিল, তারাও শেষ মুহূর্ত্তে নিজেদের ভুল যে বুঝেছে, তাতে আমার মনে সংশয় নেই। সাহসের বা অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব ছিল না ত তাদের, কিন্তু ধরা পড়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য একটা বন্দুকের আওয়াজ পর্য্যন্ত করেনি তারা। আর নির্দ্দোষীদের রক্ষা করার জন্য মুক্তকণ্ঠে আপনাদের দোষ স্বীকার ক'রে নিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে পুলিসের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝাঁপ দিয়েছে! এইখানেই তাদের মনের খাঁটি মহত্ত্ব; খাঁটি সাত্ত্বিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে—তাদের পূর্ব্বানুষ্ঠিত প্রচণ্ড নীতিকে ক্ষণিকের ভুলভ্রান্তি ব'লে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে।"

"কিন্তু এ ভুল যে দেশের প্রাণের ভুল। সে ভুল যতদিন না ভাঙ্গে, ততদিন এমনিই চলবে। ব্যর্থতার ভয়ে পিছু হঠা কাপুরুষের ধর্ম্ম,—সফলতা এক মুহূর্ত্তে নাও আসতে পারে —একদিন যে সিদ্ধিলাভ হবেই—এই তাদের ধ্রুব বিশ্বাস। মাণিকতলার দল ধরা পড়েছে ব'লে তারা দ'মে যায়নি;—পুলিস দমনেও এ চক্রান্ত বাড়বে বই কমবে বোধ হয় না।"

"তা ঠিক! কিন্তু এখনকার বিপ্লবপন্থী দল—মাথা হারিয়ে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য নিষ্ঠুর কবন্ধ হয়ে উঠেছে। ইংরাজ খুন-জখমের চেষ্টা আপাততঃ ততটা আর শোনা যাচ্ছে না—বোধ হয়, এ কাযটা তাদের পক্ষে তত সহজসাধ্য নয়। স্বদেশী খুন, স্বদেশী ডাকাতীতেই এখন তারা বিদেশী দস্যুদেরও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। হায় হায়! স্বজাতিপীড়নেই স্বরাজলাভের ব্যবস্থা! সত্যই ভারতের মঙ্গলদেবতা ভারত-ভূমি থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।"

শরৎকুমার এই গম্ভীর প্রসঙ্গে লঘুভাব প্রদান করিয়া কহিলেন—"কিন্তু দেশে ছেলেদের মনে যে কার্য্যোদ্যম-ক্ষুধা জেগে উঠেছে, তার ত একটা খোরাক চাই। যদি সৈনিক-পদ তাদের জন্য খোলা থাকত, তা হ'লে এ ক্ষুধার জ্বালাটা থেমে যেতে পারত। কিন্তু আপনারা এতদিন বক্তৃতায় কবিতায় জঠরানল জ্বালিয়ে তুলে অন্ন দেবার বেলা এখন বলছেন,—যা বাছারা চরে গিয়ে খা, অথচ যেই তারা চরে খেতে আরম্ভ করেছে—অমনি কাঁদুনী গাচ্ছেন—হায় হায়! গোল্লায় গেলি বাছাধনরা! বেচারারা কি করে বলুন ত?"

রাজাও একটু হাসিয়া বলিলেন,—"কিন্তু বেচারাদের সত্যই যদি উদ্দেশ্য হয় দেশোদ্ধার করা—তা হ'লে গোল্লায় গেলে ত চলবে না। মেরে ধরে ইংরাজকেও তাড়ান যাবে না—দেশ-বাসীকেও স্বাধীনতার কলমা পড়ান চলবে না। দেশ-মাতাকে ভালবাসতে শিখলেই তার স্বার্থপর সন্তানগণও তাঁর মঙ্গলে নিজের মঙ্গল জ্ঞান ক'রে স্বার্থত্যাগী হ'তে শিখবে। কিন্তু দেশসেবকদের এরূপ নিষ্ঠুর আচরণে স্বাধীনতার প্রতি জন-সাধারণের অনুরাগ বাড়ছে, না বিরাগ জন্মাচ্ছে,—এতে দেশ-মাতার শৃঙ্খলমোচন হচ্ছে না বিশৃঙ্খলা বাড়ছে, সেইটে বল দেখি? ইংরাজ প্রজাপীড়ন করে, এই অজুহাতে তোমরা তাদের দণ্ডনীয় জ্ঞান কর অথচ ভারতবাসীর খাঁটি যে মহত্ত্ব,—আদর্শ যে ধর্ম্মনীতি, তাকেই পদদলিত ক'রে বিলাতী করালী-মূর্ত্তি সেজে ভ্রাতৃ-রক্তপানে তোমরা উল্লসিত হয়ে উঠেছ! এই ত দেশ-ভক্তির পরিণাম। দুঃখে, ক্ষোভে, অসহ্য যন্ত্রণায় হৃদয় জ্বলে ওঠে।" বলিয়া রাজা নীরব হইলেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

১১ই শ্রাবণ—

ত্রিপুরায় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র রায় অবৈধ আটকের অভিযোগে গ্রেপ্তার ; কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের বাড়ীতে খানাতল্লাস ; এক জায়গা হইতে একটি হাফ প্যাণ্ট ও কোট পুলিশ লইয়া গিয়াছে। বরিশাল জেলে চার জন অসহযোগী বন্দীর প্রতি বেত্রদণ্ড। গয়া সেণ্ট্রাল জেলে 'মহাত্মার জয়' শব্দে চার জন ওয়ার্ডার বরখাস্ত। তারকেশ্বরের বন্যায় আরামবাগ মহকুমায় জলপ্লাবন, সহস্রাধিক গ্রাম জলমগ্ন ; ইতিপূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে আর দুইবার বান হইয়াছিল। বাঙ্গালোরের পাঁচ জন গোলন্দাজ সৈনিক স্থানীয় হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকানে চুরী করার অভিযোগে অভিযুক্ত। ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে আয়-কর কমিটির অধিবেশন। সিন্ধুর বদিন তালুকে দিন-দুপুরে ঘোড়ায় চড়িয়া সশস্ত্র ডাকাতি ; গ্রামের প্রত্যেক গৃহ খুঁজিয়া লক্ষাধিক টাকা লুণ্ঠন। আইরিশ যুদ্ধে ডি-ভ্যালেরার নেতৃত্ব। আঙ্গোরায় বাগদাদ-বিখ্যাত সেনাপতি জেনারেল টাউনশেণ্ড ; উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত ভাবে তুরস্কে শান্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

১২ই শ্রাবণ—

দিল্লীর অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লিঙ্কনের বিচারে রাজদ্রোহের অভিযোগে "কংগ্রেস" সম্পাদক মৌলানা কুতবুদ্দীন সিদ্দিকীর তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। সার্ভেণ্টের মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ ঘোষ বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের সম্মুখে অবৈধ জনতা করার এবং কলেজের মধ্যে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার। কলিকাতা পুলিসের অস্থায়ী ইনস্পেক্টার প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জোড়াবাগান থানায় হাজত আসামীর প্রতি প্রহারের অভিযোগে মামলা। সিন্ধুর দিগরিয়া তালুকে ডাকাত দল কর্ত্তৃক থানা, আদালত, দোকান-পাট, ঘর-বাড়ী লুট ; ১০ জন লোক খুন, তন্মধ্যে কয়জন কনেষ্টবল ; লক্ষাধিক টাকা লুণ্ঠিত। আইরিশ বিদ্রোহী সেনা কর্ত্তৃক ক্লিফডেনে বে-তার টেলিগ্রাফ-ষ্টেশন ধ্বংস ; যুদ্ধের জন্য আইরিশ পারলামেণ্টের অধিবেশন আবার স্থগিত। রুসিয়ার সঙ্গে বৃটিশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা ; ঋণ-শোধ সম্বন্ধে বলশেভিক কর্ত্তৃপক্ষের ভরসা পাইলেই হয়। গ্রীসের কনস্তান্তিনোপল আক্রমণের ভয়-প্রদর্শন। আফগান সীমান্তে বলশেভিক লাল-পল্টন আগমনের সংবাদ।

১৩ই শ্রাবণ—

জেলে মৌলানা মহম্মদ আলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, ইংরেজীতে কথা কহিবার ব্যবস্থা হওয়ায় আলি-জননী, বেগম মহম্মদ আলি বা বাড়ীর ছেলেরা—কেহই মৌলানাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীহট্টে অস্ত্র আইনের অদ্ভুত ব্যবহার ; কোচ, কাটারী, এমন কি, লাঠী পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হওয়ার সংবাদ। "পেলারামের স্বদেশিতা" নামক নাটকের অভিনয়ে বাঙ্গালা সরকারের বাধা। লক্ষ্ণৌ জেলায় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত অভিনয় করা নিষিদ্ধ। কলিকাতায় শিল্ড প্রতিযোগিতায় ড্যালহাউসীর এক গোলে হার, ক্যালকাটার শিল্ড লাভ। হিন্দু বিধবা ও অন্যান্য মহিলাদের অর্থকরী ও সাধারণ বিদ্যা-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত ৯৪এ সুকীয়া ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের কার্য্যারম্ভ। এরোপ্লেনে করিয়া আফগান আমীরের সীমান্ত পরিদর্শন ; ওয়াজিরিস্থানে আতিথ্য, এরোপ্লেন-বহর সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন ; এরোপ্লেনগুলি আফগানিস্থানেই তৈয়ারী ; সংবাদ ইরাক ঘুরিয়া ভারতে আসিয়াছে।

১৪ই শ্রাবণ—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ম্মী শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ রায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে গৌহাটী যাইয়া গোয়েন্দা-হস্তে গ্রেপ্তার। পঞ্জাবে পিউনিটিভ পুলিসের বাড়াবাড়ি, চৌদ্দটি জেলার সত্তর আশী থানা গ্রামে নানা রকমের পুলিস বসিয়াছে। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী উত্তরে প্রকাশ—কারাগারে মহাত্মা গন্ধীকে সংবাদপত্র পড়িতে দেওয়া হইতেছে না—নির্দ্ধারণ কারা কমিশনের ; সভায় মহাত্মার স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কতকগুলি প্রশ্ন অশিষ্ট সাব্যস্ত ; অত্যাচারবর্জ্জিত রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর কয়েদীদের মত ব্যবহার করার প্রস্তাবে সরকার পক্ষের পরাজয়। সুনামগঞ্জে দরবার সভায় আসাম লাটের বক্তৃতার সময় "লাউডার প্লীজ" বলায় জনৈক দরবারীর কৈফিয়ৎ তলব, ভবিষ্যতে দরবারের নিমন্ত্রণ-বন্ধের ভয়-প্রদর্শন। বিলাতে প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল অধ্যাপক টনির লোকান্তর। জাপানে মহাত্মার আদর্শের প্রশংসার সংবাদ। মরক্কোর রিফ অঞ্চলে সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কনস্তান্তিনোপল অধিকারে গ্রীসের প্রার্থনা মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত। য়ুরোপীয় তুরস্কের নিরপেক্ষ অঞ্চলে এক দল গ্রীক সেনার প্রবেশ এবং তুর্কী সেনার গোলাবর্ষণে প্রত্যাবর্ত্তন। এসিয়ামাইনরে স্মার্ণা অঞ্চলে গ্রীস কর্ত্তৃক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ঘোষণা।

১৫ই শ্রাবণ—

কালীকটের উকীল শ্রীযুত নারায়ণ মেননের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগ। বরিশালে রমেন্দ্রবাবু ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির গ্রেপ্তারের পর ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রদের কলেজ বয়কট ; কলেজের ফটকে মহিলাদের পিকেটিং। মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকীল সভা কর্ত্তৃক আইন অমান্য তদন্ত কমিটির অভিনন্দন। গণ্টুরে আইন অমান্য তদন্ত কমিটির উদ্দেশে অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত টি, প্রকাশম্ ও অন্যান্য কর্ম্মিগণের প্রতি ১৪৪ ধারা ; তদন্ত কমিটির কেহ গণ্টুর ও তাহার দশ মাইলের মধ্যে ছয় দিনের জন্য সভা করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ও সুরমার প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটির দুই জন করিয়া মহিলা কর্ম্মীকে আহারাদি দিয়া বয়ন-শিল্প শিক্ষা দিবার বিষয়ে শিলচর নারী-শিল্পাশ্রমের প্রস্তাব। টেরিটোরিয়াল সৈন্যদলে ফরিদপুর, কোড়কদীর শ্রীযুত বিমলকান্ত লাহিড়ী এম এ, বি এল্। গৌরীশঙ্কর অভিযানের অবশিষ্ট ভারতীয় ও য়ুরোপীয়দের নিরাপদে কালীম্পঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন। ব্রহ্মে ভীষণ ঝড়ে মার্ত্তাবান ও পেগু সহরের মধ্যে যাত্রিগাড়ী রেল লাইন হইতে খাদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত ; বহু হতাহত। কনস্তান্তিনোপল রক্ষার্থ সহরের অদূরে বৃটিশের ভূমধ্য সাগর বহরের ছয়খানি রণতরীর উপস্থিতি। ইকহলমস্থিত তুর্কী মন্ত্রী কর্ত্তৃক গ্রীক অত্যাচারের বিবরণ—প্রায় এক লক্ষ মুসলমান নারী ও শিশু গ্রীকদের ভয়ে

কনস্তান্তিনোপলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে পল্লী অঞ্চলে অনাচারী গ্রীক সেনা তুর্কী যুবকদিগকে দলে দলে মসজিদের মধ্যে পুরিয়া আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া মারিতেছে, তুর্কী যুবতীগণের উপর তাহাদের আত্মীয়-স্বজনগণের সমক্ষে গ্রীক সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচার—ফলে অনেকে লজ্জায় ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিতেছে, অনেকে পাগল হইয়া যাইতেছে; ওদিকে অর্থের অনটনে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জায়গীর ও অন্যান্য সম্পত্তি গ্রীকদের নিকট বিক্রয় হইয়া যাইতেছে; মন্ত্রী মহাশয় ভারতীয় মুসলমানগণকে ঐরূপ সম্পত্তি কিনিবার অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত হইতে লাসা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন বিস্তৃত।

১৬ই শ্রাবণ—

গৌহাটীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের দুই জন কর্ম্মী থানায় হাজত আসামী—তাঁহাদের সহকর্ম্মীকে খাবার দিতে যাইয়া গ্রেপ্তার। রাজসাহী নওগাঁয় "যেবার পতন" অভিনয়ে ১০৭ ধারা জারীর মামলার বিচারে কলিকাতা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক উক্ত চণ্ডনীতির ব্যবস্থা বাতিল। গিরিডী মিউনিসিপ্যালিটীতে চর্ম্মকারের কমিশনারের পদ-লাভ। ডারবানে ষ্টীমার ঘাটে জাতিগত পার্থক্য রক্ষার ব্যবস্থার প্রতিবাদে মহাত্মার পুত্র শ্রীযুত মণিলাল গন্ধী, শ্রীযুত সোরাবজী রুস্তমজী ও শ্রীযুত ইস্মাইল বন্দর আইন অনুসারে পাঁচ পাউণ্ড অর্থদণ্ড বিকল্পে ৭ দিনের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত; প্রথম দুই জন নিষ্ক্রিয় প্রতিকূলতা নীতি অনুসারে কারাবরণ করেন। গ্রীক কর্ত্তৃক স্মার্ণায় স্বায়ত্ত-শাসন ঘোষণায় তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৃটিশ ও ইটালীর নিকট প্রস্তাব। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁহার ঋণ পরিশোধের জন্য বৃটেনকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকায় বৃটেন কর্ত্তৃক অনিচ্ছা সত্ত্বে ফ্রান্স, ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, রুম্যানিয়া ও পর্ত্তুগালের নিকট তাঁহার প্রাপ্য ঋণ আংশিকভাবে শোধের তাগাদা।

১৭ই শ্রাবণ—

গণ্টুরে আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর অভ্যর্থনার আয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট ১৮৬ জন স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় কংগ্রেস সম্পাদক গ্রেপ্তার; কমিটীকে অভ্যর্থনা করিবার মণ্ডপ পুলিশ কর্ত্তৃক অধিকার; অন্য স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে নিষিদ্ধ মিউনিসিপাল অভিনন্দন প্রদান। ফরিদপুরে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে শ্রীযুত ব্রজমোহন ঘোষ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সুকুমারী ঘোষ কর্ত্তৃক স্বীয় কন্যাদের সঙ্গে লইয়া পিকেটিং। হুগলী জেলে স্বপাক আহারের অনুমতি প্রদান না করায়, কলিকাতার পিকেটিংয়ের আসামী এক মারাঠী পণ্ডিতের প্রায়োপবেশন। অম্বালায় পৃথিবী-ভ্রমণকারী বৈমানিক মেজর ব্লেকের বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এড্ভোকেট শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মান্দালয়ে ছোট আদালতের জজ, অতিরিক্ত জেলা-জজ ও অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত; উত্তর-ব্রহ্মে এই প্রথম ভারতবাসীর পক্ষে ব্যবহারাজীবের পদ হইতে বিচারকের পদ-লাভ। মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী কনষ্টেবল কেরামত আলি ও জনৈক গ্রামবাসী রজনী মল্লিক ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় তাহাদের পুরস্কারের জন্য হাজার টাকা মঞ্জুর। শিলাবতীর বন্যায় বাঁকুড়ার শিমলাপাল থানার ভেলাইডিহী পরগণায় ও মেদিনীপুরের কুঁচকাপুর অঞ্চলে ক্ষতি; প্রথমোক্ত স্থানে চৌদ্দখানি গ্রাম বিপর্য্যস্ত, চার পাঁচ জন মানুষ ও বহু গো-মহিষাদি মৃত্যুমুখে পতিত; শেষোক্ত স্থানে শত শত গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে। দ্বারকেশ্বরের বন্যায় বাঁকুড়ায় ওন্দা ও কোতুলপুর থানার বহু গ্রাম বিপন্ন; ইন্দাশ থানার পাঁচ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত; গ্রামগুলিতে বহু গো-মহিষাদি মারা গিয়াছে, বহু আসবাব-পত্র ও মূল্যবান্ সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, মোট ক্ষতি চার লক্ষ হইবে। দ্বারকেশ্বরের বন্যায় বর্দ্ধমানের রায়না ও খণ্ডঘোষ থানার বহু গ্রাম বিপর্য্যস্ত। টেলিফোন, গ্রামোফোন, ফটোফোন যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা ডাঃ আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল লোকান্তরিত হইয়াছেন; বৃটেন তাঁহার জন্ম ও শিক্ষার স্থান, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া বাস করেন; সেইখানেই অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময় তিনি ঐ যন্ত্রগুলির আবিষ্কার করেন। ভারতে সংস্কার ব্যবস্থার জন্য ইংরেজ সিবিলিয়ানদের আশঙ্কায় মিঃ লয়েড জর্জ্জের আশ্বাস; সংস্কার ব্যবস্থা পরীক্ষাধীন; বৃটেন ভারতের দায়িত্ব পরিহার করিবেন না, ভারতবাসীর সাহায্য গ্রহণ সে উদ্দেশ্যে নয়; প্রধান মন্ত্রীর এই শাসন-সংস্কার ব্যবস্থার প্রত্যাহারের কথায় কর্ণেল ওয়েজ উডের প্রতিবাদ। ঋণ পরিশোধ সমস্যায় মার্কিণের উত্তর—বৃটেনের অবস্থা সচ্ছল, রেহাই সম্ভব নহে। মার্কিণের উপরে ফ্রান্সের আশাভঙ্গে জর্ম্মাণীর নিকট নিয়মমত ক্ষতিপূরণ আদি পাইবার জন্য চরমপত্র জারী; দণ্ড-বিধানের ভয়প্রদর্শন। ইটালীতে সোসালিষ্ট ও ফাসিষ্ট সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে শেষোক্ত দলের জয়-লাভ; নূতন মন্ত্রি-সমিতি গঠন; মন্ত্রি-সমিতিতে ঐ দুই দলের কাহাকেও লওয়া হয় নাই। গ্রীক অশ্বারোহী সৈন্যেরা তুর্কীর রাজ্যে প্রবেশ করায় তুর্কী পুলিশের গুলীবর্ষণ, তিন জন হতাহত হইবার পর গ্রীকদের প্রত্যাবর্ত্তন; গ্রীক প্রহরী সৈন্যেরা আর এক স্থান অধিকার করায় ফরাসী সেনা কর্ত্তৃক কৈফিয়ৎ তলব।

১৮ই শ্রাবণ—

কাছাড় জেলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কাপ্তেন শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দেব কর্ত্তৃক গৌহাটী জেলে সাধারণ কয়েদীদের আক্রমণ হইতে জেলারের প্রাণরক্ষার সংবাদ। বরিশালে শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর নেতৃত্বে প্রায় এক শত মহিলার পিকেটিংয়ে যোগদান। বরিশাল জেলের ভিতর জেল আইন অমান্য করায় কতিপয় কয়েদীর প্রতি নূতন করিয়া কারাদণ্ডের সংবাদ। পাটনা হাইকোর্টে ডাল্টনগঞ্জের বিনাপাশে শোভাযাত্রা বাহির করিবার মামলা; আসামীর অব্যাহতি; বিচারপতি শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাশের রায়—বিনাপাশে শোভাযাত্রা বাহির করা নিষিদ্ধ করিয়া পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ বে-আইনী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পাশের সর্ত্ত ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিশ শোভাযাত্রা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না; শোভাযাত্রা বন্ধ করিবার ক্ষমতা পুলিশের নাই, এ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট প্রজার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, প্রজার অধিকার সাব্যস্ত করাও আদালতের কর্ত্তব্য। লাহোর হাইকোর্টে 'প্রকাশ ষ্টীম প্রেসে'র দুই হাজার টাকা জামীন বাজেয়াপ্তের আদেশ নাকচ; বিচারপতিদের রায়—জনকয়েক পুলিস কর্ম্মচারীর নিন্দাবাদে সরকার ঘৃণাভাজন হয়েন না; আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট বলিতে স্থানবিশেষের জনকয়েক পুলিশ-কর্ম্মচারী বুঝায় না। বন্যায়—ব্রহ্মে রেঙ্গুন হইতে মান্দালয়ে ট্রেণ যাতায়াত বন্ধ, মাদারীপুরে ও ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে শস্য নাশ, বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়ার মধ্যে বি এন্ রেল চার জায়গায় জখম। বোকা নামক এক জন মেথর কায করিতে গিয়া বাড়ীর কর্ত্রী, মিসেস্ ডাঙ্কানকে সেলাম না করায় কর্ত্তাদের হস্তে প্রহৃত হয়, বিচারে মিঃ ডাঙ্কানের ১০ টাকা ও তাহার ভাইয়ের ৫ টাকা মাত্র অর্থদণ্ড হইয়াছে। ফেনী কলেজে শ্রীযুত চণ্ডীচরণ লাহার চার হাজার টাকা দান। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি তদীয় পুত্রবধূ কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রদান। পূর্ব্ব-য়ুরোপে শান্তিস্থাপন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য কামাল পাশার স্বরাষ্ট্রসচিব ফেতি পাশার লণ্ডনে গমন। য়ুরোপীয় তুরস্কে বিখ্যাত চাতালজা অঞ্চলে মিত্রশক্তির নূতন নূতন সৈন্য-সমাবেশ; সীমান্তে গ্রীক সেনার সংখ্যা ২০ হাজার।

১৯শে শ্রাবণ—

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নেতাদের অসুস্থ সংবাদ; শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী অজীর্ণ ও অনান্য ব্যাধিতে, মৌলবী মজিবর রহমান বাতে, মৌলবী মঞ্জুর আলাম ও মৌলবী মহম্মদ ওসমান জ্বরে, শ্রীযুত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী উদরাময়ে, শ্রীযুত যামিনীকুমার রায় চৌধুরী বাতজ্বরে ও মৌলবী আবদুল কাশেম ভুঞা ব্রংকাইটিস রোগে কষ্ট পাইতেছেন; শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁর শরীরের ওজন কমিয়া যাইতেছে। শ্রীহট্টে "জনশক্তি"র নামে ১৫৩এ ধারায় জাতিবিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগ; এই চণ্ডনীতির সংবাদে করিমগঞ্জের সরকারী উকীলের উপাধি-ত্যাগ, আদালত-বর্জ্জন, জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ

ও "জনশক্তি"র সম্পাদনভার গ্রহণ। আইন অমান্য তদন্ত কমিটির কটক আগমনে আট জন কংগ্রেস কর্ম্মী এবং কংগ্রেস ও খেলাফতের সভাপতি ডাঃ এক্রাম রসুলের প্রতি ১৪৬ ধারা জারী। সিন্ধু, হায়দ্রাবাদের 'পাবলিক হলে' সভা বসিবার ব্যবস্থা পণ্ড করিবার জন্য পুলিশ কর্ত্তৃক উহার অধিকার; অথচ, পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটির অনুমতি লওয়া হইয়াছিল। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর কারামুক্তি। খানাতল্লাসী করিতে গিয়া অনাবশ্যক খাতাপত্র, ছাপিবার সাদা কাগজ প্রভৃতি লইয়া যাইয়া, প্রেসের হরপগুলা মিশাইয়া দিয়া এবং কয়দিন যাবৎ ছাপাখানায় চাবী দিয়া রাখিয়া "জনশক্তি প্রেসে"র ক্ষতি করার অভিযোগে শ্রীহট্টের সাত জন পুলিস কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে ৫০০ টাকা ক্ষতি পূরণের অভিযোগ। গৌরীশঙ্কর অভিযানের দার্জিলিঙ্গ প্রত্যাবর্ত্তন; তিন জন কর্ত্তৃপক্ষ ফিরেন নাই; কাপ্তেন নোয়েল তিব্বতে এবং ডাঃ সমার ভেল ও মিঃ ক্রফোর্ড সিকিমে রহিয়া গিয়াছেন। মেছুয়াবাজার ও সেন্ট্রাল এভেনিউয়ের মোড়ে সন্ধ্যাবেলা গুণ্ডার ছোরায় কনেষ্টবল গণেশ সিং আহত; দুই জন গুণ্ডা ধৃত। হাবড়া জেলার নারীট খালনা প্রভৃতি অঞ্চলে দামোদরের বন্যা; ঘর-বাড়ী ও শস্য নষ্ট। খানাকুল অঞ্চলেও আবার বন্যা। আগামী শীতকালে ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগুর ভারত আগমনের সংকল্প। চীনের সোয়াটো বন্দরে সামুদ্রিক ঝড়; বহু জাহাজ জল হইতে ডাঙ্গায় নিক্ষিপ্ত; শাম্পান নৌকাগুলির অধিকাংশ চূরমার, নৌকার মাঝি-মাল্লারা প্রায় সকলেই জলে মগ্ন, আটাশ হাজার লোকের প্রাণনাশ। তুর্ক-গ্রীক সন্ধিতে বিলম্বে মহাসভায় বৃটিশের দোষ দেওয়ায় প্রধান মন্ত্রীর স্পষ্ট কথা—কামাল পাশার দাবীতে গ্রীসদের অসম্মতি ন্যায়সঙ্গত।

২০শে শ্রাবণ—

কলিকাতায় আইন অমান্য তদন্ত কমিটী, হাবড়া ষ্টেশনে বিরাট অভ্যর্থনা। খেলাফৎ তদন্ত কমিটীর শ্রীহট্টে যাওয়ার টেলিগ্রাম-প্রেরণ আপত্তি। শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'স্বরাজ' পত্রে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত ফজলল হকের মানহানি করার অভিযোগ।

২১শে শ্রাবণ—

আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর সদস্যদের কলিকাতা হইতে আসাম যাত্রা। বন্যায় খানাকুল অঞ্চলের ক্ষতির সংবাদ, বহু গ্রাম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাঁসাই নদীর বন্যায় মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানায় ত্রিশখানি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত। কালীঘাই নদীর বন্যায় কাঁথী অঞ্চলে সবঙ্গ থানায় বিশেষ ক্ষতির সংবাদ। মেদিনীপুরে ডেবরা থানার অধীন সুন্দরপুর গ্রামে ডাকাতিতে ডাকাতদলে গৃহস্থে ও গ্রামবাসীতে যুদ্ধ, গৃহস্বামীর এক পুত্রের কৌশলে ডাকাতদলের কয় জন ধৃত; এক জন স্ত্রীলোক এই দলের সর্দ্দার ছিল, সেও ধৃত হইয়াছে।

২২শে শ্রাবণ—

জলন্ধরের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে মাষ্টার মোটা সিংএর ১২৪।এ ও ১৫৩।এ ধারার অভিযোগে ৫ বৎসর দ্বীপান্তর ও ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড; ইঁহার বিরুদ্ধে আরও দুইটি রাজদ্রোহের মামলা ঝুলিতেছে। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে আরও ছয় মাসের জন্য রাজদ্রোহ সভা বন্ধের আইন জারী। বরিশালের শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী জেলে আনীত; ৫৯ দিনের পর প্রায়োপবেশন ভঙ্গ। বেলিয়াঘাটার ডাক্তার শ্রীযুত শ্রীনাথ দাশ ও তাঁহার পুত্রকে অকারণে গ্রেপ্তার ও প্রহারাদি করার অপরাধে দুই জন কনেষ্টবলের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড। আমতায় জলপ্লাবন, কতকগুলি গ্রাম বিপন্ন। নিকট ও মধ্য প্রাচী সভার বৃটিশ রাজনীতিক ও পারলামেণ্টের সদস্যদের জাতি-সংঘের নিকট প্রদত্ত প্রস্তাব প্রকাশ; স্মার্ণা সমেত এশিয়া-মাইনর তুরস্ককে দেওয়া উচিত, পূর্ব্ব থ্রেস ও আড্রিয়ানোপলও তুরস্কের প্রাপ্য; থ্রেসের অবশিষ্ট অংশে একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসন-শাসিত রাজ্য স্থাপন করিয়া গ্রীস ও তুরস্কের সীমানা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া উচিত, দার্দ্দানেলিজ একক তুরস্ককে না দিলে তুরস্কও জাতি-সংঘের হস্তে দেওয়া দরকার। কর্ক অঞ্চল আইরিশ বিদ্রোহীদের কবলে; সহর হইতে তাহাদের লক্ষ পাউণ্ড কর আদায়। ডাবলিনের চারিদিকের সেতু, রেলপথ ও রাজপথ উড়াইয়া দিবার জন্য সিনফিনদের চক্রান্ত; আইরিশ সমর বিভাগের চেষ্টায় সময়ে ষড়যন্ত্র প্রকাশ ও বহু বিদ্রোহী ধৃত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও গ্রীসের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণ মিলিয়া গ্রীক-তুর্কী সীমান্তের পৌনে এক মাইল বিস্তৃত স্থান নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া স্থিরীকৃত; সকলের সে স্বীকার-পত্রে স্বাক্ষর।

২৩শে শ্রাবণ—

রাজদ্রোহের অভিযোগে "আকালী"র সম্পাদক জ্ঞানী হীরা সিংএর এক বৎসর এবং প্রকাশকের তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। হুগলী জেলের অন্ন-গ্রহণে অনিচ্ছুক প্রায়োপবেশনকারী মারাঠী পণ্ডিত কয়েদীকে বাহির হইতে ফল-মূল প্রদানে আপত্তি। ১২৪এ ও ১৫৩এ ধারায় "দেশের ডাকে"র গ্রন্থকার শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। লাহোরে আবদুল ওয়াহেদ নামক এক স্বেচ্ছাসেবক জাতীয়সঙ্গীত গান করায় ১২৪এ ধারায় ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। রুসিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক সাইরিস কর্ত্তৃক শূন্য সিংহাসনের অভিভাবকত্বের দাবী; তিনি রুসিয়ার জাতীয় কাউন্সিলে বিচারপ্রার্থী হইয়াছেন। লণ্ডনে আঙ্গোরার দূতের পররাষ্ট্র বিভাগের সহিত কথোপকথন।

২৪শে শ্রাবণ—

হাইকোর্টে সার্ভেণ্ট মানহানি মামলায় সম্পাদকের পক্ষে আপীল গৃহীত; মুদ্রাকরের শাস্তি কেন অগ্রাহ্য করা হইবে না, তাহার জন্য রুল-জারী। মাদ্রাজ হাইকোর্টে উকীল সভায় পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতি আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর নেতাদের সংবর্দ্ধিত করায় প্রধান বিচারপতির উষ্মা, ভবিষ্যতে এরূপ ব্যবহার নিষিদ্ধ। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের মুক্তি। ১০৪ ডিগ্রী জ্বর অবস্থায় দেশবন্ধুর সহিত শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলেরও কারামুক্তি। সিন্ধু, হায়দ্রাবাদের হিন্দু-পত্রের সপ্তম সম্পাদক গ্রেপ্তার, অভিযোগ মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস প্রেসিডেণ্টের মানহানি; পাবলিক হলে তিলক স্মৃতি-সভা নিষেধের জের। শ্রীহট্টে খেলাফৎ আইন অমান্য তদন্ত কমিটী। কচ্ছ হইতে শ্রীযুত মণিলাল কোটারীর বহিষ্কার। সরকারী শ্রম-শিল্প বিভাগ হইতে কুমিল্লায় চামড়া ট্যান করা শিখান; চর্ম্মকারদের সহিত কয়েকটি ভদ্রঘরের ছেলের বিদ্যা-শিক্ষা। প্যারিসে ও বার্লিনে আফগান মন্ত্রী নিয়োগ। মার্কিণের বিরাট শ্রমিক সংঘের সিনসিনাটীর অধিবেশনে ভারতের বর্ত্তমান মুক্তির সংগ্রামে সহানুভূতি জ্ঞাপনের সংবাদ। চীনের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট সান-ইয়াট-সেনের পক্ষপাতী সেনাপতিদের দক্ষিণ চীনে পরাজয়; বৃটিশ গানবোটে সান-ইয়াটের ক্যাণ্টন পরিত্যাগ।

২৫শে শ্রাবণ—

কানপুরে পিকেটিংয়ে নেতাদের যোগদান। চণ্ডনীতির প্রতিবাদে পুরীতে তাহিরপুরের রাজকুমার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শান্তিশেখরেশ্বরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগের সংবাদ। চট্টগ্রাম, ছাতরীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিযোগে কয়টি বালকের কারাদণ্ড, একটি বালকের বয়স সাত বৎসর, আর কয়টি দশ হইতে পনেরোর মধ্যে; অভিযোগ—বালকগুলি ম্যাজিষ্ট্রেটের পথে ঢেলা প্রভৃতি রাখিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কুমিল্লায় খেলাফৎ আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর সাক্ষ্য-গ্রহণ। যশোহর পুলিসের হাবিলদার জবা খাঁর অপমান করার অভিযোগে স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিশনার শ্রীযুত বেণীমাধব মিশ্রের অর্থদণ্ড। দিনাজপুরে বধূ-নির্য্যাতন মামলায় বালিকার স্বামী কুলদাচরণ ভট্টাচার্য্যের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই শত টাকা অর্থদণ্ড। পালিটানা রাজ্যে জীব-হত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদ। সরকারী হিসাবে প্রকাশ, এ বৎসর বাঙ্গালায় তুলার চাষ প্রায় বারো হাজার বিঘা অধিক জমীতে হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া-প্রবাসী ভারতীয় শ্রীযুত রহিম বক্স কর্ত্তৃক ভারতে দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয়ের জন্য শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে এক শত পাউণ্ড দান। ফরাসী কর্ত্তৃক আলসাস-লোরেন প্রদেশের ৫০০ জার্ম্মাণকে ফরাসী মুলুক পরিত্যাগের নোটিশ।

২৬শে শ্রাবণ—

কলিকাতায় আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর পুনরাগমন ও সাক্ষ্য-গ্রহণ। পাঞ্জাবের সাবাসচাঁদ নামক একটি বালক কর্ত্তৃক বি বি সি আই রেলপথে যাত্রীর ভিড়ে তাহার পিতা দম আটকাইয়া মারা যাওয়ায় রেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী। টাকার অনাটনে বোম্বায়ে সরকারী মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে রোগীর সংখ্যা চার শত হইতে কমাইয়া আশী করায় স্থানীয় করপোরেশন কর্ত্তৃক কৈফিয়ৎ তলব। কাবুল হইতে চৈনিক মিশনের প্রত্যাবর্ত্তন। আইরিশ বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক কর্ক সহরে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক পলায়ন; বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি।

২৭শে শ্রাবণ—

দক্ষিণ কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের সভাপতিত্বে দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশকে অভিনন্দন। আমেদাবাদের নির্ভীক তালুকদার শ্রীযুত গোপালদাস অম্বাইদাস দেশাই মহাশয়ের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাসাদ হইতেও বহিষ্কৃত করার আদেশ। মেদিনীপুরের বন্যায় বাঙ্গালা সরকারের পঁচিশ হাজার টাকা সাহায্যের প্রস্তাব। বোম্বায়ের বিখ্যাত ধনী স্যার বিঠলদাস দামোদর ঠাকুরজীর লোকান্তর; তিনি পাঁচটি কাপড়ের কলের মালিক ছিলেন এবং নিজ কৃতিত্বগুণে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি সম্মানিত পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের "ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টে"র সর্ব্বস্ব, বিখ্যাত সংবাদ-পত্র সম্পাদক দেওয়ান বাহাদুর করুণাকর মেননের লোকান্তর। আয়ারলণ্ডে সিন্‌ফিন্ আন্দোলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, বর্ত্তমানে আইরিশ সরকারের অন্যতম কর্ত্তা, স্বদেশপ্রাণ আর্থার গ্রিফিথস্ হৃদরোগে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

২৮শে শ্রাবণ—

কলিকাতায় খেলাফৎ তদন্ত কমিটীর সাক্ষ্য-গ্রহণ। মীর্জাপুর পার্কে কংগ্রেস ও খেলাফতের আইন অমান্য তদন্ত সমিতির সদস্যদিগকে কলিকাতাবাসী জন-সাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন। কৃষি-সচিব-গমনে মাদারীপুরে হরতাল। বলশেভিকরা বাটুমে তিনখানি বৃটিশ জাহাজ ধরিয়াছে; প্রতীকার-উদ্দেশ্যে বৃটিশ বাহিনীর কয়েকখানি জাহাজ বাটুমযাত্রা করিয়াছে।

২৯শে শ্রাবণ—

নিখিল ভারত কংগ্রেসের খদ্দর বিভাগের বিবরণে প্রকাশ, তিলক স্বরাজ-ভাণ্ডার হইতে এই বিভাগে ৫ লাক টাকা দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ চাঁদায় নগদ সওয়া লাখ ও পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টে শ্রীহট্টের "জন-শক্তি"র দুই হাজার টাকার জামীন বাজেয়াপ্তের মামলা; ওদিকে আসাম সরকার কর্ত্তৃক আদেশের প্রত্যাহার। বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ হইতে শ্রীযুত রমেন্দ্রনাথ ঘোষের অব্যাহতি। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় আলিপুরের সেণ্ট্রাল জেল হইতে ফরিদপুরের লক্ষ মুসলমানের গুরু পীর বাদশা মিঞার মুক্তিলাভ। করিমগঞ্জ জেলায় সাজাই পুলিসের অনাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে যাইলে স্থানীয় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কর্ম্মীদের বিবরণ উক্ত পুলিসের দারোগা কর্ত্তৃক কাড়িয়া লওয়ার অভিযোগ। ভূ-প্রদক্ষিণকারী মেজর ব্লেকের তত্ত্বাবধানাধীন বৈমানিক দলের কলিকাতায় অবতরণ। স্বর্গীয় রতন টাটার ট্রাষ্টিগণ কর্ত্তৃক যক্ষ্মানিবাসের সাহায্যকল্পে ত্রিশ হাজার টাকা দান। বলশেভিকগণ কর্ত্তৃক হেগের সিদ্ধান্তে সম্মতি। জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানে নূতন বিভ্রাট, মিত্রপক্ষের বৈঠক ভাঙ্গিল; বৃটিশের প্রস্তাবে ফরাসীর অসন্তোষ; ফরাসীর অসন্তোষ সত্ত্বেও জার্ম্মাণীর নোট চালাইবার প্রস্তাবে মিত্রপক্ষের সম্মতি। মিশরে সাত জন নেতা গ্রেপ্তার; এক জন সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী; দুই জনের সঙ্গে সঙ্গে বিচার; কারা ও অর্থদণ্ড; সকলেই কায়রোর দুর্গে আবদ্ধ। বিলাতের টাইমস্, ডেলি-নিউজ প্রভৃতি বড় বড় শক্তিশালী সংবাদপত্রের মালিক, সংবাদপত্র-পরিচালনে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী লর্ড নর্থ ক্লিফের লোকান্তর; সংবাদপত্রের বাহিরে সরকারী কাযকর্ম্মে ও রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব সপ্রকাশ; কিন্তু তিনি ভারতে বৃটিশ সিবিলিয়ানী শাসনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

৩০শে শ্রাবণ—

দক্ষিণ মালাবারের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষতিপূরণ মামলায় মাদ্রাজের শ্রীযুত প্রকাশমের ছয় হাজার ও 'হিন্দু' পত্রের এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড; জলন্ধরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে দুইটি রাজদ্রোহ মামলায় মাষ্টার মোটা সিংএর যথাক্রমে আঠারো ও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড। সবরমতীর খাদী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রেরিত ৫২ জন ছাত্র সূতা কাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি শিখিতেছেন; খদ্দর ভাণ্ডার হইতে সিন্ধু, অন্ধ্র ও উৎকলকে খদ্দর প্রচারের জন্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে। হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতি নেতৃবর্গের পাটনা জেলে মৌলানা মজহরল হকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রস্তাবে জেল কর্তৃপক্ষের আপত্তি। হাবড়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গার্ণার কুলগাছিয়ার নিকট বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে একটি জেলেনীকে বন্যা-স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া নিজে স্রোতে ঝাঁপ দিয়া তাহাকে রক্ষা করেন; ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গিগণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভূ-প্রদক্ষিণকারী মেজর ব্লেকের বিমান নীলামে বিক্রয়, কলিকাতার বীরলা কোম্পানী কর্ত্তৃক দুই হাজার টাকায় ক্রীত। দাঙ্গার অপরাধে বর্দ্ধমানে তিন জন গুরখা পুলিসের অর্থদণ্ড। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজ-সংসারের ব্যয় বার্ষিক দশ হাজার পাউণ্ড হ্রাস করিবার জন্য উপায় অবলম্বন। রুস তুর্কস্থানের সহিত রুস সোভিয়েটের সন্ধি; সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েটের সুবিধা। শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর কানাডার ভাঙ্কুবারে উপস্থিতি।

৩১শে শ্রাবণ—

পাটনায় আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর তাঁহাদের বৈঠকের অবসান। খুর্জা জেলা কনফারেন্সে বক্তৃতা দেওয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্য গোস্বামী ছবিলাল রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার। আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর নেতাদের সংবর্দ্ধনায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আদেশে ভবিষ্যতের জন্য কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে উকীল সভার অসম্মতি। বৃটিশ ভূ-পর্য্যটক মিঃ স্কালির কলিকাতায় উপস্থিতি; ১৯১৯খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বন্ধুবর্গের সহিত বাজী রাখিয়া তিনি দশ বৎসরের মধ্যে পদব্রজে পৃথিবীর সকল স্থান ঘুরিতে বাহির হইয়াছেন; ইতিমধ্যে তিনি নয় হাজার মাইল পথ হাঁটিয়াছেন এবং বোর্ণিয়ো হইতে যাত্রা করিয়া একে একে যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ, মালয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ ও উত্তর ব্রহ্ম, মাদ্রাজ, তথা হইতে সমুদ্র-সৈকত দিয়া বোম্বাই, আমেদাবাদ, মাড়োয়ার, করাচী, তথা হইতে বড় বড় সহরগুলি হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন; তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন; কলম্বো, পারস্য ও আফ্রিকা ঘুরিয়া য়ুরোপ যাইবেন। হাবড়ায় রেলের মালগাড়ীর ও কয়লার ডিপোর শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনায় ১৪৪ ও ১০৭ ধারার ব্যবহারে শান্তি-স্থাপন। মিশরে জগলুল পাশার মুক্তির দাবী; জগলুল সঙ্কটজনক পীড়ায় আক্রান্ত। কনস্তাণ্টিনোপলস্থিত মিত্রশক্তির হাই কমিশনার কর্ত্তৃক তুর্ক-গ্রীক সমস্যার সমাধানের জন্য ভিনিসে মিত্রশক্তির বৈঠক বসাইবার প্রস্তাব।

৩২শে শ্রাবণ—

বিহারেও টেরিটোরিয়াল সৈন্যদল গঠনের সঙ্কল্প; প্রাথমিক খরচের জন্য কুমার রঘুনন্দন প্রসাদ সিংএর ১০ হাজার টাকা দান। দ্বারবঙ্গের দায়রা জজের রায়ে স্থানীয় এক ডাকাতি মামলার সম্পর্কে চৌকীদার ও দফাদারের কর্ত্তব্য-ত্রুটিতে তীব্র মন্তব্য, ডাকাতির সময় কেহই সেখানে যায় নাই। রুস তুর্কীস্থানে তুর্কী বীর আনোয়ার পাশা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে গুপ্তঘাতক-হস্তে নিহত হওয়ার জনরব; আনোয়ার নাকি আপনাকে তুর্কীস্থানের আমীর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। গ্রীস কনস্তাণ্টিনোপল আক্রমণ করিলে তুর্কীকে বলশেভিকদের সাহায্যের প্রস্তাব।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পাড়ার মেয়ে।

১ম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩২৯ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আগমনী

১
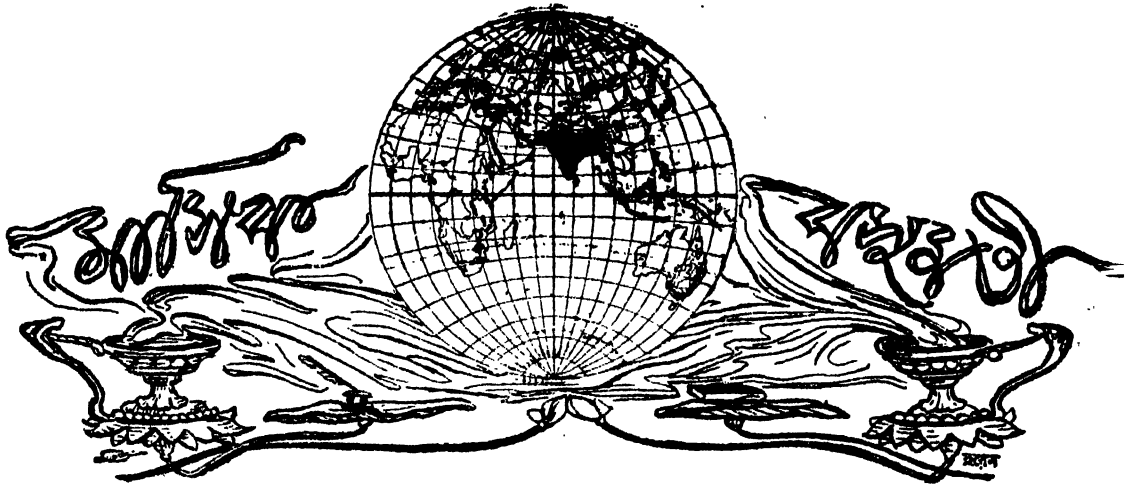
শত শত শ্বেত আলোক-কপোত নামিল দেউল-চত্বরে
পাখার বাতাসে উড়ায়ে হতাশ অন্ধকার,
সুষমার খনি কুসুম-তরুণী প্রজাপতিপাখা-পা'লভরে;
আনিছে বহিয়া তব অঞ্চল-গন্ধ-ভার।

২

বৎসর পরে আসিছ আবার জননি, বৎস-বৎসলা,
তাই উৎসব-উৎস-প্রসার স্পন্দমান।
শিশু শশিদূত ঘোষিছে বারতা, ধরণী পুলক-চঞ্চলা;
দিশি দিশি শুভশংসিসূচন,—ছন্দ গান।

বিম্বিত তব তনু-লাবণ্য স্ফটিক-স্বচ্ছ অম্বুতে
ইন্দ্রধনুতে,—পরিবেষ মুখ-চন্দ্রমার,
দিগ্বধূগণ করিছে বরণ শুভ্র-অভ্র-কম্বুতে
বলাকা-[illegible]ায় লম্বিত তব কণ্ঠহার।

৪

যেখানে যেখানে ফেলিছ চরণ জাগিছে চেতনা উল্লাসে,
হাসিছে গরবে করবীর, স্থলপদ্মচয়,
স্মিত সুধারস পরশে হরষে মরুতেও আজি ফুল হাসে
অলির কণ্ঠে কুলু কুলু মকরন্দ বয়।

৫

ক্ষেত্র কেদার ভরেছে তোমার আদরের উপঢৌকনে,
গৃহ মালঞ্চ ধরিতে পারে না করুণাভার,
পীবর শ্যামল নীবার শালির চিক্কণ রূপ-যৌবনে;
সান্ত্বনা তব ইঙ্গিত করে বারম্বার।

[illegible]-ধবল স্নেহের বন্যা ঢেউ খেলে অই কাশবনে,
শেফালি ঝোরায় ঝরিছে ভোরাই আশীর্ব্বাদ।
হুলু-মঙ্গল-ধ্বনিত অমল হ্রদ-নদ কল নিঃস্বনে;
মরাল সারস তরলকণ্ঠে ডঙ্কানাদ।

৭

শ্মশানে-মশানে সহসা শিহরি শবদেহ আজি দেয় সাড়া—
উঠিয়া বসেছে শয্যালগ্ন রুগ্নগণ,
পাষাণে পাষাণে প্রাণসঞ্চার,—তৃণ রোমাঞ্চে,—বয় ধারা,—
ভগ্ন তরীটি খুঁজিয়া পেয়েছে মগ্নজন!

৮

কত দিন হতে ছিল পথে পথে যত ধূলিরাশি সঞ্চিত,
বারুণীর বারি বারণ করেছে লুপ্ত তায়;
কাননে ভূধরে অযুত কণ্ঠে স্বাগত বোধন ঝঙ্কৃত;
কুলায়ে কুহরে, কে র'বে এখনো সুপ্ত হায়?

৯

পল্বল রচে প্রণামাঞ্জলি কমলকুমুদকুট্মলে
কৌমুদী রচে পথে পথে তব আলিম্পন!
দাঁড়ায় দু'ধারে মাথা করি হেঁট তরু লয়ে ভেট ফুল ফলে;
আল্‌তা পরায় পুষ্পিত জবা ডালিম বন।

১০

আয় মা জননি! ক্ষীণ নিরন্ন শোকবিষণ্ণ দীন দেশে—
আসিতেই হবে, কেমনে এড়াবি স্নেহের টান?
সন্তান তোর পথে প্রান্তরে ঘুরে নিতান্ত হীনবেশে;
পাষাণি, তোর কি গলিবে না দেখি মায়ের প্রাণ?

১১

নিঃস্ব আমরা, বিশ্বে মোদের হায় নিজস্ব নাই কিছু,
কি দিয়ে তুষিব, কোথায় করিব বরণ তোর?
তবু আয়, মা গো, যদিও আমরা ধরার ধূলায় রই নীচু;
অশরণ বলি আরো বেশী চাই চরণ তোর!

১২

তিনটি দিবসো লভি আতিথ্য হেথায় ত্রিলোক-ঈশ্বরী,
ধর শাকান্ন, পর্ মা ছিন্ন জীর্ণ চীর!
এ দশা হেরিলে মহিষাসুরেরো মমতায় যাবে বুক ভরি;
সিংহবাহিনী, সিংহেরো ব'বে অশ্রুনীর!

১৩

আমরা জননি! রহিব এমনি আর কত দিন-ই রৌরবে—
কত কাল ভবে ভুঞ্জিতে হবে ভাগ্যফল!
দিবি না পূজিতে পূরাসমারোহে ও-পদ অবাধ গৌরবে
দিবি না, মা, তব পুত্র নামের যোগ্যবল?

১৪

এ অবশভুজে, দে মা দশভুজে অজেয় শক্তি সঞ্চারি,
ক্লৈব্য-কালিমা, কুণ্ঠা-কুষ্ঠ, কলুষহর্।
দে মা, সমৃদ্ধি সাধনাসিদ্ধি দৈন্যজড়তা সংহারি;
মহিষ-দলনি, সন্তানে পুন মানুষ কর্।

শ্রীকালিদাস রায়

মায়ের পূজা।

মিসেস্ মুখার্জ্জির বাড়ী দুর্গোৎসব। আজ ষষ্ঠী। সময়টা সন্ধ্যায় প্রাক্কাল। দেবীর অধিবাসের এখনও বিলম্ব আছে। ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ অধিবাস এবং পূজার আয়োজন করিতেছিলেন। মিসেস্ মুখার্জ্জি মালা হাতে করিয়া, গঙ্গাতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহের জানালায় বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতেছেন। কিন্তু ঐ অস্তগামী সূর্য্যের পানে চাহিয়া, সন্ধ্যার উদাস হাওয়ার মত, মনটা কোন্ অন্ধকারে চলিয়া যায়, সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনা বড় শক্ত। সম্মুখে শরতের শীত-সলিলা গঙ্গা লোলতরঙ্গা, রক্তাম্বরা, কল-কল্লোল-মুখরা। মিসেস্ মুখার্জ্জির জপ থামিয়া গিয়াছে। তাঁহার কান ভাগীরথীর সেই কলগানে, চক্ষু দূর-পরপারে সেই রাঙ্গা রবিছবি পানে নিবদ্ধ থাকিলেও, মন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল অতীতের ছায়ালোকে। সে অস্পষ্ট আলোকে একে একে কত ছায়াময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইতেছে, কিন্তু যে দু'খানি মুখ আজ বার বার তাঁহাকে বিচলিত করিতেছে, তাহার একখানি তাঁহার ঋষিপ্রতিম পিতার, অন্যখানি সাবিত্রীস্বরূপিণী মাতার। পশ্চিমাকাশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মিসেস্ মুখার্জ্জির উদাস দৃষ্টি দেয়ালে টাঙ্গানো দু'খানি তৈলচিত্রের উপর পতিত হইল। মিসেস্ মুখার্জ্জি যোড়করে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। সূর্য্যাস্তের আভা চিত্র দু'খানির উপর পড়িয়া তাঁহার স্বর্গীয় পিতামাতাকে যেন সজীব করিয়া তুলিয়াছে! পিতার চিত্রপানে চাহিলেই মিসেস্ মুখার্জ্জির মনে পড়ে—'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং'; আর মা ত সাক্ষাৎ ভগবতী—'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।' যখন ইঁহাদের দেহান্ত হয়—এক ঘণ্টা আগু-পিছু—মিসেস্ মুখার্জ্জি তখন বিলাতে। পিতামাতার অন্তিম আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু নিত্য নিশাশেষে জাহ্নবীর পূত জলে অবগাহন করিলে মনে হয়, দেবী যেন তাঁহাদের গচ্ছিত আশীর্ব্বাণীতে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতেছেন। মুমূর্ষুর আদেশে তাঁহাদের শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন—প্রভাস। সে এক আশ্চর্য্য ইতিহাস। পিতামাতার সন্তান-সম্ভাবনা যখন দূর হইতে সুদূর হইয়া গেল, তখন তাঁহারা এক পঞ্চমবর্ষীয় অনাথ ব্রাহ্মণ-বালককে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে দু' বৎসর না পূর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ-দম্পতির এক কন্যা জন্মিল, অসময়ে। অনেকে বলিয়াছিল, বালক কন্যাকে বিষচক্ষে দেখিবে। কিন্তু সকলে দেখিল, প্রভাসের গায়ত্রী-অন্ত প্রাণ। ক্রমে উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ দেখিয়া পিতামাতা দু'জনকে দৃঢ়তর প্রীতি-বন্ধনে বাঁধিবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু কোথা হইতে কে যে কেমন করিয়া সব ওলট্-পালট্ করিয়া দেয়, কিছুই বুঝা যায় না। তার পর অরুণকুমার আসিলেন—স্বামী। ছেলেবেলার সে ভালবাসা ছেলেখেলার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গেল। নূতন প্রণয়, নূতন প্রীতি। স্মৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া তারই কথা কহিতেছে। তখন যাঁহার তিলেক বিচ্ছেদ সহ্য হইত না, এখন তাঁহার চিরবিরহে কেমন করিয়া দিন কাটিতেছে! মিসেস্ মুখার্জ্জি নয়নপ্রান্ত হইতে দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। স্মৃতি কহিল, "আজ তুমি গোময় খাইয়া শুদ্ধ হইয়া মালা ফিরাইতেছ, কিন্তু স্বামিগৃহে গিয়ে সেই মেম রেখে ইংরাজী শিক্ষা, পিয়ানো বাজিয়ে নৃত্যগীত, তার পর স্বামীর সঙ্গে বিলাত যাওয়া, সেথা পবিত্র 'গায়ত্রী' নাম পরিবর্ত্তন করে, 'গেইটি' হওয়া—সে সব মনে পড়ে? পিতৃগৃহের জন্মগত সংস্কার সব মুছে ফেলে বিলাতী বিলাসে আত্মসমর্পণ—সেই বিজাতীয় জীবন-যাত্রা—"

মিসেস্ মুখার্জ্জির মন অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে ত জীবনযাত্রা নয়, সে যে ঝড়! বারো বছরে বিবাহ হয়েছিল, তার পর বারো বছর ধ'রে সে ঝড় বয়েছে; সে কি ভোলা যায়?

স্মৃতি একটু উপহাসের স্বরে প্রশ্ন করিল, "বল্‌ছ—ঝড়। কিন্তু সে ঝড়েও ত বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলে?"

মন হাসিয়া উত্তর দিল, "না থাক্‌ব কেন? যে দেবতা সে ঝড় তুলেছিলেন, পিতৃ-আজ্ঞায় আমি যে তাঁর প্রীতির জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করেছিলাম, আপনার ব'লে ত কিছু রাখিনি। যখন কুশণ্ডিকা হয়ে গেল, বাবা স্বামীকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আজ থেকে ইনিই তোমার দেবতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গতি। যখন যেখানে যেভাবে যেমন ক'রে রাখ্‌বেন, তেমনি থাক্‌বে। যা শেখাবেন, তাই শিখ্‌বে; যা করাবেন, তাই কর্‌বে। তাতে আর দ্বিধা-বিচার কোর না।' [illegible]

ইচ্ছায় তৃণের মত আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। আপনার ভারে মহাজনী নৌকারই ভরাডুবী হয়; কিন্তু ঝড়ের মুখে খড়-কুটো অনায়াসে ভেসে যায়, শেষে কোথাও না কোথাও কূল পায়।"

স্মৃতি বলিল, "হাসির কথা! এত যদি—স্বামী ত শেষ পর্য্যন্ত সাহেব ছিলেন। তবে তোমার এখন এ সব থানপরা, স্বপাক শুদ্ধাহার, বাছ-বিচারের ধুম কেন?"

মন বলিল, "স্বামী শেষ পর্য্যন্ত সাহেব ছিলেন বটে, কিন্তু শেষ-শয্যায় তাঁর শেষ উপদেশটি লুকুচ্ছ কেন? তিনি কি বলেননি যে, 'পবিত্র বংশে জন্মে ম্লেচ্ছাচার ক'রে অকালমৃত্যু আমার বিষময় পরিণাম! পৈতৃক যা কিছু ছিল, সব বিলাসে উড়িয়েছি; সন্ধ্যাপূজা ত দূরের কথা, ক্ষুধাতুরকে কখন এক মুঠ' অন্ন, একটা পয়সা দিইনি। গায়ত্রি, এ পাপের গৃহ ছেড়ে তুমি তোমার বাপের বাড়ী গিয়ে থেক! তুমি ঋষি-কন্যা, তোমাকেও ম্লেচ্ছাচারে কলুষিত করেছি। কিন্তু তোমার এখনও প্রায়শ্চিত্তের সময় আছে। সাবধান'!"

স্মৃতি একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তা না হয়, গড়া পর্‌লে, গঙ্গাস্নান কর্‌লে, স্বপাক আলোচাল কাঁচকলা খেলে, আর মালা ফেরালে; ছিলে বিলাসিনী, হলে তপস্বিনী! এক রূপ টুট্‌ল; আর এক রূপ ফুট্‌ল! সব হ'ল, কিন্তু তুমি ত, বাপু, সহজে বশ হবার পাত্র নও!"

মন যেন একটু কুঞ্চিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

স্মৃতি হাসিয়া বলিল, "কথায় বলে, মনের অগোচর পাপ নেই, তোমার কথা তুমিই জানো।"

"এ-ত হেঁয়ালি! একটু স্পষ্ট ক'রে বল না।"

"তাই বল্‌ছি। স্বামীর আদেশে পিতৃগৃহে এসে বাস কর্‌তে প্রথম একটু কুণ্ঠিত হয়েছিলে কেন?"

"হবারই ত কথা! পিতৃগৃহ নামে বৈ ত নয়। বাবা, তাঁর অল্প-স্বল্প যা-কিছু ছিল, এ বাড়ীখানা পর্য্যন্ত সব দেবোত্তর ক'রে প্রভাসকে সেবাইত ক'রে গিয়েছিলেন, আমি সেখানে কি অধিকারে বাস কর্‌ব।"

স্মৃতি গম্ভীর স্বরে কহিল, "কথাটি বল্‌তে বেশ! কিন্তু সেটা অধিকার বিচার, না ভয়? তোমার স্বামীর গৃহ বিক্রি ক'রে তাঁর সমস্ত দেনা পরিশোধ কর্‌বার পর যখন প্রভাসের আশ্রয়ে এলে, তখন কি তোমার ভয় হয়নি যে, পাছে যে রক্ষক, সেই ভক্ষক হয়?"

"তা ত হবেই! না হওয়াটাই যে অস্বাভাবিক। ভোগ, বিলাস, আশা, সুখ, স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চিতার আগুনে সব ছাই হয়, কিন্তু রূপ-যৌবন ত যায় না!"

"সেই কথাই ত হচ্ছে! বিধবা হবার পর বছর দুই বেশ কাট্‌ল। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে তোমার দেব-বাঞ্ছিত রূপ ক্রমে যখন শরীরে হোমাগ্নি-শিখা জ্বালিয়ে তুললে; পঁচিশ বছর ধ'রে রেখায় রেখায় পরিস্ফুট তোমার প্রফুল্ল নিটোল যৌবন; নিবিড় নিতম্ব-চুম্বিত আলুলায়িত চূর্ণকুন্তলরাশি; তোমার বিম্বাধরবিলাসী, কলিকা-বিকাশী, পাগল-করা হাসি উদাসী প্রভাসকে আর স্থির থাক্‌তে দিলে না। ব্রহ্মচারী বলি বলি, বলে না। হাওয়ার মত আসে, ঝড়ের মত চ'লে যায়। তুমি বুঝেও বুঝ্‌তে চাও না, আপনার কাছে আপনি অস্বীকার কর। কিন্তু মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলে।"

সত্য! আগুনের তাপ কতদিন অস্বীকার করা চলে। প্রভাস মুখে কিছু না বলিলেও অন্তরের প্রচ্ছন্ন বহ্নি তাহার লোলুপ চক্ষুতে ক্রমে প্রখর হইয়া উঠিল। মিসেস্ মুখার্জ্জির প্রাণ বলিল—আহা! মন বলিল—ছি ছি! প্রভাস অকারণে তিরস্কার করে, অহেতু কাঁদিয়া আকুল হয়। তাহার নির্ব্বাক্ যন্ত্রণা ক্রমে গায়ত্রীকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। গায়ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, "প্রভাস দাদা, আমি অনাথিনী বিধবা, নিতান্ত নিরাশ্রয়, আমাকে অকূলে ভাসিয়ো না।" প্রভাস ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দুই দিন পরে সে মিসেস্ মুখার্জ্জিকে বলিল, "গায়ত্রি, আমায় ছুটি দাও।"

গায়ত্রী সজলনেত্রে কিছুক্ষণ প্রভাসের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে ধ'রে রাখি, এমন জোর আমার নেই, প্রভাস দাদা! কিন্তু আর দু'ট দিন অপেক্ষা কর।"

প্রভাস সম্মত হইয়া চলিয়া গেলে মিসেস্ মুখার্জ্জি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার পথভ্রষ্ট বাল্যসুহৃদকে বিদায় দেওয়া যেমন দুষ্কর, পিতৃগৃহের আশ্রয় ত্যাগ করাও তেমনই সুকঠিন। যেখানে যাইবেন, শত্রু সঙ্গে থাকিবে। রূপ নয়, এ বিধাতার অভিসম্পাত! ইহাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ। আর্সীতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু ভরিয়া উঠিল।

এক বাটীতে বাস করিলেও প্রভাস কিছু দিন হইতে মিসেস মুখার্জ্জির সহিত কোন সংস্রব রাখে না, তাঁহার দিক্ মাড়ায় না। দুই দিন পরে বিদায়ের কথা পুনরুত্থাপন

করিতে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। কে এ বর্ষীয়সী নারী, তাহার সম্মুখে! মুণ্ডিত মস্তক! কোথায় গেল সে নিবিড় ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি! কোথায় সে হাসি! উপর নীচের ঠোঁট তুবড়াইয়া গিয়াছে। কি কুৎসিত! দন্তের অভাবেও কেশহীনা প্রাচীনার শ্রীহীন মুখে বয়সের গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্যের ক্ষতি পূর্ণ করে। কিন্তু অনাগত বার্দ্ধক্যে বিকৃত শ্রী—এ কি বিসদৃশ কদর্য্যতা! প্রভাস নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। ক্রমে ক্ষোভে, রোষে, অভিমানে সে আর অশ্রুর বেগ সামলাইতে পারিল না। আকুল কণ্ঠে কহিল, "এ শাস্তি আমায় কেন দিলে, গায়ত্রি? আমি ত কোন দিন কোন কথা বলিনি। গায়ত্রি, বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান তুমি আমার জন্যে হেলায় ফেলে দিলে! এ দুঃখ যে আমার মলেও যাবে না!"

"তা হ'লই বা, প্রভাস দাদা! রূপ ক'দিনের জন্য? রোগ ডাকাতি ক'রে কেড়ে নেয়, সময় তিল তিল ক'রে চুরি করে। দুদিন আগু-পিছু।"

কশাহত কুকুরের মত প্রভাস নিঃশব্দে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু যে ঝি গায়ত্রীকে মানুষ করিয়াছিল, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—তাহার সে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা কোথায়? "হায় হায়! মাথা কেন মুড়ুলি? নীচে ওপর দু'পাটিরই সামনের চারটে চারটে দাঁত তুলিয়ে ফেলেছিস্! আর্শীতে মুখখানা দেখ দেখি।"

কিন্তু গায়ত্রী সাহস করে নাই। ইহা দুই বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা। ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে সূর্য্য ডুবিয়া গেছে, ভাগীরথী সোনার সাজ খুলিয়া ফেলিয়াছেন, মিসেস্ মুখার্জ্জি জানিতে পারেন নাই। নীচে, বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া রক্তচক্ষু দৈত্যের মত পোর্ট-কমিশনারদিগের মাল-বোঝাই ট্রেণ সশব্দে আনাগোনা করিতেছে। মিসেস্ মুখার্জ্জি পুনরায় পরপারে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহারই দুর্ভাগ্যের মত পশ্চিমাকাশ ঘোর হইয়া উঠিয়াছে। আজ মহাষষ্ঠী, সন্তানের জন্য ব্রত উপবাস পালন করিয়া পুত্রবতীদিগের আজ কি আনন্দ! মিসেস্ মুখার্জ্জির মর্ম্মস্থল মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল। হায়, দাম্পত্য-প্রীতির একটা ক্ষুদ্র স্মৃতি—মা বলিবার একটা কেউ যদি থাকিত—একটি পুত্র কি কন্যা! নিষ্ফল, লক্ষ্যহীন, নিরুদ্দেশ্য জীবন লইয়া সংসারে বাস বিড়ম্বনা! অবশিষ্ট জীবন কোন তীর্থস্থলে গিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় অতিবাহিত করিবার জন্য মিসেস্ মুখার্জ্জি প্রভাসের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রভাস কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিয়াছিল, "বেশ! কিন্তু মায়ের একটি কাজ তোমার শেষ ক'রে যাওয়া উচিত। তিনি চার বৎসর দুর্গা-পূজা কর্‌বার সঙ্কল্প করেছিলেন, তিন বৎসর বৈ হয় নি। তুমি তাঁর কন্যা। মায়ের সঙ্কল্প পূর্ণ করা তোমার কর্ত্তব্য।" স্থির হইল, পূজান্তে গায়ত্রী তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইবেন এবং যে তীর্থ মনোনীত হয়, তথায় বাস করিবেন। এ বৎসর তাই পূজার আয়োজন। পুরাণো ঝি ঘরে দীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। এই সময় অদূরে পূজার ঘরে মৃদু গুঞ্জনে সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিল—

জাগো, জাগো মা জননি।
দিন গেল, হ'ল আগত রজনী॥
ভুলায়ে আনিয়ে ভবে,
ভাসাইয়ে দুখার্ণবে,
আপনি ঘুমালে শিবে, জাগিবে কবে?
দিশেহারা হয়ে তারা ডুবে মা তনু-তরণী॥

মন্ত্রমুগ্ধবৎ মিসেস্ মুখার্জ্জি শুনিতে লাগিলেন। প্রভাসের কণ্ঠ তাঁহার চির-পরিচিত। কিন্তু এ-ত স্বর নয়, এ যে অশ্রুর নির্ঝর! সংযমের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়াও এই দুই বিচ্ছিন্ন হৃদয়ের তলে তলে সহানুভূতির একটা অনাবিল ধারা অন্তঃশিলা প্রবাহিত হইত। মিসেস্ মুখার্জ্জি ভাবিতে লাগিলেন, হায়! বৃথায় দিন বহিয়া গেল, অন্তরের দেবতা জাগিলেন কৈ? তাঁহাকে চেতাইয়া তুলিবার কি উপায় নাই? ভাগীরথীর মর্ম্মর তান, সিন্ধুতে বিন্দু দান করিবার জন্য চলধারার সে কল গান—আকুল আহ্বান, গায়ত্রীকে আজ মর্ম্মে মর্ম্মে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তখন হঠাৎ শব্দ উঠিল—'গেল, গেল, গেল! গাড়ী থামাও!' মিসেস্ মুখার্জ্জি নীচের দিকে চাহিলেন। গঙ্গার কূলে তখন গ্যাস্ জ্বালা হইয়াছে। 'মেয়েটা খুব বেঁচে গিয়েছে' বলিতে বলিতে কয়েকজন লোক একটি স্ত্রীলোকের দেহ বহন করিয়া একটা গ্যাস্-পোষ্টের তলায় স্থাপন করিল; তার পর বলাবলি করিতে লাগিল, 'পেটের ওপর দিয়ে চাকা চ'লে গিয়েছে। আছে—আছে, এখনও মরে নি।'

মুমূর্ষুর মুখের উপর

মুখার্জ্জি শিহরিয়া উঠিলেন—এ যে সেই মুসল্‌মানী ভিখারিণী, শিশু কন্যা কোলে লইয়া কত বার তাঁহার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে! "আহা! আহা!" বলিতে বলিতে মিসেস্ মুখার্জ্জি এক ঘটী জল লইয়া ছুটিয়া গিয়া মুমূর্ষুর মুখে চোখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ভিখারিণী চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, "বেটী!" কন্যা কাছেই ছিল, উত্তর দিল, "আম্মা!" মিসেস্ মুখার্জ্জি মুমূর্ষুর অধরোষ্ঠে জল-সিঞ্চন করিলেন। ভিখারিণী তাঁহার মুখের উপর কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া অতি ক্ষীণ মিনতি স্বরে কহিল, "মা—" মিসেস্ মুখার্জ্জি কহিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হও, গঙ্গা সাক্ষী, আজ থেকে আমি ওর মা।" ভিখারিণী চক্ষু মুদিল। যবন-কন্যাকে বুকে তুলিয়া লইয়া গায়ত্রী গৃহে ফিরিলেন। তখন চারিদিকে অধিবাসের বাজনা বাজিতেছে।

পুরোহিত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সময় বয়ে গেল যে, মা! এটা যে দেখছি, মোছরমানের মেয়ে! নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও! ঝাঁ ক'রে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে এস!"

"বাবা, আমি যে গঙ্গাতীরে কথা দিয়েছি, আজ থেকে আমি ওর মা।"

"কথা দিয়েছ? গঙ্গাতীরে? একটা ভিকিরীকে? তা দিয়েছ, দিয়েছ! তার ব্যবস্থা কর্‌লেই হবে। আমাদের পাড়ায় অনেক মোছরমান আছে, কিছু খোরাকী বরাদ্দ ক'রে একজনকে পাল্‌তে দিলেই হবে। যাও, নেয়ে এস।"

গায়ত্রী নড়িলেন না। পুরোহিত পুনশ্চ বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে যে! একটা ডুব দিয়ে এস! আমি ওর ব্যবস্থা ক'রে দেব। তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি সব ভার নিচ্ছি। তুমি ডুবটা দিয়ে এস।"

অতি মৃদু স্বরে গায়ত্রী বলিলেন, "আমি যে কথা দিয়েছি।"

পুরোহিতের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। বলিলেন, "কথা দিয়েছ? বটে! তুমি যবনকন্যা পালন কর্‌বে, আর আমি তোমার গৃহে পূজা কর্‌ব? সে কখনই হবে না।"

গায়ত্রী নতজানু হইয়া কহিলেন, "বাবা, দয়া কর, এ বিধাতার দান—"

"আরে, তাই কেন বল না! একটা পুষ্যি নেবে! সে বেশ ত! ওটাকে ফেলে দাও! আমি ভাল বামুনের মেয়ে এনে দেব! আমারই ছ'টা মেয়ে রয়েছে, কোন্‌টাকে চাও, বল না! যেটাকে ইচ্ছে মানুষ কর, বে দাও! যাও, এখন ডুবটা দিয়ে এস! প্রভাস কোথায় হে! ওটাকে কেড়ে নাও না।"

গায়ত্রী প্রাণপণে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

পুরোহিত, "প্রভাস, প্রভাস" করিয়া হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিলেন এবং সে সম্মুখে আসিতে বলিলেন, "স্ত্রীলোক, উনি যেন বুঝছেন না। তুমি দাঁড়িয়ে মজা দেখছ কি? ওটাকে কেড়ে নিয়ে দূর ক'রে দাও।"

প্রভাস সবিস্ময়ে কহিল, "কেড়ে নেব কি ঠাকুর! মা'র কোল থেকে ছেলে কেড়ে নেব, আমি এমনি পাষণ্ড?"

গায়ত্রী সকৃতজ্ঞ নেত্রে প্রভাসের মুখ পানে চাহিলেন। পুরোহিত নির্ব্বাক-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ উভয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তা হ'লে মায়ের অধিবাস হবে না?"

"তাতে না হয়, কি কর্‌ব!"

গালাগাল এবং তিরস্কার ব্যতীত এ কথার উত্তর নাই। পুরোহিত অবশেষে সেই পথই ধরিলেন। অতঃপর অভিসম্পাত! সে সকল ব্রাহ্মণকন্যা আয়োজন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল, পুরোহিত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যদি জাত দিতে চাও ত মোছরমানের ঘরে থাক।"

গায়ত্রীকে অটল অচল স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহারা একে একে সকলে গৃহ ত্যাগ করিল। গায়ত্রী নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। গৃহত্যাগকালীন পুরোহিত কহিলেন, "দেবীর সঙ্গে ঠাট্টা! সর্ব্বনাশ হবে!"

প্রভাস হাসিয়া বলিল, "আছে কি ঠাকুর, যে সর্ব্বনাশ হবে!"

গায়ত্রী যেন দুঃস্বপ্ন ভঙ্গে চকিত হইয়া বিষণ্ণ স্বরে কহিল, "আপনি চ'লে যাচ্ছেন, বাবা, আপনার দক্ষিণাটা—"

পুরোহিত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তা—দেবে, দাও! কি জান, মা, তোমাদের খ্রীষ্টানী মত—দেবতা-ব্রাহ্মণের খাতির ত কর না!"

প্রতিমার পূজা হইল না। তিন দিন সমভাবে কাটিল। অভুক্তা দেবীর মুখ চাহিয়া গায়ত্রীর চক্ষে যত জলধারা বহিয়াছে, ততই প্রাণপণে শিশু-কন্যাকে তিনি বুকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। গায়ত্রী ও প্রভাসের তিন দিন অনাহারে কাটিল। কিন্তু অন্ধ, খঞ্জ, আতুর তিন দিন পরিতৃপ্তি পূর্ব্বক [illegible]রিল।

নবমীর সন্ধ্যায় গায়ত্রী আজিও আবার উদাস নেত্রে সূর্য্য পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু আজ আর তাঁহার হাতে মালা নাই, কোলে যখনকন্যা। সেই আসন্ন সন্ধ্যায় দুই জন বাউল গঙ্গাকূলে গাহিল—

দিন যে গেল, সন্ধ্যা হ'ল, দীপ জ্বাল ঘরে।
মিলে আঁখি, দেখ না কি আছে ভিতরে॥

গায়ে ফুঁ দে নেচে কুঁদে,
কাল কাটালি নয়ন মুদে,
এখন, মিশে গেছে জলে দুধে চিন্‌বি কি ক'রে॥

আর কি রে দিন পাবি ফিরে,
হীরে দিয়ে কিন্‌লি জীরে,
প্রাণ হয়েছে সসেমিরে, শমন শিয়রে॥

বাকি কেবল একটা থাবি,
আজ আছিস্ কাল কোথায় যাবি,
শেষ হবে সাজা-নবাবি স'য়ের উপরে॥

এড়াতে শমনের কলে,
বেড়াস ঠাকুর ঠাকুর ব'লে,
ঠাকুর কি রে গাছে ফলে, পাবি মন্তরে?

খুঁজিস্ কি মন্দিরে মঠে,
সোনার ঠাকুর সর্ব্বঘটে,
পাবেনাক ঘটে পটে, খোঁজ অন্তরে।

ঘুরে মরিস্ দেশ-বিদেশে,
ঘরে ফিরে দেখ না এসে,
দীননাথ ঐ দীনের বেশে দাঁড়িয়ে তোর দোরে!

অনাথের নাথ অনাথ হয়ে,
বেড়ায় ব্যথার বোঝা বয়ে,
চোখ পেয়ে দেখলি নে চেয়ে, শতধিক্ তোরে!

জীবের সেবায় শিবের পূজা,
দ্বিভুজাতে দশভুজা,
প্রেমের লীলা চাও কিছু যা, পাও কি পাথরে?

প্রেমের মেলা এ সংসারে,
প্রেমময় তোর হৃদ্‌মাঝারে,
প্রেমের খেলায় আপনারে বিলিয়ে দে পরে॥

সেই দিন গভীর রাত্রে সেই অনর্চ্চিত প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইল। কিন্তু নিশাশেষে গায়ত্রী স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী মাতা-আসিয়া বলিতেছেন, "বাছা, তোমার পূজা সম্পূর্ণ হইয়াছে।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

সাধু ও নিন্দক।

(সাদীর অনুসরণে)

গুরুর সমীপে আসিয়া শিষ্য নিবেদিল "প্রভুপাদ,
সারাদিন শুধু অমুক প্রভুর করিছে নিন্দাবাদ।"
শুনে ক'ন গুরু, "আমার নিন্দা করেছে সে বুঝি ব্রত,
কর তার ব্রত উদ্‌যাপনের সহায়তা বিধিমত।
আমার দোষের কতটুকু জানে? ক'দিনের পরিচয়?
ষাট্ বছরের সব দোষ মোর অবগত তার নয়।
কত পাপ আমি করেছি জীবনে অবধি তাহার নাই,
ডাক তারে, মোর অপরাধগুলি সকলি জানাতে চাই,
অগণন মোর দোষ পাপ ত্রুটি সব শুধু জানি আমি,
আর জানে সব যা' কিছু গোপন মম অন্তরযামী।
দিও নাক বাধা, বন্ধু আমার করুক নিন্দাবাদ—
প্রচারে প্রচারে ক্ষয় হোক্ সব অপরাধ পরমাদ।
ডাক তারে বাছা, বসুক লইয়া কাগজ কলম তবে—
বৎসর ধরি লিখুক যা' বলি, বিরাট্ গ্রন্থ হবে।"

শ্রীকালিদাস রায়।

মনের খেলা।

১
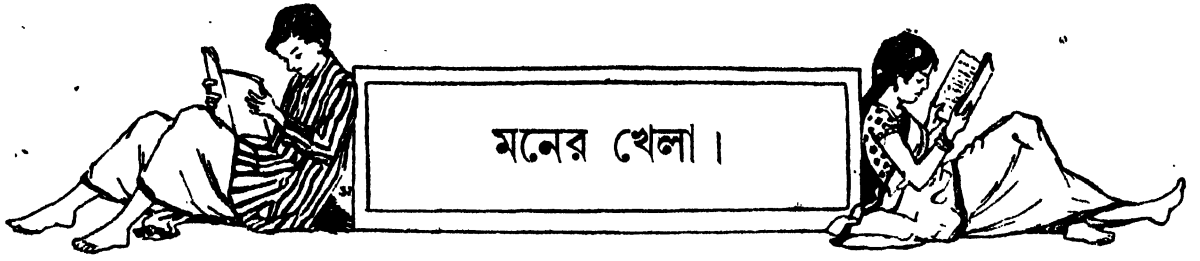
"ওগো! একবার ওঠ ত!"

পৌষ মাসের প্রখর শীতে, সন্ধ্যার পরেই সুকুমারী মেয়েকে লেপের মধ্যে, কোলের কাছে লইয়া একটু আরাম করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। স্বামীর আহ্বানে চমকিত হইয়া তিনি তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

নিশীথচন্দ্র তখনও বাহিরের বেশভূষা ছাড়েন নাই। শুধু টুপীটা র‍্যাকের উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। এত সকালে ডাক্তারখানা হইতে তিনি কোনও দিন ফিরেন না। কাযেই সুকুমারী বিস্মিতভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

নিশীথচন্দ্র বলিলেন, "ও ঘরে চল, তোমার জন্য একটা নূতন জিনিষ এনেছি, দেখ্‌বে এস।"

কৌতূহলভরে পত্নী স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কক্ষান্তরে গেলেন। গৃহমধ্যে একটি ক্ষুদ্র বালক একখানা কম্বল জড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাচক, ভৃত্য ও দাই তাহার চারিদিকে জটলা করিতেছিল। নিশীথচন্দ্র সকলকে কক্ষত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

তখন সেই কালো পাতরের মত কৃষ্ণবর্ণ, অপ্রিয়দর্শন, ক্ষুদ্র বালকটিকে দেখাইয়া নিশীথচন্দ্র বলিলেন, "একে আজ কুড়িয়ে পেয়েছি, সুকু। লালন-পালন করতে পারবে?"

সুকুমারী ভাবিয়াছিলেন, স্বামী না জানি কি অপূর্ব্ব জিনিষই তাঁহার জন্য আনিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে শেষে একটা কালো, কুৎসিতদর্শন, কুড়ান বালকে পরিণত হইবে, এরূপ অসম্ভব কল্পনা ভ্রমেও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। সুতরাং একটু বিহ্বলভাবেই তিনি স্বামীর দিকে চাহিলেন।

নিশীথচন্দ্র বলিলেন, "বুঝ্‌তে পার্‌লে না বুঝি? শোন তবে—তিন দিনের প্লেগে ছেলেটির বাপ, মা, ভাই, বোন্ সব মারা গেছে। শুধু ওকে বাদ রেখে দিয়েছে, দয়া ক'রে কেন যে ওকে নিয়ে যায়নি, তা বল্‌তে পারি না। ত্রিসংসারে ওর কেউ নেই দেখে, এবং কোন হিন্দু ওর ভার নিতে রাজি না হওয়ায় শেষে মিশনারীদের হাতে ওকে তুলে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। আমি খবর পেয়েই আগে ওকে দখল ক'রে ফেলেছি। মিশনারীদের কাছে গেলে ও খৃষ্টান হয়ে যেত; হিঁদুর ছেলে সেটা সহ্য কর্‌তে পার্‌লাম না। মন্দ কায করেছি কি সুকু?"

ঘাড় নাড়িয়া সুকুমারী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পিতৃমাতৃহীন, নিঃসহায় বালকের করুণ-কাহিনী শুনিয়া ডাক্তার-গৃহিণীর মাতৃ-হৃদয় কি সহানুভূতি ও মমতায় আর্দ্র হইয়াছিল? তাই কি এ দীর্ঘশ্বাস?

বালক তাহার ক্ষুদ্র, কালো, উজ্জ্বল নয়নযুগল তুলিয়া দম্পতির দিকে চাহিতেছিল। সুকুমারী বালকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কি জাতের ছেলে, জান?"

মৃদু হাসিয়া নিশীথচন্দ্র বলিলেন, "শিশুর কি জাতবিচার করতে আছে, সুকু? সব শিশুই ত ভগবানের দান! যাক্—ছেলেটি ভাল বংশেই জন্মেছে; জল-চল। ওর বাপ কাঁসারী ছিল। তোমার রান্নাঘর ও জলের কলসী অপবিত্র হবার ভয় নেই।"

পত্নীর সুগৌর গণ্ডদেশে সহসা যেন লজ্জার রক্তিমরাগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু স্বামী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি ঠাট্টা কর্‌ছিলাম; কিছু মনে করো না, সুকু। দেখ, বেচারা বোধ হয় সারাদিন পেট ভ'রে কিছু খেতে পায়নি। তুমি ওর খাবার ব্যবস্থা ক'রে ফেল। আর একটা কথা, ও আমার কুড়ানো ছেলে, তুমি আজ থেকে ওর মা।—তোর নাম বদ্রি না?"

বালক মৃদুকণ্ঠে বলিল, "জী—হুজুর।"

সুকুমারী বালককে সঙ্গে করিয়া রন্ধনাগারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

২

পিতৃমাতৃহীন বদ্রি, আত্মীয়-স্বজনবর্জ্জিত আট বৎসরের বালক, আগ্রার সরকারী ডাক্তার নিশীথচন্দ্রের বাড়ীতেই

রহিয়া গেল। 'বাবুজী' ও 'মায়ীজী'র আদর-যত্নে তাহার কোন অভাব, কোন কষ্টই আর রহিল না। পিতামাতা প্রভৃতির বিয়োগ-দুঃখের স্মৃতিও অল্পদিনের মধ্যে বালকের তরুণ হৃদয়ের আকাশপট হইতে ধীরে ধীরে যেন মুছিয়া গেল। কন্যার সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিশীথচন্দ্র একটা 'দাই' রাখিয়াছিলেন বটে; কিন্তু দুই বৎসরের খুকী বীণা, বালক বদ্রির কোলে পিঠে চড়িয়াই বেড়াইতে লাগিল। সেই নবনীত-কোমল, নধরগঠন, ফুলের মত সুন্দরী খুকীকে কোলে লইয়া, তাহার চাঁদমুখে উচ্ছ্বসিত হাসির লহর দেখিয়া বালক-বদ্রির অন্তরে বাহিরে আনন্দের যে সুধাস্রোত উছলিয়া উঠিত, তাহার আতিশয্য সে অনেক সময় সংবরণ করিতে পারিত না। এই ভক্ত বাহনটি সর্ব্বদাই বীণার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর খুকী যখন কাঁদিয়া উঠিত, বাৎসল্যময়ী জননীর ন্যায়ই ব্যগ্র উদ্বেগভরে তখনই শত কায ফেলিয়া বদ্রি শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া যাইত এবং নানা উপায়ে খুকীকে সে শান্ত করিত। বীণাও এই ঘোর কৃষ্ণকান্তি, অপ্রিয়দর্শন বালকের কোলে পিঠে চড়িতে বিন্দুমাত্র আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ করিত না। কোন সময়ে 'দাই' ও বদ্রি মজা দেখিবার জন্য একই কালে খুকীকে কোলে লইতে হাত বাড়াইলে, শিশু হাসির লহর তুলিয়া, দাইকে উপেক্ষা করিয়া বালকের উদ্যত, ক্ষুদ্র, কালো বাহুর মধ্যেই ঝাঁপাইয়া পড়িত। বদ্রির হৃদয় তখন বিশ্বজয়ী বীরের ন্যায়ই আনন্দ-গর্ব্বে ভরিয়া উঠিত। আর নিশীথচন্দ্র ও সুকুমারী কন্যার এইরূপ বদ্রি-প্রীতি দেখিয়া আনন্দে হাসিতেন।

এই কুৎসিতদর্শন, ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ হিন্দুস্থানী বালকের প্রতি শিশুর এই পক্ষপাতিত্ব কেন? শিশুচিত্ত স্বতঃই অসুন্দরের প্রতি বিমুখ, সৌন্দর্য্যের ভক্ত। কিন্তু শুধু বাহিরের রূপই কি শিশুচিত্তকে জয় করিতে পারে? যাহার বাহিরে শুধু সৌন্দর্য্যের বিলাস—অন্তরে স্নেহ, মমতা, করুণা, ভালবাসার রেখাপাতমাত্র হয় নাই, এমন বাহ্য সৌন্দর্য্যে শিশু-চিত্ত কি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়? অসম্ভব। কিন্তু অপ্রিয়-দর্শন হইলেও যাহার ভিতরটি স্নেহ-মমতায় আর্দ্র, শিশু কিন্তু অনতিকালের মধ্যে তাহারই অনুরক্ত হইয়া পড়ে। ইহাই শিশু-হৃদয়ের গূঢ়তম রহস্য। বড় বড় দার্শনিকের অপেক্ষাও সহজে ও অভ্রান্তভাবে শিশু-হৃদয় প্রকৃত মানুষ চিনিয়া লইতে পারে। দুই বৎসরের খুকী কি বালক বদ্রির অন্তরের স্নিগ্ধ, মধুর, মমতাভরা উৎসের সন্ধান পাইয়াছিল?

শৈশব জীবনের সমুদয় স্মৃতি লুপ্তপ্রায় হইলেও বালকের হৃদয়ের একপ্রান্তে তাহার ছোট বোনটির কথা হয় ত সুপ্তপ্রায় ছিল। বীণারাণীকে নাড়িয়া চাড়িয়া হয় ত সেই সহোদরার স্মৃতি নূতনভাবে তাহার মনে জাগিয়া উঠিত! অবশ্য, ধনীর দুলালী কন্যার মত রূপ তাহার ছিল না; কিন্তু খেলার সময় সেই শিশুর অকপট নির্ভরতা, মুখের সেই অনাবিল হাসি—বীণার সহিত তাহার পার্থক্য কতটুকু? বীণাকে কেন্দ্র করিয়া বদ্রির পরলোকগতা সহোদরার স্মৃতি অনুক্ষণই তাহার হৃদয়ে জাগিয়া থাকিত। তাহার বুভুক্ষু ভ্রাতৃ-হৃদয় খুকুরাণীর সেবা করিয়াই যেন তৃপ্তি ও চরিতার্থতা লাভ করিত।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীণা যখন পুতুলের সহিত ঘনিষ্ঠতা পাতাইয়া খেলায় মগ্ন হইয়া থাকিত, প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায় বদ্রি অদূরে বসিয়া একাগ্রমনে তাহাই লক্ষ্য করিত। একটি শব্দ অথবা বাক্য দ্বারাও সে তখন বালিকার খেলার আনন্দ বা একাগ্রতায় বাধা জন্মাইত না। তার পর সহসা মুখ ফিরাইয়া বীণা যখন আধ আধ স্বরে ডাকিত, "বদ্লি!" তখন সে দ্রুতগতিতে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত এবং তাহার 'বীণাদি'র আদেশ—খেয়াল প্রতিপালন করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিত।

সাধারণতঃ বয়সের সঙ্গে মানুষের দেহের ও মনের পরিপুষ্টি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু মনের পরিণতির কথা বলা যায় না। তবে বদ্রির দৈহিক গঠনের যে ক্রম-পরিপুষ্টি ঘটিতেছিল না, ইহা তাহার দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যাইত। তাহার শরীরের গঠনটা পাকান। অনেক বৃক্ষ অথবা লতা বয়সে বাড়িলেও যেমন আকারে বাড়িয়া উঠে না, ঠিক সেইরূপ। মাংসপেশী সমূহ সুদৃঢ় ও সবল হইলেও তাহার দেহের গঠন বয়সের অনুপাতে পরিপুষ্ট হয় নাই। তাহাকে দেখিয়া সহজে কেহ তাহার বয়স নির্দ্ধারণ করিতে পারিত না। চৌদ্দ বৎসরের বদ্রিকে সকলেই দশ বৎসরের বালক বলিয়া অনুমান করিত। কিন্তু যখন সে বড় বড় জলের কলসী অথবা গুরুভার জিনিষ অবলীলাক্রমে স্থানান্তরিত করিত, তখন তাহার সামর্থ্য দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া পড়িত। ঐ পাকান দেহের অন্তরালে এমন শক্তি কিরূপে থাকিতে পারে, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিত না।

নিশীথচন্দ্র ও তাঁহার পত্নীকে বদ্রি দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, ভালবাসিত। তাঁহাদের সেবায় সে আত্মবিস্মৃত হইত। পরিচিত ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ ফটকের কাছে আসিয়া থামিলেই বদ্রি সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়া সেখানে দাঁড়াইত, তাঁহার ঔষধের ব্যাগ বা আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সযত্নে তুলিয়া লইয়া ঘরে আনিয়া রাখিত। ক্ষিপ্রহস্তে জুতার ফিতা খুলিয়া দিয়া, কোট, প্যাণ্ট, টুপী, মোজা স্বহস্তে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া সে পিতৃতুল্য আশ্রয়দাতার পরিচর্য্যা করিত; সুকুমারীকেও অনেক সময় সে এ সকল কার্য্যে অধিকার পর্য্যন্ত দিত না। তাহার নিপুণ সেবায় উভয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন।

গৃহের প্রত্যেক খুঁটি নাটি, প্রয়োজনীয় দ্রব্য বদ্রির নখদর্পণে ছিল। কোনও জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, বদ্রি নিমেষমধ্যে তাহা যথাস্থান হইতে আনিয়া উপস্থিত করিত। সে বেশী কথা বলিত না, কিন্তু তাহার কালো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-পথ হইতে এতটুকু বিষয় এড়াইয়া যাইত না। নিশীথচন্দ্র ও সুকুমারীর বদ্রিকে না হইলে একদণ্ড চলিত না। সে পরিচারক নহে, অথচ পরিচর্য্যার যাবতীয় অধিকার সে আপনা হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল। মুখ ফুটিয়া তাহাকে কোনও দিন কোনও কথা বলিতে হইত না, সে শুধু তাঁহাদের দৃষ্টি দেখিয়াই প্রয়োজনটি বুঝিয়া লইতে পারিত।

নিশীথচন্দ্র, সুকুমারী অথবা বীণার শরীর অসুস্থ হইলে, বদ্রির আহার-নিদ্রার জ্ঞান থাকিত না। নিপুণা ধাত্রীর ন্যায় সে অনুক্ষণ তাঁহাদের পরিচর্য্যা, শুশ্রূষায় নিমগ্ন হইয়া যাইত। সহস্র প্রতিবাদেও সে নিরস্ত হইত না। বিশেষতঃ বীণারাণীর অসুখ করিলে বদ্রির উদ্বেগের অন্ত থাকিত না। তাহার আননের আনন্দ-দীপ্তি যেন ম্লান হইয়া যাইত। রোগীর কক্ষ হইতে সে নড়িতেই চাহিত না। বালকের ক্রীড়ার প্রতি আসক্তি চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু বদ্রির সকল ক্রীড়া, সমুদয় আনন্দ বীণারাণীকে কেন্দ্র করিয়াই বাড়িত বা কমিত।

৩

আগ্রা হইতে মীরাট, তথা হইতে দিল্লী, তাহার পর লক্ষ্ণৌ, এইরূপে নানাস্থানে বদলি হইতে হইতে যখন তিনি কানপুরে আসিলেন, তখন নিশীথচন্দ্রের ধৈর্য্যও শেষসীমায় উপনীত হইয়াছিল। এমনভাবে বেদিয়া-জীবন যাপন দুঃসহ, অত্যন্ত বিরক্তিকর। পুনঃপুনঃ স্থানপরিবর্ত্তনে একমাত্র সন্তান বীণার সুশিক্ষার বিশেষ অন্তরায় ঘটিতেছিল। সর্ব্বত্র উপযুক্ত বালিকা-বিদ্যালয়ও ছিল না, বাড়ীতে পড়াইবার সুযোগ্য বাঙ্গালী শিক্ষকও সুলভ ছিল না। সুকুমারী নিজেই কন্যার শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন, অবসরকালে নিশীথচন্দ্রও তাহার পড়া-শুনা দেখিতেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে বাঙ্গালীর আদর্শে গড়িয়া তুলাই পিতামাতার লক্ষ্য ছিল। যুক্তপ্রদেশের আব্‌হাওয়ার মধ্যেও তাঁহারা বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষার দিকে বিশেষরূপে অবহিত ছিলেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কন্যার বরদেহে নবীনতার তরুণশ্রীর বিকাশ লক্ষ্য করিয়া মাতার মনের উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিতেছিল। মেয়েকে পাত্রস্থ করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু নিশীথচন্দ্র সে সকল কথা কানে তুলিতেন না। এখনই ব্যস্ত কি? কিন্তু কানপুরে আসিবার পর তাঁহার মনের গতি সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, প্রকৃতি দেবী যেরূপ ক্ষিপ্রহস্তে কন্যার দেহে সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্যভার বহন করিয়া আনিতেছেন, তাহাতে আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। বীণার তরুণ আননে শুক্লা রজনীর বাল-জ্যোৎস্নার তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়া তিনি সঙ্কল্প দৃঢ় করিলেন। কিন্তু এতদূর হইতে তাহার উপযুক্ত ঘর ও বরের সন্ধান কি করিয়া পাওয়া যায়?

নানা কারণে বর্ত্তমান জীবন-যাত্রার প্রণালীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হইয়াছিল। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় ফলে তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তিলাভ ঘটিতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণের স্পন্দন বাঙ্গালা ছাড়া অন্যত্র অনুভব করা যায় না। সেইখানেই বাঙ্গালীর মান ও প্রাণকে যথার্থভাবেই পাওয়া যাইতে পারে। অনেক দিন হইতেই এই কথাটা তাঁহার চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল; কন্যার বিবাহের চিন্তা তাঁহার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিয়া তুলিল। বাঙ্গালায় গিয়া—বাঙ্গালীর মধ্যে থাকিয়া, স্বজাতির প্রীতি, আনন্দ, সুখ, দুঃখ, হিংসা, দ্বেষকে সমভাবে বরণ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন—চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। যে দেশের মাটীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পিতৃপিতামহগণ যে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামের পর দেহরক্ষা করিয়াছেন, শত আবর্জ্জনাপূর্ণ হইলেও তাহা তাঁহার কাছে পবিত্র, মধুর, সুন্দর।

এই কর্ম্মক্ষেত্রে কায করিতে করিতে দেহরক্ষা করিতে পারিলেই তাঁহার জীবন ধন্য হইবে, ধর্ম্ম অব্যাহত থাকিবে।

সুকুমারী স্বামীর সঙ্কল্পের কথা শুনিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বাধা দিলেন না। তাঁহার চিত্তও 'সুজলা-সুফলা' বঙ্গভূমির শ্যামশীতল অঙ্কে ফিরিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। বিশেষতঃ কন্যার ভাল 'ঘরবরের' জন্য তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়াও পড়িয়াছিলেন।

আর বীণা? সেও শুনিয়াছিল যে, বাবা চাকরি ছাড়িয়া বাঙ্গালাদেশে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিবেন। সে কখনও বঙ্গভূমি দেখে নাই। সে বাঙ্গালীর মেয়ে; কিন্তু যুক্তপ্রদেশের অঙ্কেই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালার কথা, বর্ণনা, সে শুধু কেতাবেই পড়িয়াছে, লোকের মুখেই শুনিয়াছে। সে কেমন দেশ! কবি, সোনার বাঙ্গালার মধুর চিত্র, ভাষার ঝঙ্কারে কি হৃদয়গ্রাহী করিয়াই না আঁকিয়াছেন! বাঙ্গালার আকাশ, বাতাস, পথ, প্রান্তর, নদীর জল সবই মধুর, সবই সুন্দর! গাছের পাতা, ফুলে পল্লবে শ্যাম-সুষমায় কি ছড়াছড়ি! বাঙ্গালা—বাঙ্গালীর বাঙ্গালা! তোমার স্নেহশীতল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বীণার জীবন কি ধন্য হইবে না?

উচ্ছ্বসিত আগ্রহে, উৎসাহভরে বীণা বলিল, "বদ্‌রি, বাবা বলেছেন, তুইও আমাদের সঙ্গে যাবি। দেখিস্, সে কি চমৎকার দেশ!"

বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও খর্ব্বকায় বদ্‌রিকে বীণা যেন কনিষ্ঠের মতই দেখিত। দেহের পুষ্টি অনুরূপ না হইলেও বয়স যে তাহার বাড়িতেছিল, এ কথাটা বীণা কেন, কেহই মনে করিতে পারিত না।

বীণাকে বদ্‌রি 'বীণাদি' বলিয়া ডাকিত। বাঙ্গালী পরিবারে—বিশেষতঃ নিশীথচন্দ্রের গৃহে লালিত-পালিত হওয়ায়, সে বাঙ্গালা ভাষায় বেশ কথা কহিতে পারিত। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, বাড়ীর কেহই হিন্দীতে কথাবার্ত্তা বলিতেন না। এ বিষয়ে নিশীথচন্দ্রের প্রখর দৃষ্টি ছিল। কাযেই বদ্‌রিও বাঙ্গালা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখিয়াছিল। বীণা যখন উচ্চৈঃস্বরে পাঠ আবৃত্তি করিত, বদ্‌রি কক্ষতলে বসিয়া হাঁ করিয়া তাহা শুনিত। শুধু শুনিত না, বুঝিবার চেষ্টা করিত। 'কখনও কাহাকে কুবাক্য বলিও না; কুবাক্য বলা বড় দোষ' হইতে আরম্ভ করিয়া, 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' প্রভৃতি নানা গদ্য, পদ্য ও গানের ছত্র বা চরণ তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। নিশীথচন্দ্র প্রথমতঃ বদ্‌রিকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া পড়াশুনা করিবার আগ্রহ তাহার আদৌ ছিল না। প্রথমভাগের, 'অচল, অধম' পর্য্যন্ত পড়িবার পর তাহার পাঠ আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। নিশীথচন্দ্র অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সকলের সেবা করিতে পারিলেই সে যেন চরিতার্থ হইয়া যাইত।

বীণাদি'র কথা শুনিয়া বদ্‌রি স্মিতহাস্যে তাহার আগ্রহ প্রকাশ করিল। নিজের দেশ, নিজের জাতভাই বলিয়া বিশেষ কোন জ্ঞান তাহার পরিপুষ্ট হয় নাই। নিশীথচন্দ্রের গৃহই তাহার বাড়ী, ডাক্তার-দম্পতিই তাহার পিতামাতা, 'বীণাদি'ই তাহার বহিন, তাঁহাদের সুখ-দুঃখেই তাহার সুখ-দুঃখ, ইহাই সে বুঝিত। নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা সে কল্পনা করিতেই পারিত না।

৪

কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিশীথচন্দ্র পাত্রের সন্ধানও করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা ব্যাঙ্কে বেশ মোটা টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। নিজের উপার্জ্জন হইতেও সঞ্চয়ের পরিমাণ মন্দ ছিল না। সুতরাং কলিকাতায় জীবন-যুদ্ধে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইল না। কলিকাতার কোনও ভদ্রপল্লীতে তিনি একটি বড় বাড়ীও ক্রয় করিয়াছিলেন, গাড়ী-ঘোড়ার বন্দোবস্তও হইয়াছিল।

অনেক দেখা-শুনার পর বীণার জন্য একটি সুপাত্র মিলিল। ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন-স্বরূপ। পেন্সন-প্রাপ্ত সদরালা পিতার চেষ্টায় সুধীরচন্দ্র ডেপুটিগিরিপদে পাকা হইয়া দুই বৎসর কায করিতেছিলেন। এই রূপবান্ ও গুণবান্ পাত্রটিকে নিশীথচন্দ্র হাতছাড়া করিলেন না। বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়া দিনস্থির হইয়া গেল।

একমাত্র সন্তানের বিবাহ, নিশীথচন্দ্র সখ মিটাইয়া খরচ করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রণ-বাটী আত্মীয়-স্বজনের আগমনে উৎসব-মুখর হইয়া উঠিল।

সৌধ-কিরীটিনী রাজধানী কলিকাতার বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের বিপুলতা দেখিয়া বদ্‌রি প্রথমতঃ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকদিন সে 'সরকার মহাশয়ের' সহিত বেড়াইয়া সহরের অনেক জিনিষই দেখিয়া লইয়াছিল। সহরের জীবন-যাত্রাটা

কিছু অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার 'বীণাদির' শুভ-বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল, তখন তাহার কাযের মাত্রা বাড়িয়া গেল। সে কখনই বেশী কথা কহিত না; কিন্তু কায করিত অনেক। এমন মুখ বুজিয়া কায করিতে নিশীথচন্দ্র আর কাহাকেও দেখেন নাই। তাই সকল বিষয়েই বদ্‌রিকে তাঁহার প্রয়োজন হইত। তাহাকে না হইলে ডাক্তার-দম্পতির একদিনও চলিত না। গৃহস্থালীর সকল বিষয় গুছাইয়া রাখিবার ভার তাহারই উপর ছিল। সকল কাযেই বদ্‌রি—সে না হইলে নিপুণভাবে, নির্ভুলভাবে কে আর মূল্যবান্ জিনিষপত্রের হিসাব রাখিবে? এই গুরু দায়িত্ব-লাভে বদ্‌রির হৃদয়ও কৃতজ্ঞতায় ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বিবাহের দিন সকালে নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সুকুমারী যখন স্বর্ণকারের আনীত মূল্যবান্ অলঙ্কারপূর্ণ বাক্সটি আনিয়া বদ্‌রির হস্তে অর্পণ করিলেন, তখন সে সত্যই পুলকিত ও বিস্মিত হইল। উহার মধ্যে হীরা-মুক্তার কায করা অলঙ্কারগুলি কি সুন্দর, কি মনোরম! কুটুম্বিনীগণ একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বদ্‌রি সেই সুদৃশ্য, মূল্যবান্ গহনাগুলি দেখিল। হাঁ, দেবী ভগবতীর মত 'বীণাদি'র অঙ্গস্পর্শে অলঙ্কারগুলি ধন্য ও পবিত্র হইবে।

লোহার আলমারী খুলিয়া সে সযত্নে অলঙ্কারগুলি তুলিয়া রাখিল।

অপরাহ্নের দিকে কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে সুকুমারী বদ্‌রির খোঁজ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখন তাহার উদ্দেশ মিলিল না। কেহ বলিল, সারাদিনের গুরুপরিশ্রমের পর বাহির বাটীর কোথাও হয় ত সে পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। হইতে পারে, মানুষের শরীর ত বটে! সত্যই ত, আজ কয়দিন তাহার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম চলিতেছে। প্রয়োজনীয় কাযটা সুকুমারী নিজেই সারিয়া লইলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সমগ্র অট্টালিকা বৈদ্যুতিক আলোকে হাসিতে লাগিল! বাহিরে নহবৎ মধুররাগিণী আলাপ করিতেছিল! ব্যস্তভাবে সুকুমারী কক্ষান্তরে যাইতেছেন, এমন সময় চিরপরিচিতকণ্ঠে শব্দ হইল—"মা-জী!"

সুকুমারী ফিরিয়া চাহিয়া বদ্‌রিকে দেখিতে পাইলেন।

বাঙ্গালীর মত সহজভাবে বাঙ্গালায় সব কথা বলিতে পারিলেও সে "বাবুজী" ও "মায়ীজী" এই দুইটি শব্দ পরিত্যাগ করে নাই। তবে কলিকাতায় আসিবার পর হইতে "মায়ীজী"কে সংক্ষিপ্ত করিয়া সে "মা-জী" বলিত।

"কি রে বদ্‌রি, তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি?"

"মায়ীজীর" পশ্চাৎ চলিতে চলিতে সে বলিল, "সরকার ম'শয়ের সঙ্গে একটু বাজারে গিয়েছিলুম, মা-জী।"

"তা বেশ করেছিস্। একটু আগে বাবু তোকে খুঁজছিলেন, শুনে আয়।"

"যাচ্ছি" বলিয়া বদ্‌রি দাঁড়াইয়া যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

সুকুমারী তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোর কি কোন কথা বল্‌বার আছে, বদ্‌রি?"

একটা ছোট নীল কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বদ্‌রি কুণ্ঠিতভাবে তাহা "মায়ীজী"র হস্তে অর্পণ করিল।

মোড়কটি খুলিয়া ফেলিতেই উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি ক্ষুদ্র স্বর্ণ-প্রজাপতির উপর পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। বদ্‌রির কালো নয়ন-যুগলের উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিয়া তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "কি হবে রে?"

বদ্‌রির দৃষ্টি মুহূর্ত্ত ভূমিলগ্ন হইল। পরক্ষণেই সে মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল, "বীণাদির কানে মানাবে কি, মা-জী?"

সুকুমারীর মনে পড়িল, এইজন্যই বুঝি বদ্‌রি দ্বিপ্রহরে তাঁহার নিকট হইতে তাহার সঞ্চিত পার্ব্বণীর টাকাগুলি চাহিয়া লইয়াছিল! এ উপহার অতি দীন, অতি তুচ্ছ হইতে পারে; কিন্তু কি অসীম স্নেহের প্রেরণা, কি নিষ্ঠাপূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তির স্মৃতি এই নগণ্য উপহারকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সুকুমারীর উদার, গভীর মাতৃহৃদয় অনায়াসে অনুভব করিতে পারিল। তাঁহার মনশ্চক্ষে অকস্মাৎ অতীতের দৃশ্যাবলী বায়স্কোপের চলচ্চিত্রের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেবার ইনফ্লুয়েঞ্জার ভীষণ আক্রমণে বাড়ী-শুদ্ধ সকলেই যখন শয্যাশায়ী, তখন এই বদ্‌রিই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। নিশীথচন্দ্র শয্যায় শুইয়া জ্বরের যন্ত্রণায় অস্থির, সুকুমারী উত্থান-শক্তি-বিরহিত, বাড়ীর পাচক, দাস-দাসী সকলেই পীড়িত। সাত বৎসরের বীণা জ্বরের ঘোরে অচেতন। তের বৎসরের বদ্‌রি ডাক্তার ডাকা হইতে আরম্ভ করিয়া পথ্য ও শুশ্রূষা সকল ব্যাপারেই কি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিল, তাহা কি তিনি জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিবেন? বীণা বমি করিতেছে—পাত্র আনিবার অবসর নাই—বদ্‌রি

কৃতজ্ঞচিত্তে অঞ্জলি ভরিয়া উহা ধারণ করিল! শুধু কি তাই? এমন অকুণ্ঠিত সেবা, এমন প্রাণপাত পরিশ্রম তিনিও . হয় করিতে পারিতেন না! শত কার্য্যে তিনি, বীণার প্রতি বদ্রির সোদরাধিক স্নেহের অজস্র প্রমাণ পাইয়াছেন।

সকল কথা স্মরণ করিতে তাঁহার নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত হইল।

"আমার সঙ্গে আয়, বদ্রি" বলিয়া তিনি অগ্রে চলিলেন। সুসজ্জিত, আলোকিত কক্ষমধ্যে আত্মীয়া-কুটুম্বিনী-পরিবৃত হইয়া বীণা বসিয়াছিল। 'কনে' সাজাইয়া আত্মীয়ারা সেখানে জটলা করিতেছিলেন। বীণাকে তখন শোভাময়ী দেবীর মতই দেখাইতেছিল। সুকুমারী স্বর্ণ প্রজাপতি দুইটি কন্যার হাতে দিয়া বলিলেন, "বীনু মা, বদ্রি দিয়েছে, প'রে দেখ ত!"

দ্বারপ্রান্তে পাংশুমুখে বদ্রি দাঁড়াইয়া ছিল। জিনিষটা কি, দেখিবার জন্য সকলেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তার পর কেহ বা মুখ বাঁকাইলেন, কেহ নাক সিট্কাইলেন, কেহ বা কোন মন্তব্য প্রকাশও অনাবশ্যক মনে করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। বদ্রির দৃষ্টি এ সকল উপেক্ষার চিহ্ন দেখিয়া যেন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল।

বীণার প্রভাত-প্রসন্নপদ্মের মত কমনীয় আননে তৃপ্তির একটা মধুর হাস্যরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে স্নিগ্ধ, মৃদু-কণ্ঠে বলিল, "বাঃ! বড় চমৎকার ত!" সঙ্গে সঙ্গে সে কানের হীরক-দুলজোড়া খুলিয়া, সেই ছিদ্রপথে ক্ষুদ্র প্রজাপতি-যুগল সন্নিবিষ্ট করিল।

মাতা বলিলেন, "ওরে বদ্রি, এই দেখ, কেমন সুন্দর মানিয়েছে!"

প্রাণদণ্ডের আসামী, সহসা মুক্তির আদেশ পাইলে, যেমন অভিভূত হইয়া পড়ে, বদ্রির অবস্থাটা অনেকটা সেইরূপ হইল। কিন্তু সমবেত নারীবৃন্দের নীরব-নয়নের দৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ দেখিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল।

হীরক-দুলজোড়া মাতার হস্তে ফিরাইয়া দিয়া বীণা বলিল, "প্রজাপতিই কানে থাকুক্।"

সুকুমারী গাঢ়স্বরে বলিলেন, "বেশ ত।"

বদ্রি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না।

বীণার সমবয়স্কা মাসতুত ভগিনী অন্নপূর্ণা শ্বশুরালয় হইতে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিল। সে বলিল, "ও ছোঁড়াটা কে রে?"

বীণা ধীরকণ্ঠে বলিল, "ও ছোঁড়া নয়—ও আমার ভাই, দাদা! আমার মা'র পেটের ভাই-বোন্ নেই, ওই আমার সে অভাব দূর করেছে।"

৫

আলো জ্বালিয়া, বাজী পুড়াইয়া, বিপুল শোভাযাত্রা সহ বর যখন আসিল, বদ্রি তখন সভা-ক্ষেত্রের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। সেই সুন্দর বর-মূর্ত্তি দেখিয়া চারিদিক হইতে প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল।

হাঁ, তাহার 'বীণাদি'র যোগ্যপাত্রই 'বাবু-জী' নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীর মত, না না, সরস্বতীর মত—না না, দেবী ভগবতীর মত 'বীণাদি'র পার্শ্বে, মহাদেবের ন্যায় এই বরকে কি সুন্দর মানাইবে! আঃ! তখন তাহার 'বীণা-দি'র মুখে তৃপ্তির কি মধুর হাস্যই না উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে! সে কি শুধুই হাসি? পূর্ণিমার চাঁদের আলোকও কি সে হাসির কাছে ম্লান হইয়া যায় না? তার পর, জামাইবাবুর সঙ্গে বীণাদি যখন চলিয়া যাইবে, তখন—তখন—পৃথিবীর সব আলো কি তখন নিবিয়া যাইবে না? তাই ত!—

বদ্রি দুই হস্তে চক্ষুমার্জ্জনা করিল। তাহার নয়নপথে কি অমাবস্যার ঘনান্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল? উঃ! তাহার বুকের মধ্যে এ কি ভীষণ শব্দ!

"পান! পান!"—"তামাক দে রে"—"সিগারেট কই?"

বদ্রির চমক ভাঙ্গিল। সে শরীরকে নাড়া দিয়া যেন সমস্ত অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিল। তার পর দ্রুতপদে ভিতরের দিকে ছুটিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে একহাতে পানের থালা, অপর হস্তে সিগারেট ও চুরুটের আধার লইয়া সে সভা-ক্ষেত্রে পুনরায় প্রবেশ করিল।

চারিদিকেই চীৎকার, ডাকাডাকি, দৌড়াদৌড়ি। কর্ম্ম-সমুদ্রের মাঝে বদ্রি ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুশাসন পাতিয়া, পাতা, গেলাস, খুরী সাজাইয়া বদ্রি যেন চরকীর মত ঘুরিতে লাগিল। যেখানে যাহার যাহা প্রয়োজন, বদ্রি তখনই তাহাকে সেই জিনিষ যোগাইয়া দিতেছিল। তাহার ক্লান্তি ছিল না, বিরক্তি ছিল না।

অধিক রাত্রিতে লগ্ন। কলিকাতার সমাজে বিবাহের পূর্ব্বেই ভোজের হাঙ্গামা মিটিয়া যায়, কোনও বালাই নাই। গণ্ডগোল অনেকটা মিটিয়া গেল।

ক্রমে শুভলগ্ন ঘনাইয়া আসিল। শঙ্খরোল ও হুলুধ্বনির মধ্যে কন্যাকে অন্তঃপুর হইতে বিবাহ-প্রাঙ্গণে লইয়া আসা হইল। নহবত তখন বড় মিঠা রাগিণী আলাপ করিতেছিল।

যথানিয়মে শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান প্রভৃতি বিবাহের অনুষ্ঠান-শেষে কন্যা-জামাতা ভিতরে চলিয়া গেল। নিশীথচন্দ্র তখন অবশিষ্ট অভুক্তদিগের আহারাদির তদ্বির করিতে লাগিলেন। পিতার কর্ত্তব্য, গৃহীর কর্ত্তব্য তিনি স্বয়ং পালন করিতে ভালবাসিতেন। আজও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

সকল কায মিটিতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। তখন উৎসবশ্রান্ত অট্টালিকার সর্ব্বত্রই অবসাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বহির্ব্বাটীতে যে যেখানে পাইয়াছিল, শুইয়া পড়িয়াছিল। শুধু বৈদ্যুতিক আলোকগুলি দীপ্তনক্ষত্ররাজির মত উজ্জ্বল রশ্মিধারা বর্ষণ করিতেছিল।

অন্তঃপুরের বাসরকক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি, নারীকণ্ঠের কলগুঞ্জন ও হাস্যরব বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। সেখানকার উৎসব সারারাত্রিই হয় ত চলিবে।

যাক্, জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তিনি যথার্থরূপেই পালন করিতে পারিয়াছেন, সে বিষয়ে আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। তবে বাড়ীর আনন্দ-আলোক আর তেমনভাবে কিরণ দান করিবে না। তাঁহার বুকজোড়া বীণুমা এখন পরের ঘর আলো করিতে চলিল! মেয়ে পরের জন্যই হয়। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, আনন্দ কোথায়?

বহির্ব্বাটীর দ্বিতলে, এককোণের ছোট ঘরটির অভিমুখে তিনি চলিতেছিলেন। সেই ঘরে তাঁহার ঔষধপত্র প্রভৃতি থাকিত। এ ঘরটিতে কেহ তাঁহার নির্জ্জন বিশ্রামের ব্যাঘাত করিবে না। শ্রান্ত দেহভার কিছুক্ষণের জন্য শয্যার অঙ্কে ঢালিয়া না দিলে আর চলিতেছে না।

সহসা তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরের বারান্দায় একটিমাত্র আলোক জ্বলিতেছিল। সম্মুখের ছোট ঘরটির মধ্যস্থ অন্ধকার তাহাতে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। চারিদিক্ তখন নির্জ্জন—শব্দশূন্য। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, ঘরের ভিতর হইতে কাহার দীর্ঘশ্বাস মুহুর্মুহুঃ স্তব্ধ বায়ুমণ্ডলকে আন্দোলিত ও ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। হাঁ, এ যেন কোন পীড়িতের কাতরশ্বাস! স্বল্পালোকে তিনি দেখিলেন, কেহ যেন মাটীর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

মুহূর্ত্তমাত্র তিনি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন, তার পর নিঃশব্দ-চরণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সুইচ্ টানিয়া দিলেন। আলোক-প্লাবনে কক্ষটি ভাসিয়া গেল; কিন্তু যে মূর্ত্তি ভূমি আলিঙ্গন করিয়া, উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া ছিল, আলোক-স্পর্শে তাহার কোন ভাবান্তরই ঘটিল না। যেন কোন তীব্র ব্যথার যন্ত্রণায় তাহার দেহ পুনঃপুনঃ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে তিনি বুঝিলেন, সে আর কেহই নহে; তাঁহারই পুত্রসম স্নেহভাজন বদ্রি। উহার কি হইয়াছে?—পীড়া? অসম্ভব নহে। কয়দিনের গুরুভোজনে, অত্যাচারে পেটের পীড়া হওয়া সম্ভব। পেটের যন্ত্রণা চাপিবার জন্য তাই বুঝি এমনই ভাবে পড়িয়া আছে!

উৎকণ্ঠাভরে তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া তিনি ডাকিলেন, "বদ্রি! বদ্রি!"

চমকিতভাবে বদ্রি উঠিয়া বসিল। তাহার আনন অশ্রু-সিক্ত, বিবর্ণ। রেখায় রেখায় তীব্রতম ব্যথার যন্ত্রণা যেন মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে! ক্ষিপ্রহস্তে বদ্রি বস্ত্রপ্রান্তদ্বারা মুখ চোখ মুছিয়া ফেলিল।

ব্যথিতচিত্তে, উদ্বেগভরে নিশীথচন্দ্র বলিলেন, "কি হয়েছে রে?"

ধীরকণ্ঠে সে বলিল, "কিছু না, বাবুজী।"

"তবে অমন কর্‌ছিলি কেন? পেটে ব্যথা হয়েছে?"

ঘাড় নাড়িয়া সে তাহাই স্বীকার করিল।

"দাঁড়া, একটা ঔষধ দিচ্ছি। তার পর ঐ কোণে সতরঞ্চটার উপর চুপ ক'রে শুয়ে ঘুমো।"

বদ্রি শান্তকণ্ঠে জানাইল যে, তাহার ব্যথা সারিয়া গিয়াছে; এখন আর কোন অসুখ নাই, ঔষধের প্রয়োজন হইবে না।

নিশীথচন্দ্র তথাপি ঔষধ দিলেন। বদ্রি ঘরের কোণে নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল।

৬

মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় নিশীথচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র পারিবারিক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিতের মধ্যে কয়েকটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—তন্মধ্যে রমণীর সংখ্যাই অধিক।

আর দুই দিন পরে; বিজয়া-দশমীর পরদিবস, তিনি

সপরিবারে অন্যতম স্বাস্থ্য-নিবাস গিরিডিতে বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল, তাই এই বিদায়ভোজ। বাঙ্গালার আর্দ্র-বায়ুতে ইদানীং সুকুমারীর শরীর সুস্থ থাকিতেছিল না, জামাতা সুধীরচন্দ্রও ম্যালেরিয়া-পীড়িত পল্লী-সহরে ডেপুটিত্ব করিয়া প্রায়ই জ্বরে ভুগিতেছিলেন। এবার পূজার ছুটীর সঙ্গে তিন মাস অবকাশ লইয়া তিনি শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। বৈবাহিকের অনুমোদন নিশীথচন্দ্র পূর্ব্বাহ্নেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পরেই বীণারাণী তাহার ভগিনী সম্পর্কীয়া সমবয়স্কাদের সহিত গান, গল্প, আমোদ-প্রমোদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। আজ তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। নিশীথচন্দ্র ও সুধীর তখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন নাই। সুকুমারী রন্ধনের তদ্বিরে ব্যস্ত। বদ্‌রি তাঁহাকে নানা কার্য্যে সহায়তা করিতেছিল।

আকাশে অষ্টমীর চাঁদ, গৃহমধ্যে সুন্দরীদিগের কলহাস্য, গানের গুঞ্জন। সন্ধ্যার বাতাস শব্দময়।

মায়ীজীর 'ফরমাস্' অনুসারে কি একটা কাযে বদ্‌রি বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া আলোকিত কক্ষের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিল। তরুণ জীবনের অনাবিল আনন্দ-চাঞ্চল্য, নমনীয়, কমনীয় দেহ-লতিকার লীলায়িত গতির ছন্দ, মধুর কণ্ঠের কলগুঞ্জনে নিশ্চয় একটা মাদকতা আছে—হয় ত পাষাণেও তাহারা জীবনস্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে পারে।

বদ্‌রির কালো দেহের অন্তরালে—বক্ষঃপঞ্জরের নিম্নে তখন কোন তরঙ্গ উঠিয়াছিল কি না, কে জানে? তবে সে যে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সুন্দর, পবিত্র দৃশ্য যে তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহা তাহার নিশ্চল, স্তব্ধমূর্ত্তি দেখিলে যে কেহ অনুমান করিতে পারিত।

ভ্রমণশেষে সুধীরচন্দ্র অন্তঃপুরের দিকে আসিতেছিলেন। বারান্দার প্রান্তদেশে আসিয়াই তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীর ঘরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একে হাকিমী মেজাজ, তাহাতে মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া উহা আরও উগ্র হইয়াছিল। মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কয়েকবার শ্বশুরালয়ে আসিয়া বদ্‌রিকে তিনি দেখিয়াছিলেন। প্রথম দর্শন হইতেই তাহার প্রতি সুধীরচন্দ্রের মনের মধ্যে কেমন একটা বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছিল। বদ্‌রির অবস্থার ব্যক্তির যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা না হইয়া সে বাড়ীর ছেলের মত সর্ব্বত্র অবাধে চলাফেরা করিত, ইহা তাঁহার আদৌ প্রীতিপ্রদ ছিল না। অমন একটা সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, ভিন্ন জাতীয়, হীন বংশের যুবক সর্ব্বদা মেয়েদের কাছাকাছি ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তবে কোনও ছিদ্র না পাইলে এমন একটা বিষয় লইয়া তাঁহার মত একটা পদস্থ ব্যক্তির কোন কথা বলা সঙ্গত নয় বলিয়া এতদিন তিনি মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি জামাই মানুষ। কিন্তু আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে, যুবতী রমণীদিগের প্রতি আত্মবিস্মৃতভাবে বদ্‌রিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধে তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল। তিনি দ্রুতচরণে মূর্ত্তির কাছে আসিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "তুই এখানে কি কচ্ছিস্?"

বদ্‌রি এমনই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিল যে, কথাটা প্রথমে সে শুনিতেই পাইল না। সুধীরচন্দ্রের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বহুদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ, অবকাশ পাইয়া বাঁধভাঙ্গা প্লাবন-ধারার ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইল। এক হস্তে তাহার কর্ণ আকর্ষণ করিয়া সগর্জ্জনে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হারামজাদা, পাজি! লুকিয়ে মেয়েমানুষ দেখা হচ্ছে—বদ্‌মাসের ধাড়ি!"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হস্তধৃত বেত্রদণ্ড সবেগে বদ্‌রির পৃষ্ঠে পুনঃপুনঃ পড়িতে লাগিল।

অকস্মাৎ এমন ভাবে আক্রান্ত হইয়া বদ্‌রি প্রথমতঃ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। সুধীরচন্দ্রের নির্ম্মম বেত্রাঘাতের যন্ত্রণায় তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। আজ পর্য্যন্ত কেহ কখনও তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। ডাক্তার-দম্পতির ভয়ে সকলেই তাহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। সুধীরচন্দ্রের বেত্রাঘাতে এবং তাঁহার উক্তির কদর্য্য ইঙ্গিতে সহসা তাহার আত্ম-সম্মান-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। বেত্রাঘাতের যন্ত্রণার অপেক্ষাও তাঁহার কথার আঘাতের জ্বালায় তাহার ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। প্রবল আকর্ষণে সে তাহার কান ছাড়াইয়া লইল। ক্রুদ্ধ সুধীর তখন উন্মত্তের ন্যায় পুনরায় তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বদ্‌রির

হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। বাম হস্তে অবলীলাক্রমে সে সুধীরচন্দ্রের উদ্যত বেত্র ধারণ করিয়া এক টানে উহা কাড়িয়া লইল। তাহার ক্ষুদ্র কালো চোখের ভিতর দিয়া তখন অগ্নি-শিখা নির্গত হইতেছিল, মুখমণ্ডল হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ। প্রতিপ্রহারের জন্য সে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলিতে যাইবে, এমন সময় চন্দ্রালোকে সম্মুখে বীণার পাংশু মুখ ও মায়ীজীর শঙ্কিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুষ্টি শিথিল হইল। বেত্রদণ্ড সশব্দে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সে নত-নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুধীরচন্দ্রের চীৎকার ও প্রহারশব্দে আকৃষ্ট হইয়া চারি-দিক্ হইতেই সকলে ছুটিয়া আসিয়াছিল। বারান্দার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সুধীরচন্দ্র তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া-ছেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। কার্য্যের হঠকারিতা বুঝিয়া তিনি মনে মনে লজ্জানুভব করিতেছিলেন। দেখা গেল, বদ্রির পৃষ্ঠদেশ বহিয়া রক্তের ধারা পড়িতেছে। অনুশোচনা ও অনুতাপে তাঁহার উচ্চশিক্ষিত হৃদয় যেন মুসড়িয়া পড়িল। সত্যই ত, বদ্রি এমন কি অন্যায় করিয়াছে—যে জন্য আজ তিনি এমন নির্লজ্জ ব্যবহার করিলেন! তাড়াতাড়ি তিনি বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বদ্রির পৃষ্ঠের ক্ষত দেখিয়া মা ও মেয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। সুধীরচন্দ্রের উক্তিগুলিও তাঁহাদের কানে গিয়াছিল। উভয়ে লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাদের প্রতি বদ্রির একনিষ্ঠ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের গভীরতা, অসীম-তার পরিমাণ করা নবাগত সুধীরচন্দ্রের পক্ষে যে সম্পূর্ণ অসম্ভব!

জলে কাপড় ভিজাইয়া বীণা অতি সন্তর্পণে বদ্রির পৃষ্ঠের রক্তধারা মুছাইয়া দিতে লাগিল। ব্যথায় যেন তাহার নিজের দেহই শিহরিয়া উঠিতেছিল।

"বড় লেগেছে, দাদা?"

তীব্র যন্ত্রণার জ্বালা অসীম বলে চাপিয়া বদ্রি শান্ত-কণ্ঠে বলিল, "ও কিছু নয়, বীণাদি!"

অন্যের অলক্ষ্যে সুকুমারী একবার চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন।

"থাক্, বীণাদি, সেরে যাবে' খন" বলিয়া বদ্রি ধীরপদে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে প্রলয়-ঝটিকা যে ভীমবেগে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল, তাহার সন্ধান কেহ রাখিয়াছিল কি?

৭

কি মুক্তি! কি স্বাধীনতা! অবরোধের প্রাচীর-বেষ্টন নাই। পাখীর ন্যায় মুক্ত জীবন! সকল সম্প্রদায়ের কুললক্ষ্মীরা যখন ইচ্ছা অবাধে যথা ইচ্ছা বেড়াইয়া বেড়াইতেছে! এ স্বাধীনতা সুকুমারী যুক্তপ্রদেশেও ভোগ করেন নাই।

বারগণ্ডার কোন উৎকৃষ্ট স্থানে একটা ভাল বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। উচ্ছ্ নদীর তীরে, মুক্ত প্রান্তরে প্রভাতে ও অপরাহ্ণে ভ্রমণ করিয়া সকলেরই দেহ ও মন সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বদ্রিও সঙ্গে আসিয়াছিল। উল্লিখিত ঘটনার পর ডাক্তার-দম্পতি গোপনে পরামর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিতান্ত অসুবিধা ও দুঃখ হইলেও বদ্রিকে কলিকাতাতেই রাখিয়া আসিবেন। কিন্তু জামাতা সুধীরচন্দ্র যখন জিদ করিয়া বসিলেন, বদ্রিকে সঙ্গে লইতেই হইবে, তখন প্রসন্ন মনে তাঁহারা সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। যবনিকার অন্তরালে, নৈশ-বক্তৃতার প্রভাবেই কি সুধীরচন্দ্রের ভ্রম সংশোধিত হইয়াছিল? তাহাকে লইয়া গোপনে যে এত ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, ইহার কোন সন্ধানই বদ্রি রাখিত না। শুধু জামাইবাবুর সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিত।

আশ্বিনের শেষভাগে উপর্য্যুপরি দুই দিন ও দুই রাত্রি প্রবল বারিপাত হইয়া গেল। উচ্ছ্র বিশাল হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। প্রভাতে মেঘ কাটিয়া সূর্য্যোদয় হওয়াতে সুধীরচন্দ্র প্রস্তাব করিলেন, আজই সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া উচ্ছ্ প্রপাত দেখিতে যাইতে হইবে। বৃষ্টির পরেই এই প্রপাতের দৃশ্য অতি মহান্ ও গম্ভীর হইয়া থাকে, তিনি শুনিয়াছিলেন।

মোটর লরি ভাড়া করিয়া যথা-সময়ে সকলে যাত্রা করি-লেন। বীণাদি ও মায়ীজীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বদ্রিকেও সঙ্গে যাইতে হইল। পাচক, ভৃত্য, দারবান্ প্রভৃতিও সঙ্গে চলিল।

সাত মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড়ের কাছে আসিয়া লরি থামিল। সেখান হইতে এক মাইল অরণ্যবহুল গিরিপথ

পদব্রজে অতিক্রম করিতে পারিলেই তবে প্রপাতের দর্শন-লাভ ঘটিবে। নিকটেই ডোম-পাড়া। জনৈক 'গঙ্গাপুত্র' তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত হইল।

উপলখণ্ডবহুল, কঙ্করাকীর্ণ পথ ক্রমেই সংকীর্ণ ও ঢালু হইয়া শত শত ফুট নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন পাহাড়। দর্শকের দল মহা উৎসাহ-ভরে পথ চলিতেছিল।

কিয়দ্দূর চলিবার পরই সমুদ্রগর্জ্জনবৎ শব্দ সকলের কানে প্রবেশ করিল। কেহ না বলিয়া দিলেও উহা যে প্রপাতধারার পতনশব্দ, তাহা সকলেই বুঝিল।

নিম্নভূমি হইতে একটু উপরের দিকে উঠিতেই সহসা প্রপাতের গম্ভীর মহান্ দৃশ্য নেত্রপথে পতিত হইল। বীণা বলিয়া উঠিল, "কি চমৎকার!"

চমৎকার যে, তাহা যে অন্য প্রপাত কখনও দেখে নাই, তাহাকেই বলিতে হইবে। বিপরীত দিকের পাহাড়ের উপর দিয়া উচ্ছ্বসিত বিপুল সলিলরাশি মহা গর্জ্জনে প্রবলবেগে নিম্নে পতিত হইয়া নদীর আকারে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে বরাকর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

সুধীর পথি-প্রদর্শকের নিকট শুনিলেন, সকল সময় প্রপাতের অবস্থা এমন থাকে না। গ্রীষ্মকালে অতি ক্ষীণ ধারায় জল পড়িতে থাকে। কিন্তু বর্ষার সময় এই প্রপাতের বেগ যেমন প্রবল, তেমনই ভীষণ। দুই দিনের বর্ষণের পর আজ প্রপাতের পূর্ণাবস্থা।

মুগ্ধ হৃদয়ে সকলেই কিয়ৎকাল সেই ভীমকান্ত প্রপাতের দৃশ্য দেখিলেন। গর্জ্জনের এমনই প্রচণ্ড শব্দ যে, পার্শ্বের লোকের কথাও স্পষ্ট শুনা যায় না।

সুধীরচন্দ্র প্রস্তাব করিলেন যে, ওপারে গিয়া, স্রোতোধারা কিরূপ ভাবে আসিয়া পড়িতেছে, তাহা দেখিতে হইবে। পথি-প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সময়ে সময়ে হিংস্র জন্তুর আগমন হইয়া থাকে বটে, তবে এ সময়ে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। কিন্তু ওপারে যাইতে হইলে, যে পথে সহজে যাতায়াত করা যাইত, বিপুল জলস্রোতে তাহা এখন ডুবিয়া গিয়াছে। পার্শ্বস্থ পাহাড়ের উপর উঠিয়া ঘুরিয়া যাইতে হইবে। সকলেই যাইবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল।

'গঙ্গাপুত্র'কে সঙ্গে লইয়া সুধীরচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে চলিলেন।

৮

সূর্য্য তখন মাথার উপর। সলিল শীকর-সিক্ত স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছিল বলিয়া কাহারও তেমন ক্লান্তির সম্ভাবনা হইতেছিল না। চারিদিকে প্রকৃতির দৃশ্য গম্ভীর, মৌন। প্রপাতের ভীম-গর্জ্জন প্রকৃতির সেই গম্ভীর নীরবতাকে যেন ভৈরব-রাগে অর্চ্চনা করিতেছিল। সে দিন তখনও অন্য কোনও যাত্রীর সমাবেশ হয় নাই, শুধু দশ বারটি নর-নারী পাহাড়ে পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে নামিতে নামিতে উচ্ছ্বসিত নীরের দৃশ্য, জলের তীব্রবেগ দেখিয়া চলিতেছিল। জলের দিকে চাহিলেই দেহ যেন শিহরিয়া উঠে। বিপুল জলরাশি কি প্রচণ্ড নৃত্যেই প্রপাতের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। একটি তৃণ পড়িলেও যেন মুহূর্ত্তে স্রোতের বেগে শত খণ্ড হইয়া যাইবে!

নিশীথচন্দ্র-স্ত্রী ও কন্যার হাত ধরিয়া শৈলসমাকীর্ণ নদীর বঙ্কিম-পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। বন্দি সকলের পশ্চাতে আসিতেছিল। সুধীরচন্দ্র গাইডের সহিত তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সহসা একটা আর্ত্ত-চীৎকার স্তব্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আকাশপথে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গাইডের আহ্বান-ধ্বনি শোনা গেল। কন্যা ও স্ত্রীর হাত ছাড়িয়া দিয়া নিশীথচন্দ্র রুদ্ধশ্বাসে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, গাইড পাগলের মত লাফাইতেছে, সুধীরচন্দ্র নাই! জলের দিকে চাহিতেই তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! প্রবল স্রোতোধারার মধ্যে পড়িয়া সুধীরচন্দ্র পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছেন, জল হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর হাস্যে জলধারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে করিতে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। সে স্থলের দুই পার্শ্বের পাহাড় সোজাভাবে জল হইতে উঠিয়াছে। নিকটে একটি বৃক্ষ বা লতা পর্য্যন্ত নাই। সন্তরণেও তিনি তেমন পটু নহেন।

নিশীথচন্দ্রের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। গাইডের নিষেধ না শুনিয়া সুধীরচন্দ্র একটা পিচ্ছিল শৈলের উপর দিয়া জলের গতি পরীক্ষা করিতে গিয়াই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে! প্রাণপণে চীৎকার করিয়া, মিনতি জানাইয়া, গাইডকে জলে নামিয়া সুধীরকে রক্ষা করিবার জন্য নিশীথচন্দ্র পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। গাইড মাথা নাড়িয়া জানাইল, ধ্রুব মৃত্যুর মধ্যে কে ঝাঁপাইয়া পড়িবে? এই ভীষণ স্রোতের

মধ্যে নামিবার শক্তি মানুষের নাই। তবে তীরে থাকিয়া যতটা করা যায়, সে তাহা করিতে লাগিল। কিন্তু তীব্র স্রোতোধারা যাহাকে মুহূর্ত্তমধ্যে দশ হাত দূরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, তীরদেশ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার উপায় কি? পাহাড় বহিয়া নীচে নামিবার সুবিধাও নাই। বুদ্ধি বাহির করিয়া রক্ষা করিবার অবকাশই বা কোথায়?

সমবেত সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শুধু হায় হায় করিতে লাগিল। সুকুমারী এই ভয়ানক দৃশ্যে চৈতন্য হারাইলেন। বীণা যখনই বুঝিল, তাহার স্বামী দ্রুত মৃত্যুর মুখে ভাসিয়া যাইতেছেন, তখন সে একবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা!" তার পর পাগলিনীর ন্যায় জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

বদ্রি সকলের পশ্চাতে ছিল। সুধীরচন্দ্রের আত্মরক্ষার ব্যর্থ-প্রয়াস সে নিশ্চল দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। তাহার মুখের একটি রেখাও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু বীণার মর্ম্মভেদী চীৎকার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর একলম্ফে বীণার গতিপথের সম্মুখভাগ রোধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবুজী! বীণাদিকে ধরুন!"

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া তিনি সবলে কন্যার হস্ত আকর্ষণ করিলেন। মূর্চ্ছিতা কন্যার দেহ তাঁহার বক্ষে ঢলিয়া পড়িল। সেই রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়াই বদ্রি, বাবুজীর ভূপতিত উত্তরীয়খানা তুলিয়া লইয়া মৃগের ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া দ্রুতগতিতে প্রপাতের অভিমুখে চলিল।

পথে আসিবার সময় তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপথ হইতে কোনও পদার্থ এড়াইয়া যায় নাই। এক স্থলে নদী একটু বাঁকিয়া যেখান হইতে সোজা প্রপাতের অভিমুখে চলিয়াছে, সেইখানে রুদ্ধশ্বাসে আসিয়া সন্নিহিত একটা বৃক্ষের গোড়ায় সে উত্তরীয়খানার এক প্রান্ত আবদ্ধ করিল। তাহার পর নিজের মাথার পাগড়ীটা খুলিয়া সে রজ্জুটা বড় করিয়া লইল। এখানেও পাহাড় অত্যন্ত ঋজু। সেই রজ্জু ধরিয়া সে তখন দ্রুতবেগে জলের উপর নামিয়া আসিল।

ঐ আসিতেছে! যে একদিন তাহার পৃষ্ঠে নিদারুণ বেত্রাঘাত করিয়াছিল, তাহার আরাধ্য দেবতার সম্পর্কে কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছিল, ঐ তাহার অর্দ্ধচেতন দেহ নিতান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যুর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে! সে যদি এখন নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া উহার রক্ষার জন্য চেষ্টা না করে, তবে আর কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যেই প্রপাতের ফেনোর্ম্মি-শীর্ষ জলের ধারা তাহাকে মৃত্যুর গহ্বরে নিক্ষেপ করিবে! বেশ ত! তাহাতে তাহার ক্ষতি কি?

কশাহত অশ্বের ন্যায় তাহার অন্তরিন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার কি? তাহার বীণাদির সুখের প্রদীপ, আনন্দের আলোক যে জন্মের মত নিবিয়া যাইবে! ভগ্ন-মন্দিরে তাহার দেবতা যে ধূলায় লুটাইয়া হতশ্রী হইবে! সেই দেবীর রাজরাজেশ্বরীমূর্ত্তি সে ত আর দেখিয়া ধন্য হইতে পারিবে না।

না, না!—সে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়া দেখিবে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে সংকল্প স্থির করিয়া বামহস্তের মণিবন্ধে আবদ্ধ রজ্জুপ্রান্ত দৃঢ়ভাবে করমুষ্টিতে ধারণ করিয়া জলের মধ্যে নামিল। স্রোতের বেগ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া বাঁকের মুখে আনিয়া ফেলিল। ঠিক সময়েই সে জলে নামিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তেই নিমজ্জমান সুধীরচন্দ্র একবার অন্তিমবলে পাহাড়টার দিকে হাত বাড়াইয়াছিলেন।

বদ্রি দক্ষিণ-বাহুর সাহায্যে ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরিল। কিন্তু স্রোতের বেগে তাহার পৃষ্ঠদেশ পশ্চাতের পাহাড়গাত্রে প্রতিহত হইল। যাক্, তাহার দেহাস্থি ভাঙ্গিয়া যাক্, কিন্তু ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। ভগবান্ তাহার বাহুতে আজ শক্তি দিন।

জীবন-রক্ষা আপাততঃ হইল বটে; কিন্তু এই নির্জ্জীববৎ দেহভার লইয়া সে উপরে উঠিবে কিরূপে? সে চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। পাহাড়ে পাহাড়ে তাহার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হইল। মুহুর্মুহুঃ তাহার দেহ পর্ব্বত-গাত্রে প্রবলবেগে আহত হইতেছিল, সে সুধীরচন্দ্রের সংজ্ঞা-শূন্য দেহ সম্মুখের দিকে রাখিয়া ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া তীব্র বেদনা সহ্য করিতে লাগিল। কিন্তু এমনভাবে সে আর কতক্ষণ সংগ্রাম করিবে? তাহার সর্ব্বদেহ যে ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে। অন্তিমবলে সে সুধীরচন্দ্রের মস্তকোর্দ্ধভাগ জলের উপর কোনওরূপে ভাসাইয়া রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, যতক্ষণ তাহার বিন্দুমাত্র চৈতন্য থাকিবে, সে কখনই সুধীরচন্দ্রের দেহ পরিত্যাগ করিবে না।

কিন্তু এ কি! সে যে আর পারিয়া উঠিতেছে না, হস্ত

অবশ হইয়া আসিতেছে। চোখের উপর ও কি আলোক-শিখার নৃত্য? শ্বেত-বস্ত্র-পরিহিত ও কাহারা আকাশ-পথ হইতে নামিয়া আসিতেছে? দেবদূত? কানের মধ্যে চারিদিক্ হইতে অশরীরী বাণীর গুঞ্জন—উহা কি মৃত্যু-লোকের আহ্বান? তাহার মনে হইল, আকাশ-পথ-বাহিত মূর্ত্তিগুলি ধরাধরি করিয়া তাহাকে যেন শূন্যপথে তুলিতেছে। আঃ, কি শান্তি!—তাহার চৈতন্য তিরোহিত হইল।

* * * * * *

তাহার সংজ্ঞা যখন ফিরিয়া আসিল, সে দেখিল, প্রস্তর-শয্যায় সে শায়িত। চারিপার্শ্বে শঙ্কাব্যাকুল প্রিয় মুখগুলি অস্তগামী সূর্য্যের আলোকে ম্লানতর। তাহাকে চাহিতে দেখিয়াই যেন সহসা একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। বেত্রাহত ক্ষত-স্থান, ভালরূপে শুকাইয়া যায় নাই। পাষাণ-গাত্রে প্রতিহত হইয়া সেই ক্ষতপথে যে রক্তের ধারা ছুটিয়াছিল, উচ্ছ্বসিত প্রবাহ তাহার অধিকাংশ ধৌত করিয়া দিয়াছিল। সে বুঝিল, পার্ব্বত্যলতা নিষ্পেষিত করিয়া সযত্ন-হস্তে কেহ তাহার ক্ষতস্থল ছিন্ন উত্তরীয়ের দ্বারা বাঁধিয়া দিয়াছে। বদ্রি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

সুধীরচন্দ্র তখন অনেকটা সুস্থ হইয়া তাহারই নিকট বসিয়া ছিলেন।

নিশীথচন্দ্র বদ্রির হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, তুই আর জন্মে নিশ্চয় আমার ছেলে ছিলি।"

সুধীরচন্দ্র আবেগভরে বলিলেন, "বদ্রি, আমার সহোদর নেই, তুমি আজ থেকে আমার ভাই—ছোট নয়, বড় ভাই।"

প্রশান্ত হাস্যরেখা বদ্রির কালো মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বাক্য দ্বারা শুধু দুই জন কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা—সুকুমারী ও বীণা। তাঁহাদের ভাষাময় নীরব নয়ন হৃদয়ের যে গভীরভাব ব্যক্ত করিতেছিল, পৃথিবীর কোনও ভাষায় তাহার যথার্থ অনুবাদ অসম্ভব।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

উদ্ভট-সাগর।

কোন এক বিরহিণী চন্দ্র-কিরণে নিতান্ত সন্তাপিত হইয়া বিদেশ-গত পতিকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন:—

(ক)

বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো
তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ।
সম্প্রত্যযোগ্যস্থিতিরেষ দেশঃ
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি॥

প্রাণনাথ! রাখ মোর এই নিবেদন,—
কিছুদিন সেই স্থানে করহ যাপন।
এ দেশে বসতি করা হ'ল বড় দায়,
হিমাংশুর কর হেথা দহিছে আমায়!

উল্লিখিত শ্লোকটি প্রাপ্ত হইয়া বিদেশ-গত পতি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার রমণী তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া চন্দ্র-কিরণের দাহিকাশক্তি অনুভব করিতেছেন। তখন তিনি রমণীর ভ্রান্তি দূর করিবার ছলে নিম্নলিখিত শ্লোকে স্বীয় নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণা জ্ঞাপন করিতেছেন:—

(খ)

নৈতৎ প্রিয়ে চেতসি শঙ্কনীয়ং
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি।
বিয়োগতপ্তং হৃদয়ং মদীয়ং
তত্র স্থিতা ত্বং পরিতাপিতাঽসি॥

হিমাংশুর হিমকর দহিছে আমায়,
এরূপ আশ্চর্য্য কথা শুনা নাহি যায়।
তোমার বিরহানলে হৃদয় আমার
এত তপ্ত হইয়াছে,—সীমা নাই তার।
তাই প্রিয়ে! থাকিয়াও দূরে অতিশয়
সেই তাপে তপ্ত তব হ'য়েছে হৃদয়!

রামকৃষ্ণের দুর্গোৎসব।

১

রামকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীতে দুর্গোৎসব। তিনি দূরদেশে চাকুরী করেন। তখন রেল-ষ্টীমার হয় নাই, তাঁহাকে নৌকাপথে বাড়ী যাইতে হইত। তিনি পূজার তিন দিন পূর্ব্বে নৌকায় রওনা হইয়াছেন। বোধনের দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী পৌছিবার কথা। তাঁহার বহু যত্নে সংগৃহীত পূজার দ্রব্যাদি সঙ্গে রহিয়াছে, পূজার পূর্ব্বে বাড়ী পৌছান নিতান্ত আবশ্যক।

কিন্তু তিনি নৌকায় উঠিবার দ্বিতীয় দিনে দৈবদুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। নৌকা খুব বড় ছিল, তাহা সত্বেও মাঝিরা বোধনের দিন প্রাতঃকালে একটা খালের ধারে নৌকা বাঁধিতে বাধ্য হইল। তখন প্রবল পদ্মানদীতে ঝড় উঠিয়াছে—উত্তাল তরঙ্গমালা গভীর গর্জ্জনে আকাশ কম্পিত করিতেছে, কাহার সাধ্য নদীতে নৌকা ধরে। নদীর অবস্থা দেখিয়া রামকৃষ্ণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাড়ী এখনও বহুদূরে।

২

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। দুর্য্যোগ কিছুমাত্র কমিল না; বরং বাড়িতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামে বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সেই বাজনা শুনিয়া রামকৃষ্ণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার বাড়ীতেও মায়ের বোধন হইতেছে, আর তিনি এখন কোথায়? তিনি যে চিরদিন নিজে উপস্থিত থাকিয়া মায়ের বোধনাধিবাস সম্পন্ন করেন। ঐ যে পুরোহিত ঠাকুর বোধন-মন্ত্র পাঠ করিতেছেন—তাঁহার কানে সেই মন্ত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল—অমনি তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইল। তিনি মনে মনে মাকে সম্বোধন করিয়া সেই মন্ত্রের ভাবার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "মা, তুমি প্রবুদ্ধ হও। যেমন একদিন ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তবে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলে—যেমন একদিন অসুরাপহৃত রাজ্যোদ্ধারের কামনায় ইন্দ্রের স্তবে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলে—যেমন একদিন দশাননের নিধন-কামনায় দাশরথি রামের পূজা-দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াছিলে—মা গো, আমি নিতান্ত অকিঞ্চন, আমার হৃদয়ে কি কৃপা করিয়া প্রকাশিত হইবে না?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বোধনের সময় অতিবাহিত হইল। তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ চিত্তে নৌকায় বসিয়া রাত্রি কাটাইলেন। সেই ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

৩

পরদিন শুভ সপ্তমী তিথি। ঝড়ের বেগ কমিয়াছে, কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। পদ্মা নদীতে তখনও তরঙ্গের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে। রজনীপ্রভাতে নিকটবর্ত্তী গ্রামের পূজা-বাড়ীতে পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ কোনক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বাড়ীতে কিরূপে মায়ের পূজা হইতেছে? পূজার দ্রব্যাদি যে সমস্তই তাঁহার সঙ্গে। বাল্যাবধি তিনি পূজার সময় উপস্থিত থাকিয়া পূজার তত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন, আজ তাহা কে করিতেছে? ঐ যে পুরোহিত ঠাকুর বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া "মেরুমন্দার-কৈলাস-হিমবচ্ছিখরে গিরৌ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতেছেন; ঐ যে তিনি নবপত্রিকার স্নান করাইতেছেন—সেই স্নানের প্রত্যেকটি মন্ত্র তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তার পরে দেবীর মহাস্নান। মহাস্নানের সময় তিনি স্বহস্তে ঘট জলপূর্ণ করিয়া দেন, আজ কে তাহা দিতেছে? মহাস্নানের প্রাণস্পর্শী মন্ত্রগুলি তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি সেই সকল মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—"মা গো! তুমি যদি এই অকিঞ্চনের কুটীরে শুভাগমন করিয়া থাক, তবে ঐ সকল ঘটপূর্ণ স্নানের জল গ্রহণ কর। কিন্তু তুমি রাজরাজেশ্বরী—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বহস্তে তোমাকে স্নান করাইয়া কৃতার্থ হন। তাঁহারাই বিবিধ বারিপূর্ণ কলসের দ্বারা তোমার অভিষেক করুন—

দেবাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবগণ মন্দাকিনীজলে প্রথম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন।

মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীম্।
মেঘতোয়াদিপূর্ণেন দ্বিতীয়কলসেন তু॥

হে সুরেশ্বরি! মরুদ্গণ ভক্তিযুক্ত চিত্তে মেঘবারিপূর্ণ দ্বিতীয় কলস দ্বারা তোমার অভিষেক করুন।

সারস্বতাদিতোয়েন সংপূর্ণেন সুরোত্তমাম্।
বিদ্যাধরাশ্চাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয়কলসেন তু॥

হে সুরসুন্দরি! বিদ্যাধরগণ সরস্বতী আদি নদীর পবিত্র জলপূর্ণ তৃতীয় কলস দ্বারা তোমার অভিষেক করুন।

যক্ষাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থকলসেন তু॥

যক্ষ ও লোকপালগণ সাগরোদকপূর্ণ চতুর্থ কলস দ্বারা তোমার অভিষেক করুন।

বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু॥

নাগগণ পদ্মরেণু-সুগন্ধি জল দ্বারা পঞ্চম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন।

হিমবদ্ধেমকূটাদ্যা অভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ।
নির্ঝরোদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু॥

হিমালয়, হেমকূট প্রভৃতি পর্ব্বত সকল নিঝরোদক দ্বারা ষষ্ঠ কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন।

সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন সপ্তমেন সুরেশ্বরীম্।
শক্রাদয়োঽভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্ত এব চ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সপ্ত ঋষিগণ মিলিত হইয়া সর্ব্বতীর্থ হইতে সমানীত পবিত্র জল-দ্বারা সপ্তম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন।

বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥

অষ্টবসু অষ্টম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। হে অষ্টমঙ্গলদায়িনি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার।"

এই মহাভাবময় স্নান-মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে রামকৃষ্ণের নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তন্ময় হইয়া মায়ের মহিমা ধ্যান করিতে লাগিলেন।

স্নানান্তে বসন পরিতে হইবে। তিনি বহু যত্নে মায়ের পরিধানের জন্য যে সুন্দর রক্তবর্ণ চেলীর কাপড় আনিয়াছেন, তাহা ত তাঁহার সঙ্গেই রহিয়াছে। তিনি মাকে আজ সেই চেলীর শাড়ী দিয়া সাজাইতে পারিলেন না, ইহাতে তাঁহার হৃদয় যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। মায়ের নৈবেদ্যাদির জন্য অনেক ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারিলেন না। সারাদিন বসিয়া তিনি এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার আহারের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ, তিনি সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতেন। সন্ধ্যার পরেও দুর্য্যোগের জন্য রন্ধনাদির কোন ব্যবস্থা হইল না। নৌকায় যে ফল-মূলাদি ছিল, তাহা তিনি মায়ের জন্য আনিয়াছিলেন, তাঁহাকে না দিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করিবেন? এইজন্য বিন্দুমাত্র জলও গ্রহণ না করিয়া তিনি মনের দুঃখে শুইয়া পড়িলেন।

৪

পূর্ব্বরাত্রে ঝড়ের জন্য তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, আজ ক্লান্ত শরীরে তাঁহার সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হইল। গভীর নিদ্রার পরে রাত্রিশেষে তিনি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন! তাঁহার বাড়ীতে পূজা হইতেছে। তাঁহার পরিজনবর্গ তিনি না আসাতে অনেক কষ্টে যৎসামান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কোন-ক্রমে পূজা নির্ব্বাহ করিতেছেন। মায়ের পরিধেয় বস্ত্র তিনিই আনিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি না আসাতে গ্রামের দোকান হইতে একখানা লাল কস্তাপেড়ে আট হাতি শাড়ী আনিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরোহিত সেই কাপড় হাতে লইয়া মাকে নিবেদন করিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি ভোর হইয়াছে। দুর্য্যোগ থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাকাশে উষার কনকচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সহসা নিদ্রাভঙ্গে রামকৃষ্ণ নৌকা হইতে উঠিয়া তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেখিলেন, অদূরে ঘাটে একটি ষোড়শবর্ষীয়া পরমসুন্দরী কন্যা দাঁড়াইয়া আছে—তাহার অঙ্গ হইতে অরুণ-কিরণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে,—তাহার পরিধানে আট-হাতি কোরা কস্তাপেড়ে শাড়ী। তাহাকে দেখিয়া রামকৃষ্ণ "মা, তুমি কে?" বলিতে বলিতে তাহার

সম্মুখীন হইলেন। বালিকাটি ঈষৎ-হাস্যমুখে বলিলেন, "আমাকে একখানা ভাল কাপড় দেবে? দেখ, আজ পূজার দিন আমার বাবা আমাকে যে কাপড় দিয়াছেন, তাহা বড় ছোট—আমার গা ঢাকে না।" বিদ্যুৎচমকের ন্যায় রামকৃষ্ণের মনে অমনি কি ভাবের উদয় হইল। "মা, তুমি দাঁড়াও—আমি তোমার জন্য ভাল কাপড় আনিতেছি"—বলিতে বলিতে তিনি নৌকায় ছুটিয়া গেলেন, এবং পূজার জন্য আনীত সেই চেলীর কাপড়খানি লইয়া সেই ঘাটের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু সে বালিকা কোথায়? চঞ্চলা চপলার ন্যায় সে বালিকা অন্তর্হিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ অমনি "মা, দেখা দিয়ে কোথায় গেলি?" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গী লোকেরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নৌকায় উঠাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

৮

তিনি যখন বাড়ী পৌছিলেন, তখন সন্ধ্যারতি শেষ হইয়াছে, পুরোহিত সন্ধিপূজার আয়োজন করিতেছেন। রামকৃষ্ণ অনুসন্ধানে জানিলেন, যথার্থই সপ্তমী-পূজাতে একখানি আট-হাতি কস্তাপেড়ে শাড়ী দিয়া মায়ের পূজা করা হইয়াছে। তিনি মায়ের অসাধারণ করুণার কথা স্মরণ করিয়া ভাব-বিহ্বল-চিত্তে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার আনীত চেলীর শাড়ীর দ্বারা মায়ের সন্ধি পূজা সম্পন্ন হইল। তিনি সেই মহাসন্ধিক্ষণে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তির মুখপানে তাকাইয়া যেন দেখিলেন, সেই নদী-তীরস্থ বালিকার ন্যায় মা মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। তখন রামকৃষ্ণ মায়ের পদতলে পতিত হইয়া ভাব-বিহ্বল-চিত্তে স্তব করিলেন—

"ধন্যোঽস্মি কৃত-কৃত্যোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতোঽসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মমাশ্রমম্॥"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।
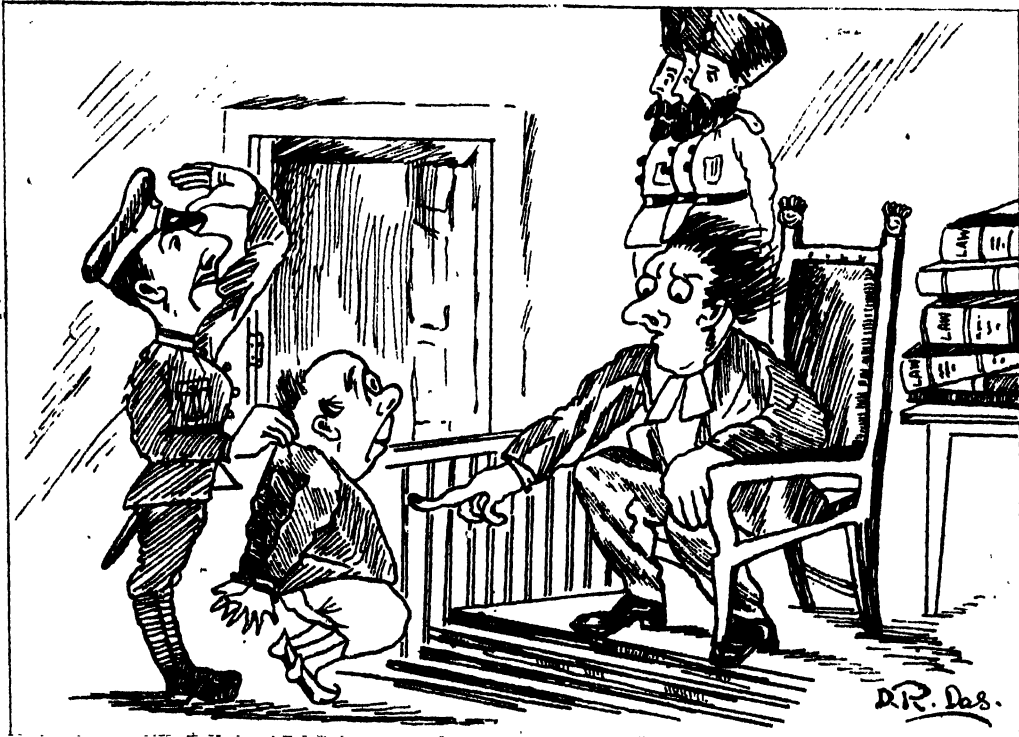
অভিযোগ।

হাকিম—আসামীর অপরাধ?
পুলিশ—এ বড়বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানের সামনে ফুটপাথে থুথু ফেলেছে
হাকিম—ভীষণ অভিযোগ।

অভাগা।

১
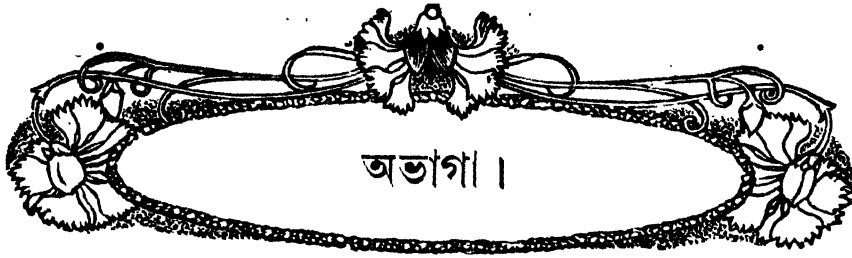
"অভাগা যত্তপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়" এই পুরাতন প্রবাদটা শ্রীদাম পাকড়াশীর ছেলে কৃষ্ণধন ওরফে কেষ্টার উপর যেমন প্রত্যক্ষ সত্যরূপে খাটিয়া গিয়াছিল, এমনভাবে আর কাহারও উপর খাটিতে প্রায় দেখা যায় না। কেষ্টাকে তিন মাসের রাখিয়া মা মারা গেলে, বাপ শ্রীদাম পাকড়াশী একদিনের জন্যও মনে করে নাই যে, এই মাতৃহীন শিশুটি বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশাস্থল হইবে। সুতরাং শ্রীদাম এই শিশুটির সম্বন্ধে তেমন যত্ন লওয়া প্রয়োজন বোধ করে নাই। তবে ধর্ম্মতঃ যতটুকু না করিলে নয়,—সময়ে না হউক, অসময়েও একটু দুধ খাওয়ান, কাঁদিয়া দম বন্ধ হইবার উপক্রম দেখিলে একবার কোলে লওয়া, রোগে একটু ঔষধের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য স্বচ্ছন্দচিত্তে না হউক, বিরক্তিসহকারেও করিয়া যাইতে হইল এবং বিধাতার কলমের জোরে সেই আগ্রহবৰ্দ্ধিত যত্নটুকুর প্রভাবেই কেষ্টা বেশ নিরাপদেই সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিল।

বাঁচিবে না বাঁচিবে না করিয়া তিন মাসের ছেলে সাত বৎসরে পা দিল, বাপ তখন ছেলের উপর একটু আশা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে হাতে খড়ি দিয়া ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিল। কেষ্টা পাঠশালায় বসিয়া পাঁচ জন ছেলের সঙ্গে তালপাতায় দাগা বুলাইতে লাগিল।

কেষ্টার এই দাগা বুলনো শেষ না হইতেই হঠাৎ একদিন তাহার বিদ্যাশিক্ষার সহিত বাপের পার্থিব লীলার শেষ হইয়া গেল।

পিতৃহীন হইয়া কেষ্টা দিনকতক গ্রামের এ বাড়ী সে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া দিন কাটাইল। কিন্তু এ ভাবে পরের বাড়ীতে কয়দিন কাটিবে? জনৈক সহৃদয় প্রতিবেশী কেষ্টাকে লইয়া তাহার পিসতুতো ভগিনীপতির বাড়ীতে রাখিয়া আসিল। পিসতুতো ভগিনী কিন্তু বেশীদিন মাতুলপুত্রের অন্ন যাপিতে পারিলেন না। তিনি নিজের ছেলেপিলে লইয়াই অস্থির, ইহার উপর পরের ছেলের ঝক্কি কে পোহাইবে? শুধু ভাত কাপড় দেওয়া নয়, তাহার দেখা-শুনা, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি নানান্ হাঙ্গামা আছে। সে হাঙ্গামা পোহায় কে? বিশেষ, কর্ত্তার মত এই যে, এরূপ মা-বাপ-খেকো অগ্নিদগ্ধাকে স্থান দিলে তাহাতে গৃহস্থের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হয় না। পুরুষের যখন এই মত, তখন মেয়েমানুষ তাহাকে রাখে কোন্ সাহসে? কাযেই তিনি গৃহস্থের মঙ্গলকামনায় মাতুলপুত্রকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। ভগিনীপতি কেষ্টাকে সঙ্গে লইয়া তাহার মাসীর বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন।

মাসীর অবস্থাও যে ভগিনী-পুত্রকে প্রতিপালন করিবার পক্ষে বেশ অনুকূল ছিল, তাহা নহে। তাঁহার নিজের দুইটি ছেলে, একটি মেয়ে, তাহার উপর নিজের চিররুগ্ন দেহ; এই পোড়া শরীর এমন অপটু যে, মাসের অর্দ্ধেক দিন কর্ত্তাকে নিজে হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে ও ছেলেগুলার মুখে এক-মুঠা আহার দিতে হয়। ইহার উপর কেষ্টার প্রতিপালনের ভার লওয়া মাসীর পক্ষে যে কষ্টকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কষ্টকর বলিয়া মাসী প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছুক হইলেও মেসো সিদ্ধেশ্বর বাপুলী কিন্তু এই অনাথ আত্মীয় বালকটিকে আশ্রয় দিয়া লোক সমাজে উদারতা প্রদর্শন করিলেন। এই উদারতা-প্রদর্শনের জন্য গৃহিণীর নিকট তিরস্কৃত হইলেও বাপুলী মহাশয় ইহাতে তেমন ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং আশ্রয়ার্থীকে আশ্রয় প্রদান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিলেন। লোক বলিল, "হাঁ, জাল-জুয়াচুরি করিলেও বাপুলী মহাশয়ের ধর্ম্ম-জ্ঞানটুকু বেশ আছে।"

তা ধর্ম্ম-জ্ঞানের প্রেরণাতেই হউক, বা লোক-লজ্জার খাতিরেই হউক, বাপুলী মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় পাইয়া কেষ্টা কৃতার্থ হইল।

বাপুলী মহাশয় শুধু কেষ্টাকে আশ্রয় দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহার মঙ্গলের জন্য যাহা যাহা করা প্রয়োজন, তাহার কোনটাই বাদ দিলেন না। কেষ্টার বাপের ঘরে তৈজসপত্র যাহা কিছু ছিল, পাছে সে সব অপরে হস্তগত করিয়া ছেলেটাকে বঞ্চিত করে, এই আশঙ্কায় তিনি কেষ্টাকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং ঘটী-বাটি হইতে বিছানা, বালিস, এমন কি, ঘরের দরজা-জানালা পত্র পর্য্যন্ত মুটের মাথায় দিয়া নিজের ঘরে আনিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ঘরের বাঁশ-বাখারি, চালের খড় পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দুই পাঁচ টাকা সংগ্রহ করিলেন। কেষ্টার বাপের দশ বিশ টাকার খাতকালি ছিল। বাপুলী মহাশয় কাগজ-পত্র ঘাঁটিয়া, খাতকদের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া, অনাথ ব্রাহ্মণ-বালকের দোহাই দিয়া তাহার পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত আদায় করিয়া লইলেন। পাঁচ ছয় বিঘা নাখ্‌রাজ জমী ছিল। কেষ্টা নাবালক বলিয়া আপাততঃ সেগুলা বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না। কাযেই জমীগুলা ভাগজোতে বিলি করিয়া দিয়া বাপুলী মহাশয় কেষ্টাকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং ফিরিয়া আসিয়াই গৃহিণীর জন্য নথের টানা গড়াইতে দিয়া গৃহিণীর বহুদিনের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করিলেন।

২

"কেষ্টা, ওরে কেষ্টা, ওরে হতভাগা!"

"কেন মেসো মশাই?"

তীব্রকণ্ঠে তর্জ্জন করিয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "কেন মেসো মশাই! বলি, আজ পাঠশালে যাওয়া হয়নি কেন?"

মেসো মহাশয়ের রাগ দেখিয়া কেষ্টা যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিতে পারিল না। বাপুলী মহাশয় তাহার শুষ্ক-মুখের কাছে হাতখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আমাকে মাস মাস দু'গণ্ডা পয়সা মাইনে গুণ্‌তে হবে, আর তুমি সকাল থেকে খেলিয়ে বেড়াবে, না?"

কাঁদ-কাঁদ মুখে কেষ্টা বলিল, "আমি তো খেলা করিনি মেসো মশাই।"

গর্জ্জন করিয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "তবে কি কচ্ছিলে? তোমার বাপের পিণ্ডী চট্‌কাচ্ছিলে বুঝি।"

ভীতিজড়িতকণ্ঠে কেষ্টা বলিল, "মাসীমা বল্লে, এঁটো বাসনগুলো মেজে-ধুয়ে নিয়ে আয়। তাই—"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "তুই পাঠশালে যাস্‌নি ব'লেই তো এঁটো বাসন মাজতে বলেছিল।"

কেষ্টা বলিল, "না মেসো মশাই, আমি পাতা, দোয়াত নিয়ে যাচ্ছিলাম—"

গৃহিণী রান্নাঘরে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া শ্লেষতীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি পাঠশালে যাচ্ছিলে, না অমলিকে ডেকে নিয়ে খেল্‌তে বেরুচ্ছিলে গো বাবু! এখন আবার মিছে কথা! অমলিকে তুই ডাকিস্‌ নি?"

"কেষ্টা বলিল, "ডেকেছিলাম, সে আমার কলম কোথায় রেখেছে ব'লে।"

ঠাস্‌ করিয়া কেষ্টার গালে চড় পড়িল। দ্বিতীয় চড় উঁচাইয়া গৃহিণী রোষরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ফের্‌ মিছে কথা! এক রত্তি ছেলে, এর মধ্যে মিছে কথার ধুকুড়ি হয়েছে।"

চড় খাইয়া কেষ্টা চোখে হাত চাপা দিল। গৃহিণী তখন স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাত থেকে আমার মাথাটা ধ'রে আছে। ও খেল্‌তে যাচ্ছে দেখে, ওকে বাসন ক'খানা মেজে আন্‌তে বলেছি। তাই ক'খানা বাসন, হাত চালিয়ে মাজলে কোন্‌ কালে হয়ে যেতো। তা নয় তো, ঘাটে ব'সে খেলা কচ্ছিল। ওর কি পাঠশালায় যাবার মন আছে? তোমার যেমন পয়সা রাখবার যায়গা নেই, তাই গুরুমহাশয়কে দু'গণ্ডা ক'রে পয়সা দণ্ড দিচ্ছো। দু'গণ্ডা পয়সা থাক্‌লে আমার ছেলে-মেয়ে খেয়ে বাঁচে।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "সে কথা কি জানিনে, গিন্নি! তবে কি জান, লোক বল্‌বে, সিদু বাউলি পরের ছেলে ব'লে ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখালে না।"

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তাই ব'লে পরের কথায় নিজের বুঁচ্‌কি জলে ফেলে দিতে হবে না কি? তুমি যতই কর, লেখাপড়া ওর কিছু হবে না। তার চাইতে যদি সংসারের কায-কর্ম্ম করে, তবু অনেকটা উপকার হবে।"

মাথা চুল্‌কাইয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "সংসারের কায কি কর্‌তে পার্‌বে?"

হাত-মুখ নাড়িয়া গৃহিণী বলিলেন, "পার্‌বে না কেন? আট ন' বছরের ছেলে, দু' বেলায় তিন পোয়া চালের ভাত খায়। আমার অম্‌লি বেটের কোলে দশে পা দিয়েছে, সে ওর অর্দ্ধেক খেতে পারে না। এত খায়, আর কাযের

বেলায় পারবে না? না পারলে চলবেই বা কেন? গুরু-পুত্তুরকে কে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে?"

বাপুলী মহাশয়ও বুঝিয়া দেখিলেন, কথাটা ঠিক। পরের ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া লাভ কি? কথাতেই আছে, 'পরের বিড়াল খায়, বনপানে চায়।' তাহা অপেক্ষা সংসারের কায-কর্ম্ম করিলে গৃহিণীর পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইবে; চাই কি, ইহাতে তাঁহার দুর্ব্বল দেহ অনেকটা সবল হইয়া উঠিতে পারে।

তাহাই হইল; লেখাপড়ার পরিবর্ত্তে কেষ্টা সংসারের কায-কর্ম্ম শিখিতে লাগিল। লোক যদি জিজ্ঞাসা করিত, ছেলেটা পাঠশালায় না গিয়া ঘরে বসিয়া আছে কেন? তাহা হইলে বাপুলী মহাশয় আক্ষেপ সহকারে উত্তর করিতেন, ছেলেটা নেহাৎ হতভাগা, পাঠশালায় যাইবার নাম হইলে উহার গায়ে জ্বর আসে, শুধু খেলা লইয়া থাকিতে পাইলে আর কিছু চায় না। বাপুলী মহাশয় উহাকে বেশী মারধর করিতে পারেন না, করিলে লোক দোষ দিবে। আর গৃহিণীর বড়ই মায়ার শরীর; তিনি মা-বাপ-মরা ছেলেটার গায়ে হাত তুলিতে দেন না। কাযেই বাপুলী মহাশয় নিরস্ত হইয়াছেন। উহার অদৃষ্ট!

লোকও বুঝিল, ছেলেটার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ; নতুবা উহার এমন দশা বা এরূপ মতিগতি হইবে কেন? কেষ্টার পরিণাম চিন্তা করিয়া অনেকেই ব্যাকুল না হইয়া থাকিতে পারিত না।

কেষ্টা কিন্তু নিজের পরিণামের জন্য একটুও চিন্তিত হইল না। সে গুরুমহাশয়ের কবল হইতে অব্যাহতি পাইয়া আপনার অদৃষ্টকে সুপ্রসন্ন জ্ঞান করিল এবং গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত অপেক্ষা মাসীমার চড়চাপড়গুলাকে অধিকতর কঠোর বলিয়া বোধ করিল না।

৩

"কেষ্ট, ও বাবা কেষ্টধন!"

"কেন, মাসীমা!"

"গোবরজল গুলে ঘরে-দোরে ছাতাটা দিয়ে দাও না, বাবা। আমার কোমর-পিঠে এমন একটা ব্যথা ধরেছে যে, সোজা হ'তে পাচ্ছি না। তুমি ছাতাটা দাও, অমলি এঁটো বাসনগুলো মেজে ফেলুক।"

অমলা কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সে মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আমি বাসন মাজতে পারবো না।"

গৃহিণী তাহার দিকে ফিরিয়া সরোষে বলিলেন, "কেন পারবি না, শুনি?"

অমলা মাতার রাগে একটুও ভীত না হইয়া উত্তর করিল, "আমি যদি না পারি।"

গৃহিণী বলিলেন, "না পারলে করবে কে?"

অমলা বলিল, "কেন, কেষ্টা করবে। ও মুখপোড়া ব'সে ব'সে খাবে, আর আমি কায করতে যাব। বোয়ে গেছে আমার!"

"তবে রে আবাগী" বলিয়া গৃহিণী তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কেষ্টা বাধা দিয়া বলিল, "থাক্ মাসীমা; আমিই বাসন ক'খানা মেজে ফেলবো।"

গৃহিণীর রোষগম্ভীর মুখে প্রফুল্লতার হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ্ অমলি, একেই তো বলে লক্ষ্মী ছেলে। আচ্ছা, বাবা, তুমি শীগ্‌গির কায সেরে ফেল। আমি ততক্ষণ ওবাড়ীর মেজোবোয়ের মেয়েটা কেমন আছে, দেখে আসি।"

বলিয়া গৃহিণী বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। কন্যাও মাতার পশ্চাদ্‌গামী হইল। কেষ্টা নীরবে মাসীমার আদিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

কেবল আজ বলিয়া নয়, গৃহিণীর এমন পিঠে ব্যথা, পেটে কন্‌কনানি, মাথাধরা প্রায়ই হইত, এবং সেদিন ছাতা দেওয়া, বাসনমাজা হইতে জল তোলা, বাট্‌নাবাটা, উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা প্রভৃতি যাবতীয় কাযের ভার কেষ্টার উপরেই পড়িত। গৃহিণী শুধু বসিয়া বসিয়া রান্নার কাযটা করিতেন, এবং সকলকে খাইতে দিয়া নিজে এক মুঠা খাইতেন। তাঁহার উচ্ছিষ্ট থালাখানাকে পর্য্যন্ত কেষ্টাকে মাজিতে হইত। কেষ্টা কখন প্রফুল্ল, কখন বা বিরক্তচিত্তে এই সকল কায সম্পন্ন করিত।

কেষ্টার এই বিরক্তির কারণ ছিল। মাসীমা কার্য্যে নিয়োগ করিবার সময় যেরূপ সদয়ভাব প্রদর্শন করিতেন, কায শেষ হইলে আর তাঁহার সে ভাব দেখা যাইত না। কাযে সামান্য একটু ত্রুটি দেখিলেই রাগে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কেষ্টাকে তিরস্কার ও গালাগালি করিতেন, শেষে প্রহার পর্য্যন্ত দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। কেষ্টা সে সকল

নীরবেই সহ্য করিয়া যাইত। যে দিন বেশী বাড়াবাড়ি বা অসহ্য বোধ হইত, সে দিন বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইত। গ্রামের বাহিরেই নদী। নদীর ধারে একটা বড় বটগাছ ছিল। সেই বটগাছটা কেষ্টার লুকাইবার স্থান ছিল। গাছের ঘন পাতায় ঢাকা একটা ডালে উঠিয়া সে বসিয়া থাকিত। বসিয়া বসিয়া প্রথমে খানিক কাঁদিত। হায়, সংসারে সকলেরি মা আছে, বাপ আছে, ভাই-বোন আছে, স্নেহ-মমতা দেখাইবার লোক আছে; কিন্তু তাহার কেহ নাই কেন? সে কি এমন দুর্ভাগ্য লইয়া সংসারে আসিয়াছিল যে, তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও ধরিবার কেহ নাই, চোখ ফাটিয়া রক্ত বাহির হইলেও আহা বলিবার লোক নাই! সে কি শুধু অযত্ন অনাদর ভোগ করিতে, গালাগালি আর প্রহার খাইতেই সংসারে আসিয়াছে? নয় বছরের ছেলে গাছের ডালে বসিয়া এই সকল কথা ভাবিত, ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। পায়ের নীচে নদীর জল তর্ তর্ বেগে বহিয়া যাইতেছে; কেষ্টার চোখের জল গাছের পাতা বহিয়া নদীর জলে গিয়া পড়িত।

ভাবিতে ভাবিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া আসিয়া নদীর বুকে পড়িত। কেষ্টা আর গাছে বসিয়া থাকিতে সাহসী হইত না, ধীরে ধীরে নামিয়া আসিত। কিন্তু নামিয়া কোথায় যাইবে? কোথায় তাহার দাঁড়াইবার স্থান আছে? কে এক মুঠা ভাত দিয়া তাহার উত্তেজিত জঠরানল নির্ব্বাপিত করিবে? ওহো, তাহার কে আছে গো, কে আছে! উন্মত্ত বাতাস তাহার কর্ণের পাশ দিয়া হো হো শব্দে বহিয়া যাইত। কেষ্টার ইচ্ছা হইত, নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পেট পুরিয়া খানিকটা জল খায়। তাহার পর—তাহার পর মরিলে তাহার জন্য কাঁদিতে কে আছে? কিন্তু বালকের ক্ষুদ্র প্রাণে এতটা সাহস হইত না। সে ভয়ে নদীতীর ত্যাগ করিয়া মাসীমা'র বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইত।

সারাদিনের পর অনুপস্থিতি;—গরুটা খাবার পায় না, উঠানে ঝাঁট পড়ে না, ছেলেদের এঁটো বাসনগুলো ঘাটেই পড়িয়া আছে। হতভাগা কি না সারাদিনটা খেলিয়া বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময় পিণ্ডলাভের প্রত্যাশায় যমালয় হইতে ফিরিয়া আসিল! এত অবাধ্যতা, এমন দুষ্টামি কি সহ্য হয়! তবে মাসীমা তেমন পর ভাবেন নাই বলিয়াই দুই চারি ঘা প্রহার দিয়া তাহার পিণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, অপরে হইলে কি করিত বলা যায় না।

৪

কেষ্টা ভয়ে ভয়ে অথচ যথাসম্ভব সত্বর মাসীমা'র আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। সে ন্যাতা শেষ করিয়া, ঘাটে গিয়া বাসনগুলা তাড়াতাড়ি মাজিতে লাগিল। মাসীমা আজ তাহাকে লক্ষ্মী ছেলে বলিয়া প্রশংসা করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, মাসীমা না ফিরিতেই কায সব শেষ করিয়া আপনাকে মাসীমা'র নিকট প্রকৃত লক্ষ্মী ছেলে বলিয়া প্রতিপন্ন করে। সুতরাং সে উৎসাহের সহিত শীঘ্র থালাঘটীগুলা মাজিয়া ফেলিতে লাগিল।

পাশের ঘাটে তিনুর মা বাসন ধুইতেছিল। সে কেষ্টাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুই যে বাসন মাজ্‌ছিস, কেষ্টা?"

কেষ্টা সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হুঁ।"

"তোর মাসী কোথায়?"

"পচাদের বাড়ী গিয়েছে।"

"তুই বাসন মাজ্‌ছিস্, আর তিনি সকালবেলা বেড়াতে গিয়েছেন?"

"মাসীমা'র কোমরে বেদনা হয়েছে।"

তিনুর মা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "কোমরে বেদনা হয়েছে ব'লে পাড়া বেড়াতে গিয়েছেন, আর বেটা ছেলে তুই সংসারের কায কচ্ছিস্। ন্যাতা দিলে কে?"

কেষ্টা উত্তর করিল, "আমি।"

বিস্ময়সূচক স্বরে তিনুর মা বলিল, "বলিস্ কি রে, তুই ন্যাতা দিতে পারিস্?"

গর্ব্বের সহিত কেষ্টা বলিল, "কেন পার্‌বো না, আমি তো প্রায় রোজ ন্যাতা দিই।"

তিনুর মা বলিল, "ও মা, মাসীর কি আক্কেল! তোকে দিয়ে এই সব কায করিয়ে নেয়? তুইই বা এ সব মেয়েলি কায কর্‌তে যাস্ কেন?"

কেষ্টা বলিল, "না কর্‌লে মার্‌বে যে।"

ইহা শুনিয়া তিনুর মা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, এবং কেষ্টার মাসীমা'র মত নিষ্ঠুর মেয়েমানুষ যে জগতে আর একটিও নাই, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। কেষ্টা মাজা বাসনগুলা জলে ধুইয়া

উঠিবার উপক্রম করিল। এমন সময় অমলা তথায় উপস্থিত হইল এবং কেষ্টাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তিনির মা'র সঙ্গে কি এত কথা হচ্ছিল রে কেষ্টা?"

শুষ্কমুখে কেষ্টা বলিল, "কি কথা হবে আবার?"

ঘাড় নাড়িয়া, মুখভঙ্গী করিয়া অমলা বলিল, "কি কথা হবে আবার! আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। আচ্ছা, মায়ের কাছে চল।"

কেষ্টা কোন উত্তর না দিয়া জল হইতে ঘাটের পৈঠায় উঠিল। অমলা তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "তোমার আর কায কত্তে হবে না, দাও, আমি বাসন নিয়ে যাচ্চি।"

কেষ্টা বলিল, "তুই নিয়ে যাবি কেন? আমি মেজেছি, আমিই নিয়ে যাচ্চি।"

অমলা কিন্তু ছাড়িল না। সে মাতার বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছে, তাহার দ্বারা কায করাইবে না, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। কেষ্টারও জেদ, সে যখন এত কায করিতে পারিয়াছে, তখন এই বাসন কয়খানা অমলাকে লইয়া যাইতে দিয়া স্বীয় পরিশ্রমের অংশ তাহাকে দিবে না। তখন বাসনের গোছা লইয়া দুই জনের মধ্যে টানাটানি চলিতে লাগিল, এবং টানাটানির ফলে বাসনের গোছা ঝন্ ঝন্ শব্দে পৈঠার কাঠের উপর আছাড়িয়া পড়িল। পড়িবামাত্র বড় পাতরের বাটিটা চুরমার হইল, কাঁসার থালা একখানা ফাটিয়া গেল। তখন উভয়েই সশঙ্কনেত্রে একবার পতিত বাসনগুলার দিকে চাহিল, তাহার পর অমলা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

কেষ্টা পলাইল না; সে বাসনগুলি একে একে গুছাইয়া তুলিল এবং কম্পিত হস্তে সেগুলি পুনরায় জলে ধুইয়া ঘরে লইয়া আসিল। ঘরে কেহই ছিল না। কেষ্টা বাসনের গোছা যথাস্থানে রাখিয়া চারিদিকে সশঙ্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

গৃহিণী যথাসময়ে বাড়ী ফিরিলেন এবং বাড়ীতে আসিয়া ভাঙ্গা থালা পাতরবাটির অবস্থা দেখিয়া রাগে দুঃখে অধীর হইয়া উঠিলেন। আহা, কত সাধের পাতরবাটি! পাতর ত নয়, যেন শালগেরামের গা। অম্বল খাইবার জন্য কত সাধ করিয়া তিনি বাটিটি নগদ সাড়ে পাঁচ আনায় ক্রয় করিয়াছিলেন। ক্রয়কালে পয়সার জন্য কর্ত্তার সহিত ঝগড়া পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। হতভাগা কি না সেই সাধের বাটিটাকে গুঁড়া করিয়া রাখিয়াছে। থালাখানার অবস্থা দেখিলেও চোখে জল আসে। এমনভাবে কি করিয়া ভাঙ্গিল? গৃহিণী অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, আর কিছু নয়, কায করিতে হইয়াছে বলিয়া হতভাগা সেই রাগে ইচ্ছা করিয়াই এগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। আসুক আজ সে, আজ তাহাকে যমালয়ে না পাঠাইয়া কিছুতেই ছাড়িব না। কি বলিব, কর্ত্তা কাল হইতে ঘরে নাই। থাকিলে আজ তাহারি একদিন কি আমারি একদিন হইত। সেই মিনষেই ত আদর করিয়া এই হতভাগাকে বাড়ী ঢুকাইয়াছে।

অমলা প্রকৃত ঘটনা জানিলেও ভয়ে সে কথা বলিল না, বরং কেষ্টা যে ইচ্ছা করিয়াই এগুলা ভাঙ্গিয়াছে, মাতার এই সিদ্ধান্তের পোষকতা করিতে লাগিল এবং সে যে কতদিন ঘাটে কেষ্টাকে ঘটী-বাটি আছড়াইতে দেখিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া মাতার সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করিয়া দিল।

কিন্তু কেষ্টার যে আর দেখা নাই! সারাদিনটা গেল, সন্ধ্যা হয় হয়, তবুও ফিরিল না। হতভাগার কি একটু আক্কেলও নাই? কর্ত্তা বাড়ীতে নাই, গরুটা সারাদিন গোয়ালেই রহিয়া গেল, এক মুঠা খাবার পর্য্যন্ত পাইল না। তাহার নিজের যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই, কিন্তু গরুটার ত আছে! একটু ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানও কি নাই? আচ্ছা, যেখানেই থাক্, রাত্রিতে ত ফিরিতেই হইবে। তখন তাহার সহিত বুঝা-পড়া হইবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অমলা পাড়ার এ বাড়ী সে বাড়ী খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কেষ্টাকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

৩

অমলা যখন কেষ্টাকে এ বাড়ী সে বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, কেষ্টা তখন নদীর ধারে সেই বটগাছটার একটা নীচু ডালে চুপ করিয়া বসিয়াছিল এবং সান্ধ্যচ্ছায়াচ্ছন্ন নদীবক্ষের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, অতঃপর সে কি করিবে। পশ্চিম আকাশে একখণ্ড মেঘ উঠিয়াছিল। মেঘের ছায়া বুকে ধরিয়া নদীর জল তরতর বেগে বহিয়া যাইতেছিল; পাখীগুলা কিচির-মিচির শব্দ করিতে করিতে গাছের এ ডালে সে ডালে আশ্রয় লইতেছিল; অদূরে পারঘাটার মাঝি খেয়া নৌকার দাঁড় টানিতে টানিতে গাহিতেছিল—

"বেলা গেলো সন্ধ্যে হ'লো নন্দলাল কেনে
ঘরে এলো না।"

"হায়, কোথায় তাহার ঘর যে, সে সেখানে ফিরিয়া যাইবে! বনের পাখী—তাহাদেরও একটা আশ্রয় আছে, কিন্তু সে মানুষ হইলেও নিরাশ্রয়। ঐ যে পাখীর ছানা, তাহারও মা-বাপ আছে, তাহারা মুখে করিয়া খাবার আনিয়া ছেলের মুখে তুলিয়া দিতেছে। কিন্তু সে যদি সাতদিন না খায়, তাহার মুখে এককোঁটা জল দিতে কেহই নাই; এত বড় সংসারে আহা করিবার লোক একজনও নাই, মরিলে কাঁদিতে, হারাইলে খুঁজিতে নাই। এত নিরাশ্রয়—এমন স্নেহ-মমতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন, তথাপি সে বাঁচিয়া রহিয়াছে? শুধু মার-গাল খাইবার জন্যই বাঁচিয়া রহিয়াছে! সে বাঁচিয়া রহিল, অথচ তাহার বাবা মারা গেল। বাবা বাঁচিয়া থাকিলে, আজ তাহার এত কষ্ট হইবে কেন? কেষ্টার ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ডাকে—বাবা গো, বাবা গো!

পশ্চিমে বাতাসের সঙ্গে কালো মেঘটা গড়্ গড়্ শব্দে ডাকিয়া উঠিল। মেঘের ছায়ার সঙ্গে সন্ধ্যার অন্ধকার মিশিয়া মুহূর্ত্তে নদীবক্ষকে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। আকাশের দিকে, নদীর দিকে চাহিতেই ভয়ে কেষ্টার বুক গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া পড়িল।

গাছ হইতে নামিয়া কেষ্টা একবার এ দিকে সে দিকে চাহিল। চারিদিকেই অন্ধকার। সম্মুখে ভীমকায় রাক্ষসের মত কালো মেঘখানা সমগ্র আকাশটাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তীব্র বিদ্যুৎশিখা তাহার লেলিহমান জিহ্বার মত আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নাচিয়া বেড়াইতেছে; পশ্চাতে অন্ধকার নদী-বক্ষ ঝটিকাতাড়নে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে; উড্ডীয়মান ধূলিকঙ্কররাশি চোখে-মুখে তীরের মত আসিয়া বাজিতেছে। কেষ্টা আর দাঁড়াইতে পারিল না, অন্ধকারের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটিল।

৬

"ও মা, কেষ্টা এয়েছে গো।"

"তবে আর কি, শাঁখ বাজাও। আসবে না ত যাবে কোন্ চুলোয়? গেলেও ত আপদ্ যায়। তা কি যাবে? সারাদিন খেলিয়ে এবার পিণ্ডী গিলতে এসেছে। আমিও পিণ্ডী চট্‌কাচ্ছি। কোথায় সে?"

কেষ্টা তখন অন্ধকার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিজা কাপড়ের আঁচলে গা-মাথা মুছিতেছিল; মাসীমা'র সাদর আহ্বান শ্রবণে দরজার ভিতরে আসিবে, কি বাহিরে পলাইবে ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহিণী আলোটা উঁচু করিয়া ডাকিলেন, "কেষ্টা!"

সে বজ্রকঠোর আহ্বান শুনিয়া ভয়ে কেষ্টার গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল, সুতরাং সে উত্তর দিতে পারিল না।

গৃহিণী পুনরায় ডাকিলেন, "ওরে কেষ্টা, ও হতভাগা, ওরে মুখপোড়া!"

ভীতিজড়িতকণ্ঠে কেষ্টা উত্তর দিল, "কেন?"

মুখভঙ্গী করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কেন? ওখানে দাঁড়িয়ে তোমার কি ছরাদ হচ্চে? এখানে এসো না।"

কেষ্টা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া ঘরের দাওয়ার উপর উঠিল। গৃহিণী রোষকষায়িতনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারাদিন ছিলি কোথায়?"

কেষ্টা নিরুত্তর। গৃহিণী উত্তরের জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বেলা থালা-বাটি ভেঙ্গে চুরমার করলি কি ক'রে?"

কেষ্টা মুখ তুলিল; কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই অমলা বলিয়া উঠিল, "আছড়ে ভেঙ্গেচে মা, ও বাড়ীর দিদি দেখেছে।"

"হতভাগা!" গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় পড়িল। সে বজ্রকঠোর চড় খাইয়া কেষ্টার মাথাটা যেন ঘুরিয়া উঠিল; সে পড়িয়া যাইতে যাইতে পাশের খুঁটাটা ধরিয়া ফেলিল। এইরূপে তাহাকে খুঁটা ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে দেখিয়া গৃহিণী আরও রাগিয়া উঠিলেন, এবং একটা মোটা কঞ্চি লইয়া এই অবাধ্য ছেলেটাকে সোজা করিতে আরম্ভ করিলেন। কেষ্টা কিছুক্ষণ নীরবে প্রহার সহ্য করিল। কিন্তু প্রহারের বেগ যখন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইল, তখন সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী হইতে ছুটিয়া পলাইল। গৃহিণী তাহাকে যমালয়ে যাইতে আদেশ দিয়া বাহিরের দরজায় খিল আঁটিয়া দিলেন।

তখনও ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়িতেছিল। প্রহারের ভয়ে কেষ্টা সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না। একে সারাদিনের অনাহার, তাহার উপর প্রহারের যাতনা—অল্প দূর যাইতেই সর্ব্বশরীর

ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সম্মুখে নিতাই পালের গরু বাঁধিবার একটা চালা ছিল। কেষ্টা চালায় উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সেই-খানে শুইয়া পড়িল।

সকালে নিতাইয়ের মা দেখিল, কেষ্টা তাহাদের গোয়াল-চালায় পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। বামুনের ছেলেকে এমন জায়গায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া নিতাইয়ের মা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, এবং অনেক ডাকাডাকির পর কেষ্টাকে ঘুম হইতে তুলিয়া তাহার এরূপভাবে পড়িয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কেষ্টা মাসীমা'র প্রহারের ভয়ে পলায়নের কথা বলিল। শুনিয়া নিতাইয়ের মা কেষ্টার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিল এবং কেষ্টাকে অনেক বুঝাইয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া গেল। যাইবার সময় সে এই অনাথ বালকের উপর নিষ্ঠুরতা প্রকা-শের জন্য গৃহিণীকে দুই পাঁচটা কড়া কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না।

কেষ্টার অনুপস্থিতির জন্য একে গৃহিণীকে ছেলে কাঁদাইয়া সংসারের কায স্বহস্তে করিতে হইতেছিল, তাহার উপর নিতাইয়ের মা'র কথাগুলা তাঁহার মর্ম্মে যেন শেলের মত বিঁধিল। কিন্তু নিতাইয়ের মাকে কোন কথা বলিবার উপায় ছিল না। কাযেই তিনি সব রাগটা কেষ্টার উপর ঝাড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং হতভাগা যে যমালয়ে গিয়া রাত কাটা-ইয়াছিল, সেই যমালয়েই না থাকিয়া তাঁহাকে জ্বালাইবার জন্য কেন যে ফিরিয়া আসিল, তজ্জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেষ্টা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া মাসীমা'র এই দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করিল, তাহার পর আস্তে আস্তে গোয়াল-ঘরে গিয়া গাভীটিকে লইয়া বাঁধিয়া দিতে চলিল। কিন্তু গাভীটিও সে দিন কেষ্টার উপর বিরূপ হইয়াছিল। সে সেদিন কেষ্টার নির্দ্দেশমত চলিল না; পাশেই কিনু রায়ের একটু ধানের ক্ষেত ছিল; গাভীটি সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কেষ্টা প্রাণপণ শক্তিতে তাহাকে টানিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু শ্যামল শস্য ভক্ষণে লোলুপ গাভী কিছুতেই নিরস্ত হইল না। সে টানিয়া হিঁচ্ড়াইয়া কেষ্টাকে একটা কাঁটার ঝোপে ফেলিয়া দিল, তাহার পর ছুটিয়া গিয়া ধানের ক্ষেতে পড়িল।

ক্ষেতের মালিক রায় মহাশয় দূর হইতে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেও ক্ষেতের ফসল নষ্ট হওয়ায় রাগে কেষ্টার নির্দ্দোষিতা বিস্মৃত হইলেন, এবং কেষ্টা ক্ষত-বিক্ষত দেহে কাঁটার ঝোপ হইতে উঠিতে না উঠিতেই তিনি ছুটিয়া আসিয়া কেষ্টাকে দুই চারি ঘা উত্তম-মধ্যম দিলেন; তাহার পর দড়ি সমেত গরুটাকে ধরিয়া কাজী হাউসে দিতে চলিলেন। কেষ্টা অনেক কাকুতি-মিনতি করিল; কিন্তু বাপুলী মহাশয়ের সহিত বিবাদ থাকায় রায় মহাশয় তাহার কাতরতায় কর্ণপাত করিলেন না। কেষ্টা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল।

গৃহিণী তাহার মুখে গাভীর বিবরণ শুনিয়া রাগে ভৈরবী-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং কেষ্টা যে স্বেচ্ছায় পরের ক্ষেতে গরু ছাড়িয়া দিয়া কাজী-হাউসে তাঁহাদের অর্থদণ্ড করাইয়াছে, ইহাই ব্যক্ত করিতে করিতে কেষ্টাকে গালি দিতে লাগিলেন। কেষ্টা নিজের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করাইবার জন্য তাঁহার সম্মুখে গিয়া গায়ে কাঁটার আঁচড় দেখাইতে গেল। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল,—নিকটেই আড়াই বছরের ছোট ছেলেটা দাঁড়াইয়া ছিল, কেষ্টার হাঁটুর ধাক্কা লাগায় সে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী আর রাগ সাম্লাইতে পারিলেন না; সম্মুখে একটা পিতলের ঘটী পড়িয়াছিল, সেটাকে তুলিয়া লইয়া সবলে কেষ্টার মাথায় বসাইয়া দিলেন। কেষ্টা 'বাবা গো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘটীর কাণার আঘাতে মাথার একস্থানে কাটিয়া গিয়া ঝর্ ঝর্ রক্ত পড়িতে লাগিল। কেষ্টা দুইহাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

৭

সন্ধ্যার অল্পপূর্ব্বে বাপুলী মহাশয় বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তিনি মেয়ের জন্য পাত্র দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু পাত্র দেখিতেই যে তাঁহার দুই দিন বিলম্ব হইয়াছিল, তাহা নহে, পাত্র স্থির করিয়া সেই সঙ্গে মেয়ের বিবাহের খরচের যোগাড়েও গিয়াছিলেন। বিবাহে প্রায় তিন শত টাকা খরচ। কিন্তু এতগুলা টাকা ঘর হইতে বাহির করিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। জমীজায়গা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে গেলেও তাহার সুদ দিতে হইবে, এবং দেনা পরিশোধ করিতে না পারিলে জমী-জায়গা সব বিকাইয়া যাইবে। কাযেই ফাঁক হইতে টাকাটা সংগ্রহ করিবার যোগাড়ে তিনি ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কেষ্টার বাপের পাঁচ ছয় বিঘা নাথরাজ জমী ছিল। বাপুলী মহাশয় সেগুলা ভাগজোতে বিলি করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কয় বিঘা জমী হইতে মেয়ের বিবাহের টাকার যোগাড় করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি, বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার উপায় ছিল না। কাযেই বাপুলী মহাশয় আর এক স্বতন্ত্র পন্থার আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

তাঁহার চেষ্টায় এক ক্রেতা জুটিল, এবং সেই হাজার টাকার সম্পত্তি চারি শত টাকা মূল্যে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। তাহার সহিত স্থির হইল, কেষ্টার দ্বারা যখন সম্পত্তি বিক্রীত হইবার উপায় নাই, তখন কেষ্টার বাপের নামে একটা কেশ খাড়া করিতে হইবে, এবং যিনি ক্রেতা, তিনিই মহাজনস্বরূপে নালিশ করিয়া ঐ সম্পত্তি দেনার দায়ে নীলাম করিয়া লইবেন। এজন্য শ্রীদাম পাকড়াশীর নামে একটা জাল বন্ধকী কোবালা প্রস্তুত করিতে হইবে। বাপুলী মহাশয়ের কাছে শ্রীদাম পাকড়াশীর অনেক কাগজপত্র আছে, তদৃষ্টে অনায়াসেই জাল সহি করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

এইরূপে অর্থ-সংগ্রহের উপায় স্থির করিয়া বাপুলী মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। সন্ধ্যার তখন অল্পই বিলম্ব ছিল, কিন্তু পশ্চিম আকাশে একখণ্ড মেঘ উঠিয়া অন্ধকারকে যেন তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিতেছিল। সুতরাং স্বল্প পথ বাকী থাকিলেও বাপুলী মহাশয় নদীর বাঁধ ধরিয়া একটু দ্রুতপদেই অগ্রসর হইতেছিলেন। সহসা তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল;—বাঁধের নীচে বটগাছটার নিকট হইতে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল—ও মা গো!

বাপুলী মহাশয় থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার সেই ক্ষীণ করুণ আর্ত্তনাদ উঠিল—'ও মা, মা গো!' এ কি ভৌতিক স্বর, না মানুষের আর্ত্তনাদ! দিনের আলো থাকিতে এমন ভৌতিক স্বর উত্থিত হইবে কেন? শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাপুলী মহাশয় ধীরে ধীরে বটগাছটার দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং গাছের নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি ভয়ে বিস্ময়ে যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন, গাছের তলায় কাদার উপর রক্তাক্ত-দেহে পড়িয়া কেষ্টা ক্ষীণ-করুণকণ্ঠে এক একবার ডাকিতেছে—"ও মা গো।"

বাপুলী মহাশয় কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে কেষ্টার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তার পর তাহার খুব কাছে গিয়া ডাকিলেন, "কেষ্টা, কেষ্টা!"

কেষ্টা কোন উত্তর দিল না, নিমীলিত-নেত্রে নিঃশব্দেই পড়িয়া রহিল। বাপুলী মহাশয় আরও দুই চারিবার ডাকিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, কেষ্টার উত্তর দিবার শক্তি তিরোহিত হইয়াছে, তখন নদী হইতে আঁজলা আঁজলা জল আনিয়া কেষ্টার মুখে চোখে দিলেন!

তাহার পর তাহার নিঃসংজ্ঞ দেহ কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

৮

নাক সিট্‌কাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "ওঃ, বাবুকে আবার কাঁধে ক'রে আনা হচ্চে যে?"

বাপুলী মহাশয় তাঁহাকে বিছানা পাতিয়া দিতে বলিয়া উত্তর দিলেন, "বোধ হয়, গাছ থেকে প'ড়ে গিয়ে এমন হয়েছে। ডাক্তার ডাক্‌বো নাকি?"

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া তীব্র শ্লেষের স্বরে গৃহিণী বলিলেন, "ডাক্‌বে বৈকি! তবে ছোট-খাট ডাক্তার ডাক্‌লে হবে কি? বর্দ্ধমানের সাহেব ডাক্তারকে না হয় ডেকে নিয়ে এস।"

অপ্রতিভভাবে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "দেখি, যদি আপনা হ'তে চেতনা না হয়, তখন যা হয়, করা যাবে।"

গৃহিণী একখানা ছেঁড়া চাটাই পাতিয়া দিলেন। তাহার উপর কেষ্টাকে শোয়াইয়া তাহার চোখে-মুখে জলের ছিটা দিয়া বাপুলী মহাশয় উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "কেষ্টা, কেষ্টা!"

কেষ্টা চোখ মেলিয়া চাহিল এবং ইতস্ততঃ চঞ্চল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, —"আর মেরো না গো মাসীমা, আর মেরো না।"

গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বাপুলী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন ক'রে ছেলেটাকে কেন মার্‌লে?"

গর্জ্জন সহকারে গৃহিণী বলিলেন, "ভুল হয়েছে, ঘাট হয়েছে। ছেলেটি পরের ক্ষেতের ধান খাইয়ে গরুটাকে কাঞ্জী হাউসে পাঠিয়েছে, তা জান? এখন পয়সা দিয়ে আগে গরু ছাড়িয়ে নিয়ে এস।"

ঘাড় দোলাইয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "তাই ব'লে এমন ক'রে মার্‌তে হয়? যদি ম'রে যেত?"

তীব্রকণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "আপদ্ চুকে যেত, আমাকে এমন হাড়ে-নাড়ে জ্বলতে হ'ত না।"

বাপু। কেষ্টা না তোমারি বোন্‌পো?

গৃহি। তাই ত আমার চাইতে তুমি বেশী দরদ জানাতে বসেছ। আরে আমার দরদী রে! বলে, 'মার চেয়ে দরদী যে তারে বলি ডান।'

স্বামীর মুখের উপর একটা শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিয়া গৃহিণী কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। বাপুলী মহাশয় কেষ্টার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। ওঃ, কি অসহায়, কি দুর্ভাগ্য বালক! স্নেহ নাই, মমতা নাই, ভালবাসা নাই, মারিয়া ফেলিলেও আহা বলিবার লোক নাই! কি কঠোর, কি অভিশপ্ত জীবন এই ক্ষুদ্র বালকের!

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "হাঁ গা, এত পথ হেঁটে এলে, মুখে-হাতে জল দেবে, না ঐ হতভাগার কাছে চুপ্ ক'রে ব'সে থাক্‌বে?"

এই ত সংসারে এত স্নেহ-মমতা রহিয়াছে। শুধু এই অভাগার কাছেই কি এ সকলের দ্বার চিররুদ্ধ! বাপুলী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ভারী গলায় বলিলেন, "আগে ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসি।"

বাপুলী মহাশয় বাহির হইয়া গেলেন। গৃহিণী স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়া আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "অতিরিক্ত রক্তস্রাবে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর প্রবল জ্বর। নাড়ীর অবস্থাও ভাল নয়—অতি ক্ষীণ। এই জ্বরের অবকাশে কি হয় বলা যায় না।"

ডাক্তার উপস্থিত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। বাপুলী মহাশয় ঔষধ আনিয়া কেষ্টাকে খাওয়াইতে লাগিলেন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার ডাক্‌লে, ওষুধ আন্‌লে, টাকা দিতে হবে ত?"

বাপুলী মহাশয় উত্তর করিলেন, "তা দিতে হবে বৈকি।"

গৃহি। টাকা আস্‌বে কোথা থেকে?

বাপু। কেষ্টার বাপের টাকায় তোমার সোনার শাঁখা হয়েছে। সেই শাঁখা বেচে টাকা দিলেই চল্‌বে।

স্বামীর এই বয়সেই ভীমরথী উপস্থিত হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য গৃহিণী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "কাঁথা একখানা, বালিস একটা এনে দাও।"

গৃহিণী বলিলেন, "কাঁথা আর কোথায়? সব ত বিছানায় পাতা আছে।"

বিরক্তভাবে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "বিছানায় পাতা থাকে, তুলে এনে দাও। কেন, কেষ্টার ঘর থেকে যে এত বিছানা বালিস এসেছিল?"

ঝঙ্কারের সহিত গৃহিণী বলিলেন, "সে সব আমি খেয়ে ফেলেছি।"

বলিয়া তিনি বিরক্তির সহিত একখানা ছেঁড়া কাঁথা এবং একটা ময়লা বালিস আনিয়া ফেলিয়া দিলেন। বাপুলী মহাশয় কাঁথাখানা পাতিয়া, বালিস দিয়া, আস্তে আস্তে কেষ্টাকে তুলিয়া শোয়াইলেন। তুলিবার সময় কেষ্টা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো মাসীমা গো, আর মেরো না গো।"

৯

রাত্রিতে বাপুলী মহাশয় আহারে বসিলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলে দেখ্‌তে গিয়েছিলে, তার কি হ'লো?"

বাপুলী মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "দেখা-শোনা সব হয়েছে, এখন চার শো টাকা চাই।"

গৃহি। কেষ্টার বাপের কি জমী বিক্রীর কথা না বলেছিলে?

বাপু। সে জমী বিক্রী করা হবে না।

গৃহি। কেন হবে না?

বাপু। সে জমী কেষ্টার। কেষ্টা বাঁচলে বাপের জমী ভোগ করবে।

নাক সিট্‌কাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "কেষ্টা জমী ভোগ কর্‌বে, কিন্তু তুমি মেয়ের বিয়ে দেবে কেমন ক'রে?"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "যে উপায়ে হোক্ দিতেই হবে। তোমার গয়না-গাঁটী আছে, ঘর-ভিটে আছে।

ক্রুদ্ধস্বরে গৃহিণী বলিলেন, "নিজের ঘর-ভিটে বেচ্‌বে, তবু কেষ্টার জমী বেচ্‌বে না। কেষ্টা জমী ভোগ কর্‌লে তোমার বুঝি স্বর্গ হবে?"

গম্ভীর মুখে বাপুলী মহাশয় উত্তর করিলেন, "স্বর্গ না হোক্, নেহাৎ নরকে যেতে হবে না।"

"ওঃ, একেবারে বকধার্ম্মিক হয়ে পড়লে দেখছি।"

বলিয়া গৃহিণী যেন ঘৃণার সহিত মুখটা ফিরাইয়া লইলেন। বাপুলী মহাশয় আহার শেষ করিয়া কেষ্টার পাশে আসিয়া বসিলেন।

১০

"ও মা, মা গো!"

বাপুলী মহাশয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল; তিনি তাড়াতাড়ি মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া কেষ্টার গায়ের উত্তাপ দেখিলেন, নাড়ী টিপিলেন। জ্বরটা যেন ছাড়িতেছে মনে হইল। রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বাকাশে ঊষার আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। বাপুলী মহাশয় এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া কেষ্টার মুখে দিলেন। কেষ্টা মুখ বিকৃত করিয়া আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো মাসীমা গো, আর মেরো না গো।"

তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বাপুলী মহাশয় ডাকিলেন, "কেষ্টা, বাবা কেষ্টধন!"

সে স্নেহকোমল সম্বোধন কানে যাইবামাত্র কেষ্টা ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল। বাপুলী মহাশয় স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কি কষ্ট হচ্চে কেষ্ট?"

কেষ্টা স্থির নিস্পন্দ-দৃষ্টিতে তাঁহার স্নেহসিক্ত মুখের দিকে চাহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো মাসীমা গো—"

আর কথা বাহির হইল না, কেষ্টা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। বাপুলী মহাশয় ডাকিলেন, "কেষ্টা, কেষ্টা!"

কোথায় কেষ্টা? কেষ্টার যাতনা-পীড়িত হৃদয়ের শেষ অশ্রুবিন্দু গণ্ডদেশ অতিক্রম না করিতেই তাহার ব্যথিত নিপীড়িত আত্মা পৃথিবীর কঠোর-গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কোন্ এক নূতন দেশে চলিয়া গিয়াছে; ঊষার রক্তিম-আভায় তাহার গণ্ড-প্রবাহিত অশ্রুবিন্দু তখনও টল্ টল্ করিতেছে।

কেষ্টার চীৎকারে গৃহিণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং কেষ্টার অসাড় দেহের দিকে চাহিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, হয়ে গেল নাকি? হাঁ গা, বুড়ো মিন্‌ষে ঠায় ব'সে আছ, কাঁথাখানা বালিসটা টেনে নিতে পার্‌লে না?"

বাপুলী মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না, শুধু কঠোর-দৃষ্টিতে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গর্ব্বের অবসান।

(H. Wotton)

ও গো গগনের রূপ-গর্ব্বিত তারকাবলী—
ভাবিতেছ বুঝি দ্যুতি তোমাদের মানসহরা।
ক্ষীণ বিভা ল'য়ে কতখন আর রহিবে জ্বলি,
জনতার মত সংখ্যায় শুধু গগনভরা?

ভুবন আলোকি' নিশাপতি ধীরে উদিবে যবে,
তখন হায় রে তোমাদের জাঁক কোথায় রবে?

ও গো গহনের বিহগপুঞ্জ কুঞ্জমাঝে,
গীত-গর্ব্বিত, কলরব করি ভাবিছ বুঝি,
স্বভাব-মাতার মধু-সঙ্গীত কণ্ঠে বাজে,
গাহ গাহ ঢালো ক্ষীণ কণ্ঠের যা কিছু পুঁজি।

নিখিল পুলকি' কোকিল কুঞ্জে গাহিবে যবে—
স্বর-গৌরব কল কল রব কোথায় রবে?

ও গো কুঞ্জের অশোক-পলাশ-কুসুমরাজি,
মধূৎসবের গর্ব্বিতা যত তরুণী যেন,
আগে হতে এসে অরুণ বসন-ভূষণে সাজি,
সারা মধুমাস করেছ দখল ভাবিছ হেন।

মধু-সৌরভে নব গৌরবে গোলাপ যবে
ফুটিবে যখন, তোমরা তখন কোথায় রবে?

ও গো সুন্দরী রূপসী তরুণী রমণী-শ্রেণী—
রূপ গৌরবে করিতেছ হেলা নিখিল জনে।
ভূষা-বৈভবে প্রমোদে মেতেছ দুলায়ে বেণী
হাসে উপহাসে মানুষে মানুষ ভাব না মনে।

মহাদেবী মোর যদি আসে হেথা এ সভা মাঝে,
সমুখে তাঁহার কোথায় বদন লুকাবে লাজে?

শ্রীকালিদাস রায়।

ফলিত জ্যোতিষ।

(ছোট গল্প)

গণনা।

প্রতি রবিবারে ও অন্যান্য ছুটির দিনে ভোরবেলা হইতে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত জ্যোতিষ বাবুর 'বৈঠকখানা-ঘরে' বিষম ভিড় হয়। সে ভিড় গীতবাদ্যের বা তাসপাশার আকর্ষণে জমায়েত হয় না। বাবুটি আফিসের বড় বাবু নহেন, তথাপি তাঁহার কাছে এত লোক-সমাগম হয় কেন? এইরূপ প্রচার যে, তিনি করকোষ্ঠী-বিচারে অদ্বিতীয়; এবং সে জন্য রজত-দক্ষিণা গ্রহণ করেন না; কেবল পরোপকারের জন্যই এত শ্রম স্বীকার করেন। এমন বে-খরচায় ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কাহার না সে বিষয়ে কৌতুহল হয়? এ অবস্থায় কেন এত লোকে তাঁহার দ্বারস্থ হয় এবং তাঁহার নিম্নতলস্থ অপ্রশস্ত 'বৈঠকখানা-ঘরে' কেওড়া-কাঠের ছারপোকা-সমাকুল তক্তপোষের উপর বিছান ধূলিধূসরিত, স্থানে স্থানে ছিন্ন, লাল-কাল প্রভৃতি নানাবর্ণের মসীরঞ্জিত শতরঞ্চে ঠেসাঠেসি করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কাহার কবে চাকরী হইবে, কাহার কবে বেতন-বৃদ্ধি হইবে, কাহার কবে অবস্থার উন্নতি হইবে, কাহার কবে পুত্রলাভ বা স্ত্রীবিয়োগ হইবে, কাহার কবে বড় ঘরে পুত্র-কন্যার বিবাহ হইবে ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বর্ষমাস কেন, দিন ঘণ্টা মিনিট পর্য্যন্ত ঠিকঠাক গণিয়া বলেন, আর সে সব কথা হুবহু ফলিয়া বা মিলিয়া যায় বলিয়া তাঁহার ভক্তমহলে খুব একটা নামডাক ছিল।

এক দিন বেলা ৯টার সময় মোটরবিহারী এক জন সুশ্রী ও সুবেশ যুবক একটি সহচর-সঙ্গে জ্যোতিষীর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গীটি নাছোড়বান্দা, জ্যোতিষীর অশেষ গুণগান করিয়া যুবককে এখানে আসিতে সম্মত করাইয়াছেন। যুবকটি ধনী, মানী, বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র, নাম রমণীমোহন; পিতা, পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতি অভিভাবক-অভাবেও অসৎসঙ্গ করেন নাই, কোনওরূপ বদখেয়াল নাই, পরন্তু সুখ্যাতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর এম্ এ উপাধিভূষিত হইয়াছেন এবং আপাততঃ আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। সম্প্রতি একটি রূপবতী গুণবতী ধনিকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছে। কন্যাটি ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং একক্ষেত্রেই কামিনী ও কাঞ্চন-লাভ ঘটিবে। বর স্বয়ং কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিয়াছেন (ইহাই হইল হাল আইনের শুভদৃষ্টি—অর্থাৎ ভোগের আগে প্রসাদ বা বোধনের আগে দেবীবরণ) এবং মধুময় পরিণয়ের জন্য উন্মুখ হইয়া দিন গণিতেছেন। ভাবী জীবনে দাম্পত্যসুখে কিরূপ সুখী হইবেন, বোধ হয়, তাহা জানিবার প্রচ্ছন্ন কৌতুহল তাঁহার জ্যোতিষীর নিকট আসিতে সম্মত হইবার মূলে ছিল।

সূর্য্যোদয় হইতেই করকোষ্ঠী দেখা চলিতেছিল। লোক-সমাগম বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে বাড়িতেছিল বই কমিতেছিল না। ঠিক যেন রেল-গাড়ীর থার্ড ক্লাস। যাহা হউক, যাহাদের ভাগ্যপরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল অথচ অপরের সম্বন্ধে মন্তব্য শুনিবার লোভে স্থানত্যাগের বড় ইচ্ছা ছিল না, বিশিষ্ট ভদ্রলোক দেখিয়া তাহারা অনেকে উঠিয়া দাঁড়াইল, অপর সকলেও যথাসম্ভব সরিয়া সরিয়া বসিল, কষ্টেসৃষ্টে আগন্তুক-দ্বয়ের জন্য শতরঞ্চের এক কোণে একটু স্থান হইল। গণৎকার আফিসে কি বেশে বাহির হয়েন, জানি না, তবে এক্ষেত্রে ত তাঁহার পরনে পট্টবস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, কপালে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক, মস্তকে জটাযুক্ত অথচ সুবিন্যস্ত কেশ; চেহারাটিও দর্শনধারী বটে। আরও যে কয়েকজন 'তীর্থের কাকে'র মত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, জ্যোতিষী একটু চটপট তাঁহাদিগের কার্য্য সমাধা করিয়া এই সুবেশ ভদ্রলোকটির দিকে ঝুঁকিলেন। তাঁহাকে দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিতে বলিয়া নিজের দক্ষিণ হস্তে তাহা তুলিয়া লইলেন এবং অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখের ভাব যেন কেমনতর হইয়া গেল, তিনি যেন চমকিত হইয়া ধৃত হস্ত ছাড়িয়া দিলেন। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া বাম করতল দেখিতে চাহিলেন। বাম করতলে দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়াও তাঁহার পূর্ব্বভাবের ব্যত্যয় হইল

না। আশেপাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া তটস্থ হইলেন। রমণী বাবুও একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে আচ্ছন্ন হইলেন। যাহা হউক, জ্যোতিষীর বহুলোক লইয়া কারবার করিতে হয়, এরূপ ভড়কাইলে চলে না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং যেন এতক্ষণে কর-কোষ্ঠী উদ্ধার করিয়াছেন, এই ভাব দেখাইয়া কতকগুলি বাঁধা বুলি আওড়াইতে লাগিলেন,—"আপনি দীর্ঘজীবী, নীরোগ, যশস্বী ও সর্ব্বসুখে সুখী হইবেন, রূপবতী গুণবতী পত্নী লাভ করিবেন, এবং স্ত্রীর সঙ্গে সম্পত্তি লাভ করিবেন। শীঘ্রই আপনার এক জন দূর আত্মীয় বা আত্মীয়ার সম্পত্তিও আপনার লভ্য হইবে।" এই বলিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া জ্যোতিষী এক জন নবাগতের দিকে ফিরিলেন ও তাঁহার করকোষ্ঠী-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। রমণী বাবু ও তাঁহার সহচর অগত্যা জ্যোতিষীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রমণী বাবু কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন, তিনি বেশ বুঝিলেন, জ্যোতিষী কি একটা অশুভ কথা গোপন করিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে সঙ্গীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি তাহাকে একটা ছলে বিদায় দিয়া আবার ফিরিয়া জ্যোতিষীর গৃহাভিমুখে গেলেন এবং একটু তফাতে থাকিয়া সকলের প্রস্থানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলে চলিয়া গেলে তিনি ধীরে ধীরে জ্যোতিষীর সম্মুখীন হইলেন। জ্যোতিষী তাঁহাকে আবার আসিতে দেখিয়া একটু বিচলিত হইলেন। তথাপি সে ভাব গোপন করিয়া হাসিমুখে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন ও বসিতে বলিলেন। রমণী বাবু বেশী ভূমিকা না করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "দেখুন, আপনি তখন কি একটা অশুভ কথা আমার কাছে গোপন করিলেন। বোধ হয়, বেশী লোকজন ছিল বলিয়া চাপিয়া গিয়াছেন, এখন নিরিবিলি আমাকে কথাটি বলিতে হইবে।" জ্যোতিষী এড়াইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রমণী বাবু তাঁহাকে এমন করিয়া ধরিয়া বসিলেন (এবং এক শত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন) যে, শেষে জ্যোতিষীকে বাধ্য হইয়া গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে হইল। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "আপনার দ্বারা এক জনের প্রাণের হানি হইবে, কররেখা হইতে এইরূপ যেন একটা আভাস পাওয়া যায়। তবে হয় ত আমার বিচারে প্রমাদ ঘটিয়াছে, কেন না, মানুষ অভ্রান্ত নহে, আর আমাদের শাস্ত্রও বড় জটিল। অতএব আপনি ইহার জন্য দুশ্চিন্তা করিবেন না। 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এই ঋষিবাক্য স্মরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।" এই কথার পর রমণী বাবু শুষ্কমুখে অবসন্ন-হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন।

ভাবনা।

কি কুক্ষণে রমণী বাবু পার্শ্বচরের প্ররোচনায় জ্যোতিষীর গৃহে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, জ্যোতিষীর মুখে গুপ্ত কথা ব্যক্ত হওয়ার পর হইতে তাঁহার মনের সুখশান্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। তিনি আকাশ-পাতাল ভাবনায় পড়িলেন। এই সবে মাত্র সুরূপা ধনিকন্যার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, বিমল প্রণয়ের রঙ্গীন স্বপ্নে তাঁহার নবীন হৃদয় রাঙ্গিয়া উঠিয়াছে, আর সেই সময়ে এই নিদারুণ অদৃষ্টগণনা। এ যে বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত। বিবাহের পরে, যে কোন সময়ে খুনের অপরাধে ধৃত ও দণ্ডিত হইলে তাঁহার নিজে জীবন ত ব্যর্থ হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সুখের ক্রোড়ে পালিতা প্রিয়তমা পত্নীর জীবন চিরদিনের মত বিষময় হইবে, ধনী, মানী শ্বশুরের উচ্চ মাথা হেঁট হইবে, পিতৃকুল শ্বশুরকুল উভয়ই কলঙ্কের কালিমাকীর্ণ হইবে। এ অবস্থায় অন্ততঃ পরের মেয়েকে সারা জীবনের জন্য দুঃখসাগরে না ভাসাইয়া চিরকুমার থাকাই সুবিবেচনার কার্য্য। অথচ বিবাহের সব ঠিকঠাক হইয়াছে, দিনস্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, এখন কি উপায়েই বা তিনি বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গেন, কিছুই কূলকিনারা পাইলেন না। আবার বিবাহের আশা ত্যাগ করিতেও তাঁহার মন সায় দেয় না। সুন্দরীর লোভ দুর্দ্দমনীয়, সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিবার চেষ্টা অসাধ্য। এই বিষম সমস্যা লইয়া তিনি তিন দিন তিন রাত্রি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দারুণ অশান্তিতে, অসহ্য যন্ত্রণায় কাল অতিবাহিত করিলেন। এমন কেহ অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই যে, তাহার কাছে এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া মনের ভার লাঘব করেন, এবং তাহার কাছ হইতে উপায়-নির্দ্ধারণ-সম্বন্ধে সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন। যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দুই প্রবল অথচ পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে এইভাবে রফা

করিলেন,—কাহাকেও অতি গোপনে ও সুকৌশলে খুন করিয়া সেটা চাপিয়া রাখিবেন এবং কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিবেন যে, খুনের আস্কারা হইল না, আর শাস্তির ভয় নাই, তখন নিশ্চিন্তমনে বিবাহ করিবেন। আর খুনও এমন লোককে করিবেন, যাহার মরণে জগতের কোনও ক্ষতি হইবে না, কোনও পরিবারের আর্থিক বা মানসিক কষ্ট হইবে না, যাহার মৃত্যু শোচনীয় অকালমৃত্যু বলিয়া নিরতিশয় দুঃখের কারণ হইবে না। মীমাংসাটা তর্ক-বিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে পারদর্শী চরিত্রবান্ লোকের মত হইল কি না, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি তখন পাত্র ও প্রণালী স্থির করিতে মনঃসংযোগ করিলেন। পাত্র—শ্রীবিষ্ণুঃ—পাত্রী অল্প আয়াসেই নির্ব্বাচিত হইল। তাঁহার দিদি-মার এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনী বহু বৎসর যাবৎ কাশীবাস করিতেছিলেন, অশীতিপর বৃদ্ধা, মধ্যে মধ্যে শূল-বেদনায় যমযন্ত্রণা ভোগ করে, অথচ বুড়ী মরিবার নামও করে না; মরিতে পারিলেই বুড়ী যেন বাঁচে। বুড়ী মরিলে তাহার জন্য শোক করিবে, এমন লোক তিন কুলে কেহ নাই। বুড়ীর সঞ্চিত ধনও বিস্তর, তাহার একমাত্র ওয়ারিশান রমণী বাবু স্বয়ং। এ অবস্থায় তাঁহার বিবেচনায় বুড়ীর ভববন্ধন ঘুচাইয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কাশীতে অপমৃত্যু হইলেও শিবত্ব-প্রাপ্তিতে বাধা নাই, অতএব ঐহিক পারত্রিক উভয়তঃই ইহা শ্রেয়ঃ পন্থাঃ।

এইবার উপায়-নির্দ্ধারণের পালা। রমণী বাবু দর্শন-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সম্প্রতি সৌখীন (amateur) ভাবে বিজ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। এখন এই কার্য্যের জন্য তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে রসায়ন-শাস্ত্রের রহস্য-উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত হইলেন। অনন্যকর্ম্মা হইয়া বহু গ্রন্থ ও গবেষণাত্মক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ঘাঁটিয়া, বহু বিজ্ঞান-শালায় ঘুরিয়া, বহু বৈজ্ঞানিকের সহিত তত্ত্বালোচনা করিয়া, তিনি অবশেষে এমন একটি বিষের সন্ধান পাইলেন, যাহার ক্রিয়া যন্ত্রণাহীন। (অবশ্য, বিষের নামটি পাঠকবর্গকে জানাইতে সাহস হয় না। কেন না, কাহার মনে কি আছে, কে জানে?) ইহা হইতে প্রস্তুত লজেঞ্জুসের মত মিষ্টস্বাদ এক প্রকার বটিকা বিষপ্রয়োগ-কার্য্যে বৈজ্ঞানিক-জগতে বিনিয়োজিত হয়। সাধারণতঃ ঔষধালয়ে যাহাকে তাহাকে এই বিষাক্ত মোদক বিক্রয় করে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-সমাজে রমণী বাবুর খাতির যথেষ্ট, আর পয়সার অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহাকে উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কার্য্যসিদ্ধির প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হওয়াতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল।

সাধনা।

তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী কাশীযাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া কাশীর প্রস্তুত একটি সুদৃশ্য কাঠের কৌটায় বটিকাটি পুরিয়া পকেটে ফেলিলেন এবং অবিলম্বে বৃদ্ধার চরণবন্দনা করিতে গেলেন। রমণী বাবুই বৃদ্ধার উত্তরাধিকারী, সুতরাং বৃদ্ধার তাঁহার উপর একটু আবদার অভিমান করিবার অধিকার ছিল। নাতিকে সম্মুখে পাইয়াই তিনি খুব একচোট লইলেন, "কখনও একবার পথ ভুলেও আস না; তা' আস্‌বে কেন? বুড়ীর আদর কে কোন্ কালে করে? এখন আবার রাঙ্গা নাতবৌ ঘরে আস্‌বে, সেই চিন্তেতেই মগ্ন আছ।" নাতির কুশল-প্রশ্নে উত্তর করিলেন, "আর দাদা, ও কথা শুধিও না। শূল-বেদনা যখন ওঠে, তখন যে কি যন্ত্রণা, তা'র আর কি বল্‌ব? তখন ইচ্ছে করে, আত্মঘাতী হ'য়ে জ্বালা জুড়ুই, তবে আত্ম-হত্যে মহাপাপ, তাই কর্‌তে পারিনে।" এ কথা শুনিয়া রমণী বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দিদিমা, আর তোমাকে সে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে না, আমি কল্‌কাতা থেকে এমন ওষুধ এনেছি যে, তা' একবার খেলে আর কখনও বেদনা উঠবে না।" বুড়ী সাগ্রহে বলিল, "কৈ দাও দাদা, এখনি খেয়ে ফেলি।" রমণী বাবু একটু ফাঁফরে পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, তিনি উপস্থিত থাকিতেই বুড়ী বিষাক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করে, কেন না, সে ক্ষেত্রে বুড়ীর আকস্মিক মৃত্যুর সহিত তাঁহাকে জড়াইতে পারে। তিনি একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "না, দিদিমা, ওষুধটা যখন তখন খাবার নয়। যখন বেদনা উঠবে, তখুনি গিলে ফেল্‌বেন, সকল যন্ত্রণা দূর হবে।" এই বলিয়া তিনি কৌটাটি বুড়ীর হাতে দিলেন এবং দুই চারিটা কথার পর আজই বিশেষ দরকারে দিল্লী যাইতে হইবে বলিয়া চটপট বিদায় লইলেন। বড় ভয়, পাছে তিনি থাকিতে থাকিতেই বুড়ীর বেদনা উঠে ও বুড়ী তৎক্ষণাৎ বটিকা ভক্ষণ করিয়া তাঁহাকে কোনও ফ্যাসাদে ফেলে।

কাশীতে তাঁহার কার্য্য আপাততঃ ফুরাইল; তিনি জ্ঞানকৃত পাপের জন্ম জ্ঞানবাপীর জল মাথায় ছিটাইয়া সেই দিনকার ট্রেণেই দিল্লী রওনা হইলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া কলিকাতার কর্ম্মচারীকে ঠিকানা জানাইলেন। দিল্লীতে বসিয়া বসিয়া তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে বুড়ীর মৃত্যুসংবাদের 'তার' পাইবার জন্ম দিন কাটাইতে লাগিলেন। মাসখানেকের মধ্যেই খোসখবর আসিল, তাঁহার দুর্ভাবনা ঘুচিল, তিনি বুড়ীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ম ও সম্পত্তির দখল লইবার জন্ম কাশী ছুটিলেন। শাস্ত্রের অনুশাসন, পিণ্ডং দত্বা ধনং হরেৎ।

মহাসমারোহে শ্রাদ্ধকৃত্য সমাপ্ত হইল। বুড়ীর সঞ্চিত অর্থ অনেক ছিল, রমণী বাবু তৎসমস্ত গ্রাস করিতে ব্যগ্র ছিলেন না, সুতরাং উহার অধিকাংশ ব্যয় করিয়া খুব ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধাদির পর এক দিন বুড়ীর শয়নঘর পরিষ্কার করাইতে গিয়া রমণী বাবু তাঁহার প্রদত্ত সুন্দর কৌটাটি পাইলেন; শুধু তাহাই নহে, কৌটা খুলিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যস্থ বটিকাটিও রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তবে ত তাঁহার সকল আয়োজনই পণ্ড হইয়াছে; বুড়ী খুন হয় নাই, রোগের যন্ত্রণায় বা বয়সের গতিকে স্বাভাবিক ভাবেই মরিয়াছে। সুতরাং তাঁহার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আশঙ্কা আবার প্রবল হইল, খুনের ভবিতব্যতা ত খণ্ডাইল না। খানিক দম ধরিয়া থাকিয়া আবার তিনি নবোৎসাহে অন্য শীকারের চেষ্টায় মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।

*** ***

অনেক চিন্তার পর তাঁহার স্মরণ হইল যে, তাঁহার পিতার মাতামহ অত্যন্ত স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ুঃ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। শৈশবে পঠিত কবিতাংশও তাঁহার মনে পড়িল,—'অশীতিপরের বটে মরণ মঙ্গল।' বুড়া বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার একটি বাতিক ছিল, বোধ হয়, এই বাতিকই তাঁহাকে জীয়াইয়া রাখিয়াছিল। অসংখ্য ঘড়ী তাঁহার প্রশস্ত বৈঠকখানায় জমিয়াছিল, নূতন রকমের ঘড়ীর সন্ধান পাইলেই তিনি কিনিতেন, আর নিয়মিতরূপে ঘড়ীগুলিতে স্বহস্তে দম দেওয়া তাঁহার নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির একটি অঙ্গ ছিল। রমণী বাবু এই রন্ধ্র দিয়া তাঁহার শনি হইয়া প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশে বোমার ব্যাপারে হুলস্থূল লাগিয়াছে। রমণী বাবুর মাথায় এই বুদ্ধি যোগাইল, ঘড়ীর ভিতর কৌশলে এমন ভাবে বোমা রাখা হইবে যে, ঘড়ীতে দম দিতে গেলেই বোমা ফাটিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটাইবে। বোমাওয়ালাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হইলেও পরোক্ষভাবে জানাশুনা ছিল। তিনি অতি গোপনে মধ্যবর্ত্তীর মারফত উক্ত দলের এক জন মাতব্বরের কাছে এইরূপ একটি ঘড়ীর ফরমায়েস পাঠাইলেন। বোমাওয়ালা এরূপ এক জন ধনী, মানী ও বিদ্বান্ লোককে এই সূত্রে হাতে রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে অনেক উপকার পাইবে, এই আশায় খুব উৎসাহের সহিত ফরমায়েসী ঘড়ী সত্বর প্রস্তুত করিয়া দিল।

ঘড়ী লইয়া রমণী বাবু হাসিমুখে বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন ও কুশলপ্রশ্নান্তে ঘড়ীটি তাঁহার হস্তে দিলেন। ঘড়ীর কারুকার্য্য দেখিয়া বৃদ্ধ খুসী হইলেন এবং ঘড়ীটির মূল্য জানিতে চাহিলেন। রমণী বাবু যখন বলিলেন, "ইহার মূল্য লাগিবে না, আমি এটি আপনাকে ভক্তি-উপহার দিলাম," তখন তিনি প্রাণ খুলিয়া দৌহিত্রপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রমণী বাবুর মনোগত অভিপ্রায় জানিলে বৃদ্ধ যে তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে কঠোর অভিশাপ দিতেন, তাহা বলা বাহুল্য!

সেই অবধি রমণী বাবু পর পর কয় দিন বৃদ্ধের দরবারে হাজিরা দিতে লাগিলেন, বুড়া কোন্ দিন ঘড়ীটিতে দম দিতে গিয়া নিজে বেদম হইয়া যান, তাহার সংবাদ রাখিবার জন্ম। কিন্তু এবারও তাঁহার আশাভঙ্গ হইল। বৃদ্ধ এক দিন রমণী বাবু আসিবামাত্র বলিলেন, "তুমি দেখছি ঘড়ীর আসল মজাটুকুই আমার কাছে প্রকাশ কর নি,—বোধ হয়, আমাকে হঠাৎ তাক লাগা'বার মতলবে।" রমণী বাবু কম্পিতবক্ষে অথচ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলুন ত?" বৃদ্ধ সকৌতুকে বলিলেন, "দম দিতে গেলেই ঘড়ীতে এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটে, যেন সার্ সার্ পটকাতে কে আগুন লাগিয়েছে, চটাপট শব্দ দশ মিনিট ধ'রে চল্‌তে থাকে।" কথা শুনিয়া রমণী বাবু হাসিবেন কি কাঁদিবেন, কিছুই ঠিক পাইলেন না। তিনি বেশ বুঝিলেন, তাঁহার কপালের দোষে বা বুড়ার বরাতের জোরে সাজ্যাতিক বোমা ছেলেখেলার পটকায় পরিণত হইয়াছে। তিনি মনে মনে আনাড়ী বোমাওয়ালাকে ও বাহাত্তুরে বুড়াকে জাহান্নমে

প্রলোভন

ভাস্কর— শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক

পাঠাইয়া, কোনও প্রকারে ঢোক গিলিয়া কষ্টহাসি হাসিয়া জরুরী কাযের অছিলায় বুড়ার কাছ হইতে বিদায় লইয়া সরিয়া পড়িলেন।

দক্ষিণা ৷

দুই দুই বার বড় আশায় বঞ্চিত হইয়া রমণী বাবু একেবারে মুষড়িয়া গেলেন। ও দিকে নানা অজুহাতে, মামলা মুলতবী করার মত, বিবাহ স্থগিত করার জন্য কন্যাকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার আত্মীয়-স্বজনগণ খুবই বিরক্ত হইতেছিলেন। অনেক শুভানুধ্যায়ী কন্যার পিতাকে লুব্ধ আশ্বাসে বসিয়া না থাকিয়া কালবিলম্ব না করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহের চেষ্টা দেখিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এমন সুপাত্রের আশা একেবারে ত্যাগ করিতে মন সরে না বলিয়া কন্যার পিতা সে কথা বড় গায়ে মাখিলেন না।

এ দিকে রমণী বাবুর মনের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার বড় আশা ছিল, জ্যোতিষী গণনার একটা কিনারা করিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে মনোরমা পত্নী বিবাহ করিয়া জীবনের সার-সুখ অনুভব করিবেন, কিন্তু এত দিনে 'সে আশা হইল দূর।' দুই দুই বার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন। নৈরাশ্যে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সর্ব্বদাই একা একা থাকেন, বিমর্ষভাবে কাল কাটান, আমোদ-প্রমোদ দূরে থাকুক, আহার-নিদ্রায়ও কোনও সুখ পান না। কি করিবেন, কি করিলে হৃদয়ের শূন্যতা দূর হয়, একটু শান্তিলাভ হয়, তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কখনও ভাবেন, সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া বিবাগী হইয়া এক দিকে বাহির হইয়া যান, দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান; কখনও ভাবেন, আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়ান। কোন মীমাংসায়ই আসিতে পারিলেন না।

মনের এইরূপ অবস্থায় তিনি এক দিন সন্ধ্যাকাল হইতে খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত অন্যমনস্কভাবে হাওড়ার পুলের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল, জ্যোতিষী অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; তিনিও কেমন যেন অন্যমনস্ক। বোধ হয়, তিনি আফিসের কায শেষ করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে গঙ্গার শীতল বায়ুসেবনে ক্লান্তি দূর করিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইয়াছেন। তখন দণ্ড চারেক রাত্রি হইয়াছে, পুলের উপর সে সময়ে তত লোক-জন ছিল না। জ্যোতিষীকে একই ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রমণী বাবুর মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিল,—এই লোকটার গণনায়ই আমার মনের সুখশান্তি চিরদিনের মত নষ্ট হইয়াছে, উহাকে অতর্কিত-ভাবে পুল হইতে গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিয়া ইহার প্রতিশোধ লওয়া যায় না কি? আর ইহাতে গণনাও ত সফল হইবে! সাবধানে কায করিতে পারিলে এ সময়ে কেহ টের পাইবে না—ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। আর যদি কেহ টেরও পায়, তাহাতেই বা এমন ক্ষতি কি? এমন করিয়া সুখলেশহীন জীবনভার বহন করা অপেক্ষা শক্রনিপাত করিয়া মৃত্যুদণ্ড লাভ করাও শ্রেয়ঃ।

এই ভীষণ সঙ্কল্প আঁটিয়া তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া জ্যোতিষীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। আচম্কা এরূপ করাতে জ্যোতিষী আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র করিতে পারিলেন না। মানুষটিও ছোটখাট ছিলেন, সুতরাং এ কার্য্যে রমণী বাবুকে কোনও বেগ পাইতে হয় নাই। আহা, বেচারা পরের অদৃষ্টগণনা করিয়াই দিন কাটাইয়াছে, নিজের অদৃষ্ট গণনা করিবার বোধ হয় কোন দিন সময় পায় নাই। যাহা হউক, এই সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করিয়াই রমণী বাবু লোকটি ডুবিল কি উঠিল, তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ মোটর-যানে গৃহে ফিরিলেন। অনেক দিন গৃহে ফিরিয়া তিনি এমন আনন্দ পান নাই। বহু দিন পরে রাত্রিতে একটু সুনিদ্রাও হইল।

পরদিন প্রাতে চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী দৈনিক কাগজ খুলিয়া তিনি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে ও (morgue) মর্গে রাখা হইয়াছে, এই সুসমাচার পাইলেন। মৃতদেহের যেটুকু বিবরণ কাগজে ছিল, তাহাতে তাঁহার বেশ ধারণা হইল যে, জ্যোতিষীর মুক্ত আত্মার দেহ-পিঞ্জরই বটে; তথাপি নিশ্চিতকে নিশ্চিততর করিবার জন্য তিনি নিজে অবিলম্বে মর্গে গিয়া দেখিয়া আসিলেন, জ্যোতিষীর মৃতদেহই বটে, দেহ এক রাত্রিতে বেশী বিকৃত হয় নাই, সহজেই চেনা গেল। যথাসময়ে (coroner's inqust) করোনারের বিচারালয়ে সাব্যস্ত হইল, এক জন অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির নদীতে পতনে আকস্মিক মৃত্যু। জুরীর রায়ে খুনের সন্দেহমাত্র ছিল না। তখন রমণী বাবু 'রাম বল, বাঁচা গেল' বলিয়া স্বস্তির

নিশ্বাস ফেলিলেন এবং মহোৎসাহে বিবাহোৎসবের ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গেলেন। বিবাহের রোশনাই ও মিছিল, ব্যাণ্ড ও ব্যাগপাইপের বাজনা, রোশনচৌকীর মধুর-আলাপ, ভূরিভোজন ও প্রীতি-উপহার, স্ত্রী-আচার ও বাসর-ঘর প্রভৃতির সরস-বিবরণ দিয়া পুঁথি বাড়াইব না।

ইহার পর যদি কখনও কথাপ্রসঙ্গে কেহ রমণী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিত, আপনি ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন কি না, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন, "বিলক্ষণ বিশ্বাস করি। আমার জীবনে জ্যোতিষী গণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে, তাহারই ফলে আমি নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য-সুখ ভোগ করিতেছি।" *

* একটি ইংরেজী গল্পের অনুসরণে লিখিত।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাসন-সংস্কার-কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনিয়া (মেম্বর ও মিনিষ্টার)—মোদের "কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য;

নির্ম্মলা।

১

"আজ না কি নতুন বউ আসবে ?"

"হাঁ বাছা, যোগিন ত তাই লিখেছে।"

"কটার গাড়ীতে ?"

"এই বিকেলবেলা চারটের সময়। মাখম আর খুদু ষ্টেশনে আন্‌তে যাবে।"

কথা হচ্ছিল রায়েদের বাড়ীর গৃহিণী আর পাশের বাড়ীর মেয়ে নির্ম্মলাতে। নতুন বউ আর নির্ম্মলায় খুব ভাব। বউ যখন বিয়ের কনে, সেই সময়ে বউভাতের রাত্রিতে দুই জনে আলাপ হয়। সে আজ পাঁচ বছরের কথা। নয় মাস হ'ল নতুন বউ তার স্বামীর সঙ্গে তার কর্ম্মস্থানে গিয়েছে। স্বামী এখন তিন মাসের ছুটী নিয়ে দেশে আস্‌ছে।

বাড়ীতে ছয় ছেলে। ছোটটির নাম মাখম, তার এখনও বিয়ে হয়নি। খুদে বাড়ীর দৌহিত্র।

নির্ম্মলা বাপ-মায়ের সাত আদরের একমাত্র মেয়ে। তার স্বামী পাটের দালালী করে। নির্ম্মলা কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে বড় একটা যায় না, যদি দু' মাস শ্বশুরবাড়ী ত ছয় মাস বাপের বাড়ী। নির্ম্মলা খুব চট্‌পটে, নাকে চোখে কথা কয়, কিন্তু মনটা সাদা, কারও সাতে পাঁচে থাকে না, মুখে হাসি লেগেই আছে।

"হাঁ মাসীমা"—(নির্ম্মলা গৃহিণীকে মাসীমা বল্‌ত)—"নতুন বউ এসেই কি বাপের বাড়ী যাবে ?"

"তা যাবে বই কি। কত দিন বাদে দেশে আস্‌ছে। তাঁরা নিতে পাঠালেই পাঠিয়ে দেব।"

"কিন্তু বেশী দিন যেন রেখ না। তা হ'লে তার জন্য আমার বড় মন কেমন কোর্‌বে।"

গৃহিণী হাস্‌তে লাগ্‌লেন। "এমন মেয়ে ত দেখিনি। তুমি বাপের বাড়ী এলে দু'দিন পরেই যদি আবার শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যায়, তা হ'লে তোমার মনে কেমন হয় ?"

নির্ম্মলার গোলগাল মুখখানি, ডাগা-ডাগা চোখ, হাস্‌লে গালে টোল খায়। হেসে বল্‌লে, "আমি কি যাব না বলেছি ?"

গৃহিণীর পাশে ডাবরে পান ছিল, নির্ম্মলা একটা তুলে নিয়ে মুখে দিল; কহিল, "মাসীমা, কাল আসব। আজ তোমার ছেলে বউ আস্‌বে, আজ আর আমি তোমাদের আদরে ভাগ বসাব না।"

গৃহিণী তাহার থুঁতি নেড়ে আদর ক'রে বল্‌লেন, "তুই এত কথাও জানিস্। মেয়ে যেন কথার ধুকুড়ি।"

নির্ম্মলা উঠে বাড়ী গেল।

বিকালে ছেলে বউ ঘরে এলে আহ্লাদের কলকলানিতে বাড়ী পুরে গেল। নতুন বউ শাশুড়ীকে, বড় জা কয়জনকে নমস্কার কোরে, রূপে ঘর আলো কোরে শাশুড়ীর পায়ের কাছে বস্‌ল। জায়েরা ঘিরে দাঁড়াল।

সকলের চক্ষু নতুন বউয়ের মুখের দিকে। মেজবউ বল্‌লে, "ও কথা বল্‌তে নেই, কিন্তু পচ্চিমে থেকে নতুন বউ গায়ে বেশ সেরেছে।"

অপর জায়েরা বলিল, "বাড়ীতে পা না দিতেই বুঝি অমনি কোরে খুঁড়্‌তে হয় ?"

গৃহিণী বল্‌লেন, "মেজবউমা, তুমি নিজেই বল্‌ছ অমন কথা বল্‌তে নেই, তবে কেন বল্‌ছ ? নতুন বউমা এতটা পথ তেতে-পুড়ে এসেছেন, তাঁকে মুখ-হাত ধুয়ে মুখমিষ্টি কোরতে বল, তার পর থিতিয়ে জিরিয়ে কথাবার্ত্তা হবে। বেলা গিয়েছে, আমি কাপড় কেচে আসি।"

গৃহিণী ত নতুন বউকে মুখ-হাত ধুতে বল্‌লেন, কিন্তু তাকে ছাড়ে কে ? বাড়ীর ছেলে-মেয়ে ঝি-চাকর সকলে মিলে তাকে ছ্যাঁকা-বাঁকা কোরে ধর্‌লে। গৃহিণী কাপড় ছেড়ে এসে যখন একটু রাগ কোর্‌লেন, তবে সে রেহাই পায়।

২

পরদিন নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি খেয়ে এসে হাজির। নতুন বউর হাত ধোরে হিড় হিড় কোরে টেনে তাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজার খিল দিল। মনের প্রাণের অনেক কথা আছে, সকলের সাক্ষাতে বলা হয় না।

দরজা বন্ধ কোরে নতুন বউয়ের মাথার কাপড় খুলে দিয়ে নির্ম্মলা ঘুরে-ফিরে তার মুখ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কখন ডান পাশ, কখন বাঁ পাশ, কখন সুমুখ দিয়ে, থুঁতি ধ'রে মুখ তুলে খুব গম্ভীরভাবে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। নতুন বউ মুচকে মুচকে হেসে বল্‌লে, "তোর জ্বালায় আর বাঁচিনে! ও আবার কি রঙ্গ! কখনো কি আমায় দেখিস্‌ নি?"

"এমন ত দেখিনি? এ রকম আজ নতুন দেখ্‌চি।"

"নতুন আবার কি! ছ' মাসে মানুষ আবার নতুন হয় না কি! তোর যত সব অনাছিষ্টি কথা!"

"এই তুই নতুন বউ, নতুন দেশে গিয়ে নতুন হয়ে এসেছিস্‌। তাই দেখ্‌চি। তা এখন তোর নতুন দেশের গল্প বল্‌।"

তার পর যে কত কথা হ'ল, বল্‌তে গেলে লিখ্‌তে গেলে ফুরোয় না।

শেষে নির্ম্মলা বল্‌লে, "তুই কি শীগ্‌গির বাপের বাড়ী যাবি?"

"কবে যাব, তা ত জানিনে। মা আজ সকালবেলা বল্‌ছিলেন, তাঁরা নিতে এলেই পাঠিয়ে দেবেন। মা বাবাকে ত অনেকদিন দেখিনি।"

এই কথা বল্‌তে নতুন বউর চোখ ছলছল করতে লাগ্‌ল।

নির্ম্মলা তাকে আঁকড়ে ধ'রে,তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌লে, "আমি যদি তোর বর হতুম, তা হ'লে তোকে এক দণ্ডও ছেড়ে থাকতে পারতুম না।"

নতুন বউয়ের মাথা নুয়ে পড়্‌ল। লজ্জায় মুখখানি রাঙা হয়ে উঠ্‌ল।

এদের এই রকম কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, আর এক ঘরে আর দুই জনের কথা হচ্চিল অন্য রকম। মেজ আর সেজবউ ব'সে ফুসফুস্‌ গুজ্‌গুজ্‌ করছিলেন। মেজবউ বল্‌ছিলেন, "বাপ-মায়ের আদুরে হ'লে কি ঐ রকম করে? কোথাও কিছু নেই, নতুন বউয়ের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজায় খিল। এ ত আর বরবউ নয়।"

সেজবউ মুখে কাপড় দিয়ে খিল্‌খিল্‌ কোরে হেসে বল্‌লেন, "সোয়ামী আর স্ত্রী কি দিন-দুপুরে ঘরে খিল দেয়?"

মেজবউ। ভাব কি আর কারুর হয় না? এমন কি লুকোনো কথা যে, ঘরে দরজা বন্ধ না কোরে বলা যায় না?

সেজবউ। সত্যিই ত! এ যে বড্ড বাড়াবাড়ি।

"ওই যে চাকাপানা মুখখানা ঠাকুরুণটি আছেন, উনি নতুন বউয়ের পরকাল ঝরঝরে কোরে দেবেন।"

"তবু যদি অতি বড় সোহাগী হতেন। চিরকাল ত বাপের বাড়ী প'ড়ে আছে, শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবার একবার নামও করে না।"

"তা আছ ত বাপের বাড়ীই প'ড়ে থাক্‌, এখানে এসে নতুন বউর মাথা খাওয়া কেন?"

সেজবউ হাই তুলে বল্‌লেন, "তাই বলে কে! মা ত কিছুতেই কাউকে কিছু বল্‌বেন না। হতুম যদি আমি বাড়ীর গিন্নী, তা হ'লে অমন ধ্যাং-ধেঙে হাউ-হাউয়ে বাচাল মেয়েকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিতুম না।"

"ঠিক যেন দেখনহাসি!"

"তবু যদি কোনখানটা একটু রূপ থাক্‌ত!"

মেজবউ সেজবউয়ের গা টিপ্‌লেন। হেসে হেসে কথা কইতে কইতে নির্ম্মলা আর নতুন বউ সেই ঘরের দিকে আস্‌ছিল। নতুন বউয়ের গলা তেমন শোনা যায় না, কিন্তু নির্ম্মলার হাসির ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছিল।

হাত ধরাধরি কোরে যখন তারা ঘরের মধ্যে এল, তখন মেজ আর সেজবউয়ের মুখে এক গাল হাসি। মেজ বল্‌লেন, "নতুন বউয়ের কপাল ভাল, তা নইলে নির্ম্মলার সঙ্গে এত ভাব!"

নির্ম্মলার হাসি বন্ধ হয় না। বল্‌লে, "কেন, তোমাদের সঙ্গে আড়ি না কি?"

মেজবউ বল্‌লেন, "কথার ছিরি দেখ! তা ভাই, তোমার সঙ্গে ত কথায় পারবার জো নেই। কার সাধ্যি তোমার সঙ্গে আড়ি করে! তবে নতুন বউয়ের সঙ্গে তোমার যেমন, এমনটি ত আর কারুর সঙ্গে নয়।"

"ঠিক্‌ কথা। নতুন বউ যে আমার বঁধু, তা বুঝি তোমরা জান না? বিদেশ থেকে এতদিন পরে বঁধু এসেচে, তাকে আঁচলে পুরে গেড়ো দিয়ে রাখ্‌ব।"

সেজবউ বল্‌লেন, "এত কথাও তোর আসে! আর জন্মে নিশ্চয় মধু দান কোরেছিলি, তা নইলে এখন মধুমুখী হলি কোথা থেকে?"

মেজবউ বল্‌লেন, "নির্ম্মলার মত অত গুণের মেয়ে আজকাল দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।"

নির্ম্মলা চোখ উল্টিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে মট্‌মট্ কোরে ছুটো আঙ্গুল মট্‌কে বল্লে, "অত কোরে মুখের সাম্‌নে বলো না, তা হ'লে গুমোরে আমার পা আর মাটীতে পড়্‌বে না।" এই ব'লে সে খাটের উপর পা তুলে দিল।

ফিকে আল্‌তা-পরা তুল্‌তুলে ধব্‌ধবে পাখানি বিছানায় যেন ফোটা পদ্ম ফুলের মত দেখ্‌তে হ'ল। সেজবউ মান-ভঞ্জনের ভাণ কোরে, মধুর হাসি হেসে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন, "পায় ধর্‌ব ?"

নির্ম্মলা বল্লে, "বালাই, তুমি কেন ধর্‌তে গেলে ? ধর্‌বার যে, সে গোকুলে বাড়্‌চে।"

হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়ে, নতুন বউয়ের হাত ধোরে নির্ম্মলা চ'লে গেল। যাবার সময় মেজবউর কানে কানে ব'লে গেল, "আড়ালেও কি আমার কথা এই রকম হয় ?" নির্ম্মলার কানে কানে কথা আর ছেলেদের সদর রাস্তায় চানাচুরওয়া-লাকে ডাকা সমান।

নির্ম্মলা আর নতুন বউ ঘরের বাইরে গেলে ছুই জায়ে চোখ চাওয়াচাই হ'ল। চাউনির ভাব যেন ঠাকুরঘরে কে, না আমি ত কলা খাইনি।

৩

দিন ছুই পরে নতুন বউর ছোট ভাই এসে তাকে বাপের বাড়ী নিয়ে গেল। নির্ম্মলারও যাওয়া আসা কমে গেল।

মেজবউ বল্লেন, "দেখ্‌লি, ভাই ?"

সেজবউ পাল্টালেন, "দেখ্‌ব আবার কি ; দেখ্‌চে ত সবাই, তবে আর সকলে দেখেও দেখে না।"

"মুখপুড়ীর কথা শোন ! নতুন বউ হ'ল ওনার বঁধু ! বঁধু নেই, তা কোন্ সুখে আর এখানে আস্‌বেন ? আর এ বাড়ী মাড়ায় না।"

"না মাড়ালেই ভাল। আমরা ত মাথা খুঁড়ে মর্‌ব না।"

"কি দজ্জাল হাড়ে ছুষ্টু মেয়ে ! সেদিন যাবার সময় কি ব'লে গেল !"

"হ্যাঁ, আড়ালে আমরা ওঁর সুখ্যাতি করি ! যত রূপ, তত গুণ, তা সুখ্যাতি কোর্‌ব না ? ওঁকে কি আমরা ভয় করি, না কি যে সাম্‌নে বল্‌তে পারিনে ?"

"তবে কি জানিস্, আমরা কেন কারুর গায় প'ড়ে কিছু বল্‌তে গেলুম, কেমন ভাই ?"

"সে ত ঠিক কথা, আর শাশুড়ী ত তেমন মানুষ নন ; নির্ম্মলা হ'ল আপনার, আর আমরা হলাম পর !"

নতুন বউ বাপের বাড়ী গেলে,যোগিন দিনকয়েক কোথায় বেড়াতে গেল। ফিরে এলে পর ভাজেরা তাকে খুব যত্ন কোর্‌তেন। তার খাওয়া-দাওয়া, বিছানা-পত্র, কাপড় চোপড় সব দেখ্‌তেন। সঙ্গে যে চাকর এসেছিল, সে শুধু বাহির-বাড়ীর কায কোর্‌ত। যোগিনের খাবারের কাছে বউয়েরা বসে ব'লে গিন্নী আর বড় একটা আস্‌তেন না, অন্য কাযে থাক্‌তেন। আবার মেজবউ আর সেজবউর চাড় দেখে বড়-বউও নিজের ছেলে-পুলে নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তেন। মেজ আর সেজবউ ছুই জা' নতুন ঠাকুরপো বল্‌তে অজ্ঞান। তাকে ছু'বেলা ব'সে খাওয়ান, জলখাবারের সময় ফল ছাড়িয়ে দেওয়া—সব ভার তাঁদের। আর সকলে বল্‌ত, যোগিন এখন রোজগারে হয়েচে ব'লে তার এত আদর। যোগিন নিজে ভাব্‌ত, ভাজেদের যেমন করা উচিত, তাঁরা সেই রকম কোর্‌চেন। সেও যখন তখন তাঁদের জন্য এটা ওটা সেটা, নানা রকম সখের জিনিস নিয়ে আস্‌ত।

একদিন যোগিন আহার কোর্‌তে বসেচে, মেজবউ পাখা নিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। সেখানে আর কেউ নেই। কি সব কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, এমন সময় মেজবউ মাঝখান থেকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, "আচ্ছা, নতুন ঠাকুরপো, নির্ম্মলাকে তোমার কেমন মনে হয় ?"

মুখ তুলে যোগিন মেজবউর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে ; বল্লে, "ও কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌চ কেন ? নির্ম্মলা ত বেশ মেয়ে।"

মেজবউ বল্লেন, "আমিও সেই কথা বল্‌চি। তবে যেন একটু বেশী কথা কয়, না ঠাকুরপো ?"

"তা হবে।"

"একটু যেন বেহায়া ?"

"কই, আমি ত কখনো কোনও রকম বেহায়াপনা দেখিনি।"

"পুরুষমানুষে অত শত দেখে না। আর দেখ, ঠাকুরপো, এই যে নির্ম্মলা সোমবছর বাপের বাড়ী থাকে, শ্বশুরবাড়ী যাবার নাম নেই, এটা কি ভাল কথা ?"

যোগিন একটু শুক্‌নোভাবে বল্লে, "সে কথায় আমাদের কায কি ? তার বাপের বাড়ী আর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা বুঝ্‌বে।"

মেজবউ একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লেন, "সে ত সত্যি কথা। তবে লোকে বলে, তাই আমি বলছিলুম।"

"লোক কি না বলে! তা নিয়ে, তাদের কথা নিয়ে থাক্‌ব কেন?"

মেজবউ চুপ কোরে রইলেন।

তার পরদিন সেজবউর পালা। তিনি পানিফল ছাড়াচ্ছিলেন, যোগিন সেইখানে বসে ছিল।

সেজবউ বল্‌লেন, "কালকে মেজদির সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?"

"কিসের কথা?"

"এই পাশের বাড়ীর নির্ম্মলার কথা?"

"ফের ওই কথা! তোমাদের খেয়ে-দেয়ে কি অন্ত কায নেই যে, কে কার নামে কি বলে, তাই নিয়ে ঘোঁট কর?"

"যত দোষ আমাদের। আমরা কি না নতুন বউকে ভালবাসি, আর তার জন্ত ভাবি, এই আমাদের দোষ।"

যোগিন আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "এর মধ্যে নতুন-বউ এল কেন?"

"তার সঙ্গে যদি কারুর ভাব হয়, তা হ'লে সে কেমন মানুষ জান্‌তে নেই কি?"

"কেন, নির্ম্মলাকে কি তোমরা জান না, তোমাদের সঙ্গে ভাব নেই? আমার যখন বিয়ে হয়নি, তখন থেকে ত আসে যায়, তার জন্ত তোমাদের অত মাথাব্যথা কেন?"

গতিক দেখে সেজবউ ঠাক্‌রুণও চুপ কোরে গেলেন। ইচ্ছে, ঠারে-ঠোরে, কথার খোঁচায় যোগিনের কান ভারি হয়, তা সে এমন ছেলে নয়, কান পাতলা নয়।

৪

মাসখানেক পরে নতুন বউ ফিরে এল। আবার নির্ম্মলার হাসিতে আর তার কথার ঘটায় রায়েদের বাড়ীখানা ভরে গেল। আবার মেজ সেজ দুই জায়ে ফুস্‌ফুস্ গুজ্‌গুজ্ আরম্ভ হ'ল।

নতুন-বউ আর নির্ম্মলায় এক দিন ব'সে কথা কইচে, এমন্ সময় যোগিন উপস্থিত। নির্ম্মলাকে দেখে বল্‌লে, "এই যে নির্ম্মলা!"

আর কারুর যদি চোখের পলক পড়্‌বার দেরী হয় ত নির্ম্মলার চোট-পাট জবাবে বিলম্ব হয় না। সে বল্‌লে, "এই যে নতুন দাদাবাবু! কি মনে কোরে?"

"নিজের ঘরে আস্‌ব, তাও আবার কি মনে কোরে?"

"আজ্ঞে, যতক্ষণ স্ত্রী শ্রীমতী নির্ম্মলা, ওরফে নূর বেগম, ওরফে মিঞা নূরউদ্দীন এখানে এবং যতক্ষণ তাঁহার দোস্ত নওনিহালী বেগম ওরফে নতুন বউ তাঁহার সহিত গোপনীয় পরামর্শে ব্যস্ত, ততক্ষণ এ ঘর তাঁহাদের; আপনার কিংবা আর কাহারও বিনা ইত্তলায় প্রবেশ করিবার হুকুম নাই।"

যোগিন মাটী পর্য্যন্ত হাত নীচু ক'রে একটা লম্বা সেলাম কর্‌লে, বল্‌লে, "জো হুকুম, বেগম নূরমহল সাহেবা! তবে আপনাদের গোপনীয় রাজকর্ম্মের পরামর্শ হয়?"

"জনাবের বিবেচনায় আমরা অতি তুচ্ছ হাসি-ঠাট্টার কথা কই, কেমন? আর পাড়া-পড়সীর চর্চ্চা করি?"

যোগিন দুই কানে হাত দিয়ে বল্‌লে, "তোবা, তোবা, এও কি কোন কথা! হুজুররা পাড়া-পড়সীর নাম-গন্ধও করেন না, আর কেহও করে না।"

নির্ম্মলা বলিল, "আলবৎ, কে কি করে, খোঁজ রাখিনে, আমাদের নজর উঁচু। মই লাগিয়ে আকাশের তারা পাড়ি, আর আসমান-জমীনের কথা কই।"

"কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ! মইগাছা যেন মাঝে মাঝে আমরা পাই! দু'ট একটা খবর আছে, ভয়ে বল্‌ব, না নির্ভয়ে?"

"নির্ভয়ে অভ কোর্স। তবে একটা কিন্তু আছে। খবর তাজা না বাসী?"

"হিন্দী ছেড়ে আবার ইংরিজি! তবে নির্ভয়ে বলি কেমনে? খবর টাট্‌কা কি পুরাণো, তুমি বিচার কর। আমার কাছে ত তাজা, বাসী হ'লে আমি ঝাঁটানো জঞ্জাল থেকে কুড়িয়ে আন্‌ব কেন?"

নির্ম্মলা তখন খুব গম্ভীর হয়ে, নতুন বউয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বস্‌ল; বল্‌লে, "শোনাও তোমার খবর।"

"পাশের বাড়ীতে নির্ম্মলা ব'লে একটি মেয়ে আছে, সে একটু বেশী কথা কয়, আপনার জানা আছে? এই হ'ল একের নম্বর খবর।"

"বিলকুল পুরাণো খবর। আমি যতদিন থেকে সে মেয়েটাকে জানি, বরাবর বেশী কথা কয়; বেজায় বেশী; তার কথায় কান ঝালাফালা হয়ে যায়।"

যোগিন আঙুলে গুণ্‌ছিল, "বাম গেল, এইবার দুই। নির্ম্মলা একটু যেন বেহায়া।"

"ভারি ফিকে খবর, লক্ষ্মী গয়লানীর খাঁটী দুধের মত। একটু বেহায়া? এত বড় বেহায়া মেয়ে সহরে খুঁজে পাওয়া যায় না? আপনি ভয়ে বল্‌চেন, না নির্ভয়ে বল্‌চেন?"

"অভয় যখন পেয়েচি, তখন নির্ভয়েই বল্‌চি। যেমন শুনেচি, ঠিক তেমনি বল্‌চি।"

"আর কিছু আছে?"

"আছে বই কি! তিন না হ'লে পূরো হবে কেন? ওয়ান, টু, থ্রী। এই যে নির্ম্মলা সোমবছর বাপের বাড়ী থাকে, শ্বশুরবাড়ী যাবার নাম নেই, এটা কি ভাল কথা?"

নির্ম্মলার গাম্ভীর্য্য কর্পূরের মত উবে গেল, হাঁততালি দিয়ে খিল্‌খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌ল। "খবর বড় জবর, পুরাণো হ'লই বা! তবে ওতে নির্ম্মলা সুন্দরী, তার বাপের বাড়ী আর শ্বশুরবাড়ী সব জড়ানো, কেউ বাদ যায়নি। এ খবর পুরস্কারের যোগ্য, আপনার কি বখশীস্ চাই?"

"বেগম সাহেবার যা মর্জ্জি।"

নির্ম্মলা নতুন বউয়ের পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্‌লে, "আমার এই যে দিলের দোস্ত, তাকে আপনি বখশীস্ পেলেন।"

নতুন বউ একটি কথাও কয়নি, ফিক্ ফিক্ কোরে হাস্‌ছিল, আর মজা দেখ্‌ছিল। বাক্য-বাণের বৃষ্টিতে ঘর অন্ধকার হয়ে উঠেছিল, নতুন বউ হাসিমুখে রঙ্গ দেখ্‌ছিল। এতক্ষণ পরে হেসে স্বামীকে বল্‌লে, "তুমি ত খুব বক্তা। পার নির্ম্মলার সঙ্গে কথায়?"

"সাধ্যি কি! না লাগ্‌তেই আমার হার।"

৬

যোগিনের ছুটী প্রায় ফুরিয়ে এল। বাড়ীতে বলাবলি হচ্ছিল, এবার নতুন বউ তার সঙ্গে যাবে না, বাড়ীতে থাক্‌বে। মেজ আর সেজবউ বল্‌লেন, "নতুন বউ, এবার তুমি নাই বা গেলে? এই ত সেদিন এসেচ, আর দিনকতক থাক না?"

কিসের জন্ত দুই জায়ের যে নতুন বউর উপর এত টান, তা ভগবান্‌ই জানেন; তবে ঠাকরুণ দুটি তেমন সুবিধা রকম নন, মনে মনে একটা কিছু জিলিপীর পীক ছিল। নতুন বউ থাক্‌লে পাকে-চক্রে নির্ম্মলাকে নিয়ে একটা কিছু বাধে, এই রকম একটা উড়ো মতলব থাক্‌তে পারে। নতুন বউ চ'লে গেলে ত নির্ম্মলা আর ধরা-ছোঁয়াই দেবে না।

নতুন বউ তার সেই নিজের শান্তভাবে বল্‌লে, "মেজদি ভাই, যাওয়া না যাওয়ার কথা আমি কি জানি? মা যা বল্‌বেন, তাই হবে। তবে সেখানে নতুন সংসার, আমি না গেলে ওঁর অসুবিধে হবে।"

"অসুবিধে আবার কিসের? নতুন ঠাকুরপোর ত সেখানে লোক-জন আছে।"

নতুন বউ আর কোন কথা কইলে না। একে ত সে মুখবোজা, তাতে এমন কথায় সে কিছু বল্‌তেই পারে না।

কথাটা যদি উঠ্‌ল ত এ-কান ও-কান হয়ে গৃহিণীর কানে গেল। পান সাজার যায়গায় বউয়া সব ঘিরে ব'সে, এমন সময় গিন্নী এসে বল্‌লেন, "কে বলেচে নতুন বউমা যোগিনের সঙ্গে যাবেন না?"

বড়বউ বল্‌লেন, "কে আবার বল্‌বে? মেজবউ সেজবউ, তোমরা কিছু শুনেচ?"

"কই, আমরা ত কিছু শুনিনি।"

নবউ বাপের বাড়ী।

গিন্নী বল্‌লেন, "নতুন বউমা, তুমি কিছু শুনেচ?"

নতুন বউ গিন্নীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "শুনে থাক্‌ব মা, কিন্তু কেউ যদি আমাকে ভালবেসে এখানে দু'দিন থাক্‌তে বলেন, তাতে ত কিছু মনে কর্‌বার কথা নেই, বরং আহ্লাদের কথা।"

সেজবউ আঁচলের ভিতর থেকে একটা আঙুল দিয়ে মেজবউর গা টিপ্‌লেন।

নতুন বউর কথা শুনে গিন্নী জল হয়ে গেলেন। বল্‌লেন, "সে ত ভিন্ন কথা, বেশ কথা, তবে আমি তোমাকে যোগিনের সঙ্গে যেতে দেব না, এমন কথা ওঠে কেন? তোমার সেখানে ঘর-সংসার, এই সবে নতুন পেতেছ, তুমি না গেলে দেখবে কে?"

নতুন বউর মাথাখানি অমনি হেঁট হয়ে গেল।

বেরিয়ে এসে মেজবউ বললেন, "দেখলি সেজ, নতুন বউ কেমন সেয়ানা সুবুদ্ধি, কারুর গায় আঁচ লাগতে দিলে না?"

"তবে ওই পাড়াচলানে নির্জ্জলাটার সঙ্গে ওর এত ভাব কিসের?"

"ভগা জানে!"

৬

দিন দুই পরে নতুন বউর জর হ'ল। ক্রমাগত হাঁচি, বুকে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। ডাক্তার এসে বল্‌লেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা।

হু হু কোরে রোগ বেড়ে গেল। নিউমোনিয়া, প্রথমে বাঁ দিকে, তার পর ডান দিকে, দুই দিককার ফুস্ ফুস্ ভরে গেল। ভয়ানক জ্বর, সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বিকার।

বাড়ী শুদ্ধ লোক ভয়ে আড়ষ্ট। গিন্নী সকল ঠাকুর-দেবতা মানাতে লাগলেন, কত যায়গায় পূজা মান্‌লেন, আর যখন তখন এসে রোগীর পাশে বস্‌তেন। যোগিন যেন কি রকম হয়ে গেল, কেবল এ ঘর ও ঘর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কখন মা'র মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কখন নতুন বউর খাটের কাছে এসে দাঁড়ায় আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সহরেরর বড় বড় ডাক্তার, কবিরাজ রোগীকে দু' বেলা দেখতে আস্‌তেন। ডাক্তারেরা বল্‌লেন, রোগ বড় ছোঁয়াচে, রোগীর ঘরে কিংবা তার কাছে সকলের আসা উচিত নয়। গিন্নী সে কথায় কান দিতেন না, কিন্তু বউরা, বিশেষ মেজ বউ আর সেজ বউ, ভয়ে সে দিকে এগোত না। বড় বউ কখন কখন দরজা-গোড়ায় উঁকি মেরে দেখে যেতেন। প্রাণের ভয় কার নেই, বল?

ভয় ডর জান্‌ত না নির্ম্মলা। যেই শুন্‌লে নতুন বউর বড় অসুখ, অমনি ছুটে এসে তার কাছে বস্‌ল। তার পর কার সাধ্য তা'কে সেখান থেকে নড়ায়! যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ নতুন বউ সবতাতে কেবল তাকে ডাক্‌ত। নির্ম্মলা জল দেয়, ওষুধ দেয়, দুধ খাওয়ায়, নতুন বউর গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, পাখার বাতাস করে। যারা দেখত, তারা বল্‌ত, মায়েও এমন সেবা করতে পারে না।

এক দিন নির্ম্মলা বাড়ীতে দু গরম ভাত খেতে গিয়েচে, খাবার সময় নির্ম্মলার মা বল্‌লেন, "নিরি, ও বাড়ীর নতুন বউর বড় শক্ত ব্যারাম, ডাক্তার বলেচে, ভারি ছোঁয়াচে। তোর জন্য আমার ভয় করে।"

নির্ম্মলার চোখ দুটি জলে ভরে এল, বল্‌লে, "কিছু ভয় নেই মা, আমার কিছু হবে না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন নতুন বউ শীগ্‌গির সেরে ওঠে।"

অবধি মেয়েকে আর কিছু বল্‌তেন না। নিজেও গিয়ে অনেক সময় নতুন বউর কাছে, না হয় সেই ঘরে বস্‌তেন।

"এক দিন যোগিনের মা নির্ম্মলাকে বল্‌লেন, "রোগ ছোঁয়াচে, আমরা ত রয়েছি, বউরা বড় একটা কেউ এ ঘরে আসে না, তুমি একবারটিও নতুন বউমার কাছে থেকে নড় না। আমার ভয় করে।"

নির্ম্মলা বল্‌লে, "মাও আমাকে ঐ কথা বলেছিলেন, কিন্তু তিনি ত আমাকে বারণ কর্‌তে পারেন নি। মাসীমা, তুমি কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে? মেরে তাড়ালেও আমি যাব না।"

এমন কথার উপর গিন্নী আর কি বল্‌বেন?

নতুন বউর বিকারে প্রলাপ বেশী নেই। বিব্‌ভুল বকা নেই। কখন মা বলে, কখন নিরি, কখন স্বামীর উল্লেখ, কদাচ যে দেশে যাবে, সেখানকার দু' একটি কথা। রোগের যাতনায় মাঝে মাঝে বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। নিঃশ্বাসে বড় কষ্ট, যে দেখে, তারও কষ্ট হয়।

নির্ম্মলার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, ঘুম নেই, চক্ষুতে জল নেই। তার চোখ নতুন বউর মুখের দিকে আর তার হাত সেবায় নিযুক্ত। সবাই দেখে অবাক্। কে কাকে এমন ক'রে প্রাণ দিয়ে সেবা করে?

এক রাত আর কাটে না। ডাক্তার এসে দেখে মুখ গম্ভীর কর্‌লেন, কবিরাজ অনেকক্ষণ নাড়ী দেখে বল্‌লেন, "আজ রাত যদি কাটে, তবেই জীবনের আশা করা যায়। অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন।"

দু চার জন ছাড়া সকলে ঘরের বাহিরে গিয়ে রোদন কর্‌তে লাগ্‌ল। উঠ্‌ল না কেবল নির্ম্মলা; যেমন বসে-ছিল, তেমনি ব'সে রইল, চোখ শুক্‌নো, রোগীর মুখের দিকে চেয়ে। বিকারের অবস্থায় নতুন বউ নির্ম্মলার হাত চেপে ধরেছিল। নির্ম্মলার হাত তার হাতের ভিতর ছিল।

ভারি রাত্রে সব স্তব্ধ, কেউ খাট ধ'রে দাঁড়িয়ে, কেউ দরজার কাছে ছল ছল চোখে ব'সে। সকলে প্রতীক্ষা কর্‌চে, মৃত্যুর ছায়া সে ঘরে প্রবেশ করে কি না করে!

রাত্রিশেষে নির্ম্মলা উর্দ্ধমুখ হয়ে, নীরবে প্রাণের সমস্ত বেদনা দিয়ে ভগবান্‌কে ডাকৃতে লাগ্‌ল। সেই আকুল, নীরব মর্ম্মবাণী তাঁর চরণে পৌঁছিল।

নিঃশ্বাসের সে যাতনা, টান বন্ধ হয়ে গেল। কি হ'ল মনে কোরে নির্ম্মলা আতঙ্কে নতুন বউর মুখের দিকে, বুকের দিকে চেয়ে দেখলে। খুব ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়চে, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, মাথা বালিসে এক পাশে ফিরে আছে।

একবার গিন্নী এসে নির্ম্মলার কানে কানে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "কেমন আছে?"

"ঘুমুচ্চে। এই প্রথম ঘুম। লক্ষণ ভাল।"

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, আমাদের মুখ রক্ষে হোক্," ব'লে গিন্নী আবার পা টিপে টিপে ঘরের বাহিরে গেলেন।

বেলা আটটার সময় কবিরাজ এলেন। তখন নতুন বউ ঘুমুচ্ছে। কবিরাজ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখ দেখ্‌লেন, নিঃশ্বাস লক্ষ্য কর্‌লেন; তার পর সাবধানে, যাতে রোগীর ঘুম না ভাঙ্গে, আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ নাড়ী দেখ্‌লেন। দেখে তাঁর মুখ প্রসন্ন হ'ল, বাইরে এসে বল্‌লেন, "আর ভয় নেই, এ যাত্রা রক্ষে পাবেন।"

আর খানিক পরে ডাক্তার এলেন। তাঁরও সেই মত। তখনও রোগী নিদ্রামগ্ন।

সারা দিনমান এই রকমে গেল। মঝে মাঝে নতুন বউ চোখ চায়, আবার তখনি ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে ডাকৃতে কিংবা তার ঘুম ভাঙ্গাতে চিকিৎসকের নিষেধ। রাত্রিতে একবারও ভাঙ্গল না।

আর সকলে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু নির্ম্মলার চোখে ঘুম নেই, তবে দিব্য শান্তির আবেশ।

তার পরদিন রোদ উঠ্‌লে নতুন বউর ঘুম ভাঙ্গল। চোখের চাউনি পরিষ্কার, বিকারের কোন চিহ্ন নেই। চারিদিকে চেয়ে স্বামীকে দেখে মাথায় কাপড় দিতে গেল, হাতে বল নেই। শাশুড়ী বল্‌লেন, "থাক্ মা, এখানে তোমার লজ্জা কর্‌বার কেউ নেই।"

নতুন বউ শাশুড়ীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, তাঁর চোখের জল আর চোখে ধরে না। সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "মা, তোমার চোখে জল কেন?"

"এই মা আহ্লাদে, তোমার অসুখ সেরে গিয়েছে, তাই," বল্‌তে বল্‌তে গিন্নীর চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ কোরে জল পড়্‌তে লাগল।

আবার নতুন বউ বল্‌লে, "নির্ম্মলা!"

"এই যে আমি!" নির্ম্মলা পাশে ব'সে কি না, তাই তাকে নতুন বউ দেখ্‌তে পায়নি।

গিন্নী বাইরে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলাও বেরিয়ে এল। গিন্নী তার হাত ধ'রে বল্‌লেন, "আমি আর তোমাকে কি বলব? কত পুণ্যিতে তোমার মা তোমাকে পেটে ধরেছিলেন!"

নির্ম্মলা কিছু না ব'লে, গিন্নীকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল। কি কান্না! কিছুতেই যেন ফুরোয় না। পাতরে আটকে যেমন পাহাড়ের জল বাধে, তার পর হঠাৎ পাতর ভেঙ্গে অজস্র ধারায় বহে যায়, তেমনি নির্ম্মলার বুকে বাঁধা পাতর এতদিন পরে খসে গেল, এ কয়দিনের সঞ্চিত অশ্রু উথলে পড়্‌ল!

অনেকক্ষণ পরে গিন্নী বল্‌লেন, "চুপ্ কর, আর কেন কাঁদ্‌চ?"

বিকেলবেলা পূর্ব্বদিকে জলঝরা মেঘে সূর্য্যের আলো লেগে যেমন রামধনু ওঠে, তেমনি কান্না থেমে নির্ম্মলার মুখে হাসি ফুট্‌ল। সে বল্‌লে, "মাসীমা, এও আমার মত আহ্লাদের কান্না। এক দিন কোথা থেকে দিনরাত গিয়েছে, কিছুই জানিনে।"

দিন দুই চার পরে নতুন বউ খাটে শুয়ে আছে, পাশে ব'সে নির্ম্মলা। মেজ আর সেজ দুই বউ এসে দরজায় দাঁড়ালেন।

নির্ম্মলা বল্‌লে, "ভিতরে এস, এখন ত এখানে আস্‌তে বারণ নেই।"

নতুন বউ খুব কাহিল, ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌লে, "এস, ব'স।"

দু'জনে এসে বস্‌লেন। দুই চারটে কথার পর নির্ম্মলা নতুন বউর গায়ে হাত দিয়ে বল্‌লে, "বঁধুকে আর একটু হলেই হারিয়েছিলুম।" তার মুখে সেই পুরাণো হাসি।

একটু পরে দুই'জা উঠে গেলেন। এবার আর তাঁদের মুখ চাওয়াচাই হ'ল না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(পঞ্চাঙ্ক প্রহসন)

মুখ

যিনি আহার করিতে বসিয়াছিলেন, তিনি এক জন নেটিভ 'ডাক্তার। এখানে নেটিভ মানে কালা আদমি নহে, ক্যাম্বেলের পাশ করা ভি, এল্, এম্, এস্, বুঝিতে হইবে। ইঁহার ডাক ছিল প্রচুর—কিন্তু সে ডাক আসিত নাসিকার ভিতর দিয়া; আর পেসেন্ট ছিলেন ইনি নিজে—অর্থাৎ খুব ধৈর্য্যশালী। তথাপি বিধু ডাক্তারের নাম করিলে অনেকেই চিনিত—ইঁহার অসংখ্য পেটেন্ট ঔষধের জন্য। অভাগা বাঙ্গালাদেশে রোগবিশেষে যখনই মহামারী উপস্থিত হইত, বিধু তাহার পেটেন্ট ঔষধ, আবিষ্কার নয়—উদ্ভাবন করিতেন। আমার পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে যদি কাহারও শত্রুপীড়া থাকে, এই জিনিয়াসের উদ্ভাবিত ঔষধ এক ডোজ্ ব্যবহার করিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন—অলমিতি বিস্তরেণ।

তথাপি সত্যের খাতিরে বলিতে হয়, সুগন্ধে স্পৃহা জাগাইয়া ঐ যে অন্ন-ব্যঞ্জনের রাশি বিধুর সম্মুখে বিরাজমান, ও সমস্তই এই পেটেন্ট জিনিয়াসের উদ্ভাবনার ফল। কিন্তু হায়, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। বিধুর অর্দ্ধাঙ্গিনী, প্রচলিত নাম টেঁপীর মা, কর্ত্তার পাতে খানিকটা তপ্ত ঘি ঢালিয়া দিয়া, বাটিটা সরাইয়া রাখিয়া নিকটে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, একটু হাঁপাইয়া হাঁকিলেন, "ওলো ও টেঁপি, দুধের বাটি এনে দে।"

টেঁপী নীচে হইতে হাঁকিল, "গরম ক'রে নে যাব, মা?"

"শুন্‌লে মেয়ের আক্কেল?"

মা আগেকার চেয়ে গলা আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া হাঁকিলেন, "নয় ত কি, লোকের পাতে ঠাণ্ডা দুধ দিতে আছে না? ঠাণ্ডা দুধ খাওয়াস্ তোর শাউড়ীকে। বলি মেয়েকে ত মাতৃকুলেশান না কি ছাই-ভস্ম পড়াচ্ছ। মাতৃকুল পিতৃকুল দুই কুলই উদ্ধার কর্‌বে আর কি! গেরস্তর মেয়ে, রান্না-বান্না মাথায় থাক, দুধ জ্বাল দিতে জানে না! কাল দুধটা চড়িয়ে বল্‌লুম, টেঁপি, একটু দেখিস্ ত মা, আমি আস্‌ছি। ও মা, যাই দুধ উথ্‌লে উঠেছে, মেয়ে অম্‌নি তিড়িং মিড়িং ক'রে নাপিয়ে উঠে চীচ্‌কার, মা মা, শীগ্‌গির এস, দুধ ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কড়া ছেড়ে পালাচ্ছে। কি ঘেন্না মা!"

কর্ত্তা নির্ব্বিবাদে আহার করিয়া যাইতে লাগিলেন। গৃহিণী পুনরায় সুরু করিলেন, "বলি, মেয়েকে ত বিউনিদোলানি বিবি ক'রে তুলছ! তা কি মেমেদের মত স্বয়ংবরা হবে, না, সেকেলে সাবিত্রীর মত বর খুঁজ্‌তে বেরুবে? তোমার মতলবটা কি?"

কর্ত্তা মাছের মুড়াটা পাতে তুলিয়া লইয়া গৃহিণীকে নিঃশব্দে বুঝাইয়া দিলেন, মতলব—আপাততঃ এইটে সাব্‌ড়ান, কিন্তু টেঁপির মা নির্ব্বিঘ্নে তাহা সমাধা হইতে দিল না। বলিল, "রাত্তিরে ত মদের নেশায় মোষের মত ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমুবে! নাকের ডাকে পাড়ার নোক ঘুমুতে পারে না। পরশু পাশের বাড়ীর নতুন ভাড়াটেদের গিন্নী জান্‌লা খুলে গাল দিতে লাগ্‌ল, শোর খা মিন্‌ষে শোর খা! সেদিন অমনি পাকড়াসী মাসী রাত তিনটের ডেকে তুলে বল্‌লে, বউমা, নাক ডাকান ত অনেক শুনেছি বাছা, এমন সোরগোল তুলে রকম রকম রাগ-রাগিণীর আলাপ কারু সাধ্যি নেই, কালোয়াত হার মেনে যায়। আমার ভাসুর-পো এসেছে—আজ তিন দিন হ'ল। তিনটি রাত ঠায় ব'সে, দুটি চোখের পাতা এক কর্‌তে পারে নি।"

মাছের মুড়াটা তখন অর্দ্ধেক আয়ত্ত হইয়াছে। বিধু

বলিলেন, "যায় ত যায়! কোন বেটা বেটীর নাক ত ভাড়া ক'রে এনে ডাকাইনি যে, দশ কথা শোনাবে।"

"শোনায় সাধ ক'রে, রাত দুপুরে পাড়ায় সাড়া প'ড়ে যায়! আশ-পাশের লোক সব জানলা খুলে ঠায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। ঘুম এ পাড়া দিয়ে চলে না।"

"কেন চল্‌বে না? আমি ত দিব্যি ঘুমুই, কিছুই টের পাই নি।"

টেঁপীর মা এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "নিজের নাক-ডাকা বুঝি নিজে শোনা যায়! তা এমন ক'রে নাক-ডাকিয়ে ঘুমুলে ত চল্‌বে না, মেয়ের একে ছেয়ালো গড়ন—"

ছেয়ালো-গড়ন দুধ আনিলে গৃহিণী কর্ত্তাকে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁগা, সিদ্ধেশ্বর এটর্ণী তোমাদের সঙ্গে পড়্‌ত না?"

টেঁপী বানান করিতে লাগিল, "এ—টি—টি—ও—আর—এন—ই—ওয়াই—এটর্ণী।"

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। সেই যে ছেলেবেলা টেঁপী সকল কথা বানান করিয়া পড়িত, সে অভ্যাস আজও ছাড়িতে পারে নাই! কেবল পড়া নয়, কথা কয় বানান করিয়া। তবে তাড়নার ভয়ে মায়ের সম্মুখে অতি কষ্টে প্রবৃত্তি দমন করিতে হয়। টেঁপী জিজ্ঞাসিল, "এটর্ণী মানে কি বাবা?"

"এটর্ণী মানে তোর শ্বশুর। দুধ চাপা দিয়ে এলি, না, ভুলে গেছিস্?"

টেঁপী জিব্ কাটিয়া ছুটিয়া গেল। বিধু দুধের বাটি নিঃশেষ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সিধু এটর্ণী আবার তোমার কি করলে?"

"তার ছেলেও টোর্ণী হয়েছে না?"

কর্ত্তা গৃহিণীতে চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত হইয়া গেল। বিধু গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিলেন—

"তোমার নাকের ডাকে চৌকি হাঁকে,
　　ঘুমে পড়ে জমাদার।

আমার জন্তে পাড়ায় চোর পড়তে পায় না। নেমো-খায়াম সব।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "চল চল, হাতে জল দিইগে।"

প্রতিমুখ

সিদ্ধেশ্বর এটর্ণীর অফিস উকীল-পাড়ায়। বিধু তথায় দর্শন দিতেই সিধু বলিল, "আরে কও কথা! সিভিল সার্জ্জন যে!"

বিধু উত্তরিল, "হেরে গেছি, ব্রাদার, হেরে গেছি।"

"কি রকম, কি রকম?"

"আর রকম কি! একেবারে জখম। গিন্নীর সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম যে, তুমি কিছুতেই চিন্‌তে পারবে না।"

"চিন্‌তে পার্‌ব না! বাপ্ রে! সে কি ভোলবার? আমার কম পেন্‌সিলটা তুমি গেঁড়া মেরেছ! এখনও পেন্‌সিল হারালে আমার বিধুকেই মনে পড়ে।"

"তুমিও ভায়া আমার কাছ থেকে কম ভোগা দাও নি! ভাজা মস্‌লা, পান, সুপারি—"

এতক্ষণে দুই বন্ধুতে করমর্দ্দন করিলেন। সিধু প্রশ্ন করিল, "এখনও তেমনি পান খাও ত?"

"ছেলেবেলার বদ অভ্যেস কি সোজায় ছাড়া যায় ব্রাদার?"

"বটে! বটে! তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়! পান আনাই দাঁড়াও! বেয়ারা! বেয়ারা!"

কিন্তু কাল্পনিক বেহারার কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। তৎপরিবর্ত্তে জনৈক তালিম-দেওয়া বাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বেয়ারাকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছি।"

"ও, তাই বল! আজ আদায় কত? কত জমা দিতে পাঠালে?"

অম্লানবদনে বাবু উত্তর দিল, "দু হাজার সাত শ বিরাশী।"

বাবু চলিয়া গেলে বিধু বলিলেন, "বাবাজীও শুন্‌ছি এটর্ণী হয়েছেন? এইবার বাপ-বেটায় প'ড়ে সহরটা লুটবে আর কি!"

"তুমিও কি কসুর করছ, ভায়া! যে বাড়ীতে যাই, দেখি, তোমার দু'একটা পেটেণ্ট আছেই। তার পর আছ কেমন?"

"ভাল আর থাক্‌তে দেয় কই, ব্রাদার! ঘরে আছেন গিন্নী—মেয়ে আট বছরে প'ড়ে এস্তোক তিনি গৌরীদানের তাড়া লাগিয়েছেন—সে আজ প্রায় বছর পাঁচেক হ'তে চল্‌ল।"

"তা হ'লে গৌরীদান আর হ'ল না ?"

"হবে, হবে, আমার ত একটি বই মেয়ে নয়! ভেবে রেখেছি, ষোল বছরেই বিয়ে দেব। একেবারে ডবল গৌরী-দান হবে। তদ্দিন ভাল ক'রে ইংরেজীটা শিখুক।"

সিধু হাসিয়া বলিল, "বা! বেড়ে সোজা হিসেব ক'রে রেখেছ ত!"

"আরে ব্রাদার, তুমি ত বল্লে সোজা! মেয়েমানুষ কি হিসেব বোঝে! এই ত গেল ঘরের খবর।"

"তার পর বাইরের?"

"ইংরেজটোলায় জনকতক ভাড়াটে আছে, কেউ একটি পয়সা ভাড়া বাড়াতে চায় না। উল্টে ফি মাসে মেরামত খরচা—আজ কলি ধরিয়ে দাও, কাল তাঁর গুষ্ঠীর পিণ্ডি।"

"বটে! বটে! আগে বল্তে হয়!"

"কেন? আগে বল্লে কোন্ রাজত্ব আমায় জয় ক'রে দিতে?"

"তোমার ভাড়ার রাজত্ব। হুঁ হুঁ ব্রাদার! ফন্দী আছে! ফন্দী আছে!"

এই সময় পাশের ঘরে টাকা-ঢালার ঝম্ ঝম্ শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস সিধুর বুক ঠেলিয়া নাকে উঠিবার উপক্রম করিল। হায়, শাস্ত্র ত মিথ্যা বলে না, রজ্জুতে সর্পভ্রম সত্য সত্যই হয়। সিধু উদ্‌গত নিশ্বাসটা চাপিতে চাপিতে বলিল, "ভাড়াটেদের জব্দ করবার ফন্দী আছে ব্রাদার।"

টাকার রুণ্‌ঝুণ্ ধ্বনি বিধুর প্রাণের ভিতর তখনও প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল। কাল্পনিক বাড়ী ও ভাড়াটেদের কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, টেঁপির বরাত, কিন্তু সোজায় হবে না, ফন্দী চাই। এমন সময় হঠাৎ ফন্দীর কথায় বিধুর বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কিসের ফন্দী?"

"ওহে ব্রাদার, সংসারে একেবারে নির্জ্জলা সাধু হ'লে চলে না। তোমার ভাড়াটেদের জব্দ করবার প্ল্যান্ আমি বাত্‌লে দেব। কিন্তু তোমাকে আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হবে। ভয় নেই! এক লাফে এভারেষ্টের চূড়ায় উঠতে বল্‌ব না। আমার ছেলের একটি পাত্রী খুঁজে দাও।"

বিধুর বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া নাচিতে লাগিল। বলিলেন, "পাত্রী? তোমার ছেলের?"

"হাঁ হে, পিণ্টুর!"

সিধুর একমাত্র বংশধরের নাম পিণ্টুগোপাল। বিধু সিধুকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "পাত্রীর অভাব কি! কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন, বল দেখি? অরক্ষণীয়া কন্যা ত নয়!"

"ব্যস্ত হয়েছি কেন?" বলিয়া সিধু এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে বিধুকে বলিল, "দেখ দেখি, দরজার বাহিরে কেউ আছে কি না।"

বিধু বহির্দ্দেশ দেখিয়া আসিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি, ব্যাপারখানা কি?"

সিধু চাপা স্বরে বলিল, "এস্‌রাজ শিখ্‌ছে!"

"কে? পিণ্টু? তাতে অপরাধটা কি?"

"অপরাধ? অপরাধ—Public Nuisance—পিনাল কোডের ২৬৮ ধারা।"

বিধুর নিজের বিরুদ্ধে পাড়ার লোক এমনি একটা অপরাধ খাড়া করিবার চেষ্টায় আছে ভাবিয়া, একটা উদার সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পিণ্টুর অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। মন বলিল, জামাই করতে হয় ত এমনি, কিন্তু তাঁহার মুখ বলিল, "কেন ব্রাদার, এস্‌রাজের আওয়াজ ত বেড়ে মিঠে?"

"জানি, মানি! কিন্তু ও যে কেমন ক'রে সেই সড়ঙ্গে ছোট্ট যন্ত্রটার ভেতর থেকে তেমন সব বিট্‌কেল আওয়াজ বের করে, ভেবে ত পাই নি।"

বিধু নিজের নাসিকার কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "তার আশ্চর্য্য কি?"

বিধুর সহানুভূতি পাইয়া সিধু কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "ভাই রে, একটাও ভাড়াটে টেঁকাতে পাচ্ছিনে!" কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। সিধুর আধখানা বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইত।

"কেন হে?"

"কেন? গভীর রাত্রে যখন এস্‌রাজের আওয়াজ ওঠে, তখন মনে হয় যেন, দশ লাখ নরকের আসামী আমার বাড়ী ঢুকে দুপুরে-মাতন সুরু করেছে! তখন আমারই ছেলে ব'লে জ্ঞান থাকে না, ইচ্ছে করে, যন্ত্রটা ওর মাথায় ভেঙ্গে ফেলি—কেবল গিন্নীর জন্যে পারিনি—তাঁর আদুরে গোপাল।" ভিতরকার কথা শ্বশুর বড়লোক এবং সিধু তাঁর মাসহারাভোগী।

"বেশ ত, খুনোখুনীর দরকার কি! বারণ কর না কেন?"

"আহা হা! তুমি বুদ্ধি দেবে, তবে আমি নেব! বারণ! ত্যাজ্যপুত্তুর কর্‌বার ভয় দেখিয়ে কোন ফল হয়নি! বারণ!"

"ও! তাই বে দিতে ব্যস্ত হয়েছ!"

"নয় ত কি সখ?"

বিধু মনে মনে খানিক তোলাপাড়া করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার দর কত?"

সিধু ভাবিল, গরজ বুঝিয়া বিধু দাঁও খুঁজিতেছে। জিজ্ঞাসিল, "কিসের দর?"

"কি হ'লে ছেলেকে বেচ্‌বে হে?"

"ওঃ! তাই বল্‌ছ!" টাকা থাকিলে সিধু বলিত; ঘরের কড়ি দিয়ে। কিন্তু লোহার সিন্দুকে কেবল খোলামকুচীর ঝম্‌ঝমানি। বলিল, "সিকিটি পয়সা চাই না।"

বিধু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রাজী।"

"তার মানে? রাজী কে? তুমি? ডবল গৌরীদান কর্‌বে না?"

"তোমার হিতার্থে স্বার্থত্যাগ করা কি বেশী?"

সিধু ছুটিয়া আসিয়া বিধুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "কিন্তু ভাই, এক সর্ত্ত— তোমার কন্যা পিণ্টুর এস্‌রাজ রোগ সারাতে পার্‌বে ত?"

"তিন দিনে।"

"আমি যাচাই ক'রে নেব।"

"নিশ্চয়।"

"তা হ'লে তুমি ছেলে দেখ।"

"কিছু দরকার নেই।"

"না না, সে কি হয়! এক পয়সার একটা হাঁড়ী কিন্‌তে লোক তিনবার বাজিয়ে নেয়। তোমায় ত কোথাও যেতে হবে না হে! একসঙ্গে আপিস। পিণ্টু পাশের ঘরেই আছে।"

পিণ্টু তখন উদ্বিগ্নমনে এক অপরিচিত মক্কেলের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই প্রথম মক্কেল। বিধু ঘরে ঢুকিতেই সোল্লাসে অভ্যর্থনা করিল, "আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, আসুন, আসুন!"

বিধু মনে ভাবিলেন, ছেলেটি খুব সপ্রতিভ।

"আমি ভাবছিলুম, আপনি বুঝি এলেন না। তা দেখুন, আমার কাছে যখন এসেছেন, আপনার কোন চিন্তা নেই। এ দায় থেকে আমি যেমন ক'রে পারি, উদ্ধার কর্‌ব।"

বিধু বলিলেন, "দেখ বাবাজী, কথা দিচ্ছ।"

পিণ্টু কানখাড়া করিল, বাবাজী! সম্পর্ক পাতায় যে! নিশ্চয় কি ফাঁকি দেবার মতলব। দীর্ঘ কর প্রসারিত করিয়া বলিল, "টাকা এনেছেন ত?"

বিধু মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ও বাবা! এ যে দেখি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! পাকা দেখাতেই টাকা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে। এর যে গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি!" বিধুকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া পিণ্টুর আর ধৈর্য্য রহিল না। বটে! বাঁকা আঙ্গুল নইলে ঘি উঠে না! একটু চড়াসুরে বলিল, "হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

বিধু একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। পিণ্টু অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিল, "কোথাকার বেহায়া! আবার শেকড় গেড়ে বসে! পরাণে ত আচ্ছা এক জোচ্চোরকে পাঠিয়েছে দেখ্‌ছি!"

"পরাণে ত আমায় পাঠায়নি বাবাজি!"

পিণ্টু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তবে কে তোমাকে পাঠালে?"

"তোমার বাবা।"

"আবার ঠাট্টা!" কিন্তু রক্ত গরম করিয়া কাজ নষ্ট করিবার পাত্র পিণ্টু নয়। বলিল, "বাবাই হোক্ আর খুড়োই হোক্—বেয়াড়িং পোষ্টে আমি কারুর কায করিনে। এতক্ষণ আমার সময় নষ্ট কর্‌লে, টাকা দাও, নইলে চাদর কেড়ে নেব।"

বিধু একটু সশঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "তোমার মতলবখানা কি বাবাজি! আমি ত আইন-আদালত করতে তোমার কাছে আসিনি।"

"তবে কি জন্যে আসা হয়েছে? সং দেখ্‌তে?"

"না, সম্বন্ধ কর্‌তে।"

"ওঃ! অন্তরা ভাঙ্গ! তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়! ঘটক-চূড়ামণি! কিন্তু স্পষ্টাপষ্টি কথা ভাল, বাবাকে যা দেবে, তার ওপর আমাকে কিছু নগদ ছাড়্‌তে হবে। কি বল? তোমার ক্লায়েন্ট পাত্রব? কার মেয়ে?"

"আমার।"

পিণ্টু মহা অপ্রতিভ হইয়া একেবারে যেন নিবিয়া গেল। কিছুক্ষণ এলোমেলো কতকগুলা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া, একটা কাল্পনিক এস্রাজে বাঁ-হাতে পর্দা টিপিয়া, ডান

হাতে ছড় টানিতে টানিতে মৃদুগুঞ্জনে গৎ ধরিল— নি-সা-ধা-নি-পা—

বিধুও আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাতে যোগদান করিলেন—গাম্মা-পাম্মা-গা-রে-সা—বেহাগ খাম্বাজ।

পিণ্টু চকিত হইয়া চাহিতেই বিধু পরমোৎসাহে বলিলেন, "চলুক্ বাবাজি! চলুক—সাগ্‌পা-সাগ্‌গা-মাপ্পা-নিপ্পা—"

এই সময় সিধু সহসা ঘরে আসিয়া বলিলেন, "ওহে ব্রাদার, বউঠাকুরুণ লোক পাঠিয়েছেন, বড়বাজারে তোমার জরুরি ডাক এসেছে।"

বিধু এই অসম্ভব ডাকের জন্য মনে মনে টেঁপীর মাকে ধন্যবাদ দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন। সিঁড়ির কাছে করমর্দন করিতে করিতে সিধু জিজ্ঞাসিল, "কেমন? ছেলে পছন্দ?"

"খুব, খুব।"

"তবে দিন স্থির ক'রে ফেল। কিন্তু ব্রাদার, সর্ত্তটা মনে আছে?"

"খুব। একদিন আমার ওখানে খাওয়া দাওয়া কর্‌বে চল। সেইদিন দিন স্থির করা যাবে।" তার পর দুই হাতে একটি কাল্পনিক বোতলের ইঙ্গিত করিয়া বিধু প্রশ্ন করিলেন, "চলে ত?"

"খুব, খুব" বলিয়া সিদ্ধেশ্বর আর একবার করমর্দন করিয়া কহিল, "কিন্তু, রোগ যদি না সারাতে পার, তোমায় ঘর-জামাই রাখ্‌তে হবে।"

৬ গর্ভ

বিধু আজ মহা সমস্যায় পতিত। হবু বেহাইকে নৈশভোজের নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতে হইবে। দুই-তিন জন মাতব্বর লেখকের সহিত পরামর্শ চলিতেছে, গোড়াটা আরম্ভ করা যায় কেমন করিয়া? একজন প্রস্তাব করিলেন—I shall deem it a great honour—

বিধু বলিলেন, "ইংরাজীটা তেমন জোরাল হচ্চে না। আচ্ছা deem it a great honour না লিখে honour it a great deem লিখ্‌লে কেমন হয়?"

সকলে একবাক্যে সায় দিল, "অতি উত্তম হয়।"

পত্রখানা সিধুর অন্তঃকরণে শরতের মেঘের মত একটা লঘু ছায়াপাত করিল। great deemটা শেষে ঘোড়ার ডিমে পরিণত হইবে না ত? দেখাই যাক্, বলিয়া সিধু নিমন্ত্রণালয়ে দর্শন দিল। বিধু তখন হোটেলে আহারের বন্দোবস্ত করিতে গিয়াছেন।

সিধু আসিয়া দেখিল, দ্বারে একটি দিব্য ফুটফুটে মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু যেখানে বিধুর সহিত পাঠকের প্রথম পরিচয়, এ সে বাড়ী নয়—তার পাশের বাড়ী। বিধুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ইহার স্বত্বাধিকারী আপাততঃ অনুপস্থিত। বিধু এই সুসজ্জিত ভবনে ভোজনের আয়োজন করিয়াছেন। সিধু প্রশ্ন করিল, "তোমার নাম কি, খুকী?"

খুকী বলিল, "এম্-আই-ডবলএস্—মিস্, টয়ে চন্দ্রবিন্দু একার টেঁ, পয়ে দীর্ঘ ঈকার পী, মিস্ টেঁপী।"

সিধুর চক্ষু কপালে উঠিল। জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি বিধুবাবুর মেয়ে?"

"হয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার—হাঁ—মানে ইয়েস্।"

"তোমার বাবাকে ব'লে এস, অ্যাটর্ণীবাবু এসেছেন।"

"এ-টি-টি-ও-আর-এন্-ই-ওয়াই—এটর্ণী, মানে শ্বশুর।" বলিয়া টেঁপী নিজেদের বাড়ীতে চলিয়া গেল। সিধু অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিধু আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি ব্রাদার, টেঁপীকে দেখ্‌লে?"

"হাঁ।"

"কেমন বানান্ শুন্‌লে? আমি অমন পারি না।"

"আমিও না। কিন্তু মেয়েটি ও-বাড়ীতে গেল কেন?"

"ঐটেই ত অন্দরবাড়ী।"

সিধুকে উপরে লইয়া গিয়া বিধু বলিলেন, "খাবারের একটু দেরী আছে, ততক্ষণ খেলা যাক্?"

"আপত্তি কি? কিন্তু অনেকদিন তোমার গান শুনিনি, একটা গাও।

বন্ধুর ও নিজের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া, হারমোনিয়মটা টানিয়া লইয়া বিধু গাইল—

দিল্ পেয়ারা শাকি আমার শুধবে কে তার ঋণ।
দিচ্ছে ভরে পিয়ার ক'রে পিয়ালা রঙিন॥
টলছে আঁখি, বলছে শাকি,
জীবন একটা মস্ত ফাঁকি,
একচুমুকে পান ক'রে নাও যেটুকু বাকি,—
পলকটি না ফেলতে আঁখি ফেলবে [illegible]

গান থামিল। ভোজনও সুরু হইল। সিধু পাত্রটায় আর এক চুমুক দিয়া বলিল,"ওহে, তোমার সেই ভাড়াটেদের এক কায কর। এক মাসের টাইম্ দিয়ে নোটীশ দাও। বল, বাড়ী ভেঙে নতুন করে গাঁথবে।"

"ভায়া, যা কর্‌বার এখন সব তুমিই কর। খুদ-কুঁড়ো যা আছে, সবই ত ঐ মেয়ের। আর তা হ'লেই সব তোমার। এখন ও-কথা ছেড়ে দাও। একটা দিন স্থির করা যাক্ এস। এই অঘ্রাণে? কি বল?"

সিধু বলিল, "আমার আপত্তি কিছু নেই। তবে একটু গোল বেধেছে।"

বিধুর হাতের কাট্‌লেট্ মুখে উঠিল না। জিজ্ঞাসিল, "গোল কি?"

"আমার পরিবারের উর্দ্ধ্বকের ব্যারাম আছে কি না! যখন দাঁত-কন্‌কনানি সুরু হয়, বাড়ীতে কাক-চিল বস্‌বার যো থাকে না।"

"ব্রাদার, তোমারও যে দেখ ছি, ঘরে-বাইরে। ঘরে দাঁত-কন্‌কনানি, বাইরে এস্‌রাজ। কিন্তু তার জন্তে ভাবনা নেই, ভায়া! আমার 'বদন-রদন-রোদন-মুরারি' এক কৌট নিয়ে যাও, আজই দিচ্ছি। নাল ভাঙে ত?"

"ভাঙ্‌বে না? ঘা হয়েছে।"

"বেশ হয়েছে। আজই দাঁতে লাগিয়ে দাও গে! দেবা-মাত্রই সর্ব্বাপদঃ শান্তিঃ!"

"বল কি, ভায়া, বল কি? সর্ব্বাপদ? ঘরে-বাইরে দুই রোগই সার্‌বে নাকি?"

"আগে গিন্নীকে ত সারো।"

"কিন্তু যেমন দাঁতের রোগ, তেমনি দাঁত-ভাঙ্গা নামও করেছ। আমার বোধ হয়, না লাগালেও চলে। বার দুই নামটা আওড়ালেই—ব্যস্! কি বল্লে? বদন-মুরারি না কি! এমন দাঁত-ভাঙ্গা নাম কখন শুনিনি।"

"ঐ নামেতেই সব, ব্রাদার, নামেতেই সব। বলে বটে, নামে কি এসে যায়! কিন্তু আমি ত দেখ্‌তে পাই, নামেই বিকোয়।"

"ভায়া, এইবার এসরাজ-যমরাজ গোছের একটা পেটেণ্ট বার ক'রে ফেল। আমার মাথার দিব্যি রইল।"

"হবে, হবে! তুমি ভেব না। সব ঠিক ক'রে দেব।"

অতঃপর আহারাদির পালা সাঙ্গ এবং ভোজন-সভাও ভঙ্গ হইল। বাটী ফিরিবার সময় সিধু জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাদার, কিছু মনে করো না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ওষুধ লাগালে কিছু হবে না ত? দাঁত এখনও তার অনেকগুলি আছে, কিন্তু প্রাণ একটি।"

"তুমি লাগিয়েই দেখ না" বলিয়া বিধু আচ্ছা করিয়া ভাবি-বৈবাহিকের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিলেন।

গৃহে ফিরিয়া সিধু সরাসরি শয্যা-গৃহে প্রবিষ্ট হইল। গৃহিণী তখন প্রাণান্তিক চীৎকার করিতেছেন। সিধু প্রশ্ন করিল, "ওগো, জেগে আছ, না, ঘুমুচ্ছ?"

চীৎকারের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। সিধু পুনরায় প্রশ্ন করিল, "ঘুমিয়ে পড়্‌লে নাকি? একটু জাগো দেখি, তোমার বেয়াই ওষুধ পাঠিয়েছেন, একটু দাঁতে লাগাও দিকি, একেবারে জল।"

অনেক সাধ্যসাধনায় ঔষধ লাগান স্থির হইল। গৃহিণী উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু এক চিম্‌টি দাঁতের গোড়ায় লাগাই-তেই—বাপ্! এবং সঙ্গে সঙ্গে কৌটাটা ছোটখাট একটা বোমার মত স্বামীর মুখের উপর পড়িয়া একটা মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত করিল। বদন-মুরারির ফাঁকি কতক চোখে ঢুকিল, কতক নাকে। এ দিকে বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইতেই গৃহিণী কটু দিব্য করিলেন,—"ওর মেয়ের সঙ্গে যদি আমি ছেলের বে দি ত"—ইত্যাদি। কর্ত্তা দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া হাঁচিতে আরম্ভ করিলেন। মিনি পয়সার নেশা একেবারে ছুটিয়া গেল।

বিমর্ষ

মল্লযুদ্ধে দুই পালোয়ান যেমন পরস্পরকে বেড়িয়া পাঁয়তারা কষিতে কষিতে চক্রাকারে ঘুরিয়া উভয়ে উভয়কে আয়ত্ত করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকে, এই দুই বাল্যবন্ধু তেমনি পরস্পরের কাল্পনিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরস্পরকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এ সংসারে কে এক অলক্ষ্য কৌতুকী আছেন, যাঁহার পরিহাস-প্রবৃত্তি সময় সময় সম্ভবের সীমা ডিঙ্গাইয়া যায়। বিধু যখন শুনিলেন, তাঁহার ভাবী বেহাইন্ 'বদন-রদন-রোদন-মুরারি'র নিরতিশয় লাঞ্ছনা করিয়া কুৎসা করিয়া বেড়াইতেছেন, উপরন্তু আবার সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন তিনি ঈষৎ হাসিলেন মাত্র।

টেঁপীর মা একটু বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, "হাসছ যে! এ কি হাসবার কথা?"

"বাপ্ রে! হাসবার মত কথা কটা শুনতে পাওয়া যায়! কিন্তু টেঁপীর গর্ভধারিণী, তুমি অনর্থক উতলা হয়ো না। টেঁপীকে নির্বিঘ্নে বানান্ করতে দাও, তুমিও অবসর পেলেই টাকের ওষুধ মালিস করতে থাকো। আমার নাকডাকার হিংসে কোর না, আর পুরুষমানুষের অধিকারে অযথা হাত দিয়ো না। আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি আর কিছুদিন মেয়েমানুষ থাক, তোমার সীঁথির সিঁদুর, হাতের নোয়া আর হাতা-বেড়ী নাড়ার ক্ষমতা অক্ষয় হ'ক!"

"যে আজ্ঞে মশাই, প্রাতঃ পেন্নাম" বলিয়া টেঁপীর মা নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল। স্বামীর ক্ষমতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস। যিনি কয়েকটা শিশি এবং 'এ্যাকোয়া পাৎকোয়া' সহায়ে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহার অসাধ্য কি? যাহারা এমন স্বামীর অব্যর্থ ঔষধের কোন মাহাত্ম্য বুঝে না, তাদের বংশধর চিরদিন আইবুড় থাক্ আর এস্রাজ বাজাক্, তার জন্য কিছুই আসে যায় না। টেঁপীর বিবাহের ফুলও ফুটিবে, বরও জুটিবে।

এ দিকে বিধু মনে মনে স্থির করিলেন, সিধুকে একটু শিক্ষা দিতে হইবে। বিনা মূল্যে ঔষধ দেওয়াটা ভাল হয় নাই। সে জন্য ঔষধের দরদও বুঝিল না, দাঁতের দরদও সারিল না। তা না সারুক, ঔষধের নিন্দা ক'রে আমার অন্নে হাত দেওয়া কেন? বিধু সিধুকে পত্র লিখিলেন—

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর অ্যাটর্ণী

বরাবরেষু—

নিম্নলিখিত বিলের বাবদ আমার প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া বাধিত করিবে।

১ম দফা ...	বাটীতে আসিয়া ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্দ্ধ দর্শনী ...	... ৪৲
২য় দফা ...	ঔষধের মূল্য বাবদ ...	... ৷৷০
	মবলকে ...	৪৷৷০

পত্র শেষ করিয়া বিধু একবার ভাবিলেন, বন্ধুকে বরাবরেষু লেখাটা ভাল হইল না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, না—'বিজিনেস্ ইজ্ বিজিনেস্।'

পত্র পাইয়া সিধু একেবারে আগুন! "বটে! চোথ-কাণা ক'রে দেবার ফন্দি ক'রে আবার বিল! তোর বাবুকে বল্‌গে যা নালিস করতে!" বলিয়া সিধুও সেই দিনই এক বিল পাঠাইল—

শ্রীযুক্ত বিধু ডাক্তার

বরাবরেষু—

তোমার কাছে কষ্ট্ বাবদ নিম্নলিখিত বিলের টাকা পত্রপাঠ চুকাইয়া দিবে—

১ম দফা—অফিসে ক্লায়েণ্ট্ অ্যাটেণ্ড করা ...	৫৲
২য় দফা—লেটার রিসিভ্ করা ...	... ২৲
মবলকে ...	৭৲

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত লেটার সেই নিমন্ত্রণপত্র। টেঁপীর মা ত হাসিয়া খুন; বিধুকে বলিল, "ওগো, তোমার চেয়ে আড়াই টাকা বেশী ক'রে ধরেছে!"

বিধু বলিলেন, "ধরুক না ওর যত খুসী বেশী, টাকা পেলে ত! চাইলেই যদি পায়, তা হ'লে তুমি এত দিন ধ'রে যে আমার কাছে কত কি চেয়েছ, কবে কি পেয়েছ?"

"না, সে অপবাদ তোমার শত্তুরও কখন দিতে পারবে না।"

"থ্যাঙ্ক্ ইউ, মাই ডিয়ার" বলিয়া বিধু দোসরা নম্বর বিল্ করিলেন—

১ দফা—নিমন্ত্রণপত্র পাঠানর মজুরী ...	১৲
২ দফা—ভোজ	৫৲
৩ দফা—এক বোতল মদ্য সরবরাহ ...	১২৲
৪ দফা—গীতবাদ্যের পারিশ্রমিক	১০৲
একুনে ...	২৮৲

যথাসময়ে সিধু বিল্ পাইয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া গেল। তখন তাহার ঘাড়ে রোখ্ চাপিয়াছে। ন্যায়-অন্যায়, যথা-অযথা জ্ঞানশূন্য হইয়া সেও দুই নম্বর বিল্ পাঠাইল—

১ দফা—বাড়ীতে ক্লায়েণ্ট্ অ্যাটেণ্ড্ করা ...	১৭৲
২ দফা—ইনষ্ট্রাকসন্ দেওয়া	১০৲
৩ দফা—যাতায়াতের ট্যাক্সীভাড়া ও ওয়েটিং চার্জ্জ	৮৲
৪ দফা—গীতবাদ্য শ্রবণের পারিশ্রমিক ...	১৫৲
একুনে ...	৫০৲

বিল্ পাইয়া ডাক্তার মনে মনে অ্যাটর্ণীর কাছে হার মানিলেন। একে ত অ্যাটর্ণীর বিল্ সাড়ে চব্বিশ টাকা বেশী, তার উপর সিধু এক দফা প্রশ্ন করিতেছে, তোমার মদ বেচিবার লাইসেন্স আছে কি না? না থাকিলে, কর্ত্তৃ-পক্ষকে অবগত করাইয়া তোমাকে দণ্ড দেওয়ান যাইবে। দুই দফা লিখিয়াছে, পত্রপাঠ প্রাপ্য না চুকাইলে বিল্ ট্যাক্স করাইয়া আদায় করিবে।

টেঁপীর মার প্রবেশ ও প্রশ্ন, "কি ভাব্‌ছ?"

"বড় ভুল হয়ে গেছে।"

"কি?"

"নেমন্তন্নর চিঠিখানা পাঠিয়েছিলুম খামে পুরে, মুখামৃত দিয়ে এঁটে। পাঠাবার মজুরী ধরেছি, কিন্তু প্যাকিং খরচাটা ধরা হয় নি।"

"তাই ত গা! নিদেন চার আনা ত বাড়ত। ও কি, এত বেলায় যাচ্ছ কোথা? খেয়ে যাও, নইলে পিত্তি পড়বে।"

"কার?"

"কার আবার! আমার।"

"তাই বল! আমি ভাব্‌ছিলুম, হঠাৎ এ কি হ'ল! আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি! আমার পিত্তি-পড়বার ভাবনা! তা আমার যদি বেলা হয়, তুমি মিছে গর্ভযন্ত্রণা পেয়ো না। আহারটা সেরে নিয়ো।"

"তা হ'লে তোমার জন্যে কিছু থাকবে না।"

"বল কি প্রেয়সি! একেবারে একাদশীর বন্দোবস্ত! উপবাসটা আমার বড় অভ্যাস নাই। তার চেয়ে তুমি যেমন পতিভক্তির প্রশ্রয় দিয়ে প্রসাদ পাও—সেই প্রথাই বজায় রেখো।"

"যে আজ্ঞে! এখন যাওয়া হচ্ছে কোথা?"

"সিধুর পাওনা সাড়ে চব্বিশ টাকা শোধ দিতে হবে ত?"

"তাই ত গা। এত!"

"নইলে কি তোমার পিত্তি-পড়া নিবারণ কর্‌বার জন্য জেলে যাব" বলিয়া বিধু হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন এবং পাড়ার এক ধনি-গৃহে গিয়া সিধুকে টেলিফোঁ করিলেন।

সিধু যন্ত্র ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "কে মশায়?"

"সে কি! আপনার এক জন বড় মক্কেল, চিন্‌তে পার্‌লেন না?"

"হাঁ, হাঁ, পেরেছি বৈকি! কে বলুন দিকি?"

"নেহাত মনে পড়িয়ে দিতে হবে" বলিয়া বিধু বলিলেন, "জেলা মুস্কিলাবাদের এক নম্বর তৌজীভুক্ত চৌকী চর্ম্মচটিকা, পরগণে পিসী-মাসীর অন্তর্গত, থানা থ্যাব্‌ড়ানাকীর এলাকায় সব্‌রেজেষ্ট্রী শিল্-নোড়ার অধীন ডিহি ডামাডোলপুরের সামিল মৌজে মজামারীর রকম পৌণে-পোণ-আনীর জমিদার—রায় শ্রীল শ্রীযুক্ত সার শুন্দরাম টাকী বাহাদুর। অধীন তাঁর সদর আমলা, নাম শ্রীমন্দারাম গোলমরিচ—"

"কি বল্‌লেন? গোলমরিচ?"

"আজ্ঞে! কখন শোনেন নি নাকি? মারীচের বাপ—মরিচের গোত্র মশায়। বুঝতে পার্‌লেন না?"

"হাঁ, হাঁ, পেরেছি বৈকি। রায় বাহাদুর ভাল আছেন?"

"শ্রীযুতের কথা বল্‌ছেন? ভাল আছেন বৈকি! তবে আপাততঃ একটু বিপদে পড়েছেন।"

"কি? কি? কি বিপদ?"

"তাই ত আপনার শরণাপন্ন হতে বল্‌লেন।"

"তা বলবেন বৈকি। এত দিনের জানা-শোনা—"

"এক ক্লাসে পড়েছিলেন বুঝি?"

"হাঁ, হাঁ, সে এক রকম পড়াই বৈকি!"

"আচ্ছা, টোর্ণী বাবু, তিনি আপনার সঙ্গে পড়েছিলেন, না, আপনি তাঁর সঙ্গে পড়েছিলেন?"

সিধু মনে মনে বলিলেন, কোথাকার পাড়াগেঁয়ে! জমিদারের আমলা কি না!

"কি মশায়, জবাব দেন না যে? আপনি কি তাঁর, তিনি নন?"

"হাঁ, হাঁ, তিনি বৈকি, আমিই সেই। ও, কি জানেন, ওটা উভয়তঃ। তিনিও আমার সঙ্গে পড়েছিলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে পড়েছিলুম।"

"ওঃ, তাই আপনাদের দুজনে এত ভাব।"

"ভাব আর কি? তিনি যে আমাকে মনে রেখেছেন—"

"মনে কি মশায়! পাছে ভুলে যান ব'লে শ্রাদ্ধের খাতায় নাম লিখে রেখেছেন।"

"কিসের খাতায় বল্‌লেন?"

"শ্রাদ্ধের খাতায়। বড়লোকের বাড়ী, শ্রাদ্ধের খাতায় নাম উঠ্‌লেই পাকা হ'ল। সে ত আর বদল হবে না। এখন আমাদের উদ্ধার কর্‌বেন কিনা, বলুন?"

"কর্‌ব বৈ কি! সে কি! কি বিপদ্ বলুন দেখি?"

"কি জানেন, জমিদারমশা'র কন্যার শুভ বিবাহ।"

"এ আর বিপদ কি? কবে?"

"আগামী লগ্নে, মশায়! বিপদ নয়! আপনাকে একটু মনোযোগ কর্‌তেই হবে!"

"কন্‌ভেয়ান্স করতে হবে বুঝি? থুড়ি—ডিড্ অফ্ গিফট্?—না না, থুড়ি—রেজিষ্ট্রেশন? আরে রাম রাম—না না—থুড়ি—কি বিপদ বলুন দিকি?"

"তাঁর লোকজনদের থাক্‌বার জন্যে একখানি বাড়ীভাড়া ক'রে দিতে হবে। তার জন্য আপনার পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।"

"আরে রাম রাম! এই সামান্য কাযের জন্য আবার পারিশ্রমিক কি? কি রকম বাড়ী চাই?"

"এই ছোট-খাট একখানা। দু-তিনখানা ঘর থাক্‌লেই হবে। বাজে লোক থাক্‌বে, মশায়! সন্ধানে আছে?"

সিধুর নিজের বাড়ীর আধখানা খালি। সম্প্রতি কাল একজন ভাড়াটে উঠিয়া গিয়াছে। ভাবিল, এই ত এক সুযোগ! কিন্তু তখনি অমনি পিণ্টুর এস্রাজের কথা মনে পড়িল। টেলিফোঁর অপর দিক্ হইতে প্রশ্ন হইল, "ভাবছেন কি মশায়! পার্‌বেন না?"

"পার্‌ব বৈ কি! আমার নিজেরই বাড়ী রয়েছে, তার আধখানা ছেড়ে দেব। ক'দিনের জন্য চাই?"

"পনের দিন। কিন্তু মশাই, গিরিমেণ্ট কর্‌তে হবে। কত ভাড়া?"

"না না, ভাড়া আবার কি!"

"সে কি! আপনি তাঁর ক্লাস্‌ফ্রেণ্ড বলেই না, এমন কথা বল্‌তে সাহস কর্‌লেন! জমিদার—তাঁর একটা পজিসন্ আছে ত? আপনার অনুগ্রহ তিনি গ্রহণ কর্‌বেন কি দুঃখে? ভাড়াও নিতে হবে, আর গিরিমেণ্টও কর্‌তে হবে।"

সিধু ভাবিল, এগ্রিমেণ্ট করিতেছে, পিণ্টু দশটা এস্রাজ বাজাইলেও উঠিয়া যাইতে পারিবে না। যখন আপনা হইতে ফাঁদে পা দিতেছে, তখন ছাড়ি কেন? বলিল, "সামান্য দিনের জন্য আর এগ্রিমেণ্ট কেন? পরস্পরকে দু'খানা চিঠি লিখ্‌লেই হবে।"

"বেশ, ভাড়া আপনি ভেঁড়ে-যুবে নিন। এক শ টাকা ঠিক রইল। জমিদার লোক, মশাই, কিসের অভাব! আপনি আপিসে আছেন ত? আমি আহার করেই জমিদারের সই-করা পত্র নিয়ে আস্‌ছি।"

অপরাহ্ণে এক জন লোক আসিয়া বলিল, "আমি মন্দারাম গোলমরিচ।"

সিধু মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া প্রশ্ন করিল, "পত্র এনেছেন?"

"না, মশায়।"

"কেন? কি হ'ল?"

"হয় নি কিছু। তবে শোনা গেল, আপনার পরিবার বড় দজ্জাল, আর আপনার ছেলে নাকি এস্রাজ বাজিয়ে ভাড়াটে টিঁক্‌তে দেন না?"

"কে বল্‌লে?"

"বিধু ডাক্তার।"

"আপনাদের সঙ্গে জানা-শুনা হ'ল কি ক'রে?"

"সে কি মশায়! তিনি যে আমাদের কল্‌কেতার ফ্যামিলি-ডাক্তার।"

সিধু ভাবিল, দেশ-বিদেশে এরূপ দুর্নাম রটনা হইলে, কস্মিন্‌কালে আর ভাড়াটে জুটিবে না, তার উপর এত বড় জমিদারটা হাতছাড়া হয়। উপরন্তু ঈর্ষা—বিধু ভাংচি দিয়ে জিতে যাবে! সিধু মরিয়া হইয়া বলিল, "বেশ! আপনারা চিঠি দিন, আর নাই দিন, মশায়! আমি লিখে দিচ্ছি, যদি আমার দিক থেকে কোন রকম গোলমাল হয়ে আপনাদের উঠ্‌তে হয়, আমি হাজার টাকা খেসারত ধ'রে দেব। বিধু আমার—আমার—আমার মামার সম্বন্ধী।"

সিধু সেইমত সর্ত্ত লিখিয়া দিলেন।

উপসংহৃতি।

"মা, আমার এস্রাজ?" বলিতে বলিতে পিণ্টুগোপাল পিতার কক্ষে প্রবেশ করিল। সিধু দেখিল, বিপদ্ আসন্ন। কহিল, "যাই, বাড়ীটা কদ্দুর পরিষ্কার হ'ল, দেখিগে। কাল তারা আস্‌বে।"

সিধু যেমন দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল, পিণ্টু পথ আগুলিয়া বলিল, "মা, আমার এস্রাজ দিয়ে যেতে বল।"

"এস্রাজ, আমি কি জানি।"

"জান না ? জান না ? বেশ, আমি চল্‌লুম। থানায় ডায়ারি করতে, তারা এসে খানাতল্লাসী করুক।"

সিধুর ভয় হইল। যে গোঁয়ার ছেলে! যন্ত্রটি যেখানে তিনি সরাইয়াছেন, খানাতল্লাসীতে অনায়াসে বাহির হইয়া পড়িবে। তখন? কিন্তু সিধু আজ মরিয়া—বলিল, "থানায় ডায়ারি? বেশ, দোর আট্‌কে দাঁড়িয়েছ! আমিও চার্জ্জ দেব, বে-আইনী আটক, কর্ত্তব্য-কার্য্যে বাধা প্রদান—"

পিণ্টু একটু দমিয়া গিয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

"আইন শিখে আমার সঙ্গে লাগ্‌তে এস," বলিয়া সিধু দ্রুত প্রস্থান করিল। মনে মনে একটু গর্ব্ব হইল, হাজার হোক্, আমি ওর জন্মদাতা। আমার কাছে চালাকি!

পরদিন সকালবেলাই একটি যুবক আসিয়া বাটী অধিকার করিল। সিধু আত্মীয়তা করিয়া জিজ্ঞাসিল, "আপনি একলা বুঝি, আর কেউ এলেন না?" যুবক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিল মাত্র।

"পরে আস্‌ছেন বুঝি?"

যুবক এবার একগাল হাসিল। সিধু বিস্তর প্রশ্ন করিল, কিন্তু সেই ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাউনি ও হাসি ছাড়া যুবকের কাছে আর কিছু পাইল না।

সন্ধ্যার পর আপিস হইতে বাটী আসিয়া সিধু দেখিল, বাটীতে আলো জ্বলিতেছে, তিন-চারি জন লোকও উপস্থিত, কিন্তু সব চুপচাপ। একটি টুঁ শব্দ নাই। সিধু মনে ভাবিল, ভাগ্যিস্ এস্রাজটা সরানো গেছে। পিণ্টুর দৌরাত্ম্যে এই সব নিরীহ নির্ব্বিরোধী লোক কি একদিন টেঁক্‌তে পার্‌ত? যাক্, অন্ততঃ দিন পনের ত ঘুমিয়ে বাঁচি! সিধু সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া শয়ন করিল। গভীর রাত্রে হঠাৎ পৈশাচিক আওয়াজে নিদ্রাভঙ্গ! সিধু ভীতি-চকিত হইয়া ডাকিল, "গিন্নি, গিন্নি, শুন্‌ছ?"

গিন্নী জাগ্রত হইয়া রাম নাম আরম্ভ করিলেন।

"আরে রাম রাম কর্‌লে কি হবে! এ কি ভূত? এ নিশ্চয় চোর!"

"হাঁ, চোরে তোমার বাড়ীতে ভেঁপু বাজিয়ে চুরি কর্‌তে এয়েছে!"

"আহা, আমার বাড়ী কেন? শুন্‌ছ না, ও বাড়ীর ছাতের ওপর থেকে আওয়াজ আস্‌ছে! একটু কান পেতে শোন না।"

"এ দুপুর রেতে ভূতের—রাম, রাম, রাম, রাম—সানাই শোনবার সখ্ আমার নেই। মিন্‌ষে কাকে ভাড়াটে আন্‌লে, তার ঠিক নেই! রাম, রাম, রাম,—ভালয় ভালয় রাতটা পোয়াক, গোপালকে নিয়ে আমি কালই বাপের বাড়ী চ'লে যাব।"

"আমাকে একলা ফেলে?"

"একলা কেন? তোমার ত এখন ঢের সঙ্গী জুটলো! ওদের নিয়ে থাক। মিন্‌ষে বাড়ীতে ভূত—রাম, রাম—ডেকে আন্‌লে গা!"

"দেখ, আপনার বুকে হাত দিয়ে কথা কও! ভূত ডাক্‌লুম আমি! তোমরা মায়ে-বেটায় যে রকম আওয়াজ কর, ভূতকে আর ডাক্‌তে হয় না। হ্যাঁ, সত্যি কথা বল!"

আওয়াজটা একটু থামিয়াছিল। অকস্মাৎ আর এক রকমের একটা বিট্‌কেল আওয়াজ উঠিল। গৃহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিলেন, "ও মা!—রাম-রাম-রাম-রাম—ভূত এয়েছে গো, ভূত! সেটা সরু—পেত্নীর,—রাম-রাম,—এটা মোটা আওয়াজ—তাঁদের!"

"তাঁদের! কাদের?"

"তোমার ভাই-বেরাদারদের গো! আবার কাদের? তোমার কাছে যখন বাড়ী ভাড়া নিতে এয়েছিল, পায়ের দিকে চেয়ে দেখেছিলে?"

"কেন?"

"কোথাকার হাঁদা মিন্‌ষে! ওদের সাম্‌নের দিকে গোড়ালী, পিছন দিকে পা হয়, জান না? আচ্ছা, কথা ত কয়েছিলে? তাতেও বুঝ্‌তে পারনি, খোনা খোনা আওয়াজ কি না?"

সিধু কথা কহিয়াছিল সত্য, কিন্তু কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাউনী আর হাসি ছাড়া কোন উত্তরই ত পায় নাই। উঃ, সে হাসি-চাউনীর ভিতর এত ছিদ্র, কে জানে!

"কালই যদি না ওদের বিদেয় কর ত আমি গলায় দড়ি দেব।"

"তা হ'লে ওরাই দলে পুরু হবে! বিদেয় কর! হাজার-খানি চক্‌চকে চাকি ঝাঁক্‌বে—তার খবর রাখ?"

"ওদের জোটালে কে বল্‌তে পার?"

সিধু মুস্কিলে পড়িল। কেহই ত চেনা নয়! বলিয়া ফেলিল, "বিধু।"

"বিধু আবার কবে তোমার কাছে এল ?"

"আহা, বিধু আস্‌বে কেন ?"

"তবে কে এসেছিল ?

সিধু ইতস্তত করিতে লাগিল।

"কে, তার নাম জান না ?"

"কেন নাম জান্‌ব না ? গোলমরিচ !

"দেখ, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না। আমি কি খুকী ?"

"ঠাট্টা কর্‌ছে কোন্ চণ্ডাল ?"

"আমার গা জ্ব'লে যাচ্ছে।"

"আহা, এ ত সত্যিকার গোলমরিচ নয় যে, গা জ্বল্‌বে !"

"গোলমরিচ মানুষের নাম হয় ?"

"কেন হবে না ? গরমমস্‌লা, গোলমরিচ, পাঁচফোড়ন, কত রকম পদবী আছে, তার তুমি জান্‌বে কি ? মেয়েমানুষ ঘরের ভেতর থাক।"

"মসলা পরে বাহিরে বেরিয়ে যে বুদ্ধি খরচ কর্‌ছ, আর পর্য্যে পেড় না ! গামলা ভরে জাব দেবে ! ঐ হেতুড়ে ডাক্‌তারটার যে বুদ্ধি আছে—তোমার তা নেই !"

এই সময় ছাদের উপরে সেই সরু-মোটা আওয়াজ অতীব ভীষণ হইয়া উঠিল। যেন হাতী, ঘোড়া, গরু, গাধা, টিয়া, কাকাতুয়া প্রভৃতি চুণাগলির ব্যাণ্ডওয়ালাদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া ঐক্যতানবাদন করিতেছে। গৃহিণী কানে আঙ্গুল দিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "যেমন ক'রে পার, হাতেপায়ে ধ'রে বিধু ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে পিণ্টুর বিয়ে দাও।"

এমন সময় পিণ্টু আসিয়া দ্বার ঠেলিতে ঠেলিতে ভয়-বিকৃত স্বরে ডাকিতে লাগিল, "মা—মা—"

গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ঐ গো, আঁই আঁই ক'রে দোর ঠেলাঠেলি কর্‌ছে—আমি কোথায় যাব !"

আদুরে গোপাল পিণ্টু তখন ভয়ে অধীর হইয়া দ্বারে দুম্‌দাম আওয়াজ করিতে করিতে চেঁচাইতেছে, "শীগ্‌গির দোর খোল বল্‌ছি, নইলে ভাঙ্‌লুম।"

"ঐ শোন, বল্‌ছে, ঘাড় ভাঙ্‌বো ! আমার লেপখানা মুড়ি দিয়ে দাও—তোমার পায়ে পড়ি ! রাম—রাম—রাম।"

সিধু কান পাতিয়া শুনিতেছিল। বলিল, "কি আপদ ! ও তোমার আদুরে গোপাল।"

পিণ্টু জড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "মট্‌কা মেয়ে পড়ে আছিস্—"

"ঐ—ঐ—ঘাড় মট্‌কাবে বল্‌ছে ! রাম—রাম—রাম—"

এ দিকে সিধু আল্‌মারীর ভিতর হইতে বোতল বাহির করিয়া এক পেগ্ টানিয়া বলিল, "হামবাগ্।" তার পর একগাছা মোটা লাঠী হাতে করিয়া দ্বার খুলিবামাত্র পিণ্টু হুড়্‌মুড়্ করিয়া যেমন বিছানায় ঢুকিতে যাইবে, অমনি মশারি ছিঁড়িয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর দাঁতি ! সিধু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সিধা ছাদে চলিল। কিন্তু সিঁড়ির ঘরের দ্বারের নিকট আসিতেই যে দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল, তাহাতে পদদ্বয় আপনা হইতে থামিয়া ত গেলই, অধিকন্তু কাঁপিতে লাগিল। সিধু দেখিল, দুইটা মানুষের মত মূর্ত্তি সামনাসামনি বসিয়া এক জন কর্ণেট্ ও আর এক জন একটা আল্‌থরণ্ বাঁশী ফুঁকিতেছে। একবার এক জন বাজাইতেছে এবং সে থামিলেই আর এক জন ধরিতেছে। কখন কখন আবার একসঙ্গে। সিধু ভাবিতে লাগিল, ইহারা কি ভূত ? ভূতে কি কখন কর্ণেট্, আল্‌থরণ্ বাজায় ? কখনই না ! কিন্তু অগ্রসর হইতেও সাহস হইতেছে না। ইতিমধ্যে ব্যাগ্‌পাইপ্ বাজাইতে বাজাইতে এক গোরার মূর্ত্তি ছাদে উঠিল। কি ভুতুড়ে সুর রে বাবা ! ব্যাগ্‌পাইপ্ ছাদে আসিবামাত্র কর্ণেট্, আল্‌থরণ, তাহার সহিত যোগ দিয়া বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য ! সহধর্ম্মিণীর কথামত সিধু তিন জনের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু তাহাদের নৃত্যভঙ্গীতে কিছুতেই ঠিক্ হইতেছে না—সম্মুখভাগে গোড়ালী কি অঙ্গুষ্ঠ। এমন সময় কর্ণেট্, ব্যাগ্‌পাইপ, আল্‌থরণের আওয়াজ ছাপাইয়া পশ্চাতে সহসা বাজিয়া উঠিল —ধো—ধো—ধোতা—ধোতা—

সিধু দেখিল, এক লম্বা টিকিদার বাবাজী প্রাণপণে রামশিঙ্গা ফুঁকিতে ফুঁকিতে তালে তালে পা ফেলিয়া গট্ গট্ চলিয়া আসিতেছে ! দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সিধু দেখিতে লাগিল ; তখন তাহার বাক্‌শক্তি, চলৎশক্তি, এমন কি, চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছে, "অপরন্থা কিং ভবিষ্যতি।" সে 'অপরন্থা' ঘটিতেও বিলম্ব হইল না। গোটাচারেক ঢাক ও গোটাআষ্টেক ঢোল জোর কাঠীতে বাজিতে বাজিতে ছাদে আসিয়া উপস্থিত

[illegible]

ব্যাপারও হয়, অন্ততঃ একটা রক্তমাংসের শরীর তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান। সিধু ছুটিয়া গিয়া বিধুকে জড়াইয়া ধরিল, "বাঁচাও, ব্রাদার, বাঁচাও! আগামী লগ্নই স্থির রইল।"

বিধু বলিলেন, "সে কেমন ক'রে হবে! তোমার ছেলের ধনুকভাঙ্গা পণ, হাতে নগদ কিছু না পেলে বে করবেন না। ওহে, চালাও, চালাও—"

সিধু নিরুপায় হইয়া কানে আঙ্গুল দিয়া বলিল, "সে ভার আমার, তাকে যা দিতে হয়, আমি দেব।"

"তা ত দেবে! কিন্তু আমারও যে কিছু যোগাড় নেই! না টাকা, না গয়না! চলুক, চলুক!"

"না থাকে নেই-নেই।"

বিধু ভাবিতে লাগিলেন।

সিধু উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি ভাব্‌ছ ব্রাদার?"

বিধু বলিলেন, "ভাব্‌ছি, টেঁপী যদি এস্রাজ রোগটা সারাতে না পারে? ওহে, বাজাও, বাজাও!"

সিধু তাড়াতাড়ি বলিল, "না পারে, কুছ্ পরোয়া নেই! এদের এখন থামাও!"

"এটর্ণীর কষ্ট বাবদ তোমার পাওনাটা—

"গায় গায় শোধ" বলিয়া সিধু বাল্য-বন্ধুকে আলিঙ্গন করিল এবং অচিরে শুভ শঙ্খরোল ও হুলুধ্বনিতে বর-কন্যার বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল।

(বাসর-সঙ্গীত)

কেউ কমি নয় সমান ওজন দু'জন মাণিকজোড়।
ওরই মধ্যে একটু বেশী 'বদন-রদন-মুরারি'র গুমোর॥
বেউড়-বাঁশের তেউড় দুটি পেয়ার দোড়দার,
বরযাত্রীর বাহ্‌বা বরাত—অষ্টরম্ভা সার,—
দস্ত্য নয়ে আকার দিয়ে সমাপ্ত ফলার;
সাগ্‌গা-সাগ্‌গা-মাপ্‌পা-নি-পা—থাপ্পা হয়ে গায় গিধোড়!
হাত্‌-তালি দে বল সবাই— এন্‌কোর! এন্‌কোর!!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

অসহযোগ।

মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী?

নীল-লোহিত।

আমাকে যখন লোক গল্প লিখতে অনুরোধ করে, তখন আমি মনে মনে এই ব'লে দুঃখ করি যে, ভগবান্ কেন আমাকে নীল-লোহিতের প্রতিভা দেন নি। সে প্রতিভা যদি আমার শরীরে থাক্‌ত, তা হ'লে আমি বাঙ্‌লার সকল মাসিক পত্রের সকল সম্পাদক মহাশয়দের অনুরোধ এক সঙ্গে অক্লেশে রক্ষা করতে পার্‌তুম।

গল্প বল্‌তে নীল-লোহিতের তুল্য গুণী আমি অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখি নি।

অনেক সময়ে মনে ভাবি যে, তাঁর মুখে যে সব গল্প শুনেছি, তারই গুটিকয়েক লিখে গল্প লেখার দায় হ'তে খালাস হই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সব গল্প লেখবার জন্যও লেখকের নীল-লোহিতের অনুরূপ গুনিপণা থাকা চাই। তাঁর বল্‌বার ভঙ্গীটি বাদ দিয়ে তাঁর গল্প লিপিবদ্ধ করলে সে গল্পের আত্মা থাক্‌বে বটে, কিন্তু তার দেহ থাক্‌বে না। তিনি যে গল্প বল্‌তেন, তাই আমাদের চোখের সুমুখে শরীরী হয়ে উঠত এবং সাঙ্গোপাঙ্গ মূর্ত্তি ধারণ করত। এমন খুঁটিয়ে বর্ণনা করবার শক্তি আর কারও আছে কি না, জানিনে। কিন্তু আমার যে নেই, তা নিঃসন্দেহ। এ বর্ণনার ওস্তাদি ছিল এই যে, তার ভিতর অসংখ্য ছোট-খাটো জিনিষ ঢুকে পড়ত। অথচ তার একটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়, অসঙ্গত নয়, অনাবশ্যক নয়। সুনিপুণ চিত্রকরের তুলির প্রতি আঁচড় যেমন চিত্রকে রেখার পর রেখায় ফুটিয়ে তোলে, নীল-লোহিতও কথার পর কথায় তাঁর গল্প তেমনি ফুটিয়ে তুল্‌তেন। তাঁর মুখের প্রতি কথাটি ছিল, ঐ চিত্র-শিল্পীর হাতেরই তুলির আঁচড়।

তার পর কথা তিনি শুধু মুখে বল্‌তেন না। গল্প তাঁর কথায় তিনি শুধু গল্প বল্‌তেন না, সেই সঙ্গে সেই গল্পের অভিনয়ও কর্‌তেন। যে তাঁকে গল্প বল্‌তে না শুনেছে, তাকে তাঁর অভিনয়ের ভিতর যে কি অপূর্ব্ব প্রাণ ছিল, তেজ ছিল, রস ছিল, তা কথায় বোঝানো অসম্ভব। তিনি যখন কোনো ধ্বনির বর্ণনা কর্‌তেন, তখন তাঁর কানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হ'ত যে, তিনি যেন সে শব্দ সত্য সত্যই স্বকর্ণে শুন্‌তে পাচ্ছেন। তাজি ঘোড়াকে ছারতকে ছাড়লে সে চল্‌তে চল্‌তে যখন গরম হ'য়ে ওঠে, তখন তার নাকের ডগা যেমন ফুলে ওঠে ও সেই সঙ্গে একটু একটু কাঁপতে থাকে, নীল-লোহিতও গল্প বল্‌তে বল্‌তে গরম হয়ে উঠলে, তাঁর নাকের ডগাও তেমনি বিস্ফারিত ও বেপথুমান হ'ত। আর তাঁর চোখ? এমন অপূর্ব্ব মুখর চোখ আমি আর কোনও লোকের কপালে আর কখনো দেখিনি। গল্প বল্‌বার সময় তাঁর দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ থাক্‌ত, যেন সেখানে একটি ছবি ঝোলানো আছে, আর নীল-লোহিত সেই ছবি দেখে দেখে তার বর্ণনা ক'রে যাচ্ছেন। সে চোখের তারা ক্রমান্বয়ে ডান থেকে বাঁয়ে আর বাঁ থেকে ডাইনে যাতায়াত কর্‌ত; যাতে ক'রে ঐ আকাশপটের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তার সমগ্র রূপটা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর চোখের আড়াল না হয়, এই উদ্দেশ্যে। তার পর তাঁর মনে যখন যেমন তীব্র কোমল প্রসন্ন বিষণ্ণ সতেজ নিস্তেজ ভাব উদয় হ'ত, তাঁর চক্ষুদ্বয়ও সেই ভাবের অনুরূপ, কখনো বিস্ফারিত, কখনো সঙ্কুচিত, কখনো ত্রস্ত, কখনো প্রকৃতিস্থ, কখনো উদ্দীপ্ত, কখনো স্তিমিত হয়ে পড়ত। আর কথা তাঁর মুখ দিয়ে এমনি অনর্গল বেরত যে, আমাদের মনে হ'ত যে, নীল-লোহিত মানুষ নয়, একটা জ্যান্ত গ্রামোফন।

বন্ধুবান্ধবরা সবাই বল্‌তেন যে, নীল-লোহিতের তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। যদিচ আমার ধারণা ছিল অন্যরূপ, তবুও এ অপবাদের আমি কখনো মুখ খুলে প্রতিবাদ কর্‌তে পারি নি। কেন না, এ কথা কারও অস্বীকার কর্‌বার যো ছিল না যে, বন্ধুবর ভুলেও কখনো সত্য কথা বল্‌তেন না। কথা সত্য না হলেই যে তা মিথ্যা হ'তে হবে, এই হচ্ছে সাধারণত মানুষের ধারণা, আর এ ধারণা যে ভুল, তা প্রমাণ করতে হলে,মনোবিজ্ঞানের তর্ক তুলতে হয়, আর সে তর্ক আমার বন্ধুরা শুন্‌তে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

লোক নীল-লোহিতকে কেন মিথ্যাবাদী বলত জানেন? তাঁর প্রতি গল্পের hero ছিলেন স্বয়ং নীল-লোহিত, আর নীল-লোহিতের জীবনে যত অসংখ্য অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটেছিল, তার একটিও লাখের মধ্যে একের জীবনেও একবারও ঘটে না।

তাঁর গল্পারম্ভের ইতিহাস এই। যদি কেউ বলত যে, সে বাঘ মেরেছে, তা হ'লে নীল-লোহিত তৎক্ষণাৎ বল্‌তেন যে, তিনি সিংহ মেরেছেন এবং সেই সিংহ-শীকারের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করতেন। একদিন কথা হচ্ছিল যে, হাতী ধরা বড় শক্ত কাজ। নীল লোহিত অমনি বল্‌লেন যে, তিনি একবার মহারাজ কিরাতনাথের সঙ্গে গারো পাহাড়ে খেদা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েই "দায়দারদের" সঙ্গে তিনিও একটি পোষমানা "কুনকি"র পিঠে চড়ে বস্‌লেন। তাঁর দুঃসাহস দেখে মহারাজ কিরাতনাথ হতভম্ব হ'য়ে গেলেন, কেন না, "দায়দাররা" জীবনের ছাড়পত্র লিখে, তবে বুনো-হাতী-ভোলানে ঐ মাদী হাতীর পিঠে আসোয়ার হয়। তার পর ঐ কুনকি জঙ্গলে ঢুকুতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক প্রকাণ্ড দাঁতলা,—মেঘের মত তার রঙ আর পাহাড়ের মত তার ধড়, আর তার দাঁত দুটো এত বড় যে, তার উপর একখানা খাটিয়া বিছিয়ে মানুষ অনায়াসে শুয়ে থাকৃতে পারে। ঐ দাঁতলাটা—একেবারে মস্ত হয়েছিল, তাই সে জঙ্গলের ভিতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছগুলো শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে উপড়ে ফেলে নিজের চল্‌বার পথ পরিষ্কার ক'রে আস্‌ছিল। তার পর কুনকিটিকে দেখে সে প্রথমে মেঘগর্জ্জন ক'রে উঠলো! তার পর সেই হস্তিরমণীর কানে কানে ফুসফুস ক'রে কত কি বলতে লাগল। তার পর হস্তিযুগলের ভিতর সুরু হ'ল, "অঙ্গ হেলাহলি গদ্‌গদ ভাষ।" ইতিমধ্যে "দায়দাররা" "কুনকির" পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে তার পিছনের পা ধ'রে ঝুলছিল, আর নীল-লোহিত তার লেজ ধ'রে। এ অবস্থায় "দায়দারদের" অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল যে, মাটীতে নেমে চট্‌পট্‌ শোণের দড়ি দিয়ে ঐ দাঁতলাটার পাগুলো বেঁধে ছেঁদে দেওয়া। কিন্তু তারা বল্‌লে "এ হাতী পাগ্‌লা হাতী, ওর গায়ে হাত দেওয়া আমাদের সাধ্য নয়,—যদি রশি দিয়ে পা বেঁধেও ফেলি, তার পর যখন ওর পিঠে চড়ে বস্‌ব, তখন সে দড়ি ছিঁড়ে জঙ্গলের ভিতর এমনি ছুটবে যে, গাছের ধাক্কা লেগে আমাদের মাথা চুর হয়ে যাবে।" এ কথা শুনে নীল-লোহিত "দায়দারদের" damned coward ব'লে, এক ঝুলে কুনকির লেজ ছেড়ে দাঁতলার লেজ ধ'রে সেই লেজ বেয়ে উঠে দাঁতলার কাঁধে গিয়ে চড়ে বস্‌লেন। মানুষের গায়ে মাছি বস্‌লে তার যেমন অসয়োস্তি হয়, দাঁতলাটারও তাই হ'ল, আর সে তখনি তার শুঁড় উঁচালে ঐ নররূপী মাছিটাকে টিপে মেরে ফেল্‌বার জন্য। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নীল লোহিত কি করেছিলেন জানেন? তিনি তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে উপুড় হ'য়ে পড়ে, দাঁতলাটার কানে মুখ দিয়ে নিধুবাবুর একটা ভৈরবীর টপ্পা গাইতে সুরু করলেন, সেই মদমত্ত হস্তী অমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু নিমীলিত ক'রে গান শুনতে লাগল। ঐ প্রণয় সঙ্গীত শুনে, হাতী বেচারা এমনি তন্ময়—এমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল যে, ইত্যবসরে "দায়দাররা" যে তার চারিটি পা মোটা মোটা শোণের দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে, সে তা টেরও পেলে না। ফলে দাঁতলার নড়বার চড়বার শক্তি আর রইল না। সে হাতী এখন মহারাজ কিরাতনাথের হাতীশালায় বাঁধা আছে।

মহারাজ কিরাতনাথ কে? এ প্রশ্ন করলে নীল-লোহিত ভারি চটে যেতেন। তিনি বল্‌তেন, ও রকম ক'রে বাধা দিলে তিনি গল্প বলতে পারবেন না। আর যেহেতু তাঁর গল্প আমরা সবাই শুনতে চাইতুম, সেই জন্যে পাছে তিনি গল্প বলা বন্ধ ক'রে দেন, এই ভয়ে ঐ সব বাজে প্রশ্ন করা আমরা বন্ধ ক'রে দিলুম। কারণ, সকলে ধ'রে নিলে যে—নীল-লোহিতের গল্প সর্ব্বৈব মিছে,ও গল্প শোন্‌বার জিনিষ, কিন্তু বিশ্বাস করবার জিনিষ নয়। কেন না, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত, যে—নীললোহিত সতেরবার ঘোড়া থেকে

পড়েছিলেন, আর তার একবার দারজিলিংয়ে ঘোড়াসুদ্ধ দু হাজার ফিট নীচে খদে, অথচ তাঁর গায়ে কখনো একটি আঁচড়ও যায়নি, যদিচ পড়বার সময় তিনি স-ঘোটক শূন্যে দুবার ডিগবাজি খেয়েছিলেন। নীললোহিত তিনবার জলে ডুবেছিলেন, যেখানে তিস্তা এসে ব্রহ্মপুত্রে মিশছে, সেখানে একবার চড়ায় লেগে জাহাজের তলা ফেঁসে যায়—সকলে ডুবে মারা যায়, একমাত্র নীললোহিত পাঁচ মাইল জল সাঁতরে—শেষটা রৌউমারিতে গিয়ে উঠেছিলেন। আর একবার মেঘনায় জাহাজ ঝড়ে সোজা ডুবে যায়,সেবারও তিনি তিন দিন তিন রাত ঐ জাহাজের মাস্তুলের ডগায় পদ্মাসনে ব'সে ধ্যানস্থ ছিলেন; পরে অন্য জাহাজ এসে তাঁকে তুলে নিলে। আর শেষবার মাতলার মোহনায় জাহাজ উল্টে যায়, তিনি ঐ জাহাজের নীচেই চাপা পড়েছিলেন, কিন্তু ডুব-সাঁতার কাটতে কাটতে তিনি ঐ জাহাজের হাল ধ'রে ফেল্লেন, আর ঐ হাল বেয়ে তিনি ঐ জাহাজের উল্টো পিঠে গিয়ে চ'ড়ে বস্‌লেন। ঐ উল্টোনো-জাহাজ ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তার পর একখানা জার্ম্মাণ মনোয়ারি জাহাজ তাঁকে তুলে নেয়, আর সেই জাহাজেই Kaiserএর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। কাউজার নাকি বলেছিলেন যে, নীললোহিত যদি তাঁর সঙ্গে জার্ম্মাণীতে যান, তা'হলে তিনি তাঁকে sub-marineএর সর্ব্বপ্রধান কাপ্তেন ক'রে দেবেন। যে মাইনে কাউজার তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন, তাতে তাঁর পোষায় না ব'লে তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এ সব নীললোহিতের কথা বস্তর নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করলুম, কিন্তু তাঁর কথারসের বিন্দুমাত্র পরিচয় দিতে পারলুম না। তুফানের বর্ণনা সমুদ্রের বর্ণনা তাঁর মুখে না শুনলে, গুণীর হাতে পড়লে জলের ভিতর থেকে যে কি আশ্চর্য্য রৌদ্ররস বেরয়; তা কেউ আন্দাজ করতে পারবেন না।'

নীললোহিতকে দিয়ে গল্প লেখাবার চেষ্টা করেছিলুম। কেন না, গল্প তিনি আর বলেন না। তিনি আমার অনুরোধে একটি গল্প লিখেওছিলেন। কিন্তু সেটি পড়ে দেখলুম, তা একেবারে অচল। সে গল্প প্রথম থেকে শেষ লাইন তক্ পড়ে দেখি যে, তার ভিতর আছে শুধু সত্য, একেবারে আঁককষা সত্য; কিন্তু গল্প মোটেই নেই। সুতরাং বুঝলুম যে, তাঁর দ্বারা আমাদের সাহিত্যের কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি হবার সম্ভব নেই। তিনি কেন যে গল্প লেখা ছেড়ে দিলেন, তার ইতিহাস এখন শুনুন।

বাঙলায় যখন স্বদেশী ডাকাতি হতে সুরু হ'ল, তখন পাঁচ জন একত্র হলেই ঐ ডাকাতির বিষয়ই আলোচনা হ'ত। খবরের কাগজে ঐ রকম একটা ডাকাতির রিপোর্ট পড়ে, অনেকের কল্পনা অনেক রকমে খেলত। কথায় কথায় সে রিপোর্ট ফেঁপে উঠত—ফুলে উঠত। কেউ বলতেন, ছেলেরা একটানা বিশ ক্রোশ দৌড়ে পালিয়েছে, কেউ বলত, তারা তেতালার ছাদ থেকে লাফ মেরে পড়ে পিট্‌টান দিয়েছে। একদিন আমাদের আড্ডায় এই সব আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় নীললোহিত বললেন যে, "আমি একবার এক ডাকাতি করি, তার বৃত্তান্ত শুনুন।" তাঁর সে বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত লিখতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড উপন্যাস হয়, সুতরাং ডাকাতি ক'রে তাঁর পালানোর ইতিহাসটি সংক্ষেপে বলছি। নীললোহিত উত্তর-বঙ্গে এক সা-মহাজনের বাড়ী ডাকাতি করতে যান। রাত দশটায় তিনি সে বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। এক ঘণ্টার ভিতর সেখানে গ্রামের প্রায় হাজার চাষা এসে বাড়ী ঘেরাও করলে, ডাকাত ধরবার জন্য। নীললোহিত যখন দেখলেন যে, পালাবার আর উপায় নেই, তখন তিনি চট্ ক'রে তাঁর পণ্টনি সাজ খুলে ফেলে, একটি বিধবার পরণের একখানি সাদা-শাড়ী টেনে নিয়ে সেইখানি মালকোচ্চা মেরে পরে, পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লোকে তাঁকে বাড়ীর চাকর ভেবে আর বাধা দিলে না। কিন্তু একটু পরেই লোকে টের পেলে যে, ডাকাতের সর্দ্দার পালিয়েছে, অমনি দেদার লোক তাঁর পিছনে ছুটতে লাগল, মাইল দশেক দৌড়ে যাবার পর তিনি দেখলেন যে, রাস্তার দু' পাশের গ্রামের লোকরাও তাঁকে তাড়া করছে। শেষটা তিনি ধরা পড়ে পড়ে, এমন সময় তাঁর নজরে পড়ল যে, একটা বর্ম্মা-টাট্টু একটা ছোলার ক্ষেতে চরছে। তার পিছনের পা-দুটো দড়ি দিয়ে ছাঁদা। নীললোহিত প্রাণপণে ছুটে গিয়ে তার পায়ের দড়ি খুলে,তার মুখের ভিতর সেই দড়ি পূরে দিয়ে, তাতে এক পেঁচ লাগিয়ে সেটিকে লাগাম বানালেন। তার পর সেই ঘোড়ায় চড়ে দে ছুট। রাত বারোটা থেকে রাত ছটো পর্য্যন্ত সে টাট্টু বিচিত্র চালে চলতে লাগল, কখনো কদমে, কখনো দুলকিতে, কখনো চার-পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে। জীবনে এই একটিবার তিনি ঘোড়া

থেকে পড়েন নি। তার পর সে টাট্টু হঠাৎ থেমে গেল। নীললোহিত দেখলেন, সুমুখে একটা প্রকাণ্ড বিল অন্তত তিন মাইল চৌড়া। অমনি ঘোড়া থেকে নেমে নীললোহিত সেই বিলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পাছে কেউ দেখতে পায়, এই ভয়ে, প্রথম মাইল তিনি ডুব-সাঁতার কেটে পার হলেন, দ্বিতীয় মাইল এমনি সাঁতরে, আর তৃতীয় মাইল চিৎ-সাঁতার দিয়ে, এই জন্য যে, পাড় থেকে কেউ দেখলে ভাববে যে, একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে। নীললোহিত যখন ওপারে গিয়ে পৌছলেন, তখন ভোর হয় হয়। ক্লান্তিতে তখন তাঁর পা আর চল্‌ছে না। সুতরাং বিলের ধারে একটি ছোট খড়ো-ঘর দেখবামাত্র তিনি যা থাকে কুল-কপালে বলে, সেই ঘরের দুয়োরে গিয়ে ধাক্কা মারলেন। তৎক্ষণাৎ দুয়োর খুলে গেল, আর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি পরমাসুন্দরী যুবতী। তার পরণে সাদা-শাড়ী, গলায় কণ্ঠী আর নাকে রসকলি। নীললোহিত চিন্‌তে পারলেন যে, স্ত্রীলোকটি হচ্ছে একটি বোষ্টমী, আর সে থাকে একা। নীললোহিত সেই রমণীকে তাঁর বিপদের কথা জানালেন। শুনে তার চোখে জল এল, আর সে তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে নীললোহিতের ভালবাসায় পড়ে গেল। আর সেই সুন্দরীর পরামর্শে নীললোহিত পরণের ধুতি, শাড়ী ক'রে পরলেন। আর সেই যুবতী নিজ-হাতে তাঁর গলায় কণ্ঠী পরালে, আর তাঁর নাকে রসকলি-ভজন ক'রে দিলে। গুম্ফ-শ্মশ্রু-হীন নীললোহিতের মুখাকৃতি ছিল একেবারে মেয়ের মত। সুতরাং তাঁর এ ছদ্মবেশ আর কেউ ধরতে পারলে না। তার পরে তারা দু-সখীতে দুটি খঞ্জনি নিয়ে, "জয় রাধে" ব'লে বেরিয়ে পড়ল। তার পর পায়ে হেঁটে ভিক্ষে করতে করতে বৃন্দাবন গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তার পর কিছুদিন মেয়ে সেজে বৃন্দাবনে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার পর—পুলিশের গোলমাল যখন থেমে গেল, তখন তিনি আবার দেশে ফিরে এলেন। আর তাঁর সেই পথে বিবর্জ্জিতা বোষ্টমী, মনের দুঃখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাগনাপাড়ায় চ'লে গেল, কোনও দাড়িওয়ালা বোষ্টমের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করতে।

নীললোহিতের এই রোমান্টিক ডাকাতির গল্প মুখে মুখে এত প্রচার হয়ে পড়ল যে, শেষটা পুলিশের কানে গিয়ে পৌছল। ফলে নীললোহিত ডাকাতির চার্জ্জে গ্রেপ্তার হলেন। এ আসামীকে নিয়ে পুলিশ পড়ল মহা ফাঁফরে। নীললোহিতের মুখের কথা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতির আর কোনই প্রমাণ ছিল না। পুলিশ তদন্ত ক'রে দেখলে যে, যে-গ্রামে নীল-লোহিত ডাকাতি করেছেন, উত্তরবঙ্গে সে নামের কোন গ্রামই নেই। যে সা-মহাজনের বাড়ীতে তিনি ডাকাতি করেছেন,—উত্তর-বঙ্গে সে নামের কোনও সা-মহাজন নেই। যে দিনে তিনি ডাকাতি করেছেন,—সে দিন বাঙলা দেশে কোথাও কোন ডাকাতি হয় নি। তার পর এও প্রমাণ হ'ল যে, নীললোহিত জীবনে কখনো কল্‌কাতা সহরের বাইরে যান নি, এমন কি, হাবড়াতেও নয়। বিধবার এক-মাত্র সন্তান ব'লে নীললোহিতের মা নীললোহিতকে গঙ্গা-পার হতে দেন নি, পাছে ছেলে ডুবে মরে, এই ভয়ে। অপর পক্ষে নীললোহিতের বিপক্ষে অনেক সন্দেহের কারণ ছিল। প্রথমতঃ তাঁর নাম। যার নাম এমন বেয়াড়া, তার চরিত্রও নিশ্চয় বেয়াড়া। তার পর, লোহিত রক্তের রঙ—অতএব, ও-নামের লোকের খুন-জখমের প্রতি টান থাকা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ তিনি একে কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান—তার উপর তাঁর ঘরে খাবার আছে—অথচ তিনি বিয়ে করেন নি, যদিচ তাঁর বয়েস বাইশ তেইশ হবে। তৃতীয়তঃ—তিনি বি-এ পাশ করেছেন অথচ কোনও কায করেন না। চতুর্থতঃ—তিনি রাত একটা দুটোর আগে কখনো বাড়ী ফেরেন না,—যদিচ তাঁর চরিত্রে কোনও দোষ নেই। মদ ত দূরে থাক, পুলিশ-তদন্তে জানা গেল যে, তিনি পান-তামাক পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না; আর নিজের মা-মাসী ছাড়া তিনি জীবনে আর কোনও স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়ান নি।

এ অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই interned হতেন, যদি না আমরা পাঁচ জনে গিয়ে বড় সাহেবদের ব'লে-কয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতুম। আমরা সকলে যখন একবাক্যে সাক্ষী দিলুম যে, নীললোহিতের তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই—আর সেই সঙ্গে তাঁর গল্পের দু'-একটি নমুনা তাঁদের শোনালুম, তখন তাঁরা নীললোহিতকে অব্যাহতি দিলেন এই ব'লে,—যে, "যাও, আর মিথ্যে কথা বলো না।" যদিচ কাইজারের সঙ্গে নীললোহিতের বন্ধুত্বের গল্প শুনে তাঁদের মনে একটু খট্‌কা লেগেছিল। এর পর থেকে নীল-লোহিত আর মিথ্যা গল্প করেন না। ফলে গল্পও করেন না। কেন না, তাঁর জীবনে এমন কোনও সত্য ঘটনা ঘটে নি, ঐ এক গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়া—যার বিষয় কিছু

বল্‌বার আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে।

আসল কথা কি জানেন, তিনি মিথ্যে কথা বল্‌তেন না, কেন না, ও সব কথা বলায় তাঁর কোনরূপ স্বার্থ ছিল না। ধন-মান-পদ-মর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি বাস কর্‌তেন কল্পনার জগতে। তাই নীললোহিত যা বল্‌তেন—সে সবই হচ্ছে, কল্পলোকের সত্য কথা। তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ সবই ছিল ঐ কল্পনার রাজ্যে অবাধে বিচরণ করায়। সুতরাং সেই কল্পলোক থেকে টেনে তাঁকে যখন মাটীর পৃথিবীতে নামান হ'ল, তখন যে তাঁর সুধু প্রতিভা নষ্ট হ'ল, তাই নয়; তাঁর জীবনও মাটী হ'ল।—দিনের পর দিন তাঁর অবনতি হ'তে লাগল।

গল্প বলা বন্ধ করবার পর, তিনি প্রথম বিবাহ কর্‌লেন, তার পর চাকরি নিলেন। তার পর তাঁর বছর বছর ছেলে-মেয়ে হ'তে লাগল। তার পর তিনি বেজায় মোটা হ'য়ে পড়লেন, তাঁর সেই মুখর চোখ, মাংসের ভিতর ডুবে গেল। এখন তিনি পুরোপুরি কেরাণীর জীবন যাপন করছেন—যেমন হাজার হাজার লোক ক'রে থাকে। লোকে বলে যে, তিনি সত্যবাদী হয়েছেন—কিন্তু আমার মতে তিনি মিথ্যার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। তাঁর স্বধর্ম্ম হারিয়ে,যে জীবন তাঁর আত্মজীবন নয়,অতএব তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা জীবন—সেই জীবনে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা এই ভেবেই খুসি যে, তিনি এত দিনে—মানুষ হয়েছেন, কিন্তু ঘটনা কি হয়েছে জানেন? নীললোহিতের ভিতর যে মানুষ ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে,—যা টিঁকে রয়েছে, তা হচ্ছে সংসারের ঘানি ঘোরাবার একটা রক্তমাংসের যন্ত্র-মাত্র।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ভদ্রাসন।

সোজা-সড়ক গড়্‌বি তোরা
ভিটের দখল নিয়ে,
সাত-পুরুষের স্মৃতিটুকু
পেঁতলে দু'পা দিয়ে!

আইন দিয়ে, চোখ রাঙিয়ে
অর্থ কিছু দানি,
নিঠুর তোরা গুঁড়িয়ে দিবি
কুঁড়ের প্রদীপখানি!

বুক দিয়ে ঐ আগ্‌লে রাখা
দুখীর বাস্তুখানি,
চখের 'পরে কর্‌বি ধূলা
মাটীর ঢেলা মানি!

বিত্তে খুসী চিত্ত তোদের—
বুঝ্‌বি কেমন ক'রে,
কোঁকিয়ে কাঁদে পরাণ কেন
ভিটে-মাটীর তরে!

কি অভাবে বস্‌তে শুতে
বুকভরা খাদ পড়ে,
বাপের ভিটে কি যে মিঠে
জানবি কেমন ক'রে!

জন্মেছিলেন বাপ দাদারা—
যে মেঝেটির 'পরে,
হামা দিতেন বুক ঠেকিয়ে
যে মাটীকে ধ'রে,

যে মাটীতে প্রথম হেঁটে—
ক্লান্ত হয়ে নুয়ে,
দিগম্বর অঙ্গে তাঁরা—
পড়েছিলেন শুয়ে,

যে মাটীতে মা ঠাকুমা
ক'রে গেছেন ঘর,
ব্রত পূজার শুদ্ধ শুচি
যাহার প্রতি স্তর—

সে যে মোদের স্বর্গ সেরা
তীর্থ-ভূমি আজ,
সে মাটীতে নিঠুর ওরে—
হানিস্ নেক বাজ!

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়

নর্তক।

ত্যাগী।

(MAURICE SEVEL-এর ফরাসী হইতে)

বছর ত্রিশেক বয়স পর্য্যন্ত বরাট মহাশয় তত্ত্বজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ এবং আত্মার গতিমুক্তি সম্বন্ধে যে চিন্তা করা উচিত,সে বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু কতকগুলি ঘটনায় তাঁর এই ঔদাসীন্য ঘুচে যাবার উপক্রম হ'ল। প্রথমতঃ—একটি আকস্মিক বিপদ্ থেকে তিনি দৈব-যোগে রক্ষা পান; দ্বিতীয়তঃ—যে হোটেলের ঘরে এক রাত কাটিয়েছিলেন, সেথানে কোন আগন্তুক দ্বারা পরিত্যক্ত একটি ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি পাঠ করেন; তৃতীয়তঃ—তাঁর এক ঘোর নাস্তিক বন্ধুর অকালে মৃত্যু হয়। এখন নিজের অতীত জীবনের অসারতা ও আমোদ-প্রমোদের পঙ্কিলতা স্মরণ ক'রে তাঁকে পরকালের বিচারসভায় না জানি কত বড় পাপের ফর্দ্দের জবাবদিহি করতে হবে, এই ভেবে তাঁর আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল।

বরাট-গিন্নীর কাছে তাঁর স্বামী এই সব দুশ্চিন্তার কথা খুলে বলাতে তিনি তাঁকে কতকগুলি ধর্ম্মসাধনের পথ বাৎলালেন;—যথা বেশী ক'রে উপাসনায় যোগদান, এমন কি, নিভৃত চিন্তা বা তীর্থযাত্রা; কর্ত্তাও তাঁর এই ব্যবস্থায় সায় দিলেন। কিন্তু এই ব্রত-নিয়মের ফলে তাঁর শান্তি-লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃই আপনার জীবনের পাপের ভারে ও নিত্যবর্দ্ধিত দুষ্কৃতির চাপে তিনি ভেঙ্গে পড়তে লাগলেন।

তাঁর কথা শুনলে মনে হ'ত যে, তাঁর মত এমন পাষণ্ড নরাধম আর জগতে নেই; নরকের সমস্ত অন্ধকারে যেন তাঁর অন্তরাত্মা ছেয়ে ফেলতে লাগল।

হাহাকার ক'রে তিনি ব'লে উঠলেন:—"এমন কি প্রায়শ্চিত্ত আছে, যা' করলে আমার এই রাশীকৃত মনের ময়লা ধুয়ে যাবে?"

বরাট-গিন্নী তাঁকে স্তোক দিয়ে বললেন যে, তিনি স্বকৃত পাপের বোঝা বড় বেশী ভারি মনে করছেন এবং অধিকাংশ মানুষে যে সব দোষ ক'রে থাকে, তার তুলনায় সেগুলি আসলে কম বই বেশী গর্হিত নয়।

কিন্তু এ কথায় তাঁর প্রত্যয় হ'ল না; বরং এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হ'ল যে, মোক্ষলাভের জন্য উত্তরোত্তর কঠিন তপশ্চরণ তাঁর না করলেই নয়। তাই সুযোগ বুঝে তিনি চাতুর্ম্মাস্যের শেষভাগে প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্ত করলেন। তার পর গরীবের হিতার্থে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি যা' কিছু ছিল,—মায় মিহী সুতার কামিজ ও ভাল ছাঁটের কোট শুদ্ধ বিক্রী ক'রে, নিজের জন্য কেবলমাত্র একটি দড়ির খাটিয়া ও কাঠের টুল এবং পরণের এক প্রস্থ খাকীর পোষাক আর এক যোড়া কাঠের জুতা রাখলেন। এইরূপে তিনি নিজ গৃহে থেকে এবং সহরের প্রলোভনের মধ্যে বাস ক'রেও বনবাসী সাধু-সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে লাগলেন। নিজের প্রতি এমন নির্ম্মম হলেও পরের উপর তাঁর যথেষ্ট দরদ ছিল। সুতরাং তাঁর স্ত্রী ও বারো বছরের ছেলেকেও যে তাঁর পন্থা অনুসরণ করতে হবে, এরূপ আদেশ তিনি দিলেন না।

তাঁর দৈনিক জীবনযাত্রা শীঘ্রই এইভাবে নিয়মিত হ'ল:—

সূর্য্যাস্তে শয়ন, প্রত্যূষের পূর্ব্বেই উত্থান, আহারের সময়-টুকু ভিন্ন সমস্তক্ষণ অবিরাম পূজা,—সে আহারের পরিমাণও নিতান্ত আবশ্যকীয়ের বেশী নয় এবং যে সময়ে কারও সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, সেই সময়ে বাগানে এক চক্র ঘুরে আসা। কারণ, বদ্ধ হাওয়ায় থাকলে শরীর ক্ষয় হয়। এই-রূপ স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিধান; এবং জীব নিজের মৃত্যুকাল এগিয়ে আনতে পারে না, এইরূপ ঈশ্বরের আদেশ। এ অবস্থায় যে ভাবে তিনি দিন কাটাতেন,—আগুন নেই, আলো নেই, চাবুকের ঘায়ে ও চটের কাপড়ের ঘর্ষণে অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত,—সে এ যুগের মানুষের জীবনযাত্রা নয়।

তাঁর পরিজনবর্গ ভাবলেন যে, এই বাঁধাবাঁধি নিয়মপালনে তিনি অচিরেই বিরক্তিবোধ করবেন। কিন্তু উল্টে তিনি প্রফুল্লচিত্তে নতুন নতুন শরীরশোষণের উপায় উদ্ভাবন এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-গ্রীষ্ম সম্বন্ধে অধিকতর ক্লেশসহনে প্রবৃত্ত হলেন। কখনো কখনো ক্লান্ত শরীরে ও ব্যাকুল অন্তরে তিনি

আকাশের দিকে হাতযোড় ক'রে বল্‌তেন, "হে ভগবান্! আমি কি ভবযন্ত্রণার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি, না এখনো আরো বাড়াতে পারা যায় ?"

যখন তিনি স্থিরনিশ্চয় কর্‌লেন যে, শরীর-পীড়নের মাত্রা আর বৃদ্ধি করা অসম্ভব; শুধু তখন একটুখানি বিরামের অবসর তাঁর হ'ল ;—এক শরীরপাত করা বাকি ছিল, তারও সুযোগ ঘট্‌লে তিনি স্বচ্ছন্দে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

সংসারের সঙ্গে একটিমাত্র চরম বন্ধন তাঁর অবশিষ্ট ছিল :—এক দাসী তাঁর খাবার এনে দিত—তাই দেখা এবং দেওয়ালের ওপাশ থেকে তাঁর স্ত্রী কিংবা ছেলে জিজ্ঞাসা করত, তাঁর কিছু চাই কি না—তাই শোনা। এই যোগসূত্রটিও ছিন্ন ক'রে দিয়ে তিনি হুকুম দিলেন যে, তাঁর খাবার দরজার কাছে রেখে দিয়ে যাবে, আর তাঁর কি চাই না চাই, সে কথা কেউ জিজ্ঞাসা করতে আস্‌বে না। যত কিছু ত্যাগস্বীকার তিনি এ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় করেছিলেন, তার মধ্যে এই শেষোক্তটিই বোধ হয় তাঁকে সব চেয়ে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছিল। তা হ'লেও তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে সেটি বহন কর্‌লেন।

এই নির্জ্জনবাসে পনেরো বৎসর কেটে গেল। নানারূপ কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে এ সময়ে তাঁর শরীর এমন কাহিল হয়ে পড়ল যে, বাগানে নেমে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। গির্জ্জার ঘণ্টা এখন কেবল সুদূর গুঞ্জনের মত তাঁর কানে এসে পৌঁছোয়। চোখের সামনে একটা পর্দ্দা নেমে সূর্য্যের আলোর তেজ কমিয়ে দেয়, পেটে আর খাবার সয় না; দিনমান ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে থেকে কাটিয়ে দিতেন। মনটাই কেবল তাঁর সজাগ ছিল। শুয়ে শুয়ে হিসেব কর্‌তেন, কোন্ কোন্ শাস্তি নিজেকে দিয়েছেন, কি কি দুঃখ ভোগ করেছেন। সে তালিকা তাঁর কাছে অতি ভয়ঙ্কর মনে হ'ত,—এমন সুন্দর নৈবেদ্য বুঝি আর কোন লোক ভগবান্‌কে দিতে পার্‌বে না।

তাঁর নিস্তব্ধতায় ভীত হয়ে এই সময় তাঁর ছেলে নিষেধ সত্ত্বেও ঘরে প্রবেশ কর্‌লে। কিন্তু তিনি রাগ না ক'রে শান্ত ভাবে মুমূর্ষুর কণ্ঠে তাকে বল্লেন :—

"আমার সময় হয়েছে, ভগবান্ আমাকে ডেকেছেন। আমি তাঁর ন্যায় বিধানে বিশ্বাস ক'রে নির্ভয়ে তাঁর বিচারাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। কারণ, আমি মোক্ষলাভের জন্য কষ্ট স্বীকার করেছি। বৎস, তোমার মত যে অন্ধ ব্যক্তি সংসারের অলীক সুখ ভিন্ন আর কিছুর আস্বাদ পায় নি, তাকে আমি অতি কৃপাপাত্র দীন মনে করি।"

"হা পিতঃ! সাংসারিক সুখের কথা বল্‌ছেন আপনি ?—যে পরিশ্রমের দরুণ এই বয়েসেই আমার মাথায় পাকা চুল দেখা দিয়েছে, সে শ্রমকে কি আপনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন ?—আপনি কি মনে করেন, এটা কিছুই নয় যে, আমার এতই রাত জাগতে হয়েছে যে, ঘুমের অভ্যাসই চ'লে গিয়েছে; যে আমার এক ছেলে মারা গেছে। আর এক ছেলের শরীর এত দুর্ব্বল যে, তাকে মানুষ ক'রে তুল্‌তে পারব কি না সন্দেহ ; যে এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি সত্ত্বেও আমাকে দেউলে হ'তে হয়েছে ; যে আমার চোখের সাম্‌নে স্ত্রী মরেছে'—যে আমার—"

"থামো, থামো"—মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে বরাট মহাশয় কেঁদে উঠে বল্লেন—"আর বল না। তোমার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে যে, হয় ত সংসারের দুঃখকষ্টের হাত এড়িয়ে আমিই সুখে দিন কাটিয়েছি এবং দৈনিক দুঃখের ভার শিরোধার্য্য ক'রে তুমিই যথার্থ ত্যাগীর জীবন যাপন করেছ!"

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

অভিনয়

পূজার বাজারে হরিষে বিষাদ।

(সকল ভূমিকায় প্রফেসর তারকনাথ বাগচী)

প্রথম দৃশ্য।

রবিবার—প্রাতঃকাল। হরিশ সংবাদপত্র পাঠ করিতে-ছিলেন। সংবাদপত্র পাঠেও বিশেষ মনঃসংযোগ হইতেছিল না—কেন না, আজ তিন সপ্তাহ হইল, বাটী হইতে স্ত্রীর কোন পত্র পান নাই। বেতন পাইবার সময় হইয়াছে—হাতে টাকা নাই—বেতন না পাইলে বাটী যাওয়া'রও সুবিধা নাই। শেষবার যখন বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসেন, যুবতী গৃহিণী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিল—এবার বাড়ী আসিবার সময় যেন অতি-অবশ্য তাঁর জন্য একটি হীরার নাকছাবি আনেন। হীরার একটি নাকছাবির মূল্য অন্তত পঞ্চাশ টাকা—তাও কি আশী টাকা বেতনের কেরাণীর পক্ষে কম। হরিশ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ডাকপিয়ন আসিয়া পত্র দিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।
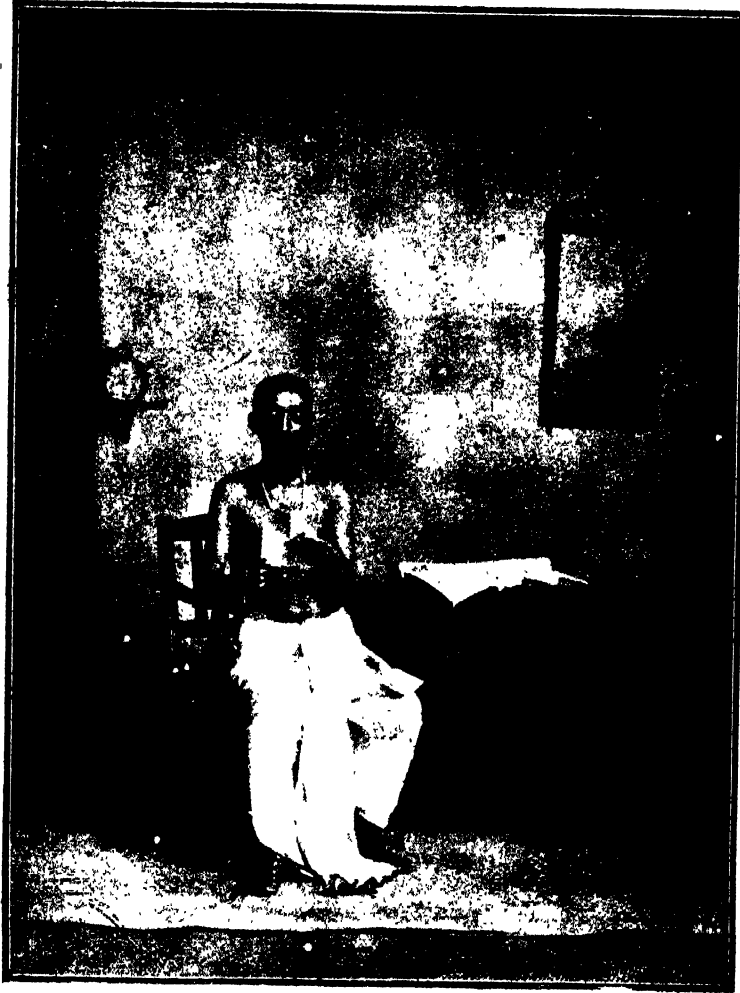
হরিশ তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন হরিশের পত্নী তেমন লেখাপড়া জানিতেন না—কষ্টে-সৃষ্টে ভুল-ভ্রান্তিতে কোন রকমে পত্র লিখিতে পারিতেন। পত্রের ভাষা ও লিখনভঙ্গী এইরূপ—যথা:—প্রাণকান্ত, তোমার পত্র না পেয়ে আমি অত্যন্ত চিন্থিত আছি—আমাকে একলা রাখিয়া—একলা বই কি – সাসুড়ির চোখের দৃষ্টি নাই—তার সেবা করতে করতে আমার প্রাণান্থ! তার উপর তুমি দিন দিন আমার প্রিতি নিদয় হতেছ—তুমি যদি এই রবিবারে বাড়ী না আসো, তবে আমি সোংসারের মায়া ত্যেগ করিয়া গলায় দড়ী দিয়ে এ পরাণ সংহার করিব। বাড়ী আসিবার সময় হাবড়ার প্রসিদ্ধ জুয়েলার কিষণলাল মতি-লালের নিকট থেকে, একটি হীরের নাকছাবি আনিতে ভুলিবে না।—ভুলিলে আমিও তোমাকে ভুলিব ইত্যাদি ইত্যাদি—

এরূপ পত্র পাওয়ার পর হরিশের মত ব্যস্তবাগীশ লোক সুস্থির থাকিতে পারে না। যেমন করিয়াই হোক্ হীরার নাকছাবি ও অন্যান্য কিছু জিনিসপত্র লইয়া আজই বাড়ী যাইতে হইবে। হরিশের সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

হরিশ। এই ঝাঁকামুটে—হাবড়া ষ্টেশন যেতে পারবি?

মুটে। (খইনি তৈরী করিতে করিতে) ক্যা বাবু?

হরিশ। আরে তোম কানমে শোন্‌তা পার্‌তা নেই—হাবড়া ইষ্টিশন যেতে পারতা হায়।

মুটে। কাহে নেই পারেগা?

হরিশ। ক' পয়সা লেগা?

মুটে। চার আনা লাগেগা বাবু—এতনা ভারি মোট।

হরিশ। আরে কি বল্‌তা হায়—দু' পয়সা—দু' পয়সা।

মুটে। নেহি বাবু—দু' পয়সামে হাম লোক পাথুরিয়াঘাটা যাতা—

হরিশ। দু' আনা দেগা—ওঠ—ওঠ—তিনটের ট্রেণ।

মুটে। অবি তো দো বাজা বাবু—

হরিশ। আরে শিগ্‌গির শিগ্‌গির জানে হোগা—নইলে ট্রেণ ফেল হোগা।

মুটে। নেহি বাবু বিশ মিনিটকা বিছমে পৌছায় দেগা—চার আনা লাগেগা।

হরিশ। নেই—নেই—দু' আনা দেগা।

মুটে। ভাগো বাবু—দো আনামে কোন্ যাগা!

হরিশ। আচ্ছা—আচ্ছা—দশ পয়সা দেগা। উঠোও

মুটে। তিন আনাকো কম্‌তিমে নেহি যায়েগা।

হরিশ। (স্বগত) ভাল বিপদ—আর তো মুটেও দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—এ দিকে আড়াইটে বাজে। আচ্ছা—আচ্ছা—তাই দেবো—ওঠ—ওঠ—

মুটে। ঠাহ্‌রো বাবু—এত্‌না ঘাবড়াতা কাহে—টেইনকা আবি বহুত দের্ হায়—খেইনি খাই লেই—তব যাগা—

হরিশ। ব্যাটা ফ্যাসাদে ফেল্‌লে দেখ্‌চি—ওরে বাবা—তোর সাত গুষ্টির—দূর হোক্—বাবা, দয়া করকে চটপট উঠো—নেইতো টেরেন ফেল হোগা—

মুটে। (স্বগত) এ বাবু পাগ্‌লা হায়। (প্রকাশ্যে) চলো বাবু চলো।

চতুর্থ দৃশ্য।

হরিশ। (রাস্তার কতক দূর আসিয়া) বাবা, হুঁসিয়ার হয়ে আমারা পিঠ পিঠ আও—দৌড় দৌড় আও—নইলে টেরেন ফেল হোগা, তা তোম জানতে পারতা নেই—বচ্ছপকা মাফিক ধীরে ধীরে চলতা কাহে?

মুটে। বাবু, হামারা পায়ের মে দরদ হায়—হাম ঠিক পৌছায় দেগা—ডর ক্যা—টেরেন ঠিক মিল যাগা।

হরিশ। আরে তোম বেকুব হায়—বাবার ঘরকা টেরেন নেহি হায়—কোম্পানী কো—বুঝতে পারতা হায়?

মুটে। হামি খুব বুঝতে পারে—চলো বাবু চলো—

প্রথম দৃশ্য।
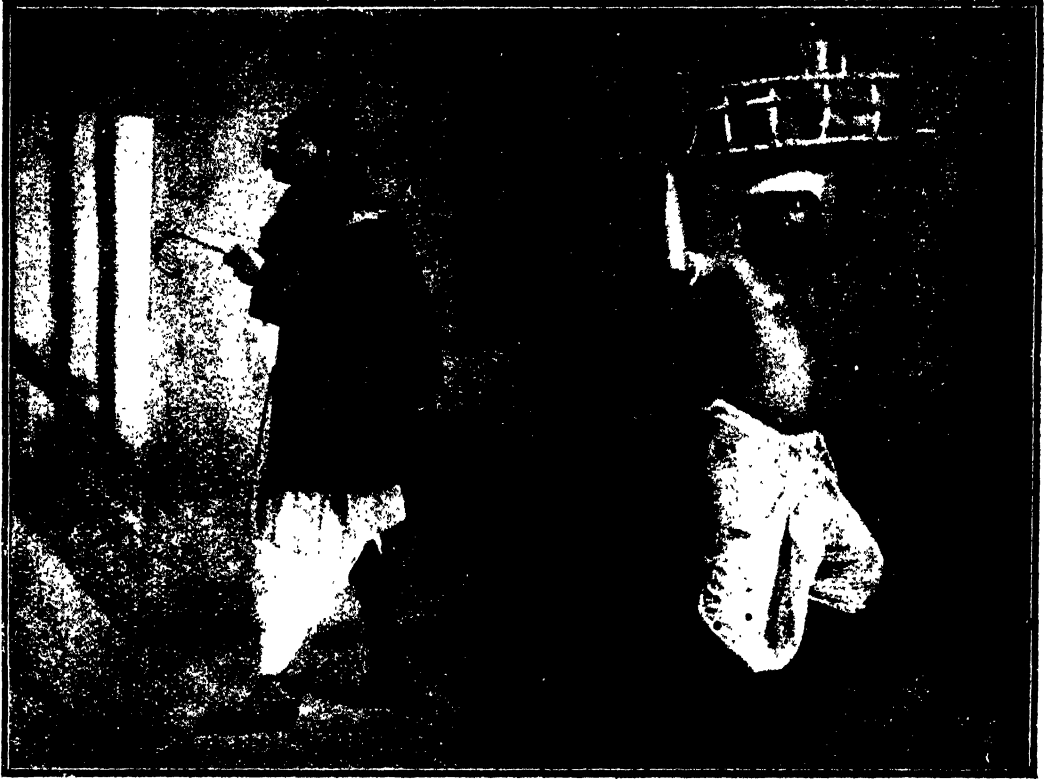
হরিশ ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিলেন। কারণ, একখানি বই ট্রেণ নাই—ট্রেণখানি 'মিস্' করিলে আর আজ তাঁহার যাওয়া হইবে না। মুটে—জুয়াচোর। বাবুর ভাবগতিক দেখিয়া সে ব্যাগ লইয়া চম্পট দিল।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হরিশ ট্রেণের ভাবনায় নিতান্ত অভিভূত, সুতরাং তাঁহার মুটের কথা মনেই নাই। হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—মুটে তাঁর ব্যাগ (যাতে তাঁর সর্ব্বস্ব আছে) লইয়া পলাইয়াছে। হরিশ তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। হায়! তাঁর কি সর্ব্বনাশ হইল!!
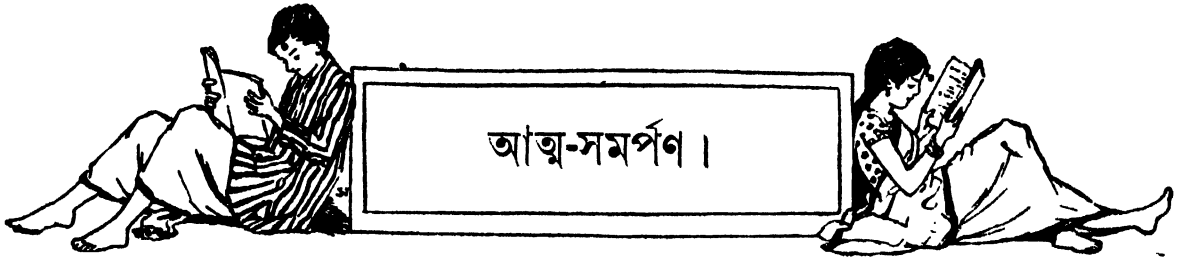
আত্ম-সমর্পণ।

আধুনিক শিক্ষায় যে কোন সুফল ফলে নি, এ কথা বল্‌তে আমি সাহস করি না; কিন্তু তদ্বিপরীত ফল যে অনেক ফলেছে, একবার ভাল ক'রে চক্ষু মেলে দেখলে বেশ বুঝা যায়। প্রধান দোষ হ'য়েছে এই যে, আমরা একেবারে আমাদের 'আমি'কে হারিয়ে ফেলেছি। সাধনার উচ্চাবস্থায় ভগবৎ-কৃপালাভে মানব যে 'আমি'কে ডুবিয়ে দিয়ে 'তত্ত্বমসি' ব'লে ব্রহ্মানন্দে লীন হয়, সে 'আমি'টা হারান দূরে থাক্, বরং খুব মস্ত হয়ে, বুক ফুলিয়ে, ভূতের মত আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। হারিয়েছি সেই আমি,—যে আমি আমাকে একটা মানুষ ব'লে চিনিয়ে দেয়, যে আমি আমার একটা শক্তি আছে ব'লে জাগিয়ে দেয়, যে আমি আমার আপনার জনকে ভালবাসতে, আপনার জনের ভাল করতে, আপনার জনের সঙ্গে একপাতে ভাত মেখে ভাগ ক'রে খেতে প্রবৃত্তি দেয়।

জাতি হিসাবে আমরা বেশ প্রাচীন। বার্দ্ধক্যে দেহ মন দুই-ই একটু অশক্ত হয়, প্রাণের ভিতর একটু পরনির্ভরতা প্রবেশ করে; সুতরাং ইংরাজ যখন এ দেশে এসে প্রথমেই আমাদের বল্লেন যে, "আমরা তোমাদের ভাল ক'ত্তে এসেছি" তখন আমরা একেবারে আহ্লাদে গলে গেলাম; ভাবলেম, আর ভাবনা কি, এইবারে আমাদের জোয়ান রোজগেরে বেটা এয়েছে; বুড়ো বয়সে একটু জিরিয়ে নিই, বাবাজীই আমাদের দেখবেন—শুন্‌বেন—সব কর্‌বেন।

আমাদের সেই পরম মঙ্গলার্থী সাহেবের রূপ দর্শন কল্লেম, দর্শনে ধন্য হলেম! দেবর্ষি নারদের সঙ্গে সে রূপের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে,—সেই কর্পূরোজ্জ্বল শুভ্র-কান্তি, সেই পিঙ্গলকুন্তলজাল, সেই পাটল নয়ন, আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রুরাজিও পিঙ্গলবর্ণ, সেই ঋষিবরের ন্যায়-ই ঢেঁকি-পরিমাণ বুদ্ধি-বাহনে বিরাজিত। আবার শক্তিরূপিণী শ্যামামায়ের প্রতিমার আভাসও সেই মূর্ত্তিতে প্রকাশ দেখিলাম। বাবাজী যদিও চতুর্ভুজ ন'ন, তথাপি দ্বিভুজে বরাভয়; দক্ষিণ হস্তে একখানি ধর্ম্মপুস্তক বরস্বরূপ বিরাজিত, বামহস্তে একটি 'ষ্টেথেসকোপ' অভয় প্রদান কর্‌ছে, অসি কটিদেশে পশ্চাদ্দিকে লম্বমান আর বগলে একযোড়া দাঁড়ী-পাল্লা।

বাবাজী।—তোমরা পুতুল পূজো কর?

আমরা।—করি-ই ত।

বাবাজী।—আর কোরো না।

আমরা।—আপনারা ড্রেণ তৈরী করুন, আমরা তাতেই শালগ্রাম ফেলে দেই।

বাবাজী।—তোমরা সত্য-ধর্ম্ম জান না, ঈশ্বর চেন না।

আমরা।—কিছুই চিনি নি বাবা, কিছুই চিনি নি—কেবল তোমায় চিনি, তুমি যে রূপে-ই দোবরা কাশীর চিনি বাবা!

বাবাজী।—তোমরা মুরগী খাও না—স্বর্গে যেতে পাবে না।

আমরা।—অঋণী অপ্রবাসী বাবা, কোথাও যেতে চাই নি, তোমরা দোকান খোল, ঠ্যাং চুষতে চুষতে-ই আমরা এখানে-ই স্বর্গ পাব।

বাবাজী।—তোমাদের বিদ্যা শিক্ষা মোটেই হয়নি।

আমরা।—হয়নি-ই ত বাবা! বেড়ালকে বেড়াল বলি, কুকুরকে কুকুর বলি, ও কি আর বিদ্যে! তোমাদের 'ক্যাট' 'ডগ্' আমাদের পেটে পূরে দাও বাবা!

বাবাজী।—তোমাদের রোগ হ'লে চিকিৎসা হয় না।

আমরা।—ঐ বস্তি দেখাই বাবা।

বাবাজী।—তোমরা সংস্কৃতও জান না। আমরা সংস্কৃতের নতুন ব্যাকরণ তৈরী করেছি—

আমরা।—(সাশ্চর্য্যে) সত্যি বাবা? বা! বা! কি বিদ্যে;—কি বিদ্যে!

বাবাজী।—সেই ব্যাকরণে আছে যে, বেদে শব্দ থেকে বস্তি তৈরী হয়েছে, বেদেরা কি চিকিৎসা কত্তে জানে?

আমরা।—তুমি যখন বল্‌ছ, তখন ত তারা জানে-ই না বাবা।

বাবাজী।—তোমাদের যে লিভার আছে, স্প্লীন আছে, লাংস আছে, হার্ট আছে, তারা এ সব কিছু জানে? হাকিম

বদ্যিরা তোমাদের কেবল ফাঁকি দেয়, এদ্দিন তোমাদের মোটেই চিকিৎসা হয় নি।

ভয়ে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে শিউরে উঠল, জিব শুকিয়ে গেল; পরস্পরে মুখ চাওয়া চাওয়ি কত্তে লাগলেম। কেউ পেটের বাঁ-দিকটা টিপি, কেউ টিপি ডান-দিকটা, কেউ বুকে আঙ্গুলের ঠোকর মারি, কেউ বা আপনা আপনি নাড়ী দেখি, কেউ বা গলা খাঁকরানি দিয়ে একটু কেসে নিই; শেষে সকলে মিলে বাবাজীকে বল্লাম,—বাপ আমার! ধন আমার! কোথায় ছিলি এতকাল? এত রোগ আমাদের শরীরে, কিছু জান্‌তাম না রে! তখন সবাই মিলে বাবাজীকে ধরে পড়্‌লুম, বল্ বাপ! আমরা বেঁচে আছি,—না ম'রে গেছি?

বাবাজী।—তোমরা বেঁচে-ও নেই, মর-ও নি; মলে ত ভূত হ'তে।

আমরা।—তা বটে—তা বটে! (পদের দিকে দৃষ্টি করিয়া) কৈ পা ও তো ঠিক সোজা আছে, ভূত ত হয়নি; তবে কি হয়েছি বাবা?

বাবাজী।—অদ্ভুত।

আমরা।—(জনান্তিকে) দেখছ, বাবাজীর মুখ দিয়ে কি সংস্কৃত বেরুচ্ছে! এবার প্রেতপক্ষ পড়লে বাবাজীকে দিয়েই মন্ত্র বলিয়ে তিল-তর্পণ আরম্ভ করব, এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে। পারি তো নিজের শ্রাদ্ধটাও ওঁকে দিয়েই সেরে নেব।

এই সময় বাবাজী একবার আমাদের গোলার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওগুলো কিসের চালা?" আমরা উত্তর করলেম, "ওগুলো গোলা।" বাবাজী ত শুনেই "হাঃ! হাঃ! হাঃ!" ক'রে একেবারে হেসেই খুন। বল্লেন, "ও কি গোলা, গোলা কাকে বলে, তোমাদের দেখাব, একটু ধৈর্য্য ধর! ওগুলোতে কি থাকে?"

আমরা।—ওতে বাবা, ধান থাকে, চাল থাকে, যব, তিসি, সরষে এই সব জমা ক'রে রাখি বাবা।

বাবাজী।—তার পর?

আমরা।—তার পর আর কি বাবা,—খাই, দাই, থিতুই, ওতেই সংসার চলে।

বাবাজী।—সব খাও? অত খেতে পার?

আমরা।—একদিনেই কি খাই বাবা! সময় সময় দু তিন বছরের খোরাক পর্য্যন্ত জমা থাকে।

বাবাজী।—সর্ব্বনাশ! এই জমিয়ে জমিয়ে নষ্ট কর? ইঁদুরে খায়, চড়ায়ে খায়, পিঁপড়েয় খায়! Economics জান?

আমরা।—(আড়ষ্ট হইলাম)

বাবাজী।—Import, Export?

আমরা।—(চেঁচিয়ে চাহিলাম)

বাবাজী।—Statistics?

আমরা।—(একেবারে হাঁ করিলাম)

বাবাজী।—টাকা চেন?

আমরা।—একটু একটু চিনি বাবা। কড়ি জমিয়ে জমিয়ে পয়সা করি, আবার তাই জমিয়ে টাকা গাঁথাই, গাঁথিয়ে—

বাবাজী।—গাঁথিয়ে কি কর?

আমরা।—কি করি বাবা—কি করি বাবা—এই—এই তা তুমি ঘরের ছেলে, তোমার সাম্‌নে আর বল্‌তে দোষ কি—পুঁতে রাখি বাবা, মাটীর ভেতর পুঁতে রাখি।

বাবাজী।—এ্যাঁ! টাকা পুঁতে রাখ! কেন গাছ বেরুবে?

আমরা।—না বাবা, তা কি বেরোয়, আমরা মলে ঐ ত ছেলেদের নাচ্ চল্‌বে

বাবাজী।—জমাতে হবে না আমিই তোমাদের টাকা দেব।

আমরা তখন ঝেড়-ঝুড়ে উঠে দাঁড়ালেম, পাঁচ কোটি বাহু তখনই হাত পেতে লম্ব হয়ে বেরুল; দুঃখের বিষয়, দশ কোটি বার কর্‌তে পারলেম না, কেন না, সকলকেই দক্ষিণ হস্ত মাত্র বিস্তার ক'রে বাম কনুয়ে ঠেসে পাশের লোককে ঠেলে দিতে হ'চ্ছে। পঞ্চকোটি কণ্ঠ তখন কলকলনাদে টাকাং দেহি,—টাকাং দেহি রবে দিগদিগন্ত ঝঙ্কৃত করে তুলল। বাবাজী তখন নিজ অঙ্গের কোন গোপনীয় স্থান হ'তে একটা তাড়া বার ক'রে উঁচু কোরে দেখিয়ে বল্লেন, "এই দেখ টাকা।"

আমরা।—(সাশ্চর্য্যে) ওকি টাকা—ও যে কাগজ—টাকা যে রূপোর হয়।

বাবাজী।—রূপোর টাকা বর্ব্বরের ব্যবহার্য্য। সভ্য টাকা হচ্ছে—কাগজের টাকা।

আমরা।—একখান কাগজ এক টাকা?

বাবাজী।—একখানা কাগজে এক টাকাও হয়—দশ হাজার টাকাও হয়। যত টাকা লিখে দেব, তত টাকাই হোব।

আমরা।—অ্যাঁ!—এ কি লেখাই লিখতে শিখেছ বাবা! যত টাকা লিখবে, তত টাকা হবে! না বাবা, এখন তোমায়

আমাদের স্বর্গেও পাঠাতে হবে না, চিকিৎসেও কত্তে হবে না, আর নগদ টাকাও দিতে হবে না; এখন তুমি আমাদের ঐ লেখাটা লিখতে শেখাও—যাতে লিখলেই টাকা হয়।

বাবাজী।—তা শেখাতে পারি। কিন্তু শিখবে কখন্? ঐ লাঙ্গল নিয়ে, গোলা নিয়ে, ধানচাল নিয়ে, পড়ে থাকলে এ লেখন লিখতে শিখবে কখন্?

আমরা।—(আম্‌তা আম্‌তা করিয়া) তাই ত—তাই ত —ওগুলো কি করি—

বাবাজী।—ও সব ভুষিমাল আমাদের দাও।

আমরা।—এঁ্যা—এঁ্যা—সে কি বাবা—সে কি বাবা!

বাবাজী।—ধর, ও চাল যদি এখানে বেচ, মণ পিছু কত পাবে?

আমরা।—কতই বা পাব—সবারই ঘরে ধান-চাল আছে —আনা আষ্টেক মণ করা পেলেও পেতে পারি।

বাবাজী। আচ্ছা, আমি যদি দু' দু' টাকা ক'রে মণ দিই?

আমরা।—বুড়ো মানুষ পেয়ে তামাসা করছ বাবা? দু' টাকা ক'রে চালের মণ এ দেশে কেউ কখন শুনেছে বাবা?

বাবাজী।—আমরা কি আর দোকানদারী করছি—তোমাদের যে ভাল করতে এয়েছি—তোমাদের মানুষ ক'রে তোলবার দায়িত্ব যে আমরা গ্রহণ করেছি।

আমরা।—(পরস্পরে) এই দেখেছ—এইটে-ই আমরা বুঝতে পারি নি। বুড়ো হয়েছি—বুদ্ধি-শুদ্ধি ত গিয়েছে। বাবাজী যে আমাদের ভাল করতে এয়েছেন!—ভাল করতে এয়েছেন গো! ভাল কর বাবা!—ভাল কর! বের কর যাচ, তোমার দাঁড়ি-পাল্লা। অ ভগবতি! কোথা গেলি রে! ঢেলে দে, ঢেলে দে—সব ঢেলে দে! ও রাজি! তোর সরষেগুলো কোথা? শ্রীধর! তোর না তুলো জমা আছে? হাঁ বাবা, তুলো নেবে বাবা? বেশ নরম, তোমারই মুখের মতন ধবধবে! নাও বাবা, সব নাও—বেশ মেপে নাও। (সাহ্লাদে বিজ্ঞভাবে) কাগজের টাকা বড় মজার চিজ! এ টাকা বাজিয়ে নিতে হয় না—মেকি হয় না। (বাবাজীর প্রতি) বাবা শ্বেতাঙ্গচন্দর! এ জন্মে ত ছেলে হ'য়ে জন্মেছ—বুড়ো বাপের ভার মাথায় পেতে নিচ্ছ, আর জন্মে কি চৌদ্দপুরুষ ছিলে?

আমাদের মধ্যে একজন।—কি পাগলের মতন ছেলে ছেলে বোচ্ছ? (সাহেবের প্রতি) প্রভু, আপনি অপরাধ নেবেন না, মায়াবশে আপনাকে পুত্রসম্বোধন ক'রে ফেলেছি যশোদা যেমন নন্দদুলালকে ভগবান্ ব'লে চিন্‌তে পারেন নি

যশোদা যেমন নন্দদুলালকে ভগবান্ ব'লে চিন্‌তে পারেন নি, শচীদেবী যেমন নিমাইকে তাঁর দুষ্ট ছেলেই মনে কোত্তেন, পূর্ণব্রহ্ম যে গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ, তা বুঝতে পারেন নি, আমাদেরও সেই দশা ঘটেছে—আমরাও সেইরূপ মোহ-প্রাপ্ত হয়েছি। কালাপাহাড় যখন মন্দির, মূর্ত্তি প্রভৃতি চূর্ণকরণ ও পুরাণ-শাস্ত্রাদি দহনরূপ মহা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, বোধ হয়, সে সময় শ্বেত-পুরাণখানিও দগ্ধ করেছিলেন, সেই জন্য কল্কি অবতারেরও পূর্ব্বে শ্বেত অবতারও অবতীর্ণ হবেন, সেটা এখনকার লোক জানতে পারে নি। প্রভু! যদি অধম জীবের প্রতি এতই দয়া করলেন, তবে একবার আপনার বিরাট-মূর্ত্তিতে আমাদের চর্ম্ম চক্ষুর সম্মুখে দর্শন দিন, আমরা ধন্য হয়ে নির্ব্বাণলাভ করি।

আর একজন।—ভাই রে! কি কথাই শুনালি! দাস্য—সখ্য—বাৎসল্য—মধুর এই কয় ভাবেই অবতারের সেবা; নন্দ-যশোদার ছিল বাৎসল্য ভাব, আমাদের রং ময়লা হলেও ময়লা নই যে, আপনার প্রতি ঐ বোকাটে ভাব প্রাণে পোষণ করব। রামাবতারে শ্রীহনুমান দাস্যভাবে সেবা ক'রে অমর হয়েছেন, মুখ পুড়ে কাল হ'ল, তবু দাস্যভাব ছাড়লেন না, আহা হা! দাস কখন মরে না, প্রভু! আপনি অবতার, বিরাটরূপ দেখান।

সাহেব তখন একটু মধুর হাস্য করিলেন; বলিলেন,—আমায় চিন্‌তে কি পেরেছ? গভীরনাদে এককলি গানও গাহিয়া ফেলিলেন,—

আমায় কে পারে চিন্‌তে ভ্রান্ত রে ভারত, করো না ও চিন্তে।
চাল বেচো সরষে বেচো বেচো পাট তুলো,
ঢেঁকি পোড়াও চরকা পোড়াও পুড়িয়ে ফেল কুলো,
কাচের চুড়ি কিন্‌তে কিন্‌তে কর অন্ন-চিন্তে।

আমরা। হা রে অভাগা রামপ্রসাদ! এ আধ্যাত্মিক ভাব তুইও পাস্ নি!

বিরাটরূপ দেখবার জন্যে আবার আকুল ক্রন্দনরোল উত্থিত হোল, অবতার সকলকে চক্ষু মুদ্রিত করতে আদেশ করলেন।

দিব্যচক্ষুতে কি দেখলাম, আ মরি মরি! যশোমত দেখেছিলেন কৃষ্ণাঙ্গে নদ নদী-গিরি, বন, কত সূর্য্য, কত চন্দ্র-শোভিত ত্রিভুবন, আর আমরা দেখলেম সর্ব্বগুণাধার অবতারের শ্বেতাঙ্গে কি অপরূপ রঙ্গ-লীলা! বিরাটরূপ বিভূষিত, ক'রে বিন্ধ্যগিরিনিন্দাকারী চিমনির [illegible]

রসে ভাসমান; সুনীল তরঙ্গাকুল সাগর-বক্ষে কত শত অর্ণবযান, তাঁরা জাঁতা নে যান, ছাতা দে যান; তুলো নে যান, কাপড় দে যান; তাঁরা করেন পাটের ব্যাপার, আনেন্ রাঙ্গা র্যাপার; নিয়ে যান মাল বাছের বাছ, এনে যুগিয়ে দেন বেলোয়ারি কাচ। আবার দেখলেম—ভুজযুগলে রেল-পাতা, তাতে মাড়োয়ারি লোক মুল্লুক যাতা, রেলীর গুদাম সঙ্গে লেতা, ভাই-বহিনকো পিঁয়ে দেতা, মনে কর্তা মুনাফা হোতা। আবার তাতেই চড়ে পৈন্সেপাই, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে করেন কোপাই। দেখলাম আবার শুভ্রবক্ষে, কত গিল্টী করা ভলম্ রক্ষে, যেমন প্রতিপত্রে ছত্রে ছত্রে চৈতন্য চরিতা-মৃতে মধু ক্ষরে, তেমনই সেই সব বইয়ের প্রতি অক্ষরে নিজে-দের নিজের স্বাক্ষরে, বলে আমাদের ওরে মূর্খ রে, দি পেতে চাস্ ভোজনের ভোক্ষ্য রে, লজ্জার হাতে রক্ষা রে, শুয়ে পড়বার কক্ষ রে, সেবায় হতে দক্ষ রে, টেক্স দিতে অধ্যক্ষরে, পরকালে মোক্ষ রে, তবে—

ভজ ভজ ভজ ভজ রে মন ভজ শ্বেতাঙ্গে।
হ্যাট্-কোট-বুট-ভূষিত চুরুট-বদন কুকুর সঙ্গে॥

ভাবে তখন আমরা অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম, গীতের অন্তরাটা অন্তরে প্রবেশ করিল না। মোহ কাটিলে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, অবতার তখনও আমাদের এই পাপ অঙ্গে শান্তি-জল সিঞ্চন করিতেছেন। বামহস্তে লম্বগ্রীব স্ফাটিক পাত্র, তীব্র-সৌরভে দশদিক্ আমোদিত। আমাদিগের মধ্যে যাঁরা গোঁড়া-ভক্ত, তাঁহারা জানু পাতিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চরণামৃত ভিক্ষা করিলেন। দেবতা সন্তুষ্ট, সুতরাং বঞ্চিতও হইলেন না।

জীবনে চরণামৃত অনেক পান করিয়াছি, নারায়ণের চরণা-মৃত, কালীঘাটের, তারকনাথের, সত্যনারায়ণের, পিতামাতার, কিন্তু চরণামৃতের এমন সদ্য-প্রদায়ী আশ্চর্য্য দৈবফল কখনও দেখি নি।

চরণামৃত পান করিবামাত্রই সকলের ভাব লাগিল; কেউ গায়, কেউ নাচে, নাচ্তে নাচ্তে কেউ আছাড় খেয়ে পড়ে, কেউ কারোর ঘাড়ে চড়ে! তার পর ড্যাম্ ডোম্ বঁটীর বাঁট, গড়ের মাঠ, এই রকম কটাকট্ কি সব বলতে লাগলো; আমাদের নিজের লোক কেউ ভাই, কেউ দাদা, কেউ খুড়ো, কেউ পিসে,—সবই নিজেদের লোক, অথচ তাদেরই ভাষা বুঝতে আমরা দিশেহারা হ'য়ে গেলুম। গোঁড়া-ভক্তরা তো "আরও চরণামৃত দাও!—আরও চরণামৃত দাও!" ব'লে চীৎকার আরম্ভ কর্লে। অবতার বল্লেন, "এখন আর ত চরণামৃত নাই, এই দেখ বোতল খালি; চরণামৃতের ভাবনা কি? রাধাবাজারে শীঘ্রই দোকান খোলা হবে, যত ইচ্ছা চরণামৃত পাবে।"

রাধা নাম কানে শোন্বামাত্র আপাততঃ নিজ নিজ পরি-বারের চরণামৃত পান-লালসায় যে যার বাড়ীর দিকে ছুটলো।

তখন আমরা দেখি, অবতার অন্তর্দ্ধানের উদ্যোগ কচ্চেন। তখন সকলেই প্রভুর সম্মুখে নতজানু উপবিষ্ট হ'য়ে জোড়-করে বল্লেম,—বল্লেম কি এমনি বল্লেম—একেবারে বীররসে গদগদ হয়ে, বজ্রনাদে বল্লেম,—"প্রভু! কি ভেবেছ মনে? আমাদের যা আশা দিয়েছ, তা বিস্মরণ হচ্ছো কেন? ভাদ্র মাসে আশা দিয়ে কোন্ ভদ্রলোকে তা বিস্মৃত হয়? এই যে বল্লে আমাদের ভাল কর্বে, আমাদের সমস্ত ভার নেবে, আমাদের দায়িত্ব নেবার মাহাত্ম্য যে একমাত্র তোমার-ই! আমাদের ভাল কোত্তেই হবে—কোত্তেই হবে,—কোত্তেই হবে; আমরা তোমাকে ছেড়ে দেবো না—দেবো না—দেবো না! আমরা ভাল হতে না চাই, তোমায় জোর কোরে ভাল কত্তে হবে,—ধর, যদি আমরা লেখা-পড়া না শিখতে চাই, তা হলে তোমাকে আমাদের জোর কোরে নিয়ে লেখা-পড়া শেখাতে হবে। এ কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ কত্তে যদি ঘৃণা হয়, পাহারা-ওলা দিয়ে আমাদের কান পাকড়ে নিয়ে পাঠশালায় বসাতে হবে। আমাদের ভাল কর,—সভ্য কর,—নিশ্চিন্ত কর, নইলে আমরা মান কোরে মুখ ফিরিয়ে বোস্বো, তুমি কুঞ্জ-দ্বারে দ্বারী হয়ে সারারাত পাহারা দিলেও আমরা মান ভাঙ্গবো না। 'কালোরূপ আর দেখ্বো না'—'কালো জলে নাইবো না'—'কালো কেশ বাঁধবো না'—'কালো আকাশ পানে চাইবো না'—সামিয়ানা খাটিয়ে দেবো।

বঁধু তোমায় মধুপুরে দেবো না তো যেতে।
আমরা পাতেও প্রসাদ পাবো, তোমায় ব'সে হবে খেতে॥
তুমি না রাখলে অধীন জনে দিষ্টি,
স্বাধীনতা মোদের ওগো লাগবে না তো মিষ্টি,
হারিয়েছি যে 'আমি,' তুমি মোদের স্বামী,
এ দামী কথা ভুললে পরে যাব নরকেতে;—
ভাল কর—ভাল কর—নাগর হে, করুণাতে মেতে॥"
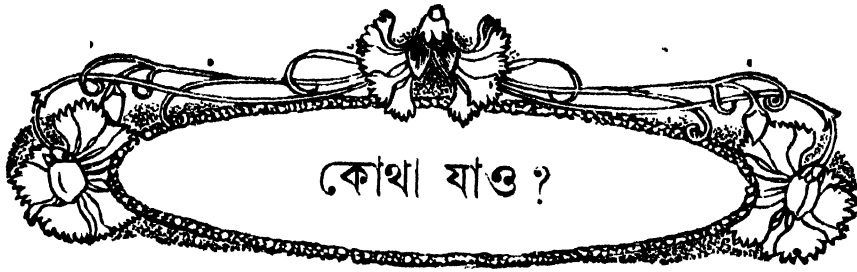
কোথা যাও ?

আজ শরতের আকাশে বাতাসে আগমনীর সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়-দেবতা উমারাণীর শুভাগমনবার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হইতেছে। বৃষভবাহন শঙ্কর ভোলানাথের কথা ক্ষণেকের জন্য মনে পড়ে। শিব ও শক্তি অর্দ্ধনারীশ্বর, অবিচ্ছিন্ন। এমন কি, শক্তিকে অশিব কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু য়ুরোপে ?

আজ ভাবিতেছি, কে সেই ককুভস্কন্ধ বৃষরূপী দেবতা, যিনি সৃষ্টির আদিম যুগে মোহিনী য়ুরোপাকে অপহরণ করিয়া কোন এক অনির্দ্দেশ্য রহস্য-লোকে অদৃশ্য হইয়াছিলেন ! সাগর অতিক্রম করিয়া দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে, উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে, ভ্রাতা তাঁহার অন্বেষণ করিলেন; রূপসীর সন্ধান পাওয়া গেল না। বহু যুগ পরে, ফিনীশিয়ায়, মিসরে, ক্রীটে বৃষরূপী দেবতার শত শত পাষাণ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল; কিন্তু সেই মোহিনী কোথায় ?

যিনি আজ য়ুরোপা বলিয়া পরিচিতা, তিনি কি সেই দেবভোগ্যা সুন্দরী ! বঞ্চিতা, পরিত্যক্তা,—আজ তাঁহার ভাইয়ের কথা মনে পড়ে কি ? তাঁহার সন্তানগণ প্রত্যেকেই নিজেকে দেবতার অংশ বলিয়া গৌরব বোধ করেন; অথচ পরস্পর মর্ম্মান্তিক বিরোধে পরস্পরের প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করিতেছে, তাহা তাঁহার পরিচিত ছিল না। কলহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি সব দেখিতেছেন, শুনিতেছেন; কিন্তু নিবৃত্তির কোনও উপায় তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। যিনি স্বীয় ভ্রাতাকে ছলনা করিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির বশে দেবতার সঙ্গে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে ছলনা ও বিরোধ যে মূর্ত্তিমান্ অভিশাপের মত দেখা দিবে, ইহাতে তিনি বিস্মিত হইবেন কেন ? তিনি ভাবিতেছেন কৈলাস-গেহিনীর কথা……কঠোর ব্রতধারিণী, তপঃক্লিষ্টা উমা কাহাকেও ছলনা না করিয়া বৃষবাহন শিবকে লাভ করিয়াছিলেন………আজ উমার পার্শ্বে লক্ষ্মী সরস্বতী………আর সুদূর প্রাচ্য দিগন্ত হইতে কোটি কণ্ঠ-নিঃসৃত আগমনী গান ধ্বনিত হইতেছে। বর্ষে বর্ষে এমন গান তাঁহার ছেলেরা কই গায় না ত ! যে সভ্যতার তাহারা উত্তরাধিকারী, তাহার মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাদের কোনও আগ্রহ দেখা যায় না ত ! শ্মশানবাসিনী উমার লক্ষ্মী আছেন, সরস্বতী আছেন। কিন্তু য়ুরোপের পরিচয় দাঁড়াইয়াছে অলক্ষ্মীর সঙ্গে; আর সমস্ত য়ুরোপীয়ের স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী চাপিয়াছেন। গো-রূপিণী বাগ্‌দেবতার অনুসরণ করিয়া ভ্রাতা ক্যাডমস্ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে গ্রীসে আসিয়া না কি বর্ণজ্ঞানহীন গ্রীককে লিপিকলা শিখাইয়াছিলেন; দেবভোগ্যা য়ুরোপা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। আজ সেই লিপিচাতুর্য্যের ফলে তাঁহার সন্তানগণ পরস্পরের প্রতি যে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহার নিরাকরণের কোনও উপায় দেখা যায় না। প্রাচ্যে আগমনীর গান, আর বিজয়োদ্ধত প্রতীচ্যে বিসর্জ্জনের করুণ সুর ! তিনি সব শুনিতেছেন, দেখিতেছেন;—তাঁহার সন্তানগণের ভীষণ দৈন্য ও রিক্ততা সত্ত্বেও কি মত্ততা !

গ্রীক বলিতেছেন,—"থ্রেস্ পরিত্যাগ করিয়া, এশিয়া ছাড়িয়া আমি চলিয়া আসিব কেন ? আমার রাজকোষ শূন্য; কিন্তু আমি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি ছাড়িব না। টাকার সন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু কেহই আমাকে ঋণ দিতে স্বীকৃত হইল না। ইংরাজ আমাকে যথেষ্ট সাহস দিয়াছিলেন। বসফোরস্ ডার্ডানেলস্‌এ প্রবেশ করিয়া আমাদের রণতরী তুর্কীনগর বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস পাইল; ইংরাজ তাহাতে আপত্তি করেন নাই। গাজী কেমাল পাশা neutrality'র কথা তুলিলেও সে আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু যখন টাকা চাহিলাম, ইংরাজ কিছুকাল ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কথাটা একেবারে চাপা দিলেন। আমাদিগকে টাকা ধার দিবার জন্য যতটুকু সাহস প্রয়োজন,

সেটুকুরও অভাব দেখা গেল। আজ আমাদের দুর্গতির সীমা নাই।"

ইংরাজ বলিলেন—"আজ আমার সাহসের কিঞ্চিৎ অভাব দেখিতেছ? তোমাকে তুর্কীর কবল হইতে মুক্ত করিতে কে অগ্রসর হইয়াছিল? আমাদের জর্জ্জ ক্যানিং না থাকিলে গত শতবর্ষের ইতিহাস তোমাদের কিরূপ দাঁড়াইত, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?"

রুষ হাসিয়া উঠিলেন—"তোমাদের ক্যানিং কি গ্রীসকে স্বাধীন করিয়া দিলেন? তুর্কীর বিরুদ্ধে রুষের অভিযান, রণক্ষেত্রে তুর্কীর পরাজয়, সন্ধি-পত্রিকায় গ্রীসের মুক্তির কথা ইংরাজ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। অত দিনের পুরাতন প্রসঙ্গ মনে রাখা কিছু শক্ত। যাহা হউক, ক্যানিং পত্র লিখিলেন, আর গ্রীসের ভবিষ্যৎ, ইতিহাস অন্যদিকে চালিত হইল,—এ রহস্য মন্দ নয়।"

ইংরাজ অবজ্ঞাভরে ইহার উত্তর দিলেন না। গ্রীকও চুপ করিলেন। রুষ আবার কথা কহিলেন;—এবার তাঁহার কণ্ঠস্বর তীব্র ও কঠোর। "গ্রীস্ পশ্চিম এশিয়ার তুর্কী প্রদেশ অধিকার করিবেন ইংরাজের সাহায্যে! তাই স্মার্ণা প্রদেশের নাম পরিবর্ত্তিত হইল; কোন এক বিস্মৃত যাবনিক যুগের নাম স্মরণ করিয়া উক্ত প্রদেশের নাম রাখা হইল—যবনিয়া (Ionia); ইংরাজ জোর করিয়া কিছু বলিতেছেন না। আজ যখন তুর্কীর গাজী কেমাল পাশা গ্রীক সেনাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আনাতোলিয়া হইতে বিতাড়িত করিতেছেন, ইংরাজ আর কিছু করিতে না পারুন, গ্রীক বীর্য্যের ও সৌজন্যের প্রশংসাবাদ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। আরও চমৎকার ব্যাপার এই যে, রাজকোষ শূন্য হইলেও বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে রাজা কনষ্ট্যাণ্টাইন্ ইস্তাম্বুল দখল করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পুরাকালে এক কনষ্ট্যাণ্টাইন্ যে নগরের প্রতিষ্ঠাতা, আজ আর একজন কনষ্ট্যাণ্টাইন্ তাহা অধিকার করিবেন, ইহাতে বোধ করি ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইবে!"

উত্তেজিত স্বরে গ্রীস্ বলিলেন—"না, তা কেন? সামঞ্জস্য রক্ষা হইত, যদি পীটরের কনষ্ট্যাণ্টিনোপল্-স্বপ্ন গত আড়াই শ' বৎসরের মধ্যে সফল হইত। আজ রুষ তুর্কীর বন্ধু! জর্জ্জিয়া, ককেশিয়া, আর্ম্মেনিয়া, আজারবাইজান্ সম্বন্ধে তুর্কীর সঙ্গে রুষের আদান-প্রদানে যে প্রীতি ও মৈত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আপাততঃ যথেষ্ট মনে না করিয়া স্মার্ণা-প্রদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বল্‌শেভিক রুষ সঙ্গত বিবেচনা করিতে পারেন; কিন্তু..."

গাজী কেমাল পাশা।

"রাষ্ট্রবহিষ্কৃত ভেনিজেলোস্-এর স্মার্ণা দুঃস্বপ্ন সফল করিবার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী-শক্র প্রবাস হইতে প্রত্যাগত কনষ্ট্যাণ্টাইনের প্রচেষ্টায় ইংরাজের সাহায্য-প্রার্থনা সঙ্গত হইয়াছে বোধ হয়!"

"ভুলিয়া গিয়াছ বোধ করি, গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গ্রীস্ ইঙ্গ-ফরাসীর সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।"

"কিছুই আমি ভুলি নাই। ঠিক সেই সময়ে আমরা রাষ্ট্রবিপ্লবের আবর্ত্তে পড়িয়াছিলাম। যখন তোমার সঙ্গে মিত্রতার কথা ওঠে, আমরা সে কথা শুনিবার অবসর পাই নাই। কিন্তু তোমাকে মিত্রশক্তি বলিয়া গণ্য করিবার কিছু পূর্ব্বে, ঐ ১৯১৭'র এপ্রিল মাসে আমরা ইংরাজ ও ফরাসীর

সহিত মিলিত হইয়া স্মার্ণা ও আদালিয়া প্রদেশ ইটালীকে সমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। আমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এ কথা বলিলে হয় ত ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হইতে পারে। ঘটনাচক্রে আমরা যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারি নাই। আজ স্মার্ণা সম্পর্কে ইটালীর নামগন্ধ নাই!"

"বল্‌শেভিক্ কর্তৃপক্ষীয়েরা বুঝি রুষিয়া-রাষ্ট্রের প্রাচীন দপ্তরখানা হইতে ঐ সন্ধির ছিন্নপত্রটুকু বাহির করিতে পারিয়াছেন! আর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০এ ডিসেম্বর ভেনিজেলোস্ ভার্সাইল সন্ধি-বৈঠকে যে memorandum উপস্থাপিত করিয়াছিলেন; স্মার্ণা থ্রেস্ প্রভৃতিতে আমাদের জন্মগত অধিকার বুঝাইয়া দিয়া সুম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সম্মতি লইয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যাহার বলে এসিয়া ভূখণ্ডে আমরা সসৈন্যে অবতীর্ণ হইলাম;—তাহার কোনও সন্ধান বোধ করি বল্‌শেভিক্ রুষ রাখেন নাই।"

"একটু একটু রাখি বৈ কি! এশিয়ায় গ্রীকের শুভাগমনের ফলে আরম্ভক্রমে মুস্তাফা কেমালের ইস্‌লাম-শক্তি সংহত করিবার চেষ্টা; কন্‌ষ্টান্টিনোপল্ গভর্মেণ্টের তরফ্ হইতে ফরিদ্ পাশার কেমাল্‌কে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত করা; কেমালের অ্যাঙ্গোরা গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা,—সবই লক্ষ্য করিয়াছি।"

"স্তান্ রেমোয় স্মর্ণা প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশ আমাদিগকে দেওয়া হইবে, ইংরাজ ও ফরাসীর এই প্রতিশ্রুতি সেভ্রে সন্ধিতে বজায় রহিল। ইটালীর কথা বলিতেছ;—তাঁহাকেও বঞ্চিত করা হয় নাই।"

"জানি, তাহাকেও বঞ্চিত করা হয় নাই; কিন্তু কেমাল পাশা তোমাদের কোনও সন্ধির কোনও সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন কি? আর ইটালী······"

ইটালী বলিলেন—"বল্‌শেভিকের মুখে আমার নাম কেন? সোশ্যালিষ্ট বল্‌শেভিকের জ্বালায় আমার মাথা খারাপ হইবার জোগাড় হইয়াছে। এক দিকে communist-দিগের ধর্ম্মঘট, অন্যদিকে ফ্যাসিষ্ট-বিভীষিকা;—নগরে নগরে শ্রমিক-বিদ্রোহ, আর সেই বিদ্রোহদমনের ছলে ফ্যাসিষ্টদিগের ভীষণ অত্যাচার। এই দুইয়ের মাঝখানে পড়িয়া ফ্যাক্টা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো অথবা বণমি কোনও ক্যাবিনেট গঠিত করিতে পারিলেন না। অবশেষে ফ্যাক্টা কোনও প্রকারে জোড়াতাড়া দিয়া একটা সোশ্যালিষ্ট ফ্যাসিষ্ট গভর্মেণ্ট খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা আমাদের কথা কি বলিতেছিলে?"

রুষ ও গ্রীক্ সে কথার জবাব দিলেন না। অষ্ট্রীয়া বলিলেন—"আমাকে তোমরা বাধা দিতেছ কেন? তোমরা কেহ কিছু করিলে না, আমার দুরবস্থার কথা একবারও ভাবিয়া দেখিলে না। ইটালী এইমাত্র আমাকে পরামর্শ দিতেছিলেন যে, তিনি আমাকে টাকা ধার দিবেন। হঠাৎ তিনি উঠিয়া গিয়া গ্রীস্ ও রুষিয়ার সঙ্গে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিতেছি। কোথাও টাকা পাওয়া যাইতেছে না·········"

ইংরাজ প্রতিবাদ করিলেন। "সাত আট মাস হইল, আমরা তোমাকে বিশ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছিলাম; যাহাতে তাহার অপব্যবহার না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। খরচের তত্ত্বাবধান করিতে মিঃ ইয়ঙ্গ প্রেরিত হইলেন। কিন্তু আমাদের ষ্টার্লিং-এর সঙ্গে তোমাদের ক্রোণ্ মুদ্রার parity সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তিনি ভরাডুবি হইলেন। এখন বলিতেছ, কোথাও টাকা পাওয়া যাইতেছে না।"

"বিশ লক্ষ পাউণ্ডে আমাদের দেশের অবস্থা ফিরাইবার চেষ্টায় তোমার বদান্যতা প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু আমাদের আসল রোগের নিরাকরণের সম্ভাবনা কিছুমাত্র ছিল না। বিদেশী ধনী শ্রেষ্ঠিগণের চেষ্টায় যদি ভিয়েনাতে একটা বড় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইত, তাহা হইলে আমাদের এ দুর্গতি হইত না। অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হয়; কারণ, আমাদের জীবনধারণোপযোগী সমস্ত জিনিষ দেশের মধ্যে পাওয়া এখন অসম্ভব। কয়লা আমাদের দেশের খনিজ পদার্থ নহে; বিদেশ হইতে না আনিলে এক দণ্ড চলিবে না। শিল্পকার্য্যের জন্য অধিকাংশ আবশ্যক উপকরণ পাইতে হইলে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। জিনিষ কিনিলে দাম দিতে হইবে; কিন্তু বিক্রেতা আমাদের কাগজের ক্রোণ্ মুদ্রা লইতে চাহেন না। যুদ্ধের পূর্ব্বে এক ষ্টার্লিং পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে চব্বিশটা ক্রোণ্ দিলেই চলিত; এখন কিন্তু দু লক্ষ ক্রোণ্ মুদ্রা দিলেও ষ্টার্লিং-এর সহিত parity রক্ষা করা সম্ভবপর হইতেছে না। সুতরাং বিদেশীয় পণ্যের মূল্য দিতে হইলে আমাকে ডলার অথবা ষ্টার্লিং অথবা চেকোস্লভাক ক্রাউণ কিনিয়া দাম চুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে হয়।

যত বেশী ডলার অথবা ষ্টার্লিংএর উপর টান পড়িল, তত বেশী দামে তোমাদের ঐ সব বিদেশী মুদ্রা বাজারে কিনিতে হইল; কাজেই অধিক সংখ্যায় কাগজের ক্রোণ মুদ্রিত করিতে হইল। যত বেশী কাগজের মুদ্রা বাজারে ছড়াইয়া পড়িল, তত তাহার দাম কমিয়া যাইতে লাগিল। ক্রোণের দাম যতই কমিয়া যাইতে লাগিল, ততই অধিকসংখ্যক ক্রোণ নোট মুদ্রিত করা আবশ্যক হইল। এমনি করিয়া সমস্তটা চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। এই circulus vitiosus-এর আবর্ত্তে আমরা ঘুরপাক খাইতেছি, ইহার শেষ কোথায়? তুমি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের বিশ লক্ষ পাউণ্ড সেই আবর্ত্তে কোথায় তলাইয়া গেল! একবার স্থির হইয়া বিবেচনা করিতে পারিলে না যে, আমাদের ক্রোণের এই চাঞ্চল্য আমাদের প্রাণান্তকর হইয়াছে; ইহাকে দৃঢ়ভাবে বাজারে ধ্রুব অর্থাৎ stabilise করিতে না পারিলে আমাদের সমস্ত কাযকর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, আদান-প্রদান অচল হইয়া পড়িবে; আমরা যদি অচল হইয়া পড়ি, তোমরা সচল হইয়া কত দিন থাকিবে? এই কিছুক্ষণ হইল, ইটালীর সঙ্গে এই বিষয় লইয়া আমার তর্ক-বিতর্ক হইতেছিল। আমি বলিতেছিলাম যে, অগত্যা আমাকে জর্ম্মণীর শরণ লইতে হইবে। ইটালী আপত্তি জানাইলেন; কুটিল ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিলেন; অসমাপ্ত কথা বলিতে বলিতে আমার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া গ্রীস ও রুষের সঙ্গে কি কথা বলিতে সহসা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, আমাকে যখন কেহ এই ঘূর্ণি-চক্রের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলেন না, তখন আমার চোখের উপর ভার্সাইল্ সন্ধিপত্রখানা ঝুলাইয়া রাখায় তোমাদের কাহারও লাভ অথবা পৌরুষ-বৃদ্ধি হইতেছে কি? জর্ম্মণীর সহিত আমাকে মিলিত হইতে দাও না কেন?"

ফরাসী বলিলেন—"কখনই না।"

চেকো শ্লভাক।—অসম্ভব, হইতে দিব না।

ইটালী।—ছি ছিঃ! ও কথা মুখে আনিও না।

যুগো শ্লাভ।—দ্রব্যাদি কিনিতে পার না বলিয়া জর্ম্মণীর আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহিতেছ? স্পষ্ট করিয়া সব কথা আমাদিগকে পূর্ব্বে জানাও নাই কেন?

অষ্ট্রীয়া।—তোমাকে জানাইব? যদি বলি, তোমার জন্তই আমার আজ এ দশা হইয়াছে! সারাজেভোয় আমার রাজপুত্রকে বলি দিয়া যিনি রণচণ্ডিকার বোধন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার শরণাপন্ন হইব কি করিয়া?

ইটালী।—হাঁ, সে কথা বলিতে পার বটে; কিন্তু আমার কাছে তোমার দুঃখের কথা ভাল করিয়া বল নাই কেন?

অষ্ট্রীয়া।—তোমার ত দেখিতেছি অবসর নাই। এই মাত্র ত কত কি বলিতেছিলে···সোশ্যালিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট, ছাই-ভস্ম;—আর, তুমি টাইরল পাইয়াছ; আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া আর তোমার লাভ কি?

হঙ্গেরি।—কেন,অষ্ট্রীয়া, তুমিও ত বার্গেনল্যাণ্ড পাইয়াছ, তোমার আর ভাবনা কি? তোমার জন্যই আমাকে যুদ্ধে ঝাঁপ দিতে হইয়াছিল;—যুদ্ধের অবসানে তোমার বেশী ক্ষতি হইল, না আমার বেশী ক্ষতি হইল? ভাবিয়া দেখ দেখি একবার সব কথাগুলো। যে রাষ্ট্রের নাম ছিল অষ্ট্রো-হঙ্গেরি, আজ এ দশা তার কে করিল? ইটালির পিয়াভ্ নদীর তীর হইতে রণে ভঙ্গ দিয়া তোমার আমার প্রত্যাবর্ত্তন; যুদ্ধ স্থগিত-বার্ত্তাও armistice ঘোষণা,—চার বৎসর এখনও পূর্ণ হইয়াছে কি? কাউন্ট্ টিস্তাকে কে খুন করিল? রাজা কার্ল সুইটজর্ল্যাণ্ডে পলায়ন করিলেন। কাউন্ট্ কেরোলাই একটা ক্যাবিনেট গঠিত করিয়া হঙ্গেরির territorial অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিবার প্রয়াসী হইলেন।

অষ্ট্রীয়া।—আমার territorial integrity রক্ষা করিবার বাসনা কাহারও মনে হইয়াছিল কি? সহসা আমার রাষ্ট্রদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বোহেমিয়া-গ্যালিসিয়া স্বাধীন চেকো শ্লভাক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইল।

হঙ্গেরি।—সে ত উইলসনের self-determination নীতির ধুয়া তুলিয়া রাজনীতিজ্ঞেরা সমর্থন করিল, কিন্তু আমার উত্তরপশ্চিম প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া উহারা নিজ রাষ্ট্র-দেহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিল কেন?

অষ্ট্রীয়া।—সব 'কেন'র কি উত্তর আছে? নবজাত যুগো-শ্লাভ রাষ্ট্র আমার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ক্রোশিয়া-শ্লাভোনিয়া অধিকার করিয়া লইল কেন?

হঙ্গেরি।—সে যেন মনে করা যাইতে পারে, এ ক্ষেত্রে জাতিগত বর্ণগত পার্থক্য আছে। কিন্তু আমার দক্ষিণে বেণাৎ ও বাক্স্কা প্রদেশ কোন্ ছলে চেকো শ্লভাক কাড়িয়া লইল বল দেখি। armistice পত্রে সহি করিতে না করিতে

নভেম্বর মাসের মধ্যেই এই সমস্ত ব্যাপার চুকিয়া গেল। মাসকাবার হইতে না হইতেই রুমানিয়া পহেলা ডিসেম্বর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে, আমার ট্যান্সিলভ্যানিয়া প্রদেশটা আত্মসাৎ করিল। তুমি, বোধ হয়, তখন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিলে; বার্গেণল্যাণ্ডের উপর নজর দাও নাই। তা'র পর ? ১৯১৯এর মার্চ্চ মাসে কেরোলাই-এর পদত্যাগ; বলশেভিক্ বেলা-কুণের শুভাগমন ও মস্কোর সহিত প্রীতিবন্ধন; চেকো-শ্লভাক ও রুমানিয়ার যুগপৎ আমাকে আক্রমণ; রাজধানী বুডা-পেস্থে রুমাণীয় সৈন্যের প্রবেশ; বেলা-কুণের পলায়ন; নভেম্বর মাসে রুমাণীয় সৈন্যের বুডা-পেস্থ পরিত্যাগ ও এক দল ন্যাশনাল গার্ড লইয়া অ্যাডমিরাল নিকোলস্ হর্টির নগরে প্রবেশ। হর্টি শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইলেন ১৯২০ খৃষ্টাব্দের গোড়ায়। আর তোমরা বার্গেণল্যাণ্ড দখল করিয়া লইলে। গত্যন্তর না দেখিয়া হর্টি সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। আমাদের রহিল কি ?

অষ্ট্রীয়া।—তোমার কি আছে! তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিবার উপকরণের অভাব আছে কি? দ্রব্যসামগ্রীর খুব বেশী অভাব না থাকার দরুণ তুমি ক্রোণ লইয়া ব্যস্ত হইতেছ না। আর আছে তোমার তীব্র প্রতিহিংসাবৃত্তি। কেবলই ভাবিতেছ, তোমার ভূ-সম্পত্তি পরে লুঠ করিয়া লইয়া দিব্য আরামে বাস করিতেছে; এক দিন ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। তোমার শিল্পী এই ভাবকে জীবন্ত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে যে চারিটি পাষাণ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারা তোমার সমগ্র ম্যাজ্যার জাতিকে Der Tag "সেই দিন"-এর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে বলিতেছে। এত দিন আমরা ইটালির Irredentism লইয়া ব্যস্ত ছিলাম; এখন আবার এই দুর্গতির মধ্যে তোমাদের এই নূতন জিঘাংসাবৃত্তি-প্রণোদিত Irredentism কথা ভাবিতে হইলে মধ্য য়ুরোপে নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে না কি? তুমি ত তোমার ইতিহাস আমাকে শুনাইলে; আমার এখন অবস্থা এমন যে, আমার কাহিনী শুনাইবার প্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়াছে। এখনও তোমাদের বুডা-পেস্থে আমাদের ক্রোণ চলিতেছে; এখনও চেকো-শ্লভাক ও বার্লিন আমাদের ক্রোণ লইতেছে, কিন্তু যে দিন লইতে অস্বীকৃত হইবে!

ইংরাজ।—ঘুরিয়া ফিরিয়া তুমি তোমার ঐ ক্রোণ মুদ্রার কথাই বলিতেছ শুনিতেছি। গত ২৬এ জুলাই তোমার পার্লামেণ্টে স্থির হইয়াছিল যে, একটা বড় নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে; সব নোট, সমস্ত কাগজের টাকা সেই ব্যাঙ্ক লইবে; সোনা-রূপার জন্য সমগ্র দেশের উপর একটা জবরদস্ত ঋণভার বসাইয়া দেওয়া হইবে। সে প্রোগ্রামের কি হইল ?

অষ্ট্রীয়া।—অন্য সব প্রোগ্রামের যা' হইতেছে, এ ক্ষেত্রেও তাই হইল। ঐ জুলাই মাসেই জর্ম্মণীর Reparation লইয়া একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল;—তিন কোটি বিশ লক্ষ স্বর্ণ মার্ক জুলাই মাসের মধ্যে দিতে সে বাধ্য, নচেৎ তাহার রক্ষা নাই। ভিয়েনায় জর্ম্মণীর যথেষ্ট ক্রোণ পাইবার সুবিধা আছে। সেই creditএর তিনি সদ্ব্যবহার করিলেন। তাঁহার ব্যাঙ্কে প্রচুর ক্রোণ মুদ্রা সঞ্চিত আছে। রাশি রাশি ক্রোণ মুদ্রা লইয়া তিনি ভিয়েনার বাজারে উপস্থিত হইলেন; ডলার, ষ্টার্লিং প্রভৃতি ক্রোণের পরিবর্ত্তে তিনি কিনিলেন। দেখিতে দেখিতে স্বর্ণমুদ্রা এতই মহার্ঘ্য হইয়া গেল যে, এক মাসের মধ্যে ক্রোণ একেবারে অতলে ডুবিয়াছে। এক ষ্টার্লিং পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে এক মাস আগে ৬৬০০০ ক্রাউণ দিলেই চলিত; আগষ্ট মাসে প্রথম সপ্তাহে দাঁড়াইল এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ক্রাউণ। পরে দাঁড়াইল আড়াই লক্ষ ক্রাউণ। এ অবস্থায় আমার পক্ষে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বৃথা। তোমরা পার; মার্কিণ পারেন। কিন্তু তোমরা নিজের কথা লইয়া এত ব্যস্ত যে, আমার ভাল-মন্দের সঙ্গে তোমাদের ভাল-মন্দও যে কতকটা জড়িত আছে, তাহা ভাবিতে পারিতেছ না।

ইংরাজ।—তোমরা কেবলই হা-হুতাশ করিতেছ; কিন্তু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা কর নাই কেন? দুর্দ্দিনের আশঙ্কা ছিল না। না-ই বা রহিল ?

অষ্ট্রীয়া।—আশঙ্কা করি নাই? লয়েড জর্জ্জ যখন আমার ramshackle Empire নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া তোমাদের পার্লামেণ্টে বক্তৃতা করিলেন, তখন আমরা আমাদের কানে তূলা দিয়া বসিয়া ছিলাম না। আজ তোমার মুখে হিতোপদেশ শুনিয়া আমার এত দুঃখের মধ্যেও হাসি আসে। আমাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত করিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত রহিলে না; আমার অন্য সমস্ত সম্পত্তির উপর তোমরা সকলে এমন একটা দাবি

রাখিলে যে, সেগুলা বন্ধক রাখিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু কর্জ্জ লইব, এমন সম্ভাবনা রহিল না। চার বৎসর তোমরা আমাদের customs শুল্ক প্রভৃতি কতকগুলো আয় একেবারে আটকাইয়া রাখিলে; আর কেন আমরা indemnity দিতে পারিতেছি না, তাহার জন্য অনুযোগ দিতে লাগিলে। এত দিন পরে, তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমার নিকট হইতে indemnity পাইবার প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। সম্প্রতি তোমরা আমাকে ঐ দুরন্ত পরিহাস হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছ; কিন্তু এমন সময়ে দিয়াছ যে, এমন কোনও উত্তমর্ণ দেখিতেছি না, যিনি আমাকে টাকা ধার দিতে অগ্রসর হইতে পারেন। ইটালীর কাছে টাকা ধার চাহিলে, চেকো-শ্লভাক আমাকে ভয় দেখাইতেছেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর সাইপেল চেকো-শ্লভাক সচিবশ্রেষ্ঠ ডক্টর বেনিস্এর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন; ইটালি আমার প্রতি কুটিল ভ্রূকুটিপূর্ণ বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যুগো শ্লাভ আমার দক্ষিণে দুইটা প্রদেশ হস্তগত করিবার চেষ্টা না কি করিতেছে—

যুগো শ্লাভ।—মিথ্যা কথা! ষ্টীরিয়া ও করিন্থিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে; আমরা তাহাতে সম্মত হইব কেন?

অষ্ট্রীয়া।—কে মিথ্যাবাদী? ছোট আঁতাৎ-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া আজ তোমার স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে।

যুগো শ্লাভ।—জেনোয়ার পূর্ব্বে তোমার সুর খুব নরম ছিল; এখন দেখিতেছি একটু পরিবর্ত্তন!

অষ্ট্রীয়া।—জেনোয়ার পূর্ব্বে আমার আশা ছিল; লণ্ডনের পরে আর আমার কোনও আশা নাই। তখন সত্য কথা বলিতেও ইতস্ততঃ করিয়াছি; আজ আর ভয় করিবার কিছু নাই। ষ্টীরিয়া ও করিন্থিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য তোমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছে, এ কথা আমাকে শুনাইতে তোমার মুখে একটু বাধিল না। অথচ তোমরা সকলে খুব ভাল রকমই জান যে, আমার সাতটা প্রদেশই জর্ম্মণীর সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাবে ভোট দিয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়াছে। বার্লিনে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য আমার প্রতিনিধি যখন ভিয়েনা হইতে বাহির হইলেন, ইটালী ও যুগো-শ্লাভ, রুমানিয়া ও চেকো-শ্লভাক অস্থির হইয়া উঠিলেন কেন? এই মাত্র একটু আগে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল; সকলে বলিয়া উঠিলেন—না, না, না। এখন তুমি আমাকে বুঝাইতে চাও যে, তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য আমাদের কেহ কেহ উৎসুক হইয়াছে। যাহারা বাধ্য হইয়া মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে তোমরা কি এতই মিষ্ট ব্যবহার করিতেছ যে, অন্যে তোমাদের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে? মিথ্যাবাদী কে?

ইংরাজ।—তোমরা কিছু গরম হইয়া উঠিতেছ। তোমরা দু'জনেই দেখিতেছি,বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছ। বল্কানে অনেক দিন অষ্ট্রীয়ার ও রুষিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল; রাষ্ট্রীয় সতরঞ্চের ছক্-এর উপর রুষিয়া একটা চাল দিলে অষ্ট্রীয়া আর এক চালে মাৎ করিবার চেষ্টা করিত। তুমি অষ্ট্রীয়া ভাবিতে যে, অন্ততঃ সার্ভিয়া-মন্টিনিগ্রোর মধ্যে তোমার প্রতাপ প্রবল থাকা উচিত; রুষ স্থির করিলেন, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে তাঁহার ইঙ্গিতে পররাষ্ট্র-সচিব চলিবেন। শেষে একদিন তুমি, অষ্ট্রীয়া ভয় পাইলে। তোমাকে অভয় দিবার জন্য তোমার মিত্রবর উইল্‌হেল্‌মের বর্ম্মপরিহিত মূর্ত্তির বিভীষিকা আমার এখনও মনে পড়ে; সেই কঠোর বাণী—My place will be beside my ally in shining armour। আজ সমগ্র য়ুরোপ একটা মহা-বল্কানে পরিণত হইয়াছে। তুমি ইটালীর সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে চাও; ছোট আঁতাৎ তাহাতে বাধা দিবে; জর্ম্মণীর সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা কর,—আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু ফরাসী ছোট আঁতাৎ ও পোল্যাণ্ড গর্জ্জিয়া উঠিবে। জর্ম্মণী রুষের সঙ্গে র‍্যাপালোয় একটা সন্ধি করিলেন; ফরাসী ক্রুদ্ধ হইলেন, পোল্যাণ্ড ও ছোট আঁতাৎ ভয় দেখাইলেন, কন্‌ফারেন্সের মধ্যে রুষ ও জর্ম্মণের দেখা-শুনা বন্ধ হইল। পরস্পরের মিষ্ট-শিষ্ট ব্যবহারের কথার উত্থাপন না হওয়াই ভাল। এ অবস্থায় অন্য কাহাকেও দোষ না দিয়া নিজে সামলাইয়া চলিবার চেষ্টা কর না কেন?

অষ্ট্রীয়া।—কি করিয়া সামলাইব? তুমি আমাকে সঞ্চয় করিবার জন্য উপদেশ দিতেছিলে। তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি আসে। কি সঞ্চয় করিব? খাদ্যদ্রব্য? ধনীরা যদি যুদ্ধের শেষভাগ হইতে প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আপামর সাধারণের কি অবস্থা হইত, বল দেখি? তোমাদের গভর্মেণ্টও কড়া আইন করিয়া ঐ প্রকার সঞ্চয় বন্ধ করিয়া

দিয়াছিল। উপন্যাসরচয়িত্রী মেরী করেলিকে তোমাদের আদালত শাস্তি দিয়াছিল। টাকা সঞ্চয় করার কথা বলিতেছ? তবে একটা গল্প বলি শুন। যুদ্ধ চলিতেছিল। একজন ধনী বণিক দশ লক্ষ ক্রোণ মুদ্রা রাখিয়া মারা গেলেন। তাঁহার দুই ছেলে। প্রত্যেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পাইলেন। ছেলে দুটির মধ্যে একটির স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল; অপরটি উচ্ছৃঙ্খল। ভাল ছেলেটি সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সমস্ত টাকা জমা রাখিয়া সুদে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ক্রোণের অধঃপতন আরম্ভ হইল। আজ হিসাব করিয়া দেখ, তাহার পাঁচলক্ষ ক্রোণের মূল্য ষ্টার্লিং হিসাবে তিন পাউণ্ডেরও কম দাঁড়াইয়াছে; আর সুদ বাবদে সে দু'শিলিং আন্দাজ পাইতেছে। তাহার দুশ্চরিত্র ভাই সমস্ত টাকা মদ্যপানে উড়াইয়া দিল। খালি বোতলগুলা সে রাখিয়া দিয়াছিল। সম্প্রতি সে সেই বোতলগুলা বিক্রয় করিয়া আশী লক্ষ ক্রোণ পাইয়াছে!

ইংরাজ।—তাই, কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম, আমাদের য়ুরোপীয় সভ্যতা টলমল্ করিতেছে। ভাল-মন্দের তারতম্য, সঞ্চয়-অপচয়ের উপকারিতা বা অপকারিতা, কিছুই আর বুঝা যাইতেছে না। এখন কে কাহাকে দোষ দিতে পারে? যুদ্ধ শেষ হইল; কিন্তু ঝগড়া মিটিতেছে না।

ফরাসী।—মিটিবে কি করিয়া? এইমাত্র তুমি যে য়ুরোপের Balkanisationএর কথা বলিলে, তাহাতে বোধ হইল যেন পোল্যাণ্ড ও আমরা প্রধানতঃ দোষী। পোল্যাণ্ড এদিকে নিজের জ্বালায় অস্থির। পশ্চিমে জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়া সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট সতর্ক হইতে হইয়াছে; পূর্ব্বে রুষের জন্ম সে ব্যস্ত হইয়াছে। তাহার নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এখন এমন নয় যে, সে অন্য কাহারও উপর জুলুম করিতে পারে। মার্শ্যাল পিল্‌সুড্‌স্কির গভর্মেণ্ট প্রায় অচল হইয়াছিল, যখন সেনাপতি কর্ফ্যাণ্টি প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

ইংরাজ।—এই অচলতার কারণ বোধ করি তোমরা জান না; আমরা অন্ততঃ এইটুকু জানি যে, পোঁয়াকারের গভর্মেণ্ট কর্ফ্যাণ্টিকে যতটা স্নেহের চোখে দেখেন, প্রেসিডেণ্ট পিল্‌সুড্‌স্কিকে ততটা দেখেন না। উভয়ের মধ্যে কেহই যে বিশেষ শান্তিপ্রিয়, এমন নহে। দু'জনেই Militarist ভাবাপন্ন। কিন্তু কর্ফ্যাণ্টির সাইলেশিয়া অভিযান তোমাদের বেশ মনের মত হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট যখন দেখিলেন যে, কর্ফ্যাণ্টি প্রধান মন্ত্রী হইবার জন্ত ঝুঁকিয়াছেন, অথচ দুজনে এক সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব, তখন তিনি পদত্যাগ করিলেন। দিনকতক পোল্যাণ্ডে প্রেসিডেণ্ট, ক্যাবিনেট, প্রধান মন্ত্রী কিছুই ছিল না। প্রেসিডেণ্ট তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন না; নিজেও পদত্যাগ করিলেন, কাজেই রাষ্ট্র অচল হইবার জোগাড়। ক্রমে কর্ফ্যাণ্টির দল ভাঙ্গিয়া গেল। মার্শ্যাল পিল্‌সুড্‌স্কি আবার গদিতে বসিয়াছেন।

ফরাসী।—অদৃষ্টের পরিহাস বই ত নয়! অন্য কোনও দেশের প্রধান মন্ত্রীর দল ভাঙ্গিয়া গেলে য়ুরোপের কল্যাণ হইত।

ইংরাজ। আমিও তাই ভাবিতেছিলাম। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর বিরোধ ত সব দেশে হয় না!

ফরাসী।—রাজা ত আর প্রধান মন্ত্রীর উপর রাগ করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে যাইবেন না; প্রধান মন্ত্রীর দল ভারি ত সব জায়গায় থাকে। রাজ্যরক্ষার জন্য মন্ত্রীকে পরিত্যাগ করা সবদেশেই রাজনীতির অনুমোদিত।

ইংরাজ।—রাজার কথা আনিতেছ কেন? প্রেসিডেণ্ট আর প্রধান মন্ত্রীর কথা হইতেছে।

ফরাসী।—ওঃ, ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তোমরা রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে রাজার নাম তুলিতে চাও না। প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রীর বিরোধ হইলেই কি অপর রাষ্ট্রের খুব সুবিধা হইবে মনে কর?

ইংরাজ।—সব সময়ে মনে করি না। হইতে পারে যে, 'মহিষের দুই শিং বাঁকা, কিন্তু বুঝিবার সময় একা'।

ফরাসী।—পোঁয়াকারে সরিয়া দাঁড়াইলে তোমরা কি মনে কর ব্রিয়াঁকে পাইবে?

ইংরাজ।—লয়েড জর্জ্জ সরিয়া গেলে, তুমি কি ফ্রান্ক-বন্ধু লর্ড গ্রে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন আশা কর? নর্থক্লিফ্ ত এখন জীবিত নাই। থাকিলেও…

ফরাসী।—মৃত ব্যক্তির নাম করিয়া পরিহাস করিতেছ কেন? জেনোয়ার পরে তাঁহাকে যেন তোমরা আমাদের সঙ্গে বেশী জড়াইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলে। কিন্তু তিনি যে ইংরাজের কত বড় হিতৈষী ছিলেন, তাহা তোমরা ভুলিয়া যাও।

ইংরাজ।—ভাল। তুমি বোধ হয় ভুলিয়া যাও নাই যে,

লর্ড নর্থক্লিফের উত্তেজনায় 'মিঃ অ্যাস্কিথ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, আর ইংরাজের এত বড় হিতৈষী প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

ফরাসী।—জেনোয়া বৈঠকের সময়ে পোঁয়াকারের বার্-লে-দিউ বক্তৃতা তোমাদের কানে ভাল শুনায় নাই। তোমরা স্পষ্টই বলিয়াছিলে, ঐ রকম বক্তৃতাই ত আন্তর্জাতিক মিলনের প্রধান অন্তরায়। এবার লণ্ডন বৈঠকের প্রাক্কালে তোমাদের ব্যাল্‌ফোর নোট, আমাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করে নাই।

ইংরাজ।—হয় ত লর্ড ব্যাল্‌ফোরের যে সব কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা একটা পত্রের মধ্যে বলা সহজ নয়। কিন্তু তিনি কি করিবেন? মার্কিণ তাহার পাওনা টাকা চাহিয়া বসিল। অগত্যা আমরাও য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে আমাদের পাওনা টাকা চাহিয়াছি। সব টাকাটাই এখনই দিতে হইবে, এমন কথা বলা হয় নাই। যতটা না পাইলে আমাদের পক্ষে মার্কিণের ঋণ পরিশোধ করা শক্ত হয়, সেই-টুকু মাত্র চাওয়া হইয়াছে। আপাততঃ পঁচাশী কোটি পাউণ্ড পাইলেই আমরা মার্কিণের দেনা মিটাইয়া দিতে পারি। পঁচাশী কোটির তিন গুণেরও অধিক টাকা আমাদের পাওনা আছে।

ফরাসী।—তা' সত্য; কিন্তু এমন উপায় রাখ নাই যে, আমরা এ সময়ে তোমার প্রাপ্য টাকা দিতে পারি। জর্ম্মণী চায় দীর্ঘকালের জন্য দেনা দেওয়া বন্ধ রাখিতে; সে রকম moratorium হইলে আমাদের দুর্দ্দশার শেষ থাকিবে না। একে ত ফ্রান্সের দলিত প্রাচ্য-প্রদেশগুলার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য রাশি রাশি টাকা ঢালিতে হইতেছে; আবার লক্ষ লক্ষ নর-নারীর পেন্সন্ আমাদের গভর্মেণ্ট জোগাই-তেছে; অথচ reparationএর জন্য জর্ম্মণীকে পীড়াপীড়ি করিবার জো নাই; তোমরা ঠিক তাহা পছন্দ করিতেছ না।

ইংরাজ।—অতএব লণ্ডন বৈঠকে কোনও মীমাংসাই হইল না। আবার একটা কন্‌ফারেন্স চাই? এবার কোথায়? ব্রেসেলসে?

ফরাসী।—আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি; আর তোমরা দিব্য নিশ্চিন্ত মনে মধ্য ও প্রাচ্য য়ুরোপে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছ!

ইংরাজ।—তোমরা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছ; কাফ্রিসৈন্য বসাইয়া রাইন্ প্রদেশ শাসন করিতেছ; কিন্তু এক একটা কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, আর জর্ম্মণ মার্ক কত নামিয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না। মার্ক ছুটিতেছে অষ্ট্রীয়ার ক্রোণের পিছনে, আর ক্রোণ ছুটিতেছে রুশিয়ার রুব্‌লের পিছনে। আর তোমরা reparation, reparation করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছ। ব্যবসা-বাণিজ্য-বিস্তারের কথা বলিতেছ;—আন্তর্জাতিক কারেন্সি যদি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে কে কাহার সহিত ব্যবসা করিবে?

ফরাসী।—কিন্তু যতক্ষণ না জর্ম্মণী আমাদিগকে টাকা দিতেছে, ততক্ষণ আমরা আমাদের ঋণ-পরিশোধের চেষ্টা করিতে পারিব না।

ইংরাজ।—ঋণটা উড়াইয়া দিতে পারিবে না ত? আমরা মার্কিণের কাছে ঋণ করিয়াছিলাম,—তোমার জন্য, ইটালীর জন্য, অপর ছোট ছোট মিত্রশক্তির জন্য। আমরা জামিন হইয়া…

ফরাসী।—মার্কিণের নিকট হইতে টাকা পাইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলে? মার্কিণ সেক্রেটরি মিঃ মেলো কি বলিয়াছেন, জান ত? তোমার জামিন লইয়া অন্য রাষ্ট্রকে টাকা ধার দেওয়া হয় নাই। তুমি নিজের খরচের জন্য মার্কিণের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছ।

ইংরাজ।—আমার রাজকোষ শূন্য করিয়া তোমাকে ও অন্যান্য মিত্রশক্তিকে টাকা দিয়াছিলাম; কাজেই মার্কিণের কাছে আমাকে হাত পাতিতে হইয়াছিল। আজ তোমার "তাং" পত্রিকা একটি ইংরাজি বচন উদ্ধৃত করিয়া তোমার গভর্মেণ্টকে উপদেশ দিতেছে যে, যদি ইংরাজ টাকা চায়, তাহা হইলে হাটের মাঝে ফলের বাজ্‌রা উল্টাইয়া দাও,—Upset the apple-cart!

ফরাসী।—উত্তেজনা ত' তোমাদের প্রেসের। কাহা-কেও দোষ দিবার আগে নিজের ঘরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ। একটু আগেই আমি বলিতেছিলাম যে, য়ুরোপের Balkanisationএর জন্য তোমরা প্রধানতঃ আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছ।

ইংরাজ। আল্‌সাস্ লোরেণের শত শত জর্ম্মণ গৃহস্থকে তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছ কি? তাহাদের কি দোষ?

ফরাসী—দোষ-গুণ বিচার করা আমাদের কাজ নয়। জর্ম্মণীর নিকট হইতে প্রাপ্য আদায় করিতে হইবে। আয়র্লণ্ডের ব্ল্যাক্-অ্যাণ্ড্-ট্যান্, ভারতবর্ষের অমৃতসর, যাঁহাদের

কীর্ত্তিধ্বজা তুলিয়াছে; তাঁহারা আল্‌সাস্ লোরেণের কথা শুনিয়া দোষ-গুণের বিচার করিতে বসেন!

ইংরাজ।—তুমি অ্যাঙ্গোরার বন্ধু!

ফরাসী।—গ্রীক তোমার আদরের দুলাল!

ইংরাজ।—মরক্কো-টিউনিসিয়ার ইংরাজ অধিবাসিগণকে তুমি ফরাসী ন্যাশনাল বলিয়া পরিগণিত করিতে চেষ্টা করিতেছ!

ফরাসী।—মিশরে সুদানে তোমরা শান্তি স্থাপিত করিতে পার নাই। মরক্কো-টিউনিসিয়ায় শান্তি বিরাজ করিতেছে। আমরা শান্তি-রক্ষক নহি। ইংরাজকে ন্যাশনাল বলিয়া আইন-হিসাবে আমরা গণ্য করিতে পারি কি না, তাহা নেশন-সঙ্ঘ (League of Nations) বিচার করুন।

ইংরাজ।—তুমি যদি আমাদের পাওনা টাকা না দাও, তাহা হইলে বাজারে তোমাদের Credit থাকিবে কি?

ফরাসী।—সে ভাবনায় তোমাদের নিদ্রা হইতেছে না। বাজারে Credit থাকিবে কি না, ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বে আমরা জর্ম্মণীর Creditor, সে কথা ভুলিয়া যাও কেন?

ইংরাজ।—তোমাদের বাজারে Credit না থাকিলে, তোমাদের ফ্রাঙ্ক জর্ম্মণীর মার্কের পিছনে ছুটিবে।

ফরাসী।—তোমাদের ষ্টার্লিং অবশ্যই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে না; সেও ফ্রাঙ্কের পিছনে ছুটিবে।

* * *

য়ুরোপ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছেন। প্রাচ্য-ভুবনের whispering galleryর ভিতর দিয়া আগমনীর স্নিগ্ধ মধুর সুর ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচী নব-জীবনের গান গাহিতেছে! কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে,—ওগো, কোথায় যাইতেছ! Quo Vadis!

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

ব্যয়ের বহর।
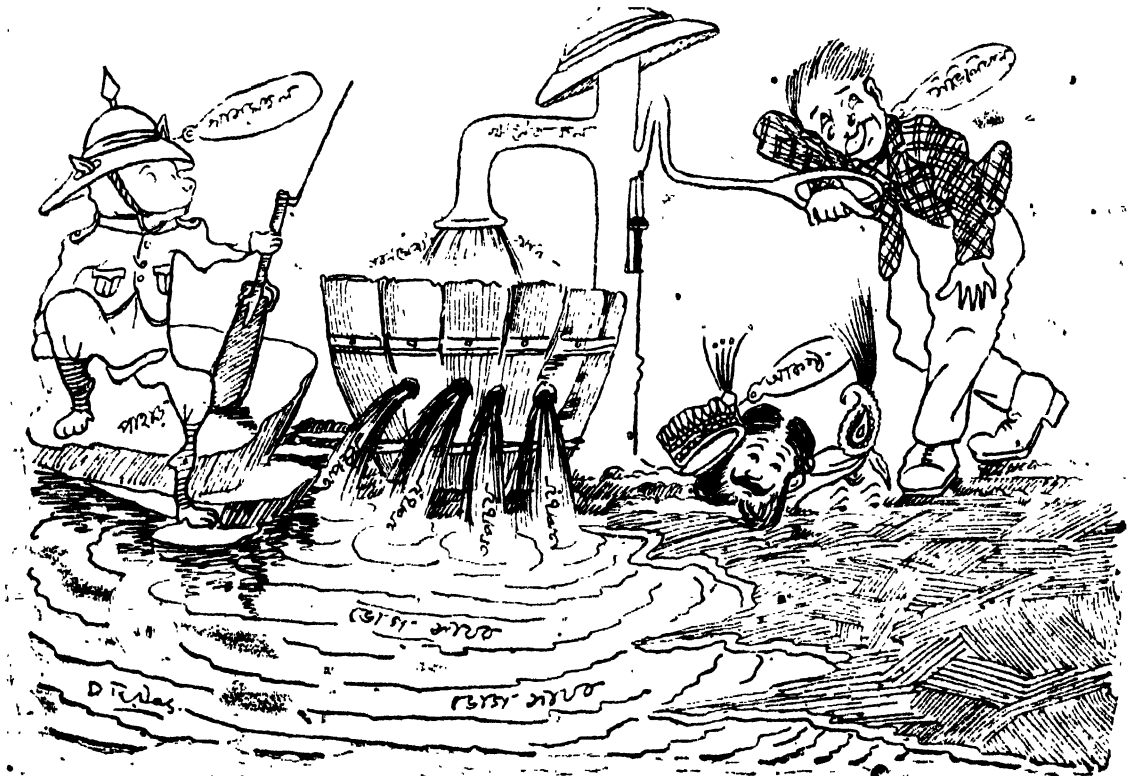
জ্যোৎস্না-রাত।

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

পাদ্রীর ডাক-নাম ছিল আবে-মারিয়ঁ। লোকটা পাত্‌লা, লম্বা, ধর্ম্মমতে গোঁড়া, সর্ব্বদাই পারত্রিক উচ্চচিন্তায় রত, কিন্তু খুব সরল। বিশ্বাসগুলা স্থির নির্দ্দিষ্ট, তাতে একটু এদিক্ ওদিক্ হবার যো ছিল না। তিনি অকপটভাবেই মনে কর্‌তেন,—তিনি তাঁর ঈশ্বরকে জানেন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প ও অভিপ্রায়ের ভিতর তিনি প্রবেশ কর্‌তে পেরেছেন। গ্রাম্য-পাদ্রীর ক্ষুদ্র একটি পল্লী-ভবনের বীথি-পথে যখন তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে চল্‌তেন, তখন কখনো কখনো তাঁর মনে এই প্রশ্নটা উদয় হ'ত; "ঈশ্বর ওটা কর্‌লেন কেন?" মনে মনে ঈশ্বরের স্থানে আপনাকে স্থাপন ক'রে, তিনি নাছোড়-বান্দা হয়ে এই বিষয়ের অনুসন্ধান কর্‌তেন—আর অনুসন্ধানে প্রায়ই সফল হতেন। "প্রভু, তোমার অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়"—ধার্ম্মিকের এই বিনয়-নম্র উচ্ছ্বাস তাঁর মুখ দিয়ে কখনও বেরোতো না; তিনি ভাব্‌তেন;—"আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের কৃত সমস্ত কাযের গূঢ় হেতু আমারই জান্‌বার কথা; যদি বা না জানি, অনুমান কর্‌তেও পারি।"

তাঁর মনে হ'ত—বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তা অতি চমৎকার,—তার গোড়ায় ন্যায়শাস্ত্রের মত অকাট্য নিয়ম রয়েছে। "কেন?" ও "যে-হেতু"—এই দুয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই মিল হ'য়ে যাচ্ছে। জাগরণে আনন্দ দেবার জন্য উষার সৃষ্টি, ফসল পাকাবার জন্য দিনের সৃষ্টি, ফসলে জল দেবার জন্য বৃষ্টির সৃষ্টি, নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে সন্ধ্যার সৃষ্টি, আর ঘুমাবার জন্য অন্ধকার রাতের সৃষ্টি।

কৃষির সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে চার ঋতুর সম্পূর্ণ মিল আছে। এ কথা পাদ্রীর মনে কখন একবার সন্দেহও হ'ত না যে, বিশ্বপ্রকৃতির কোনও উদ্দেশ্য নেই, বরং বিশ্বপ্রকৃতি কেবল দেশ, কাল ও ভৌতিক পদার্থের কঠোর প্রয়োজনের তাড়াতেই আপনাকে ক্রমাগত নোয়াচ্ছে, বাঁকাচ্ছে।

কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর তাঁর ভয়ানক বিদ্বেষ ছিল, এই বিদ্বেষটা তাঁর অজ্ঞাতসারেই ছিল—স্বভাবতঃই তিনি স্ত্রীলোককে দুই চক্ষুতে দেখ্‌তে পার্‌তেন না। খৃষ্টের এই কথাটা তিনি সর্ব্বদাই আবৃত্তি কর্‌তেন; "রমণি!—আমার ও তোমার মধ্যে এমন কি আছে যা' সমান?" তিনি এই কথার সঙ্গে আর একটু যোগ ক'রে দিতেন;—"দেখে মনে হয় যেন, স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর এই নারী-সৃষ্টির উপর অসন্তুষ্ট।" পাদ্রীর মতে, এই কবির উক্তির চেয়ে রমণী ১২ গুণ অপবিত্র। নারী প্রলোভক; নারী লোভ দেখিয়ে, আদিম মানুষকে কুপথে এনেছিল; নরকে নিয়ে যাবার কায এখনো তার চল্‌ছে। এই জীবটি দুর্ব্বল, বিপদাবহ, কি-এক-রকম গূঢ়ভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়।

যদিও তিনি আপনাকে নারীর আক্রমণের অতীত ব'লে জান্‌তেন, তবু অনেক সময় নারীর স্নেহ-মমতাও বেশ অনুভব করেছিলেন। নারীর অন্তরে এই যে ভালবাসার একটা তাগিদ সর্ব্বদাই দেখা যায়, এইটে মনে হ'লেই তিনি একেবারে আগুন হ'য়ে উঠ্‌তেন।

তাঁর মতে,—পুরুষকে প্রলোভিত করবার জন্যই, পরীক্ষা করবার জন্যই ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করেছেন। পাছে তারা ফাঁদে ফেলে, এই জন্য আত্মরক্ষার উদ্দেশে খুব সতর্কতার সহিত, ভয়ে ভয়ে তাদের কাছে এগোনো দরকার। যে ফাঁদ পুরুষের দিকে সর্ব্বদাই বাহু বাড়িয়ে আছে, ঠোঁট বাড়িয়ে আছে—এইরূপ একটা আস্ত ফাঁদ হচ্চে নারী।

কেবল মঠের সেবিকাদের তিনি একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ্‌তেন, কেন না, তাদের গৃহীত ব্রতই তাদের নির্দ্দোষ ক'রে রেখেছে। কিন্তু তবু তাদেরও প্রতি সময়ে সময়ে তিনি কঠোর ব্যবহার কর্‌তেন, যখন তিনি অনুভব কর্‌তেন, তাদেরও শৃঙ্খলিত হৃদয়ের অন্তস্তলে, তাদেরও শাসন-সংযত হৃদয়ের অন্তস্তলে এই চিরন্তন বহ্নিটা সর্ব্বদাই জ্বল্‌ছে,—আর পাদ্রী হ'লেও, তার একটু আঁচ তাঁর গায়ে কখন কখন এসে লাগ্‌ত।

মঠের ভিক্ষুণীদের দৃষ্টির চেয়েও, এই সেবিকাদের ধর্ম্ম-পূত স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে, তাঁদের নারীত্ব-মিশ্রিত যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে, খৃষ্টের প্রতি তাদের ঐকান্তিক অনুরাগের মধ্যে—

(এই অনুরাগ তাঁর ভাল লাগ্‌ত না, কেন না, এটা মেয়েলি ধরণের প্রেম, রক্ত-মাংসের প্রেম)—এই সমস্তের মধ্যে তিনি সেই জঘন্য প্রেমের ভাব উপলব্ধি করতেন। এমন কি, তাদের শিষ্টতার মধ্যেও, তাঁর সহিত কথা কবার সময়, তাদের কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার মধ্যেও, তাদের আনত দৃষ্টির মধ্যেও, তিনি যখন তাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতেন, তখন তাদের সেই সহিষ্ণু অশ্রুর মধ্যেও তিনি এই প্রেমের পরিচয় পেতেন।

তার পর, যখন তিনি মঠের দরজা থেকে বেরোতেন,—তিনি তাঁর আলখাল্লাটা ধ'রে একবার ঝাড়া দিতেন। আর, যেন একটা বিপদের হাত থেকে এড়ালেন, এই ভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রস্থান করতেন।

তাঁর এক বোন্‌ঝী ছিল;—সে, পাশের ছোট একটা বাড়ীতে তার মা'র সঙ্গে থাকৃত। পাদ্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা, সে "সেবব্রতা ভগিনী" দলভুক্ত হয়।

মেয়েটি দেখ্‌তে সুশ্রী, একটু মাথা পাগ্‌লা, ও পরিহাস-প্রিয়। যখন পাদ্রী গির্জ্জায় ধর্ম্মব্যাখ্যা করতেন, তখন সে হাস্‌ত; আর, যখন তার উপর রাগ করতেন, মেয়েটি তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে চুম্বন কর্‌ত। যদিও তিনি অজ্ঞাতসারে তার হাত থেকে আপনাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতেন; তবু ভিতরে-ভিতরে একটা মধুর আনন্দরসের আস্বাদ পেতেন—তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে একটা পিতৃত্বের ভাব জেগে উঠ্‌ত—যা' সকল পুরুষের মনেই প্রসুপ্ত থাকে।

পাদ্রী তার সঙ্গে মাঠের রাস্তা দিয়ে যখন চল্‌তেন, তখন প্রায়ই তাকে ঈশ্বরের কথা বল্‌তেন, তাঁর সেই নিজস্ব ঈশ্বরের কথা বল্‌তেন। কিন্তু মেয়েটি তাঁর কথায় কান দিত না; সে আকাশের দিকে, ঘাসের দিকে, ফুলের দিকে চেয়ে থাক্‌ত। তার চোখের দৃষ্টিতে, একটা প্রাণের স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হ'ত। কখন কখন কোন উড়ন্ত পতঙ্গ ধর্‌বার জন্য ছুটে যেত, তার পর, ধ'রে নিয়ে এসে বল্‌ত, "মামা, দেখ-দেখ, কেমন সুন্দর! আমার একে চুমো খেতে ইচ্ছে কর্‌ছে।" এই পতঙ্গকে চুমো খাবার ইচ্ছেটা, ফুলকে চুমো খাবার ইচ্ছেটা পাদ্রীর বড়ই খারাপ লাগ্‌ত—তিনি এতে চটে উঠ্‌তেন; তাঁর মনে হ'ত, যে প্রেমের ভাব নারীর হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কুরিত হয়, সেই দুশ্ছেদ্য-মূল প্রেমের অঙ্কুর এর ভিতরেও দেখা যাচ্ছে।

তার পর একদিন, গির্জ্জায় এক ভৃত্যের স্ত্রী—যে পাদ্রীর ঘর-কন্না দেখ্‌ত—সে খুব গোপনে পাদ্রীকে বল্লে যে, তাঁর বোন্‌ঝীর এক ভালবাসার লোক আছে।

পাদ্রী এই কথা শুনে একেবারে আগুন হ'য়ে উঠ্‌লেন; তখন গোঁপ-দাড়ি কামাবার জন্য মুখটা সাবানের ফেনে আচ্ছন্ন করেছিলেন,—দম আট্‌কাবার মত হ'য়ে এই অবস্থাতেই বসে গেলেন।

তার পর একটু হাঁপ ছেড়ে, যখন বিবেচনা-শক্তি ফিরে এল, তখন তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "এ কখনো সত্যি নয়, মেলানি, তুমি মিথ্যা কথা বল্‌ছ।"

কিন্তু এই চাষার মেয়ে বুকে হাত রেখে বল্লে:—"আমাদের মহাপ্রভু বিচার করবেন, যদি আমি মিথ্যে কথা ব'লে থাকি, পাদ্রীমশায়। আমি আপনাকে বল্‌ছি, আপনার বোন্ শুতে গেলেই, আপনার বোন্‌ঝী প্রতিদিন রাত্রিতে তার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যায়। নদীর ধারে তারা একসঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ায়। ১০টা থেকে ১২টা রাতের মধ্যে সেখানে গেলেই আপনি দেখ্‌তে পাবেন।"

পাদ্রী দাড়ি কামাতে ক্ষান্ত হলেন; আর, তাঁর গুরুগম্ভীর ধ্যান-চিন্তার সময় তিনি যে রকম ঘরের মধ্যে সজোরে পায়চারি করতেন, সেই রকম পায়চারি করতে লাগ্‌লেন। তার পর যখন আবার দাড়ি কামাতে ইচ্ছে হ'ল, তখন দাড়ি কামাতে গিয়ে, নাক থেকে কান পর্য্যন্ত, তিন যায়গা কাট্‌লেন।

সমস্ত দিনটা, রাগে ও রোষে গুম্ হ'য়ে রইলেন। এই যে দুর্জ্জয় প্রেমের উপর তাঁর প্রচণ্ড রোষ—এই পাদ্রী-সুলভ রোষের সঙ্গে আবার পিতার রোষ, অভিভাবকের রোষ যুক্ত হ'ল। একটা বাচ্চা-মেয়ে কি না তাঁকে ঠকালে, প্রবঞ্চনা করলে, তাঁর সঙ্গে চালাকি করলে! কোনও মেয়ে, বাপ মাকে না জানিয়ে যখন আপনার ইচ্ছামত আপনার বর ঠিক ক'রে তার পর তাঁদের জানায়, তখন বাপ-মা'র আত্মাভিমানে যে রকম আঘাত লাগে, সেই রকম ঘা খেয়ে পাদ্রীর প্রায় শ্বাসরোধ উপস্থিত হ'ল।

আহারের পর, তিনি একটু বই পড়্‌বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পার্‌লেন না; ক্রমেই রেগে-রেগে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। ঘড়ীতে যখন ১০টা বাজ্‌ল, তখন তিনি তাঁর বেড়াবার ছড়িটা হাতে নিলেন। আসলে এটা বেতের ছড়ি নয়—এটা ভীষণ

ওক্-গাছের একটা কোঁৎকা বল্লেও হয়! যখন তিনি রাত্রিতে রোগী দেখ্বার জন্য বের হ'তেন, তখনই তিনি এই লাঠিটা ব্যবহার কর্তেন।

তাঁর মোটা দৃঢ় মুষ্টিতে লাঠিটা ধ'রে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে লাঠিটা দেখ্তে লাগ্লেন; তার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, দাঁত কিড়্মিড়্ কর্তে-কর্তে একটা চৌকির উপর সজোরে লাঠির এক ঘা বসিয়ে দিলেন—চৌকির পিঠটা চূর্মার্ হ'য়ে ভেঙ্গে ঘরের মেজের উপর পড়ে গেল।

তিনি বাহিরে বেরোবার জন্য দরজা খুল্লেন; কিন্তু সচরাচর যা দেখা যায় না—চাঁদের প্রদীপ্ত কিরণচ্ছটায় আকাশ প্লাবিত দেখে তিনি দরজার সাম্নে থম্কে দাঁড়ালেন। গির্জ্জার প্রধান পাদ্রীদের মন স্বভাবতঃই যে রকম ঊর্দ্ধদিকে উধাও হ'য়ে ধাবিত হয়, কবিসুলভ নানা প্রকার কল্পনার স্বপ্ন দেখে, ইনিও সেইরূপ এই শুক্ল-নিশার মহান্ ও প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছিলেন।

তাঁর ছোট বাগানটিতে, সারি সারি ফলের গাছগুলো এই মধুর আলোয় স্নাত হ'য়ে, হরিৎপত্র-বিরহিত স্বকীয় শীর্ণ ডাল-পালার ছায়া, উদ্যান বীথিকার উপর যেন এঁকে দিয়েছিল। এ দিকে, বৃহৎ মাধবী লতা, তাঁর বাড়ীর উপর লতিয়ে উঠে অতি মধুর সুরভি নিশ্বাস ফেল্‌ছিল; এই মৃদু গ্রীষ্ম-রাত্রিতে একটা যেন সুরভিত আত্মা চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

পাদ্রী খুব টেনে-টেনে নিশ্বাস নিতে লাগ্লেন,—মাতাল যে রকম সুরা পান করে, সেই ভাবে। তার পর বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে আবার ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্লেন। তাঁর ভাগিনীর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন।

মাঠ-ময়দানের মধ্যে এসেই আবার থম্কে দাঁড়িয়ে এই জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রশান্ত নৈশ সৌন্দর্য্য মুগ্ধভাবে ধ্যান কর্তে লাগ্লেন। আহা! চন্দ্র-কিরণের মদালস কোমল স্পর্শে মাঠ-ময়দান যেন আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভেকেরা ছাড়া-ছাড়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আকাশকে মুখরিত করছে; সেই সঙ্গে দূর হ'তে গায়ক বিহঙ্গের মধুর সঙ্গীত মিশে এক অপূর্ব্ব মোহজাল রচনা করেছে;—আজ রাতে এই সঙ্গীত যেন মোহিনী কৌমুদীর মধুর প্ররোচনায় কেবল প্রেমিকদের চুম্বনের জন্যই রচিত হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে।

পাদ্রী আবার চল্‌তে আরম্ভ কর্লেন। মনটা যেন উদাস হয়ে যাচ্ছিল—কেন, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন না। তিনি আবেগভরে একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়লেন; মনে কর্লেন, এইখানে একটু ব'সে, একটু বিশ্রাম ক'রে, ঈশ্বরের রচনার মধ্যে ঈশ্বরকে ধ্যান কর্বেন, ঈশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন কর্বেন।

ঐ ও-দিকে একটি ক্ষুদ্র নদীর তরঙ্গিত গতির অনুসরণ ক'রে সারি সারি ঝাউগাছ অনেক দূর পর্য্যন্ত এঁকে বেঁকে গেছে। একটা সাদা বাষ্প চন্দ্রকিরণ লেগে রূপোর মত ঝিক্‌মিক্ কর্‌চে—সমস্ত তীরের উপর—আঁকা-বাঁকা সমস্ত জলের উপর যেন একটা স্বচ্ছ সোনার লঘু আচ্ছাদন ঝুলিয়ে দিয়েছে।

পাদ্রী আবার থম্কে দাঁড়ালেন; একটা দুর্দ্দমনীয় অনিবার্য্য কোমল ভাব তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ কর্‌ল।

একটা সন্দেহ, একটা অস্পষ্ট ভাবনা তাঁর মনকে অধিকার কর্‌ল। কখন কখন তাঁর মনে যে রকম প্রশ্ন উদয় হ'ত, এখন আবার সেই রকম একটা প্রশ্ন তাঁর মনে এসে উপস্থিত হ'ল।

ঐ জিনিষটা ঈশ্বর কেন সৃষ্টি কর্লেন? রাত্রি ত নিদ্রার জন্যই নির্দ্দিষ্ট; অচেতনার জন্য, বিশ্রামের জন্য, সমস্ত বিস্মৃত হবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। তবে কেন ঈশ্বর রাতকে দিনের চেয়ে রমণীয় কর্লেন, উষার চেয়ে, সন্ধ্যার চেয়ে মধুর কর্লেন; এই ধীরগতি চিত্তবিমোহন উপগ্রহটাকে সূর্য্যের চেয়েও কেন কবিত্বরসে পূর্ণ কর্লেন? বেশী আলো সহ্য হয় না,—এই রকম সুকুমার ও রহস্যময় ব্যাপার সকল উদ্‌ঘাটন কর্‌বার জন্য, অন্ধকারকে একটু স্বচ্ছ ক'রে তোল্‌বার জন্যই কি চাঁদের সৃষ্টি?

খুব ভালো গাইয়ে পাখীরা অন্য পাখীদের মত বিশ্রাম কেন করে না?—বিশ্রাম না ক'রে কেন এই চিত্তক্ষুব্ধকারী ছায়ার মধ্যে গান গাইতে আরম্ভ করে?

পৃথিবীর উপর কেন এই অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠন ফেলা হয়েছে? কেনই বা এই সব হৃদয়ের স্পন্দন, আত্মার আবেগ, শরীরের এলিয়ে-পড়া ভাব?

বিছানায় শুয়ে মানুষ কেন এই সব মন-ভোলানো কুহকজাল দেখ্‌তে পায় না? তবে কাদের জন্য এই মহান্ দৃশ্য? কাদের জন্য এত কবিত্ব অজস্র ধারায় স্বর্গ হ'তে পৃথিবীর উপর বর্ষিত হচ্ছে?

পাদ্রী কিছুই বুঝতে পার্‌ছিলেন না। কিন্তু দেখ দেখ, ঐ দিক্‌-পানে, মাঠ-ময়দানের ধারে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার্দ্র তরু-মণ্ডপের নীচে, দুইটি ছায়া-মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে—দুটিতে হাত-ধরাধরি ক'রে পাশাপাশি চলেছে।

পুরুষটি মাথায় বেশী উঁচু, হাত দিয়ে মেয়েটির গলা জড়িয়ে ধ'রে আছে এবং মাঝে মাঝে তার ললাট চুম্বন কর্‌ছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা দুজনেরই খুব ভাল লেগেছে। তাদের মনে হচ্ছিল, যেন তারা দুইজন একই প্রাণী এবং তাদের জন্যই যেন এই প্রশান্ত নিস্তব্ধ রজনীর সৃষ্টি হয়েছে। তখন যেন ঐ যুগল-মূর্ত্তি পাদ্রীর প্রশ্নের জলজ্যান্তো জাবন্ত উত্তরের মত মনে হ'ল—তাঁর মনে হ'ল, স্বয়ং মহাপ্রভু যেন তাঁর প্রশ্নের এই উত্তর পাঠিয়েছেন।

পাদ্রী দাঁড়িয়ে রইলেন; তাঁর বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগ্‌ল, বাইবেল গ্রন্থে যে রুথ ও বুজের প্রেম-কাহিনী আছে, তিনি যেন তাই স্বয়ং দেখ্‌তে পেলেন—পবিত্র গ্রন্থের শ্লোকগুলি তাঁর কানে গুঞ্জন কর্‌তে লাগ্‌ল; সেই জ্বালাময়ী কবিতার জলন্ত কবিত্বে তাঁর সমস্ত শরীরকে কণ্টকিত, মনকে পুলকিত ক'রে তুল্‌ল।

তিনি মনে মনে ভাব্‌লেন,—মানুষের পার্থিব প্রেমকে স্বর্গীয় আদর্শ-প্রেমের আচ্ছাদনে আবৃত কর্‌বার জন্যই বুঝি ঈশ্বর এই সব রাতের সৃষ্টি করেছেন। প্রেমিক-যুগল হাত-ধরাধরি ক'রে বরাবর এগিয়ে চল্‌ছিল—পাদ্রী পিছিয়ে ছিলেন। পাদ্রীর মনে হ'ল, এ নিশ্চয়ই তাঁর ভাগ্নী। কিন্তু, পাদ্রীর মনে আবার এই সন্দেহ উপস্থিত হ'ল, তিনি এই প্রেমে প্রশ্রয় দিলে, ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করা হবে না ত? ঈশ্বর যে এমন দীপ্তিচ্ছটা, এমন মোহন দৃশ্য চারিদিকে বিস্তার করেছেন, তাতে কি বোধ হয় না, তিনিও সাক্ষাৎভাবে এই প্রেমকেই প্রশ্রয় দিচ্চেন?

পাদ্রী অবসন্ন হ'য়ে, কতকটা লজ্জিত হ'য়ে সেখান থেকে পলায়ন কর্‌লেন;—যেন এমন-একটা মন্দিরে তিনি প্রবেশ করেছেন, যেখানে প্রবেশ কর্‌বার তাঁর কোনও অধিকার ছিল না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃপণের বদান্যতা।

টাকার কুমীর প্রেমদাস গুঁই কঞ্জুস ছিল বড়।
ছাড়িত না সুদ একটি পয়সা যত হাতে পায়ে ধর॥
তুলসীর মালা গলায় তাহার হরিনাম-ঝোলা হাতে।
সুদের হিসেব করিতে করিতে বেড়াত' উঠানে ছাতে॥
এক মুঠো কভু অন্ন দেয়নি, অতিথে দেয়নি ঠাঁই।
চাঁদা চাহিলেই বলিত "তবিলে একটি ছিদেম-ও নাই॥"
একটি মুষ্টি ভিক্ষা চাহিলে লাঠী নিয়ে যেত তেড়ে।
আধপেটা খেয়ে টেনা পরে, টাকা মাটীতে রাখিত গেড়ে॥
সহসা একদা,—ভগবান্ কারে নিয়ে যান কোন্ দিকে,—
তার আজীবন-সঞ্চিত ধন খয়রাতে দিল লিখে॥
ডাক্তারখানা টোল ইস্কুল দেউল অতিথশালা।
নির্ব্বাণ তরে সব দিল, শুধু রেখে ঝোলা আর মালা॥
নামাবলী গায় কাঁথাখানি ঘাড়ে শ্রীরাধামাধব বলে'।
প্রেমদাস গুঁই গেলেন সহসা শ্রীবৃন্দাবন চলে'॥
যার নাম কেহ করিত না ভয়ে কভু, পাছে হাঁড়ী ফাটে।
শতবার তার নাম না করিয়া কারো দিন নাহি কাটে॥
চন্দনতরু একটিও ফল দেয়নি ক্ষুধিতে ভুলে।
একটিও ফুল ফুটায়ে কখনো তুষেনিক অলিকুলে॥
দুর্গম মূলদেশে তার কেউ পায়নি শীতল ছায়া।
ব্যাঘ্র-শাসিত কানন তাহার সর্পে ভূষিত কায়া॥
একদা তাহার সকল অঙ্গ নিবেদিল অকাতরে।
দারুভূত ঐ নিবিড় ভক্তি পলে পলে রস ক্ষরে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

১

যে 'গেজেটে' সাব-জজ যোগেন্দ্রনাথের "রায় বাহাদুর" খেতাব ও শেশন জজের পদপ্রাপ্তিতে অনেক চাকুরীয়ার মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছিল, তাহার ঠিক পরের 'গেজেটেই' যখন প্রকাশিত হইল—তিনি চাকরীতে ইস্তাফা দিয়াছেন, তখন তাঁহার মত চাকুরীয়াদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। কিন্তু কি কারণে তিনি চাকরীতে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিতে পাইয়াও উঠিলেন না—সরাসরি নামিয়া আসিলেন—তাহা অনেকেই জানিতে পারিল না। লোকের কৌতুহল নিবারণের পথটিও তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন—বিদায় লইয়াই কাশীবাস করিতে গেলেন। যোগেন্দ্রনাথের কাশীবাস তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে তাঁহার চাকরীত্যাগ অপেক্ষাও বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল।

কারণ, যে সময় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরা "হাকিম" ও মুন্সেফরা "নিরীহ" বলিয়া বিবেচিত হইতেন, সে সময়েও যোগেন্দ্রনাথ সর্ব্ববিষয়ে ডেপুটীদের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলিতেন। তিনি চাপকান চোগা পরিতেন না—কলার টাই ব্যবহার করিতেন—দেশী মুচীর গড়া জুতা কখনও তাঁহার শ্রীচরণ আবৃত করিত না—তাঁহার বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণও যেমন ছিল, তেমনই মুসলমান বাবুর্চ্চীও বিরাজ করিত—চাকরকে তিনি "বয়" বলিয়া ডাকিতেন—হুক্কা পরিহার করিয়া তিনি হাভানা চুরুট টানিতেন—তাঁহার কন্যা লজ্জাবতীকে তিনি "লিজি" বলিতেন এবং বিলাতে না যাইয়া এ দেশে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যতটা স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখিতে পাইতেন, তাহা কন্যাকে দিতেন—ইত্যাদি। তিনি পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছিলেন; এবং তাহার পর শ্বশুরের উইলে থোক এক লক্ষ টাকা তাঁহার স্ত্রীর হস্তগত হইয়াছিল। এ হেন যোগেন্দ্রনাথ জীবনের ও চাকরীর চরম ও পরম উদ্দেশ্য উপাধি ও জজীয়তী পাইয়াই ছাড়িয়া একেবারে কাশীবাস করিতে যাইলেন—ইহাতেও যদি মানুষ বিস্মিত না হয়, তবে তাহারা, বোধ হয়, কিছুতেই বিস্মিত হইবে না।

২

লজ্জাবতী যোগেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান—তাহার জন্মের পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যোগেন্দ্রনাথের স্নেহ কন্যাই সমধিক লাভ করিয়াছিল এবং তিনি তাহাকে ছবি আঁকা হইতে পিয়ানো বাজান পর্য্যন্ত নানা ইঙ্গ-বঙ্গ-প্রিয় বিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। মেয়েকে এক দিন সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহে দিতে হইবে, ইহা তাঁহার কল্পনাতেও আইসে নাই। কিন্তু কন্যা যখন দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশে এবং ত্রয়োদশও অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশে পদার্পণ করিল, তখন গৃহিণীর অবিরাম চেষ্টায় কন্যার বিবাহের কথা যোগেন্দ্রনাথকেও ভাবিতে হইল। অথচ তখন কন্যার শিক্ষার ও চাল-চলনের সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—শিক্ষা তখন "গুণ হৈয়া দোষ" হইয়াছে—সাধারণ হিন্দুর ঘরে সে 'মেম মেয়েকে' লইতে কেহ সাহস করে না। যোগেন্দ্রনাথ ইহাতেও বিচলিত না হইলেও গৃহিণীর ব্যাকুলতা তাঁহাকে অবিচলিত থাকিতে দিতেছিল না।

এই সময় "শশী মোক্তার" তাঁহাকে অকূলে কূল দেখাইয়া দিলেন। শশিকান্ত সে জিলায় সাহা জমীদারদিগের আম-মোক্তার। তিনি খুব মজলিশী লোক—যেন চোখে মুখে কথা কহেন; বেশটি সর্ব্বদা পরিপাটী, কথায় খুব বাঁধুনী; সংবাদপত্র হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া খুব "আপ-টু-ডেট।" ডেপুটী, মুন্সেফ প্রভৃতি হাকিমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং জজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেলাম বাজান ও ভোট যোগান তাঁহার কার্য্য।

যাঁহার যে জিনিষের প্রয়োজন হয়, জানিতে পারিলেই শশী মোক্তার তাহা যোগান এবং মামলা-মোকর্দ্দমায় তাহার প্রতিদান ও যে না পাইয়া থাকেন, এমন নহে। যে সময় জমীদারের একটা চরের স্বত্ব লইয়া একটা বড় মামলা যোগেন্দ্রনাথের আদালতে দায়ের ছিল এবং তাঁহার কাছে শশী মোক্তারের যাতায়াতটাও কিছু অধিক হইয়াছিল, সেই সময় তিনি সাব-জজ বাবুর কন্যাদায়ের কথা শুনিয়া বলিলেন—"এই কথা! তা' এতদিন আমায় বলেননি কেন? মা যেমন 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী', আমি তেমনই পাত্র এনে দেব।" অতিরঞ্জনে শশী মোক্তারের স্বাভাবিক পটুত্ব থাকিলেও পাত্রের বর্ণনায় সে অতিরঞ্জন করে নাই। পাত্রটি তাহার ভাগিনেয়। ভগিনীপতি গ্রামের স্কুলে মাষ্টার ছিলেন—বিধবা ভগিনীর সেই এক সন্তান। অবস্থা ভাল নহে। তবে শশী মোক্তার যে বলিতেন, তিনিই ছেলেটিকে পড়ান—সে কথা সত্য ও মিথ্যা। ছেলেটির সাধারণ ব্যয় তাহার বৃত্তিতেই চলিয়াছে; তবে পরীক্ষার ফীস ও পুস্তক কিনিবার টাকা সময় সময় শশী মোক্তারকে দিতে হইয়াছে। ছেলেটি যেমন সুরূপ, তেমনই সচ্চরিত্র। ছেলে এতদিন বিবাহ করিতে চাহে নাই—শশী মোক্তারও বিশেষ চেষ্টা করেন নাই—কারণ, বিবাহ দিয়া টাকাটা যে তিনি লইতে পারিবেন, এমন সম্ভাবনা ছিল না; ছেলেটি খুব হুঁসিয়ার। এবার বিবাহে ছেলের আপত্তি একটু কমিয়া আসিয়াছিল; কেন না, মা অত্যন্ত জিদ করিতেছিলেন আর এম, এ, পাশ করিবার পর আইন কলেজে তাহার কোন বৃত্তির আয়ও ছিল না। শশী মোক্তার এই ছেলের সন্ধান দিলে যোগেন্দ্রনাথ একবার আগাইতে একবার পিছাইতে লাগিলেন; ছেলেটি ভাল, কিন্তু বড় গরিব। শেষে তিনি একবার ছেলেটিকে দেখিতে চাহিলেন। শশী মোক্তার বলিলেন, "এ—ই কথা; আমি তা'কে আনাচ্ছি।" তিনি ভাগিনেয়কে একটা কাযের ছল করিয়া একবার আসিতে লিখিলেন।

ছেলে আসিলে তাহাকে দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইলে—যোগেন্দ্রনাথের আর সে সম্বন্ধে আপত্তি রহিল না। চমৎকার ছেলে—সে উকীল হইলে তিনি তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া আনিবেন। বিলাতের একটা মোহ যোগেন্দ্রনাথকে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। তিনি নিজে কালাপাণি পার হইতে পারেন নাই—কিন্তু তাঁহার বড় সাধ ছিল, ছেলে ও জামাই বিলাতে যাইবে। যোগেন্দ্রনাথ শশী মোক্তারকে বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আমার অমত নেই, কিন্তু আপনার ভগিনীর যে অবস্থা, তা'তে এখন ত মেয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে পার্‌ব না।" শশী মোক্তার বলিলেন, "সে ত বটেই; সেখানে বনগাঁয়ে কোথায় এ সোনার প্রতিমা নিয়ে যাবে? সে আমি ঠিক ক'রে দেব।"

শশী মোক্তার তখন ভগিনীর বাড়ী যাইয়া ভগিনীকে বুঝাইলেন, "ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না দিলে, ছেলে হয় ত একটা খৃষ্টানের মেয়ে বিয়ে কর্‌বে।" মা সব শুনিয়া বলিলেন, "তুমি এ মেয়ের সঙ্গেই বিমলের বিয়ে ঠিক ক'রে দাও। দু'বছর বই ত নয়—এত দিন যেমন কেটেছে, আর দু'বছর তেমনই কাট্‌বে; আমি বৌ আন্‌ব না।"

মাও যখন জিদ্ করিতে লাগিলেন, তখন বিবাহে বিমলের আপত্তিও কমিয়া গেল। আজকালকার ছেলে—ঘোমটা-পরা লজ্জায় জড়সড় লিখাপড়া-না-জানা মেয়ে বড় পসন্দ করে না। তাহারা যেমনটি চাহে—লজ্জাবতী তেমনই বটে।

৩

বিবাহের পর এক বৎসর প্রেমের নেশায় কাটিয়া গেল—ছুটী পাইলেই বিমল শ্বশুরবাড়ী আসিত—হয় ত ফিরিবার সময় একবার মা'র কাছে যাইত। যত দিন সে কলিকাতায় থাকিত, স্বামিস্ত্রীতে প্রতিদিন পত্র চলিত—মেসের ছেলেরা বলিত, "বিমল বাবুর 'ডেলীমেল'।" বিমল যতই স্ত্রীর হৃদয়ের পরিচয় পাইতে লাগিল, ততই মুগ্ধ হইতে লাগিল—এত ভালবাসা! এক বৎসর কাটিয়া গেল- প্রেমের রঙ্গিন নেশা ফিকা না হইয়া আরও ঘোরাল হইয়া উঠিল। বিমলের মা'র কাছে যাইবার জন্যই বা লজ্জাবতীর কত আগ্রহ! সে বলিত, "তুমি একবার বাবাকে বল—আমি যা'ব; মা সেখানে একা, এ কি ভাল দেখায়?"—বিমলই তাহাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিত, "বাড়ীতে ত আর কেউ নেই; মা একা; আর ত একটা বছর, তা'র পর আমি মা'কেও কল্‌কাতায় নিয়ে যা'ব; তুমিও যা'বে"—বলিয়া সে পত্নীকে আদর করিত। লজ্জাবতী প্রতি সপ্তাহে শাশুড়ীকে পত্র লিখিত। মা সেজন্য ছেলের কাছে তাহার কত প্রশংসা করিতেন; বলিতেন, "আর একটা বছর গেলে হয়—আমার ইচ্ছা হয়, দিনগুলাকে হাত দিয়ে ঠেলে ফেলি।"

দিন হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিবার না হইলেও দিন দিন কাটিয়া সে বৎসর শেষ হইল। তাহার পর আইনের শেষ পরীক্ষা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বিমল শ্বশুরবাড়ী গেল—এবার স্বামিস্ত্রীতে ভবিষ্যতের ব্যবস্থার আলোচনা করিতে লাগিল। যোগেন্দ্রনাথ তাহার বিলাতযাত্রার কথা বলিলে তাহা যেন বিমলের ভাল লাগিত না।

৪

বিলাতে যাইবার কথা যে বিমলের ভাল লাগিত না, তাহার কারণ ছিল; প্রথম—স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে যুবকের মন সরিত না; দ্বিতীয়—মা এতকাল একা কাটাইয়াছেন, এবার ছেলে-বৌ লইয়া ঘর করিবেন—তাঁহাকে সে আশায় বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু আরও একটা কারণ ছিল;—তখন পঞ্জাবে ভারতবাসীর লাঞ্ছনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে—সমগ্র ভারত সেই অপমানের বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং বিদেশের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লাঞ্ছিত স্বদেশীর পাশে আপনার স্থান সন্ধান করিতেছে—ভারতবাসীর আত্মস্থ হইবার ডাক আসিয়াছে। একে এ সময়, আর বিদেশে—শাসক-সম্প্রদায়ের দেশে যাইতে বিমলের ইচ্ছা হইতেছিল না, তাহাতে আবার যোগেন্দ্রনাথ যে বলিতেন, "ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলী চালিয়ে ঠিক কাজ করেছে—নইলে দুষ্টলোকগুলা সায়েস্তা হ'ত না"—তাহাতে বিমল এত বিরক্ত হইত যে, সে যত শীঘ্র স্ত্রীকে লইয়া যাইতে পারে, সেই চেষ্টা করিতেছিল। বিমল স্বভাবত: "খোলা" লোক ছিল—তাহাতে আবার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার জন্য সে কোন কথা স্ত্রীর কাছে গোপন করিত না—কাযেই সে কথাও সে লজ্জাবতীকে বলিয়াছিল। লজ্জাবতীরও স্বামীর মত ছাড়া অন্য মত ছিল না।

বিবাহের পূর্ব্বে—বিমল সময় সময় মামার কাছে আসিয়াছে; কাযেই সে সহরে তাহার পরিচিত যুবক ছিল এবং তাহারা জানিত—বিমল সুকণ্ঠ। বিমল "হাকিমের জামাই" হইবার পরও যখনই শ্বশুরবাড়ী আসিত, তখনই পূর্ব্ব-পরিচিতদিগের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিত যে, কেহ তাহার ব্যবহারের নিন্দা করিতে পারিত না। প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে তাহারা সহরের বাহিরে নদীর ধারে মাঠে যাইয়া বসিত। গাছের উপর পাখীর ডাক, আকাশের গায় বর্ণের খেলা, নদীর জলে তরঙ্গ-ভঙ্গ—তাহারই মধ্যে বিমল যখন গান করিত, তখন সকলেই মুগ্ধ হইয়া সে গান শুনিত। শেষে আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিলে সকলে ফিরিয়া আসিত। "যা'র তা'র" সঙ্গে এমন ভাবে মিশা যোগেন্দ্রনাথ ভাল দেখিতেন না। কিন্তু তিনি স্ত্রীকে সে কথা বলিলে গৃহিণী যখন বলিলেন, "তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি। ছেলে মানুষ, সারাদিন কি বাড়ীতে আটকান থাকতে পারে। ও সব ছেলে ওর আলাপী—ওদের সঙ্গে মেশা বন্ধ করলে ওরাই বা কি বলবে?"—তখন সে দিকেও সহানুভূতি না পাইয়া যোগেন্দ্রনাথ সে কথা আর তুলিলেন না। তিনি যে কিছু ভয় করিতেন স্ত্রীকে।

৫

সে দিন মধ্যাহ্নে বিমল লজ্জাবতীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল। যোগেন্দ্রনাথ আদালতে গিয়াছেন। বিমল মা'র কাছে যাইবে যাইবে করিয়াও যাইতে পারিতেছে না—যাইতে মন সরিতেছে না। এখনও ত ছুটী আছে,—বলিয়া মনকে বুঝাইয়া সে স্ত্রীর কাছে রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ আজ কয়দিন হইতে লজ্জাবতীর শরীরটাও যেন ভাল ছিল না—মাথা-ধরা, বিবমিষা, দৌর্ব্বল্য বোধ হইতেছে। লজ্জাবতী খাটে শুইয়া ছিল—পাশে একখানা চেয়ারে বসিয়া বিমল গল্প করিতেছিল।

দূরে রাজপথে বহুকণ্ঠের গীত-ধ্বনি শ্রুত হইল। দূরাগত গীত ধ্বনি ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল—তাহার পর সেই গৃহদ্বারে আসিয়া গায়কদল দাঁড়াইল। বিমল তাহাদের কাছে গেল। তাহারা বিমলকে বলিল, "চল; আমাদের সঙ্গে।" তখনই তাহারা এক জন রাজনীতিক নেতার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়াছে; বাজারে বিদেশী কাপড়ের দোকানে "পিকেটিং" করিতে যাইতেছে। ভাবপ্রবণ বিমল "না" বলিতে পারিল না—তাহাদের সঙ্গে চলিল।

তাহারা বাজারে পৌঁছিয়া দেখিল, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিসদারোগা প্রস্তুত হইয়া আছে—তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে। দারোগাটির কার্য্যপটুত্ব অনেকগুলি মিথ্যা মামলা সাজানতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

যুবকদল গ্রেপ্তার হইয়া থানায় ও থানা হইতে মহকুমা হাকিমের আদালতে নীত হইল। তাহাদের মুখে হাসি।

তাহারা স্থানীয় উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতির পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়। ডেপুটীবাবু তাহাদিগের সকলকেই সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কেবল দলপতি বলিয়া বিমলের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল—আদালত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সে আটক থাকিবে।

যোগেন্দ্রনাথ মুন্সেফ হইলেও যে ডেপুটীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন না, তাহাতে ডেপুটীবাবুর রাগ ছিল এবং সেই জন্যই তিনি বিমলের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিলেন। কেবল যোগেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য; তিনি অল্পক্ষণ পরেই এজলাস হইতে উঠিয়া গেলেন।

ছেলের দল আদালতেই ছিল—তাহারা বিমলকে ফুলের মালা পরাইয়া তাহাকে ঘিরিয়া শোভাযাত্রা করিয়া গান করিতে করিতে পথে বাহির হইল। তাহারা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

৬

আদালতে এই সংবাদ শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ নিদাঘ-দিগন্তের মত আঁধার মুখে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। বিমলকে ঘিরিয়া যুবকগণ যখন তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিল, তখন তাঁহার মনে হইল—স্বহস্তে তাহাদিগকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করেন।

ছেলেরা গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—বিমল গৃহে প্রবেশ করিল। যোগেন্দ্রনাথের রুদ্ধ রাগ জামাতার উপরেই পড়িল। তিনি ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "এ সব বাঁদরামী আমি সহ্য করব না।"

বিমল কোন কথা বলিল না।

যোগেন্দ্রনাথ যেন আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, "কি, চুপ ক'রে রইলে যে? আমার বাড়ীতে থেকে ও সব চলবে না।"

এবার বিমল আর আত্ম সংযম করিতে পারিল না; বলিল, "আমি চ'লে যাচ্ছি।"

"কি তেজ! কিন্তু যখন আশ্রয় দিয়ে আজ এই কথা বলবার উপায় ক'রে দিয়েছিলাম, তখন এ তেজ কোথায় ছিল? বলে, 'আঁস্তাকুড়ের পাত কি কখনই স্বর্গে যায়?'—ভাল, তাই হোক।"

বিমল আর কোন কথা না বলিয়া অন্দরের দিকে যাইতেছিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

বিমল বলিল, "আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে যা'ব।"

"যখন দেখা করবার যোগ্যতা হ'বে, যখন পরিবার পালন করতে পারবে, তখন দেখা করো।"

আর কোন কথা না বলিয়া বিমল বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।"

৭

যাহার সন্ধানে বিমল অন্দরের দিকে যাইতেছিল, সে যে পাশের ঘরেই ছিল এবং শ্বশুর জামাইয়ের কথোপকথন সব শুনিয়াছিল, বিমল তাহা জানিত না। বিমল চলিয়া গেলে, লজ্জাবতীর মনে হইল, তাহার চক্ষুর সম্মুখে সব যেন অন্ধকার হইয়া গেল। পাশে একখানা আরাম কেদারা ছিল—সে সেই খানার উপর বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বুক-ভাঙ্গা বেদনায় কাঁদিতে লাগিল।

লজ্জাবতীর মাতা তখন রান্না-ঘরে ময়দাটা মাখিয়া দিতেছিলেন—পাচক লুচি ভাজিবার আয়োজন করিতেছিল। বাড়ীর দ্বারে ছেলেদের জয়ধ্বনি শুনিয়া তিনি ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য মুরারিকে পাঠাইয়া দিলেন। মুরারি যোগেন্দ্রনাথের আদালতে চাপরাশী—বাড়ীতে সরকার—সর্ব্ব প্রযত্নে গৃহিণীর মন যোগাইয়া আদালতের চাকরী এবং বাড়ীতে অন্নের সংস্থান ঠিক রাখে। সে অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া বিমলের আগমন হইতে তাহার গৃহত্যাগ পর্য্যন্ত সব ঘটনা যখন বিবৃত করিল, তখন গৃহিণী ভিজান ময়দা ফেলিয়া রাখিয়া—ময়দামাখা হাতেই দ্রুত বাহিরের ঘরে যাইলেন—পথের ঘরে মেয়েকে বিহ্বলভাবে কাঁদিতে দেখিয়া গেলেন।

যোগেন্দ্রনাথ তখনও রাগে ফুলিতেছিলেন। গৃহিণী কিন্তু তাঁহার রাগকে ভয় করিতেন না; বরং তিনিই গৃহিণীর রাগকে ভয় করিতেন। গৃহিণী বলিলেন, "বলি, তোমার হয়েছে কি; জামাইকে যা নয় তা বলেছ?"

যোগেন্দ্রনাথ একটু চড়া স্বরেই বলিলেন, "ও সব তুমি বুঝ না—ও কথায় কথা বলো না; আমার বাড়ীতে—"

বুদ্ধিতে দোষারোপটা গৃহিণী নীরবে সহ্য করিলেন না; বলিলেন, "দেখ, ও হাকিমী মেজাজ এজলাসেই রেখে এসো, ওটা বাড়ীতে ভাল নয়; কাঁচা পোয়াতী মেয়ে—সেই অবধি কাঁদছে। আর জামাই যে চ'লে গেল, তা'র পর?"

"চ'লে গেল! যা'বে কোথায়? খা'বে কি?"

"তোমার জামাই হ'বার আগে ত না খেয়েই বিশ বছর ছিল! খাবার ভাবনাই বা কি? কেন—পাশে কি কিছু কম যে, একটা মুন্সেফীও জুট্‌বে না?"

যোগেন্দ্রনাথ নিরুত্তর হইলেন। গৃহিণীর সঙ্গে তিনি কোন দিনই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। কেই বা পারে? কিন্তু তিনি মনে মনে আপনার কাযের সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন—তিনিই কি কম দুঃখে ও সব কথা বলিয়াছেন? ডেপুটীর কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "তা' এখন কি করতে বল?"

গৃহিণী বলিলেন, "জামাইকে ফিরিয়ে আন।"

"তা' দেও মুরারিকে পাঠিয়ে।"

গৃহিণী পাশের ঘরে যাইয়া সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"ওঠ মা, ওঠ—অমন ক'রে কাঁদে না। আমি জামাইকে আন্‌তে পাঠাচ্ছি।" তাহার পর গলাটা একটু চড়াইয়া—কর্ত্তাকে শুনাইয়াই বলিলেন, "পোড়া চাক্‌রীতে চোদ্দ জিলার জল খেয়ে দেহও গেল—এ যেন বেদের টোল ফেলে থাকা। আর 'সাহেবের' ভয় যেন জুজুর ভয়!"

তাহার পর তিনি বিমলের সন্ধানে মুরারিকে পাঠাইলেন—অনেক অনুনয়-বিনয়ের কথা বলিয়া দিলেন—তাঁহার মাথার দিব্য সে যেন ফিরিয়া আইসে।

মুরারি চতুর লোক—পর পর আট জন মুন্সেফের মন যোগাইয়া চাকরী বজায় রাখিয়াছে। সে বুঝিল, এই ব্যাপারের পর বিমল আর মামার কাছে যাইবে না—তবুও ষ্টীমার ঘাটে যাইবার পথে শশী মোক্তারের বাড়ী একবার হইয়া গেল। অসময়ে তাহাকে দেখিয়া শশী মোক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মুরারি?" সে বলিল, "কিছু নয়—এই পথে যাচ্ছিলাম, তাই।" শশী মোক্তার তখন বলিলেন, "দেখলে বিমল ছোঁড়াটার কাণ্ড। আমি যে কেমন ক'রে সদর-ওয়ালা বাবুর কাছে মুখ দেখাব, তাই ভাবছি। কা'ল সকালে যা'ব। বাপু, তোর সব হ'ল কোম্পানীর চাকর ঐ শ্বশুর হ'তে, তোর 'বন্দে মাতরম্' করা কেন?" তিনি হুকা হইতে কলিকাটি লইয়া মুরারিকে দিলেন, সে আড়ালে যাইয়া একটা টান দিয়া কলিকাটি যথাস্থানে রাখিয়া বিদায় লইল।

ষ্টীমার ঘাটেই মুরারি বিমলের দেখা পাইল। সে অতি বিনীত ভাবেই গৃহিণীর কথা বিমলকে জানাইল। কিন্তু শেষ অবধি শুনিবার ধৈর্য্যও বিমলের ছিল না। সে বলিল, "আবার যেতে হ'বে? তাই চাপরাশী পাঠিয়েছেন? কেন—বড়মানুষের মেয়ে বিয়ে ক'রে, যা অপমান হবার, তা'র সবই হয়েছে। আরও কিছু বাকি আছে না কি?"

খানিকটা ব্যর্থ চেষ্টার পর মুরারি ফিরিয়া গেল।

টিকিট কিনিয়া বিমল ষ্টীমারে উঠিল। টিকিট কিনিবার সময় কয় বৎসরের অভ্যাসমত সে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটই কিনিতে যাইতেছিল; কিন্তু সে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিল; সে দরিদ্রের সন্তান দরিদ্র; দারিদ্র্যে তাহার লজ্জা কি?

৮

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল—তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ডেকের উপর ভিড় করিয়া বসিয়া ছিল—শুইবার স্থানাভাব। তাহাদেরই মধ্যে এক পাশে বসিয়া বিমল ভাবিতে লাগিল। সে মুরারিকে বলিয়াছিল, বড়মানুষের মেয়ে বিবাহ করিয়াই তাহার যত অপমান। কথাটা কতটা সত্য? বড়মানুষের মেয়ে বিবাহ করিয়া তাহার যত অপমানই কেন হউক না, লজ্জাবতী ত কখন তাহাকে কোন অপরাধ দেয় নাই। লজ্জাবতীর কোনও দিনের কোন ব্যবহারে সে তাহার প্রতি প্রেম ব্যতীত অবজ্ঞার কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পায় নাই। পরন্তু সে তাহার ব্যবহারে সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রতি নির্ভরশীলতার পরিচয়ই পাইয়াছে। সে তাহার দরিদ্রের গৃহে যাইবার জন্য বহুবার ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছে। এমন অবস্থায় লজ্জাবতীর উপর তাহার রাগের কোন কারণ থাকিতে পারে না। লজ্জাবতী তাহার স্ত্রী—সে যে আসিবার সময় তাহার সহিত দেখা করিয়া আসিতেও পারিল না, ইহাতে তাহার বুক বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। আর সে জন্য দায়ী—যোগেন্দ্রনাথ। যোগেন্দ্রনাথের উপর রাগে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে যদি মানুষ হয়, তবে এ অপমানের প্রতিশোধ সে লইবে।

এত রাগের মধ্যেও লজ্জাবতীর কথা মনে করিয়া বিমলের চক্ষু অশ্রুতে ঝাপসা হইয়া আসিতে লাগিল। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া লজ্জাবতীকে লইয়া আসিবে। সে যে পিতার পক্ষাবলম্বন করিতে পারে, এ সম্ভাবনাকেও বিমল মনে স্থান দিতে পারিল না।

পূজারিণী

ওগো —দেবতা, মোর দেবতা !
আজি কোন্ লোক হ'তে আশীষ তোমার
বহি আনে কোন্ বারতা !
অন্তর মোর ব্যাকুলিয়া উঠে
পূজিতে ভকতি চন্দনে ;
ধন্য হইব অর্ঘ্য আমার
সঁপিয়া তোমার চরণে ।

ওগো— দেবতা, মোর দেবতা
আজি শুন নিবেদন, অন্তর-তল
শুনাও তোমার বারতা ।
আমার যা' কিছু লহ উপহার
নিঃস্ব করিয়া আমারে :
আমারে বন্দী কর প্রেমময়
তব মঙ্গল-আগারে ।

ভোর হইলে ষ্টীমার যে ঘাটে ভিড়িল, তাহাকে বাড়ী যাইতে হইলে সেই ঘাটে নামিতে হয়। সে নামিয়া পড়িল এবং তাহার পরীক্ষার খবর বাড়ীর ঠিকানায় দিতে কলিকাতায় মেসে এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়া ডাকে দিয়া বাড়ী চলিল। প্রায় চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় সে যখন বাড়ীতে পৌছিল, তখন সহসা তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া মা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, খবর না দিয়ে—"

বিমল মা'র পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "কেন, এ ত আর কুটুমবাড়ী নয়?"

মা ছেলের আহারের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন।

৯

মুরারি সে সংবাদ লইয়া ষ্টীমার ঘাট হইতে ফিরিয়া গেল, তাহা শুনিয়া লজ্জাবতীর মাতা কর্ত্তার উপর রাগের এমন ঝাল ঝাড়িলেন যে, যোগেন্দ্রনাথের মুখে আর কথা ফুটিল না। পরদিন প্রাতেই তিনি শশী মোক্তারকে ডাকাইয়া সব কথা বলিলেন এবং শেষে বলিলেন, "আচ্ছা, বলুন দেখি, আমার কি দোষ? আমাকে অমন ক'রে অপমান করলে, তা' আমি যদি রাগের মাথায় ছুটো কথা বলেই থাকি, তাই কি অমন করতে আছে?" শশী [illegible]ার বলিল, "সে ত বটেই; বলে, বাপের বাড়া শ্বশুর—যা হ'তে তোর সব। কথাটা হচ্ছে—ঐ যে আজকাল 'বন্দে মাতরম্' হয়েছে—ওতেই ছেলেদের মাথা খেয়েছে; আর কাউকে গ্রাহ্য করে না। দেশের সর্ব্বনাশ হচ্ছে।"

শশী মোক্তার সংবাদ আনাইয়া দিবে বলিয়া চলিয়া গেল এবং সেই দিনই বিমলের বাড়ী যাত্রা করিল।

শশী মোক্তার যাইয়া যখন সব কথা বলিল, তখন বিমলের মা ছেলেকে বলিলেন, "লক্ষ্মী বাবা আমার, শ্বশুর এত করেছেন, রাগ করো না। তুমি ফিরে যাও।"

বিমল কিছুতেই সম্মত হইল না। মা শশী মোক্তারকে বলিলেন, "দেখ, আমার ত যা সাধ্য করলাম; ছেলে কিছুতেই রাজী হয় না।"

শশী মোক্তার বলিল, "তা ত দেখলাম। কিন্তু, এও ব'লে দিচ্ছি—ওর কপালে দুঃখ আছে। অত তেজ ভাল নয়—ভাল নয়।"

তাহার পর শশী মোক্তার ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিয়া কাপড়গুলা ক্যাম্বিশের ময়লা ব্যাগে পুরিল ও গামছাখানা ব্যাগের সঙ্গে বাঁধিল।

শশী মোক্তার রওনা হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই গ্রামের ডাক-পিয়ন বিমলের বাড়ীতে আসিল—হাতে একখানা টেলিগ্রাম! শশী মোক্তার ভাবিল, এ আবার কি? বিমল টেলিগ্রাম লইয়া খাম খুলিয়া ফেলিল। তাহাতে খবর ছিল—সে ওকালতী পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বন্ধু লিখিয়াছে, আইন কালেজে একটা চাকরী খালি আছে, সে কলিকাতায় ফিরিয়া চেষ্টা করিলে চাকরীটা হইবার সম্ভাবনা।

তবে ত বিমলও এক দিন হাকিম হইতে পারে! শশী মোক্তার বলিল, "সে আমি বরাবরই জানি—তোমার ভাল হ'বে। আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হও। দেখ, শ্বশুর, শালা—ও সব কিছুই নয়—অদৃষ্টই সব, আর পুরুষকার।"

১০

কলিকাতায় যাইয়া বিমল লজ্জাবতীর পত্র পাইল—"তুমি কেন আমাকে লইয়া গেলে না? তোমার অপমান কি আমার অপমান নহে যে, আমাকে এই অপমান সহিতে রাখিয়া গেলে? আমি নিজে যাইতে পারি না—নহিলে চলিয়া যাইতাম। আমাকে লইয়া যাও।"

পত্র পড়িয়া বিমলের বুকটা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। লজ্জাবতীর কথা মনে করিয়া সে যেন আর স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। কিন্তু স্থির না থাকিয়াই বা উপায় কি? সে নিঃস্ব—মেসে থাকিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতেছে—বিশেষ সে নিঃসম্বল। সে সেই কথাই লজ্জাবতীকে লিখিল,—"আমার একটা সুবিধা হইলেই, আমি পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিলেই, তোমাকে লইয়া আসিব। এখন লইয়া আসিতে চাহিলেও তোমার বাবা আসিতে দিবেন না; ইহা লইয়া আবার একটা কেলেঙ্কারী করা ভাল নহে।"

উত্তরে লজ্জাবতী লিখিল—"আমি গরিবের স্ত্রী, গরিবের মত থাকিব; তুমি আমাকে তোমার বাড়ীতে তোমার মা'র কাছে লইয়া যাও।"

পত্র পড়িয়া বিমল হৃদয়ে পরম আনন্দ লাভ করিল। কিন্তু লজ্জাবতী কখন গরিব গৃহস্থের ঘরের কায করে নাই—বিশেষ তাহার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যে—?

সে লজ্জাবতীকে লিখিল, সে তাহার পত্র পাইয়া কত যে

সুখী হইল, তাহা পত্রে প্রকাশ করা যায় না—তাহা প্রকাশ করা যায়, তাহার ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া! কিন্তু তাহার মন যত দৃঢ়ই কেন হউক না, শরীরে কষ্ট সহিবে না -বিশেষ এ সময়।

যে গৃহ হইতে স্বামী অপমানিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, সে গৃহে বাসই যে লজ্জাবতীর পক্ষে বিশেষ কষ্টকর বলিয়া মনে হইত, তাহা বিমল সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহা বুঝিলেন, লজ্জাবতীর মা। লজ্জাবতীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া তিনি দিন দিন শঙ্কিতা হইতে লাগিলেন—সে দৌর্ব্বল্য ও সে শীর্ণতা ত সম্ভাবিত মাতৃত্বের লক্ষণ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। ক্রমে যোগেন্দ্রনাথেরও সে দিকে দৃষ্টি পড়িল; তিনিও বিশেষ চিন্তিত হইলেন; কিন্তু কি করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। শেষে তিনি মান-মর্য্যাদার বৃথা গর্ব্ব পরিহার করিয়া শশী মোক্তারকে দিয়া বিমলকে পত্র লিখাইলেন—তাহার স্ত্রী সে ইচ্ছা করে, লইয়া যাউক। উত্তরে বিমল মাতুলকে লিখিল, "আমি সেই চেষ্টাই করিতেছি। যে দিন স্ত্রীকে আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারিব, সেই দিনই আনিব; তাহাতে একদিনও বিলম্ব হইবে না। আজও যে এ অপমান সহ্য করিতে হইতেছে, সে কেবল আমি নিরুপায় বলিয়া।"

১১

সৌভাগ্যক্রমে চেষ্টার ফলে বিমল চাকরী পাইল। প্রথম মাসের বেতন পাইয়াই সে বাসা ভাড়া করিয়া লজ্জাবতীকে আনিবার খরচ শশী মোক্তারকে পাঠাইয়া স্বয়ং মা'কে আনিতে গেল।

সে মা'কে লইয়া কলিকাতায় আসিবার পরদিনই শশী মোক্তার লজ্জাবতীকে লইয়া আসিলেন। দুই মাস পরে পত্নীকে দেখিয়া বিমল শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল—এ যেন দীর্ঘকাল রোগভোগের পর শীর্ণ রোগী! অধ্যাপকের বেতন অধিক নহে, তাহাকে কলিকাতার বাসা খরচ কুলাইয়া পত্নীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপাততঃ ওকালতী করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বিমল একটা ছাত্র পড়ান চাকরী লইল।

কলিকাতায় আসিয়া, বোধ হয়, মনের আনন্দে প্রথম কয় দিন লজ্জাবতীর স্বাস্থ্যোন্নতি অনুভূত হইল; কিন্তু সে উন্নতি স্থায়ী হইল না—পক্ষকাল পরেই সে এত অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, ডাক্তার তাহাকে শয্যা লইতে উপদেশ দিলেন। স্বামীর অবস্থা সে জানিত; সেই অবস্থায় সে যে স্বামীর বিষম ভার হইয়াছে, এই দুশ্চিন্তায় লজ্জাবতী যেন আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

চাকরী বজায় রাখিয়া রোগীর সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করা দুষ্কর। কিন্তু অতর্কিতভাবে বিমলের সে কায সুলভ হইয়া আসিত। তাহার বাড়ীর কাছেই কংগ্রেস কমিটীর একটি কার্য্যালয় ছিল। সে যে একবার স্বদেশী গান গাহিয়া শোভা-যাত্রা করায় লাঞ্ছিত হইয়াছিল, সে সংবাদ পাইয়া কমিটীর সদস্যরা সর্ব্বদা তাহার কাছে আসিত। মহাত্মা গন্ধী লোক-সেবা কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, তাহারা সে কার্য্যেও অবহিত হইয়াছিল। তাহারাই এ বিপদে বিমলের অবলম্বন হইয়াছিল এবং তাহাদের জন্য বিমল কোন দিন লোকের অভাব অনুভব করিত না।

প্রায় দেড় মাস চিকিৎসা চলিল—রোগীর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে এক দিন ডাক্তার বলিলেন, রোগীর অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কৃত্রিম উপায়ে অকালে প্রসব করাইলে যদি সে বাঁচে। বিমলের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে মা'র সঙ্গে পরামর্শ করিল। মা বলিলেন, "যেমন ক'রে হোক বৌমাকে বাঁচা।"

সেই আয়োজন হইতে লাগিল।

যোগেন্দ্রনাথের পুত্র কোন ফিরিঙ্গী স্কুলের ছাত্রাবাসে থাকিত। সে সর্ব্বদাই দিদির সংবাদ লইত ও মা'কে দিত। এই সংবাদ শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "জামাইবাবু, মা'কে আস্তে টেলিগ্রাফ কর্‌বো?" বিমল কঠোরস্বরে বলিল, "না।" অগত্যা সে টেলিগ্রাফ না করিয়া পত্র লিখিল।

এ দিকে লজ্জাবতী যখন শুনিল, তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে প্রসব করান হইবে, তখন তাহার কোটরগত নয়ন জলে ভরিয়া উঠিল। সে স্বামীর ভারমাত্র হইয়াছে—তবুও তাহার আশা ছিল, স্বামীকে তাঁহার ছেলে উপহার দিতে পারিবে। হায়!—সে আশাও আর নাই। দুশ্চিন্তায় তাহার এমন অবসাদ হইল যে, ডাক্তাররা আরও ভয় পাইলেন; কিন্তু তখন অস্ত্রোপচার ব্যতীত আর কিছুতেই জীবন-রক্ষার আশা করিতে পারা যায় না।

তাহাকে অজ্ঞান করাইবার পূর্ব্বে সে শাশুড়ীর ও

স্বামীর পদধূলি লইল, তাহার পর প্রশান্তভাবে অবশ্যম্ভাবীর জন্য প্রস্তুত হইল। বিমল আর চক্ষুর জল রোধ করিতে পারিল না।

১২

রাত্রি প্রভাত হইল—শঙ্কাদুঃসহ দীর্ঘ রাত্রি—জীবন-মরণের দ্বন্দ্বে মৃত্যুই যে জয়ী হইবে, সে বিষয়ে তখন আর সন্দেহ নাই। জীবনের মেয়াদ তখন আর ঘণ্টায় নহে—মিনিটে। বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় গাড়ী থামিল—জানালা দিয়া বিমল দেখিল—গাড়ীতে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী। সে উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেল। যে যুবকটি রোগীর শুশ্রূষার জন্য লজ্জাবতীর কাছে বসিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সময় কোথায় যাচ্ছেন?" উত্তর না দিয়া বিমল নামিয়া গেল।

সে যখন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, তখন তাহার শাশুড়ী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছে, বাবা?" বিমল সে কথার উত্তরে কেবল শ্যালককে বলিল, "উপরে নিয়ে যাও।" তিনি চলিয়া গেলে যোগেন্দ্রনাথ যখন ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন বিমল পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল; তাহার দৃষ্টিতে শোকের আর্দ্রতা ভেদ করিয়া অপমানের তীব্রতা ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—"একদিন আপনি আমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দেন নি। আপনি তা'কে মেরে ফেলেছেন। আপনাকে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দেব না।"

তখন উপরে কন্যার শোকে কাতর জননী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"মা, আমি এইছি, একবার মা ব'লে ডাক, মা! বাপের উপর রাগ ক'রে কি এমনি প্রতিশোধ নিতে হয়; মা'র বুক এমনি ক'রে খালি ক'রে যেতে হয়, মা।"

যোগেন্দ্রনাথের মনে হইল, শোকাতুরা জননীর সেই আর্ত্তনাদ তাঁহারই হৃদয় বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অপরাধের প্রতিশোধ বুঝাইয়া দিতেছে। তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন কেবল অনুতাপের যাতনা ভোগ করিবেন—চাকরী, উপাধি, অর্থ—কিছুতেই তিনি সুখ পাইবেন না।

* * * * *

সেই দিনই 'গেজেটে' তাঁহার উপাধি-প্রাপ্তির ও পদবৃদ্ধির সংবাদ প্রকাশিত হইল। সে সংবাদও যেন তাঁহার বুকে জ্বালার সঞ্চার করিল; তিনি পদত্যাগপত্র পাঠাইয়া দেশত্যাগের আয়োজন করিলেন।

মাতৃত্ব।

"ওগো কদলী নব-মরকত মেদুরপ্রভ।
নিটোল সুডোল সুঠাম-পীবর গঠন তব॥
রম্ভা তোমার নামটি যোগ্য—যোগ্যতম।
ফলরাজি ভারে আনত তনুটি নয়নরম॥
গজকরভ ও গজগমনার ঊরুর মত।
স্নিগ্ধকান্তি চারুচিক্কণ পীনোন্নত॥
ভরাযৌবনে বিলসিছে তব অঙ্গখানি।
কোন্ দুখে তুমি এখনি কহিছ বিদায়বাণী?"

"চারু তারুণ্য এত লাবণ্য যাহার তরে।
হয়েছে সফল সার্থক মোর ধরার পরে॥
বৃথা কেন আর এই দেহ-ভার বহিয়া মরি।
কচি-কাঁচাদের যায়গা জুড়িয়া আহার হরি'॥
বাঁচিতে চাহি না নশ্বর-সুখভোগের লাগি।
ব্রতশেষে এবে অসার দেহের মরণ মাগি॥
নারীত্ব আর যৌবন সার সফল হলো।
মাতৃতা লভি, ধন্য জনম, আর কি বলো?"

শ্রীকালিদাস রায়

সঙ্গীত-শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সঙ্গীত-বিদ্যা শিখাইবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া আমেরিকায় নানা প্রচেষ্টা হইতেছে। প্রধানতঃ মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহারই উদ্ভাবনার গবেষণা করিতেছিলেন। এ বিষয়ে কয়েক বৎসর হইল, তাঁহারা সফলতা লাভও করিয়াছেন। কাহার স্নায়ু কিরূপ উপযুক্ত, শুধু তাহা নির্দ্ধারণ করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হয়েন নাই। সঙ্গীত-বিদ্যায় কাহার প্রতিভা কতদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, তাহা নিরূপণ করিবার যন্ত্রও বৈজ্ঞানিকগণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সংপ্রতি "টোনোস্‌কোপ্‌" বা স্বরবীক্ষণ নামক এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিগত ২০ বৎসর হইতে এই যন্ত্রের ক্রমোন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা হইতেছিল। কয়েক বৎসর মাত্র উহার দ্বারা শিক্ষার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। এই 'স্বরবীক্ষণ' যন্ত্রের দ্বারা কোন্ কণ্ঠস্বর প্রতি সেকেণ্ডে কতবার স্পন্দিত হইতে পারে, তাহা যথার্থরূপে নিরূপণ করা যায়।

কোনও গায়ক বা গায়িকার গলা কতদূর আরোহণ করে, তাহা জানা থাকিলে এই যন্ত্রের সাহায্যে উহা সত্যই কোন্ পর্দ্দা পর্য্যন্ত পৌঁছে, তাহা সংখ্যার দ্বারা অভ্রান্তভাবে নির্ণীত হয়। উল্লিখিত যন্ত্রের সহিত একটি ড্রম সংলগ্ন; উহা এমনই কৌশলে স্থাপিত যে, প্রতি সেকেণ্ডে একবার আবর্ত্তিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সারি সারি কালো বিন্দু ড্রমের শুভ্র-দেহে পতিত হয়। উহার সহিত একটা পরিমাপ যন্ত্র আছে। তদ্দারা নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারা যায়, প্রতি সেকেণ্ডে সেই কণ্ঠস্বর কতবার স্পন্দিত হইল।

ড্রমের সহিত কথা কহিবার নল ও গ্যাসাধারের আলোক-শিখার এমন সংযোগ আছে যে, আলোক-শিখার স্পন্দন ও ড্রমের কৃষ্ণবিন্দু সমূহ গণনায় আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়।

স্বরবীক্ষণ যন্ত্র। কথা কহিবার নলের প্রান্তদেশে, ড্রমের সম্মুখে একটি গ্যাসাধারযন্ত্র সংরক্ষিত। উহার আলোক-শিখা স্পন্দিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ড্রমের শুভ্র দেহে কৃষ্ণ বিন্দুসমূহ অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে।

আলোক-শিখার স্পন্দনের সংখ্যা ও ড্রমের কৃষ্ণবিন্দু সমূহ সমসংখ্যা-বিশিষ্ট হইবামাত্র ড্রমের গায় আর রেখা পড়িবে না। সুতরাং কাহারও কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে এক সেকেণ্ডে যদি একটা স্পন্দন লইয়াও তর্ক বাধে,

তবে এই স্বরবীক্ষণ যন্ত্র তাহারও মীমাংসা করিয়া দিতে সমর্থ।

উদ্ভাবিত স্বরবীক্ষণ যন্ত্র প্রথমতঃ আইওয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়েই প্রবর্ত্তিত হয় এবং উহার পরিপুষ্টি ও ক্রমোন্নতিসাধনের জন্য তত্রত্য বৈজ্ঞানিকগণ নানা গবেষণা করেন। তাহার পর উক্ত যন্ত্র স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো, কালিফ্, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থলে ব্যবহৃত হইতেছে। ক্রমে উহা কার্ণেজি ইন্‌ষ্টিটিউশনে, পিটস্‌বর্গে, পা ও ইভানষ্টন 'নর্থওয়েষ্টারন্' বিশ্ব-বিদ্যালয়েও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদিগের মধ্যে সঙ্গীতে কাহার কিরূপ স্বাভাবিক অনুরাগ, আসক্তি আছে, তাহা পরীক্ষার জন্য অন্যান্য যন্ত্রও উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই সকল যন্ত্রের অনেকগুলি অধুনা ইভানষ্টনের সাধারণ বিদ্যালয় সমূহে ব্যবহৃত হইতেছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে গায়িকার কণ্ঠস্বরের আরোহণ অবরোহণের স্বাভাবিকতা ও পরিণামে সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শিতার সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যায়। স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষিত হইলে সেই ছাত্রীকে তদনুসারে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছন্দের প্রতি অনুরাগ নির্ণয়ের জন্যও অন্যবিধ যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে

এই চিত্রে কণ্ঠস্বরের দ্রুততা পরীক্ষিত হইতেছে। বাম দিকের চিত্রে যন্ত্রের সম্মুখে একটি ছাত্রী দাঁড়াইয়া। তাহার কণ্ঠস্বর কতদূর আরোহণ করে বা উহাতে মূর্চ্ছনা আছে কি না, তাহার পরীক্ষা হইতেছে। ছাত্রী দক্ষিণ হস্তের দ্বারা নল ধারণ পূর্ব্বক তান ছাড়িতেছে, শিক্ষক ঘড়ী লইয়া তাহার কণ্ঠস্বরের আরোহণ অবরোহণকালের মাত্রা নির্ণয় করিতেছেন।
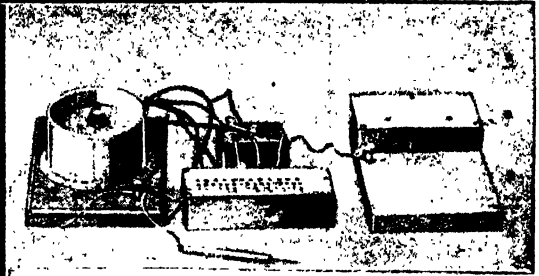
স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি পরীক্ষা করিবার যন্ত্র। ছাত্রীর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকত্ব ও সঙ্গীতে তাহার কিরূপ দক্ষতা জন্মিতে পারিবে, স্নায়ুর শক্তি পরীক্ষায় তাহা নির্ণীত হইতেছে।

ইভানষ্টনের নর্থওয়েষ্টারন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

মনের গতি পরীক্ষার জন্যও এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাহারও সঙ্গীতে যথার্থ অনুরাগ আছে কি না এবং তাহার পরিমাণ কতটুকু, এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহাও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে—"Mood charts" বা মনের গতির পরিচয় অভ্রান্তরূপে জানিবার পর ছাত্রীকে তদনুসারে শিক্ষা দিবার অত্যন্ত সুবিধা জন্মে।

ছন্দ ও কাব্যের প্রতি অনুরাগ নির্ণয়ের যন্ত্র।

কাহারও হয়ত কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শিতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষায় তাহার প্রতিভার বিকাশ হইতে পারে। এই ক্রনোস্কোপের সাহায্যে তাহা নিঃসংশয়রূপে বুঝিতে পারা যায়। তদনুসারে কেহ বা পিয়ানো, কেহ বা বেহালা, কেহ বা বাঁশী ইত্যাদি নানাপ্রকার যন্ত্রে বুৎপত্তিলাভ করিতে পারে। এই যন্ত্র

উদ্ভাবিত হইবার পর এখন এই সুবিধা হইয়াছে যে, অতঃপর যাহার শুধু পিয়ানো যন্ত্রে দক্ষতালাভের সম্ভাবনা আছে, সে আর অকারণ কণ্ঠ-সঙ্গীতের চর্চ্চায় সময়-ক্ষেপ করিবে না। কিংবা যিনি উত্তরকালে শুধু কাব্য-রচনায় যশস্বী হইতে পারিবেন, তাঁহাকে কণ্ঠ-সঙ্গীত অথবা যন্ত্র-সঙ্গীত আয়ত্ত করিবার জন্ম বৃথা সময়ের অপব্যবহার করিতে হইবে না।

ক্রনোস্কোপ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে ছাত্রীর সঙ্গীতের প্রতি মানসিক আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বৃক্ষের সহিত মানব-জীবনের তুলনা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঝটিকার বেগে আমেরিকায় "হয়োসোমাইট ন্যাশনাল পার্কের" কোনও অতিকায় বৃক্ষ পড়িয়া গিয়াছিল। উল্লিখিত উদ্যানের কোনও বৈজ্ঞানিক উক্ত বৃক্ষের স্থূল কাণ্ডের কিয়দংশ করাত দিয়া কাটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বৃক্ষটি কতদিন জীবিত ছিল, তাহা দেখাইবার জন্মই এই প্রচেষ্টা। গুঁড়ির কাছে বৃক্ষটির পরিধি ১৪ ফুট। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নির্ণীত হইয়াছে যে, বৃক্ষটি ৯শত ৯৬ বৎসর জীবিত ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার পারম্পর্য্য অনুসারে বৃক্ষের কর্ত্তিতাংশে শ্বেত চিহ্নসমূহ অঙ্কিত করা হইয়াছে।

বিরাট বৃক্ষের কর্ত্তিত অংশ। বৈজ্ঞানিক,বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাপে মানবজীবনের ব্যাপ্তি দেখাইয়া বৃক্ষের দীর্ঘজীবনের কথা বুঝাইয়া দিতেছেন।

ভ্রমণ-যষ্টির অভ্যন্তরে বেহালা।

ভ্রমণ-যষ্টিকে যদি মুহূর্ত্তমধ্যে বেহালায় পরিণত করা যায়, তবে সেটা খুবই বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই—নূতনত্বও হয় বটে। কিন্তু ইহা কবিকল্পনা নহে। আমেরিকায় ইহাও সম্ভবপর হইয়াছে। যষ্টির আকারে বেহালাটি যখন বদ্ধ থাকে, তখন অনেকটা ছাতার মত দেখিতে হয়, মধ্যস্থলে সামান্ত পুষ্ট। উপরের ঢাকনিটা খুলিয়া দিলেই একটা বেহালা ও ছড়ি দেখা যাইবে। ইহাতে চমৎকার সঙ্গীতালাপ চলে। সাধারণ বেহালার যেমন সুর বাঁধিয়া লইতে হয়, ইহাকেও সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।
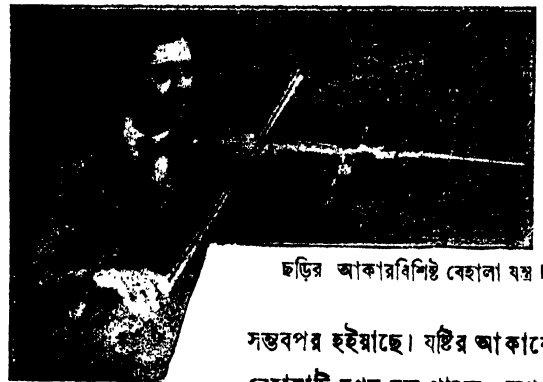
ছড়ির আকারবিশিষ্ট বেহালা যন্ত্র।

অন্যের অশ্রাব্য টেলিফোন্ যন্ত্র।

টেলিফোন্‌যোগে কথা বলিবার নূতন এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা ব্যবহারকালে, কথা বলিলে অপরের শুনিবার কোনও সুবিধা হইবে না। নিউইয়র্কে এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। অধুনা কথা বলিবার জন্য যে সাধারণ মুখনল টেলিফোনে ব্যবহৃত হয়, এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র তাহাতে সংলগ্ন করিয়া দিলেই হইল। বক্তা তার পর সেই যন্ত্রে মুখ সংলগ্ন করিয়া কথা বলিলে আশেপাশের কেহই তাঁহার কথা আর শুনিতে পাইবে না। যন্ত্রটির অভ্যন্তরে, দুই দিকেই এমন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে যে, তাহাতে শব্দ মিলাইয়া যায়, প্রতিধ্বনিত হইতে পারে না, আশেপাশের শব্দও কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। এই যন্ত্রের সাহায্যে গোপনে কথা বলিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

অশ্রাব্য টেলিফোন যন্ত্র।

লুসিটানিয়া স্মৃতি-মূর্ত্তি।

লুসিটানিয়া জাহাজ যে স্থলে জলমগ্ন হইয়াছিল, ঠিক সেই স্থলে একটি প্লবমান স্মৃতি-মূর্ত্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভাস্কর জর্জ্জ দে বয়্ এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই স্মৃতি-মূর্ত্তির নিম্নভাগে কাষ্ঠের ভেলা

ঘটনাস্থলে লুসিটানিয়া স্মৃতি-মূর্ত্তি
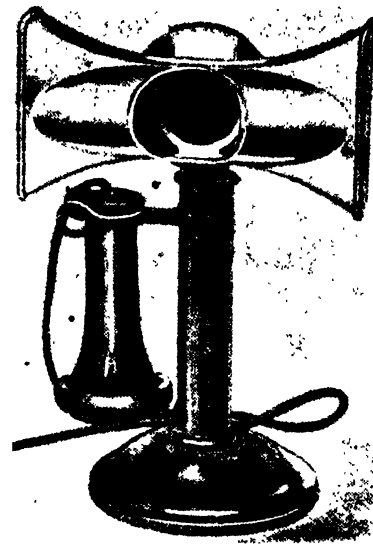
থাকিবে। উহাকে সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলের দ্বারা এমন ভাবে আবদ্ধ করা হইবে যে, কোনও মতে উহাকে ঝড় বা জলের স্রোত অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিবে না। উক্ত কাষ্ঠ-ভেলার উপর একটি ৮০ ফুট দীর্ঘ মাতৃ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে। মাতা জানু পাতিয়া সন্তানকে দুই বাহুর দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক উর্দ্ধপানে চাহিয়া তাঁহার সন্তানরক্ষার জন্য যেন ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিতেছেন! পুত্র আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তীরদেশের সহিত এই কাষ্ঠ-ভেলাকে তারের দ্বারা সংযুক্ত করা হইবে। রাত্রিকালে উহা বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত করা হইবে। তাহাতে মূর্ত্তিটিকে আলোকিত করাও হইবে এবং সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকেও সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। এই লুসিটানিয়া স্মৃতি-মূর্ত্তিতে শিল্পীর নিপুণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় বিদ্যমান।

ফ্রান্সে জনসংখ্যার হ্রাস।

ফ্রান্সের জনসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর ফ্রান্সে ২ লক্ষ লোক হ্রাস পাইতেছে। ফরাসী দেশের জন্ম ও মৃত্যুর তালিকা দেখিয়া তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই ভাবে লোকসংখ্যা যদি হ্রাস পায়, তবে অর্দ্ধ-শতাব্দী কালের মধ্যে ফ্রান্সের জনসংখ্যা আড়াই কোটীতে দাঁড়াইবে। দেশের মঙ্গলকামী ব্যক্তিরা এজন্য ফরাসীদিগকে এখন হইতেই সতর্ক- বাণী শুনাইতেছেন। লোকসংখ্যা হ্রাস পাইলে সর্ব্বপ্রকারে ফ্রান্স দেউলিয়া হইয়া যাইবে। য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের তুলনায় তখন ফ্রান্সের কি শোচনীয় অধোগতি হইবে, তাহা ভাবিয়া জনৈক পত্রপ্রেরক প্যারীর "লা রিভিউ হেব্‌দো মাদের্" নামক সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ১৭০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র য়ুরোপের জনসংখ্যার অনুপাতে ফ্রান্সের লোকসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ ছিল; কিন্তু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে উহা হ্রাস পাইয়া সমগ্র য়ুরোপের নবমাংশের একাংশে উপনীত হইয়াছে। সামরিক হিসাবে এই জনসংখ্যার হ্রাস অতীব আশঙ্কাজনক। লেখক বলিতেছেন, "এইরূপে যদি জন্মের সংখ্যা হ্রাস পায়, তবে ফ্রান্স কিরূপে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবে?" জন্ম-সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার একমাত্র অর্থ, উৎপাদকশক্তির অবনতি— জাতি ইহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে, জীবনযাত্রার সকল পর্য্যায়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যে জাতি সন্তান-উৎপাদনে বিমুখ, লেখকের মতে সে জাতি নীতির আদর্শ হইতেও স্খলিত বলিতে হইবে। যে দেশে পর্য্যাপ্ত জনসংখ্যা থাকে না, সে দেশ বৈদেশিক ব্যবসায়ীর আক্রমণ হইতেও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়ে। বৈদেশিকগণ তখন দলে দলে সেই দেশে প্রবেশ করিয়া ক্রমে তাহার দুর্ব্বল হস্ত হইতে তাহার স্বাধীনতাকে পর্য্যন্ত কাড়িয়া লয়। লেখক বলিতেছেন, "কোনও দেশের ধনসম্পদের পরিমাপ করিতে হইলে সেই দেশের অধিবাসীর জনসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধনশীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে দেশে ভূমিষ্ঠ শিশুর সংখ্যা মৃত্যুর হার অপেক্ষা অল্প, বুঝিতে হইবে, সে দেশের, সে জাতির সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত ধনসম্পদ হ্রাস পাইতেছে। ইহার পরিশ্রমী, (অতি অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত) সে জাতির সকলেই কোন না কোন প্রকার উপায়ে পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে আর একটি পোষ্য বাড়িল মনে করিয়া হতাশ হইলে চলিবে না। উহার যেমন একটি মুখ খাদ্যের অংশে ভাগ বসাইল, আবার তেমনই মনে রাখিতে হইবে যে, উহার দুইটি বাহু এবং মস্তিষ্কও আছে।

"জর্ম্মণীর দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। য়ুরোপের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মণীতে বৎসরে ৮ লক্ষ করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। লোকসংখ্যা এই অনুপাতে বাড়িয়াছিল বলিয়াই জর্ম্মণী যুদ্ধকালে এত সেনা রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারিয়াছিল। অন্য দেশের সম্বন্ধেও এই কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, মৃত্যুর অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা অধিক। সর্ব্বত্রই দেশের ধন-সম্পদ, ফ্রান্সের তুলনায় অধিক। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের জন্মসংখ্যা, মৃত্যুর হার অপেক্ষা কম না হইলেও সমান সমান ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পাইলে আমাদের প্রতিবেশীদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় আমরা কেমন করিয়া টিকিয়া থাকিব? এখন ত দেখা যাইতেছে যে, জন্মের সংখ্যা মৃত্যুর অপেক্ষা অনেক কম। এরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে অচিরে আমাদের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা।"

লণ্ডনের "টাইমস" পত্রের ফরাসী সংবাদদাতাও উক্ত পত্রে ফরাসীদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ সতর্কবাণী প্রকাশ করিতেছেন। আসন্ন বিপদের সম্বন্ধে ফরাসীর জননায়কগণের মধ্যেও একটা চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। যাহাতে বিবাহ-প্রথা ফরাসী দেশে বিশেষভাবে জনগণের মধ্যে প্রচলিত হয়, বংশবৃদ্ধি ঘটে, তজ্জন্য ফরাসী পার্লামেণ্টে কয়েকটি নূতন বিধানও বিধিবদ্ধ হইয়াছে—আয়করের হ্রাস, পেন্সনের হারবৃদ্ধি, কাহারও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সন্তানের অধিক শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি হইয়াছে; কিন্তু সবই ব্যর্থ। 'টাইমসে'র সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, ফ্রান্সের বর্ত্তমান জীবনযাত্রার প্রণালী, বাসগৃহজনিত সমস্যা, অশন ও বসন-ভূষণের দুর্ম্মূল্যতা যেরূপ জটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে শ্রমজীবীরা বিবাহ-

যাহাতে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, সে দিকে তাহারা সচেষ্ট।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে জন্ম-মৃত্যুর তালিকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায় যে, ১০ লক্ষ ভূমিষ্ঠ শিশুর মধ্যে গড়ে প্রতি দম্পতিতে ৩·৩ শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের পরেই বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু প্রতি দম্পতিতে ১·৬৬ সংখ্যার অধিক শিশু ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ফল আরও শোচনীয়। যদি প্রতি দম্পতিতে ১·৬৬ সংখ্যক শিশুর হার বজায় রাখা যায়, তাহা হইলে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার বিবাহের ফলে ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা। মৃত্যুর হার যদি না বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যে হিসাবে প্রতি বৎসর গড়ে লোক মরিয়া থাকে, তাহা ধরিলে ফ্রান্সের জনসংখ্যা বৎসরে ২ লক্ষ করিয়া হ্রাস পাইবে। বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ নির্দ্ধারণের উপর এখন বলিতেছেন যে, এই ভাবে চলিলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ৩ কোটী ৫০ লক্ষে দাঁড়াইবে। বর্ত্তমানে ফ্রান্সের অধিবাসীর সংখ্যা ৩ কোটী ৯০ লক্ষ। অর্থাৎ ১৮ বৎসরে ৪০ লক্ষ লোক হ্রাস পাইবে। এই অনুপাতে হিসাব করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়া ২ কোটী ৫০ লক্ষে দাঁড়াইবে!

সর্প-দংশনে সর্প-বিষ।

জীবদেহে সর্প-বিষ প্রয়োগ করিবার পর যে 'সিরম্' বা জলীয় পদার্থ সংগৃহীত হয়, তাহারই সাহায্যে সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা আমেরিকায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই "সিরম্" সর্প-বিষের প্রতিষেধক বলিয়াই মার্কিণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতীয় সর্প-দংশনের জন্ত বিভিন্ন প্রকার সর্প-বিষ হইতে 'সিরম্' সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ব্রেজিলে একটা বৃহৎ সর্পক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সর্প-নিবাসে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বিষাক্ত সর্প প্রতিপালিত হইতেছে। ভারতবর্ষেও এইরূপ একটা বিরাট সর্প-নিবাস প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাবও চলিতেছে। মিঃ হ্যারি এল্ বরণহাম্ নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক এ সম্বন্ধে চিকাগো হইতে প্রকাশিত "ইলষ্ট্রেটেড ওয়ার্লড্" নামক কোনও সাময়িক পত্রে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এক প্রকার সর্প-'সিরমের' দ্বারা বহুবিধ সর্প-দংশনজনিত বিষের চিকিৎসা হইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বিষাক্ত সর্পের সংখ্যা তত অধিক নহে, সর্পদংশনে সে দেশের মৃত্যুর হারও নিতান্ত অল্প—একেবারেই উপেক্ষণীয়। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে তাহা নহে। এ দেশে অন্ততঃ তিন শত বিভিন্ন শ্রেণীর সর্প বিদ্যমান। তন্মধ্যে ৬৮ প্রকারই বিষধর সর্প। এ দেশে বৎসরে সর্পদংশনে গড়ে ২০ হাজারেরও অধিক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। এতদ্ব্যতীত গৃহ-পালিত গো-মেষাদির কথা ত স্বতন্ত্র।"

ডাক্তার হ্যারি এল্ বরণহাম্ উল্লিখিত সাময়িক পত্রে আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"বহু শতাব্দী ধরিয়া সর্প-দংশনের ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। এখন পরীক্ষার দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, সর্প বিষই সর্প-দংশনের প্রকৃষ্ট মহৌষধ। কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে।

"কেহ যদি গোক্ষুর অথবা 'রসেল' সর্পের দ্বারা দংশিত হয়, তবে সেই নির্দ্দিষ্ট সর্প-সিরম্ ব্যতীত দংশিত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার অন্য কোনও উপায় নাই। অন্য কোনও বিষধরের সিরম্ প্রয়োগ করিলে তাহাতে কোনও ফল দর্শিবে না। সুতরাং সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে কোন্ জাতীয় সর্পে দংশন করিয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। তার পর দংশনের অব্যবহিত পরেই যদি সেই জাতীয় সর্পবিষ বা সিরম্ দংশিত ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট করিয়া না দেওয়া যায়, তবে রোগীর রক্ষার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এরূপ স্থলে তাহা জানাও সকল সময় সম্ভবপরও নহে।

"ভারতবর্ষে সর্প-দংশন-জনিত মৃত্যুর হার হ্রাস করিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে এমন কোনও প্রতিষেধক সর্প-বিষ আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহার দ্বারা একাধিক জাতীয় সর্পের দংশন-জনিত বিষকে প্রতিরোধ করা যায়। ডাক্তার ভিটাল ব্রাজিল সংপ্রতি একপ্রকার সিরম্ তৈয়ার করিয়াছেন, ইহার দ্বারা তিনি ব্রেজিলের যাবতীয় বিষধরের দংশনজনিত বিষের প্রতিকার করিতে পারেন। তিনি এখন ভারতগবর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষে একটা বৃহৎ সর্প-নিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে

অনুরোধ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে অতি শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা হইবে।

"ব্রেজিলে সর্প নিবাস বা সর্প-পালন-ক্ষেত্র প্রায় দশ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দশ বৎসরে কাযও যথেষ্ট হইয়াছে। এই বিরাট্ সর্প-ক্ষেত্রে দক্ষিণ আমেরিকায় তীব্র বিষধরদিগকে ধরিয়া আনিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজাকার ঘরের মধ্যে রাখা হইয়াছে। এই ঘরগুলি উত্তমরূপে সিমেণ্ট করা। এই সর্পক্ষেত্রের গম্বুজাকার ক্ষুদ্র গৃহগুলি দেখিলেই আফ্রিকায় পল্লীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সংগৃহীত সর্প হইতে সময়ে সময়ে বিষ বাহির করিয়া লওয়া হয়। সুগার অব মিল্কের সহিত সেই বিষ মিশাইয়া অন্য জীবদেহে যন্ত্রযোগে প্রবিষ্ট করান হয়। বিন্দু বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে

ব্রেজিলে সর্পপালন ক্ষেত্র।

মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। অবশেষে সেই পশু সম্পূর্ণরূপে সর্পবিষ প্রতিরোধে সমর্থ হয়। তখন সেই পশুর দেহ হইতে বীজ সংগৃহীত হয়। এই বীজ উল্লিখিত জাতীয় সর্পদংশনের প্রতিষেধক।

"ডাক্তার ব্রাজিল প্রথমতঃ দুই প্রকার বিষাক্ত সর্পের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন। কিন্তু কোন্ জাতীয় সর্প মানুষকে দংশন করিয়াছে, রোগীকে দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না, এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ডাক্তার বহু গবেষণা ও পরীক্ষার পর আর এক প্রকার সিরম্ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আবিষ্কৃত বিষ প্রতিষেধকের সাহায্যে ব্রেজিলের যে কোনও জাতীয় বিষাক্ত সর্পের দংশন হইতে মানুষকে রক্ষা করা যায়। ভারতীয় ডাক্তাররা চেষ্টা করিলে যে কোনও প্রকার ভারতবর্ষীয় বিষাক্ত সর্পের দংশন হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা সর্প-সিরম্ কেন আবিষ্কার করিতে পারিবেন না, তাহা বুঝা যায় না।

"আমেরিকা যুক্তরাজ্যের বিষাক্ত সর্পসমূহ, ভারতীয় গোক্ষুর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিষধরগণের ন্যায় উগ্রপ্রকৃতির বা কোপনস্বভাবের নহে। যুক্তরাজ্যের বিষধর সর্পগণের বিশেষত্ব আছে বলিয়া এ প্রদেশের বুদ্ধিমান্ জনগণ মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া বা তাহাদের আবির্ভাব বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়া থাকে। কাযেই যুক্তরাজ্যের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করে। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে কয়েকবার সর্পক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কারণ, সর্পক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া, সর্পবিষ হইতে প্রতিষেধক প্রস্তুতের দ্বারা ব্যবসায় হিসাবে এখানে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা তেমন অধিক নহে বলিয়াই এখানে সে ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

"এতদঞ্চলে যে সিরম্ ব্যবহৃত হয়, তাহা ফ্রান্সের পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে আনীত হইয়া থাকে। ডাক্তার কাল্‌মেৎ তথায় কিছুকাল ধরিয়া সর্পবিষ-প্রতিষেধক প্রস্তুত করিতেছেন। গৃহপালিত পশুদেহে ক্রমে ক্রমে গোক্ষুর সর্পের বিষ সঞ্চারিত করিয়া সেই পশুকে তিনি বিষ প্রতিরোধে সমর্থ করিয়া তুলিবার পর তাহার দেহ হইতে সংগৃহীত বীজ অন্য

সিরম্ সর্ব্বশেষে সংগৃহীত হয়, তাহা সর্পদংশনের বিশিষ্ট প্রতিষেধক।"

মিঃ বরণহাম্ অতঃপর সর্প-বিষের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিতেছেন যে, সর্প-দংশনের পর জীবদেহে রক্ত-সঞ্চালন স্তব্ধ হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, শ্বাস-প্রশ্বাস, স্নায়ুমণ্ডলী এবং প্যাকস্থলীর ক্রিয়াও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। জীবদেহে শোণিত-স্রোত সাধারণতঃ যেরূপ নিয়মিত গতিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে, সর্প-দংশনের পর তাহা হ্রাস পাইয়া থাকে। দংশনের অব্যবহিত পরে—সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রাথমিক উত্তেজনার পর—স্নায়ুমণ্ডলীতে অবসাদের সঞ্চার হয়, ক্রমে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আহত ব্যক্তি ঢলিয়া পড়ে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এ তন্দ্রা আর ঘুচিয়া যায় না। মস্তিষ্ক সর্ব্বশেষে আক্রান্ত হয়। ডাক্তার বলিতেছেন :—

"সর্পবিষ সাক্ষাৎসম্বন্ধে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবামাত্র অতি দ্রুত ক্রিয়া করিতে থাকে। কিন্তু হাইপোডারমিক্ প্রয়োগে চর্ম্ম ও মাংসপেশী বিদ্ধ করিয়া উক্ত বিষ সঞ্চারিত করিলে উহার প্রক্রিয়া খুব দ্রুত হয় না। সুতরাং দংশনের অব্যবহিত পরেই যদি বিশেষ চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে দংশিত ব্যক্তির জীবনরক্ষার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে—বহুসংখ্যক ব্যক্তি এইরূপে রক্ষাও পাইয়াছে।

"সর্পের বিষ একটু গাঢ়। উহার মুখবিবরের উপরিভাগের দুই পার্শ্বের 'মাড়ীর' গ্রন্থির মধ্যে বিষ সঞ্চিত হয়। অর্থাৎ সাপের চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে ত্বকের নিম্নেই বিষের থলির অবস্থান। উত্তর-আমেরিকার র‍্যাটেল্ সর্পই সর্ব্বাপেক্ষা বিষাক্ত। এই সর্প পঞ্চদশ শ্রেণীর। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক শ্রেণীর বিষাক্ত সর্প আছে। কিন্তু র‍্যাটেল সর্পের বিষই অতি ভয়ঙ্কর। সাধারণের বিশ্বাস যে, সর্পের বিষদন্ত উৎপাটিত হইলেই আর তাহার অনিষ্ট করিবার কোনও ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানেন যে, এই বিশ্বাস অতি ভ্রমাত্মক। বিষদন্ত একটি নহে। যদি উভয় দিকের বিষদন্ত উৎপাটিত করা যায়, তবে তাহা আবার গজাইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ হয়। প্রত্যেক বিষদন্তের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষদন্ত থাকে। ক্রমে সেগুলি বড় হইয়া দংশনের উপযোগী হয়। উপাড়িয়া না ফেলিলেও বড় দাঁতগুলি আপনা হইতেই পড়িয়া যায়। তখন নবোদ্গত দন্ত স্বধর্ম্ম পালন করিয়া থাকে। দেড় মাস হইতে দুই মাসের মধ্যে যে কোনও বিষধর সর্পের বিষদন্ত আপনা হইতে স্খলিত হইয়া যায়। পার্শ্বের ছোট দাঁত কার্য্যক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত বড় দাঁত পড়ে না। তার পর যদি বিষদাঁতগুলি উপাড়িয়া ফেলাও সম্ভবপর হয়, তথাপি বিষের থলি থাকিয়া যায়। তখন মাড়ীর অস্থ্য দন্তের দ্বারা দষ্ট হইলেও বিষের ক্রিয়া জীবদেহে প্রকাশিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।"

আগ্নেয় গিরিমুখে বিমানচারী।

ফরাসী বিমানবিহারী সটিলোপ্ সংপ্রতি বিমানপোতযোগে জাভার পূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী টেন্‌গার পর্ব্বতে অবরোহণ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পর্ব্বতের সেমিরুশৃঙ্গ হইতে তখন ধূম-বাষ্প নির্গত হইতেছিল। তিনি পর্ব্বতে অবতরণ করিবার পর আগ্নেয়গিরির মুখ-বিবরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

ব্রমো আগ্নেয়-গিরি; সটিলোপ্ ইহার মুখবিবরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

ব্রমো হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। সম্মুখের গিরির নাম ব্যাটক্। ব্রমো উহার অপরপার্শ্বে অবস্থিত।

বিমানপোত হইতে সটিলোপ যখন ব্রমোর অগ্ন্যুৎপাত দর্শন করেন, তখনকার অবস্থা।

ফরাসী বিমানবিহারী শূন্যপথে অবস্থানকালে ব্রমোর এই ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত দর্শন করেন। তাহার পর তিনি অতি সাবধানে উত্তপ্ত গৈরিকধারানিঃস্রাবী মুখবিবরের এক-প্রান্তে তাঁহার বিমানপোত নামাইয়া মুখবিবর পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার এই দুঃসাহস ও তথ্যানুসন্ধানপ্রবৃত্তির প্রশংসা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। এরূপ কার্য্য পূর্ব্বে কেহই সম্পাদন করিতে পারেন নাই। জাভা-দ্বীপ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আগ্নেয়-গিরিবহুল। শুধু তাহা নহে, এখানকার অগ্ন্যুৎপাতের তুলনা হয় না।

সমুদ্র-সলিলে স্বর্ণ।

সমুদ্র-সলিলে স্বর্ণ পাওয়া যায়, বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইদানীং পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমুদ্র-সলিলে ৩০টি বিভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত আছে। অবশ্য তাহার অতিরিক্ত অন্য কোনও পদার্থ আছে কি না, তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। হয় ত থাকিতেও পারে। লবণ, ম্যাগনেসিয়ম্, ক্যালসিয়ম্ সলফেট এবং স্বর্ণ এই আবিষ্কৃত পদার্থ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। স্বর্ণ অতি অল্প পরিমাণেই আছে। সমুদ্র-সলিল হইতে স্বর্ণ বাহির করিবার বহু চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু উহা এমনই ব্যয়সাধ্য যে, ফল তাহাতে কিছুই নাই। প্রায় ৩ শত টাকা ব্যয় করিয়া ১৫ টাকা মূল্যের স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে মাত্র। সুতরাং সমুদ্র-সলিলে এই মূল্যবান্ ধাতু মিশ্রিত থাকিলেও লাভ তাহাতে নাই।

জলের ভিতর সিনেমা চিত্র গ্রহণ।

জলের ভিতর হইতে কিরূপে মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তুর চিত্র তুলিতে হয়, সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে। মিঃ মার্টিন্ ডন্‌কান্ নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ লণ্ডনের "জুলজিকাল সোসাইটি"তে এতৎসংক্রান্ত অনেকগুলি চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। জলের ভিতরের প্রাণীর চলচ্চিত্র তুলিতে হইলে যে প্রকারের ক্যামেরা ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয়, তিনি তাহারও বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সুকৌশলে নির্ম্মিত বিশিষ্ট জলাধারে মৎস্য রাখিয়া তাহাদের ছবি তুলিতে হয়। এই জলাধার কাচ-নির্ম্মিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর ফটো লইতে হইলে বিশিষ্ট প্রকারের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। এই জলাধারের তিন দিকে কাচ, পশ্চাদ্ভাগের আবরণ ধাতু নির্ম্মিত। প্রাণীর বর্ণভেদে এই ধাতব আবরণের বর্ণও পরিবর্ত্তিত করা হইয়া থাকে। নিম্ন ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড প্রভৃতির দ্বারা সমাচ্ছন্ন। পশ্চাদ্ভাগ কখনও কখনও পাহাড়ের মত করিয়া গঠন করিতে হয়।

স্বল্প সলিলের অভ্যন্তরস্থ জলজ প্রাণীদিগের চলচ্চিত্র এই ক্যামেরার সাহায্যে অনায়াসে গ্রহণ করা যায়। মিঃ ডন্‌কান্ বলিয়াছেন যে, বহু বর্ষ ধরিয়া তিনি সামুদ্রিক প্রাণীর ছবি তুলিতেছেন। এ জন্য তাঁহাকে নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত করিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ছবি তুলিবার নানা প্রণালীও তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। একটা নূতন রকমের জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তিনি জলজন্তুদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, সময়ে সময়ে তাহাদের ফটোগ্রাফও লইয়াছেন। এইরূপে দীর্ঘকাল চেষ্টার পর তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। জলাশয় বা জলাধার কাচ-নির্ম্মিত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা সাধারণ কাচ নহে। ছবি তুলিবার সময় কাচের জন্য পদার্থের আকৃতির বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে, এ জন্য এমন কাচ তিনি ব্যবহার করেন, যাহাতে প্রাণীর চিত্র খুব স্বাভাবিক ভাবেই ক্যামেরায় প্রতিফলিত হয়। তাঁহার পরীক্ষাগারে, চৌবাচ্চায় যে জল ব্যবহৃত হয়, তাহা অত্যন্ত নির্ম্মল। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই জল তিনি সুপরিস্কৃত করিয়া লয়েন। জলের বিশুদ্ধির উপরেই চিত্রের সুস্পষ্টতা বিশেষরূপে নির্ভর করে। যে মৎস্য বা জলজন্তুর ছবি তুলিবার প্রয়োজন
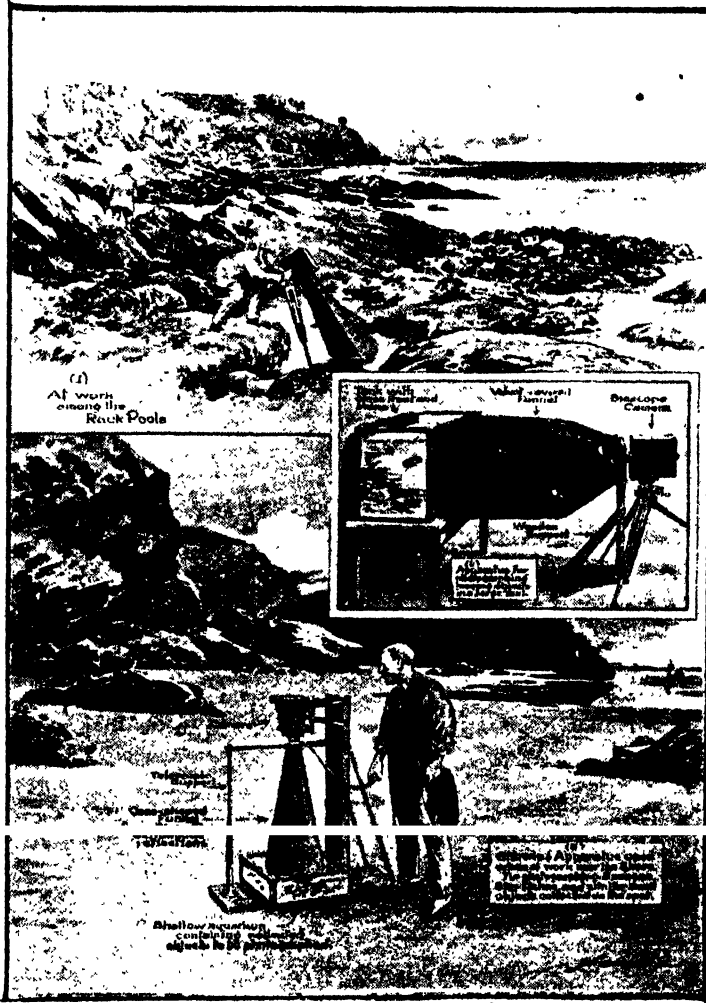
১ম চিত্র—জলাশয়ের অভ্যন্তরস্থ জীবসমূহের চলচ্চিত্র গ্রহণের যন্ত্র। শৈলাভ্যন্তরস্থ রক্ষিত জলরাশির মধ্য হইতে কিরূপে যন্ত্রযোগে ছবি তুলিতে হয়। ২য় চিত্র—প্রকাণ্ড, কাচনির্ম্মিত জলাধারের মধ্যস্থ মৎস্যাদি জলচর জীবের চলচ্চিত্র গ্রহণের যন্ত্র। ৩য় চিত্র—এই যন্ত্র সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী শৈলাভ্যন্তরস্থ স্বল্প সলিল হইতে সংগৃহীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ-প্রাণীর চলচ্চিত্র গ্রহণের উপযোগী।
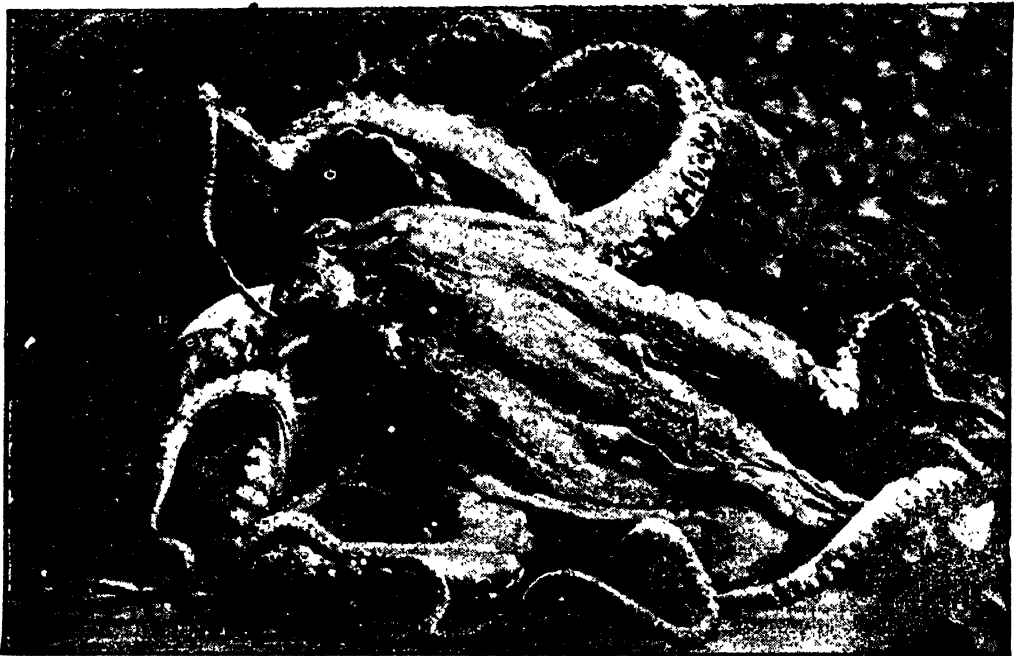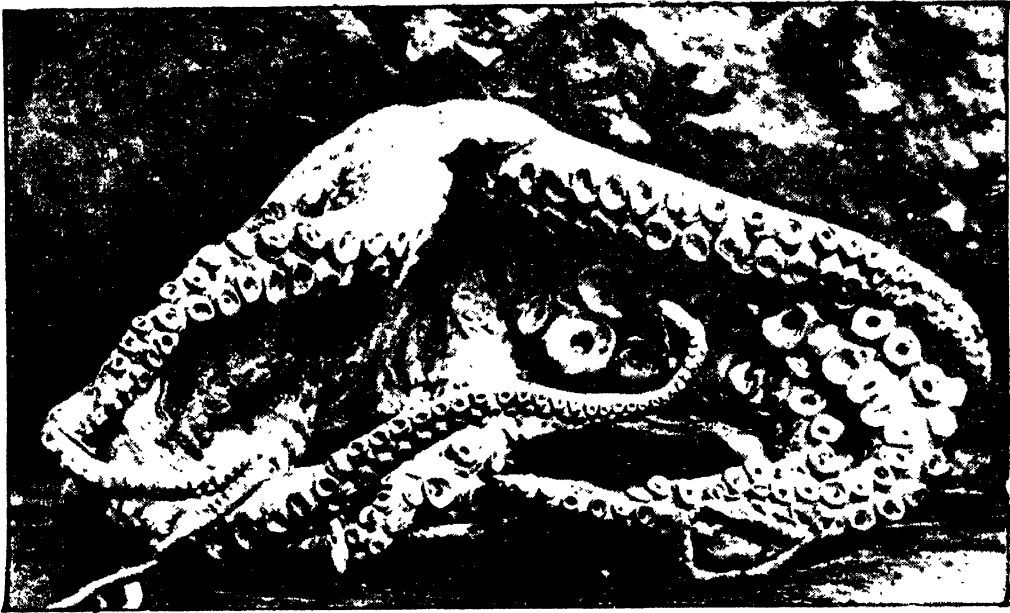
অষ্টভুজ রাক্ষস। জলের মধ্য হইতে গৃহীত। ইহার প্রতি ভুজে দুই সারি করিয়া রক্তশোষণী আছে।

হয়, তাহাকে উক্ত আধারস্থ জলে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে স্পঞ্জের দ্বারা তাহার দেহ মার্জ্জিত ও ধৌত করিয়া দেওয়া হয়, যেন বালুকা বা অন্য কোনরূপ ময়লা তাহার দেহে থাকিতে না পারে।

জলের মধ্য হইতে সিনেমা বা চলচ্চিত্রের জন্য তিনি যে সকল জলজন্তুর ছবি তুলিয়াছেন, তাহার কয়েকটি চিত্র প্রদত্ত হইল।

এই জাতীয় অষ্টভুজের শোষণ যন্ত্রের সংখ্যা ২ হাজার

হইবে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সমুদ্রমধ্যে প্রায় ৯০ প্রকারের অষ্টভুজ রাক্ষস আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বাহামাজ' উপকূলে একটা অষ্টভুজ ধৃত হইয়াছিল। তাহার বাহুগুলি ৫ ফুট দীর্ঘ, ওজনে এই রাক্ষসটি প্রায় সাড়ে ৩ মণ হইবে। এক একটি স্ত্রী-অষ্টভুজ এক এক বারে ৪০ হইতে ৫০ হাজার ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রসলিলে একবার একজন ইংরাজ মহিলা স্নান করিতে নামিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি একটা অষ্টভুজের দ্বারা আক্রান্ত হয়েন। ভীষণ সংগ্রামের পর এই রাক্ষসের কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়। নিহত অষ্টভুজকে মাপিয়া দেখা গিয়াছিল, তাহার দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। গত বৎসর আয়র্লণ্ডের অনতিদূরে একটি বৃহৎ অষ্টভুজ রাক্ষস ঝড়ের দ্বারা তাড়িত হইয়া সমুদ্র-তরঙ্গের প্রভাবে 'কারোনিয়া' নামক জাহাজের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দুষ্ট রাক্ষস, জাহাজের সূত্রধরকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময় রাক্ষস উক্ত সূত্রধরের উপর এক প্রকার মসীবৎ জলীয় পদার্থ নিক্ষেপ করিয়াছিল। একটি লৌহদণ্ডের সাহায্যে উক্ত সূত্রধর রাক্ষসটিকে নিহত করে। লিভারপুল যাদুঘরে উক্ত অষ্টভুজের দেহ রক্ষিত আছে। ইহার একটি বাহু দৈর্ঘ্যে ৪ ফুটেরও অধিক।
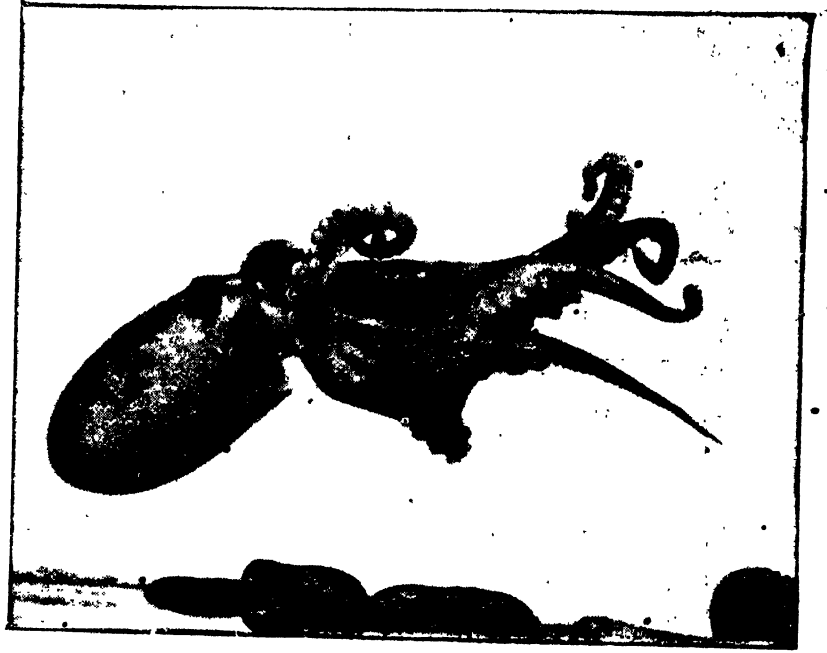
সন্তরণকালে অষ্টভুজের অবস্থা।

জলের মধ্যে, আবাসগৃহে সামুদ্রিক মোচা চিংড়ী।
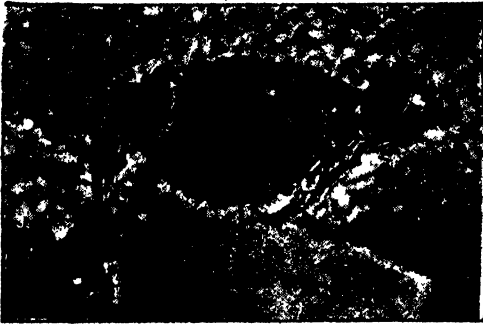
জলের মধ্যে কর্কটক বেড়াইতেছে।

জলের মধ্যে একটি কাঁকড়া অপর কাঁকড়াকে আক্রমণ করিয়াছে।
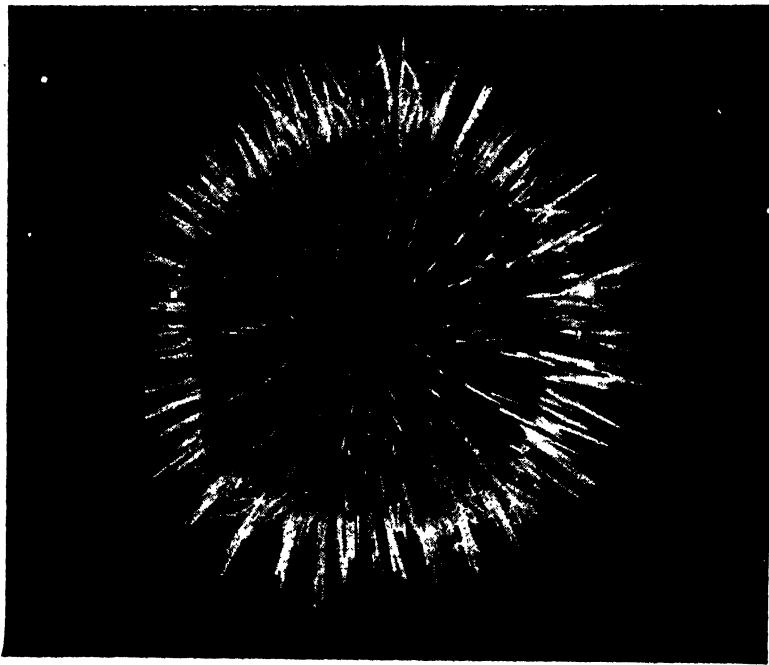
তারা মৎস্য।

উভয় কাঁকড়ার দ্বন্দ্বযুদ্ধ—বিয়োগান্ত দৃশ্য।

শোচনীয় পরিণাম। জেতা, পরাজিত কাঁকড়ার দেহ খাইতেছে।

অপ্সর জাতীয় মৎস্য। অনেকটা বেহালার ন্যায় দেখিতে।

সামুদ্রিক পুষ্প।

রে-জাতীয় মৎস্য—সাঁতার দিতেছে।

নব ডাকাতের ডায়েরি।

১
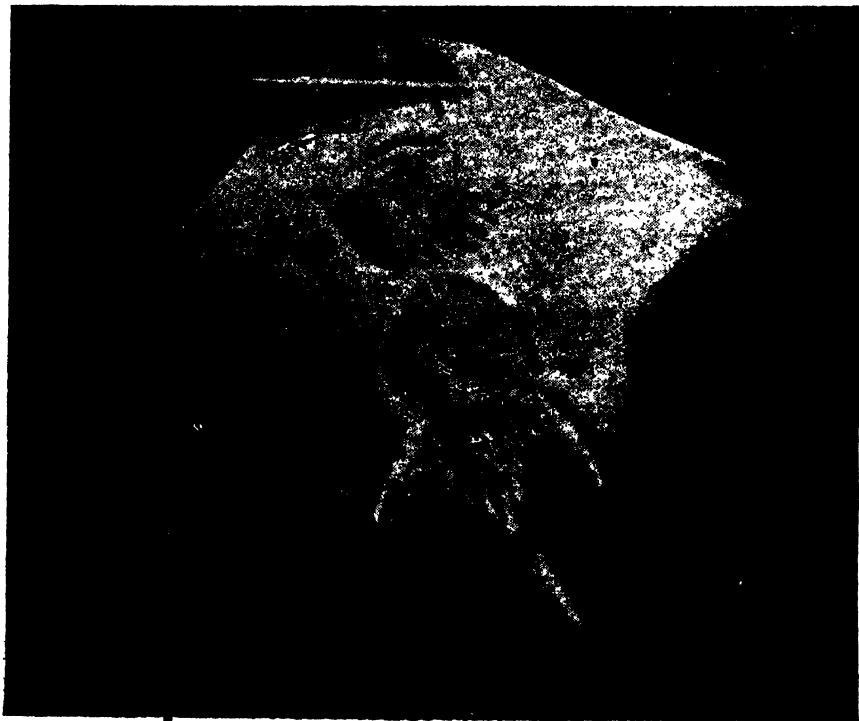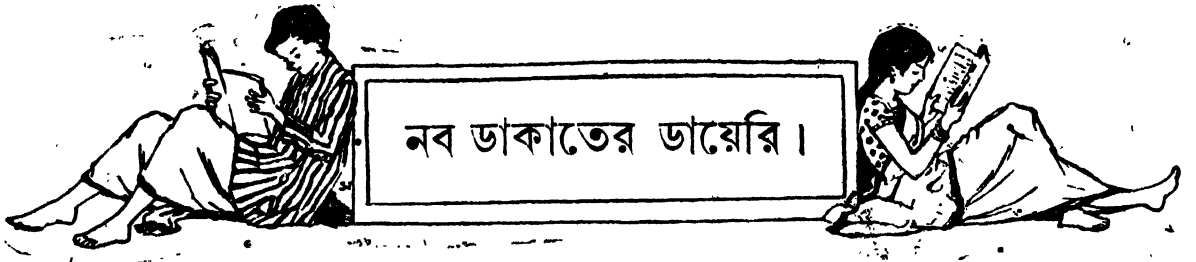
নাঃ, আর পারা যায় না! দুর্ব্বল মনটার সঙ্গে কিছুতেই আর পারিয়া উঠিতেছি না। আগে বিশ্বাস ছিল, 'স্বদেশী' হইবামাত্র মনের কাপুরুষতা-মালিন্য আপনা হইতে মুছিয়া পুঁছিয়া যায়। কিন্তু বিপরীত জ্ঞানের টনটনে বেদনায়— গ্লানিজর্জ্জর আত্মাপুরুষ হতাশ্বাসে মর-মর হইয়া পড়িতেছে—উপায় কি করি? কিমৌষধং?

দুঃখের জ্বালায় এক একবার এমনও ইচ্ছা হয় যে, দুর্ব্বলতা-দুর্দ্দান্ত এই হৃৎপিণ্ড-অরিটাকে দুই হাতে চিরিয়া হিরণ্যকশিপু-বধের আনন্দলাভ করি,—তাই বা পারি কই? ইহা ত আর অসহায়া বাঙ্গালী-বধূকে ঘরের কোণে ঠাসিয়া মারা নয়—এ হইতেছে প্রবল দৈত্য আত্মাপুরুষ—ইহাকে মারিতে গেলে নিজেই মরিতে হইবে, তাহা পারি কই? অতএব আবার জিজ্ঞাসা করি—কিমৌষধং? মনের কাপুরুষতা ঘুচাই কিরূপে?

শুনা যায়, আমার পূর্ব্বপুরুষ হরিহর শর্ম্মার নামডাকে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। রঘো ডাকাত আমাদের বাস্তুভিটার ধার দিয়া নদী বাহিয়া ডাকাতী করিতে যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে তাঁর নাম জপ করিতে করিতে নৌকা চালাইত। হরিকর্ত্তা ছিলেন রঘুর অস্ত্রগুরু। লাঠি-তলোয়ারে তিনিই নাকি তার হাতে খড়ি দেন। গুরুভক্ত রঘুবীর ডাকাতীর পর প্রতিবারই নবরত্ন ডালি তাঁহার চরণতলে ধরিয়া দিয়া গুরুপ্রণাম পূর্ব্বক সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত। তখনকার দিনে এরূপ উপহার গ্রহণ মানহানিকর বা রাজ-অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল কি না, আমার জানা নাই— তবে রঘুবীরের এই সম্মানে হরি শর্ম্মার নামডাক যে খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল, দেশের সর্ব্বসাধারণ যে তাঁহাকে অতিরিক্ত ভক্তি-সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিত, ইহা বেশ ভাল করিয়াই জানি। এ হেন প্রবলপ্রতাপ হরিহর শর্ম্মার সন্তান যে আমি—আমার সকল তেজ, সকল উদ্দীপনা,—একটা নরম কথাতেই কিনা ঠাণ্ডা জল হইয়া যায়! হায়রে! প্রকাশেও এ দুঃখের উপশম নাই—কেবল লজ্জা!

আমার পিতৃঠাকুর ছিলেন—হেয়ার কলেজের এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র। কলেজের ইংলিশ প্রোফেসর ডাক্তার কেমিক্যাল তাঁহাকে সন্তানতুল্য স্নেহ করিতেন। তখনকার দিনে নাকি গুরুশিষ্যে বিজাতীয় বিসংবাদ ছিল না। এই পুরাদস্তুর পিঠ-থাবড়ান সম্পর্ক—ইংরাজীতে যাকে বলে Patronising ভাব, তাহা যে আমাদের জাতীয়তার তেজ-খর্ব্বকর—তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এ রকম গায়ে হাত-বুলান স্নেহ তাই আজকাল আমরা মোটেই পছন্দ করি না, তবে পিতৃদেব অন্যরূপ বুঝিতেন, শিক্ষকের স্নেহে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

পিতার মৃত্যুকালে আমার বয়স ছিল ১৫ বৎসর। তিনি যখন রোগশয্যায় পড়িয়া, তখন ডাক্তার কেমিক্যাল প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, আমাকে সেখানে উপস্থিত দেখিলে, অজস্র মিষ্ট কথা আমার উপর বর্ষণ করিতেন, আমার বালক-মন সহজেই তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িত।

মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে একদিন বাবা কেমিক্যাল সাহেবকে বলিলেন, "জানেন ত সাহেব, অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে এই ছেলেটি আমার বেঁচে আছে, এ'কে আমি মানুষ ক'রে যেতে পার্‌লাম না, আপনার উপরই সে ভার রইলো, দেখ্‌বেন, ভবিষ্যতে এ যেন মানুষ হয়।"

* * * * *

বলা বাহুল্য, আমিও হেয়ার স্কুলে পড়িতাম। পিতৃবিয়োগের পর আমার পড়াশুনার প্রতি কেমিক্যাল সাহেবের এমন তীব্র-দৃষ্টি পড়িল যে, আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। বছরখানেক টি'কিয়া থাকিতে পারিলে, এণ্ট্রেন্সটা সহজেই পাশ করিতে পারিতাম। কেন না, তিনি নিজে যত্ন করিয়া সন্ধ্যাবেলা আমাকে পড়াইতেন; ছাত্র-জীবনে ইহা পরম সৌভাগ্য। কিন্তু অতিরিক্ত সুখ-সৌভাগ্য বহু সময়ে অসুখেরই কারণ

হইয়া উঠে। অন্ততঃ এ সৌভাগ্য আমি বরদাস্ত করিতে পারিলাম না। বছর ত বছর বটে, দিনও নয়, মুহূর্ত্ত ত নয়ই। বারোটা মাসে ছুটীগুলা সব পুরাপুরি বাদ সাদ দিয়া তবুও ত অন্ততঃ দু'শ পঁয়ত্রিশ দিন বই হাতে করিয়া দিন কাটাইতে হইবে বৎসরে! পিতৃমৃত্যুতে স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া এই দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় কি কাটান যায়! মনে করিতেও দম বন্ধ হইয়া উঠিত! ইহার উপর, আমার উপর ক্লাশের ছাত্র-বন্ধুরা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, কেমিক্যাল সাহেব মানুষ গড়িবার ছলে আমাকে বাঁদর বানাইবার চেষ্টায় আছেন; তখন আর আমাকে পায় কে? নিজেকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার নিজের হাতে লইয়া, মাস-কতক যাইতে না যাইতেই স্কুল ত্যাগ করিলাম।

আবাল্য আমি 'স্বদেশী'। দুধে দাঁত বোধ হয় তখনও আমার সব ভাঙ্গে নাই, যখন আমি সদলবলে দোকানীদের বিলাতী কাপড় পুড়াইয়া আসিয়াছি। এবার স্কুল ছাড়িয়া রীতিমতভাবে বিপ্লবপন্থী হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু এমন গোপন কথাও কেমিক্যাল সাহেবের নিকট গোপন রহিল না। কি করিয়া যে এ খবর তাঁহার কানে পৌছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত আমার নিকট রহস্যপূর্ণ। ইচ্ছাশক্তির এ কোনরূপ অবিদিত ক্রিয়া না কি? কে জানে? কিন্তু আমার খবরকে ধরা আর আমাকে ধরা ত আর এক কথা নয়। তাঁহার চিঠি বহাবহিতে ডাকপিয়নের জুতার তলাটাকে ক্ষয়রোগে ধরিল, শিকলকাটা মুক্ত পাখী আমি, কিন্তু তবু তাঁহাকে ধরা দিতে চাহিলাম না। না চাহিলে কি হয়—? দৈব যে স্বয়ং ক্ষমতার অধীন, ইচ্ছাশক্তির দাস—আমরা যদি শুধু এই সত্যটুকুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে জানিতাম, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যলিপি উল্টাইয়া যাইত। যাক্। ধরা না দিয়াও এক দিন আমি ধরা পড়িয়া গেলাম।

তখন বেলা ২টা, আমি শ্যামবাজার হইতে ট্রামে ভবানীপুর যাইতেছিলাম, কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দেখিলাম, এক জন হ্যাটকোটধারী সেই গাড়ীর দিকে দ্রুতপদে চলিয়া আসিতেছেন। কে ও? কেমিক্যাল সাহেব ত নন? হইতেও পারেন তিনি, এই সময় লেক্‌চার শেষ করিয়া কোন কোন দিন তিনি বাড়ী যান। আর ঠিক এ সময়েই কি না আমি চৌরঙ্গীর ট্রামে চড়িয়া বসিলাম—কি দুর্ব্বুদ্ধি আমার! আপসোষটা লজ্জায় এবং সন্দেহ সত্যে পরিণত করিয়া কেমিক্যাল সাহেবের পাদুটা গাড়ীর পাদানীর উপর যখন চড়িল, তখন আমার বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; ইচ্ছা হইল, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এ লজ্জাভয় নিবারণ করি; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সাহেব আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া 'হ্যালো' বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার স্বরে তাঁহার সমস্ত মুখে কি আনন্দ-স্ফূর্ত্তি! সেই আনন্দধারা আমার লজ্জানুতাপপূর্ণ মনকেও বেশ একটু আর্দ্র করিয়া তুলিল, বিস্মৃত অনুরাগ-প্রীতি আমার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

* * * * *

সাহেব বলিলেন—মর্ম্মান্তিক অনুনয়পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তোমার পিতার কাতর মৃত্যুবাণী আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারি নে, তুমি স্কুল ছেড়ে গিয়ে পর্য্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। কথা রাখ নবকুমার, স্কুলে আবার ভর্ত্তি হও—জীবনটা নষ্ট কোরো না—তোমার প্রতিভাশক্তির বিকাশ কর।" বলিয়া এক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিলেন; তাহার পর শক্তি সংগ্রহ করিয়া যেন বলিলেন—"ও পথ ছাড় নবকুমার, ওতে দেশেরও মঙ্গল নেই, তোমারও মঙ্গল নেই, প্রকৃত বন্ধুর উপদেশ শোন, ও পথ ছাড়। আবার পড়াশুনা ধর।"

তাঁহার কাতরতায় মনটা বড়ই নরম হইয়া গেল, বলিতে লজ্জা করে—আমার চোখ দুটা জলে ভরিয়া উঠিল। আমি আন্তরিকভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—"বল স্কুলে ভর্ত্তি হবে—আমি আজই তোমার নামে টাকা জমা দিয়া দিব।"

"বেশ।"

"বলো ও দলে আর মিশবে না? কথা দাও নবকুমার; প্রতিজ্ঞা কর?"

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। মন বলিল,—"তাও কি কখনো হয়?" কিন্তু মনের মত পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ এ দুনিয়ায় বোধ হয় আর দুটি নাই—অন্ততঃ আমার পক্ষে। সাহেবের জুতার দিকে চাহিয়া মন যে কথা ভাবিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহা ভুলিয়া গেল—তাঁহার অনুনয়পূর্ণ কাতর-দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখিয়া আমি বলিতে যাইতেছিলাম—"আচ্ছা, বেশ, তাই হবে।" কিন্তু মনের কথা মুখে ফুটিবার

পূর্ব্বেই গাড়ীটা সশব্দে থামিল—আর ধীরেন গুরুগম্ভীর মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র আমরা বাক্‌রোধ হইয়া গেল। এতক্ষণ গাড়ীর এ অংশে আমরা দুই জন মাত্র ছিলাম। তৃতীয় ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া কেমিক্যাল সাহেবও নীরব হইয়া গেলেন; ট্রামও চৌরঙ্গীর পথে আসিয়া পড়িল,—তিনি নামিবার সময় এইটুকু শুধু বলিয়া গেলেন—সন্ধ্যার সময় আমি যেন তাঁহার কাছে যাই—তিনি আমার প্রতীক্ষায় থাকিবেন।

* * * * *

তিনি চলিয়া গেলে ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা হচ্ছিল শুনি?"

আমি একটু বাদসাদ দিয়া মোটামুটি সবই তাহাকে বলিলাম। সে শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, সাহেবের তোমার ইচ্ছা! চিরদিনই আমরা ওদের পদানত হয়ে থাকি। দেখিস্, ওসব মিষ্টি কথায় ভুলিস্ নে।"

"আরে ক্ষেপেছ? কোথায় যাচ্ছ ধীরেনদা?"

"যাচ্ছি—কামাখ্যাধামে একটা কাযের চেষ্টায়, বুঝলে ত?"

"কামাখ্যাধামে! আমাকে কিন্তু এবার সঙ্গে নিতে হবে।"

"পারবি তুই?"

"নিশ্চয়?"

"বিশ্বাস হয় না। তুই যে রকম দুর্ব্বল! রাস্তার কুকুর একটা এক ঘা লাঠী খেয়ে কুঁই কুঁই করলে তোর চোখে জল আসে, কালীঘাটে পাঁঠা বলি দেখলে মূর্চ্ছা যাস্।"

"আরে সে আলাদা কথা। নিরপরাধ বেচারা জীবগুলির প্রতি নিষ্ঠুরতা বা স্বার্থের জন্য তাদের বলি দেওয়া—"

"তা বল্লে চলবে না! রক্তপাতে অভ্যস্ত হ'তে হবে। পরীক্ষা দিতে পারবি?"

"নিশ্চয়। কি করতে হবে বল?"

"শান্তার পাঁঠাটাকে নিয়ে এসে, স্বহস্তে তার মুণ্ডপাত ক'রে—কাল আমাদের বন-ভোজন করা দিকি?"

* * * * *

শান্তা আমার পিসীমার মেয়ে, আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট। পিসীমা বিধবা, মেয়েটিকে লইয়া আমাদের বাড়ীতেই থাকেন। পিসীমার যত্ন-আদরে মাতৃহারা শিশু আমি কোনদিনই মাতার স্নেহের অভাব বুঝি নাই, বরঞ্চ অতিরিক্ত স্নেহ পাইয়া স্নেহের অনাদর করিতেই শিখিয়াছি।

শান্তা একটি কুকুর ও একটি ছাগশিশু পালন করিয়াছিল, এই দুই জীবের আশ্চর্য্য রকম ভাব—তাহারা দুটতে জড়াজড়ি করিয়া খেলা করিত, যেন দুটি বিড়ালছানা। শান্তা দুপুরবেলা মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া শুইয়া থাকিত—তাহার এই বন্ধু বাচ্ছা দুইটি তাহার গায়ের উপর ডিগবাজি খেলিয়া বেড়াইত। ছাগশিশুটিকে লইয়া গেলে, বাড়ীটা যে কি রকম বিষাদপূর্ণ হইবে, মনে করিতেও মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু দেশমাতৃকার চরণে সর্ব্বস্ব বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি, এ রকম কষ্ট দুঃখ ত তাহার তুলনায় সামান্য।

ভোরবেলা বাড়ীর কেহ উঠিবার পূর্ব্বেই ছাগশিশুটাকে গোয়ালঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া চম্পট দিলাম। আশ্চর্য্য! বাচ্চাটা একবার ডাকিল না! সে ভাবিল, আমি তাহাকে স্নেহের আশ্রয়েই উঠাইয়া লইলাম! তখনও শান্তা শয়নকক্ষে, তার কুকুরটা সে সময় তাহারই ঘরে ঘুমাইতেছিল। অতএব আমার কার্য্যে কোনই বাধা পড়িল না। আমি তাহাকে লইয়া বালিগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া অনতিদূরে একটি নিভৃত জঙ্গলে আসিয়া থামিলাম, সেখানে আমার বন্ধুগণ বন-ভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল।

তাহার পর যাহা ঘটিল, সেই নিষ্ঠুর ব্যাপারের বর্ণনা না করাই ভাল। বধকালীন ক্রন্দনপরায়ণ ছাগশিশুর স্নেহ অনুনয়পূর্ণ কাতর ভর্ৎসনা-দৃষ্টি আমার প্রাণে যে শেল বিদ্ধ করিয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে উচ্ছ্বসিত নর-রক্তধারাও আমার মনে সেরূপ অনুতাপ বিঁধাইতে পারে নাই।

২

যাহা ভাবিয়াছিলাম, দেখিলাম, মোটেই তাহা নয়। স্বদেশী ডাকাতীতে ভয়-ভাবনার কারণ—ষোল আনার কড়াক্রান্তি মেলে কি না সন্দেহ—এক কথায় বাধাবিপত্তি নাই বলিলেই হয়। যাত্রার সময় অতীত যুগের আর্য্যবীর্য্য-কাহিনী স্মরণ করিতে করিতে কালীমাতার নামডাকে বিজন জঙ্গলপথ যখন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলাম—তখন আপনাদিগকে ভীমার্জ্জুন তুল্যই মহারথী বলিয়া মনে হইয়াছিল, অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শনে ইতিহাসে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার আশায় মনঃপ্রাণ আত্ম-গৌরবে নাচিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র প্রাণের সেই ভরপুর উপন্যাস

শূন্যে বিলীন হইয়া পড়িল—বুঝিলাম, এ রণও নহে, মরণও নহে, একতরফা শূন্য আস্ফালন মাত্র। হায়! হায়! কার্য্যান্তে মনটা বড়ই দমিয়া গেল।

মুখোসধারী আমরা সংখ্যায় ছিলাম—১৮ জন। যাত্রা করিয়াছি—শ্রীবাবুর বাড়ীর উদ্দেশে—লক্ষ্মীপুর। আগেই পথ-ঘাট বাড়ী-ঘর দেখিয়া চিনিয়া ম্যাপ আঁকিয়া লওয়া হইয়াছে। আজ যে শ্রীবাবু বাড়ী নাই, কার্য্যোপলক্ষে এখন তিনি কলিকাতায়—সে খবরও আগেই জানিয়াছি। শ্রীবাবু এক জন মহাজন, তেজারতি কারবারে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন, ঘরে নগদ টাকা-কড়ি তাঁর যথেষ্ট থাকে। একতলা পৈতৃক কুঠী শীঘ্রই দোতলা হইবে শুনিতেছি; কিন্তু আমাদের লুণ্ঠন-কার্য্যে সুবিধা জোগাইবার জন্যই, বোধ হয়, এখনও একতলাই রহিয়া গিয়াছে। পুলিসথানা তাঁহার বাড়ী হইতে অধিক দূরে নহে, আধ ক্রোশ অপেক্ষাও নিকটে—তাহা ছাড়া এ কালে ডাকাতীর ভয়ও লোকের মন হইতে এক রকম ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, ডাকাতের বীরত্ব এখন গালগল্প মাত্র। অতএব শ্রীবাবু তাঁহার কানন-ভবনদ্বারে দুই জন ভোজপুরী প্রহরী রাখিয়াই এ যাবৎ নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতেছিলেন, সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাততুল্য আমরা তাঁহার শান্তি ভবনের শান্তি নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম।

তখন রাত্রি প্রায় ১২টা। আমরা সকলে বাগানের সীমানা ধীরে ধীরে পার হইয়া, সদর দ্বারে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বহির্ভাগে দুইখানা খাটিয়ার মধ্যে একখানা অনধিকৃত, সম্ভবতঃ ইহার মালিক প্রভুজীর সহিত কলিকাতা যাত্রা করিয়াছে, অন্য খাটিয়াখানির অধিকারী দিব্য আয়েসে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছে। সার্চ্চলাইট তাহার মুখে পড়িবামাত্র, সে ঘুমাচ্ছন্ন চোখেই পাশের লাঠীখানার উদ্দেশে হাত বাড়াইয়া "কোন্ হ্যায় রে, কোন্ হ্যায় রে", করিয়া ডাক ছাড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। সর্দ্দার মহাশয় তাহার মুখের কাছে পিস্তল ধরিয়া বলিলেন, "কথা কহিবে কি গুলী তোমার বুকে পড়িবে।" অন্যেরা অচিরাৎ খাটিয়ার সহিত তাহাকে দড়ী-বুনন করিয়া ফেলিল। ইহার পর এক জন পিস্তলধারীকে তাহার নিকটে এবং কয়েকজনকে বাহিরে পাহারায় রাখিয়া আমরা ৮ জনে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দ্বার দেখিলাম ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দৈব আমাদের সহায় হইলেন, দ্বার ভাঙ্গিবার আর প্রয়োজন হইল না। ভিতর আঙ্গিনায় যে চাকর শুইয়া থাকিত—বাহিরের অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনিতে পাইয়া, প্রভু আসিয়াছেন ভাবিয়া সে যেমন দরজা খুলিয়া দিল, অমনই আমরা কয়েকজন হুড়মুড় করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। চাকরটা "ডাকাত ডাকাত, হুঁসিয়ার হও বাবু" বলিতে বলিতে দ্রুতপদে কোথা দিয়া কোথায় যে পলাইল, তাহাকে আর ধরা গেল না। লোহার সিন্দুক থাকে বাড়ীর ভিতরে অর্থাৎ অন্তঃপুরে, সে খবরও আমরা আগেই পাইয়াছিলাম। দরজায় চারি জনকে রাখিয়া, আমরা চারি জনে ভিতর-বাড়ীতে ছুটিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীবাবু সেদিন বাড়ী ছিলেন না—তাঁহার বাবা, কাকা বা মামা এমনই কোন এক জন বৃদ্ধ একটি ছোট বাক্স লইয়া গুঁড়ি মারিয়া অন্দরের সুঁড়িপথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সর্দ্দার তাঁহার পিঠে আস্তে আস্তে বন্দুকের আগার দ্বারা দুই একটি টোকা লাগাইয়া সসম্মানে কহিলেন, "পালাবার পথ বন্ধ, বাক্সটি ফেলে দিতে আজ্ঞা হোক।" বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কি সে করুণ ভীতভাব! সভয়দৃষ্টি! সহযোগীর হাতের টর্চ্চলাইটের রঙ্গিন আলোক যেন শবের পাংশু মুখে নাচিয়া উঠিল। বৃদ্ধ কম্পিতহস্তে বাক্সটা ভূতলে রাখিয়া ক্রন্দনপরায়ণ হইয়া কহিলেন—"আমার তরঙ্গিণী এ বাক্স আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। তার বিধবা মেয়ের গহনা। কি জবাবদিহি করব তাকে?"

"বল্‌বেন—তার ধন খুব সৎকাযেই লেগেছে; চাবির গোছাটা দিলেন না ত? ফেলে দিন ঠাকুরমশায়!"

বৃদ্ধ ভাবিতেছিলেন, বাক্স ফেলিয়া দিকেই তিনি রেহাই পাইবেন, কিন্তু আমাদের আব্দার তাহাতেই নিবৃত্ত নহে দেখিয়া, অগত্যা চাবির গোছাটাও ফেলিয়া দিয়া একটু ক্ষীণ অভিমান প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এই নে বাবারা এই নে, দেখিস্ যেন কাউকে প্রাণে মারিস্ নে।"

অতঃপর তিনি কাতরচিত্তে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সারসপক্ষীর ন্যায় অন্ধ সাজিয়া বসিয়া রহিলেন; আমরা আলমারি, সিন্দুক লণ্ডভণ্ড করিয়া মাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। স্ত্রীলোকরা ছেলে কোলে করিয়া ঘোমটা টানিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমরা সম্মানভরে নমস্কারপূর্ব্বক সমকণ্ঠে বলিলাম—

"যান মাঠাকৃরুণরা, যান, আপনাদের আমরা কিছুই বল্‌ব না কিন্তু—"

"কিন্তু দেশের কাযে কিছু ভিক্ষা দিয়ে যেতে হবে, বেশী কিছু নয়—হাতের অনন্ত ডু'গাছি খুলে দিয়ে যান।"

"গলার হারগাছাও দান ক'রে ফেলুন।"

"নথটাও বাদ রাখবেন না, আজকাল নথের ফ্যাসান একেবারেই উঠে গেছে—জানেন ত ?"

"লোহাগাছি হাতে রেখে বালাজোড়া দিতে কি কষ্ট বোধ কর্ব্বেন ? বাঙ্গালীর মেয়ে ত আপনারা ; পুণ্যলাভের জন্য কোলের ছেলেকেও ত সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে থাকেন। দিন মাঠাকুরুণ—দেশের কাযে এ দান দিয়ে পুণ্যলাভ করুন ?"

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে অলঙ্কারহীন হইতে লাগিলেন, মাতাদের অলঙ্কারে দেশমাতাকে সাজাইবার মানসে আমরা উৎফুল্লভাবে সে দান গ্রহণ করিলাম।

মা'র অঞ্চলধারী একটি ছোট মেয়ে মুখোসগুলার দিকে চাহিতেছিল, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। এক জন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "এস ত লক্ষ্মী এ দিকে।" সে খুব জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই সময় সহসা আমার মুখোসের দড়িটা খুলিয়া মুখোসটা আমার মুখ হইতে নামিয়া পড়িল। মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিল, তাহার বোধ হয় মনে হইল, এই ভীষণ দৈত্যকুলে আমি প্রহ্লাদ, আমার নিকট হইতে করুণা পাইবে সে। সে ঠিকই আঁচিয়াছিল, আমার ইচ্ছায় কায হইলে, আমি তাহার গহনা লইতাম না ; কিন্তু আমি এখন যন্ত্রমাত্র, সর্দ্দারের ইঙ্গিতচালনায় আমি তাহার হাত হইতে বালা ডু'গাছি খুলিয়া লইলাম। একটা অনুতাপের তীব্র ঝাপটায় অন্তস্তল ভেদ করিয়া সে কাতর-ক্রন্দনে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বার বার "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের জপে সে আলোড়ন শান্ত করিয়া লইলাম।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল মাত্র আমাদের কার্য্যের সময় নির্দ্দিষ্ট। তাহার মধ্যেই আমরা টাকা-কড়ি অলঙ্কারাদি যথেষ্ট বাঁধিয়া লইয়া থলি-স্কন্ধ-সৈনিকবেশে সদর-দ্বারে উপনীত হইলাম।

এই সময় পলাতক ভৃত্যের সহিত কয়েকজন পাড়া-প্রতিবাসী এবং জন দুই চৌকিদার পুরুষ আমাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। সকলের হাতে বড় বড় লাঠী, কিন্তু তাহা চালনার অবসর তাহাদের ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠিল না। ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজে তাহাদিগকে চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, চোরাই মালসহ আমরা তাহাদের পাশ দিয়াই বীরদর্পে বুক ফুলাইয়া চলিয়া গেলাম।

৩

ইহাই স্বদেশী ডাকাতী ! এত সহজে এরূপ সর্ব্বনাশা জয়লাভ এক বাঙ্গালাদেশেই সম্ভবে ! আত্মরক্ষার জন্য একখানা খাঁড়া—অর্থাৎ বড় রকম দা ঘরে রাখিতেও বাঙ্গালীর অধিকার নাই। এই অবাধ জয়লাভে আত্মপ্রসাদ লাভ করিব কি, মন দুঃখগ্লানিতেই ভরিয়া উঠিল। বাঙ্গালার প্রকৃত অসহায় অবস্থা বেশ ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তবুও যে এ দেশে ঘন ঘন ডাকাতী হয় না, রাজভয় তাহার প্রকৃত কারণ নহে, বাঙ্গালী জাতি যে কিরূপ শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির লোক—ইহা হইতে তাহাই বুঝা যায়। হায় হায় ! কত শৌর্য্যবীর্য্য মনুষ্যত্বের বিনিময়ে এই শান্তিটুকু আমরা কিনিয়াছি !

দ্বিতীয়বারে আমরা নৌকাডাকাতী করি। সেবারেও বেশ সহজে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয়বারে আমরা নিরাপদে ফিরিতে পারি নাই। আমাদের কৃপায় ক্রমে লোকরাও সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। এই মুমূর্ষু নির্জ্জীব জাতিকে প্রাণবন্ত সজীব করিয়া তুলিলাম আমরা অঙ্গুলিগণ্য নগণ্য কয়েকজন বালক ! ইহা কি আমাদের গৌরবের কথা নহে ? রাজপুরুষগণও আমাদের ধরিতে না পারিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছিলেন !

তৃতীয়বারেও নৌকাযোগে ডাকাতী করিতে যাই। ডাকাতীর পর মালপত্রসহ আমরা যখন নদীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, সপুলিস জমীদারের লোকজন দুই পাশ হইতে আমাদের আক্রমণ করিল। Fire করিতে অর্ডার পাইলাম—পুলিসও বন্দুক ছুড়িল। তবে অন্ধকার রাত্রি—পুলিসের হ্যারিকান লণ্ঠনের আলো মাঝে মাঝে এক একবার এক একদিকে মাত্র আলোক নিক্ষিপ্ত করিতেছিল, সেই জন্য আত্মরক্ষার সুযোগ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছিলাম। একটিমাত্র ছেলে বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়া পড়িল, কিন্তু সে অবস্থায় তাহাকে নৌকায় তোলা সহজ নহে বুঝিয়া, সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুই জন দেহ লইয়া গেল, ছিন্ন মস্তক তুলিয়া নদীতে

নিক্ষেপের ভার পড়িল আমার উপর। একদিন আমার পাঁঠা কাটিতে কষ্টের সীমা ছিল না, আর আজ সেই আমিই সর্দ্দারের হুকুমে অনায়াসে বন্ধু বালকের ছিন্নমুণ্ড তুলিয়া লইয়া অন্ধকার পথে তীরের দিকে ছুটিলাম। সোজাপথে নৌকা ধরিতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা, সকলেই আমরা ঘুরপথে যাত্রা করিলাম। পথ-ঘাট আগে হইতেই যদিও চেনা জানা, তবুও অন্ধকারে আমি কেমন দিশাহারা হইয়া দলবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। নৌকায় উঠিবার যথন শেষ সঙ্কেত-ধ্বনি পড়িল, তথনও আমি তীরে পৌঁছিতে পারি নাই। ছুটিয়া ছুটিয়া পথ চলিয়া দু' মিনিটের মধ্যেই যদিও একটা আঘাটায় আসিয়া পৌঁছিলাম, কিন্তু নৌকা তথন প্রায় মধ্য-জলে সশব্দে বাহিত হইয়া চলিয়াছে; তাহার নিশানখানা অন্ধকারেও দুলিয়া দুলিয়া আমার পরিত্যক্ত অসহায় অবস্থা বেশ পূর্ণভাবেই ইঙ্গিত করিয়া জানাইল।

বিজন নদীতীরে তৃতীয় প্রহর নিশাকালে যূথভ্রষ্ট মেষসম আমি একা, না, ঠিক একা নহে-- আমার সাথী হস্তে সেই ছিন্ন মুণ্ডটি! আমারি সমবয়সী বালক ছিল সে --কি ভালই বাসিতাম তাহাকে! মুণ্ডটি দুই হাতে ধরিয়া গভীর স্নেহভরে সেই মৃত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—নক্ষত্র-জগতের সমস্ত কিরণ কণা তাহার উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিল,—কি প্রশান্ত কি প্রফুল্ল সে মৃতমুখ,—হাসিভরা চোখ দুটি আমাকে যেন সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল, তবু কষ্টে চখে জল ভরিয়া উঠিল, আমি চক্ষু নিমীলিত করিলাম। কতক্ষণ এরূপে বসিয়া ছিলাম, জানি না—সহসা যেন পশ্চাতে পদশব্দ শুনিলাম, আর ত ভাবনা-চিন্তার সময় নাই—আত্মরক্ষার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া দাঁড়াইয়া মুণ্ডটা নদীর গভীরতর প্রদেশে নিক্ষেপ করিলাম, পরে উঠিয়া অন্য স্থানে গিয়া দাঁড়াইলাম। তথন ভোরের আলোক ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে, দেখিলাম—পিরাণটা রক্তমাখা; তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া, নদী পাড়ের নীচে নীচে কভু বা বালু-পথে, কভু বা কাদা-পথে, কভু কাঁটা-ঝোঁপের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম।

কি সে উৎকট ঔৎসুক্য! বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। যিনি ভুক্তভোগী, তিনিই মাত্র আমার সে সময়ের নিদারুণ যন্ত্রণা বুঝিতে পারিবেন। একবার নিশ্বাস গ্রহণের জন্য একটা ঝোপের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম,—তথন ধুতীর উপরেও দুই এক স্থানে রক্তের দাগ লক্ষ্য করিলাম। কাপড়খানা কাচিতে আবার জলে নামিলাম।

ঐ, ঐ, আবার পদশব্দ! তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঝোপের মধ্যে বসিলাম। পদশব্দ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, দীর্ঘকায় দুই জন লোক ঝোপের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়া জলের দিকে নামিল; আমি ধীরে ধীরে জ্বালাময় রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেখিলাম—তাহারা ধীবর, নৌকাখানা জলে টানিয়া দাঁড় বাহিয়া যথন তাহারা চলিয়া গেল – তথন মনে হইল, আমিও ত উহাদের সহিত যাইতে পারিতাম; নিশ্চয়ই বলিলে উহারা আমাকে লইয়া যাইত। কিন্তু হায়! তথন সময় চলিয়া গিয়াছে!

আবার পদশব্দ! উঁকি মারিয়া চাহিলাম---লালপাগড়ীর চূড়া নজরে পড়িল। আর রক্ষা নাই! গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল; কিন্তু পাগড়ীধারী এদিকে আসিল না; অন্য পথে চলিয়া গেল; হাঁফ ফেলিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া জলে নামিলাম। কি তৃষ্ণা! যেন মুমূর্ষু ব্যক্তির পিপাসা! জলপান না করিতে পারিলে এখনই প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। অঞ্জলি ভরিয়া অমৃত পান করিলাম, দেহে বলসঞ্চয় করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম – তথনও সূর্য্যোদয় হয় নাই— পূর্ব্বগগন লাল হইয়া উঠিয়া---তাঁহারই উদয় অপেক্ষা করিতেছে,—এখনও নদীতীর নির্জ্জন, সবেমাত্র দুই এক জন বৃদ্ধা অনতিদূরে ঘাটে নামিতেছেন; দুই এক জন চাষা লাঙ্গলধারী বলদ লইয়া মাঠের দিকে চলিয়াছে। জমীদারবাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল। মাত্র দুই ঘণ্টা আমি এই তীরে ঘোরা-ফেরা করিতেছি; মনে হইল, এই দুই ঘণ্টার মধ্যে যুগ-যুগান্তর আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেছে! কোথায় লুকাই! কোথায় পলাই! হে ভগবান্, রক্ষা কর, পথ দেখাও; এই অসহায় বালককে আশ্রয় দাও।

আমি একমনে সেই বিপদের কাণ্ডারীকে ডাকিতে লাগিলাম। আবার পদশব্দ! উঠিবার শক্তি হারাইলাম। নিদারুণ ঔৎসুক্যে হৃৎপিণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, আমি সকল শক্তি হারাইলাম! এ কষ্টের অপেক্ষা বন্দী হওয়া ত ভাল! ভগবান্ সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। দুই জন লোক হন্ হন্ করিয়া আমার নিকটেই এবার আসিতে লাগিল। এক জন বলিল,"এই যে— এই যে'!

দেখ দেখি,ও কে এক জন বসে ওখানে ?" মুহূর্ত্তমধ্যে উভয়েই আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আমি বন্দী হইলাম।

* * * *

রাজনীতিক বন্দীর যে কিরূপ অবস্থায় দিন কাটে—তাহার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ইহা এখন আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বস্তুতঃ এ জাতীয় জীবের অবস্থা কবাত-মধ্যবর্ত্তী শঙ্খের ন্যায় শোচনীয়। একদিকে নির্জ্জন কারাবাসের মানসিক পীড়ন, অন্যদিকে স্বীকার-গৃহের শারীরিক পীড়ন। এই উভয়বিধ নৈষ্ঠুর্য্যই যে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম হইতে বৃহত্তম মাহাত্ম্যে সুসভ্য-জাতির মহত্তম কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই মহাপীড়ন সহ্য করিয়াও বন্দী বালকেরা যে বাঁচিয়া ফিরে, ইহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! তাহারা মহাপ্রাণ বা মহাপাষাণ!

ব্যাটারির আঘাতে হাত-পা ভাঙ্গে না; কিন্তু হাড়ে হাড়ে যে ভীষণ বেদনা অনুভূত হয়, তাহাতে মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। ইহা ছাড়া আরও দুই একরূপ ভয়ঙ্কর পীড়ন আছে, তাহা লেখনীমুখে প্রকাশযোগ্য নহে। কেন যে দুর্ব্বল-প্রকৃতির লোক এই পীড়ন-মুখে approver হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমি কিন্তু এতদিনে বুঝিলাম—আমি কাপুরুষ নহি। নরম কথায় আমি যতই টল্‌মল্ করি না কেন, পীড়ন-কষ্টে আমি অটল ছিলাম! তবে সে কষ্ট হইতে ক্ষণিক নিষ্কৃতিলাভের জন্য মিথ্যা কথা অজস্র বলিয়া যাইতাম। এ সব উপায়ে আগে হইতেই শিক্ষিত হইয়াছিলাম! পুলিসকে ধাঁধা দিবার জন্য স্বীকার-উক্তিতে প্রায়ই অজানা-অচেনা এমন সব জমীদারপুত্রের নামোল্লেখ করিতাম—যাহাদের ধরা-ছোঁয়াও সহজ নয় এবং বিদ্রোহিতা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু আজকালকার কালে কি যে সম্ভব, কি যে অসম্ভব, তাহা ত বুঝা যায় না। পুলিস মহাজনরা সেই সব কল্পিত সহযোগীদের সন্ধানে শূন্যে ফাঁদ পাতিতে ছাড়িতেন না! একবার কিন্তু সত্য সত্যই বড় অনর্থ ঘটিয়াছিল। শান্তিপুরের জমীদারপুত্র শশধর আমাদের এক জন সহযোগী,এই খবরটা আমি পুলিসকে দিই। অথচ কোথায় যে শান্তিপুর,তাহাও কখন দেখি নাই;—সেখানে জমীদার আছে কি নাই, তাহার পুত্রই বা কে, তাহাও জানি না। একদিন সত্যসত্যই পুলিস শান্তিপুর হইতে শশধরনামক একটি ছেলেকে আমার নিকট আনিয়া হাজির। এ জমীদারপুত্র নয়, তাহার শ্যালক-পুত্র। তাহাতে কি আসে যায়! শশধর নামও সে ধরে আর স্কুলেও পড়ে। তার ঘরে কংগ্রেসওয়ালার দু' একখানা ছবি, দু' একখানা যুগান্তর, সর্ব্বোপরি গীতার ছোট্ট এডিসন পকেট-বুক দু' একখানাও নাকি পাওয়া গিয়াছে; প্রমাণ চূড়ান্ত! তবুও আমি কিন্তু তাহাকে চিনিলাম না! ইহার ফলে লাঠির সামান্য গুতো খাইয়া সে বেচারা বিদায় লাভ করিল—কিন্তু আমার অদৃষ্টে যে পীড়নলাভ হইল, তাহা এমনই ভীষণ হইতে ভীষণতর যে, অবশেষে তাহার নিবৃত্তি হইল কোথায়—তাহা আমার মনে নাই। কষ্টে যখন চোখ বুজিলাম, তখন মনে হইল, যমদূত আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া! কিন্তু আমার ত বাঁচিবার সাধ তখনও মিটে নাই! ধরণী কি সুন্দর! পিতার স্নেহ, পিসীমা'র আদর, বয়স্য-প্রীতি, শান্তার ভালবাসা সকলই কি সুন্দর! (পিতা যে লোকান্তরে, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।) সর্ব্বোপরি সুন্দর আমার দেশ। তাহার বন্ধন এখনও ঘুচাইতে পারি নাই,—আমার কাযও ত ফুরায় নাই!

ঐ দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতার উন্মুক্ত অমৃত-ভাণ্ডার-দ্বার, দুই পদ অগ্রসর হইবামাত্র ব্যাকুল প্রাণের তৃষ্ণা দূর হইবে, অমৃতপানে জীবন অমর হইয়া উঠিবে,—পারিব না, আমি মরিতে পারিব না, আমার কায এখনও ফুরায় নাই, আমার দেশমাতৃকা এখনও অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা!

চোখ খুলিয়া গেল! এ কি,কোথায় আছি! এ ত আমার সে কারাগৃহ বা পীড়নগৃহও নয়! পুলিসের লোকরাই বা কোথায়? আমি পাশ ফিরিলাম;—এ কি! কাহার স্নেহময় চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত? কেমিক্যাল সাহেব না? কেমিক্যাল সাহেব আমার কপালে হাত দিয়া আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "ভাল আছ তুমি, নবকুমার?"

"হাঁ ভালই আছি। এখানে কি ক'রে এলুম? আপনি এনেছেন?"

"এ হাসপাতালে। তোমার অসুখ করেছিল—তাই এখানে আছ। আর একটু ভাল হও, তখন বাড়ী যেতে পারবে। তুমি মুক্তি পেয়েছ।"

এ কথায় বিশ্বাস করিতে যেন সাহস হয় না। ক্ষীণকণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে আনন্দ-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মুক্তি পেয়েছি?"

"হ্যাঁ, তুমি মুক্তি পেয়েছ। মিথ্যা-মিথ্যি পুলিস তোমাকে কষ্ট দিয়েছে—নিশ্চয়ই তুমি দোষী নও।"

কেমিক্যাল সাহেবের হাত ধরিয়া আনন্দকৃতজ্ঞতায় বালকের ন্যায়ই আমি কাঁদিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য কেমিক্যাল সাহেবই আমার পক্ষে দাঁড়াইয়া—আমি যে সুচরিত্র—এই প্রমাণে আমাকে পুলিসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

আশ্বিন মাস; বোধন-বাদ্যের আগমনী-সঙ্গীতে চারিদিক আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—আমি মহাশক্তিকে ভক্তি জানাইতে গিয়া কেমিক্যাল সাহেবের প্রতিই ভক্তিনত হইয়া ভাবিলাম—"যদি ভারতে এইরূপ দশ বিশটাও কেমিকেল সাহেব থাকিতেন, তাহা হইলে ইংরাজ-রাজ্য আজ প্রেম রাজ্য হইয়া উঠিত।"

এখন আমি প্রকৃতই good boy, এণ্ট্রেন্স দিবার মানসে আবার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি, খুন ডাকাতী যে স্বাধীনতার পথ নয়, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তবুও—! তবুও আমার চিত্ত প্রশান্ত হয় নাই। অধীনতা-বন্ধন ছেদন করিবার আকুলতাও এখনও নিবে নাই। যদি সময় আসে, যদি কোন পথি-প্রদর্শক কাম্যফল-লাভের উজ্জ্বলতর উৎকৃষ্টতর পথ দেখাইয়া দেন—তবে আমি যে সর্ব্বাগ্রে জীবন-মরণ-পণে পুনরায় তাঁহার নিশানতলে গিয়া দাঁড়াইব, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

কে বলিতে পারে, কেমিক্যাল সাহেবের ন্যায় কোন বিদেশী মহাপুরুষই তাঁহার হস্তের বিশাল মশাল-আলোকে আমাদের অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়া তুলিবেন না? হিউম সাহেবও ত ছিলেন বিদেশী!

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

পিস্‌গুডসের চিঠি।
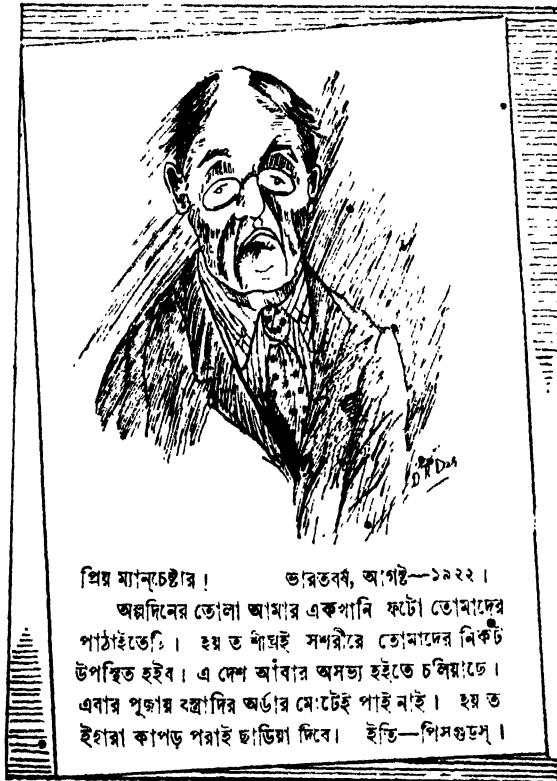
চিত্রশিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

পরিকল্পনার বিখ্যাত শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ আজ তরুণ বয়সেই শুধু বাঙ্গালায় নয়, সমগ্র ভারতেই এক জন যশস্বী চিত্রশিল্পী বলিয়া পরিচিত। যে কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ আমরা তাঁহার চিত্রে সৌন্দর্য্যের সুষমারাশি দেখিতে পাই, তাহার সম্যক্ উপলব্ধির-জন্য চিত্রের পাশাপাশি শিল্পীকেও জানিতে হইবে। কাব্য চিনিতে হইলে কবিকে বাদ দিলে চলে না, শিল্পীর সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কারণ, যে সকল ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে শিল্পীর জীবন পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার ছায়া চিত্রে পড়িবে, ইহা স্বাভাবিক। অতএব আলোচনাটিকে যেন কেহ হেমেন্দ্রনাথের জীবনী বলিয়া ভ্রম না করেন। আমরা শুধু তাঁহার শিল্প সাধনার নিগূঢ় পথটির পরিচয় দিব।

মানুষ সৌন্দর্য্যের উপাসক। সুন্দর বস্তু বা সুদৃশ্য দেখিলে মানুষের হৃদয় ক্ষণিকের জন্য হইলেও মোহিত হয়; এমন কি, অবোধ শিশুও এ নিয়মের বাহিরে স্থান পায় না। যাঁহারা মনে করেন, চিত্রশিল্পের সাধনা বিলাসবৃত্তির পরিচায়ক, ইহার দ্বারা জগতের কোন উপকারই সাধিত হয় না, তাঁহারা মানব-হৃদয়ের-সূক্ষ্মানুভূতিজ্ঞান অস্বীকার না করিয়া পারেন না; সুতরাং মানুষের জীবনের খাওয়া পরা ইত্যাদি অতিমাত্রিক বিষয় ছাড়া তাঁহাদের কল্পনা অধিক উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তাঁহাদিগকে ললিতকলার রসাস্বাদন করান "বিড়ম্বনা মাত্র"। সুখের বিষয়, সৌন্দর্য্য-বিরাগী লোক জগতে বিরল। তবে সকলের অনুভূতি জ্ঞান সমান না থাকায়, প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি এবং তাহা কেমন করিয়া বিচার করিতে হয়, অনেকেই জানেন না। কেহ কেহ কার্য্যকারিতা দেখিয়া সৌন্দর্য্যের বিচার করেন, কেহ বা উদ্দেশ্য ভাবিয়া তাহা নির্ণয় করিতে যান, আবার কেহ বা বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া তাহার মাপকাঠী তৈয়ার করেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যে ভ্রম বিচার করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

সৌন্দর্য্য কাহারও উদ্দেশ্য বা কার্য্যকারিতার গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে। একটি সুন্দর গোলাপ ফুলের রূপ, যদি তাহা হইতে কতটা নির্য্যাস প্রস্তুত হইবে, ভাবিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে বুঝিতে হইবে, গোলাপের পুষ্পত্বকে খর্ব্ব করিয়া মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তিরই প্রাধান্য দেওয়া হইল। সুন্দর, সুন্দরের পরিমাণেই নির্ণীত—অনন্ত সুন্দরের বিকাশই তাহার চরম লক্ষ্য। শিল্পী তাঁহার চারু তুলিকার স্পর্শে বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির অন্তরাল হইতে রূপের সৃষ্টি করিয়া অরূপের মোহন মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলেন, আর মানুষ তাহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হয়। এই কারণেই শিল্পীরা মানুষের উচ্চবৃত্তিগুলিকে বিকাশ করিয়া দিবার অধিকারী।

ভাষা-শিক্ষায় যেমন ব্যাকরণের অনুসরণ প্রয়োজন, চিত্র-বিদ্যায়ও তেমনই রীতিপদ্ধতি আছে। ব্যাকরণের অধিক গবেষণায় মানুষ কবি হইতে পারে না—শিল্পরাজ্যেও রং-তুলিকার বহুল ব্যবহারে ভাবুক শিল্পী হওয়া যায় না। প্রকৃত শিল্পী তাহাকেই বলে, যাহার চিত্রে নিয়ম অনিয়মের দ্বন্দ্ব থাকে না—যে চিত্র দেখিলে অন্য চিন্তা আসে না—যাহার দিকে তাকাইলে অব্যক্ত প্রাঞ্জল হয়, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ডুবিয়া যায়! এতাদৃশ শিল্পী সমাজের একটা বিশেষ দান। শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ যে পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করেন, তাহা যে নির্দ্দোষ, এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না, তবে তাঁহার চিত্রে মাধুর্য্যের মাত্রা এত অধিক যে, দর্শককে দোষ-গুণের বিচারের অবকাশ দেয় না। বর্ণের সুচারু সংমিশ্রণ ও চরিত্রের মৌলিক বিশ্লেষণই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে প্রতিভার উন্মেষ হয়। এই কারণেই বোধ হয়, ২৮ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জিলার কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীর দরিদ্র পরিবারে হেমেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। যে দেশে ললিতকলার চর্চ্চা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং যেখানে চিত্রানুশীলন "মা-তাড়ান বাপ-খেদান" ছেলেদের একচেটিয়া মনে করা হয়, সেখানে হেমেন্দ্রনাথের চিত্রানুরাগ যে শৈশব হইতেই অবজ্ঞার সহিত "সমাদৃত" হইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? অনেক সময় তিরস্কার ও গঞ্জনা উপেক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে অবাধ্য আচরণ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, নিন্দাবাদ সহ্য করিবার অপরিমেয় বল যদি তাঁহাতে না থাকিত, তবে আজ তিনি 'শিল্পী' নামের অধিকারী হইতে পারিতেন না। অতি শৈশব হইতেই চিত্রাভ্যাস তাঁহার চরিত্রগত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার

চিত্রাঙ্কনে হেমেন্দ্রনাথ

স্কুলের পড়াশুনা উত্তরোত্তর বাধা পাইতে লাগিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই লুক্কায়িত শিল্প-প্রতিভার উৎসাহদাতা তখন এক জনও ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী হইয়াছিল,—"জীবনে তাঁহার কোন উন্নতি হইবে না।" উদীয়মান প্রতিভার এইরূপ নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে; তাই আজ শিল্প কল্পনা প্রসূত অলীক স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।

ইংরাজী ১৯১০ সালে হেমেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টে ভর্ত্তি হয়েন। তখন হইতেই স্কুলের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা ছাড়া তিনি প্রত্যহ বাড়ীতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিখ্যাত শিল্পিগণের অঙ্কন পদ্ধতির মৌলিকতা অতি নিবিষ্ট-চিত্তে আলোচনা করিতেন। ফলে, বস্তুর বৈশিষ্ট্যটুকু ফোটাইয়া তুলাই তিনি শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ বুঝিয়াছিলেন এবং ইহার অনুশীলনে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াও তৃপ্ত হইতেন না। তাঁহার অনন্যসাধারণ পরিশ্রম লক্ষ্য করিয়া এক দিন কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন, "উন্নতি অবনতির কথা জানি না, তবে পরিশ্রমের যদি কোন পুরস্কার থাকে, তাহা তোমার প্রাপ্য।"

বিচারের সুবিধার জন্য হেমেন্দ্রনাথের চিত্রগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—রূপক (Allegor'cal), ধর্ম্মবিষয়ক (Religious) ও প্রেম-রসাত্মক (Romantic)। রূপকচিত্রে "সংসারবন্ধনই" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ আপনার প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করিতে যাইয়া ধর্ম্মজীবনে যেই একটু অগ্রসর হয়, অমনই সংসারের মায়া-মোহ তাহার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়, ইহাই চিত্রের সংক্ষিপ্ত বিষয়। ভাবের গাম্ভীর্য্য ও কল্পনার প্রসারতায়ই চিত্রখানি এত সুন্দর হইয়াছে। দ্বিতীয় চিত্র "মানস-কমল।" কুমারী-জীবনের অজ্ঞাত কামনার একটি কমনীয় মূর্ত্তি। কল্পনার পূর্ণত্বে বোধ হয়, এই চিত্রখানা শিল্পীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রের মধ্যে "মুরলী-শিক্ষা" ও "একটি কথা" বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ব্রজ-লীলার নায়ক-নায়িকা লইয়াই চিত্রগুলি অঙ্কিত। প্রেম-রসাত্মক চিত্রগুলির মধ্যে 'অভিমান', 'পল্লী-প্রাণ', 'রূপ', 'প্রণয় বাঁশরী' ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পী প্রেমিক-হৃদয়ের রাগ-রঙ্গ চিত্রিত করিতে কতদূর অভ্যস্ত, তাহা 'অভিমান' দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। এক-মাত্র ভঙ্গিমা দ্বারাই শিল্পী চিত্রে অভিমানের সৃষ্টি করিয়াছেন। সদ্যঃস্নাতা রমণীদিগের অর্দ্ধ-বস্ত্র অঙ্কনে হেমেন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। 'পল্লীপ্রাণ', 'স্মৃতি', 'প্রতিধ্বনি' প্রভৃতি চিত্রগুলি ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

বড়ই সুখের বিষয়, শিল্পীর চিত্রগুলি ভারতের বিভিন্ন শিল্পপ্রদর্শনীতে বহুবার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথের অঙ্কনপদ্ধতি কোন বৈশিষ্ট্যে আবদ্ধ নহে, তাহা পাশ্চাত্য নিয়মাধীন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত; কিন্তু চরিত্রসৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ভাবান্বিত। ভাবের ভিতর দিয়া হেমেন্দ্রনাথকে বিচার করা বড়ই দুরূহ; কেন না, বিষয়ের তারতম্য অনুসারে তিনি কখন বা উন্মত্ত প্রেমিক সাজিয়া প্রেমের উদ্দামরসের আবৃত্তি করেন, কখন বা সাধকের রূপ ধরিয়া ভক্তিতত্ত্বের অবতারণা করেন, আবার কখন বা চিন্তাশীল সংস্কারকের আসনে বসিয়া সমাজের দোষ গুণ বিচার করেন।

শেষ কথা, হেমেন্দ্রনাথের আলোচনার সময় ইহা নহে। তবে তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্তে যদি দেশের নবীন শিল্পীরা একটু সাড়া দেন, তবে আশা করা যায়, দেশের বর্ত্তমান সুপ্ত-শিল্প পুনর্দীপ্ত হইলেও হইতে পারে।

শ্রীপ্রেমেশচন্দ্র সোম।

বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী।

পূর্ব্বাভাষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ঠিক কবে প'ড়েছিলাম, মনে নাই। ১৯০২ সালের পূর্ব্বে থিয়েটারে 'আনন্দমঠ' অভিনয় হ'তে দেখেছি। তখন বিশেষ কিছু ভাব প্রাণে জেগে উঠেছিল ব'লে মনে হয় না। "বন্দে মাতরম্" গানটিতে যে এত শক্তি ও ভাব নিহিত ছিল, তাও কেউ তখন সন্দেহ করতে পেরেছিলেন ব'লে শুনিনি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে না কি সভাবাজারের রাজবাটীতে এক দিন নিমন্ত্রিতদের সভাতে কথাচ্ছলে সেকালের কয়েকজন লেখক ও কবিদের নিকট বলেছিলেন, "তোমরা দেখবে, এই বাঙ্গালাদেশে আমার 'আনন্দমঠ' জলজ্যান্ত অভিনীত হয়ে মহাবিপ্লব আনবে।" বিশেষ বিশেষ ঘটনার ঠিক পরেই এই রকম উক্তি পরিকল্পিত হয়ে থাকে। এই উক্তিও সেই প্রকারের কি না কে জানে?

১৯০২ সালের পর 'আনন্দমঠ' আবার প'ড়ে অনুভব করেছিলাম, কেবল গল্প শুনিয়ে আনন্দ দেওয়া ছাড়া, ইহা অজ্ঞাতসারে মনের উপর একটা সজীব এবং ঐকান্তিক ভাবের ছাপ মেরে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকখানি উপন্যাসে ঐ ভাবের ইঙ্গিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সেই ভাবটা যে কি, তা এখন অনেক ঘটনা-বিপর্য্যয়ের চাপে প'ড়ে যতটুকু বুঝ্‌তে পারছি, তখন কিন্তু তার কিছুই পারিনি। তাই বেহুঁসে ঐ ভাবের দ্বারা চালিত হয়ে বাঙ্গালাদেশের তথাকথিত বিপ্লববাদীরা 'আনন্দমঠের' ভাবটি কেমন অভিনয় করেছিলেন, তা শুনাতে হবে, ইহাই আমার কাছে অনুরোধ।

গুপ্ত সমিতির সূচনা।

ছেলেবেলায় যাত্রা, থিয়েটারের যে পালায় অথবা যে পৌরাণিক গল্পে যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপার না থাক্‌ত, তা আমার বড় ভাল লাগ্‌ত না। যুদ্ধের সংবাদ থাক্‌লে সংবাদপত্রের যেমন কাট্‌তি হয়, এমনটি আর কিছুতে হয় না। এ থেকে মনে হয়, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অল্পবিস্তর যেন যুদ্ধের পক্ষপাতী। অবশ্য, এখন যুদ্ধটা যে একেবারে গর্হিত ও অনাধ্যাত্মিক—সুতরাং অসভ্যতার পরিচায়ক, তা নানা রকমে ঘোষিত হচ্ছে। আর তাই আমরা শিখ্‌ছি। ১৮৯৯ সালের অক্টোবরে সত্যিকার বুয়র-যুদ্ধের সংবাদে বাঙ্গালা দেশে কিন্তু এখনকার মত বিভীষিকা ও ঘৃণার বদলে প্রচ্ছন্ন তৃপ্তি ও ক্ষীণ আশার মধ্য দিয়া প্রাণের একটা বেমালুম সাড়া অনুভূত হয়েছিল।

সেই সময়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। উভয়ে এক যায়গায় কায করতাম। ইহার কিছুদিন আগে তিনি পরে পরে দু'টি ইংরাজি পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কাযেই রাজনীতিতে তাঁর দখল ছিল, এ কথা বলা যেতে পারে। এখানে তখন যাঁরা রাজনীতিতে মাতব্বর ছিলেন, হয় ত তাঁদের চেয়ে অ-বাবু অনেক এগিয়েছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর সঙ্গে যাঁদের মত মিল্‌ত না, তাঁদের তিনি দেখ্‌তে পারতেন না। তাই তাঁর অবসরকালে আলাপ করবার লোকের বোধ হয় অভাব হয়েছিল। এরূপ অবস্থায় সুবিধামত লোক দেখে তাকে মনের মত ক'রে গড়ে নেওয়া ভিন্ন তাঁর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু মনের মত শিষ্য জোটা বড় ভাগ্যের কথা। মনের মত বুঝি জোটেনি। অগত্যা আমার ঘাড়ে চ'ড়ে বসলেন। এ কাযটা তিনি আমায় ব'লে-ক'য়ে নিশ্চয়ই করেন নি; এমন কি, তিনি নিজে বুঝে-সুজে করেছিলেন বলেও মনে হয় না। এমনতর অনেক কায নিত্য করি, যার মৎলব সম্বন্ধে আমরা তখন সম্পূর্ণ বেহুঁস থাকি।

তিনি সংবাদপত্র থেকে নিত্য বুয়র-যুদ্ধের খবর প'ড়ে শুনাতেন ও নানা প্রকারে "পলিটীক্‌স" এমন আগ্রহ সহকারে বুঝাতেন যে, আমার পক্ষে না বোঝাটা নিতান্ত অভদ্রতা হবে ব'লে অনেক সময় শুনবার ও বুঝ্‌বার ভাণ

কর্‌তাম। তাঁকে এত খাতিরের কারণ, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের উপর আমার অসাধারণ ভক্তি। মামা মহাশয়ের নিকট বাল্যকাল থেকে তাঁর মহত্ত্বের কত প্রকার গল্প শুনেছিলাম। অ-বাবু, রাজনারায়ণ বাবুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মামা মহাশয়ও অ-বাবুকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এ হেন লোকের সহিত অখাতির বা অভদ্র ব্যবহার কর্‌তে পারা যায় কি?

বুয়র-যুদ্ধের অনেক অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে সব চেয়ে বড় হয়ে প্রাণে লেগেছিল এই ঘটনাটি যে, অত কটি অসভ্য (তখন এই রকমই বুঝেছিলাম) বুয়র, অত বড় শক্তিশালী ইংরাজকে হটিয়ে দিচ্ছে। এটা যে কেবল সিক্রেট সোসাইটীর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল—অ-বাবু তা নানা দেশের নানা ঘটনা থেকে উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দিতেন।

নূতন কিছু কর্‌বার, ভাববার, জান্‌বার প্রবৃত্তিটি মা ও বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে একটু পেয়েছিলাম। কিন্তু দিদিমা সুলভ পারিপার্শ্বিক গতানুগতিকতার পাষাণ-চাপে সে প্রবৃত্তি কখনও সম্যক্ স্ফূর্ত্ত হ'তে পারেনি। শত শত উদ্যমশীলের উদ্যম এই দেশজোড়া দিদিমা-প্রকৃতি কত রকমে যে আজও দমিয়ে দিচ্ছে ও আরও কতকাল দমাতে থাক্‌বে, তা এখন ভাবলে আমাদের দেশসম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হ'তে হয়। কিন্তু তখন হতাশার কোন কারণ অনুভূত হয়নি। বরং এই নতুন কিছু কর্‌বার প্রবৃত্তি এতে সুবিধা পেয়ে আরও বেড়ে উঠ্‌ল। অবশেষে আমরা বুয়রদের পথ অবলম্বন করি না কেন, এই প্রশ্নই বার বার আমাদের গল্পের মধ্যে উঠ্‌তে লাগল।

বুয়রযুদ্ধের পূর্ব্বে আবিসিনিয়ায় ইতালীর পরাজয় এবং খুঁজলে, কালা জাতের দ্বারা গোরা জাতের পরাজয়ের আরও এক আধটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু এ সব খবর আমাদের দেশের খুব কম লোকই রাখে। তাই এ দেশের লোকের দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছ্‌ল যে, গোরার বিরুদ্ধে কালা কখনও যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারে না। বুয়রযুদ্ধ থেকে আমাদের সে ধারণা উলটে গেল। বুয়ররা যদিও গোরা, তথাপি তখন বুঝে ফেলেছিলাম, তারা আমাদের তুলনায় অসভ্য মূর্খ। কারণ, কোন প্রকারে অন্যকে চেঁচিয়ে ছোট বা অসভ্য জাহির কর্‌তে পার্‌লেই বড় হওয়ার গলদ্‌ঘর্ম্মের দায়-টাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হয়। এ প্রকৃতি শুধু আমাদের নয়—ভারতের সাধারণ লোক আমরা ত চির-কৃতদাস, যে কোন জাতি যখন দাস অবস্থায় থাকে, তখনই এই প্রকৃতি-সম্পন্ন হয়। আসল কথা ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি। যা'ক। বুয়রদের পন্থাটি কিন্তু অবশেষে আমাদের পক্ষে নিতান্ত ঠিক ব'লে, এক দিন শুভক্ষণে স্থির ক'রে ফেলা গেল; অর্থাৎ কি না সিক্রেট সোসাইটী গড়তে হবে, এ মতলবটি আঁটা হয়ে গেল।

পূর্ব্বে যা হয়েছে বা শাস্ত্রে যার আদেশ আছে, তা ছাড়া নূতন কিছু করতে হ'লেই আমরা সঙ্কোচ বোধ করি, অথবা অনিচ্ছা অনুভব করি। দাস-প্রকৃতির ইহাও একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ। আর তখনও আমাদের মধ্যে দৈব আদেশের ব্যাপারটা গজায়নি। কাযেই আমাদের মন আরও নজির খুঁজে নিয়েছিল। যেমন, আমাদেরই মত দাস জাতি ইতালী, এই সেদিন মাত্র সিক্রেট সোসাইটী করেই স্বাধীন হয়েছে; রুসিয়া এই করেই কিছু কিছু অধিকার পাচ্ছে এবং পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার আশা করে; চীনও তাই। এতগুলি নজির দ্বারা যখন সমর্থিত হ'ল, তখন সিক্রেট সোসাইটী কর্‌বার মত অবস্থা আমাদের হয়েছিল কি না, এই লজ্জাজনক প্রশ্নটা আর উঠ্‌লই না।

সিক্রেট সোসাইটীর কায সুরু হ'ল:—আপাততঃ বন্দুক ছোড়া, ছাতা মাথায় না দিয়ে রোদে রোদে জোরে হাঁটা, যে ঘোড়া হ'তে পড়বার কোন সম্ভাবনা নাই, বরং ঘোড়ারই পতন ও মূর্চ্ছার বিশেষ সম্ভাবনা, এমন ঘোড়ায় চড়তে শেখা। বিশেষ ক'রে কায হয়েছিল, সিক্রেট সোসাইটীর সভ্য জুটান, আর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি যত লোককে পারা যায়, আমরা যে সিক্রেট সোসাইটী করেছি, এই কথাটি গোপন রাখ্‌তে বলা। এই ভাবেই কয়েক মাস কেটে গেল।

এই বুয়র যুদ্ধের ব্যাপারটি প্রায় সমস্ত পরাধীন জাতির প্রাণ পরাধীনতার দুঃখ অনুভূতি অপেক্ষাকৃত তীব্র করেছিল। বহুকাল চুপচাপে থেকে হঠাৎ এই ঘটনাটির পর হ'তেই যেন নানা দেশে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা-লাভের জন্য মারামারি কাটাকাটি লেগে গেছে। আমাদের দেশও বাদ পড়েনি; কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় আমাদের স্বাধীনতা-লাভের বাসনা যেন একটু অদ্ভুত রকমের ছিল।

আমাদের স্বাধীনতালাভের বাসনা।

সে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন বুয়র-যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অনেক চেষ্টায় ৩।৪ জন সভ্য, আর আন্দাজ ৭ কি ৮ জন অর্দ্ধ-সভ্য মাত্র যোগাড় হ'ল। আলিপুর জেলে নরেন্দ্র গোঁসাইর হত্যাকারী সত্যেন্দ্রনাথ বসুও এক জন সভ্য ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর আপন ভাইপো ছিলেন। অনেককে এই গুপ্ত সমিতির ব্যাপার চুপি চুপি "sound" করা হয়েছিল। এই sound শব্দটি একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হ'ত, অর্থাৎ সুযোগ বুঝে অনেক ভূমিকার পর আসল কথাটি এক রকম হেঁয়ালির ছলে ব'লে শ্রোতার মন পরীক্ষা করা হ'ত। সুবিধা বোধ হ'লে তবেই খুলে সব কথা বলা হ'ত। অনেকে শুনে বেশ ভয় পেতেন; তখন তাঁদের ভীতু আর নিজেদিগকে বীর মনে ক'রে বড় সুখ পেতাম। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার কথা এই যে, ইহা অন্যায় ব'লে প্রায় তখন কেহ প্রতিবাদ করেন নি; বরং আশার কথা ব'লে তাঁরা যে মনে করতেন, তা তাঁদের প্রাজ্ঞজনোচিত সতর্কতার বচনে ধ'রে নিতাম। এ থেকে ক্রমে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে, দেশশুদ্ধ লোক স্বাধীনতালাভের জন্য প্রস্তুত ছিল। এই প্রস্তুতের ভাবটা যে তখন কেমন ছিল, এখানে তা একটু খুলে বলি।

দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার জ্বালায় মৃতপ্রায় পুত্র কন্যার গ্রাস যে ক্ষুধাতুর কেড়ে খায়, অথবা নরমাংসদ্বারা যে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতে বাধ্য হয়, তারই প্রকৃত ক্ষুধার দুঃখ অনুভূতি যেমন হয়েছে, বলা যেতে পারে, পরাধীনতারূপ দুঃখের তেমন তীব্র অনুভূতি আমাদের দেশে ছিল না, এখনও নাই। দুঃখের অনুভূতি তীব্র হ'লে, সে দুঃখ করবার জন্য প্রাণটা তুচ্ছ জ্ঞান করে, প্রাণ দেওয়ার জন্য যে অস্থিরতা আসে, তার একটুও তখন পর্য্যন্ত আমরা অনুভব করি নি। করবার উপায়ও তখন ছিল না। স্বাধীনতালাভের এক রকম বাহ্যিক বা সখের বাসনামাত্র কারো কারো মনের কোণে হয় ত বা জেগেছিল। আর স্বাধীনতার সুখের অনুভূতি ত আমাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। সে সুখের ধারণাও কারও কি ছিল? এমন কি, পরাধীনতা-মোচনের প্রকৃত যোগ্যতা কাকে বলে, তার কোন ধারণা কারও ছিল কি? তার পর স্বাধীনতালাভের পর তাহা সংরক্ষণের যোগ্যতা সম্বন্ধে ত তখন কোন চিন্তাই কারও মনে আসে নি। এরূপ অবস্থায় দেশ শুদ্ধ লোককে স্বাধীনতালাভের জন্য প্রস্তুত ব'লে, আমরা সহজে ধ'রে নিতে পেরেছিলাম কেমন ক'রে, তা এখন মনে হ'লে, নিজেদের উপর ঘৃণার ভাব না এসে পারে না। আর সত্য বলতে কি, নেতাদের উপরেও করুণার উদ্রেক হয়; কারণ, তাঁরা সাঁতার না শিখিয়ে অগাধ জলে ঠেলে ফেলে দেওয়ার মত দুষ্কর্ম্মই করেছিলেন।

স্বাধীনতালাভের বাসনা আমাদের মধ্যে কেমন ক'রে এসেছিল, এখন যেন তা দেখতে পাচ্ছি। পরাধীনতা থেকে যে অশেষ প্রকার দুঃখ আসে, তা আমরা কংগ্রেস-নেতৃগণের কৃপায় এক রকম শিখে ফেলেছিলাম ব'লে মনে করতাম। কিন্তু দুঃখানুভূতির অভাবে স্বাধীনতার বাসনা আমাদের ভিতরে ঠিকমত জাগে নি। উক্ত নেতৃগণ এই বাসনা জাগান উচিত বলেও হয় ত মনে করতেন না; কারণ, এ দেশ যে কখনও পূর্ণ স্বাধীন হ'তে পারে, এ কথাও হয় ত তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতালাভের বাসনা জাগাবার চেষ্টা কংগ্রেস-নেতৃগণ না করলেও কংগ্রেসের বহু পূর্ব্বে মহাপুরুষ কবিগণ সমসাময়িক য়ুরোপের স্বাধীনতার আন্দোলনের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে পরাধীনতায় দুঃখানুভূতির প্রথম দীর্ঘনিশ্বাসস্বরূপ যে সকল মর্ম্মস্পর্শী গান ও কবিতা শিখিয়ে গিয়েছেন, তার তুলনা নাই।

যাই হোক, এ সত্ত্বেও কেবল একটামাত্র দুঃখ ছাড়া আর কোন দুঃখই আমরা অনুভব করিনি। সেই দুঃখটা হ'তেই আমাদের স্বাধীনতালাভের বাসনা জেগে উঠেছে। এই স্বাধীনতা মানে ইংরাজের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ।

স্মরণাতীতকাল থেকে এ কাল পর্য্যন্ত এ দেশের জনসাধারণ, কত প্রকার পরাধীনতার পীড়নে নিদারুণভাবে নিষ্পেষিত হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন ব'লে, সাধারণ ভারতবাসী আমরা কখনও অনুভব করিনি। কিন্তু এই ইংরাজের আমলে দেশের লোকমত, পূর্ব্বে যে একটি দুঃখ অনুভূতির উল্লেখ করেছি, তার খুব সহায় হয়েছে। সেটি হচ্ছে বিদেশিকৃত নিন্দা ও ঘৃণাজনিত দুঃখ। নিন্দার সবটা সত্য নয় ব'লে অস্বীকার করতে পারি না। আবার নিন্দিতের তুলনায় নিন্দককে যখন প্রায় সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করতে বাধ্য হই, তখনই এই দুঃখের জ্বালা তীব্র হয়ে উঠে। তীব্র

অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখনিবারণ ইচ্ছা আসাই সঙ্গত। আমাদেরও কতকটা এসেছিল। সে ইচ্ছা পূরণের প্রধান উপায় দুইটি। প্রথম, নিন্দার যথাযথ কারণগুলি দূর করা। সে কায কতকটা স্থির ও দৃঢ়ভাবে সুরু হয়েছিল, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির দ্বারা। তার পর রক্ষণশীলতা ও ভূতপ্রীতির প্রভাবগ্রস্ত লোকমত এই চেষ্টাকে বিধর্ম্মী বিদেশীর অনুকরণ—কাযেই আত্মসম্মানহানিকর ব'লে অপবাদ দিলে। ঠিক সেই সময় কয়েকজন মৎলবী প্রাচ্যপ্রেমাতুর পাশ্চাত্যের অনুমোদন ও সাহায্য পেয়ে এই অনুকরণ আতঙ্কভীষণ হয়ে উঠ্‌ল। এই প্রতিক্রিয়া নিন্দার কারণ দূর কর্‌বার সেই প্রথম উপায়কে ব্যর্থপ্রায় করেছিল।

তখন উক্ত দুঃখনিবারণের দ্বিতীয় সহজ উপায়টি অবলম্বিত হ'ল। সেটি হচ্ছে বিদেশীরা যা নিয়ে গৌরব করে, তা ঘৃণা করা, আর তারা আমাদের যা নিন্দা করে, তাতে লজ্জাবোধ না ক'রে তা সগৌরবে জড়িয়ে ধরা। বিদেশীর যা কিছু তা ছোট ক'রে, নিজেদের যা কিছু সে সমস্ত তাদের চেয়ে ভাল, এই সত্য প্রমাণ কর্‌বার জন্য দেশের আশাস্থল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতের মস্তিষ্কশক্তি ব্যয়িত হ'তে লাগ্‌ল। দেশীয় সাহিত্য এই সত্য প্রমাণ কর্‌তে গিয়ে পুষ্ট হয়ে উঠ্‌ল।

শত শত বিদেশীয়ের মধ্যে, দুই এক জন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজেদের নিন্দা করেছে ও করে; আর দু' এক জন ব্যবসায়ী প্রাচ্যপ্রেমিক হয় ত কোন মৎলবে ভারতের অল্প-বিস্তর সুখ্যাতি করে। যখন উক্ত সত্য প্রমাণ জন্য তাদের সাক্ষ্য অকাট্য ব'লে গ্রহণ করি, তখন অন্যদিক দেখবার কথা আমাদের মনে আসে না। এই প্রকারে ইলবার্ট বিল পাশের সময় হ'তে ইংরাজ-বিদ্বেষ অপেক্ষাকৃত প্রবল হ'তে আরম্ভ করে। কংগ্রেস সেই বিদ্বেষে ঘৃতাহুতি দিতে থাকে। অবশেষে এই বিদ্বেষই স্বদেশপ্রীতির নাম নিয়েছিল। কালে ইংরাজ-বিদ্বেষের ফলে, ইংরাজ-শত্রু বুয়রদের প্রতি আমাদের সহানুভূতির আধিক্য হ'ল; তার ফলে তাদের অবলম্বিত উদ্দেশ্যের অনুকরণ অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের বাসনা এল। সেই বাসনা পূরণের জন্য তাদের অবলম্বিত মাত্র একটি উপায়ের অনুকরণ, অর্থাৎ সিক্রেট সোসাইটীর এ দেশে উদ্বোধন হ'ল।

সফলতার যুক্তি ছিল এই যে, মাত্র কয়েক লক্ষ অশিক্ষিত বুয়র যদি এতবড় ইংরাজ জাতকে হটিয়ে দিতে পারে, তবে বত্রিশ কোটি আমরা আর এই কটা ইংরাজকে পারি না? পন্থা ত বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠেই' দেখিয়ে দিয়েছেন; বাঙ্গালী মেয়েমানুষ, যাকে লোকে অবলা বলে, শান্তি তাদেরেই একজন হয়েও সে ইংরাজ কাপ্তেনের হাত থেকে হেলায় যখন রাইফেল্‌টা কেড়ে নিতে পেরেছিল এবং তাকে কদলীপ্রেমসর্ব্বস্ব জেনে, ঘৃণাভরে যখন রাইফেল্‌টি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, তখন আমরা বাঙ্গালার পুরুষ, না পারি কি? শুধু শান্তি কেন? বঙ্কিমবাবুর আরও অনেক অবলা এমন করেছে। এর পরে সফলতা সম্বন্ধে কি আর সন্দেহ আস্‌তে পারে?

ভারতবাসীর স্বাধীনতা বল্‌তে যে জিনিষটি বুঝায়, সে হিসাবে আমাদের এই বাসনাকে স্বাধীনতালাভের বাসনা না ব'লে, বিদেশি-কৃত ঘৃণা, নিন্দা ও অপমান হ'তে কোনপ্রকারে মুক্তিলাভের বাসনা বলা যেতে পারে। সহৃদয় ব্যবহারের দ্বারা ইংরাজ যদি আজ এই ঘৃণা, নিন্দা ও অপমানের তীব্র জ্বালা কোন প্রকারে জুড়িয়ে দিতে পার্‌ত, তবে ফরাসীর অধীন দেশগুলির মত আজও হয় ত আমাদের মধ্যে এই রাজনীতিক স্বাধীনতালাভের বাসনাটুকুও জাগত না। হয় ত এই জন্যই যে অনেক সাদা হৃৎপিণ্ডে প্রাচ্য প্রেম উথ্‌লে উঠে না, এ কথা কি কেহ জোর ক'রে বল্‌তে পারেন?

স্বদেশপ্রেম জাগাবার সোজা উপায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এক দিন অ-বাবুর কাছে শুন্‌লাম, ক-বাবু বাঙ্গালা দেশে সিক্রেট সোসাইটী স্থাপনের চেষ্টা কর্‌ছেন। বাঙ্গালা দেশ ছাড়া ভারতের সর্ব্বত্র সিক্রেট সোসাইটী হয়ে গেছে। কলিকাতার অনেক বড় বড় লোক তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এ রকম অনেক আজগুবি খবর শুনে ধন্য হয়ে গেলাম। নিজের কাছে নিজের দরটা অনেক বেড়ে গেল।

দিনকতক পরে এক দিন ক-বাবুর এক জন ভীমাকৃতি সহকারী এসে হাজির হলেন। তাঁকে আমরা খ-বাবু বলেই উল্লেখ কর্‌ব। তাঁর জিহ্বাখানি তাঁর ভীম-বিনিন্দিত দেহখানির তুলনায় বেজায় লম্বা। তিনি যা বল্লেন, তার প্রায় সবই অসম্ভব আজগুবি। তিনি যা আওড়েছিলেন, তার সার মর্ম্ম যা মনে পড়ল, তাই লিখছি। সমস্ত ভারত ইংরাজ

তাড়াবার জন্য তইয়ার। করদ রাজ্যগুলির এবং প্রত্যেক প্রদেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য তলওয়ার সানাচ্ছে। এমন কি, নাগা, গারো, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদেরও হাজার হাজার লোক পাঁয়তাড়া দিচ্ছে; খালি বাঙ্গালা প্রদেশ তইয়ার নয় ব'লে সব আট্‌কে ব'সে আছে। সেই জন্যই ওঁকে দূতস্বরূপ ক-বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক বছরের মধ্যেই বাঙ্গালা দেশকে তইয়ার ক'রে ফেল্‌তেই হবে। কামান, বন্দুক প্রভৃতি হাতিয়ারের ভাবনা একটুও নাই। জেনারেল, কাপ্তেনও তইয়ার। কিন্তু বাঙ্গালী কমাণ্ডার ও কাপ্তেন ত' চাই। যে আগে যোগ দিবে, তাকেই এই সব পদগুলি আগে দেওয়া হবে। . . .

এ রকম কত যে আজগুবি গল্প ঝেড়ে দিলেন, তা হুবহু দিতে পারলাম না, এই দুঃখ। কিন্তু ভারি মজার কথা এই যে, এ সকল বক্তৃতা সত্য ব'লে হজম ক'রে ফেলেছিলাম।

সিক্রেট সোসাইটীর উদ্দেশ্য, কার্য্য-প্রণালী, ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, আমরা যা আগে স্থির করেছিলাম, তার থেকে অনেক নতুন জিনিস এঁর কাছে পেলাম। যেমন লাঠি ও তলওয়ার ঘুরান, কুস্তি, বক্‌সিং ইত্যাদি শেখা। আর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হ'তে হ'লে তলওয়ার সাক্ষ্য ক'রে গীতা ছুঁয়ে দীক্ষা নেওয়া। ক্ষমতা-প্রাপ্ত দীক্ষিত-গুরু ব্যতীত অন্য কেহ দীক্ষা দিতে পার্‌ত না। দীক্ষার মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত ছিল। পরীক্ষার পর দীক্ষা দেওয়া হ'ত। এর আগে আমাদের কোন মন্ত্র ছিল না, ধর্ম্ম কিংবা ভগবানের সঙ্গেও কোন সম্বন্ধ ছিল না।

অধীনতা-জনিত কুফলের ইনি যে সকল হিসাব দিলেন, তা কংগ্রেসওলাদের তালিকার অতিরিক্ত কিছু বলেছিলেন ব'লে মনে পড়ে না। যেমন একত্রে বিচার ও শাসন বিভাগ, নুণের ট্যাক্‌স্‌, ইন্‌কম্‌ ট্যাক্‌স্‌, হোম চার্জ্জ, বিলাতে আই, সি, এস পরীক্ষা, উচ্চ-রাজকর্ম্মচারীর পদগুলি ইংরাজের অধিকৃত, শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি, দেশের দারিদ্র্যবৃদ্ধি, দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর প্রকোপবৃদ্ধি, অস্ত্র-আইন, প্রেস এক্ট ইত্যাদি।

ইলবার্ট বিলের সময় হ'তে কংগ্রেসের এ সকল আন্দোলন দ্বারা মাত্র এক ভাগ ভারতবাসীর ইংরাজ। শাসনের উপর ক্রমে অবিশ্বাস জন্মেছিল। আধ্যাত্মিক পুণ্য-সঞ্চয় কর্‌বার জন্য যে ইংরাজ ভারত শাসন কর্‌তে আসে নি, এই অবিশ্বাস শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশের মনে দৃঢ়ভাবে জাগিয়ে দেওয়াই কংগ্রেসের সার্থকতা।

কিন্তু সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মনেও এই অবিশ্বাস বিস্তৃতি লাভ করাবার আরও অনেক কারণ ঘটেছিল। পুলিসের অত্যাচার (বিশেষতঃ গামা পুলিসের অত্যাচার) এখন অপেক্ষা পূর্ব্বে অনেক অধিক থাক্‌লেও, অথবা যথেচ্ছাচারী রাজা, জমিদার, কাজী প্রভৃতির অমানুষিক অন্যায় অবিচার সেকালে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে হলেও, দেশের সাধারণ লোক, আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাব আদান-প্রদানের ফলে অন্যায় অত্যাচার যে অসহ্য ব'লে মনে করা এবং চীৎকার করা উচিত, ইহা শিখছে, অত্যাচারীকে তখনকার মত ভয় ও ভক্তির দৃষ্টিতে না দেখে, ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখ্‌তে না পার্‌লে, লোক কি বল্‌বে ব'লে, মনে কর্‌তেও শিখছে। তার পর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইতে প্লেগের আমদানী হয়েছিল, অনেক অশিক্ষিত লোকের ধারণা হয়েছিল যে, ইংরাজই শান্তিপ্রিয় দেশী কালা লোকগুলাকে এ দেশ থেকে চিরশান্তির দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এ রকম মহামারী রোগ এ দেশে আমদানী করেছে। কূয়াতে রোগের বীজ ঢেলে দেয়, আর ঐ রোগের লক্ষণ বা যে কোন জ্বর দেখা দিলেই প্লেগে আক্রান্ত ব'লে, রোগী এবং রোগীর বাড়ী শুদ্ধ লোককে টেনে নিয়ে গিয়ে সিগ্রিগেসন ক্যাম্পে মেরে ফেলে। এই ব্যাপারে বোম্বাইতে বিখ্যাত চাপেকার মিঃ র‍্যাণ্ড নামক ডাক্তারকে গুলী করে। এই প্লেগের ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনা-খুনী হয়েছিল। কলিকাতার প্লেগের প্রথম আমদানীতেও ভীষণ কাণ্ড বেধেছিল। এর কিছু পূর্ব্বে টালার মসজিদ ভাঙ্গার দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে কতকগুলি লোক মারা গিয়েছিল। তার পর নোয়াখালির জজ মিঃ পেনেলের রায় নিয়ে যে বিশ্রী ঘটনা ঘটে, তাতে দেশে হুলুস্থুল পড়ে গেছল।

হিন্দু ও মুসলমান আমলের বিচার-পদ্ধতির তুলনায় ইংরাজের বিচার ও আইন যে অনেক অধিক ন্যায়সঙ্গত, তা সাধারণ লোক আগে উপলব্ধি কর্‌ত। তাই ইংরাজকে ভক্তি কর্‌ত। এই শেষোক্ত ঘটনাগুলি বাঙ্গালা দেশের সাধারণ লোকের মনে ইংরাজের উপর অবিশ্বাসের ও বিদ্বেষের বীজ ক্রমে দৃঢ়ভাবে রোপণ করে। উক্ত খ-বাবু সিক্রেট সোসাইটীর নতুন সভ্য জোটাবার যে সকল কৌশল

আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন, এখন আমার মনে হয়, সে সমস্তই প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষকে জাগিয়ে ইংরাজের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ করা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ক-বাবু এসে আমাদের দীক্ষা স্বয়ং দেবেন, এই আশা দিয়ে খ-বাবু ফিরে গেলেন।

মিথ্যাই হোক্ আর বুজরুকীই হোক্, এই প্রকারে তিনি আমাদের মধ্যে একটা অতি প্রবল উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। তখনকার ভাব আমার বেশ মনে আছে। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ থেকে ইংরাজ চ'লে যাবে; দেশ একদম স্বাধীন হবে; নিজেদের রাজা হবে; তার পর স্বাধীন ভারতে স্বাধীন দেশবাসীর সাম্‌নে আমরা এক একটা দেশ উদ্ধারকারী ব'লে পূজ্য হব। (গীতার নিষ্কামভাব তখনও আমাদের মধ্যে আসে নি) এইটি তখন জলজ্যান্ত সত্য ব'লে যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। ওর মধ্যে যে কোথাও একটুও ফাঁকি ছিল, তা স্বপ্নে তখন দেখ্‌তে পাই নি।

আর এখন? তখন থেকে প্রায় বিশ বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে দুনিয়ার কত না পরিবর্ত্তন হয়ে গেল; চিন্তা, ভাব, আদর্শ, কার্য্য-প্রণালী, সব উল্টে-পাল্টে কত রূপ নিয়ে কত প্রবল বেগে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু হায়! এই বিশ বছরে ভারতের চিন্তায় তেমনই অলসতা, ভাবে তেমনই কুজ্ঝটিকা, আদর্শে তেমনই প্রহেলিকা, আর কাযে তেমনই প্রহসনের কত লীলাই না প্রকটিত হচ্ছে। অন্যে দেখে, নয় হাতে কাযে ক'রে, নয় ত ঠকে শিখ্‌ছে; আর আমরা, দেখে, হাতে কাযে ক'রে, বারবার ঠকে কেবল ঠক্‌তেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই ছোট বড় সকল কাযেই দিন দুবেলা ঠক্‌ছি; তবু ভুলেও কখন এ প্রশ্নটা মনে আসে না যে, কেন ঠক্‌ছি? তাইতে ত আজও চাঁদ পাবার নিশ্চিন্ত আশায় মুগ্ধনেত্রে দিদিমা'র কোলে শুয়ে শুন্‌ছি—"আয় আয় চাঁদ আয় আয় আয় আয় রে, মণির কপালে মোর টিপ্ দিয়ে যা রে।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

কেন?

তোমারি মধুর রূপে ভুবন ভরিয়া আছে,
তবুও বেদনা জাগে ধরিতে পারি না কাছে।
তব হাসি পরকাশে,
শরতের নীলাকাশে;
প্রেমধারা ঝরিতেছে বরষায় ঘন-মাঝে।

তুমি শান্তি তুমি সুখ,
তুমি ব্যথা তুমি দুঃখ;
তোমাময় হেরি সদা নিখিল ভুবন-মাঝে।
তবু যেন ব্যবধান পাইলে তোমারে কাছে॥

শ্রীস্নেহশীলা চৌধুরী।

মিশরে।

মিশরী কন্যা।

কবি নবীনচন্দ্র কবি-কল্পনায় মিশরের বর্ণনা করিয়াছেন—

"মরু-ভূমি-মধ্যে
মৃগতৃষ্ণিকার মত
সোনার মিশর রাজ্য।"

সত্যই আফ্রিকার মরুমধ্যে মিশর "সোনার রাজ্য।" নীল নদের বারিরাশি শত পথে শত দিকে প্রবাহিত হইয়া এই মরুনন্দনের সৃষ্টি করিয়াছে। তবে এই শ্যাম-শোভাময় রাজ্য "মৃগতৃষ্ণিকার মত" নহে; পরন্তু ইহার সমৃদ্ধি অনেক রাজাকে মৃগতৃষ্ণিকার মত প্রলুব্ধ করিয়াছে। মিশরের প্রাচীন ইতিহাস সুপরিচিত—ইহার সভ্যতা বহুদিনের—শিল্প কালজয়ী—খ্যাতি ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত। বিশেষ এই মিশরের ক্লিওপেট্রাকে অবলম্বন করিয়া যে বিপুল

কৃষক-কন্যা।

মিশরী বালিকা।

কাব্য-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজ মিশরে প্রাচীনের ও নবীনের সম্মিলন লক্ষিত হয়। য়ুরোপের নানা জাতি—গ্রীক, ফরাসীস, ইংরাজ—ব্যবসা-ব্যপদেশে মিশরে গিয়াছে এবং এ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে—মিশরের সহরগুলিতে—কায়রোয়, আলেকজান্দ্রিয়ায়, পোর্ট সইদে—বিলাসের বাহুল্যে পবিত্রতা মলিন হইয়াছে। যে দেশে জীবিকা অনায়াসলভ্য, সে দেশের লোক অলস ও বিলাসী হয়। মিশরে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। মিশরের সাধারণ লোকের মধ্যেও বসনে বর্ণের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। পল্লীগ্রামে নগরের বিলাস সংক্রমিত না হইলেও অল্পমূল্য বিদেশী রঙ্গিন কাপড় ফেলা অর্থাৎ কৃষক

মিশরী ধীবর।

নর নারীর—বালক বালিকার অঙ্গেও লক্ষিত হয়। ফেলা বালিকা লম্বগ্রীব কলস লইয়া জল আনিতে যাইতেছে বা পাত্রটি রাখিয়া দাঁড়াইয়া নীল আকাশে পারাবত দেখিতেছে —তাহার বসনে বর্ণের বৈচিত্র্য। হস্তে বা পদে হয় ত অলঙ্কারের বাহুল্য নাই—গলায় হয় ত কেবল একগাছি স্ফটিকের মালা, কিন্তু বস্ত্রের বর্ণবৈচিত্র্য সেই শ্যামশোভাময় ক্ষেত্রে যেন নূতন শোভার সঞ্চার করে। সেই রবিকরোজ্জ্বল নীলাম্বরতলে শ্যামশোভার মধ্যে মসজেদের গম্বুজের নিম্নে কার্পাস ক্ষেত্র তাহারই মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্যবহুল বেশধারিণী বালিকা।

যে ধীবর মৎস্য ধরিয়া তাহাই বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করে, তাহার দেহ অর্দ্ধাবৃত হইলেও মস্তকে টুপীর বর্ণ উজ্জ্বল লোহিত। মিশরী যত দরিদ্রই কেন হউক না, বেশ-বিষয়ে তাহার বিশেষ লক্ষ্য আছে। বিশেষ মিশরী মহিলা কখন সুবেশে সজ্জিতা না হইয়া বাহির হয় না। তাহার অলঙ্কারপ্রিয়তাও অধিক। ভিতরে যে রঙ্গিন বা ডোরা-কাটা সার্ট যৌবন আবৃত করিয়া রাখে, তাহার উপর রঙ্গিন উপর-জামা—কাণে দুল; গলায় স্ফটিকের বা প্রবালের মালা —তাহাতে ধুক্‌ধুকি বক্ষের স্পন্দনে স্পন্দিত হয়; হাতে চুড়ী, পায় মল, অনেকেরই পায় জুতা; অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়। অলঙ্কার অনেক স্থলেই স্বল্পমূল্য—কিন্তু শোভন।

এ দেশে যেমন "পাখীডাকা—ছায়াঢাকা" পথে নারীরা "কলসী লয়ে কাঁখে" জল আনিতে যাইয়া থাকেন, তেমন বাঙ্গালার বাহিরে আর কোথাও দেখা যায় না। এটি বাঙ্গালার নিজস্ব। এমনই ভাবে যাইতে যাইতে গাছের ডালে ঘন পল্লবের মধ্যে কোকিলকে কুহু ডাকিতে শুনিয়া গালি দেয় কেবল বাঙ্গালার রোহিণী। বাঙ্গালার বাহিরে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও জলের পাত্র মাথায় তুলিয়া বহি-বার প্রথা আছে। রাসবিহারীর লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনের গোপীরা বলিয়াছিল—

"কে না যায় মথুরায়, কে না যায় মথুরায়,
মাথে লয়ে দধির পশরা ?
তোমার ও চাঁদ-বদন, কে না করে দরশন ?
সবে ভাল ; কলঙ্কিনী মোরা !"

মিশরী নারী।

মিশরী নারীরাও মাথার উপর জলপাত্র লইয়া যায়। সে পাত্র লম্বগ্রীব। সন্ধ্যার সময় দেখা যায়, দলে দলে মিশরী মহিলা মুখের উপর হইতে বোরকার আবরণ ফেলিয়া দিয়া জল লইয়া যাইতেছে।

মিশরেও বড়ঘরের ঘরণীরা রাজপথে বাহির হইতে চাহেন না—কখন কোথাও যাইতে হইলে, তাঁহারা বোরকায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত না করিয়া বাহির হয়েন না। এই প্রথা মুসলমানপ্রধান সকল দেশেই আছে—ভারতবর্ষেও অনেক স্থানে এই প্রথা বর্ত্তমান।

ঘাটের পথে।

ইটালীতে মহিলাদের শিরাবরণে বর্ণের যে ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়—স্পেনেও তাহার অভাব নাই। ফ্রান্সে বা ইংলণ্ডে মহিলাদিগের বেশে বর্ণ খুব ঘোরাল অর্থাৎ loud না হইলেও ফিকার বৈচিত্র্য—সুর বড় অল্প নহে। কাজেই মিশরীদিগের এই বর্ণবৈচিত্র্যপ্রিয়তা প্রাচীর নিজস্ব বলা যায় না। তবে এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে, যে দেশে রবিকর উজ্জ্বল—কুজ্ঝটিকায় ম্লান নহে, সে দেশে—বিশেষ কৃষ্ণলতার পুষ্পখচিত শ্যামশোভার মধ্যে বর্ণের বৈচিত্র্য যেমন সুন্দর দেখায়, অন্যত্র তেমন সুন্দর দেখায় না। প্রজাপতি কুসুমকাননেই মুকুলিত উপবনেই বিচরণ করে। অন্যত্র নহে।

যে দেশে ধীবরও তাহার অতাপ্ল বেশে বর্ণযোগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে না, সে দেশে যে জলবাহী ভিস্তীও সেই বৈশিষ্ট্যে বঞ্চিত থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। রাজপথে যাহারা জল ছিটায় বা বাড়ীতে জল দেয়, তাহাদের বেশেও বর্ণের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। মোট কথা—মিশরীরা বর্ণের বড় ভক্ত, কেহ কেহ বলেন, এই যে বর্ণপ্রিয়তা, ইহা প্রাচীর নিজস্ব—তাহা নহে। প্রতীচীতে পুরুষের বেশে কৃষ্ণ বা ধূসর একঘেয়ে হইলেও, নারীর বেশে সে অভাব খুবই পূরণ হয়।

মিশরেও ইরাক ইরাণের মত রমণীরা বেশের উপর কৃষ্ণবর্ণ বোরকা ব্যবহার করেন। যে দেশে সূর্য্যের তেজ প্রখর, সে দেশে এই কৃষ্ণ আবরণে রৌদ্রতাপের তীব্রতার হ্রাস হয় এবং সেই জন্যই, বোধ হয়, ইরাকে ও মিশরে মহিলাদিগের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ মলিন হয় না। পথে পথে বোরকাপরা মহিলা দেখা যায়—দোকানে দোকানী যে স্থলে গবাক্ষপথে, পণ্য দেখায় ও দর করে, সে স্থলে

মিশরী ভিস্তী।

দোকানে।

আরবী ফলওয়ালী।

বাহিরে রাজপথের উপর অনেক বোরকা-পরা মহিলাকে দেখা যায়। তাঁহাদের বোরকার ছুই অংশের মধ্য দিয়া কেবল চক্ষু দেখা যায়—আর বোরকার মধ্য হইতেই যে কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়, তাহা সর্ব্বত্র "মলয়স্পন্দনের" মত মধুর বলা যায় না।

মিশরীদের কাহারও কাহারও বর্ণ অপেক্ষাকৃত মলিন। যাহারা ক্ষেত্রে—মুক্তবায়ুতে রৌদ্রে খাটিয়া খায়—তাহাদিগের বর্ণের শুভ্রতা মলিন হইয়া যায়। কিন্তু আরবীদিগের বর্ণ কাঞ্চন-গৌরবর্ণ—যাহাকে

আরবী মহিলা।

মহাভারতকার বলিয়াছেন, "প্রতপ্তচামীকরতপ্তগৌর।" আরবী মহিলারা সুন্দরী। সে সৌন্দর্যে ক্ষীণতার বা দৌর্ব্বল্যের চিহ্নমাত্র নাই—যে গঠন—যে বলদৃপ্ত দেহ প্রাচীন গ্রীক শিল্পীরা সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন, আরবী মহিলারা সেইরূপ গঠনে—দেহসৌন্দর্য্যে সুন্দরী। অমর কবি কালিদাস তাঁহার যক্ষের বনিতার বর্ণনা করিয়াছেন—

"তন্বী, শ্যামা, সুদশনা,
ওষ্ঠাধরে বিম্ব রহে ফুটি;
ক্ষীণমধ্যা নিম্ন নাভি
চকিত-হরিণী-আঁখি-ছু'টি।

শ্রোণীভার মন্দগতি,
স্তনভারে ঈষৎ আনতা;
প্রথমা প্রমদা যেন
সযতনে সৃজিলা বিধাতা।"

সৌন্দর্য্যের এই আদর্শ—এই "শ্রোণীভারাদলসগমনা"—"স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং"—অতিরঞ্জিত হইতে হইতে শেষে যে অস্বাভাবিক আদর্শে পরিণতি লাভ করিয়াছে, ভারতীয় স্থাপত্যে ও অজন্টা প্রভৃতির চিত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। শেষে নারীর বক্ষ পর্ব্বতের সহিত তুলিত হইয়াছে—আর "মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া।" এ আদর্শ মিশরে নাই। এ দেশে নারী-দেহ সমতায় সুন্দর—তন্বী অধিক দেখা যায় না—বরং যাহাকে মাংসল "দোহারা" গঠন বলা যায়, তাহাই লক্ষিত হয়। মধ্যদেশ যে অতিক্ষীণ—এমনও নহে—কেন না—এ দেশে য়ুরোপীয় বিলাসিনীদিগের মত বন্ধনে মধ্যদেশ ক্ষীণ করিবার চেষ্টা নাই। শ্রোণী ও বক্ষ—শরীরের সহিত সামঞ্জস্য হারায় নাই। এইরূপ আরবী নারীদিগকে সময় সময় নদীর কূলে জল লইতে দেখা যায়। তাহাদিগের বলদৃপ্ত সৌন্দর্য্য প্রশংসনীয়।

আরবী গায়িকা।

কোন কোন বাজারে এই জাতীয়া ফলবিক্রেত্রীদিগকে দেখিলে সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা বলিয়াই ভ্রম হয়। দেহে যৌবন যেন আর ধরে না—অঙ্গে নানারূপ অলঙ্কার—বাসে বর্ণের বৈচিত্র্য। যেন মোগলদিগের খোসরোজের বাজারে ফলবিক্রেত্রী—নানাবর্ণের সুপক্ক ফলের মধ্যে দাঁড়াইয়া মন কেনা-বেচা করিতেছে। ফলটা উপলক্ষ মাত্র।

আরবী গৃহে—বিশেষ ধনবানের গৃহে বিলাসের উপকরণও অল্প নহে। ধূমপান প্রচলিত। নারগিলা—কাচের ফুরসী—তাহাতে কেহ কেহ গোলাপজলও ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই সেই নারগিলায় ধূমপান করেন। ইরাণের ও তুর্কীর গালিচা প্রসিদ্ধ—তেমন কোমলতা, তেমন বর্ণের বাহার আর কোন দেশের গালিচায় দেখা যায় না। ধনীর গৃহে, গৃহপ্রাচীরে নানারূপ শিল্পের গালিচা ঝুলান—সেইরূপ গালিচায় আসন আবৃত। সেই আসনে উপবেশন করিয়া তন্দ্রালসভাবে আরবী বিলাসিনীরা ধূমপান করেন। বাহিরের রবিকর সেই কক্ষ-মধ্যে স্নিগ্ধ হইয়া প্রবেশ করে—যেন জ্যোৎস্নালোক। পার্শ্বে পাত্রে সরবৎ। তিনি যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। সে রাজ্যে শ্রম নাই—শোক নাই—ভয় নাই—ভাবনা নাই।

এই সব অন্তঃপুরে যে বহু ষড়যন্ত্র—বহু পাপ প্রশ্রয় পায়—এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। তবে বিদেশী লেখকরা যে সব বর্ণনা করেন, সে সবই যে অতিরঞ্জন-বর্জ্জিত—এমন মনে হয় না।

বিশেষ সহরে—যে সব স্থানে নানা জাতির সম্মিলন, সে সব স্থানে যে পাপের পঙ্কিল প্রবাহ প্রবল, তাহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। পোর্ট সৈয়দে বা কায়রোর রাজপথে বারাঙ্গনাদিগের চর শীকার সন্ধান করিয়া ঘুরে। তাহারা কেহ বা ফুল, কেহ বা স্ফটিকের বা প্রবালের মালা, কেহ বা ছবি বিক্রয় করে। ক্রেতাকে পণ্য দেখাইতে দেখাইতে নানা জাতীয়া সুন্দরীর সন্ধান দেয় ও পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

কায়রো সহরে যে সব নাচের আড্ডা আছে, সে সব পাপের লীলাক্ষেত্র বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।

কোন কোন রঙ্গালয়ে আরবী গায়িকা দেখা যায়। ইরাকের মত মিশরে মুসলমান রমণীর পক্ষে প্রকাশ্যভাবে

আরবী নারী।

রঙ্গমঞ্চে গান করা নিষিদ্ধ নহে। বহু অলঙ্কারে শোভিতা, আরবী কিশোরী ও যুবতীরা রঙ্গালয়ে গান গাহিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকে।

আর রাজপথে বোরকাঢাকা নারীর দলকে উষ্ট্রযুক্ত বৃহৎ রথোপম গাড়ীতে বা শ্বেতবর্ণ গর্দ্দভের পৃষ্ঠে যাইতে দেখা যায়।

গার্হস্থ্য কার্য্যে মিশরে নারীরা শ্রমশীলা। গৃহপালিত পশুর সেবা করা—বাগান দেখা—ঘরদ্বার পরিষ্কার রাখা—এ সব কাযে মিশরী নারীর আলস্য নাই। আজকাল য়ুরোপে ও মার্কিণে যেমন কৃত্রিম উপায়ে কুক্কুটাদির ডিম্ব ফুটাইয়া শাবক বাহির করা হয়, মিশরে তেমনই ভাবে—তাপ দিয়া ডিম্ব ফুটান বহুকাল হইতে প্রচলিত প্রথা। সে সব কায মহিলারাই দেখিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন জল আনয়ন—রন্ধন—এ সব কায সর্ব্বদেশের মত মিশরেও নারীরাই করিয়া থাকেন।

মিশরের লোক অতিথিসৎকারে অবহিত। গৃহে অতিথি আসিলে তাহার সেবার মধ্যে রমণীর চেষ্টা অনুভূত হয়।

তুর্কীর মত মিশরও সুন্দরীর রাজ্য—সে রাজ্যে সুন্দরীর বাহুল্য—সেই সেকালের সুন্দরীশিরোমণি ক্লিওপেট্রার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

বলি।

১

সে অনেকদিনের কথা, ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় নাই। তখন বঙ্গের দ্বিজাতিবর্গ টোলে কাব্য ব্যাকরণ-পুরাণাদি অধ্যয়ন করিত। আর অন্য ভদ্র সন্তানরা ফারসী ও আরবীতে লায়েক হইয়া বিদ্বান্ খ্যাতি লাভ করিত। তখন এতদঞ্চলে সপ্তগ্রামের মাদ্রাসা ও ত্রিবেণীর টোলের অধ্যাপনার প্রশংসা ছিল। এই দুইটি বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সহস্রাধিক ছাত্র শিক্ষা পাইত।

সপ্তগ্রামের মাদ্রাসার ছাত্রগণের মধ্যে রামাক্ষয় ঘোষের কৃতিত্বের কথা অনেকের মুখেই শুনা যাইত। তাহার বয়স সত্বেও সে ফারসী কাব্যে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

ত্রিবেণীর টোলের অন্যতম ছাত্র হরিহর ছিল রামাক্ষয়ের পরম বন্ধু। তাহার বাটী শান্তিপুরের নিকট; ত্রিবেণীর ঘাটে নৌকা চাপিয়া, অথবা বালি হইতে আরম্ভ করিয়া যে পুরাতন পথটা ত্রিবেণীর ভিতর দিয়া নদীয়া, রঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের দিকে চলিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর দিয়া পদব্রজে বা গো শকটে সেখানে পৌছান যাইত।

বঙ্গের কোন অংশেরই তখন অস্বাস্থ্যকর অখ্যাতি ছিল না। ত্রিবেণীর জল-বায়ুর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। সুতরাং সেখানকার টোলের ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছাত্রগুলির শরীর ও মন দুই-ই যে সুস্থ সবল ছিল এবং তাহাদের জীবন উপভোগের উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তিও যে প্রচুর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

সে দিন বৈকালে হরিহর পুঁথিগুলি গুছাইয়া রাখিয়া ভাবিতেছিল, কতক্ষণে রামাক্ষয় আসিবে। এবারকার পূজার ছুটীতে তাহার হরিহরদের বাটীতে যাইবার কথা ছিল। রামাক্ষয় আসিলে খেয়ালী হরিহর যে কেন বলিয়া উঠিল, "তারকেশ্বর" যাইবি?" তাহা সে-ই জানে।

রামাক্ষয় বলিল, "কবে?"

"কবে কি রে? এখনই।"

"এখনই! শান্তিপুর?"

"সে পরে হইবে।"

২

মহাপূজার ধূম হইতেছিল। সে কালের পূজা, পল্লীগ্রামে, জমীদারের বাটীতে। কীর্ত্তন, পাঁচালী গান, বন্ধু-বান্ধব, কুটুম্ব-কুটুম্বিনীর সমাগম, শ্বশুরালয় হইতে বৎসরান্তে স্নেহের দুহিতা, ভগিনী, ইহারাও গৃহস্থ-গৃহে ফিরেন। কিন্তু ও সকল বর্ণনা করিলেই রায় নগরের রায়েদের বাড়ীর পূজার ব্যাপার বুঝান যায় না।

রায় মহাশয়ের প্রত্যেক তালুক হইতে মোড়ল মাতব্বররা কিছু না কিছু 'নজর' লইয়া উপস্থিত হয়। বৎসরান্তে বাবুকে সম্মান দেখাইবার জন্যও বটে, পূজার কয় দিন বাবুর বাটীতে যাত্রা-গান শুনিয়া, মিঠাই-মোণ্ডা খাইয়া, আমোদ আহ্লাদে কাটাইবার জন্যও বটে। সাধারণ প্রজার ত কথাই নাই; তাহাদের সংখ্যাও দুই এক সহস্রের ভিতর আবদ্ধ থাকে না। রায়েদের বাটীর পূজার ভোজন এতদঞ্চলে গল্পের বিষয়, কিন্তু তাহার বিশেষত্ব বলিতেছি। নবমীর দিন নিরানব্বইটা পাঠা ও তিনটা মহিষ বলি সকলের সম্মুখেই হইত। তাহার পর পূজার দালানের নীচের উঠানে কয়েক সহস্র দর্শকের যে উল্লাস চীৎকার, বলির পশুর মুণ্ড লইয়া রক্তসিক্ত কর্দ্দমের উপর যে উদ্দাম নৃত্য, সদ্য-নির্ম্মুক্ত রক্তস্রোতের গন্ধে, দর্শনে, স্পর্শে আদিম মানবের ব্যাঘ্রবৃত্তির পুনরুন্মেষ, শক্তির তন্ত্রোক্ত তরল প্রসাদের উত্তেজনার সহিত মিশিয়া বৎসরান্তে সেখানে যে দৃশ্যের সৃজন করিত, তাহার খ্যাতি ও স্মৃতি, সে প্রদেশের অপগণ্ড শিশু ও অসূর্য্যম্পশ্যা বধূরও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণের যে বলি, তাহা এরূপ গোপনে, সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে এরূপ অসাধারণভাবে নিষ্পন্ন হইত যে, তাহার উপর সম্ভ্রম, ভীতি ও ভক্তির একটা বিশেষ ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল। অষ্টমীর দিন সমস্ত রায় পরিবার সন্ধিপূজার পূর্ব্বে জলগ্রহণ করিতেন না; বিশেষ শুদ্ধাচারে যেন ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকিয়া সন্ধিক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেন; অতিথি অভ্যাগতরা, আমোদ-প্রমোদের মাননীয় উপাদানগুলি—গায়ক, গায়িকা, নর্ত্তকী, বাদ্যকর প্রভৃতি সকলেই একটা শুষ্ক গাম্ভীর্য্যে আবৃত হইয়া পড়িত। সন্ধিক্ষণের পূর্ব্বে পূজা-বাটীর

প্রশস্ত প্রাঙ্গণ একরূপ জনশূন্য হইত, গুরু-পুরোহিত, কর্ত্তা-গৃহিণী এবং রায় পরিবারের বিষয়ের উত্তরাধিকারী বংশধর ও দুই এক জন অতি বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত, আর কাহারও সেখানে থাকিবার নিয়ম ছিল না। কি যে সেখানে হইত, তাহা বাহিরের কেহ জানিতে পারিত না, কাযেই সে সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক এবং ভয়াবহ প্রবাদ প্রচলিত ছিল।

৩

রায় পরিবারের অন্দরমহলে গৃহিণীর গৃহতলে গুরুপুত্র একখানি কম্বলের আসনে বসিয়া আছেন। একটু দূরে কর্ত্তা, গৃহিণী ও তাঁহাদের একমাত্র কন্যা কাত্যায়নী বসিয়া তাঁহার সহিত এ বৎসরের দুর্গোৎসব সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, "ঠাকুর, এই হয় ত আমার শেষ পূজা। এবার যাহাতে পূজা বিশেষ নিষ্ঠার সহিত নিষ্পন্ন হয়, কোন দিকে কোন ত্রুটি না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য নিবেদন করিতেছি। গত বারে, শুনিয়াছি, সম্পূর্ণ নিষ্ঠার অভাব হইয়াছিল। এক জন তন্ত্রধারক অশুদ্ধাচারী ছিলেন, এ কথা লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, এবং পরে মহামায়ার স্বপ্নপ্রত্যাদেশেও জ্ঞাত হইয়াছিলাম।"

তরুণবয়স্ক গুরু-পুত্র তাঁহার গলার মালার একটু রুদ্রাক্ষের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "পিতামহের মুখে শুনিয়াছি, আপনাদের এই পূজা বহুকাল হইতে প্রচলিত। লক্ষাধিক বলি এই স্থানে হইয়া গিয়াছে এবং ইহা একরূপ পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে। এ স্থানে পূজায় নিষ্ঠার ত্রুটি হইলে প্রত্যাদেশ অসম্ভব নহে।"

"সেই জন্যই নিবেদন করিতেছি, পাঠক, তন্ত্রধারক প্রভৃতির নির্ব্বাচন, পূজার বিধি ব্যবস্থা, আয়োজন, উপকরণ সমস্ত ভার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এবার যেন কোন ত্রুটি না হয়, পূজা যেন সর্ব্বোপচারে সম্পন্ন হয়।"

গুরু-পুত্রের বদন গম্ভীর হইল, ললাটরেখা কুঞ্চিত হইল। একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "রায়েদের দুর্গোৎসবের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পাদন বোধ হয়, একালে সম্ভব নহে।"

গৃহিণীর কর্ণে কন্যা কাত্যায়নী মৃদুস্বরে কি বলিতেছিল। গুরু-পুত্রের গম্ভীর স্বরে গৃহিণী চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইলেন, রায় মহাশয়ের উৎসুক উদ্বিগ্ন দৃষ্টি গুরু-পুত্রের মুখের উপর ন্যস্ত।

গুরু পুত্র কিন্তু মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "মা'কে কি বলিতেছিলে, দিদি?"

কাত্যায়নীর মুখে একটা সঙ্কোচের হাসি ফুটিয়া উঠিতে উঠিতেই মিলাইয়া গেল, তাহার দৃষ্টি নত হইল।

রায়-গৃহিণী বলিলেন,"বল না মা, ওতে আর লজ্জা কি?"

"তুমিই বল।"

"কাত্যায়নী বলিতেছিল যে, এবার যত প্রজা আসিবে, তাহাদের সকলকেই বস্ত্র দান করিলে ভাল হয়।"

গুরু পুত্র বলিলেন, "এবারকার পূজার এও একটা বিশেষত্ব হইবে।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "যে আজ্ঞা।" তাহার পর কি একটু ভাবিয়া কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কাতু, পূজায় বিলাইবার কত কাপড় তোমার চাই, তাহার একটা হিসাব করিয়া লইয়া এস ত এখনি।"

পরম উৎসাহে কাত্যায়নী উঠিয়া গেলে তিনি বলিলেন, "ঠাকুর, সর্ব্বোপচারে পূজার সম্বন্ধে কি অনুমতি করিয়াছিলেন?"

গুরু পুত্র অতি মৃদুস্বরে যে কথা বলিলেন, তাহাতে কর্ত্তা গৃহিণী উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন। রায় মহাশয় বলিলেন, "সে সম্বন্ধে কালানুযায়ী ব্যবস্থা ত আপনার পিতামহ ঠাকুরই দিয়া গিয়াছেন।"

"কিন্তু সে ত প্রকৃত ব্যবস্থা নহে।"

৪

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রায়-গৃহিণীর শয়নকক্ষ হইতে একটা আর্ত্তের ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়া সুবৃহৎ প্রাসাদটির সর্ব্বাংশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। পার্শ্বস্থ কক্ষে নিদ্রিতা কাত্যায়নীই সেই শব্দে প্রথমে জাগিয়া উঠে। তাহার পরে অন্দরের অপরাপর মহিলাগণ, পরিচারক-পরিচারিকাবর্গ, বহির্বাটীর আমলা কর্ম্মচারী, দেউড়ির দ্বারবান, লাঠিয়াল, সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

মোমবাতিতে আলোকিত সুধাধবল গৃহের মধ্যে পালঙ্কের সুকোমল শয্যায় রায় মহাশয়ের বিপুল দেহখানি পড়িয়া আছে। তাঁহার মুখের অস্ফুট ভীতিব্যঞ্জক শব্দ, ওষ্ঠপ্রান্তের

স্নায়বিক আকুঞ্চন-বিকুঞ্চন, চক্ষুতারকার অস্বাভাবিক বিস্তৃতি, তাঁহার অন্তরস্থ বিভীষিকা বাহিরে আনিয়া আত্মীয়-অনুগত বন্ধু-বান্ধব সকলকেই ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। রায় মহাশয় যথাসময়ে নিদ্রা গিয়াছিলেন, মধ্য-রাত্রিতে একটা অস্পষ্ট শব্দে গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি স্বামীর অবস্থা দেখিয়া ক্রন্দন-কোলাহলে সকলকে জাগাইয়া তুলেন। প্রায় এক দণ্ড অতীত হইয়াছে, এখনও রায় মহাশয়ের সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আইসে নাই। এখন সে গৃহে বেশী লোক-জন নাই। গুরু-পুত্র ও কবিরাজ বসিয়া আছেন, গৃহিণী পীড়িতের মাথার নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন, এবং কন্যা কাত্যায়নী পদতলে বসিয়া পা-দুইটিতে হাত বুলাইতেছে।

জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে রায় মহাশয়ের চক্ষুর সহজ ভাব ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল গুরু-পুত্রের তরুণ দীপ্ত মুখ-মণ্ডলের উপর, তাহাতে তিনি যেন শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু ফিরাইয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি কত ?"

"প্রায় তিন প্রহর।"

রায় মহাশয় উঠিয়া বসিলেন। শুশ্রূষাপরায়ণা কন্যার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আকুল আগ্রহে তাহার মাথায় হাত দিয়া কি একটা কথা বলিতে গিয়া তাঁহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। কাত্যায়নীর চক্ষু দুইটি জলে টল্‌টল্ করিতেছিল, সে বলিল, "কি হইয়াছিল, বাবা ?"

"কিছু হয় নাই, মা, বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।"

কবিরাজ মহাশয় বিদায় হইলেন। কাত্যায়নীকে ঘুমাইতে পাঠান হইল। গুরু-পুত্র তখনও সে গৃহে রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে যখন তিনি বাহিরে গেলেন, তখন তাঁহার মুখে ভক্তির, বিশ্বাসের এবং উল্লাসের একটা চিহ্ন এবং সেই নিস্তব্ধ গৃহে কর্তা ও গৃহিণীর মুখে উদ্বেগের, গাম্ভীর্য্যের এবং মহা সমস্যার ভাব।

৩

"তারকেশ্বর কতদূর হইবে ?"

"পশ্চিমদিকে প্রায় তিন ক্রোশ।"

বেলা তখন প্রহরাধিক। হরিহর বলিল, "বাবা তারকনাথ মাথায় থাকুন, এখন ব্রহ্মাগ্নিকে শান্ত করা প্রয়োজন। হাঁ হে বাপু, পাশের গ্রামটির নাম কি বলিতে পার ?"

"কেন, রায়-নগর।"

"এ গ্রামে কোন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস আছে ?"

"আপনারা বোধ হয় ও অঞ্চলের লোক নহেন ঠাকুর, রায়-নগরের রায়েদের কে-না জানে ?"

"চল হে, রায়-নগরের রায়েদের অতিথি সেবা-প্রবৃত্তির পরীক্ষা করা যাউক!"

সপরিচারিকা কাত্যায়নী ষষ্ঠীর পূর্ব্বাহ্ণে নদীতে স্নান করিতে যাইতেছিল। সরু রাস্তায় সম্মুখে পড়িল রামাক্ষয়, তাহার পশ্চাতেই হরিহর। রামাক্ষয় আইল হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। হরিহর জিজ্ঞাসা করিল, "রায়েদের বাটী কোন্ পথে যাইব ?"

"ঐ যে পুকুরটা, ওর বাঁ দিক্ দিয়া।"

রামাক্ষয় বলিল, "পথ ছাড়িয়া উঁহাদের যাইতে দাও না।"

রায়েদের বাটী যাইতে যাইতে হরিহর বলিল, "মেয়েটা কি সুন্দরী; ঠিক্ যেন পরীর বাচ্ছা!"

রামাক্ষয় উত্তর দিল, "ছিঃ! সুন্দরী বটে—

'অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।

কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্'॥"

নদীর ঘাটের কাছে কাত্যায়নী পরিচারিকাদের জিজ্ঞাসা করিল, "উঁহারা কাহারা ?"

"পড়ুয়া, পূজার সময় ভিক্ষা করিতে কি বৃত্তি লইতে আসিয়াছে।"

রায়েদের চণ্ডী মণ্ডপে সুসজ্জিতা দেবী-প্রতিমার তখনও ষষ্ঠী-পূজা আরম্ভ হয় নাই। পুরোহিত পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। গুরু-পুত্র সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। হরিহর "ভো ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ" বলিয়া দাঁড়াইল! গুরু-পুত্র যথাযোগ্য উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আগমন ? উদ্দেশ্য ?"

হরিহর উত্তর করিল, "ত্রিবেণীর টোল হইতে তারকেশ্বরে যাত্রা করিয়াছি। অদ্য এ স্থানে আতিথ্য-গ্রহণে ইচ্ছুক।" হরিহর যখন তাহার বন্ধুর পরিচয় দিতেছিল, তখন গুরু-পুত্র একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুরোহিত বলিলেন, "পরম সৌভাগ্য।" গুরুপুত্রের মুখ দিয়াও প্রতিধ্বনির মত

নির্গত হইল—"নিশ্চয়ই পরম সৌভাগ্য।" তাঁহার ঠোঁটের উপর যেন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ার বিস্ময়-রহস্য রেখা।

৬

ষষ্ঠীর রাত্রিতে রামাক্ষয় বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল। রাত্রির শেষাংশে পীড়ার বাড়াবাড়ি দেখিয়া হরিহর রায়েদের এক জন পাইককে সঙ্গে লইয়া রামাক্ষয়ের বিধবা মাতাকে আনিতে চলিল। অষ্টমীর প্রাতে যখন সে তাঁহাকে লইয়া ফিরিল, তখন রামাক্ষয়ের শ্মশান-সৎকার প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। একমাত্র পুত্রের দগ্ধ-দেহের গন্ধ, ধূমের সহিত মিশিয়া জ্ঞানহারা জননীর নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিল মাত্র—শেষ দেখা হইল না।

সদ্য-পুত্রহারা শোকার্ত্তা জননী রায়েদের অন্দর প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছেন। পুরস্ত্রীগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। তত জনকোলাহলমুখরিত বাটীখানি আজ মহাষ্টমীর দিনেও যেন নিরানন্দ, স্তব্ধ, শোকগ্রস্ত। কর্ত্তা সমস্ত দিন উপর হইতে নামেন নাই। গৃহিণী কাল সন্ধ্যার সময় হইতেই পূজার উৎসবের ভার এক আত্মীয়ার উপর দিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অতিথি-শালায় অতিথির অভাব নাই, উৎসবের অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই; তথাপি যেন অজ্ঞাত-কুলশীল সুন্দর কিশোর বালকটির আকস্মিক আবির্ভাব এবং অন্তর্দ্ধান এবারকার পূজায় আনন্দ পণ্ড করিয়া দিতে বসিয়াছে। কিন্তু ধন্য গুরু-পুত্র। তিনিই এখন কর্ণধার। এত বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তিনি অবিচলিত থাকিয়া সমস্তই সুব্যবস্থার সহিত পরিচালনা করিতেছেন।

৭

মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ রাত্রি দ্বিপ্রহর একদণ্ড তিনপল চারি বিপল গতে। পূজার যথারীতি আয়োজন হইয়াছে। সন্ধ্যার পর গুরু-পুত্র অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন। শয়ন গৃহে ম্রিয়মাণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কর্ত্তা-গৃহিণী বসিয়াছিলেন। গুরু-পুত্র বলিলেন, "শাস্ত্রানুযায়ী সর্ব্বোপচারসম্পন্ন সন্ধি-পূজার আয়োজন হইয়াছে, আপনারা প্রস্তুত হউন।"

গুরু-পুত্রের দৃঢ়নিবদ্ধ সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধরের উপর কর্ত্তা-গৃহিণীর দৃষ্টি একসঙ্গেই পড়িল। তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন। গৃহিণী অত্যন্ত মিনতির ভাবে বলিলেন, "কাত্যায়নীকে একান্তই থাকিতে হইবে?"

"নিশ্চয়ই। রায়-পরিবারে দুর্গোৎসবের আরম্ভ হইতেই এই বিধি চলিয়া আসিতেছে।"

গুরুপুত্র চলিয়া গেলে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আজও তোমার সে কথা মনে আছে? তুমি ত তখন সাত বছরের মোটে।"

"হাঁ, এখনও যেন চোখের সম্মুখে দেখিতেছি।"

"মূর্চ্ছা গিয়াছিলে, নয়?"

"হাঁ, এক ফোঁটা গরম রক্ত ছিট্‌কাইয়া আসিয়া আমার কপালে লাগিয়াছিল। তার আগে যখন তা'র বাউরি চুল-গুচ্ছ [illegible] হাড়িকাঠে পুরিল, তখন কি জীবন-মরণের দাপাদাপি, কি ভয়ার্ত্ত করুণ কাতর বাঁচিবার প্রার্থনা! চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই রাত্রির ঘটনা আজও মনে করিয়া আমার শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে। দুধের মেয়ে, কাতু কি আমার সে দৃশ্য সহিতে পারিবে?"

"হাঁ, শুনেছ ত, নরহত্যা, ডাকাতীতে রায়-বংশের পত্তন। এইবারে বোধ হয় উদ্‌যাপন।"

সন্ধি-পূজার সময় সন্নিকট। রক্ত-চন্দনচর্চ্চিত-ললাট কর্ত্তা, গৃহিণী, কাত্যায়নী পূজার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সেখানে সিন্দূর-রঞ্জিত যূপ-কাষ্ঠ, রক্তাধার খর্পর প্রভৃতি যথাস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে।

কাত্যায়নী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বলির ছাগল কৈ? তুমি এবারও কি বুকের রক্ত দিবে?"

মাতার মুখ হইতে কথা ফুটিবার পূর্ব্বেই প্রতিমার পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র দ্বার উন্মুক্ত হইল, এবং তাহা দিয়া গুরু-পুত্র একটি তরুণ সুন্দর কুমারের হাত ধরিয়া বাহির হইলেন। সে বলিতেছিল, "এ কি রহস্য তন্ত্র-তীর্থ? প্রাতঃকাল হইতে অতিথিকে উপবাসী রাখিয়াছেন। হরিহরের দেখা নাই—"

কাত্যায়নী নবাগতকে দেখিয়া সরিয়া মাতার গাত্র স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার মরা মানুষের মত সাদা মুখ দিয়া বাহির হইল—"মরা মানুষ আবার ফিরে এল!"

গুরুপুত্র তখন রামাক্ষয়কে বলিতেছিলেন—"রায় পরিবারের সন্ধিপূজার রহস্য জানিতে চাহিয়াছিলে, এখনই জানিতে পারিবে। প্রতিমার নিকটে সরিয়া আইস।

রায়েদের মহাষ্টমীর নরবলি প্রথা। তোমার সৌভাগ্য, তোমার নশ্বর দেহ মহামায়ার প্রীত্যর্থে নিয়োজিত হইল।"

এই অকস্মাৎ বজ্রপাতে রামাক্ষয়ের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তাহার সন্ত্রস্ত দৃষ্টি সেই মণ্ডপস্থ সমস্ত অপরিচিত নরনারীর মুখের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া কাত্যায়নীর ভীতিকরুণ চক্ষুর উপর আসিয়া সহসা থামিয়া গেল।

যূপকাষ্ঠের নিকটে কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র দুর্ব্বলের জীবনরক্ষার প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির সহিত ধর্ম্মোন্মত্ত প্রবলের পশুবলের যে সংঘর্ষ বাধিল, তাহার ফলে রামাক্ষয়ের কণ্ঠ যূপকাষ্ঠে সংলগ্ন হইল। গুরুপুত্র হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উৎসর্গিত কিশোরের মাথার চুল দুই হাতে টানিয়া ধরিয়াছে, তাহার মূর্ত্তি পৈশাচিক, কণ্ঠ হইতে অমানুষিক স্বরে "মা, —রব-রব নির্গত হইতেছে। আর এক জন ব্রাহ্মণ যূপসংলগ্ন বলির দুই পা টানিয়া ধরিয়াছে এবং পুরোহিত খড়্গোত্তোলন করিয়া সন্ধিক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছে।

অকস্মাৎ সমস্ত প্রতিমাখানি কাঁপিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর কোন্ গভীর তলদেশ হইতে সহস্র কামানের ধ্বনি উত্থিত হইয়া দিগ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র প্রকৃতির সে কি তাণ্ডব নৃত্য! কিন্তু তাহারই মধ্যে বুঝি বা শত বৎসরের ধ্বংসলীলা অভিনীত হইয়া গেল।

যখন জলস্থল প্রকৃতিস্থ হইল, ভীষণ কম্পনের পর মাতা বসুন্ধরা আবার সর্ব্বংসহাভাব ধারণ করিলেন, তখন রায়েদের অন্দরমহলের কতকাংশ ভূগর্ভে অর্দ্ধ-প্রোথিত হইয়াছে, অপরাংশ জ্বলিতেছে; বহির্বাটীর কতকটা একবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, পূজার দালানের কয়েকটা স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং মহামায়ার মুণ্ডটি ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা স্তম্ভের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

কিছুক্ষণের জন্য বোধ হয় সে বাটীর সকলেই সংজ্ঞা হারাইয়াছিল। যখন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন জীবনরক্ষাবৃত্তির অনুগামী হইয়া যে সকল অন্তঃপুরিকা এবং তাহাদের মধ্যে রামাক্ষয়ের মাতাও, অন্তঃপুরের অগ্নিদাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রয়াসে দিগ্বিদিকজ্ঞান হারাইয়া পূজার মণ্ডপে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সবিস্ময়ে গৃহলগ্ন অগ্নির উজ্জ্বল আলোকে দেখিল, পূজার প্রাঙ্গণে নরবলি হইয়া গিয়াছে, গুরু পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে। তাহার সদ্য ছিন্ন কণ্ঠোৎকীর্ণ রক্তধারায় অভিষিক্ত মূর্চ্ছিতপ্রায় কুমারী কাত্যায়নী রামাক্ষয়ের দেহাবলম্বন করিয়া কাঁপিতেছে। মৃতপ্রায় রায়-মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণীকে একটি ভাঙ্গা দরজার তলা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বলশালী হরিহর ও আর কয়েক জন লোক প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। পুরোহিত অদূরে ভগ্নপদের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে।

কতকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও রায়েদের বার্ষিক দুর্গোৎসব সেই স্থানেই রামাক্ষয় ও কাত্যায়নীর বংশধরদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এখন কিন্তু সে পূজায় জীববলির পরিবর্ত্তে ইক্ষুবলির প্রথা প্রবর্ত্তিত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

নিশীথের কথা।

শ্যামা-পাখী।

১

বা! বেশ ত বাগানটি! এ রকম সাজানো বাগান—দেখি নি? কখন দেখি নি? না না, দেখেছি বই কি! কবে—কোন্ সময়ে? ওই সুমুখের হাত-পা-নাড়া মাথা-দোলানো—ফুলে ভরা নয়ন-রঞ্জিনী লতা জড়ানো নয়নরঞ্জন হে তরু, হে তরুরাজ! তোমাকে কি আমি আর কখনো দেখি নি? তোমার ওই সোনা-মাখানো, আকাশের নীলিমা-ছড়ানো, চাঁদ-গলা অরুণ-উথলা হরিৎ-শুভ্র ফুল—আমি কি সত্য সত্যই দেখি নি?

উঁহুঁ—দেখেছি বই কি! কি মানসী, চুপ ক'রে রইলি কেন—বল্ না।

"দেখেছ বই কি!"

"কোথা থেকে কথা কইলি, মানসী?"

"হি-হি হি-হি!"

"হাসলি কেন?"

"হি-হি-হি-হি!"

"হাস্‌ছিস্ কেন? হাস্‌বার কথা কি কইলুম! ওই কুঞ্জ থেকে? ওই কুঞ্জ? ওই দূরের কুঞ্জ?, এই কুঞ্জ? আরে মর্ হাস্‌ছিস্ কেন? ওরে আমার প্রিয়—প্রিয়ের প্রিয়—সই—আমার সর্ব্বস্ব!"

"উঃ!"

"তোর দীর্ঘশ্বাস শোনালি, আমারটা কি শুনতে পেলি নি? চুপ্! বটে রে সর্ব্বনাশী,—সমস্ত কুঞ্জ আমি তোলপাড় করব।"

"পার্‌লে কি ছেড়ে কথা কইতে এতক্ষণ?"

"মানসী—মানসী! ওরে আমার! ওরে কেবল আমার! ওরে নিখিল-জোড়া বেদনা-ধরা আমার কথার সীমার পার!"

"চল।—কর কি কর কি সখা, পিছনে চেয়ো না!"

"চাইব না?"

"না গো!"

"কেন গো?"

"কেন আবার কি, ওই যে বললুম - চল।"

"ওরে আমার ব্যাকুল চোখের অন্তরাল, আমার কাঁপন-হিয়ার বাহুপাশ!"

"ছিঃ! চোখ দুটো তোমার কি পিছন-কাণা, বুকটা তোমার কি এতই ছোট!"

"চল, প্রিয়তমে!"

"উঃ!"

"চল্ বিলাসী চল্—আমি পিছনে চাইব না, চল্।"

২

"মানসী!"

"উঁ!"

"বলি, আস্‌ছ ত?"

"বুঝে দেখ না।"

"পায়ের শব্দ পাচ্ছি না যে!"

"আমিও পাচ্ছি না।"

"ও! সারা পথটা ফুলে ঢেকে দিয়েছ!"

"আমি না তুমি?"

"এত ফুল আমি কোথায় পেলুম, সখি?"

"এত ফুল তুমি কোথায় পেলে, সখা?"

"দুপ্ দুপ্ দুপ্—এ কিসের শব্দ সই?"

"তাই ত সখা, শব্দই ত বটে—দুপ্ দুপ্ দুপ্।"

"কোথা থেকে উঠছে, প্রিয়তমে?"

"তোমার পা থেকে, প্রিয়তম!"

"উঁহুঁ।"

"তোমার বুক থেকে।"

"উঁহুঁ—হাস্‌লি যে! আবার হাসি! বেশ, পরীক্ষা কর্।"

"চোখ বোজো।"

"তোর হাতখানাকেও দেখ্‌তে দিবি নি? চুপ্! আবার নিশ্বাস? না না প্রিয়তমে, আমি চোখ বুজেছি।—আ! তৃপ্তিময়ী!—একবার তোমার ও করপল্লবটা দেখি না! না না—আর একটু রাখ, আর একটু রাখ—রাখ্ নিঠুরে রাখ্।—মানসী!"

"নাথ!"

"আমার বুকের কাঁপন যে বেড়ে গেল!"

"আমারও—দুপ্ দুপ্ দুপ্।"

"আমার বুকে একটু মাথা দাও না।"

"চোখ বোজো।"

"দেখাতে কি অপরাধী হ'ল আমার সর্ব্বস্ব!—আ! আ! মুখখানি একবার দেখ্‌তে অনুমতি দে না রাক্ষসী!"

"কেন, তুমি কি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ না?"

"বদ্ধ চোখের আগুন জল তোমার গণ্ডে পড়লো নাকি সই?"

"ছেড়ে দাও।"

"ওঃ! বুঝতে পারিনি—এ কঠোর বাহুর বাঁধন। ও কি, কাঁদছ?"

"রাগ কর্‌লে নাকি, হৃদয়েশ্বরী! অপরাধ করেছি—ক্ষমা কর মানসী!

"কি বল।"

"রাগ কর্‌লে?"

"হি-হি-হি-হি।"

"তবে কাঁদ্‌লি কেন সর্ব্বনাশী?"

"কখন্ কাঁদ্‌লুম?"

৩

"এ বাগান কি আর কখন দেখেছি?"

"মনে ক'রে দেখ না।"

"হুঁ! বাগানটি কার?"

"আমাকে বল্‌তে হবে?"

"আমার?"

"তোমার।"

"এ বাগানের যেখানে যা?"

"তোমার।"

"তুমি?"

"স্নেহ।"

"না, না, জিজ্ঞাসা ক'রে অন্যায় করেছি। তুমি কি রাগ কর্‌লে? আবার চুপ? মানসী—প্রেয়সী!"

"উঁ!"

"তুই বড় দুষ্টু।"

"তোমার চেয়ে?"

"তোর অধরটা একবার পেতুম ত এর উত্তর দিতুম।"

"আমিও পেতুম!"

"বাধা কি, ও রে আমার ওরে!"

"কি জানি ওগো আমার ও গো!"

"হুঁ।"

"চল।"

৪

"ওই গাছ!"

"আহা কি সুন্দর!"

"ওই গাছ জড়ানো লতা? বল্ সুন্দর। বল্‌বি না—কিছুতেই বল্‌বি না?"

"কই লতা?"

"লতিকে—লতিকে! এ কি পরশ! জড়া, আরও জড়া—"

"কই লতা?"

"এই যে তার ফুল—ফুট্-ফুট্-ফুট্—একটি, দু'টি, তিনটি—আ! আর গুণবো না।"

"কই ফুল? ওরা যে তোমার রং-পাগল চুম্বন-চিহ্ন!"

"আমার না তোমার? মিথ্যাবাদিনী!"

"মিথ্যাবাদী!"

"আ! আ! আমার অঙ্গের সর্ব্ব পরমাণুকে নাচিয়ে দিলি! আমার ওষ্ঠাধর কি অপরাধ কর্‌লে, নিঠুরে!"

"আঃ! ছাড়, কর কি? ভুল, ভুল—ও আমার হাত নয়—তোমারি দীর্ঘশ্বাস—দূর তটিনীর কূল-কাঁদানো জংলি গান। এ আমার বুক নয়—তোমারি মর্ম্ম—কুঞ্জবনের আলসফুলের ঘুম-কাঁদানো বিছানা। এ আমার নয় পরশ—ওগো ধ'র না, ফিরো না, চেয়ো না।"

"মানসী—মানসী—ওরে আমার! ওরে আমার অতৃপ্ত মুখর সকল সাধের কলকল্!"

"পি-পি-পি-পি।"

"পোড়ামুখী শ্যামা-পাখী উড়ে গেলি!"

*　*　*　*　*

ওই অসীম দেশের অলখ ফুলের অবুঝ গন্ধের ভিতর দিয়ে ও কোন্ কবির গান তুমি বয়ে আনচ অ'চিন্ সুন্দরী?

"মাটীর উপর সাজানো সাগর
তাহার উপর ঢেউ,
তাহার উপর পিরীতি-বসতি
বুঝিতে পার কি কেউ?"

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

কৌলিক দুর্গোৎসব

(নক্সা)

আবার পূজো এসেছে; আশ্বিনের বাতাস যেন পূজো বয়ে আন্‌ছে, শরতের নূতন রৌদ্র যেন পূজা ফুটিয়ে তুল্‌ছে, মনের ভিতর সব ভাবনা, সব চিন্তা, সব ঝঞ্ঝাট ঝড়ের ভিতর থেকেও যেন কেমন একটা পূজা উঁকি-ঝুঁকি মেরে উঠ্‌ছে। আবার পূজা এসেছে—বাঙ্গলা হেসেছে।

এ পূজা, শরতের এ দুর্গাপূজা, বাঙ্গলার নিজস্ব পূজা, এ উৎসব বাঙ্গলার নিজের বাঙ্গালীর নিজের। যেথায় বাঙ্গালী, সেথায় দুর্গাপূজার এ আনন্দ। বাঙ্গালী পাঞ্জাবে থাক্‌লে পাঞ্জাবে দুর্গাপূজা, মাদ্রাজে থাক্‌লে মাদ্রাজে দুর্গাপূজা, বসরা বাগ্‌দাদ বিলাত যেখানেই বাঙ্গালী থাকুক, সেখানেই দুর্গাপূজার সময় একটু আনন্দ না ক'রে থাক্‌তে পার্‌বে না। পূজার সময় বাঙ্গলার সকলেই বাঙ্গালী, পূজায় বাঙ্গলার মাড়োয়ারী বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী, ভাটিয়া মাদ্রাজী বোম্বাই বাঙ্গালী, বাঙ্গলার মুসলমানও পূজায় আনন্দ করে, ইংরাজও আনন্দ করে। তাই বল্‌ছি, আবার পূজা এসেছে—আবার বাঙ্গলা হেসেছে। ইহাকে কেউ চাপিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না। তুমি হাজার সভ্যতার ভাণ কর, হাজার নবধর্ম্ম অবলম্বন কর, হাসির সঙ্গে যতই তোমার বিষ-দৃষ্টি হ'ক, বাঙ্গলার মুখে চোখে বুকে যে আশ্বিনে-হাসি শিশির-সিক্ত শেফালীর মত—শরতের পদ্মের মত প্রকৃতির প্রেরণায় আপনা-আপনি ফুটে উঠে, তার একটি পাপড়িও ছিঁড়ে ফেল্‌বার, সেই বর্ষাধৌত নূতন জ্যোৎস্না-মাখান হাসি মুছে ফেল্‌বার সাধ্য তোমার নাই।

ঐ শুন আবার বেজে উঠ্‌ল পূজার ঢোল, আবার ঘরে ঘরে আনন্দরোল। বাজারে বাজারে কেনা-বেচার কি জীবন্ত গোল! বাপের বড় টানাটানি, ফি-বছরেই টানাটানি, পূজায় ভাবনা, পূজায় কষ্ট, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা এসে আবদার ক'রে যদি না বলে—"বাবা, কবে আমার নূতন জামা, নূতন কাপড়, নূতন জুতা, নূতন চুড়ি হবে?" তাতে যেন আবার আরও কষ্ট। পূজার কেনা-বেচা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে একটু খিচি-কিচি, একটু মান অভিমান, একটু হাসি-কান্না, একটু নওলা-দওলা না হ'লে যেন সে মিষ্টি-কষ্ট আরও মিষ্টি হয় না।

আনন্দময়ী মা আমার, বাঙ্গালীর কষ্টকে মিষ্ট করতে, তুমি এই আশ্বিনে আশ্বিনে মঙ্গলময়ী মূর্ত্তিতে এসে দেবীরূপে, —জননীরূপে—কন্যারূপে বাঙ্গালীর মনের মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হয়ো!

কিন্তু এক দিন, সেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, এই পূজায় বাঙ্গলায় যে আনন্দের বাজার বস্‌ত, বাঙ্গলার নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রাসাদে অট্টালিকায় পর্ণকুটীরে হাটে ঘাটে মাঠে বাটে আনন্দের যে মেলা চল্‌ত, তার তুলনায় আজকালকার উৎসব উৎসবই নয়। সে ঝড় তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলে নদী-বক্ষ আলোড়িত ক'রে থেমে গেছে, এখন জেরের হিসাবে গোটাকতক ছোট-খাট ঢেউ উঠে মাত্র। এখন টাকার দাম কমে গিয়েছে, তখনকার চার আনার জিনিষে এখন দেড় টাকা দিতে হয়; ভক্তির গঙ্গায়ও ভাঁটা পড়েছে, স্বল্পে এখন কেউ সন্তুষ্ট নয়, যে ধরণে নূতন কাপড় নূতন জুতা পেয়ে আমরা ছেলেবেলায় আহ্লাদে আটখানা হয়েছি, এখনকার অনেক চাকর-ও সে রকম কাপড় পেলে মুখ সিঁট্‌কায়। তার উপর আবার রেল, কন্‌সেসনে আফিম ধরিয়ে মৌতাত জমিয়ে দিয়েছে, এখন ষষ্ঠীর সকাল হতে না হতেই বাস্তু ছেড়ে অনেক বাঙ্গালী ছুটে বেরোন, অষ্টমীর খিচুড়ীভোগ আনন্দ ক'রে খাওয়ার চেয়ে হাওয়া-খাওয়া এখন তাঁদের বেশী মিষ্ট লাগে; টেলিগ্রাফে মাকে পাঠান বিজয়ার প্রণাম—পরিবারকে আলিঙ্গন।

হায় রে সেকাল! সত্য সেকালের সবই কিছু ভাল নয়, কিন্তু এই পূজার বেলায় সত্যি সত্যিই বলি হায় রে সেকাল! তখনকার পূজা এক একটা দিক থেকে দেখ্‌লে জাতির প্রাণে এক একটা ভাব যেন ফুটে উঠেছে দেখা যেত। নবমী পূজার কাদা-মাটিতে আর বিজয়ার লাঠী তরোয়াল খেলাতে বাঙ্গালীর প্রাণের বীরভাব বর্দ্ধিত হ'ত; আগমনী গান শুন্‌লে ও অন্তঃপুর পানে চাইলে বঙ্গ-নারীর প্রাণে

মাতৃভাবের যে মধুর বিকাশ প্রকটিত হ'ত, আর সাদর আপ্যায়নে আদান-প্রদানে অন্যকে আনন্দ প্রদান ক'রে নিজে আনন্দিত হবার যে অতুল সুখ, তা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভূত হ'ত।

আঃ, সে কি আমোদই গিয়াছে! কি সে সব বড় বড় মহানৈবেদ্য সাজান, ঘড়ি ঘণ্টা-কাঁসরের কি সে ভক্তি-মাখা ঝনঝনা! বাজাতে বাজাতে ঢাকি-ঢুলিদের কি সে উন্মাদ নাচন! ধূপ-ধুনার গন্ধে সুরভিত পল্লীতে পল্লীতে কি সে খাওয়া-দাওয়া বাঁধা-ছাঁদা! ফলারে ও দক্ষিণায় ব্রাহ্মণের আনন্দ, নূতন কাপড় পরে ঘুরে ঘুরে ছেলেদের আনন্দ, নৈবেদ্য বইতে বইতে পাড়ার ছেলেদের বকে ঝকে চাকরদের আনন্দ, খোকাকে পোষাক পরিয়ে বাবার আনন্দ, নাতি কোলে ক'রে ঠাকুরদাদার আনন্দ, বাড়ী বাড়ী খই-মুড়কী নারিকেল-নাড়ু পেয়ে ভিখারীর আনন্দ, মদ খেয়ে মাতালের আনন্দ, বড়বাজারে গাঁট-কেটে চোরের আনন্দ, তাকে কেউ ধরিয়ে দিলে পাহারাওলার আনন্দ, সে হাত ফসকে পালিয়ে গেলে, নিদেন যে ধরিয়ে দিছ্‌লো, তাকে ধরেও পাঁড়েজীর মহা আনন্দ। আর এক এক পূজাবাড়ীতে এক এক রকম আনন্দ; কোন কোন বাড়ীতে আনন্দের চোটে কত রকম মজার রংও ঘটে গেছে; সেই রকম একটা মজার গল্প মনে পড়্‌ছে, শোন ত বলি :—

জেলা ঠিক মনে আছে—পাবনা, কিন্তু গ্রামখানির নামটি ভুলে যাওয়ায়ই সুবিধা মনে কচ্ছি, তবে গ্রাম সহর থেকে বেশী দূরে নয়, বরাবর পাকা রাস্তা। ইতর-ভদ্র অনেক লোকের বসতি। ব্রাহ্মণ কায়স্থ তিলি প্রভৃতি অনেক লোকের বাস থাকলেও গ্রামখানি বৈদ্য-প্রধান। গ্রামে চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্য থাকিলেও আমি যাঁহাদের কথা বলিতেছি, ইদানীং তাঁহারা কেহ-ই জাতি-ব্যবসায় করিতেন না। সকলেরই কিছু জমী-জমা ও তেজারতী ছিল। আর 'বড় বাড়ী' 'ছোট বাড়ী' 'উত্তরের বাড়ী' ও 'পূবের বাড়ী'র মালিকেরা রীতিমত জমীদার ছিলেন। বড় বাড়ী ও ছোট বাড়ীর বাবুরা রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, আর উত্তরের ও পূবের বাড়ীর কর্ত্তারা সেনে-ই সন্তুষ্ট ছিলেন। বৈদ্যরা সকলেই শক্তি-উপাসক, বামাচারী কৌল; রায়-বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ও-অঞ্চলে একটা কথা প্রচলিত আছে, এবং পাবনা জেলার তখনকার লোকে রায় মহাশয়দিগের বাটীর কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাদের দৈবানুগ্রহ লাভ ও অলৌকিক শক্তির অনেক গল্প করিত। সকল বাড়ীতেই দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা হইত, রায়েদের বড় বাড়ীর ধুমধাম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মহানৈবেদ্যে চাউলের পরিমাণ দুই মণ, নৈবেদ্যের শিরোভাগস্থিত আগ-মণ্ডাটির ওজন প্রায় দশ সের; অন্যান্য উপকরণও তদুপযুক্ত। মোটা দড়ীর শিকায় নৈবেদ্যখানি বসাইয়া, শিকাটি একটি বাঁশের মাঝে ঝুলাইয়া ছয় জন জোয়ান বেহারা বাঁশের দুই দিকে কাঁধ দিয়া ঐ নৈবেদ্য পূজান্তে রায় মহাশয়দের গুরু-বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিত। বলিদানের জন্য সরকারী বরাদ্দ ছিল, পঞ্চান্নটি ছাগ ও পাঁচটি মহিষ—এ সওয়ায় বৎসরের মধ্যে বাড়ীর লোকের পীড়ারোগ্যে ও মোকদ্দমা জিতের মানত-স্বরূপ আর দশ বারোটি ছাগও ঐ দিন মুক্তি-পথের পথিক হইত; গ্রামের লোকের মানত হিসাবেও প্রতি বৎসর পনেরো ষোলটি ছাগ হাড়কাটের সাহায্যে হাঁড়ি-লোক প্রাপ্ত হইত। পূজার সময় প্রতিমার সম্মুখে দুইদিকে বারোটি করিয়া চব্বিশটি ডাব রক্ষিত হইত। ডাবগুলির মধ্যে অর্দ্ধেক তাহাদের নিজের জল, আর অর্দ্ধেক কারণ-বারি। কর্ত্তারা প্রত্যহ-ই কারণ করিয়া উপাসনা করিতেন, বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে, অনেক উপাসক মিলিত হইয়া কারণের মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দিতেন; আর দুর্গোৎসব ও শ্যামা-পূজার সময় কারণের ঢেউ উঠিত। ছেলেমেয়েদের-ও সে সময় কারণপাত্রে আঙ্গুল ডুবাইয়া জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিতে, নিদেন কপালে-ও টিপ করিয়া পরিতে হইত।

দেবী-পক্ষারম্ভে বোধনের দিন হইতে কারণ পান ও আগমনী গানের ঘটা আরম্ভ। সকলেই পান করিতে ও গান গাহিতে পারিতেন। বাটীর কর্ত্তা ও অন্যান্য বয়স্ক পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া, চাকর-বাকর, খানসামা, সর্দ্দার, পাইক, নগদী, ভুঁইমালী, ঢাকী, ঢুলী সকলেই কারণপানে ও ভক্তিভাবে আনন্দে উন্মাদ হইত।

গুরুদেবের নামেই পূজার সঙ্কল্প ইহাঁদের কুলপ্রথা, সুতরাং দেবীকে বরাবর অন্নভোগ দেওয়া হইত এবং ভয়, ভক্তি, খাতির বা লোভে ব্রাহ্মণাদি প্রায় সকলেই জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ইহাঁদের বাড়ী প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন; বিশেষ অত পরিমাণ মহাপ্রসাদ তখনকার কালে সর্ব্বদা সকলের

ভাগ্যে জুটিত না; কর্ত্তার হুকুম ছিল যে এমন বড় বড় পাঁঠা কিনে আন্‌বি যেন তার পিঠে চড়ে বাড়ী আস্‌তে পারিস্। সে পাঁঠার লোভ পরিত্যাগ করা অনেক চাটুয্যে চক্রবর্ত্তী গাঙ্গুলী লাহিড়ী মহাশয়দের পক্ষে-ও দুষ্কর হইয়া উঠিত।

সে রকম ভূরি-ভোজন এখন আর দেখাই যায় না; সেই সদর হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ পঞ্চাশ খানা গ্রাম পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ, সেই অভ্যর্থনা আপ্যায়ন, সেই দীয়তাং ভুজ্যতাং। তখন কয়েকটি পূজাবাড়ী ভিন্ন গ্রামের অন্যান্য সকল বাড়ীতেই তিন দিন উনুন জ্বলিত না।

ঐশ্বর্য্যাভিমানে ও জাতিগর্ব্বে রায় মহাশয়রা সকল সময়ে বড় যার তার সঙ্গে মিশিতেন না, মাথাটা সতত যেন একটু উঁচু করিয়া থাকিতেন, কিন্তু এ তিন দিন অন্য ভাব, এ তিন দিন গলবস্ত্র, জোড়-হস্ত, প্রতিমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি, গুরু-পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি, নিমন্ত্রিত অভ্যাগত অতিথি ভিখারীদিগের সম্মুখেও কৃতাঞ্জলি। আমাদের জাতিভেদ আছে, কিন্তু সে জাতিভেদ পাতের, আঁতের নয়, এক পংক্তিতে আহার করিতে আমাদের আপত্তি, কিন্তু সর্ব্বজাতিকে অন্তরঙ্গ করা আমাদের প্রকৃতি। তাই রায় মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণে দুলে কাওরা হাড়ী বাগ্‌দী সকলেই নিমন্ত্রিত, সকলেই প্রসাদ পাইতে আসিত এবং শুভ্রশির তপ্তকান্তি বড় রায় মহাশয় নিজে জোড় হস্ত করিয়া তাহাদিগকে বলিতেন, "বাবা তোদের বাড়ী তোদের ঘর এ কয় দিন নিজের বাড়ীতে গিয়ে যদি কেউ কিছু খাবি, তা হ'লে এ জন্মে আর তোদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি থাকবে না।"

পূজার তিন রাত্রেই যাত্রা হইত; এক যায়গায় অধিক ভিড় হইবে বলিয়া মণ্ডপের সম্মুখে অঙ্গনে এক দলের গাহনা চলিত আর বাহিরে নারিকেলবাগানের পার্শ্বে চালা বাঁধিয়া আর এক দলের গাহনা বসিত। যাত্রা শুনিতে কত লোক যে জমায়েত হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; সদর হইতে বড় বড় মহাজনেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন, উকীল মোক্তার ডেপুটী মুন্সেফ এমন কি জজ কালেক্টার ডাক্তার সাহেব ও পুলিস সাহেবরাও আসিয়া আমোদ করিতেন।

নবমী পূজার দিন ছাগ-মহিষরক্তে অঙ্গন প্লাবিত হইয়া যাইত, অধিক মাত্রায় 'কারণ' পান করিয়া সকলে আনন্দে মত্ত হইয়া উঠানে গড়াগড়ি দিতেন এবং রক্ত মাখিয়া কাদা-মাটী করিতেন। রক্তবর্ণ চক্ষু, রক্তসিক্ত বস্ত্র, রক্তাক্তদেহে রণ-চণ্ড মূর্ত্তিতে গভীরনাদে দুর্গানাম গাহিতে গাহিতে সকলে নদীতে স্নান করিতে যাইতেন; স্নানান্তে যেন একটু অবসাদ আসিত। আজ শেষ পূজা, তাই সকলেরই মন যেন একটু মরা মরা, কিন্তু যেই ভোজনের পাত পড়িত, পরিবেশনের সময় আসিত, অমনি আবার সেই আগেকার উৎসাহ, আগেকার আগ্রহ, আগেকার আনন্দ।

বিজয়ার প্রাতে যাত্রা ভাঙ্গার পর বাড়ী যেন একটু নিব' নিব', সব যেন কেমন একটু মলিন মলিন, মা'র মুখখানিও যেন একটু মলিন। যাত্রাওয়ালারা পালা সাঙ্গ করিয়া শেষ বিজয়া গান গাহিয়াছে;—

"নবমীর নিশি বুঝি হ'ল অবসান;
আজি কেন হেরি মা তোর মলিন বয়ান॥"

অপরাহ্ণে নিরঞ্জনের ধুমধাম। মণ্ডপ হইতে প্রতিমা উঠানে নামান হইয়াছে—সদর দরজা বন্ধ, অন্তঃপুরিকাগণ বিদায়ের পূর্ব্বে দেবীকে বরণ করিতেছেন, ঢাকঢোলে বরণের বাজনা বাজিতেছে। বাটীর সম্মুখস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে পাইকেরা লাঠি খেলিতেছে, সেই লাঠি খেলায় অনেক ভদ্রলোক যোগ দিয়াছেন; বাড়ীর ছোট বাবু একজন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়, তিনি বুড়া হীরু সর্দ্দারের সাকরেদ এবং মেজ রায় মহাশয় স্বয়ং তাঁহাকে অনেক তাক-তোক প্যাঁচ বাতলাইয়া দিয়াছেন; আর এক পাকা খেলোয়াড় ছিলেন পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সেজ ভ্রাতা শম্ভু ঠাকুর। সে লাঠি খেলায় কি ধুম, কি উৎসাহ, কি মত্ততা, কি আনন্দ! তিন চার জন পাকের সঙ্গে লাঠি খেলার পর ছোট বাবু বাটীর পুরাতন ব্রজবাসী অযোধ্যা মিশিরের সঙ্গে তরোয়াল খেলিতেন। সেই মেজ রায় মহাশয়, সেই ছোট বাবু, সেই শম্ভু ঠাকুরের বংশদুলালরা এখনও বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু বোধ হয় সর্ত্তমান কলা চটকাইতেও তাঁহাদের আঙ্গুলে খিল ধরে।

বাজনা বাজাইতে বাজাইতে, লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, নৃত্য করিতে করিতে, "জয় মা, জয় মা" বলিতে বলিতে প্রতিমা নদীতীরে নীত হইত, সেখানে গ্রামের আরো অনেক প্রতিমা আনা হইত; বাদ্যভাণ্ড লোকজন লইয়া যে যার প্রতিমা নৌকায় উঠাইতেন, নদীবক্ষে ভাসমান নৌকাশ্রেণীর

উপর সেই সকল সুসজ্জিত প্রতিমার প্রোজ্জ্বল দৈবশ্রী ভক্ত-বক্ষ ভাবের বন্যায় প্লাবিত করিয়া দিত। নিরঞ্জনান্তে ঢোলে যেন রোদনের রোল তুলিয়া শানাইয়ের করুণ সুরে সঙ্গত করিতে করিতে বাটীতে প্রত্যাগমন, অলক্তরসে বিল্বপত্রে দুর্গানাম লিখন, শান্তিজল গ্রহণ, পরে পরস্পরে প্রণাম, নমস্কার আলিঙ্গন। আঃ! কি মধুর সেই কোলাকুলি! হৃদয়ের কত তিক্ত রস সেই মুহূর্ত্তে মুছিয়া যাইত, কত বিবাদ-বিসংবাদ, মামলা মোকদ্দমা, লাঠালাঠি, মারামারি বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দিয়া বাঙ্গালী যেন শান্তির কাঙ্গালী হইয়া সেই শুভক্ষণে একে ওকে সকলকে বুকে টানিয়া লইয়া জড়াইয়া ধরিত। . . .

রায় মহাশয়দের বাড়ীর সেকালের পূজার গল্প এখনও অনেক যায়গায় চলে। এখন-ও তাঁদের ভিটায় পূজা হয়, কিন্তু সে ধুমধামও নাই—সে আমোদও নাই, আর মণ্ডপে সেই প্রতিমার শোভাও নাই। অনেক দিন হইতে ঘটস্থাপনা করিয়া-ই পূজা চলিতেছে, কেন ঘটে পূজা হইতেছে, তাহার কথা একটু পরে বলিতেছি, আপাততঃ একটা মজার কথা বলি।

বোধ হয় বলিয়াছি যে, নবমীর পূজার দিন-ই সর্ব্বাপেক্ষা ধুমধাম বেশী, সেই দিনকার বায়না খুব উঁচুদরের অধিকারীরই থাকিত, ঐ দিনই সদর হইতে ইংরাজ-বাঙ্গালী হাকিমেরা এবং বড় বড় উকীল মোক্তার সেরেস্তাদার পেষকার নাজীর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসরে উপস্থিত থাকিতেন। একবার নবমী পূজার রাত্রে কলিকাতায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ কোন অধিকারীর দল নলদময়ন্তীর পালা গান করিবে। মণ্ডপের সম্মুখে উঠানে আসর হইয়াছে, সামিয়ানার নীচে সব ঝাড় ঝুলান, চারিদিকে থামে থামে দেয়ালগিরি। আজ আর তেলের আলো নাই, সব মোমবাতির ব্যবস্থা; দালানের সামনের রকে ও তিনদিকের বারান্দায় অভ্যাগত নিমন্ত্রিতগণ বসিয়াছেন, বাড়ীর ও পল্লীর ছেলেরা কেহ বা জরি-মখমলের পোষাক পরিয়া, কেহ বা কোমরে কোরমাথান কাপড় জড়াইয়া গায়ে ছিটের জামা আঁটিয়া গান-আরম্ভমাত্র-ই আসরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সং আসিলে জাগিয়া উঠিবে। উঠানের একপাশে কয়েকখানি কেদারা পাতা, তাহাতে জজ কালেক্টার পুলিস সাহেব ডাক্তার সাহেব প্রভৃতি রাজপুরুষেরা বসিয়া আছেন, তাঁহাদেরও পান আহারের বন্দোবস্ত ছিল, সুতরাং সকলের-ই হাস্যবদন। যাত্রা খুব জমিয়া গিয়াছে, এক দল ছোকরা রঙ্গিন পোষাক পরিয়া জরির তাজ মাথায় দিয়া হাত নাড়িয়া গান গাহিতেছে, দুই দিকে দুই জন মশালচি ছোকরাদের মুখের সামনে দুই দিকে মশাল ধরিয়া আছে; এখন যেমন থিয়েটারে অভিনয়কালে বড় বড় অভিনেতার মুখের উপর 'লাইম লাইট' নিক্ষেপ করে, সেকালে সেইরূপ যাত্রার গায়ক-দিকের মুখের কাছে মশাল ধরা হইত। ছোকরারা গাহিতেছে :—

"হয়ে আমারও স্বপক্ষ যাও পক্ষরাজ বল গে রাজায়।"

চারিদিক হইতে রুমালে বাঁধা সিকি, আধুলি, টাকা প্যালা পড়িতেছে, বাহবা বাহবা! বেশ বেশ! শব্দে অট্টালিকা মুখরিত, সাহেবরাও পেলা দিতেছেন, কালেক্টার সাহেব-ও মাঝে মাঝে এক এক টাকা দিতেছেন; কিন্তু তাঁর মুখভাবে যেন কতকটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা যাইতেছে। প্রথমে আসিয়াই যাত্রা শুনিবার জন্য তিনি যেরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন যেন ক্রমেই তাহা নিবিয়া যাইতেছে। সকল দর্শকের দৃষ্টি-ই কালেক্টার সাহেবের মুখের উপর স্থাপিত, তিনি খুসী হইলে কর্ম্মকর্ত্তার ক্রিয়া সার্থক, জেলাস্থ সকল লোক-ই তাঁহার খুসীতে খুসী; কিন্তু তাঁহার মুখে হাসি না দেখিয়া কি বড় রায় মহাশয় কি বাড়ীর বাবুরা কি ডেপুটী উকিল মোক্তার ও অন্যান্য লোক সকলেই যেন মনমরা হইয়া যাইতেছেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, তিনি যখন জয়েন্টরূপে কুষ্টিয়ার সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন সেখানে একবার বারওয়ারী পূজার নিমন্ত্রিত হইয়া নিমাই দাসের 'রাবণ-বধ' যাত্রা শুনিতে যান। সে যাত্রায় তিনি দশমুণ্ড রাবণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হন, মাথার উপর একখানি থালা রাখিয়া তাহার উপর একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ সমেত পিলসুজ বসাইয়া ঝোড়োর অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া খুব তারিফ করেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা খুসী হন—হাসিয়া লুটাপুটী খান ও প্যালা বৃষ্টি করিতে থাকেন সেই দলের হনুমানের লেজ ও লম্ফ-ঝম্প দেখিয়া। পাবনার পুরা কালেক্টার হইয়া তিনি প্রায় সাত আট মাস আসিয়াছেন এবং ক্লাবে শুনিয়াছিলেন যে, রায়েদের বাড়ী পূজার সময় যাত্রা শুনিবার জন্য সাহেবদের প্রতি বৎসর নিমন্ত্রণ হয়, সেই অবধি তিনি হনুমান দেখিবার আশায় মনে মনে বড়

আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং হনুকে বক্‌সিস দিবার জন্য আজ অনেকগুলি টাকা পকেটে করিয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু দেড় ঘণ্টার উপর গাহনা চলিতেছে, এখনও হনু আসিল না দেখিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মেজবাবু আসিয়া চেয়ারের পাশে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন ও হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "হুজুর! হাউ যাত্রা, ইজ্ ইট প্লিজ ইওর লর্ডশিপ?"

সাহেব বলিলেন, "ওয়েল, ওয়েল, হোয়ার ইজ হনু?"

মেজবাবু কথার ভাবার্থটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময়ে এক জন পোষাকপরা খানসামা একখানি বড় রূপার থালায় করিয়া গুটিকতক ফরাসী 'কারণ'-পূর্ণ কাচের গ্লাস আনিয়া সাহেবদের সম্মুখে ধরিল, সকলেই এক এক চুমুক পান করিলেন, কালেক্টার সাহেব যেন একটু বেশী করিয়াই গলায় ঢালিয়া দিলেন, তখন আবার গান শোনা হাসি-গল্প চলিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই কালেক্টার সাহেব জোর গলায় বলিলেন, "বন্ধ্ করো, বন্ধ্ করো।" মফঃস্বলে কালেক্টার সাহেবের হুকুমে প্রসূতির প্রসব-বেদনা বন্ধ হয়, এ ত যাত্রা; একটা ছোকরা ডান কানে হাত দিয়া তান ধরিয়াছিল, "দময়ন্তী—ই—ই—ঈ—ঈ—ঈ—" সে তানে দীর্ঘ ঈ তুলিতে তুলিতে নিজে হ্রস্ব উ হইয়া বসিয়া পড়িল। গাওনা বন্ধ হইল, সকলেই স্তম্ভিত—শঙ্কিত! ভূধর-ডেপুটী তাড়াতাড়ি দালান হইতে নামিয়া সাহেবকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অপরাধ হয়েছে?" সাহেব বলিলেন, "হনু কাঁহা—হনু ল্যাও।"

ডেপুটী বলিলেন, "এ নল-দময়ন্তীর পালা, ইহাতে হনু নাই।"

সাহেব বলিলেন, "বাবু, তোম কুচ্ নেই জান্‌তা। নাল-ডাইনই হাম নেই মাংতা—হনু ল্যাও, হনু বেগার যাত্রা হোটা? হনু ল্যাও।"

ডেপুটী বাবু তখন রায় মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, "মশাই, সাহেব ত বড় চটে গেছেন, হনুমান না হ'লে ওঁর কোন মতেই চলবে না।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "উপায়? এমন জান্‌লে রাম-রাবণের পালা যারা গায় তাদেরই আনাতুম, এখন কি করা যায়?"

ডেপুটী মুন্সেফ উকীল প্রভৃতি পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিছুই স্থির হয় না। যাত্রা বন্ধ; সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় দোলগোবিন্দ মোক্তার পরামর্শ দিলেন যে, "এর আর ভাব্‌চেন কি, বলুন না অধিকারীকে ডেকে একটা যাকে হোক্ ল্যাজ ট্যাজ পরিয়ে মুখে একটা মুখোস দিয়ে আনুক, খানিকটা হুপ্ হাপ্ ক'রে লাফিয়ে টাপিয়ে চ'লে যাবে, সাহেব-ও খুসী হবে—সব দিক্ বজায়-ও থাক্‌বে।"

অধিকারীকে ডাকা হইল, তিনি বলিলেন, "এত রাত্রে হনুমান পাই কোথা?" কর্ত্তা বলিলেন, "যাকে হোক্ একটাকে দাও না সাজিয়ে, আমি না হয় তাকে আলাদা কিছু বখ্‌শিস্ দেব, বুঝছ না,—কালেক্টার সাহেবের হুকুম।"

অধিকারী বলিল, "ল্যাজ না হয় একটা দড়ী-টড়ী দিয়ে বা কাপড় পাকিয়ে ক'রে দিলুম। কিন্তু মুখোস পাই কোথা? আমাদের পালায় ত মুখোসের দরকার হয় না।"

মোক্তার দোলগোবিন্দ বলিলেন, "আরে, টিকে টিকে, মুখে টিকের গুঁড়ো মাখিয়ে তার ওপর চুণ-সিঁদুরের গোটাকতক ফোঁটা দাও, দিব্যি হনুমান হবে।"

কি করে, যে মুটেটা যাত্রাওয়ালাদের সাজের ঝাঁকা মাথায় ক'রে এনেছিল, অধিকারী অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকেই হনুমান সাজিয়ে দিলে; এ বাড়ীতে যাত্রার দলের মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু কারণ প্রসাদ মুখে দিয়াছিল, মুটেটিও বঞ্চিত হয় নাই; সুতরাং সে নাচতে বসিয়া আর ঘোমটা টানিল না, হুপ-হাপ করিয়া লম্ফে ঝম্পে বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল ও মুখ খিঁচাইতে লাগিল; কালেক্টার সাহেব আহ্লাদে আটখানা, টাকার ওপর টাকা প্যালা দিতে লাগিলেন। হুজুর যখন খুসী হইয়া প্যালা দিতেছেন, তখন বাড়ীর কর্ত্তা ও বাবুদিগের-ও সঙ্গে সঙ্গে প্যালা দিতে হইল, দোতালায় চিকের ভিতর হইতে-ও উঠানে প্যালা পড়িতে লাগিল। সাহেব হাঁকিতে লাগিলেন, "আউর হনু, আউর হনু ল্যাও।" মোক্তার দোলগোবিন্দ বলিলেন, "অধিকারী, আর একটা হনুমান বের কর, সাহেব বলছেন।" তার পর আর একজন হনুমান সাজিয়া আসিল। সাহেব হাঁকিতে লাগিলেন, "আউর হনু, আউর হনু ল্যাও।" ক্রমে দুটো, তিনটে, পাঁচটা;——নল চাপকান খুলিয়া হনুমান সাজিল, দময়ন্তী সাড়ী ফেলিয়া ল্যাজ পরিল, নাচিয়েদের আর ঘুমুর খুলিতে অবসর হইল না, মুখে কালি মাখিয়া লাফাইতে

লাগিল—বেহালাওয়ালা বেহালা রাখিয়া, ঢুলী ঢোল রাখিয়া, জুড়ী ল্যাজ পরিয়া হনুমান হইল, আর সাহেবরা "ব্রাভো, ব্রাভো" করিতে লাগিল, আর চারিদিক্ হইতে প্যালা-বৃষ্টি হইতে লাগিল, শেষ অধিকারী নিজে হনুমান সাজিয়া উঠানের এক কোণে স্থিত একটা পিয়ারা গাছ হইতে এমন এক লাফ মারিল যে, একেবারে হুপ্ করিয়া পুলিস সাহেবের কোলে পড়িয়া গেল, কালেক্টার সাহেব তার হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন। কোথায় বা নলের বন-গমন, কোথায় বা দময়ন্তীর রোদন, কোথায় বা সেই গান—

"মহারাজা নল দময়ন্তী হারাল রাজ্য-ভ্রষ্ট হল—"

উঠানময় কেবল কালো মুখ দড়ির ল্যাজ আর হুপ্ হাপ।

সাহেবরা স্যাম্পেনের উপর ব্রাণ্ডি চাপাইয়াছেন, হনুমান-দলের লাফ দেখিয়া "পূর্ব্বকথা স্মরি" তাঁহারা-ও গ্যালপ আরম্ভ করিলেন; সাহেবদের নাচে আর আমাদের লাফে প্রভেদ বড় কম-ই, তাহার উপর দেশী বিলিতী কারণ আসরে রীতি মত চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় লম্ফ-রোগ সকলকেই আক্রমণ করিল—উঠানে কেবল লাফ। পঞ্চাশ পঞ্চান্নটা হনু লাফাইতেছে, হাতে হ্যাট তুলিয়া সাহেবরা লাফাইতেছেন, শামলা মাথায় ডেপুটী লাফাইতেছে, ভুঁড়ি ফুলাইয়া সদরালা লাফাইতেছে, হাসিবার চেষ্টা করিয়া মুন্সেফ লাফাইতেছে, সেরেস্তাদার পেস্কার নাজির মহাফেজ পেয়াদা আর্দ্দালী বাড়ীর কর্ত্তা বাবুরা পাক-সর্দ্দার খানসামা সবাই লাফাইতেছে আর ঢুলী ঢাকিরা বাজাইতে বাজাইতে উচ্চ-লম্ফে নৃত্য করিতেছে। ছেলেগুলি আঁতকে উঠিয়া যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল; লজ্জা অনেক মানা করিলে-ও স্ত্রীলোকের-ও ত একটা সহের সীমা আছে, কে সে মানা শোনে। চিকের কাঠির ফাঁক দিয়া বামাকণ্ঠের কলহাস্য প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত হইল। এ বাড়ীতে প্রায় ৭০ বৎসর পূজা হইয়া আসিতেছে, প্রতি বৎসর যাত্রা-ও হই-তেছে, কিন্তু এমন ডিমোক্র্যাটিক্ যাত্রা কখন-ও হয় নাই।

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সাহেবরা আমোদ শেষ করিয়া বিদায় হইলেন। সেক্হ্যাণ্ডের চোটে বড় রায় মহাশয়ের ডান কব্জীতে ব্যথা ধরিয়া গেল, যাইবার সময় কালেক্টার সাহেব বৃদ্ধকে বলিয়া গেলেন যে, তিনি তাঁহাকে মনে রাখিবেন। তখনও বোতলে মাল ছিল, সুতরাং দেশী হাকিম ও উকীল মোক্তারদের মধ্যে অনেকেই ভোর পর্য্যন্ত রায়েদের কৃতার্থ করিলেন।

এখনও বোধ হয় পাবনায় দু পাঁচ জন প্রাচীন লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা ইংরাজ-বাঙ্গালী-হনু-মিলনের এই আনন্দোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এবারকার রায়েদের বাড়ীর পূজার গল্প এক বৎসর ধরিয়া চলিল। পর বৎসর আবার পূজা। নদীপারে কুমারের বাড়ী, সেইখানে-ই প্রতিমা প্রস্তুত হইয়া রং দেওয়া ও সাজ পরানো হয়; ষষ্ঠীর দিন প্রাতে বাড়ীর কর্ত্তা, গুরুদেব পুরোহিত আত্মীয়-স্বজন বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া পারে যান ও তথা হইতে নৌকায় উঠাইয়া প্রতিমা বাটীতে আনেন, ইহাই ইঁহাদের কুলপ্রথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রতিপদে বোধন আরম্ভ হইতেই কারণ চলিতে আরম্ভ হয়, যত দিন যায়, তত মাত্রা বাড়ে, পঞ্চমীর রাত্রে কেহ আর শয্যা গ্রহণ করেন নাই। ভোর অবধি আগমনী গান ও কারণ-পান চলিয়াছে; প্রাতে মুখপ্রক্ষালনাদির পরে আবার সকলে বীরাসনে বসিয়াছেন; গুরুদেবের পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, স্কন্ধে তদ্রূপ উত্তরীয়, গলদেশে বৃহৎ রুদ্রাক্ষের মালা, চক্ষু রক্তবর্ণ, দীর্ঘ কেশ দীর্ঘ-গোঁপ পাকান, তিনি শোধন করিয়া দিয়াছেন সকলে পাত্রের পর পাত্র গলাধঃকরণ করিতেছেন, এরূপে বেলা দশটা বাজিল; পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, আর সময় নাই; তখন ঝাঁ ঝাঁ গুড়্ গুড়্ ঝাঁ ঝাঁ গুড়্ গুড়্ গিজদা গিজোড়্ গিজদা গিজোড়্, তাক্ তাক্ সাঁই, তাক্ তাক্ সাঁই, ঢাক-ঢোল কাড়া নাগ্‌রা জগঝম্প কাঁসি বাঁশী বাজিয়া উঠিল, ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং ——ঢং- ঢং-ঢং কাঁসর ঘড়ী বাজিতে লাগিল; অন্দরে শঙ্খধ্বনি উঠিল:—

"গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী"

গাহিতে গহিতে সকলে প্রতিমা আনিতে যাত্রা করিলেন।

বাবুদের প্রতীক্ষায় প্রতিমাকার আপন বাটীর উঠানে একখানা আচ্ছাদন টাঙ্গাইয়া তাহার নীচে সতরঞ্চি মাদুরাদি পাতিয়া রাখিয়াছে। মৃৎ-শিল্পী জানিত যে জমিদারী সেরে-স্তায় ফর্দ্দ দাখিল করিয়া খাজাঞ্চি মহাশয়ের হাত হইতে প্রতিমা ও অন্যান্য কুমার, সজ্জার দাম দস্তুরি আদি বাদ

দিয়া আদায় করিতে দু' বৎসর তিন বৎসর লাগিতে পারে বটে কিন্তু আজিকার পাওনাতেই তাহার যথেষ্ট লাভ। আজ তাহার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাঙারি ও হাঁড়ি ভরিয়া রীতিমত সিধা আসিবে; চাউল তিন চার রকম দাইল রান্নার মশলা তরকারী আনাজ লবণ ঘৃত তৈল চিনি মণ্ডা দধি মৎস্য তাহার নিজের ও পরিবারস্থ সকলের কাপড় আর নগদ আটটি টাকা। সে আরও জানিত যে বংশানুগত প্রথামত এই উঠানে আজ একটি ছোটখাট মজলিস বসিবে, বাজনা বাজিবে, আগমনী গান হইবে, কারণও চলিবে এবং সেও তাহার প্রসাদ পাইবে। একবার সে তুলিটি লইয়া প্রতিমার চক্ষের নিম্ন রেখাটি আরও পরিষ্কার করিয়া দিল, মৃত্তিকানির্ম্মিত অলঙ্কারগুলির উপর যে সোনার পাতলা পাত বসাইয়াছিল, শুভ্র বস্ত্রখণ্ডের গোপ দিয়া দিয়া তাহা ভাল করিয়া বসাইয়া দিল এবং সেই সময়ে তাহার কর্ণে ঢোল-ঢক্কার রোল প্রবেশ করিয়া তাম্রকূট-ধূম কৃষ্ণ ওষ্ঠাধরে আশা ও আনন্দের হাস্য বিকসিত করিয়া দিল; বাজনার শব্দ অতিক্রম করিয়া "মা" "মা" রব করিতে করিতে রায়-বাড়ার দল শিল্পীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাকার সকলকে প্রণাম করিল।

"কেমন ভগবান, সব মঙ্গল ত?" বলিয়া কর্ত্তা তাহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ জোড়হস্তে উত্তর করিল, "আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে ছেলে-পিলে নিয়ে এক রকম সব বেঁচে আছি।" চালার ভিতর গিয়া সকলে প্রতিমা দেখিতে লাগিলেন এবং বাঃ! বাঃ! চমৎকার! চমৎকার! বলিয়া উঠিলেন। অম্বিকা গুপ্ত বলিলেন, "দেখেছ এখনই যেন মা'র মুখখানি হাসছে!" নিতাই দত্ত বলিলেন, "আরে এ ত আর ছোট-বাড়ীর মতন বিবিয়ানা মুখ নয়, আমাদের বড়-বাড়ীর প্রতিমার চিরকালই দেবীমুখ হয়ে থাকে।" বনমালী চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ওহে বাপু ভক্তি ভক্তি, ভক্তি চাই, বড়-বাড়ীর ভক্তি কত! সেই ভক্তিতে ভগবানের হাত দিয়ে ভগবান্ স্বয়ংই যে এই শক্তিমূর্ত্তি গড়ে দিয়েছেন;—

(সুরে) "দশ ভুজ ধরি আহা মরি মরি বিহরে সিংহপরে
অনুপমা কার বামা এল গিরিরাজ আজ ঘরে।"

কর্ত্তার দু-নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। গুরুদেবের রক্তচক্ষুও ভিজিয়া উঠিল, সকলে গিয়া উঠানে উপবিষ্ট হইলেন; ইঙ্গিতমাত্র একটি ভৃত্য একটি ছোট কলসী সেইখানে রক্ষা করিল, কর্ত্তা করজোড়ে গুরুদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্রভু, নিবেদন ক'রে দিতে আজ্ঞা হোক্।" গুরুদেব গম্ভীরভাবে একটি নারিকেলের মালায় কারণ ঢালিয়া ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিলেন এবং সেই নিবেদিত সুধা কিঞ্চিৎ নিজে পান করিয়া প্রসাদ কর্ত্তার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন; তার পর সকলেই প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। ভগবান অন্দরে সিধা পৌঁছাইয়া দিয়া ছাঁচতলার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, নিতাই দত্ত বলিলেন, "আরে পাল মশাই, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এস প্রসাদ নাও, আজ যে তুমিই যজ্ঞেশ্বর।" পাল মশাই একটি কাল পাথরের বাটি আগেই জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল, কর্ত্তা তাতে একেবারে প্রায় আধপোয়া মাল ঢালিয়া দিলেন। পাল আবার গুরুদেবের ও কর্ত্তার পদধূলি গ্রহণ করিয়া একচুমুকে কারণটুকু ফলান্বেষণের জন্য উদরমধ্যে প্রেরণ করিল। বেড়ার বাহিরে গাবতলায় লোক-লস্কর ও বাজুন্দরেরা আসর জমাইয়াছে, কর্ত্তার হুকুমে তাহারাও একটা কলসী পাইয়াছে। আজ আনন্দের দিনে আনন্দময়ীর সম্মুখে আনন্দের মেলা; তখন বাঙ্গালী অন্যকে আনন্দিত করিয়া নিজে আনন্দিত হইতে জানিত, অন্যের সুখ দেখিয়া আপনি সুখী হইতে পারিত, অপরকে হাসিতে ভাসাইয়া আপনি হাসিতে সক্ষম হইত। আজ জমিদার প্রজা ভেদ নাই, ইতর-ভদ্র ভেদ নাই, বাবু-বাজুন্দরে ভেদ নাই; সবাই জগন্মাতার সন্তান, জগন্মাতার চক্ষের সমক্ষে সবাই মানব, আজ আর অন্য পরিচয় নাই। দিনটা মেঘ্‌লা-মেঘ্‌লা ছিল, পানে গানে যে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে কাহারও হুঁস নাই। "ও দাদা, বেলা পুইয়ে এল, আজ কি তুমি নাবা খাবা না?" বলিয়া ভগবানের একটি ছোটনাতনী আসিয়া তাহাকে ডাকাডাকি করাতে বনমালী চক্রবর্ত্তীর হুঁস হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত—তাই ত, কালবেলা পড়্‌বে যে, চলুন মাকে নিয়ে ঘরে যাই।" আট জন দুলে একটু দুলতে দুলতে এসে বাঁশে বেঁধে প্রতিমা কাঁধে তুললে। আবার গিজ্‌দা গিজোড় গিজ্‌দা গিজোড় বাজাতে বাজাতে সকলে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া প্রতিমা নৌকার উপর রক্ষা করিল। দুইখানি নৌকা পাশাপাশি রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে প্রতিমা রক্ষিত, সেই

নৌকায় পুরোহিত মহাশয় উঠিলেন, তাঁহাকে একটু ধরিয়া তুলিতে হইয়াছিল, বাজুন্দরেরা ও অন্যান্য কতক লোক ঐ নৌকাতেই উঠিল, পার্শ্বস্থ পান্‌সিতে গুরুদেব, কর্ত্তা এবং নিকট আত্মীয়েরা উঠিলেন, আরও তিনখানি নৌকা বোঝাই হইয়া গেল। বলিয়াছি সে দিন মেঘলা রৌদ্র নাই বেলা তিনটার সময়ই যেন সন্ধ্যার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। নৌকা কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ কেমন গুরুদেবের ভাব আসিল। তিনি গাহিয়া ফেলিলেন :—

"মা হয়ে কেমন ক'রে তোরে দেব মা বিদায়।
(ওগো) পুরবাসী তোরা আসি মানা কর গো
উমা যেন নাহি যায়॥"

গুরুদেবের মুখে বিজয়া-গান শুনিয়া কর্ত্তা-ও তান ধরিলেন। ক্রমে কর্ত্তার পান্‌সীর গান শুনিয়া অন্যান্য নৌকার যাত্রীরা-ও বিজয়া গান ধরিল, ঢুলীর ঢোলে বাজনার বোল ফিরিয়া গেল। গুরু পুরোহিত কর্ত্তা আত্মীয় প্রতিবেশী লোক-লস্কর নিশানওয়ালা বাজুন্দরে দাঁড়ী-মাঝি সকলেই আকণ্ঠ কারণ পান করিয়াছে, তাহার উপর স্বয়ং গুরুদেব বিষাদের গান ধরাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং ষষ্ঠীতে বিজয়া অনুভব নিতান্ত অকারণ নয়। নৌকাগুলি যখন প্রায় মাঝ দরিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে, তখন গুরুদেব নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গলুয়ের নিকট দাঁড়াইলেন এবং জোড়করে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা চল্‌লি মা! এতই কি তোর শিবের উপর টান, তিনটে দিন বই রইলিনি? যা বেটী তবে যা, আবার আসিস্‌!" কর্ত্তাও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা গো, আমার মণ্ডপ যে শূন্য হয়ে গেল মা! দেখিস্‌ মা ভুলিস্‌নি অধম সন্তানকে আস্‌ছে বছর যেন আবার দেখা দিস্‌!" সকল নৌকাতেই করুণস্বরে মা মা রব স্ফুরিত হইতে লাগিল, সানাই বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতে লাগিল, ঢোলে-ও করুণ রোল, পুরোহিত মহাশয় একটু আচ্ছন্ন মতন হইয়াছিলেন বিজয়ার বাদ্যে তন্দ্রামুক্ত হইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, নারাণ মাঝি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "অনুমতি হয় ত নৌকা সরিয়ে দি।" কর্ত্তা তখন ফোঁপাইতেছিলেন, মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, বনমালী চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "দাও বাবা নারাণ দাও, মাকে নিরঞ্জন কর, মেয়ে হলে ঐ জ্বালা চিরকাল-ই আছে।" দুইখানি নৌকা দুই পাশে সরিতে লাগিল, সুগঠিতা সুসজ্জিতা অপূজিতা প্রতিমা শুধু ভক্তদলের ভাষায় কথিত ভক্তির অঞ্জলি লইয়া ধীরে ধীরে নদীগর্ভে নিমজ্জিতা হইলেন। নৌকা নিজ গ্রামের ঘাটে ভিড়িল, সকলেই বিষণ্ণমুখ অবনত-মস্তক চক্ষে জল যেন অবসাদে দাদাগো দাদাগো বাজাইতে বাজাইতে দলবল বাটীতে ফিরিল।

প্রতিমা আসিয়াছে মনে করিয়া অন্তঃপুরে অঙ্গনারা শঙ্খ ধ্বনি করিলেন, মণ্ডপের পাশে চণ্ডীর ঘরে গৃহিণীরা উপস্থিত ছিলেন, ছেলে-মেয়ের দল উঠানে জড় হইয়া "ঠাকুর কৈ ঠাকুর কৈ" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কর্ত্তা একটি ছোট নাতনীকে কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "আয় দিদি, আগে তোর সঙ্গেই কোলাকুলি করি।" নাতনী বলিল, "ও দাদামশাই সে আজ কেন, সে ত শুক্রবার। ঠাকুর কত দূরে?" কর্ত্তা বলিলেন, "আর ভাই এ বছরের মত মাকে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম, বেঁচে থাকি—আবার আর বছর আনব। ভট্‌চায্যি মশাই গেলেন কোথায়, শান্তি জল দিন কই আলতা বিল্বপত্তর টত্তর জোগাড় করে রাখা হয়নি?" এই রকম সব কথা, সবার কাঁদ কাঁদ মুখ আর বিসর্জ্জনের বাজনা—মেয়েরা ত অবাক্‌! একটি সতর আঠার বছরের জ্ঞাতিপুত্র বাটীতে থাকিত, তাঁহার চৈতন্য হারাইবার কোন কারণ ঘটে নাই, সে এ কে তাকে পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসল কথাটা বুঝিয়া লইল এবং অন্দরে গিয়া সংবাদ দিল যে নদীর মাঝখান অবধি প্রতিমা আনিয়া তাঁহারা ষষ্ঠীতে দশমী ভ্রমে প্রতিমার বিজয়া করিয়া আসিয়াছেন। মহা-অমঙ্গলের আশঙ্কায় অন্তঃপুরে কান্নাহাটি পড়িয়া গেল; ইতিমধ্যে দুর্গানাম লিখিবার জন্য বিল্বপত্রাদি হাতের কাছে না পাইয়া এবং প্রতিমা বসাইবার জন্য যে আল্‌পনা দেওয়া চৌকী রক্ষিত ছিল তাহারি উপর ভীমকায় গুরুদেবকে মুদিতচক্ষে শায়িত দেখিয়া কর্ত্তা-ও মণ্ডপের মধ্যে শয়ন করিলেন। অবসাদ তখন সকলেরই শরীরে আসিয়াছে,—যে যেখানে পাইল, শয়ন করিল। নিতাই দত্ত রকে শানাইওয়ালা সিঁড়িতে চক্রবর্ত্তী উঠানে—সব ঘুম; ঢাকী ঢাকে মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে, ঢুলী ঢোলকে কোলবালিস করেছে। নিশানওয়ালা ছোঁড়ারা ঈশান কোণে জড় হয়ে শুয়ে পড়েছে সব ঘুম—সব নিঝুম!

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের পর কর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ হইল;

ক্রমে দুই এক জন ক'রে সকলেই জেগে উঠ্‌লেন, গৃহিণী চণ্ডীর ঘরের দরোজার ফাঁক থেকে কর্ত্তার দিকে চেয়ে বল্লেন, "কি সর্ব্বনাশ ক'রে এলে?" অপ্রস্তুত কর্ত্তা তখন প্রকৃতিস্থ ভবনদীর কর্ণধার গুরুদেবের মুখপানে চাহিলেন; প্রভু বলিলেন,—অন্দরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আপনারা ভাব্‌বেন না, মার ইচ্ছা হয়েছে, এখন থেকে ঘটে পূজা নেবেন।" এর উপর আর কথা নাই। সেই অবধি বড় রায়দের বাড়ী আর প্রতিমা আনা হয় না, ধূমধাম বলি-দান খাওয়া-দাওয়া সবই আছে, তবে পূজা হয় ঘটস্থাপনা করিয়া।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

শারদা-মঙ্গল।

সাগর-ছেঁচা রতন আমার জন্মভূমি বঙ্গ।
নদীহারে হৃদি ভরা নরম মাটীর অঙ্গ॥
সব্‌জে যেন উব্‌জে ওঠে ক্ষেতে মাঠে বনে।
আস্য সদা হাস্য-পূর্ণ স্বর্ণ-ধান্য ধনে॥
বার মাসে তের পার্ব্বণ গর্ব্বের কথা তোমার।
খর্ব্ব তুমি কার কাছে মা চর্ব্বে ভরা ধাঁমার॥
দাঁড়ালে বর্ষা শেষে হরিৎ বেশে স্নান ক'রে মা উঠে।
আস্‌তে শরৎ সুহৃৎ যেন পড়লো তোমার ফুটে॥
পথের পাশে শুভ্রকেশে কেশের হাসির ঘটা।
রাজার শিরে পাখীর পরে ঝলকে যেন ছটা॥
জলে এখন কমল দোলে স্থলে তারি নকল।
শিউলি সুখে ছড়িয়ে প'ড়ে ধরায় পরায় বাকল॥
হেসে কুটি-কুটি দোবুঁটি দল আলো করে গাছ।
রঙ্গভরে পতঙ্গদের ফুলের উপর নাচ॥
বিকেল বেলা মেঘের খেলা কিবা রঙের মেলা নভে।
সেই আকাশে নিশায় ভাসে চক্‌চকে চাঁদ ধব-ধবে॥
জিরেন পালার মাঝে এখন চাষার নিড়েন কাজ।
এ সময়ে বুন্‌লে কাপড় ঢাকবে বৌয়ের লাজ॥
কাপাস গাছে ফুল ধরেছে ভর্‌বে তুলোয় ফল।
তাই নে সতী কাটবে সুতো ঘুরিয়ে চরকা কল॥
সব্‌জী বাগে বীজের চারায় লক্‌লকে সব পাতা।
ফলের মধ্যে আম বাতাবি শসা কলা আতা॥
এই শরতে হয় শারদার বরদ করে বঙ্গে আগমন।
হয় শরতে রঙ্গরসে বঙ্গবাসী আনন্দে মগন॥

অনুপমা সে প্রতিমা হররমা সিংহপরে।
সঙ্গে কুমার গজপতি রমা বাণী শোভা করে॥
পূজা পান দশভুজা বাজনা বাজায় বাজুন্দরে।
মন্ত্র ছন্দে পুষ্প গন্ধে সবাই বন্দে সুন্দরে॥
সাজায় বাজার মজার মোহে হাজার হাজার খদ্দেরে।
ভদ্দর লোকের দেখছি ব্যাভার আদর এবার খদ্দরে॥
চরকা-কাটা পূত সুতো তাঁতির তাঁতে বোনা।
পরের হীরে উনুনের থার নিজের রাং-ও সোনা॥
তিক্তহাটের মুক্তকেশী খিড়কির দোকোর কাছে।
দাম নেই তার আম যা ফলে পুকুরপাড়ের গাছে॥
মায়ের রান্না নিমঝোলেতে পাই যে সুধার তার।
কোন্ হোটেলের পাঁঠার কালিয়া দাঁড়ায় কাছে তার॥
দাও মা শক্তি শক্তিরূপা দাও শুদ্ধা ভক্তি অন্তরে।
যেন ভিক্ষা করা শিক্ষা পেয়ে ভুলি না দীক্ষ-মন্তরে॥
দাও মা আনন্দ দাও মা আনন্দ দাও মা আনন্দ নন্দনে।
যেন ভাবি পোমেটম্ ঘায়ের মলম আদর করি চন্দনে॥
এই আশ্বিন এলে কস্মিন কালে প্রাচীন বঙ্গদেশ।
যেন পূজার রঙ্গে ব্যঙ্গ করে পরে না পরের বেশ॥
আজ এসেছেন আমার দুর্গা আমার লক্ষ্মী আমার সরস্বতী।
আমার গঙ্গাজলে পুষ্পদলে অঞ্জলি দে করবো পদে নতি॥
ভিক্ষা যদি করতে হয় করবো দাক্ষায়ণীর পাশে।
আমার অন্ন আমার বস্ত্র পাইবেন মা আমার ভূমির চাষে॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

কয়েকটি ভারতীয় পাখী।

শ্যামা।

আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বন্দী অবস্থায় আমরা ইহাকে দেখি এবং ইহার উচ্ছ্বসিত মধুর স্বর-লহরী শুনিয়া মুগ্ধ হই। কিন্তু স্বাধীন অবস্থায় ইহার আনন্দ-গান শুনিবার ভাগ্য আমাদের সহজে হয় না। কারণ, গ্রাম-প্রান্তে বা ছোট-খাট জঙ্গলে সে বাস করে না। ঘোর দুর্গম অরণ্যে, পার্ব্বত্য উপত্যকায় নির্ঝরিণীর কল্লোল-গীতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া সে জীবন অতিবাহিত করে। শ্যামা ভারতের শ্রেষ্ঠতম সুগায়ক পাখী।

শ্যামা

কালী-শ্যামা।

শ্যামার দেহে যে যে বর্ণ দেখা যায়, ইহার অঙ্গেও সেই সকল বর্ণের সমাবেশ আছে বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম কালী-শ্যামা। পুচ্ছটিকে সোজা আস্‌মানের দিকে তুলিয়া দিয়া যখন সে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া থাকে; তখন তাহার বক্ষোদেশের ঘন কৃষ্ণবর্ণ নজরে পড়ে। তাই বোধ হয়, শ্যামার সঙ্গে কাল সংজ্ঞা যুক্ত করিয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে। নিম্নবঙ্গে ইহাকে দেখা যায় না। মেদিনীপুর ও বীরভূমের পশ্চিম-প্রান্তে খুঁজিলে ইহার দেখা পাওয়া যাইতে পারে; পশ্চিম অঞ্চলই ইহার আবাসভূমি; হিমালয়ের নাতি-উচ্চ পর্ব্বত-মালার উপত্যকাতেও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এ পাখী জঙ্গল পছন্দ করে না, উন্মুক্ত প্রান্তরে যেখানে ভূখণ্ড প্রস্তরময়, সেই সব স্থানেই ইহা বিচরণ করে। দোয়েল যেমন আমাদের দেশে মনুষ্যালয়ের অতি নিকটে আগমন করে—কালী-শ্যামা সেইরূপ বিহার ও পশ্চিমাঞ্চলে লোকের গৃহসান্নিধ্যে থাকে; ঘরের দাওয়ায় ও চালের উপরও আসিয়া বসে। সুমিষ্ট শীষই ইহার কণ্ঠস্বর—কিন্তু এই শীষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া লহরে লহরে বাহির হয়। ইহা বিলাতী

রবিন পাখার মত গৃহ-প্রাচীরে ও গবাক্ষে আসিয়া উপবেশন করে ও ইহার জীবন-যাপন প্রণালীর সঙ্গে উক্ত পাখীর সাদৃশ্য দেখিয়া ইংরাজ ইহার নাম দিয়াছেন--The Indian Robin.

পিদ্দা।

এই ক্ষুদ্র বিহঙ্গটির কণ্ঠস্বর খুবই সুমিষ্ট, মধুর ও করুণ। নিম্নবঙ্গে ইহাকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না; ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তরময় প্রদেশে, আবাদী জমীতে কিংবা ঝোপ-জঙ্গলে ইহা অবস্থান করে। ইহা খুব লাজুক নহে—সহজেই পোষ মানে। সেই কারণে পশ্চিম অঞ্চলে ইহা খুব আদরের খাঁচার পাখী। এই পিদ্দাটির বিশিষ্ট নাম কাল-পিদ্দা, কারণ, ডানা ও

পিদ্দা।

উদরে একটু-আধটু সাদা ব্যতীত ইহা সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। ইংরাজের নিকট ইহা The Common Pied Bush-chat নামে পরিচিত। এই চঞ্চল পাখীটির পুচ্ছটি অনবরত গতিশীল—ইহার তৃপ্তি ও বিরক্তির সহিত পুচ্ছ-নৃত্যের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়।

খর-পিদ্দা।

এটি কাল-পিদ্দার একটি জাতি। বর্ণ অন্য রকম, বাহার একটু বেশী। দেহের উপরিভাগ কাল, নিম্নভাগ উজ্জ্বল লাল, কণ্ঠে শুভ্ররেখা। কিন্তু এই নয়নরঞ্জন পাখীটিকে আমরা বড় দেখিতে পাই না; ইহা শস্যক্ষেত্রে, ঝোপে-জঙ্গলে আপনাকে লুকাইয়া রাখে, মনুষ্যসঙ্গ সযত্নে পরিহার করিয়া চলে। শীতকালে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র ইহাকে দেখা যায়—বাঙ্গলা-দেশেও ইহা আগমন করে, এমন কি, কলিকাতার বাহিরে পল্লী অঞ্চলের আশে-পাশে ইহাকে খুঁজিলে যে পাওয়া যায় না, এমনও নহে। এ পাখী গ্রীষ্মকালে হিমালয়প্রদেশে কিংবা আরও উত্তরে প্রয়াণ করে। কাল-পিদ্দার মত ইহার কণ্ঠস্বর সুললিত নহে। শস্যক্ষেত্রে অনিষ্টকর কীট নাশ করে বলিয়া ইহা চাষীর সুহৃৎ। ইংরাজ ইহার নাম দিয়াছেন The Indian Bush-chat.

কালী শ্যামা।

লালকণ্ঠ।

বাঙ্গলার এই ছোট্ট সুন্দর পাখীটি দোয়েল বুলবুলের মত সচরাচর আমাদের নজরে পড়ে না। ঝোপে-ঝাপে, ঘাসের অন্তরালে, ইক্ষুক্ষেত্রে ইহারা কীট-পতঙ্গের অন্বেষণে বিচরণ করে। একটুতেই ইহারা ভয় পাইয়া আত্ম-গোপন করে। ইহাদের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, দুঃখের বিষয়, মানবের গৃহে ইহার আদর পরিলক্ষিত হয় না। ইহাদের দেহের বর্ণ পিঙ্গল, চোখের উপর ও নিম্ন দিয়া দুইটি সাদা রেখা চলিয়া গিয়াছে, এবং কণ্ঠ লাল। ইহার ইংরাজী নাম —The Common Ruby-throat.
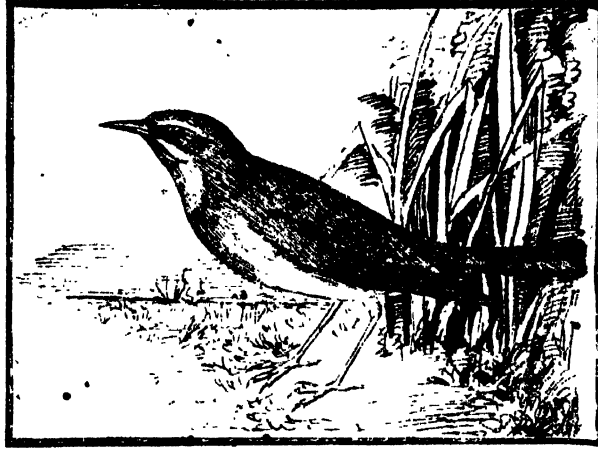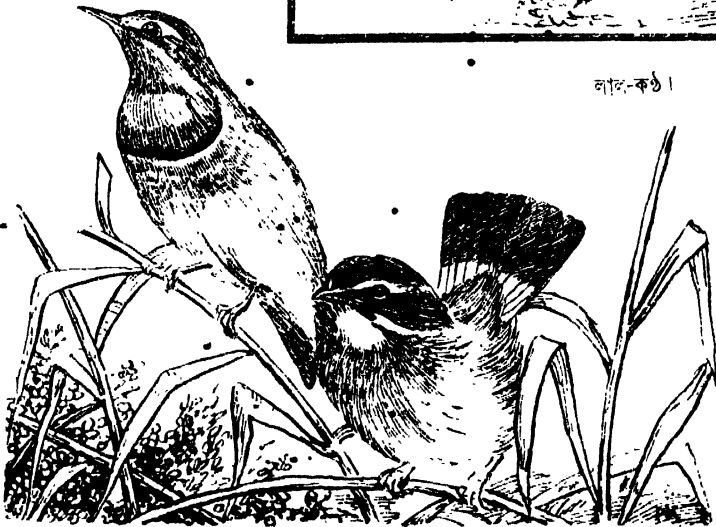
লাল-কণ্ঠ।

নীলকণ্ঠ।

নীল-কণ্ঠ।

সুন্দর-বর্ণচ্ছটা-সমন্বিত এই পাখীটিও লালকণ্ঠের মত গোপন-স্বভাব। বাঙ্গলায় শরৎকালে যখন শান্তশোভায় সজ্জিত হয়, তখন এই বিহঙ্গ এ দেশে সুদূর উত্তরমেরু-প্রান্ত হইতে আগমন করে; জল-সান্নিধ্যে ঘন কাশ ও ঘাসের মধ্যে, ইক্ষু-ক্ষেত্রে ও শস্যক্ষেত্রে আহার খুঁজিয়া বেড়ায়। জমীর উপরই ইহারা থাকে—খঞ্জনের মত খুব দ্রুত দৌড়াইতে পারে; মাঝে মাঝে উড্ডীয়মান পতঙ্গও নিপুণভাবে শীকার করে। ইহার কণ্ঠদেশের উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণবিন্যাস খুব সুন্দর, কিন্তু তাহা সহজে চোখে পড়ে না। মানুষ দেখিলেই এ পাখী লুকাইয়া যায়, কিছুতেই বাহির হয় না। ইহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট—শুধু তাই নহে, অন্যান্য পাখীর স্বরও অনুকরণ করিতে পারে। ইহার ইংরাজী নাম—The Indian Blue-throat.

দোয়েল।

খঞ্জনিদা।

এমন সুগায়ক পাখী ভারতবর্ষে আর নাই। পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে বাগানে ও গৃহসংলগ্ন খোলা মাঠে ইহাকে দেখা যাইত; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন নগরের প্রসারে ও ঘর-বাড়ীর বাহুল্যে খোলা যায়গার অভাব হওয়ায় এই পাখী কলিকাতা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এখন শুধু গ্রামেই ইহাকে পাওয়া যায়; ইংরাজ ইহাকে Mag-pie Robin নামে অভিহিত করেন।

দোয়েল।
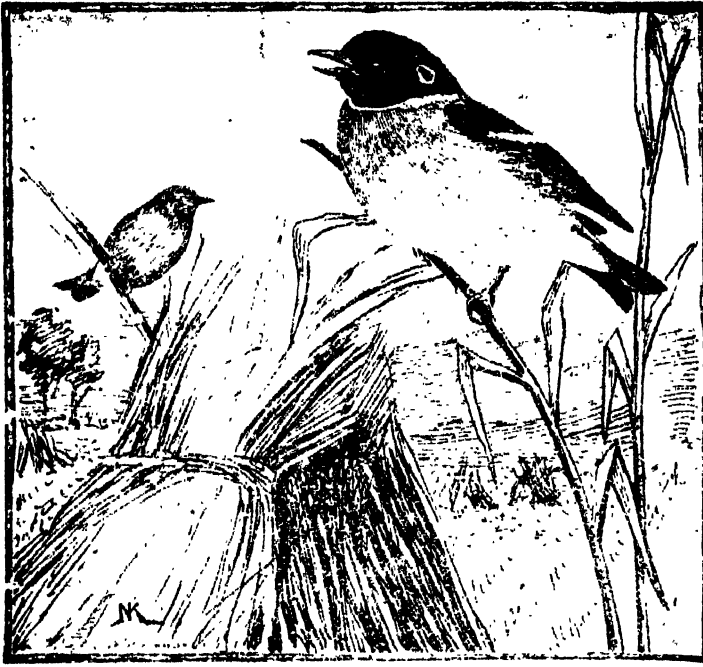
দোয়েলের পরিচয় বাঙ্গালী পাঠককে বিশেষ করিয়া বোধ হয় দিতে হইবে না। এমন ঘন-চিক্কণ-কৃষ্ণ ও দুগ্ধফেননিভ শুভ্রতার সুন্দর সমাবেশ, এমন অঙ্গসৌষ্ঠব, এমন সদর্প গতি ও পুচ্ছলীলা বাঙ্গালার অন্য কোনও পাখীতে দেখা যায় না। দোয়েল মানবালয়ের আশে-পাশেই থাকে এবং বেশ নির্ভীক ভাবে বিচরণ করে; অতি সহজেই পোষ মানে ও পালকের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে। প্রভাত-সন্ধ্যায় ইহার সুললিত কাকলী বাঙ্গালার পল্লীভূমি মুখরিত করিয়া রাখে। শ্যামা ব্যতীত
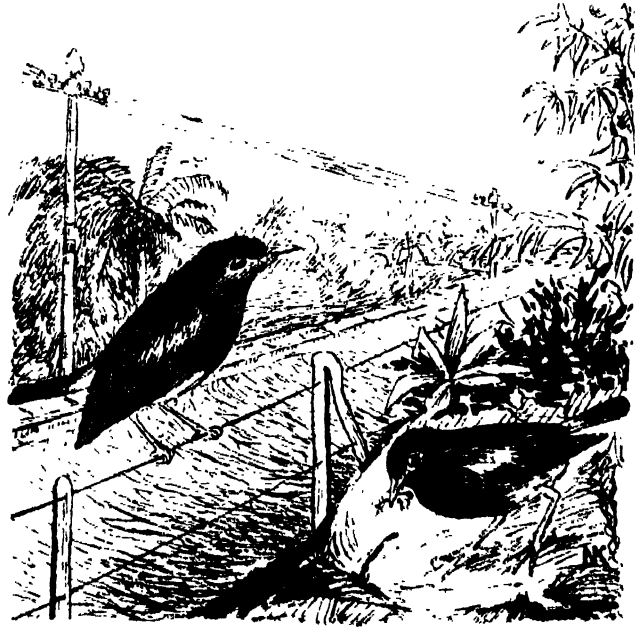
পিদ্দা।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

আধুনিক শিক্ষা।

"গুড্-মর্ণিং গুরুদেব।"

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন।

জ্ঞানেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পরম ভক্ত শল্য-চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল

জ্ঞানেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল।

মহাশয়ের অকালবিয়োগে আমরা শোকার্ত্ত হইয়াছি। তিনি যে কেবল চিকিৎসক-হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে, পরন্তু তিনি সাহিত্যচর্চ্চাও করিয়াছিলেন। তিনি 'গোপালের মা' নামক পুস্তকখানি ছদ্মনামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সার বিঠলদাস ঠাকুরসী

বোম্বাইয়ের ব্যবসাক্ষেত্রে সুপরিচিত সার ... মৃত্যু হইয়াছে।

সার বিঠলদাস ঠাকুরসী।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি এলফিনষ্টোন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ও বড়লাটের ব্যবস্থাপ[ক] সদস্য ছিলেন। তিনি বোম্বাই কলওয়ালাদিগের সভাপতি ছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শি[ল্প] অধিবেশনে তিনিই সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন বোম্বাইয়ের ৫টি কাপড়ের ও সূতার কলের কর্ত্তা ছি[লেন]।

মতিলাল ঘোষ

গত ১২শে ভাদ্র মঙ্গলবার 'অমৃতবাজার পত্রিকার' অন্যতম প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রায় ৭৬ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। যশোহর জিলার মাগুরা গ্রামে মতিলালের জন্মগ্রাম। হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল—জননীর নামে গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে অমৃতবাজার নামে পরিচিত করিয়াছিলেন।

মতিলাল ঘোষ

বাঙ্গালার—কেবল বাঙ্গালার কেন সমগ্র ভারতের রাজনীতিক ব্যাপারে 'অমৃতবাজারের' প্রভাব ও প্রতাপ কাহারও অবিদিত নাই। সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় আসিয়া এই কয় ভ্রাতা কেবল আন্তরিক যত্ন চেষ্টায় 'অমৃতবাজার পত্রিকাকে' ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। 'অমৃতবাজার'কে মারিবার জন্য লর্ড লিটন "ভার্ণাকুলার প্রেস" আইন বিধিবদ্ধ করিলে 'অমৃতবাজারের' পরবর্ত্তী সংখ্যা ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। তখন ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, শিশিরকুমার ধুতি ত্যাগ করিয়া [illegible] পরিতেছেন আর লর্ড লিটনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন [illegible] —কর্ম্মচারী—অনাচারী অমাত্য ভয় করিত; 'অমৃতবাজারের' দাপে সার লেপেল গ্রিফিন ভূপালের রেসিডেন্সী ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন; মিষ্টার বিমস্‌কে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

দেশকে মতিলাল ও শিশিরকুমার যেমন চিনিতেন, তেমন অনেকে চিনেন না। দেশের অভাব অভিযোগ 'অমৃতবাজারে' যেরূপে বর্ণিত হইত, সেরূপে আর কোন পত্রে তখন বর্ণিত হইত না। প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে কৃষ্ণনগরে মতিলাল যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিছু দিন হইতে তাঁহার অবস্থা শঙ্কাজনক হইয়াছিল এবং তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয় দিন মাত্র পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বিদায়-বাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—

"আমি আমার মাতৃভূমির জন্য যে কিছুই করিতে পারিলাম না, ইহা আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি এবং ইহা ভাবিতে আমার কষ্ট হইতেছে। আমরা প্রাচীন দল দেশের জন্য যাহা করিতে পারি নাই, তাহা, আমাদের অপেক্ষা যোগ্যতর ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সম্পন্ন করিবেন, এই আশা লইয়াই আজ আমি পৃথিবী হইতে বিদায় লইতেছি। আমি যখন আমার এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিব, তখন [illegible] অলক্ষিতে থাকিয়া দেশের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে; দেশমাতৃকার সেবায় নিরত সমস্ত কর্ম্মীকেই আমি আমার আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি এবং এই পবিত্র মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তিনি যেন দেশের এই স্বাধীনতার সংগ্রামে সকলকে সাহস ও শক্তি প্রদান করেন।"

শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কারারুদ্ধ হইবার সময় শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে বঙ্গীয় "প্রাদেশিক-সভাপতি" মনোনীত করিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দর বাবু জেলে যাইলে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ সেই পদ পাইয়াছিলেন। এতদিন তিনি "প্রত্যর্পিতন্যাস" হইয়া চাঁদপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি সঙ্কটকালে যে ভাবে কংগ্রেস-কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে [illegible] তাঁহার।

খদ্দর-শারদ-শ্রী

নামক পুস্তকখান